প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

অষ্টাদশ ভাগ—প্রথম খণ্ড

১৩২৫ সাল, বৈশাখ—আশ্বিন

প্রবাসী-কার্য্যালয়
২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২৫ বৈশাখ—আশ্বিন

১৮শ ভাগ ১ম খণ্ড

বিষয়-সূচী

সূচীপত্র

সূচীপত্র

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

চিত্র-সূচী

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ ১৩২৫

১ম সংখ্যা

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে,
কে তারে বাঁধ্‌ল অকারণে।

গতিরাগের সে ছিল গান,
আলো-ছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চম্‌কে দিত বনে।
কে তারে বাঁধ্‌ল অকারণে।

মেঘ্‌লা দিনের আকুলতা
বাজিয়ে যেত পায়ে
তমাল-ছায়ে-ছায়ে।

ফাল্গুনে সে পিয়াল-তলায়
কে জানিত কোথায় পালায়
দখিন্ হাওয়ার চঞ্চলতার সনে।
কে তারে বাঁধ্‌ল অকারণে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিল্প ও সৌন্দর্য্যের রহস্য *

(ভক্ত দাদূর বাণী হইতে)

পূজ্যপাদ ভক্ত রামানুজ স্বামীর সময় হইতে গুরু রামানন্দের সময় পর্য্যন্ত শুদ্ধ সংযত ও সাধনাপরায়ণ আচারী বৈষ্ণব-গুরুগণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কাছেই ধর্ম্ম দান করিয়া ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া আসিতেছিলেন। শাস্ত্রে উপদিষ্ট, মঠ-মন্দিরাদিতে পালিত, ব্রাহ্মণাদির দ্বারা আচরিত যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত রাখিয়াছিল।

গুরু রামানন্দ এই বিশুদ্ধ "আচারী পন্থা" পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রে অনধিকারী প্রাকৃত জনগণ যেখানে পথের ধূলায়, দীনহীন প্রান্তপল্লীতে, নিঃশব্দে, বিনম্রভাবে, তাহাদের আপন হৃদয়ের অনুভূত ধর্ম্ম ও ভাব সাধন করিতেছিল, সরল সহজ সত্যের অনুসন্ধান করিতেছিল, সেখানে সরিয়া পড়িলেন। কেন সরিলেন ও কেমন করিয়া সরিলেন তাহা আজিকার আলোচ্য নহে। সুযোগ হইলে ধর্ম্মের সেই প্রাকৃত পথে যাত্রার ইতিহাস সময়ান্তরে বলিব।

যে ধর্ম্ম কেবল বিপ্র ও যতিজনের সাধনার বিষয় ছিল, গুরু রামানন্দের কৃপায়, তাহা জোলা ধুনুরী মুচি ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্ম ও সাধনরূপে ছড়াইয়া পড়িল।

* ২৯শে ফাল্গুন ১৩২৪, বিচিত্রা সভায় পঠিত।

ইহার পূর্ব্বেও বৌদ্ধযুগের অবসানে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ রূপ ধর্ম্মসাধন ছিল; কিন্তু এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ও কোনোরূপ কুৎসিতাচার দ্বারা ইহা কিছুমাত্র কলুষিত নহে।

গুরু রামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে কবীর একজন প্রধান। অনেকে বলেন ইউরোপে লুথারের ধর্ম্মমত যতদূর ছড়াইয়াছে কবীরের ধর্ম্মমত তাহা অপেক্ষা বহু বহুগুণে বেশীদূর ছড়াইয়াছে, অথচ লুথারের সঙ্কীর্ণতা তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না, এবং এই ধর্ম্ম বিপ্লব কোনো অস্ত্রের সাহায্যে সাধিত হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্ম যেমন উদার, তেমন করুণায় ও শান্তিতে স্নিগ্ধ।

আচারী বৈষ্ণবগণ অনেক পরিমাণে সাকার উপাসক ছিলেন; যদিও তাঁহাদের দর্শনাদি খুব উঁচুদরেরই ছিল। কাজেই তাঁহাদের সময় মূর্ত্তির লক্ষণাদিতে আবদ্ধ থাকায় ও পূজার কার্য্যেই ব্যবহারে লাগায়, আর্ট্ জিনিষটা মুক্ত ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এখন প্রাকৃত জনের সাধনার দিনে সুযোগ আসিল। ইঁহারা প্রায়ই নিরাকারবাদী ও শাস্ত্রের অনুশাসনাদি হইতে মুক্ত, অথচ ভাবে ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তায় পরিপূর্ণ। তাই কবীর প্রভৃতির সময় হইতেই আর্টের নানাবিধ প্রেরণার সন্ধান পান নাই। যদিও তাহা টেক্‌নিক্ (technic) বা আর্টের কোনোরূপ অনুশাসন-মাত্র নহে।

পূর্ব্বতন সাধকগণের প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কবীর গৃহী-সন্ন্যাসী হইলেন। যেহেতু কবীর পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন তাই আর ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার যখন পুত্র হইল তখন তাহার নাম রাখিলেন "কমাল"। "কমাল" কথাটির বাংলা করা সহজ নহে; তাহা পরম-পরিপূর্ণতা, অপরূপ ও অপরিমিত কল্যাণ ও আরো অনেক কিছু। এই পুত্রটি পরে অতিশয় গভীর ভাবের সাধক হইলেন। ইনি কোনো দিন বাহিরের আচারের দাস ছিলেন না। এমন কি, কবীর প্রভৃতির অনিচ্ছাসত্ত্বেও একএকটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইঁহার চারিদিকে কোনো সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবার সুযোগমাত্র পায় নাই। ইনি অতিশয় ধীর, প্রশান্ত, ভাবরসিক, মরমী সাধক ছিলেন। ইনি অতিশয় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও রসের সমজ্‌দার আর্টিষ্ট্ ছিলেন বলিয়া ইঁহার কাছে যাহারা আসিতেন তাঁহারাও সঙ্গগুণে সেইসব দোষে দূষিত হইয়া যাইতেন। তাই সাধকসমাজে কথা আছে—

"ডূবা বংস কবীরকা জব উপজা পুত্র কমাল"

"ঐ যে পুত্র-কমাল জন্মিল, তাহাতেই কবীরের বংশ রসাতলে গেল।" কবীর কিন্তু এই পুত্র জন্মিতেই ধ্যাননেত্রে ভবিষ্যৎকে মহিমায় সমুজ্জ্বল দেখিয়া মহোৎসব করিলেন। তিনি গাহিলেন—

> "অহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরৌ মঙ্গর থার।
> ঘর আঙ্গনকী কদর ভঈ হৈ রাহ হৈ গুলজার॥
> জনম মরন মেঁ কদম তুম্হারা অরস ভয়া হৈ কাল।
> মেরা ঘরমেঁ ডেরা লগায়া পায়া হম কমাল॥
> কৌনসী সেবা করিহোঁ তুমকো কৌন করিহোঁ পূজা।
> পন্থ পন্থী ঘর একহি হৈ জী ভার মিটা অব দূজা॥"

"অসীম-যাত্রী আমার ঘরে আজ অতিথি আসিয়াছেন, মঙ্গল থালী সম্মুখে ধর, আজ আমার গৃহ ও অঙ্গন ধন্য হইয়া গেল, আপন যাত্রার পথ (পুষ্পময়) গুলজার করিয়া এ উপস্থিত। জন্ম ও মরণ তোমার পাদক্ষেপ, হে যাত্রী, কাল তোমার নিকট শক্তিহীন। আমার ঘরে যে তুমি ডেরা লইলে ইহাতেই আমি কমাল পাইলাম। কিরূপ সেবা তোমার করিব, কি করিব তোমার পূজা? পথ, পথিক ও গম্য ঘর সবই যে দেখিতেছি একই, সব দ্বৈত ভাব আজ মিটিয়া গেল।"

এই যে তাঁহাকে কমাল—অর্থাৎ পরিপূর্ণতা (Perfection) বলিলেন—ইহাতেই তাঁহার নাম কমাল হইয়া গেল।

দাদূর সহিত কেমন করিয়া ইঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং গৃহী ও মুচী দাদূ কেমন করিয়া সাধকগণের অগ্রগণ্য হইয়া গেলেন—তাহাও আজ বলিবার বিষয় নহে।*

দাদূ বিপত্নীক হইয়াও মুচীর কাজ করিয়া আপনাকে পালন করিয়া আরও দশজনকে সাহায্য করিতেছিলেন। তিনি স্বভাবতই শুদ্ধচরিত্র ও পরম দয়ালু ছিলেন। কমালের সঙ্গ পাইয়া তিনি সাধনার গভীর অন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং সৌন্দর্য্যের গূঢ় রহস্যেরও সন্ধান পাইলেন। এই

* Note—Wilson, Siddons প্রভৃতি সাহেবের মতে কমালের পরই দাদূ নহেন। মধ্যে জমাল বুদ্ধন প্রভৃতি গুরু আছেন, কিন্তু এই গুরু পরম্পরায় সুধাকর দ্বিবেদীর মতকে অনুসরণ করিয়াছি। দাদূর ইতিহাস লিখিবার সময় ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিব।

জন্যই দাদূ তাঁহাকে প্রায়ই কমাল বলিয়া উল্লেখ না করিয়া "সুন্দর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দাদূ যখন ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তিনিও চক্ষু কর্ণ বুজিয়া নির্ব্বিকল্প ধ্যানে ডুবিলেন না। কবীরের মত তিনিও

আঁখ ন মূদূঁ কান ন রূঁধু কায়া কষ্ট ন ধারূঁ
অগল বগল মেঁ হঁস হঁস দেখূঁ সুন্দর রূপ নিহারূঁ (কবীর)

চক্ষুও বুজিলেন না, কানও রুদ্ধ করিলেন না—সৌন্দর্য্যে ও সঙ্গীতে ভরপুর হইয়া পরম আনন্দে চারিদিকে চাহিয়া সুন্দরের রূপ দেখিতে লাগিলেন।

প্রথমে তিনি অসীম ও নিরাকারের ধ্যানে ডুবিয়া সব রূপ ও রস হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রিয় রসিক মরমী মন—যেমন ভাবের জন্য তেমনি রূপের জন্য সমান ব্যাকুল। তাই তিনি আকার (form) ও ভাব এই দুইয়ের জন্যই পিপাসিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অবশেষে রূপে ও ঘটে তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি কহিলেন—

জা কারন জগ ঢূঁঢিয়া সো হৈ ঘটহি মাহি
ডুবত নাহিঁ প্রাণ মেঁ তাতেঁ জানত নাহি।

অন্তরে

"যাহার জন্য জগৎ ঢুঁড়িয়া মরিলাম সে যে দেখি ঘটেরই (form) মধ্যে। প্রাণের মধ্যে না ডুবিলে ঘটের এই রহস্যটি বুঝা যায় না—তাই এতদিন ইহা বুঝিতে পারি নাই—এখন প্রাণের অতল রসে ডুব দিয়া রূপের রসটি আবিষ্কার করিলাম।"

চৈতন্য চাই

সাধারণ মানুষ জড়ের মত হয়—রূপের পূজা করে, আর না হইলে—রূপকে চাহিয়াও দেখে না; তাই সৌন্দর্য্য-রসের যে "স্বাদ" যে "আনন্দ" তাহা এই বিশ্বে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। "এই আনন্দ পাইতে হইলে জাগিতে হয়, জাগ্রত আত্মার কাছেই এই আনন্দ ধরা দেয়, জড়ত্বের-নিদ্রায় যে আচ্ছন্ন সে এই স্বাদ পাইবে কোথায়? প্রেম না হইলে যে এই রহস্যের চাবী খোলে না—তাইতো এই আনন্দের সন্ধান সহজে মেলে না।"

জড়মত জির জানই নহী পরম স্বাদ সুখ জাই।
জাগত জো আনঁদ করই সো পারই সুখস্বাদ।
দাদূ সুরস ন পাইবে প্রেম গবাঁয়া বাদ॥

সকলে কহিল "দাদূ, ছিলে তুমি সাধক, এখন হইলে তুমি 'সানী' (শিল্পরসিক) ও 'মুসউয়র' (চিত্রকর) মাত্র,—এ হইল কি? রূপ ও আকার দিয়া তোমার কিসের প্রয়োজন? তুমি হইলে অরূপ অসীমের সেবক!"

রূপমালা

দাদূ কহিলেন—হে সাধকগণ, এই যে সব রূপ, ইহাই আমার জপমালা। ধর্ম্মের ব্যর্থ আচার পালন করিয়া দেখিয়াছি আমার অন্তর পূর্ণ হয় নাই। "হে ভগবান, তোমার এমন সুন্দর যে নাম তার উপযুক্ত মালাই এই বিশ্বের সব আকার (form), এই বিশ্বের আকার যে নিরন্তর চলিয়াছে তাহাতেই তোমার জপের মালার নিরন্তর 'জাপ' হইতেছে।"

মালা সব আকারকী সাধূ সুমিরই রাম।
করনী করতে ক্যা কিয়া ঐসা তেরা নাম॥

"হে দাদূ ঘটেই তো সুখ ও আনন্দ। ঘটের এই আনন্দের স্বাদ পাইলে সব-কিছু ঠাহর করিতে পারিবে। ঘটের এই আনন্দ যে না জানিল, সে যে কখনও সুখী হইয়াছে এমন তো দেখি নাই।"

দাদূ ঘট মেঁ সুখ আনন্দ হৈ তব সব ঠাহর হোই।
ঘটমেঁ সুখ আনন্দ বিন সুখী ন দেখ্যা কোই॥

কেন তোমার চারিদিকে নিরন্তর গ্রহ চন্দ্র তারা ঘুরিতেছে? প্রত্যেকের চারিদিকে এই যে বিশ্বচক্র ঘুরিতেছে ইহাই অমৃত। ঘানী ঘুরিলে যেমন তৈল চুয়াইয়া পড়ে—তেমনি প্রত্যেকের চারিদিকে এই যে বিশ্বচক্র চলিতেছে ইহাতেই ভাবসৌন্দর্য্যের অমৃত নিষ্যন্দিত হইতেছে। এই চক্র যদি কখনও বন্ধ হয় তবে বস্তুর বিষম পুঞ্জে ও বিপুল চাপে জগৎ পিশিয়া যাইবে। কিন্তু সে যে নিত্য চলিয়াছে তাই অমৃত মহারসের ধারা নিত্য বহিয়া যাইতেছে।

ঘর ঘর ঘট কোল্হূ চলৈ অমী মহারস জাই॥

"এই তোমার মধুর নামের জন্য তোমাকে ভজনা করি, গতির জন্য ভজনা করি তোমাকে। প্রেমের জন্য ভজি তোমাকে, এমন করিয়াই তো রস হয় সুন্দর।"

নাব নিমিত্ত সোই ভজই, গতি নিমিত্ত ভজই সোই।
প্রেম নিমিত্ত সোই ভজই, যোঁ রস সুন্দর হোই॥

গতির অমৃত

বিশ্বের রক্ষাই এই যে সে নিত্য যাত্রা করিয়াছে। নহিলে রূপ আকার ও বস্তুর ভিড়ে জগতে সকলে যে দম বন্ধ হইয়া মরিত। এই অপরূপ সুন্দর বিশ্বে তাহা অসম্ভব। মূর্ত্তি (form) ও সৌন্দর্য্য তাই ক্রমাগতই চলিয়াছে এবং বলিতেছে—"অগম ও অগোচরের মন্দিরে আমরা অর্থাৎ মূর্ত্তি (form) ও সৌন্দর্য্য সবাই যাত্রা করিয়া চলিয়াছি।" আমার মনও তাই এই গোচর সৌন্দর্য্যের "সঙ্গে সঙ্গে অগম অগোচরের" মন্দিরে যাত্রা করিয়াছে।

মুরতি পুকারই সুন্দরী অগম অগোচর জাই॥

সে রসমন্দির যে দূরে নহে—সে যে আমারই অন্তরে। সেই মন্দিরে বসিয়া দেখি আমার মন্দিরে "মোহন" আসিয়াছেন। "তাঁহার দিকে চাহিয়া গগনের কোটি সূর্য্য পদ্মের মত ঝলমল করিয়া আকাশের নীল সরোবরে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহাদের অঙ্গে কি অপরূপ অনন্ত জ্যোতি! আমার মন্দিরে যে 'মোহন' আসিলেন, তাই আমার জীবন মন না উৎসর্গ করিয়া থাকিতে পারি কেমন করিয়া? তাই তো আজ সৌন্দর্য্যের পরম আনন্দ আমার মন্দিরে বিরাজিত, যুগ যুগ এই রস এই রঙ্গই চলিয়াছে। এই মোহনকে যে দেখিয়াছে তাহার মন্দিরে নিত্য উৎসব"—

পদম কোটি রবি ঝিলমিলে অংগ অংগ তেজ অনংত।
মো মন্দির মোহন আরিয়া বারঁড় তনমন জীব।
দাদূ সুন্দরী সুখ ভয়া জুগ জুগ য়হ রসরংগ॥

মোহন-উৎসব

"হে মোহন, এই যে সব ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড পরম সৌন্দর্য্য-লীলার উৎসবময়, ইহা তোমারি লীলা। হে পরমেশ্বর, তোমার পবন, তোমার সলিল, তোমার রবি, তোমার চন্দ্র, সবাই যে আমায় মোহিত করিয়া রাখিয়াছে! সপ্তসাগর, ধরণী, ধরা, অষ্টকুল পর্ব্বত, মেরু, যে দিকে তাকাই, নয়ন একেবারে মোহিত হইয়া যায়! আমি যে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। হে জগতজীবন, তোমার ত্রিভুবন দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল! সকল সৌন্দর্য্যে নিরন্তর তোমারই পূজা শোভা পাইতেছে! অগম, অগোচর, অপার অসীম তোমার লীলা! হায় যে তোমার এই লীলা না দেখিল! হে সুন্দর, কি শোভাই তোমাতে শোভিত দেখিলাম! কি বলিয়া যে বলিহারি যাইব তাহাই বুঝিতে পারি না।"

যে সব চরিত তুম্হারে মোহন মোহে সব ব্রহ্মংড খংডা।
মোহে পবন পানী পরমেশ্বর সব মুনি মোহে রবি চংডা॥
সায়র সপ্ত মোহে ধরনীধরা অষ্টকুলা পর্ব্বত মেরু মোহে।
তিন লোক মোহে জগজীবন সকল ভবন তেরী সের সোহে॥
অগম অগোচর অপার অপরংপার কো য়হ তেরে চরিত ন জানহিঁ।
য়হ সোভা তুম্হকো সোহই সুন্দর বলি বলি জাউঁ দাদূ ন জানহিঁ॥

রূপের পূর্ণতা অরূপ-অসীমে

আমি রূপে ও সৌন্দর্য্যের জন্য এরূপ ব্যাকুল বলিয়া মনে করিও না যে আমি রূপের অতীত নির্ব্বিকল্প নিরাকার "এক রসের" "অচিত্র" ধামের সংবাদ জানি না। সেখানকার তীর্থে ডুব দিয়াই তো মোহন বিচিত্র ধামের রহস্য বুঝিয়াছি। "যেখানে ঋতুর পরিবর্ত্তন নাই সেই পরমধাম আমি দেখিয়াছি—আমি তো সেই দেশেরই লোক, তাই এক-রস দেশ হইতে বিচিত্র-রস দেশে আসিয়াছি রস-মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। যেখানে না আছে নিকট, না আছে দূর, সে দেশ আমি দেখিয়াছি। যে দেশে নিত্য পূর্ণতা, আমি তো সেই দেশেরই লোক। যে দেশে না আছে নিশা, না আছে দিবা, না আছে আলো, না আছে ছায়া, যেখানে নিরঞ্জনরূপে রাম বিরাজমান, আমি তো সেই দেশেরই লোক। সেখানকার লোক বলিয়াই এই বিচিত্র সুন্দর ধামকে আমি সম্ভোগ করিতে পারি। সেখান হইতে যে সহজ রূপের মহাধামে আসে—সে বারমাস যে উপজিতে থাকে (অঙ্কুরিত হয়, বাড়ে ও সমস্বরে বাজিতে থাকে), সে কখনও শুষ্কতা ও দৈন্যকে প্রাপ্ত হয় না। বেদ কোরান এই রহস্যের কি জানে? রসের এই রহস্য-লোকে তাহাদের প্রবেশই নাই। এ এক আশ্চর্য্য ধাম, সেখানে কি যে অপরূপ লীলা দেখিলাম, তাহা বুঝাইব কেমন করিয়া?"

একদেশ হম দেখিয়া ঋতু নহিঁ পলটই কোই।
হম দাদূ উস দেসকে সদা এক রস হোই॥
একদেস হম দেখিয়া নহি নিয়রে নহি দূর।
হম দাদূ উস দেসকে রহে নিরংতর পূর॥
এক দেস হম দেখিয়া নহিঁ নিসদিন নহিঁ ঘাম।
হম দাদূ উস দেসকে নিকট নিরংজন রাম॥

বারহমাসউ উপজই তঁহা কিয়া পরবেস।
দাদূ সুখা ন পড়ই সহজ রূপ উস দেশ ॥
বেদ কোরানকা গম নহী তহাঁ নাহিঁ পরবেস।
তহঁ কছু অচরজ দেখিয়া যহ কছু ঔরহি দেশ ॥

সেই অরূপেতেই এই রূপের সার্থকতা। ভাবেতেই তো সব আকারের সার্থকতা। "তিল যে তাহার প্রাণ হইল তৈল, সকল ফুলের জীবন হইল তাহাদের সুরভিতে, ক্ষীরের মধ্যে নবনীতই হইল জীবন, পরমাত্মার মধ্যেই সকল আত্মার যথার্থ জীবন।"

দাদু জিয়ে তেল তিলনমেঁ জিয়ে গন্ধ ফুলন্নি।
জিয়ে মথুন ছিরমৈ জিয়ে রূব রংহন্ন ॥

আকার ও নিরাকারের এই নিত্য বৈষম্যের সামঞ্জস্য কোথায়? "আমার যাহা দেহ তাহা রহে রূপময় সংসারে, আমার জীবন রহে ভগবানের কাছে।"

দেহ রহৈ সংসারমেঁ জীব রামকে পাস ॥

রূপের অতীতকে দেখিয়াছি বলিয়াই তো রূপকে সম্ভোগ করিতে পারিয়াছি। নহিলে রূপকে পাইবার এই তৃষ্ণাটাই জন্মিত না! অরূপ ধাম হইতে আসিয়াছি বলিয়াই তো—"আমার প্রতি রোমে রোমে রসের পিপাসা চীৎকার করিতেছে। হে বিধাতা, হৃদয়ে ভাব-ঘন-ঘটা ঘনাইয়া রস বর্ষণ কর। হে রসময়, এই রস প্রেম আমার পঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতি রোমে রোমে 'প্রেমময়' 'প্রেমময়' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, আর কোনো ডাক তাহার নাই। তোমার প্রেমে সকল দেহ বসনা হইয়া তোমাকে আস্বাদ করিতে চাহে, সকল দেহ রসনা হইয়া গাহিতে চাহে, সকল দেহ নয়ন হইয়া তোমার অপরূপ রূপ সম্ভোগ করিতে চাহে—বিরহ হইয়াছে বলিয়াই তো এই রূপ-বৈচিত্র্য দেখিতে পাইলাম—ইহাই তো বিরহের দৃষ্টি"—

রোম রোম রস প্যাস হৈ দাদূ করই পুকার।
রাম ঘটা দিল উমগি করি বরসহু সিরজনহার ॥
প্রীতি জো মেরে পীরকী পইঠি পংজর মাহি।
রোম রোম পিয় পিয় করই দাদূ দুসর নাহি ॥
সব ঘট রসনা সুরতি সোঁ সব ঘট রসনা বৈন।
সব ঘট নৈনা হোই রহই দাদূ বিরহা ঐন ॥

বিরহ ও তৃষ্ণা

আমার বিরহের ব্যাকুলতা এত তীব্র কেন? সমস্ত বিশ্বভুবনকে পাইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই কেন? এই বিরহ যে তাঁরই তৃষ্ণা। তিনি আমার মধ্য দিয়া আপন রূপ দেখিতে চান। আমি তাঁর দর্পণ মাত্র। আমার মধ্য দিয়া আপন রস পান করিতে চান—তাই এই দর্পণে এই অমৃতরসের অঞ্জলির মধ্যে বিশ্বের পিপাসা নিহিত রহিয়াছে। দর্পণ ছাড়া যে নিজের রূপখানি নিজেরই গোচর হয় না—

দরপন মাহৈঁ দেখিয়ে অপনা সুঝই আপ।
দরপন বিনা সুঝই নহী দাদূ পুনি রূপ অরূপ ॥

উভয়ের সৃষ্টি

এই সৃষ্টি যদি একেলা তাঁহার সৃষ্টি হইত তবে কি ইহাতে আমার কোনো আনন্দ হইত। এ সৃষ্টি যে আমারও সৃষ্টি। আমাকে নহিলে তিনি এই সৃষ্টি পাইলেন কোথায়? দুগ্ধ যে বৎসের তৃপ্তি-সুধা তাহার কারণ দুগ্ধ বৎসেরও সৃষ্টি। বৎস-বিনা গাভীর দুগ্ধ হউক দেখি! তাই দুগ্ধ যেমন গাভীর, তেমনি বৎসের। তাই দুগ্ধ দিয়া গাভী যেমন সুখী, দুগ্ধ পাইয়া বৎসও তেমন তৃপ্ত। বৎসের প্রতি প্রেমেই গাভীর অন্তর রসে ভরিয়া ওঠে। আমার প্রতি প্রেম ছাড়াও বিধাতার সৃষ্টি তেমনি অসম্ভব হইত! চিত্রকর যেমন শুষ্ক বর্ণক দিয়া ছবি আঁকিতে পারেন না—তাঁর বর্ণ গুলিয়া লইতে জলের আবশ্যক হয়; তেমনি "বিধাতার শক্তি শুষ্ক বর্ণকমাত্র (মসী), আমার প্রতি যে তাঁর প্রেম সেই রসে গুলিয়া এই চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন।" তাই বিশ্বচিত্র প্রেমে রসে ভরপুর—এবং তাই ইহাতে আমার মনও পূর্ণ তৃপ্তি পায়। ইহা যে আমারও সৃষ্টি, তাই বিশ্বসৌন্দর্য্য উপভোগে আমার কোনো দৈন্য নাই—ইহাতে আমার পূর্ণ অধিকার—

"সুখী মসীতল সুরতি মতি ॥"

কি সৃষ্টিতে, কি ভোগে, ব্রহ্ম ছাড়া আমি, ও আমি ছাড়া ব্রহ্ম অপূর্ণ। "আমি যদি না থাকি তবে নাম-স্বরূপ তাঁহার সার্থকতা কোথায়? নাম উচ্চারণের দ্বারাই তো নামের সার্থকতা। আমি-ছাড়া সেই সার্থকতা হইবে কেমন করিয়া।"

মৈঁ নাহীঁ তব নার ক্যা কহা কহাবৈ আপ ॥

"যেমন নাদ ছাড়া শ্রুতি ও শ্রুতি ছাড়া নাদ ব্যর্থ, যেমন নয়ন ছাড়া রূপ ও রূপ ছাড়া নয়ন ব্যর্থ, রসনা বিনা স্বাদ ও স্বাদ বিনা রসনা ব্যর্থ, তেমনি সম্বন্ধ আমাতে ও তাঁহাতে।" এ এক অনুপম রহস্য—

শ্রবনা রাতে নাদ সোঁ নৈনা রাতে রূপ।
জিহ্বা রাতী স্বাদ সোঁ দাদূ এক অনূপ॥

কাজেই ব্রহ্মের সৃষ্টিকে যদি পূর্ণ করিতে হয় তবে তাঁহার অনুকরণমাত্র করিলে চলিবে না, ভাব ধ্যানের দ্বারা আমাকে নূতন রস সৃষ্টি করিতে হইবে। এই জন্যই ভারতের শিল্পী কখনও ব্রহ্ম সৃষ্টিকে অনুকরণ করে নাই। সে নূতন সৃষ্টি করিয়াছে। শিল্প নকল (Re-production) নহে, শিল্প নব সৃষ্টি (Re-creation)। নকল করিতে গেলে ক্রমাগতই ব্রহ্ম হইতে দূরেই সরিয়া যাইতে হয়।

চিরদিনই অসীম এই রূপসীমার জন্য ও সীমা অসীমের জন্য কাঁদিতেছে। ইহাই বিশ্বব্যাপী ক্রন্দন—এই ক্রন্দনে ও রোদনে সমস্ত ক্রন্দসী ও রোদসী ভরিয়া উঠিতেছে। "গন্ধ কহে আমি যদি ফুলকে পাইতাম, ফুল কহে আমি যদি পাইতাম গন্ধ। 'ভাস' কহে আমি যদি 'সৎ'কে পাইতাম, 'সৎ' কহে যদি পাইতাম আমি 'ভাস'। রূপ কহে যদি ভাবকে পাইতাম ভাব কহে যদি পাইতাম আমি রূপ! এইরূপ উভয়ে উভয়কে চাহে পূজা করিতে—অগাধ অনুপম এই পূজা।"

বাস কহে হম ফুল কো পাউঁ ফুল কহে হম বাস।
ভাস কহে হম সত কো পাউঁ সত কহে হম ভাস॥
রূপ কহে হম ভাব কো পাউঁ ভাব কহে হম রূপ।
আপস মেঁ দউ পূজন চাহে পূজা অগাধ অনূপ॥

সহজের সাধন

এই পূজার লীলা প্রত্যক্ষ দেখিতে চায় যে সাধক, এই রসের "মরমী" যে হইতে চাহে, তাহার সহজ হওয়া চাই। কৃচ্ছ্রসাধনমাত্র করিলে এই রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। "আমি ঘরও ছাড়ি নাই, বনেও যাই নাই, কোনো ক্লেশও করি নাই, সহজ প্রেমে এই পৃথিবী ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিই দেখিলাম।" ইহাই সৌন্দর্য্য, ইহাই অমৃত।

না ঘর তজা না বন গয়া না কুছ কিয়া কলেশ।
দাদূ জোঁহি তোঁ মিলাসহজ সুরত উপদেশ॥

নিষ্কাম সাধন

এই সহজের যে সাধক হইবে সে বিশ্বের প্রবাহকে আপন কামনা বা লোভের বশে এক মুহূর্ত্ত দাঁড় করিয়া রাখিবে না—তাহা হইলেই সমস্ত সৌন্দর্য্যের প্রবাহ স্থির হইয়া একটা বিপুল মৃত্যু-পুঞ্জ হইবে। তাহাই মিথ্যা। "যে সাধক, সে কিছুকেই বাধা দিয়া দাঁড় করায় না, মিথ্যায় কলুষিত হয় না। নদীপ্রবাহের মত মায়ার (সীমা = finite রূপ) প্রবাহ চলিয়াছে।"

রোক ন রাখই ঝূঠ ন ভাখই দাদূ খরচই খায়।
নদী পুর পুরবাহ জ্যোঁ মায়া আবই জাই॥

"সহজের সাধক ঋদ্ধি সিদ্ধি মুক্তি প্রভৃতি কিছুই চাহে না - সে কেবল প্রেম-পেয়ালার পিয়াসী।"

প্রেম পিয়ালা রাম রস হমকো ভাবই এই।
রিধি সিধি মাগই মুক্তিফল চাহ তিনহী কো দেহই॥

বৈরাগ্য

দাদূ বলেন, যে সাধক সেও "সানী" (artist)। সে শিল্পীরই মত যেমন বৈরাগী তেমনি প্রেমিক। যাহা অনিত্য (evanescent) তাহাকে সে বহিয়া যাইতে দেয়, ধরিয়া রাখে না—অথচ তাহারি মধ্যে যে একটি আধটি লগ্ন প্রেমে বাজিয়া ওঠে—তাহা প্রেমামৃত পানে আপনি সঙ্গীত হইয়া ওঠে। "যাহা প্রবাহ তাহাকে বহিয়া যাইতে দাও, অথচ যেটুকু থাকিবার সেটুকু থাকুক। যাহা রহিবার তাহা প্রেমের জোরেই থাকিবে—যাহা বহিয়া চলিল তাহার পিছে পিছে দৌড়াইয়া কোনো লাভ নাই"—

দাদূ রহতা রাখিয়ে বহতা দেই বহাই।
বহতে সংগ ন জাইয়ে রহতে সোঁ লব লাই॥

Sympathy, প্রাণ-পরশ

সহজের যে সাধক, সকলের সঙ্গে তাহার প্রাণপরশ (sympathy) চাই, নহিলে কিছুরই সৌন্দর্য্য ও অমৃত সে লাভ করিতে পারিবে না। "প্রতি ঘটে (রূপে ও আকারে) যাহা হইয়া চলিয়াছে, প্রাণ দিয়া পরশ করিতে পারিলে তবে সেই অমৃত রস মেলে।"

ঘটঘটকে হোনহার সব প্রাণ পরস হোই জায়॥

এই প্রাণ পরশ হইলে সমস্ত খণ্ডতা অর্থাৎ সীমার ও আকারের বন্ধন হইতে মুক্তি মিলে। "খণ্ড মুক্তির জন্যই সবাই সাধন করে, প্রাণ-মুক্তির সাধন তো কেহই করে না। যে জন প্রথমে প্রাণকে জানিয়া প্রাণ পরশ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে, সে কোথাও লিপ্ত না হইয়া মুক্তভাবে সমস্ত রূপ ও আকারের মধ্য দিয়া যাওয়া-আসা করিতে পারে।" এইরূপ "মুক্ত"ই রস সম্ভোগের অধিকারী। শিল্পের দীক্ষায় তাহারই অধিকার।

খণ্ড মুকুতি সব কোই করে প্রাণ মুকুতি নহি কোই ॥
পহিলী প্রাণ বিচার করি পীছে আরৈ জাই ॥

বীর্য্য

যে সহজের সাধক হইবে সে ভীরু নির্ব্বীর্য্য হইলে চলিবে না। বীর্য্যহীনের যে রস পান তাহা মাতালের নেশা মাত্র হইয়া ওঠে—তাহাতে জাগরণ যে হয়ই না—তাহাতে চিত্ত দিন দিন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সে রসের সাধক, সে বিপদকে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে চোখ বুজিয়া পাশ কাটাইয়া চলিলে হইবে না। "যে আত্মা ঝঞ্ঝা-বিজয়ী—তাহাতেই আনন্দ-ভাব নিত্য জাগ্রত রহে।"

ঝংঝা বিজয়ী আতমা উপজা আনন্দ ভার ॥

তাই দাদূ সহজের সাধক হইয়া কঠিন সঙ্কল্প করিতেছেন যে "যতই কঠিন হউক না, সেই স্থানে পৌঁছিতেই হইবে। বীরের যে গম্যভূমি শত বিপদ উল্লঙ্ঘন করিয়া সেখানে যাইতেই হইবে। ওরে দাদূ, এখনও তো তুই মাঝ-পথেই আছিস, এতবড় কথা বলিস তবে কোন্ সাহসে?"

পাবহিঁগে উস ঠৌরকো লাঁঘহিঁগে য়হ ঘাট।
দাদূ ক্যা কহি বোলিয়ে আজ বীচহিবাট ॥

সুর বাঁধ

এক সাহস আছে যে ব্রহ্মের সুরে সুর বাঁধিয়া লইলে সবই সহজ হইয়া আসে। ইহাই যথার্থ সেবা, এই সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াই পৃথিবী শ্যামল, রবি শশী দীপ্যমান। নহিলে "ধরিত্রী কি সাধন করিয়াছে? নীল আকাশ কোন্ সন্ন্যাস করিয়াছে? রবিশশী জ্যোতির অমৃত লাভ করিল কোন সাধনার দ্বারা?"

ধরতী কা সাধন কিয়া অংবর কৌন সন্ন্যাস।
রবি শশী কিস আরংভ তেঁ অমর ভয়ে নিজ দাস ॥

এই সেবা যে করিতে চাহে বিশ্বচ্ছন্দে যোগ রাখিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। বসিয়া থাকিলে, জড়তায় শুইয়া পড়িলে তাহার চলিবে না—"চন্দ্রসূর্য্যকে তিনি জ্যোতি দিয়া জ্বালাইয়া গগনপথে যাত্রায় বাহির করিয়া দিলেন, একটি প্রদীপ হইল শীতল, অন্যটি তপ্ত, উভয়ে মিলিয়া অনন্তকালকে দেখাইয়া যাত্রা করিল। বহুবর্ণে ও বহুসুরে তিনি সকল-সৌন্দর্য্য-ধরিত্রী ধরণীকে সৃষ্টি করিলেন, সপ্তসমুদ্র তাই অসীমসুন্দর, কি জানি কেন রাত্রিদিন সেই সমুদ্র তাই স্থির হইতে পারিল না।"

চংদ সূর জিন্‌হে সুর কিয়ে চিরাগা চরনউ বিনা চলারইরে।
ইক সীতল ইক তাতা ডোলই অনংত কাল দিখলারইরে।
ধরতী ধরন বরন বহুবানী রচিলে সপ্ত সমংদারে।
রৈনি দিবস রহত নহী দিসই সর্মদ ন রহসী খারে ॥

বিশ্বরাগ

সহজ সাধনের একমাত্র পন্থা হইল ব্রহ্মের সহিত সুর মিলানো। এবং সুর মিলাইতে হইলেই হইতে হইবে "সানী" (শিল্পী)। কারণ ব্রহ্ম যে "মহাগুণী"। তাঁর সৃষ্টিই তো সঙ্গীত। এই বিশ্বকে ধূলামাটি বা ভূতবস্তু মনে করিও না। জড় দৃষ্টিতে তাই মনে হয়—কিন্তু ইহা পরম শিল্প, জাগ্রত-জীবন্ত-শিল্প, শিল্পীর সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ-শিল্প—এক কথায় ইহা তাঁহার সঙ্গীত। আজও তিনি গাহিতেছেন বলিয়াই বিশ্ব সকল রাগ ও বর্ণের ছটা লইয়া শোভমান। "আদি সঙ্গীত যে ওঁকার আজিও সকল ঘটে (রূপে, আকারে, সীমায়) তাহাই বাজিয়া চলিয়াছে। সেই সঙ্গীতই বিশ্বের আকাশে অগ্নিবর্ণে জ্বলিতেছে। যে সেই সুরে সুর মিলাইতে পারে সেই পরম আনন্দরস লাভ করে।"

আদি সবদ * ওঁকার হৈ বোলঈ সব ঘটমাহি।
সবদ ভরই সো মিলি রহই একরস পুরা ॥

"যিনি ব্রহ্ম তিনি তো নিরঞ্জন, তাঁহার ওঁকার-সঙ্গীতেই তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতই তাঁর আকার। হে দাদূ, যত রঙ্গ, যত রূপ সবই সেই সঙ্গীতেরই নানাবিধ 'বিস্তার।'"

নীরংজন নিরাকার হৈ ওঁকারই আকার।
দাদূ সব রংগ রূপ সব সব বিধি বিস্তার।

"বাণীর প্রকাশ হয় যেখানে সেখানে প্রধান কথা হইল জ্ঞান। জ্ঞানলহরী যেখানে উঠে সেই হইল বাণীপ্রকাশের স্থান। কিন্তু সঙ্গীতের যেখানে উৎপত্তি সেখানে অনুভবেরই (feeling) রাজত্ব। অনুভব যখন বাজিয়া উঠে তখনই তাহা সঙ্গীত।" বিশ্ব সঙ্গীতময়—অতএব বিশ্বে বিধাতার অনুভবই বাজিতেছে।

জ্ঞান লহরী জহঁতেঁ উঠই বানীকা পরকাস।
অনভব জহঁতে উপজই সবদ কিয়া তঁহ বাস ॥

সঙ্গীতের বেদনা

এই সঙ্গীতের সৃষ্টিটি বড় সুখকর ব্যাপার নহে। যাহারা হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্য রস শিল্প ও সঙ্গীতের সৃষ্টি

* হিন্দী সাধকেরা সঙ্গীতকে শব্দ বলেন।

হয়, তাহার হৃদয়ে অনন্ত জ্বালার পালা। "যতক্ষণ সঙ্গীত আপনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করে, ততক্ষণ মনের মধ্যে এই যে গুপ্তগুঞ্জন সেই দুঃখের আর পরিমাণ নাই।"

পার ন দেরই আপনা গুপ্ত গুঁজ মন মাহি॥

ব্রহ্ম স্বয়ং দিবানিশি সেই জ্বালায় পুড়িতেছেন। তাঁহার মনের ভাব অসীম। তাহাকে সীমায় রূপে প্রকাশ করিতে হইবে, সে তো সহজ ব্যথা নহে। ব্রহ্ম তো অরূপ অসীম হইতে তাঁহার সঙ্গীত দিয়া রূপে সীমায় বৈচিত্র্যে আসিতেছেন—সাধককে তাই শিল্পে ও সঙ্গীতে সীমা ও রূপ হইতে অসীমের অরূপের দিকে যাত্রা করিতে হইবে। আমরাও যদি রূপের ও সীমার দিকে যাত্রা করি, তিনিও যেই পথে আসিতেছেন আমরাও যদি সেই পথেই অগ্রসর হইয়া চলি, তবে কোনো দিনই দেখা হইবে না। তাঁহার সঙ্গে মিলিতে হইলে তাঁহার উল্টা পথে যাত্রা করিতে হইবে। তাহাই সাধকের জ্বালা। সাধকের হাতে সসীম ভাষা, তাহা দ্বারা ছন্দে ও সুরে কোনো মতে অসীমের ভাব বাহির করিতে হইবে। সসীম রেখায় ও বর্ণে কোনো মতে অসীম ভাব চিত্রে ফুটাইতে হইবে। ইহাই বিধাতার সহিত মিলনের সঙ্কেত। এইজন্যেই ব্রহ্মরস-পিপাসু শিল্পী ব্রহ্মের সৃষ্টির অনুকরণ বা নকল-মাত্র না করিয়া নব নব ভাব-রস সৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মের দিকে নিত্য অগ্রসর হইতে থাকিবেন। তাঁর জ্বালা তিনি অসীম হইতে যাইতে চাহেন সীমায়—আমার জ্বালা আমি সীমা হইতে যাইতে চাই অসীমে।

জরই সো নাথ নিরংজন বাবা জরই সো অলখ অভের।
জরই সো জোগী সবকা জীবনি জরই সো জগমেঁ দেব॥
জরই সো আপ উপজাবনহারা জরই সো জগপতি সাঁঈ।
জরই সো অলখ অনূপ হৈ জরই সো মরনা নাহী॥
জরই সো অবিচল রাম হৈ জরই সো অমর অলেখ।
জরই সো অবিগতি আপ হৈ জরই সো জগমেঁ এক॥
জরই সো অবিগতি আপ হৈ জরই সো অপরংপার।
জরই সো অলখ অগাধ হৈ জরই সো সিরজনহার॥
জরই সো পুরণ ব্রহ্ম হৈ জরই সো পুরণহার।
জরই সো পুরণ পরমগুরু জরই সো প্রাণ হমার॥
জরই সো জোতি সরূপ হৈ জরই সো তেজ অনংত।
জরই সো ঝিলিমিলি নুর হৈ জরই সো পুংজ রহংত॥
জরই সো পরম প্রকাশ হৈ জরই সো পরম উজাস।
জরই সো পরম নিবাস হৈ জরই সো পরম বিলাস॥

"জ্বলিতেছেন তিনি নাথ নিরঞ্জন বাবা, জ্বলিতেছেন তিনি অলক্ষ্য অভেদ এক, জ্বলিতেছেন সে যোগী সব্বাকার জীবনস্বরূপ, জ্বলিতেছেন তিনি জগতের দেবতা। জ্বলিতেছেন যিনি আপনাকেই নব নব রূপে উৎপন্ন করিতেছেন, জ্বলিতেছেন সেই জগৎপতি স্বামী, জ্বলিতেছেন সেই অলক্ষ্য অনুপম; জ্বলিতেছেন তিনি যাঁর নাই মরণ। জ্বলিতেছেন যিনি অবিচল রাম, জ্বলিতেছেন যিনি অমর অবর্ণনীয় আত্মস্বরূপ, জ্বলিতেছেন যিনি জগতে একমাত্র। জ্বলিতেছেন তিনি নিত্য অবর্ণনীয় আত্মস্বরূপ, জ্বলিতেছেন যিনি অসীম অপার, জ্বলিতেছেন যিনি অগম্য অতলস্পর্শ (অগাধ), জ্বলিতেছেন যিনি সৃষ্টি করিতেছেন। জ্বলিতেছেন যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, জ্বলিতেছেন যিনি পূরণকর্ত্তা, জ্বলিতেছেন যিনি পূর্ণ-পরমগুরু, আর জ্বলিতেছে সে আমার প্রাণ। জ্বলিতেছেন যিনি জ্যোতিস্বরূপ, জ্বলিতেছেন যিনি তেজ-অনন্ত, জ্বলিতেছেন যিনি কম্পমান আলোক, জ্বলিতেছেন যিনি পুঞ্জ-জ্যোতিস্বরূপে অবস্থিত। জ্বলিতেছেন যিনি পরমপ্রকাশ, জ্বলিতেছেন যিনি পরম দীপ্তি, জ্বলিতেছেন যিনি পরমনিবাস, জ্বলিতেছেন যিনি পরম বিলাস।"

প্রয়োজনের অতীত "অপরিমিতত্ব"ই শিল্প

এই যে সাধকের জ্বালা ইহা তাহার আত্মার বিপুলতারই প্রমাণ। শিশু গরুড়ের ন্যায় শিল্পসাধক সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিতে চায়। তাহার আত্মার ক্ষুধা যে অপরিমিত। "পবন জল সবই পান করিয়াছি; ধরিত্রী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, এই পাঁচ মিলিয়া আমার একটি গ্রাস মাত্র।"

পবনা পানী সব পিয়া ধরতী অরু আকাস।
চংদ্র সুর পাবক মিলে পাঁচো এক গরাস॥

এই অসীম তৃষা তৃপ্ত করিতে পারে একমাত্র অসীম ভাব। যে ভাবের "কোনো কূল বা সীমা পাওয়াই যায় না, কাজেই তাহা অমূল্য ধন।"

বার পার কো না লহই কীমতি লেখা নাহিঁ॥

সেই অসীম ভাবরস পাইলে আমার এই তৃষা মিটিতে পারে। কোনো সসীম সুখে, ক্ষুদ্র-রস পানে এই তৃষ্ণা মিটিবার নহে। "হে পরম প্রভু, আকাশ-ভরা আলোকের প্যালা ভরিয়া ভরিয়া দাও।"

আল্লা আলে নুর কা ভরি ভরি প্যালা দেহ॥

"সেই পরম পরিপূর্ণাত্মার আনন্দসাগর পাইলে সকল তৃষ্ণা দূর হয়, জীবন সুখী হয়।"

সুখ সাগর সো ভর ভরা পী তৃষা দুখ জীব ॥

সেই প্রয়োজনের অতীত অপরিমিত আনন্দ-সাগরের যখন দেখা পাই তখনই "মরণ হইতে মরণ গেল পলাইয়া, সকল দুঃখ হইতে পলাইল দুঃখ।"

মরণা ভাগা মরনতেঁ দুকহি ভাগা দুকখ ॥

তিনি ছাড়া আমার এই তৃষ্ণা কেহ মিটাইতে পারে না। কারণ আমার এই তৃষ্ণা যে তাঁহা হইতে একটুও কম নহে। "আমার রাম যেমন অপার, তেমনি আমার ভক্তি অগাধ; এই দুইয়ের যে কোনো পরিমাণ হয় না, সকল সাধুই ইহা ঘোষণা করেন। যেমন অবর্ণনীয় আমার রাম, তেমনি অবর্ণনীয় আমার ভক্তি, এই দুয়েরই কোনো পরিমাণ নাই, সহস্র মুখে অনন্ত ইহা ঘোষণা করেন। যেমন নির্গুণ আমার রাম, তেমনি নিরঞ্জন আমার ভক্তি, এই দুইয়ের কোনো পরিমাণ নাই, সকল সাধক ইহার প্রমাণ দিবেন। যেমন পরিপূর্ণ আমার রাম, ঠিক তেমনি পরিপূর্ণ আমার ভক্তি, এই দুইয়ের কোনো পরিমাণ নাই। হে দাদূ এই বাক্যের অন্যথা নাই।"

জৈসা রাম অপার হৈ তৈসা ভগতি অগাধ।
ইন দোনোঁকী মিত নহীঁ সকল পুকারই সাধ ॥
জৈসা অবিগত রাম হৈ তৈসা ভগতি অলেখ।
ইন দোনোঁকী মিত নহীঁ সহস মুখী কহ সেখ ॥
জৈসা নিরংজন রাম হৈ ভগতি নিরংজন জানি।
ইন দোনোঁকী মিত নহীঁ সংত কহহিঁ পরবানী ॥
জৈসা পুরা রাম হৈ পুরন ভগতি সমান।
ইন দোনোঁকী মিত নহীঁ দাদূ নাহী আন ॥

আনন্দের মূল্য শিল্প

আনন্দ-রস পান করিলেই তাহার মূল্য দিতে হয়। যে আনন্দলাভ করিয়াছে তাহাকে সঙ্গীতে তাহার মূল্য দিতে হইবে। কবির ও শিল্পীর ইহাই দুঃখ, ইহাই জ্বালা—অথচ যখন সৃষ্টিটি সুন্দর হইয়া বাহির হয় তখন তাহাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কাজেই "যিনি আনন্দরস পান করিয়াছেন তিনিই জ্বলিতেছেন, কারণ তিনি যে তখনও গভীর অন্তরের গুঞ্জনধ্বনি প্রকাশ করিয়া গাহিতে পারেন নাই।"

সোই সেবক সব জলই জেতা রস পীয়া।
দাদূ গুঞ্জ গভীরকা পরকাস ন কীয়া ॥

তবে আশার কথা এই যে এই জ্বালা ও সঙ্গীতই সকল অনিত্য সংসারের মধ্যে নিত্য ধন। "যে আনন্দ-ধারাতে সাধক ভাসিয়াছেন তাহা মরিয়া যাইবে—কিন্তু সাধকের জ্বালাটুকু নিত্যকাল সঙ্গীতরূপে বিরাজ করিবে।"

জরনা জোগী জুগ জীরই ঝরনা মরি মরি জাই ॥

দীক্ষা

কাজেই ব্রহ্মের জ্বালা হইতে আপন জ্বালা গ্রহণ কর। ইহাই রসের দীক্ষা। এই অগ্নিই সৌন্দর্য্য-পথযাত্রার প্রদীপ। "তিনি গুরু, তাঁহার প্রদীপটি হইতে তোমার প্রদীপ জ্বালিয়া লও—চন্দ্রালোকের মত তাঁর দয়াও আছে, কিন্তু রসমন্দিরে যাইতে যদি চাও আপন দীপ সাথে লও।"

দীএ দীআ কীজিয়ে গুরুমুখ মারগ জাই।
দায়া জগমেঁ চাঁদনা দীয়া চালই সাথি ॥

"তাঁহার সঙ্গীতে তোমার সঙ্গীতের সুরটি বাঁধিয়া লও, সেই পরমাত্মার সুরে প্রাণের সুর লও বাঁধিয়া, এই মন সেই মনের সুরে বাঁধ, সেই চিত্তের চৈতন্যে আপন চিত্ত কর জাগ্রত। তাঁহার সহজে আপন সহজ মিলাইয়া দাও, জ্ঞানের সঙ্গে বাঁধ জ্ঞান, তাঁহার দৃষ্টিতে আপন দৃষ্টি ডুবাইয়া লও, সেই ধ্যানে বাঁধ আপন ধ্যান, তাঁহার ভাবে ডুবাও তোমার ভাব, তাঁর ভক্তিতে বাঁধিয়া লও তোমার ভক্তি। তাঁহার মনে ডুবাও তোমার মন, এক কথায় তাঁর প্রেমের সুরে তোমার প্রেমের সুরটি বাঁধিয়া প্রেমামৃত পানকর।"

সবদৈ সবদ সমাইলে পরমাতম সোই প্রান।
যহ মন মন সোঁ বাঁধিলে চিতই চিত্তসোঁ জান ॥
সহজই সহজ সমাইলে জ্ঞানই বাধা জ্ঞান ॥
দৃষ্টিই দৃষ্টি সমাইলে ধ্যানই বাঁধা ধ্যান ॥
ভাবই ভাব সমাইলে ভগতই ভগতি সমান।
মনহীঁ মন সমাইলে প্রীতি প্রীতি রস পান ॥

বেদনার সার্থকতা

হে সাধক, জীবনে বাধা আঘাত বেদনা যখন আসে তখন মনে করিও, "সেই গুণী তোমাকে তাঁর যন্ত্র বানাইয়া তোমাকে তাঁর অসীম সুরে বাঁধিয়া লইতেছেন। এই পঞ্চেন্দ্রিয়তে যে এই বিশ্বসম্ভোগ করিতেছে, তোমার মধ্যে সে আনন্দ বাজিয়া ওঠা চাই, হে দাদূ, তোমাকে সেই সুরে বাজিতে হইবে।"

জংত্র বজায়া সাজ করি কারিগর করতার।
পাচহুঁ কা রস নাদ হৈ দাদূ বোলনহার ॥

বড় বেদনা যখন জীবনে আসিয়াছে তখন ইহা জানিয়া ধন্য হইয়াছি যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। "তিনি আমাকে আপন বীণা করিয়া আপন কোলে বামে রাখিয়া বাজাইতেছেন, আর আমি বাজিতেছি। এখান হইতেই সেই অসীমস্থর ধরিয়া লও, জগতের সকল ভগবদ্‌ভক্ত সাধুরা বাজিতেছেন, আমাকে শীঘ্র আমার সুরটি দাও।"

বাঁধে সুররা বায়েঁ বাজই ইহরা সো ধর লীজহু।
রাম সনে হি সাধু বাজে বেগ মোহি কলি দীজহু ॥

"হে দাদু প্রেমের সহিত যদি বাজিয়া উঠিতে পার, সেই সুরটি যদি প্রেমে সত্য হয়, তবে সঙ্গীতটি কমলের মত বিকশিত হইয়া উঠিবে।"

দাদ বানী প্রেমকী কমল হোই বিকাস ॥

প্রেমের অধিকার

সেই সত্য প্রেম যদি পাও তবে, কেবল সৃষ্টি করিতে নহে, বিশ্বশিল্প সম্ভোগ করিতেও পাইবে। কারণ যে প্রেম লাভ করে নাই এই বিচিত্র-রস-সৌন্দর্য্য মন্দিরে তাহার উৎসবেরও অধিকার হয় নাই। যে সেই প্রেম লাভ করিয়াছে, "সে বিকসিত হইয়া হইয়া দর্শন করে, সে পুলকে পুলকে রস পান করে, প্রেম-পুলকে সে তাঁহার ভেট (সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ) লাভ করে, সে প্রাণে প্রাণে তাঁহাকে পরশ করিয়া থাকে। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তাহার তনু মন হইয়া যায় বিলয়, দেখিতে দেখিতে চিত্ত হয় দীন। নিরখি নিরখি মিলিত হও প্রিয়তমের সঙ্গে, নিরখি নিরখি আনন্দে উঠ জীবিত হইয়া।" তাহার তনুমনের মুক্তি, চিত্তের দৈন্য হৃদয়ের আনন্দ সবই সহজ হইয়া যায়। এই প্রেমই যে সকল সিদ্ধির সহজ সাধন।

বিগসি বিগসি দরসন করই পুলকি পুলকি রস পান।
প্রেম পুলক মুলকত রহই অরস পরস মিলি প্রাণ ॥
দেখি দেখি তন মন বিলই দেখি দেখি চিত দীন।
নিরখি পিয়কো তব মিলই নিরখি নিরখি সুখ জীর ॥

কি করিয়া পাপ ও কলুষ হইতে রক্ষা পাইবে এই জন্যই তো তোমার ধ্যান ধারণা? প্রেম যদি কর সব সহজ হইয়া যাইবে। যে সেই সৌন্দর্য্যে ডুবিয়াছে তাহাকে আর কোন কলুষ স্পর্শ করিতে পারে না। "রক্তকুমুদ মলিন জলে জন্মিয়াও জল হইতে রহিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চন্দ্রের সঙ্গেই যে তার প্রেম, মলিন জলের সঙ্গে তো নহে।"

লাল কমল জল উপজই ক্যোঁ সো জুদা জল মাহি।
চংদ হিতে আহি প্রীতড়ী সৌজ্জল সেতী নাহিঁ ॥

"সকল ভুবন সকল আত্মা তাঁরই প্রেমে অমৃতময় হয়, তিনিই সব অমৃত করিয়া লন। যেটুকু আবরণ আছে তাহা দূর করিয়া তিনি কুসুমের লহর তাহার উপর তুলিতে থাকেন।"

সকল ভুবন সকল আতমা ইমরিত করি হরি লেই।
পরদা হৈ সো দূর করি কুসুম লহর তহিঁ দেই ॥

শিল্পীর বিশ্রাম

যে "সানী" (শিল্পী) সে প্রেমের দ্বারাই বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। তাহার এত যে সৃষ্টির জ্বালা, এত যে নিরন্তর অন্তরের ক্রন্দন, তাহার আর অন্য কোনরূপ শান্তি নাই। "প্রেমের মধ্যেই তাহার সকল প্রয়াসের শান্তি, প্রেমই সকল গতির বিশ্রাম"—

প্রেম গতি বিসরাম।

হে দাদু, মন চিত্ত ধ্যান লাগাইয়া শ্রাবণের হরিৎ শোভা দেখিতেছ তো? কত যুগ যে কাটিয়া গেল তবু তো শ্যাম শোভা গেল না। হে দাদু, হৃদয়ের সব রস যখন শুকাইয়া যায় তখন মন পঙ্গু হইয়া যায়! হে দাদু কায়াখানি থাকে নব যৌবনে ভরা, অথচ মন হইয়া যায় (বুড়া) জীর্ণ। যাহার প্রেম রহে যেখানে তাহার সেখানেই বিশ্রাম,—চাই মায়া-মোহতেই থাকুক, চাই আত্মারামেই থাকুক। আদি অন্ত যেস্থানেই হউক, যেখানে প্রেম আছে সেইখানেই জীবনও আছে। মায়া বা ব্রহ্ম যেখানেই প্রেম রাখ, হে দাদু, সেখানেই তোমার বিশ্রাম। যেখানে প্রেম, সেখানেই জীবন; বাঁচন মরণ রহে সেই ঠাঁইতেই। অগম সুগম যেখানে রাখ প্রেম, হে দাদু, সেখানেই মন ডুবিয়া যায়"—

সাবন হরিয়রি দেখিয়ে মন চিত ধ্যান লগাই।
দাদু কেতে জুগ গয়ে তোভী হরা ন জাই ॥
দাদু মন পংগুল ভয়া সব রস গয়া বিলাই।
কায়া হৈ নব জ্বান য়হ মন বুঢ়া হোই জাই ॥
জিসকী সুরতি জহাঁ রহই তিসকী তহঁ বিশ্রাম।
ভাবই মায়া মোহমেঁ ভাবই আতমারাম ॥

জহাঁ সুরতি তহঁ জীব হৈ জহঁ নহীঁ তহঁ নাহিঁ।
গুণ নিরগুণ জহঁ রাখিয়ে দাদূ ঘর বন মাহিঁ॥
জহাঁ সুরতি তহঁ জীব হৈ আদি অংত অস্থান।
মায়া ব্রহ্ম জহঁ রাখিয়ে দাদূ তহঁ বিশ্রাম॥
জহাঁ সুরতি তহঁ জীব হৈ জিবন মরন তিস ঠৌর।
বিস অমৃত তহঁ রাখিয়ে দাদূ নাহী ঔর॥
জহঁ সুরতি তহঁ জীব হৈ জহাঁ চাহই তহঁ জাই।
অগম গম জহঁ রাখিয়ে দাদূ তহাঁ সমাই॥

প্রেমই জরা-জয়ী অমৃত। ইহাই বিশ্বশোভাকে নিত্য হরিৎ রাখিয়াছে। চিত্তে যদি প্রেম রাখ কখনই চিত্ত নীরস ও পঙ্গু হইয়া যাইবে না। মনে যদি প্রেম রাখ, মন কখনই বৃদ্ধ হইবে না—জীর্ণ হইবে না। আশ্চর্য্য!—এই দেহ থাকে তরুণ, তখনই প্রেম ও রসের অভাবে মন যায় জীর্ণ ও পঙ্গু হইয়া। শ্রান্ত মন অবসন্ন হইয়া যায়। সকল শ্রান্তির বিশ্রাম "প্রেম" যে তার নাই। প্রেমের দৃষ্টি পাইলে এই বিশ্ব যখন মোহন-লীলা হইবে তখন ইহার রহস্য তুমি সেই সৌন্দর্য্যগুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করিবে। যে গুণীর বীণার সুরে তোমার সুরটি বাঁধিয়া লইয়াছ, সেই লীলাময় অপরূপ শিল্পীর কাছে জিজ্ঞাসা করিবে—

ভোগ-রহস্য

"হে স্বামী বুঝাইয়া বল যে এক হইতে অনেক কেন করিলে?" এই আমার ঘট (দেহ)-পরিচয়ে সব ঘট দেখিতেছি, এই আমার প্রাণ পরিচয়ে দেখিতেছি সকল প্রাণ, ব্রহ্ম-পরিচয় পাইতেই তো দাদূ হইল হয়রান। (অর্থাৎ আমার প্রাণ বা দেহ দিয়া তো ব্রহ্মের পরিচয় পাই না, আমার দেহ দিয়া অন্যের দেহধর্ম্ম বুঝি, আমার প্রাণ দিয়া অন্য প্রাণ বুঝি, কিন্তু ব্রহ্ম বুঝিব কি দিয়া?)।

ইনিই (ব্রহ্মই) (আমার) দেহের নয়ন; ইনিই (ব্রহ্মই) (আমার দেহের) আত্মা হইয়া আছেন। এই (আমার আত্মা ও জীবনই আবার) ব্রহ্মের নয়ন। দাদূ পালটাপালটি করিয়া দুইই দেখিয়া লইয়াছ। (ব্রহ্ম জীবে প্রবিষ্ট হইয়া জীব ও বিশ্বকে সম্ভোগ করিয়াছে, জীব ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিয়াছে)।

জিনহ মোহন বাজী রচী সো তুম্হ পুছো জাই।
অনেক একতেঁ ক্যোঁ কিয়ে সাহিব কহো সমুঝাই॥
ঘটপরেচেই সবঘট লখই প্রাণ পরেচেই প্রাণ।
ব্রহ্ম পরেচেই পাইয়ে দাদূ হৈ হৈরান॥
এহী নৈনা দেহকে এহী আতম হোই।
এহী নৈনা ব্রহ্মকে দাদূ পলটে দোই॥

রূপের উৎস

"তাঁহার সৌন্দর্য্যরসে ডুবিয়াই সব-কিছু সুন্দর, তাই সব অতি সুন্দর লাগে; তিনি যদি তাঁর সৌন্দর্য্যটুকু বাহির করিয়া নেন—তবে সব সৌন্দর্য্যই চলিয়া যায়।"

তেরী খুবী খুব হৈ সব নীকা লাগই।
সুন্দর সোভা কাঢ়ি লে সব কোই ভাগই॥

"তাঁর অপরূপ লাবণ্যে সব সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই বলি, সে সৌন্দর্য্য উপেক্ষার জিনিষ নহে—ইহা সাধনার ধন।"

জিসকী খুবী খুব সব সোঈ খুব সংভারি।

এই রস-সাধনের প্রধান সহায়ই হইল রস। যাহার রস আছে সে-ই এই সাধনার অধিকারী। এই সাধনাতে জাতি-কুলের বিদ্যা-ধনের কোনো মূল্যই নাই, ইহার অধিকার নির্ণয় কেবল রস লইয়া।

"রস হী মেঁ রস বরসিহই"॥

"রসেই হয় রসের বর্ষণ"। রসশাস্ত্রের নিয়মই এই। এখানে Parable of talentsই রীতি। প্রেম যদি থাকে, রস যদি থাকে, তবেই সেজন বিশ্বচিত্র দেখিয়া তৃপ্ত হয়। সে তৃপ্তির আর অবসান নাই।

সাধনার বাধা পূজা

এই সৌন্দর্য্যসাধনে বিপদও আছে, সে বিষয়েও সাধক দাদূ সবিধান করিয়া দিয়াছেন। সৌন্দর্য্যকে যদি তাঁর লীলা বলিয়া সাধন কর তবে বিপদ নাই, কিন্তু "যদি সুন্দর মূর্ত্তি খাড়া করিয়া মনে কর ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা, তবে হে দাদূ তুমি কিছুই দেখিলে না, সৌন্দর্য্যও দেখিলে না, কিছুই বুঝিলে না—এমন করিয়াই তো এই সংসার ডুবিল।"

মূরতি ঘড়ী পথানকী কীয়া সিরজনহার।
দাদূ সুঝইনহীঁ য়োঁ বূড়া সংসার॥

ভোগতৃষ্ণা

সৌন্দর্য্যসাধনে আর-এক বিপদ আছে—কামনা। তাহাতেও রসপিপাসু আপনাকে নষ্ট করিতে পারেন। শিল্পীর সে বিষয়ে সাবধান হইতেই হইবে।

"ভোগের কারণে রূপে হয় অনুরক্ত, হে ভাই এইরূপে নয়নকে করিয়া দিল অপবিত্র, কুৎসিত কথা সারাদিন

শুনিয়া শুনিয়া শ্রবণকেও এইরূপে করিল 'অপবিত্র। স্বাদের কারণ লুব্ধ হইয়া ভোগ্যবস্তুতে লাগিয়া রহিল, তাই ভোগের দ্বারা রসনাকে করিল অপবিত্র। ভোগের জন্য বাসনাতে রহিল লাগিয়া তাইতো দেহকেও করিল অপবিত্র। কমলবাসে লুব্ধ ভ্রমর আসিয়া বদ্ধ হয় কমলপাশে, দেখিতে দেখিতে দিনদশেকের মধ্যে দুই-ই যায় বিলয় হইয়া।

> বিষয় কারণ রূপ রাতে রহে নৈন নাপাক যো কীন্হ ভাঈ।
> বদাকী বাত সুনত সারা দিন স্রবন নাপাক যো কীন্হ ভাঈ॥
> স্বাদ কারণ লুবধি লাগি রহে জিন্‌ভা নাপাক যো কীন্হ খাঈ॥
> ভবঁরা লুবধী বাসকা কমল বধানা আঈ।
> দিন দশ মাহি দেখতা দোনোঁ গয়ে বিলাঈ॥

আত্মচেতনা Self-consciousness

'শিল্পে সকল কথার বড় কথা যে শিল্পী যেন আপনাকে আপনি না জানে। যে আপনার সম্বন্ধে খুব সচেতন, মনে করে আমার চরম হওয়া হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কিছুই হইবার আশা নাই। "যে মানুষ উড়িয়া চলিয়াছে, সে জানিতেই পারে না যে সে চলিয়াছে, সে বলে এই পথটুকু ধরিয়াছি মাত্র। যে বলে 'পৌছিয়াছি' তোমরা সবাই এই পথটি ধরিয়া চলিতে থাক!' হে দাদূ, সে পথের দেখাই পায় নাই।"

> মানুষ জব উড় চালতে কহতে মারগ মাহি।
> দাদূ পহুঁচে পংথ চল কহহিঁ সো মারগ নাহি॥

কাজেই যিনি যথার্থ গুরু তিনি নূতন কোনো "পদ্ধতি" বা "পন্থা" প্রস্তুত করিয়া সকল বিচিত্র-স্বভাব মানুষকে একটা বিশেষ পথে বদ্ধ করেন না। তিনি সকলের অন্তরের মধ্যে নব প্রেম ও নব আনন্দ নব আশা জাগ্রত করেন। সবাই তখন নিজ নিজ ভাবে অগ্রসর হইয়া চলে। ইহাই যথার্থ মুক্তিদাতা গুরুর লক্ষণ। ইহাই নূতন মুক্ত দীক্ষা।

এই প্রকৃতির মধ্যে যে এত অপরূপ সৌন্দর্য্য নিত্য সৃষ্টি হইতেছে, তাহার হেতু এই যে প্রকৃতি অজ্ঞ (unconscious)। মানুষের বিপদ যে সে সচেতন, সে যখন এই অতি-চেতনার সেতু পার হইয়া পরম আনন্দে সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার সৃষ্টি অতি অপরূপ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে চক্ষু জুড়ায় তাহাতেই বুঝি এই সৃষ্টির মূল কি? "অম্বরে বসিয়া আছেন স্বামী, অসীম অনন্তের খবর না জানিয়াই হরিত পট্টবসন পরিধান করিয়া ধরিত্রী করিতেছেন অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, সাজসজ্জা ও প্রসাধন। অপার ও অনন্ত পৃথিবী সকল বসুধা হইতেছে পুষ্পিত ও সফল। গগন গরজিয়া জলস্থল হইতেছে পরিপূর্ণ। হে দাদূ, জয় জয়কার অজ্ঞ বসুধারই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টির! কালের মুখে কালি দিয়া স্বামী আমার সদাই সু-কাল (উৎসবময়)। তোমার ঘরে প্রেমের মেঘ ঘনাইয়া গহন হইল, হে দীনদয়াল বর্ষণ কর।"

> অজ্ঞা অপরংপারকা বসি অংবর ভরতার।
> হরে পটংবর পহির করি ধরতী করই সিংগার॥
> বসুধা সব ফুলই ফলই পৃথিবী অনংত অপার।
> গগন গরজি জল থল ভরে দাদূ জয় জয় কার॥
> কালা মুহ করি কালকা সাঁঈ সদা সুকাল।
> মেঘ তুম্হারে ঘর ঘনা বরসহু দীন দয়াল॥

মানুষের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টি হইতেও গভীর ও বিচিত্র, কিন্তু তাহার অহমটিকে আনন্দরসে ডুবাইতে না পারিলে নিস্তার নাই।

সবশেষে শিল্পীর নমস্কার দিয়া অদ্যকার বক্তব্য সমাপ্ত করি। "নমো নমো হরি নমো নমো, তোমাকে হে গোসাঁই নমো নমো। অখণ্ড নিরঞ্জন নমো নমো। সর্ব্বব্যাপী যিনি এই অপূর্ব্ব জগৎ সৃষ্টি করিলেন, সেই নারায়ণ নমো নমো। শ্রবণে নয়নে রসনায় বদনে এমন অপরূপ সাজাইয়া যিনি অতি মনোহর চিত্র করিলেন; ধরিত্রী অম্বর সূর্য্য চন্দ্র জল পবন জিনিয়া যিনি সুন্দর করিলেন, সেই নমো নমো হরি নমো নমো। নারায়ণ নিজ নমো নমো॥"

> নমো নমো হরি নমো নমো। তাহি গোসাঈ নমো নমো॥
> সকল নিরংজন নমো নমো। সকল বিয়াপী জেহি জগ কীন্হা
> নারায়ন নিজ নমো নমো॥
> শ্রবন সরীরি নইন রসনা মুখ অইসো চিত্র কিয়ো।
> ধরতী অংবর সূর চংদ জিনি পানী পবন কিয়ো।
> নমো নমো হরি নমো নমো।
> নারায়ণ নিজ নমোনমো॥

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

---

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত চার-পাঁচটি "বাণী" Asiatic Societyতে মুদ্রিত Siddonsর গ্রন্থ হইতে লইয়াছি। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহার কৃপায় তাহা পাইয়াছি। বাকী সবগুলি "বাণী" আমি পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংগৃহীত পুথী হইতে ও জয়পুরের J. Trail সাহেবের সংগৃহীত পুথী হইতে লইয়াছি। সবিনয়ে এই ঋণ স্বীকার করিতেছি।

আলো ফুল

(রূপক)

সকালের সোনালী আলো তখন সবে পৃথিবীতে নেমে এসেছে, এখনও সব-জায়গায় ছড়িয়ে পড়েনি। একটি পদ্মফুলে-আলো-করা দিঘির ধারে একটি ফুটফুটে খোকা তার দিদির হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই তরুণ উষারই মত সুন্দর নিষ্কলঙ্ক তার মুখ।

ফুল দেখ্‌তে দেখ্‌তে হটাৎ সে বলে উঠ্‌ল, "দিদি, এই সাদা ফুলগুলো কি করে হল?"

দিদি বল্‌লে, "রাত্রে যখন ঘুমতে যাবি তখন বল্‌ব।"

খোকা তাতেই রাজি। সন্ধ্যে হতে-না-হতে সে আর তার বড় দুচারটি ভাই বোন দিদিকে ছেঁকে ধরলে ফুল কি করে হল তাই বল্‌তে হবে। দিদি সবাইকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুক্‌লেন। ঘরের এককোণে ঝক্‌ঝকে পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বল্‌ছে, আস্‌বাব বিশেষ কিছু নেই। মস্ত বড় ঢালা-বিছানায় সবাই মিলে দিদিকে ঘিরে বস্‌ল। সেই খোকা তাঁর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ডাগর চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে "এইবার বলো।" দিদি তার কোঁক্‌ড়া চুলে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প আরম্ভ কর্‌লেন।

সে অনেক বচ্ছর আগে, এক অন্ধকার বনের মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ে জন্মাল। সেই গহন বনের আঁধারের মধ্যে তার সুন্দর মুখখানি ভোর বেলার শুকতারার মত ঝিক্‌মিক্ কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন শীতকাল, সকাল হলেও কুয়াসার পরদা ছিঁড়ে সেই ঘন গাছের সার ভেদ করে আলো ঢুক্‌তে পারে না। গাছের পাতা সব শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে, আর ঠাণ্ডা হাওয়া তাদের শুক্‌নো হাড়-পাঁজরের মধ্যে ডাইনীর মত চীৎকার করে বেড়াচ্ছে। সমস্ত জগৎ শীতে হিহি করে কাঁপ্‌ছে। যেখানে যা কিছু সুন্দর ছিল সব শীতের ভয়ে কোথায় কোন্ মাটির তলায় লুকিয়ে আছে। মেয়ের মা নিজের আঁচল দিয়ে ছোট মেয়েটিকে ঢেকে রাখ্‌লেন, তাঁর নিজের গায়ে শীতের হাওয়া হুহু করে লাগ্‌তে লাগ্‌লো, কুয়াসা তাঁর খোলা চুলের রাশে ফোঁটা ফোঁটা জল হয়ে লেগে রইল। মেয়েটি মায়ের শরীরের গরমে আর আঁচলের আড়ালে বেশ গরম হয়ে রইল; কিন্তু মায়ের শরীর ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে এল। তাঁর নিশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছিল, তবু তিনি প্রাণপণে নিজের আঁচল দিয়ে খুকীকে ঢেকে রাখ্‌ছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর শীত তাঁকে কেবলি বেশী করে আঘাত করতে লাগলো। শেষে ছোট্ট খুকীকে সেই আঁধার বনের মধ্যে একলা ফেলে তিনি কোথায় কোন্ এক অজানা দেশে চলে গেলেন! সেখানে তাঁর কোনো কষ্টই আর রইল না।

ছোট মেয়েটি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না, সে চাঁপার কলির মত একটি আঙুল মুখে দিয়ে আগের মতই হাস্‌তে লাগ্‌ল। বাঘে ভালুকে তার মাকে খেতে এল, কিন্তু খুকীর মুখ দেখে তাদেরও দয়া হলো, তারা চলে গেল। একপাল হরিণ সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল, তারা দেখ্‌লে খুকীর চোখ তাদেরই মতন সুন্দর! একটি হরিণীর ছানা মারা গিয়েছিল, সে মেয়েটিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন পরে শীত চলে গেল। সবুজ রঙের কচি কচি ঘাস পাতা, যারা সব ভয়ে লুকিয়ে ছিল, সব তাড়াতাড়ি উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল যে তাদের বেরুবার সময় হয়েছে কি না! বনের দেবীরা কোকিলের কাছে খবর পেলেন যে বসন্তরাজ তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌ছেন! তাঁরা এতদিন শীত-বুড়োটার উপর রাগ করে ধূসর রঙের ঘোম্‌টায় মুখ ঢেকে বসে ছিলেন! এখন খুসী হয়ে নূতন সবুজরঙের কাপড় আর কাঁচা সোনার গয়না পরে সবাই বেরিয়ে এলেন; তাঁরা মাটিতে পা দিতেই শুক্‌নো ফাটা মাটি কচি ঘাসের গালিচায় ঢেকে গেল, তাঁদের মুখের হাসিতে শীতের কুয়াসা দূরে ছুটে পালিয়ে গেল, আর সারা বন আলোয় হেসে উঠ্‌ল। তাঁদের গলার স্বরে সব ঘুমন্ত পাখীগুলো জেগে উঠে গান ধরে দিলে।

সেই যে ছোট্ট খুকী, সে এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। সেই অনেক আগেকার দিনে বড় হতে এখনকার মত অত সময় লাগ্‌ত না, সবাই শিগ্‌গির বড় হয়ে যেত। যখন বনের মধ্যে আর সবই আঁধার তখনও মেয়েটির মুখ হাসিতে আলো হয়ে থাক্‌ত, তাই তার নাম হয়েছিল আলো। তার চোখ হয়েছিল তার হরিণী মায়ের মত! আর গায়ের রং হয়েছিল ঝিনুকের বুকে যে মুক্তা লুকিয়ে

থাকে, তেমনিই স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল। তাকে ত কেউ চুল বাঁধ্‌তে শেখায়নি, তাই তার কোঁকড়া চুলের গুচ্ছগুলি সব-সময়ই মুখের চারিদিকে দুলে খেলা কর্‌ত। সে কেবল হরিণছানাদের সঙ্গে খেলা কর্‌ত, তাই তাদের মত অন্য কোনো জীবজন্তু দেখ্‌লেই ছুটে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে যেত। সে কিনা হরিণের পালিত মেয়ে তাই তাকে কেউ ধর্‌তে পার্‌ত না। বসন্তকালে ফুলের হাটের মধ্যে তাকে কেউ যদি হটাৎ দেখ্‌তে পেত তাহলে ভাব্‌ত এ বুঝি বন-দেবীদেরই মেয়ে, খেলা কর্‌তে বেরিয়ে পড়েছে।

এম্‌নি করে দিন কেটে যায়, আলো এখন বেশ বড় হয়েছে। চাঁপা-গাছের ফুল পাড়্‌বার জন্যে এখন আর তার ময়ূর পাখীকে সাধ্‌তে হয় না, সে এখন নিজেই নাগাল পায়। আলো ফুল বড় ভালবাসে। সে বনের মধ্যে থাকে কিনা, তার ত সোনার হীরের গয়্‌না নেই, তাই সে ফুলের পাতারই গয়্‌না পরে। সে যখন জুঁইফুলের মল আর বালা পোরে মাথায় চাঁপার মালা জড়িয়ে সবুজ আঁচল উড়িয়ে হরিণছানাদের সঙ্গে ছুটে চল্‌ত, তখন তাকে দেখ্‌লে কিন্তু তোমরা বল্‌তে যে হীরের সোনার গয়্‌নার চেয়ে ফুলের গয়্‌না ঢের বেশী সুন্দর।

বর্ষাকাল এল। আকাশটা কালো মেঘে একেবারে ঢেকে গেল, ঝরঝর করে জল কেবলি ঝর্‌তে লাগ্‌ল, যত ঝর্‌ণা পুকুর নদী ছিল, সব কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠ্‌ল। মেঘের ডাকে সারা বন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু আশ্চর্য্য, যে হরিণরা সামান্য একটা শব্দ শুন্‌লে ভয়ে লুকিয়ে থাক্‌ত তারা মেঘের গভীর গম্ভীর ডাকে একটুকুও ভয় পেলে না, বরং পালে পালে বেরিয়ে আনন্দে লাফিয়ে খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। কতরকম তাদের রং, কেউ বা সোনালি, কেউবা নীল, কেউ বা নানা রঙের ছোপ লাগানো। কারো ডালপালাওয়ালা মস্ত শিং, কারো বা শিং একে-বারে নেই। তাদের দলে তীরের মত তীক্ষ্ণগতি, আগুনের হল্কার মত চোখ মস্ত বড় বড় বন্য-হরিণ অনেক ছিল, আবার খুব ছোট ছোট ছানাও ছিল, তাদের ডাগর চোখ দুটি সারাক্ষণ চঞ্চল হয়েই আছে, গায়ে সবে মাত্র পাট্‌কিলে রংএর চিক্‌চিকে লোম বেরুতে সুরু হয়েছে। আলোর সঙ্গে সবারই সমান ভাব, সবাই তার সঙ্গে খেলা কর্‌তে ভালবাসে। বনের ভিতর পাহাড়ের ছোট ঝর্‌ণাগুলোয় এখন অনেক জল, গলানো রূপোর স্রোতের মত ফেনায় ফেনায় শাদা হয়ে তারা হুড়মুড় করে পাহাড় বেয়ে নাম্‌ছে। আলো এখন নিজে সেগুলো পার হতে পারে না, বড় বড় শিংওয়ালা হরিণরা এসে তাকে পিঠে করে পার করে দেয়। আবার ছোট ছানাগুলো যখন বর্ষাকালের নূতন দূর্ব্বাঘাস দেখে লোভ করে খেতে গিয়ে নিজেদের দুধে-দাঁত দিয়ে ঘাস ছিঁড়তে পারে না তখন আলো তাদের নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মুঠো মুঠো দূর্ব্বা তুলে খাওয়ায়।

একদিন রাত্রির শেষে ভোর হয়েও বনে রোদ উঠ্‌ল না। কেবলি বৃষ্টির জল ঝর্‌ছে। হরিণরা কিন্তু পালে পালে বেরিয়ে পড়েছে, আলোও তাদের সঙ্গে বেরিয়েছে। খানিকক্ষণ খেলা করে তার আর ভালো লাগ্‌ল না, সে ঝাঁক্‌ড়া-মাথা গাছের তলায় বসে কতগুলো ফুল পাতা নিয়ে মালা গাঁথতে লাগ্‌ল। কাজ্‌লা বলে তার হরিণী মায়ের একটা ছানা তার কাছে এসে বসে পড়্‌ল, মাঝে মাঝে তার কোলে নিজের মুখটা ঘস্‌তে লাগ্‌ল।

হটাৎ একটা মৃদু শব্দে আলো মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লে একটি খুব সুন্দর মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! সে নিজের মুখের ছায়া অনেক ঝর্‌ণার জলে দেখেছিল, তাই বুঝ্‌তে পার্‌লে যে ইনি ঠিক তারই ধরণের দেখ্‌তে। এতদিন খালি জীবজন্তুর সঙ্গেই সে থেকেছে, তাই তার নিজের মত চেহারার আর-একজনকে দেখে সে খুব খুসী হয়ে বল্‌লে "আপনি কে?" সেই মেয়েটি খুব মিষ্টি হাসি হেসে বল্‌লেন "তুমি ত আমাকে চিন্‌বে না, এর আগে আমায় কখনো দেখনি। আমি তোমার সঙ্গেই দেখা কর্‌তে এসেছি!" আলো বল্‌লে "আপনি কি আমার সঙ্গে থাক্‌বেন?" তিনি বল্‌লেন "না। আমাকে তুমি আর চোখে দেখ্‌তে পাবে না, তবে আমি চিরকালই তোমার খুব কাছে কাছে থাক্‌ব।"

আলোর মুখটি ভার হয়ে এল। এখনি চলে যাবেন, তা হলে না-এলেই ত হ'ত! তার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে সেই মেয়েটি একটু হাস্‌লেন, তারপর দুই হাতে দুটি ফুল তুলে ধরে বল্‌লেন "আলো, এর মধ্যে একটি তোমায় দেবো, কোন্‌টা নেবে বলো ত?"

আলো মুখতুলে চাইলে। সেই সুন্দর মেয়েটির ডান হাতে একটি শাদা ধব্‌ধবে ফুল, তার বুকের ভিতর থেকে শাঁখের কোলের মত লাল আভা ফুটে বেরুচ্ছে, আর তার মিষ্টি গন্ধে যত মৌমাছি আর ভোম্‌রা এসে জুটেছে। এমন সুন্দর ফুল আলো কখনও দেখেনি, বনে ঢের ফুল ছিল, কিন্তু এমনটি কোথাও নেই। ফুলের ডাঁটাটি অনেকখানি লম্বা, তার রং গাছের পাতার মত সবুজ।

মেয়েটির বাঁ হাতে যে ফুলটা ছিল সেটা আর-এক রকমের, রক্তের মত ঘোর লাল তার রং, বেশীক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকলে চোখ ঝল্‌সে যায়। তার গন্ধ মিষ্টি কিন্তু ভয়ানক তীব্র, একটুক্ষণের মধ্যেই তাতে মানুষ মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে। আঁধার বনের মধ্যে ফুলটা যেন পদ্মরাগমণির মত ঝল্‌মল করতে লাগ্‌ল, তার কেশর থেকে রেণু ঝর্‌ছিল, ঠিক মনে হচ্ছিল আগুনের ফিন্‌কি ছুট্‌ছে! আলোর চোখ যেন ঐ ফুলে আট্‌কে গেল, শাদা ফুলটির দিকে তার আর চাইবার সময় রইল না। ফুলের ডাঁটাটা রূপোর মত ঝক্‌ঝকে আর তেমনই কঠিন দেখ্‌তে।

আলো কেবল চেয়েই আছে দেখে মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন "কোনটা নেবে বলো?" আলো কথা না বলে হাত বাড়িয়ে লাল ফুলটা তুলে নিলে। মেয়েটির মুখের হাসি এক নিমেষে নিভে গেল, তাঁর চোখে যেন জল ভরে এল, তিনি বল্লেন "আলো, আমি আর-একবার তোমায় দেখা দেবো, যখন তোমার আমাকে সবচেয়ে দরকার হবে তখন আমি আবার আসব।" এই বলে তিনি সেই ঘন গাছের সারের মধ্যে হটাৎ মিলিয়ে গেলেন।

আলো লাল ফুলটি নিয়ে বসে রইল। ফুলের গন্ধে কাজ্‌লা হটাৎ ভয় পেয়ে ছুটে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। আলো তখন ফুল নিয়েই ব্যস্ত, সে চেয়েও দেখ্‌লে না। রাত্রি হয়ে এল, হরিণরা সব নিজেদের আড্ডায় ফিরে চল্‌ল, কিন্তু ঐ আগুনের রঙের ফুলটা দেখে কেউ আর আলোর কাছে এল না!

সেইদিন থেকে আলো এক্‌লাই থাকে, তার সব সাথীরা এখন তাকে দেখ্‌লেই ছুটে পালায়, তার হাতের ফুলটার তেজ কেউ সইতে পারে না। আলোর কিন্তু তার জন্যে কিছু দুঃখ হত না, লাল ফুলটা পেয়ে সে এতই খুশী হয়েছিল! সেটার রং যেন দিন দিন আরো ঘোর হয়ে উঠ্‌ছিল, ফুলটাও ক্রমে বেশী করে ফুটে উঠ্‌ছিল, ঝর্‌বার নামগন্ধও তার ছিল না। দিনরাত ঐ ফুলটিকে নিয়ে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। যেখানে সে দাঁড়াত, সেইখান উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত, ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যেত!

বৃষ্টির ধারা ক্রমে কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। একদিন হটাৎ মেঘের ঘন নীল পর্দ্দা ছিঁড়ে সোনালি রোদ বনের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। গাছপালাদের মধ্যে যেন হাসির ঢেউ উঠ্‌ল, সবাই আনন্দে মাথা খাড়া করে দাঁড়াল। আলো, বনের পথ দিয়ে চল্‌ছিল, একটা রোদের টুকরো তার হাতের ফুলটার উপর এসে পড়্‌তেই সেটা যেন দপ্‌দপ্ করে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল!

আলো মনে মনে ভাব্‌লে "বেশ হল, আঁধারেই আমার ফুলটাকে এত সুন্দর দেখাত, এখন না জানি আরও কত ভাল দেখাবে।"

এমন সময় ভারি সুন্দর একটা সুর এসে তার কানে পৌঁছল। এ কিসের সুর? আলো এগিয়ে চল্‌ল, বোধ হলো তার সাম্‌নে থেকেই সুরটি আস্‌ছিল। পাহাড়ের তলায় যেখানে একটা ঝর্‌না নেমে এসে ছোট্ট একটি নদী সৃষ্টি করেছে, সে সেইখানে এসে দাঁড়াল।

নদীটির দুধারে ঝাউগাছের বন, সেই গাছের তলায় কে একজন বসে গান গাইছিল। সে অনেকটা আলোরই মতন দেখতে, কিন্তু একেবারে একরকম ত নয়? কোনখানে যেন একটু অন্য ধরণের। কিন্তু তারি জন্যেই যেন আলোর তাকে বেশী করে ভাল লাগ্‌ল। এমন সুন্দর মানুষ কোথা থেকে বনের মধ্যে এল? সে আলোরই মত অত বড়, এতদিন এ কোথায় ছিল?

তার গান শুনে বনের হরিণগুলো তার চারিদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে, কাজ্‌লা তার পায়ের কাছে শুয়ে পড়েছে। আলোর কি জানি কেন ইচ্ছে কর্‌ল যে সবাই চলে যাক্, সে কেবল একলা দাঁড়িয়ে ঐ মানুষটির গান শোনে।

সে আস্তে আস্তে ছেলেটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আলোকে দেখেই তার গান থেমে গেল, সে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। আলোর হাতের ফুল তখন

আঁচলের তলায়, কিন্তু তার গন্ধেই হরিণরা সব ছুটে পালিয়ে গেল।

আলো হাসিমুখে সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলে "তুমি কে? এখানে কি করে এলে?"

সে বললে "আমি অনেক দিন থেকে কেবলি ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঘুরতে ঘুরতে আজ এই বনে এসে পৌঁছেছি। আমি কে তা ত জানি না, আমাকে তা কেউ বলে দেয় নি!"

আলো অবাক হয়ে বললে "তুমি কেবলি ঘুরে বেড়াও কেন?"

"আমি একটা ফুল খুঁজছি কিনা, ভারি সুন্দর একটা ফুল। এখনও সেটা পাইনি, তাই কেবলি ঘুরছি। অনেক ফুল দেখলাম, আমি যে আরও সুন্দর ফুল চাই।"

আলো ভাবলে "এ নিশ্চয়ই আমার ফুলটাই খুঁজছে, এর চেয়ে সুন্দর ফুল ত আর হতে পারে না? এ কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে, আমি একটু একে আমার ফুল দেখাই।"

সে আঁচলের তলাথেকে ফুলটি বের করে তুলে ধরে হেসে বললে "দেখ দেখি, এই ফুল বুঝি? তুমি যদি রোজ ঐরকম সুন্দর গান শোনাও তা হলে আমি রোজই এই ফুল নিয়ে তোমার কাছে আসব।"

ছেলেটি মুখ তুলে চেয়েই হটাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলে বলে উঠল "না, না, ও ফুল নয়, তুমি ওটা নিয়ে চলে যাও, আমি দেখতে চাই না।"

আলো খুব অবাক হয়ে গেল, তার একটু রাগও হল! তার অমন সুন্দর ফুলও কিনা ছেলেটার পছন্দ হলো না! কিন্তু তার উপর রাগ ওর বেশীক্ষণ রইল না, সে আর-একটু এগিয়ে গিয়ে বললে "তুমি ভাল করে দেখ, এর চেয়ে সুন্দর কি ফুল কখনও হয়? কেমন সুন্দর এর গন্ধ!"

ছেলেটির মুখ কাঁদ-কাঁদ হয়ে গেল, সে আরও দূরে সরে গিয়ে বলতে লাগল "তুমি চলে যাও, আমি তোমার দিকে চাইতে পারছি না, আমার চোখে লাগছে। তুমি শিগ্‌গির সরে যাও।" আলো তবু যাচ্ছে না দেখে সে নিজেই ছুটে কোথায় চলে গেল। আলোর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেন ছেলেটি অমন করলে? সে যে-দিকে চলে গিয়েছিল, আলো সেই দিকে চলতে আরম্ভ করলে। বনের পথ ধরে, নদীর ধারে ধারে সে কেবলি চলতে লাগল, কিন্তু ছেলেটিকে কোথাও দেখতে পেলে না। ক্রমে রাত্রি হয়ে এল, আঁধারে চলতে গিয়ে তার পায়ে কাঁটা ফুটতে লাগল, চারিদিকে নানা-রকম শব্দ শুনে তার ভয় করতে লাগল, তবুও সে চলতে লাগল। এক-একবার তার ইচ্ছে করছিল ফিরে পালিয়ে যায়, কিন্তু ছেলেটির মুখ যেই মনে পড়ছিল অমনি সে আবার চলতে আরম্ভ করছিল।

শেষে রাত্রি ভোর হয়ে এল, এখন আর তত আঁধার নেই। আলো দেখতে পেলে অনেক দূরে বনের পারে একটা মস্ত কালো পাথরের ঢিপির পাশে একরাশ সবুজ শ্যাওলা আর পাতার উপর ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো তার কাছে গিয়ে দেখলে যে তার ঘুমন্ত মুখেও যেন দুঃখের ছায়া লেগে রয়েছে, সে যে তখনও ফুল পায় নি!

আলোর পায়ের শব্দে ছেলেটি জেগে উঠে বসল। আলো ভয়ে-ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে, সে যদি এখুনি আবার ফুলটা দেখে পালিয়ে যায়! কিন্তু কৈ সে ত এবার পালাল না? চুপ করে যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে রইল, কথাও বললে না, গানও করলে না! তবে কি আর তার ফুলটাকে ভয় করছে না?

সারারাতের মধ্যে আলোর একবারও ফুলটার কথা মনেই আসে নি। এখন সে নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখলে। ও মা! ফুলটা এ কি-রকম হয়ে গিয়েছে! তার রং কালো, পাপ্‌ড়ি শুক্‌নো, কোঁকড়ানো! কয়েকটা পাপ্‌ড়ি এরি মধ্যে ঝরে পড়েছে। এত যে তার তীব্র গন্ধ ছিল এখন তার লেশও নেই! আলো বুঝতেই পারলে না এ-রকম কি করে হলো। সে ত জানত না যে রাত্তিরে তার চোখের জল ক্রমাগতই ফুলটার উপর ঝরে পড়েছে আর তাতেই ফুলটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে! সে শুক্‌নো ফুলটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। তার ওটার জন্যে একটুও দুঃখ হল না, ছেলেটিকে পেয়ে সে এতই খুশী হয়েছিল!

কিন্তু কৈ, ছেলেটি ত তবুও তার সঙ্গে কথা কইলে না? তেমনি অন্যদিকে চেয়েই বসে রইল। আলো চুপ করে তার কাছে দাঁড়িয়েই রইল, তার তখন কান্না আসছিল।

খানিকক্ষণ ধারে নিশ্বাস ফেলে ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, তার পর বনের দিকে চলল! আলো আর থাকতে পারলে না, ছুটে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে "তুমি চলে যাচ্ছ কেন? আমি ত সে ফুলটা ফেলে দিয়েছি!"

ছেলেটি বললে "এখানে থেকে কি করব? আমি যে ফুল খুঁজতে যাচ্ছি!"

আলো বললে, "না, তুমি যেও না, কি রকম সে ফুল তুমি আমায় বলো, আমি সারা বন খুঁজে তোমায় এনে দেবো।"

ছেলেটি বললে "সে ফুলটি শাদা ধব্‌ধবে, কিন্তু তার বুকের ভিতরটা রঙিন, তার ডাঁটাটা সবুজ রঙের, অনেকখানি লম্বা। আর তার গন্ধ এমন মিষ্টি যে মৌমাছি আর ভোমরা তাকে ছেঁকে থাকে।"

আলোর মনে পড়ল ঠিক এমন ফুলই সে সেই সুন্দরী মেয়েটির হাতে দেখেছিল। হায়, হায়, তখন কেন সে লাল ফুলটা নিতে গেল! শাদা ফুল থাকলে ত আর কোনো দুঃখই থাকত না, ছেলেটিকে আর বনে বনে ঘুরতে হত না, সে আলোর সঙ্গেই চিরদিন থাকতে পারত। আলো সেইখানে বসে বসে কাঁদতে লাগল, ছেলেটি আস্তে আস্তে বনের মধ্যে চলে গেল।

আলো যে কতক্ষণ ওখানে বসে ছিল তার ঠিক নেই। সে বুঝতেই পারেনি যে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, দিনের আলো নিভে আসচে, আর গাছের সারির মাথার উপর দিয়ে চাঁদ উঁকি মারছে। হটাৎ সে শুনতে পেলে কে একজন বলে উঠল "আলো, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি!"

আলো মুখ তুলে দেখলে সেই মেয়েটি, এবার কিন্তু তার হাতে কিছুই নেই। আলো কাঁদতে কাঁদতে বললে, "তুমি যদি এলেই তবে সেই শাদা ফুল নিয়ে এলে না কেন?"

মেয়েটি বললেন "আমার কাছে ত সে ফুল আর নেই; তুমি নিলে না, তাই আমি সেটাকে অনেক দূরদেশের আর-একটি মেয়েকে দিয়ে এসেছি!"

আলো বললে "তবে আমি কি করব, ফুল কোথায় পাবো?"

"ফুল তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে, তা না হলে পাবে না।"

আলো বললে "কি করে করতে হয় তুমি বলে দাও, আমি ত জানি না।"

"বলে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি কি পারবে? সে যে ভারি শক্ত!"

আলো বললে "যতই শক্ত হোক না, আমি নিশ্চয়ই পারব।"

সেই মেয়েটি তখন আলোর কানে-কানে কি যেন বললেন, শুনতে শুনতে আলোর মুখ একেবারে শাদা হয়ে গেল, তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল, তবুও সে বললে "আচ্ছা তাই হোক।"

সেই সুন্দর মেয়েটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন, আলো তাঁর পিছন-পিছন চলল। সেই ছোট নদীর এক জায়গায় বড় বড় পাথর পড়ে স্রোত আটকে গিয়েছে, সেখানটি ঠিক একটি দিঘির মত। সেই দিঘির ধারে আলো আর তার সঙ্গিনী এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন "আলো, এইবার সময় হয়েছে, এখনও ভেবে দেখ পারবে কি না?"

আলো চোখ বুজে সেই জলের ধারে বসে পড়ল, কাঁপতে কাঁপতে বললে "হ্যাঁ পারব, আমার কিছু ভয় করছে না।" সে চোখ বুজেই যেন সেই ছেলেটির মুখ দেখতে পাচ্ছিল।

সেই মেয়েটি বললেন "একবার চোখ চাও।"

আলো চোখ চাইল, চাঁদের আলোতে চারিদিক ভরে গিয়েছে। আলোর সুন্দর মুখের ছায়া দিঘির বুকে যেন হাসছে। তখুনি একটা মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে, আলো আর কিছু দেখতে পেলে না।

অনেকক্ষণ পরে আঁধার কেটে গেল, আলো বুঝলে ভোর হয়েছে। সে তখনও সেই দিঘির ধারে বসে। দিঘির দিকে চেয়ে দেখলে, ও-মা এ কি! দিঘির জলে চারিদিক আলো করে সবুজ ডাঁটার উপর মস্ত বড় শাদা ফুল ফুটে উঠেছে! তার বুকের ভিতরটা তরুণী উষার মত লাল আভায় রঙিন। সকালের বাতাসে ফুলটি দুলতে লাগল, আর তার মিষ্টি গন্ধে রাজ্যের মৌমাছি এসে জুটল।

জানো, ফুলটি কোন্‌খানে ফুটেছিল? আলোর সুন্দর মুখের ছায়া যেখানে পড়েছিল, ঠিক সেইখানটিতে। ঐ ছায়াটিই নীলজলের কোলে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

আলো আর-একবার জলের দিকে চাইল। তার মুখ আর একটুও সুন্দর নেই, তার সব রূপ কোথায় চলে গিয়েছে। সে জলের ধার থেকে উঠে গিয়ে একটা মস্ত গাছের আড়ালে বসে পড়্‌ল।

এমন সময়ে কোথা থেকে সেই ছেলেটি দিঘির ধারে এসে দাঁড়াল। ফুল দেখে সে আনন্দে যেন পাগল হয়ে গেল, তখুনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলটিকে তুলে নিয়ে এল। তারপর সেটিকে বুকের কাছে নিয়ে আনন্দে গান করতে করতে চলে গেল। তার মুখ তখন যেন ভোরের সূর্য্যের মত ঝলমল্ কর্‌ছিল। কিন্তু ফুলটি তুলে নেবামাত্র ঠিক সেই রকমই সুন্দর আর-একটি ফুল সেই বোঁটায় ফুটে উঠ্‌ল! এ ফুল আর ফুরবে না, যে যতই তুলুক না কেন। এ ফুল দিনের আলোর সঙ্গেই ফুটে উঠ্‌বে, আবার আলো নিভে গেলেই সেও ঘুমিয়ে পড়্‌বে, সে আলোরই ফুল কি না!

আলো একদৃষ্টে ছেলেটির দিকেই চেয়ে ছিল। হটাৎ শুন্‌লে তার পাশে থেকে কে বল্‌ছে "আলো, ফুল পেয়ে খুসী হয়েছ?"

"আলো চেয়ে দেখ্‌লে কেউ নেই, বুঝ্‌লে সেই মেয়েটিই আড়াল থেকে কথা বল্‌ছেন, সে বল্‌লে "হ্যাঁ খুসী হয়েছি।" আড়াল থেকে তিনি আবার বল্‌লেন "কিন্তু তোমার এত দুঃখের ধন ত তোমার কাছে রইল না, সে ত পরে নিয়ে গেল!" আলো উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে "পরকে দিতে পেরেছি বলেই ত আমার অত দুঃখও সার্থক হয়েছে।"

ঘরের প্রদীপ নিভে আস্‌ছিল, খোকাখুকীদের মা ঘরে ঢুকে বল্‌লেন "হ্যাঁরে তোরা আজ ঘুমোবি না?" ছোট খোকা আধ-আধ সুরে বল্‌লে "মা, আম্‌লা যে ফুলেল দপ্প ছুন্‌ছিলাম।"

শ্রীসীতা দেবী।

ম্যালেরিয়া নিবারণের একটি দৃষ্টান্ত

বাংলাদেশের প্রধান ব্যাধি ম্যালেরিয়া। সকলেই জানেন ইহার প্রকোপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; যেখানে একদিন সুখ ও স্বাস্থ্য বিরাজ করিত, আজ সেখানে ম্যালেরিয়া রক্ত-শোষণ করিতেছে; ইহার অত্যাচারে বাংলাদেশের কত গ্রাম, কত পল্লী আজ জনশূন্য। প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়ার দরুণ মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

অথচ কেমন করিয়া এই ব্যাধির প্রতিকার করা যাইবে ইহা লইয়া এখনও এ-দেশে তর্ক-বিতর্ক লেখা-লেখি চলিতেছে। এমন কি ম্যালেরিয়ার মূলকারণ সম্বন্ধেও অনেকের মনে সন্দেহ আছে। আর দেখিতে দেখিতে ইতালীর বিস্তীর্ণ জলাভূমি মনুষ্যবাসের উপযোগী হইয়া উঠিল, মেক্‌সিকোর অস্বাস্থ্যকর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থান হইতে, প্যানামার মতন বিল হইতে ম্যালেরিয়া দূর হইল, যেখানে কোনোদিন মানুষ বাস করিতে পারিবে এমন আশা ছিল না আজ সেখানে সভ্যতার এক-একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারিল।

কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে যে চেষ্টা সফলতা লাভ করিয়াছে, আমাদের কাছে হয়ত সেই দৃষ্টান্ত উপযোগী না হইতেও পারে। এইজন্য ভারতবর্ষের কাছাকাছি মালয়-উপদ্বীপে একটি রবার-বাগানে (Rubber plantation) ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বাগানের মালিকেরা যাহা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

কিছুদিন হইতে মালয়-উপদ্বীপে রবারের চাষ সুরু হইয়াছে। দেশটা ইংরেজের অধীনে নহে, তবে ইংরেজ ইহার রক্ষক। ছোট ছোট রাজ্যগুলি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে—এক ভাগের নাম Federated Malay States বা যুক্ত মালয় ষ্টেট, অপর ভাগের নাম Non-federated Malay States (স্বতন্ত্র মালয় ষ্টেট।) আমি যে বাগানের বৃত্তান্ত বলিব তাহা Federated Malay States অর্থাৎ যুক্ত মালয় ষ্টেটের অন্তর্গত।

এখানকার জমি খুব উৎকৃষ্ট আর নদীখালের অভাব নাই; বৃষ্টির পরিমাণও যথেষ্ট, সাধারণতঃ কমবেশী হয়

না। এই সকল সুবিধার খোঁজ পাইয়া উদ্যোগী ইংরেজ অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি রবারের বাগান এদেশে স্থাপন করিয়াছে। ১৯১০ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩৫টি বাগান ছিল—পর বৎসরই গণনায় দেখা গেল ৭০০ বাগান। রবার-বাগানের জন্য কুলী আসে চীন আর ভারতবর্ষ হইতে। চীনার সংখ্যাই অধিক। কুলীদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ব্যবসায়ে লাভ হয় বেশী, সন্দেহ নাই। সেই হেতু বাগানের মালিকেরা ম্যালেরিয়ার প্রতীকারের জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন না।

আমি যে বাগানটির কথা বলিতেছি তাহার নাম "Seafield Estate"—সীফীল্ড্ এষ্টেট। যেখানে ইহা স্থাপিত সেখানকার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ ছিল—পৃথিবীতে বোধ হয় ম্যালেরিয়ার এত প্রাদুর্ভাব আর কোথাও নাই। স্থানটি পর্ব্বতাকীর্ণ; পাহাড়ের মাঝখানে অসংখ্য নালা আর দুইপাশে নিবিড় বন। যদি ঝোপ জঙ্গল কাটিয়া ফেলা যায় তবুও নালার Anopheles masculatus নামক মশকের সংখ্যা কমে না, আর যদি জঙ্গল থাকে তবে ইহারই জ্ঞাতি Anopheles umbrosus নামক মশার প্রাদুর্ভাব হয়। অতএব এই ষ্টেটে ম্যালেরিয়া-নিবারণের সমস্যা নিতান্ত সহজ নহে।

কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টা ও যত্নে এই বাগানে অল্পকালের মধ্যে যে সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। কুলীদের মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, প্লীহাযকৃতের আকার স্বাভাবিক হইয়াছে, এবং সমস্ত বাগানের স্বাস্থ্যের ক্রমশই উন্নতি হইতেছে। হাঁসপাতালের খাতা হইতে উদ্ধৃত অঙ্করাশি ইহার সাক্ষ্য দিবে।

হাঁসপাতালে ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর সংখ্যা

(বাগানের কর্ম্মীদের মধ্য হইতে)

সন	মোটকুলীর সংখ্যা	হাঁসপাতালে যত লোক ভর্ত্তি করা হইয়াছে	মৃত্যুসংখ্যা
১৯১৪	৬৫৮	৮১৫	২৭
১৯১৫	৮০৪	৯০০	২৪
১৯১৬	৮১১	৯৩৩	২০
১৯১৭	৭৭০	৭১৯	১৮

তারপর যাহাদের কেবলমাত্র ঔষধ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। মাথাধরা, গায়ে ব্যথা, সর্দ্দিজ্বর প্রভৃতি অসুস্থতাকেও যদি ম্যালেরিয়ার উপসর্গ নাম দেওয়া যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, স্থানীয় লোকজনের স্বাস্থ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

সন	কুলীর সংখ্যা	ম্যালেরিয়া	অন্যান্য ব্যাধি
১৯১৪	৬৫৮	৫৩৭০	৮৩৯৯
১৯১৫	৮০৪	৩২৩৭	৭৪১৭
১৯১৬	৮১১	১৫৫৮	৪৮৬৪
১৯১৭	৭৭০	৫৪৬	২৯০৯

অর্থাৎ ১৯১৭ সালে ৭৭০ কুলীর মধ্যে ৫৪৬ রোগীকে সামান্য অসুস্থতার জন্য ঔষধ দিতে হইয়াছে—দৈনিক দুইজনেরও কম অসুস্থ! ১৯১৭ সালে যদি ১৯১৪ সালের অনুপাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থাকিত তাহা হইলে ৭১৯ জনের স্থানে ৯৫৩ জনকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করা প্রয়োজন হইত এবং ৫৪৬ রোগীর স্থানে ৬২৮৪ জনকে বাহির হইতে ঔষধ দিতে হইত।

কুলীদের স্বাস্থ্য ভাল থাকা যে ব্যবসার পক্ষেও ভাল একথা বাগানের মালিকেরা বুঝিতেন। ১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালে প্রায় ১০৭৯৮ দিনের কাজ বেশী পাওয়া গিয়াছে। ইহা কি লাভজনক নহে?

মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে নিম্নে তাহা দেখান যাইতেছে :—

ভারতীয় কুলীদের মৃত্যুহার

সন	মোট কুলী	প্রতিহাজারে মৃত্যুসংখ্যা
১৯১১	৫২০	১৪৪
১৯১২	৪২৭	১২৩
১৯১৩	৫৫২	১১০
১৯১৪	৬৫৮	৬৯
১৯১৫	৮০৪	৪৮
১৯১৬	৮১১	৪৩
১৯১৭	৭৭০	৩৬

বাগানের কুলীদের মৃত্যুহার এখনও যদি ১৯১১ সালের মতন থাকিত তাহা হইলে কিরূপ অঙ্ক দাঁড়াইত দেখা যাক :—

	হাজারে ১৪৪ জন হারে	বাস্তবিক কত মৃত্যু হইয়াছে	কত মানুষের প্রাণ বাঁচানো গিয়াছে
১৯১৫	১১৫	৩৯	৭৬
১৯১৬	১১৬	৩৫	৮১
১৯১৭	১০৯	২৮	৮১
	৩৪০	১০২	২৩৮

আর অধিক অঙ্ক কষিবার প্রয়োজন নাই। এই রবার-বাগানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ রোধ করিবার চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, নানা ভাবে তাহা বুঝাইবার জন্যই গণনার সাহায্য লইতে হইল। কি প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার আলোচনা এখন করা যাক্।

মালয় উপদ্বীপে যে বিশেষ জাতের মশক ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করে তাহাদের নাম Anopheles umbrosus আর Anopheles masculatus. অর্দ্ধমাইলের মধ্যে ইহাদের গতিবিধি বদ্ধ। প্রথম সমস্যা, জলনিঃসরণের (Drainage) সুব্যবস্থা করা। কিন্তু কতখানি জমি কি-ভাবে ঢালু করিতে হইবে ইহা গোড়ায় হিসাব করা কঠিন। অতএব অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্ত এক এক কেন্দ্র ধরিয়া এক অভিনব প্রণালীতে জল নিঃসরণের ব্যবস্থা করা হইল। এ-দিকে এই ব্যবস্থায় ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে মশকের দলও ব্যাধির বীজাণু বহন করিবার আর সুযোগ পাইল না।

বাগানের কোনো নর্দ্দমার শেষপ্রান্তে রবারগাছ রোপণ করা হইয়াছিল। ইহা সঙ্গত নহে—কেননা গাছের শিকড় নালায় (pipes) নামিয়া জল চলাচলের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। কথা হইয়াছে গাছ সরাইয়া দেওয়া হইবে।

বাগানের মধ্যে বাঁধের (Dam) কাছে যে-কয়েকটি বাড়ী আছে, সেখানে মশার দৌরাত্ম্য কিছু বেশী। সন্দেহ হইল বাঁধের জলে মশা বংশবৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছে। কিনারা পরিষ্কার করা হইল, পাড় ঢালু করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু মশার উৎপাত কমিল না। মনে হইল বাঁধের জলে ভাসমান শেওলার আড়ালে মশকদের আশ্রয় থাকা সম্ভব। একবার পানা শেওলা ভাল করিয়া তোলা হইল, কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হইল না। তারপর অনেক পরীক্ষা ও পরিশ্রমের ফলে বাঁধের আবর্জ্জনারাশির মধ্যে Anopheles umbrosus পাওয়া গেল এবং এই পানাপুকুরটিই যে ম্যালেরিয়ার বাহন জন্মাইতেছে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। পাহাড়ের গা দিয়া আর যে-সব নালা গিয়াছে তাহাতে জল বাধিতে দেওয়া হয় না। যদি বাধে তবে তৎক্ষণাৎ সেখানে তেল ঢালিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই বৃহৎ জলাশয়ে ত তাহা ব্যবহার করিবার উপায় নাই। সমস্ত বাগানের পানীয় জল এই বাঁধ হইতে আসে। অতএব তুঁতে (copper sulphate) ব্যবহার করিয়া শেওলা পানা প্রভৃতি আবর্জ্জনা নষ্ট করিবার চেষ্টা হইল। রবার-বাগানের সমিতির রাসায়নিক মিষ্টার মরগ্যান্ বলিলেন তুঁতে ব্যবহার করাই ফলপ্রদ হইবে, কিন্তু থলির মধ্যে তুঁতে রাখিয়া তাহা জলে টানিয়া লওয়া অপেক্ষা তুঁতে গুঁড়া করিয়া ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। দানাগুলি পুকুরের তলদেশে পৌছিয়া উদ্ভিদের মূল নষ্ট করিতে পারে। এবং এই পরিমাণ (৩,০০০,০০০ মধ্যে এক ভাগ) তুঁতে মাছের পক্ষে হানিকর নহে।

এই বাগানে ডিসেম্বর মাস হইতে প্রতি সপ্তাহে ৪০০,০০০ মধ্যে একভাগ হিসাবে সাড়ে তিন সের তুঁতে বাঁধের জলে দেওয়া হইতেছে। আশা করা যায় ইহাতে মশার দৌরাত্ম্য কমিবে।

বাগানের হাঁসপাতাল সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই কুলীরা হাঁসপাতালকে ভয় করে এবং যথাসম্ভব ইহা এড়াইতে চেষ্টা করে। সেইজন্যই মালিক-দের এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। রোগীদের বিশেষ যত্ন করা হয় বলিয়াই এই ষ্টেটে এই বৎসর ১২৫০ জনের মধ্যে মাত্র ৩৫টি রোগী মরিয়াছে।

হাঁসপাতালে মশার উপদ্রব রোধ করিবার জন্য বাড়ীর প্রত্যেক জানলা দরজা ও রন্ধ্রের মুখে জালের পর্দ্দা ব্যবহৃত হইবার কথা উঠিয়াছে। মশারি অপেক্ষা ইহা সহস্রগুণে ভাল।

মালয় উপদ্বীপের রবার-বাগানের এই দৃষ্টান্তটি হইতে ম্যালেরিয়া-পীড়িত বাংলাদেশের কি কিছু শিখিবার নাই? একটি বাগানের মালিকেরা নিজেদের চেষ্টায় যদি এতটা সফলতা লাভ করিয়া থাকে, তবে বাংলাদেশের জমিদারগণ

কি তাঁহাদের নিজ নিজ জমিদারীর অন্তর্গত সকল গ্রাম হইতে এক এক করিয়া ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করিবার সুব্যবস্থা করিতে পারেন না?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর

[জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত]

৫৪ অধ্যায়।

তিব্বতে বিবাহ ও বিবাহিত জীবন।

আমি ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিবের বাড়ীতে বাস করিতাম। সেই সূত্রে অন্যান্য বড়লোকদিগের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হইল। আমি যখন লাসায় ছিলাম সেই সময় প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ের কন্যার সহিত য়ুটকের রাজকুমারের বিবাহ হইল। আমি সেই বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। তিব্বতের বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইতে লাসায় কি-প্রকারে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না। তিব্বতের নানা প্রদেশে নানাপ্রকার বিবাহের প্রথা দেখা যায়। আমি লাসায় বাস করিবার সময় অনেকগুলি বিবাহ দেখিয়াছি, তাই সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

তিব্বতে যে বিবাহ-প্রথা দেখা যায় তাহার বিশেষত্ব এই যে এক নারী বহু পতি গ্রহণ করে—যেমন অনেক দেশে বহু পত্নী গ্রহণের প্রথা দেখা যায়। সচরাচর এক পরিবারের ভ্রাতারা এক সাধারণ পত্নী গ্রহণ করে—কখন বা দুই তিনজন পুরুষ একজন নারীকে বিবাহ করে, আবার সময়ে সময়ে দেখা যায় কোন নারী স্বামীর অনুমতিক্রমে আবার অন্য পুরুষকেও বিবাহ করে। যদি কোন পরিবারের কর্ত্তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে হয় গৃহস্বামী স্বয়ং নয় ত তাঁহার পুত্র আবার বিবাহ করে এবং সেই নারীই পরিবারস্থ সকল পুরুষের পত্নী হয়। যে দেশের নিয়ম এই-প্রকার সে দেশের বিবাহপ্রথার কথা শুনিলে সভ্যসমাজের লোক লজ্জায় সারা হয়। তবে ভাইবোনের বিবাহ কিম্বা জেঠতুত মামাত পিশতুত ভাইবোনের বিবাহ অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া সে দেশে গণ্য। তিব্বতে স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভুত্ব অসাধারণ। স্বামীরা যাহা কিছু উপার্জন করিবে সমুদয় স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সন্তান যেমন মাতার কাছে ভিক্ষা করে তেমনি করিয়া ভিক্ষা করিয়া লইতে হয়। উপার্জ্জিত অর্থের কিছু যদি স্বামী স্ত্রীকে লুকাইয়া নিজের কাছে রাখে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই—তিরস্কার তুচ্ছ কথা—প্রহার পর্য্যন্ত স্ত্রীর হাতে লাভ করিতে হয়। নারীগণ তিব্বতরাজ্যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে পুরুষের উপর রাজত্ব করে। এমন আর কোথাও দেখি নাই। স্ত্রী যে হুকুম করিবেন, স্বামীদিগকে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতে হইবে। স্ত্রীর তুষ্টির জন্য স্বামী সকল কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত। যদি কোন বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন হয়, স্বামী দৌড়িয়া গৃহে গিয়া স্ত্রীর মত জানিয়া আসিবে। ধনীরা কখন কখন এক পতি মাত্র গ্রহণ করে। তিব্বতে বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ করা অতি সহজ। স্বামী কিম্বা স্ত্রীর অপরকে ভাল না লাগিলেই সম্বন্ধ ছিন্ন করা যায়। এদেশে বাল্যবিবাহ নাই—পুরুষ এবং নারী উভয়েই ২০ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করে। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য বিশেষ কিছু দেখা যায় না। কদাচ স্বামী স্ত্রীর চেয়ে বেশী বয়সের হয়। যদি কোন পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে জ্যেষ্ঠ ভাইকে সন্তানের পিতা এবং অন্যান্য ভাইদের কাকা বলা হয়। সমুদয় সন্তান জ্যেষ্ঠভ্রাতার বলিয়া গণ্য হয়।

এদেশে মনোনয়ন প্রথা নাই। পিতামাতা কন্যার পতি মনোনীত করিয়া দেন। কন্যার মত কখন জিজ্ঞাসা করা হয় না। এমন কি কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহ-সম্বন্ধে যে কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে তাহার বিন্দু-বিসর্গ জানান হয় না। এদেশে কদাচ লোকে আপনার পতি মনোনীত করে। তিব্বতে ঘটকের দ্বারা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইলেই তাহার জনকজননী উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিতে থাকে। কোন কন্যা উপযুক্ত মনে হইলেই ঘটকের দ্বারা সেই কন্যার পিতামাতার নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উভয় পক্ষে সম্মত হইলে বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়—তারপর যথারীতি বিবাহ হয়। কিন্তু

বিবাহের দিন পর্য্যন্ত পাত্রপাত্রীর নিকট বিবাহের বিষয় একেবারে গোপন রাখা হয়। যাহাদের বিবাহ তাহারা কোন কথাই জানিতে পায় না। পাত্রপাত্রীর পিতামাতা গণৎকারের নিকট গিয়া বিবাহের শুভদিন ঠিক করিয়া আসে। অন্যান্য দেশের মত বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে কোনরূপ যৌতুক দিতে হয় না। লোকে সাধারণমত কন্যাকে কিছু উপহার দেয়। বরের দিক হইতেও কন্যার মাতাকে "দুধের দাম" অর্থাৎ স্তনদুগ্ধের ঋণ মোচন স্বরূপ কিছু টাকা দেওয়া হয়। ভিতরে ভিতরে গোপনে বিবাহের দিন ঠিক হইয়া যায়। ঘটক চুপি চুপি বলিয়া পাঠায় কখন বরের দল কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইবে। তখন কন্যার মা আসিয়া আদর করিয়া মেয়েকে বলেন "আজ মনে করছি পূজা দিতে মন্দিরে যাব—কিম্বা বনে ফুলের উৎসব করতে যাব—তুমি বেশ সুন্দর করে কাপড়-চোপড় পরে এস, চুল বাঁধ—এখনই যেতে হবে।" হাবা মেয়ে আনন্দে আটখানা হইয়া বেশবিন্যাসে রত হয়; আর চতুর মেয়ে তখনই সব বুঝিয়া ফেলে এবং কাঁদিতে বসে।

কন্যার সাজসজ্জার কথা বলিতে গিয়া এদেশের লোক কি করিয়া মুখ ধোয়, সে কথা বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এদেশে সাধারণ লোক পারতপক্ষে জল স্পর্শ করে না, তবে ভদ্রলোক এবং বড়লোকদিগের মুখ ধুইবার ব্যবস্থা আছে। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেই ভৃত্য একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ গরম জল লইয়া উপস্থিত হয়, গৃহস্বামী মুখের ভিতর কিঞ্চিৎ জল লইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া অল্পে অল্পে হাতে ঢালিয়া সেই জল দিয়া হাতমুখ ধুইতে থাকেন, তারপর যখন জল ফুরাইয়া যায় তখন থুতু দিয়া মুখ হাত ঘসিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করা হয়। ইহার নাম মুখ হাত ধুইয়া ভদ্রলোকের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া। সাধারণ লোকেরা এতবড় আয়েসের ধার ধারে না।

বিবাহের দিন কন্যার সাজসজ্জা সমাধা হইলে মাতা আসিয়া গম্ভীর ভাবে বলেন "মন্দিরে যাওয়া নয় বাছা, আজ তোমার অমুকের সঙ্গে বিয়ে।" আর এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া কন্যা কাঁদিয়া আকুল হয়। সে বলিতে থাকে, "না মা, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।" তখন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন মিষ্টকথা বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। কন্যাকে পিতৃগৃহ হইতে বিদায় দিবার পূর্ব্বে দিন কয়েক ক্রমাগত তাহার পিতৃগৃহে ভোজের আয়োজন হয়। দরিদ্রের গৃহে দুই তিন দিন, ধনীর গৃহে দুই, তিন সপ্তাহ ধরিয়া ভোজন-ব্যাপার চলে। সেই সময় আত্মীয়-স্বজন আসিয়া আমোদ-প্রমোদ করে এবং কন্যাকে নিজেদের অবস্থানুসারে নানাবিধ উপহার দেয়। এই সময়ে সকলেই প্রচুর মদ্য পান করে। ভোজের মধ্যে চমরী আর ভেড়ার মাংসই প্রধান বস্তু। ভোজের আয়োজন অতি সাধাসিধা। মাংস সিদ্ধ আর ভাত। ভাতের সঙ্গে মাখম চিনি ও কিসমিস দেওয়া হয়। বিবাহের সময় সকলেই নানা-প্রকারে আমোদ করে। নৃত্য গীত, বাদ্য, ক্রমাগত চলিতে থাকে।

এখন বরপক্ষের কথা বলা যাক। বিবাহের দিন অপরাহ্নে বরের পক্ষ হইতে ঘটক এবং লোকজন কন্যাকে তাহার ভাবী পতিগৃহে লইয়া যাইবার জন্য আসে। তাহারা কন্যার মাতাকে কিছু টাকা দেয় অর্থাৎ স্তন্যের মূল্য পরিশোধ করে। কন্যাপক্ষ কিছুতেই সে টাকা লইতে চাহে না—তাহারা বলে "আমাদের কত আদরের কন্যা, তাহার জন্য আমরা কিছু লইতে পারি না—আমাদের মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে আদর হইলেই আমরা খুসী, ইত্যাদি।" অনেক পীড়াপীড়ির পর কন্যাপক্ষ চার টাকা গ্রহণ করে। কোন কোন স্থলে একেবারেই কিছু লয় না! তখন ঘটক কন্যার বিবাহের সজ্জা তাহাকে পরাইবার জন্য দেয়—কাপড়, জুতা কোমরবন্ধ সবই বরের পিতাকে দিতে হয়। সময় সময় বহুমূল্য রত্ন অলঙ্কার প্রভৃতি বরের পিতা এই উপলক্ষে ভাবী পুত্রবধূকে উপহার দিয়া থাকে। তিব্বতী মেয়েদের কপালের উপর যে গহনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই সধবার লক্ষণ। সধবা ভিন্ন কপালের উপর বহুমূল্য প্রস্তরখচিত গহনা কেহ পরেনা। মাথার উপর কিম্বা কপালের উপর এই গহনা দেখিলেই সধবা বলিয়া বুঝা যায়। স্বামী যদি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, এই গহনাখানি খুলিয়া লইলেই হইল, আর আদালতে যাইতে হয় না—মধ্যস্থও মানিতে হয় না। কন্যার পিতাও বিবাহের সময় কন্যাকে কিছু কিছু অলঙ্কার দিয়া থাকে—কিন্তু বিবাহের পোষাক বরপক্ষই দিয়া থাকে।

বরযাত্রীগণ বিবাহের রাত্রে কন্যার বাড়ীতে থাকে এবং মদ্য-মাংসে অভ্যর্থিত হয়। কিন্তু এখানেও এক বড় মজার প্রথা আছে। বরযাত্রীরা এবং ঘটক মহাশয় অতি সাবধানে মদ্যপান করিয়া থাকে, কন্যাপক্ষগণ ক্রমাগত তাহাদিগকে মদ্যপান করিবার জন্য অনুরোধ করে। যদি কোন-প্রকারে বরযাত্রীদিগকে মাতাল করা যায়, তাহা হইলে কন্যাপক্ষের ভারি লাভ। তাহারা কোন-প্রকারে বরপক্ষের কোন জিনিষ চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখে—পরদিন সমাগত লোকদিগকে তাহা দেখায়, তখন কন্যাপক্ষের আনন্দ আস্ফালন দেখে কে? বরপক্ষকে এই অসাবধানতার জন্য জরিমানা দিতে হয়। বিবাহবাড়ীতে মদ্যপান করিয়া যদি চীৎকার মাতলামি না হয় তবে সে দেশে বিবাহে কোন উৎসব হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করে না।

৫৫ অধ্যায়

তিব্বতের বিবাহ-পদ্ধতি।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে কন্যার গৃহে একটি ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। ঠিক সেই সময়ে দেবতাদের তুষ্টির জন্য প্রাচীন সম্প্রদায়ের মন্দিরে এবং গৃহেও পূজার আয়োজন হয়। প্রাচীন বন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস আমরা দেবতাদের তুষ্টিসাধন করিতে না পারিলে কন্যার পিতৃগৃহ ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে তাহারাও সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া যায়। তাই দেবতাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলা হয় তাহারা যেন কন্যার অনুগামী হইয়া তাহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত না করে। ভোজের পর পুরোহিত মহাশয় কন্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিবিধ মিষ্ট কথায় উপদেশ দিতে থাকেন, মধ্যে মধ্যে তিনি অতি সুন্দর সুন্দর গল্পও বলিয়া থাকেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এইরূপ "তুমি পতিগৃহে গিয়া সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে—শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা করিবে, স্বামীর অনুগত হইবে—স্বামীর ভাইবোনকে নিজের ভাইবোনের মত ভাল বাসিবে। ভৃত্যদিগকে সন্তাননির্ব্বিশেষে পালন করিবে। ইত্যাদি।" পুরোহিতের বক্তব্য শেষ হইলে পিতা-মাতা কন্যার সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐপ্রকার উপদেশ দেন। তারপর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে যথাক্রমে কন্যার হাত ধরিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া অনেক মিষ্টকথায় উপদেশ দিয়া থাকেন। সকলের বক্তব্য শেষ হইলে, কন্যা পিতৃগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করে। কন্যাকে বিবাহের সময় যৌতুক দিবার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। সম্পন্ন পিতা-মাতা কন্যাকে ভূমি-ধনরত্ন দান করেন। দরিদ্র সামান্য বস্ত্র দিয়া কন্যাকে বিদায় করে। বিদায়ের সময় কন্যা মাটিতে পড়িয়া রোদন করে, কিছুতেই অশ্বে আরোহণ করিয়া পতিগৃহে যাইতে প্রস্তুত হয় না। তখন তাহাকে দেখিলে মনে হয়, পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে তার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে! বন্ধুবান্ধব কন্যাকে ধরিয়া ঘোড়ায় উঠাইয়া দেয়। তিব্বতের মেয়েরা পুরুষের ন্যায় দুধারে পা দিয়া ঘোড়ায় বসে। বরের প্রদত্ত বস্ত্র পরিয়া কন্যা পতি-গৃহে যায়—পিতামাতা কন্যাকে মস্তকে ও হাতে অলঙ্কার দেন। কন্যার মুখ একপ্রকার বস্ত্রে ঢাকা থাকে। কন্যার পশ্চাতে প্রায় ১৪ ইঞ্চি লম্বা পাঁচ রঙ্গের একখণ্ড পতাকা দেওয়া হয়, তাহাতে সুবচন লিখিত থাকে। এই-প্রকারে কন্যাকে সকল বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করা হয়। বর-যাত্রী কন্যাযাত্রী সকলেই অশ্বে আরোহণ করিয়া কন্যার অনুগমন করে। বরের বাড়ী যাইবার সময় পথে ৬টি ভোজ দেওয়া হয়! বরযাত্রীরা তিনটি ভোজ দেয়—কন্যাযাত্রীরাও তিনটি ভোজ দিয়া থাকে। দুই মাইল তিন মাইল অন্তর এইরূপ ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। শেষ ভোজের পরই বরের গৃহের নিকটে সকলে উপনীত হয়। এই-সকল ভোজে কেহ অধিক মদ্যপান করে না, কারণ কন্যাকে বরের গৃহে নিরাপদে উপস্থিত করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তিব্বতে অতিথির সম্মুখে ভোজ্যবস্তু দিয়া অনেক অনুরোধ উপরোধ করিতে হয়। অনেক পীড়াপীড়ি করিবার পূর্ব্বেই আহার করিলে লোকে তাহাকে "চীনের মত চাষা" বলে। পথে তাঁবুতে তাঁবুতে ভোজের আয়োজন করিতে করিতে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। পাঠকপাঠিকাগণ হয়ত ভাবিতেছেন যে কন্যা পতিগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে মহাসমারোহে গ্রহণ করা হয়। এদেশের ব্যবহার ঠিক বিপরীত। কন্যা বরের বাড়ী আসিয়া দেখে যে দ্বার রুদ্ধ, তার প্রবেশের উপায় নাই। বরের বাড়ীর

সম্মুখে অনেক লোকের ভিড়, সেই ভিড়ের মধ্যে একব্যক্তি লুকাইয়া থাকে; কন্যার সঙ্গে যে-সকল ভূতপ্রেত, রোগের বীজ পথ হইতে আসিয়াছে তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই তাহার কাজ। সে ব্যক্তি যে কে তাহা প্রথমে কেহই অনুমান করিতে পারে না। তাহার ডান হাতের জামার ভিতর "তরমা" নামে মন্ত্রপূত এক মাখম-ময়দা দিয়া তৈয়ারী কাল রং করা তরবারি থাকে। সেটা অতর্কিতে হঠাৎ কন্যার মুখের উপর ছুড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সে দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়। কন্যার মুখের উপর তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। কন্যার মুখ কিন্তু বস্ত্রে ঢাকা থাকে। সে দেশের লোকের বিশ্বাস কন্যা পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় পিতৃকুলের দেবতাদিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে—পথে ইহার অনেক মন্দ আত্মা তাহার সঙ্গ লইয়াছে—সে জন্য কন্যাকে ভূতপ্রেতের হস্ত হইতে উদ্ধার না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে পারা যায় না। এই "তরমা" ছুড়িবামাত্র সমুদায় ভূতপ্রেত পলায়ন করে। কিন্তু "তরমা" ছুড়িয়াই এ ব্যক্তির দৌড়িয়া পলাইবার অর্থ কি?—এ দেশে এক অদ্ভুত নিয়ম আছে—এই ব্যক্তিকে কন্যাযাত্রী যদি কেহ ধরিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে ২০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। বাড়ীর ভিতর হইতে বরের আত্মীয়স্বজন কন্যাযাত্রীদের চীৎকার করিয়া বলে—যদি "সেপা" না বলিতে পার তবে কন্যা এ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। "সেপা" হচ্চে বরকন্যার শুভকামনা করিয়া নানা শ্লোক ছড়া বলা। "সেপা" বলিবার প্রস্তাব হইবামাত্র কন্যাপক্ষের মুখপাত্র বলিয়া উঠে আমরা "সেপা" বলিতে পারি—কিন্তু আমাদের 'কাটা' নাই। তখন দরজা একটু ফাক করিয়া বরের বাড়ী হইতে একখণ্ড কাপড় বাহির করিয়া দেয়, বাহির করিয়াই তখনই তাহা লুকাইয়া ফেলে। এই "কাটা" অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড যদি কন্যাপক্ষ ধরিয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে আবার ২০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। তখন কন্যা-পক্ষের মুখপাত্র "সেপা" বলিতে আরম্ভ করে। "এই সেই দ্বার যে দ্বারে প্রবেশ করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য, নিরবচ্ছিন্ন সুখসৌভাগ্য মেলে; ইত্যাদি ইত্যাদি।" "সেপা" বলা শেষ হইলে বরের বাড়ীর দ্বার উন্মুক্ত হয়।

মাঝে-মাঝে এমন হয় যে কন্যা হয়ত কোন গ্রামের ভিতর দিয়া আসিবার সময় সে গ্রামের লোকেরা আসিয়া কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অর্থদণ্ড না দিলে ছাড়ে না। যে-সকল পরিবার সাধারণের অপ্রিয় হয় তাহাদের অদৃষ্টেই এইপ্রকার অভ্যর্থনা জোটে।

বরের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র বরের মা দই এবং "চেমা" নামক সুখাদ্য হস্তে লইয়া দ্বারে উপস্থিত হন। ময়দা ঘৃত চিনি এবং এক প্রকার আলু দিয়া এই সুখাদ্য প্রস্তত হয়। এই সুখাদ্য একটু একটু সকলকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। বরের মা পরম সমাদরে সকলকে গৃহে লইয়া ভোজের আয়োজন করেন। পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়ে—পতিকুলের দেবতাদিগকে বলা হয় যে সে-গৃহে যে নূতন বধু আসিয়াছে তাহাকে যেন রক্ষা করেন।

বরযাত্রী এবং সমুদয় অভ্যাগতকে বরের পিতামাতা, "কাটা" দেয়। বরের বাড়ী কয়েকদিন ধরিয়া ভোজ চলিতে থাকে—আত্মীয়স্বজন আসিয়া আমোদ প্রমোদ করে এবং সকলেই বরকন্যাকে কিছু কিছু উপহার দিয়া থাকে। কখন দুইতিন দিনে বিবাহোৎসব সমাধা হয়—কখন কখন একমাস পর্য্যন্ত আমোদপ্রমোদ চলিতে থাকে। অন্যান্য অতিথি অভ্যাগত বিদায় লইলেও কন্যার বাড়ীর লোকজন কিছুদিন বরের বাড়ীতে বাস করে। ধনীর কন্যা হইলে কন্যার সহিত পিতৃগৃহ হইতে যে সকল ভৃত্য আসে তারা আজীবন সেখানেই থাকে। বিবাহের একমাস কিম্বা একবৎসর পরে কন্যা পতির সহিত পিতৃগৃহে আগমন করে, এবং যতদিন ইচ্ছা পিতৃগৃহে বাস করে। জামাতা দিনকয়েক শ্বশুরগৃহে থাকিয়া স্বীয় আলয়ে ফিরিয়া যায়—আবার যথা-সময়ে পত্নীকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া থাকে। বরের ভাই থাকিলে তাহাকেও কিছুদিন পরে বিবাহ করিতে হয়। সে বিবাহ ঘরে-ঘরেই হয়, বরের মা জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর সঙ্গেই কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। এই দ্বিতীয় বিবাহের সময় বধূর প্রথম স্বামী গৃহে থাকে না, তাহার অনুপস্থিতিতে বিবাহ হইয়া যায়। স্বামীর যত ভাই থাকুক না কেন প্রত্যেককে এইপ্রকারে বিবাহ করিতে হয়। কখন কখন কোন-প্রকার অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই তিব্বতী মেয়েরা দেবরদের

পতিরূপে গ্রহণ করে। তিব্বতের বিবাহপ্রথা এইরূপ। কিন্তু নারী অনেক পতি গ্রহণ করিলেও সকল পতি একত্র বাস করে না। একজন যখন গৃহে থাকে, অপর সকলে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম্মে চলিয়া যায়। একসময়ে যাহাতে একজন বই ধরে অপর স্বামী না থাকে, সেই ব্যবস্থা করা হয়। তিব্বতে নারীর বহুপতি গ্রহণের প্রথা অতিশয় প্রবল। সেখানকার লোকেরা ইহাকে অতি সুপ্রথা মনে করে। বিদেশীরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করিলে বিরক্ত হইয়া বলে, "আমাদের এই চিরদিনের নিয়ম।"

যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব আজও আছে এমন কুৎসিত প্রথা সে দেশে—এ দোষ বৌদ্ধধর্ম্মের নয়—যত ঐ দোষ লামাদিগের। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম কি তাহারা তা জানেই না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা দেবী।

পঞ্চশস্য

অন্ধকার দেখা—

অনেকের অভ্যাস আছে দেখা যায় যে মাথা ধরিলে তাহারা ঘর অন্ধকার করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু কেন যে থাকে তা তাহারা জানে না। নিউইয়র্কের ডাক্তার উইলিয়াম বেট্স্ তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন যে কৃষ্ণবর্ণের চিন্তার দ্বারা মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারিলে শারীরিক বেদনা বোধ অনেক কম হয়। এইজন্য অন্ধকারে বেদনার উপশম বোধ হয়। কাহারো শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে সে এই কালোর আবরণে অনেক পরিমাণে যন্ত্রণা দূর করিতে পারে। বেদনায় কাতর রোগী যদি চোখ বুজিয়া দুই হাতের তেলো চোখের উপর চাপিয়া আলো অবরোধ করে আর মনে-মনে মিশমিশে কালো রূপ ধ্যান করে, তাহা হইলে তার বেদনা কম বোধ হইবে। চোখ বুজিবার আগে রোগী যদি কালো ফাউন্টেনপেন বা কালিবুরুশ জুতার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া কালোর রূপ মনে গাঁথিয়া লয় ও তাহারই ধ্যান একমনে করে তবে ফল আরো ভালো হয়। Neuralgic ব্যথায় এই প্রক্রিয়ায় খুব উপকার পাওয়া যায়। অন্ধকার ধ্যানে মনের যে অনুভবশক্তির অবসাদ হয়, তাতে দাঁত তোলা ও ছোটখাটো অস্ত্র করা স্বচ্ছন্দে চলে দেখা গিয়াছে। এই ঔষধে খরচ বা হানি কিছুই নাই, সুতরাং পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আপনার এবার যখন মাথা ধরিবে বা স্নায়বিক শ্রান্তিতে অবসন্ন বোধ হইবে তখন একবার 'চুচক্ষু মুদে' চোখের উপর হাতের তেলো চাপিয়া 'অন্ধকার দেখা' পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। (Every Week.)

লালয়েৎ, ন তু তাড়য়েৎ—

চাণক্যের কৌটিলীয় শাস্ত্রের কুটিল বিধি ছিল,

'লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ন, তু লালয়েৎ॥"

কিন্তু এখনকার কালের পিতা ও শিক্ষকেরা ঠেকিয়া বুঝিয়াছেন যে চাণক্যনীতি পালন করাতে ফল খারাপই হয়। তাই তাঁরা এখন চাণক্যের শ্লোকটিকে কিঞ্চিৎ বদল করিয়া লইয়াছেন—

'তাড়নে বহবো দোষাঃ লালনে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ন, তু লালয়েৎ॥'

অথবা

'তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ লালয়েৎ, ন তু তাড়য়েৎ॥'

এখন অভিভাবকেরা বুঝিতেছেন শিশুরা যেমনভাবে খেলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা আপনা হইতেই আহরণ করিয়া লয়, তার তুল্য ফল সাবেকি শুষ্ক পদ্ধতিতে হয় না, মার-ধর মেজাজগরম করিলে ত শিশুর মন আর মগজ একদম খাবড়াইয়া যায়।

আমেরিকায় গ্যারী-পদ্ধতির শিক্ষাপ্রণালীতে শিশুদের মনে শিক্ষালাভের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগাইয়া তবে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। যে বিষয় জানিতে আগ্রহ জন্মে তাহা শিখিতেও শীঘ্র আর অনায়াসে পারা যায়।

গ্যারী-পদ্ধতির স্কুলে ছেলেমেয়েরা যখন খুসী সেখানে খুসী গল্প করে, হাসে, খেলা করে; স্কুলে গোলমাল করিতেছে বলিয়া গুরুমহাশয় চোখ রাঙাইয়া বেত উঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসেন না। সেখানে ইতিহাস অভিনয় করিয়া পড়ানো হয়; আবৃত্তি করিবার জন্য পড়া মুখস্থ করিতে ছেলেদের আগ্রহই দেখা যায়। স্কুলের সঙ্গে লাইব্রেরী থাকে; সেখানে সকল বয়সের শিশুর উপযুক্ত বই আর বসিয়া পড়িবার জায়গা থাকে; ছেলেরা খেলা করিতে করিতে কখনো কখনো গিয়া রঙিন ছবির বই পাড়িয়া বসে; একের দেখাদেখি অপর পাঁচজনও আসিয়া জুটে। প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে খোলা হাতা থাকে, সেখানে ক্লাসের পড়ার মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েরা গিয়া ছুটিয়া খেলা করিয়া আসে; স্কুলের সমস্ত ছেলেমেয়ে একসঙ্গে খেলিবার ছুটি পায় না, ছয় ভাগের এক ভাগ একসঙ্গে ছাড়া পায়, তাতে খেলার জায়গায় বেশী ভিড়ও হয় না।

যে ছেলের যন্ত্রবিজ্ঞানে অনুরাগ বা যার ছাপাখানার কাজ শিখিবার ঝোঁক, সে ছেলেকে অনাবশ্যক বোধোদয়ের দুর্ব্বোধ্য শব্দের বানান আর জীবনে অব্যবহার্য্য বাক্যের মানে আয়ত্ত করিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিতে হয় না। যার যাহা ভালো লাগে তার জন্য সেইরকম বিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা স্কুলে থাকে। একটি ছেলে হয়ত পড়া ফেলিয়া যন্ত্রের কৌশলেই আকৃষ্ট হইল; কিন্তু সে যন্ত্র চালাইতে চালাইতে বুঝিল যে অঙ্ক আর অঙ্কন না জানিলে যন্ত্রী হওয়া যায় না; তখন সে ঐ দুই বিদ্যার প্রতিও মন দিল; তারপর সে দেখিল যে ভাষা শিক্ষা ব্যতীত কিছুই শেখা যায় না; তখন তাকে সাহিত্যের মূল্য কাহাকেও উপদেশ দিয়া বুঝাইতে হইল না।

গ্যারী-পদ্ধতির স্কুলের শিক্ষকেরা জানেন যে শিশুরা কথার ফোয়ারা আর চঞ্চলতার অবতার; সেইজন্য তাঁরা শিশুদের আড়ষ্ট করিয়া বোবা বানাইয়া রাখেন না। ছেলেরা তাদের পুষি মেনী বেরাল, কুকুর, ছাগল পর্য্যন্ত স্কুলে লইয়া যাইতে পায়। কোনো ছেলে দাণ্ডাগুলি খেলিয়া স্কুল কামাই করিলে পরদিন তাকে স্কুলে গিয়া বেঞ্চিতে দাঁড়াইতে হয় না—সুতরাং স্কুল শিশুদের কাছে

গ্যারী স্কুলের পাঠাগার।

গ্যারী স্কুলের ক্লাস।

কারাগারের রূপান্তর নহে। একজন যেই বলিল—'ভাই, খেলতে যাবি ?' অমনি ক্লাস শুদ্ধ চম্পট, গুরুমশায়ের অনুমতিরও অপেক্ষা নাই; গুরুমশায়কে তাদের পিছনে পিছনে ছুটিতে হইল; তারপর তারা দল বাঁধিয়া নদীতে গিয়া গুরুমহাশয়ের সাহায্যে শিখিয়া আসিল কেমন করিয়া বেঙাচি হইতে ব্যাং হয়।

গ্যারী স্কুলের ছেলেরা নিজেদের ছাপাখানায় নিজেদের বই ছাপার খেলা করিয়া শুদ্ধ বানান আর কথার মানে আনন্দে শিখে। ছেলেদের রচিত কবিতা গল্প একত্র করিয়া মাঝে মাঝে বই ছাপা হয়; তারা গ্রন্থকার কম্পোজিটার প্রুফরীডার প্রিণ্টার সব নিজেরাই। কোনো কোনো স্কুল থেকে সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়। এইরূপে ছেলে-মেয়েরা নানা কাজ হাতেকলমে ছেলেবেলা হইতে শিখিতে থাকে, তাতে তাদের তৎপরতা নিপুণতা বাড়ে। এইসব কাজ শেখানোর মানে এ নয় যে ঐ ছেলেমেয়েরা বড় হইয়াও ঐসব কাজ করিয়াই জীবিকা উপার্জ্জন করিবে। তাদের কাছে জ্ঞানের আর বিদ্যার সকল দরজাই খুলিয়া ধরা হয়, সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে করিতে ছেলেমেয়েরা আপনার মতের ও ক্ষমতার মতন ক্ষেত্র বাছিয়া লইবার অবকাশ পায়।

এইসব স্কুল ছেলেমেয়েদের এমন প্রিয় ও টানের জায়গা যে বাড়ীতে দুষ্টামি করিলে মা-বাপেরা ছেলেদের শাসন করেন—'কাল তোমাকে স্কুলে যেতে দেবো না!' এই দারুণ শাসনে ছেলে শান্ত হয়।

গ্যারী স্কুলে ছেলেদের ছাপাখানা।

আর আমাদের ছেলেমেয়েদের ঐ কথা বলিলে তারা উহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাচে। (Every Week.)

শিশুদের বইয়ের দোকান—

শিশুদের দেখা শোনা ভাবা চিন্তা তাদের নিজেদের ধারাতেই চলে। এই সোজা কথাটি বুঝিয়াই আজকালকার শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। আমেরিকার বষ্টন শহরের Woman's Industrial Union বা স্ত্রীশিল্পসমবায় এই সোজা কথাটি কাজে খাটাইবার জন্য শিশুদের জন্য একটি বইএর দোকান খুলিয়াছেন। এই দোকানটি সদর রাস্তার উপর সাধারণের বাগানের ধারে বেশ ফর্দ্দা আলো-হাওয়াদার ঘরে। এই দোকানের বইএর তাক আল্‌মারী সব ছোট ছোট, স্থানে-স্থানে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার পাতা আছে; দোকানঘর জমকালো রঙিন ছবি, টবের ফুলগাছ, পরদা ঝালর দিয়া বাড়ীর মতন সাজানো—কেনাবেচার দোকান বলিয়া চিনিবার জো নাই। বইএর তাকগুলি শেয়াল-পণ্ডিতের আর নাপিত ভায়ার গল্পের বইএ বোঝাই; ক্ষুদে-ক্ষুদে ক্রেতারা দোকানে গিয়া নিজের ইচ্ছামত বই টানিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া বসিয়া পড়ে অথবা পছন্দ হইলে কিনিয়া বাড়ী লইয়া যায়। এইরূপে এই দোকান হইতে ছেলেমেয়েরা ভালো ভালো বই কিনিতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বইএর উপর ভালোবাসা বাড়িয়া চলে। উৎকৃষ্ট বই জীবনের উত্তম সঙ্গী, এ কথা শিশুরা ছেলেবেলা হইতেই বুঝিতে শিখিতেছে।

এই দোকান ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ক্লাব বা আড্ডার মতন হইয়া উঠিয়াছে, তারা পরস্পরের কাছ হইতে নূতন বইএর খবর পায়, কোন্ বই ভালো বা মন্দ আর কেন ভালো বা মন্দ তা লইয়া বিচার বিতর্ক করিতে শিখে, পরস্পরের মননশক্তির সংঘর্ষে উৎকর্ষ ঘটিতে থাকে। মাঝে-মাঝে সময় স্থির করিয়া গল্প-বলিয়েরা সমবেত ছেলে মেয়েদের মুখে মুখে গল্প বলিয়া শোনান। দোকানে মাঝে মাঝে শিল্প-প্রদর্শনীও হইয়া থাকে।

এই দোকান হইতে দেখা যায়, সকল ছেলেমেয়ের রুচি একরকম নয়; কেউ-কেউ বা কেবলই ইতিহাস পড়িতে ভালো বাসে। এক দিন দুটি ছোট ছেলে আসিয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মানুষ কেমন করে হল তার কোন বই আছে কি? ডারউইন আর ওয়ালেসের তত্ত্ব সহজ করিয়া লেখা বই তাদের জোগাইতে হইল। সেই দুটি ছেলে দুহাজার বছরের পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একজন প্রাচীন ও অপরজন অর্ব্বাচীন কাল লইয়া লাগিয়াছে—অর্ব্বাচীন কালের অর্ব্বাচীন লেখকটি হালনাগাদ ইতিহাস লিখিবেন—বর্ত্তমান যুদ্ধের কথাও বাদ পড়িবে না। ইতিহাসখানি হাজার পৃষ্ঠার হইবে। এখনো প্রেসে যায় নাই যদিও।

এইরকম বইএর দোকান কি আমাদের দেশে কেউ খুলিবেন না? আমাদের এই দেশ কি চিরকাল নিরানন্দ ছেলেদের ভ্রূকুটি দেখাইতেই থাকিবে? (American Review of Reviews.)

গ্যারী স্কুলে ছেলেদের যন্ত্রকৌশল শিখিবার ক্লাস।

মাতাল মৌমাছি চোর—

মদ খাইলে মানুষ অধঃপাতে যায়, ভদ্রলোকেও চোর হইয়া দাঁড়ায়, জানা কথা। মদ যে পতঙ্গকে পর্য্যন্ত চোর বানাইয়া ছাড়ে ইহা নূতন কথা। যে মৌমাছি শ্রমপরায়ণতার দৃষ্টান্তস্থল, সেও মদ খাইলে শ্রমবিমুখ হইয়া চোর হইয়া উঠে। আমেরিকার ক্রিশ্চান হেরাল্ড নামক খবরের কাগজে প্রকাশ যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিউ-জার্সী জেলার একজন লোক এক ঝাঁক মৌমাছি পুষিয়া তাদের মদ খাইতে শিখাইয়াছে। ফলে এই মৌমাছির ঝাঁকটি মাতাল হইয়া এমন অলস

শিশুদের বইএর দোকান।

কর্ম্মকুণ্ঠ হইয়াছে যে ফুলে ফুলে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মধু আহরণ না করিয়া তারা পরের মৌচাকে সিঁদ কাটিয়া আহৃত মধু চুরি করিয়া বেড়ায়। এই উপায়ে সেই লোকটি প্রতিবেশীদের চাকের মধু মাতাল মৌমাছিদের দিয়া চুরি করাইয়া প্রতিবেশীদের চেয়ে বেশী লাভ করিতেছে।

কিন্তু 'দি গাইড টু নেচার' নামক খবরের কাগজ ঐ কথা স্রেফ্ গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। এর মতে মৌমাছিদের চাকে মধুর অভাব ঘটিলে আর নিকটে মধু প্রচুর না মিলিলে মৌমাছিরা প্রতিবেশীর চাক হইতে চুরি করিয়া থাকে; এই চুরি নিবারণের জন্যই মৌমাছির হুল আছে—তা সে চোর মানুষই হোক, কি ভালুকই হোক, কি মৌমাছিই হোক। তামাকপাতা বা সিদ্ধির পাতার ধোঁয়া লাগাইলে যেমন মৌমাছিরা নেশায় ঝিমাইয়া পড়ে, তেমনি মদ খাইলেও তাদের ঝিমাইয়া পড়িবার কথা, মদের নেশায় যদি যারা তারা চুরি করিবার মতন সামর্থ্য পাইবে কোথায়?

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, খোয়ারি ভাঙিবার সময় ত চুরির প্রবৃত্তি চাগিতে পারে।

আলোর আবশ্যক—

মানুষ ঘরবাড়ী করিয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়া একদিকে যেমন ঝড়বৃষ্টি শীতাতপ থেকে বাঁচিয়াছে, অপর দিকে তেমনি আলো আর বাতাস থেকে বঞ্চিত হইয়াছে। ঘরের ভিতরের চেয়ে খোলা মাঠের উপর আলো বাতাস কত বেশী! ঘরের চেয়ে খোলা জায়গায় আলো ১০ হইতে ৮০০ গুণ বেশী চড়া হয়, কোনো জায়গায় ঘরের চেয়ে বাহির দশ হাজার গুণ উজ্জ্বল। যেসব ঘর আলোওয়ালা কাচের, সেখানেও বাহিরের আলো কুণ্ঠিত হইয়া মন্দীভূত হইয়া প্রবেশ করে—কতক আলো কাঁচের স্বচ্ছ গায়ে লাগিয়া ঠিক্‌রিয়া বাহির দিকেই ছিট্‌কাইয়া যায়, কতক আলো কাঁচ নিজেই অপহরণ করে। যে-কাচের পিঠ খুব চৌরস, কোথাও কোনো কোণ নাই, আর আলোর ধারা কাচের পিঠে সমকোণে আসিয়া পড়ে, সেখানেও আলোর দশমাংশ অপচয় হইয়া যায়। তারপর বাড়ীর পাশে যদি উঁচু বাড়ী বা গাছপালার আড়াল থাকে তবে আলো আরো বাধা পায়।

আমেরিকায় এই আলোর অভাব মোচনের জন্য কারখানা দোকান প্রভৃতির বাড়ী যথাসম্ভব বেশী জানলা রাখিয়া ও শার্শী-কপার্ট আর কাচের ছাদ দিয়া তৈরি করা হইতেছে; আশপাশের বাড়ীগুলিতেও এমন হাল্কা রং দেওয়া হইতেছে যে সেইসব দেয়াল হইতে আলো ঠিক্‌রিয়া দোকানঘরের কাচের দেয়ালের ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরে পড়ে। একটি কারখানা তৈরী হইয়াছে, তার দেয়ালের ৯৩৫ অংশ কেবল জানলা।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যে ঘরে বাহিরের চেয়ে ৫০ গুণ আলো কম, সে ঘরে জুন মাসের দিনেও সকাল ৭টায় আর বিকাল ৩টায় কৃত্রিম আলো না জ্বালিলে কাজ করা যায় না; শীতকালে আরো অল্প সময় কাজের মতন আলো পাওয়া যায়; মেঘলা দিনে আরো কম।

আমাদের দেশের—বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদের সন্দুক-কা মাফিক অস্বাস্থ্যকর অন্তঃপুরে, দোকানঘরে, আপিসে এই আলোর যে-রকম অভাব তার প্রতীকারের জন্য আমরা কি করিতেছি? মনের আর ঘরের সকল রকম অন্ধকার দূর করার জন্য আলোর দরকার আমাদেরই সবচেয়ে বেশী। আমেরিকার কারখানাওয়ালারা মজুরদের

দু মাসে শহর পত্তন। এই শহরে ৪৮০০০ সৈন্য বাস করিবে, ১৪০০ বাড়ী আর ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

কল্যাণের জন্য কাঁচের বাড়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু আমরা যারা বাড়ীর কর্ত্তা তারা সকালবিকাল মাঠে আলো বাতাস সম্ভোগ করিয়া আসি বলিয়া মা স্ত্রী কন্যা প্রভৃতির কষ্টভোগের দিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক মনে করি না; আমরা যারা মনিব তারা চাকরদের অন্ধকার স্যাঁতা ঝুপ্‌সী ছোট ঘরে সমস্ত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিতে দ্বিধা বোধ করিনা, কারণ আমাদের নিজেদের ত সে রকম ঘরে থাকিতে হয় না। এই স্বার্থপরতাই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অন্তরায়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শহর—

ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে, রোম নগর একদিনে তৈরি হয় নাই। কিন্তু আমেরিকা সেই কথাটাকে খেলো করিয়া একদিনে না হোক দু মাসে আড়াই মাসে একএকটা শহর পত্তন করিয়া তুলিয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকা লিপ্ত হইয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। আগে ত আমেরিকার এত সৈন্য ছিল না, সুতরাং তাদের থাকিবার মতন বাড়ীঘরও ছিল না। এখন বিরাট বাহিনীর বাসের জন্য আমেরিকা তাড়াতাড়ি ১৬টি শহর পত্তন করিয়াছে; একএকটি শহর দু মাসে আড়াই মাসে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একএকটা শহর স্থাপন করিতে দেড় কোটি টাকা খরচ হইয়াছে; এক এক শহরে ৩৫০০০ হইতে ৪৫০০০ লোক বাস করিবে; তার জন্য ১৪০০ হইতে ১৫০০ বাড়ী নির্ম্মাণ, পথ ঘাট বাগান জলের-কল নর্দ্দমা প্রভৃতির ব্যবস্থা, বিদ্যুতের আলোর কারখানা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুতের আলোর আর টেলিফোনের তার খাটানো, মিউনিসিপালিটি, পুলিশ, আদালত কাছারী আপিস ব্যাঙ্ক পোষ্টাপিস প্রতিষ্ঠা, যাতায়াতের যানবাহনের ব্যবস্থা, লাইব্রেরী গির্জা দোকান খোলা—সব ঐ দু মাসে আড়াই মাসের মধ্যে করিয়া তোলা এক আলা দীনের প্রদীপের সাহায্য ছাড়াও যে সম্ভব ছিল তা আমেরিকা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে। এই সব সহর লোকসংখ্যায় আমাদের দেশের আরা বর্দ্ধমান ছাপরা মুঙ্গের মজঃফরপুর শ্রীরামপুর মেদিনীপুর জৌনপুর আলিগড় গাজিপুর মোরাদাবাদ প্রভৃতি শহরের সমান; বালেশ্বর বাঁকুড়া বহরমপুর হুগলী-চুঁচুড়া নৈহাটি-ভাটপাড়া নারায়ণগঞ্জ রামপুর-বোয়ালিয়া রাঁচি শান্তিপুর প্রভৃতি শহরের লোক-সংখ্যার চেয়ে ঐসব শহরের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ; অথচ আমাদের দেশের সহরের চেয়ে সেগুলির ঢের উন্নত অবস্থা। এইরকম এক একটা শহর আড়াই মাসে পত্তন করা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই অভাব্য ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে সমস্ত শহরগুলিকে একই ছাঁচে গড়ার জন্য। ইহাতে বৈচিত্র্যের হানি হইয়াছে বটে, কিন্তু কাজ চটপট আর বাড়ীঘর স্বাস্থ্যের অনুকূল হইয়াছে। একই ছাঁচে সকল শহর গড়াতে সুবিধা হইয়াছিল এই যে শহর পত্তনের জন্য দরজা জানলা চৌকাঠ কড়ি বরগা স্ক্রু পেরেক তক্তা শাশী খড়খড়ি খুঁটি খাম্বা যা কিছু দরকার তা একই মাপের হওয়াতে চটপট একএক কারখানা হইতে একএকরকম জিনিস লক্ষ লক্ষ তৈরি করিয়া ফেলিতে পারা গিয়াছে; তারপর সেই জিনিসগুলি বহিয়া লইয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট জায়গায় জুড়িয়া খাটাইয়া কাজ সত্বর সারা হইয়াছে।

একএকটি শহর পত্তনে ৫০০০ হইতে ১০০০০ মজুর খাটিয়াছে; প্রত্যেক ঠিকাদার অন্ততঃ ৫০০০ গাড়ী বোঝাই মাল লইয়া কারবার করিয়াছে। প্রত্যেক শহরের জন্য মোটের উপর গড়ে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ফুট কাঠের কড়ি, ১৭ লক্ষ বর্গফুট তক্তা, ৩৭০০০ জানলার শাশী, ৩২০০০ টালি, ৩৭০০০ বর্গ ফুট তারের জাল, ৬৫০০ কপাটের বাইল, আর ২৭০০ পিপে পেরেক লাগিয়াছে। জলের কলের জন্য ৪৫০০০ ফুট আর নর্দ্দমার ড্রেনের জন্য ১ লক্ষ ফুট সরু মোটা নল দরকার হইয়াছে।

শহরে জলের জোগান্ আর ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা একেবারে আধুনিকতম উন্নত পদ্ধতিতে হইয়াছে, কলের জলের জন্য স্থানে স্থানে ইঁদারা খুঁড়িতে হইয়াছে।

এইসব সেনানিবাস শহরের ইমারতের সংখ্যা গড়ে ১২০০। এখানে থাকিবার বাড়ীর আনুষঙ্গিক সমস্ত বিভাগ ছাড়া আপিস আদালত, হাঁসপাতাল, ধোবীখানা, দোকানপসার, বায়োস্কোপ থিয়েটার সবই আছে। প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া মিলন-মন্দির আছে; সেখানে সৈনিকদের লেখাপড়া করিবার আয়োজন আছে, উপযুক্ত শিক্ষকেরা ক্লাস করিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা দান, বক্তৃতা ও বায়োস্কোপের সাহায্যেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রত্যেক শহর একটি প্রকাণ্ড U অক্ষরের আকারে বসানো হইয়াছে, সেনানায়কের আস্তানা ঠিক মাঝখানে, আর সেখান হইতে তিনি শহরের দুই বাহু স্বচ্ছন্দে তদারক করিতে পারেন। দুইবাহুর মাঝখানের খোলা মাঠে কুচকাওয়াজ চাঁদমারি আর খেলাধূলা হইয়া থাকে।

একএক কম্পানি ফৌজের জন্য ১২০ × ৯২ ফুট মাপের দোতলা বাড়ী নির্দ্দিষ্ট। প্রত্যেক সেনিকের স্বতন্ত্র খাট। শোবার ঘরের পাশেই স্নানাগার, সেখানে ঠাণ্ডা আর গরম জলের কল ঝাঁঝরা-কলের ঝরণা প্রভৃতি আছে। সব বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো। শীতকালে গরমজলের ভাপরা দিয়া বাড়ীগুলিকে গরম রাখা হয়।

একএকটা হাসপাতালে হাজার রোগীর জায়গা হয়।

এইসব নূতন শহর পত্তনের ফলে অনেক নূতন রেলপথ খুলিতে হইয়াছে, অনেক রেলের শাখাপথ বিস্তৃত করিতে হইয়াছে, নূতন নূতন পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

সমস্ত শহরই পোড়ো জমির উপর পত্তন হইয়াছে; এসব জমিতে আগে চাষবাস ছিল না।
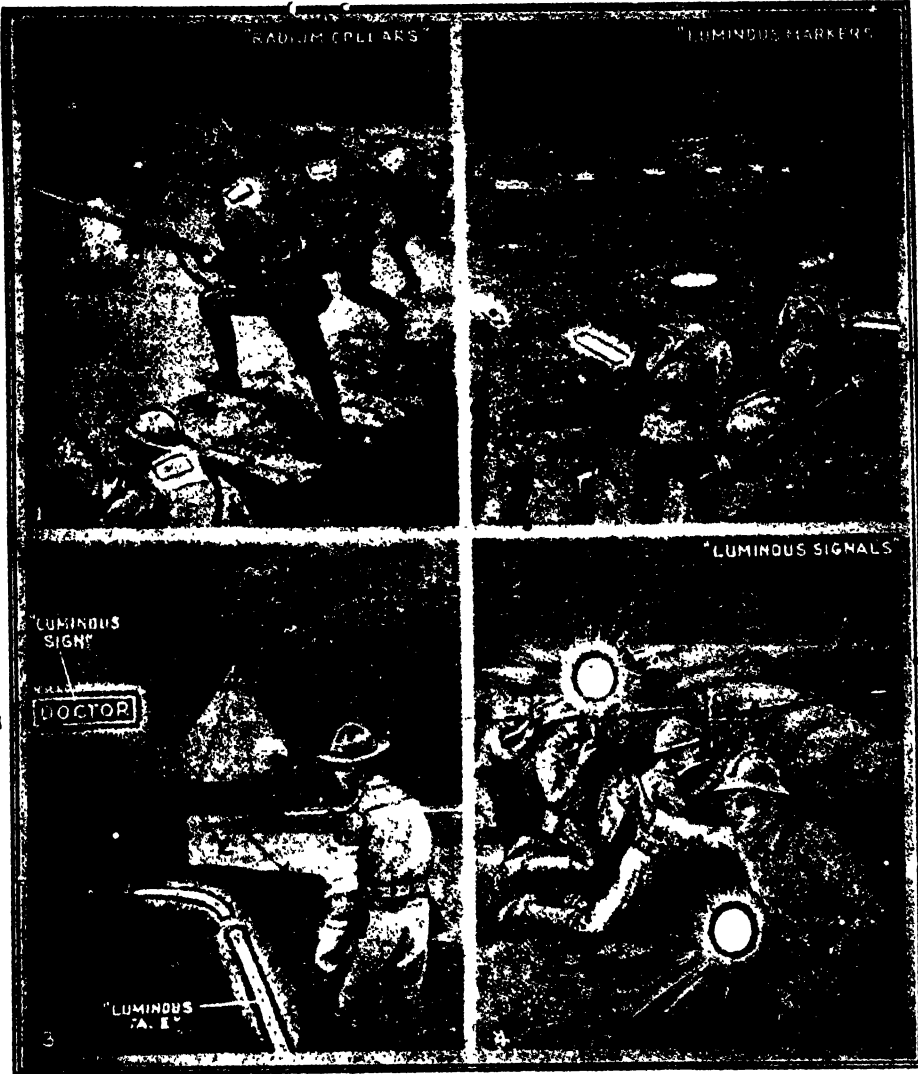
যুদ্ধে রেডিয়মের ভাস্বর রঙের ব্যবহার।

একএকটা শহর পত্তনে খরচ পড়িয়াছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইতে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পর্যান্ত। সবগুলিতে খরচ পড়িয়াছে ১৫০ কোটিরও উপর।

যুদ্ধে জ্যোতিষ্মান রং—

যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রির অন্ধকারেও দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া রেডিয়াম আর জিঙ্ক-সালফাইড মিশাইয়া একপ্রকার জ্যোতিষ্মান রং প্রস্তুত হইয়াছে; সেই রং কোনো জিনিসের গায়ে লাগাইয়া দিলে সেই জিনিস অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণ করে। জিঙ্কসাল্‌ফাইড বা দস্তা গন্ধকের যৌগিক পদার্থ আলোক সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, উহাকে খানিকক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া অন্ধকারে লইয়া গেলে কিছুক্ষণ তাহা হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। জিঙ্কসাল্‌ফাইডের সঙ্গে স্বয়ংপ্রভ রেডিয়াম অল্পপরিমাণ যোগ করিয়া দিলেই আর সূর্য্যালোকের উত্তেজনা আবশ্যক হয় না, তখন ঐ মিশ্র পদার্থ স্বয়ংই ভাস্বর হইয়া আলোক বিকিরণ করিতে থাকে।

আমাদের দেশের অনেকেই রেডিয়ামযুক্ত ঘড়ীর ডালা দেখিয়াছেন। য়ুরোপের যুদ্ধে রেডিয়াম-ডালার কম্পাস দেখিয়া রাত্রে সৈন্য-চালনা, আকাশে বিমান চালনা ও জলের তলে সাব-মেরীন চালনা হইতেছে। রাত্রে যুদ্ধের সময় মিত্রকে শত্রু বলিয়া ভ্রম না হয় এজন্য সৈনিকদের জামার পিঠে এক একটা ভাস্বর পটি লাগানো থাকে; প্রথম লাইনের লোকেরা ট্রেঞ্চ বা পগার ছাড়িয়া উপরে উঠিলে পশ্চাতের লোকেরা যাতে তাদের নিজের দলের লোক বলিয়া বুঝিতে পারে এইজন্য সকলের পিঠে ভাস্বর রঙের প্রলেপ লাগানো কাপড়ের পটি সেলাই করা থাকে।

পেরেকের মাথায় ঐ ভাস্বর রং প্রলেপ দিয়া খোঁটার মাথায়-মাথায় পেরেক পুঁতিয়া অন্ধকারে পথের নিশানা করা হয়, অনেক সময়

ভাস্বর কাপড়ের পটি মাটিতে পাতিয়াও পথ নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপ নির্দ্দেশ থাকাতে হাঁসপাতালে আহতদের লইয়া যাওয়া আসা সহজ ও অবাধ হইতে পারে। পথের মাঝে গাছ বা খুঁটি থাকিলে তাহার গায়ে একটা ভাস্বর পটি লাগাইয়া সেটিকে চক্ষুগোচর করা হয়; পথে খানা বা পগার থাকিলে তার একটু দূরেই একটি ভাস্বর ঘেরা কাটা থাকে। পথ চলিতে চলিতে কোথাও কিছু বিপদের বার্ত্তা পশ্চাদ্‌গামীদের জানাইবার দরকার হইলে ঐরূপ ভাস্বর পটির উপর লিখিয়া রাখিয়া গেলে অন্ধকারেও চিঠি চোখে পড়ে আর পড়িবার জন্য আলোকেরও দরকার হয় না। এই ভাস্বর পটি দিয়া বড় বড় অক্ষর লিখিয়া সাইনবোর্ডও তৈরি হইতে পারে। বাতির আলো দূর হইতে শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু এই ভাস্বর রঙের প্রভা শুধু নিকটের লোকেরই দৃষ্টিগোচর হয়।

রাত্রে আলোকসঙ্কেত করা অনেক সময় শত্রুকে চোখ টিপিয়া ডাকার সামিল বিপজ্জনক; কিন্তু এই ভাস্বর রঙের সঙ্কেত ২০ গজ বা ৬০ ফুট তফাতে পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, অথচ ইহা দূরে আলোক নিক্ষেপ করে না; ইহার এই সুবিধা থাকাতে বাক্যে আজ্ঞা প্রদান করিয়া শত্রুকে নিজেদের অবস্থান জানিতে দেওয়া হয় না, অথচ নিঃশব্দে নিকটে থাকিয়া শত্রুদের সাড়াশব্দ শুনিবার খুব সুবিধাই ঘটে। ইংরেজদের রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারেরা প্রথমে এই নূতন অথচ আশ্চর্য্য সঙ্কেতবার্ত্তা উদ্ভাবন করিয়া কাজে লাগাইয়াছে।

চারু।

বৈশাখে

আগুনের স্বর্ণবাসে আবরিয়া শীর্ণ কলেবর
বৈশাখ এসেছে নামি। এলাইয়া পড়েছে প্রান্তর
স্তব্ধতার বুকে।
পথের ধূলার তলে অনলের দাহন ঘুমায়,
চকিতে জাগিয়া ওঠে পথিকের পায়ের তলায়,
অলক্ষ্য চুমুকে
ধরণীর উরসের নিভৃত সঞ্চয় করি
নিঙাড়িয়া নিঙাড়িয়া পান,
বাড়িয়া উঠিছে ভরি দিগন্তের অন্তরাল
ক্ষুধাতুর দীপ্ত দিনমান।

এমন সময়,—চাষা, পিপাসায় একান্ত অধীর
আশেপাশে নাহি জল, স্বেদসিক্ত নগ্ন দেহটির
অবসন্নতায়
মাঠের কঠিন পথ দীর্ঘতর ঠেকিছে কেবলি
সুমুখের চক্রবাল দূর হতে দূরে যায় চলি
প্রতি পায় পায়,—
পথ বাহি চলে আর ফিরে ফিরে শতবার
আপনার মনে মনে কয়—
সাঙ্গ রহিল কাজ, এ হেন রোদের ঝাঁজ
কোথায় কাহার দেহে সয়!

অদূরে পথের বাঁকে হেরি এক নিরালা কুটীর
তৃষাতুর ছুটে যায় বারি আশে, নয়ন দুটির
অপলক দিয়া
সুবধ তিয়াস তার দ্রুত হৃদি কম্পনের বেগে—
দীর্ঘ অপেখার অন্তে, বিরামের অধীর আবেগে—
আসে বাহিরিয়া
লেলিহান বহ্নি সম। প্রসারিত পদে যবে
পশিল সে আঙিনার পর
প্রকাশের মুখে ভাষা থমকি থামিয়া রয়,
লাজে মরে গোপন অন্তর।

বিস্ময়-বিথার চোখে দেখে চাহি—জীর্ণ চালাঘরে
উননে আগুন জ্বলে শিখা তুলি শিখার উপরে;
বসি তারি ধারে,
আরক্ত কপোল বাহি ঝরে স্বেদবিন্দু অনিবার,
উন্মাদ অনলশিখা খরিছে খেলিয়া তলোয়ার
মুখের কিনারে,
কাজেরে সহজে ঘিরি কর্ম্মের কামনাভরা
আত্মহারা বাহুর বন্ধনে,
গৃহলক্ষ্মী অনায়াসে ঈষৎস্খলিতবাসে
মুক্তকেশে নিরত রন্ধনে।

সরমে পড়িল খসি পরাণের কর্ম্মহারা বেশ।
কোথা তৃষ্ণা, কোথা শ্রম; আলসের কুণ্ঠিত আবেশ
টুটিয়া পলকে
শিহরিয়া রন্ধ্রে রন্ধ্রে সচকিতে চমকি আকুল
উদ্দাম জীবন জাগে শক্তির আবেগ-সমাকুল
ব্যাকুল পুলকে,
কর্ম্মময় জীবনের চলিবার আঘাতেরে
সুরে ভরি বাজিল নূপুর,
কাজের ভিড়ের কাছে মুরছি পড়িয়া রয়
নিদাঘের দুরন্ত দুপুর।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

আনন্দ-প্রদীপ

(রূপক)

এই সবে সেদিন, ফাল্গুনের প্রথমে শ্রীপঞ্চমীর দিনে শ্রীদেবী ধরার গায়ে তাঁর শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিয়ে সমস্ত আকাশ বাতাস, কাননকুসুম শ্রীমণ্ডিত করে তুল্লেন! সেইদিন থেকে গাছে গাছে সমস্ত ফুল বসন্তলক্ষ্মীর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ফুটে উঠ্‌ল, হাজার ফুলের হাজার গন্ধ ধূপের মত ঊর্দ্ধমুখ হয়ে তাঁর আগমন ভিক্ষা করতে সুরু করে দিল, তাদের এই শব্দহীন পূজায় মানুষের মনও চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল; মানুষপূজারী তার 'গানের ডালায়' নৈবেদ্য সাজিয়ে তরুলতার পূজার দোসর হয়ে দাঁড়াল।

তারপর যেদিন ফাল্গুনের মাঝামাঝি আগমনীর গানে গন্ধে উন্মনা হয়ে বসন্তলক্ষ্মী নেমে এসে তাঁর জগৎ জোড়া সিংহাসনের শ্যামশোভা শতগুণ বাড়িয়ে দিলেন; পৃথিবী তাঁর আশাপথ চেয়ে এত দীর্ঘদিন ধরে যে আসন নানা রঙে সাজিয়ে তুল্‌ছিল, সেই আসন যেদিন তাঁর অঙ্গস্পর্শে ধন্য হয়ে গেল, যেদিন মাঘী-পূর্ণিমার স্বর্ণপ্রদীপ দেবীর আরতির আলোয় মানুষের চোখ জুড়িয়ে দিল, পাখীর বাসায় বাসায় আরতির ধ্বনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, সেদিন মানুষ আর দেয়ালগাঁথা ঘরের নির্ব্বাসন সইতে পার্‌লে না। তার চিরনবীন প্রাণ মুক্তির আশায় ছুটে বেরিয়ে পড়্‌ল!

মানুষ তার সঙ্গে নিয়েছিল একটি তরুণী সখীকে। সেই তরুণীর পা মাটি ছোঁয় না, তার গতির সঙ্গে-সঙ্গে আশে-পাশের সমস্ত তুচ্ছ ধূলিকণাও মধুর হয়ে ওঠে, সেই মাধুরীই মানুষের মনে আনন্দ জাগিয়ে রাখে! তরুণীর দৃষ্টি কোথাও বাধে না, হাজার উঁচু পাঁচিল দিয়ে রাখ, হাজার কাঁটার বেড়া দিয়ে থাক, তোমার ঘরের সকল-কিছুই তার চোখে পড়বে, তার চোখের ছায়ায় মানুষও সমস্ত জগতের ছায়া দেখে নেয়।

মানুষ কিন্তু এই সখীর দেখা দিনে বড় পায় না, রাত্রেও জ্বলন্ত মশাল জ্বেলে তাকে খুঁজতে গেলে সে পাখীর মত কোথায় উড়ে চলে যায়। সে দিনের আলোয় দেখা না দিলেও সে ছায়াময়ী; তার অঙ্গস্পর্শ মানুষ কোনো দিন করেনি; কাজের কথা ভুলে, সকল সন্ধান ছেড়ে দিয়ে, যখন নিজেকেও মনে করে রাখে না, অমনি পূর্ণিমার আলোয় যখন মানুষ সেই বাইরের জগতের সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ডাক শুন্‌তে পায়, তখনি পথের সাথী হয়ে, বিশ্বভুবনের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে তার ছায়া-সখীটি একটু দূরে পাশেই এসে দাঁড়ায়, তার খোলা চুলের মৃদু গন্ধ, আঁচলের বাতাস, মানুষকে বলে যায়—তোমার পথের সাথী এসেছে।

মাঘীপূর্ণিমার রাত্রে ছায়া-সখীর সঙ্গে পথে বেরিয়ে চাঁদের আলোর উপর দৃষ্টি রেখে শালগাছের ছায়ায় নিজেকে একটু আড়াল করে যেতে যেতে তার মনে হ'ল—আকাশে আজ এত আলো কেন? পৃথিবী আজ অজস্র আলোর বুকে এমন ছায়ার ছবি এঁকেছে কি করে? শুনেছিলাম না চাঁদ মরা? তাকে এত রূপ, এমন মধুর দৃষ্টি আজ কে ধার দিয়েছে?

সখীর চোখে মানুষের মনের প্রশ্নটি ফুটে উঠ্‌ল। সে তার অতল সাগরের মত চোখ দুটি তুলে একটু মধুর হেসে বল্লে—এই কথাটাই জান না? আচ্ছা আজ তবে শুনে রাখ—

সৃষ্টি যখন প্রথম হয়, তখন দুটি প্রাণী হয়; মাত্র তারাই দুজন আকাশ ধরণী সমস্ত পূর্ণ করে জগতের মাঝখানে বাসা বেঁধেছিল। তারা দুজন কিন্তু থাক্‌ত দুজায়গায়। এই দুজনের নাম ছিল সুনীল আর শ্যামা।

শ্যামা থাক্‌ত ছায়ানিবিড় একটি বনের বুকের মাঝ-খানটিতে। গাছের তলায় কত যুগযুগান্ত ধরে তখনকার দিনেও পাতা পড়ে পড়ে পুরু গালিচার মত স্তূপ হয়ে থাক্‌ত। সেই পাতার গালিচার উপর গাছের ডালের ঘন-বিনোনির চাঁদোয়ার তলে, তুষারের-মুকুট-পরা যোজন-জোড়া দেয়ালের পাশে সাগরিকা নদীর ধারে শ্যামার বাড়ী। সেই বিছানার উপর সারাদিন বসে বসে সে নদীর দিকে চেয়ে থাক্‌ত, কখন বা ঘাটে পা ডুবিয়ে নদীর জলে ছোট দুখানি হাত দিয়ে ঢেউ তুলে দিত, আবার কখন বা বনের ভিতর ঢুকে আঁচলের দোলা দিয়ে গাছের মাথায় মাথায় শিহরণ জাগিয়ে দিত। গাছের ডাল-গুলি ঝুঁকে পড়ে আনন্দে তার সঙ্গে খেলা করতে ছুটে

আস্‌ত, অমনি নদীর জলও কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ করে ডাঙায় উঠে এসে শ্যামার আঁচল চেপে ধরতে যেত। খেয়ালী শ্যামা হয়ত তখনি সব খেলা ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে বস্‌ত। বন কি করে? মনের দুঃখে মাথা নীচু করে বসে থাকৃত, আর দু'চারটা গাছ অভিমানে একেবারে আছড়ে পড়ে মাটিতেই শুয়ে পড়ত, সাগরিকা ছোট্ট মেয়ের মত রাগ করে বেঁকে বেঁকে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে যেত।

এই দুষ্টু মেয়ে শ্যামার বন্ধুবান্ধব কেমন দেখ্‌লে ত? কিন্তু সে নিজে কেমন দেখ্‌তে ছিল তাও ত একটু জানা চাই। বসন্ত উদয় হতে না হতে শাল-বনে কচি কচি পাতায় কেমন রং ধরে দেখেছ? শ্যামার গায়ের রং ছিল তেমনি। সে একখানা সবুজ রঙের জরি-পেড়ে শাড়ী পরতে খুব ভাল বাস্‌ত, সেখানার রং ছিল প্রথম-শরতের ধানের ক্ষেতের মত, তাতে পাখী ফুল পাতা আরও কত কি নক্সা-কাটা। শ্যামার চুল ছিল দূর মাঠের শেষের আঁধার বনের মত ঘন নিবিড়, নাড়া পেলেই তাতে বনের মাথার মত তরঙ্গ খেলে যেত। বর্ষার দিনে সেই চুলের রাশ এলিয়ে শ্যামা মনের সাধ মিটিয়ে স্নান করত! শ্যামার চোখ দুটি যে কত সুন্দর তা বলা শক্ত! সন্ধ্যাবেলা সূর্য্যাস্তের শেষ স্মৃতি বুকে ধরে দীঘির কালো জল যখন চুপটি করে পড়ে তার অতীতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে, তখন তার দিকে চেয়ে দেখেছ কি? হয়ত শ্যামার চোখের দৃষ্টি তেমনি ছিল! কিম্বা তাই বা বলি কি করে? নদীর জলে ভোরের আকাশের রক্ত-রাগের সঙ্গে-সঙ্গে যে হাসিটি ঝলমল করে ফুটে ওঠে, তাতে বিয়ের কনের কল্পনার মত যে অক্ষয় সৌন্দর্য্যের আভা উঁকি দিতে থাকে, শ্যামার চোখের দৃষ্টি তেমনও হতে পারে। কিন্তু এতেও যে ঠিক কথাটা বলা হল না। সূর্য্যমুখী ফুল যে-ব্যাকুলতা দৃষ্টিতে ভরে সারাদিন তার প্রিয়ের দিকে চেয়ে থাকে, কমলকলিকা যে গভীর দৃষ্টি নিয়ে ফুটে ওঠে, ঘাসের বনের ছোট ফুলগুলি যেমন মিষ্টি হাসি হেসে সব অপমান সহ্য করে, শ্যামা বোধ হয় তার চোখে এই সবেরই মিলন ঘটিয়েছিল।

এই শ্যামা একদিন হঠাৎ তার নতদৃষ্টি উঁচু করে আকাশের দিকে চাইল। সেখানে সে যে কি দেখ্‌লে তা সেই জানে, তার দৃষ্টি আর তুচ্ছ ধরার দিকে ফিরে আস্‌তে চায় না। শ্যামার ঘরের থেকে অনেক উপরে কোন এক সাত-শ'তলার ঘরে সুনীলের বাস ছিল। কবে থেকে যে সে সেখানে ঘর বেঁধেছিল তা বলা যায় না, কারণ তার চেহারা দেখে বয়স ঠিক করা একটু শক্ত। পোষাকে তার বৈরাগ্যের লক্ষণ কোনো দিন দেখা যায় নি, কিন্তু বয়স যে তার একেবারেই হয় নি, এটাও সব সময় মনে হয় না। ফিকে নীল রঙের বসনখানিই সে সব সময় গায়ে জড়িয়ে থাকৃত, কিন্তু সময় সময় ঘন নীল বাসের উপর হীরের মালা দুলিয়ে সে একেবারে বর সেজে বস্‌ত! ছোট বড় অনেক প্রদীপ তার সভা উজ্জ্বল করে থাক্‌ত। এই যে সুনীল, এর মেঘের মত ঘন গুচ্ছ গুচ্ছ নরম হাল্কা একমাথা চুল ছিল, কিন্তু সে চুল কখনও শরৎ-শেষের মেঘের মত তুষারশুভ্র হয়ে উঠ্‌ত আবার কদিন যেতে না-যেতেই কি এক মায়ার খেলায় বুড়োর মাথা ভরা পাকা চুল বর্ষার সজল মেঘের মত ঘোরাল হয়ে যেত।

এই শ্যামা যেদিন সুনীলকে দেখে অমন অবাক হয়ে চেয়ে রইল, সেদিন সুনীলের চোখও কোন্ অজানার টানে নীচু হয়ে শ্যামার দিকে চাইল। শ্যামা হেসে বল্লে, "ওগো নীল-সাগরের নূতন বন্ধু, অত উপরে কেন? নীচে এস না। একলাটি নিজের ঘরে আর কতদিন বসে থাকৃব? তুমিও ত দেখ্‌ছি একলাই থাক, নেমে এস, দুজনে ঘর বেঁধে একসঙ্গে আনন্দে দিন কাটাব।"

সুনীল তার কথা শুনে নিজের শক্তির অভাবের কথা মনে করে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল। কি আর করে, যা হোক একটা উত্তর ত' দিতে হবে! সেও একটু হেসে বল্লে, "আমি যে ভাই ঘর ছেড়ে নীচে যেতে পারি না। আমার হীরে মাণিক অনেক আছে বটে, বাড়ীও সাত-শ তলার উপরে, কিন্তু আমার ক্ষমতা এত কম যে একটু নীচে নাম্‌তেও পারি না। তুমিই না হয় উপরে উঠে এস। আমার ঘরে অনেক জায়গা আছে, তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

শ্যামার হাসি শুকিয়ে এল, সে বল্লে, "আমিও ভাই উপরে উঠ্‌তে পারি না, আমায় এই মাটির পৃথিবীতেই চিরকাল কাটাতে হবে।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে শ্যামার গলা কেঁপে এল। দুঃখে

অভিমানে মুখ ভার করে সে চুপ করে বসে রইল। শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে সুনীলের মুগ্ধ দৃষ্টি ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে এল। ক্রমে রাগে তার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠ্‌ল; একি অন্যায় জগতের নিয়ম! চিরকাল এমনি বন্দী হয়ে দুজনকে থাকতে হবে? এত দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পরে যে সাথের সাথীর দেখা পেল, সে কেন চিরসাথী হতে আসবে না? রাগে সুনীলের ইচ্ছা হচ্ছিল চোখের দৃষ্টিতে শ্যামাকে ভস্ম করে ফেলে। কিন্তু কি করবে বেচারী শ্যামা? সেও যে ধরার বাঁধন কাটিয়ে আস্‌তে পারে না। বন্দিনী শ্যামার দুঃখে বন্দী সুনীল ব্যথিত হয়ে বিষণ্ণ মুখে ঝুঁকে পড়ে তার করুণ কোমল মূর্ত্তিটি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার হাওয়ার মত হাল্কা উত্তরীয়খানি দুলে দুলে গিয়ে শ্যামার চুলের উপর পড়্‌ল। শ্যামার মনে হল, ওই অত উপর থেকে যেন তার সুদূরের নূতন বন্ধুর স্নেহস্পর্শ উত্তরীয়ের উপর ভর করে ভেসে এসে তার মাথায় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করে যাচ্ছে। যেন বলে যাচ্ছে বন্ধু, তোমার মুক্তি হোক্।

শ্যামা তখনও তেমনি করেই চেয়ে রইল। সারাদিন চোখের পলক না ফেলে সুনীলের ক্লান্ত চোখ ঢুলে আসছিল। সে ঘুমে দৃষ্টি ভরে বিদায়ের মধুর হাসি হেসে তেমনি একটু নত মুখে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল। শ্যামার স্বপ্ন তার ঘুমন্ত মুখের উপর সোনার রঙে কত ছবি এঁকে দিয়ে গেল।

এমনি করে কত দিন যায়। প্রতিদিন সকাল হতে-না-হতে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে গল্প জুড়ে দেয়। শ্যামা হাত দুলিয়ে ডাকে "এস, এস।"

সুনীল কোঁকড়া চুলের গোছা নেড়ে বলে, "না, গো, না, যেতে পারব না।" দিনের পর দিন একটা না একটা গল্প করে, একদৃষ্টে সুনীলের প্রখর দৃষ্টির দিকে চেয়ে বসে থেকে থেকে শ্যামা যেন শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অযত্নে আর ধূলার অত্যাচারে তার স্নিগ্ধ সবুজ শাড়ীখানি গেরুয়া হয়ে গেল, তার চুল ঝরে পড়ে যেতে লাগ্‌ল, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এল।

সুনীল সজল চোখে চেয়ে বল্‌লে, "শ্যামা ভাই, কি হয়েছে তোমার? অমন সোনার প্রতিমা এমন হলে চল্‌বে না ত।"

তার ইচ্ছা কর্‌ছিল শ্যামার গায়ে হাত বুলিয়ে তার সব দুঃখ দূর করে দেয়। কিন্তু শক্তি যে নেই। দুঃখে সুনীলের চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল ঝরে শ্যামার আঁচলে শ্যামার চুলে ছড়িয়ে পড়্‌ল। শ্যামা ক্ষীণ কণ্ঠে ডেকে বল্‌লে, "জল দাও ভাই, আমি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেলাম।"

মহা উৎসাহে ছুটে গিয়ে সুনীল হুড়মুড়্‌দুড়্ করে ঘরের সোনার ঝারি কলসী উল্টে ফেলে শ্যামার চোখ ঝল্‌সে দিয়ে কি একটা আগুনের মত পিচ্‌কারি করে উপর থেকে হাজার ধারায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে লাগ্‌ল।

সেই জলে স্নান করে আকণ্ঠ পান করে শ্যামার চেহারা ফিরে এল, তার চোখের চাউনি ঢল্‌ঢলে হয়ে উঠ্‌ল।

তার পর দিনে শ্যামার ঘরের চারি ধারে কত জীব-জন্তু সুনীলের দৃষ্টির তলায় ঘর বাঁধ্‌লে। তারা সবাই শ্যামার কোলের ছেলের মত তার কাছে সহস্র আব্‌দার জুড়ে দিলে। তাদের নিয়ে শ্যামার দিন একরকম মন্দ কাট্‌ত না। কিন্তু সে যাকে চেয়েছিল, তাকে ত পায় নি, কাজেই তার চিরদিনের ব্যথাটা বুকের মধ্যে লুকিয়েই রইল। সে ব্যথায় সে এখনও তেমনি শুকিয়ে ওঠে, তার দুঃখে সুনীলের চোখের জল এখনও তেমনি করে ঝরে পড়ে।

শ্যামার নূতন সাথীদের মধ্যে একজন ছিল তরুণ। তরুণের হাতে একটা বাঁশের বাঁশী, গায়ে বাসন্তী রঙের চাদর, গলায় রজনীগন্ধার মালা। সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, মনের মধ্যে তার কত ছন্দ কত গান থেকে থেকে জেগে ওঠে, কিন্তু সুর ধরে বাইরে তারা কেন জানিনা ফুটে ওঠে না। বাঁশীর কানে সে তার সেই সুর ঢেলে দিতে চায়, কিন্তু বাঁশী দুঃখের সুরে ব্যথার রাগিণীতে মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে বটে কিন্তু আনন্দের ঝঙ্কার তাতে কিছুতেই বেজে ওঠে না।

তরুণের এ দুঃখ সহ্য হত না। সে ভাব্‌ত,—কেন এমন হবে? আনন্দ কি জগতে নেই? কেবল দুঃখের কান্নাই কেন গাইব।

শ্যামার কাছে তরুণ তার দুঃখের কথা নিবেদন কর্‌লে। সেই যে আনন্দ, যাকে সে সারা জগৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেন তাকে সে পাবে না?

শ্যামা বল্লে—"ওরে পাগল, যে শ্যামা আঁচল দিয়ে তোদের ঢেকে রেখেছে, যার হাতের অন্ন খেয়ে মানুষ

হলি, সে যে দুঃখ ছাড়া আর কিছু জানে না! যে সুনীলের চোখের আলোয় তোদের ঘরে আলো জল্ছে, সেও যে বড় দুঃখী, দুঃখই যে তোদের ঘিরে রেখেছে। দুঃখের মাধুরীই তোর বাঁশীর সুরে বাজ্‌বে।"

"পাগ্‌লা তরুণ বল্লে,—"সে কিছুতেই হবে না। ব্যথায় আমাদের প্রথম দৃষ্টি মেলেছি, তখন ব্যথার বাঁশীতে বাজ্‌বেই, কিন্তু আনন্দ চাই। এই যে তোমার কোলের ছেলেমেয়েগুলি, এরা সারাদিন বেদনার সঙ্গে, বিচ্ছেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, সন্ধ্যায় ব্যথাভরা চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ে। এরা তোমার হাতের অন্নের সঙ্গে-সঙ্গেই এ-সব পেয়েছে জানি, কিন্তু আনন্দ আমি এদের দেবো, মিলনও এনে দেবো। বলো তুমি সে আনন্দ কোথায় পাবো, মিলনই বা কোথায় ঘট্‌বে। তুমি তোমার দুঃখের সাথী আমাদের করেছ, আমরা আমাদের সুখের সাথী তোমায় করব।" শ্যামা বল্লে, "যাও সুনীলের কাছে। কোথায় আনন্দ আছে সে বলে দেবে আর পারো ত সুনীলকেও সেই আনন্দের সাথী করে নিও।"

পাগ্‌লা তরুণ সুনীলের সাত-শ তলার ঘরে গিয়ে ধাক্কা দিলে। সুনীল ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "কে গো তুমি পথিক? কি চাও?" তরুণ উত্তর দিলে, "আনন্দ চাই, দিতে পার্‌বে?"

সুনীল ত অবাক্! আনন্দ কোথায় পাবে সে? দুঃখই ত তার সম্বল। তরুণ ছাড়্‌বার পাত্র নয়। সে বল্লে, "তুমি সন্ধান বলে দাও। আমি সংগ্রহ করে আন্‌ব। এনে তোমাকেও ভাগ দেবো।"

সুনীল চোখ খুব বড় করে একবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বল্লে, "দেখ্‌ছি, ধূলিকণার মত আনন্দরেণু জগতে ছড়িয়ে আছে; তোমায় কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে। সব জায়গাতেই আছে, তোমার চোখে সবই ধরা পড়্‌বে। যাও কণা-কণা করে খুঁটে আনো।"

তরুণ চলে গেল। নেমে গিয়েই দেখ্‌লে বনের হরিণের চোখের দীপ্তিতে আনন্দ এককণা ফুটে আছে। চাইতেই তারা তার ভাগ দিলে।

তারপর বন পার হয়ে পথের শিশুর হাসি থেকে, ঘরের বধূর প্রতীক্ষা থেকে, কুমারীর কল্পনা থেকে, ফুলের রূপ থেকে, কণা-কণা করে আলো আর আনন্দ নিয়ে বাসন্তী চাদর বোঝাই করে তরুণ এসে সুনীলের দরবারে হাজির। কিন্তু এত আনন্দ সে রাখে কোথায়?

সুনীল আবার বাড়ী উল্‌ট্‌পাল্‌ট্ করে খোঁজ কর্‌তে সুরু কর্‌লে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বেরুল একটা প্রকাণ্ড শূন্য সোনার প্রদীপ। তরুণ ছুটে গিয়ে সেইটা তুলে নিয়ে তাতে তার সমস্ত আহরণ উজাড় করে ঢেলে দিলে।

আনন্দের আলো পেয়ে শূন্য প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল। তখন রাত্রি হয়েছে। ঘরে ঘরে ক্লান্ত মানুষগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্যামার আঁচল তাদের সকলকে বাতাস দিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমের কোলে শুইয়ে দিচ্ছিল। সারাদিনের দুঃখ তখন তারা ভুলে গেছে। গত দুঃখের পরে আবার আগামী দুঃখের সময় জেগে উঠ্‌তে হবে, তাই মাঝপথে তারা একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিল।

এমনি সময় সমস্ত আকাশ পৃথিবী পূর্ণ করে আনন্দ-প্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়্‌ল। শ্যামার চোখে মুখে সে আলোর রেখা পড়ে তার সমস্ত হারানো রূপ ফুটে উঠ্‌ল, সঙ্গে-সঙ্গে নূতন রূপের শিখা যেন তাকে ঘিরে নেচে উঠ্‌ল। শ্যামার সমস্ত শরীর হাওয়ার মত হাল্কা হয়ে গেল; আনন্দের স্রোতের উপর সে ক্রমে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তার মনে হচ্ছিল তার ধরার বাঁধন আজ খসে গেছে, যেন সে আলোর ডানায় ভর করে সুনীলের ঘরের দিকে উড়ে চলেছে।

ঘরের সোনার চূড়ার উপর আনন্দ-প্রদীপ স্নিগ্ধ আলোর ছটা ছড়িয়ে জ্বলে উঠ্‌তেই সুনীল আনন্দে পাগল হয়ে উঠ্‌ল, এ নূতন আলোর প্রভায় তার হীরার মালা ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু আজ আর তাতে দুঃখ নেই। আজ যে তার শ্যামা তার ঘরে উড়ে আস্‌ছে। ব্যস্ত হয়ে সুনীল ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল। তারও বাধা-নিয়মের নিগড় আজ টুটে গেছে। অবাধে সে ধরার দিকে নেমে চল্‌ল শ্যামাকে তুলে আন্‌তে। মাঝপথে দুজনের দেখা হল। সোনার প্রদীপের আলোয় শ্যামার সবুজ শাড়ী সুনীলের নীলাম্বরের সঙ্গে মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেল। সেখানের যত রং, যত আলো, সব মিলে আজ নূতন প্রদীপের রূপোলি আলোয় গলে এক হয়ে গেল। সবই সেই এক রঙে রঙীন।

ঘরের কোণে যে শ্রান্ত মানুষগুলি ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কি একটা অজানা আনন্দের স্পর্শে তাদের শ্রান্তি এক নিমেষে ঘুচে গেল; কোমল মৃদু আলোর রেখা তাদের চোখের পাতায় পড়ে ঘুম লুটে নিয়ে চলে গেল। তারা জেগে উঠে ঘরের বাইরে এসে দেখ্‌লে তাদের দুঃখিনী শ্যামার মুখের হাসি আজ মুক্তোর মত ঝরে পড়ছে, তার কোমল হাত দুখানি আজ সেই সাত-শ তলার সুনীলের হাতের মধ্যে ফুলের মত পড়ে আছে আর আকাশের নূতন আলো তাদের মুখ দুখানির উপর পড়ে এক রঙে রঙিয়ে দিয়েছে।

সবাই জেগে উঠ্‌তেই তরুণের বাঁশী আনন্দে তার গোপন ভাণ্ডারের সমস্ত আনন্দগান বাতাসের গায়ে ছড়িয়ে দিলে।

সেই যে আলো সেই ত জ্যোৎস্না। মরা চাঁদকে সেই রূপ ধার দিয়েছে, মানুষের আনন্দ-মিলনের শুভলগ্ন সেই স্থির করে দিয়েছে।

শ্রীশান্তা দেবী।

সেমা নাগা

সেমাদের বাসস্থান।

সেমারা নিজেদের এসিমি বলে। আঙ্গামীদের সহিত সেমাদের ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। সেমারা দয়াং তিজু এবং টিটা উপত্যকায় বাস করে।

সেমাদের উৎপত্তি।

সেমাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কিংবদন্তি আছে। সেমারা বলে তাহারা 'জালু' পাহাড় হইতে আসিয়াছে। কোন কোন সেমাদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, সর্ব্বপ্রথমে মাতৃগর্ভ হইতে মানুষ দেও এবং বাঘ ভূমিষ্ঠ হয়। মানুষ এবং দেও তাহাদের বৃদ্ধ মাতাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করিত, কিন্তু বাঘ সর্ব্বদা স্বীয় জননীকে উদরসাৎ করিবার প্রয়াস পাইত, মানুষ এবং দেওএর ভয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সাহস পাইত না। যখন মানুষ ও দেও কৃষিক্ষেত্রে গমন করিত, তখন শ্রীমান বাঘের উপর জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিত, কিন্তু বাঘ মাতাকে একাকিনী পাইয়া ভক্ষণের মানসে তাহাকে নানারূপ ভীতিপ্রদর্শন করিত। বাঘ কৃষি করিতে জানিত না—তাই মাতার প্রহরী থাকিত। ব্যাঘ্রভয়ে ক্লিষ্টা জননী ক্রমে আরও জীর্ণশীর্ণা হইতে লাগিল! মানুষ ও দেও যখন মাতার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী এবং ব্যাঘ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, তখন

সেমা বালিকা।

ব্যাঘ্রকে ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া আপনারা মাতার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল। জননীর মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ ব্যাঘ্রের ভয়ে উনুনের নিম্নে পুতিয়া রাখিল। ব্যাঘ্র গৃহে ফিরিয়া মাতাকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল এবং মাতার কথা জিজ্ঞাসা করিল। মানুষ ও দেও উত্তর দিল মাতা দূরে জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছেন। ব্যাঘ্র-

বাবাজী মাতার অনুসন্ধানে জঙ্গলে চলিয়া গেল। মানুষ ও দেও একত্র কৃষিকার্য্যে মন দিল। দেওএর চষা ক্ষেতে নানাবিধ এবং প্রচুর শস্য জন্মিতে লাগিল এবং দেও যে-সময়ে যতটুকু জমি কর্ষণ করিতে পারে, মানুষ তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ সময়েও ততটুকু জমি কর্ষণ করিতে পারে না। দেও নানাপ্রকার গেনা বা তুক্‌তাক্ জানে, মানুষ তাহা বিদিত নহে। ক্ষেত্রে-গমন-কালে মানুষ যে পথে গমন

সেমা বালিকা দুজন কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে।

করে, দেও তাহার বিপরীত পথে যায়। মানুষ একদা দেওকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ পথে যাইবে? দেও উত্তর দিল আমি উপরের পথে যাইব। মানুষ দেওএর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নীচের পথে গেল এবং হঠাৎ দেখিল মুরগীর ন্যায় একটা লাল পদার্থ কোথা হইতে তীব্রবেগে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মানুষ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। দেও মন্ত্র পড়িয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল, এবং বলিল তোমার মৃত্যু ঘটিবে বলিয়া আমি তোমাকে যে রাস্তা বলি সেই পথে গমন করি না—বিভিন্ন পথে গমন করি। ইহার পর মানুষের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া দেও কোন এক জলাশয়ের ধারে চলিয়া গেল। যাওয়ার কালে মানুষকে উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্যের এবং গেনা করিবার পরামর্শ দিয়া গেল। তাই নাগারা দেও পূজা করিয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রথম-মানুষের দুইটি পুত্রসন্তান হয়। তাহাদের নাম 'উপ' (সেমা কথায় 'উপ' = পালাইয়া যাওয়া—তখন একটি মুরগী পালাইয়া যাইতেছিল তাই 'উপ'.) এবং 'হুয়েপো' (হুয়েপো = মধু খাওয়ার লাউ—মধু-খাওয়ার লাউ একটি নিকটে ছিল তাই 'হুয়েপো') রাখে।

কোন কোন সেমাদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, আঙ্গামী আউ লোটা এবং সেমা চারি সহোদর ভ্রাতার সন্ততি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধার্ম্মিক ছিল, পিতামাতা তাহাকে পরম আদর ও যত্নে লালনপালন করিত, বস্ত্রাদি তাহাকে যথোচিত দিয়াছিল; তাহার সন্ততি আঙ্গামীজাতি। দ্বিতীয় সন্তান অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিল, তাই পিতামাতা তাহাকে সামান্য মাত্র বস্ত্র প্রদান করিয়াছিল; দ্বিতীয়ের সন্ততি আউ। তৃতীয়ও দ্বিতীয়ের ন্যায় সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ করিত, এবং তাহাকে পিতামাতা দ্বিতীয়ের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিল; তৃতীয়ের সন্ততি লোটা। চতুর্থ অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত ও স্বেচ্ছাচারী ছিল, কদাপি পিতামাতার বশীভূত ছিল না, পিতামাতা বিরক্ত হইয়া তাহার কটিতে একটুকরা বস্ত্র বাঁধিয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। চতুর্থের সন্ততি সেমা। উপরোক্ত চারি জাতির পরিধেয় বস্ত্র পূর্ব্বোক্ত কারণে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে।

কোন কোন সেমারা বলে তাহারা কেজেকেনোমা গ্রামের এক বৃহৎ প্রস্তরের ভিতর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নাগাজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আঙ্গামীদের মধ্যে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। আঙ্গামীদের মধ্যেও কেহ কেহ বলে যে আঙ্গামী সেমা এবং লোটা 'কেজেকোনামা' গ্রামের বৃহৎ প্রস্তরের ভিতর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রস্তরের ভিতর হইতে নাগাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য নাগাজাতির মধ্যেও

সেমাদের ক্ষেত চাষ।

এরূপ প্রবাদ শুনা যায়। 'আউ' নাগারা বলে তাহারা "লুঙ্তুথ্রক" পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত নাগারাই এজন্য পাহাড়কে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে।

'কেজেকেনোমা' গ্রাম হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে আঙ্গামী-দের এরূপ প্রবাদ আছে যে কোন সময়ে এক বৃদ্ধ দম্পতি বাস করিত। তাহাদের তিন পুত্র ছিল। পুত্রেরা প্রত্যহ পালাক্রমে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর ধান রৌদ্রোত্তাপে শুকাইত। সায়ংকালে এক বোঝা ধান শুকাইয়া দুই বোঝা হইত। পাথরের এই গুণ দেখিয়া পুত্র-গণের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। পুত্রগণের মধ্যে মারা-মারি হওয়ার আশঙ্কায় পিতা পাথরখণ্ডের উপর খড় চাপা দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, বজ্রের ন্যায় গম্ভীর নিনাদে প্রস্তরখণ্ড দেখিতে দেখিতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। প্রস্তরের অভ্যন্তরস্থ দেবতা স্বর্গে চলিয়া গেল। প্রস্তরখণ্ডের অলৌকিক মহিমা বিলুপ্ত হইল। ভ্রাতৃবিরোধ অচিরে আরম্ভ হইল। তাহারা পৃথক হইয়া বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গেল। তাহাদের সন্ততি—আঙ্গামী সেমা ও লোটা!

আঙ্গামী সেমা ও লোটাদের এক বংশে উৎপত্তির প্রবাদ সম্বন্ধে আমরা অটল বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও এই তিন জাতির কার্য্যকলাপের সাদৃশ্য দেখিলে কোন এক সময়ে তাহারা একত্র অবস্থান করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে পারি। 'আউ' ও 'মিরিদের' মধ্যেও সাদৃশ্য আছে এবং তাহাদেরও এক বংশে উৎপত্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। আঙ্গামী সেমা ও লোটারা মৃতদেহ মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখে, আউ ও মিরিরা মৃতদেহ শুকায়। আঙ্গামী সেমা ও লোটা স্ত্রীলোকেরা উল্কি পরে না; আউ ও মিরি স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরে। আঙ্গামী সেমা ও লোটাদের পৃথক মরং বা অবিবাহিতদের বাসগৃহ নাই, আউ ও মিরিদের মরং গৃহ আছে। আঙ্গামী সেমা ও লোটাদের রণজয়-বাদ্য (শঙ্কম্) নাই; আউ ও মিরিদের শঙ্কম্ আছে। গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও ইহাদের সাদৃশ্য আছে। আঙ্গামী সেমা

সেমা সর্দ্দার।

ও লোটাদের গৃহে কাষ্ঠনির্ম্মিত 'কিকা' আছে, কিন্তু মাচাং নাই। আউ ও মিরিদের গৃহব্যাপী বাঁশের মাচাও এবং গৃহের বহির্ভাগে বাঁশের নির্ম্মিত উন্মুক্ত বারান্দা আছে—কিন্তু গৃহের সম্মুখে 'কিকা' নাই। অন্যান্য তারতম্যের ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়।

সেমা স্ত্রী-পুরুষ এবং পোষাক পরিচ্ছদ।

সেমা পুরুষ দেখিতে সুন্দর, অধিকাংশের বর্ণ শ্যাম। তাহারা বলবান সাহসী এবং নির্ভীক। তাহারা শিকারী এবং যুদ্ধপ্রিয়; সম্ভবতঃ সমস্ত নাগাজাতির মধ্যে সেমারাই সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধকৌশলী।

পুরুষেরা ৮ অঙ্গুলী লম্বা ও ৩ অঙ্গুলী প্রস্থ সবুজ রঙের বস্ত্র কটিদেশে একটি রজ্জুর সহিত সংবদ্ধ করিয়া সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখে। ইহাই সেমার পরিধেয় বস্ত্র; ইহাকে সেমারা নেংটি বলে; লজ্জা নিবারণ তাহাতে আদৌ হয় না। উহাদিগকে উলঙ্গ জীব বলা যায়। সেমারা বলে মাতৃগর্ভ হইতে তাহারা উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে চিরজীবন উলঙ্গ থাকিতে হইবে; অঙ্গাচ্ছাদন করিলে তাহারা পাপী হইবে। নাগাদের মধ্যে সেমারা চুরি করিতে এবং মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত। বংশমর্য্যাদা সেমাদের মধ্যে বিলক্ষণ আছে।

গ্রামের যে প্রস্তরখণ্ড হইতে আঙ্গামী সেমা ও লোটা নাগা জাতিদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

সেমারা আঙ্গামীদের মত লম্বা বলিষ্ঠ, তাহাদের পেশী দৃঢ় এবং মুখশ্রী বীরত্বব্যঞ্জক। সঙ্গতিপন্ন লোক গলায় সাদা শঙ্খের মালা, বাহুতে হস্তীদন্তের অনন্ত এবং মণিবন্ধে কড়ি-গাঁথা অলঙ্কার পরিধান করে। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে যাহারা মানুষের মাথা কাটিয়াছে, কিংবা বর্ত্তমানে মিরি মিস্‌মি আবর আকা কিংবা ডাফ্‌লা অভিযানে সীপাহীদিগের সহিত কুলী হইয়া গমন করিয়া কাহারও মাথা কাটিতে পারিয়াছে, কিংবা কোন মৃতের শরীরে লাঠি বিদ্ধ করিয়াছে, তাহারা শূকরের দাঁত পরিতে পারিবে।

সমস্ত নাগাজাতির মধ্যে সেমাদের নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। কোন উৎসব উপলক্ষে সেমারা নৃত্য করিয়া থাকে। নৃত্যকালে সেমারা পনর ইঞ্চি চৌকা কড়ি-নির্ম্মিত চাকৃতি নাভির নীচে নেংটির উপরে ঝুলাইয়া রাখে। বক্ষঃস্থলে ছাগলের চুলে নির্ম্মিত লাল রঙের চিহ্ন পরিধান করে। একহস্তে জাঠি, অন্যহস্তে ভাল্লুকের কিংবা মিথুনের চর্ম্মে নির্ম্মিত ঢাল এবং দেহের পশ্চাৎভাগে সচ্ছিদ্র কাষ্ঠফলকে দাও ঝুলাইয়া রাখে। সেমাদের দা দুইদিকে ধার-বিশিষ্ট এবং তাহাদের জাঠির ফলা অপেক্ষাকৃত ছোট। পশ্চাৎভাগের কাষ্ঠফলকে মানুষের মাথার লম্বা চুল ঝুলাইয়া রাখে। মস্তকে ভাল্লুকের চর্ম্মের কিংবা মানুষের চুলে নির্ম্মিত টুপি পরিধান করে। যাহারা মানুষের মাথা কাটিয়াছে তাহারা টুপির উপর পালক-নির্ম্মিত শিং লাগায়। আউ ও লোটাদের মত সেমারা চুল কাটে। ছোট ছোট ছেলেরা গলায় পিত্তলের হার এবং হাতে পিত্তলের বলয় ধারণ করে। একহাতে একটির বেশী বলয় ধারণ করে না। প্রত্যেক কর্ণে তিনটি করিয়া ছিদ্র থাকে—কর্ণরন্ধ্রে কাপাস পরিধান করে।

সেমা কবর।

সেমা স্ত্রীলোক দেখিতে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি, তাহাদের শরীরের বর্ণ উজ্জল শ্যাম, দেখিতে অধিকাংশ কুৎসিত। চুল অধিকাংশের পিঙ্গলবর্ণ ও খাটো। সেমা স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পর শরীরের যত্ন প্রায় করে না।

সেমাদের বিবাহে পণের হার অত্যন্ত অধিক, এজন্য বিবাহ ব্যয়সাধ্য। সুতরাং আউদের ন্যায় নিত্য নূতন বিবাহ সেমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা বিবাহ-বিচ্ছেদের আশঙ্কা করে না, সেজন্য শরীরের বিষয়ে উদাসিনী থাকে। সমস্ত নাগাজাতিদের মধ্যে সেমা স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত, এবং তাহারা সতীত্বের মর্য্যাদা রাখে।

সেমা স্ত্রীলোকেরা বাহুতে দস্তা-নির্ম্মিত অনন্ত এবং হস্তে পিত্তলনির্ম্মিত বলয় পরে। কাহারও কাহারও প্রত্যেক হস্তে ৮।১০টি পর্য্যন্ত বলয় থাকে। প্রত্যেক কর্ণে ২টি ছিদ্র, উপরের কর্ণরন্ধ্রে কাপাস এবং নীচের ছিদ্রে ছাগলের চুলে নির্ম্মিত ফুল পরিধান করে। গলায় লাল মণির মালা ও শঙ্খের মালা পরে। সেমা স্ত্রীলোকের মেখলা ব্যয়সাধ্য। তাহাদের মেখলা কোমর হইতে জানুর উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অবস্থানুযায়ী মেখলার উপর লাল হলুদ প্রভৃতি নানাবিধ রঙের মণির মালার লহর সমান্তরালভাবে গ্রথিত থাকে। এক লহর হইতে অন্য লহর ½ ইঞ্চি ব্যবধান। কাহারও কাহারও মণির লহর অর্দ্ধ-হস্তের উপর চৌড়া থাকে। সঙ্গতিপন্ন লোকের স্ত্রীকন্যার এক-একটি মেখলার মূল্য ৪০।৫০টাকা পর্য্যন্ত হয়। যাহাদের স্বামী কোন কোন সামাজিক গেনা করিয়াছে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা মেখলার উপরিভাগে সমান্তরালভাবে কড়ি পরিধান করে। তাহাদের বক্ষস্থল অনাবৃত থাকে।

সেমাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক প্রায় নাই। তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা এখনও আরম্ভ হয় নাই। উহারা এবং মিরিরা সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য।

সেমাগ্রাম এবং গৃহ।

আঙ্গামীদের গৃহের ন্যায় সেমাদের গৃহ পৃথক পৃথক। গ্রামের চতুষ্পার্শে পরিখা আছে, এবং পরিখার চতুর্দ্দিকে বাঁশের বেড়া আছে। পরিখার ভিতরে বাঁশের পাঞ্জি (জাঠির ন্যায়) পুতিয়া রাখে। বহিঃশত্রু হইতে গ্রামরক্ষার্থ এই-সকল উপায় অবলম্বন করে। সেমাদের অধিকাংশ গৃহই

বাঁশে নির্ম্মিত, খড়ে ছাওয়া, দুচালা। সেমাগৃহে তিনটি দরজা—সম্মুখে একটি, পশ্চাতে একটি এবং পার্শ্বে একটি। সেমা ব্যতীত অন্য কোন নাগাগৃহের পার্শ্বে দরজা থাকে না। পার্শ্বের দরজার সম্মুখে গৃহের ভিতরে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। গৃহ সাধারণতঃ তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠে মিথুন গরু শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু থাকে এবং মাঝের প্রকোষ্ঠে ধান রাখিয়া থাকে। সেমাদের পৃথক মরং গৃহ নাই। ধনী ব্যক্তির গৃহের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রকোষ্ঠে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মাচাঙে অবিবাহিত যুবকেরা রাত্রি যাপন করে। তাহাকেই সেমারা মরং কহে। গৃহের মধ্যের প্রকোষ্ঠ ক্ষুদ্র, সেখানে অবিবাহিত বালিকারা রাত্রিযাপন করে। গৃহের পার্শ্বের দ্বার তৃতীয় প্রকোষ্ঠের সহিত সংলগ্ন। সেই কামরাতে গৃহস্থালির যাবতীয় জিনিষপত্র থাকে, আহার্য্য রন্ধন হয় এবং গৃহস্বামী অগ্নির চতুর্দ্দিকে এক-এক খণ্ড কাষ্ঠাসনের উপর স্ত্রী এবং ছোট ছোট পুত্র-কন্যার সহিত রজনী যাপন করে। সেমাদের গ্রামে কোন 'খেল' কিংবা পাড়া নাই।

বিবাহ-পদ্ধতি।

পিতামাতা পুত্রকন্যাগণের বিবাহ সাব্যস্ত করিয়া পুত্র-কন্যাদের মতামত জিজ্ঞাসা করে। মাতারাই পুত্র-কন্যাগণের মতামত জানিয়া স্বামীকে জ্ঞাত করে। বিবাহে বর কন্যা উভয়ের সম্মতি আবশ্যক। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়ার রীতি নাই। সেমাদের কোর্টশিপের রীতি নাই। সেমা বালিকারা সতীত্বের মর্য্যাদা জানে। পিতামাতা অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। বিবাহের পূর্ব্বে কোন যুবক কোন যুবতীর গাত্রস্পর্শ করিলে তাহাকে জরিমানা দিতে হয়। গ্রামের লোকেরা উক্ত যুবককে উপহাস করে এবং ঘৃণার চক্ষে দেখে। সেমাদের কঠোর সামাজিক শাসনে যুবক যুবতী আউ কিংবা অন্যান্য নাগাদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল নহে। বিবাহের কথোপকথন স্থির হইলে বর বন্ধুবর্গের সহিত কন্যার গৃহে বেড়াইতে যায়; কন্যা মাতার অভিপ্রায়-মতে বর এবং তাহার বন্ধুবর্গকে মধু এবং ভাত খাইতে দেয়। বিবাহের পূর্ব্বে বর নিজের নূতন গৃহ প্রস্তুত করে। সেমাদের বিবাহে যৌতুকের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। বিবাহে বর-কন্যার সম্মতি জানিলে পর, তাহাদের পিতামাতা যৌতুকের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে। বরের পিতা কন্যার পিতাকে যৌতুক প্রদান করে। সেমা সর্দ্দার (রাজা) এবং ধনীর কন্যাদের বিবাহে যৌতুক অত্যন্ত বেশী। কখন কখন ৩০০৲, ৪০০৲ টাকা হইতে ৬।৭ শত টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পিতাকে বিবাহ-পণ (যৌতুক) দিতে হয়। উক্ত পণ আংশিক নগদ টাকা এবং আংশিক ধান মিথুন গরু শূকর কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বাবতে গৃহীত হইয়া থাকে। কোন গরীব লোকও ৫০।৬০ টাকার কমে কোন সেমা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। বিবাহপণের এরূপ আধিক্যবশতঃ সেমাদের ডাইভোর্স বা বিবাহভঙ্গ কম। বিবাহের সময়ে কন্যার পিতা আপনার সঙ্গতিমত গৃহীত পণ হইতে কন্যাকে ২০৲।৫৲ টাকা হইতে ১০০।১২৫৲ টাকার সামগ্রী বিবাহে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে। বিবাহের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বরের পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের সহিত একটি বৃহৎ শূকর সঙ্গে লইয়া কন্যাকে আনিতে তাহার পিতৃগৃহে গমন করে। শূকর কন্যার পিতাকে উপহার দিতে হয়। কন্যার পিতা উক্ত শূকর কাটিয়া সমাগত লোকদিগকে ভোজন করায়। ভোজনান্তে সকলে কন্যাকে লইয়া বরের নূতন গৃহে গমন করে। সে রাত্রি সকলে বরের গৃহে অতিবাহিত করে। বিবাহের রাত্রে এবং পরদিন প্রাতে সকলে বরের গৃহে ভোজন করিবে। সেমা বলিকা পিতৃগৃহে অবস্থানকালে পিতামাতার অগোচরে ধনসামগ্রী সঞ্চয় করে। সঞ্চিত ধন এবং ধান শূকর প্রভৃতি সামগ্রী অন্যস্থানে রাখে। বিবাহের পর এরূপ সংগৃহীত সঞ্চিত ধন সামগ্রী স্বামীর গৃহে লইয়া যায়। সেমা বালিকা বিবাহের সময়ে পিতার নিকট হইতে শূকর মুরগী ধান, গলার ও মেখলার মণি, চাউল, দস্তার অনন্ত, পিত্তলের বালা, মেখলা, প্রভৃতি যৌতুক-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অবস্থানুযায়ী যৌতুকের তারতম্য হয়। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। একজন সর্দ্দার ৫।৭টি স্ত্রী একসঙ্গে বিবাহ করিতে পারে। একাধিক স্ত্রী একই গৃহে মনের সুখে বাস করে। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীর ভ্রাতৃবৃন্দ ইচ্ছা করিলে বয়সের তারতম্য অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াদের পাণিগ্রহণ করিতে পারে। স্বামীর ভ্রাতৃবৃন্দ বিবাহে রাজী থাকিলে

ভ্রাতৃজায়ারা অপরকে বিবাহ করিতে পারিবে না—অন্যথা অন্যত্র বিবাহে আপত্তি নাই। পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে বিবাহ করা যায়। ডাইভোর্সের অর্থাৎ বিবাহ-ভঙ্গের নিয়ম আছে। কিন্তু অন্যান্য নাগাজাতির, বিশেষতঃ আউদের মত সেমাদের মধ্যে ডাইভোর্স অহরহ সংঘটিত হয় না। স্বামী স্ত্রীর মনঃপূত না হইলে এবং বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিলে স্বামী বিবাহের সমস্ত পণ কন্যার পিতার নিকট হইতে ফেরত পাইবে। তিন বৎসরের ভিতরে ছেলে মেয়ে জন্মিলেও ডাইভোর্সের রীতি আছে। তিন বৎসরের পর ডাইভোর্স ঘটিলে স্বামী যৌতুক ফেরত পায় না। স্ত্রী স্বামীর মনঃপূত না হইলে স্বামী স্ত্রীকে জরিমানা প্রদান করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজক।

সেমারা একেশ্বরবাদী। তাহারা ঈশ্বরকে 'কুঙ্গলিউ' কহে। যিনি সমস্ত পৃথিবী জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর "কুঙ্গলিউ"। 'কুঙ্গলিউ' আকাশে থাকেন—এবং তিনি মানুষের কার্য্যকলাপ সকলই দেখিতেছেন। তাহারা শয়তান ও ভুতপ্রেত বিশ্বাস করে। শয়তানকে তাহারা 'তাগামি' বলে। 'তাগামি' বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ভিতর, নদীর জলে, জঙ্গলে এবং কেহ কেহ বলে মানুষের ঘরেও থাকে। সেমাদের মতে পুণ্য কাজ করিলে মৃত্যুর পর আকাশে এবং পাপ কাজ করিলে মৃত্তিকাগর্ভে মানুষের আত্মা গমন করে। আকাশে যাহারা গমন করে তাহাদের আত্মা 'দেও' হয়। মৃত্তিকাগর্ভে যেসকল আত্মা প্রবেশ করে, তাহারা মৃত্তিকাগর্ভেই একবার মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তারপর 'মাছি' জন্ম পরিগ্রহ করে।

'আউভ্ভ' সেমাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক। প্রত্যেক গ্রামে এক-একজন 'আউভ্ভ' আছে। উহা বংশগত উপাধি ও ব্যবসায়—পিতার মৃত্যুর পর পুত্র 'আউভ্ভ'এর কাজ প্রাপ্ত হয়। গ্রামে রাজা বা সর্দ্দারের নীচেই 'আউভ্ভ'এর সম্মান। 'আউভ্ভ' গেনার দিন ধার্য্য করিবে এবং সকলকে জানাইবে। 'আউভ্ভ' সর্ব্বপ্রকার গেনার কর্ত্তা। 'আউভ্ভ' গ্রামের সকলের নিকট হইতে ধান পায়। প্রত্যেক 'গেনাতে' সে মাংস পায়। কোন নূতন গ্রাম প্রস্তুত করিলে সর্ব্বপ্রথমে 'আউভ্ভ'এর গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং তৎপর সর্দ্দারের এবং তৎপর অন্যান্যের গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সেমাগ্রামে একশ্রেণীর লোক আছে, তাহারা গ্রামবাসীর মৃতদেহ মৃত্তিকাতে পুতিয়া থাকে। তাহাদিগকে 'লাপু' বা 'আমুসো' বলে। মৃতদেহ কবর দেওয়ার কালে যে কোদাল দিয়া মৃত্তিকা খনন করে, আমুসো তাহা প্রাপ্ত হয়। কোন নূতন গ্রাম প্রস্তুত কালে 'লাপু' সর্ব্বপ্রথমে জলপ্রণালীর নালা খনন করিবে। 'আফিকসাতে' গেনাতে 'আমুসো' সর্ব্বপ্রথমে মধুপান করিবে, এবং তৎপরে অন্যান্যেরা মধুপান করিবে। উক্ত গেনাতে 'আমুসো' একটি গরুর পদ ও একসের লবণ প্রাপ্ত হয়। 'আমুসো' মৃতদেহ পুতিবার জন্য দুই টুকরী ধান পায়।

গেনা।

সেমাদের গেনার সংখ্যা কম এবং প্রণালী সরল। অন্যান্য নাগাজাতির ন্যায় সেমাদেরও ব্যক্তিগত এবং জাতীয় গেনা আছে। ব্যক্তিগত গেনা ধনীলোক ভিন্ন অন্যে সম্পাদন করিতে অসমর্থ, যেহেতু তাহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত গেনার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; উহা ঐশ্বর্য্য-এবং-পদ-মর্য্যাদা-জ্ঞাপক। জাতীয় গেনা গ্রামবাসী সকলেই করিবে—এবং সকলেই ঐ সকল গেনায় অর্থ সাহায্য করে। বিবাহের পরে, ক্ষেত্রে ধান্য বপনের পরে, ধান কাটিবার সময় ও পরে, জঙ্গল কাটিয়া নূতন ক্ষেত্র করিবার সময় সেমারা নানাবিধ গেনা বা পুজাপার্ব্বণ করে, এবং বিধি অনুসারে শূকর গো মিথুন হত্যা করিয়া মধু ভাত ও মাংসের ভোজ দেয়; এইসব উৎসবের সময় নৃত্যগীতও হয়। বিভিন্ন গেনার সময় তিন দিন হইতে ত্রিশ-দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। এইসব গেনার উদ্দেশ্য ধনধান্য বৃদ্ধি এবং বৈষয়িক ও সাংসারিক উন্নতি ও কল্যাণ। দেও পুজার সময় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকিতে পায় না। সেমাদের পশুবধের যুপকাষ্ঠ Y অক্ষরের মতন, বা বাংলার হাড়কাঠের মতনই কতকটা। সেমারা বলে তাহাদের গৃহে শয়তান বাস করে; তজ্জন্য কেহ কেহ বৎসরে একবার, কেহ বা তিনবৎসরে একবার গেনা করে, যেন শয়তান গৃহবাসীর কোন অহিতসাধন না করিতে পারে। এই গেনাকে "আকিচিনে" বলে। এই গেনাতে একটি ছোট

শূকর কাটিয়া থাকে। গেনার দিন অতি প্রত্যূষে স্ত্রী-পুরুষ শয্যাত্যাগ করিয়া একটি শূকর কাটিবে এবং তাহা পোড়াইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৬০ টুক্‌রা মাংস এবং ৬০টি চাউল ৬০টি পাতায় রাখিবে। গেনা-সম্পাদনকারী স্ত্রীপুরুষ উক্ত দিবস কেবল মাংস এবং মধু খাইবে, গৃহের বাহিরে যাইবে না।

গ্রামে কোনরূপ মড়ক কিংবা অগ্নির উপদ্রব না ঘটে তজ্জন্য গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া প্রতিবৎসর "আকুয়ে"-গেনা সম্পাদন করে। আকু = গ্রাম। 'আউও' এই গেনা সম্পাদন করে। উক্ত গেনাতে একটি বৃহৎ শূকর এবং ২০টি মুরগী বলি দেয়। সমস্ত পুরুষেরা এই গেনাতে যোগদান করে—স্ত্রীলোকেরা যোগদান করে না। এইরূপ নানাবিধ গেনা আছে।

সেমা-সর্দ্দার ও উপনিবেশ-প্রথা।

প্রত্যেক সেমা গ্রামে এক-একজন সর্দ্দার বা রাজা আছে। সে-ই গ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সর্দ্দারী বংশগত ও জ্যেষ্ঠাধিকারী, কখনও বা পিতা বৃদ্ধ হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বেই স্বেচ্ছাক্রমে জ্যেষ্ঠপুত্রকে আপন ক্ষমতা অর্পণ করে। সর্দ্দারই সেই গ্রামের সমস্ত জমির মালিক; অন্যেরা তাহার নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লয়। গ্রামের সমস্ত লোক সর্দ্দারের জমি চাষ করিয়া দেয়। গ্রামের লোকেরা কেহ মাছ ধরিলে কিংবা কোন পশু মারিলে সর্ব্বপ্রথমে সর্দ্দারের গৃহে যাইবে এবং রাজার প্রাপ্য অংশ সর্ব্বাগ্রে দিবে।

কোন গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এবং জমির উৎপন্ন শস্যে অকুলান হইলে নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় লোক অন্যস্থানে গমন করে এবং নূতন গ্রাম নির্ম্মাণ করে এবং নূতন শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অন্য নাগাদের মধ্যে উপনিবেশ-প্রথা নাই। স্থানান্তরে গমন-কালে সর্দ্দার আপন পুত্রদের মধ্যে একজনকে নূতন স্থানে যাইতে অনুমতি দেয়। সর্দ্দারের পুত্রই নূতন উপনিবেশ স্থানে সর্দ্দার হয়। একজন 'আউও' এবং একজন লাপুও গমন করে। 'লাপু' নূতন গ্রাম নির্ম্মাণের পূর্ব্বে গ্রামের জলপ্রণালীর পথ খনন করে। সর্ব্বপ্রথমে 'আউও'-এর গৃহ, তারপর সর্দ্দারের গৃহ ও তারপর অন্যান্য সকলের গৃহ নির্ম্মিত হয়।

নামকরণ।

সর্দ্দার বা রাজা সংগ্রামকুশলী, বীরপুরুষ, সমাজে যশস্বী এবং খ্যাতনামা ইত্যাদি অর্থসূচক নাম আপনার পুত্রদের রাখিয়া থাকে। গরীবেরা এসকল নাম রাখিতে পারে না। যদি কেহ ইহার অন্যথাচরণ করে, তবে সমাজে উপহাসাস্পদ হয়। সর্দ্দারের নাম অনুযায়ী কোন কোন গ্রামের নাম হইয়া থাকে।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার।

পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভাগ প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃগৃহের মালিক হয়। অন্যান্য পুত্রেরা বাকি সম্পত্তি তুল্যাংশে প্রাপ্ত হয়। ধনী লোকের মেয়েরা ধান কাপড় মিথুন গরু ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকেরা কখনও স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় না।

মানুষের বাঘ হওয়ার যাদুবিদ্যা। (Lycanthropy).

নাগা জাতির মধ্যে একমাত্র সেমাদের ভিতরে কোন কোন ব্যক্তি বাঘ হইতে পারে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। যাহারা এই বিদ্যায় পারদর্শী তাহাদের অর্দ্ধ আত্মা বাঘ হইয়া জঙ্গলে চলিয়া যায়, মনুষ্যদেহ এবং অর্দ্ধ আত্মা পূর্ব্বের ন্যায় গৃহে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করে। কেহ মানবাত্মাধারী বাঘকে তাড়না করিলে যাহার আত্মা সেই লোক উন্মত্ত হইয়া উঠে। তখন লোকে বুঝিতে পারে ঐ ব্যক্তির আত্মা বাঘ হইয়াছে। কেহ কেহ শত্রুর উপর আক্রোশবশতঃ বাঘ হইয়া তাহার পশ্বাদি হতাহত করে। না জানিয়া লোকে মানুষ-বাঘকে নিহত করিলে ঐ ব্যক্তিও প্রাণ হারায়। মানুষের আত্মা ব্যাঘ্র-দেহ হইতে ফিরিয়া আসে না। যদি কোনক্রমে ব্যাঘ্রের আহারাবশিষ্ট কোন পশুর মাংস ঐ ব্যক্তি খাইতে পারে তবে ব্যাঘ্রের দেহগত আত্মা পুনরায় উহার শরীরে ফিরিয়া আসে। ঐ ব্যক্তি মরিলে ব্যাঘ্র মরে কি না তাহারা বলিতে পারে না, কিন্তু ব্যাঘ্র মরিলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষবাঘ প্রকৃত ব্যাঘ্রের আকৃতি প্রাপ্ত হয় —মানুষের বাহুতে হাতীর দাঁত থাকিলে, ব্যাঘ্রের বাহুতে শাদা চোড়া দাগ থাকে, প্রকোষ্ঠে কড়ি-নির্ম্মিত অলঙ্কার থাকিলে, বাঘের মণিবন্ধে শাদা চোড়া দাগ থাকে; মানুষের গলার মালার অনুযায়ী বাঘের গলাতেও শাদা ও লাল

রঙের মালার ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ঐ মানুষ অরণ্যে নিজের আত্মীয় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাইলে, ব্যাঘ্র ব্যগ্র হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। সরোমি গ্রামের কোন নাগা একেবারে বাঘ হইয়া জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে, এরূপ প্রবাদ শুনা যায়। যে-সকল লোক না জানিয়া ঐ ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়াছে তাহাদের সকলেই নদীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। আমার নাগা ভৃত্য হেভেকে বলিয়াছে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর লুজাভোকে (খুকিয়া গ্রামের) এবং হয়িবী গ্রামের সাকুতোকে বাঘ হইতে সে দেখিয়াছে। এই-প্রকার বাঘকে যখন নাগারা তাড়না করে তখন বাঘের আত্মীয় মানুষ জানিতে পারে এবং স্বীয় গ্রামের লোকদিগকে জ্ঞাপন করে। গ্রামের লোকেরা জানিলে অপরকে বাধা দেয়। সাকুতোর বাঘকে খুকিয়া গ্রামের লোকেরা যখন তাড়না করিতেছিল, তখন হেভেকেও উপস্থিত ছিল, ইতিমধ্যে হয়িবী গ্রামের লোকেরা দৌড়িয়া আসিয়া জানাইল উহা সাকুতোর ব্যাঘ্রমূর্ত্তি। তখন সকলে গৃহে ফিরিয়া গেল। সাকুতো সকলকে বলিল সে অল্পের জন্য মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যাহারা এই-সকল যাদুবিদ্যা জানে তাহারা অপরের আত্মাকেও ব্যাঘ্রে পরিণত করিতে পারে, কিন্তু উহা সময়সাপেক্ষ।

কৃষিকার্য্য ও উৎপন্ন শস্য।

নাগামাত্রই কৃষিজীবী। সেমারা অনেকেই গরীব, সকলের কৃষিক্ষেত্র নাই। কেহ-কেহ রাজা এবং ধনীর গৃহে দাসের ন্যায় অবস্থান করে। জীবিকানির্ব্বাহার্থ তাহার প্রভু তাহাকে জমি দেয়, সে প্রভুর কাজ করিয়া দেয় এবং জমির উৎপন্ন শস্য হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষি হইতে উৎপন্ন শস্যের মধ্যে কাপাস ধান কনিধান ভুট্টা কুমড়া কচু প্রভৃতি প্রচুর হয়। সেমাদের পানিক্ষেত নাই, সমস্তই শুকনাক্ষেত; আজকাল জলের ধারে কাহারও-কাহারও সামান্য পানিক্ষেত হইতেছে। আঙ্গামীদের অধিকাংশই পানিক্ষেত। পানিক্ষেত করিতে পারিলে প্রতি বৎসর জমিতে ফসল বপন করা যায়। শুকনা জায়গাতে স্থান খুব উর্ব্বর হইলে সেমারা পর পর দুই বৎসর শস্য বপন করে; বেশী উর্ব্বর না হইলে একবৎসর মাত্র শস্য বপন করে; তারপর ৮।৯ বৎসর উক্ত স্থান পতিত রাখে। এই নিমিত্ত নাগারা কৃষিকার্য্যে খুব কষ্ট পায় এবং অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়।

সেমাদের মধ্যে অনেকেই বস্ত্রবয়ন করিতে জানে না—তাহারা বলে 'গেনা' (নিষেধ) আছে বলিয়া বস্ত্র বয়ন করে না; ইহা তাহাদের মিথ্যা ওজর, জানে না বলিয়াই প্রস্তুত করে না। লৌহজাত জিনিধাদি সম্বন্ধেও তাহাদের এই ওজর। লৌহজাত জিনিষ সেমারা মিরি রেঙমা ও লোটাদের নিকট হইতে ক্রয় করে। বর্ত্তমানে কোন কোন গ্রামের কোন কোন ব্যক্তি লৌহজাত নিত্য-আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে।

খাদ্যাখাদ্য।

মিথুন গরু শূকর মুরগী কুকুর প্রভৃতি যাবতীয় গৃহপালিত পশু তাহারা খায়। কোন কোন জাত বানর খাইতে খুব ভালবাসে। হরিণ ভাল্লুক প্রভৃতি বন্যজন্তু সকলই খায়। সাপ এবং বাঘ সেমারা খায় না। কোন কোন পাখীর মাংস তাহারা খায় না। মধু নাগামাত্রেরই উপাদেয় পানীয়। মধু নাগা-মদ্য বিশেষ। সমস্ত নাগাজাতির মধ্যে সেমাদের খাদ্য অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আওদের আহার্য্যসামগ্রী সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার; এবং আঙ্গামীরা সর্ব্বভুক। জীয়ন্ত সপক্ষ উইপোকা কাঁচা খাইতে আও সেমা লোটা সকলকেই দেখিয়াছি। গোধূলিতে যখন উইপোকা গর্ত্ত হইতে নির্গত হইতে থাকে, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়। নির্গমন-স্থানে বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা অসংখ্য নাগা নরনারী সমবেত হইয়া টপ টপ পোকাগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া উদরসাৎ করিতে থাকে। আমাদিগকে দেখিলে স্কুলের ছেলে এবং দ্বিভাষীরা একটু লজ্জা অনুভব করে,—কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহাদের লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহারা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। আমাদের প্রতি চাহিয়া বলে—খুব মিঠা লাগে। কেহ কেহ খাইতে থাকে এবং বাঁশের চোঙায়ও গৃহে খাওয়ার জন্য ভরিতে থাকে। কেহ কেহ এত বেশী খায় যে দেখিলে গা শিহরিয়া উঠে। রাত্রির আহারের ব্যবস্থা অনেকেই সেখানেই সারিয়া লয়। সেমারা হাতী খায় না, যেহেতু তাহাদের উচ্চ পাহাড়ে হাতী থাকে না। নাগারা জন্তুর কোন অংশ

পরিত্যাগ করে না। সেমা, লোটা এবং আউ নাগারা চুল খায় না—জন্তুর চুল কিংবা পক্ষীর পালক আগুনে পোড়াইয়া ফেলে; কিন্তু আঙ্গামীরা চুল এবং পালক সমেত আহার করে।

মৃতদেহের ব্যবস্থা।

আঙ্গামী ও লোটাদের ন্যায় সেমারা গৃহপ্রাঙ্গণে মৃতদেহ পুতিয়া রাখে। ৬।৭ দিনের শিশুর মৃতদেহ গৃহের ভিতরে পুতিয়া রাখে। সেমারা মৃত্যুর দিনেই মৃতদেহ পুতে। ধনী লোক মরিলে, তাহার আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির গৃহে সমবেত হইয়া ক্রন্দন করে এবং গরু মিথুন প্রভৃতি কাটিয়া গেনা করিয়া তৎপর মৃতদেহ পুতিয়া রাখে। সেমাদের মধ্যে আয়ুসো বা লাপুই মৃতদেহ পুতিয়া থাকে। তাহারা প্রতি মৃতদেহের নিমিত্ত ২ থাং ধান প্রাপ্ত হয়—গেনার উৎসর্গীকৃত মিথুন গরু প্রভৃতির অংশ প্রাপ্ত হয়। মৃতব্যক্তির মৃত্যুর তৃতীয় দিনে আত্মীয়-স্বজনের ভোজনার্থ একটি বৃহৎ শূকর কাটিয়া 'গেনা' করে। পুরুষের জন্য ৬ দিন এবং স্ত্রীলোকের জন্য ৫ দিন মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গেনা করে, অশৌচের ঐ কয়দিন তাহারা কোন কাজকর্ম্ম করে না। সর্দ্দার এবং ধনী লোক মরিলে গ্রামের সকলে একদিন গেনা করে—ঐ দিন কেহ কাজ করিতে পারে না।

সঙ্গতিপন্ন লোকদিগের কবরের স্থানে ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে—গৃহের অভ্যন্তরে বাঁশের মাচাং নির্ম্মাণ করে। মাচাঙের উপর জাঠি, দা, ঢাল, নানাপ্রকারের বস্ত্রাদি, এবং মণির মালা সাজাইয়া রাখে। যে যতসংখ্যক হিংস্র জন্তু ও পশু হত্যা করিয়াছে ততসংখ্যক কাষ্ঠনির্ম্মিত পশুর মস্তক প্রস্তুত করিয়া মাচাঙের চতুর্দ্দিকে ঝুলাইয়া রাখিবে। এবং যে যত নরমস্তক কাটিয়াছে ততসংখ্যক কাষ্ঠনির্ম্মিত নরমস্তকও ঝুলাইয়া রাখিবে।

বরপেটা, আসাম। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

উদ্যানলতা

(১)

হ্যারিসন রোডের উপরেই একটা বাড়ীতে ফুটপাথের উপর চওড়া বারাণ্ডায় সারি সারি টবে বিলিতি ফার্ণ ও দেশী টগর গোলাপ মল্লিকা বেল যুঁই ফুলের গাছ সাজানো। শিবেশ্বর গাঙুলী বাড়ীর কর্ত্তা। নামটা নেহাৎ সেকেলে হলেও বয়সে লোকটি তরুণ; এবং মতামতে ও ধরণধারণে তরুণের চেয়েও সাতকাঠি বাড়া। বর্ত্তমানের লোক না বলে তাঁকে ভবিষ্যতের লোক বল্লেই ঢের বেশী সত্য কথা বলা হয়।

যাক্, সে-সব কথা পরে বলা হবে, এখন আজকের কথাটাই আগে বলে ফেলা ভাল। রাত তখন বারোটা, কল্‌কাতার রাস্তার লোকজনও বিরল হয়ে এসেছে, দু-চারখানা ছ্যাকড়া গাড়ী থেকে-থেকে খোয়া কাঁপিয়ে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটে চলেছে; পথের মাঝে মাঝে বসানো টিনের কাছে অতরাত্রেও প্রকাণ্ডমূর্ত্তি শিব-বাহনগুলি খাবারের সন্ধানে ঘুরছে; শুঁড়িখানার ফেরৎ মাতালদের চীৎকার পথের ধারের অধিবাসীদের সুখনিদ্রায় থেকে থেকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় নব্য উকীল শিবেশ্বর গাঙুলি পথের ধারের বারাণ্ডায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন। দুপুর রাত্রেও তাঁর চোখে ঘুম নেই; সমস্ত মুখ ঘেমে উঠে কোঁকড়া চুলগুলো কপালের উপর নেতিয়ে পড়ে আছে। অথচ শীত যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না, কারণ গায়ে তাঁর একখানা বেশ দামী শাল। সবুজ শালের জরির পাড়টা গলার পাশ দিয়ে নেমে এসে মাটিতে লুটোচ্ছে, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। কি একটা শব্দের অপেক্ষায় যেন কান পেতে আছেন। পথের আলো শালে-ঘেরা চিন্তাক্লিষ্ট মুখের উপর পড়ে তার মধ্যে একটু সরসতা আন্‌বার চেষ্টা করছে। কিন্তু ফুটিয়ে তোল্‌বার মত কোনো মধুর ভাবই আজ সে-মুখে পাওয়া দায়।

বাড়ীর দরজার সাম্‌নেই একখানা কালো-পাল তোলা মোটর গাড়ী, দুখানা পাল্কী আর একখানা ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়িয়ে। গোলমাল বড় শোনা যায় না, কিন্তু বাড়ীর ঘরে-ঘরেই আলো জ্বালা, লোকজনের ছুটোছুটিরও বিরাম নেই।

সকলেই কিন্তু পা টিপে টিপে হাঁটুছে চল্‌ছে। একগলা-ঘোমটা-টানা একটি মেয়েমানুষ বারকতক বারাণ্ডায় এসে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলে গেল। শিবেশ্বর কেবল বল্লেন, "এখন একটু ভাল ত ?" পাইচারি কর্‌তে কর্‌তে শ্রান্ত হয়ে ভদ্রলোক যখন রেলিং-ঘেঁসা একখানা লোহার বেঞ্চিতে বসেছেন, ঠিক সেই সময়ে একটা শাঁখের শব্দ একবার ঘর কাঁপিয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই ডুবে গেল। হঠাৎ ভিতর-বাড়ীতে কেমন যেন একটা গোলমাল শোনা গেল। শিবেশ্বর ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তেই সেই ঘোমটা-টানা মেয়েটি তাঁকে ইঙ্গিতে বাড়ীর ভিতর ডেকে নিয়ে গেল।

ভিতর-বাড়ীর সব ঘরগুলিই সাজসজ্জায় বেশ সুরুচির পরিচয় দিচ্ছে। ছবিগুলি সবই আধুনিক যুগের ঘটনার চিত্র। কোনো-কোনোটা নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রতিলিপি, দু-চারখানা মুসলমানী আমলের ছবির নকল, ছায়াচিত্রও যথেষ্ট আছে; কিন্তু দেবদেবীর ছবি কিম্বা পৌরাণিক ঘটনার ছবি একখানাও খুঁজে বের করা শক্ত। প্রথম ঘরে তাজমহলের একটা প্রকাণ্ড ছবি, তার চারি পাশে নুরজাহান, আকবর শা, ঔরঙজেব প্রভৃতির ছবি, মেঝেতে ফরাশ পাতা, তার উপর লক্ষ্ণৌয়ের ছিটের ও মকমলের অনেকগুলি মোটা মোটা তাকিয়া সাজানো। ঘরের চারকোণে চারটে জালিকাটা মার্ব্বেল-পাথরের ছোট ছোট ঝোলানো কুলুঙ্গি, তার উপর রূপোর আতরদান আর আগ্রার ঝিনুক-ও-পাথরের-কাজ-করা নানারকম ছবি ও খেলনার বাহার। দুপাশে দুটা উঁচু গদির উপর কাশ্মীরি গালিচা পাতা; মাথার উপর জরির-ঝালরদার লাল শালুর টানা-পাখা। পাখার দুই পাশে দুটো বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলোনো।

তার পরের ঘরখানা হাল-ফ্যাশানে নানা-রকম বিলিতি আর জাপানী জিনিষ সাজানো। দরজায় জাপানী চিক্, জানালায় বিলিতি বুটিদার মস্‌লিনের পরদা। ঘরের মাঝখানে একটা রূপোলি হাঁস-আঁকা জাপানী শক্ত পরদা, এককোণে একটা পিয়ানো। দেয়ালের গায়ে বড়-বড় শিকারের ছবি। পাশ্চাত্য চিত্রকরদের মধ্যে যাঁরা প্রাকৃতিক দৃশ্য কি ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি আঁক্‌তে সিদ্ধহস্ত তাঁদের আদর যে এ ঘরে আছে তা এক দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, কিন্তু র‍্যাফেল প্রভৃতি যাঁদের রূপক ও ভাবাত্মক ছবির এত নাম তাঁদের আদর বড় বেশী আছে বলে মনে হয় না। ঘরে কোচ সোফা ও টিপয়ের ঘটাও খুব। আলো ও পাখার বন্দোবস্তটাও নিতান্তই সাহেবী ধরণের।

পাশে একখানা ছোট ঘরে মেঝের উপর উপুড়-করা গোটা-দুই লক্ষ্মী-সরস্বতীর ছবি ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, কোণে ঠেসানো একখানা র‍্যাফেলের-আঁকা মাতৃমূর্ত্তি আছে। একটা বড় কাঁচের আল্‌মারিতে কৃষ্ণনগরের অনেক পুতুল বোঝাই করা। তার ভিতরের নকল আম জাম কাঁটাল-গুলোকে আদর করে অন্য ঘরে সাজিয়ে রেখেছে, কিন্তু কৃষ্ণ রাধা শিব দুর্গার অনন্ত দুর্গতি।

এক কোণে আর-একটি ছোট ঘরে কাশী ও জয়পুরের নানারকম বাসন ও পৌরাণিক গন্ধহীন অন্যান্য কিছু-কিছু দিশী জিনিষ আছে।

এই-সব ঘর পার হয়ে তবে অন্দর মহল। সেখানেরই একটি ঘরের সাম্‌নে আজ যত ডাক্তার, ধাত্রী, দাই প্রভৃতির ভিড়। ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকে শিবেশ্বর দেখ্‌লেন মাটিতে আসন করে বসে তাঁর মা মোক্ষদা দেবী দুই হাতে উঁচু করে তুলে একটি টুক্‌টুকে খুকীকে দোলাচ্ছেন। ছেলে ঘরে ঢুক্‌তেই মা বল্লেন, "আঁতুড় ঘরটায় ঢুক্‌লি ? তা' ঢোক্, সাতরাজ্যের লোকই ত ঢুকে গেল। কাউকে আন্‌তে ত আর বাকি রাখনি। তা ছিষ্টি উলোট-পালোট করে জন্মালেন ত' এক মেয়ে !"

কথাটা বলে মোক্ষদা দেবী একটু অবজ্ঞার হাসি হাস্‌বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাসিতে তাঁর অবজ্ঞা না ফুটে আনন্দই ফুটে উঠ্‌ল।

শিবেশ্বর বল্লেন, "বেশ ত ভালই হয়েছে। তোমাদের ওই সাতকেলে পছন্দের আমি কোনো অর্থ বুঝি না। মেয়ে কম কিসে ? জগৎব্যাপারে তার দরকারটা কি কিছু কম ? আমি ও সব মানি না, ছেলের চেয়ে আমার কাছে মেয়ের আদরই বেশী। মা, ও-সব কথা যাবৃগে এখন, মেয়ের ভাবনা পরে ভাবলেও চল্‌বে। এঁর কথা ডাক্তার কি বল্লেন ?" কথাটা বলে মুখটা একটু বিষণ্ণ করে তিনি স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

মোক্ষদা বল্লেন, "কি জানি বাছা, ওদের কথা আমি কিছু বুঝি না, তুমি নিজে জিগ্‌গেশ কর গিয়ে।"

ডাক্তার পাশের ঘরে গিয়ে যা বল্লেন তার অর্থ সোজা কথায় এই দাঁড়ায় যে অবস্থা ভাল নয়, বরং খারাপই, তবে 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'।

ডাক্তারকে বিদায় করে শিবেশ্বর আবার আঁতুড়-ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর মা তাঁকে দেখে বল্লেন "এইবার একটু শুগে যা না। সারারাত্তি জেগে আর কি হবে? তা হ্যাঁরে ডাক্তার-সাহেব কি বল্লে?"

ছেলে প্রশ্নের উত্তরে শুধু বল্লেন "বিশেষ কিছু নয়," তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন "হ্যাঁ মা, খুকুর নামটা এইবেলা হয়ে যাক্ না।"

তাঁর মা এ-প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না, উল্টে বল্লেন "যত সব অনাসৃষ্টি কথা। আজই নাম কখন হয়?"

কিন্তু যে নুতন মা-টি খাটে শুয়ে ছিল সে অত্যন্ত ক্ষীণ সুরে বল্লে, "তাই হোক্ না, আমি খুকুর নামটা শুনে যাই, পরে হলে আমার আর শোন্‌বার সময় হবেনা।"

তাঁর স্বামী একটু আড়ালে আস্তে-আস্তে বল্লেন "ছিঃ হেম, অমন কথা বলে আমাকে কষ্ট দিও না, তুমি নিশ্চয় সেরে উঠ্‌বে। তবে খুকুর নাম আজই না হয় হোক। কি নাম হলে ভাল হয় বল দিখি মা?"

মা মস্ত ঘরটার একেবারে আর-এক কোণে দাঁড়িয়ে, একটা ঝিকে অনেক কিছু ফরমাস করছিলেন; ছেলের ডাকে কাছে এসে বল্লেন "আজ নাম না হলে আর চল্‌ল না? আমাকে আর জিগ্‌গেশ্ করা কেন, আমার পছন্দে কি তোমরা কাজ করবে?"

"বেশ ত! একটা নাম বলই না, সকলেরই যদি পছন্দ-মত হয় তাহলেই ত ভাল হবে।"

"আমার গঙ্গাজল তাঁর নাত্‌নীর নাম রেখেছিলেন মুক্তকেশী। বেশ নামটি আমার লাগ্‌ল। তোমার মেয়ের এখুনি যে-রকম একমাথা চুল হয়েছে, বড় হলে ত আরোই হবে; ওকে এই নামেই বেশ মানায়।"

ছেলে কপাল কুঁচকে একটু কি ভেবে বল্লেন "আচ্ছা মা, তোমার পছন্দ আর আমার পছন্দের মাঝামাঝি একটা রফা করা যাক্। খুকীর নাম থাক মুক্তি। ভাগ্যে তুমি ঐ নামটা বলেছিলে, তা না হলে আমার এমন সুন্দর নামটা কিছুতেই মনে আস্ত না।"

"আচ্ছা, কি ভাল নামই তোমার মনে এল! যা খুসী নাম রাখ বাছা, আমার এখন হাজার কাজ রয়েছে, আমি চল্‌লাম।"

মা বেরিয়ে গেলেন। একজন ধাত্রী এসে ঘরে ঢুকল। খুকীর মা মেয়ের নাম শুনে একটু তৃপ্তির হাসি হেসে তাঁর পাশের কচি মুখটির দিকে চাইলেন। কথা বল্‌বার শক্তি বোধহয় ছিল না, তাই কিছু বল্লেন না। মেয়ের বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খুকুর জন্ম আর তার মায়ের অসুখের জন্যে বাড়ীতে আনন্দ আর নিরানন্দের স্রোত একসঙ্গেই বইতে লাগ্‌ল। শেষে কালো স্রোতটারই জয় হল! সে ঐ তরুণী নূতন মা টিকে নিজের অতল জলে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর খুকুর মুখ আর নাম মনে রইল কি না কে জানে? বৌয়ের শাশুড়ী চীৎকার করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর ছেলে মুক্তিকে বুকে চেপে চুপ করে বসে রইল।

(২)

ভগবান কেন যে শিবেশ্বরের নামটার সঙ্গে তাঁর স্বভাবের এমন আশ্চর্য্যরকম অমিল করে দিয়েছিলেন তা তিনিই জানেন। শিবেশ্বর যে উগ্রচণ্ডের মত রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন তা বলছি না। বল্‌ছি একে-বারেই অন্য কথা। শিবেশ্বর ছিলেন সংস্কারক। একেবারে চূড়ান্ত রকমের সংস্কারক। কোনো কথায় কি কাজে, আকারে কি ইঙ্গিতে, তিনি কুসংস্কারের গন্ধ সইতে পারতেন না। ঠাকুর দেবতা নামক জীবগুলি ছিল তাঁর দুচক্ষের বিষ। তাঁদের নামগন্ধও তাঁর অসহ্য। কিন্তু এমনি তাঁর দুরদৃষ্ট, যে, পিতামাতার দেবভক্তির জলন্ত প্রমাণ স্বরূপ এই ঠাকুরদেবতার নামটাই চিরকালের জন্যে তাঁর ঘাড়ে চড়ে বসল। এর হাত থেকে তাঁর নিস্তার আর কোনো কালেই হবে না।

যখন ইস্কুলে প্রথম ভর্ত্তি হন তখন এই নামের বিড়ম্বনাটা তাঁর মনে একবারও খোঁচা দেয়নি। এমন কি কলেজে দুটো তিনটে পাশ করবার পুরেও কথাটা তাঁর মনে তেমন করে নাড়া দেয়নি। তাহলে হয় ত ছাপার অক্ষরে বিশ্বময় নামটা বেরিয়ে যাবার আগে এই নামটারই সংস্কার তিনি করে ফেল্‌তেন! কিন্তু কপালে

যার-দুঃখ বিধি লিখে দিয়ে গিয়েছেন, তাকে নিস্তার করে কে?

ল কলেজে ভর্ত্তি হবার পরে শিবেশ্বর যখন সংস্কারের ধ্বজা মাথায় তুলে জগৎ মাৎ করে বেড়াতে লাগ্‌লেন, সেই সময় একদিন বন্ধু অবিনাশের বাগানবাড়ীর চায়ের আড্ডায় নানা সামাজিক ব্যাধির আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে অনাদি বাবু বলে বস্‌লেন, "আচ্ছা, দেখ শিবেশ্বর, জগৎ-সংসারে যা কিছু হাতের কাছে পাচ্ছ, সবই ত সংস্কার করে ফেল্‌ছ; এমন কি এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও সংস্কারের তাড়ায় বেলের সরবৎ ফেলে চায়ের পেয়ালাটাতেই টান দিচ্ছ! কিন্তু ভায়া, গোড়াতেই যে গলদ! বলি বিল্ববৃক্ষের প্রতি বিমুখ হলেও হবে না, বাহন ষণ্ডরাজকে সাড়া না দিলেও চল্‌বে না, নামটাই শিবেশ্বর—স্বয়ং মহাদেব, পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র, দ্বিপত্নীক, গাঁজা-খোর, তেত্রিশ কোটি পুতুলের বড় পুতুল! এর চেয়ে বড় কুসংস্কার আর কি আছে?"

কথা শুনেই শিবেশ্বরের ত চক্ষুস্থির! তাই ত বটে, মগজে এই সামান্য কথাটাও এতদিন ঢোকে নি কেন? যাক্, যার সময়কালে ব্যবস্থা করা হয় নি, তার জন্যে এখন কেঁদে-কোকিয়ে ফল কি! তাই মুখে বল্লেন, "কি করব, বলো? ওতে ত আর আমার হাত নেই! মা বাবা ছ'মাসে নাম রেখে খালাস; আমার মুখ চেয়ে ত বসে ছিলেন না!"

অনাদিবাবু বল্লেন, "একথা মনে থাকে যেন! নিজে অমন ভুল আর করে বোসোনা কিন্তু!"

শিবেশ্বর লাফিয়ে উঠে বল্লেন, "এই বলে রাখছি, আমার ত্রিসীমানায় ও-সব আর খুঁজে পাবে না!"

অল্প বয়সেই শিবেশ্বরের বিবাহ হয়েছিল; সেখানেও মতামত খাটাবার অবসর তাঁর বড় হয় নি। কিন্তু বিয়ের বছর পাঁচ-ছয় পরে, যখন হৈমবতী শ্বশুরবাড়ী এলেন, তখন তাঁর স্বামী বল্লেন, "দেখ হেম, তোমার নামটা বড় সেকেলে; আমি ওটা একটু বদ্‌লে রাখ্‌তে চাই। হেমনলিনী নামটা বেশ। তোমার নিশ্চয় এতে কিছু আপত্তি হবে না!"

ঘোমটা-টানা কোনে বউ বেচারী শহুরে রসিক স্বামীর কথা শুনে অবাক্! হৈমবতীর হেঁট মাথা আর ওঠে না, সাড়া শব্দও কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু তার মত না নিয়ে ত তার নামটা নিজের ইচ্ছেয় বদ্‌লে দেওয়া যায় না! স্ত্রীজাতির উপর জোর ফলানো মোটেই সংস্কারকের উপযুক্ত কাজ নয়! কাজেই অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁর কাছে কেবল "তোমার যা ইচ্ছে" এইটুকু শুনেই শিবেশ্বর সেদিনকার মত বিদায় নিলেন।

বৌয়ের নাম বদ্‌লে বিশেষ কিছু এল গেল না, শ্বশুর-বাড়ীতে তার নাম ধরে ডাকবার লোক এক শিবেশ্বর ছাড়া কেউ ছিলেন না; তিনিও সকলের সাম্‌নে ডাক্‌তেন না; আর বাপের বাড়ীতে বৌয়ের ডাক-নাম ছিল পুঁটী, সেখানে কোনো সংস্কারকের প্রবেশের পথ একেবারেই বন্ধ! যা হোক্ এইটুকু লাভ হল যে শিবেশ্বর তাঁর নিজের কীর্ত্তিতে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। আর কেউ না জানুক তিনি নিজে ত জান্‌লেন যে তাঁর সংস্কার শুধু মুখের কথায় নয়, কাজেও বটে। সংস্কারের প্রথম চোট ভাল-মানুষ বউয়ের উপর দিয়েই নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল।

হেমনলিনীর পালা শেষ হলে আরম্ভ হল গৃহ সংস্কার। বড়মানুষের ছেলে যতই খেয়াল হুজুগ করুক না কেন পয়সার ভাবনা ত আর ভাব্‌তে হয় না! কাজেই কলেজ থেকে বেরিয়ে শিবেশ্বর যখন শাম্‌লা মাথায় হাইকোর্টের পথ ধর্‌লেন, তখন পাঁচজনের একজন হওয়ার গুরুত্বে তিনি তাঁর পিতার আমলের ভবানীপুরের বাড়ীর সেকেলে আবর্জ্জনাগুলো দূর কর্‌তে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে গেলেন।

বাড়ীতে লোকের মধ্যে তিনি আর তাঁর তরুণী পত্নী হেমনলিনী। সে বেচারীর মুখ দিয়ে কথা কোনোকালেই বেরোয় না; তার উপর তার স্বামীর স্নেহে প্রেমে সে এমনি মুগ্ধ যে তাঁর কোনো কাজের সমালোচনা করা তার পক্ষে অসম্ভব। বাধা দেবার লোকের মধ্যে ছিলেন মা মোক্ষদা দেবী। কিন্তু দেশের ভদ্রাসন ছেড়ে আস্‌বার পাত্র তিনি নন। শিবেশ্বরকে আর সাম্‌লায় কে? বীরদর্পে তিনি বাড়ীর পুরোনো ঠাকুরদালান ভেঙেচুরে তার লতানে খিলান, ডমরু-আকৃতি থাম-বাঁধানো বেদী, পঞ্চ-প্রদীপ, পদ্ম-আঁকা শাঁখ সব বিসর্জ্জন দিলেন। কলালক্ষ্মী মনের দুঃখে মার্ব্বেল-পাথরের মেঝের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করে আনমনে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

বন্ধু অনাদি এসে বল্লেন, "কিহে শিবেশ্বর, একেবারে

যে কালাপাহাড়ী চাল ! ব্রাহ্ম না খৃষ্টান, কি হচ্ছ বল দেখি ? জর্ডনের জলটল কিছু মাথায় পড়েছে ।”

শিবেশ্বর গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন, “তোমাদের এক কথা ! এত করে সব ভাঙছি কি আর-একটা নূতন জালে জড়াবার জন্যে ? আমি হওয়ার দলে নয়, না-হওয়ার দলে ! ওসব কন্‌ভেন্‌শন ডগ্‌মা. ক্রীড এসব আমার কাছে খাটবে না ।”

অনাদি বাবু বল্লেন, “আচ্ছা ক্যাপা লোক যা হোক্ ! সংস্কার তোমার মাথা খেলে । জগতের যা-কিছু বাঁধা-নিয়ম আছে, সবই কি উল্টে দেবে নাকি ? ৩ বেলা ভাল করে মাথায় তেল দিয়ে স্নান কোরো, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হবে । হেমদিদিকে আমি না হয় সেবার ভারটা দিয়ে যাচ্ছি ।”

শিবেশ্বর মানুষটি খুবই স্নেহশীল । যে তাঁকে একবার ভালবেসেছে, কিংবা যাকে তিনি ভালবেসেছেন, তাঁর কোনো কথায় তাঁকে বড় রাগ করতে দেখা যেত না । তবে তাঁর সংস্কারপ্রীতিটা কেউ ভালবাসার টানে বিশেষ কমাতে পারেনি । তাঁর জীবনে এইটেই তাঁকে সবচেয়ে পেয়ে বসেছিল ।

অবিনাশ আর অনাদির পরামর্শে শিবেশ্বর ক্রমে বুঝলেন, মুসলমানী গৃহসজ্জায় কুসংস্কার জিনিষটার ছায়া বিশেষ লাগেনি । আর বিলিতি সরঞ্জামে যে নেই, সেটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । তা-ছাড়া জাপান এমন উগ্ররকমের আধুনিক যে তার পুরাণের ছবি-আঁকা চিক পর্দা ফুলদানি-গুলির অতীত ইতিহাসের মধ্যের কুসংস্কারের অনাবশ্যক অংশটা তাঁর মনেই পড়েনি ।

হেমনলিনীকে গান বাজনা শেখাতে এবং নকল ছবির নকল করাতে একজন বিদেশী শিক্ষয়িত্রী ও এক-জন স্বদেশী শিক্ষক সপ্তাহে চার দিন যাওয়া-আসা আরম্ভ করলেন । হিন্দুস্থানী ওস্তাদ রেখে সেতার ও হিন্দি গান শেখাবার ইচ্ছাও একটু হয়েছিল, কিন্তু ভেবে দেখলেন তারা সেই কৃষ্ণরাধার গান ছাড়া অন্য বেশী কিছু জানে না, সুতরাং শুধু বাজনা শেখাবার জন্যে রাখা উচিত কি না সেটা একটু ভেবে দেখা দরকার । পিয়ানোর চেয়ে সেতারের সুরটাই হেমের কানে লাগত ভাল । কিন্তু স্বামী যা বলেন, তার উপর সে কোনো দিনই কথা বলেনি, কাজেই ঐ বিষয়েও কোনো উচ্চবাচ্য না করে সবটা তাঁর বিবেচনার উপরেই ফেলে দিলে ।

তাবিজ কঙ্কণ খুলে হেম ব্রেসলেট হাতে দিয়ে নানা নূতন কাজের মধ্যে পড়াশুনো, গান-বাজনা নিয়ে দিন-গুলি বেশ সহজে কাটিয়ে যাচ্ছিল । তার আনন্দ আর সুখের জন্য শিবেশ্বরের কোনো আয়োজনের ত্রুটি ছিল না । হেমনলিনীর গহনা কাপড় বই বাজনা সবই তিনি সমস্ত দোকান বাছাই করে এনে ঘর বোঝাই করে ফেলেছিলেন । তাঁর চোখে যেটা সুন্দর লাগত, সেটা হেমনলিনীর জন্য না আনতে পারলে রাতে তাঁর ঘুম হত না । স্বামীর ভালবাসায় মুগ্ধ হেম অনেক সময় একটু মৃদু হেসে বলত, “আচ্ছা, রাজ্যি সুদ্ধ আমার জন্যে ঘাড়ে করে না আনলে কি আমার দিনগুলি কাটানো শক্ত হয়ে ওঠে ?” শিবেশ্বর বলতেন, “তোমার কেন হবে ? শুধু নিজে দেখে শুনে এলে আমার মনে হয় যেন চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছি । তুমি না দেখলে আমার দেখা সম্পূর্ণ হয় না । তোমায় না দিলে আমার টাকাগুলোর কোনো অর্থই হয় না, নামে অর্থ হলে কি হয়, কাজে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায় ।”

কথাগুলোর মানে বুঝতে হেমনলিনীর একটুও কষ্ট হত না, কিন্তু তার মত একটা মানুষকে যে অমন একজন মানুষের-মত-মানুষ এমন পূর্ণ প্রেমের অঞ্জলি দিতে পারে, এমন করে প্রাণ-ভোলানো কথা বলতে পারে, এটা মনে করেই সে বেচারা এত বিব্রত হয়ে পড়ত, যে, আনন্দ-সম্ভোগের অবসরটাও তার কমে যেত । সে মুখখানি লাল করে স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ আদায়ের চেষ্টা ফেলে ছুটে গিয়ে নিজের রাশিকরা বইয়ের বোঝার মধ্যে বসে সেই কথাগুলোই উল্টে-পাল্টে নানা-রকম করে ভেবে আনন্দে বিভোর হয়ে উঠত ।

হেমনলিনীর জীবনের দিন কিন্তু ফুরিয়ে এল । শিবে-শ্বরের সমস্ত আয়োজন, গৃহসজ্জা, নূতন সংসার, আদর্শ-প্রতিষ্ঠা, সব পড়ে রইল । যাকে নিয়ে সব গড়ে উঠছিল সেই সরে পড়ল । কেবল ভালবাসাটুকু নিঃশেষে ভোগ করবার জন্য রইল হেমের সাত দিনের মেয়ে মুক্তি ।

(ক্রমশ)

শ্রীসংযুক্তা দেবী ।

স্বরলিপি

II র্সা র্গা -া II { মা র্সা -া। র্সনা গা -া I মা ধা -া। না র্সা -ঋা I
সে কোন্ ০ ব নের ০ হ রিণ ০ ছি ল ০ আ মার ০

I র্সনা র্সা -া। -া -া -া I (র্গা -া -া। ঋা -া -া I র্সা -া -া। র্সা গা -া)} I
ম নে ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ আ ০ ০ আ ০ ০ সে কোন্

I -া -া র্সা। না না ধা I নধা -া পা। মা মা গপা I
০ ০ কে তা রে ০ বাঁধ্ ০ ল অ কা ০

I পমা মা -া। র্সা গা -া II
ব নে ০ সে কোন্ ০

II { নধা ধা -া। না র্সা -া I র্সা -ঋা র্সা। না র্সা -া I -না -া -া।
গ তি ০ রা গের ০ সে ০ ছি ল গান ০ ০ ০ ০

। -া -া -ধা I নধা ধা -া। পা পা -া I মা গা পা। পমা মা -গা I
০ ০ ০ আ লো ০ ছা য়ার ০ সে ০ ছি ল প্রাণ ০

I -মা -পা -ধা। -না -র্সা -ঋা I -র্সনা র্সা -া। -া -া -া } I

I র্গা র্গা -া। ঋা র্সা -া I র্সনা -া র্সা। ঋা র্সা -া I র্সনা র্সা -া।
আ কাশ ০ কে সে ০ চম্ ০ কে দি ত ০ ব নে ০

। -া -া -া I -া -া র্সা। র্সনা না -া I নধা -া পা। মা মা -গপা I
০ ০ কে তা রে ০ বাঁধ্ ০ ল অ কা ০

I পমা মা -া। র্সা গা -া II
র ণে ০ সে কোন্ ০

II সা -মা মা। মা মা -া I গমা মা -া। মা মা -পা I পগা গা পা
মেঘ্ ০ লা দি নের ০ আ কু ০ ০ ল তা ০ বা জি য়ে

| পমা মা -পা I গা গা -া। -মা -পা -া I গপা গা -া। গা রা -গা I
  যে ত ০ পা য়ে ০ ০ ০ ০ ত মাল ০ ০ ছা য়ে ০ ০

I গরা সা -া। -া -া -া I নধা -া ধা না র্সা -া I র্সর্ঋা র্সর্সা -া।
  ছা য়ে ০ ০ ০ ০ ফাল্ ০ গু নে সে ০ পি য়াল ০

| র্সনা র্সা -া I -না -া -া। -া -া -ধা I ধা -না নধা। পা পা -া I
  ত লায় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কে ০ জা নি ত ০

I মা মগা -পা। পমা মা -গা I -মা -পা -ধা। -না -র্সা -ঋা I -র্সনা -র্সা -া।
  কো থায় ০ প লায় ০ ০ ০ ০

| -া া -া I র্সর্গা র্গা -া। র্গর্ঋা র্সা -া I র্সনা -া র্সা। র্সর্ঋা র্সা -া I
  ০ ০ ০ দ খিন্ ০ হাও য়ার ০ চন্ ০ চ ল তার ০

| র্সনা র্সা -া। -া -া -া I -া -া র্সা। র্সনা না -ধা I নধা -া পা।
  স নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ কে তা রে ০ বাঁধ্ ০ ল

| মা মা গপা I পমা মা -া। সা গা -া II II
  অ কা ০ র ণে সে কোন্ ০

শ্যামলী

(১)

আসন্ন শ্রাবণের মেঘভার আকাশের দিকে দিকে স্তূপীকৃত হইতেছিল। ঘন কৃষ্ণবর্ণ করীগণের ন্যায় তাহারা দলে দলে অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া গগনপ্রান্তর ছাইয়া ফেলিতেছে। বৃংহিতধ্বনি নাই, বপ্রক্রীড়ার ঘটা নাই, তাহাদের ধীর মন্থর গতি ক্রীড়াকৌতুকের চাপল্যমাত্র-বর্জ্জিত। গম্ভীর অথচ শ্যামশোভায় আকাশ ছাইয়া তাহারা নীরবে যেন কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

সেই ঘন মেঘের শ্যামচ্ছায়া পৃথিবীর বুকের উপর আসিয়া পড়িয়া তাহার হরিৎ বসনখানির বর্ণ গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। দীর্ঘশির বৃক্ষগুলা সেই মেঘরচিত শ্যামচ্ছদের নিম্নে স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে যেন অধীর হইয়া উঠিতেছিল। আর তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। যাহা হইবার শীঘ্র হইয়া যাউক, এতক্ষণ ধরিয়া কেন এ বৃথা প্রতীক্ষা, এইরূপ বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিয়া তাহারা ক্রমে চঞ্চল ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল। কেতকী ও কদম্বের বনে ঘন হরিতের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া শুভ্র পুষ্পস্তর ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। কুটজ কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি বর্ষার শ্বেত লোহিত পুষ্পদল সেই শ্যামচ্ছায় সবুজের বুকের উপর নিতান্তই যেন উপেক্ষিত ভাবে ফুটিয়া আছে মাত্র। বর্ষার সেই ঊর্দ্ধে অধে বিস্তৃত ঘনশ্যাম বর্ণ-সমুদ্রের মধ্যে তাহাদের ঐ বর্ণ-বৈচিত্র্যটুকু নিতান্তই যেন খাপ্‌ছাড়া, সুরহারা!

কিন্তু সেই শ্যামায়মানা প্রকৃতির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অট্টালিকার উপরে একটি তরুণী যে নিস্পন্দদেহে নিশ্চল-নেত্রে সেই পুঞ্জীভূত স্তূপীকৃত মেঘভারের পানে চাহিয়া ছিল,

তাহার অঙ্গের শ্যামবর্ণে এবং সেই তনুদেহের চতুর্দ্দিকে লম্বিত কতকগুলা কৃষ্ণকেশের চাঞ্চল্যে তাহাকে এই শ্যামলা প্রকৃতির সঙ্গে যেন একীভূত কোন পদার্থের মতই দেখাইতেছিল। যেমন ঐ হরিৎবসনা ধরণীর সহিত বহু ঊর্দ্ধের সেই স্তরবিন্যস্ত ঘনশ্যাম মেঘের মৌন একত্ব নিঃশব্দেই প্রতিভাত হইতেছিল, তেমনি সেই তরুণীর স্বচ্ছবিশাল নেত্রের শ্বেত ক্ষেত্রটুকু পর্য্যন্ত আকাশ ও ধরণীর শ্যামচ্ছায়াপাতে শ্যামলা হইয়া উঠিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ অন্তরকেও সেই শ্যামপ্রকৃতির সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিল। যেন এই আসন্নবর্ষার জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে তাহার দেহমনের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই এমনি তন্ময় নিস্পন্দ ভাবে সে মেঘের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গুম্-গুম্ গুম্-গুম্—স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। মূক জড়প্রকৃতির উপরে শব্দময় অনন্তের যেন এ একটা উপহাস মাত্র। তাই তাহার রুদ্ধকর্ণ এ শব্দে সচকিত হইল না। তরুণীটিরও মুখে বা চোখে একটুও স্পন্দন আসিল না। সে যেমন চাহিয়া ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল। বায়ু আরও বেগে বহিল। এইবার যেন তাহারও সারা অঙ্গে সাড়া জাগিয়া উঠিল! মুক্তকেশগুচ্ছ আরও উড়িতে লাগিল, অঞ্চল বিপর্য্যস্ত হইল। তরুণী সেই আর্দ্র বায়ুর আঘাতে সসংজ্ঞ হইয়া হর্ষকণ্টকিতদেহে আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেই দেখিল আকাশের এককোণে বিদ্যুতের স্বর্ণজ্যোতি ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। যেন শ্যাম-গিরিশৃঙ্গে স্বর্ণভুজঙ্গিনী খেলিয়া বেড়াইতেছে। সেই দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তরুণীর সমস্ত মুখে ও চক্ষে মুহূর্ত্তে সেই বিদ্যুতের মতই দীপ্তি খেলিয়া গেল! ছাতের আলিশার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আনন্দোজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে সেইদিকে চাহিয়া রহিল!

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি তাহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িল। তরুণী তাহার সেই হর্ষবিকসিত চক্ষুকে আবার ঊর্দ্ধে মেঘের পানে স্থির করিবামাত্র তাহার চোখে মুখেও কতকগুলা ফোঁটা পড়িল। হাসিয়া চক্ষু মুছিয়া সে আবার চাহিল! আবার চোখের ভিতর জল পড়ায় চোখ মুছিতে হইল, কিন্তু তথাপি সে রণে ভঙ্গ দিল না? মেঘের ধারার সঙ্গে এই হাসির খেলা তাহার কিছুক্ষণ ধরিয়াই চলিল, ওদিকে সর্ব্বাঙ্গ যে মন্দ মন্দ বৃষ্টিধারায় অভিষিক্ত হইতেছে সেদিকে তাহার কোন লক্ষ্যই নাই।

একটি রমণী ভিজিতে ভিজিতে ছাতে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ডাকিলেন 'শ্যামলি!' তরুণী চমকিয়া উঠিয়া আগন্তুকের পানে চাহিল। রমণী বিরক্তির সহিত বলিলেন—"যাকে ভগবান বঞ্চিত করেন তাকে কি এমনি করেই বঞ্চিত করেন! এমন করে ভিজ্‌ছিস্ তাও কি তোর হুঁস্ নেই? চল্।" বলিতে বলিতে তিনি ছাদ হইতে তাহাকে একপ্রকার টানিয়া সিঁড়ির মধ্যে লইয়া গেলেন। নবাগতার বিরক্তিপূর্ণ মুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া তরুণী উচ্ছ্বাসের সহিত তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং বালিকার ন্যায় অধীর আনন্দে বাহিরের মেঘের পানে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলীসঙ্কেত করিয়া রমণীর বিরক্ত মুখখানা সেইদিকে ফিরাইয়া ধরিল। রমণী বলিলেন—"দেখেছি দেখেছি, মেঘ উঠেছে, ভিজ্‌তে হবে কি তাই বলে? সব চুল ভিজে গেছে, সারা গায়ে জল, এতটুকুও কি তোর হুঁস্ হবে না? নে, মাথা মোছ্।"

সমুখের সুবিন্যস্ত সুনীল মেঘস্তরে সুতীব্র আলোক জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। রমণী ব্যস্তভাবে "মাগো চোখ্ গেল যে! চল্ হতভাগী নীচে চল্" বলিয়া কন্যাকে আকর্ষণ করিতে গেলেন, কিন্তু কন্যা ইতিমধ্যে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সেই বর্ষণোন্মুখ মেঘের পানে চাহিয়া উচ্ছল আনন্দে করতালি দিতে দিতে সে মেঘমন্দ্রিত আকাশের তলে বসিয়া পড়িল! রমণী বিব্রত ভাবে ডাকিলেন "বিজলি, বিজলি, ওকে ডেকে দে ত একবার!"

সিঁড়ির নিম্ন হইতে শব্দ আসিল "কেন মা?"

"এ পাগলকে যে আমি ঘরে নিয়ে যেতে পারি না। তুইই একবার আয় দেখি।"

স্থির বিদ্যুৎলেখার ন্যায় একটি কিশোরী মাতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সভ্রুভঙ্গে বলিল "ও তো মেঘ দেখ্‌লেই অমনি করে,—থাকুক অমনি,—যেমন ওর বুদ্ধি!"

"তাই বলে কি ভিজে মরবে? এই বর্ষায় ভিজ্‌লে ব্যারাম হবে যে!"

"দাঁড়াও তুমি, আমি দেখি।"

"না রে তুই আর ভিজিস্ না—জোরে জলও এল যে, —আমিই দেখি!" মাতা ছুটিয়া গিয়া আবার কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন "ওরে ঘরে চল পাগল—ঘরে চল!"

পাগল নড়িল না, স্পন্দিত-তার-লোচনে দিগন্তে যেখানে পেঁজা তুলার আকারে তরলীকৃত মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। মাতা এইবার দুইহাতে কন্যার মুখ নিজের পাশে ফিরাইয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন "শ্যামলি-শ্যামলি আমার কথা শুন্‌বি না—আমায় কষ্ট দিবি? চল ঘরে চল, জান্‌লায় গিয়ে বসে মেঘ দেখ্‌বি চল।"

মাতার মুখের পানে চক্ষের পানে একটু চাহিয়া শ্যামলী আবার শিশুর মত তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল এবং এইবার মাতা আকর্ষণ করিতেই তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে ধীরে-ধীরে আশ্রয়ের তলায় গিয়া দাঁড়াইল। মাতা তাহার অঞ্চল নিংড়াইয়া অঙ্গ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন আর বিজলী বকিতে-বকিতে নিজের শুষ্ক অঞ্চল দিয়া তাহার সুদীর্ঘ আর্দ্র কেশগুলিকে নিংড়াইতে লাগিল।—"ও তো চিরকেলে পাগল। তুমিও এই বর্ষায় কি বলে ওর সঙ্গে ভিজে এলে মা? বাবা দেখ্‌লে এখনি অনর্থ কর্‌তেন। নাও, তুমি এইবার কাপড় ছাড়গে, আমি শ্যাম্‌লীকে নীচে নিয়ে যাচ্ছি। কিলো নীচে যাবি, না বাবাকে ডাকব।"

কনিষ্ঠার রুক্ষ মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তে শ্যামলী বিদ্রোহীভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং নিজের কেশগুলা তাহার হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল।

বিজলী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌লে, দেখ্‌লে মা! একে বল তুমি পাগল! 'সেয়ানা পাগল বোঁচ্‌কা আগল!' রাগটুকু বিলক্ষণ আছে। তাও যদি কানে শুনতে পেত আর কথা কইতে পার্‌ত তাহলে নাজানি কি কর্‌ত।"

"তাহলে কি ও এমনই হত রে? আমারও কপাল, ওরও কপাল! যা, তুই আর বকাবকি করিস্‌নে; উনি শুন্‌তে পেলে, এসে আরও গণ্ডগোল কর্‌বেন। তুই নীচে যা, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।"

বিজলী অস্ফুটস্বরে বকিতে বকিতে নীচে চলিয়া গেল। মাতা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া সাদর ভঙ্গীতে নীচে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং তাহার একখানি হাত ধরিয়া নিজেও অগ্রসর হইলেন। শ্যামলী নিঃশব্দে ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিতে-চাহিতে মাতার সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল।

সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া মাতা কন্যাকে একটি জানালার নিকটে বসাইয়া দিলেন। শ্যামলী বাহিরের বর্ষণাচ্ছন্না ধূমাকারা পৃথিবীর পানে চাহিয়া সাগ্রহে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মাতা ক্ষুব্ধস্নেহের ম্লানহাস্যে বলিলেন "হয়েছে-হয়েছে, আর আদর কর্‌তে হবে না। চুপ্ করে এই জানালায় বসে থাক্ এখন, বুঝ্‌লি? বাইরে যাস্‌নে যেন।"

কন্যা মাতার মুখভাবের ইঙ্গিতে তাঁহার কথা যে বুঝিয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া চোখ মুদিল। মাতা ক্ষণেক সেইভাবে থাকিয়া বলিলেন "ছাড়, কাজ আছে।" হস্তদ্বারা কন্যাকে সরাইয়া দিয়া মাতা উঠিয়া গেলেন।

শ্যামলী তখন একাগ্রমনে জানালায় বসিয়া এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির উপর ধূমল বর্ণের এবং শীতলস্পর্শের যে একখানি আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার অন্তরালে তাহার চির-অম্লান পরিবর্ত্তিত ধ্রুবরূপটি চিরপ্রকাশিত আছে, এই মেঘাবরণ ভেদ করিয়া শ্যামলী সেই রূপটি দেখিবার জন্যই তাহার সদা-জাগ্রত মনটিকে যেন চক্ষের পথে প্রাণান্ত আগ্রহে অগ্রসর করিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। ধরণী যেখানে ভাষাময়ী শব্দময়ী, সেখানে তো তাহার সহিত শ্যামলীর কোন পরিচয় নাই। সে যে আজন্ম বধির, আজন্ম মূক। সেইজন্য এই রূপময়ী বর্ণময়ী প্রকৃতিই তাহার সর্ব্বস্ব, এবং দুটি সদা-জলন্ত সদা-জাগ্রত চক্ষুই শ্যামলীর তাহাকে অনুভব করিবার একমাত্র অবলম্বন।

(২)

সহরের কোন প্রসিদ্ধ বড় রাস্তার উপরে কোন এক ধনীর প্রকাণ্ড চারিতালার অট্টালিকার মধ্যে সেই গৃহের গৃহিণী তাঁহার পুত্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে-ছিলেন। গৃহের সাজসজ্জার অভাব নাই! অট্টালিকাটিও যেমন বিপুল, তাহার মহার্ঘ সজ্জাও তেমনি, গৃহস্বামীর বিপুল ধনের পরিচায়ক। কক্ষে কক্ষে বিদ্যুতের আলোক,

—দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার শিল্পকৌশলসংযুক্ত ধাতু কাষ্ঠ ও প্রস্তরে নির্ম্মিত খট্টা, আসন, দ্বারাবরণী, পুত্তলিকা, স্ফটিকের নানাবিধ দ্রব্য, কিছুরই অভাব নাই। কেবল এহেন সুখসৌভাগ্যশালী গৃহের মধ্যস্থ মাতা-পুত্রের কথোপকথনে সমমতের কিছু অভাব লক্ষিত হইতেছিল। মাতা বলিলেন—"এবার আর কথাটি কইতে পাবিনা—বুঝলি ?"

পুত্র বলিল "একটিও না ?"

পুত্র হাসি-হাসি মুখে উত্তর দিতেছে। মায়ের কথাগুলি কোপ ও দৃঢ়তাসূচক!

"না একটিও না! এম-এ পাশ করা হয়ে গেল, আবার কথা কইবি কি শুনি? এখন যে মেয়ে আমি পছন্দ করে দেবো তাকেই তোকে বিয়ে কর্‌তে হবে।"

"তা সে কাণা-খোঁড়াই হোক্, আর হাবা-কালাই হোক্—নয় মা ?"

"তোর্ চালাকি রাখ্‌ত অনিল। ওসব কথায় এবার আর আমায় ফাঁকি দিতে পার্‌ছিস না। আমি ওঁকে কাণা খোঁড়া কি কালোকুচ্ছিত মেয়েই গছিয়ে দেবো যেন! উনি যেন তা জানেন না, তাই এইসব চালাকি! কিন্তু এই মেয়ে-পছন্দ নিয়েই যে তুমি আমায় হায়রান করবে আবার, সে জোটি তোমার রাখ্‌ছি না। আমার যাকে পছন্দ হবে তাকেই তোর বিয়ে করতে হবে, জেনে রাখ্।"

"হ্যাঁ মা, তাকে যদি আমার পছন্দ নাও হয় তবুও বিয়ে কর্‌তে হবে ?"

"হ্যাঁ হবে। ওর আবার পছন্দ! এই তিন চার বচ্ছর ধরে কত কত পরীর মত সুন্দরী মেয়ে ওঁকে দেখালাম, তার একটাকেও যার পছন্দ হল না তার কি পছন্দ বলে কোন জিনিষ আছে? এবার আমি যা সুমুখে পাব, যে মেয়েকে আমার ইচ্ছে হবে, তাকেই ধরে তোর বিয়ে দেবো। দেখি তুই কি করতে পারিস্।"

পুত্র অপরিমিত হাসিতে হাসিতে বলিল "ওমা তাই কর মা! সেকালের গল্পের সেই রাজাদের মত তোমার এই ধেড়ে আইবুড়ো ছেলের দায়ে বিব্রত হয়ে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে রাত্ পোহালে উঠে যার মুখ দেখব তার সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেবো। তারপরে সকালে উঠে জানালা দিয়ে রাস্তা সাফ্‌করা মেথরাণীকেই দ্যাখ কিম্বা ডিম্‌ওয়ালি মাখন্‌ওয়ালিকেই দ্যাখ, তাকেই বৌ করে ফেলো, কেমন মা ?"

"আমাকে বিস্তর রাগাস্‌নে অনিল। আমি মেথরাণী বৌ করব? তোর চেয়ে আমার পছন্দ লাখ্‌গুণে উঁচু তা জানিস্? কেমন মেয়ে আমি বৌ করতে যাচ্ছি দেখ্‌বি একবার তবে ?"

মাতা ব্র্যাকেট হইতে একথোলো চাবি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে একটা চন্দনকাষ্ঠের বহুশিল্পচাতুর্য্যযুক্ত আল্‌মায়রা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো ফটো বাহির করিলেন। সেখানির উপর একবার নিজে চোখ্ বুলাইয়া লইয়া সগর্ব্বে সেটি পুত্রের চক্ষের নিকট ধরিয়া বলিলেন "দ্যাখ্‌দেখি একবার।"

অনিল একভাবেই হাসিমুখে বলিল "আঃ চোখের ভেতর গুঁজে দিলে কি দেখ্‌তে পাওয়া যায়? হাতে দাও, দেখি—কাণ্ডখানা কি!"

"এই দ্যাখ্—কিন্তু এ তোমায় পছন্দ কর্‌তেই হবে বাপু তা কিন্তু বলে রাখ্‌ছি—নইলে আমি অনর্থ করব! আমি ভদ্রলোকদের কথা দিয়েছি।"

পুত্র ফটো হাতে লইতে গিয়া হাত টানিয়া লইল, হাসিয়া বলিল "যখন পছন্দ কর্‌তেই হবে,—তোমার এই হুকুম, তখন আর কেমন, কি বৃত্তান্ত, দেখে কি হবে! তা সে গয়লানীই হোক্ আর মালিবৌই হোক্।"

"অনিল, তুই কি আমায় পাগল কর্‌বি! কি অপছন্দের জিনিষটা আমি পছন্দ করছি একবার চোখ্ মেলে দ্যাখ্ আগে—তারপরেই না হয় ওসব বলিস্!"

"পছন্দ কর্‌তেই হবে একথা শুন্‌লে কি মা আর পছন্দের পাত্তা পাওয়া যায়? সে ও-হুকুমকে সেলাম ঠুকে ছশো হাত দূরে পালায়, তা কি জান না মা ?"

"আচ্ছা আচ্ছা, তুই আগে দ্যাখ্, পছন্দ কর, তারপরেই না হয় সে-কথা হবে।"

"বেশ, এই তো ভদ্রলোকের মেয়ের মত কথা। তুমি যে তাড়া আমায় দিয়েছ মা—তাতে ঠিক যেন বোধ হ'ল তোমার বাবা—সে কথা কি আর বল্‌ব—"

মাতা স্নেহ-কোপের সহিত সতর্জ্জনে বলিলেন "আমি

যাই তেমন বাপের বেটি তাই এই তোর মত বুড়ো ছেলেরও এত দামালি সয়ে আছি! আমার বাপকে আবার গাল্?"

পুত্র ভালবাসা ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কোমল চক্ষে মাতার পানে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তা সেটা আমায়ও স্বীকার কর্‌তে হবে মা।"

"নে নে, এখন বাজে বকুনি রাখ্—ছবি দেখ্‌বি কি না?"

"দাও, না দেখে আর কি করি। কিন্তু বল্‌ছিলাম কি মা, যে, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদটা দিয়ে নিয়ে ছবি দেখাদেখি করলে হত না?"

"এম-এ হলো তো আবার রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ? আর তাই যদি পড়বি পড়্‌না, তাতে বিয়ে কর্‌লে কি দোষটা হবে শুনি?"

"আহা বোঝ তো মা, বিয়ে কর্‌লে কি আর পড়াশোনা হয়? তোমরাই তো বল এ-কথা!"

"আবার চালাকি? এখনো যদি অমনি করবি, সত্যি আমি মাথামুড় খুঁড়্‌ব—"

"আচ্ছা আচ্ছা, আর আমি কিছু বল্‌ব না, তুমি বিয়ের জোগাড় কর।"

"আগে ছবি দ্যাখ্—দ্যাখ আমি কেমন মেয়ের খোঁজ পেয়েছি এবার। কত পরীর মত সুন্দরী মেয়ে যে তুই ফিরিয়ে দিয়েছিস্, একে যদি ঘরে আন্‌তে পারি সে দুঃখ আমার ঘুচবে।"

পুত্র ছবিখানা লইয়া ধীর অনুসন্ধিৎসুভাবে ক্ষণিক দেখিয়া বলিল এরও তো দুটো পা, দুটো চোখ, দুটো হাত! "কই মা, পরীর মত দুটো ডানার সন্ধান তো মোটেই পাচ্ছিনা।"

মাতা সবেগে পুত্রের হাত হইতে ছবিখানা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন "দ্যাখদেখি কেমন চোখ, কেমন ভুরু, কেমন মুখ; কি গড়ন, আর রংও—"

"আঃ সে তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি—কেমন ছাইএর মতন চমৎকার—"

"এ ফটোতে রঙের কি বুঝ্‌বি বল্‌ত? পেণ্ট করে আনালে দেখতে পেতিস্ কেমন গোলাপের মত রং! নামেও বিজলী, দেখতেও স্থির বিদ্যুতের মতই। বিশ্বাস না হয় শিশিরকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্।"

"শিশিরকে? সেই বুঝি এবারের গুপ্তচর তোমার?"

"সে কেন হবে। সইকে আমিই তোর উপযুক্ত একটি মেয়ের জন্য চিঠি লিখি—সেই খোঁজ দিয়েছে। তার চিঠিতে মেয়েটি বড্ড সুন্দর শুনে শিশিরকে আমি দেখ্‌তে পাঠিয়েছিলাম, ফটোর ক্যামেরাটাও সঙ্গে দিয়েছিলাম।"

"বাঃ! এত কাণ্ড করেছ, অথচ আমি কিছুই জানিনা। আমি জানি শিশির তার বাড়ী যাচ্চে! তার সঙ্গে কখনই বা এত পরামর্শ আঁটলে?"

"তুই তো সব খোঁজই রাখিস্। কি বিষয়-আশয় দেখা, কি সংসারের কিছু দেখা, কিসের খোঁজ তুই রাখিস্? আমি না থাক্‌লে তোর যে কি গতি হবে—"

"সে কথা সত্যি গো। তোমার মতন মা-টি না হলে আমার যে কি হত—"

"নে-নে, কিন্তু তাই বলে চিরকাল তো মায়ের খোকা হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না বাপু—"

"কেন চল্‌বে না? তোমার সলিল সব বিষয়-আশয় সংসার-ধর্ম্ম দেখ্‌বে আর আমি তোমার খোকা হয়েই তোমার কোলে দিন কাটাব।"

"তাইত! তা হলেই আমি বর্ত্তে গেলাম আর কি! তুই আগে, সলিল পরে। একটি ভাল বৌ এনে তোর এই খোকামি ঘুচিয়ে সংসারী করে তবে আমার নিশ্চিন্তি।"

"তোমার ভাল বৌ এসে সর্ব্বাগ্রে আমার খোকামিটিই ঘোচাবে? তবেই হয়েছে মা—"

"ওরে রাখ্ রাখ্। এই সুন্দর বৌ পেয়ে শেষে দিনান্তে একবার মায়ের কাছে আস্‌তেই মনে থাক্‌বে না হয়ত দেখিস্! তখন হয়ত এ খোকামির কথা মনে কর্‌তেও হাসি পাবে।"

পুত্র ছলগম্ভীর মুখে মাতার পানে চাহিয়া বলিল "এই এতক্ষণে ছেলের বিয়ে দেওয়ার সার মর্ম্ম তোমার মনে এসেছে মা! তবুও এই ছেলে পর করার ঝোঁক্ তো যাবে না।"

"ঝোঁক্ যাবে কিরে, সংসারে এসে এইই তো কর্‌তে হয়। মেয়েটিকে কত যত্নে মানুষ করে পরের ঘরে পাঠিয়ে পরের চেয়েও পর করে দিতে হয়। ছেলেকে ততোধিক আশার সঙ্গে গড়ে তুলে শেষে কারও কপালে সে আপনারই

থাকে, কারও পর হয়ে যায়, তবু একটি পরের মেয়ে এনে তার সঙ্গে গেঁথে দিয়ে তবে ত মার নিশ্চিন্দি? এ কি একা আমি কর্‌ছিলে, জগতেই তো এই কর্‌ছে। এই একান্ত আপনারটিকে পর করতে না পেলেও মানুষের কতনা ভাবনা কতনা দুঃখ!" মাতা উচ্ছ্বসিত একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। পুত্র ব্যথিত হইয়া মাতার পানে চাহিয়া রহিল। মাতা তখনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন "কি এমন করে দেখ্‌ছিস্—মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে মা বাপে কত কাঁদে দেখিস্‌নি কি? তুই যে ছেলের মত নস্, তুই যে আমার মেয়েরই মত চিরকেলে আঁচলধরা! তোকে আমার চেয়েও একজন আপনার লোক এনে দেবো, এতে একটু চোখে জলও আস্‌বে না?"

পুত্র অন্যমনস্কভাবে ধীরে-ধীরে উত্তর করিল "কি জানি কি কর্‌ছ মা—ভাল কর্‌ছ কি মন্দ কর্‌ছ ভগবানই জানেন।"

"সেই ভাল কথা, মায়ে যা করে থাকে তাইই কর্‌ছি, ফল ভগবানের হাতে। তুই ভাবিস্‌নে অনিল, বেশ সদ্বংশের মেয়ে, বড়লোক নয়, কিন্তু খুব ভাল ঘর। কেমন মেয়ে আন্‌ব, সে কেমন হবে, তা কি আমারই ভয় নেইরে!"

"তুমি সবদিক দেখেই কর্‌ছ, তা কি আমি জানি না? আমি সেকথা ভাব্‌ছিনা মা—আমি ভাব্‌ছি—কি জানি কি ভাব্‌ছি তাও জানিনা—কেমন মনটা বড় খারাপ কর্‌ছে।"

মাতা লজ্জিতভাবে বলিলেন "আমারি দোষে কর্‌ছে অনিল! আমি বুড়োমাগী সত্যিই যেন মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি এমনি কাণ্ড কর্‌লাম। তুই যে আমার ছেলে, তুই যে আমার বৌ এনে দিবি-নাতি-নাতনি দিবি, আমার সংসার সাজিয়ে দিবি। তুই কি আমার সত্যিই মেয়ে যে পরের ঘরে পর হয়ে যাবি অনিল? ছিঃ, আর ওকথা ভাবিস্‌নে! শিশিরকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। তার কাছে যা তোর খোঁজ নিতে ইচ্ছে হয় নে। এ মেয়ে ইচ্ছে না হয় বল অন্য মেয়ে দেখি, কিন্তু এইটিই আমার বড় পছন্দ।"

"তোমার পছন্দেই কাজ হোক্ মা—এর আর শুন্‌ব দেখ্‌ব কি?"

"না না তাও কি হয়। খোকা সেজে থাকিস্ বলে কি সত্যিই তুই তাই? সব ভার মেয়েমানুষ মার ওপর দিলে হবে কেন? এই যে শিশির এসেছিস্—অনিলকে বল্ কেমন মেয়ে দেখে এলি।"

অনিল এইবার চেষ্টার দ্বারা মুখে হাসি আনিয়া বন্ধুকে সম্ভাষণ করিল "কিহে গুপ্তচর, তোমার এই কাজ? তুমি না কত কি করবে, কত কি হবে। চিরকৌমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করে দ্বিতীয় ভীষ্ম হবে?"

শিশির হাসিয়া কাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া বলিল "বাঃ আমি কি নিজে বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছি নাকি! আমি তো মার হুকুমে তোমার কোনে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম?"

"শুধু কোনে দেখ্‌তে যাওয়া? ক্যামেরা পর্য্যন্ত ঘাড়ে করে। বাহাদুর বটে! পরের জন্য এমন ঘাড় না ভেঙে নিজের চেষ্টা দেখ্‌লেই তো পার্‌তে।"

"ওকে কেন বক্‌ছিস বাছা—ও তোর মত অবাধ্য ছেলে নয়। ও কি আমার কথা ঠেল্‌তে পারে? নে তোরা কথাবার্ত্তা কয়ে সব ঠিক্ করে ফ্যাল্; আমি পুজো কর্‌তে যাই! আস্‌ছে মাসেই বিয়ের দিন কর্‌ব--তা কিন্তু বলে রাখ্‌ছি!"

মাতা চলিয়া গেলে অনিল শিশিরকে বলিল "মাকে এমন করে খেপালে কেন বলদেখি?"

"একটিও বাড়িয়ে বলিনি ভাই—মেয়েটি সত্যই অতি অপূর্ব্ব!"

"অপূর্ব্ব তো নিজের জন্যে ঠিক্ কর্‌লেই পার্‌তে!" তোমার অনূঢ় আদর্শের গয়ায় পিণ্ডি পড়ে যেত।"

"আঃ—কি যে বল—গিয়েছি তোমার জন্য কোনে দেখতে—"

"তা কি হয়েছে? তোমায় আমায় প্রভেদটা কিসে?"

"জমীন-আস্‌মানে যতখানি। তুমি হলে লক্ষপতি কৃত-বিদ্য সুন্দর সচ্চরিত্র—"

"আর তুমি একটা এম্-এ-পাশ হতভাগা বওয়াটে বোম্বেটে! চাট্টি টাকা বেশী বলে আমার বিশেষণ ঐগুলি— আর তুমি—নাঃ-যার প্রারম্ভেই বন্ধুবিচ্ছেদ সুরু হল, তার শেষ ফল না-জানি কতদূর—"

"বন্ধু-বিচ্ছেদ? তুমি বল কি অনিল?" রুদ্ধকণ্ঠে শিশির উত্তর দিল।

"আর বল কি !" ফটোর পানে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া অনিল বলিল "আমাদের দেশের কোনের মত ছোটখাটো নয়, বয়স চোদ্দ-পনের হবে, নারে ?"

"কিছু কম হবে, তের চোদ্দ এই-রকম। কিন্তু তুমি বন্ধুবিচ্ছেদ শব্দটা মুখে কেন আন্‌লে অনিল ? এমন শুভ-দিনের সম্ভাবনায় এমন কথা—"

"আঃ—যা প্রায়ই ঘটে থাকে তাইই বলেছি, তাতে হয়েছে কি ! এই তো মা ছেলে পর হয়ে যাবার আশঙ্কায় কেঁদেও ফেল্লেন, আবার বিয়ে দিতেও ছাড়্‌বেন না। আর তুমিও সেই 'অপূর্ব্ব' মেয়েটি দেখে নিশ্চয়ই মনে আশঙ্কা করেছ যে এইবার আমাদের চিরকালের বন্ধুত্বের মাঝে একটি বিষম ছেদ পড়্‌বার সময় এল। আমিও যে এক্ষেত্রে এই-রকমই ভাব্‌তাম। তাইতো বল্‌ছি যে এইবার এক নূতন পালা সুরু হল আমাদের—না ?"

শিশির ঈষৎ আশ্বস্তভাবে বলিল "হ্যাঁ তা একরকম হল বই কি ! কিন্তু এ যে জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য—তোমায় করতেই হবে অনিল।"

"নাঃ ! সুন্দর মেয়ে দেখে তোর মত্‌ পর্য্যন্ত বদ্‌লে গেছে দেখ্‌ছি ! এমন কথা তো তোর মুখে শুনিনি কখনো।"

"আমি কি আমার বিষয়ে বল্‌ছি নাকি ? তোকে যখন মার কথায় বিয়ে করতেই হবে তখন এ অবশ্যকর্ত্তব্য না ত কি ? এমন মেয়ে হয়ত আর না পেতেও পার অনিল ?"

ফটোখানা আর-একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া অনিল বলিল "হ্যাঁ সুন্দরী বটে, বংশও ভাল শুনেছি, কিন্তু আমাদের এই মা-ছেলের মধ্যের উপযুক্ত হয় তবে ত !"

মাতা সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "নাঃ তোর জ্বালায় আমার পূজো করতে বসাও ঘটে না দেখ্‌ছি। অত ভাব্‌ছিস্‌ কেন বল্‌ ত ? আমি যদি ঠিক্‌ তোরও মা হতে পারি তাকেও আমার মেয়ে হতেই হবে এ জেনে রাখিস্‌।"

"তুমি ছেলের বিয়ের ভাবনাতেই যখন পূজো আহ্নিক বন্ধ করলে মা, তখন বিয়ের সময় এলে যে কি করবে এই ভাবনায় আমারও পেটের ভাত চাল হচ্ছে। যাক্‌ আর আমি অন্য ভাবনা ভাব্‌তে যাচ্ছি না। যদি কিছু ভাবি তো সে কেবল বিয়ের রেশালার কথা,—আর—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্ধুর প্রতি গোপন কটাক্ষপাতে মাতার অলক্ষ্যে তাহাকে ইঙ্গিতে ফটোখানা দেখাইল। উভয় বন্ধু যুগপৎ সজোরে হাসিয়া উঠায় মাতাও সবটুকু না বুঝিয়া "আচ্ছা—আচ্ছা—সবতাতেই বাক্‌চাতুরী ! তোমায় রেশালার ভাবনাও ভাবতে হবে না বাপু, যাও এখন স্নান করতে যাও"—বলিতে বলিতে তিনি হাসিমুখে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

(৩)

নির্দ্দিষ্ট কালের অধিকাংশ দিনই প্রায় কাটাইয়া দিয়া শরৎলক্ষ্মী ধীরে ধীরে তাঁহার রাজসম্ভার সঙ্গে লইয়া পল্লীগ্রামের উপর আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহার খবর রাখে ! মানুষ আপনার সুখ দুঃখ ও অভাব অভিযোগ লইয়া এমন অবকাশ পায় না যে আর অন্য কোন দিকে দৃষ্টি ফিরায়। যাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন অনুভবশক্তি জগতের সব যা কিছু অনুভাব্য তাহা প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে সক্ষম—তাহাদের কাছে প্রকৃতির এ নিত্য নব বিচিত্রতায় তো কোন অজ্ঞাত রহস্যের আকর্ষণ নাই। তাহারা জানে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, শরতের পর হেমন্ত, শীতের পর বসন্ত, এ তো পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে চিরকালই চলিতেছে, চলিবে। তাহারা দেখে গ্রীষ্মের রৌদ্রে জ্বালাময় আকাশকে এবং দগ্ধ তাম্র দিগন্তকে বর্ষার মেঘে শ্যামল করে, শরতের বিচিত্র মেঘভরা স্বর্ণ-কিরণোজ্জ্বল নীলাম্বর ও হরিৎ দিক্‌শোভাকে নীহার-বাষ্পে ধূসর করিয়া হেমন্ত আসে। তারপরে শীতের ঘনশুভ্র তুষারজাল কাঁপিয়া বসন্তের পীত উত্তরী জলে স্থলে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা শোনে গ্রীষ্মের খরদাহদগ্ধ ভীত পক্ষীর 'ফটিই-ইক্‌ জল,' আষাঢ় শ্রাবণের স্নিগ্ধ চণ্ড নীরদ-নির্ঘোষ, শরত-হেমন্তের বিচিত্র কাকলী ; শীতজর্জ্জর তীক্ষ্ণ বায়ুর বৃক্ষপত্র-কুঞ্জে শিরশির শব্দ, তারপরে বসন্তস্পর্শমুগ্ধ জগতের শতকণ্ঠে শতগান শততান। কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিস্ময়ের বা মুগ্ধ হইবার তো কিছু নাই। যাহাদের সতেজ-ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন, কিসের হইতে কি হইতেছে তাহা ভাবিবার অগ্রেই বুঝিতে পারে, তাহারা তো প্রকৃতির দ্বারে ভিক্ষুকের মত চাহিয়া বসিয়া থাকে না। আর যে অর্দ্ধ-

বোধশক্তিসম্পন্ন জীব এই অনুভবময়ী প্রকৃতির অধিপানার বেশী অনুভব করিতে পারে না, এই শতশব্দ-চাঞ্চল্যময়ী প্রকৃতি যাহার চোখের উপর নৃত্য করিতেছে, যাহার নৃত্য-ভঙ্গী সে দেখিতে পায়, অথচ তাঁহার নূপুরের শব্দ যাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, সেই বধিরতার অতল সমুদ্রে নির্ব্বাসিত জীবের কাছে এই অর্দ্ধমাত্র প্রকাশিত প্রকৃতির নিত্য নব রূপসম্পদ অতি আশ্চর্য্যের অতি আকর্ষণের! যে দেখিতে পায় না সে তাহার বাকী সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি দিয়া কেবল শোনে, আর যে শুনিতে পায় না তাহার সর্ব্বাঙ্গ একাগ্র ভিক্ষুকের মত মুগ্ধের মত প্রকৃতির দ্বারে শুধু দেখিবার জন্যই পড়িয়া থাকে। বায়ুর পদশব্দ তাহার শ্রবণশক্তিতে পৌঁছে না বলিয়া বায়ুর স্পর্শে এবং তাহার মেঘে মেঘে ও পৃথিবীর বসনাঞ্চলের উপর দিয়া গমনভঙ্গী দর্শন মাত্রই সে রোমকণ্টকিত হইয়া উঠে। এই বহুবর্ণময়ী রূপ-শোভান্বিতা প্রকৃতির বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে কেবল তাহাকে দেখিয়াই লয়। তাহার সেই অদ্ধ-উন্মেষিত জীবন উন্মাদের বা শিশুর মত কেবল দেখাতেই মুগ্ধ ও তন্ময় থাকে।

বিস্তৃত জলাশয়ের তীরে শ্যামলী বসিয়া ছিল। তাহার মাতা এবং ভগ্নী তখনো স্নান করিতেছেন, শ্যামলীর সিক্তবস্ত্র ছাড়াইয়া গা মাথা মুছাইয়া দিয়া মাতা তীরে তুলিয়া দিয়াছেন,—বিজলী তখনো সাঁতার কাটিতেছে। শ্যামলী বিলের অপর তীরের পানে মুগ্ধদৃষ্টি পাতিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিল। শরতের নির্ম্মল নীল আকাশে ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ শুভ্র মেঘখণ্ড যখন বিলের বিস্তৃত স্বচ্ছ হৃদয়ে ছায়া ফেলিয়া মাঝে মাঝে সূর্য্যকে আড়াল করিতেছিল তখন আবার সচকিতে সে আকাশ-পানে চাহিয়া হর্ষের আধিক্যে উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল।

মাতা ও ভগ্নী স্নান সমাপনান্তে উঠিয়া আসিলে শ্যামলী হস্তের ইঙ্গিতে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইল নিকটস্থ একটি বৃক্ষে একটা অতিক্ষুদ্র পক্ষী বসিয়া মাঝে-মাঝে মুখ নাড়িতেছে ও গলা ফুলাইতেছে। মা চাহিয়া দেখিলেন, বিজলীও দেখিয়া মুগ্ধ ভাবে মাতার পানে চাহিয়া বলিল "এইখানে বসে ও এমন করে ডাকৃছে? দ্যাখ মা, অন্য দিকে চেয়ে আছে বলে এত কাছে ও আমাদের টের পাচ্চে না, একমনে ডেকেই যাচ্চে। আঃ ধরতে পারা যেত যদি?"

মাতা বলিলেন "খাঁচায় পুরলে কি ও অমন করে আর ডাক্‌ত বাছা?"

শ্যামলী তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া বিজলী সভ্রূভঙ্গে চক্ষে ও কর্ণে হস্ত দিয়া হস্ত নাড়িয়া ইঙ্গিতে শ্যামলীকে জানাইল "ও-পাখীর রূপ কি ছাই, বিচ্ছিরি! ওর ডাক শুনতে পাচ্ছিস্ কি যে ওর মিষ্টি সুর তুই বুঝবি! হাঁ করে দেখ্‌বার কিছু নেই ও পাখীতে, কেবল ওর গান শুনতে মিষ্টি! ও তুই কি বুঝবি!"

ভগ্নীর পুনঃ পুনঃ কর্ণেন্দ্রিয় স্পর্শে ও কি একটা ইঙ্গিতে শ্যামলী প্রায়ই এমনি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত। এখনও মার দুঃখপূর্ণ দৃষ্টি এবং বিজলীর ইঙ্গিতে আবার নিজের একটা কিছু অভাবের তীব্র আভাস বুঝিয়া শ্যামলী বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ দৃষ্টিতে কেবল পাখীটার পানে চাহিয়া রহিল। কিসের তাহার অভাব তা ত সে জানে না,—কিন্তু কেন সকলে তাহার পানে এমন করিয়া চায়!

নিকটে নরসমাগম বুঝিয়া পাখীটা এইবার পলাইল; কোন্ দিকে গেল দেখা গেল না, কেবল তার উচ্চ তীব্রকণ্ঠ দিকে দিকে বাজিতে লাগিল—কু-কু-কু-কু-কু-কু-কু-কু! কুক্ কুকু! কুক্ কুকু!"

বিজলী আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টিতে মাতার পানে চাহিয়া বলিল "কি সুন্দর ডাক্‌ছে—ওমা—কি মিষ্টি গলা ওদের! ঠিক্‌ই যেন বল্‌ছে 'চোখ্ গেল—চোখ গেল'—পাপিয়ার মত মিষ্টি সুর আর কোন পাখীরই নয়—না?"

মা একটা হুঁ বলিয়া বিহ্বলদৃষ্টি ভুর্ম্মনা চিরবধির কন্যার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া সস্নেহ সবিষাদ ইঙ্গিতে বুঝাইলেন "চল মা, বাড়ী যাই চল।"

মাতার অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্যামলী অত্যন্ত মন্থর গতিতে যেন বিষাদের ভরে বিহ্বল হইয়া চলিতে লাগিল। পাখীটাকে দেখা যাইতেছে না—অথচ তাহার ভগ্নী কি যেন একটা সুন্দর জিনিষ অনুভব করিতেছিল! সে অনুভবটা যেন শ্যামলীর এই শারদসৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়ার সুখানুভবের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। ঐ যে বিকশিত শুভ্র কাশের বন

বিলের জলকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া মাথা নাড়িতেছে; ও-পাশের কাঁচা সোনার বর্ণের ধানের ক্ষেত, কচিৎ কোন স্থান সবুজ, বায়ুর স্পর্শে মাঝে মাঝে সেই বিচিত্র রঙের বিস্তীর্ণ কোমল আসনখানি যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, বিলের বুকের নির্ম্মল কাঁচের মত জলে সবুজ শ্যাম পত্রদলের মাঝে-মাঝে আরক্ত পদ্মের যে শোভা, উপরের দিগন্ত-বিস্তৃত উদার সুনীল আকাশের যে স্ফূর্ত্তি, এই সব দেখিয়া শ্যামলীর যেমন সুখ হইতেছিল, ঐ পাখীটাকে দেখিতে না পাওয়া গেলেও তাহার কি যেন আর একটা অনুভব করিয়া বিজলীও তেমনি সুখে উৎফুল্ল হইয়া চলিল। বিজলীর ভাবে ও ইঙ্গিতে নিজের মধ্যে কিসের একটা অভাব সহসা আজ তীব্র হইয়াই শ্যামলীর মনে উদয় হইতে লাগিল, অথচ তাহা যে কি—তাহা বুঝিবারও যে তাহার শক্তি নাই! হায় প্রকৃতির একি বিদ্রূপ?—না অভিশাপ?

তাহারা গৃহে গিয়া পৌঁছিতেই গৃহস্বামী অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বলিলেন "ওগো শুনছ—মঙ্গলবারে বিজলীকে পাকা দেখ্‌তে আস্‌বে বরপক্ষ থেকে! মাঝে এই তিনটে দিন মাত্র। এর মধ্যেই সম্ভব-মত উদ্যোগটুদ্যোগ করতে হবে। মনে করছি গ্রামের নিকট আপনার লোকগুলিকেও নিমন্ত্রণ করব সেদিন। বুঝলে?"

গৃহিণী নিঃশব্দে সিক্তবস্ত্রাদি শুকাইতে দিতে লাগিলেন। কর্ত্তা উৎসাহের সহিত বলিয়াই যাইতে লাগিলেন—"তারা যখন কিছু নেবে না, তখন বিয়ের একটু ধুমধাম তো করতে হবে,—গ্রামের সব লোককে খুঁটিয়ে ভোজ ফলার দিতে হবে। ঈশ্বরেচ্ছায় যখন অমন পাত্রটিতে মেয়ে দিতে পাওয়া যাচ্চে, তখন সকলকেই নিয়ে একটু আনন্দ করা চাই ত! ২রা অঘ্রাণই বিয়ে, বুঝলে? এখন থেকেই উদ্যোগ সুযোগ করতে আরম্ভ কর। গায়েহলুদ আর বাসি-বিয়ের ভোজ দুটো আর বিয়ের রাতের ফলারে গাঁয়ের ছোটবড় সবাইকে বল্‌তে হবে?"

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "গাঁয়ের ছোটরা খেতে পারে, কিন্তু বড়রা এ বিয়ের ভোজ ফলার কি খাবে গো?

"খাবে না কি-রকম? সবাই খাবে—কত আহ্লাদ করে খাবে।"

"মুখে আহ্লাদ জানাবে বটে, কিন্তু মাতব্বররা কেউ খাবে না!"

"তুমি বল কি? আমার কি কুলে কোন দোষ আছে, না আমি জাতে তাদের চেয়ে ছোট, যে, তারা খাবে না? দলাদলির জন্যে যদি বল, সব দলকেই আমি সমান আদর করব। তবে কেন খাবে না?"

"সব দলই বল্‌বে তুমি পতিত, তুমি বড় মেয়ে অদত্তা করে ঘরে রেখে ছোটর বিয়ে দিচ্চ—তোমার ঘরে কেউ তাই খাবে না।"

কর্ত্তা বিস্ফারিত চক্ষে ক্ষণেক স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন "বটে? কার মুখে শুনেছ নাকি এ-রকম কথা?"

গৃহিণী বেদনাবিদ্ধস্বরে বলিলেন "শুনেছি বই কি! তাই বল্‌ছি, বেশী ঘটা করে কাজ নেই, তাতে কেবল অপমান হতে হবে।"

কর্ত্তা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন "অপমান কিসের? কারও কি অঙ্গহীন সন্তান হয় না? তাই বলে সে জাতে ঠেলা থাকে? তার বাড়ী কেউ খায় না?"

"তা নয়। এতদিন খেয়েছে, কিন্তু এই বিয়ের পর আর বড় কেউ খাবে না!"

"আমার অপরাধ? আমি কি শ্যামলীর বিয়ের চেষ্টা করিনি? কালা বোবা মেয়ে কেউ নিতেও চাইবেন না—আবার জাতেও মারবেন—এ কি-রকম বিচার?"

"যাদের জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলে অঙ্গহীন সন্তান হয় তাদের তো ঐসব কষ্টই ভোগ করতে হয় চিরকাল, তার জন্যে রাগ করে ফল নেই তো।"

"তবে কি চুপ করে সইব? এ কি ভগবানের কাজ? তিনি যে পাপের শাস্তি দিয়েছেন মাথা পেতে নিয়েছি—তা বলে মানুষের এ অত্যাচার সইতে পারব না।"

"না সয়ে কি করবে? শাস্তি ভগবান দেন—কতক নিজের হাতে, কতক মানুষের হাত দিয়ে।"

"আমি সে মানি না। এ তাদের হিংসে! বিদ্বান লক্ষপতি জামাই পাচ্চি বিনা পয়সায়, এই হিংসেয় মরছে সব। নইলে এতদিন কি ক্রিয়াকর্ম্মে আমার বাড়ী কেউ খায়নি?"

গৃহিণী ধীরকণ্ঠে বলিলেন "কেবল আমাদের গাঁয়ের নয়-

আমাদের বাপের বাড়ীর দেশেও দেখেছি একজনের একটা জড়পিণ্ড মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনি বলে তার ছোট মেয়ের বিয়ে হয় না, শেষে তেমনি একটা জন্তু ধরে জড়টার বিয়ে দিয়ে ফেলে তবে তারা অন্য মেয়ের বিয়ে দিতে পায়!"

"তোমার মেয়েরও কি আমি তেমন বিয়ে দিতে চাইনি—তাতে তুমি রাজী হয়েছ কি এতদিন? তারপরে সেই খোঁড়া ছোঁড়ার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলাম তো তার মা রাজী হল না। হবে কি করে? তোমার ও মেয়েটি কি শুধু কালা বোবা? ও যে পাগল, হাবা-কালার বাড়া। ও গলগ্রহকে ঘাড়ে করে মরবে!"

মাতা নতমুখে নিঃশব্দে রহিলেন।

কর্ত্তা বকিয়া যাইতে লাগিলেন—"নিজহাতে খেতে জানে না, নাইতে জানে না, খিদে তেষ্টা বুঝতে জানে না, ওটা একটা জন্তু। নইলে কাণা মেয়েও শুনেছি হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজে-আন্দাজে যত শিল্পকাজ করে। মথুর মুচির জন্মান্ধ মেয়েটা ঘরকন্নার কাজ পর্য্যন্ত করতো, আর এ তোমার কি যে মেয়ে! হাবা কালা হলেই কি অমনি বুদ্ধিহীন হয়। সাত জন্মের আমার পাপের ফল—আর কি! কিন্তু তা বলে ঐ একটার জন্যে আমি এমন পাত্র তো হাতছাড়া করতে পারব না। ভাল মেয়েটার কপালে যদি এমন পাত্র জুটেছে তো আমার যেমন করে হয় বজায় রাখতেই হবে—তাতে ওটার বরাতে যাই হোক্। বিয়ের লোকজন না হয় নাই খাওয়ালাম। ভেবেছিলাম একটু আহ্লাদ করব—কপালে নেই, কোত্থেকে হবে! কিন্তু তাই বলে যে জাতে ঠেলা থাকব, ক্রিয়া-কর্ম্মে কেউ বাড়ীতে পাত পাতবে না, সে সহ্য হবে না।"

গৃহিণী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করবে?"

কর্ত্তা তাড়া দিয়া উঠিলেন "তা কি এখান ভেবে ঠিক্ করতে পেরেছি! দেখি ভেবে। কিন্তু বলে দিচ্ছি, যা ধরে বিয়ে দিতে চাইব তাতেই তোমায় রাজী হতে হবে, কথাটি কইতে পাবে না। তারপরে তোমার ও পাগল মেয়ে কেউ কেড়ে নেবে না সে ঠিক্ জেনো—তোমার আমারই ঘরে চিরদিন থাকবে, কিন্তু সেজন্যে ত আমি ভাবছিনা, অন্য সম্প্রদান করি—বিজলীর পাত্রটিও হয়ত হাতছাড়া হবে। বড় ঘর আর সুন্দর মেয়ে বলেই তারা নিচ্ছে, শুনেছ ত? সেই ঘরে না ছোট হতে হয় এই যা এক মহা ভাবনা। যাক্, তুমি এখন পাকা দেখার ঠিক্ কর তো সব। আর আমিও দেখি এঁরা সব সেদিনে আমার বাড়ী ফলার খেতে আসেন কি না।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে পাত্রপক্ষ হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কন্যা দেখিতে এবং বিবাহের দিন স্থির করিতে আসিলেন। বিজলীর পিতা তাঁহাদের পল্লীগ্রামের পক্ষে সম্ভবাতিরিক্ত সমাদর করিলেন। গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদেরও তিনি সেই-সঙ্গে নিমন্ত্রণ করিলেন—কিন্তু গৃহিণীর অনুমানই সত্য হইল। নিমন্ত্রিতের মধ্যে কেহবা একেবারেই পদার্পণ করিলেন না। যাঁহারা আসিলেন তাঁহারাও আহারের পূর্ব্বেই নানা অছিলায় পলায়ন করিলেন। পাছে ভাবী কুটুম্বেরা তাঁহার এই সদ্য একঘরে অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া ফেলেন, সেজন্য কর্ত্তা এবিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি মাত্র না করিয়া গ্রামস্থ প্রধানেরাও যে সেদিন নিমন্ত্রিত ছিলেন তাহা নবকুটুম্বদের বুঝিতে দিলেন না।

কন্যার রূপে এবং কন্যাকর্ত্তার সমাদরে বরপক্ষের সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা তখন কন্যার বিবাহের সময়েও পাছে এই ব্যাপার ঘটিয়া বিবাহে কোন বাধা উপস্থিত করে এজন্য শ্যামলীর উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু কালা বোবা এবং পাগল এই ত্রিবিশেষণ-বিশিষ্টা কন্যাকে নামে মাত্র সম্প্রদানের জন্যও স্বজাতি এবং সমকুলস্থ এমন কোন পাত্রই তিনি তখন খুঁজিয়া পাইলেন না যে তাঁহাকে জাতিচ্যুতি হইতে রক্ষা করে। বিজলীর বিবাহের আনন্দ তাঁহার ঘুরিয়া গেল। সদ্যপ্রাপ্ত কুটুম্বদের সম্মুখে গ্রামের সমাজপতিদের দ্বারা পাছে অপমানিত হন্ এই ভয়ে তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

মাতা মনু

পাখী ডেকে ওঠে ওই গো ওই,
বয় ভোরের হিম বাতাস ;
জাগ্‌ল কার শান্ত চোখ
ফুট্‌ল কার পুষ্প-হাস !
ভিজে ওঠে আঁধারের আঁচল
মৌক্তিকের স্নিগ্ধ ভায়,
কম্পমান অঙ্গে ম্লান
কল্প শেষ রাত্রি যায় !
সারা-নিশি-ভরা যন্ত্রণার
দুঃস্বপন টুট্‌ল মোর,
অশ্রু আর দুর্দশার
হয় রে শেষ, হয় রে ভোর
একাকী আছিনু মুহ্যমান
এই ধুলায় কল্প-কাল ;
কার আঙুল—ফুল চাঁপার—
বুন্‌ল আজ স্বপ্নজাল !
কোথা হ'তে এল এই অতিথ্—
এই কোমল—এই অরুণ—
এই চমৎকার আমার—
মোর প্রসব—মোর প্রসূন !
বাছা ! ওরে বাছা ! মোর দুলাল !
মোর হিয়ার একটি ফুল !
সঙ্গী মোর—অঙ্গ মোর—
স্বপ্ন মোর—তুই অতুল !
তোরে পেয়ে প্রাণে উল্লাসের
উঠ্‌ল ঢেউ, ভরল বুক,
উৎসবের উৎস তুই,
উৎসুকীর নিত্য-সুখ।
তোরে হেরে চোখে নেই পলক
হাল্‌কা তুই—মোর পুতুল,
পাপ্‌ড়ি-ময় তোর শরীর
হাল্‌কা তুই প্রাণ-পুতুল।

কোথা তোরে আমি রাখ্‌ব, বল্,
কই তেমন ঠাই কোথায়,
হায় রে হায় একটুতেই
অঙ্গে তোর লোন্‌ছা যায়।
পাথরে কাঁকরে এক্‌সা ভুঁই
ছুঁচ্‌লো-ধার বন কাঁটার,
স্থল যেমন তেম্‌নি জল,—
ধুন্-পাথার—ধুন্-পাথার।
কোথা পাব আমি ইন্দ্রাণীর
মন্দারের শয্যা, হায়,
দুর্ভাগার দুখ্-হরণ
এই রতন শুই কোথায় ?
অদিতি যদিচ বোন্-সতীন্
হায় রে এই বঞ্চিতার,—
বঞ্চি কাল এই ধুলায়,
স্বর্গে ভাগ নেই আমার।
সোদরা অদিতি মোর নিজের—
সূর্য্য চাঁদ পুত্র তার,—
তার ছেলের রূপ্-ছটায়
মূর্চ্ছা পায় অন্ধকার।
তারা পেয়েছিল জন্মিয়েই
নীল গগন্-হিন্দোলার,
তোর তেমন কিছু নেই—
জন্ম, হায়, তোর ধুলায়।
কেঁদে পেলে তুমি ঠোঁট কোথাও,
কই আদার ? হায় রে হায়।
দুর্ভাগার পুত্র তুই,
বৎস মোর নিঃসহায়।
হরিষে বিষাদে দ্বন্দ্ব ঘোর
মোর হিয়ায় আজ কেবল,
দুখ-সুখের ঝঞ্ঝনায়
কাঁপ্‌ছে বুক—মন বিকল।
আঁখি ভ'রে আসে জল কেবল
ঝাপ্‌সা চোখ একশোবার—
নেই রে নীড় মোর শিশুর,
বাসা নেই মোর বাছার।

নাড়ীতে নাড়ীতে কান্না-রোল,—
মন শরীর প্রাণ অধার।
হয় না কার এই হিয়ার
রক্তধার মিষ্ট ক্ষীর?

ক্ষণে-ক্ষণে ছেয়ে ফেল্‌ছে সব
অশ্রুময় অন্ধকার।
নয় নিখুঁৎ—নয় রে সুখ—
ধন পেয়েও সাত রাজার।

দনু-দিতি-অদিতির আপন
মার পেটের বোন্ আমি,
বোন্-সতীন আমরা সব—
সব বোনের এক স্বামী।

আমি অভাগিনী সব-শেষের,
প্রেম্-চন্দর পাইনি আগ্,
সব-নীচেই ঠাঁই আমার,
পাইনি তাঁর ঢের সোহাগ।

দাসীপনা ক'রে সাত বোনের
কাট্‌ল মোর কাট্‌ল কাল
এই কঠিন এই ধূলার
পৃথ্বী পর সাঁঝ সকাল।

দুখের তপে যে দিন কাটায়
তার তপের নেই কি ফল?
আজ আমার হোক সহায়
সেই তপের পুণ্য-বল।

স্নেহ-বলে শুধু কর্‌তে চাই
মোর বাছার দুঃখ দূর,
হরবে তার সব অভাব
এই হিয়ার স্বর্গপুর।

কিছু যে পেলেনা পিতৃধন,
থাকতে যার নেই গেহ,
বিত্ত তার মার আশিস,
নিত্য-নীড় মার স্নেহ।

বাছা ওরে বাছা! মোর দুলাল!
ভাবনা নেই, ভয় কি তোর,
স্বর্গ নিক্ পথ্য চাঁদ,
রত্ন নিক সব চোর।

তুমি যে পেয়েছ মাতৃকোল,—
দেবতা সব যার লোভে
জন্মাবেন এই ধরায়
ম্লান ধূলার সংকোচে।

ফিরে-ফিরে হেথা ফুটবে ফুল,
উঠবে গান নিত্য কাল,
এই ধরায় নন্দনের
মন্দারের দুইবে ডাল।

তোর দেহে দেহে দুধ-নদীর
উঠল ঢেউ লাল লোহে;
তোর পরশ ইন্দ্রজাল,
তোর হরষ মন মোহে।

ভালোবাসা সে যে দৈবী তপ,
যজ্ঞ যার দিব্য হোম,
সেই হোমের তুই পাবক—
তুই পাবন স্বর্ণ-সোম।

মায়ের পীযূষে তুই অজয়
তোর কবচ মার আশিস;
সাপ-গরুড় দেব-দানব
তোর মাঝেই ভুল্‌বে বিষ।

তোর প্রাণে সবে কর্‌বে বাস,
ঘির্‌বে তোর বক্ষ-নীড়,
সাত পাতাল তোর জানিস্,
তুই মালিক সব নিধির।

গরুড়ের মত কুণ্ঠাহীন
ফির্‌বি বৈকুণ্ঠে তুই,
পাখ্‌না নেই? প্রেম এবং
শ্রদ্ধা তোর পাখ্‌না দুই।

দানবেরা হবে স্বপ্নশেষ,
দৈত্যাসুর যুগ পরে
থাকবে তোর বিক্রমের
বিদ্রোহের অন্তরে।

দ্বাদশাদিত্যে করবে ম্লান
তোর ধ্যানের দিব্য চোখ,
ছাইবে লোক মৈত্রী তোর,
স্বর্লোকের তুই আলোক!

তপে তোরি হবে অগ্নিস্নান,
বিদ্যুতের ক্ষীণ দ্যুতি ;
সৃষ্টি তোর সৃষ্টি সার,—
সূক্ত, সাম, গান, স্তুতি।
ত্রিভুবনে হবি সব-সেরা,
সব-শেয়ের সৃষ্টি তুই,
তুই রে ধন বুক-চেরা,
মিষ্টি তুই, মিষ্টি তুই !
মায়েরি আশিসে তুই রে বীর,
তুই তাপস তপ-বিপুল,
ইন্দ্র ন'স চন্দ্র ন'স
ন'স অমর তুই অতুল।
এ মম স্নেহেরি সব ধারায়
স্নান করায়, ধন, তোমায়।
দ্যায় লেহন সব লেহায়
বৎস তোর সর্ব্ব গায়।
দিনে-দিনে বেড়ে উঠ্‌বি তুই
মোর প্রাণের পুণ্যদীপ,
এই ভূলোক ভরবি তুই,
মেল্‌বি দল স্বর্ণনীপ।
যুগে যুগে জেগে রইল মোর
তুই নয়ন আর পরাণ।
ক্লান্তি তোর করব দূর,
ঘিরব রোজ তোর শিথান।
চুপে এসে নিতি শুনব তোর
মঞ্জু গান দৃপ্ত ভাষ,
দেখ্‌ব তোর উচ্চ শির
উচ্চ প্রাণ উচ্চ আশ।
ঘ্রাণে প্রাণে পাব ওই কেশের
সৌরভের নীপ্-কেয়া,
শুনব রোজ ওই 'মা'-বোল
নাম ও মোর তোর দেওয়া !
কি নামে মা তোরে ডাক্‌বে বল্ ?—
তুই মনুর—তুই মনুজ—
কশ্যপের অংশ তুই—
দেবতাদের তুই অনুজ'।
তোরি চোখে চেয়ে দেখ্‌তে পাই
দূর ভবিষ্যের লিপি,
রক্তিমায় অঙ্গারের
অঙ্গ ছায় দীপ্‌দীপি' !
তোরি তপে হেরি এই কঠোর
কূর্ম্মপিঠ শস্যময়,
তোর হিয়ার নীড়-মাঝার
স্বর্গ রয়—বিশ্ব রয় !
বাছা ওরে বাছা ! মোর দুলাল !
মোর হিয়ার মূর্ত্ত প্রাণ,
তোর হাসির ফুল্ল ভায়
চন্দ্র ম্লান—সূর্য্য ম্লান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জ্ঞানের দিক পরিবর্ত্তন

মানুষ যখন জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাহাকে একেবারে রিক্ত হস্তে চলিতে হয় না। পূর্ব্ব-সুধীদিগের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সে তাহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লয়। কখনো কখনো এমনও হয় যে সম্মুখে প্রসারিত নূতন পথে পদক্ষেপ না করিয়া, বহুপদপীড়নে কর্দ্দমাক্ত পুরাতনের ভিতরেই যাতায়াত করিতে থাকে। অর্থাগমচেষ্টা-বিমুখ কৃপণ যেমন সঞ্চিত ধন পুনঃ পুনঃ দেখিয়া গণিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া দিনাতিপাত করে, সেও তেমন পূর্ব্বপুরুষদিগের আহৃত জ্ঞানমধ্যে আপাদমস্তক নিমগ্ন থাকিয়া তাহারই আলোচনা-আন্দোলনে তর্কসিদ্ধান্তে ব্যাপৃত থাকে। চক্ষু সে ব্যবহার করে পুরাতনের চশমার সাহায্যে, কর্ণে তাহার লাগিয়া থাকে পুরাতন সুরলহরী, সে যেন অতীতের নূতন একটি ভৌতিক সংস্করণ।

ইউরোপে একদিন এমনই অবস্থা ছিল। রণমদোন্মত্ত নাইটের বাড়ীর পার্শ্বে কুটীর বাঁধিয়া, অথবা জাঁকাল ধর্ম্মমন্দিরের নিভৃত কক্ষে সমাহিতবৎ থাকিয়া যে সকল ক্লার্ক বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদের না ছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি, না ছিল চিন্তার স্বাধীনতায় আগ্রহ। রোমক পণ্ডিতগণের অথবা কাথলিক যাজকবর্গের শ্রীমুখ-

নিঃসৃত বাক্যাবলীর আস্বাদনে এবং ব্যাখ্যানে, এবং তৎসমবায়ে বিমানচারী লূতাতন্তু বয়নে তাঁহারা ব্যস্ত থাকিতেন। বর্ত্তমান যুগের প্রথমাঙ্কে যখন গ্রীক পণ্ডিতদিগের তল্পীতল্পা উন্মুক্ত হইয়া পড়ে, তখন হইতে অনুসন্ধান-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। পরিবর্ত্তিত অনুসন্ধানের প্রকৃতি এই হইল যে লিপিবদ্ধ মন্তব্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া লোকে চোকে-কানে হাতে-হাতিয়ারে চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুসমূহের পর্য্যবেক্ষণে ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইল। এই অনুসন্ধানের ফল অচিরাৎ ফলে নাই। এই ত সেদিন অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার সম্যক্‌ফল মানবের করায়ত্ত হইয়াছে।

তখনকার জ্ঞানার্থীরা পর্য্যবেক্ষণের বলে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিলেন, তাহা মানবের অপূর্ব্ব সম্পত্তি। এই সম্পত্তি কোষাগারে স্থগিত রাখিয়াই পণ্ডিতেরা ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা আরও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে এই-সকল তত্ত্বের নিয়ামক একটি কিম্বা কয়েকটি কারণ আছে কি না, অল্পসংখ্যক কারণের চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক তত্ত্ব শ্রেণীবদ্ধ করিলে পদার্থজ্ঞান সহজ হয় কি না—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শনের সৃষ্টি হইতে পারে কি না; এবং এই-সমস্ত তত্ত্বের সহিত মানবের যে সম্পর্ক আছে তাহা অবগত হইয়া সমাজের ও জীবনের পরিবর্ত্তন করা যায় কি না। ফলে বহু বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইল, সমাজ পরিবর্ত্তিত হইল, জীবন নব আকার ধারণ করিল। আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি তাহারই ফল; সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি তাহারই ভাবীফলপ্রসূ পুষ্প; আধুনিক মনস্তত্ত্ব পরাবিদ্যা প্রভৃতির অঙ্কুরোদ্গমও তাহা হইতেই। শুধু তাহাই নহে। এত যে কলকব্জা, চিম্‌নিচাকি, আরামবিরামের পান-ভোজনের এত যে উপকরণ-উপসর্গ—তাৎকালিক তত্ত্বানুসন্ধায়ীর চেষ্টা তাহারও মূলে। এই-সকল তত্ত্ব সমাজে প্রচলিত করিতে গিয়া গতানুগতিক সম্প্রদায়ের শঙ্কিত চঞ্চলদলের যে-সকল সংঘর্ষ সংঘটিত হইল তাহার বৃহত্তমটির নাম ফরাসীবিপ্লব। এই বিপ্লবের রক্তারক্তি ধ্বস্তাধ্বস্তির দিকটায় দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া পূর্ব্ব-পর বিবেচনা করিলে, ইহাই মনে হয় যে, নবতত্ত্বান্বেষীদের—এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট প্রভৃতির—আহৃত জ্ঞানের সান্নিধ্যে পুরাতন সংকীর্ণ সমাজকে সম্প্রসারিত করিবারই প্রয়োজন ছিল,—শুধু ফরাসী দেশে নয়, শুধু এক দেশে নয়—সমস্ত ইউরোপে, সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবীতে সামাজিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ছিলই ছিল। ফরাসীবিপ্লব দ্বারা সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে—হইতেছে—এবং ভবিষ্যতে হইবে।

নবজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট সামাজিক পরিবর্ত্তনের বহু দিক, বহু ধারা। একটির উল্লেখ না করিলেই নয়। সেইটি ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যক্তিত্ব-বোধ। সেকালে এক ভীমের কিংবা এক সার্লমেনের ভ্রূকুটীতে জনসঙ্ঘ সন্ত্রস্ত হইত, এক দুর্ব্বাসার কিংবা এক পোপের মন্ত্রোচ্চারণের ভয়ে জনসমাজ আলোড়িত হইত; এখন সকলেই এক-একজন, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান, কেহই সমাজের অকিঞ্চিৎকর এরূপ কেশগুচ্ছ নহে যে তাহাকে রাখিলে চলে, ফেলিলেও চলে। এখন সকলেরই সমাজ, সমাজ সকলেরই, জ্ঞানে গুণে বিলাসে প্রতিষ্ঠায়—অধিকার সকলেরই সমান। হৃদয়ের ভিতরে ব্যক্তিত্বের গর্ব্ব, হাতের কাছে বহুক্রিয় ভবিষ্যআশাপ্রদ বিজ্ঞানযন্ত্র। উভয়ের সমবায়ে কি বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হইল! তাঁতের পরিবর্ত্তে কল, দুর্ব্বল হাতের পরিবর্ত্তে অনন্তশক্তি চক্র, পায়ের পরিবর্ত্তে বাষ্পীয় যান, আবর্জ্জনাপঙ্কিল পাড়াগাঁয়ের পরিবর্ত্তে আলোকপ্রদীপ্ত সুরম্য নগরী, স্বদেশজাত শাকান্নের হাঁড়িতে বহু দেশের ক্ষীর-সর-নবনীত কাবাব-কোপ্তা! আরও বিশেষ উন্নতি—সেকালের ম্রিয়মাণ মানুষের হৃদয়ে জলজীয়ন্ত নবনব আশা!!

সেকালের তুলনায় একাল কত সুন্দর! আরও কত সুন্দর হইত, যদি এখানেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইত! কিন্তু তাহা না হইয়া আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, ঔষধ ব্যাধি উৎপাদন করিতেছে। ব্যক্তিত্ববোধের মাত্রাধিক্যে ক্ষুরধার প্রতিযোগিতার দিনে যাহারা একটু পশ্চাতে থাকিতেছে তাহারা একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন অধিকার মানুষকে বাতুল করিয়া লালসাবিলাসের দাস করিতেছে, পশু করিয়া ফেলিতেছে। মুগ্ধকরী বর্ত্তমান সভ্যতার একটা মসিলিপ্ত দিক্ আছে। সে দিকে অনশন, ভিক্ষুকশালা, হাসপাতাল; সে দিকে অতিরিক্ত পরিশ্রম, মড়ক, মনোবিকাশের অভাব, নানা

অভিযোগ। কার্লাইল্, রস্কিন্, টেনিসন্, ডিকেন্স প্রভৃতি সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাধারণতন্ত্রানুরাগ এই দিকের মসিরেখা কিছুমাত্র বিলোপ করিতে পারে নাই। কিন্তু যাহারা সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সভ্যতার উজ্জ্বল দিকে পড়িয়াছেন, তাহাদের স্বর্গও সুখের স্বর্গ নয়। সে স্বর্গকে দেবতার অধ্যুষিত স্বর্গ না বলিয়া, আহম্মকের স্বর্গ বলা যাইতে পারে। বিলাসসামগ্রী যতই সুলভ হইতেছে, আকাঙ্ক্ষা আবার ততই প্রবল হইতেছে। তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বৃশ্চিকবৎ পশ্চাতে হুল-বিশিষ্ট, অতৃপ্তি অতীব তীব্র, দুঃখ নিত্য নূতন, আর সুখ—প্রায়শঃ কল্পিত এবং তুলনায় নগণ্য। এই যে আমি কলম দিয়া লিখিতেছি—নাঃ, এও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, আরো ভাল চাই। কেহ বা ঘর্ম্মসিক্ত ললাটে ভাবিতেছেন—আরও ভাল কলম গড়িতে হইবে। এই যে ছয়মাসের পথ দশ দিনে ঘুরিয়া আসিলাম, কিছু কিছু দেখিলাম বটে, কিন্তু আরব মিশর ভেনিস রোম ত দেখা হইল না! আরও দেশ দেখা চাই, আরও দ্রুতগমন চাই। সৌভাগ্যবান্‌দেরও মনের কথা—আরও, আরও। কত পড়িতে বাকি রহিল, আরও কত জানিবার প্রয়োজন। এই আকাঙ্ক্ষার পরিণাম কি?

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে-পর্য্যন্ত সঞ্চিত হইয়াছে, সেখানে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নয়। যিনি কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি ত স্বদল সহ জীবনব্যাপী গবেষণা করিতেছেনই, কিন্তু যিনি সেরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তিনিও একটি পাতার, পাতার একটি রেখার, রেখার একটু বিন্দুর, অথবা পতঙ্গের একটি পক্ষের পরীক্ষা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্ত্রের সাহায্যে মশকদেহ বিশ্লেষণ করিয়া এবং অতি শক্তিধর অণুবীক্ষণ দ্বারা শুঁয়াপোকার একটি শুঁয়ার নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া হয়ত জানা যাইবে যে মশকের শুঁড় ম্যালেরিয়ার বাহন এবং শুঁয়াপোকার শুঁয়া অপর কোনও ব্যাধির নিদান। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ভাবে পরীক্ষাস্রোত উদ্দাম চলিয়াছে, তাহাতে জীবনের সঙ্গে নবাহৃত জ্ঞানের সম্পর্ক তেমন থাকিতেছে না। জানিবার জন্যই যেন জানা। ইহাতে পরীক্ষকের মনে কেবলই আকাঙ্ক্ষার আঘাত লাগিতেছে। ফলতঃ এই দিকেও বাড়াবাড়ি খুবই।

সাহিত্যক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি আছে। বর্ত্তমান সাহিত্যে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—উপন্যাস ও সংবাদপত্র। উপন্যাস বহুবিস্তৃত এবং বহুশাখ। ডিকেন্সের অনেক উপন্যাসে অত্যধিক চরিত্রের সংঘর্ষ ও অত্যধিক ঘটনার সমাবেশ। থ্যাকারের উপন্যাস বক্তৃতা-বহুল। উপন্যাসে কেহ বা মনস্তত্ত্ব, কেহ বা প্রত্যক্ষবাদ, কেহ বা ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। কেহ কেহ বা খ-পুষ্প ও শশবিষাণের অনৈসর্গিক সমাবেশে লালসাপ্রবণ মানবমনকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিতেছেন। পূর্ব্বে ওথেলো কিম্বা লীয়রে একএকটি ভাবের পরিপুষ্টি দেখানো হইত—তাহাও আভাসে ইঙ্গিতে। অধুনা কেহ কেহ বহু ভাব একত্র করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট খিচুড়ি রাঁধিতেছেন—পাঠককে অবাক্ করিবার জন্য। উপন্যাস-পাঠেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৃপ্তির পরিবর্ত্তে পাঠকের মনে কেবল ইহাই হইতেছে যে, আরও কতকগুলি উপন্যাস পড়িতে হইবে, এই ধরণের আরও উপন্যাসের প্রয়োজন। কোনও গ্রন্থই যেন পাঠককে সাহিত্যরসে বিভোর করিয়া শান্তি দিতে পারিতেছে না। এ-যুগের ও সে-যুগের যে-সকল গ্রন্থ বাস্তবিকই শান্তিরসে রসাল, বর্ত্তমানের বাজে গ্রন্থের প্রলোভনে তাহাতেও পাঠক নিবিষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। সংবাদপত্রেও বাজে প্রসঙ্গের দৌরাত্ম্য বেশী, এবং বাজের দিকেই পাঠকেরও অনুরাগ খুব বেশী। সমালোচনা ও ব্যাখ্যা বর্ত্তমান সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ বিশেষ উপকারী। কিন্তু এই জাতীয় বহু গ্রন্থের আস্পর্দ্ধা এত বেশী যে মূলগ্রন্থের প্রকৃত সৌন্দর্য্য পাঠকের চক্ষে না পড়িয়া ব্যাখ্যাকারকের বাহাদুরীটাই পাঠককে মুগ্ধ করিয়া রাখে।

বর্ত্তমানে মানুষ নানান দিকে ছুটাছুটি করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে। কেন যে ছুটিতেছে তাহা যেন মনে নাই, ছুটিয়া কোথায় যাইতেছে তাহা যেন দেখিবার অবসর নাই। বিবেচক যাঁহারা তাঁহারা শঙ্কিত হইতেছেন; ভাবিতেছেন, এত বাতুলতা কেন? ভাবিতেছেন, এত করিয়াও দুঃখের নিবৃত্তি হইল কই?

এই প্রশ্ন আজ নূতন উঠে নাই। একদিন উপনিষদের ঋষির মনেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তিনি তাহার কার্য্যোপযোগী উত্তরও পাইয়াছিলেন। ঋষি পার্থিব বিলাসসামগ্রী হইতে দূরে থাকিয়াও ধ্যাননেত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে পার্থিবসম্ভোগে দুঃখের অবসান না হইয়া ঘৃতসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় বর্দ্ধিতই হয়। সেইজন্যই মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-প্রদত্ত বিত্তসম্পত্তি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তখনকার ব্রাহ্মণ পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা প্রভৃতিতে আগ্রহান্বিত হইতেন না। ঋষি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, জগতের সমস্ত বিষয়ের একটিমাত্র মূল কারণ আছে, তাহা জানিতে পারিলে অজ্ঞাত বিষয়ও জানিতে পারা যায়, জগতের সমস্ত বস্তুই জানা হইয়া যায়। ঋষি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন ব্রহ্ম বা আত্মা। "যেমন একটি মাটীর ডেলা জানিতে পারিলে সমস্ত মৃত্তিকার ধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়, তেমনই সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্তই জানা যায়।" "লবণ জলে গুলিলে যেমন সমস্তটুকু জলেই লবণের স্বাদ পাওয়া যায়, ব্রহ্মসত্তাও তেমনই সমস্ত বস্তুতে আছে।" ইহা জানিতে পারিলে পরস্পর-বিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যেও সাম্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা জানিতে পারিলে গীতার "অবিভক্তং বিভক্তেষু" যে কি তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ লোকে পৃথক পৃথক পদার্থের মূল ঐক্য না পাইয়া মৃত্যুর পথে চলিতে থাকে। তত্ত্বদর্শী গীতার "চলতি চক্রকেই" একমাত্র দর্শনীয় মনে না করিয়া স্থির কীলকের সন্ধান করিতে থাকেন। এই জ্ঞান উপলব্ধি করিতে হয়, শুনিয়া ইহা বুঝা যায় না। উপকোশল যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিবারও উপযুক্ত মনে করেন নাই। সাধারণের পরিজ্ঞাত বিষয় হইতে এই তত্ত্ব এরূপ পৃথক যে সাধারণের ভাষায় ভাবে ইহা ব্যক্ত করা একরূপ অসম্ভব। এই জ্ঞানের বক্তারা প্রায়শঃ উপমার আশ্রয় লইয়া থাকেন।

ঋষির আবিষ্কৃত এই জ্ঞান ভারতবর্ষে আবদ্ধ থাকে নাই। প্লেটো, প্লটিনাস, পরফিরি, পিথাগোরাস ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়া ইউরোপে প্রচার করেন। তদবধি ভারতে ও ইউরোপে বহু ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইউরোপের সভ্যতা আধুনিক এবং তাহার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। বলিয়া এই শ্রেণীস্থ মহাজ্ঞানীর সংখ্যা ইউরোপে অপেক্ষাকৃত কম। জার্ম্মেনীর বীয়ম বা বীমেন এবং সুইডেনের সুইডেনবর্গ এই তত্ত্বের আস্বাদন করাইয়া বহু লোককে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই জ্ঞানের আভাস পাইয়াছিলেন। 'কর্ত্তব্য', 'অমরত্ব', 'টিনটার্ণ' প্রভৃতি কবিতা তাহার সাক্ষ্যস্থল। ব্লেক্ কল্পনাবলে ইহা জানিয়াছিলেন। ব্রাউনিং এবং কিছুদিন পরে বিবি ব্রাউনিং এই জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া কিছু পরিমাণে শোকদুঃখের অতীত হইয়াছিলেন। একবিংশতি দিবসের কঠোর সাধনার পর কার্লাইল এই জ্ঞান লাভ করিয়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই জ্ঞানের অল্পাধিক আভাস অনেকেই জীবনে অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন খুব কম লোকে। চেষ্টা করিয়া যাঁহারা সফল হন, তাঁহাদের সংখ্যা আরও কম। অনেকে ইহা শুনিয়াও শুনেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না; অনেকে ইহা আশ্চর্য্যবৎ মনে করেন। টেনিসনের কবিতাতে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের ভাষার প্রতিধ্বনি পাইয়া লোকে উন্মত্ত হইয়া বলিতেছিলেন, ইনিই এ যুগের ব্যাস। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ব্রাউনিং যে এই মহাতত্ত্বের আভাস দিতেছিলেন, তাহা বুঝিবারও তেমন চেষ্টা হয় নাই। টেনিসন্ বর্ত্তমান সমাজের মসিলিপ্ত দিক্ অবলোকন করিয়া যখন সড়ে নানাছন্দে বিনাইয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন, ব্রাউনিং তখন "দ্বন্দ্বাতীত নিঃসংশয় ভাবে" পূর্ণ হইয়া, "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" গাহিতেছিলেন,

"স্বর্গধামে সুরপতি;
জগৎ মঙ্গলময়।"

তখন তাহার কথায় লোকে কর্ণপাত করে নাই। এই জ্ঞানের পরিচয় দিয়া প্যাটমোর একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। গস শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু মানবসমাজ এইরূপ গ্রন্থ বুঝিতে তখনও সক্ষম নয় বিবেচনায় গ্রন্থকার তাহা প্রচারিত না করিয়া অগ্নিদগ্ধ করেন।

সাধারণ লোকে এখনও ইহা বুঝিতে পারে না, এবং

চায় না। কিন্তু ইউরোপের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্ত্তমান অবস্থা বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া এই ভাবটি ধারণ করিতে এবং প্রচার করিতে ব্যস্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে জ্ঞানের দিক্‌টা উল্টাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। তাঁহাদের মতে এখন আবার সেই প্রয়োজন উপস্থিত। পদার্থের খণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে লোক যে একেবারেই নিরাপদ নয়, বর্ত্তমান সমর তাহাই বুঝাইতেছে। তাই সেই আর্যজ্ঞানের কথা উঠিয়াছে, ব্রাউনিংএর আদর বাড়িয়াছে। ইয়েটস্‌-প্রমুখ বর্ত্তমান কবিরা এই তত্ত্ব দর্শনের জন্য চেষ্টাপরায়ণ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিও এই ভাবের দ্যোতক। গীতাঞ্জলির ইউরোপীয় সুখ্যাতিতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে পৃথিবী এই মহাতত্ত্ব আবার পাইতে চায়।

গীতাঞ্জলির কবি সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান যুগের লোক। তিনি সংসারত্যাগী তিব্বতীয় লামাসন্ন্যাসী নহেন। তিনি "কর্ম্মাণামারম্ভের দ্বারাই নৈষ্কর্ম্ম্য" লাভ করিতে চান। স্বদেশের মঙ্গল, জগতের হিত, তাঁহার কাম্য। কিন্তু বর্ত্তমান সাধনাকে তিনি দিব্যভাবে মধুর করিতে চান মহাতত্ত্বের দ্বারা। জগতের গতিশীল পদার্থমাত্রকেই আবার ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া তাঁহার প্রয়াস। তাঁহার পথে চলিলে কর্ম্মী "কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে" এবং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা হইতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তিনি ভগবান্‌কে খুঁজিতেছেন কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে—

"সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের মাঝে।"

তিনি তাঁহাকে দেখিতে চান সহযোগীদের সাথে। এই সাংসারিক সন্ন্যাসীর সাধনা অতি কঠোর। সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এমন কথা তিনি বলেন না, স্বীয় বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিয়াছেন এ ভরসাও তিনি রাখেন না। কিন্তু তিনি যাহা বলেন তাহা সমস্তই প্রাণস্পর্শী, কারণ তাহা অনুভবের কথা, একটিও সাজানো কথা নয়।

"জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি।"

এবং এইরূপ আরও কতরূপ কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা কানে লাগিয়া উড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাণ পাই নাই; কিন্তু এই সাধকের অস্পষ্ট কথাতেও প্রাণস্পন্দন পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই জ্ঞান উপলব্ধির বিষয়, শুধু শুনিবার বিষয় নয়। যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি মহাত্মা কবীরের ন্যায় বলিতে পারেন, ভগবান্‌ "সব শ্বাসোঁ কো শ্বাসোঁ মে" আছেন, অথবা তিনি মহাজ্ঞানী ব্লেকের ন্যায় দেখিতে পান,

"ক্ষুদ্র বালুকণা মাঝে পৃথিবী প্রকাণ্ড,
ঝরা বনফুলদলে স্বর্গ সুবিশাল,
হস্তমুষ্টি মাঝে তাঁর অনাদি-অনন্ত,
এক মুহূর্ত্তের গর্ভে সুপ্ত সর্ব্বকাল।"

উপলব্ধি করিতে না পারিলে সাদা কথায় বলিলেও ইহা অতি কঠিন, অতি অস্পষ্ট রহিয়া যায়। "চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি" প্রভৃতি কথা অতি সহজ—শুনিতে, কিন্তু অনুভব করিতে নয়। আবার, অনুভব করিতে পারিলে,

"এবার কালী তোমায় খাব,"

এবং এইরূপ অন্যান্য উক্তিও সহজ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব কবিদিগের "বিরহ," "অভিসার" প্রভৃতি শব্দ এবং রবীন্দ্রনাথের "তরী-বাওয়া" "একাপথিক" প্রভৃতি ভাবও অনুভব করিয়া বুঝিতে হয়। গেটে বলিয়াছিলেন, "রোম অতি সুন্দর স্থান বটে, কিন্তু আসিবার কালে রোমে যাহা লইয়া আসিবে, রোম হইতে তদতিরিক্ত কিছুই লইয়া যাইতে পারিবে না।" এই জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই, যাহা অনুভব করিতে পারিবে, তদতিরিক্ত কিছুই বুঝিতে পারিবে না। বর্ত্তমান শিক্ষায় অনুভবশক্তির অনুশীলন ততদূর হয় না। বর্ত্তমানে ইনটুইসন্‌ বা সহ-জ জ্ঞান নামে যে একটা নূতন শব্দ, অথবা পুরাতন আপ্তজ্ঞান শব্দের যে একটা নূতন প্রতিশব্দ শোনা যাইতেছে, তাহার সাহায্য লইতে পারিলে, অনুভব সহজ হইতে পারে। অনুভবের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি না, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ পণ্ডিতেরা আবার উৎসুক হইবেন কি না, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এই জ্ঞানের বহুলপ্রচারের পূর্ব্বে প্রতিযোগিতার ঝটিকা প্রবলতর হইয়া ভয়ঙ্কর যুগপ্রলয় উপস্থিত হইতেও বা পারে। "যোগাতমেব প্রতিষ্ঠা" প্রভৃতি একদেশদর্শী আংশিক অর্দ্ধসত্যে যতদূর অনিষ্ট হইতে পারে, হয়ত তাহা এখনও পূর্ণ মাত্রায় হয় নাই। এখন ভগবান্‌, তোমার ইচ্ছা!

শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন।

নিরুদ্দেশ

ঐ যেখানে শিরীষ-গাছে
ঝুরু-ঝুরু কচি পাতার নাচে
ঘাসের পরে ছায়াখানি কাঁপায় থরথর
ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর—
ঐখানে মোর পোষা হরিণ চর্‌ত আপন মনে
হেনা-বেড়ার কোণে
শীতের রোদে সারা সকালবেলা।
তারি সঙ্গে করত খেলা
পাহাড় থেকে-আনা
ঘন রাঙা রোঁয়ায় ঢাকা একটি কুকুরছানা।
যেন তারা দুই বিদেশের দুটি ছেলে
মিলেছে এক পাঠশালাতে, একসাথে তাই বেড়ায় হেসে খেলে।
হাটের দিনে পথের কত লোকে
বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেত, দেখ্‌ত অবাক্ চোখে।

ফাগুন মাসে জাগ্‌ল পাগল দখিন হাওয়া
শিউরে ওঠে আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙীন-চিঠি পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হল সুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগ্‌ল কাঁপন দুরুদুরু।
হরিণ যে কার উদাস করা বাণী
হঠাৎ কখন্ শুন্‌তে পেলে আমরা তা কি জানি।
তাই সে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে,
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে
চম্‌কে দাঁড়ায় বেঁকে।

একদা এক বিকাল বেলায়
আমলকি বন আঁধার যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুট্‌ল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে।
সম্মুখে তার জীবনমরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।

ভেবেছিলেম আঁধার হলে পরে
ফিরবে ঘরে
চেনা হাতের আদর পাবার তরে।
কুকুরছানা বারে বারে এসে
কাছে ঘেঁসে ঘেঁসে
কেঁদে-কেঁদে চোখের চাওয়ায় শুধায় জনে-জনে,
"কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দেখি অঙ্গনে?"
আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তার সাথী।
আঁধার হল, জ্বল্‌ল ঘরে বাতি;
উঠ্‌ল তারা; মাঠে-মাঠে নাম্‌ল নীরব রাতি।
আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে,
"নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে?"
কেন যে তা সেই কি জানে? গেছে সে যার ডাকে
কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে।
আকাশ হতে, আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এলো!
বুকে যে তার বাজ্‌ল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন-দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তারেই অন্বেষণ
জন্ম হতে আছে যেন মর্ম্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল চপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই ত তাহার চেনাশোনার খেলাধূলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তারে ডাক দিয়েচে কেঁদে,
আলোক তারে রাখ্‌ল না আর বেঁধে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অস্পৃশ্যতা নিবারণের মন্ত্রণা-সভা।

পুরাকালে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন কোন দেশেও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য আচরণীয়-অনাচরণীয়ের বিচার ছিল। ইহুদীদের দেশে সামারিটানরা অনাচরণীয় বিবেচিত হইত। তা ছাড়া, তাহাদের মধ্যে কিয়ৎকালের বা দীর্ঘকালের জন্য কেহ কেহ অশুচি বিবেচিত হইত। এই অশুচিতার মাত্রা-ভেদ ছিল। আমাদের দেশেও কাহারও বাড়ীতে কোন আত্মীয় মরিলে অপর-সকলের অশৌচ হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষৌর কর্ম্ম করাইবার পর স্নান না করা পর্য্যন্ত অশুচি থাকেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণরা ইংরেজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর বাড়ী আসিয়া স্নান করিতেন।

১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জাপানের হীনিন্ বা এতা জাতির লোকেরা অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বিবেচিত হইত। হীন্-ইন্ কথাটির মানে অ-মানব। অর্থাৎ এতারা মানুষ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এইজন্য আদমসুমারী বা লোকসংখ্যা-গণনায় তাহাদিগকে ধরা হইত না। তাহারা গ্রামের মধ্যে বাস করিতে পাইত না। উচ্চতর ও উচ্চতম শ্রেণীর লোকেরা যে-সব কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত, এতাদের তাহা করিবার অধিকার ছিল না।

১৮৬৮-৭১ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে নবযুগের প্রারম্ভ হয়, তাহাতে কেবল রাজনৈতিক সংস্কারই সাধিত হয় নাই। সামাজিক সংস্কার এবং বার্ত্তিক (economic and professional) সংস্কারও সাধিত হইয়াছিল। উচ্চতম শ্রেণীর লোকেরা স্বদেশের কল্যাণার্থ স্বেচ্ছায় নিজ নিজ বিশেষ অধিকার-সকল ত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় অন্য সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সমশ্রেণীস্থ হইয়াছিলেন। দেশের ভূস্বামী দাইম্যোরা রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে কেবল অভিজাতশ্রেণীভুক্ত হইয়া জাপানের পার্লেমেণ্টের অভিজাতসভার সভ্যত্ব ভিন্ন আর কিছু বিশেষ অধিকার পান নাই। জাপানের ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধাজাতির নাম ছিল সামুরাই। তাহারা পুরুষানুক্রমে বৃত্তিভোগী ছিল। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন কাজ তাহাদিগকে করিতে হইত না। তরবারি ধারণ ও ব্যবহারের অধিকার তাহাদেরই ছিল। কেহ তাহাদিগকে অপমান করিয়াছে মনে করিলে তাহারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিতে পারিত। তাহাতে "না" বলিবার, বাধা দেওয়ার, ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কেহ তাহাদিগকে গেরেফ্‌তার করিতে পারিত না, বা যাহাকে তাহারা আক্রমণ করিত তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত না। এই সব অধিকার তাহারা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিল, এবং সকল-রকমের কাজ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

গত মাসে বোম্বাই শহরে হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ জাতি-সকলের "অস্পৃশ্যতা" নিবারণ করিবার জন্য যে সভা হয়, তাহার সভাপতিরূপে বড়োদার মহারাজা শ্রীসয়াজী রাও গায়কবাড় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অনেক কথা তিনি বলেন। জাপানের সম্রাট্ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যে অনুশাসন দ্বারা হীনিন বা এতা-দিগের "অস্পৃশ্যতা" দূর করেন, মহারাজা তাহার নিম্নলিখিত ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করেন:—

"The designations of Eta and Hin-in are abolished. Those who bore them are to be added to the general registers of the population, and their social position and methods of gaining a livelihood are to be identical with the rest of the people."

"এতা এবং হীনিন নাম উঠাইয়া দেওয়া হইল। যাহারা ঐ নামে অভিহিত হইত, তাহারা দেশের সমুদয় অধিবাসীদের রেজিষ্টরীভুক্ত হইবে, এবং তাহাদের সামাজিক পদমর্য্যাদা এবং জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ঠিক্ অন্যান্য অধিবাসীদের মত হইবে।"

জাপানে যে সামাজিক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা স্তর নাই, তাহা নয়। স্তর আছে, কিন্তু সেগুলির সম্বন্ধে গায়কবাড় বলেন:—

"But these are classes, not castes, and the humblest citizen can and does rise through these fluid social strata to the highest position in the business, professional and public services, contingent upon his personal abilities alone. The social system is as flexible as that of England and America. Is there any reasonable doubt that this social polity is in large measure responsible for that abounding energy and zeal which enabled Japan, in two generations, to rise from obscurity to so large a measure of economic and political importance in the family of nations?"

গায়কবাড় মহোদয় বলেন, জাপানে যে সামাজিক স্তর আছে, তাহা জা'ত নহে, শ্রেণী মাত্র, সেখানে খুব

সামান্য অবস্থার লোকও কেবল নিজের যোগ্যতার জোরে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে এবং পৌঁছে। তাঁহার মতে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে এই-প্রকার সামাজিক নীতির জন্যই জাপানীদের সেই প্রচুর কার্য্যশক্তি ও উৎসাহ জন্মিয়াছে যাহার জোরে জাপান দুইপুরুষের মধ্যেই অজ্ঞাত অবিখ্যাত অবস্থা হইতে জাতিসমাজে এরূপ মান্যগণ্য হইয়া উঠিয়াছে।

এখন একমাত্র ভারতবর্ষেই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচার আছে। ইহা যে আমাদের জাতীয় ঐক্য ও শক্তিলাভের একটা প্রধান বাধা তাহাতে সন্দেহ কি। ভারতবর্ষের ৩১ কোটি লোকের মধ্যে ৫ কোটি অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়! এ অবস্থায় জাতিটা যে শক্তিহীন থাকিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কিন্তু আমরা যে রাষ্ট্রীয় অধিকার বা শক্তিলাভের জন্যই অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চাহিতেছি, তাহা নয়। আমরা যদি স্বাধীন এবং শক্তিশালী জাতি হইতাম, তাহা হইলেও মনুষ্যত্বের এই অপমান, ধর্ম্মের এই বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করিতাম না। জাতিটা প্রবল হউক বা না হউক, "অস্পৃশ্য" মানুষেরাও মানুষ; তাহাদেরও আত্মা আছে। তাহাদের অবস্থা সকল বিষয়ে ঠিক্ অন্য মানুষদের মত হওয়া উচিত। তাহারা ছোট থাকায় আমরাও ছোট হইয়া আছি। যাহার কোনরূপ বিশেষ অধিকার বা প্রভুত্ব থাকে, তাহার মনুষ্যত্ব কম হইয়া যায়; যে গোলাম বা অনুগ্রহজীবী থাকে, তাহারও মানবত্ব হ্রাস পায়। সহচর ও সমান যে সে-ই মানুষ হইবার পূর্ণ-সুযোগ নিজে পায় এবং অপরকেও দিতে পারে।

জাপানে সম্রাটের আদেশে অস্পৃশ্যতা দূর হইয়াছে। ভারতবর্ষে কাহারও এরূপ কোন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক শক্তি নাই, যাহার জোরে এত সহজে একদিনেই কোটি কোটি লোকের অস্পৃশ্যতা দূর হইতে পারে। এখানে আমাদিগকে শিক্ষার ও হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ইহাতে ফল বিলম্বে ফলিবে বটে, কিন্তু ফল যে নিশ্চয় ফলিবে সে বিষয়ে গায়কবাড়ের কোন সন্দেহ নাই, আমাদেরও নাই। তিনি বলেন:—

"The vitality of the Hindu people is so great and their devotion to ideals so tenacious, that I for one have no doubt of the ultimate outcome."

"হিন্দুজাতির জীবনীশক্তি এত বেশী এবং তাহারা এরূপ দৃঢ়তার সহিত আদর্শ ধরিয়া থাকে, যে, শেষ ফল সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

কিন্তু এই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আমরা যে যেদিকে যেমন ভাবে পারি, আমাদিগকে অস্পৃশ্যতা ভাঙ্গিতে হইবে। অলস ও ভীরু লোকেরা "সময়ে"র উপর নির্ভর করিতে ভাল বাসে। কিন্তু "সময়" নামক ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট স্বতন্ত্র কোন একটা ব্যক্তি নাই। মানুষে যে-সব চেষ্টা করে, কালক্রমে তাহারই ফল ফলে। তখন বিজ্ঞতাভিমানী লোকেরা "ধৈর্য্যহীন" সংস্কারকদিগকে উপহাস করিয়া বলে, "তোমরা অসময়ে যাহা করিবার বিফল চেষ্টা করিয়াছিলে, সময়ে তাহা আপনা-আপনিই হইল।" এই মূর্খেরা জানে না যে বিলম্বে যে ফল ফলিল, তাহা সংস্কারকদেরই চেষ্টার ফল, "সময়" নামক কোন স্বতন্ত্র পুরুষের কাজ নহে।

গায়কবাড় শাস্ত্র হইতে দেখান যে অস্পৃশ্যতা হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত নহে। তিনি ইতিহাস হইতেও দেখান যে যখন মহারাষ্ট্রীয় জাতি স্বাধীন ছিল, তখন তাহাদের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অনাচরণীয়তার বিচার করা হইত না। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের নানা "অস্পৃশ্য" জাতি হইতে উদ্ভূত অনেক পবিত্রচেতা ধর্ম্মোপদেষ্টার নাম করেন। "প্রবাসী"র এই সংখ্যায় দাদূ-নামক যে মহাত্মার অনেক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি মুচি ছিলেন। তাঁহার পদাবলীতে দার্শনিক তত্ত্ব ও ভাবের গভীরতার কি আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখা যায়।

গায়কবাড় ঐতিহাসিক মত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে জনসাধারণের অনেককে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে কি প্রকারে জাতীয় অধঃপতন ঘটে। প্রাচীন মিশর গ্রীস ও রোমের অধঃপতনের অন্যতম কারণ দাসত্ব প্রথা। এই প্রথা কোন কোন বিষয়ে আমাদের জাতিভেদ-প্রথার মত, কোন কোন বিষয়ে জাতিভেদ-প্রথা অপেক্ষা অতিশয় নিকৃষ্ট, আবার কোন কোন বিষয়ে জাতিভেদ-প্রথা অস্পৃশ্য জাতিদিগকে দাসদের অপেক্ষাও হীন করিয়া রাখিয়াছে। মিশর রোম ও গ্রীসের লোকেরা দাসদিগকে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় মনে করিত না, তাহাদের রান্না খাইত।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মুসলমানদের দাসদের অবস্থা "অস্পৃশ্য" জাতিদের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে ভাল ছিল। তাহাদের জল ও রান্না ত খাওয়াই হইত, তাহারা অনেকে মন্ত্রী সেনাপতি সম্রাট পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টিয়ান জাতিরা যতদিন নিগ্রো ক্রীতদাস রাখিত, ততদিন তাহাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত এবং কখন কখন তাহাদিগকে মারিয়াও ফেলিত বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ছুঁইলে অশুচি হইত না, তাহাদের জল ও রান্না খাইত। ভারতবর্ষের উত্তর অংশে অস্পৃশ্যতার প্রকোপ দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা কম হইলেও এখনও অনেকটা আছে; যতটা কমিয়াছে, তাহার জন্য মুসলমান-প্রভাবের প্রশংসা করিতে হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নানা অংশে অস্পৃশ্যতা এরূপ আকারে আছে, যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। অনেক জাতির জল পান করা বা তাহাদিগকে ছোঁয়া দূরে থাক্, তাহারা কে কত হাত দূর হইতে ব্রাহ্মণ-আদি "স্পৃশ্য" জাতিকে অশুচি করিতে পারে, তাহা দেশাচার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। অনেক জাতিকে সাধারণ রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, অনেককে ভিক্ষা করিবার জন্য গৃহস্থের বাড়ীর নিকটে আসিতে দেওয়া হয় না, অনেককে ছুঁইলে দেখিলে বা তাহাদের নাম উচ্চারণ করিলে অশুচি হইতে হয়। অনেক জাতি দেশাচার অনুসারে দূর হইতে চীৎকার করিতে করিতে আসিতে বাধ্য; কারণ, তাহা না হইলে যদি তাহাদের ছায়া গায়ে পড়িয়া কোন ব্রাহ্মণকে অপবিত্র করিয়া ফেলে! অনেক জাতি দেশ-প্রচলিত রীতি অনুসারে গলায় মাটীর ভাঁড় ঝুলাইয়া বেড়াইতে এবং প্রয়োজন-মত তাহাতেই থুথু ফেলিতে বাধ্য; কারণ তাহা না হইলে যে ব্রাহ্মণের ব্যবহার্য্য রাস্তা তাহাদের নিষ্ঠীবন আদি দ্বারা অপবিত্র হইবে! এইরূপ প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণেতর লোক যে ব্রাহ্মণদিগকে ইংরেজদের মধ্যে অত্যাচারী লোকদিগের চেয়েও বেশী বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, এবং এইজন্য হোমরূল বা স্বরাজ চায় না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ তাহাদের এই ভ্রান্তধারণা জন্মিয়াছে যে মান্দ্রাজ অঞ্চলে হোমরূলের মানে হইবে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব।

গায়কবাড় ঠিকই বলিয়াছেন, যে, Those who seek equity must do equity, যাহারা ন্যায্য ব্যবহার চায় তাহাদিগকে ন্যায্য ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেরূপ সমান অধিকার চাহিতেছি, সামাজিক ব্যবস্থায়ও তেমনি সমান অধিকার দিতে হইবে।

তিনি বলেন, "আমি এ আশা করিতেছি না যে আমার স্বদেশবাসীরা সব জাতির সহিত খাওয়া-দাওয়া করিবেন বা বৈবাহিক আদান-প্রদান করিবেন। আমি কেবল এই চাই যে তাঁহারা বহুকোটি লোকের অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক মোচন করিবেন।"

বোম্বাইয়ের সভায় শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দুও যোগ দিয়াছিলেন। তিনি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, এবং বলেন যে সভার উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি বলেন, হিন্দু-শাস্ত্র অস্পৃশ্যতার সমর্থক নহে। মন্বাদিতে যে ইহার অনুকূল ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

যে যে কারণে কতকগুলি জাতি অস্পৃশ্য বিবেচিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করা যায় না; এবং তাহা করিবার মত ইতিহাস-জ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু অস্পৃশ্যতা যে যে কারণেই আরোপিত হইয়া থাক্, উহা যে অত্যন্ত গর্হিত, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর ব্যবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। গরু ছাগল ভেড়া বিড়াল মাছি মশা ইঁদুর বাঁদর সব স্পৃশ্য, আর কতকগুলি মানুষ অস্পৃশ্য, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের অপমানকর ব্যবস্থা কি হইতে পারে? কতকগুলি জাতিকে অসভ্য, অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্র, কৃষ্ণবর্ণ, কদাকার বা অপরিষ্কার বলিয়া অস্পৃশ্য মনে করা যায় না; কারণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেও এইরূপ মানুষ আছে; তাহারা ত অস্পৃশ্য নহে? অপরিষ্কার বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংস্পর্শ সান্নিধ্য-আদি বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা ও ব্যাধিগ্রস্ততা জাতিগত নহে। মানুষটি যে জাতিরই হউক, সে যদি পরিষ্কার হয়, এবং সুস্থ হয়, তাহা হইলে তাহার স্পর্শ ও সান্নিধ্য পরিহার করিবার কারণ নাই। অন্যদিকে অপরিষ্কার বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণেরও স্পর্শ ও সান্নিধ্য অবাঞ্ছনীয়। অনেকে মনে করেন, পূর্ব্বজন্মের

পাতকের ফলে মানুষ "নীচ"কুলে জন্মিয়া অস্পৃশ্য হয়। পূর্ব্বজন্মে কে কি করিয়াছেন জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে যোগবাশিষ্ঠাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের কুফল বর্ত্তমানজন্মের পৌরুষ দ্বারা নাশ করা যায় এবং নাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য, এইরূপ বচন রহিয়াছে। চৈত্রের প্রবাসীতে আমরা ঐ গ্রন্থের মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণের চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম ও নবম সর্গ হইতে ঐ প্রকার অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তাহার মধ্যে কয়েকটি আবার উদ্ধৃত করিতেছি।

'হে রঘুনন্দন, ইহ সংসারে যথাযোগ্যরূপে পুরুষার্থ প্রযোগ করিলেই সকলে সকল বিষয় সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৈব ত মন্দমতি মূঢ়গণের কল্পিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা অলীক। প্রাক্তন বর্ত্তমান পুরুষকার দ্বারা ধ্বংস করা যায়। সদাচার এবং শাস্ত্র সমন্বিত উদ্যোগী যত্নশীল পুরুষগণ কত শত সুমেরুকেও চূর্ণ করিতে পারে, প্রাক্তনের কথা ত অতি সামান্য।"

"পূর্ব্বকৃত অসৎকর্ম্ম যেমন সৎকর্ম্ম দ্বারা শুভে পরিণত করা যায়, প্রাক্তন কর্ম্মও সেইরূপ করা যাইতে পারে।"

"যাহারা দৈবপরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে, সেই আত্মবিদ্বেষ্টাগণ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিতয়ের নাশ করিয়া থাকে।............যাহারা অল্পবুদ্ধি, দুঃখের সময় রোদন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিত্তই দৈব শব্দের ব্যবহার। হে রঘুনাথ, এ জগতে পুরুষকারই ইষ্টসিদ্ধির কারণ; হে সুভগ, এখানে চিরকাল অশঙ্ক ভাবে সেইরূপ যত্ন কর, যাহাতে পাদপ সরীসৃপ প্রভৃতির দশা প্রাপ্ত হইতে না হয়।"

আমাদের দেশের পাঁচকোটি লোককে আমরা "পাদপ সরীসৃপ প্রভৃতির দশা" অপেক্ষাও হীন অবস্থায় রাখিয়াছি। তাহারা যাহাতে "চিরকাল অশঙ্ক ভাবে সেই যত্ন" করিতে পারে যদ্দ্বারা মানুষের দশা পাইতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?

ধরিয়া লওয়া যাক্ যে পূর্ব্বজন্মের কুকর্ম্মের জন্য মানুষ ইহজন্মে অস্পৃশ্য হয়। এই অনুমানের ফলস্বরূপ আরও কি কি অনুমান করিতে হয় দেখা যাক্। পূর্ব্বে জাপানে কতকগুলি লোক অস্পৃশ্য বিবেচিত হইত, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে কেহ হয় না। তাহার মানে কি এই যে ১৮৭১ সাল হইতে জাপানের আর কেহই কুকার্য্য করিতেছে না, সুতরাং মরিয়া আবার অস্পৃশ্য হইয়াও জন্মিতেছে না? আমরা কিন্তু জানি যে সমস্ত জাপানী জাতিটা সাধুপ্রকৃতি হইয়া যায় নাই। ইউরোপে কোন অস্পৃশ্য জাতি নাই। তাহা হইলে কি এই অনুমান করিতে হইবে যে সেখানকার লোক বহু বহু শতাব্দী হইতে এরূপ পুণ্যাত্মা হইয়াছে, যে, তাহাদিগকে আমার জন্মগ্রহণ করিয়া অস্পৃশ্যতার অপমান ও দুঃখ সহিতে হয় না? কিন্তু ইউরোপের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসে ত তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া ভ্রম হইবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। আর একটা সিদ্ধান্ত এই করা যাইতে পারে, যে, পূর্ব্বজন্ম পুনর্জ্জন্ম কেবল হিন্দুদেরই আছে, আর কাহারও নাই; কিন্তু এরূপ মনে করিবারও ত কোন কারণ দেখিতেছি না। আরও একটা সিদ্ধান্ত এই হইতে পারে, যে, ইউরোপ জাপান প্রভৃতি অহিন্দু পাষণ্ড দেশের লোকেরা, মানুষের পূর্ব্বজন্ম-কৃত পাপের বিধি-নির্দ্দিষ্ট শাস্তি অস্পৃশ্যতা উঠাইয়া দেওয়ায়, বিধাতা পূর্ব্বজন্মের মত পাপীকে ভারতবর্ষেই এবং হিন্দুসমাজেই (কেন না, মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির মধ্যে অস্পৃশ্যতার বিশ্বাস নাই) জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে বিধাতা সমস্ত পৃথিবীর পূর্ব্বজন্মের সমস্ত অপরাধীর আণ্ডামানে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার আমরা কোনই কারণ দেখিতেছি না। আমাদের বিশ্বাস এই, যে, অস্পৃশ্যতা মানুষের কল্পনা- বা অভিসন্ধি-প্রসূত একটা ধারণা মাত্র, এখন প্রবল কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। বিধাতা উহার স্রষ্টা নহেন। উহা মানুষের সৃষ্টি, সুতরাং মানুষই সহজে উহাকে বিনষ্ট করিতে পারে। জাপানে মানুষেই উহাকে নষ্ট করিয়া সমস্ত জাতিকে মানুষ করিয়াছে; ভারতবর্ষেও আমরা উহা বিনষ্ট করিয়া সকল মানুষকে মানুষ হইবার সুযোগ করিয়া দিতে পারি। সুযোগ ও শিক্ষা পাইলে সমুদয় "অস্পৃশ্য" জাতি নিশ্চয় সব বিষয়ে অন্য সব জাতির সমকক্ষ হইতে পারিবে।

একটা কাল্পনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি বোধ হয় প্রথমে থিয়সফিষ্টরা এদেশে অস্পৃশ্যতার সমর্থনার্থ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে গায়কবাড় বলেন, "there is no scientific justification for the doctrine of *aura* according to which the mere proximity of an untouchable is supposed to impart pollution.;" "অস্পৃশ্যদের শরীরের 'অরা' নামক অদৃশ্য বাষ্পমণ্ডল তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী অন্য লোককে

অপবিত্র করে, এই মতের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।" ইহার আলোচনা করা অনাবশ্যক। থিয়সফিষ্টদের নেত্রী মিসেস্ বেসান্ট তাঁহার "Wake Up India" নামক পুস্তকে ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথার এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নানা প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সরিষার মধ্যেই ভূত ঢুকিলে "বৈজ্ঞানিক"-অস্পৃশ্যতা-বাদী ওঝা কি অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন?

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজ "মাহ্‌রাট্টায়" লিখিত হইয়াছে যে "অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়" জাতিদের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে মিউনিসিপাল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভোট দিলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা।" ইহা ঠিক্ কথা। তাহারা ভোট পাইলে তাহাদের আত্মমর্য্যাদা বাড়িবে, সুতরাং তাহারা তাহাদের এই নূতন অধিকারের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে, এবং তাহাদের ভোট আছে বলিয়া যাঁহারা মিউনিসিপাল কমিশনার বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে চাহিবেন বা হইবেন, তাঁহারা উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত শ্রেণীর লোকদের হিতসাধন-চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবেন, নতুবা তাহাদের ভোট পাইবেন না।

উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত শ্রেণীর লোকদের উন্নতির চেষ্টা আর যিনি যাহাই করুন, বাস্তবিক তাঁহারা নিজে চেষ্টা না করিলে তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জাগিয়াছেন, তাঁহারা খুব সচেষ্ট হউন। তাঁহারা নিজে দৃঢ় বিশ্বাস করুন এবং স্বজাতীয়দিগকে বুঝান যে তাঁহারা ঠিক্ অন্য মানুষদেরই মত, তাঁহারা হীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। অন্যান্য মানুষের মত চেষ্টা দ্বারা তাঁহারাও বড় হইতে পারেন। তাঁহারা অস্পৃশ্য নহেন। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগের মধ্যে আছেন, তাঁহাদিগকে ছুঁইয়া আছেন। মানুষ তাঁহাদিগকে না ছুঁইলে সেটা মানুষের অতিবড় আস্পর্দ্ধা ও ভ্রম।

কর্ম্মবাদ ও অদৃষ্টবাদ।

বিদেশী লোকেরা যদি কর্ম্মবাদকে 'অদৃষ্টবাদ' মনে করেন, তবে সেরূপ ভ্রম তাঁহাদের পক্ষে শোভা পাইতেও পারে। কিন্তু তাহাদের দেখাদেখি যদি আমাদের দেশের নব্য যুবকেরাও কর্ম্মবাদকে অদৃষ্টবাদ মনে করেন, তবে ইহাঁদের পক্ষে তাহা শোভা পাইতে পারে না। কেন না, আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের অভিপ্রায়মতে কর্ম্মবাদ অদৃষ্টবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দেশের শাস্ত্রমতে কর্ম্মের ফলপরম্পরাই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অধীন—আর, সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র সে কথার পোষকতা করিতেছে; শুধু বিজ্ঞানশাস্ত্র কেন, সব মানুষের দৈনন্দিন আচরণ ইহার পোষকতা করিতেছে;—মানুষ যে-কর্ম্ম করে, তাহার একটা ফল ফলিবে, ইহা স্বভাবতঃ সবাই বিশ্বাস করে। কর্ম্মের ফলপরম্পরা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অধীন হইলেও কোনও শাস্ত্রই একথা বলে না যে, কর্ম্মফলের ন্যায় সাক্ষাৎ কর্ম্মও কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অধীন—সকল শাস্ত্রই বলে যে, কর্ম্ম কর্ত্তার অধীন। এবিষয়ে আমরা চৈত্রের প্রবাসীতে যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের দেশীয় যুবকদের উচিত, এই-সকল মূল্যবান্ সামগ্রী দেশীয় শাস্ত্র হইতে অধ্যয়ন করিয়া স্বাধীনভাবে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা। পরের মুখে ঝাল খাওয়া অকর্ত্তব্য।

স্বরাজলিপ্সুদের বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ বন্ধ।

পাইয়োনীয়ার কাগজে খবর বাহির হইয়াছে—গবর্ণমেণ্ট এই হুকুম করিয়াছেন যে আপাততঃ হোমরূল ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে বিলাত যাইবার ছাড়পত্র (passport) দেওয়া হইবে না। যেসকল প্রতিনিধিকে ইতিপূর্ব্বে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদিগকে সাবধান করা হইতেছে যে তাঁহাদের ছাড়পত্র বাতিল হইল; এবং তাঁহাদিগকে আপাততঃ বিলাত যাইতে দেওয়া যাইতে পারে না।

গবর্ণমেণ্ট যে-কারণে এবং যে-উদ্দেশ্যেই এই অভিনব আদেশ প্রচার করিয়া থাকুন, ইহার ফল এই হইবে, যে, বিলাতের ভারতীয়-স্বরাজ-বিরোধী ইঙ্গো-ব্রিটিশ সমিতি ও অন্যান্য তদ্রূপ সভা ও ব্যক্তি অবাধে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলিতে ও আমাদের কুৎসা রটনা

করিতে পারিবে; আমরা প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাহাদের প্রচারিত মিথ্যা কথা ও কুৎসার প্রতিবাদ করিতে পারিব না; তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে লোকমত গঠন করিবার সুযোগ পাইবে, আমরা ব্রিটিশ জাতির মত আমাদের অনুকূল করিবার সুযোগ পাইব না। এই যে ফল ফলিবে, গবর্ণমেণ্টের তাহা অভিপ্রেত না হইতে পারে; কিন্তু লোকে মনে করিবে যে এই উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমাদের সমুদয় সভাসমিতি ও খবরের কাগজের সম্পাদক এই আদেশের কারণ জানিতে চেষ্টা করুন, এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করুন। দলাদলি এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেও নানা মুনির নানা মত হওয়ার একটা কুফল আমরা সদ্যসদ্য বুঝিতে পারিব। কংগ্রেস এখন প্রতিনিধি পাঠাইতেছিলেন না, হোমরুল-লীগগুলি পাঠাইতেছিলেন। সুতরাং কংগ্রেস-নেতারা ও কংগ্রেসের কোন কোন মুখপত্র এই আদেশের প্রতিবাদ করিবেন না, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। আমাদের দেশে লোকমত প্রবল নহে; কিন্তু এই যুদ্ধের সময় নানা কারণে সকল দলের লোকের প্রতিবাদে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। লোকমত যাহা একবাক্যে চায়, গভর্ণমেণ্ট তাহা দিতে না চাহিলেও, অন্ততঃ কতকটা দিবার মত কিছু একটা করেন। কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই প্রবল মতভেদ থাকিলে লোকমতকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিতে রাজকর্ম্মচারীদের মনে কোন দ্বিধা হয় না।

গভর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়া এখন আর দুটি কাজ আমাদিগকে করিতে হইবে। ভারতবর্ষে স্বরাজের সপক্ষে লোকদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা সকল প্রদেশে খুব প্রবল করিতে হইবে, এবং স্বরাজের সপক্ষে আন্দোলন প্রবল করিতে হইবে। স্বরাজের প্রধান চেষ্টা ভারতবর্ষেই করিতে হইবে। বিলাতে এখন যে-সকল ভারতবর্ষের লোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের স্বরাজলাভের অনুকূল কাজ করিবার যোগ্যতা ও ইচ্ছা আছে, তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় পুস্তক পুস্তিকা, মাসিকপত্র, সাপ্তাহিক পত্র ও টাকা পাঠাইয়া দেওয়া চাই।

আমরা উপরে মুদ্রিত কথাগুলি লিখিবার পর জানিতে পারিলাম, যে ছাড়পত্র না দেওয়া এবং পূর্ব্বপ্রদত্ত ছাড়পত্র বাতিল করার আদেশ ভারত গবর্ণমেণ্টের নহে, বিলাতী গবর্ণমেণ্টের। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় গবর্ণর-জেনারেলকে এবিষয়ে টেলিগ্রাফ করায় তিনি বলিয়াছেন যে প্রতিনিধিরা দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্তও যদি বিলাতের গবর্ণমেণ্ট আদেশ প্রত্যাহার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ঐ স্থান হইতেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। পরে জানা গেল, অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ২০শে এপ্রিলের আগে কিন্তু আর বিলাতগামী জাহাজ পাওয়া যাইবে না।

প্রতিনিধি প্রেরণের কথা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। সুতরাং বিলাতী গবর্ণমেণ্টের এরূপ আদেশ পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। এখন হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটিল, কি গুরুতর নূতন কারণের আবির্ভাব হইল, যাহার জন্য বিলাতী গবর্ণমেণ্ট এতদিন চুপ করিয়া থাকিয়া শেষ মুহূর্ত্তে এরূপ আদেশ দিলেন, তাহা জানিতে সর্ব্বসাধারণের কৌতূহল হইবে।

মহারাষ্ট্রে স্বরাজ লাভের প্রয়াস।

সকল প্রদেশে স্বরাজ লাভের চেষ্টা ন্যূনকল্পে কিরূপ প্রবল করিতে হইবে, তাহার নমুনা মহারাষ্ট্রের হোমরুল-লীগের ১৯১৭-১৮ সালের কার্য্য হইতে বুঝা যায়। এই লীগের সভ্যসংখ্যা ৩৩৮৫৪ জন হইয়াছে। সভ্যসংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে স্বরাজ লাভের ইচ্ছা দেশে কিরূপ ব্যাপক হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে অনেকের, বিশেষতঃ ইংরেজদের, ধারণা এই যে তথাকার অ-ব্রাহ্মণেরা স্বরাজ চায় না। এইজন্য সভ্যদের মধ্যে কত লোক কোন্ জা'তের তাহা জানা ভাল। শতকরা ৪৩ জন ব্রাহ্মণ, ৫৫ জন অ-ব্রাহ্মণ। ৪০ জন সভ্য মুসলমান, ১৫ জন পার্সী, ও ৩৪ জন খৃষ্টিয়ান। ১৬৭ জন মহিলা সভ্য আছেন। অনেক লোকের ধারণা এই যে আমাদের দেশের উকীল ব্যারিষ্টার বাবুরাই রাজনৈতিক আন্দোলনের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা, এবং তজ্জন্য আইন-ব্যবসায়ী লোকদের অহঙ্কারও আছে; যদিও কার্য্যতঃ তাঁহাদের অধিকাংশ লোক দেশ-হিতার্থে বেশী স্বার্থত্যাগ ও সময় ব্যয় করেন বলিয়া আমাদের

বোধ হয় না। যাহা হউক, মহারাষ্ট্রের হোমরূল লীগে দেখা যায় যে সভ্যদের মধ্যে শতকরা দেড় জন আইন-ব্যবসায়ী, ডাক্তার ও অন্যবিধ "পাণ্ডিত্য"-সাপেক্ষ ব্যবসায় (learned professions) অবলম্বী। গত বৎসর লীগ স্থির করেন যে, এককালীন অন্যূন এক শত টাকা প্রদাতা সভ্যদিগকে আজীবন সভ্য করা হইবে। বক্ষ্যমাণ বৎসরে এইরূপ টাকা দিয়া ৬৪১ জন আজীবন সভ্য হইয়াছেন।

লীগের হিসাবে দেখা যায়, গতবর্ষে হস্তে স্থিত ছিল, মোটামুটি ১৩১৩২ টাকা। তাহা সমেত বক্ষ্যমাণ বৎসরে আয় হইয়াছে ২৬৯১৬৮ টাকা। ব্যয়বাদে হস্তে স্থিত আছে ১৮২৯৫৭। সাধারণ সভ্যদের চাঁদা হইতে ২৪০৭২ টাকা এবং আজীবন সভ্যদের এককালীন দান হইতে ১৬২৮২ টাকা পাওয়া যায়। অর্থ সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক বেরার ও মধ্যপ্রদেশে ভ্রমণ ও বক্তৃতা করিয়া ১১৭০০০ টাকা আনয়ন করেন।

লীগের প্রধান আফিস এই বৎসরে ৫০০০ চিঠি পান এবং ৭৩০০ চিঠি প্রেরণ করেন। শাখা আফিস-সকল হইতেও এইরূপ অনেক চিঠি লেখালিখি হয়। স্বরাজ সম্বন্ধে লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক সভ্য শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, এবং ইংরেজী ও দেশভাষায় স্বরাজ-বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচার করেন। এই লীগ নানা প্রদেশে সর্ব্বসমেত ৮৩৫টি সভায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিলক মহোদয় একাই ৮৮টির উপর বক্তৃতা করেন। তিনি বেরারে এই উদ্দেশ্যে রেলে ১০০০ মাইল এবং মোটরকারে ১০০০ মাইল ভ্রমণ করেন, এবং প্রায় ১৬ দিনে ৩২টি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য কখন কখন ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও হাজার হাজার লোক আসিত এবং এবং একএকটা সভায় কুড়ি হাজার লোক হইত। এইরূপে একএকটা সভা হইতে তিনি হাজার হাজার নগদ টাকা পাইয়াছেন। সঙ্গে নগদ টাকা না থাকায় কেহ কেহ তাঁহাকে সোনার আংটী ও অন্যান্য অলঙ্কার দিয়াছে।

লীগ ১৩টি মরাঠী ও ৬টি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এইগুলির মোট ১৫০০০০ খণ্ড ছাপা হইয়া ১২৫০০০ বিক্রীত বা বিতরিত হইয়াছে। মরাঠীতে মুদ্রিত ৫০০০০ খণ্ডের মধ্যে ৪৫০০০ খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। তা ছাড়া শ্রীযুক্ত এন্ সী কেলকর প্রণীত "The Case for Indian Home Rule" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহার বহুখণ্ড বিতরিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের সভানেত্রী যে "সন্দেশ" (message) প্রচার করেন, তাহা মরাঠী, গুজরাতী, কানাড়ী ও হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৮০০ সভায় পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

লীগের গত বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের একটি নির্দ্ধারণ অনুসারে উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত জোসেফ ব্যাপ্টিষ্টাকে গত জুলাই মাসে বিলাতে পাঠান হয়। ইঁহার নাম ইংরেজী হইলেও ইনি ভারতবর্ষের লোক। তাঁহার স্বার্থত্যাগ সাহস ও স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে দেশের সেবা করিতে সমর্থ করিয়াছে। তিনি বিলাতে জনসাধারণের নিকট ৩০টি বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিলাতের প্রবল শ্রমজীবীদল ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার অনুকূলে চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

লীগের বার্ষিক রিপোর্টে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় চয়ন করিয়া দিলাম।

বাংলা দেশে কলিকাতা শহরে একটি হোমরূল লীগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইলে তুলনার সুবিধা হয়।

কাইরায় "সত্যাগ্রহ"।

শুধু আন্দোলন করিলেই হইবে না, মানুষের যাহা অধিকার তাহা রক্ষা করিবার জন্য, যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তাহা করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ সহিতে হইবে। শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্ম্মচাঁদ গান্ধি মহাশয়ের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে গুজরাতের কাইরা জেলায় এইরূপ আচরণের আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে তিনি সত্যাগ্রহ বলেন। সত্যাগ্রহের অর্থ নানা-প্রকার হইতে পারে। সংস্কৃতে আগ্রহের অর্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রবল অনুরাগ, অধ্যবসায়, নৈতিক শক্তি (moral power), সাহস ইত্যাদি নানাপ্রকার হইতে পারে। গান্ধি মহাশয় ইহা বোধ হয় "প্রকৃত আত্মিকশক্তি" (real soul force)

অর্থে ব্যবহার করেন; অর্থাৎ তিনি দৈহিক বল বা অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে চান না, সত্য ও ন্যায়ে এবং সত্য ও ন্যায়ের জয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, এবং আত্মার শক্তির দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ সহ্য করা, ইহাকেই তিনি জয়লাভের একমাত্র অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে চান।

কাইরা জেলায় সত্যাগ্রহের কারণ, গত মাসের প্রবাসীতে কাইরা জেলায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে কতক বুঝা যাইবে।

১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে ঐ জেলায় পূরা ফসল হয় নাই, ইহা গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করেন। বোম্বাই অঞ্চলের জমীর খাজনা বিষয়ক আইন অনুসারে যদি কোথাও ফসল রকম চারি আনারও কম হয়, তাহা হইলে তথাকার চাষীদের নিকট হইতে সে বৎসরের খাজনা আদায় পুরাপুরি স্থগিত থাকিবার কথা; এবং যদি ফসল ছয় আনার কম কিন্তু চারি আনার বেশী হয় তাহা হইলে সে বৎসরের খাজনার অর্দ্ধেক আদায় স্থগিত থাকিবার কথা। প্রায় ৬০০ গ্রামে শস্য ভাল হয় নাই। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কেবল একটি গ্রামে পূরা খাজনা এবং ১০৪টিতে অর্দ্ধেক খাজনা আদায় স্থগিত করিয়াছেন। রায়তদের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে অজন্মার পরিমাণ ও বিস্তৃতি অনুসারে ইহা যথেষ্ট নহে, আরও অনেক গ্রামে পুরা খাজনা আদায় স্থগিত রাখা উচিত। গবর্ণমেণ্ট বলেন অধিকাংশ গ্রামেই ছয় আনার অধিক শস্য হইয়াছে। সুতরাং মীমাংসিতব্য প্রশ্নটি এই যে শস্য চারি আনা বা ছয় আনার কম হইয়াছে, না, ছয় আনার অধিক হইয়াছে? গান্ধি মহাশয় দেখাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রণালীতে এবং যে-সকল কর্ম্মচারীর দ্বারা শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। কিন্তু শুধু এই-প্রকার সমালোচনার দ্বারাই রায়তদের বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন নাই। প্রথমে গুজরাতের মান্যগণ্য দুজন নেতা—গোকুলদাস পারেখ ও বল্লভভাই পাটেল (বড়লাটের সভার সভ্য)—এবং তাহার পর গোখলে-প্রতিষ্ঠিত ভারতভৃত্যসমিতির দেবধর, যোশী ও ঠাকর স্বয়ং কয়েকটি গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান করেন। তাহার ফলে তাঁহারা স্থির করেন যে অধিকাংশ স্থানে শস্য চারি আনার কম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা বেশী গ্রাম দেখেন নাই বলিয়া গান্ধি কুড়িজন কার্য্যক্ষম অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ পদস্থ ও প্রভাবশালী লোকের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান করেন। তিনি ত্রিশটির উপর গ্রামে স্বয়ং যান, যত লোকের সহিত সম্ভব সাক্ষাৎ করেন, তাহাদের ক্ষেতে গিয়া অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, এবং জেরা করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। খারিফ শস্য তখনও মাঠে ছিল, গান্ধির সহকারীরাও পূর্ব্বোক্ত-প্রকার অনুসন্ধান-প্রণালী অবলম্বন করেন। এই-প্রকারে প্রায় চারিশত গ্রাম পরীক্ষিত হয়। তন্মধ্যে কেবল তিনটি গ্রামে শস্য ছয় আনার উপর হইয়াছে, এবং দু-একটি গ্রাম ছাড়া আর সর্ব্বত্রই ফসল চারি আনার কম হইয়াছে।

রায়তদের পক্ষ হইতে, জেলার কালেক্টর হইতে বোম্বাইয়ের লাট পর্য্যন্ত, আবেদন নিবেদন সাক্ষাৎকার প্রভৃতি অনেক চেষ্টা হইয়াছে। কোন ফল হয় নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধি গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করেন, যে, যেহেতু গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজারা উভয়পক্ষই, আপনাদের নির্দ্ধারণ ঠিক মনে করেন, অতএব একটি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত হউক এবং তাহাতে প্রজাদের প্রতিনিধি লওয়া হউক, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের কথাই ঠিক বলিয়া মানিয়া লউন। গবর্ণমেণ্ট দুটির মধ্যে কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা আইন-প্রদত্ত বলের প্রয়োগ দ্বারা খাজনা আদায় করিবার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় আছেন, এবং এইপ্রকারে বরাবরই খাজনা আদায় চলিয়া আসিতেছে। সরকারী অধস্তন কর্ম্মচারীরা জোর করিয়া লোকের গরু বাছুর মহিষ লইয়াছে, এবং খাজনা পাইলে তবে তাহা ফেরত দিয়াছে। শ্রীযুক্ত গান্ধি গবর্ণমেণ্টের নিকট শেষ একটি প্রস্তাব এই করেন যে, যেসব জায়গায় উভয় পক্ষের মতেই ছয় আনার উপর ফসল হইয়াছে, সেগুলি বাদে আর সর্ব্বত্র অর্দ্ধেক খাজনা অনাদায় রাখিবার হুকুম দেওয়া হউক; তাহা হইলে যাহাদের সঙ্গতি আছে তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে অবিলম্বে বাকী অর্দ্ধেক দিবে। রায়তদের বন্ধুরা এই প্রস্তাব অনুসারে তাহাদিগকে ইহাতে রাজী করিবার ভার লইতে প্রস্তুত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও রাজী হইলেন না। আইন

গবর্ণমেণ্টকে নানা উপায়ে খাজনা আদায় করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। আইনও অবশ্য গবর্ণমেণ্টেরই প্রণীত। গবর্ণমেণ্ট সরাসরিভাবে সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন, জরিমানা-স্বরূপ নির্দ্ধারিত খাজনার সিকি অতিরিক্ত আদায় করিতে পারেন, রায়ৎওয়ারী, এমন কি ইনামী ও সনদিয়া জমী পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন, এবং রায়ৎকে হাজতে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট এইসব উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত।

প্রজাপক্ষের কোন প্রস্তাবেই গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত না করায়, কেবল সরকারী কর্ম্মচারীরাই সত্যনির্ণয়ে সমর্থ এবং তাহারা অভ্রান্ত, কার্য্যতঃ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ বিশ্বাস প্রকাশ পাওয়ায়, শ্রীযুক্ত গান্ধির পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে প্রজারা এই প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহারা খাজনা দিবে না। গরীবদের সহিত সহানুভূতি দেখাইবার জন্য এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্গতিপন্ন প্রজারাও খাজনা না দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বার শতের উপর প্রজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। গান্ধি মহাশয় রায়ৎদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে তাহাদিগকে নানা দুঃখ পাইতে হইবে, হাজতে যাইতে হইবে, সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, তাহাদের বন্ধু দেশনায়কেরা তাহাদের বাজেয়াপ্তী জমী কিনিয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন না। ইহা বেশ বুঝিয়া-সুঝিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এবং এপর্য্যন্ত কেহ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। গান্ধি ব্যতীত গুজরাতের আরও অনেক নেতা গ্রামে গ্রামে গিয়া সভা করিয়া প্রজাদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেছেন।

সরকার পক্ষ হইতে খাজনা আদায়ের নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের গায়ের অলঙ্কার (যাহা, স্ত্রীধন বলিয়া, লইবার কাহারও আইনসঙ্গত অধিকার নাই, তাহাও) পর্য্যন্ত অধস্তন কর্ম্মচারীরা খাজনা আদায়ের জন্য লইতেছে। মাঠের অকর্ত্তিত শস্য ক্রোক হইতেছে। অনেকের জমী ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এইরূপে খাজনা আদায়ের চেষ্টা ক্রমেই বাড়িতেছে।

একটি গ্রামের একজন মাতব্বর সঙ্গতিপন্ন প্রজা নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং অন্যকেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার নাম শঙ্করলাল পরীখ। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে না জানাইয়াই খাজনা দিয়া ফেলে। তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া এই কথা জানিতে পারিয়া কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধির পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। গান্ধি বলিলেন যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাঁহার সমুদয় জমীজমা গ্রামের শিক্ষাস্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির জন্য দান করা উচিত। তিনি তাহাই করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না করিলে, খাজনা না দেওয়ার অপরাধে, তাঁহার সব জমী বাজেয়াপ্ত হইত। এখনও তাঁহার সমুদয় ভূমি গেল। সত্যরক্ষার জন্য যিনি এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারেন, তিনি ধন্য!

কাইরার প্রজারা যেরূপ বীরত্ব ও ধৈর্য্য দেখাইতেছেন, তাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র মানুষের হৃদয়ে নব বল ও নূতন আশার সঞ্চার হইবে। আইন অনুসারে যাঁহারা তাঁহাদের খাজনার সমস্তটা বা অর্দ্ধেক আদায় স্থগিত রাখিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সেই অনুরোধ রক্ষা না করায়, তাঁহারা খাজনা না দিয়া কোনো বে-আইনী কাজ করিতেছেন না। বরং, যাহা আইন অনুসারে দেয় নহে, তাহা না দিয়া তাঁহারা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের জেদ যে অন্যায়, তাহা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ও দেশের উপকারই করিতেছেন। শেষ কথা এই, আইনে যাহাই বলুক, কেহ যদি বুঝেন যে একটা কাজ করা উচিত নয়, তাহা হইলে ভয়ে তাহা করা কাপুরুষতা ও অধর্ম্ম। কাইরার প্রজারা গবর্ণমেণ্ট-পক্ষের কাহাকেও আঘাত করিতেছেন না, তাহাদিগকে কোন দুঃখ দিতেছেন না, তাহাদের কোন ক্ষতি করিতেছেন না; যত কিছু ক্ষতি ও কষ্ট তাঁহাদের নিজেদেরই হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা যদি ভুল বুঝিয়া বেঠিক্ কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার ফল ভোগ তাঁহারাই করিতেছেন। তাঁহাদের কাজ বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত নহে। যে দিক দিয়াই দেখা যাক্ তাঁহাদের কাজ ধর্ম্মানুমোদিত ও সঙ্গত হইয়াছে।

সর্ব্বসাধারণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার শান্তিসঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদিত উপায় ভারতবর্ষের মধ্যে গুজরাতেই শত শত লোক প্রথম অবলম্বন করিলেন। ইহাতে স্বভাবতই তাঁহারা লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইবেন। অধিকন্তু এখন কাইরা জেলায় ভীষণ প্লেগের আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহাদের দুঃখে লোকের প্রাণ আরও কাঁদিবে।

অন্তরীনদের স্বাস্থ্য ও সুবিধা।

কিছুদিন হইল গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, অন্তরীনদিগকে যতটা সম্ভব ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বা অন্য-প্রকারে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর স্থানে রাখা হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন, এবং যাহাতে অন্তরীনদেরও স্বাস্থ্যহানি না হয়, তজ্জন্য তাহাদের বাসস্থান কোন-প্রকারে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর বা অসুবিধাজনক হইলে তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমরা এ বিষয়ে একটি চিঠি পাইয়াছি। তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"মহাশয়,

"অনুগ্রহ করিয়া লিখিত বিষয়টি Legislative Council এ উত্থাপন করতঃ সুব্যবস্থার চেষ্টা করিবেন।

"আজ একবৎসরের অধিক বঙ্গসাগরের নিকটবর্ত্তী সুন্দরবনের ভিতর একটি নির্জ্জন দ্বীপ পাথর-প্রতিমা নামক স্থানে আবদ্ধ যুবকদের জন্য একটি Detenu Settlement স্থাপিত হইয়াছে। তথায় ১২ জন "ডিটেনিউ" আছে। স্থানটি ২৪ পরগণা জেলার ভিতর। বর্ষাকালে মানব চলাচল বন্ধ থাকে। সর্প কুমীর হিংস্র জন্তুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব। চতুর্দ্দিকে শুধু লবণাক্ত জল। পানীয় জলের বিশেষ অভাব। আহারীয় জিনিষ অতি অল্পই মিলিয়া থাকে। বর্ত্তমানে পুলিশ সাহেবের order-মত দারোগা .... [নাম বাদ দিলাম। প্রবাসী-সম্পাদক] "ডিটেনিউ"দের সকল চাকর তাড়াইয়া দিয়াছে। আজ ১৫ দিন কাহারও চাকর নাই। এদিকে দারোগার দুর্ব্যবহারে সকলেই অশান্তিগ্রস্ত, চিড়াভিজা খাইয়া সকলে জীবন কাটাইতেছে। এখানে কোন "ডিটেনিউ"কে সংবাদপত্র পাড়িতে দিতেছে না। চট্টগ্রাম হইতে অমৃত-বাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, হিতবাদী, বাঙ্গালী, পড়িতে পাইত, এখানে বদ্‌লী হইয়া সব বন্ধ হইয়াছে। চট্টগ্রামের মহিষখালি, কুতুবদিয়া হইতে এস্থান অতীব অশান্তিকর। প্রার্থনা করি, যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থার চেষ্টা করিবেন।"

অন্তরীনদের জন্য পরামর্শ-কমিটি।

বড়লাটের সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্তরীনদের ও সন্দেহভাজনদের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিতে অনুরোধ করেন। দেশের লোক যেরূপ কমিটি ও অনুসন্ধান চান, বা সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ চান, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত না হইলেও, একটি কমিটি নিযুক্ত করিতে রাজী হন। গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে বলা হয় যে বিচারকার্য্যে অভিজ্ঞ দুজন সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া কমিটি গঠিত হইবে। তন্মধ্যে একজন ভারতবাসী হইবেন। দুজনের মধ্যে একজন হাইকোর্টের জজ বা হাইকোর্টের জজিয়তী করিয়াছেন এরূপ কর্ম্মচারী হইবেন। তাঁহারা কাগজপত্র দেখিয়া গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। অবশ্য সে পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য থাকিবেন না। দেশী কাগজে এইরূপ কমিটির সমালোচনা হইয়াছে। যাঁহারা ইহাতে কতকটা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাও ইহাকে মন্দের ভাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন কাগজে লেখা হইয়াছে যে, ইহা হইতে কোন সুফলের প্রত্যাশা করা যায় না, বরং এই কুফল হইতে পারে যে কমিটির অনুসন্ধানের পরও যে-সব লোক আবদ্ধ থাকিবে, দেশের লোক তাহাদিগকে দোষী বলিয়াই মনে করিবে, অথচ কমিটির গঠন ও অনুসন্ধান-প্রণালী যেরূপ হইবে, তাহাতে সত্য নির্ণয়ের খুব বেশী সুবিধা ও সম্ভাবনা থাকিবে না।

এই-সব সমালোচনা পড়িয়া বঙ্গের লাট ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ও ভয় দেখাইয়াছেন যে দেশের লোক যদি গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহকে এরূপ অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কমিটি নিয়োগ করিবেন না; কমিটি নিয়োগ করিলে অন্তরীনদের যদি কিছু সুবিধা হইত, তাহা হইলে তাহাদের সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে কেহ দায়ী মনে করিতে পারিবেন না, দেশের লোকই দায়ী

হইবেন; ইত্যাদি। আমরা সব কাগজের সমালোচনা দেখি নাই, সুতরাং সবাই ঠিক্ কথা লিখিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু সমালোচনা যেমনই হউক, গবর্ণরের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া ভাল নয়। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবেন, তাহাতেই ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইবে, এমন আশা তিনি কেন করেন?

গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কমিটি নিযুক্ত করিতে চাহিতেছেন এবং তাহার অনুসন্ধান-প্রণালী যেরূপ হইবে, তাহাতে কোন স্থলেই কমিটি কোন অন্তরীন বা সন্দেহভাজন ব্যক্তির সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করিতে ও ন্যায্য পরামর্শ দিতে পারিবেন না, আমরা তাহা মনে করি না। কিন্তু সাধারণতঃ সত্য নির্ণয় করা কমিটির পক্ষে অতি কঠিন হইবে, এবং তাঁহারা যে সত্য নির্ণয় করিতে পারিতেছেন, ইহা লোককে বিশ্বাস করানও কঠিন হইবে।

আমরা চাই, নিরপেক্ষ লোকদের দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ। কিন্তু কমিটির দুজন সভ্যই হইবেন সরকারী কর্ম্মচারী। তাঁহাদিগকে সর্ব্বসাধারণ ঠিক নিরপেক্ষ মনে করেন না। অন্ততঃ একজন বেসরকারী স্বাধীনচেতা আইনজ্ঞ লোক কমিটিতে লইলে সত্য নির্ণয়েরও সুবিধা হয় এবং কমিটির উপর লোকের আস্থাও বেশী হয়। ঐ প্রকারের বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা সরকারী সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলে তবে কমিটির উপর লোকের সম্পূর্ণ আস্থা হয়। অন্য কারণেও অন্ততঃ তিন জন লোক লইয়া কমিটি করিলে ভাল হয়। কারণ, দুজন সভ্যের মধ্যে মতভেদ হইলে গবর্ণমেণ্ট কাহার মতকে কমিটির মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন? সভ্যসংখ্যা তিন হইলে দুজনের মতকেই বলবৎ মনে করা যাইতে পারে। প্রস্তাবিত দুজন বিচার-অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন মাত্র যদি হাইকোর্টের জজ হন, তাহা হইলে অন্য সভ্যটি তাঁহা অপেক্ষা পদমর্য্যাদায় খাট হইবেন। তিনি কি সমানে সমানে হাইকোর্টের জজের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে পারিবেন? একেবারে পারিবেনই না, এমন কথা অবশ্য আমরা বলি না। কিন্তু না পারিবার অনেকটা সম্ভাবনা আছে।

অনুসন্ধান-প্রণালীর অসম্পূর্ণতা আরও বেশী। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে অন্তরীন বা সন্দেহভাজনরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে পাইবে না। কিন্তু শুধু পুলিশের পেশ-করা একতরফা কাগজপত্র হইতে কি সত্য নির্ণয় হইতে পারিবে? কোন ক্ষেত্রেই হইবে না, এমন নয়, কিন্তু সাধারণতঃ প্রত্যেক মাম্লার দুটা দিক্ থাকে; দুই পক্ষের কথা না শুনিলে সত্য নির্দ্ধারিত হয় না। এইজন্যই আদালতে বিচারের সময় অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয় পক্ষই নিজের নিজের কথা বলিতে পায়, এবং প্রমাণে ও সাক্ষ্যে ভুল জাল চাতুরী সত্যের অপলাপ দেখাইবার জন্য এই কার্য্যে অভিজ্ঞ আইনজীবী উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার অধিকার উভয় পক্ষেরই আছে। খুব ভাল উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হয় বলিয়াই অনেক সঙ্গীন মোকদ্দমায় পুলিশের মিথ্যা প্রমাণ ধরা পড়ে ও আসামী খালাস পায়।

অভিযুক্তেরা উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, তাহা ত সরকার-পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা নিজেও অভিযোগটা কি ও প্রমাণ কি, জানিতে পারিবে কি না, স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ও পুলিশকে জেরা করিবার জন্য কমিটির সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবে কি না, পুলিশের প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে সরকারপক্ষ কিছু বলেন নাই। যদিও আইনে অনভিজ্ঞ ও জেরায় অনভ্যস্ত লোকের জেরা ও স্বপক্ষে প্রমাণ-প্রয়োগ অভিজ্ঞ আইনব্যবসায়ীর জেরা ও প্রমাণপ্রয়োগের মত নিপুণ ও কার্য্যকর হইতে পারে না, তাহা হইলেও অভিযুক্তরা অন্ততঃ এতটুকু অধিকার পাইলেও সুবিচারের কিছু সম্ভাবনা হইবে। তাহা না পাইলে, অধিকাংশ স্থলে সুবিচার হইতেছে বলিয়া আমরা নিজেই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, অপরকেই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে বলিব?

প্রস্তাবিত কমিটি দ্বারা হয়ত কোন কোন স্থলে অন্তরীন ও সন্দেহভাজনদের সুবিধা হইবে। কিন্তু তদপেক্ষা অধিক স্থলে সুবিচার, লোকমত-প্রার্থিত কমিটি ও অনুসন্ধান-প্রণালী দ্বারা নিশ্চয় হইত। প্রস্তাবিত কমিটি নিযুক্ত হইলে সেরূপ কমিটির নিয়োগ ও সেরূপ অনুসন্ধান-প্রণালীর অনু-

সরণ আর হইবে না। ইহা একটি কুফল। অপর একটি অনিষ্ট এই হইবে, যে, দেশে, বিশেষতঃ বঙ্গের বাহিরে, লোকের এই ধারণা হইতে পারে, যে, কমিটির প্রদত্ত পরামর্শ বিবেচনা করিয়া দেখিবার পরও যাহারা মুক্তি পাইবে না, তাহারা নিশ্চয়ই দোষী; যদিও বাস্তবিক কমিটি সত্যনির্ণয়ের সব-রকম সুযোগ পাইবেন না, এবং সব রকম উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

বঙ্গের লাট আরও বলিয়াছেন, যে, গবর্ণমেণ্টই দেশে অপরাধ নিবারণের জন্য দায়ী। তাঁহার একথা বলিবার তাৎপর্য্য সম্ভবতঃ এই, যে, "তোমরা ত কেবল সমালোচনা করিতে পার; চুরি ডাকাতী খুন নিবারণ ত আর তোমরা করিবে না। সুতরাং আমরা অপরাধ নিবারণের যে-সব উপায় অবলম্বন করি, তাহার উপর বেশী উচ্চবাচ্য করিবার তোমাদের অধিকার নাই।" আমাদের বক্তব্য এই যে অপরাধ নিবারণের উপায় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের আছে। পুলিশকে অধিক ক্ষমতা দেওয়ায় ও পুলিশের উপর অধিক নির্ভর করায় যদি আমাদের ধারণা হয় যে অনেক নিরপরাধ লোকও দণ্ডিত হইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত উপায়ের সমালোচনা করিব। গবর্ণমেণ্টের উপায়ে শেষ পর্য্যন্ত সুফল অপেক্ষা কুফল বেশী হইবে, যদি আমাদের এইরূপ বিশ্বাস হয়, তাহা হইলেও কি আমাদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে? লাট সাহেব ইহাও ভুলিয়া যাইতেছেন, যে, লোকমত গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা দণ্ডিতদের দিকেই যেদেশে ঝুঁকিয়া পড়ে, তথায় আইন খুব কড়া এবং পুলিশকে নিরঙ্কুশ শক্তিশালী করিলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

আবকারীর আয় ও শিক্ষার ব্যয়।

বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় একটি বক্তৃতায় সার দীনশাহ্ এদুলজী ওাচা বলেন, গবর্ণমেণ্টের আবকারী আয় এখন প্রায় তের কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে, ১৪ কোটি পর্য্যন্তও হইতে পারে। গণনা করিলে দেখা যায়, যে, ব্রিটিশ ভারতে মাথা-পিছু এখন আট আনা করিয়া আবকারী ট্যাক্স আদায় হইতেছে। ইহা বলিয়া ওাচা মহাশয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন, "আগামী বৎসরের বজেট অনুসারেও গবর্ণমেণ্টের জন-করা শিক্ষার ব্যয় কত? মাথা-পিছু দুই আনা মাত্র! অতএব আপনারা একদিকে আপনাদের আবকারী-নীতির দ্বারা লোককে নেশাখোর বানাইয়া ১৩ কোটি টাকা আদায় করিতেছেন, অন্যদিকে আপনাদের এতটুকু বদান্যতা নাই যে শিক্ষার জন্য জনপিছু দুই আনার বেশী খরচ করেন! ইহা ঠিক্ নয়। গরীব লোকদের নিকট হইতে যাহা লওয়া হয়, তাহা অন্য আকারে তাহাদেরই পকেটে যাওয়া উচিত, অর্থাৎ তাহা ধনোৎপাদক রূপে যাওয়া উচিত; শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহা ধনোৎপাদক।"

আবকারী আয় কিরূপ ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতেছে দেখুন। ১৮৭৪—৭৫ খৃষ্টাব্দে আবকারীর আয় ছিল ১৫,৬১,০০০ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড ১৫ টাকার সমান), আর ১৯১৮—১৯ সালের বজেটে আবকারীর আয় ধরা হইয়াছে ১,০৬,৪৭, পাউণ্ড। অর্থাৎ ৪৪ বৎসরে আয় বাড়িয়াছে সাত গুণ।

পুলিশবিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি।

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় দেখান, যে, গত বার-বৎসরে বাংলাদেশে পুলিশ বিভাগের ব্যয় ৩৫ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৩৭ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ উহার বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৩০০ টাকা। তিনি বলেন, "প্রতিবৎসরই আমাদিগকে কার্য্যতঃ বলা হয় যে পুলিশের জন্য নূতন এবং অতিরিক্ত ব্যয়ে সম্মতি দিতে হইবে, নতুবা গবর্ণমেণ্ট দেশে শান্তি ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দায়ী হইবেন না। এ-রকম যুক্তি ২১ বৎসর মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু প্রতিবৎসর একই বাঁধি বোল ঝাড়িলে লোকে সন্দিহান হয়।" তিনি আরও দেখান যে গতবৎসর এনার্কিষ্টদের উপদ্রব বাড়ে নাই।

নদী-পুলিশের নিমিত্ত বাষ্পচালিত নৌকা নির্ম্মাণ করিতে, ও অন্যান্য প্রকারে পুলিশবিভাগের সুবিধা করিয়া দিতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়, কিন্তু শিক্ষা স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির জন্য তেমন ব্যয় বাড়ান হয় না, কোন কোন বিভাগে কমান হয়। গত পাঁচবৎসরে শিক্ষার ব্যয় শতকরা দশ-টাকা মাত্র বাড়িয়াছে, জলসেচনের ব্যয় কিছুই বাড়ে নাই,

এবং স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যয় শতকরা ৩৫ টাকা কমিয়াছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই কৃপণতা কোন্‌দেশে করা হইতেছে? যে দেশে ম্যালেরিয়ায় বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক মরে, এবং যে-খানে লক্ষ লক্ষ লোক ভাল জলের অভাবে তরল পঙ্কে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে গিয়া রোগগ্রস্ত হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বলেন, "বাংলা দেশের মিউনিসিপালিটীগুলি পানীয় জল জোগাইবার জন্য ১৬টি এবং জল নিঃসারণের নর্দ্দামা আদি করিবার জন্য ৪০টি পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহার মোট ব্যয় হইত এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা; কিন্তু তাহা করিবার জন্য টাকা নাই।" গবর্ণমেণ্টকে ইহার কেবল এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪২০০০ টাকা মাত্র দিতে হইত; কিন্তু তাহা দিতে গবর্ণমেণ্টের টাকায় কুলায় না, কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রাদেশিক হস্তেস্থিত টাকা হইতে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; ইহার প্রায় অর্দ্ধেক পুলিশের জন্য ব্যয় হইবে।

বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়, সম্প্রতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদে ও রামমোহন-লাইব্রেরীতে বাংলায় বক্তৃতা করায়, তৎপ্রতি শিক্ষিত-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহা নূতন ব্যাপার নহে। আচার্য্য বসু মহাশয়ই যখন বহুবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি হন, তখনও তাঁহার একটি নূতন আবিষ্ক্রিয়া তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল, এবং তিনি বাংলায় বলিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা যত বেশী হয় ততই ভাল। নতুবা বিজ্ঞান বাঙালীর সাধারণ মানসিক সম্পত্তি হইতে পারিবে না।

আচার্য্য বসু ভিন্ন আরও কেহ কেহ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে কতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন হইতে দেওয়া হইবে, জানি না; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যে-সব শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নাই, সেখানে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যান এবং আলোচনা বাংলা ভাষার সাহায্যে করা আমাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন এবং চেষ্টার আয়ত্ত।

হিতসাধনমণ্ডলীর প্রদর্শনী।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী নানাপ্রকারে সমাজের হিত করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি লোকশিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, রোগীর সেবা, রোগনিবারণ, নানা উপায়ে গরীব লোকদের আয় বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে অঋণী করা, কৃষির উন্নতি, প্রভৃতি বিষয়ে কত কাজ করিবার আছে, বঙ্গে ও অন্যত্র কি কর্ম্ম হইয়াছে, কি কি উপায় অন্যত্র অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা ছবি দ্বারা, মানচিত্র দ্বারা, ম্যাজিকলণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা দ্বারা, সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য হিতসাধন-মণ্ডলী একটি সমাজ-সেবা-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ইহা খুব সুফলপ্রদ হইয়াছে, এবং ইহা দেখিবার পর সমাজসেবার প্রতি লোকের অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রদর্শনীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্সটিটিউটে দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখন সেগুলি কিছুদিন ভারতসভা-গৃহে প্রদর্শিত হইবে। তাহার পর প্রদর্শিত সব জিনিষের এক প্রস্থ নকল প্রস্তুত করিয়া ভারতসভা প্রদর্শনীটিকে স্থায়ী করিতে ইচ্ছা করেন।

হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলন।

এবার হিন্দীসাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল মহারাজা হোলকারের রাজধানী ইন্দোর নগরে। শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধি ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় উভয়েই যে উর্দ্দু ও হিন্দীকে একই ভাষা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা খুব ঠিক্। হিন্দী ও উর্দ্দুর মধ্যে প্রভেদ কেবল এই, যে, উর্দ্দু ফারসী অক্ষরে লেখা হয়, এবং ইহাতে ফারসী আরবী শব্দ বেশী পরিমাণে চালাইবার চেষ্টা মৌলবীরা করিয়া থাকেন; হিন্দী নাগরী অক্ষরে লেখা হয় এবং পণ্ডিতেরা ইহাতে বেশী পরিমাণে নিছক সংস্কৃত শব্দ চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে তাহা মৌলবীদের উর্দ্দুও নহে, পণ্ডিতদের হিন্দীও নহে। তাহাকে হিন্দুস্থানী বলা যাইতে পারে। হিন্দুস্থানী নামটি-দ্বারা হিন্দী ও উর্দ্দু দুইই অভিহিত হইতে পারে।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের যে-সব উদ্দেশ্য আছে, হিন্দী-সাহিত্যসম্মেলনের তা ছাড়া দুটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে,—(১) নাগরীকে ভারতীয় সমুদয় ভাষার অক্ষর করা, (২) হিন্দীকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করা। সমগ্র ভারতে একই লিপি ও একই ভাষা থাকিলে নিশ্চয়ই অনেক সুবিধা হইত। যদি ভবিষ্যতে সমস্ত দেশে এক লিপি ও এক ভাষা হয়, তাহাতে অনেক সুবিধা হইবে। এক লিপি ও এক ভাষার বিস্তার, এ দুটির চেষ্টা পৃথক করা দরকার। কেন না, সমস্ত দেশে এক সাধারণ ভাষার ব্যবহার চালাইবার চেষ্টার অর্থ ইহা নহে, যে, ভারতবর্ষে তামিল, তেলুগু, গুজরাতী, মরাঠী, ওড়িয়া, বাংলা, প্রভৃতি ভাষার প্রচলন কথা-বার্ত্তায় ও লেখাপড়ায় আর থাকিবে না, লোকে ঘরে ও বাহিরে কথা বলিবে কেবল হিন্দীতে এবং চিঠীপত্র ও পুস্তকাদি লিখিবে কেবল হিন্দীতে; এই চেষ্টার অর্থ এই, যে, অন্যান্য ভাষার ব্যবহার যেমন আছে তেমনি থাক্, কেবল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে কথাবার্ত্তা, বাণিজ্য, ভাব ও চিন্তার বিনিময় প্রভৃতির জন্য হিন্দী ব্যবহৃত হইবে, এবং সব প্রদেশের লোক মাতৃভাষা ছাড়া এই ভাষাটিও শিখিবে। আমরা চেষ্টাটির অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি, এবং এইরূপ বুঝিয়াছি বলিয়া ইহার সমর্থনও সর্ব্বান্তঃকরণে করি। এই অর্থে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা যদি কখন ভারতীয় কোন ভাষা হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থানীই হইবে; কেন না, ইহা এখনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভারতবাসী বুঝে ও ব্যবহার করে। শ্রীযুক্ত গান্ধি বলিয়াছেন যে যদি তামিল-ভাষী ও তেলুগুভাষী কতকগুলি লোক হিন্দুস্থানী শিখিয়া পরে উহা স্বস্ব প্রদেশে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হিন্দীসাহিত্যসম্মেলন হইতে কাশী ও এলাহাবাদে তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। ইহা সাধু উদ্যম।

হিন্দুস্থানীকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করিবার মানে যদি কোন হিন্দীপ্রেমিক এই বুঝেন যে অন্য সব দেশী-ভাষাগুলির ব্যবহার বন্ধ হইয়া ও সেগুলি লুপ্ত হইয়া কেবল হিন্দুস্থানীই চলিবে, তাহা হইলে এই চেষ্টা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতেছি না। এরূপ চেষ্টার সমর্থন আমরা করিতে পারি না।

কেবল মাত্র, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, বাণিজ্য ও ভাবচিন্তার বিনিময়ের জন্যই যে আমরা লোককে হিন্দুস্থানী শিখিতে বলি তাহা নহে। প্রাচীন হিন্দীসাহিত্যে অনেক অমূল্য রত্ন আছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে পারা পরম লাভ, ও পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আধুনিক হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী ও উর্দ্দু) সাহিত্য মূল্যহীন তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে হিন্দুস্থানীর সে প্রাধান্য নাই, প্রাচীন সাহিত্যে যাহা আছে। অবশ্য হিন্দুস্থানী যেরূপ বহুবিস্তৃত এবং ইহা যাঁহাদের মাতৃভাষা ইহা তাঁহাদের এরূপ প্রাণের জিনিষ, তাহাতে কালক্রমে ইহার আধুনিক সাহিত্যও যে খুব প্রতিভাব্যঞ্জক, মর্ম্মস্পর্শী ও শক্তিশালী হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

হিন্দুস্থানীকে ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার চেষ্টার অর্থ আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা উপরে বলিয়াছি। নাগরীকে সাধারণ লিপি করিবার অর্থ ঠিক ওরূপ নয়। ইহার অর্থ এই যে ভারতবর্ষের সব ভাষাকেই কেবলমাত্র নাগরীতে লিখিতে হইবে। আমরা এ চেষ্টার সমর্থন করি না। তাহার কারণ অনেক, সংক্ষেপে বলিবার নহে। একটা কারণ এই যে নাগরী অক্ষরের ব্যবহার আর সব অক্ষরের চেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক নহে। যদি ভিন্ন ভিন্ন সব প্রদেশের লোকদিগকে নিজের নিজের লিপি ছাড়িয়া দিতেই হয়, তাহা হইলে যাহা শিখিবার ও ব্যবহার করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ইন্দোরে হিন্দী সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশনে পাটিয়ালা-প্রবাসিনী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী এক ঘণ্টা ধরিয়া ভাল হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, ইহা বাঙালীর পক্ষে আহ্লাদের বিষয়।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর সম্মান।

সম্প্রতি বেরার ও মধ্যপ্রদেশে যে প্রাদেশিক রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী স্বদেশবাসীর নিকট হইতে এই

সম্মান পাইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু আমরা প্রধানতঃ সেকারণে এই খবরটির উল্লেখ করিতেছি না। ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে অন্যপ্রদেশে গিয়া বসবাস করিলে, তাঁহাদের ব্যবহারের আদর্শ এই হওয়া উচিত, যে, তাঁহারা তথাকার পুরুষানুক্রমিক স্থায়ী বাসিন্দাদের সহিত সম্পূর্ণ একযোগে কাজ করিবেন ও স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ জীবের মত ব্যবহার করিবেন না। যেসব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে গিয়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী কর্তৃক আদৃত ও সম্মানিত হন, তাঁহারা এই আদর্শ অনুসারে অনেকটা চলিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া আমরা প্রীত হই।

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশে ও কোন কোন দেশী রাজ্যে খেজুর গুড় উৎপাদনের ব্যবসা চালাইবার জন্য অনেক বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

হুগলীতে প্রাদেশিক রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স।

হুগলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের সম্প্রতি যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাহার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত কন্‌ফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের উভয়ের বক্তৃতা বেঙ্গলীতে যেরূপ বাহির হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। মিত্র মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি, বন্যা দ্বারা দেশের অনিষ্ট, শিল্পের উন্নতি, স্বরাজ, প্রভৃতি বিষয়ে সারবান্ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গোড়ার দিকে যুদ্ধ সম্বন্ধে কনভেন্‌শুন্যাল অর্থাৎ দস্তুরমোতাবেক কিছু বলা কংগ্রেসের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরা একটা রীতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, সুতরাং দত্ত মহাশয়ের বক্তৃতার এই অংশের আলোচনা না করাই ভাল। উহার সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছু বেশ মন খুলিয়া বলিবার মত অবস্থা আমাদের নহে। বক্তৃতাটির বাকী যেসব অংশ আমরা পড়িয়াছি, তাহা সুযুক্তিপূর্ণ এবং তাহাতে বক্তার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, সাহসের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে কলিকাতা অপেক্ষা মফঃস্বলের লোকের স্পষ্টবাদী হওয়া কঠিন। দত্ত মহাশয় আমাদের স্বরাজ চাহিবার যেসব কারণ বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকলের সেরা কথা এবং আসল কথা এই যে উহা মানুষের জন্মগত অধিকার।

বাস্তবিক স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্বকে অন্য কোন একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র মনে করা ভুল। কেন না, সেই উদ্দেশ্যটা সাধিত যদি অন্য উপায়েও হইতে পারে, মানুষকে পরাধীন রাখিয়াও যদি সেই উদ্দেশ্যটা সাধিত হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্বের কোন প্রয়োজন থাকে না, এইরূপ কুতর্ক করা যাইতে পারে। আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে, মানুষ স্বাধীন না হইলে, পূরা মানুষই হয় না; এইজন্য আত্মকর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতাই মানবজীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য আমরা কেবল রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার কথা বলিতেছি না, ধর্ম্ম সমাজ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি, সব বিষয়ে।

আত্মকর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে "Progress and History" * নামক একটি নূতন প্রকাশিত ইংরেজী পুস্তক হইতে কতকগুলি অতি খাঁটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

The ultimate goal of human government...... is liberty, to set free the life of the spirit. "Liberty," said Lord Acton, who could survey the ages with a wealth of knowledge to which no other man, perhaps, ever attained, "Liberty is not a means to a higher political end. It is itself the highest political end. It is not for the sake of a good public administration that it is required, but for security in the pursuit of the highest objects of civil society and of private life." Government is needed in order to enable human life to become, not efficient or well-informed or well-ordered, but simply good, and Lord Acton believed, as the Greeks and generations of Englishmen believed before him, that it is only in the soil of liberty that the human spirit can grow to its full stature, and that a political system based upon any other principle than that of responsible self-government acts as a bar at the outset to the pursuit of what he called 'the highest objects of civil society and of private life." For though a slave or a man living under a servile political system, may develop many fine qualities of character ; yet such virtues will, in Milton's words, be but "fugitive and cloistered," "unexercised and unbreathed." For liberty, and the responsibilities it involves, are the school of character and the appointed means by which men can best serve their neighbors. A man deprived of such opportunities, cut off from the quickening influence of responsibility, has, as Homer said long ago, "lost

* Progress and History : Essay edited by F. S. Marvin. Oxford University Press. 3s. 6d. net.

half his manhood." He may be a loyal subject, a brave soldier, a diligent and obedient workman: but he will not be a full grown man. Government will have starved and stunted him in that which is the supreme object of government to develop and set free.

অন্তরীন ও সন্দেহভাজনদের সম্বন্ধে কাগজপত্র দেখিয়া পরামর্শ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কমিটি নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কন্‌ফারেন্স যে নিদ্ধারণটিতে লোকমত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা ঠিক বলিয়া মনে করি। কন্‌ফারেন্স যে-রকমের স্বরাজ চাহিয়াছেন, তাহা বঙ্গের উপযোগী।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স।

অন্যান্য অনেক প্রদেশে দেখা যায়, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিল্পসম্বন্ধীয়, এই তিন রকম কন্‌ফারেন্স হয়। বাংলা দেশে তাহা হয় না। বাংলাদেশে বোধ হয় কোন সামাজিক কুপ্রথা বা সমস্যা নাই। এবং দেশটা এরূপ ধনশালী যে কৃষি, কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য, এ সব কিছুরই আর উন্নতির দরকার নাই।

দেশের লোকের কাজে ইংরেজ রাজ-পুরুষদের আহ্বান।

মধ্যে মধ্যে এরূপ দেখা যায়, যে, কোথাও একটি সাহিত্যিক বা অন্যবিধ সভার অধিবেশন হইল, বা কোন সামাজিক কুপ্রথার সংস্কার বা উচ্ছেদের জন্য সভা আহূত হইল, তাহাতে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজকে সভাপতি হইবার জন্য ডাকা হইল। ইহা কেন করা হয়? আমরা কি আপনাদের ভাষা ও সাহিত্যেরও উন্নতি ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারীদের সাহায্য ভিন্ন করিতে পারি না? অথবা এ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করাও বেকুবী। কারণ যে-সব ইংরেজকে এইরূপে ডাকা হয়, তাঁহারা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত নহেন। তাঁহাদের নিকট ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সুপরামর্শের আশা কেহ করে না। তবে তাঁহাদিগকে কেন ডাকা হয়? সম্ভবতঃ উদ্যোক্তারা তাঁহাদের খোসামোদ করিতে চান, কিম্বা সাহিত্যিক উন্নতির চেষ্টাটা যে বাস্তবিক খাঁটি সাহিত্যিক চেষ্টা মাত্র, প্রচ্ছন্ন বিপ্লব-প্রয়াস নহে, উদ্যোক্তারা গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্ট করিয়া ইহা বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান। পাছে ডাইনের, কুগ্রহের বা শনির দৃষ্টি পড়ে, এই ভয়ে অনেক মা শিশুসন্তানের কপালে গোবরের ফোঁটা দিয়া দেন। আমাদের কোন কোন সাহিত্যিক বা অন্যবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহূত ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এই গোবরের ফোঁটা স্বরূপ। উদ্যোক্তারা হয়ত মনে করেন, এইরূপ ফোঁটা দিয়া দিলে অনুষ্ঠানগুলির উপর টিকটিকি বিভাগের দৃষ্টি পড়িবে না। কিন্তু আমাদের মনে হয় না যে উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। লাভ কেবল এই হয় যে উদ্যোক্তাদের নিজের এবং আমাদের জাতির চরিত্রে আদর্শনিষ্ঠা সাহস ও দৃঢ়তার অভাব প্রমাণিত হয়।

কেহ কেহ এরূপ তর্ক করিতে পারেন, যে, "আমাদের পরাধীনতা দ্বারাই তো আমাদের মাথা যতটা হেঁট হইবার তাহা হইয়াছে, অতএব এখন আর অন্যান্য সামান্য হীনতা স্বীকারের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া কি ফল? সেগুলা বোঝার উপর শাকের আঁটিটা মাত্র।" আমরা এরূপ যুক্তির সার্থকতা বুঝিতে পারি না। কতকগুলা বিষয়ে আমাদের পরাধীনতা হইয়াছে বলিয়া আর-সব বিষয়েও সখ করিয়া, হীনতা স্বীকার করিতে হইবে, ইহার মানে কি? কেহ যদি তোমার মাথা জোর করিয়া নুয়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তোমাকে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া পাঁকের ভিতর মাথা গুঁজিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা কোন্ শাস্ত্রে আছে?

আমাদের মত এই যে আমাদের নিজের কাজ বলিয়া দেশের সেবা বলিয়া, আমরা যাহা করিব, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবেই করা উচিত। রাজকর্ম্মচারীদের সাহায্য বা সহযোগিতা চাহিতে যাওয়াটাই দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, তাহা পাইতে হইলেই কিছু স্বাধীনতা হারাইতে হইবে, কিছু হীনতা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা অতীত কালে দেশের কাজ দেশের বলিয়া করিতে পারি নাই বলিয়াই ত অন্যের প্রভুত্ব মানিতে হইতেছে। আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে খুব সামান্য একটি কাজ করিতে পারিলেও প্রাণে যে বল পাইব ও যে উৎসাহ আসিবে, ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মুরুব্বিয়ানায় পুষ্ট বৃহৎ আয়োজনে তাহা ঘটিবে না।

কেহ কেহ বলিবেন, "তবে কি ইংরেজ কর্ম্মচারী ও

দেশীলোকদের সহযোগিতা চাও না?” আমাদের উত্তর এই, যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এই উভয়পক্ষের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা স্থাপন অসম্ভব, অন্ততঃ দুঃসাধ্য ত বটেই। সচরাচর যাহাকে সহযোগিতা বলা হয়, তাহা একদিকে প্রভুত্ব কিম্বা মুরুব্বিয়ানা এবং অন্যদিকে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা কিম্বা অনুগ্রহলিপ্সা। দুইপক্ষ সমান সমান না হইলে সহযোগিতা হয় না। তাহা যখন হইবে, তখন প্রকৃত সহযোগিতাও স্থাপিত হইবে।

মানবপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে-কোন-প্রকারে দেশের সেবা করিতে চাই, ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মাথা উঁচু করিয়া তাহা করিতে পারিলে, নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হইতে পারে, কিন্তু আত্মগ্লানি ও মনুষ্যত্বের হ্রাস হয় না, এবং গোবরের ফোঁটা স্বরূপ ইংরেজ রাজপুরুষকে শিরোধার্য্য বা ললাটধার্য্য করিতে হয় না।

প্লেগে মৃত্যু।

গত ৯ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩২৩০০ লোক প্লেগে মরিয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্লেগে কত লোক মরিয়াছে তাহার ঠিক সংখ্যা পাওয়া যাইতে পারে না। সরকারী গণনায় প্রত্যেক বৎসরে যে সংখ্যা লিখিত আছে, গবর্ণমেণ্টও তাহা নির্ভুল মনে করেন না। প্লেগের মহামারী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে আরম্ভ হয়। তাহার পর এই তেইশ বৎসর ধরিয়া উহা আমাদের দেশে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে আর কোন দেশে এত দীর্ঘকালস্থায়ী প্লেগের মহামারী হয় নাই। সরকারী হিসাবে কোন্ বৎসর প্লেগে কত লোক মরিয়াছে, তাহার তালিকা দিতেছি।

বৎসর	মৃত্যুসংখ্যা	বৎসর	মৃত্যুসংখ্যা
১৮৯৬-৯৭	৫৭৫৪৩	১৯০৬	৩৫৬৭২১
১৮৯৮	১১৬২৮৫	১৯০৭	১৩১৫৮৯২
১৮৯৯	১৩৯০০৯	১৯০৮	১৫৬৪৮০
১৯০০	৯২৮০৭	১৯০৯	১৭৮৮০৮
১৯০১	২৮২০২৭	১৯১০	৫১২৬০৫
১৯০২	৫৭৭৩৬৫	১৯১১	৮৪৬৮৭৩
১৯০৩	৮৫৩০৭৬	১৯১২	৩০৬৪৮৮
১৯০৪	১১৪৩৯৯৩	১৯১৩	২১৭৮৬৯
১৯০৫	১০৬৯১৪০	১৯১৪	২৯৫৮৯৭

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোট ৮৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৭৮ জন মানুষ প্লেগে মরিয়াছে। ১৯১৫, ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালের এবং বর্ত্তমান ১৯১৮ সালের তিন মাসের সংখ্যা কোথাও একত্র সংকলিত দেখি নাই। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে, যে, এপর্য্যন্ত প্লেগে এককোটি লোক মরিয়াছে। বাংলা দেশে প্লেগ সামান্যই হইয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশের সরকারী সেন্সস্ রিপোর্টেই লেখা আছে, “Plague kills its thousands, but fever its ten thousands,” “প্লেগ হাজার হাজার লোকের প্রাণ বধ করে, কিন্তু জ্বর অযুত অযুত লোকের প্রাণ বধ করে,” এবং জ্বরের প্রাদুর্ভাব বাংলা দেশে খুব বেশী। সুতরাং বাঙ্গালীর অবস্থা প্লেগ-প্রপীড়িত প্রদেশের লোকদের অবস্থার চেয়ে ভাল নয়।

আমরা অনেকে ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধে লোকক্ষয় দেখিয়া কখন কখন মনে করি, এইবার পাশ্চাত্য জাতিগুলা বুঝিবা লোপ পাইবে কিম্বা নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা ত নয়, লোপ যদি কেহ পায়, ত আমরাই পাইব। কারণ ইউরোপে যাহারা স্বদেশের বা অন্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়িতেছে, অন্ততঃ যাহারা মনে করিতেছে যে তাহারা স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, তাহাদের পৌরুষের ও শক্তির গৌরব আছে, তাহারা বীরের মত মরিতেছে। যাহারা শুধু বাণিজ্যের জন্য বা ভূমির জন্য লড়িতেছে, যাহাদের যুদ্ধ করিবার কারণ পরধনে লোভ ও দস্যুবৃত্তির অনুসরণ, তাহারাও সাহসের, জেদের, অধ্যবসায়ের, আসুরিক শক্তির পরিচয় দিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে, যে যে-কারণেই লড়ুক, ইউরোপের ও আমেরিকার লোকেরা শক্তিশালিতার পরিচয় দিতেছে। শক্তির অপব্যবহার নিন্দনীয়। কিন্তু শক্তি যাহার আছে, এবং যে তাহার অপব্যবহার করিতেছে, সে শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেও পারে; সুতরাং তাহার আশা আছে। কিন্তু “যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,” যাহারা মাছির মত, গাধা-গরু-ভেড়ার মত কেবল মৃত্যুর গ্রাসেই পতিত হয়, আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়া, শিক্ষালাভ করিয়া, গৃহ গ্রাম নগর ও দেশের স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারে না, তাহাদের আশা কোথায়? যাহারা

বাঁচিতেও জানে না, অধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগেরও নিন্দা করিবার তাহাদের অধিকার কোথায়? ইউরোপের লোকেরা যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে বলিয়া আমরা অনেকে তাহাদের তামসিকতার নিন্দা করি। কিন্তু আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোক রোগে মরি, সেটা যে তামসিকতার চেয়েও অধম; তাহাতে বিন্দুমাত্রও সাত্বিকতা নাই।

"অন্তরীণ-সংযম-সপ্তাহ।"

বাংলাদেশে হাজার যুবককে অন্তরীণ করা হইয়াছে। যে আইনের জোরে এইরূপে তাহারা আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বে-আইনী আইন, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বড়লাট ও তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার এরূপ একটা আইন করিবারই ক্ষমতা নাই;—এইকথা অনেক বিলাতী ও দেশী বড় বড় আইনজ্ঞ বলিয়াছেন। কলিকাতার হাইকোর্টে এবং পরে বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে লড়িয়া দেখিলে কতকটা বুঝা যায়, সত্যই আইনটা বে-আইনী কি না।' কিন্তু তাহার জন্য অনেক টাকা চাই। আরো একটি কারণে অনেক টাকার দরকার। যাঁরা আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁদের অনেকের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়, এবং তাঁহাদের পরিবার এখন তাঁহাদের রোজগার হইতে বঞ্চিত। কোন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করিয়া পরিবারবর্গ যে সাহায্য প্রান, তাহা যথেষ্ট নয়। ইহাঁদিগকে সাহায্য দেওয়া দরকার। এইজন্য টাকা চাই। সার্ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অন্তরীণদের দুঃখ ও অভিযোগ-আদির প্রতিকার করিবার নিমিত্ত যে বঙ্গীয় সিবিল রাইটস্ কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি যাহার সভ্য, সেই কমিটি বর্ত্তমান বৈশাখ মাসের প্রথম সাত দিন সকলের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিবেন। যাঁরা ধনী, যাঁদের অবস্থা সচ্ছল, তাঁরা সহজেই কিছু কিছু দিতে পারিবেন। যাঁদের আয় অল্প, তাঁরা এই সাত দিন চেষ্টা করিলে সামান্য আয়েসের জিনিষ ব্যবহার না করিয়াও কিছু পয়সা দিতে পারিবেন। ধনী দরিদ্র সকলেরই দেশের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, কর্ত্তব্য আছে। অমুক ধনীই ত সব দিতে পারেন, এমন বলা কাহারো উচিত নয়। অন্যে নিজের কর্ত্তব্য করিল কি না, তাহা ভাবিবার ভার আমার উপর নাই; আমি নিজের কর্ত্তব্য করিতেছি কি না, আমাকে তাহাই দেখিতে হইবে। এক-একজন ধনী ভাল কাজে দশপনের লক্ষ, দু-শ, পাঁচ-শ, দিয়াছেন, তাহাও ত সকলের জানা উচিত। সকলের দানের পশ্চাতে সকলের শুভ ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকিবার কথা। টাকার চেয়েও তাহার জোর বেশী।

পুস্তক-পরিচয়

নূতন শিক্ষা-প্রণালী।—শ্রীপ্রমথনাথ দাসগুপ্ত, বি-টি- প্রণীত। পপুলার লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ১॥০ টাকা। ২১৫ পৃষ্ঠা। ১৩২৪।

অনেক বালক তাড়াতাড়ি পাঠশিক্ষা করিতে অসমর্থ, আমাদের দেশে তাহারা অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়, এবং তাহাদের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয় না। এই-সকল ছাত্র বড় হইয়া নানাবিধ সামাজিক অনিষ্ট ঘটায়। তাহাদের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিলে হয়ত তাহারা কালে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিত। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই শক্তির অপচয় নিবারণার্থ শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষাপ্রণালীর ফল কি হইতেছে? গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "৬।৭ বৎসরের ছেলেকে 'এই আমার নাক, এই মোর কাণ', ইত্যাদি 'কর্ম্মসঙ্গীত' শিক্ষা করিতে দেখা যায়; এবং ৬।৭ বৎসর বয়স্ক কৃষকের ছেলেকে শিক্ষক প্রশ্ন করেন 'বলত গরুর কয়টি পা?' এবং যাহাদের শিক্ষা অভ্যাস হইয়াছে তাহাদিগকে কাঠি, বীজ, ইত্যাদি সাজাইয়া অক্ষর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। বালকের পিতামাতা ইহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যান এবং নূতন শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন।" তিনি এই অভাবে লক্ষ্য রাখিয়া 'নূতন শিক্ষা-প্রণালী' প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রায় কুড়িখানি ভাল ভাল ইংরেজী পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, মানসিক শিক্ষা, গৃহ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, বিদ্যালয়ের শাসন, শারীরিক শিক্ষা, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা (organisation) প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। শিশুর মনোবিজ্ঞান ও শিশু-প্রকৃতি সহজ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে নূতন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা জন্মিবে সন্দেহ নাই। এবং যাঁহাদের হস্তে শিশুশিক্ষার ভার ন্যস্ত, তাঁহারা অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

জ।

সাহিত্য-পঞ্জিকা (১৩২২ বঙ্গাব্দের)—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও শ্রীরাখালরাজ রায় সঙ্কলিত, মোরাদপুর বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত।

এই পঞ্জিকায় দুই ভাগ, প্রথম ভাগে ৮ অধ্যায়—(১) ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী, (২) প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নাম, (৩) আধুনিক যুগের স্বর্গীয় গ্রন্থকারগণের নাম, (৪) বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণ ও তাঁহাদের পুস্তকাবলী, (৫) মুসলমান লেখকগণের নাম, (৬) সংবাদপত্র, (৭) সভাসমিতি ও পুস্তকালয়, (৮) মুদ্রণ বিষয়ক তথ্য। দ্বিতীয় ভাগে ৫ অধ্যায়—(১) ১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ,

(২) ১৩২২ সালের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা, (৩) সাময়িক পত্রিকার তালিকা, (৪) বিগত বর্ষের মাসিক পত্রিকার বিবরণ, (৫) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিবরণ। পরিশিষ্ট।

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে প্রথম প্রচারিত বা প্রতিষ্ঠিত বহু পুস্তক পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের তারিখ আছে। ইহা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

বিষয় ও নামগুলি বর্ণানুক্রমে না থাকাতে অথবা নির্ঘণ্ট না থাকাতে কোনো নামকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হয়। বিস্তারিত সূচী, বর্ণানুক্রম রক্ষা ও নির্ঘণ্ট এ রকম বইএ থাকা উচিত।

বইখানিতে বহু সাহিত্যিক ও পত্রিকাদির পরিচয় আছে।

ভারতবর্ষের ভাগ্যপরিবর্ত্তন—শ্রীভুবনমোহন দাস কর্ত্তৃক রচিত। প্রকাশক বি কে দাস এণ্ড কোং ৪ ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা। এক টাকা।

ইহা ইতিহাস। ইহাতে আর্য্য-প্রভুতার সূত্রপাত হইতে ইংরেজ আমল পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের ইতিহাস আছে। উপসংহারে লেখক বলিতেছেন—"ইউরোপীয় বণিকগণ যদি ভারতবর্ষে প্রবেশ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে কি অবস্থা হইত বলা যায় না। ইংরাজগণ জননীর (ভারতবর্ষের) সাহায্যে অগ্রসর না করিলে অত্যাচারী পুত্রগণের হস্তে তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।"

ইংলণ্ডের ইতিহাস—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রাষ্টফণ্ড আফিস। বারো আনা।

মনীষী ভূদেব-বাবুর লেখা ইতিহাস, সপ্তম সংস্করণ। সুতরাং বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এই সংস্করণে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত ঘটনা সংযোজিত হইয়াছে।

রিয়া—শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর। স্বাধীন ত্রিপুরা। ৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

রিয়া ত্রিপুর-মহিলাদের বক্ষবন্ধনী বস্ত্র। তারই সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ কারুকার্য্যের বিবরণ।

শ্মশান-ভস্ম—স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশশিভূষণ মজুমদার ৭৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। ১১০ পৃষ্ঠা। আট আনা।

ইহাতে সংক্ষেপে তত্ত্বকথা ও ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে।

স্নেহের স্মৃতি—শ্রীমোহিনীমোহন বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ৩০ সূত্রাপুর, ঢাকা। দু আনা।

লেখকের পত্নীবিয়োগে আক্ষেপের সঙ্গে ভগবানকে ভালো বাসিবার আকাঙ্ক্ষা জড়াইয়া কতকগুলি ছোট-ছোট গদ্য-পদ্যের উচ্ছ্বাস।

কাঞ্চনতলার কাপ—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার প্রণীত। জগতাই, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ। এক আনা।

এই পুস্তিকায় জঙ্গীপুর মহকুমার প্রভাষায় পদ্যে একটি ফুটবল কাপ্ ম্যাচের বর্ণনা করা হইয়াছে। রচনার মধ্যে সরসতা ও হাস্যরস আছে। ভাষা ও শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসুর এ বই বিশেষ কাজে লাগিবে—

একজন দর্শক এই খেলা দেখিয়া গিয়া বর্ণনা করিতেছে। তার কিয়দংশ এইরূপ—

ইখ্যান উথান থেক্যা হে মামু, এস্যাছে সব দল,
লাথাছে একটা ব্যালের ঠিকিন, কহছে ফুড্বল।
দুটাতে বল্ কুড়াছিল, একটা ছিল শালিস,
শালিসট্যাই অরঘের সোগ্‌লি, অর্ কাছে হয় নালিস।
মানুষটাও বাড্ডাই ভাল, চিম্‌ড়ু টিম্‌ড়ু লয়,
উ, সিটিতে ফুঁক দিলেই খেল বন্দ কোত্তে হয়।
লয়ানসুখের দুয়ার-খ্যারটা জালের মধ্যে তোখিন,
গাদ্দাম্ কোর্‌য়া গ্যালো পড়্যা কাত্তোল মাছের ঠিকিন্।
দুটা দলই খেলতে লাগলো বাহারে বাহারে,
ভিঁড়্যাভিঁড়ি হোলছে গ্যানে যাঁহাড়ে যাঁহাড়ে।
নিমতিত্যার একটা ছোঁড়া এমনি তাক্‌নি কোর‌্যা,
একটা লাথ্ মার্‌লে বলে উজান কড়ে ধোর‌্যা।
বল্‌টা দুটা খুঁটার ভিৎরে সাঁধিয়্যা মার্‌লে কাম,
জালের মধ্যে পড়লো য্যানে ঠুঁস'র মধ্যে আম।
এব্যার মামু, দু টা দলে, কিঁ কহবো, হে আল্লা,
মুরগা লড়ায়ের ঠিকিন লেগ্যা গ্যালো পাল্লা।
পহিলকার খেল শ্যাষ হোচ্ছেনা ডুব্যা গ্যালো চীক্যাস,
আন সুমাত্তে দেখ্‌লে শালিস ঘড়ীর দফা লিক্যাস।
টিক টিক্ করেনা উটা, ধাং গেল্‌ছে ডুব্যা,
ঘড়ী বুল্যা ব্যাচেছে অরা খালি চনের ডিব্যা।
হামারও ঘড়ী ছিলহে অমনি চামঠি-বাঁধা চ্যাপ্টা,
সিগ্‌রেটের টিকোস দিয়্যা পেয়্যাছিনু অ্যাক্‌টা।
ঘড়িটা বন্দ হ'ল বুল্যা বেস্তুরমে শালিস,
পহিলা বীরে হে মামু খ্যালালে মিনিট চালিশ।
হামার লর্মীন শুন্‌হে, অর্ঘের পাছে পাছে যেয়্যা,
ফাঁকে ফাঁকে ঢোল্যা এন্ন অসগোল্লা খেয়্যা।
শ্যাষকার খেলকে ফেঁস্থাল কহে ফুডবল খেলোয়াড়ী।
কাঞ্চনতলার ছোট যাকে কহছে সব বি টিম,
পোকোড্যারঘের সঁত্তে লাগলো ভাটাম ভিটিম।
বোরমুণে মাঠ পিছল্যা হোয়্যা বাচালে জাঞ্জাল,
এক এক খেপ পড়ছে য্যানে ভাদর মেস্যা তাল।
ফেঁস্থালের খেলে শিখ্‌নু লয়্যা লয়্যা বোল,
শালিসকে 'র‌্যাফারী' কহে 'চাঁদ'কে কহে 'গোল'।
চাঁদীরূপার বাঠনু গ্যাকটা 'কাপ' কহছে অ্যাকে,
খেল জিৎলে তিন মাসের লেগ্যা বক্সিস দিবে তাকে।

মুদারাবাদ।

মীর-পরিবার—ও অন্যান্য গল্প। কাজী আবদুল ওদুদ, বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক—মঈন উদ্দীন হুসয়ন, নূর লাইব্রেরী। ১২।১ নং সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ আনা।

বইখানিতে পাঁচটি গল্প আছে। 'করিম পাগ্‌লা' গল্পটি আর চারটির চেয়ে ভাল। করিমের চরিত্রটি ভালোই ফুটিয়াছে। 'হামিদ' গল্পটির ভাষা ও আরম্ভের ধরণ ভাল; কিন্তু এটিকে গল্প বলা যায় না। 'আবদুর রহিম' গল্পটিরও প্রথমটা এবং মোট লিখিবার ধরণ মন্দ নয়, কিন্তু গল্পের প্লট প্রায় নাই।

বইটির ভাষা চলনসই। কিন্তু 'কাণ ফেলিয়া শুনা,' 'আঞ্জাম' 'খোদার দরগায় হাজার শোকর' 'নাশ্‌তা' 'খাবার খোলা' 'পেদনা পানি হওয়া' 'কালাম' 'পাশ চুকিয়া' 'চোখে মালুম হইল' 'বাঁধিবার জন্য একজন ভাল মামা রাখিল' 'রোক সোক' 'নাদান' প্রভৃতি অনেক কথা মুসলমানেরা বুঝিলেও সর্ব্বসাধারণে বোধ হয় বুঝিবে না। এইজন্য এইসব কথার মানে পরিশিষ্টে দেওয়া ভাল অথবা পরিহার করাই যুক্তি-সঙ্গত।

বইখানির কাগজ, বাঁধাই ও মুদ্রণপারিপাট্য মোটের উপর ভালই বলিতে হইবে।

ক থ গ।

ব্রাহ্মণ্য সম্পদ—বাকিপুর ব্রাহ্মণ-সভার মহাধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রদত্ত হিন্দী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। ৺কাশীধাম অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণসভা হইতে প্রকাশিত। দাম দুই আনা।

রাজা বাহাদুর বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণ্য সম্পদ কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিয়াছেন,—

"শমোদমোস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

"এই শ্লোকে যে নয়টি ঐশ্বর্য্যের কথা উক্ত হইয়াছে, ইহাই হইতেছে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য। ব্রাহ্মণের আরও অনেক ঐশ্বর্য্য আছে, যথা—সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা ইত্যাদি। উপনিষদে সত্যকাম উপাখ্যানে সত্যকাম যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, তাহা তাঁহার কেবল এক সত্যনিষ্ঠা দেখিয়াই তাঁহার গুরু যাজ্ঞবল্ক্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাভারত-রচয়িতা বেদব্যাস স্বয়ং তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ নিঃসঙ্কোচে মহাভারতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষেই সম্ভব। এই-সকল সম্পদে যে ব্রাহ্মণ যত সম্পন্ন হইতে পারিবেন, ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে তাঁহাকে ততই ঐশ্বর্য্যশালী বলিতে হইবে। এই ঐশ্বর্য্য হারাইয়াই আজি আমরা পথের ভিখারী,—দাসের দাস, হেয় হইতেও হেয়। আমরা সুপবিত্র যজ্ঞসূত্র হারাইয়াছি, তাই আজি আমরা রেলিয়ার ডোরে কণ্ঠ বিভূষিত করিয়াছি। ব্রাহ্মণ্য পবিত্রতা হারাইয়া আজি আমরা ব্রহ্মপ্রেতত্বে উপনীত হইয়াছি।

"এই ত আমাদের বর্ত্তমান দশা! ইহার উপরে আবার শুনিতে পাই, আমরা অর্থাৎ এখনকার ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকে বড়ই ঘৃণা করেন। মান্দ্রাজ প্রদেশের কত সংবাদপত্রে ইহা লইয়া আমাদের উপরে কতই কটূকাটব্য বর্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ কস্মিন্‌কালেও কোন শূদ্রকে ঘৃণা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণের বিশ্বব্যাপী মানবপ্রেম, নিজের জাতি আর অন্য জাতীয় ব্যক্তির মধ্যে কিংবা ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নতার রেখা অঙ্কন করিয়া পৃথগ্‌ভূত করিতে অসমর্থ। চণ্ডালাদি নিম্ন জাতিকে আমরা ছুঁইতে চাহিনা; এজন্য আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করি, এমন কথা বলা হয়। ব্রাহ্মণে অনুপনীত নিজ সন্তানের হস্তের অন্ন গ্রহণ করেন না। ইহা দেখিয়া কি বলিতে হইবে, ব্রাহ্মণ নিজ সন্তানকে ঘৃণা করিয়া থাকেন?"

রাজা বাহাদুর বলিয়াছেন—"ডেমক্রেসী বা জনশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত।" রাজাবাহাদুরের দল যতই কেন বিশ্বপ্রেমের বুলি আওড়ান না কেন, কথাটা সত্য নয়। ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ যবন বলিয়া বিদেশীকে, শূদ্র অন্ত্যজ বলিয়া স্বদেশীকে চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। তার ফলে তাদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি টলিতে সুরু হইয়াছে,—ডেমক্রেসী মানে এ নয় যে এক সম্প্রদায় চিরকাল নীচে থাকিয়া অপর সম্প্রদায়কে মাথায় ধারণ করিয়া থাকিবে,—যে নিম্নশ্রেণীর উপর প্রভুতা করিয়া ব্রাহ্মণের বড়াই, তারা মাথা নাড়া দিতে সুরু করিয়া যে-সিংহাসন টলাইয়াছে তাহার ভাগ অপর জাতের যোগ্য লোকেরাও লইবে, ব্রাহ্মণ সেখানে আর অচলপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে না। তার পরিচয় নীচের বইখানি হইতে দেখাইতেছি—

জিজ্ঞাসা সঙ্গীত—শ্রীউমেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ভাবদা-স্কুলের প্রধান শিক্ষক। চার আনা।

এই লেখক একটি গানে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের অবিচার ও অত্যাচার আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কি কারণ ব্রাহ্মণ জাতিজনক হবে?
ব্রহ্মা ত কারণ নহে, ব্রহ্মায় উদ্ভব সবে।"

তারপর ঐ সঙ্গীতের টীকায় শুক্রনীতির বচন (১।৩৮-৩৯) উদ্ধৃত করিয়া আপন উক্তি সমর্থন করিতেছেন—

"ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব বা।
ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ॥
ব্রহ্মণস্তু সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বে তে কিং ন ব্রাহ্মণাঃ।
ন বর্ণেন চ জনকাদ্ ব্রহ্মতেজঃ প্রপদ্যতে॥

শুক্রনীতি ।১।৩৮—৪০

"অর্থাৎ,—এই জগতীতলে জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র ম্লেচ্ছ ইত্যাদি রূপ নির্দ্দেশ হইতে পারে না; যেহেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মানবগণ সকলেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা হইলে সকলকেই ব্রাহ্মণ হইতে হয়। বাস্তবিক মনুষ্যগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের দ্বারাই বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, বর্ণ দ্বারা অথবা জনকের দ্বারা কেহই ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিতে পারে না।"

যদি কেউ বলে যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তার প্রাধান্য, তাও খাটে না। ব্রহ্মার মুখ হইতে শুধু ব্রাহ্মণের উৎপত্তি নহে, ছাগলেরও উৎপত্তি হইয়াছিল—

'প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতান্বসৃজ্যত গায়ত্রীচ্ছন্দো রথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যা মুখতো হ্যসৃজ্যন্ত।' ইত্যাদি।

তৈত্তিরীয়সংহিতা। ৭।১।১।৪—৯।

"অর্থাৎ,—প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন 'আমি জন্মিব' তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, রথন্তর সাম, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুদিগের মধ্যে অজ (ছাগ) মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।"

আবার অন্য পক্ষে—"দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি হইয়াছিলেন?"—হিন্দুশাস্ত্র।

'শরীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত॥'

মৎস্যপুরাণ।৩৯

'বেদমাতৃজপেনৈব ব্রাহ্মণো নহি শৈলজে।
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি! তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

নীলতন্ত্র। নবত্রিংশ পটল।

"অর্থাৎ, হে পার্ব্বতি! কেবলমাত্র সন্ধ্যাগায়ত্রী জপের দ্বারাই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় তাহা নহে, যখন মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

"ইষ্টীশ্চ বিবিধাঃ প্রোপ্য ক্রতূংশ্চৈবাপ্তদক্ষিণান্।
প্রাপ্নোতি নৈব ব্রাহ্মণ্যমভিধানাৎ কথঞ্চন॥"

মহাভারত। মোক্ষাধ্যায়। ৭৭।২ ৪

"অর্থাৎ, ঋক, যজুঃ এবং সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায়, তাহা নহে।

"ব্রাহ্মণ্যলাভের প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় না।

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

অত্রিসংহিতা। ৩৭২

"অর্থাৎ,—যে ব্রাহ্মণ বেদ ও পরমাত্মার তত্ত্ব কিছুই জানেন না, অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করেন, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ পশু বলিয়া খ্যাত হন।

"ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে।

"বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম্ম আর ব্রহ্ম। যিনি তপস্যাদ্বারা সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন তিনিই ব্রাহ্মণ,—জগজ্জনের আরাধনীয়। দেখ—

"বেশ্যাগর্ভসমুৎপন্নো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
দাসীগর্ভসমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনিঃ॥
কৈবর্ত্তীগর্ভ উৎপন্নো ব্যাসশ্চৈব মহামুনিঃ।
ক্ষত্রিয়াগর্ভ-উৎপন্নো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥
মৃগীগর্ভসমুৎপন্ন ঋষ্যশৃঙ্গো মহামুনিঃ।
কুম্ভাচ্চৈব সমুৎপন্নো অগস্ত্যশ্চ মহামুনিঃ॥
শূদ্রীগর্ভসমুৎপন্নঃ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ।
তপসা ব্রাহ্মণো জাতঃ তস্মাজ্জাতির্ন কারণম্॥"

মুদ্রারাক্ষস।

দেশের কথা

দেশ কি চায়?

ভারতবর্ষ হোমরুল বা স্বায়ত্ত-শাসন চায়। জগতের নিকট—জগতবাসীর নিকট ভারতবাসী মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে—মানবোচিত ব্যবহার পাইতে চায়, ভারতবাসীর প্রাণে যে আত্মসম্মান বজায়ের ভাব জাগ্রত হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবাসী মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে চায়। স্বায়ত্তশাসন-হীনতায় ভারতবাসী জগতের নিকট যে পশুজনোচিত ব্যবহার পাইয়া আসিতেছে তাহা ভারতবাসীর অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।—যশোহর।

এর প্রধান উপায় দেশে শিক্ষার বিস্তার। 'শিক্ষা-বিস্তারের একটি প্রণালী' শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী এইরূপ ভাবিয়াছেন—

জ্ঞান মনুষ্যের পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিচয় ও শিক্ষা জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। অশিক্ষিত লোক সমাজের গ্লানি। যে-সমাজে যত অধিক অশিক্ষিত লোক বাস করে সে-সমাজ তত দুর্ব্বল ও প্রপীড়িত।

ভারতে বরোদা প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র করদমিত্র রাজ্যে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রজা হইয়াও আমরা এই ফললাভে বঞ্চিত হইয়াছি।

কলেজ, মেডিকেল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, গুরুট্রেনিং স্কুল, সংস্কৃত বিদ্যালয়, আরবী ও পারসী মাদ্রাসা ইত্যাদি ব্যতীত নিম্ন-প্রাথমিক হইতে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত, বঙ্গদেশে প্রায় ১৮½ লক্ষ ছাত্র (ছাত্রীসহ) অধ্যয়ন করে। ইঁহাদের মধ্যে ২½ লক্ষ ছাত্র যদি পুরাতন পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তবে অবশিষ্ট ১৬ লক্ষ ছাত্রের প্রতিবৎসর নূতন পাঠ্য পুস্তক খরিদ করায় আবশ্যক হয়। নিম্নপ্রাথমিক হইতে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ১৬ লক্ষ ছাত্র হইতে ১৪৪ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর পুস্তক-প্রকাশকগণ পাইতেছেন। ইউনিভারসিটি হইতে প্রকাশিত পুস্তকের মূল্য ইউনিভারসিটি গ্রহণ করিয়া তাহার লাভের টাকা শিক্ষা-কার্য্যেই ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ১৪৪ লক্ষ টাকার গ্রন্থ হইতে মুদ্রণ আদি খরচ ব্যতীত লাভের অংশ পুস্তক-প্রকাশকগণ প্রাপ্ত হইয়া নিজেরাই লাভবান হইতেছেন। ইহাতে সাধারণের কোন উপকার হয় না।

এক্ষণে যদি এমন কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যে নিম্নপ্রাথমিক হইতে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমুদয় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলি শিক্ষাবিভাগের যোগে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উপরিউক্ত ১৪৪ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইতে পারে। উক্ত ১৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে তাহার ⅝ অংশ খরচ বাদে বক্রী ৫৪ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে মজুত থাকিতে পারে। ইহা হইতে যদি ৬ লক্ষ টাকা পুস্তকপ্রণেতাগণকে বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া যায়, তবে বক্রী ৪৮ লক্ষ টাকা মজুত থাকে। এই টাকা গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন।

বঙ্গদেশের ডিরেক্টার বাহাদুরের ১৯১৫—১৬ সনের রিপোর্ট জানা যায়, ঐ বৎসর শিক্ষাবিভাগে প্রায় ২৫৯ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে এবং তাহাতে সর্ব্বপ্রকারের ৪৬৭৭০টি স্কুল ও কলেজ পরিচালিত হইয়াছে। ঐ খরচের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ১৫৫ লক্ষ টাকা ছাত্র-বেতন ও সাধারণের প্রাইভেট দান এবং প্রায় ১০৪ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের রাজকোষ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপাল বোর্ড ও দেশীয় করদরাজ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কলেজ, মেডিকেল স্কুল, গুরুট্রেনিং স্কুল, সংস্কৃত বিদ্যালয়, আরবী ও পারসী মাদ্রাসা ইত্যাদিতে যদি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, তবে অবশিষ্ট ৯৬ লক্ষ টাকা নিম্নপ্রাথমিক হইতে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৪৬৫০০ স্কুলের পরিচালন-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে ৪৮ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে মজুত থাকিতে পারে। ইহা পূর্ব্বোক্ত ৯৬ লক্ষ টাকার অর্দ্ধেক। এই টাকার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট স্কুল পরিচালন করিলে ঐ সমুদয় স্কুলের ছাত্রবেতন ও সাধারণের প্রাইভেট দান হইতে যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাও ১৯১৫—১৬ সনে ঐ বাবদ প্রাপ্ত টাকার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৪৬৫০০ স্কুলের জন্য ব্যয়িত টাকার অর্দ্ধেক হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায়, কেবল ঐ প্রণালীতে প্রাপ্ত টাকা, ছাত্র-বেতন ও সাধারণের প্রাইভেট দান হইতে আরও (৪৬৫০০ ÷ ২) = ২৩২৫০টি স্কুল পরিচালিত হইতে পারে। ঐ সকল স্কুল স্থাপিত হইলে ছাত্রদের সংখ্যাও বাড়িবে এবং ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণও বাড়িবে। এইরূপে বর্ষে বর্ষে ছাত্র ও আয়ের পৌনঃপুনিক বৃদ্ধির সঙ্গে কার্য্যারম্ভের ১০ বৎসর পরে উক্ত টাকায় সমগ্রবঙ্গে লক্ষাধিক স্কুল পরিচালিত হইতে পারে। তাহা হইলে ২০ বৎসর পরে গড়ে শতকরা অন্ততঃ ২০ জন বাঙ্গালীর ভাগ্যে শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে দেখা যাইবে। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে গৌরবের কথা তাহা ভাবিলেও অপার আনন্দ উপস্থিত হয়।

বৈতনিক বিদ্যালয় ব্যতীত উপরি উক্ত ৪৮ লক্ষ টাকা আয়ে যদি গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনও সুসঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে দেখা যায়, ঐ আয়ে মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে ৩০০০টি নিম্নপ্রাথমিক, মাসিক ৪৫৲ টাকা হিসাবে ২০০০টি উচ্চ প্রাথমিক, মাসিক ১২০৲ টাকা হিসাবে ১০০০টি মধ্য ইংরেজী, মাসিক ৬০০৲ টাকা হিসাবে ১৩৫টি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়া ৪৮০০০৲ টাকা মজুত থাকে। সকল দেশে সাধারণতঃ নিম্ন শিক্ষার জন্যই অবৈতনিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হইতে দেখা যায়। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও যদি কেবলমাত্র ঐ ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হন তবে উক্ত ৪৮ লক্ষ টাকায়, মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে ৬০০০টি নিম্নপ্রাথমিক ও মাসিক ৪৫৲ টাকা হিসাবে ৪১২০টি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল পরিচালিত হইয়া ৫৫২০০৲ টাকা মজুত থাকে। এরূপে বর্ষে-বর্ষে ছাত্র ও আয়ের পৌনঃপুনিক বৃদ্ধির সঙ্গে, কার্য্যারম্ভের ১৫ বৎসর পরে উক্ত টাকায় বর্ত্তমান স্কুলসংখ্যার সমপরিমাণ অবৈতনিক বিদ্যালয় পরি-

চালিত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। ইহা রাজা ও প্রজার পক্ষে কম লাভের বিষয় নহে।

অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের এবং সাধারণের শাইক্ষেত্র দান হইতেই পাওয়া যাইবে।

সত্য বটে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্যানুবর্ত্তী হইলে গ্রন্থপ্রণেতাগণের আংশিক ক্ষতি হয়। কিন্তু বিশাল লোকসমষ্টির উপকারের তুলনায় মুষ্টিমেয় লোকের এই ক্ষতি অকিঞ্চিৎকর। পরন্তু এই ক্ষতির আংশিক পরিপূরণ জন্য পুস্তক প্রকাশের খরচের হিসাবের পরেই ইহাদিগকে পুরস্কার দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পুরস্কারের পরিমাণ সর্ব্বসমষ্টিতে বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা হইলেই যথেষ্ট। বার্ষিক এই টাকা নিম্নপ্রাথমিক স্কুল হইতে উচ্চ ইংরেজী স্কুল পর্য্যন্ত পুস্তক-প্রণেতাগণকে বিভাগ করিয়া দিলে, ১ম—২য় শ্রেণীর ছাত্রগণের ১২ জন পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ১২০০০৲ টাকা, ৩য়—৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের ২৪ জন পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ৪৮০০০৲ টাকা, ৫ম—৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রগণের ৩০ জন পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ১২০০০০৲ টাকা, ৭ম—৮ম শ্রেণীর ছাত্রগণের ৩০ জন পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ১৮০০০০৲ টাকা, ৯ম—১০ম শ্রেণীর ছাত্রগণের ৩০ জন পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ২৪০০০০৲ টাকা পাইতে পারেন। ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট না হইলে পূর্ব্বোক্ত ৬ লক্ষ টাকায় মাসিক বেতনেও বহু গ্রন্থকার নিয়োগ করা যাইতে পারে। অথবা সামান্য পুরস্কার দানে শিক্ষা বিভাগ হইতেও ঐ জন্য সুযোগ্য লেখক সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ১৪৪ লক্ষ টাকার পুস্তক প্রকাশ করিতে ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই ৯০ লক্ষ টাকা পূর্ব্বে খরচ করিয়া পরে বৎসরান্তে ১৪৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ঐ মূলধন কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? এক্ষেত্রেও গবর্ণমেণ্ট উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিবেন।

ঋণ কোথায় পাওয়া যাইবে? তাহা অবশ্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, মিউনিসিপাল বোর্ড, ১০ লক্ষ ছাত্রের অন্ততঃ ৫ লক্ষ অভিভাবক, ৪৬ হাজার স্কুলের অন্ততঃ দেড় লক্ষ শিক্ষক, জমিদারগণ ও অপরাপর জনসাধারণ মীমাংসা করিবেন।—নোয়াখালী সম্মিলনী।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচিত কমিটি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা বিস্তারের প্রতিকূলতা করিয়া নিজেদের বুদ্ধিহীনতা ও দেশবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধতার পরিচয় দিলেও অন্যত্র ইহার সমর্থন হইতেছে—

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নিম্ন শিক্ষা।—মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি গত ২রা ফাল্গুনের অধিবেশনে এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে উহার এলাকায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নিম্ন শিক্ষা প্রচলন করা হইবে। বঙ্গের সমস্ত মিউনিসিপালিটির মধ্যে মেদিনীপুরই সর্ব্ব প্রথমে এই শুভকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতীব সুখী হইলাম।—মেদিনীবান্ধব।

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা।—দারজিলিং মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণ সকলে একমত হইয়া অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি অনুমোদন করিয়াছেন। এই দেশের ভীষণ নিরক্ষরতা যাহারা দূর করিতে অভিলাষী তাঁহাদিগকে সত্বর বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

[illegible]

আমাদের দেশের শিক্ষার ও শিক্ষিতের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে—

এ বৎসর ১৮২৩ জন বি এ এবং ৩০৪ জন বি, এস সি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮জন মহিলা আছেন। ১৭৫ জন এম এ, ৭১ জন এম.এস-সি, ১৯ জন বি টি, ১১৭ জন বি-এল, ৪০ জন এম-বি, ৭ জন বি ই, ২ জন এম-এল, ২ জন এম-ডি, ২ জন পি.এইচ-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ১৫ জন মুসলমান, দুইজন এংলো-ইণ্ডিয়ান, একজন পার্সী ও ছয়জন মহিলা ছিলেন।—সম্মিলনী।

শিক্ষা-সংবাদ।—বাঙ্গালায় গত বৎসর শিক্ষোপযোগী বয়সের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৪৪ জন ও মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৮ জন বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করিতেছিল। স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ বিস্তারলাভ হয় নাই। সর্ব্বসমেত বাঙ্গালায় শিক্ষার জন্য ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ শত ৭৮ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এই টাকার শতকরা ৪০ ভাগ সাধারণ শিক্ষাবিস্তার-তহবিল হইতে, ৪৪ ভাগ ছাত্রদত্ত বেতন হইতে, ১৬ ভাগ দানাদি হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গে সাহিত্যকলেজের সংখ্যা ছিল—৩২টি। এই-সব কলেজে মোট ১৭ হাজার ২ শত ২৬ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। এই ৩২টি কলেজের মোট বার্ষিক ব্যয় ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯ শত ৪০ টাকা। ইহার মধ্যে ছাত্রদত্ত বেতন হইতে ৯ লক্ষ ৭ হাজার ৭ শত ৮৭ টাকা ওয়াশিল হইয়াছে। বালকদিগের শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬ শত ২৭টি। এই-সব স্কুলে মোট ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৩৪ জন ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে। এই সব স্কুলের মোট ব্যয় ৪৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮ শত ৯৮ টাকা। তাহার মধ্যে ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৯ শত ৫ টাকা ছাত্রদত্ত বেতন হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৭০ হাজার ৬ শত ১৭টি, ছাত্র ছিল ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৪ শত ৬৮ জন। এই সব স্কুলের মোট খরচ ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৮ শত ৯৯ টাকা; ছাত্রদত্ত বেতন ১৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত ৯৬ টাকা। ছাত্রদত্ত বেতন বাদ দিলে দেখা যায়—সরকার ও বোর্ড প্রভৃতি এই-সব স্কুলে যে অর্থ সাহায্য দিয়াছেন, তাহাতে প্রতি স্কুলে মাসিক সাহায্য ৫ টাকার কিছু বেশী মাত্র।—সম্মিলনী।

দেশের নানা দিকে নব নব শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বা পুরাতনগুলি অর্থসাহায্যে পুষ্ট হইতেছে—

মেদিনীপুর কলেজ।—গতবর্ষে প্রকাশ অত্রত্য কলেজের কর্তৃপক্ষগণ বিএ এবং বি, এস, সি, ক্লাশ খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।—মেদিনীবান্ধব।

বি এ ক্লাস।—শুনিতেছি মেদিনীপুর কলেজের বি এ ক্লাস খোলার আয়োজন করা হইতেছে। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

সৎ প্রস্তাব।—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বিক্রমপুরের অধিবাসিগণ বিক্রমপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভ প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি।—কাশীপুরনিবাসী।

ফেণীতে কলেজ। ফেণীতে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ সংস্থাপন করার প্রস্তাব অনেক দিন যাবৎ চলিতেছিল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কমিশনার মিঃ ওকে এই কলেজ স্থাপন প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।—সম্মিলনী।

কুমিল্লা বি. এ, কলেজ স্থাপনের জন্য নেতৃবর্গ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। কুমিল্লার ধনী মহোদয়গণ এজন্য অর্থদান করিতেছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ এবং অপরাপর সকলেই যথাশক্তি সাহায্য দান করিতেছেন। মফঃস্বলের সমস্ত জমীদার তালুকদার মহাজন প্রভৃতি গণের নিকটও এজন্য আবেদন করা উচিত। যাহাতে আগামী সেসনে বি, এ, কলেজ স্থাপিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা এখন হইতেই বিশেষ ভাবে করা উচিত।—ত্রিপুরাহিতৈষী।

নূতন স্কুল: আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১০ই মার্চ তারিখে রামনগর থানার অন্তর্গত চাউলখোলা গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন জন্য স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া সভা করিয়াছিলেন। মেদিনীবান্ধব।

হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়:—স্থানীয় হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে এই অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্রীসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে এবং শিক্ষাপদ্ধতিও উত্তম হইয়াছে।—মেদিনীবান্ধব।

নূতন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।—পাঁশকুড়া থানার অধীন কুমার হাট-নিবাসী শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু জমিদার মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া জননী স্বর্ণময়ীর নামে স্থানীয় দেউলিয়া মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়কে হাই স্কুলে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।—মেদিনীবান্ধব।

নূতন ইংরেজী বিদ্যালয়—সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় বর্ত্তমান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৩০টি। তন্মধ্যে ১২।১৪টি বিদ্যালয় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নবপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে এই জেলা বাসীর উচ্চশিক্ষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ যে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সেদিন তমলুক মহকুমার নব-প্রতিষ্ঠিত কুকড়াহাটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কথা আমরা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি অবগত হইলাম, পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত দেউলিয়া মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার আয়োজন হইতেছে। ইহাদের এই সৎ চেষ্টা সফল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।—নীহার।

অনুন্নত শ্রেণীর বিদ্যালয়—মেদিনীপুর সহরে সম্প্রতি মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কালীপদ হাজরা মহাশয়ের উদ্যোগে ঝাড়ুদারদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে ঝাড়ুদার ও মিউনিসিপ্যালিটীর শকট চালকগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বর্ত্তমান ৩০ জন। ইহাদের শিক্ষাদানের জন্য আপাততঃ একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে।—নীহার।

পাঠাগারে দান। চন্দননগরের প্রসিদ্ধ বণিক ও সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় চন্দননগর পাঠাগারের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ১০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

দান।—চাচলের কুমার শিবপদ রায় চৌধুরী ২ সহস্র এবং মিঃ মাণিকলাল শেঠ ১ শত মুদ্রা কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।—ত্রিপুরাহিতৈষী।

দান। জলপাইগুড়ির উকিল বাবু চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম এ, বি এল, কাশীপুর অনাথ আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

দেশ-কথা, ঢাকা।

কিন্তু কেবলমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা হইলেই দেশের অভাব মোচনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না।

শিল্প শিক্ষালয়। নিখিল কি চায়? ছাত্রগণের বিশ্ববিদ্যালয় ... নিকট ভারতবাসী চাহিতেছে প্রকৃত মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয় ... বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে শিক্ষা দিতেছে তাহাতে প্রকৃত মানুষ জন্মাইতেছে খুব কমই বরং ভারতের বিশেষত্ব—জাতীয়তা ভুলিয়া তাহারা একটা কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হইতেছে, তাহাদের স্বাস্থ্য নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই, অন্ন সংস্থানের উপায় নাই, শিল্প-বাণিজ্যের এবং বিজ্ঞানের শিক্ষা অভাবে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াও তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে স্বজন পরিপালন করিতে অক্ষম থাকে, তাহাদের হৃদয়ে কোনরূপ আত্মনির্ভর-শীলতার ভাব জাগ্রত হয় না, তাহারা নিতান্ত নিরুপায়ের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। অভিভাবকেরাও এই সকল উপাধিপ্রাপ্ত যুবকদের লইয়া বিষম চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাহাদের স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তাহারা চিরদিন যাতনা অনুভব করে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহারা আশাভঙ্গের মর্ম্মন্তুদ বেদনা অনুভব করে। আবার মনন-শক্তিতেও তাহারা তেমন শক্তিশালী হইতে পারে না, চরিত্র উন্নত না হওয়ায় নানা প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না, তাই দেশবাসী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিতেছে না, তাই ভারতবাসী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নিকট মানুষ চাহিতেছে। ছাত্রগণ যাহাতে চরিত্রে মহত্ত্বে দেশ ভক্তিতে স্বাস্থ্যসম্পদে এবং কর্ম্মকুশলতায়, এক কথায় সর্ব্ব দিকে মানুষ নামের যোগ্য হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য দেশবাসী বিশ্ব-বিদ্যালয়-সমূহের নিকট তেমন শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্দেশ করিবার প্রার্থনা করিতেছে।—যশোহর।

আমাদের দেশের যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসে তখন তাহারা চক্ষে অন্ধকার দেখে, ওকালতি ডাক্তারী মাষ্টারী অথবা কেরানীগিরি ভিন্ন আর কিছুই অর্থাৎ কোন পন্থাই দেখিতে পায় না; তখন হা হুতাশে তাহাদের হৃদয় ভরিয়া যায়। কিন্তু এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের যে বিপুল ক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে তাহারা তাহার কিছুই দেখিতে পায় না। এই-সকল যুবকদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাগাইতে পারিলে যে তাহাদের ভবিষ্যত জীবন উন্নত হয়, দেশের মহদুপকার সাধিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। মনে হয়, দেশের সর্ব্বত্র যদি ব্যবসা ব্যাঙ্ক এবং প্রত্যেক স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনাযুক্তি পরামর্শকারী সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের পরামর্শকারী সমিতিসমূহের উপদেশানুসারে ব্যাঙ্কের মূলধন সাহায্যে দেশে অনেক প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য এবং কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।—যশোহর।

এই দিকে গভর্মেণ্টের যৎসামান্য চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জেলাবোর্ডেরও উদ্যম দেখা যাইতেছে।

টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন। বিবিধ কলকারখানাসংযুক্ত শিল্পবিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট ত্রিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। চট্টগ্রামবাসীরা একদিকে সুবিস্তৃত অরণ্যানীর পার্শ্বে ও অন্যদিকে বিশাল সমুদ্রতটে বাস করিতেছে। কিন্তু এই অরণ্য ও সমুদ্র হইতে জীবিকার্জ্জনের জন্য যেসমস্ত নব উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষা আবশ্যক চট্টগ্রামবাসী তাহার কিছুই জানে না বলিলেই হয়। এদেশের অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার মুসলমান সমুদ্রপথে জাহাজে খালাসীর কাজে নিয়োজিত আছে। এই লস্করগণের ব্যবসা নিম্ন শ্রেণীর কাজ বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা ইহাকে ভারতের একটা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। যিনি একবার লস্করদের সঙ্গে দুদণ্ড বসিয়া আলাপ করিয়াছেন, তিনিই জানেন ইহারা কত সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, ইহারা সকলেই কেমন সুস্থ ও সবল। বিলাত প্রভৃতি রাজ্যে এই শ্রেণীর লোকের জন্য যেমন মেরিন স্কুল আছে ভারতে তেমন নাই। চট্টগ্রামে একটি মেরিন-স্কুল স্থাপনের

জন্য আমরা বহুবার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছি। তেমন স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে সামুদ্রিক বিভাগের জন্য উন্নত শ্রেণীর লস্কর ও মেরিন অফিসার এখানেই পাওয়া যাইবে। জাহাজ ষ্টীমার পরিচালনের জন্য যে বহুলোকের প্রয়োজন একা চট্টগ্রামই তাহার অধিকাংশ যোগাইতে সমর্থ হইবে। আশা করি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই বিনীত প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন। জ্যোতি।

জেলাবোর্ডের বৃত্তি- সম্প্রতি বঙ্গের জেলাবোর্ড সমূহের ইঞ্জিনীয়ারীং, ডাক্তারী, কৃষি, বস্ত্র-বয়ন, মূক ও বধির, শিল্প এবং পশু চিকিৎসাদি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ যে বৃত্তি প্রদানের তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বাকুড়ার মত গরীব জেলাবোর্ড ২৬টি এবং পাবনার মত ক্ষুদ্র জেলাবোর্ড ৮৪টি বৃত্তি প্রদান করেন; অথচ এত বড় মেদিনীপুর জেলাবোর্ড মাত্র ৫টি বৃত্তি দিয়া থাকেন। ইহা মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। উক্ত তালিকায় প্রকাশ, বর্দ্ধমান ২, বীরভূম ৬, বাঁকুড়া ২৬, মেদিনীপুর ৫, হুগলী ১০, হাওড়া ১৮, ২৪ পরগণা ১২, নদীয়া ১৩, মুর্শিদাবাদ ১, যশোহর ৮, খুলনা ৩, ঢাকা ৮, ময়মনসিংহ ৩, ফরিদপুর ২৩, বাখরগঞ্জ ৩০, চট্টগ্রাম ৯, ত্রিপুরা ২, নোয়াখালী ১১, রাজসাহী ২২, দিনাজপুর ১, জলপাইগুড়ি ১, রঙ্গপুর ১২, বগুড়া ৮, পাবনা ৮৪, মালদহ ২৩, মোট ৩৬২টি বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। --নীহার।

জেলাবোর্ডের সদুদ্যোগ :—মুটরা পুষ্করিণী নামে একটি বৃহৎ জলাশয় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল অসংস্কৃত অবস্থায় ম্যালেরিয়া-বীজের আকার স্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান ছিল; স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস, সবরেজেষ্ট্রী, পোষ্ট আফিস ও থানা ঐ পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ঐ পুষ্করিণীর সম্পূর্ণরূপে পঙ্কোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্ত্তৃক প্রায় পাঁচ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং খননকার্য্য যাহাতে বর্ষাগমের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হয় তজ্জন্য ইতিমধ্যেই কার্য্যারম্ভের উদ্যোগ করা হইতেছে।—মেদিনীবান্ধব।

ইহা ছাড়া ব্যবসায়ের দ্বারাও যাহাতে দেশের অভাব দূর হইয়া অর্থাগম হয় তাহারও চেষ্টা ঈষৎ দেখা দিয়াছে—

যশোহর ঝিকরগাছা থানার এলেকায় গদখালী নামক স্থানে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী একটি ডেয়ারী ফারম খুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই ফারমের মূলধন হইতেছে দশ লক্ষ টাকা। এই ফারম হইতে দুগ্ধ ঘৃত ছানা প্রভৃতি সামগ্রী কলিকাতায় চালান হইবে। ইহাতে কলিকাতায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃতাদি পাইবার সুবিধা হইবে, লোকের স্বাস্থ্য উন্নত হইবে, সুখের কথা।—শশী।

শুভ-চেষ্টা—আমাদের দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান-কল্পে দেশে যাহাতে অধিক পরিমাণে কাপাস চাষ ও গৃহে গৃহে চরকার প্রচলন হইতে পারে, তদ্বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমরা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম, এতদঞ্চলের নানা স্থানে কিছু কিছু কাপাস চাষ হইয়াছে। অন্যদিকে স্থানে স্থানে লোকে নূতন চরকা তৈয়ারী করিয়া সেই চরকায় স্ত্রীলোকদের সূতা কাটা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এ ছাড়া ৩৪ এক স্থানে দু-একটি উন্নত প্রণালীর নূতন তাঁতেরও প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ডুমুরদহ ও বাগনিয়া গ্রামে কয়েকটি উন্নত প্রণালীর তাঁত চলিতেছে। পটাশপুর, দাঁতন ও ভগবানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে উন্নত প্রণালীর তাঁতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। দেশের বস্ত্রাভাব নাশ ইহা সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ হইলেও এই শুভ চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। দেশের সকল স্থানে যাহাতে এই প্রথা অবলম্বিত হয়, সে বিষয়ে সকলেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। নচেৎ বস্ত্রাভাবে আমাদের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না।—নীহার।

দেশের মধ্যে সেবার ভাব ও পরস্পরের সহযোগিতাও জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে! --

বিগত ২৭শে ফাল্গুন চাটমোহর থানার প্রায় দুই মাইল দূরে জনমানবশূন্য মাঠের মধ্যে মজঃফরপুরবাসী জনৈক লোক কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া একটা বাবলা গাছের নীচে পড়িয়া ছিল। বেলা প্রায় ১।টার সময় চাটমোহর শম্ভুনাথ বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ভুঁয়াইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই পথে বাইক যোগে যাইতেছিলেন, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে মুমুর্ষু পথিককে দেখিয়া রমেশ বাবু অপর একজন পথিককে রোগীর নিকট একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া সত্বর চাটমোহর থানায় উপস্থিত হইয়া উপস্থিত বিপদে পুলিশকর্ম্মচারীর সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু লোকরক্ষক পুলিশ মহোদয় তাঁহার প্রার্থনায় তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না দেখিয়া স্কুলে গিয়া প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন। সদয়হৃদয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত এবং ব্যথিত হইয়া কোনও ছাত্র ঐ রোগীর জীবন রক্ষার জন্য ইচ্ছুক ও উদ্যোগী আছে কি না জানিবার অভিপ্রায় প্রকাশ মাত্র প্রথম শ্রেণীর কতিপয় ছাত্র সাগ্রহে ও সোৎসাহে শুশ্রূষার জন্য প্রস্তুত হইল। স্বেচ্ছাসেবকগণ তখনই দুইটি ছাত্রকে দুই ঘটী জল সহ বাইক যোগে রওনা করিয়া অবশিষ্টেরা পদব্রজে সত্বর রওনা হইল। অগ্রগামী ছাত্রদ্বয় জল সহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল পথিকটি তখনও সেখানে রোগীর নিকট বসিয়া আছে এবং একজন কনষ্টবল রোগীর নিকট টাকা পয়সা কি আছে তাহাই তলব করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে রোগীর জীবন রক্ষার জন্য এক ঘটী জলও লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করে নাই! অবিলম্বে অবশিষ্ট ছাত্রগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। কিরূপে রোগীকে সেই রৌদ্রতপ্ত ভীষণ মাঠ হইতে নিরাপদ স্থানে লইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যায় তাহার জন্য তাহারা যানবাহনের চেষ্টায় দূরবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই রোগীকে বহন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় বেহারাদিগের নিকট একখানি পালকী ভাড়া করিয়া লইয়া গিয়া রোগীকে তাহাতে উঠাইয়া নিজেরা স্কন্ধে বহন করিয়া চাটমোহরের চেরীটেবল ডিস্‌পেন্‌সারিতে আনিয়া ডাক্তারবাবুর হস্তে সমর্পণ করে।--স্বরাজ।

শিক্ষকের ছাত্র বাৎসল্য। খুলনা জেলার মনসা গ্রামের অধিবাসী এবং কদমতলা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং ৪০ জন ছাত্র গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিন খানি নৌকায় শ্রীশ্রী৺সরস্বতী দেবীর প্রতিমা সহ আরোহণ করিয়া নদীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে যান। তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবার সময় দুইখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া যায়। নদীতে প্রবল তরঙ্গ ছিল, সকলেই আপন আপন জীবন রক্ষায় ব্যস্ত হইয়া সন্তরণ দ্বারা তীরে উঠিতেছিল, এমন সময় শিক্ষক দেখিলেন যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক দুইটি ছাত্র নাই। তখন তিনি নিজের জীবনের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষ্য না করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় জলে ঝাঁপ দিয়া যেখানে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল সেইদিকে ধাবমান হইলেন এবং ক্ষিপ্রগতিতে বালক দুইটিকে দুই হাতে লইয়া সহকষ্টে তীরে উঠিলেন। তীরে উঠিয়াই অতিরিক্তশ্রমজনিত অবসন্নতায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অল্পক্ষণ পরে শিক্ষক মহাশয়ের সংজ্ঞা আসিলে তিনি ছাত্র দুইটিকে অক্ষত দেখিয়া নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া

গিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। শিক্ষকের এরূপ ছাত্র-বাৎসল্য সবিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।—রাঢ় দীপিকা।

রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর জেলার সর্ব্বত্র পল্লী-সমিতি গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সমিতি হইতে জেলাবাসী কি মহদুপকার প্রাপ্ত হইবে, তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য রায় বাহাদুর নিজ ব্যয়ে প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছেন।—যশোহর।

ছাত্রের অতিথি সেবা।—আজ কয়েক দিবস গত হইল ধুলিয়ান এলাকার কতকগুলি মজুর-খাটা লোক দুমকা অঞ্চলে মজুরী করিতে গিয়াছিল। শুনিলাম ফেরৎ কালীন তাহাদের মধ্যে ৪ জন লোক বিশেষ কারণবশতঃ সঙ্গিহীন, অর্থহীন, চলৎশক্তিহীন ও ক্ষুধার জ্বালায় অধীর অস্থির হইয়া অতিথিরূপে "ভাড়ুলাল ইউনিয়ন মেসে" আশ্রয় গ্রহণ করে। উক্ত ছাত্রাবাসের মেম্বরগণ ও পরিচালক ভুড়িয়া-নিবাসী শ্রীমান্ আবদ্-উর-রউফ মিঞা (রামপুরহাট পুরাতন স্কুলের ম্যাট্রিকিউলেশান ক্লাসের ছাত্র) তাহাদের দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের খাইবার ও শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আমরা প্রত্যেক ছাত্রের ভিতর এরূপ পরদুঃখকাতরতা, পরোপকার, অতিথি-সেবা, দয়া, ধর্ম্ম, দান ও ভ্রাতৃভাব দেখিতে পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর উক্ত মেসের মেম্বরগণের ও রউফ মিঞার মঙ্গল করুন।—রাঢ়-দীপিকা।

অতিথি-শালা।—সিউড়ির ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিচরণ মাড়োয়ারী ও শ্রীযুক্ত লছমন মাড়োয়ারী তাঁহাদের বাড়ীর সন্নিকটে ৺হংসবাহিনীর বাড়ীতে একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি।—বীরভূমবার্ত্তা।

সৎকার্য্য—গত ১৮ই ফাল্গুন বীরভূম জেলার রাজনগর থানার অধীন চন্দ্রপুর গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ হঠাৎ অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রপুরের প্রজাবৎসল জমীদার শ্রীযুক্ত কমলাকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় হতভাগ্য প্রজাগণের এই দুর্দ্দশার কথা শুনিবামাত্র সেখানে যাইয়া প্রত্যেকের গৃহে গৃহে গমন করতঃ তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে ধান, নগদ টাকা এবং গৃহ নির্ম্মাণার্থ তালগাছ, শালগাছ, খড় প্রভৃতি প্রদান করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।—বীরভূমবার্ত্তা।

শুভানুষ্ঠান।—ময়মনসিংহের হিন্দু হিতসাধিনী সভা হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

—সম্মিলনী।

আমাদের দেশের লোকের নানা অভাবের মধ্যে এই গ্রীষ্মকালে জলের অভাব প্রচণ্ড হইয়া উঠে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম—

মেদিনীপুরে জলের কল—গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুরে জলের কল স্থাপন জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতেছেন। শুধু তাহাই নহে ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে এক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া লইবার আদেশও দিয়াছেন। মেদিনীপুরে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বাস্থ্যপ্রণালীর বিশেষ সংস্কার সাধিত হইবে। [illegible] লোক [illegible] করিবে। বিশুদ্ধ জল পান করিয়া নানা প্রকার [illegible] রোগের হস্ত হইতেও উদ্ধার পাইবে।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

সদনুষ্ঠান-কীর্ত্তি।—মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর [illegible] বাড়ুয়াপুর, [illegible] সুপ্রসিদ্ধ [illegible]-নিবাসী জমিদার [illegible] বাঁকুড়া জেলার [illegible] থানার [illegible] মধ্যে [illegible] একটি [illegible] লইয়া তথাকার ও তন্নিকটবর্ত্তী অধিবাসীগণের ও পথিকগণের এবং গৃহপালিত ও বন্য পশুপক্ষীগণের সুবিধা ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। উক্ত জলাশয়ের নাম "বিদ্যানিধি বাঁধ"।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

রামপুরহাট ইউনিয়ন কমিটি ইতিমধ্যে ইউনিয়ন মধ্যে কতকগুলি কূপ খনন করাইয়াছেন। এ বৎসরও দেখিতেছি কর্ত্তৃপক্ষ আরও ৪।৫টি কূপ খননের ব্যবস্থা করিতেছেন। কূপে পানীয় জলের অভাব ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্নানের পুষ্করিণীর অভাব যে বড় বেশী।—বীরভূমবাসী।

আমাদের যখন এইরূপ দারুণ অভাব চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তখন আমাদের ভাগ্যনায়কেরা আমাদের রাজস্ব লইয়া অপব্যয় করিতেছেন—

বঙ্গের রাজস্বের অপব্যয়।—আগামী এপ্রিল হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের আয় ৭,৮৬,৯৪,০০০ টাকা ও ব্যয় ৭,৯৬, ৫৪০০০ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী কেন হইবে, রাজস্ব-মন্ত্রী তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ-সমূহের মধ্যে কয়েকটি এই, ভারতরক্ষা আইনানুসারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের ও তাহাদের পরিবারের ব্যয় ২৪ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। মেদিনীপুর জেলাভাগের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে ৬,৩৪,০০০ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ময়মনসিংহ জেলা ভাগের নিমিত্ত জমি ক্রয় করিতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। পূর্ব্ববাঙ্গলার পুলিসের জন্য বাষ্পীয় তরণী ক্রয় করিতে ১ লক্ষ, পূর্ব্ববাঙ্গলার পুলিসের ব্যবস্থা করিতে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার, কলিকাতা পুলিশের জন্য বাষ্পীয় তরণী ক্রয় করিতে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে।

আমাদের ইহাতে ঘোর আপত্তি আছে। বর্ত্তমান সময়ে পাটের ও চাউলের দাম হ্রাস হওয়াতে ও লবণ কাপড় কেরাসিন প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে গরীবের বড় ক্লেশ হইয়াছে। এমন কি প্রাণরক্ষার জন্য [illegible] করিতে বাধ্য হইয়াছে। এমন সময় পুলিশ ও জেলা বিভাগের জন্য এক পয়সাও খরচ না করিয়া লবণের দাম হ্রাস করাই কর্ত্তব্য।

[illegible]রের প্রাসাদের আসবাব ও পর্দ্দা প্রভৃতির জন্য ৬১ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিশের নদী পাহারা দিবার জন্য ৭৯,৯৯৬, গোয়েন্দা বিভাগে নূতন লোক রাখার জন্য ১,৭৮,৩০৮ ও জেলায় জেলায় গোয়েন্দা বসাইবার জন্য ২,৩৩,৪৪৮ টাকা খরচ বৃদ্ধি হইবে।

দেশের লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকিলে টাকা ব্যয়ের এইরূপ ব্যবস্থা হইত না।—সঞ্জীবনী।

যে দেশের লোকের পেটে অন্ন নাই, মনে শিক্ষার আলোক নাই, সে দেশ অসুস্থ অপটু হইয়া মরণের পথে দাঁড়ায়। রোগে ও হিংস্র জন্তুর কবলে সারা ভারতবর্ষে যত লোক মরে, যুদ্ধে তত লোক মরে না।

ম্যালেরিয়া মৃত্যু—প্রতি সপ্তাহে ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার লোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। যদি এইরূপ অবস্থা আরও কতকদিন চলিতে থাকে তাহা হইলে এদেশ বিনা যুদ্ধেই লোকশূন্য হইবে। দুঃখের বিষয়, দেশের [illegible] কর্ত্তৃপক্ষের মন সেই দিকে আদৌ [illegible] এই সাংঘাতিক বিষয়ের প্রতি তাঁহারা উপযুক্ত মনোযোগ বোধ হয় দিতে পারিতেছেন না। [illegible] ইহার প্রতিকারের [illegible] না করিলে [illegible] হইবে [illegible]।

এই গরিব দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে যাঁরা চেষ্টা করেন তারা দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন।

ডাক্তার বসুর স্বাস্থ্যনিবাস।—রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসিত হইবার জন্য ডাক্তারের নিকট গেলেই ডাক্তারেরা হাওয়া পরিবর্ত্তন করিবার জন্য রোগীদিগকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলেরই যেরূপ আর্থিক দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য ব্যাপার! অথচ হাওয়া পরিবর্ত্তন না করিলে কেবল মাত্র ঔষধ সেবনে বিশেষ কোনও ফল হয় না।

মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকদিগের এই অসুবিধা কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু সাঁওতাল পরগণার দেওঘরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণ করেন। পাঁচটি বড় বাড়ী এবং আটটি ছোট বাড়ী লইয়া স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপিত হয় এবং আজ প্রায় পাঁচ বৎসর কাল শত শত রোগী এই স্বাস্থ্যনিবাসে গমন করিয়া উপকৃত হইয়াছেন।

কিন্তু কেবল দেওঘর সকল রোগীর পক্ষে উপযোগী নহে। এইজন্য কার্সিয়ং, রাজগির এবং সমুদ্রতীরে বৃহদাকার আরও কয়েকটি স্বাস্থ্য-নিবাস নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি একটি লিমিটেড কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থাপিত দেওঘরের স্বাস্থ্যনিবাস-সংক্রান্ত সমুদয় সম্পত্তি এই কোম্পানীকে চিরদিনের জন্য নাম-মাত্র খাজনা লইয়া দান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে দশ জনের টাকায় এইরূপ শত শত স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়া একদিকে যেমন অংশীগণ প্রভূত লাভবান হইতেছেন অপরদিকে দেশের আপামর সাধারণ তেমনি পীড়ার সময় স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিয়া কৃত উপকৃত হইতেছেন। আমাদিগের দেশে দশ জনে মিলিয়া কাজ করিবার সময় আসিয়াছে; এই সময় এবং সুযোগ হেলায় হারাইলে আমাদিগের দুর্গতি কোনও কালে দূর হইবে না। এই কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের একটি অভাব দূর হইবে।

—সঞ্জীবনী।

এই অশিক্ষা কুশিক্ষা দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যে পঙ্গু বাঙালীর ভয়ে হাউইট্জার-ম্যাক্সিম-কামানে পৃষ্ঠপোষিত ইংরেজ-সরকার সন্ত্রস্ত হইয়া বিনা বিচারে প্রত্যহ দলে দলে কত লোককে বন্দী করিতেছেন!

প্রতিবাদ সভা—গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে দেশের লোকদিগকে বন্দী করিয়া দেশে মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছেন।—চারুমিহির।

আবার গ্রেপ্তার।—১১ জন যুবক। অদ্য প্রাতে খানাতল্লাস করিয়া নিম্নলিখিত বালক ও যুবকগণকে ভারতরক্ষা আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে:—১। প্রবোধচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, ২। উপেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, ৩। উপেন্দ্রনাথ রায়, ৪। অক্ষয়কুমার ঘোষ আই এ পরীক্ষার্থী, ৫। রাইমোহন মুখুটী আই এ, ৬। ফণীভূষণ বসু আই এ, ৭। নলিনীকান্ত ঘোষ ২য় শ্রেণী, ৮। নরেন্দ্রনাথ বসু ১ম শ্রেণী, ৯। মহম্মদ আবদুল হামিদ, ১০। যজ্ঞেশ্বর দে, ১১। সুধীরকুমার রায়। পরীক্ষার্থী যুবককে অদ্য পুলিশ-পাহারায় পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইয়াছে।—বরিশাল-হিতৈষী, খুলনাবাসী।

নূতন গ্রেপ্তার।—গত সপ্তাহে এই সহরের ১১ জন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত বাবু হরিদাস সমুকার মহাশয়ের বাসায় নরেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক একটির নাম ও বগুড়া পল্লীস্থ কালীপ্রসন্ন দাসের বাসায় গোবিন্দ নামক জনৈক তৃতীয় শ্রেণীর বালকের খানাতল্লাসের সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।—বরিশাল-হিতৈষী।

রাজসাহীতে ধরপাকড়।—কয়েকজন ছাত্র গ্রেপ্তার। বিগত শুক্রবার দিন প্রাতঃকালে রাজসাহীতে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহারা সকলেই আগামী পরীক্ষার পরীক্ষার্থী ছাত্র। তাহাদের মধ্যে একজন বি এ, একজন আই-এ এবং বাকী কয়েকজন মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরীক্ষার্থী ছিল। তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার অপরাধে অপরাধী করা যাইতে পারে এমন কোন অপরাধজনক জিনিস তাহাদের কাহারও নিকট পুলিশ পায় নাই। এরূপ আশঙ্কা করা যায় যে পুলিশ আরও কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করিবে। কারণ জনরবে প্রকাশ যে পুলিশ আরও লোক গ্রেপ্তার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে।—নায়ক, ৩০ ফাল্গুন।

একজন বালক গ্রেপ্তার।—গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রাতে দুই জন সি, আই, ডি, ইনস্পেক্টর এবং কতকগুলি কনেষ্টবল রায় শ্যামাচরণ রায় বাহাদুরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাঁহার দৌহিত্র অরুণ মজুমদারের ঘর তল্লাসী করে। অরুণের ঘর হইতে কোনও সন্দেহজনক দ্রব্যাদি পাওয়া যায় নাই; কিন্তু পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।—রংপুর দিক্‌প্রকাশ।

বাংলাদেশে বহু যুবক বিনা বিচারে আবদ্ধ-দণ্ড ভোগ করিতেছে। এই আবদ্ধ দণ্ডনীতি প্রবর্ত্তনের সময় হইতে দেশে একটা অব্যক্ত অসন্তোষ জন্মিয়াছে। যদিও সংবাদপত্রে, রাজনীতিক সভা সমিতিতে সেই অসন্তোষের কথা প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু সমগ্র দেশের অসন্তোষের তুলনায় তাহা কিছুই নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সকল জাতিরই এক-একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গালীর ইহা বিশেষ বিশেষত্ব হইয়া পড়িয়াছে যে বাঙ্গালীরা আর কোনরূপ অন্যায় সহিতে পারিতেছে না। এই যে ঘরে ঘরে জননীর চক্ষুর জল পড়িতেছে, ঐ যে কত কুল-রমণী অসহনীয় যাতনা সহিতেছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়াই এ দেশের লোক-হৃদয়ে দারুণ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। আবদ্ধদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার হইতেছে বলিয়াও নানারূপ সংবাদ প্রচারিত হইতেছে; তাহাতেও লোক-হৃদয়ে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়াছে। তাই আমাদের মনে হয়, গভর্ণমেণ্টের আর নীরব হইয়া থাকিবার অথবা রোলাট কমিশনের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নহে। যাহা হইবার হইয়াছে, আর কালবিলম্ব না করিয়া এই আবদ্ধ যুবাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে দেশে শান্তি আসিবে—জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। দেশের আন্দোলন আলোচনা বহুলাংশে দূরীভূত হইবে।—যশোহর।

আমরা 'কৃতজ্ঞ' কথাটিতে আপত্তি করি। মানুষের স্বাধীনতা বিধিদত্ত অধিকার। তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারো নাই যদি সে মানুষ সমাজ- বা রাষ্ট্র দ্রোহিতা না করে। বিনা বিচারে, সন্দেহের বশে, যাদের স্বাধীনতা অপহৃত হইতেছে তাদের ছাড়িয়া দিলে গভর্ণমেণ্ট নিজে অন্যায় হইতে বিরত হইবেন, তাহার জন্য তাঁদের কাছে কারো কৃতজ্ঞ হইবার কারণ নাই।

অন্তরীণের বিবাহ।—যশোহর জেলার অন্তর্গত তাঁতুড়িয়ার অধিবাসী শ্রীমান প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস অন্তরীণে আটক আছে। অন্তরীণে থাকা অবস্থাতেই তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। তাহার ভাবী শ্বশুরের বাড়ী যশোহর জেলার অন্তর্গত চন্দনী গ্রামে। আগামী ৮ই

মার্চ্চ তাহার বিবাহের দিন। প্রফুল্লের পক্ষ হইতে তাহার উকিল বাবু সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এডিসন্তাল সেক্রেটারী মাননীয় মিঃ ষ্টিফেনশনের নিকট প্রফুল্লের বিবাহের জন্য এবং বিবাহের দিন হইতে ১০ দিন অর্থাৎ দশ বর্জ্জন অবধি বাড়ীতে থাকিবার জন্য অনুমতির প্রার্থনা করেন। এডিসন্তাল সেক্রেটারী সকল প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা এই সংবাদে অবাক হইয়াছি। এই যুবক একাকী জীবনের দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতেছিল—তাহার সেই দুঃখের জীবনের একজন সঙ্গিনী জুটাইয়া দিয়া তাহার প্রতি আরও বহুলোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া কাজ কি ভাল হইল? স্বামী-বিরহ যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া এক অন্তরীণের পত্নী নরোত্তমপুরে আত্মহত্যা করিয়াছে—কত ফুল্লযৌবনা সুন্দরী বিরহের ও অভিশাপের দীর্ঘশ্বাসে ভারতের আকাশ বাতাস বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে—সেই দল বৃদ্ধি করা কি সঙ্গত? আহা গরীব বেচারা কোনও দিন মুক্তি পাইলেও এই দাবদাহায় ভরণপোষণের কি ব্যবস্থা করিতে পারিবে! এই যুবকের অভিভাবকের বুদ্ধির প্রশংসা করাও যেমন কঠিন কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনার প্রশংসা করাও তদপেক্ষা কম কঠিন নহে।—বরিশালহিতৈষী।

বঙ্গের জননায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং বিশেষ পীড়াপীড়িতে সরকার আবদ্ধ যুবকদিগের সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটী গঠনের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিনা বিচারে আবদ্ধ দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকদিগের এবং তাহাদের পরিবার ও স্বজনবর্গের দুঃখকষ্টের কথায় সমগ্র দেশে যে অসন্তোষের দাবানল জ্বলিতেছিল এই-সমিতি-গঠনের ফলে যদি সেই দাবানল নির্ব্বাপিত হয় সুখের কারণ হইবে।—যশোহর।

আমাদের দুঃখের প্রতিকারের উপায় বারো আনা আমাদের নিজেদের কৃতিত্ব চেষ্টা ও বর্ত্তমান অবস্থায় অসহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করিতেছে, বাকী চার আনা হয়ত বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদের সহযোগিতা ও বিদেশের জনসাধারণের অনুকূলতার উপর। এই চার আনার কিছু আদায় করা যায় কি না তারই চেষ্টা দেখিবার জন্য লোকমান্য তিলক প্রভৃতি বিলাত যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ছাড়পত্র রদ করিয়া তাঁদের মাঝপথে আটক করা হইয়াছিল। বিভীষণের আমল হইতে আমাদের দেশ ঘরভেদীদের জন্যেই ডুবিয়াছে। তিলক প্রভৃতি দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে বিলাত যাইতেছেন দেখিয়া

বিলাতযাত্রা।—পত্রান্তরে প্রকাশ, ভারতের শাসনসংস্কারের মুণ্ডপাত করিয়া ভারতবাসীকে যে তিমিরে সেই তিমিরে রাখিবার জন্য ফুরফুরার পীর সাহেবের দলভুক্ত অনারেবল ডাক্তার সহরওয়ার্দ্দী ও মিঃ কাসেম আরেক প্রভৃতি কএকজন ভদ্রলোক বিলাত যাইবেন, 'ষ্টেটসম্যান' 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি ভারতবৈরী এংলোইণ্ডিয়ান দলের পক্ষেও কএকজন প্রতিনিধি বিলাত যাইবেন, এই দলের সহিত বর্ণিত কোম্পানির কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা জানি না। লাহোরের মিঃ শফি ও বম্বের মিঃ রফি নীরব কেন?—মোহাম্মাদী।

আমাদের স্বদেশীরাই যদি এমন হন, তবে বিদেশীদের দোষ দিব কোন্ মুখে? দেশের সমস্ত লোককে রাষ্ট্রনীতিতে তালিম করিয়া তুলিতে পারিলেই এইসব ঘরের শত্রু বিভীষণের দলকে কোণঠাসা করিতে পারা যাইবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি—

ডিঃ বোর্ড কমিটীতে দেশীয় ভাষা—বরিশালের সহযোগী কাশীপুর নিবাসীতে প্রকাশ যে বিগত ২রা মার্চ্চ তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কমিটীতে বাবু অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে বেসরকারী চেয়ারম্যান সাহেবের ১ম বৈঠকেই বাঙ্গালা ভাষায় কমিটীর কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অবধারিত হইয়াছে। লোকেল বোর্ডের ন্যায় সেখানে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডেরও কাজ বাঙ্গালা ভাষায়ই নির্ব্বাহিত হইবে। তবে রিজলিউসন সমস্ত ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীতে এ নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।—বীরভূমবার্ত্তা।

বাঙালী যে-পরিমাণ সাধনা ও চেষ্টা করিবে তার সিদ্ধি ও ফল মিলিবেই মিলিবে। আমরা আমাদের অদৃষ্টের রুদ্ধ কপাটে পদাঘাত ধাক্কা মুষ্ট্যাঘাত না করিয়া কেবল মাত্র ধীরে ধীরে যে এক-একবার আঙুলের টোকা মারিয়া আসিয়াছি তার ফলে হইতেছে এই—

বাঙ্গালীর নূতন পদ।—পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের ডেপুটী ট্রাফিক ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র হালদার মহাশয় রেলওয়ে বোর্ডের সেক্রেটারী হইয়াছেন। ভারতবাসীর এই পদ নূতন।—বীরভূমবাসী।

ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ, শ্রীহট্টের অন্যতম জমিদার রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর, মৌলবী আবদুল লাইস্ সাহুদ্দীন, শিবসাগর খুস্তাইয়ের অস্থায়ী মৌজাদার শ্রীযুক্ত গুণীন্দ্রনাথ বড়ুয়া এবং পর্ব্বত জোয়ারের জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী অস্থায়ীভাবে ভারতীয় ল্যাণ্ডফোর্সের (Indian Land Force) দ্বিতীয় লেফটেনাণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সৈন্যদলে এদেশীয় ব্যক্তিগণের ঈদৃশ পদ লাভে সমগ্র দেশবাসী আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।—সুরমা। চারুমিহির।

চেষ্টা করিলেই যে সিদ্ধি হয় তার প্রমাণ—

গারো পাহাড়ে তুরা নামক একটি নগর আছে। সেদিন নিগর সিং নামক এক শিক্ষিত খাসিয়ার তথায় মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জীবনীপাঠে জানা যায় যে তিনি সরস্বতীর কৃপায় রাখাল হইতে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি রাখাল ছিলেন। পরে পদাতিকের কার্য্য প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে। বিলক্ষণ অধ্যবসায়ের সহিত তিনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অধ্যবসায়-বলে ক্রমে স্কুল-বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি জাতিতে খাসিয়া হইলেও গারো ভাষার উন্নতিকল্পে কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।—বাঁকুড়া-দর্পণ।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

১৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

২য় সংখ্যা

স্বদেশী সাহিত্য

স্রোতের জল সব সময় শুদ্ধ। শত ময়লা আবর্জ্জনা তাহার মধ্যে ঢালিয়া দিতে পার, তবু সে জল কখন অস্পৃশ্য হইয়া পড়ে না। বদ্ধ জলের জন্য কিন্তু সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতে হয়, ব্যবহারের যোগ্য করিয়া রাখিতে হইলে প্রতি নিমেষে দৃষ্টি দিতে হয়, পাছে বাহিরের আবর্জ্জনা কিছু তাহাতে পড়ে, পাছে শেওলা আসিয়া ঢাকিয়া ফেলে।

বদ্ধ জলের মত দাস-জাতিরও অনেক আপদ। যে জাতি পরের অধীন, আপন স্বাতন্ত্র্য যাহার তেমন জাগরুক নাই, নিজের অন্তরাত্মাকে যে প্রতি মুহূর্ত্তেই হারাইতেছে, সে চায় কোথায় তাহার বৈশিষ্ট্যটুকু তাহারই খোঁজ করিতে, কোন্ জিনিষের মধ্যে তাহার আপন-বোধটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে সেটুকুকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে জিয়াইয়া রাখিতে, পরের স্পর্শ হইতে এই নিজের বলিয়া একটি কোট কোন-প্রকারে বজায় রাখিতে। কিন্তু স্বাধীন জাতি, আপনার প্রাণে প্রাণে যে মুক্ত জীবনের বেগ অনুভব করিতেছে, সে যাহা করে না কেন, যেখানে যায় না কেন, সকলের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যের, আপন অন্তরাত্মারই বৈভবের সন্ধান পাইতেছে। বাহিরের অপরিচিতের স্পর্শ হইতে সে কখন আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে না—সে মিলিয়া মিশিয়া, সকলের সহিত অম্লান চিত্তে কোলাকুলি করিয়া চলাফেরা করে; কোথাও বোধ করে না তাহার নিজত্বের, তাহার আত্মমহিমার কিছু অপচয় হইতেছে।

ব্রহ্ম যাঁহার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারই দৃষ্টি সর্ব্বদা আচার নিয়ম অনুষ্ঠান বিধিনিষেধের মধ্যে। একটা বিশেষ প্রকরণ, বিশেষ ধারাকেই সে আলিঙ্গন করিয়া থাকে; তাহার আতঙ্ক, ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু সে সব সয়তানের প্রলোভন, তাহাকে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু ব্রহ্ম যাঁহার মধ্যে জাগ্রত, স্বরাট্ যিনি, তাঁহার কোন গণ্ডী নাই, তিনি সম্রাট, বিশ্বই তাঁহার লীলাক্ষেত্র। আত্মার অনন্ত শক্তি, অনন্ত প্রতিভা যে ভুলিয়াছে সে-ই নাম-রূপের মোহে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতেছে, বলিতেছে এই নামটি এই রূপটিই সব, এইটুকু গেলে সবই গেল। কিন্তু আত্মার—তাহা ব্যষ্টির হউক আর সমষ্টির হউক, জাতির হউক আর গণের হউক—কোন আত্মার বিভূতির শেষ নাই। আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যিনি, নামরূপ বদলাইতে তাঁহার কোন কুণ্ঠা নাই। তিনি জানেন, "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি।"

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা দলাদলি দেখিয়া আমাদের এই কথা মনে হইতেছে। একদল সাহিত্যিক বাঙ্গলার যে প্রাণের কথা, যে বিশিষ্টতা

তাঁহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকল দেশভক্তকে আহ্বান করিতেছেন। দেশের মাটির উপর আমাদের অধিকার নাই, ব্যবসা বাণিজ্য শাসন-কার্য্যও পরের করতলগত, ইহা সহ্য করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশের মন, তাহার দীক্ষা, তাহার কাব্যকলা—দেশের অন্তরাত্মা যেখানে, সেখানে যেন পরের মন, পরের শিক্ষা দীক্ষা আসিয়া না অধিকার করে। এই স্বদেশভক্তগণ বাঙ্গলার প্রাণের ধারার একটা সুর ধরিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন, "হে বাংলার কবি, এই সুরকে ভুলিও না, এইখানেই তোমার অন্তরাত্মা, বিদেশীর সাহিত্যের সুরে এই দেশী সুরটি মিশাইয়া হারাইয়া ফেলিও না। বাংলার প্রাণ হইতেছে বৈষ্ণবের প্রাণ, তাহার সাহিত্যের মৌলিক সুর পদাবলীর সুর।"

প্রত্যুত: সাহিত্যে এই দেশাত্মক শুচিব্যাধি আজকাল বিশেষ ভাবে দেখি আমরা দুইটি পরাধীন জাতির মধ্যে —ভারতবর্ষে আর আয়র্লণ্ডে। আয়র্লণ্ড চাহিতেছে ইংলণ্ডের প্রভাব হইতে মুক্ত এক জাতীয় সাহিত্য, যাহার মধ্যে আয়র্লণ্ডের বিশেষত্বটুকুই ফুটিয়া উঠিবে, ইংরেজী সাহিত্যের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিবে না। ইহাই কেল্টিক জাগরণ (Celtic Revival)। আর ভারতে বাংলা-দেশেও দেখিতেছি সেই-রকম একটা চেষ্টা চলিয়াছে যাহা চায় বাংলারই প্রাণের কথা, ইংরেজের বা বিদেশীর প্রভাবের পূর্ব্বে একান্ত বাঙ্গালীর বাংলার ক্ষেত্রজাত ছিল যাহা, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ সেই বৈষ্ণব যুগ। কিন্তু দুইটি আন্দোলনের মধ্যে মস্ত একটি পার্থক্য আছে। Celtic Revival অর্থাৎ কেল্টিক জাগরণের গোড়ায় যে ভাবই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে আয়র্লণ্ড আইরিশ প্রতিভা অর্থে যে জিনিষটি ধরিয়াছে, তাহা একটা উদারতর মহত্তর বস্তু। আইরিশ জাতির মধ্যে সে জিনিষটি যতই বিশেষভাবে থাকুক না, তাহা কেবল আয়র্লণ্ডের প্রাণের কথা নয়, তাহা প্রত্যেক জাতিরই বর্ত্তমান যুগের প্রাণের কথা—সে একটা গোটা শিক্ষা দীক্ষা —কেল্টিক প্রতিভা, লাতিন বা টিউটনের মন যাহা তেমন ধরিতে পারে নাই, মানুষের সেই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক স্পৃহা, সমুদ্রের রহস্যের প্রতি টান। তাহার উৎপত্তি দেশাত্মক অভিমানের মধ্যে হইলেও, ক্রমে এই গণ্ডীকে সে ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। এইজন্যই কেল্টিক জাগরণ (Celtic Revival) রক্ষা পাইবে, কারণ জগতের সাথে সে আপনাকে মিলাইতে পারিয়াছে। কিন্তু বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের পুনঃস্থাপন-চেষ্টার মধ্যে এই-রকম বিশ্বতোমুখ ভাব কিছু দেখি না—দেখি শুধু তাহারই অনুকরণের একটা মিথ্যা প্রয়াস মাত্র। মিথ্যা, কারণ এই বৈষ্ণব আদর্শ একদিকে যেমন বিশ্ব-আদর্শ নয়, অন্য দিকে তাহা বাঙ্গলার প্রাণের সব কথা নয়। তাই আমরা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি—এ প্রয়াস টিঁকিবে না।

কালধর্ম্মে পদাবলী-সাহিত্য হইতে আমরা বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণব কবিগণ যে ভাবে যে দৃষ্টিতে জগৎকে জীবনকে মানুষকে দেখিতেন আমরা আজ ঠিক সেই একই-প্রকারে দেখি না, দেখিতে পারি না। বৈষ্ণব কবিতা যতই সুন্দর যতই মহৎ হউক না কেন, তাহাই যে কবিত্বের একমাত্র আদর্শ, অথবা তাহাই যে চিরকাল বাঙ্গলার কবি-প্রাণের কথা হইয়া থাকিবে,—জগৎ, এমন কি বাঙ্গালী জাতিও, যে সে-রকম একটা স্থাবর জিনিষ, এমন বোধ হয় না। ভাবের স্রোত চিরদিনই নূতন খাতে নূতন দৃশ্যের মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিবে, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে কে, ভাগীরথীকে আবার গঙ্গোত্রীতে লইয়া যাইবে কে? বাঙ্গলার এই যে মানসিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, তাহা শুধু মোহ, তাহা অনুচিকীর্ষার ফল, এ কথা বলিতে পারি না। বর্ত্তমানের বাঙ্গলা সাহিত্য যে ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষীণ ক্ষণভঙ্গুর প্রতিধ্বনি মাত্র তাহাও নয়। ইংরেজ যদি না আসিত, কোন বিদেশীর ছায়াই যদি বাঙ্গলার প্রাণকে না ঢাকিয়া ফেলিত, তবুও আমরা যে আজ কেবল বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকেই বসিয়া বসিয়া সৃজন করিতাম ইহাও মস্ত ভুল। তখনও বাঙ্গলা যদি সজীব থাকিত তবে সমস্ত জগতে যে হাওয়া বহিতেছে সেই "জাইট গাইষ্ট" (Zeit-Geist), সেই কালপুরুষের অঙ্গুলী-সঙ্কেতেই সে আপনাকে ভাঙ্গিয়া নিত্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিত।

বলিতে পার—পরিবর্ত্তন চাই, পরিবর্ত্তন হইবেই; কিন্তু দেখা উচিত যাহাতে প্রাণটি না হারাইয়া ফেল; তোমার

সাহিত্যের যাহা অন্তরাত্মা, যে প্রতিভা, তাহার উপর পরধর্ম্ম চাপাইয়া পিষিয়া মারিও না। কথাটি থিয়োরী হিসাবে খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কার্য্যতঃ কে আমায় দেখাইয়া দিবে এইখানে আমার সাহিত্যের স্বধর্ম্ম, আর এইখানে পরধর্ম্ম, এইটিই আমার প্রাণ আর ওইটি আমার মরণ? প্রাণের পরিচয় প্রাণে, কোন একটি বিশেষ রূপ বা ভঙ্গিমার অভাব হইলেই যে জিনিষকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে তাহা নয়। বিশেষতঃ তোমার দেওয়া মানদণ্ড আমি স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততঃই করিব। কারণ, দেখিতেছি তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার মর্য্যাদার দোহাই দিতেছ, কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পের জগতে জাতির অপেক্ষা বড় কথা হইতেছে বিশ্ব। জাতীয়ত্বের সঙ্কীর্ণতা লইয়া তুমি কবি—যিনি বিশ্বদ্রষ্টা—হইতে পার না।

আমরা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হই, রাজনীতি-ক্ষেত্রে যাঁহারা দেশকে জাগ্রত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া নয়—ইংরেজের সহিতও নয়, যাঁহারা দেশের উন্নতির একমাত্র পন্থা—একমাত্র না হইলেও প্রধান পন্থারূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন দলে দলে বিদেশ গমন, বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভারে, বিদ্যার নৈপুণ্যে মণ্ডিত হইয়া আসিতে;—সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবার তাঁহারাই উপদেশ দিতেছেন বিদেশীর ছায়া না মাড়াইতে, বলিতেছেন সাহিত্যসৃষ্টির জন্য ইংরেজের কাছে যাইও না, যাও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে—শত শত বৎসর পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে, সেইখানেই তোমার সব আদর্শ, সেই-খানেই তোমার অন্তরাত্মা।

জগতে এমন কোন জাতি নাই যে উৎপত্তি হইতে এযাবৎকাল তাহার রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। এমন জাতি বোধ হয় হইতেও পারে না; বর্ণসঙ্করই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির কারণ। সেই-রকম, জগতে এমন সাহিত্য সুদুর্লভ যাহা স্বয়ংসিদ্ধ; বিশেষতঃ আধুনিক কালে যখন সমস্ত মানবজাতির মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ অচ্ছেদ্য আদান-প্রদান চলিতেছে, তখন ইচ্ছা করিলেই কোন্ জাতি কূর্ম্মের মত আপনার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? বরং ইহাই আমরা দেখি যে বিদেশীয় বিজাতীয় সাহিত্যের সহিত অবাধ মিশ্রণেই সব সজীব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধর ইংরেজী সাহিত্যের কথা। ইংরেজী সাহিত্যের যে তিনটি মহাযুগ, তাহাদের প্রত্যেকটির গোড়ায় রহিয়াছে এই-রকম এক-একটি বৈদেশিক প্রভাব। প্রথম যুগের ইংরেজী সাহিত্যের উৎস যিনি—চসার্—তিনি তাঁহার কবি-প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিলেন ফরাসী এবং ইতালী হইতে। তারপর মধ্য যুগ অর্থাৎ এলিজাবেথীয় যুগের আরম্ভ যাহাদের হইতে—সেই ওয়াট্ (Wyatt) এবং সারে (Surrey)—তাঁহারা বীজ আনিয়াছিলেন ইতালী হইতে। আর ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ্ তাঁহার নিজের যুগ প্রবর্ত্তন করেন, প্রথমে ফরাসী দেশে, পরে তাঁহার সতীর্থ কোল্রিজের সাথে জর্ম্মনী দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া। ইদানীন্তন কালে ইংরেজী সাহিত্যে আবার একটা নূতন ঢেউ উঠিয়াছে, একটা নূতন যুগেরই প্রবর্ত্তনা হইতে চলিয়াছে। ইহারও প্রথম কবিগণ দেখি বিদেশের অপরিচিতের নিকট হইতেই তাঁহাদের নূতন প্রেরণা পাইয়াছেন। রসেটি গিয়াছেন প্রাচীনতর ইতালীয় ও ফরাসী কবিদের কাছে, মরিস্ গিয়াছেন স্কান্দেনেভিয়ার সাগা-সাহিত্যের (Sagas) কাছে, সুইন্বার্ণ গিয়াছেন এক-রকম সকল বিদেশীরই কাছে, বিশেষতঃ আধুনিক ফরাসী কবিদের কাছে। ইঁহাদের লক্ষ্যই যেন ছিল বিদেশের সহিত এত আদানপ্রদান সত্ত্বেও ইংরেজের যে একটা দ্বীপবাসী-সুলভ সঙ্কীর্ণতা, নিজত্বের অভিমান কেমন রহিয়া গিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইংরেজী সাহিত্যকে বিশ্বজনের সাহিত্য করিয়া তুলিতে। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রাচ্যের, বিশেষ ভারতবর্ষেরও যে অনেকখানি প্রভাব আছে তাহাও এইখানে স্মরণ করা যাইতে পারে।

ফরাসী সাহিত্যও যদি ইতালী স্পেন জর্ম্মনী ও ইংলণ্ডের প্রাণ অনেকখানি আত্মসাৎ করিতে না পারিত, তবে সে সাহিত্য তাহার আদিম ক্রুভেয়্যার ও ত্রুবাদুর (Trouvères, Troubadours) গানের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া যাইত। আর আমরা দেখি সমস্ত লাতিন সাহিত্যই ত গ্রীকের ছায়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে, লাতিন কবিত্বকে গ্রীকের প্রতিধ্বনি বলিলেও বিশেষ

অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কে বলিবে লাতিন সাহিত্যে প্রাণ নাই, বা তাহা লাতিন জাতিরই আপনার অভিব্যক্তি নয়? গ্রীকবন্যার বিরুদ্ধে আপন দেশের "প্রাণের কথা"টি অটুট রাখিবার জন্য স্বদেশাভিমানী কেটো কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই অবশেষে Zeit-Geist জাইট্‌গাইষ্টের তরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন—অশীতিবৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ গ্রীকভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দিলেন।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের জীবনেও আমরা দেখি তিনটি সন্ধিস্থল। এবং এই তিনটি মুহূর্ত্তে তিনজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহারা তিন জনেই যে নবজীবনের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন তাহার উৎস তাঁহারা পাইয়াছেন পাশ্চাত্য হইতে, অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে ইংলণ্ড হইতে। প্রথম রামমোহন, দ্বিতীয় মধুসূদন, তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ। নব্য বঙ্গসাহিত্যে ইঁহারা প্রত্যেকেই এক-একটি যুগের প্রবর্ত্তক; বিদেশ হইতেই তাঁহারা নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গিমা আনিয়া বঙ্গমাতাকে উপহার দিয়াছেন, বাংলাকে নিজের ঘরের গণ্ডী হইতে বাহিরে আনিয়া জগৎসভার মাঝে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। চসারের পরে দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইংরেজী সাহিত্যে যেমন একটা তামস যুগ আসিয়াছিল, চণ্ডীদাসের অথবা বৈষ্ণব কবিগণের পরেও তেমনি কত শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গসাহিত্য তমোগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুগে কবি-সম্প্রদায়ের যে একান্ত অসদ্ভাব ছিল তাহা নয়, তাঁহারা পদ্য যথেষ্ট লিখিয়াছেন কিন্তু সে-সকলের মধ্যে কাব্য খুব অল্পই মিলে। কবিত্বের সে জ্বলন্ত জীবনের পরিচয় পাই না—যেন জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষুর কোন-প্রকারে দুই দণ্ড বাঁচিয়া থাকিবার ক্ষীণ প্রয়াসমাত্র। সেই জীবন-নদের মুখ খুলিয়া দিলেন পাশ্চাত্য-ভাব-সম্পৃক্ত রামমোহন। মধুসূদন বজ্রতাড়নে দুই কূল ভাঙ্গিয়া তাহার জন্য বিস্তৃত উন্মুক্ত খাত কাটিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই খাতে বহাইয়া দিয়াছেন উচ্ছ্বসিত তরঙ্গায়িত বহুভঙ্গিমরুচির এক মহাপ্লাবন।

ঠিক এই তিন জনের বিরুদ্ধেই দেখি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন রূপে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। বাঙ্গালীকে যাঁহারা আপন ঘরের কোণে বাঁধিয়া না রাখিয়া, একটা বিশ্বপ্রাণে ভরপুর করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা নাকি শুধু বিদেশী ভাবাপন্ন; বাঙ্গলার প্রাণে যাহা খাপ খায় না, কোন দিন খাপ খাইবে না, এমন সব ভাব ভঙ্গিমা তাঁহারা আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু জীবন্ত সকল সাহিত্যের প্রকৃতিই যে এই-রকম—সে তাহার উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করে, এবং এই ক্ষমতা তাহার যত বিস্তৃত, জগৎসাহিত্যের যত-রকম বৈচিত্র্যের সহিত সে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, ততই তাহার সমৃদ্ধি মহত্ত্ব। ভারতে ইংরেজ-অধিকার দুর্ভাগ্যের কথা বটে। কিন্তু বিধাতা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়াই সৌভাগ্য সৃজন করিয়া চলিয়াছেন, এ কথাটি আবার ভুলিলে চলিবে না। ইংরেজেরই মধ্যবর্ত্তিতায় আজ আমরা মানব-জাতির সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি, ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা জগৎসাহিত্যের যাহা কিছু পরিচয় পাইয়াছি। রামমোহন যে ইংরেজী শিক্ষাকে হেয় মনে করেন নাই, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই—ইহা বাঙ্গলার, বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের কথা। ভারতবর্ষের সকল ভাষার মধ্যে বাঙ্গলাই যে এত উচ্চস্থান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার একটা কারণ—তাহার প্রধান কারণ রূপেই আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি—এই বিদেশী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা। প্রথম বিদেশী-ভাব-প্লাবনে বাঙ্গলা যদি অতখানি আপনাকে না ছাড়িয়া দিত, যদি জাতি-নাশের ভয়ে পিছাইয়া থাকিত, তবে আজ জগতের সাহিত্যের মহাজীবনস্রোত হইতে সে বিচ্যুত হইয়াই পড়িত। আমরা পদাবলী-সাহিত্যের চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতাম নিঃসন্দেহ, কিন্তু পাইতাম না 'মেঘনাদবধ,' পাইতাম না 'কপালকুণ্ডলা,' পাইতাম না 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'উর্ব্বশী,' 'সোনার তরী'।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আমাদের নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে যে কবিত্বের মূলশক্তি খেলিয়াছে, অধুনাতন আর কোন কবির মধ্যে সে শক্তি ততখানি খেলিয়াছে কি না; মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি সৃজন-প্রেরণা মহীয়ান, না বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের দৃষ্টিশক্তি সৃজন-প্রেরণা মহীয়ান—ইহাও আমরা বিচারের বিষয় করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মানিতে পারি না, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে

ভাব যে ভঙ্গিমা দিয়াছেন, বাঙ্গলার কবি-প্রতিভার তাহাই সব কথা। তাঁহারা যে-রসের সন্ধান পাইয়াছেন, আনন্দের যে-তরঙ্গটি তাঁহাদের সৃষ্টিতে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, আমরা বর্ত্তমান যুগের কবি যদি ঠিক সেই রস সেই আনন্দটি না পাই, তবে আমরা হীনতর পংক্তিভ্রষ্ট হইয়া পড়িব কেন? রসের শত ধারা, আনন্দের সহস্র রেখা—প্রত্যেক ধারার আবার কত ভঙ্গী, প্রত্যেক রেখার কত সূক্ষ্ম বর্ণপাত—সেইজন্যই যুগে যুগে কবিতে কবিতে এত পার্থক্য। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের যুগে রসের আনন্দের এক রূপ লইয়া ছিলেন, আমরা আমাদের যুগে আর-এক রূপ লইয়া আছি। ইহাদের একটি যে কবিত্বের সনাতন স্বরূপ, আর-একটি যে ক্ষণিক বিকৃতি, এমন বলিতে পারি না।

দেশী সাহিত্যের প্রাণ বলিয়া যে জিনিস তাহা অতি সূক্ষ্ম—ছায়াময় পদার্থ। তোমার আমার বিচার-বুদ্ধির ভাল-মন্দ দিয়া, প্রাণের প্রিয়-অপ্রিয় দিয়া তাহাকে নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ভুলই হইবার সম্ভাবনা। সে জিনিষটি অনুভব করিলে করিতে পারি; কিন্তু কথার মধ্যে ধরিতে গেলে তাহা প্রায়শঃই সঙ্কীর্ণ খণ্ডিত হইয়া উঠে। কোন বিশেষ ধারা বা রূপকে, বিশেষ আদর্শ বা ধর্ম্মকে একান্ত করিয়া ধরিয়া সেই অনুসারেই জাতির সকল সাহিত্য-প্রতিভাকে গড়িয়া তুলিলেই যে দেশীয় বা জাতীয় সাহিত্য হয়, তাহা আমরা মনে করি না। প্রাণহীন জড় পদার্থ হইয়া পড়িবারই তাহাতে আশঙ্কা বেশী। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একজন বলিতেছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। তিনি হইতেছেন কবির নিজের অন্তর্য্যামী সারস্বতপুরুষ, কবির আত্মা—এই আত্মাকেই কবি দেখিবেন, সৃজন করিবেন—আত্মানমেব কল্পয়েৎ। কবির এই অন্তরাত্মার জগতে স্বদেশ বিদেশ ততখানি নাই, যতখানি আছে একই অখণ্ড বিশ্বদেশ।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

শ্যামলী

(৪)

বিজলীর পিতা কার্ত্তিক মাসটার একটু অন্যায়রকম শীঘ্র শীঘ্র কাবার হইয়া যাওয়ার ধরণে বড়ই চটিয়া গেলেন। কিন্তু সে যে তাঁহার অসন্তোষের কোন খাতির রাখে এমন বোধ হইল না। তাই যথানিয়মে কালের কর্ত্তাহর্ত্তা অরুণ-দেব দক্ষিণায়ণের তুলারাশি অতিক্রম করিয়া মার্গশীর্ষে উপনীত হইলেন। বিজলীর মাতাপিতার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সঙ্গে কন্যার বিবাহের উদ্যোগের মধ্যেই মাসের প্রথম দিন কাটিয়া বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয়দিনেরও প্রভাত আসিয়া ক্রমে উদয় হইল।

প্রভাতের আলোকে স্বামীর মুখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দেখিয়া বিজলীর মাতা কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীকে অত্যন্ত ভয় করিয়াই চলিতেন, সেজন্য কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নিজের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন স্বামী নান্দিমুখ এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবার পূর্ব্বে গলবস্ত্র হইয়া গ্রামস্থ সমস্ত প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া তবে ক্রিয়ায় বসিলেন। স্বামীর এই অদম্য বাসনার ফল যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিতেও তাঁহার হৃৎকম্প হইতেছিল। সমাগত নবকুটুম্বদের সমক্ষে গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা অপমানিত হইবার এরূপ পন্থা না করিয়া তিনি যদি নিঃশব্দে বিবাহটি সম্পন্ন করিতেন তাহা হইলে অন্ততঃ কন্যাদান-কার্য্যটি নির্ব্বিঘ্নে হইবার আশা ছিল। একঘরের ঘর হইতে কন্যাগ্রহণকালে তাহারা নাজানি কি করিবে, ইহা ভাবিতেই তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিতেছিল—তথাপি কলের পুতুলের মত তিনি যাহা করিবার তাহা করিয়া যাইতেছিলেন। একবার স্বামীকে এ বিষয়ে একটু কিছু বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র তাঁহার কাছে এমন ধমক্ খাইয়াছিলেন যে ভগবানকে স্মরণ করিয়া ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর ছিল না।

শ্যামলী দেখিতেছিল কয়েকদিন হইতে তাহাদের বাটীতে কি যেন একটা চাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছে। কর্ত-

রকম কাজ, কত সব জিনিষপত্রের আমদানি, সকলের মুখেই একটা আনন্দ ও আশার উচ্ছ্বাস—কিন্তু সবচেয়ে মুখখানি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তাহার ভগিনীর। তাহার সেই অতুল সৌন্দর্য্যভরা মুখে যেন কে নূতন করিয়া রূপের তুলি বুলাইতেছে। শ্যামলীর রূপমুগ্ধ চক্ষু পলকহীন-ভাবে এক-একবার ভগিনীর মুখে সম্বদ্ধ হইতেছিল। সে মুখ কখনো লজ্জার আভাসে আরক্ত, কখনো দুঃখকল্পনায় উচ্ছ্বসিত, কখনো বা আনন্দের ভরে উষাকালের গোলাপের মত অতুলনীয়। সে মুখে তাহার চিরস্বভাবানুরূপ বিরক্তি-সূচক ভঙ্গী বা ভ্রুকুটী নাই, বাপ-মায়ের কাছে সে কত আদর জানাইতেছে, আদর পাইতেছে—তাহাকেও যে ইঙ্গিত করিতেছে তাহা যেন কত স্নেহসিক্ত মধুভরা! কিসে বিজলীর এমন পরিবর্ত্তন আসিল শ্যামলী যেন অবাক্ হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিল। বিজলীর সাজসজ্জা ও নিত্যনূতন এই যে একটা আনন্দভরা চাঞ্চল্যে এবং নবীন ব্যাপারে তাহাদের বাড়ী উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া—ইহার নায়িকা যে বিজলী, বিজলীকে লইয়াই যে এত ধুমধাম চলিতেছে, তাহা শ্যামলী যেন ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছিল। তাহাকে নববস্ত্র পরাইয়া কতকগুলি রমণীতে কত আনন্দে কতরকমই যে করিতেছে; কোন দিন হরিদ্রা মাখাইতেছে, পায়সান্ন খাওয়াইতেছে, আশীর্ব্বাদ করিতেছে, তাহাই অবাক হইয়া শ্যামলী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। কোথা হইতে সেদিন নানারকম বস্ত্রালঙ্কার ও অগণ্য দ্রব্যসম্ভার আসিল তাহাও যে বিজলীর জন্যই, তাহাও শ্যামলী বুঝিয়াছে। কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া এক-একবার সকলের পানে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিতেছিল, কিন্তু তাহার সে প্রশ্ন কেহ বা বুঝিবে। কেবল বুঝিতেছিল তাহার মা! তাই শ্যামলীর চোখে তাঁহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছিলেন।

সাজিয়া-গুজিয়া সাক্ষাৎ গৌরীটির মত পুষ্পচন্দনে ভূষিত হইয়া বিজলী অঙ্গনস্থ সজ্জিত কদলীমণ্ডপের মধ্যে একখানি চিত্রিত পিঁড়ির উপর পিতার পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং পিতা কত মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া তাহার ললাটে স্পর্শ করাইতে লাগিলেন, কতরকম জিনিষে কপালে তিলক কাটিয়া দিতে লাগিলেন। অদ্য কয়দিন হইতে বিজলীকে লইয়া এইরূপ নানাপ্রকারের দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া শ্যামলী ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল, এইবার পিতার পাশে বিজলীর এইরূপ সজ্জিতভাবে উপবেশন এবং তাঁহার দ্বারা সাদর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির দৃশ্য যেন তাহাকে একা অভিভূত করিয়া ফেলিল। যেন বাপের স্নেহ হইতে ও জগতের আনন্দ হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত বলিয়া শ্যামলীর মনে হইতে লাগিল। সে শুষ্কমুখে ঈষৎ ম্লান চক্ষে ছাদ্‌লাতলার একধারে একটা কলাগাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহার রুক্ষ কেশ শুষ্ক মুখ ও মলিন বেশে এই উজ্জ্বল দৃশ্যের পাশে সে যেন একটা বেদনা ছায়ার মতই দাঁড়াইয়া ছিল। মাতার দৃষ্টি সহসা সেদিকে পড়িতেই তিনি ব্যথিত হইয়া জগতের চক্ষু হইতে এই তাঁর অভাগা সন্তানটিকে সরাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন নিঃশব্দে শ্যামলীর নিকটে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত দিলেন মায়ের স্পর্শ বুঝিয়াও শ্যামলী মুখ ফিরাইল না, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। স্পর্শের প্রশ্নেই মাতাকে জানাইল—"এ কি মা—কেন মা? আর এ আনন্দমেলায় আমারই বা স্থান নেই কেন? আমিই বা এত দূরে কেন মা?" মাতা কন্যার স্পর্শেই প্রশ্ন বুঝিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কন্যাও ধীরে ধীরে তাঁহার সঙ্গে ঘরে যাইবার জন্য ফিরিল।

"উহুঁ উহুঁ!" স্বামীর অস্পষ্ট নিষেধে সচকিত হইয়া গৃহিণী চাহিলেন। স্বামী হস্তের ইঙ্গিতে পত্নীকে নিষেধ করিয়া আবার আরব্ধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তির জন্য ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া শেষে গৃহিণী অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "কি করবে ও এখানে থেকে, ঘরে যাক্ না?"

সজোরে আবার একটা 'উহুঁ' শব্দ করিয়া তিনি বিজলীর শুভগন্ধাধিবাস ক্রিয়ায় মন দিলেন। গৃহিণীকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া দেখিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত—যিনি সমাজপতিদের নিষেধ ঠেলিয়া এবং তাঁহার জাতি যাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও একার্য্য করিতে আসিয়াছেন—তিনি বলিলেন "আহা থাক্‌না মা ও এইখানে বসে। ভগবানের মার না হলে আজ ত ওরই এই শুভকার্য্য আগে হত, তার পরে ত বিজলীর। যাই হোক্, এমন দিনে ওকে অমন করে রেখেছ কেন গা? ছোটবোনটি অত সেজেছে-গুজেছে, বালক ও,

ওরও তো মনে কষ্ট হতে পারে! দে ত গা বাছা কে আছিস্ মেয়েটাকে একখানা ভাল্ কাপড় পরিয়ে।”

শ্যামলীর মাতা এইবার কন্যাকে প্রায় টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। ক'ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কন্যার হাতে খানকয়েক ছবি গুঁজিয়া দিয়া তাঁহার মুখ ধরিয়া একটু আদর করিলেন। শ্যামলী তাঁহার আদর ও এই ছবি-দেখা ছাড়া জগতে আর কিছু তো জানিত না বা চাহিত না, কিন্তু আজ সে তাহাও তেমন সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার ভাষা-ভরা চোখ আজ নির্ব্বাক ভাবে শুধু চাহিয়া রহিল। মাতা দাঁড়াইতে পারিলেন না, তখনি তাঁহাকে কর্ম্মান্তরে ছুটিতে হইল। শ্যামলী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গন্ধাধিবাস সমাধার পরে বিজলীও সেই ঘরে আসিয়া ভগিনীকে তদবস্থ দেখিয়া একটু যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাহার গায়েহলুদের তত্ত্বে শ্বশুরবাড়ী হইতে যত-রকমের কাপড় জামা আসিয়াছে তাহার মধ্যের দুটি কাপড় জামা আনিয়া তাড়াতাড়ি ভগিনীকে পরাইতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিল খেলনারও কিছু অংশ শ্যামলীকে সে দিবে। বিজলী তাহাকে সর্ব্বদা বকিত বলিয়া শ্যামলীও তাহার হাত হইতে সহজে কিছু গ্রহণ করিত না—কিন্তু আজ সে ভগিনীকে বাধা দিল না। বিজলী ইঙ্গিত করিতেই উঠিয়া তাহার দত্ত বসনভূষণ পরিধান করিল এবং সাজিয়াই গম্ভীর মুখে একছুটে ছান্‌লাতলায় গিয়া বিজলীর পরিত্যক্ত পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। পুরোহিত তখন তাহার পিতার সঙ্গে মৃদুস্বরে কি কথোপকথন করিতে করিতে চাউল বস্ত্র তৈজসাদি দানসম্ভার ঝাড়িয়া গুছাইয়া বাঁধিতে-ছিলেন। শ্যামলীকে ঐ ভাবে বসিতে দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া কেহ ছুটিয়া আসিল, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে-ছিল এবং কেহ বা একটু দুঃখসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিল। পুরোহিত বলিলেন “আহা বসেছে তা বসুক না, দাও ত বাবা মেয়েটার কপালে একটা ফোঁটা দিয়ে, খুসী হয়ে চলে যাবে এখন।” পিতা বাক্যব্যয় না করিয়া দধি চন্দন ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কন্যার ললাটে তিলক করিয়া দিলেন এবং গন্ধের ডালাখানি লইয়াও তাহার ললাটে ছোঁয়াইয়া দিলেন। শ্যামলী এইবার হাসিমুখে উঠিয়া মায়ের উদ্দেশে ছুটিয়া গেল এবং মায়ের গলায় পড়িয়া তাহার তিলক ও বস্ত্রাদি দেখাইতে লাগিল। সকলের আহা আহা শব্দের মধ্যে মা আবার তাহাকে হস্তে ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং কিছু খাওয়াইয়া কতকগুলা ছবি দিয়া জানালায় বসাইয়া রাখিয়া-আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে গিয়া দেখিলেন জানালার উপরেই শ্যামলী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি ক্ষণেকের জন্য নিশ্চিন্তের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইতে তখন আর বড় দেরী নাই।

রাত্রি দশটার সময় বিবাহের লগ্ন। বিপুল বাদ্য এবং সমারোহের সহিত রাত্রির প্রথম প্রহরেই বর লইয়া বরযাত্রীর দল সমাগত হইলেন এবং বহিরঙ্গণের চাঁদোয়ার নীচে আসর জাঁকাইয়া বসিলেন। বরের রূপ গুণ এবং ধনের যশে তখন গ্রামখানি একেবারে নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজপতিদের স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইতে দেখিয়া কন্যার পিতা তাঁহাদের নিকটে গিয়া জোড়হস্তে বলিলেন “লগ্নের এখনো দেরী রয়েছে—আহারাদিগুলো সেরে নিলে হত না?”

“অবশ্য অবশ্য, বরযাত্রীদের খাইয়ে দিতে হবে বই কি। যাও হে ছোক্‌রারা, তোমরা বরযাত্রীদের ভাল করে যত্ন করে খাইয়ে দাও, যেন গাঁয়ের না নিন্দে হয়। ভায়া তো জোগাড়ের কসুর করেনি, অমন জামাই বিনা-পয়সায় পাচ্চে, খরচ কর্‌বার কথাই তো? চল আমরাও তদারক করছি—বরযাত্রীদের খাইয়ে দিতে হবে বই কি আগেই।”

“আর আপনারা?”

“আমরা? হেঁ-হেঁ আমরা হলাম ঘরের লোক—আমরা খেলেই বা কি, না খেলেই বা কি! সে তখন পরে যা হয় হবে, এখন বরযাত্রীদের তো—”

“আপনারা তাহলে আজও নিতান্তই খাবেন-না? নিতান্তই আমায় একঘরে কর্‌বেন?”

“হেঁ-হেঁ সে কি কথা! এখন কি ওকথা মুখে আন্‌তে আছে? সুভালাভালি তোমার মেয়েটি পাত্রস্থ হয়ে যাক্! আমরা সে-রকম হিংসুক লোক নই যে শুভকার্য্যে একটা বাগ্‌ড়া দেব! মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাক্, তারপর তুমিও আছ, আমরাও আছি, খাওয়া না-খাওয়াও আছে।”

"বেশ! আমারও প্রতিজ্ঞা যে আপনাদের আজ পাত-পেতে আমি আমার বাড়ীতে খাওয়াবই।" বলিতে বলিতে বিজলীর পিতার দুই চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। একজন যথার্থ শুভান্বেষী ব্যক্তি তাঁহাকে অন্য দিকে টানিয়া বলিলেন "কর কি? এখন থেকে গোল তুলে যে বিয়ে পণ্ড হবে! বিয়েটা হয়ে যাক্, তারপরে ওরা খেলে না খেলে কি এমন বয়ে যাবে!"

"বয়ে যাবে না? তুমি রতন ভট্‌চায্যের কথা জান না কি? তাকে একঘরে করে রেখে তার কেউ মর্‌লে পর্য্যন্ত ফেল্‌তে যেত না, বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হতে দিত না; শেষে ধোবানাপিত বন্ধ করে। ছেলেমেয়ের বিয়ে পর্য্যন্ত হয় না। যে তার খেত বা তার কাজে যোগ দিত তার পর্য্যন্ত জাত মার্‌ত। একঘরে হওয়া কি সোজা কথা!"

"কি কর্‌বে ভাই—এখন উপস্থিত কন্যাদায় থেকে তো খালাস পাও। সেটায় বাগ্‌ড়া না পড়ে।"

"আচ্ছা—আমিও—" অর্দ্ধস্ফুট ভাবে কি উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি একদিকে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে লগ্নকাল প্রায় অতীত হইতে চলিল তথাপি কন্যাকর্ত্তার দেখা নাই। সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে কন্যার পিতা অন্তঃপুর হইতে আসিয়া কন্যার মাতার অত্যন্ত অসুস্থতার সংবাদ দিলেন এবং পাছে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হয় এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তিদের নিকটে জোড়হস্তে ত্রুটী স্বীকারান্তে বরকে লইয়া সম্প্রদানের স্থানে বসাইলেন। অন্তঃপুরের মধ্যে তখনো ঈষৎ কোলাহল চলিতেছে। কন্যার মাতা অধিক পরিশ্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, তাই স্ত্রী-আচার আদি কিছুই হইল না এবং কন্যার পিতার ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন ভাবের জন্য কন্যাকে কোন-রকমে সাতপাক মাত্র ঘুরাইয়া সম্প্রদানের স্থানে বসান হইল। পুরোহিতদের "লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়" শব্দের তাগিদে শুভদৃষ্টিরও অবকাশ হইল না। বর ও কন্যা উভয়পক্ষীয় পুরোহিতই বলিলেন "সম্প্রদানের পরে যে শুভদৃষ্টি সেই আসল শুভদৃষ্টি—ওটা মেয়েলি আচার মাত্র।" সম্প্রদান-ক্রিয়াও তখন দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। লগ্ন শেষ হইয়া আসিল বলিয়া কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতেরও ব্যস্ততার সীমা নাই। ওদিকে গ্রামের দলপতিরা কন্যাসম্প্রদানের পর কি-প্রকারে বরপক্ষীয় সম্রান্ত কুটুম্বদিগকেও কন্যার পিতার সঙ্গে নাকের জলে চোখের জলে করিবেন সেই আশায় বরযাত্রদের পরিপাটিরূপে ভোজন সমাধা করাইয়া কন্যাসম্প্রদান দেখিতে নিজেরা একে একে আসিতে লাগিলেন। গৃহিণীর সহসা মূর্চ্ছিত হওয়ার সংবাদে তাহারা আরও খুসী হইয়া "তবে ত ভারি বিভ্রাট!" বলিয়া শেষ-মজার প্রতীক্ষায় রহিলেন।

সম্প্রদান হইয়া গেল। কন্যার পিতার সমস্ত পূজার সহিত তাঁহার কন্যাটিও বরহস্ত পাতিয়া 'প্রতিগৃহ্লামি' বলিয়া ঈশ্বর সমাজ ধর্ম্ম এবং সমবেত লোকদের সাক্ষী রাখিয়া গ্রহণ করিলেন। অনিলও ইহাঁদের বিভ্রাটের সংবাদ শুনিতেছিল,—সেজন্য বিবাহের ছোটখাটো অনেক-গুলি ত্রুটীর দিকে তাহার মন ছিল না এবং সে বিষয়ে তাহার কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না। কিন্তু তাহার বিবাহিত বন্ধুবর্গ অসন্তোষ এবং মৃদু বাক্‌বিতণ্ডা জুড়িয়া দিয়াছে, "এ কি-রকম বিয়ে! এ যেন বলি-উৎসর্গের মন্ত্র পড়া চল্‌ছে! না শুভদৃষ্টি, না স্ত্রী-আচার, না হাসিখুসি, এ কাণ্ডখানা কি!" শিশির এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল—তাহারই উপর সকলে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। "একি হে, এ কোন্ পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে অনিলের জন্য কনে দেখ্‌তে এসেছিলে তুমি! এমন আঁধারে আঁধারে বিয়ে সারা তো কখনো দেখিনি।" কেহবা বলিল "কনে শুনেছি পরীর মত, আমাদের তো এই দেখ্‌বার সময়, কনেই দেখাও ছাই আমাদের। আর দেখ্‌বই বা কি, বাইরে অত আলো, আর বিয়ের জায়গায়ই এমন মিট্‌মিটে প্রদীপ! এই ভূতুড়ে দেশে কিনা শেষে ভূতের মত অনিলের বিয়ে হচ্ছে—ছ্যাঃ!"

'আলো আন, আলো আন' বলিয়া বরপক্ষীয়রা কোলাহল করায় সকলে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইতে উজ্জ্বল আলো আনাইয়া বিবাহমণ্ডপকে উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত করিল। বরের একজন বন্ধু পুরোহিতদের বলিলেন "কি মশায়, আপনাদের লগ্নের কাজ তো সারা হল? এইবার আমরা বরকনে নিয়ে ভাল করে মালাবদল শুভদৃষ্টি করাব। চল হে শিশির, অনিলকে

নিয়ে আবার শিলের ওপর দাঁড় করাও! যে-সব আচার বাদ গেছে তার আমোদ আমরা পুষিয়ে নেব। পিঁড়িশুদ্ধ কনে নিয়ে চল। লগ্নের দায়ে শুভদৃষ্টিটা পর্য্যন্ত ফাঁক্ গেল, আমাদের এ কি প্রাণে সয়? বল কি!" আমোদপ্রিয় বন্ধুবর্গ বর ও কন্যাকে টানিয়া তুলিবার জোগাড় করিবামাত্র বিবর্ণমুখ কম্পিতদেহ কন্যার পিতা তাহাদের সম্মুখে গিয়া জোড়হস্তে বলিলেন "বাবাসকল, তোমরা আর একটু দেরী কর, ঘণ্টাখানেক পরেই আর-একটা লগ্ন আছে, সেই লগ্নে তোমাদের মনের মত আমোদ-আহ্লাদ করে বিয়ে হবে আর সেই বিয়ের উপযুক্ত কনেও আমি দেব। যে বিয়ে তোমরা দিতে এসেছ, এ সে বিয়ে নয়—সে কনেও এ নয়। এটি আমার বোবা কালা বড় মেয়ে। তার বিয়ে দিতে না পারায় গাঁয়ের মুরুব্বিরা বিজলীর বিয়ের আশীর্ব্বাদে পর্য্যন্ত আমার বাড়ীতে খান্‌নি! এখনো কুটুম্ব তোমাদের ও আমাকে একজোটে অপমান ও জাতিচ্যুত করবেন বলে প্রস্তুত হয়ে সব দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ এ কাজে আমার বাড়ীতে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নি। আমি সমাজের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যই এই অভাগা জীবটাকে একবার গোটাকতক মন্ত্র পড়িয়ে বিজলীর বিয়ের আগে সম্প্রদান করে নিলাম মাত্র। এর জন্য বাবা তোমরা আমায় মাপ কর, মনে কর যে এ কিছুই নয়। যে মেয়েকে দেখে ওঁরা পছন্দ করে গেছেন সেই মেয়ের সঙ্গেই বাবাজীর আসল বিয়ে হবে, এ বিয়ে কেবল সমাজকে মুখভেঙ্গান মাত্র। রাত্রি তৃতীয় যে শুভলগ্ন আছে সেই লগ্নে আমি যথার্থ কন্যাসম্প্রদান করব।"

৫

স্তম্ভিত বরপক্ষীয় এবং কন্যাপক্ষীয়গণের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাহার পরেই বরযাত্রীদের কর্কশবাক্য কন্যাপক্ষীয়গণের বিস্মিত মৃদু কণ্ঠস্বরকে ছাপাইয়া গগন ভেদ করিয়া উঠিল—"জোচ্চোর, বদ্‌মাইস—বাটপাড়, জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? শালাদের মারো, মেরে পিসে দাও! এতবড় আস্পর্দ্ধা! সুন্দর মেয়ে দেখিয়ে কালা বোবা মেয়ে গছিয়ে দিতে এসেছে! মারো বদ্‌মাইসদের!" বরপক্ষীয় যুবকবৃন্দ আস্তিন গুটাইতে লাগিল। কন্যাপক্ষীয় নিরপরাধ গ্রাম্য যুবকবৃন্দ প্রথমে হতভম্বই হইয়া ছিল, শেষে বরযাত্রীদের অপমানসূচক বাক্যে তাহারাও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—"মুখ সাম্‌লাও, ভদ্রলোকের মত কথা কও, নইলে আমরাও সহুরে লোক্ বলে রেয়াত করব না।" উত্তরে প্রত্যুত্তরে ভারতচন্দ্রের প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-বর্ণনার দৃশ্যের মত সমরে পশিয়া দুইদলে গালাগালির পর চতুর্থ দৃষ্টান্তের অনুসরণে "মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে" যুদ্ধাবতারণার উদ্যোগ হইল। যদিও এ বিবাহসজ্জায় অনেক 'ঘোড়া' 'গজ' এবং 'সোয়ার'ও ছিল, কিন্তু তাহারা কেহই 'পায়ে পায়ে' 'শুণ্ডে শুণ্ডে' এবং 'খর তরবারে' যুঝিতে অগ্রসর না হইয়া বন্য গ্রামের আম্রকাননের পত্র তৃণ এবং বিবাহবাড়ীর লুচিই একমনে ধ্বংস করিতেছিল। গ্রামের কর্ত্তারা বিবদমান উভয় দলের যুবকবৃন্দকে নিবৃত্ত না করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া জটলা ও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, "যত সব ছেলেছোক্‌রার দল এসেছে, এর মধ্যে যদি একটা ভারিক্কি লোক থাক্‌ত তা হলে কি এই-রকমে চোখে ধুলো দিতে পার্‌ত। নে এখন মজা দ্যাখ্, কিন্তু কি কিচেল, অ্যাঁ! আমাদের পর্য্যন্ত চোখে ধুলো! নে এখন এ মেয়ে নিয়ে কি করে জাত বাঁচে তা দ্যাখ্। ছোঁড়ারা যে রেগেছে আর বিয়ে না হতে দিলেই ঠিক এর শাস্তিটা হয়ে যায়!"

কন্যাকর্ত্তার ক্ষীণস্বর যুবকবৃন্দের তর্জ্জন-গর্জ্জনে কোথায় ডুবিয়া গেল। তিনি যুদ্ধোন্মুখ উভয়দলের মধ্যে গিয়া পড়িয়া বরপক্ষীয়দের নিবৃত্ত করিতে বৃথা চেষ্টা পাইতেছিলেন, কিন্তু কে তাঁহার কথা শোনে। ছাদ্‌নাতলার মধ্যে বরাসনে বর তখনো স্তব্ধ নিৰ্বাক ভাবে চাহিয়া বসিয়া আছে, কন্যার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে। সেও একদৃষ্টে জমায়েৎ যুবকমণ্ডলীর রোষদিগ্ধ ভাবভঙ্গী দেখিতেছিল। সহসা দেখিল তাহার পিতাকে কয়েকজন লোকে ধাক্কা দিয়া একপাশে সরাইয়া দিল। তিনি আবার জোড়হস্তে তাহাদের নিকটে গিয়া কি যেন ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা এবার ঘোরতর মুখভঙ্গীর সহিত তাঁহার স্কন্ধে হাত দিবা মাত্র চকিতে শ্যামলী কন্যাসন হইতে উঠিয়া পড়িল। ছুটিয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইতে গেল, কিন্তু পশ্চাতে টান্ পড়ায় অগ্রসর হইতে

না পারিয়া চাহিয়া দেখিল বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে তাহার আঁচল বাঁধা। টানাটানি করিয়া আঁচল খুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে শ্যামলী অনুভব করিল তাহার আঁচলে আর টান নাই, ইচ্ছা করিলেই সে বুঝি ছুটিতে পারে। অমনি শ্যামলী দ্রুতপদে অপমানিত উদ্‌ভ্রান্ত পিতার নিকটে গিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার ব্যথিত আর্ত্ত চক্ষু যেন সেই স্পর্শের দ্বারাই বলিতেছিল, "বাবা বাবা, কেন তোমায় এমন করছে সবাই? কি করেছ তুমি ওদের? সরে এস, পালিয়ে এস ওদের কাছ থেকে।"

পিতা পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পরেই সবেগে কন্যাকে এক ধারে ঠেলিয়া দিলেন—"সরে যা হতভাগি, সরে যা আপদ্, তুই কেন আবার এখানেও মরতে এলি, সর্!" বলার সঙ্গে-সঙ্গে চাহিয়া দেখিলেন সেই হতভাগীর অঞ্চলে অঞ্চলবদ্ধ স্কন্দপ্রতিমকান্তি যুবক অনিল কোমল করুণ দৃষ্টিতে তাহাদের পিতাপুত্রীকে দেখিতেছে। যুবকের দৃষ্টি দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া শ্যামলীর পিতা উচ্চস্বরে প্রায় কাঁদিয়া ডাকিলেন "বাবা অনিল!" সেই দৃষ্টি যেন তাঁহাকে দেবতার মত বরাভয় দিতেই অগ্রসর হইয়াছিল।

অনিল তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বিবদমান উভয় দলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। স্বপক্ষীয় যুবকদের পানে চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল "কি কর্‌ছ তোমরা? পাগল হয়েছ?"

"পাগল হব না? এমন অপমানে কে না পাগল হয়! পাড়াগেঁয়েদের এতবড় বদ্‌মাইসি, আমাদের ওপরও এমন চাল চালা? আজ ব্যাটাদের তুলো ধুনে দেব, তবে ছাড়্‌ব।"

"এস না, কারা কাদের তুলো ধোনে দেখা যাক্! কত তেল ঘি গায়ে আছে দেখি!"

উভয় পক্ষের এই উত্তরে এইবার বিরক্তিতীব্রস্বরে অনিল বলিল "থাম দেখি এইবার তোমরা। যথেষ্ট হয়েছে।"

বরযাত্রী যুবকেরা এইবার অবাক্ হইয়া যেন অনিলের পানে চাহিল। অনিলেরই মাথার ঠিক্ আছে, কি না, তাহাই তাহারা যেন একযোগে ঠিক্ করিতে বিব্রত হইয়া পড়িল। একজন বলিয়াও ফেলিল "বল কি অনিল তোমারই মাথার ঠিক্ নেই দেখ্‌ছি। তোমার এতবড় অপমান—"

বাধা দিয়া অনিল ডাকিল "শিশির—শিশির, কি কর্‌ছ—তুমিও ক্ষেপেছ না কি এদের সঙ্গে?"

একধার হইতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শিশির আসিয়া বরের নিকটে দাঁড়াইল।

অনিল কন্যাযাত্রী যুবকদের পানে চাহিয়া বলিল "আপনারা এঁদের অশিষ্টতা মাপ করুন, আমি এঁদের হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্চি।"

অমনি তাহার দলের কয়েক জন যুবক রুদ্ধ রোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল "কি! অপমানিত হলাম আমরা, আবার আমরাই মাপ চাইব? অনিল তুমি—"

শান্তস্বরে অনিল বলিল "হ্যাঁ আমরাই মাপ চাইব। আমরাই আগে অভদ্রের মতন ব্যবহার করেছি।"

"বটে? আর এই জাল বিয়ে দেওয়া, সুন্দর মেয়ে দেখিয়ে কালা বোবা—"

"চুপ কর তোমরা! আমি বল্‌ছি আমার কোন অপমান হয়নি! তোমরা কেন মিছে দাঙ্গা বাধাচ্ছ?"

যুবকবৃন্দ হতবুদ্ধি হইয়া শুদ্ধ নির্ব্বাক ভাবে এইবার অনিলের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কন্যাপক্ষীয়রাও একটু লজ্জিত বিনীত ভাবে সরিয়া দাড়াইল। কন্যাকর্ত্তা এইবার জোড়হস্তে উভয়দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন "দোষ আপনাদের কারই নয়, দোষ একা আমার। কিন্তু আমার অবস্থা বুঝে দয়া করে আপনারা মাপ করুন। ছটোর সময় আর-একটা লগ্ন আছে, অনুগ্রহ করে আপনারা একটু স্থির হয়ে বসুন, আমি বাবাজীর শুভ বিবাহের এইবার যথার্থ উদ্যোগ করি। যে মেয়ে আপনাদের দেখানো হয়েছে সেই মেয়েই এনে বাবাজীর হাতে সমর্পণ কর্‌ব, বলেন তো মেয়ে এনে দেখাই। অনুপায় আমার এই অশিষ্টতাটুকু মাপ করে আপনারা সেই শুভ বিবাহে যোগ দেন। এ বিয়ে বিয়েই নয়, এই কথাই আপনারা মনে করুন।" বলিতে বলিতে শ্যামলীর পিতা অগ্রসর হইয়া বিমূঢ়া কন্যার অঞ্চলগ্রন্থি হইতে অনিলের উত্তরীয় মুক্ত করিতে উদ্যত হইবামাত্র

অনিল বাধা দিল—"কি করেন, আপনি ওকি কর্‌ছেন আবার ?"

"বাবা বল্‌ছি তো, তোমার এখনো তো শুভ বিবাহ হয়নি।"

"আপনি বল্‌ছেন কি! এইমাত্র আপনার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন না কি ?"

"ওকি তোমার উপযুক্ত মেয়ে বাবা !"

"তা যাই হোক—কন্যা সম্প্রদান তো আপনি করেছেন, এতে তো কোন ভুল নেই। আর আমিও ওকেই বিবাহের মন্ত্র পড়েই গ্রহণও করেছি তো।—"

আবার অজ্ঞাত একটা বিপদের আভাসে সচকিত হইয়া উঠিয়া কন্যাকর্ত্তা বলিলেন—"না বাবা, এ সে-রকম সম্প্রদান বা গ্রহণ নয়। এ মেয়ে আমার ঘরেই থাক্‌বে। তোমায় আমি—"

"কিন্তু দেখুন, আপনার মনে যাই থাক্ আপনি ত আমায় ঠিক্ সম্প্রদানের মন্ত্র পড়েই কন্যা দান করেছেন, আমিও বিবাহের মন্ত্র পড়ে একেই বিবাহ করেছি! একে নয় বল্লে তো চল্‌তে পারে না।"

"আমায় অভয় দিয়ে আবার একি কথা বল্‌ছ বাবা ? তবে কি আমার মেয়েকে গ্রহণ কর্‌বে না ?"

"করেছি তো! এটিও তো আপনার মেয়ে!"

অনিল একবার অবগুণ্ঠনমুক্তা পার্শ্ববর্ত্তিনী নিস্তব্ধ জগতের প্রাণীটির পানে চাহিয়া চক্ষু নামাইল। শ্যামলীর পিতা এইবার ব্যথিত কাতর কণ্ঠে বলিলেন "আমার মেয়ে বটে, কিন্তু ও কি তোমায় সম্প্রদান করবার উপযুক্ত মেয়ে? যেটি উপযুক্ত, সেইটির জন্যই যে তোমায় সাধনা করে এনেছি। আমার অপরাধ যদি ক্ষমা করে থাক তাহলে বিজলীকে তোমায় সম্প্রদান কর্‌তে দাও। আমার সে আশায় নিরাশ করো না।"

অনিল বিনীত কণ্ঠে বলিল "আপনি অন্যরকম কেন ভাব্‌ছেন! একজনকে দুই কন্যা সমর্পণ সেটা কি ঠিক? আপনি তো বাপ, আপনি ভেবে দেখুন দেখি!"

"এ সে-রকম মেয়ে হলে আমি বাপ হয়ে একাজ কি কর্‌তে পার্‌তাম ? এযে কালা বোবা পাগল বুদ্ধিহীন জড়, এর কথা তুমি অতখানি ভাব্‌ছ ? তোমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক হল, কি বৃত্তান্ত, ওযে কিছুই বুঝ্‌তে পারবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে বিজলীকে বিয়ে করে তাকেই ঘরে নিয়ে যাও,—ওর কথা তুমি আর মনে এনো না। ও একটা জড় মাত্র।"

অনিল স্তব্ধভাবে আবার একবার সেই অনির্দ্দিষ্ট-দৃষ্টি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ সজীব প্রস্তরপ্রতিমার পানে চাহিয়া ব্যথিত কণ্ঠেই যেন বলিয়া ফেলিল "জড় ? না না—আপনি ভুল বল্‌ছেন।" পিতার বিপদ-সম্ভাবনায় শ্যামলীর ব্যাকুলভাব অনিলের মনে তখনো উজ্জ্বল হইয়াই রহিয়াছে।

"না বাবা ভুল নয়। তুমি দুদিন পরীক্ষা করলেই—যাক্ একথা, এখন অনুমতি কর, আমি বিজলীকে তোমায় সম্প্রদান করি।"

"লগ্ন প্রায় হয়ে এল আর দেরী করা নয়"—কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত হাঁকিলেন।

বরযাত্র কন্যাযাত্র উভয় দলই স্তব্ধকৌতুহলে বরের মুখের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অত কলরব নিমেষে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া অনিল উত্তর দিল "আর হয় না। আপনার ছোট কন্যাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করবেন।"

শিশির এইবার অনিলের নিকটস্থ হইয়া তাহার কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া অন্যের অশ্রাব্য স্বরে বলিল "ওকি অনিল ? না না, একি তোমার বিয়ে নাকি ? একটা হাবাকালার সঙ্গে ? তোমার মা কি বল্‌বেন বল দেখি ? এই মেয়েটিকে যে তাঁর বড় পছন্দ। এ একটা ছেলেখেলার মতই হয়ে গেল ভাব না। এরপর তো ভাল মেয়ে বিয়ে করতেই হবে, এটিকে কেন ছাড়্‌ছ। রাজী হও বুঝেছ।"

অনিল উত্তর দিল না, কেবল নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল মাত্র। তাহার অপমানিত বন্ধুবর্গও এইবার যেন এই অপমান-সমুদ্রে কূল দেখিতে পাইল। সত্যই তো, আবার এই জালিয়াতের কন্যা গ্রহণ! কেন ? কত সুন্দর মেয়ে অনিলের জুটিবে। ইহাদের ঘরে আর একাজ না করাই অনিলের কর্ত্তব্য। সকলে একবাক্যে অনিলের মতে মত দিয়া সঝঙ্কারে এসম্বন্ধে যাহার যাহা খুসী মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

"কি বাবা অনিল, নিতান্তই আমার মেয়েটিকে পায়ে স্থান দেবে না ?"

"আপনি তো কন্যাসম্প্রদান করেছেন। একজনকে দুবার দু'কন্যা সম্প্রদান হতে পারে না।"

"তাই বা কেন হবে না? আমাদের সমাজে তাও তো আক্‌সার চলে।"

"চলে চলুক! আমি তার পক্ষপাতী নই।"

"তবে কি নিতান্তই আমায় সমাজচ্যুত হয়ে থাক্‌তে হবে বাবা? যার জন্যে একাজ কর্‌লাম তাই-ই আবার আমার কপালে ঘট্‌বে? তোমার মত জামাই পেয়েও আমার সে ফের ঘুচ্‌ল না?"

"কেন, আপনার বড় মেয়ের বিয়ে তো হয়ে গেছে, আবার জাতিচ্যুত কেন হবেন?"

"ছোট মেয়েরও যে আজ অধিবাস হয়েছে, বিয়ের সাজে সজ্জিতা মেয়ের যদি আজ বিয়ে না হয় তাহলে আমার জাত কি করে থাক্‌বে বাবা! এই রাত্রে আমি পাত্র কোথায় পাব?"

অনিল চিন্তিত হইয়া মাথা নামাইল। শিশির আবার তাহার কর্ণের নিকটে ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিল "ছবিখানার কথা একবার মনে কর হে, রাজী হও, রাজী হও।"

ইহার পূর্ব্বের ব্যাপার শ্যামলী যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল,—তাহার বাপের কোন বিপদ হইয়াছে, সকলে তাহার বাপকে অপমান করিতেছে; কিন্তু এখনকার কাণ্ড আর তাহার মাথায় প্রবেশ করিতেছিল না। সকলে এমন করিয়া তাল পাকাইয়া এ উহার পানে চাহিয়াই বা আছে কেন, আর মাঝে মাঝে ঠোঁটই বা নাড়িতেছে কেন! ঠোঁট্ তো সকলেই নাড়ে, তা নাড়ুক, কিন্তু তাহার বাবা এখনো অমন হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কেন। সে আবার পিতার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কি যেন প্রশ্ন করিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পিতা বিরক্ত ইঙ্গিতে কেবল তাহাকে শীঘ্র ঘরে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন মাত্র। এই এত জনসংঘের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের অদ্ভুতভাবের দৃষ্টিপাতে শ্যামলীও শ্রান্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তাই বিনা আপত্তিতে সে নিজের অঞ্চল বরের অঞ্চল হইতে এইবার খুলিয়া লইয়াই গৃহের পানে চলিয়া গেল। কেহ তাহাকে নিবারণও করিল না, সেও যেন তাহাদের সঙ্গ আর সহিতে পারিতেছিল না। দর্শকগণ শ্যামলীর এই ব্যবহারে মনে মনে হাসিয়া দৃষ্টির দ্বারা যেন অনিলকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিল তোমার ভাগ্যে কি মিলিয়াছে দ্যাখ, কাহার জন্য তুমি এতখানি ভাবিতেছ! এ যে একটি জানোয়ার মাত্র। কিন্তু অনিলের যেন মনে হইল তাহার নবপরিণীতা পত্নী স্বামীর দায়িত্ব হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়া বলিয়া গেল "আমি তোমায় মুক্তি দিলাম, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই নাই। আমি এক জগতের জীব—তুমি আর-এক জগতের। তোমায় আমায় কোন সম্বন্ধে কেহই বাঁধিয়া দিতে পারে না। মানুষের বাঁধা গ্রন্থি এই আমি খুলিয়া দিলাম—তোমার আর ভয় নাই। তুমি যাহা ইচ্ছা এখন করিতে পার।"

শিশির বলিল "অনিল কি ঠিক্ কর্‌লে?"

"ভগবান্ যা বিধান কর্‌লেন তাই ভাই!"

"তাহলে সত্যই আর বিয়ে কর্‌বে না?"

"না। কিন্তু ব্রাহ্মণের জাতও রাখ্‌তে হবে। বিশেষ উনি এখন আমাদের আত্মীয়।"

"তোমার শ্বশুরের? আর জ্বালিও না। মা যে মাথামুড় খুঁড়বেন তাই আমি ভাব্‌ছি অনিল। ভাল মেয়েটিকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে একথা তাঁকে না বল্লেও চল্‌ত, বল্‌লেও গায়ে লাগ্‌ত না।"

"যাক্ সে সব ভাবনা পরে। এখন উপস্থিত ওঁরও জাত বাঁচাতে হবে আমাদের।"

"কি করব আবার আমরা ওঁর?"

"তোমাকেই বিজলীকে বিয়ে কর্‌তে হবে। অমন সুন্দর মেয়েটি তা হলে আমাদেরই ঘরে যাবে।"

"আমি? সে কি অনিল, তুমি ক্ষেপেছ! তোমার সঙ্গে যার বিয়ের কথা তাকে আমি—"

"তাতে কি হয়েছে? ভগবানের অচিন্ত্য ঘটনা ঘটাবার যে কত শক্তি তা তো দেখ্‌ছ। তুমিও না হয় বরযাত্রী এসে বিয়ে করে যাবে।......আপনি উঠুন। এই শিশির সম্পর্কে আমার একরকম ভাই—বন্ধুত্বে ভাইয়ের চেয়েও বেশী, এও এম-এ পাশ, কুলশীল যতদূর ভাল হতে হয়। আমায় যদি সচ্চরিত্র ভেবে কন্যাদান করতে পারেন, শিশির তার চেয়েও সচ্চরিত্র! এঁরই হাতে আপনার ছোট কন্যাটিকে

সম্প্রদান করুন। আমি বল্‌ছি, আপনার সে মেয়ে যেমন শুনেছি তারই উপযুক্ত এ পাত্র।"

শিশির দুই-চারিবার বাধা দিতে গেল, কিন্তু অনিল নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া বিবাহের আসনে বসাইয়া দিয়া তাহাকে শীঘ্রই নীরব করিয়া দিল।

৬

চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিজলীর পিতা শিশিরের হস্তে বিজলীকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার জাতিও রক্ষা পাইল। প্রভাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রামস্থ প্রবীণেরা গণ্ডেপিণ্ডে ঠাসিয়া তাঁহার বাড়ীতে ভোজন করিলেন এবং নানারকম আমোদজনক কথায় তাঁহার মনোরঞ্জনেরও চেষ্টা পাইলেন। "আরে! আমাদের কপালে নাকি আজ বিধাতাপুরুষ এই ফলার মাপিয়েছেন, কার সাধ্য তা রোধ করে। ভায়া, তোমার ঘাড়ে আজ তিনিই চেপে এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে আমাদের খাওয়ালেন তবে ছাড়্‌লেন! তোমার খুব ভালই হল হে ভায়া, দুটি জামাই-ই তুল্যমূল্য, তবে বড় বাবাজী জমিদারের ছেলে এই যা! উনি কি আর আমাদের শ্যামলীকে নিয়ে ঘর কর্‌বেন! উনি অবিশ্যি কাল বাড়ী গিয়েই আবার চতুর্দ্দোলে চড়বেন! যাক্ তবু তো তোমার জামাই হতেই হয়েছে—এই তোমার ভাগ্যি। উনি কি আর বিজলীকে বিয়ে করতে পারেন। অমন ছেলে কি মেলে! তোমার হয়েছিল বামন হয়ে চাঁদে হাত। তা যা হল বেশ হল, এখন আমোদ আহ্লাদ কর এই রাতটা অন্ততঃ জামাই দুটি নিয়ে! কাল বিজলী শ্বশুরবাড়ী যাবে—শ্যামলী আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরেই থাক্‌বে তার জন্যে আর কি!" ইত্যাদি। কন্যাদের পিতা নীরবে তাঁহাদের ভোজন সমাধা করাইয়া একটা কক্ষে গিয়া খিল বন্ধ করিলেন। হায় জাতিরক্ষার আনন্দ আজ তাঁহার কোথায়!

পরদিন বরকন্যা বিদায়। অনিল শিশিরের পিতা-মাতাকে টেলিগ্রাম করিয়া কতক ব্যাপার জানাইল, এবং নিজের বিবাহসজ্জায় তাহাদের সজ্জিত করিয়া কয়েকজন বন্ধুর সহিত সস্ত্রীক শিশিরকে তাহার নিজগৃহে পাঠাইবার উদ্যোগ করিল। নিজের মাতার আঘাতের কথা ভাবিয়া শিশিরকে নববধূসহ প্রথমে নিজের বাড়ী লইয়া যাওয়া অনিল যুক্তিযুক্ত মনে করিল না এবং শিশিরও রাজী হইল না।

বিবাহের পরদিনের যথাকর্ত্তব্য সমাপনান্তে আহারাদির পর বরপক্ষীয়গণ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। অদ্যকার কার্য্যে বাটীর কাহারো উৎসাহ ছিল না, এতগুলি লোকের চেষ্টাতেও যেন সব কাজই শ্রীভ্রষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছিল। গৃহের উপর দিয়া যেন গতরাত্রিতে একটা অকল্যাণের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, মঙ্গলচিহ্নসকল যেন অমঙ্গলের মতই সকলের মনের উপর একটা শোকস্মৃতি আনিয়া দিতেছিল। কন্যাদের পিতা কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদানের পর সেই যে গিয়া শয্যাগত হইয়াছেন আর উঠেন নাই। কিন্তু পাড়ার মাতব্বরেরা সমবেত হইয়া সেদিনের ব্যাপার একরূপ সারিয়া তুলিলেন। অনিলের কাণ্ডে তাহার স্বজন ও বন্ধুবর্গের যেন বাঙ্‌নিষ্পত্তিরও ক্ষমতা ছিল না। অনিল যদি শিশিরের সঙ্গে বিজলীর বিবাহ না দিয়া এবং নিজেও তাহাকে গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাইত তাহা হইলেই এ ব্যাপারের একটা যা হোক্ কিছু প্রতিশোধ হইত। এ অনিল করিল কি! নিজে না হয় এর পর অন্যত্র বিবাহ করিবে, কিন্তু শিশিরের সঙ্গে ইহাদের কন্যার বিবাহ দিয়া অনিল যে ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধও স্বীকার করিল। শিশির যে তাহার ভ্রাতার মতনই তাহা সকলেই জানিত। তাই অনিলের এতখানি ঔদার্য্যকে তাহারা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না, এমন কি শিশিরের উপরও তাহাদের রাগের সীমা ছিল না। কিন্তু অনিলের ভয়ে কেহ কিছু প্রকাশও করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও আবার শিশিরের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুতও হইতে হইল।

মাতব্বরেরা কন্যাকর্ত্তাকে কোন-রকমেই এতক্ষণ দ্বার খোলাইতে পারেন নাই, আবার গিয়া বৃথা ডাকাডাকি করিলেন—"বলি কি হে, এইবার যে জামাইবাবাজীরা চল্লেন। এখনো কি গিয়ে তাঁদের পায়ে হাতে ধরে অন্ততঃ ছোট মেয়েটাকেও গছিয়ে দেবে না? সেটাও কি ঘাড়ে থাক্‌বে তোমার চিরকাল? যাহোক্ মেয়ের বিয়ে দিলে কিন্তু! বরযাত্রদের আজ একটা সম্মানও কর্‌লে না অত কাণ্ডর পরে, তাদের যে করে হাতে পায়ে ধরে আমরা

খাইয়েছি তা আমরাই জানি! বেরিয়ে দ্যাখ একবার, কুটুম্বদের ভোজেরই কি, আর বাবাজীদের কুশণ্ডিকারই বা কি, এতটুকু অঙ্গহানি আমরা হতে দিইনি। সে যাহোক্ একরকম চুকে গেছে। এখন জামাইদের বিদায় দেবার সময়েও দুটো হাত জোড় করে ছোট মেয়েটার একটু উপায় কর! আমরা অনেক করে বলায় বিজলীকে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন বটে, কিন্তু দুই জামাই-ই আবার বিয়ে করলো বলে এ জেনে রাখ।"

কন্যাকর্ত্তা নিঃশব্দেই রহিলেন।

অনিল আসিয়া যখন দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিল "আপনি বেরিয়ে আসুন—আমরা এইবার যাব—আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন।" তখন বিজলীর পিতা রুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে গৃহমধ্য হইতেই উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 'বাবা অনিল' ছাড়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর কোন শব্দই বাহির হইল না।

অনিল দ্বারে আঘাত করিয়া আবার বলিল "দোর খুলুন।"

অগত্যা দ্বার খুলিয়া কর্ত্তা একপাশে দাঁড়াইলেন। অপরাধের ভয়ে তিনি আর জামাতার দিকে চাহিতেও পারিতেছিলেন না। অনিল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "আপনি কেন অত শোকাকুল হচ্চেন। এসব ভগবানের হাতের কাজ, এতে মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই। আপনার ছোটকন্যা অপাত্রে পড়েনি, ক্রমে জানবেন শিশিরের মত পাত্র জগতে খুব সুলভ নয়। আপনার কন্যা চিরসুখিনী হবে।"

"বাবা, শিশির যেমনই হোন্—বিজলী যত সুখীই হোক্, তোমায় যে আমি পেয়েও হারালাম, ছার জাতের ভয়ে তোমার মত সন্তানকে যে আপনার করতে পেলাম না—এ ক্ষতি কি—" শোকে কর্ত্তার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অনিল একটু থামিয়া বিনীত ভাবে বলিল "এও আপনি ভুল বুঝ্ছেন। আমি তো আপনাদের সঙ্গে এই নতুন সম্বন্ধ অস্বীকার করছি না।"

"বাবা, তুমি দেবতা, তা কালই বুঝেছি। কিন্তু তোমার মহত্বে তুমি নিজে যাই বল—আমি কোন্ প্রাণে এ সম্বন্ধ স্বীকার করব অনিল? আমার ঐ ত মেয়ে! তার স্বামী বলে, আমার জামাই বলে কোন্মুখে তোমায় চাইতে পারব! লোকে যা বল্বে সে কথা দূরে থাক্, আমার মনই যে আমায় পুড়িয়ে মারছে বাবা। যদি বিজলীকে নিতে, তবুও বুঝি সান্ত্বনা পেতাম কিছু—"

"আপনি বুঝে দেখুন" সে কাজ একেবারেই ভাল হত না। আপনার বড় মেয়েকে জড় বল্ছেন। কিন্তু আমি যদি ওদের দুই বোনকেই বিয়ে করতাম তা হলে কে বল্তে পারে যে সে তার ভগিনীর সঙ্গে ও আমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তা কখনই বুঝতে পারত না বা সেজন্য কোন তাপও অনুভব করত না! আপনার একটি সন্তানের সৌভাগ্যে আর-একটি নিজেকে তার অধিকারী জেনেও যে বঞ্চিত থাকত—তার অনেক দুর্ভাগ্যের মধ্যে এই আর-এক দুর্ভাগ্য যে তার চোখের ওপর সর্ব্বদা জ্বলজ্বল্ করত, সেটা কি ঠিক্ হত? ভেবে দেখুন।"

কর্ত্তা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তুমি দেবতা, তাই দেবতার মতই বিচার করেছ বাবা—কিন্তু বাপ হয়েও আমি একথা একবার ভাবতে পারিনি, পারলে বুঝি এ কাজ করতে যেতাম না। যাক্, আমার কাজের শাস্তি আমিও পেলাম। এখন এ ঘটনা তুমি মন থেকে শীগ্গিরই মুছে ফেলো, ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কোরো—সুখী হয়ো, এই আমার তোমায় আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।"

"শিশিরদের আশীর্ব্বাদ করবেন চলুন।"

দ্বিতীয় কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া দেখিলেন শ্যামলীও ভগিনীর নিকটে পট্টবস্ত্র পরিয়া বসিয়া আছে—তাহারও ললাটে সিন্দুরচিহ্ন, ভগিনীর দেখাদেখি সেও মস্তকে কাপড় দিয়াছে। তিনি অনিলকে নিকটে দেখিয়া আর কোন বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না বা কোন প্রশ্নও অনিলকে করিলেন না, কেবল সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শিশির ও বিজলীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াই অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

একজন রমণী আসিয়া সসঙ্কোচে অনিলকে ডাকিল "আপনার শাশুড়ী আপনাকে ডাক্ছেন।"

অনিল বুঝিল—এখানের কেহই তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। সম্পূর্ণ

অপ্রত্যাশিত বিবাহ, তথাপি শিশিরকে যেন সকলে তাহার চেয়ে সম্ভ্রম কম করিতেছে; রমণীরা শিশিরকে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতেছে, কচিৎ কেহবা একটু একটু ঠাট্টা তামাসাও করিতেছে এবং ইহার পরে যে শিশিরের নিকটে নিজেদের প্রাপ্য সমস্তই একে একে আদায় করিবে তাহার জন্য শাসাইয়া রাখিতেছে—কিন্তু তাহার নিকটে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। যদি বা বিশেষ প্রয়োজনে বয়স্থারা কেহ কিছু বলিতেছেন, তাহাও অতি সম্ভ্রমে, অতি ভয়ে ভয়ে! যেন কোন একটা মহৎ ব্যক্তিকে বিষম একটা ব্যঙ্গ করা হইয়াছে—সেই অপরাধে এখানের প্রত্যেক প্রাণীটি তাহার নিকটে নতশির।

যে রমণী অনিলকে ডাকিতে আসিয়াছিল তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে অনিল একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল —মলিনবসনা একজন রমণী যেন ছায়ার সঙ্গেই মিশাইয়া সেই গৃহকোণে বসিয়া আছেন। অনিল তাঁহাকে প্রণাম করিতেই সে রমণী অঞ্চল লইয়া মুখে চাপা দিলেন এবং তাঁহার ক্ষীণ শরীর অত্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অনিল নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরে তিনি যেন অতি কষ্টে সম্বৃতা হইয়া কয়েকবারের চেষ্টায় কেবল উচ্চারণ করিলেন "শ্যামলীকে সেখানে নিয়ে যেও না—" অনিলও এই সংক্ষিপ্তভাষিণী সংযতবেদনা জননীর আদেশের উপরে অধিক কিছু বলিতে সাহস করিল না, কেবল মৃদুস্বরে বলিল "আপনি জানেন সেখানে মা আছেন। আমার জীবনের সব ব্যাপারই তাঁর পায়ে পৌঁছে দিতে আমি বাধ্য।"

শ্যামলীর মাতা এইবার আর-একটু সবল স্থিরকণ্ঠে বলিলেন "তাঁর জন্যই আমি বারণ কর্‌ছি। তুমি আমাদের হাতে এ অপমান সয়েছ, কিন্তু তোমার মা সইতে পার্‌বেন না।"

"ভগবানের হাতের বিধান মানুষকে সইতেই হবে। একেবারে না পারে, মানুষ ক্রমে ক্রমে তাকে সয়।"

এইবারে ঈষৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে শ্যামলীর মাতা বলিলেন "ভগবানের হাতের বিধান আমরা সয়েছি, কিন্তু তোমার মা এই মানুষের হাতের বিধান কখনই সইতে পার্‌বেন না বাবা, এ যে কেউই সইতে পারে না।"

"সবই ভগবানের কাজ মা, মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া শ্যামলীর মাতা বলিলেন "তবু তাঁর চোখের ওপরে এখনি ওকে নিয়ে যেও না, তিনি বড় আঘাত পাবেন। আর ও-ও—হয়ত......, ওকে আমার কাছেই ফেলে যাও বাবা।" বলিতে বলিতে রুদ্ধ বেদনায় তিনি আবার কাঁপিয়া উঠিলেন।

অনিল এইবার নানা ব্যথা এবং লজ্জায় কম্পিতা এই মহিলার কথায় বেদনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অভাগা সন্তানের জন্য শঙ্কার যে চিহ্ন প্রকাশ পাইতে দেখিল, অপরিচিত স্থানের শত আঘাত-সংঘাতের মধ্যে তাঁহার দুর্ভাগ্য কন্যাটিকে পাঠাইতে সঙ্কোচের সঙ্গে যে আশঙ্কার বেদনাও তাঁহার মুখে চক্ষে ফুটিয়া উঠিতে দেখিল তাহাতে সে অপ্রীত হইল না। দৃঢ়কণ্ঠে তখন সে বলিল "আপনি নিষেধ কর্‌বেন না? মা আঘাত পাবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই সময়েই তাঁকে একেবারে সইয়েও নিতে হবে। আর অন্য আশঙ্কাও আপনি বেশী কর্‌বেন না, আমিই ওকে দেখ্‌ব।"

শ্যামলীর মাতা আর যেন তাঁহার মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না—উচ্ছ্বসিত অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে "বাবা, কি বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ব" এইটুকু মাত্র উচ্চারণ করিয়া অমনি তখনি থামিয়া গেলেন। নিজের কাছেই নিজেকে যেন তাঁহার অত্যন্ত অপরাধী ও স্বার্থপর বলিয়া মনে হইল। একটু পরে স্থিরভাবে আবার বলিলেন "তোমার মত ছেলেকে বারে বারে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই, কিন্তু বাবা আমার একটি অনুরোধ—এই হতভাগাদের জন্যে যেন তোমার সোনার জীবনে অশান্তি এনো না। মার অবাধ্য হয়ো না— তিনি যা বল্‌বেন তাই কোরো। আমাদের জন্যে যা তুমি কর্‌লে এ সাধারণ মানুষে পারে না। বিজলীকেও উপযুক্ত পাত্রে দিলে, আমাদের জাতকুল বাঁচালে! সবচেয়ে বড়, আমাদের ঐ হতভাগাটার জন্যেও তোমার করুণার শেষ দেখ্‌ছি না! কিন্তু বাবা, এর চেয়েও অমানুষিক আর কিছু কোরো না—তাতে আমরাও সুখী হব না। মাকে একবার দেখাতে চাচ্ছ, কি দেখাবে বাবা? না নিয়ে গেলেই সব দিকে ভাল কর্‌তে, এখনো বুঝে দ্যাখো।"

অনিল এ কথায় যে সম্মতি দিল না, অনিলের অটল ভাবে তাহা বুঝিয়া অগত্যা শ্যামলীর মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তবে নিয়েই যাও, কিন্তু এর পরে আমার কাছেই দিয়ে যেও ওকে! তোমরাও ওর জন্যে কষ্ট না পাও, ও-ও যেন—" বলিতে বলিতে আবার তিনি থামিলেন।

অনিল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। শ্যামলীর মাতা আবার গৃহকোণে লুকাইয়া পড়িলেন। বিধাতা যদি শ্যামলীর ভাগ্যে এমন স্বামীই লিখিয়াছিলেন তবে তাহাকে অমন করিলেন কেন! সেই দুর্ভাগ্য মাতাকন্যার অদৃষ্টে এমন রত্নেরই বা কেন সংযোগ হইল! যা তাহাদের ভোগের নয় তেমন জিনিষ দেখাইয়া ভগবান কেন তাহাদের এই দুরদৃষ্টের উপর দ্বিগুণ বিড়ম্বিত করিলেন। অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস! একি নিদারুণ ব্যঙ্গ! কি দুর্লভ স্বামীই যে বিধাতা তাকে দিয়াছেন একি শ্যামলীর বুঝিবারও ক্ষমতা আছে! হায় শ্যামলীর পিতা এমন কাজ কেন করিলেন। নিজের অভাগ্য সন্তানের চেয়েও, আজ বুদ্ধিতে বিদ্যায় দয়ায় ও শৌর্য্যে মণ্ডিত অনুপম সুন্দর আর-একখানি মুখ শ্যামলীর মাতার বক্ষ জুড়িয়া বসিয়াছে। সে মুখের দিকে চাহিয়া তিনি যে আজ নিজের হতভাগ্য সন্তানের দুঃখও ভুলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু সে মুখখানিকে 'আমার সন্তান' বলিয়া মনের বক্ষে লইবারও যে তাঁহার সাধ্য নাই! সে মুখ তো তাঁহাদের স্পর্শক্ষম রত্ন নয়—সে মুখ যে দেবত্বমণ্ডিত অগ্নি! তাঁহারা যে পতিত! পতিতদের এই যে স্পর্দ্ধা, ইহাতেই ভগবানের নিকটে কত না জানি অপরাধী হইতে হইয়াছে! কিন্তু সেই বা কেন এখনো তাঁহাদের সঙ্গে এই নিতান্ত অনুপযুক্ত সম্বন্ধও রাখিতেছে। কেন সে শ্যামলীকে ত্যাগ করিয়া গেল না। শ্যামলীর পিতা যে পাপ করিয়াছে তাহার শাস্তি কেন সে একটুও দিল না। তবে কি...... ভগবান—ভগবান, এই নিতান্ত অন্ধ স্বার্থপরতা হইতে রক্ষা কর! সেই দেবকুমার যেন অসুখী না হয়! শ্যামলীকে যেন সে শীঘ্র তাঁহার কাছে রাখিয়া গিয়া আবার বিবাহ করে। উপযুক্ত বধূ গ্রহণ করিয়া যেন সে জীবনের সার্থকতা পায়। কোন অন্যায় খেয়ালে যেন সে শ্যামলীর মাতা-পিতাকে পাপের ভাগী না করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

[জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত]

৫৬ অধ্যায়।

তিব্বতে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা।

অক্টোবর মাসের আরম্ভে একদিন আমি লাসার বাসা হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে পারকোরের দিকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। লাসারই এক অংশের নাম "পারকোর"। এখানে অপরাধীদিগকে দণ্ড দিয়া অপমানিত করিবার জন্য সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ্যে রাখা হয়। হাতে হাত-কড়া পায়ে বেড়ি দিয়া অপরাধীদিগকে রাখা হয়। আমি যেদিন দেখিলাম সেদিন ২০ জন দণ্ডভোগ করিতেছে। কাহাকেও খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে—কারো হাত-পা বাঁধা রাস্তার একধারে পড়িয়া রহিয়াছে। সকলেরই ভদ্র-বেশ, গলায় দেড়ইঞ্চি পুরু একগজ মাপের এক চৌকো তক্তা, মাথাটি তার মধ্যে প্রবেশ করান, সেই কাঠেই একটি কাগজে অপরাধীর অপরাধের কথা লিখিত আছে, এবং যে দণ্ডভোগ করিতেছে তাহাও বর্ণিত আছে। বেত্রদণ্ড হইলে ৩০০ হইতে ৭০০ বেত পর্য্যন্ত মারা হয়। আমি দুই তিনজন ছাড়া বেশী অপরাধীর দণ্ডের কথা পাঠ করিতে পারিলাম না। ইহাদের মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে কয়জনের অপরাধের কথা পড়িলাম তাহারা সকলেই "টানগিলিং" বিহারের লোক। এই বিহারের প্রধান লামাই দলাই লামার মৃত্যু হইলে তাঁর পদ গ্রহণ করেন। তিব্বতে "টানগিলিং" বিহার বড়ই প্রসিদ্ধ। আমার লাসায় আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই বিহারের প্রধান লামার পদে "টিমোরিনপোচি" নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারই অধীনস্থ 'নরপু-চিরিং' নামে এক কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয়, যে, সে ব্যক্তি দলাই লামার প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্রতন্ত্র করিয়া ভূতপ্রেতের শরণাপন্ন হইয়াছিল। নরপুচিরিং যে মন্ত্রবলে দলাই-লামার প্রাণ সংহারের চেষ্টা পাইয়াছিল তাহা বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্গত নহে —প্রাচীন "বন" ধর্ম্মের বিধি অনুসারে তাহা প্রযুক্ত হইয়াছিল। একখণ্ড কাগজে প্রাণঘাতক মন্ত্র লিখিয়া দলাই

লামার পাদুকার নিম্নে রাখিয়া তাঁহাকে তাহা পরিতে দেওয়া হইয়াছিল। নিশ্চয় এই মন্ত্রের শক্তি অব্যর্থ, কারণ দলাই লামা যখনই সেই পাদুকা ব্যবহার করিতেন, তখনই তাঁহার একটা না একটা কঠিন পীড়া উপস্থিত হইত। অবশেষে সেই মন্ত্রসিদ্ধ কাগজখণ্ড জুতার ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হয়। এই ব্যাপার প্রকাশ হইবামাত্র অনেক ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়া ধরা হয়। তন্মধ্যে টিমোরিনপোচি অন্যতম। অনেকে টিমোরিনপোচিকেই সর্ব্বপ্রধান অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিল। দলাই লামাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং ঐ পদ লাভ করিবার জন্য নিশ্চয়ই সে এই সমুদায় ষড়যন্ত্র করিয়াছে। নরপুচিরিং টিমোরিনপোচির প্রধান মন্ত্রী—এই ব্যক্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া সকলকে উত্যক্ত করিয়াছিল। নরপুচিরিংএর জন্য কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। নরপুচিরিংকে বর্ত্তমান দুষ্কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী বলিয়া সকলেই প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দলাইলামাও সাধারণের এই অভিযোগ সত্য বলিয়া অনুমান করিয়া টিমোরিনপোচি নরপুচিরিং প্রভৃতিকে কয়েদ করিলেন।

আমার লাসায় আগমনের পূর্ব্বে এইসকল ঘটনা ঘটে। টিমোরিনপোচির মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু নরপুচিরিং এখনও কঠিন শাস্তি ভোগ করিতেছে—এখনও সে কয়েদ আছে। সে ভীষণ কারাগৃহের উপরে একটি মাত্র ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া সামান্য আহার্য্য ফেলিয়া দেওয়া হয়, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে বাহির করিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইবার চেষ্টা করা হয়। হতভাগ্য যখন সূর্য্যের আলোক দর্শন করে, তখন তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কারণ যে যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হয়, তাহা শ্রবণ করিলে শরীরের রক্ত জমাট হইয়া যায়। নরপুচিরিংকে যে শাস্তি দেওয়া হইত, তাহা অতি বীভৎস। তাহার নখের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি ঢুকাইয়া দেওয়া হইত। তাহার পর নখটি ছিঁড়িয়া ফেলা হইত। যন্ত্রণা যাহাতে অধিক হয় এই জন্য একটি একটি করিয়া দশটি অঙ্গুলি এইপ্রকারে ক্ষতবিক্ষত করা হইয়াছিল। রহিয়া সহাইয়া যন্ত্রণা দেওয়া, যাহাতে অনেকদিন ধরিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারে। হতভাগ্য নরপু এতাবৎকাল এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছে। নরপুচিরিং অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত সকল সহ্য করিয়া আসিতেছে। সে প্রাণান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও টিমোরিনপোচিকে নির্দ্দোষ বলিয়াছে, সে-ই যে একমাত্র অপরাধী একথা বারংবার বলিয়াছে। নরপুর যন্ত্রণা দেখিয়া টিমোরিনপোচি সমুদায় অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন—তিনি বলিতেন, নরপুর কোন অপরাধ নাই, সে তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া যাহা কিছু করিয়াছে। এদিকে নরপু প্রাণান্ত যন্ত্রণার ভিতর অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে "সে-ই দোষী, প্রভুর কোন অপরাধ নাই।" টিমোরিনপোচি নরপুকে কত বুঝাইয়াছেন—আপনাকে নিরপরাধ বলিবার জন্য। কিন্তু নরপু কেবল বলিয়াছে "আমার প্রভু নিরপরাধ, আমাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ স্কন্ধে সকল অপরাধ লইয়াছেন।" টিমোরিনপোচি ত ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া গিয়াছেন, নরপু দুই বৎসর এই ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যেও একবারও টিমোরিনপোচির বিরুদ্ধে কিছু বলে নাই। টিমোরিনপোচি যে নির্দ্দোষ ছিলেন তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? টিমোরিনপোচি নরপুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। নরপুর অপরাধ যাহাই হউক, তাহার এই অবিচলিত দৃঢ়তা এবং অসীম ধৈর্য্যের কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে তাহার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি জাগ্রত হইল। আমি সেদিন যতগুলি দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী দেখিলাম, সকলেই নরপুর অধীন লোক। শুনিলাম ১৬ জন "বন"সম্প্রদায়ের পুরোহিতকে এই ব্যাপারে লিপ্ত বলিয়া হত্যা করা হইয়াছে। আরও কত লোক যে কতপ্রকার শাস্তি ভোগ করিয়াছে তাহা কে গণনা করিবে। আমি যে-সকল দণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখিলাম তাহাদের অপরাধ গুরুতর নহে—তাহাদের কেহ ৩০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত-দণ্ড ভোগ করিবে। তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, বোধ হয় নরকযন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নরকে আসিয়াছি। দুঃখে আমার প্রাণ কাতর হইল। কিছুদূর গিয়া আর-এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলাম। একটি সুন্দরী তরুণীর গলায় অপরাধীর ভীষণ কাষ্ঠবেড় বাঁধা। রমণীর হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ—চক্ষুদ্বয় নিমীলিত। নিকটে যমদূতের ন্যায় তিনজন প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে।

নিকটে কিছু খাদ্যসামগ্রী পড়িয়া আছে—প্রহরীরা মুখে তুলিয়া দিলে রমণীর পক্ষে ভক্ষণ করা সম্ভব। এ হতভাগিনী রমণী আর কেহ নয়, হতভাগ্য নরপুর পত্নী। শুনিলাম তিব্বতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মানিত বংশে ইহাঁর জন্ম। শুনিলাম নরপুকে প্রথম প্রথম এত যন্ত্রণা দেওয়া হইত না… সাধারণ কারাগারেই তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানকার প্রহরীকে ঘুষ দিয়া নরপুর পত্নী প্রায়ই কারাগৃহে গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ক্রমে একথা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে, নরপুর জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইল, এবং সেইসঙ্গে তাহার পত্নীরও অশেষ লাঞ্ছনা আরম্ভ হইল। আমি যেদিন এই রমণীকে দেখিলাম সেদিনই তাঁহাকে ৩০০ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইবে। বেত্রাঘাতের পর প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহাকে রাখা হইবে।

হতভাগিনী নারী—তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যে পার্থিব কোন যন্ত্রণা অনুভব করিবার তাঁহার আর শক্তি নাই। কি বিবর্ণ শীর্ণ মূর্ত্তি—এই দেহে বেত্রাঘাত! কি আশ্চর্য্য। কত নিষ্ঠুর পাষণ্ড চারিদিকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে দেখিতে দণ্ডের তালিকা উচ্চস্বরে পাঠ করিতেছে। এমন নরাধমও দেখিলাম, যাহারা হাসিতে হাসিতে বলিয়া যাইতেছে "কেন, ঠিক ব্যবস্থা হয়েছে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" মানুষের প্রাণ কি কঠোর! এই-সকল লোকের উপর আমার অবিমিশ্র ঘৃণার উদয় হইল। নরপুর প্রসাদ লাভের জন্য একদিন যারা তাহার পদলেহন করিয়াছে, আজ তার অভাগিনী পত্নীর উপর তাদের এই অত্যাচার! এ নারীর অপরাধ কি? পতিপ্রেম বই ত নয়? আমার প্রাণ আজ ফাটিয়া যাইতে লাগিল তিব্বতের নৃশংসতার একশেষ দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বাড়ী ফিরিলাম। গৃহে গিয়া ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মহাশয়কে সমুদায় বলিলাম। তিনি বলিলেন, "এমন একদিন গিয়াছে যখন নরপুর মত সম্মানিত ব্যক্তি তিব্বতরাজ্যে আর কেহ ছিল না। টিমোরিনপোচি যথার্থই অতি সাধু মহাত্মা ছিলেন। তাঁর কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু একথা মুখ ফুটিয়া বলিতে কাহারো সাহস হয় না।"

তিব্বতে দণ্ডের ব্যবস্থা অতি নিষ্ঠুর—তাহার বর্ণনা অসাধ্য। নখের ভিতর কঞ্চি বিঁধিয়া দিবার কথা বলিয়াছি। মস্তকে ভারি ভারি প্রস্তর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ক্রমাগত একটির পর আর-একটি করিয়া চাপান হয়। প্রথমে দণ্ডিত ব্যক্তির চক্ষু দিয়া জল পড়ে, শেষে যেন চক্ষু দুটি কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। উইলোগাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মারা হয়, তাহা মাংসের ভিতর বসিয়া যায়। চারিদিকে রক্ত ছিটাইয়া পড়ে। এ দৃশ্য অবর্ণনীয়। সে ভীষণ ক্ষত দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কারাগার সর্ব্বত্রই ভীষণ স্থান। তিব্বতের কারাগারের মত ভীষণ স্থান আর নাই, দিবা দ্বিপ্রহরেও সেখানে এক রশ্মি সূর্য্যের আলো পড়ে না। তিব্বতের ন্যায় ঠাণ্ডা দেশে সে যে কি ভীষণ স্থান তাহা সহজেই অনুমেয়! কয়েদী দিনে একবার মাত্র সামান্য কিছু আহার্য্য পায়। তাহাতে কাহার প্রাণরক্ষা হয় না। যদি কেহ দয়া করিয়া কিছু দেয় তাহার অর্দ্ধেক কারারক্ষকের উদরে যায়। অভাগারা পায় কি? বেত্রাঘাত ত এ দেশে লঘুদণ্ড—হাত কাটিয়া দেওয়া, চক্ষু উপড়াইয়া লওয়া অতি সাধারণ দণ্ড। চোর ডাকাত ভিন্ন অপর কাহারও হাত কাটা হয় না। হাত কাটিয়া দিবার পূর্ব্বে ১২ ঘণ্টা হাত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহাতে হস্ত যখন অবশ হইয়া যায়, তখন হাতের কব্জা পর্য্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হয়। আমি লাসায় হাত-কাটা এবং অন্ধ ভিক্ষুক বিস্তর দেখিয়াছি। সংখ্যায় হাতকাটা ভিক্ষুকের চেয়ে অন্ধ ভিক্ষুক অধিক। এদেশে স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতার জন্য নাসাকর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পতিরই এই নাসা-কর্ণ ছেদনের অধিকার আছে। স্ত্রীর চরিত্রহীনতার পরিচয় পাইলে স্বামী অবাধে তাহার নাসা-কর্ণচ্ছেদ করিতে পারে—পরে রাজদ্বারে জানাইলেই হইল। দেশান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থাও আছে। জলে ডুবাইয়া হত্যা করাই এদেশের প্রশস্ততম ব্যবস্থা চামড়ার মোশকে পুরিয়া কখন কখন অপরাধী ব্যক্তিকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়—কখন বা হাত পা বাঁধিয়া পাথর বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর দেহটিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়—মস্তকটি ফেলিয়া দেওয়া হয় না, সেটা অনন্ত নরক ভোগের জন্য স্থানান্তরে রক্ষিত হয়। যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ প্রভাব, সেখানে এইপ্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা কি অসঙ্গত! এই কি জীবে দয়া এবং অহিংসা-

পরমধর্ম্ম-মূলক নীতি? আরও কতপ্রকার ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

লাসায় ১৯০১ সালের অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত থাকিয়া আমি সেরা বিহারে ফিরিয়া গেলাম। মন্ত্রীমহাশয় আমায় একটি অশ্ব দিলেন, আমি তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব দিন হইতে তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছিল। বৎসরের এই প্রথম তুষারপাত। পথঘাট শুভ্রবর্ণ। দেখি যে, পথে এক নদীর জল নাই, সেখানে সেরা কলেজের ছাত্রগণ তুষারের গোলা করিয়া পরস্পরের গায়ে ছুড়িয়া খেলা করিতেছে। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। দেশের কথা মনে পড়িল। এমন করিয়া কত না খেলা করিয়াছি। মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্র সমান। আমি বালকদের খেলা দেখিতেছি, এমন সময় একব্যক্তি আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমার পূর্ব্বপরিচিত সেই মানসসরোবরের তীর্থের তিন ভ্রাতার কনিষ্ঠতম। সে আমাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কি রূপান্তর,—তখন ছিলাম ছিন্নবাস-পরিহিত ভিক্ষুক, আর এখন এক ধনীর সাজে সজ্জিত। লোকটা হঠাৎ পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। আমি হাত ধরিয়া বলিলাম "তুমি কি চিনিলে না।" সে চিনিয়াছে বলিল। তাহাকে আমি প্রচুর ভোজনে তুষ্ট করিলাম এবং কিঞ্চিৎ উপহারও দিলাম। লোকটিও সেরায় যাইতেছে। তাহার মুখে শুনিলাম তাহার অপর ভ্রাতারা দেশে একত্র বাস করিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা দেবী।

ঘাস তাজা রাখিবার উপায়

গরু আমাদিগকে দুধ দেয় এবং দুধ হইতে আরও যে কতপ্রকার মুখরোচক এবং বলকারক আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তার তো একটা ইয়ত্তাই নাই। আর এই যে আমরা বাঙ্গালী বাবু দুই বেলা দুই মুঠা চিকন চাউল বা মোটা চাউলের ভাত খাইতেছি এইটিই বা কার কৃপায়? দেশের অধিকাংশ স্থানেই গরুর দ্বারাই হাল চাষ করান হইয়া থাকে। কিন্তু সদা পরহিতে রত এই গোজাতির উন্নতি বিধানের জন্য আমাদের দেশের খুব অল্প লোকই যত্নবান্। হিন্দুদের কথা বলিতেছি—যাদের কাছে গোজাতি স্বয়ং ভগবতীর সমান। তাদের বাড়ীতে গিয়া দেখুন,—সেই কল্পিত ভবগতীর আবাস অন্ধকার আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ এবং মহাকর্দ্দমময় একটা ক্ষুদ্র চালা-ঘরে। আর খাদ্য—যখন যা জোটে। সাধারণতঃ মাঠে চরিয়া ফিরিয়া যা কিছু ঘাস খাইতে পায় তাহাই গরুর পক্ষে যথেষ্ট। যে গরু রীতিমত দুই বেলা ছানিটা পায়, সে দেবতার তো আর সৌভাগ্যের সীমাই নাই। বাংলা দেশের এই অঞ্চলে গরু-দেবতার আদর যত্ন তো এতদূর! এই তো গেল সাধারণ সময়ের কথা —কিন্তু যখন বর্ষার সময় দেশের প্রায় সমস্ত মাঠ জলে ডুবিয়া যায়, এবং শীতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে যখন সব ঘাস পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া যায়, তখন এই গো-বেচারীদের আর দুঃখের সীমা থাকে না। সেই সময় ইহাদের স্বাস্থ্যের যে অধঃপতন হয় তাহা সমস্ত বৎসরের সেবা-শুশ্রূষাতেও পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া বড়ই সুকঠিন। ইহা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি।

তাজা ঘাস গরুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই উপকারী। ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু প্রায় শীতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বর্ষাকাল পর্য্যন্ত কোন কোন জেলায় ঘাস একেবারেই পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই তিন মাসই দেশে খুব ভাল ঘাস পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, এবং পৌষ মাসটা সম্পূর্ণই ভাল ঘাস থাকে। তখন গৃহস্থেরা অনায়াসেই সেই ঘাসের অর্দ্ধাংশ গোড়া সহিত তুলিয়া বাকী কয়েক মাসের জন্য জমাইয়া রাখিতে পারে। কিন্তু সেই ঘাস যদি কোন খোলা জায়গায় জমাইয়া রাখা হয়, তবে তাহা শীঘ্রই হয় পচিয়া, না হয় শুকাইয়া যাইবে, এবং গরুও সেই পচা বা শুক্না ঘাস খাইতে ভালবাসিবে না। এমন কি কোন কোন গরুর মুখের কাছে শুক্না ঘাস রাখিলে তাহা লাথি দিয়া ফেলিয়া দেয়। সুতরাং ঘাসগুলিকে এমন একটা স্থানে রাখিতে হইবে যেখানে রাখিলে তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত তাজা থাকে। কি-প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে—সেই বিষয়ে একটা উপায় উদ্ভাবন করা গিয়াছে, এবং তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে।

প্রথমতঃ গৃহস্থের বাড়ীর নিকটেই প্রায় ৫ ফুট গভীর, ৭॥০ ফুট পাশে, এবং ১০ ফুট লম্বায় একটি গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। সব সময় যে এই মাপেই গর্ত্ত করা নেহাৎ দরকারী,—তা' কিন্তু নয়। গৃহস্থগণ নিজ নিজ সুবিধা এবং ঘাসের পরিমাণ বুঝিয়া তদনুযায়ী গর্ত্ত করিবেন। আমরা যে স্থানে ইহা পরীক্ষা করিয়াছি সেই স্থানের মাপটিই আমরা উদ্ধৃত করিলাম। যাহা হউক,—তার পর সংগৃহীত ঘাসগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে খুব ঠাসিয়া রাখিতে হইবে। ঘাসের পরিমাণ গর্ত্ত অনুযায়ী হওয়া দরকার। কারণ, গর্ত্তের মুখের সমানে সমানে ঘাস থাকিবে; নতুবা ঘাস পচিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়ার খুবই আশঙ্কা থাকে। ঘাস গর্ত্তে ভরা হইলে পর, গর্ত্তের মুখের উপর দুই তিন ফুট উঁচু মাটি ঢাল ভাবে দিয়া বেশ করিয়া লেপিয়া দিতে হইবে। এবং যাহাতে বৃষ্টির জল গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে জমিয়া না থাকিতে পারে, সেজন্য গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে বেশ ছোট করিয়া ড্রেন কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ গর্ত্তের মুখে মাটি দিবার পূর্ব্বে ঘাসের উপর চাটাই দিয়া রাখিতে পরামর্শ দেন। কারণ ঘাসের উপরেই মাটি দিলে উপরের অল্প পরিমাণ ঘাস অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু চাটাই দিয়া রাখিলে তা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই নিয়মানুসারে ঘাস রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে বহুদিন পর্য্যন্ত ঘাসগুলি প্রথম অবস্থার মতই তাজা থাকে এবং ভিতরের বা চতুর্দ্দিকের ঘাসগুলি মোটেই নষ্ট হয় না। তবে ঘাসের রংটা সামান্য ফ্যাকাশে হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কোনই ক্ষতির কারণ নাই। কারণ গরু সদ্য-ঘাসের মতই এইগুলি খাইতে ভালবাসে এবং সদ্য-ঘাসের সহিত এই ঘাসের স্বাদেরও বিশেষ কোন তারতম্য আছে বলিয়া তো মনে হয় না।

সুতরাং, এই উপায়ে ঘাস জমাইয়া রাখা হইলে, গরু ঘাসের অভাবে আর অসময়ে মারা যায় না। পরন্তু, গরুগুলি সেই দুর্দ্দিনে সদ্য-ঘাস খাইয়া প্রফুল্ল থাকে, এবং তাদেরপূর্ব্ব অর্দ্ধ-ভগ্ন স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে।

যখন ঘাসের দরকার হয় তখন গর্ত্তের মুখ অল্প একটু ফাঁক করিয়া, ঘাস বাহির করিয়া আনিয়া, পুনরায় মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে ঘাস বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না।

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

চম্বা

ভারতের উত্তর প্রদেশে প্রহরীস্বরূপ যে বিরাট গগনস্পর্শী হিমাচল দণ্ডায়মান আছে, তাহার বর্ণনা বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস আদি মহাকবিগণ বহুভাবে করিয়া আসিয়াছেন। বস্তুতঃ সে মহান্ দৃশ্য দেখিয়া যাহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত না হয়,—বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতীদেবীর নানা লীলাভঙ্গী, কোথাও ভীষণ কঠিন, কোথাও মধুর কোমল ভাব দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মার অপার শক্তি যে অনুভব না করিতে পারে,—সে মনুষ্যনামের অযোগ্য।

হিমাচলের অনেক প্রদেশেই আজকাল শৈলবিহারের স্থান হইয়াছে। সেখানে অনেকেই গ্রীষ্ম উপলক্ষে বেড়াইতে যান। সিমলা, নাইনিতাল, মসুরী ও দার্জ্জিলিঙ বিখ্যাত ও প্রধান শৈলবিহারের স্থান। কিন্তু এতদ্ব্যতীত হিমালয়ের অভ্যন্তরে যে-সকল পার্ব্বত্য স্বাধীন হিন্দু নরপতিগণের রাজ্য আছে, সেখানে অতি অল্প বঙ্গসন্তানই বেড়াইতে যান। ইহার মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যই বাঙ্গালীদের মধ্যে যা একটু পরিচিত। তাহা ছাড়া মণ্ডি, সুকেত, চম্বা ও পুঞ্চ এই চারিটি হিন্দুরাজ্য পাঞ্জাবপ্রদেশের উত্তর হিমালয়ে অবস্থিত। এই স্বাধীন হিন্দুরাজ্যগুলি পাঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন।

চম্বা রাজ্য নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের পাঠানকোট ষ্টেশন হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ষ্টেশন হইতে রাস্তা বরাবর ড্যালহাউসী পাহাড়ে গিয়াছে; সেখান হইতে আবার ১৯ মাইল গিয়া চম্বারাজ্যের রাজধানীতে পৌছিতে হয়। পাঞ্জাবের অসহ্য গ্রীষ্মের পর এই-সকল প্রদেশের শীতল জলবায়ু কতদূর উপভোগ্য তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কাহাকেও বুঝানো যায় না। পাঞ্জাবে স্কুলকলেজ ও আদালত ইত্যাদি আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীষ্ম উপলক্ষে বন্ধ থাকে। এই ছুটীতে চম্বারাজ্য দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া আমি ও আমার একটি আত্মীয় উভয়ে বাহির হইলাম। সঙ্গে একটি পাচক ও ভৃত্য।

পাঠানকোট ষ্টেশন হইতে ড্যালহাউসী ও চম্বা যাইবার জন্য টঙ্গা টমটম ও একা পাওয়া যায়। টঙ্গা বোধ হয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের সুপরিচিত। ইহা একটি দুইচাকায় খুব নীচু যানবিশেষ, দুই ঘোড়ায় টানে ও ৪।৫ মাইল অন্তর ঘোড়া বদল হয়। এই-প্রকার যান ডেরাডুন, মরি,

কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে আছে। পাঠানকোট হইতে ডালহাউসী মোট ৫২ মাইল—তন্মধ্যে ছুনেরা পর্য্যন্ত ৩০ মাইল সুগম্য, বাকী ২২ মাইল রাস্তা অত্যন্ত চড়াই। একটি সম্পূর্ণ টঙ্গার ভাড়া দেশীয়দের জন্য ২৭ ও সাহেবদের জন্য ৩৩ টাকা।

প্রথম দিন প্রত্যুষে পাঠানকোট ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় ছুনেরায় পৌছিলাম। এখানে একটি ডাকবাঙ্গলা ব্যতীত একটি পান্থশালাও আছে। খাদ্যাদি সুবিধামত পাওয়া যায় না। ছুনেরায় রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রত্যুষে আবার বাহির হইলাম ও এইবার প্রকৃত "চড়াই" আরম্ভ হইল।

প্রথমে রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া অতি উচ্চ পাহাড়ের শিখরে উঠিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের নাম "হাথিধর"। এই শিখর হইতে চম্বারাজ্য আরম্ভ। এইখান হইতে আবার তিন মাইল পথ ক্রমাগত নামিয়া বকৃলো পাহাড়ের ধার দিয়া রাস্তা বরাবর চলিয়া গিয়াছে। বকৃলো পাহাড়ে গুর্খাসৈন্যের ছাউনী আছে। অন্য লোকের থাকিবার স্থান নাই। বকৃলো পাহাড় অতিক্রম করিয়া রাস্তা মধ্যে-মধ্যে অত্যন্ত খারাপ ও বিপজ্জনক। একস্থানে রাস্তার ঠিক পাশেই একটি খুব উঁচু পাহাড় আছে, সেখান হইতে প্রায়ই মাটী ও পাথর পথিকের মাথায় ঝরিয়া পড়ে, বৃষ্টি হইলে পাহাড় ধসিয়া যায়। একটি নোটীশও ইংরেজী ভাষায় এই স্থানে আছে, যে, এই পথ দিয়া যাইবার সময় উপরে দেখিতে দেখিতে যাইবে ও শীঘ্র অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে। এই পাহাড়ের নাম "কেরু" পাহাড়। পাহাড়ী ভাষায় "কেরু" অর্থ ঝরঝর করিয়া পড়া।

বিকালে "বনিখেত" পৌছিলাম। এখান হইতে চম্বা যাইবার দুইটি পথ—একটি ড্যালহাউসী পাহাড়ের উপর দিয়া, অপরটি সেই পাহাড়ের নীচে দিয়া। নীচের পথে গাড়ী চলে না, কেবলমাত্র ঘোড়া পাওয়া যায় কিংবা পদব্রজে যাইতে হয়। এই রাস্তা দিয়া চম্বা ১৪ মাইল দূর। শীতকালে যখন ড্যালহাউসীর রাস্তা বরফ পড়িয়া দুর্গম হয়, তখন চম্বা যাইতে হইলে এই পথই ব্যবহৃত হয়। আমরা বরাবর ড্যালহাউসীর রাস্তা ধরিয়া সেখানে সন্ধ্যার সময় পৌছিলাম। পথ অত্যন্ত চড়াই অর্থাৎ খাড়া বলিয়া এত দেরী লাগে।

ড্যালহাউসীর ছাউনীর নাম "বেলুন"। উহা সহর হইতে প্রায় ১০০০ ফুট নিম্নে অবস্থিত। সেখানে আজকাল টেরিটোরিয়াল্‌স্ সৈন্যরা আছে। ড্যালহাউসী পাহাড় হইতে ছাউনিটি সুন্দর দেখায়।

ড্যালহাউসী সহরটি তিনটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত, এই পাহাড়গুলির নাম পোর্ট্রেন, টিরা ও বকরোটা। এই অনুসারে রাস্তাগুলিরও নাম যথা পোর্ট্রেন মল (Portreyn Mall), নর্থ টিরা মল, সাউথ টিরা মল, আপার টিরা মল (Upper Tirah Mall), বকরোটা রাউণ্ড, ইত্যাদি ইত্যাদি। পোষ্ট অফিস হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একটি অতিসুন্দর জলপ্রপাত আছে তাহার নাম পাঁচপুলা (Panchpula Fall)। বোধ হয় ঝরণাটি পাঁচ থাকে পড়িয়াছে বলিয়া উহার ঐ নাম। উহার একটি চিত্র দেওয়া গেল।

ড্যালহাউসীর বাজার প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চ ও বকরোটা পাহাড়ের শিখর প্রায় ৮০০০ ফুট উচ্চ হইবে। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এখানে সূর্য্যের মুখ প্রায় দেখা যায় না। শীতকালে খুব বরফ পড়ে। গত ৩।৪ বৎসর হইতে বরফ কিছু কম পড়িতেছে। বোধ হয় অধিবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও গাছপালা কাটিয়া ফেলাই ইহার কারণ। ইহা লাহোরের কমিশনার ও গুরুদাসপুরের জেলাজজের গ্রীষ্মাবাস।

ড্যালহাউসী হইতে চম্বা যাইবার দুইটি পথ। একটি বকরোটা পাহাড়ের উপর দিয়া, আর একটি ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়া নীচে নীচে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের রাস্তায় চম্বা ১৯ মাইল দূর, শেষোক্ত রাস্তায় ২২ মাইল। উভয় রাস্তায়ই ঘোড়ায় ডাণ্ডিতে বা পদব্রজে যাওয়া যায়। পূর্ব্বের রাস্তা মনোরম বলিয়া আমরা জিনিসপত্র একটি ভারবাহী ঘোড়ার উপর চাপাইয়া পদব্রজে রওয়ানা হইলাম। প্রথমেই ড্যালহাউসী হইতে লক্কড়মণ্ডি নামক স্থান পর্য্যন্ত ৪ মাইল পথ কেবল চড়াই, উঠিতে উঠিতে একেবারে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। এই স্থানটি চম্বারাজের বন-বিভাগের একটি কাঠের ডিপো, এইজন্য এর নাম লক্কড় (কাঠ) মণ্ডি (আড়ত) হইয়াছে। চারিদিকে সুদূরপর্য্যন্ত কেবল দেবদারু (Cedar) চিড় (Pine) ওক্ (Oak) প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃক্ষের

বিশাল ও ঘন বনরাজি—এত নিবিড় যে বাঘ ভালুক চিতা প্রভৃতি বিস্তর হিংস্রজন্তু সে অরণ্যে নির্ভয়ে বাস করে। এই স্থান প্রায় ৯০০০ ফুট উচ্চ ও অত্যন্ত শীতল—সর্ব্বদা মেঘে আবৃত, সূর্য্যের মুখ কদাচ দেখা যায়। রাত্রে হিংস্রজন্তুর ভয়ে ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। কেবলমাত্র ডিপোর লোক ব্যতীত আর কোনও মনুষ্যাদির বাসের চিহ্ন নাই। শীতকালে ডিপোর লোকেরাও স্থানত্যাগ করিয়া চম্বায় চলিয়া যায়। স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা অতীব মনোরম।

লক্কড়মণ্ডি হইতে প্রায় ৭ মাইল পথ চলিয়া খজিয়ারে পৌঁছিলাম। এই স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা অবর্ণনীয়! নিবিড় জনমানবশূন্য বনের মধ্য দিয়া আসিয়া হঠাৎ একটি সবুজ ঘাসের সমতল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখা যায়। উহার চারিদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। পাহাড়ের শিখর হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত বনরাজি; সন্ধ্যার সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো দেবদারু বৃক্ষগুলি দেখিয়া বোধ হয় যেন চারিদিকে দৈত্যের ন্যায় তাহারা প্রহরীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। ঘন বনের মধ্যে এরূপ বিস্তৃত সমতল শ্যামল ক্ষেত্র আর কোথাও দেখি নাই। ঘাসগুলি যেন দেখিলে মনে হয় সম্প্রতি ঘাস-ছাঁটা কল (lawn mower) দ্বারা কাটা হইয়াছে; এরূপ সুন্দর ও পরিষ্কার যে হঠাৎ ভ্রম হয় যেন প্রকৃতি-রাণীর বিহারের জন্য একটি উৎকৃষ্ট সবুজরঙের গালিচা পাতা রহিয়াছে। সূর্য্যাস্তের সময় পশ্চিম দিকের পাহাড়ের শোভা চিত্রকরের উপযুক্ত—প্রথমে পাহাড়ের গায়ে কে যেন কাঁচা সোনা ঢালিয়া দিল; ক্রমে পশ্চিমগগন নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের বৃক্ষরাজিতে সেই বর্ণ প্রতিফলিত করিয়া; এবং একে একে বর্ণগুলি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গিয়া চারিদিকে অন্ধকার ছাইয়া ফেলিল। তখন কবির গানটি মনে পড়িল—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা
মম শূন্যগগন-বিহারী!

মম হৃদয়রক্তরঞ্জে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী!

শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটি অতিগভীর জলাশয় আছে। তার কাছে একটি ডাকবাঙ্গালা ও একটি মন্দির। মন্দিরে নাগমূর্ত্তি স্থাপিত। কথিত আছে যে চম্বার রাজা জনার্দ্দন ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে যখন নূরপুরের রাজা জগৎসিংহের দ্বারা নিহত হন তখন তাঁহার সদ্যজাত পুত্র পৃথ্বীসিংহকে লইয়া ধাত্রী বট্‌লু মণ্ডির রাজার নিকট পলাইয়া আশ্রয় লয়। সেই ধাত্রীই এই মন্দির স্থাপনা করিয়াছিল। তাহার সমাধিস্থান এখনও এইখানে বর্ত্তমান। এই মন্দিরের সেবার জন্য চম্বা-রাজসরকার প্রায় ৮০ বিঘা নিষ্কর ভূমি পুরোহিতকে দান করিয়াছেন।

খজিয়ার হইতে চম্বা প্রায় ৮ মাইল। বরাবর নীচে নামিয়া যাইতে হয়। শেষের ৫ মাইল পথ অত্যন্ত নীচু। দুই মাইল উপর হইতে সহরটি সুন্দর দেখা যায়। ঐ স্থান হইতে লওয়া একটি চিত্র দেওয়া গেল। সহরে প্রবেশ করিতে হইলে রাবি বা ইরাবতী নদীর উপর একটি suspension bridge বা ঝুলানো পুল অতিক্রম করিতে হয়—উহা চিত্রের নীচের দিকে আছে। সেখান হইতে সহরে উঠিবার জন্য একটি পাথরে-বাঁধানো পথ আছে। এই পথটি খুব উচ্চ। ১৯ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া এই চড়াইটি উঠিতে বেশ কষ্ট হয়। শুনিতেছি রাজসরকার এই অসুবিধা দূর করিবার সংকল্প করিতেছেন।

চম্বা সহরটি সমুদ্র হইতে প্রায় ৩০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। উহা একটি পাহাড়ের শিখরদেশে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রের উপর স্থাপিত। নিম্নেই রাবি নদী উপলরাশির উপর দিয়া প্রচণ্ডবেগে গর্জ্জন করিতে করিতে পঞ্জাব অভিমুখে প্রবাহিত। সহরের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি সবুজ ঘাসের চতুষ্কোণ ময়দান আছে। ইহার নাম "চোগান"। ইহাতে স্থানে স্থানে টেনিস্ খেলিবার ও পুরবাসীদের বেড়াইবার স্থান। ময়দানটি ৬৬০ গজ দীর্ঘ ও একদিকে ৬০ গজ ও অপর দিকে ৮০ গজ প্রশস্ত। দুই প্রস্থের একদিকে সরকারী হাঁসপাতাল, অপর দিকে রেসিডেন্সী। উত্তর দিকে পাহাড়ের গায়ে বিপণিশ্রেণী, সরকারী অফিসসমূহ ও ষ্টেট ক্লাব। দক্ষিণদিকে মিউজিয়ম, আদালত, থানা, ডাকঘর ও অন্যান্য লোকের বসবাস। রাজবাটী ও অন্যান্য লোকের বাড়ীগুলি এই চোগানের

ঠিক উপরেই স্থাপিত। সহরটি যদিও আয়তনে ছোট, তথাপি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহার লোকসংখ্যা ১৯০৫-৬ সনে প্রায় ৬০০০ ছিল; তন্মধ্যে ৪৬১৫ জন হিন্দু, ৩৫ জন শিখ, ১২৭৫ জন মুসলমান, ৬১ জন খৃষ্টান ও ১৪ জন বৌদ্ধ।

সরকারী গৃহাদির মধ্যে হাঁসপাতাল, মিউজিয়ম, ষ্টেট ক্লব ও রাজবাটী দ্রষ্টব্য। হাঁসপাতাল ১৮৬৬ সনে রাজা শ্যামসিংহের দ্বারা স্থাপিত। একজন বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বসু মহাশয় এই হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ। ইনি গত ৬ বৎসর হইতে এখানে কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার তত্ত্বাবধারণে হাঁসপাতালের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং এইজন্য ইনি রাজসরকারের সম্মান ও প্রজাবর্গের প্রীতি লাভ করিয়াছেন। ইনি ব্যতীত আরও দুইজন বাঙ্গালী এখানে রাজসরকারে কর্ম্ম করেন,—একজন রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও অপরজন বন-বিভাগের হেডক্লার্ক। এত দুরদেশে বঙ্গসন্তানগণ উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া নিজের কার্য্যকুশলতা ও ব্যবহারের গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া বাস করিতেছেন, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

চম্বার মিউজিয়মটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। এখানে চম্বারাজ্যের অতি পুরাকালের অনেকগুলি চিত্র সন্নিবেশিত আছে। এই চিত্রগুলি হইতে হিন্দুদের পুরাতন চিত্রকলা কতদূর উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল বুঝা যায়। ইহাদের রংগুলি এমন সুন্দর ও স্থায়ী যে দেখিলে মনে হয় কাল কোনও সুনিপণ চিত্রকর তুলি দিয়া রং ফুটাইয়া দিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শুনিতেছি ৩০০|-০০ বৎসরের অধিক। এই-গুলির ফটো লইয়া প্রচার করিলে বোধ হয় হিন্দুশিল্প-কলার প্রভূত লাভ হয়। কোনও শিল্পী এ বিষয়ে মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

চম্বা সহরে রাজকীয় হাইস্কুল ছাড়া মিসনরীদিগের একটি প্রাইমারী স্কুল আছে। সমগ্র রাজ্যে আটটিমাত্র স্কুল। তন্মধ্যে ৭টি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, একটি মাত্র স্কুলে এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এই স্কুলটি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

চম্বার বর্ত্তমান অধিপতি হিজ্ হইনেস্ রাজা স্যর ভুরিসিংহ, K. C. S. I., C. I. E. ইনি সুপুরুষ ও নানা গুণে অলঙ্কৃত। ইনি সমস্ত রাজকার্য্য নিজহস্তে পরিচালনা করেন।

চম্বা একটি অতি পুরাতন হিন্দুরাজ্য। ইহা রাজা মারুবর্ম্মা দ্বারা ৫৫০ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। এই রাজ্যের পুরাতন রাজধানী ব্রহ্মপুরা বা ব্রহ্মোরা—ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। চম্বারাজ্যের নৃপতিগণ সূর্য্যবংশীয় রাজপুত। ভগবান রামচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র কুশ ইঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত। এই বংশ বহুপূর্ব্বে অযোধ্যা হইতে গঙ্গার উত্তর অধিত্যকায় আসিয়া কলাপনগর প্রতিষ্ঠা করে। এই বংশের রাজা মারুবর্ম্মা একজন সাধুপুরুষ ছিলেন, সর্ব্বদা জপতপে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি কলাপনগর হইতে পুত্র জয়স্তম্ভকে সঙ্গে লইয়া আদিম কিরা জাতিকে পরাভূত করিয়া চম্বা-রাজ্য অধিকার করেন ও রাজধানী ব্রহ্মপুরা প্রতিষ্ঠা করিয়া জয়স্তম্ভকে রাজ্যদান করিয়া কলাপে প্রত্যাগমন করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের বংশাবলী চম্বা গেজেটিয়ারে দেওয়া আছে, স্থানাভাবে এখানে দেওয়া গেল না। রাজা মুষণবর্ম্মার জন্মবৃত্তান্ত আশ্চর্য্যজনক। কথিত যে ইঁহার পিতা রাজা লক্ষ্মীবর্ম্মা যখন কিম্বা জাতির দ্বারা যুদ্ধে নিহত হন, তখন ইঁহার মাতা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শিবিকারোহণে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পথিমধ্যে তিনি এক গিরিকন্দরে পুত্র প্রসব করিয়া সেইখানে সন্তানকে পরিত্যাগ করেন ও পুনরায় শিবিকা-রোহণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, ভয়ে পুত্রের জন্মকথা কাহাকেও জানান নাই। তাঁহার শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া অনুচরবর্গের সন্দেহ হয়। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহারা গুহায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখে যে নবজাত সন্তানের চারিপার্শ্বে মুষিকেরা প্রহরা দিতেছে। তদবধি আজ পর্য্যন্ত চম্বারাজ্যে মুষিক অবধ্য। এই পুত্রের নাম এইজন্য মুষণবর্ম্মা রাখা হইল। ইনি সুকেতরাজের সাহায্যে পরে ৮০০ খৃঃ অব্দে হৃতরাজ্য পুনর্লাভ করেন।

মুষণবর্ম্মার অধস্তন ৫ম পুরুষ রাজা সাহিলাবর্ম্মা পুরাতন রাজধানী ব্রহ্মপুরা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান চম্বা নগর ৯৩০খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে ইনি প্রথমে

নিঃসন্তান ছিলেন। ৮৪ জন গোরক্ষপন্থী সাধু ইঁহার রাজধানী ব্রহ্মপুরায় আগমন করেন ও রাজাকে পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। ফলে ১০টি পুত্রসন্তান ও ১টি কন্যারত্ন লাভ করেন। চম্পাবতীনাম্নী এই কন্যাকে লইয়া একসময়ে যখন তিনি রাজ্যপরিক্রমা করিতেছিলেন তখন চম্পাবতী একটি স্থানের মনোহারিতা উপলব্ধি করিয়া সেই স্থানে নগর প্রতিষ্ঠার জন্য জেদ করিয়া বসিলেন। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীগণ ইহাতে আপত্তি করায় অবশেষে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে যতদিন নগর এইস্থানে থাকিবে ততদিন প্রত্যেক বিবাহে রাজস কার হইতে আটটি চাকুলি অর্থাৎ তাম্রমুদ্রা দেওয়া হইবে। অদ্যাবধি সহরের প্রত্যেক বিবাহে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। এখানকার ৫ চাকুলি আমাদের ৮টি পয়সার সমান। এই মুদ্রার প্রচলন এখনও আছে। কোনও রৌপ্যমুদ্রা নাই।

নূতন রাজধানী-প্রতিষ্ঠা এইরূপে হইল। কিন্তু পানীয় জলের অভাব দেখিয়া গোরক্ষপন্থী সাধু চরপতনাথ আদেশ করিলেন যে একজন স্ত্রীলোক বলি না দিলে জল নিকটে পাওয়া যাইবে না। ইহাতে চম্পাবতী স্বয়ং বলি হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা নয়নাদেবী কন্যাকে বিরত করিয়া স্বয়ং আত্মদান করিলেন ও সেই মুহূর্ত্তেই বর্ত্তমান "সরোতা" প্রস্রবণ সেই স্থান হইতে নির্গত হয়। সেই প্রস্রবণই এখন চম্পা বা চম্বা নগরীর জলাভাব দূর করিতেছে। সেই স্থানে নয়নাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল এবং এখনও সেই স্থানে ১৫ই চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত সুহী-মেলা নামে একটি মেলা হইয়া থাকে।

রাজা সাহিলাবর্ম্মা অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে প্রধান উক্ত নয়নাদেবীর মন্দির, যোগী চরপতনাথের মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, ও চম্পাবতীর মন্দির যাহা অধুনা চমাস্নীর মন্দির নামে খ্যাত। লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে রাজা নিজের ১০টি পুত্রের মধ্যে ৯টিকে অধুনা জব্বলপুরের নিকট বিন্ধ্যগিরি হইতে শ্বেতপ্রস্তর আনয়ন করিতে প্রেরণ করেন। পুত্রগণ বৃহৎ একখণ্ড শ্বেতপ্রস্তর লইয়া আসিলেন। উহা কাটিলে উহার মধ্য হইতে অনেকগুলি ভেক বাহির হয়। এইজন্য পুত্রগণকে পুনরায় প্রস্তর আনিতে পাঠানো হইল, কিন্তু তাঁহারা তত্রত্য অসভ্য আদিম অধিবাসীগণের দ্বারা নিহত হইলেন। অগত্যা পূর্ব্বানীত প্রস্তরেই লক্ষ্মী-নারায়ণমূর্ত্তি প্রস্তুত হইল এবং উহাই এখনও বর্ত্তমান আছে। এই মন্দিরই চম্বারাজ্যের প্রধান মন্দির।

রাজা শালিবাহন বর্ম্মা ১০৪০ খৃঃ অব্দে কাশ্মীররাজ অনন্তদেবের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন। ইহার উল্লেখ কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণী গ্রন্থে পাওয়া যায়।

রাজা বিজয়বর্ম্মা ১১৭৫ খৃঃ অব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন ও সেই সময়ে লাহোরের স্বনামখ্যাত পৃথ্বীরাজ মহম্মদঘোরীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ইনি চম্বারাজ্য অনেক বিস্তার করেন।

রাজা বলভদ্রবর্ম্মা অত্যন্ত দানশীল রাজা ছিলেন। ইনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে ভূমি ও অর্থ দান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এই দানশীলতা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে রাজ্য যায় যায়। এই দেখিয়া অমাত্যগণের পরামর্শানুযায়ী তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র জনার্দ্দনবর্ম্মা রাজ্যচালনা করিতে লাগিলেন ও পিতাকে রাবিনদীর পরপারে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ও ভূমি দিয়া বাস করাইলেন। কিন্তু দানশীলতায় নির্ব্বাসিত রাজার সমস্ত ভূমিই দান হইয়া গেল, এমন কি প্রাসাদও একটু একটু করিয়া প্রত্যহ দান করাতে রাজা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাকে পুনরায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইল ও তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬১৩ খৃঃ অব্দে জনার্দ্দনবর্ম্মা রাজপদবী গ্রহণ করিলেন। নূরপুরের রাজা সূর্য্যমল্ল স্বীয় ভ্রাতা ও বঙ্গের মোগলাধীন শাসনকর্ত্তা জগৎসিংহের সাহায্যে ও মোগলবাদশাহের আদেশে চম্বারাজ্য আক্রমণ করিয়া ১৬২৩ অব্দে রাজা জনার্দ্দনবর্ম্মাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তদবধি ১৮ বৎসর-কাল চম্বারাজ্য জগৎসিংহের করায়ত্ত রহিল—পরে জনার্দ্দনের পুত্র পৃথ্বীসিংহবর্ম্মা মণ্ডি ও সুকেত-রাজগণের সাহায্যে ১৬৪১ অব্দে পুনরায় রাজ্য উদ্ধার করেন। এই পৃথ্বী-সিংহের ধাত্রী বট্‌লু খজিয়ারের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৬৭৮ খৃঃ অব্দে মোগল বাদসাহ ঔরঙ্গজেব সমস্ত হিন্দু মন্দির ভূমিসাৎ করিবার জন্য এক পরোয়ানা বাহির করেন। সেই আদেশের প্রত্যুত্তরস্বরূপ রাজা পৃথ্বীসিংহের

পুত্র ছত্রসিংহ বা শত্রুসিংহ রাজ্যের সমস্ত মন্দিরের চূড়ায় স্বর্ণকলস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন—আজিও সমস্ত মন্দিরের চূড়ার এই স্বর্ণকলসগুলি চম্বা রাণাদিগের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ঘোষণা করিতেছে।

রাজা ছত্রসিংহের পুত্র উদয়সিংহ ১৬৯০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকায় অমাত্যেরা তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণসিংহকে রাজা

পাঁচপুলা জলপ্রপাত।
ড্যালহাউসি পর্ব্বত।

করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। মৃগয়ার অছিলায় রাজাকে দূরে লইয়া গিয়া আক্রমণ করিলে উদয়সিংহ তরবারি হস্তে একা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মণসিংহের অনুতাপ হইল এবং তিনিও ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। অমাত্যেরা ১৭২০ অব্দে ছত্রসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র উগ্রসিংহকে রাজা করিল এবং তাহারাই পুনরায় ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে উগ্রসিংহকে হত্যা করিয়া ছত্রসিংহের আর-এক ভ্রাতুষ্পুত্র দলেনসিংহকে রাজা করিল। উগ্রসিংহের পুত্র উমেদসিংহ স্বীয় পিতৃরাজ্য লাভ করিবার জন্য দলেনসিংহকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন, কিন্তু দলেনসিংহ বিনা আপত্তিতে উমেদসিংহকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

উমেদসিংহ ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তাঁহার পুত্র রাজা রাজসিংহের নাম চম্বার ইতিহাসে বিখ্যাত। ইনি কাশ্মীররাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া "কিস্তওয়ার" পরগণা জয় করেন ও পরে কাঙ্গড়ার রাজা সংসারচন্দের সহিত যুদ্ধে বর্ত্তমান শাহপুরের নিকট "নেরুতি" গ্রামের নিকটে ১৭৯৪ অব্দে নিহত হন। যে শিলাখণ্ডের উপর ইনি মৃত্যুকালীন রক্তাক্ত হস্তের ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেই শিলার উপর রক্তাক্ত হস্তের ছাপ এখনও স্থানীয় অধিবাসীরা দেখাইয়া দেয়।

রাজা রাজসিংহের পর তাঁহার পুত্র জিতাসিংহ (১৭৯৪-১৮০৮) ও পৌত্র চরৎসিংহ (১৮০৮-১৮৪৪) যথাক্রমে রাজ্য করেন। শেষোক্ত রাজার সময় চম্বারাজ্য পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহের দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হয়—কিন্তু কেবলমাত্র রেহলু পরগণা লইয়া রণজিৎসিংহ রাজ্যের অন্যান্য অংশ প্রত্যর্পণ করেন।

চরৎসিংহের তিন পুত্র—শ্রীসিংহ, গোপালসিংহ ও সুচেৎসিংহ। প্রথমে শ্রীসিংহ রাজা হন। ইঁহার প্রধান পারিষদের নাম নারায়ণশাহ ওরফে লক্কড়শাহ, কারণ ইঁহার কাঠের ব্যবসা ছিল। এই নারায়ণশাহ প্রজাবর্গের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া ওঠাতে ঘাতকের দ্বারা নিহত হন। ইহাতে ইঁহার ভ্রাতা রণজিতের শক্তিশালী পারিষদ পণ্ডিত জল্লা শিখ বাহিনী লইয়া চম্বারাজ্য ও নগর লুট করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিত জল্লার হঠাৎ মৃত্যুতে চম্বারাজ্য রক্ষা পাইল, নতুবা উহা পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বোধ হয় স্বাধীনতা হারাইত।

বৃটিশরাজ পঞ্জাব স্বাধীকারভুক্ত করিয়া একটি সনন্দ দ্বারা চম্বারাজার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। ইহার তারিখ ৬ই মে ১৮৪৮। এইটি এখনও রাজদপ্তরে সযত্নে রক্ষিত আছে।
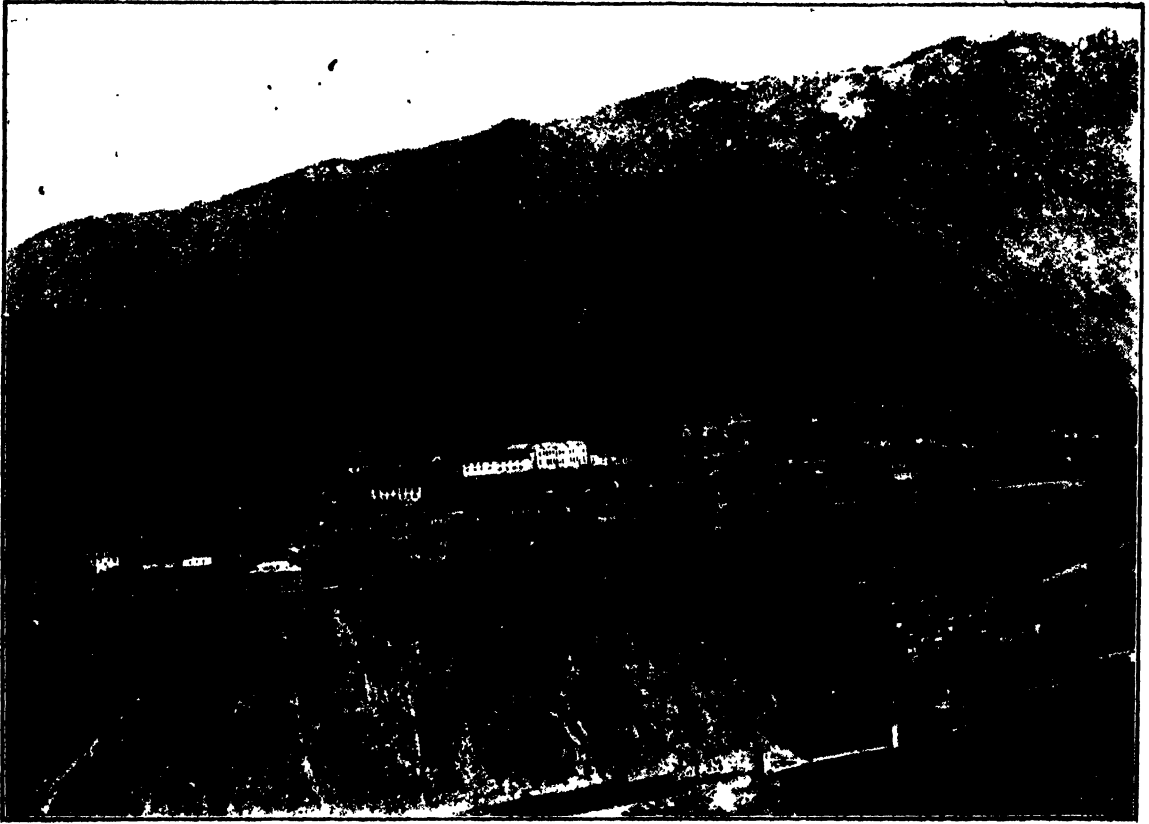
চম্বা শহর—দুই মাইল উপর হইতে নীচে যেমন দেখায়।

রাজা শ্রীসিংহ ১৮৭০ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর কন্যা বর্ত্তমান কাশ্মীরাধিপতির মহিষী ছিলেন। এই কন্যাটি বহুদিন হইল মারা গিয়াছেন।

রাজা শ্রীসিংহের পুত্র সন্তান না থাকায় দ্বিতীয় ভ্রাতা গোপালসিংহ রাজা হন। তৃতীয় ভ্রাতা সুচেৎসিংহ রাজ্য-লাভের জন্য বিলাত পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন, অবশেষে হতাশ হইয়া বিলাতেই ১৮৯৬ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা গোপালসিংহ ১৮৭৩ অব্দে রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্র শ্যামসিংহকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। ইহাঁর প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দচাঁদ অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রাজার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা বর্ত্তমান রাজা ভূরিসিংহ প্রধানমন্ত্রীর স্থলে অভিষিক্ত হন। পরে রাজা শ্যামসিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় ১৯০৪ অব্দে কনিষ্ঠভ্রাতার হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া ১৯০৬ সনে প্রাণ-ত্যাগ করেন। তদবধি বর্ত্তমান রাজাই রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যচালনা করিয়া আসিতেছেন। প্রজামণ্ডলী ইহাঁর বিশেষ অনুরক্ত। রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে ইহাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা আছে। ইহাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটির সম্প্রতি কাশ্মীরাধিপতির ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী রাজা হরিসিংহের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

সমগ্র চম্বারাজ্যের লোকসংখ্যা ১২৭৮৩৪, তন্মধ্যে পুরুষ ৬৬৪৭৪ ও স্ত্রীলোক ৬১৩৬০। নিজ চম্বাসহরে ৩৪৩৬ জন পুরুষ ও ২৫৬১ জন স্ত্রীলোক, মোট ৬০০০ লোকের বাস। রাজ্যের রাজস্ব বার্ষিক প্রায় ৯ লক্ষ টাকা।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম করে ও সেইজন্য বলিষ্ঠা ও সুন্দরী—প্রায় সকলেই গৌরবর্ণা।

চম্বা চোগানের পূর্ব্বাংশ।

স্ত্রীলোকের বেশ পায়জামা ও লম্বা কোর্ত্তা এবং উপরে গলা হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত একটি পোষাক, তাহার নাম "পেশোয়াজ"। ইহার কোমর পর্য্যন্ত আমাদের আঁট বডীর ন্যায় ও নীচের ভাগ হিন্দুস্থানীদের ঘাগরার ন্যায়। ইহা নানা রঙের হয়। মস্তক ওড়নায় আবৃত। এই বেশে এখানকার স্ত্রীলোকদের বিশেষ সুন্দরী দেখায়। মফঃস্বলে ব্রহ্মৌরা জেলার অধিবাসীদের "গদ্দি" বলে। এই গদ্দিরা কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই অত্যন্ত পরিশ্রমী ও বলশালী। বড় বড় বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া অনেকেই, এমন কি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পর্য্যন্ত, বহুদূর হইতে রাজধানীতে আসিয়া থাকে। ইহাদের আচার ব্যবহার অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন—একই কাপড়ে বহুকাল অস্নাত অবস্থায় থাকায় ইহাদের কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। গদ্দি পুরুষরা পট্টুর পায়জামার উপর চোগার ন্যায় একটি পট্টুর ঢিলা জামা পরে, উহার নাম "চোলা।" উহার মধ্যভাগে কোমরের নিকট ৮।১০ গজ কালো বা ধূসর রঙের দড়ি জড়ান থাকে, উহার নাম "ডোরা"। গদ্দি পুরুষেরা কোমরে একটি চামড়ার ব্যাগ রাখে, তাহাতে ছুঁচ সুতা, ছুরি, আগুন জ্বালিবার জন্য চকমকি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি থাকে। গদ্দি স্ত্রীলোকেরা চোলির উপর সময়ে সময়ে রঙিন সুতার একপ্রকার ঘাগরা পরে, তাহার নাম "মণ্ডু"। গদ্দি পুরুষেরা গলায় একখণ্ড ক্ষুদ্র রূপার পদক সুতা দিয়া ঝুলাইয়া পরে, তাহার নাম "তবিতা"। স্ত্রীলোকদিগের আভরণের মধ্যে "তবিত" ছাড়া "গলসোরি" ও পায়ে পিতলের ঘুঁঘুর উল্লেখযোগ্য। গদ্দি স্ত্রীলোকেরা সকলেই সুশ্রী ও গৌরবর্ণা। চিত্রে পাঠকপাঠিকারা গদ্দি পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবেন।

এখানকার অধিবাসীরা নৃত্যগীত খুব ভালবাসে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ পৃথক্ পৃথক্ নাচে। স্ত্রীলোকের নাচকে

চাম্বার মহারাজ সাব্ ভুরি সিংহ, কে, সি, এস, আই।

"ঘোরাই" বলে। বাস্তবিক ইহা ঘোরাই বটে। অনেক স্ত্রীলোক বৃত্তাকারে দাঁড়ায়, পরে গান গাইতে গাইতে দুই হাত একসঙ্গে একবার দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বাম হাঁটু পর্য্যন্ত আবার বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ হাঁটু পর্য্যন্ত ঘুরাইতে ঘুরাইতে হেলিয়া দুলিয়া চক্রাকারে ঢোলের শব্দের সহিত তালে তালে ঘুরিতে থাকে। ইহাই স্ত্রীলোকের নাচ। পুরুষদের নাচ ইহা অপেক্ষা বেশী সজোরে ও গোলমালের সহিত হয়। তাহারাও চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু তাহার সহিত হস্তপদাদির নানাপ্রকার আস্ফালন ও ভাবভঙ্গী ও চীৎকারাদি মিশিয়া তাহা এক অপূর্ব্ব তাণ্ডবনৃত্যে পরিণত হয়। এমন কি ভাবের বশে অনেকে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যায়।

ইহাদের বিবাহব্যাপার অপূর্ব্ব। চম্বার অধিবাসীদের পুত্রকন্যার বিবাহের বয়স সাধারণতঃ ১২ বৎসর। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "মঙ্গলি" অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ হইয়া যায়। মফঃস্বলে গদ্দিদিগের বিবাহের বয়স কন্যার পক্ষে ১৬ ও বরের পক্ষে ২০। বর বা বরের পিতাকে অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। অর্থ দিতে অসমর্থ হইলে বরকে কন্যার পিতার গৃহে অনেকদিন, সময়ে সময়ে সাত বৎসর পর্য্যন্ত, দাসত্ব করিতে হয়। বিবাহ নানা-প্রকারে হইতে পারে, যথা—

চম্বার গদ্দি পুরুষ।

(১) রীতিমত বিবাহ—ইহার নাম "বিয়া"। ইহাতে পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়ে ও অগ্নির চারিদিকে আট বার ঘুরিতে হয়।

(২) "ঝনঝাড়া", ইহার অপর নাম "টোপিলানি"। বিধবাদিগের বিবাহ এই পদ্ধতিতে হয়।

(৩) "জিন্দ্-ফুক্" বা "মন-মরজি"। ইহা প্রায় স্বয়ম্বরের মতন। ইহাতে উভয়পক্ষের পিতামাতার সম্মতির প্রয়োজন নাই—বর ও কন্যার মনের মরজি হইলেই একত্রে জঙ্গলে

চম্বার গদ্দি স্ত্রীলোক ও বালিকা।

গিয়া আগুন জ্বালাইয়া তাহার চারিধারে বারকয়েক ঘুরিলেই বিবাহ হইয়া যায়। ইহাই জিন্দ্ ফুক অর্থাৎ জ্যান্ত মন্ত্র। ইহাতে ভোজ বা অন্য উৎসবের কোনও আবশ্যক নাই।

(৪) উভয় পক্ষেই অতি সামান্য খরচেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা থাকিলে বরকন্যা উভয়েই চম্বা রাজধানীর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া বিগ্রহের পূজা করে। ইহাতেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়।

সমাজে এই চারিপ্রকারের বিবাহরীতির সমানভাবে চলন আছে। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবংশের রাজপুত জাতি ব্যতীত অপর জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত। ডাইভোর্স বা স্ত্রীত্যাগ প্রথাও খুব চলে। স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগপত্র লিখিয়া দেয়; পরে যে-পুরুষ সেই স্ত্রীকে বিবাহ করে সে সেই ত্যাগপত্র দেখিয়া বিবাহের সময়ে ৫০৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত প্রথম স্বামীকে স্ত্রীর মূল্য স্বরূপ দেয়। আজকাল প্রথম স্বামীকে অনেক টাকা দিয়া স্ত্রীকে ক্রয় করিতে হয় বলিয়া দ্বিতীয় স্বামীকেও সেইরূপ অধিক মূল্য দিতে হয়। সমাজে এইরূপ স্ত্রী ক্রয়-বিক্রয় করা কেহ দূষ্য বলিয়া মনে করে না।

বিধবা যদি পুনর্বিবাহ না করিয়া মৃত স্বামীর গৃহে বাস করে এবং সেই অবস্থায় যদি কখনও তাহার সন্তানাদি জন্মে তবে সেই সন্তান মৃত স্বামীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হয়—কাহার ঔরসজাত তাহা লইয়া সমাজ মাথা ঘামায় না। এইরূপে জাত সন্তানকে "চৌখণ্ডু" বলে, অর্থাৎ মৃত স্বামীর গৃহের চতুষ্কোণের মধ্যে জাত।

সমগ্র চম্বারাজ্য পাঁচটি জেলায় বিভক্ত, যথা—চম্বা, চুরাহ, পাঙ্গি, ব্রহ্মৌরা ও ভাট্টিয়াৎ। এই প্রত্যেক জেলার ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। চম্বা প্রদেশের ভাষাকে চমিয়ালি বলে এবং লিখিবার সময় এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়—উহার বর্ণমালার নাম টাক্‌রী। ইহা পুরাতন সারদালিপির অপভ্রংশ মাত্র। অন্যান্য জেলার ভাষা লিখিবার সময় ব্যবহৃত হয় না।

চম্বা সহর হইতে মন্মহেশ তীর্থ ছয়দিনের পথ। পথ অতি দুর্গম ও প্রায়ই বরফে আবৃত থাকে।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

শত্রুর চোখে ধূলো—.

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ যে যে-রকম আবেষ্টনের মধ্যে থাকে তার পারিপার্শ্বিক বস্তুর রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রকৃতি তাদের গায়ে সেইরকম রং দিয়া তাদের শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইয়া আত্মগোপনের সুবিধা করিয়া দ্যায়। মেরুপ্রদেশে বরফের একটানা শাদা রঙের মধ্যে ভালুক পর্য্যন্ত শাদা হয়; বন জঙ্গলে যেখানে আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা দেখা যায় সেখানকার বাঘ হরিণ প্রজাপতি পাখী বিচিত্র রঙের বুটিদার সজ্জা লাভ করে; মরুভূমির সিংহ বা মেঠো জায়গার হরিণ খরগোষ ধূসর বর্ণের হয়; যেখানে ফুল পাতার বাহার ও বিচিত্রতা বেশী সেখানকার প্রজাপতি পাখী প্রভৃতিও বিচিত্র রঙের হয়। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আমরা প্রবাসীতে আগে জানাইয়াছি।

সৈন্যদের ছাউনি থাকে তার উপরেও ঐরকম রংচং করিয়া ডালপালা ঢাকা দিয়া শত্রুপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি এরোপ্লেনের আক্রমণ এড়ানো হয়।

এই যে আত্মগোপনের জন্য রং চড়ানো, এও একটা বড় আর্ট; বিচক্ষণ নিপুণতার সঙ্গে হিসাবমত রং লাগাইতে না পারিলে, গোপন না করিয়া বরং সুপ্রকাশ করিবারই সাহায্য করে। এই চিত্রবিদ্যায় ফরাশীরা ওস্তাদ, জার্ম্মানরা মধ্যম, আর ইংরেজরা একরকম আনাড়ি। এইচ জি ওয়েল্‌স্‌ তাঁর Italy France and Britain at War নামক বইয়ে এ বিষয়ের রঙ্গরসিক আলোচনা করিয়াছেন।

আদিম অসভ্য জাতিরা যুদ্ধের সময় গায়ে রং মাখিত; তারা বিজ্ঞানের তত্ত্ব না জানিয়াও রঙের সুবিধার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিল।

পশু-পক্ষীর গায়ের রং উপরে গাঢ় ও তলার দিকে হাল্কা হয়; প্রকৃতির এই কৌশলের সন্ধান পাইয়া ফরাশীরা তাদের কামান প্রভৃতি

কামান গোপন করিবার কৌশল—যেন মাঠের গাছপালার অংশ।

এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যুদ্ধের সময় শত্রুর চোখে ধোকা দিবার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করা হইতেছে।

ট্রেঞ্চ বা পগার গাছের ডালপালা ঘাসের চাপড়া দিয়া ঢাকা দিয়া গোপন করা হইতেছে। দীর্ঘ পথ মাইল মাইল জুড়িয়া কৃত্রিম ঝোপ ঝাড় গাছ পালা দিয়া, রঙে আঁকা পটের সিন বা দৃশ্য খাটাইয়া ও মাচা করিয়া ঢাকা দেওয়া হইতেছে, যেন উপর হইতে বিমান বা এরোপ্লেনের চড়নদারের চোখ বা ক্যামেরার দৃষ্টি সৈন্যসামন্তদের চলাফেরা না ধরিতে পারে। যেখানে কামান পাতা হয় বা গোপন করিবার জন্য উপরের পিঠে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অনুযায়ী গাঢ় রং ও তলায় হাল্কা রং লাগাইতেছে ও রেখাগুলি সরল না করিয়া বক্র করিতেছে। ইহাতে বস্তুর স্বরূপ ঢাকা পড়িতেছে।

রঙীদের আর-একটি কঠিন বাধা অতিক্রম করিতে হয়—সেটি বস্তুর ছায়া। অনেক সময় বস্তুর রূপ দেখিয়া তার পরিচয় ধরা পড়ে। রঙীরা দেখিল যে প্রকৃতি পশুপক্ষীর গায়ে এমন হিসাবে উপরে গাঢ় হইতে ক্রমিক পাতলা রং লাগায় যে তাদের গায়ে আলো পড়িয়া ক্রমে ক্রমে এমন মিলাইয়া যায় যে মাটিতে তাদের

সৈন্যদের ছাউনি গোপন করিবার কৌশল —যেন ঢেউ-খেলানো মাঠ।

গায়ের ছায়া পড়ে না। তারা এই সূত্র ধরিয়া কামান প্রভৃতিতে এমন করিয়া রং লাগাইতেছে যে এদের ছায়ার আকারও বিগড়াইয়া যাইতেছে—কোন্ জিনিস যে কি তা আর তার ছায়া দেখিয়াও টের পাইবার জো নাই।

আবার দেখা যায়, প্রকৃতি ছোট প্রাণীর গায়ে ছোট ছোট দাগ কাটে—পাতা, শেওলা, গাছের ছালের ফাটা চটার সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য; আর বড় প্রাণীর গায়ের দাগ বড় বড় হয়। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যোদ্ধা রঙীরা কামান তাঁবু প্রভৃতিতে এমন রং চড়ায় যাতে সেগুলিকে গাছের গুঁড়ি, পাথরের চাঁই বা শৈলদীর্ণ মাটির ঢিপি বলিয়া ভ্রম হয়।

অবস্থান সঙ্করণ ধরিয়া থাকে। সুতরাং রঙীদের এও হিসাব করিয়া রং দিতে হয় যে ফটোগ্রাফের লেন্সের চোখে কোন্ রং কেমন হইয়া ধোকা দিতে পারিবে। ঠাণ্ডা রং—যেমন নীল সবুজ—ফটোগ্রাফে ফিকে দেখায়, আর চড়া রং—যেমন লাল—ফটোগ্রাফে ঘন হয়।

সমুদ্রে সাব্‌মেরিনের আক্রমণ এড়াইবার জন্য জাহাজেও রং বরা হইতেছিল। নানারকম চেষ্টা করিয়াও কিন্তু জাহাজকে সনাক্ত হইতে বাঁচানো যাইতেছে না। জাহাজের ধোঁয়া আর আকার সমুদ্রের জলের ঢেউএর আকার ও রঙের সঙ্গে মিলাইতে না পারিলে জাহাজকে অদৃশ্য করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি যে কৌশলে পশুপক্ষীর গায়ের রং উপর হইতে নীচের দিকে ক্রমশ হাল্কা করিয়া তাদের ছায়া-পতন নিবারণ
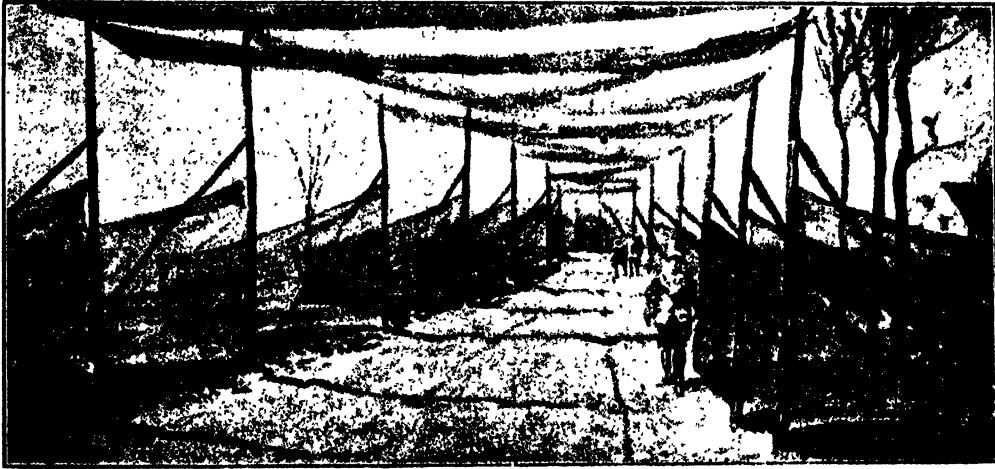
পথ গোপন করিবার কৌশল।

অনেক সময় পথের উপর বরাবর সবুজ রঙের ডোরা কাটিয়া দেওয়া হয়; তাতে এরোপ্লেন হইতে দেখিলে পথের চক্‌চকানি চোখে লাগে না, এবং সেটাকে পথ বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং সেই পথের উপর দিয়া সৈন্যদের চলাফেরা শত্রুর চোখে সহজে ধরা পড়ে না।

শত্রুপক্ষের চরেরা শুধু চোখের উপর নির্ভর করিয়াই থাকে না; তারা টেলিস্কোপিক লেন্স দিয়া ফটোগ্রাফ তুলিয়া সৈন্যসামন্তদের করে, সেই কৌশলকে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কারকের নামে নাম দিয়াছেন থেয়ারের নিয়ম (Thayer's Law)। সেই কৌশল অবলম্বন করিয়া এখন জাহাজের গায়ে গাঢ় হইতে ক্রমশ হাল্কা রং লাগাইয়া জাহাজকে অদৃশ্য করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

সমুদ্রের মেঝেয় বিচরণ—

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস-লেখক জুল্ ভ্যার্ন (Jules Verne) তাঁর আজগুবি অথচ সম্ভবপর বৈজ্ঞানিক কল্পনার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি

বহুকাল আগে আকাশচারী বিমান ও অন্তর্জলী জাহাজ কল্পনা করিয়া তাঁর উপন্যাসে লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন বিজ্ঞানের চেষ্টায় সম্ভব হইয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'টোয়েণ্টি থাউজাণ্ড্ লীগ্‌স্ আণ্ডার দি সী' যে বৈজ্ঞানিক কল্পনা প্রকাশ করিয়াছিল তাও এখন সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের কুড়ি হাজার লীগ তলে এখন মানুষ ডুবুরী-জাহাজে করিয়া নামিতে পারে, এবং সখ হইলে সমুদ্রের তলে মাটির উপর হাঁটিয়া বেড়াইয়া শীকার পর্য্যন্ত করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দুই দল হইয়াছে—একদল বিজ্ঞানসেবীর কল্পনাপ্রবণতা সমর্থন করেন, যেমন সার্ অলিভার লজ্ ও জে জে টমসন; অপরদল বলেন বিজ্ঞানসেবীর কল্পনাপ্রবণতা ঠিক নয়, তাতে সাধারণ লোকে বিজ্ঞানের চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়া হাল্কা করিয়া দেখে—এদলের মুখপাত্র অধ্যাপক বেকেরেল্। ইনি এইজন্য জুল্ ভ্যার্নের উপন্যাসগুলির নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু ডুবুরী-জাহাজ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বেজেল বলেন যে জুল্ ভ্যার্নের 'নটিলাস' নামক কাল্পনিক অন্তর্জলী জাহাজের মতন সাবমেরিন বা ডুবুরী-জাহাজ গঠন আজকাল সম্ভব হইয়াছে। নটিলাস জাহাজের ক্যাপ্টেন নেমো যেমন জাহাজ ছাড়িয়া সমুদ্রের তলায় মাটিতে নামিয়া বেড়াইয়াছে, তেমন বেড়ানো এখন আর শুধু কল্পনা নয়, এরূপ বেড়াইবার উপায় করা যাইতে পারে। এখন পর্য্যন্ত করা হয় নাই, দরকার নাই বলিয়া; দরকার পড়িলে জলের তলায় নামাইয়া দিবার ডুবুরী-জাহাজ তৈরি করিয়া দিতে পারে এমন কারিগর ও কারখানার অভাব হইবে না।

এক বিষয়ে জুল্ ভ্যার্ন একটু ভুল কল্পনা করিয়াছিলেন—তাহা হইতেছে জলের চাপ। জলের তলে এক এক ফুট ডুবিতে থাকিলেই জলের চাপ প্রতি বর্গ-ইঞ্চির উপর আধ পাউণ্ড করিয়া বাড়িতে থাকে। ৬০০০ ফুট জলের তলে প্রত্যেক বর্গ-ইঞ্চির উপর ৩০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ সের বা ৩৭৷৷০ মণ চাপ পড়ে। এত চাপ সহ্য করিবার মতন শক্ত গড়নের জাহাজ তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। ২৫ বর্গফুট স্থানে ২০০ ফুট জলের তলে ১৭৫ টন ভার চাপে; ৬০০০ ফুট তলে চাপ হইবে ৫২৫০ টন; এত চাপে সাধারণ ইস্পাতের জাহাজও তোবড়াইয়া চেপ্টা হইয়া যাইবার কথা।

জুল্ ভ্যার্নের আর-একটা ভুল জলের মধ্যে ডুবিবার হিসাবে। জলের ভাসাইয়া রাখা একটা ধর্ম্ম; সেই গুণ বাড়ে লোনা জলে। তাই তিনি কল্পনা করিয়াছেন যে জাহাজ যত নীচে নামিতেছিল কল তত জোরে চালাইয়া জাহাজকে বেগ জোগাইতে হইতেছিল। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ঠিক নয়। যদি কোন বস্তু একবার তার আকারের সমপরিমাণ সমুদ্রজলের চেয়ে ভারী হইয়া উঠে ও জলের মধ্যে লবণের তারতম্য না ঘটে তবে সেই বস্তু একবার ডুবিতে আরম্ভ করিলে বরাবর ডুবিতেই থাকিবে। টাইটানিক জাহাজ ডুবি হইলে প্রশ্ন উঠিয়াছিল—জাহাজখানা সমুদ্রের তলায় মাটি ছুঁইবে, না মধ্যজলে অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। প্রশ্ন মীমাংসা নির্ভর করে জলের তুলনায় নিমজ্জিত বস্তুর নমনীয়তার উপর। যদি জলের নমনীয়তার চেয়ে বস্তুর নমনীয়তা কম হয় ও জলের গভীরতা খুব বেশী থাকে, তবে সেই বস্তু ডুবিতে ডুবিতে গিয়া এমন এক জায়গায় পৌঁছিবে যেখানে জলের ঘনত্ব বস্তুপিণ্ডের ঘনত্বের সমান এবং সেখানে সেই বস্তু স্থগিত হইয়া থাকিবে। ধরা-যাক্ একটা নিরেট ইস্পাতের গোলা জাহাজ হইতে মুক্ত সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল। জলকে সচরাচর অনমনীয় ধরা হয়; গ্যাসের তুলনায় জল অনমনীয় বটে; কিন্তু ঐ ইস্পাতের গোলার তুলনায় জল নমনীয়। অতএব আমাদের ইস্পাতের গোলাটা যত জলের তলে নামিতেছে তত চাপ পাইয়া ঘন হইতেছে, কিন্তু তার পাশের জল সেই চাপেই গোলার চেয়ে বেশী ঘন হইতেছে। যদি জলের গভীরতা খুব বেশী থাকে তাহা হইলে এমন জল কোথাও মিলিবে যেখানকার ঘনত্ব অত্যধিক চাপে ইস্পাতের গোলার ঘনত্বের সমতুল্য, এবং সেখানে গোলাটি স্থগিত হইয়া রহিবে। ইস্পাত ও জলের নমনীয়তার তুলনায় হিসাব করিয়া ঠিক হইয়াছে যে ১০০ মাইল জলের তলে সেরকম অবস্থা হইতে পারে। কিন্তু সমুদ্র ৫।৬ মাইলের বেশী কোথাও গভীর নয়, সুতরাং গোলার সমুদ্রের তলায় মাটি ছুঁইবার কোনো বাধাই নাই।

পোকাদের পরিচয়ের উপায়—

আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইন্‌স্টিটিউসানের ডাক্তার ম্যাক-ইণ্ড একখানি বই লিখিয়াছেন—রিকগ্‌নিশান্ অ্যামং ইন্‌সেক্‌ট্‌স্। তিনি সেই বইএ দেখাইয়াছেন যে আমাদের মানুষদের দৃষ্টিশক্তি যেমন প্রখর, কীটপতঙ্গদের ঘ্রাণশক্তি তেমনি প্রখর,—কীটপতঙ্গেরা যেমন বুঝিতে পারে না মানুষের দৃষ্টিশক্তি কত তীক্ষ্ণ, আমরাও তেমনি ধারণা করিতে অক্ষম যে পোকামাকড়ের ঘ্রাণশক্তি কত জোরালো। আমরা অনেক সময় দেখি পিঁপড়ে সারি বাঁধিয়া যাইতে যাইতে কাছাকাছি হইয়া যেন কথা কহিয়া যায়। মনে হয় যেন তারা চোখে দেখিয়া পরস্পরকে চেনে। কিন্তু ইতর জীব, যে যত নিম্ন স্তরের তার চোখ তত অপটু। এমন অনেক প্রাণী আছে যারা অন্ধকারে বাস করে বলিয়া হয় একেবারে অন্ধ নয় অন্ধপ্রায়;—যেমন, গুহাবাসী মাকড়সা ও গুবরে পোকা। দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াও অন্ধকারে তারা পরস্পরকে চিনিতে পারে কেমন করিয়া? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনের পরে স্পর্শের কথাই আমাদের মনে হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে গুহাবাসী অন্ধ মাকড়সাদের মদ্দারা দূর হইতেই মাদি মাকড়সা কোথায় আছে টের পায়। দর্শন ও স্পর্শন যদি বাদ পড়িল তবে শ্রবণ ও স্বাদ ইতর জন্তুর বেলায় সহজেই বাদ দেওয়া যায়। তবে থাকে কেবল ঘ্রাণ। ইতর জীবদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই পরিচয় লাভের একমাত্র উপায়।

ডাক্তার ম্যাকইণ্ড বলেন যে প্রত্যেক জীবের গায়ে এক এক রকম বিশেষ গন্ধ আছে; এক জাতীয় জীবের মধ্যেও আবার স্ত্রীপুরুষ ভেদে ও কর্ম্ম ভেদে গায়ের গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল না হইলেও অভ্যাসের পরে তার দ্বারাও অনেক জ্ঞান সহজলভ্য হয়। যেমন ধরুন, মৌমাছি চেনা। অভ্যাস করিলে মৌমাছিদের তিন শ্রেণী—রাণী, মদ্দা আর মজুর-মৌমাছি—গন্ধ শুঁকিয়া পৃথক করা যায়। বুড়ো মজুর-মৌমাছির গায়ে মধুগন্ধ স্পষ্ট থাকে; আর তাদের ধরিলেই হুল হইতে যে বিষ নির্গত হয় তারও গন্ধ স্পষ্ট পাওয়া যায়। পাহারাদার ও পাখার বাতাসদার মৌমাছিদের গন্ধে পৃথক করা যায় না। যে মৌমাছি পুষ্পপরাগ বহন করে তার গায়ে নিজের গন্ধ ছাড়া পুষ্প-পরাগের গন্ধ মিলে। যে মজুর-মৌমাছি যত বাচ্চা, তার গায়ের গন্ধ তত অস্পষ্ট। ধাত্রী মৌমাছি ও মোম-কর মৌমাছিদের গায়ের গন্ধও স্পষ্ট নয়। যেসব মজুর-মৌমাছি চাকের কোটর কাটিয়া সদ্য বাহির হয় তাদের গায়ে একটা মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। রাণী-মৌমাছির যত বয়স হয় তত তার গায়ের গন্ধ মিষ্ট ও সুঘ্রাণ হয়। মৌমাছিরা নিজেদের গায়ের গন্ধ আরো স্পষ্ট ও আরো সূক্ষ্ম রকমে ধরিতে পারে। তারা আপনাদের একই চাকের মৌমাছি জ্ঞাতিদের গন্ধ শুঁকিয়া চিনিতে পারে। অপর চাকের চোরদের চৌকিদারেরা গন্ধ শুঁকিয়া ধরে; এক রাণীর সন্তানদের গায়ের গন্ধও একরকম হয়। যে মৌচাকে রাণী-মৌমাছি থাকে না, সেখানে রাণী-ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, আর সে চাকের মজুরেরা বড় বদমেজাজী হয় ও কাজেও গাফিলতি করে।

কোনো মৌমাছিকে তিন দিন চাকছাড়া করিয়া রাখিলে তার গায়ের চাক-গন্ধ উবিয়া যায়, কিন্তু তার নিজের একটা ব্যক্তিগত গন্ধ থাকেই। এক চাকেরই কতকগুলো মৌমাছি যদি পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র চাক বাঁধে, তবে সত্বরই তাদের চাক-গন্ধ আদিম চাক-গন্ধ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে; এবং তখন উভয় চাকের মৌমাছিরা আর পরস্পরকে নিজেদের জ্ঞাতি বলিয়া চিনিতে পারে না, এক চাকের মৌমাছি অপর চাকের মৌমাছির কাছে গেলে মারামারি লাগিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মৌমাছিদের এই চাক-গন্ধ তাদের একই চাকের জ্ঞাতিদের সামাজিক বন্ধন, বাহিরের বিচ্ছিন্নতা হইতে সংহত থাকিবার উপায়; আর রাণী গন্ধ তাদের গৃহস্থালির অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার কেন্দ্র। চাকের গন্ধে মৌমাছিরা পর হইতে পৃথক করিয়া আপনার জনকে চেনে; আর রাণীর গন্ধে তারা জানে যে তাদের গৃহস্থালির যে কেন্দ্র তা ঠিক আছে; এই দুই বোধের দ্বারা প্রকাণ্ড একান্নবর্ত্তী মৌমাছি পরিবার শৃঙ্খলায় আপোসে মিলিয়া মিশিয়া ঘরকন্না করিতে থাকে।

প্রতপ্ততম তাপ—

বিজ্ঞানের মতে তাপের সংজ্ঞা এই—অণুর সঞ্চরণই তাপ। আধুনিকতম বিজ্ঞানের মতে যেমন আলোর গতির চেয়ে বেগবত্তর গতি আর নাই, তেমনি তাপেরও একটা চরম সীমা থাকা সম্ভব—যার বেশী তাপ আর চড়িতে পারে না; তাপের এই নিম্ন সীমাকে বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়াছেন—absolute zero—অতিমাত্র শূন্যতা। এই অতিমাত্র তাপশূন্যতার কাছাকাছি শীতলতা উৎপন্ন করিতে বিজ্ঞান পারিয়াছে; কিন্তু প্রতপ্ততম তাপের সীমায় এখনো পৌঁছিতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত ৯৪০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ উৎপন্ন হইয়াছে। কোনো আবদ্ধ স্থানে খুব উগ্র বিস্ফোরক স্ফুটিত হইলে যে ক্ষণিক তাপ উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ ঐ ৯৪০০ ডিগ্রি। তা ছাড়া এতদিন কারখানার তন্দুরে ৩২০০ ডিগ্রির বেশী তাপ উৎপাদন করা যায় নাই।

তাপ উৎপাদনের বর্ত্তমান প্রধান সাধন রসায়ন ও বিদ্যুৎ। হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন গ্যাস মিলাইয়া জ্বালাইলে ৩৬০০ ডিগ্রি তাপ পাওয়া যায়; এই প্রচণ্ড তাপে আলুমিনিয়ার সঙ্গে বিন্দুপরিমাণ ক্রোমিয়াম অক্‌সাইড রং গলাইয়া ভ্যার্নেই নামক একজন ফরাসী কৃত্রিম চুনি বা পদ্মরাগ মণি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কৃত্রিম চুনি প্রকৃত মণি হইতে চিনিয়া পৃথক করা রসায়ন শাস্ত্রেরও অসাধ্য। এই অক্‌সি-হাইড্রোজেন জ্বালায় কঠিনতম ধাতুও গলিয়া যায়, সেজন্য ইহাতে ঝালাই কাজ খুব ভালো হয়।

খুব দ্রুত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তীব্র তাপ উৎপন্ন হয়—ইহা জার্ম্মানীর এসেন্‌ শহরের অধ্যাপক গোলডস্মিট্ আবিষ্কার করেন। ইহাকে থার্মিট প্রোসেস বা তাপন-প্রক্রিয়া বলা হয়। এই উপায়ে ৫৪০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ উৎপাদন করা যায়। যদি দানাদার লৌহ-অক্‌সাইড্ এলুমিনিয়মের সঙ্গে মিশাইয়া প্রকৃষ্টরূপে জ্বালানো যায়, তবে লোহা হইতে সমস্ত অক্‌সিজেন অতি দ্রুত এলুমিনিয়াম কাড়িয়া লইতে গিয়া প্রতপ্ত তাপ উৎপন্ন করে—কারণ অক্‌সিজেন ও এলুমিনিয়ামে ভাব অত্যন্ত বেশী। সেই তাপে লোহা গলিয়া টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে। এই তাপন-প্রক্রিয়া ধাতু-গর ও রাসায়নিকদের খুব কাজে লাগে। এই প্রক্রিয়ায় ধাতুর জোড়াই ঝালাই, সমস্ত জিনিসকে না গলাইয়া, করা সহজ হইয়াছে।

অক্‌সিজেন গ্যাস ১·৭ ও এসিটেলিন গ্যাস ১ অনুপাতে মিশাইয়া জ্বালাইলে আরো বেশী তাপ উৎপন্ন হয়।—এই জ্বালার শিখার চূড়ায় ৬৩০০ ডিগ্রি তাপ! এসিটেলিন হইতে হাইড্রোজেন বিযুক্ত হইয়া শিখাটিকে একটি পর্দ্দার মতন ঘিরিয়া থাকে, তাতে তাপ বিকীর্ণ হইয়া নষ্ট হইতে পায় না। এই শিখা বাঁকনল দিয়া বাঁকাইয়া কোনো ঢালাই ধাতুর উপর ফেলিয়া আনাড়ি কারিগরও অনায়াসে জোড়া ঝালা করিতে পারে।

এর চেয়েও বেশী তাপ পাইতে হইলে বিদ্যুতের শরণাপন্ন হইতে হয়—বিদ্যুৎই বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশী তাপ উৎপাদনের সাধন। দুটি অঙ্গার-শলাকা কাছাকাছি করিয়া তাদের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করিলে বিদ্যুৎ একটি ধনুকের আকারে এক শলাকা হইতে অপর শলাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও সেখানেই তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপেরও পরিমাণ ৬৩০০ ডিগ্রি। এই তাপে অঙ্গার গলিয়া যায় বলিয়া এর বেশী তাপ উৎপন্ন হইবার অবসর পায় না। এই বিদ্যুৎ-তন্দুরের সাহায্যেই এলুমিনিয়াম ধাতু তৈজসপাত্রে পরিণত করিতে পারা গিয়াছে এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড্ প্রচুর উৎপাদন করা সহজ হইয়াছে।

এর চেয়েও বেশী তাপ উৎপাদন করিয়াছেন কয়েক বৎসর আগে দুজন ইংরেজ পরীক্ষক—সার এণ্ড্রু নোব্‌ল্ ও সার এফ এবেল। একটা ইস্পাতের মজবুৎ ঢোলের মধ্যে কর্ডাইট নামক ধূমহীন বারুদ বিস্ফারিত করাতে ৯৪০০ ডিগ্রি তাপ উৎপন্ন হইয়াছিল। গান্‌কটন, নাইট্রো-গ্লিসেরিন ও খনিজ পদার্থের পঙ্ক মিলাইয়া কর্ডাইট বারুদ তৈরি হয়। এই কর্ডাইট জ্বালাইয়া হঠাৎ ভীষণ তাপ উৎপন্ন করিয়া সার্ উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ ছোট ছোট হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই ভীষণ তাপে কাজ করিবার সময় পরীক্ষকদের মুখে তাপ-রোধক মুখোস পরিতে হয়, নয়ত মুখ ঝল্‌সাইয়া যাইতে পারে।

শিলাবৃষ্টি নিবারণ—

ইউরোপ আমেরিকায় ভরা গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হইয়া ফসলের খুব ক্ষতি হয়। ফ্রান্সের একজন বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান-বিৎ মাসিলাক এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া শিলাবৃষ্টি বজ্রাঘাত নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উঁচু পাহাড়ের মাথায় সারিসারি অনেকগুলি বিদ্যুৎবাহ দণ্ড খাড়া করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন প্রচণ্ড ঝড় বজ্র বিদ্যুৎ শিলাবৃষ্টি বেগে আসিতে আসিতে ঐ বিদ্যুৎবাহ দণ্ডগুলির নিকটস্থ হইবার আগেই শান্ত ভাব ধারণ করে—বজ্রাঘাত হয় না, শিলা কুচিকুচি হইয়া ধুলার মতন হইয়া যায় এবং সেইসব দণ্ড ছাড়াইয়াও ঝড় দু মাইল পর্য্যন্ত বেশ সংযত থাকে, অথচ তারপর আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধ্বংসকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই উপায় আমেরিকায় প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প হইতেছে।

গাছ থেকে সাবান—

রিঠা গাছের ফল দিয়া যে সাবানের মতন কাপড় কাচা যায় তা আমাদের দেশের প্রায় সকল লোকই জানে। কিন্তু আমেরিকায় রিঠার গাছ চীন হইতে মাত্র ৩০ বৎসর আগে গিয়াছে; ও এই ৩০ বৎসরেও তার বংশবৃদ্ধি তেমন বেশী হয় নাই। এখন এতদিন পরে আমেরিকানদের নজর পড়িয়াছে রিঠার ফলের ফেনা-উৎপাদনের ধর্ম্ম আর সাফ করিবার শক্তির দিকে। তারা এখন এই ফল দিয়া সাবান, ফেনা দিয়া সোডা-লেমনেড-জাতীয় পানীয়, শাঁস হইতে রাঁধিবার তেল তৈরি হইতে পারে স্থির করিয়াছে। রিঠা-কাঠেরও আসবাবপত্র বেশ ভালো হইতে পারে।

আমাদের দেশে এদিকে নজর দিবার মতন উদ্যোগী লোক কি কেউ নাই।

মানুষ লম্বা বা বেঁটে কেন হয় ?—

মানুষের বাড়ের মুখে কোনো কারণে বাধা পড়িলে বেঁটে, আর বাড়ে যে সময় সচরাচর বাধা পড়ে সে সময় তা না পড়িলে মানুষ ঢেঙা হইয়া উঠে। এই বাধা এক সময়ে সকল মানুষের বাড়কেই বন্ধ করে, নয়ত সবাই তালগাছের মতন বাড়িয়াই যাইত। মানুষের দীর্ঘতা তার আভ্যন্তরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, যদিও জীবনযাত্রা-প্রণালী খাদ্য আর দেশের আবহাওয়াও খানিকটা প্রভাব খাটায়। ডাক্তারদের মত যে, মানুষের দীর্ঘতা বংশক্রমের উপর নির্ভর করে। এইজন্যই এক-একটা জাতিকে-জাতি হয় দীর্ঘ, নয় খর্ব্ব হয়, এবং খর্ব্বকায় জাতির মধ্যে ঢেঙা লোক যেমন প্রতিপ্রসব, তেমনি ঢেঙা জাতির মধ্যে বেঁটে লোকও প্রতিপ্রসব।

সুপ্রজননবাদীরা মাপ জোখ লইয়া দেখিয়াছে যে, মেয়েদের বৃদ্ধি ৮ হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ হয়, যদি ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত সেইরকম চলে, তবে তাদের ৮২॥০ ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় ৭ ফুট লম্বা হইতে হয়। বাপ-মা দুই লম্বা হইলে ছেলেমেয়ে লম্বা হয়, আর বাপ-মা দুই খাটো হইলে ছেলেমেয়েরাও খাটো হয়।

ট্রেঞ্চ চেয়ে মায়ের কোল মারাত্মক—

যুদ্ধেই যে মৃত্যু বেশী হয় এ ধারণা ভুল। আমাদের ভারতবর্ষে শিশু বালক যুবা বৃদ্ধ বছর বছর নানা রোগে ও অপঘাতে যত মরে, এক এক বছরে যুদ্ধে তত লোক কখনো মরে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি গোলা শেল, বেয়োনেটের খোঁচা, বিষাক্ত গ্যাস, রোগ প্রভৃতি বহুবিধ যমদূতের হাতে যত লোক মরে, তার চেয়ে ঢের বেশী শিশু মায়ের কোলে আদরে থাকিয়া মরে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরেজদের সৈন্য মরিয়াছে বছরে শতকরা ২ চেয়ে একটু বেশী। ইংলণ্ডের লাইফ-ইনসিয়োরান্স কোম্পানীরা বা জীবন-বীমা ব্যাপারীরা এই যুদ্ধের সময় ২০ লক্ষ সৈন্যের জীবন-বীমা করিয়া বছরে হাজারকরা ৩০ জনকে মরণোত্তর টাকা দিয়াছে; শান্তির সময় ঐ বয়সের লোক হাজারকরা ১০জন করিয়া বছরে মরিয়া থাকে। সেই ১০জন বাদ দিলে যুদ্ধ হাজারকরা ২০জন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী। হাজারে ২০জন মানে শতকরা ২ জন। কিন্তু ইংলণ্ডে একবছর বয়স হইবার আগেই ৭জন শিশুর মধ্যে ১জন মরে; সাতে এক, শতকরা ১৪ জনেরও বেশী। সুতরাং যুদ্ধে যারা যায় তাঁদের চেয়ে মায়ের কোলের বাছাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা ৭ গুণ বেশী।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বছরে ২৫ লক্ষ শিশু জন্মায়, তার মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার এক বছর বয়সও পার হয় না! ২৫ লক্ষ যোদ্ধা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় বেশী ত ৫০ হাজার মাত্র মরিবে।

শিশুদের মায়েদের অজ্ঞতা ও অসাবধানতা, দাইদের আনাড়িপনা, অখাদ্য কুখাদ্য ও বস্ত্রাচ্ছাদনের অপরিচ্ছন্নতায় শিশুদের যত ভয়, যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে কামান বন্দুক হইতে তত ভয়ের কারণ সত্যই বর্ত্তমান নাই।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শিশুহিতৈষীরা স্থির করিয়াছেন যে, যদিও যত শিশু জন্মে তাদের সবাইকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নয়, তবু সাবধান হইলে শতকরা ৫০ জনকে রক্ষা করা যায়। আমেরিকার মতন সুসভ্য ও সুশিক্ষিত স্বরাট দেশে যদি এই দশা, তবে অসভ্য কুশিক্ষিত অশিক্ষিত দেশে উদাসীন গভর্মেণ্টের অনাদরে অমনোযোগে যে কত প্রাণ বধ হইতেছে তার ইয়ত্তা কে করিবে?

জার্ম্মান প্রজার স্বত্বাধিকার—

মানুষের স্বত্বাধিকার তার জন্মগত প্রকৃতিদত্ত ন্যায়বিধি। এই বোধ মানুষের মধ্যে অঙ্কুর অবস্থায় সকল কালে ও সকল দেশেই আছে; সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমরা চার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত শুনিয়া আসিতেছি ইংরেজ ও তাদের মিত্ররা দুর্ব্বলের ও জনসাধারণের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারী পরস্বাপহারী দুর্ব্বলপীড়ক জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। আমরা ভারতবর্ষের লোক স্বাধিকারে বঞ্চিত দুর্ব্বল পরাধীন। আমরা আশা করিতেছি ইংরেজের কথায় কাজে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। কিন্তু আমাদিগকে ক্রমাগত বাধা দিয়া থামাইয়া রাখা হইতেছে—যা তোমাদের দিবার তা আমরা যুদ্ধের পরে বকশিশ করিব, এখন তোমরা সুবোধ শিশুর মতন চুপটি করিয়া বসিয়া থাকো। কিন্তু দুর্ব্বলপীড়ক জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন এই যুদ্ধের মধ্যেই হইতে সুরু হইয়াছে। 'বেরলিনের টাগেব্লাট' নামক জার্ম্মান কাগজ হইতে আমেরিকার 'লিটেরারী ডাইজেষ্ট' কাগজ সংবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন যে প্রজাদের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও দাবী দেখিয়া প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ফন্ হের্টলিং রাষ্ট্রচালনা-পদ্ধতির সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব রাষ্ট্রসচিবদের সমর্থনের জন্য উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন—

'আমি স্পষ্টই অনুভব করিতেছি যে এই প্রস্তাবগুলি প্রুশিয়ার ইতিহাসের একটি মোড় ফিরিবার ঘাটি এবং এই মোড় ফেরা যে হইতেছে এই ব্যাপারটাই অনেকের ক্লেশ ও আপত্তির কারণ হইবে। কিন্তু যথার্থ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ যে সে সাহস করিয়া জনসাধারণের অভীপ্সিত দাবী অনুসারে নূতন পথে রাষ্ট্রচালনা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। সুতরাং এই বকেয়া সেকেলে পদ্ধতির বদলে নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন আপনারা সমর্থন করিলে পিতৃভূমির বিশেষ মঙ্গলের কারণ হইবে।'

প্রধান মন্ত্রীর যে উক্তির ইহা ভাবার্থ তার ইংরেজি অনুবাদটিও এই সঙ্গে তুলিয়া দিতেছি—

"I quite recognize that these proposals signify a turning-point in the history of Prussia, and the fact that this turning-point has now been reached will evoke in wide circles painful feeling and serious objections, but the task of true statesmanship is to take innovations in hand courageously when the people's need for development requires it.

"It is my deepest conviction that this need has now arisen. The present electoral system is obsolete, and you will be doing the Fatherland a very signal service if you assent to the proposals now laid before you. The bill regulating the composition of the Upper House aims at bringing that chamber into closer touch with the life of the nation, for Prussia is no longer the agrarian State that it was in the fifties."

জার্ম্মানীর রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তার চুম্বক আভাস 'ফ্রাঙ্কফুর্টের টুসাইটুং' কাগজ হইতে 'লিটেরারী ডাইজেষ্ট' এইরূপ সঙ্কলন করিয়াছেন—

"The first bill regulates the Prussian franchise as follows: Every Prussian subject who has been such for at least three years, has resided in the same parish for at least one year, and is at least twenty-five years of age, will be entitled to vote. Each elector will have one vote and all elections will be by secret ballot. In cases where no candidate obtains an absolute majority a second ballot will

be necessary. The bill also provides for the redistribution of seats, giving a slight increase to the number of representatives in the larger towns.

"The second bill modifies the right of the Prussian Herrenhaus as regards the control of finances. Whereas heretofore the Herrenhaus could adopt or reject a budget *en bloc*, now the bill provides that henceforth a budget may be discust in details and single clauses amended.

"The third bill deals with the reform of the Herrenhaus and proposes that it shall be thus composed : Ten representatives of the princely houses, twenty-four from the princes and counts, twenty-six from the remainder of the hereditary nobility, thirty-six burgomasters, thirty-six great land-owners, thirty-six representatives of commerce and industry, seventy-six from local governing bodies, both municipal and rural, thirty-six from agriculture, thirty-six from trades, twelve from the artizan class, sixteen from the universities, and sixteen ecclesiastics, while the Kaiser, as King of Prussia, will nominate one hundred and fifty other peers, making a total of five hundred and ten representatives."

যে কেউ তিন বৎসর প্রুশিয়ার প্রজাই-স্বত্ব পাইয়াছে ও এক বৎসর এক জেলায় বাস করিয়াছে ও ২৫ বৎসর যার বয়স হইয়াছে, সে ভোট দিতে অধিকারী। প্রত্যেক নির্ব্বাচকের একটি করিয়া ভোটের অধিকার; ভোট গোপনে গুটিকা প্রক্ষেপের দ্বারা দিতে হইবে। বড় বড় শহরে প্রতিনিধির সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

প্রুশিয়ার পার্লামেণ্টের উচ্চ শাখা আগে রাজস্ব বজেট হয় অনুমোদন নয় পরিবর্জ্জন করিতে পারিত; এখন তারা পরিবর্ত্তন করিতেও পারিবে।

প্রুশিয়ার পার্লামেণ্টের উচ্চ শাখার গঠনপ্রণালী এইরূপ হইবে—রাজবংশের প্রতিনিধি ১০জন, রাজারাজড়াদের ২৪, বংশানুক্রমিক বনেদি ঘরের ২৬, জেলার শাসনকর্ত্তা ৩৬, বড় জমিদারদের ৩৬, বণিক ও ব্যবসাদারদের ৩৬, প্রাদেশিক মিউনিপাল, ডিষ্ট্রীক্ট ও লোক্যাল বোর্ড ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতদের প্রতিনিধি ৭৬, চাষীদের ৩৬, ব্যাপারীদের ৩৬, কারিগরদের ১২, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ১৬, পুরোহিত সম্প্রদায়ের ১৬জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা থাকিবে; এবং প্রুশিয়ার রাজা বলিয়া কাইজার ১৫০জন বড়লোককে মনোনীত করিবেন। মোট সংখ্যা হইবে ৫১০।

এই ব্যবস্থাতেও দেশের লোক সন্তুষ্ট হয় নাই, তারা অত্যন্ত খুঁৎখুঁৎ করিতেছে যে কিছুই মিলিল না। অথচ যারা একতাল দেশের লোকের মাথার উপর বসিয়া হুকুম চালাইয়া প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে সেই আপ্তগরজে প্রাচীন ব্যবস্থার পক্ষপাতী দল মহা আর্ত্তনাদ করিতেছে—সর্ব্বনাশ হইল, রাজার মর্য্যাদা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গেল।

আমাদের দেশেও যে ঠিক এই দশাই হইবে তার আভাস বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড তাঁর বক্তৃতায় দিয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজ গভর্মেণ্ট নিতান্ত অনিচ্ছায় যথাসম্ভব গড়িমসি করিয়া আমাদের যৎকিঞ্চিৎ যা দিবেন তাতে আমাদের মন উঠিবে না, আর আমলাতন্ত্র ও ভারত-প্রবাসী ইংরেজেরা মনে করিবে সর্ব্বস্ব খোআ গেল, সর্ব্বনাশ হইল।

—চারু।

দৈবেন দেয়ম্

সত্যিকার বাস্তব খবরের চাইতে অমূলক বাজারগুজবের প্রতিপত্তি যেমন প্রবল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের তুলনায় অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্টের মোহপ্রভাব তেমনি অনেক বেশী। স্পষ্টভাবে যাহাকে দেখি শুনি ও জানি, তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দুকথায় তাহার নাড়ীনক্ষত্রের হিসাব ফুরাইয়া যায়; কিন্তু যাহাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, সম্ভব-অসম্ভবের নানা ডালপালায় পল্লবিত হইয়া সে মনের কল্পনাকে ভরাট করিয়া রাখে। তাই প্রত্যক্ষ আলোকের চাইতে অস্পষ্টতার আবছায়াই মনের মধ্যে অধিক সম্ভ্রমের সঞ্চার করে। স্পষ্ট শাসনের ভয়ে যে শিশু বিব্রত হয় না, সেও দেখি "জুজু" নামক অনির্দ্দেশ্য পদার্থটিকে যথেষ্ট খাতির করিতে জানে।

এই অস্পষ্টতার আবরণ দিয়া মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নানারকম জুজু পুষিয়া থাকে। কতগুলা অপরিচিত নাম বা দু-দশটা প্রচলিত বচনকে গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরাইয়া এমন বড় বড় আসনে বসাইয়া রাখে যে তাহাদের সম্বন্ধে তর্কবিচারের চেষ্টাও বেয়াদবির নামান্তর বলিয়া গণ্য হয়। ব্রহ্মচর্য্যের অক্ষয়মাহাত্ম্য অস্বীকার করিবার জো নাই, কিন্তু বালবিধবার প্রবোধচ্ছলে সে মাহাত্ম্যের উচ্ছ্বসিত কীর্ত্তন যে অনেক স্থলেই জুজু দেখাইবার আড়ম্বর মাত্র, এরূপ সন্দেহ করা অসঙ্গত নয়। ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদ কিছু অবাস্তব কল্পনা নয়, কিন্তু সাত্ত্বিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বাহুল্যবর্ণনায় মন যে অকারণ সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠে, তাহা অনেকস্থলেই নিছক জুজুতন্ত্রের নিদর্শন মাত্র। মোটকথা, অস্পষ্ট তত্ত্ব ও অনির্দ্দিষ্ট সংস্কারকে যথাসম্ভব স্পষ্ট ও গম্ভীর ভাষায় ব্যক্ত করিলে, তাহাতে অনায়াসে অনেকখানি ফল পাওয়া যায়। তর্কস্থলে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা যখন আবশ্যক হয়, তখন এইরূপ দুএকটি জুজুকে অকস্মাৎ আসরে নামাইলে, তাহার ফলটি হয় ঠিক চলন্ত রেলগাড়ীর মুখে লালবাতি দেখাইবার অনুরূপ।

প্রবল তর্কের উৎসাহমুখে "দিন আগে না রাত আগে?" বলিয়া সুকৌশলে একটা বিরাট সমস্যার অবতারণা করিলে, বেহিসাবী সাধারণ লোকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, ইহার পরে আর তর্ক চলে না। কিন্তু

স্পষ্টবুদ্ধির সতর্কতা কোমর বাঁধিয়া বলে যে তর্কবিচার করিতে হয় ত এইখানেই করা দরকার। এইখানেই বিশেষভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন যে দিবারাত্রির এই আপাতভীষণ দ্বন্দ্বটা একটা নিতান্তই মোটা কৃত্রিম তর্ক মাত্র। দিন এবং রাত, ভিতর ও বাহিরের মত, উত্তর ও দক্ষিণের মত, কাগজের এপিঠ-ওপিঠের মত, শাশ্বত কাল একই বাস্তব আইডিয়ার দুই মাথায় বসিয়া আছে। শাশ্বত কাল হইতে যেখানে যেখানে সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়াছে, সেখানে সেখানেই নানা ছন্দে নানা বিচিত্র-তালে দিবারাত্রির যমজলীলার অভিনয় চলিয়াছে। এই পৃথিবীও যখন আপনার স্বতন্ত্রজীবনে প্রথম সূর্য্যালোক প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তখন হইতেই আলোআঁধারের একই চক্রে দিবারাত্রি গণনার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেইরূপ "বীজ আগে না গাছ আগে" এই প্রশ্নেরও একটা সম্মোহনমূর্ত্তি আছে। শুনিলেই মনে হয় একটা বিরাট নিরুত্তর সমস্যা, তাই মানুষ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সতর্ক সহজবুদ্ধি চোখে আঙুল দিয়া দেখায় যে জড় ও চেতনের সন্ধিমুখে জীবনের আদি উন্মেষ যেখানে, সেখানে বীজও নাই বৃক্ষও নাই, কেবল আকার-বৈচিত্র্যহীন জীবকোষ পরিপুষ্টির আতিশয্যে ফাটিয়া দুখান হয়—'এক' সেখানে সাক্ষাৎভাবে 'দুই' হইয়া বংশবিস্তার করিতে থাকে। ক্রমে জীবনরহস্যের জটিলতা যখন বাড়িয়া পরিণত ও অপরিণত জীবের প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া উঠে, জীবাবস্থা ও বৃক্ষাবস্থার স্বাতন্ত্র্যকল্পনা যখন সম্ভব হয়, তখন সেই একই সম্ভাবনার যুগলচিত্র বৃক্ষ ও বীজের অবিচ্ছিন্নদ্বন্দ্বের মধ্যে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। দ্বন্দ্বটা যে কি এবং তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি কোথায়, এরূপ স্পষ্টভাবে ঘাঁটাইয়া না দেখিলে, তাহা যে-কোন ঝাপ্সা তর্কের ও নৈয়ায়িক আগাছার উর্ব্বরক্ষেত্র হইয়া উঠিতে পারে। কার্য্যটা যে ভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণের মধ্যে বীজাকারে নিহিত থাকে, বৃক্ষটা ঠিক্ সেইরূপ সূক্ষ্মভাবে বীজের মধ্যে "একাধারে" অপ্রকট থাকে কি না; এবং বীজটা যদি উপাদানকারণ হয় তবে বৃক্ষের নিমিত্তকারণটা ঐ বৃক্ষবীজ-সম্বন্ধেরই অঙ্গীভূত কি না; কার্য্য ও কারণ এবং বৃক্ষ ও বীজ—কৃতকর্ম্ম ও অকৃতকর্ম্ম এবং বাস্তববৃক্ষ ও বৃক্ষসম্ভাবনা,—ইহাদের পরস্পর নামসম্পর্ক কিরূপ;—ইত্যাকার abstraction বা অবস্তুর বিচার তখন সমস্যার চারিদিকে জটিলতার জট্ পাকাইয়া তাহাকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখে।

এইরূপ ঝাপ্সা কথার ধোকা দিয়া মানুষ আপন মনে একএকটা অস্পষ্টতার মোহ সৃজন করে, এবং সেই মোহকে জীবনের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া অকারণ তৃপ্তিবোধ করে। এই দুর্ভাগ্য দেশ, জীর্ণতার পরিত্যক্ত কঙ্কাল যেখানে প্রাণের চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, এই জুজুতন্ত্রের শাসনও এইখানেই মারাত্মকরূপে প্রবল। এজিনিষ যে অন্যদেশে নাই তাহা নয়—বাক্য ও চিন্তার fetish সকল দেশে সকল সমাজেই সুলভ। কিন্তু মোহের কবলে এমন নিশ্চেষ্ট নিরাশ্রয়ভাবে মানুষ আর কোথাও পড়িয়া থাকে না। লোকশাসন ও সমাজবিধির অপচার সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু তাহার এমন পাকাপাকি প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর আর সকলখানেই দুর্ল্লভ।

ইংরেজিতে যাহাকে Superstition বলে, বাংলায় তাহারই নামান্তর করা হয় "কুসংস্কার"। ঐ জিনিষটার প্রতি কটাক্ষপাত নিবারণের জন্য একশ্রেণীর লোকে একটা বড় গোছের জুজু পুষিয়া থাকেন, তাহার মন্ত্র "There is a superstition in avoiding superstition" অর্থাৎ "কুসংস্কার বর্জ্জনের প্রয়াসটাও একটা কুসংস্কার।" উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে, শুভাশুভ লক্ষণবিচারে, তিথিনক্ষত্রের নানা উপদ্রবে, হাঁচি-টিক্‌টিকি আসন-মুদ্রার মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে যে জিনিষটার জালবিস্তার হইতে দেখি, তাহাকে কুসংস্কার বলিলে অনেকে রাগ করেন। বলেন, "তুমি কি এমনই দিগ্‌গজ ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছ যে কিসে কি হয় না-হয়, সমস্ত জানিয়া শেষ করিয়াছ? বিজ্ঞানের কয়েকটা পুঁথি আওড়াইয়া তুমি কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্ব একেবারে দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিয়া ফেলিয়াছ?" ইহার পাল্টা জবাব দেওয়া যায় যে "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে তোমার অন্ধ আচারের কোন বন্ধন না মানিয়াও সহজ স্বাধীনভাবে কত দেশ কত জাতি সংসারে তরিয়া গেল, আর তোমার জটিল নিয়মের বিরাট প্রশস্তি যুগযুগান্ত জপিয়া জপিয়াও 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'। তাই সন্দেহ হয় যে আধ্যাত্মিক জীবনপুষ্টির খাতিরে তুমি যে সূক্ষ্ম আহারের

অভিনয় করিতেছ, তাহা ফাঁকা রোমন্থন মাত্র।" কিন্তু ইহাতেও নূতন তর্ক জুটিবে যে সত্যসত্যই আর কোন জাতি অগ্রসর হইতেছে কি না, এবং আমরাও যথার্থই পশ্চাতে পড়িয়া আছি কি না,—আর যাহাকে 'তিমির' বলা হয় সেটাও কি যথার্থই তিমির, না স্নিগ্ধ আলোর আশ্চর্য্য প্রকারবিশেষ। এই প্রকার ধাঁধাচক্রে নিরুদ্দেশভ্রমণ আমাদের এমনই অভ্যাসগত, যে, চক্রের ব্যূহভেদ করা যে আবশ্যক, একথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়। তাই অন্ধতার গৌরব করিয়া মানুষ বলে, "সকল বিষয়ে অতি-জাগ্রত হওয়াটা কিছু ভাল নয়, ওটা সাবধানতার বাড়াবাড়ি মাত্র, There is a superstition in avoiding superstition !" মনের একএকটা অন্ধ সংস্কার নিশ্চিন্ত নিরীহভাবে জীবনের উৎসমুখে চাপিয়া বসে, সহজ ব্যাপার কথার পাকে জটিল হইয়া উঠে, গভীর তত্ত্ব নিরর্থক মুখস্থ বুলির মত বচনমাত্রে পরিণত হয়—তাহাতে কাহারও আপত্তিও নাই, অতৃপ্তিও নাই।

এইরূপে কতগুলা অস্পষ্ট ও অচিন্তিত সংস্কার যখন কথায় নিবদ্ধ হইয়া জীবনের ঘাড়ে চাপিয়া বসে তখন তাহার প্রভাব কতদূর মারাত্মক হইতে পারে, তাহার সব চাইতে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের এই অদৃষ্টবাদ। এতবড় সর্ব্বগ্রাসী 'জুজু' এদেশে বা কোন-দেশে আর দ্বিতীয় নাই। আকার ও প্রকারের প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে এই এক সংস্কারের মূঢ়তা এমন আশ্চর্য্য সম্পূর্ণভাবে জীবনের আটঘাট জুড়িয়া জীবনের হাড়ে হাড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, যে, মনে হয় জীবনের সকল অভ্যাসবন্ধনকে আমূল উপড়াইয়া না ফেলিলে, ইহার আর প্রতিষেধ হয় না। এই এক জিনিষের মোহপ্রভাব সমস্তজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সজীবতার উপর এমন পাকা করিয়া আপন রঙের ছোপ ধরাইয়া দেয় যে জীবনের প্রবল স্রোতে অবিশ্রান্ত ধুইলেও রঙের ঘোর ছুটিতে চায় না—বিচারের প্রখর রৌদ্রে উন্মুক্ত থাকিয়াও মরিতে চায় না। তাই জীবনসংগ্রামের সহস্র তাড়নার মধ্যে নিশ্চেষ্ট মানুষ, সুখে হতাশ দুঃখে হতাশ—বিচার নাই উদ্যম নাই, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, আর বলে "দৈবেন দেয়ম্।" দৈবে করায় দৈবে ঘটায়, অদৃষ্টের ফেরে পাই অদৃষ্টের ফেরে হারাই। কর্ম্মবন্ধনের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছি ফিরিতেছি, বাহির হইবার পথ দেখি না, কারণ বাহির হইবার পথ নাই। যদিবা মুহূর্ত্তের উৎসাহে বলিয়া ফেলি যে "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" কিন্তু সেই উদ্যোগী পুরুষটিকে এই উত্তমপুরুষরূপে দেখিবার আগ্রহ নাই—থাকিলেও তাহার আয়োজন দেখি না। কেবল জীবনের নিরুদ্যম ভীরুতা "দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষাঃ বদন্তি" এই কথারই সত্যতা প্রমাণ করিতে থাকে।

দৈবেন দেয়ম্। দৈবে যাহা আনিয়া দেয়, ঘাড় পাতিয়া তাহাই লও। সে দৈব যে কে, সে যে কোথা হইতে কিরূপে দেয়, তাহা দৈবই জানে—তোমার আমার কিছু বলিবার নাই করিবার নাই। দৈবের অমোঘ চক্রে তুমি আমি কলকব্জার খুঁটিনাটিমাত্র—তোমার আমার সুখদুঃখে, তোমার আমার ইচ্ছাঅনিচ্ছায়, নিয়তির চক্র টলিবে কেন? দৈবে হাসায় দৈবে কাঁদায়, নতুবা তুমি হাসিতেও জান না কাঁদিতেও পার না—তুমি কেবল দ্রষ্টা মাত্র, দৈব কর্ম্মের সাক্ষীমাত্র। দারিদ্র্যে দুর্ভিক্ষে লোক মরে, ব্যাধিতে দুশ্চিকিৎসায় লোক মরে, মানুষ তাহার কি করিবে? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই; কপালে যদি মরণ থাকে, মরণ তবে আসিবেই। আগুন জ্বলিয়া ঘর যায় বাড়ী যায়—কি করিব? দৈবের লিখন। আগুনের মধ্যে দুকলসী জল ঢালিবার চেষ্টাও যেন দৈবের নিষিদ্ধ! আর দশজন যাহারা আমাদেরই মত দৈবের অধীন, তাহারা দৈবশক্তি লাভ করে আর দৈববলে বলী হয়, দৈবের উপর আস্থা রাখিয়া সংগ্রাম করে; কেবল আমরাই এমন দুর্দ্দৈবের দাস যে দৈবের চাপে আড়ষ্ট হইয়া একবার মাথা তুলিয়াও দেখিতে জানি না? ইহার চাইতে মানুষ যদি চার্ব্বাকের মত বে-পরোয়া নাস্তিক হইয়া বলিত, "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ," জীবনের মাশুল ষোলআনা আদায় করিয়া লও—জীবনের পক্ষে তাহাও আশার কারণ হইত; অন্ততঃ বোঝা যাইত যে প্রাণের আশা এখনও সে ছাড়ে নাই।

Free Will ও Destinyর দ্বন্দ্বসমস্যা সকল দেশেই আছে এবং ছিল, কিন্তু তাহাতে আর কোথাও এমন নিষ্ফলতার বিভীষিকা ও অবসাদের সৃষ্টি হয় নাই। তাহার কারণ এই যে দৈবের বিচারতত্ত্বকে পাকা কথায় গাঁথিয়া

system বা তন্ত্রে পরিণত করিয়া জীবনের ভিত্তিমূলে বসাইয়া দিবার এমন organized ব্যূহবদ্ধ আয়োজন আর কোথাও দেখা যায় না।

যে মোহ ভাঙিবার জন্য মোহমুদ্গরের সৃষ্টি, সে মোহ মানুষের ভাঙে নাই, কিন্তু আনাড়ির হাতে মুদ্গরের প্রয়োগ এখনও মারাত্মক। শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা, আসলে যাহাই হউক, তাহার সংস্কারগত সহজমন্ত্র এই যে, "সংসারটা কিছু নয়"। যাহা দেখি, মিথ্যা দেখি—যাহা শুনি, তাহা মিথ্যা শুনি; তুমি আমি, এই জগৎসংসার, এই ঘটনার পর ঘটনা, সব মিথ্যা, সব মায়া। সুতরাং সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি? "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ"—ইত্যাদি। আসল কথা, সংসারটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেল। যে কর্ম্মজীবন চায় সে সংসারের হাটে কোলাহল করিয়া ফিরুক, যে মানুষের সঙ্গ চায় সে সংসারের হাহাকার বহন করিয়া মরুক; তুমি এ-সবের শৃঙ্খল ভাঙিয়া, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া, জগতের সুখদুঃখে উদাসীন হইয়া কর্ম্মের জন্মজন্মান্তর-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর।

কথাটা বলিলেই কাজটা সহজ হয় না—কারণ সংসারটাকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইতে চাহিলেই সে সরিয়া দাঁড়ায় না। বরং মায়াপুরীর যমদূতগুলা ক্ষুধার আকারে ব্যাধির আকারে সংসারের নানা তাড়নার আকারে জীবনের কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করে—কিন্তু কুতর্কের কণ্ঠরোধ করিবে কে?

তাহার উপর আবার কর্ম্মবাদের জগদ্দলপাষাণভার। শাস্ত্রবচনের যথার্থ মীমাংসা শুনিবার উৎসাহ মানুষের নাই, তাই লৌকিক স্থূল সিদ্ধান্তকেই ঋষিবাক্যের মুখোস পরাইয়া মানুষ শাস্ত্রানুশাসনের নামে চালাইতে চায়। এই লৌকিক সংস্কার বলে যে কর্ম্মবন্ধনে হাত পা বাঁধিয়া মানুষ সংসারে আসে। পূর্ব্বজন্মের সুকৃত দুষ্কৃতের নাগপাশ এই জন্মের জীবনযাত্রাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। এই জন্মে এখন তুমি দুর্দ্দশাভোগ করিতেছ, তাহার মূলকারণ তোমার "পূর্ব্বজন্মকৃতংপাপম্"। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলবীজ তোমার মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে, তাই ইহজন্মের জীবনবৃক্ষে তাহারই অনুরূপ ফল ফলিবে। এ-জন্মে কাঁঠাল খাইবার সাধ রাখ, তবে ও-জন্মে কুষ্মাণ্ডবীজ রোপণ করিয়াছিলে কেন? এ জন্মে শূদ্র হইয়াছ, অথবা অস্পৃশ্য 'পঞ্চম' হইয়া জন্মিয়াছ, সে তোমার কর্ম্মফলের দোষ। তবে আর মাথা তুলিতে চাও কেন? অযথা আর্ত্তনাদ কর কেন? সংসারে কেউ ছোট, কেউ বড়, ইহাই ত স্বাভাবিক নিয়ম; কর্ম্মফল অনুসারে সকলে যথাযোগ্য আসন পাইয়া থাকে। সুতরাং যে যেমন আছ তাহাতেই তৃপ্ত থাকিয়া সুবুদ্ধি মানুষের মত আপন পথে নির্দ্বন্দ্ব থাক, তাহা হইলে সুকৃত সঞ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে পরজন্মে হয়ত উচ্চতর পদবী লাভ করিবে। (অবশ্য ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদটাও তোমার কর্ম্মফলপ্রসাদে।) এই ব্যাখ্যার আশ্বাসে মানুষ কি যে সান্ত্বনা পায় তাহা জানি না, কিন্তু যে বেচারা সান্ত্বনা মানে না, মানুষ তাহাকে হতভাগ্য বলে, সমাজ তাহাকে চোখ রাঙায়।

তারপর, ইহার সঙ্গে যখন প্রাকৃত জনের অচিন্তিত অদ্বৈতবাদ জুড়িয়া দেওয়া হয় তখন জীবনতরী তাহার ভরাডুবির আয়োজন সম্পূর্ণ করে। যে অদ্বৈতবাদের শঙ্খনির্ঘোষে জাগ্রত হইয়া মানুষ আপনার মধ্যে বিশ্বপুরুষের বিরাটরূপকে প্রত্যক্ষ করে, যে অদ্বৈত বিবেক মুমূর্ষু মানুষকে আশ্বাস দেয় তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি সুখদুঃখের ও জন্মমৃত্যুর ক্রীড়নক মাত্র নও, তুমি স্বয়ং অমৃত, তুমি স্বরূপতঃ সেই বিরাট, সেই—

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—

সেই জীবন্ত অদ্বৈতবাদ, লৌকিক বুদ্ধির কবলে পড়িয়া যে জুজুর আকার ধারণ করে, তাহা যথার্থই মারাত্মক। এই সখের অদ্বৈতবাদ বলে, "ভেদ যখন কোথাও নাই, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সবই যখন একই আত্মার বহুধা প্রকাশ মাত্র, তুমি আমি বিষয়আশয় ইত্যাদির যখন কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তখন ভালমন্দের বিচার কেন? পাপপুণ্যের ও পঙ্কচন্দনের সংস্কার কেন? কর্ম্মের কর্ত্তা সেই একই আত্মা—সুতরাং কে কাহার অনিষ্ট করিবে, কে কাহার সম্মান করিবে? কে কাহাকে আশ্রয় দিবে, কে কাহাকে হনন করিবে? দোষগুণের দণ্ডপুরস্কার নিরর্থক, সমাজের শাসনবন্ধন নিরর্থক, মানুষের ধর্ম্মভয় ও দায়িত্ব-

বোধ নিরর্থক। কাজের মালিক যখন একজন, তখন তোমার পাপপুণ্যের ভাগী তুমিও যেমন আমিও তেমন। আমার লাভও নাই ক্ষতিও নাই—কিছু করিলেও হয়, না করিলেও হয়—দশের ভাবনা ভাবিলেও হয়, না ভাবিলেও হয়—কারণ, আমার কাজে ও অকাজে আমার কোন কৃতিত্ব নাই।

আশ্চর্য্য এই যে, এক সময়ে কর্ম্মবন্ধন কাটিবার জন্যই মানুষ জাগ্রত ও সচেষ্ট হইয়া অদ্বৈত প্রতিষ্ঠার আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, দৈবের জন্মজন্মান্তর-শাসন ঘুচাইবার জন্যই সংসারকে মায়ার কবল বলিয়া মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। অথচ কার্য্যকালে দেখি কেহ কাহারও বন্ধন খোলে না, বরং পরস্পরে মিলিয়া পরম বন্ধুভাবে বন্ধনকেই আঁকড়াইয়া বলে, "সংসারচক্রে জীবনটা যেমনভাবে ঘুরিতেছে, ঠিক তেমন ভাবেই ঘুরুক—তাহাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।" সাধারণ সংসারবুদ্ধির কাছে দৈববাদ ও কর্ম্মবাদ মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ মনের কোন সুস্পষ্টচিন্তিত সিদ্ধান্ত নয়, কতগুলা নির্ব্বিচার অন্ধসংস্কারের জুজু মাত্র। তাই আসলে তাহাদের অর্থ ও অভিপ্রায় কি, একথা ভাবিবার জন্য মানুষ কোন তাগিদ অনুভব করে না। পরিচিত ব্যাপার সম্বন্ধে অতটা শ্রমস্বীকার অনাবশ্যক বাহুল্য বলিয়াই বোধ হয়। পরিচয়টা যে বস্তুপরিচয় নয়, শব্দের পরিচয় মাত্র, এ বোধটাও মনের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে না। মূঢ়তার প্রশ্ন আপন মনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া বলে, ইহার নাম শাস্ত্রবাণী, ইহার নাম মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ, ইহার নাম দৈববাদ ও কর্ম্মফলবাদ। অথচ আসলে তাহা অজ্ঞতার স্বগত উক্তিমাত্র। অজ্ঞতার কবলে পড়িয়া মায়াবাদ বলিল, "এখানে কিছু করিবার নাই"—কর্ম্মবাদ বলিল "কিছু করিবার উপায় নাই"—আর অদ্বৈতবাদ বলিল, "কিছু করিবার প্রয়োজন নাই—করিয়া কিছু লাভ নাই।" আর তিনের সুর মিলাইয়া দৈববাদ গম্ভীর পরিহাস করিয়া বলিল, "কেহ কিছু করিও না, কারণ না-করাটাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম।"

এইখানে কেহ কেহ তর্ক তোলেন যে, "ইহার মধ্যে কোন্‌টা কার্য্য আর কোন্‌টা কারণ? দৈববাদের শাসনপ্রভাবেই কি জীবনের সচেষ্ট সংগ্রাম মরিয়া যায়, না জীবনটা নিস্পৃহ নিরুদ্যম থাকে বলিয়াই সে দৈববাদের দাস হইয়া পড়ে?" বাস্তবিক এ প্রশ্নের মধ্যে কোন দ্বৈধ নাই। মাতাল সে মাতাল বলিয়াই মদের দাস হয় আর মদের দাস হইলেই পাকারকম মাতাল হইয়া পড়ে। মনের মধ্যে ঔদাসীন্যের অবসাদ থাকিলেই দৈববাদের প্রতিষ্ঠাভূমি পাকা হয়; আর, দৈববাদের পাকাপোক্ত প্রতিষ্ঠার উপরেই আশাহীন নির্জ্জীবতার আসর জমে ভাল। চিন্তা ও কর্ম্মের এই vicious circle অভ্যাসের দুরন্ত চক্রে জীবনকে একবার প্রবিষ্ট করিলে আর নিষ্ক্রামণের পথ থাকে না। টাকায় যেমন টাকা আনে, দুর্ব্বল মন কেবল দুর্ব্বলতাই ডাকিয়া আনে। জীবনীশক্তি যাহার ম্লান হয়, ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে, এবং ব্যাধির আক্রমণে পড়িলে জীবনীশক্তিও ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। সুতরাং এই আগে-পরের তর্কটা খুব সমীচীন তর্ক নয়—ইহা দিবারাত্রি ও বৃক্ষবীজের পরিচিত তর্কেরই প্রত্যাভাষ মাত্র। Academic discussion বা বৈঠকী তর্কের আসরে এ আলোচনার সমাদর ঘটিতে পারে, কিন্তু বাস্তব-জীবনের প্রয়োজন-হিসাবে তর্কটা ফাঁকা তর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। রোগের চিকিৎসা করিতে বসিয়া চিকিৎসক এ ভাবনায় বিচলিত হইতে থাকেন না যে, রোগটাকে আগে মারিব, না তাহার কারণগুলাকে আক্রমণ করিব, না রোগের পরিচয়লক্ষণগুলাকে দাবাইয়া রাখিব। রোগীর ক্ষীণপ্রাণতা ও ব্যাধির প্রকোপ, চিকিৎসকের কাছে একই সমস্যার দুই তরফ মাত্র।

"অদৃষ্ট" কথাটার একটা ইতিহাস আছে। কার্য্য-কারণের কতকটা শৃঙ্খল বেশ দেখা যায়, বোঝা যায়, তাহা দৃষ্ট;—আর যাহা স্পষ্ট দেখা যায় না, যাহার হিসাব পাওয়া যায় না, তাহা অদৃষ্ট। সহজ তথ্যের এই সহজ সংস্কৃত পরিভাষা। ইহার সঙ্গে কোন বাদপরিবাদের বা বিভীষিকার সম্পর্কমাত্র নাই। অথচ এইযুগে অদৃষ্ট বলিতেই এমন আতঙ্ককে বুঝি যাহা জীবনের ঘাড়ে ভূতের মত চাপিয়া থাকে। সে আমাদের মাথার উপর একটা জাগ্রত উভয়সঙ্কটরূপে সর্ব্বদাই উদ্যত হইয়া আছে। দৈবের আজন্ম চাপে জীবনটাই অবসন্ন, কর্ম্মবন্ধন কাটি কিরূপে? আর, কর্ম্মবন্ধনে হাত পা বাঁধা, দৈবের বোঝা নামাই

কিরূপে? এই paradoxএর সৃষ্টি করিয়া, কথার চর্‌কী ঘুরাইয়া, মানুষ বেশ আশ্চর্য্যরকম পরিতৃপ্ত থাকে।

এই বর্ত্তমান যুগে দৈববাদের এক নূতন আশ্রয় জুটিয়াছে, তাহার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান তাহার বিষয়-রাজ্যে যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পায়, সে নিয়মকে পুরাপুরি ও একতরফা স্বীকার করিলে, বাস্তবিক একটা দৈবতত্ত্বকেই স্বীকার করা হয়। এই বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ কার্য্যকারণের সকল সম্বন্ধকে অঙ্কের হিসাবে মিলাইয়া দেখায় যে, প্রত্যেক কার্য্য, প্রকারে ও পরিমাণে, উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসূত। প্রত্যেক কারণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কার্য্য ফল প্রসব করে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট cause হইতে নির্দ্দিষ্ট effect উৎপন্ন হয়, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই মুহূর্ত্তে জড়জগতের যেখানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা পূর্ব্বমুহূর্ত্তে অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বমুহূর্ত্তের কারণসমষ্টি, যাহা এই মুহূর্ত্তের কার্য্যসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও তৎপূর্ব্ব সময় হইতেই অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপে এই শৃঙ্খলপরম্পরায় সুদূরতম অতীত হইতে সুদূরতম ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত এক অমোঘ শাসনে আবদ্ধ রহিয়াছে, কোথাও চুলপ্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। প্রত্যেক জড়কণার প্রত্যেক পরমাণু কখন্ কোন্‌-পথে কেমন-ভাবে চলিবে, শাশ্বতকাল হইতে তাহা অকাট্য সঙ্কেতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—কোথাও তাহার বিচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। বিশ্বসংসারে এই মুহূর্ত্তে যাহা কিছু যেমনভাবে আছে তাহার পরিপূর্ণ হিসাব যদি পাওয়া যাইত, তবে অতীত ও ভবিষ্যতের সমগ্র ইতিহাসকে অভ্রান্তভাবে তাহারই মধ্যে নিহিত দেখিতাম। দৈববাদ ইহার অতিরিক্ত আর কি বলিবে?

অবশ্য, বাহিরের জড়ব্যাপার লইয়াই বিজ্ঞানের কার্‌বার। বাহিরের দৃষ্টি, objective vision, তাহার বিচারের সম্বল। কিন্তু এই বাহিরের দৃষ্টিকে সে জীবনের অন্তর-রাজ্যেও প্রয়োগ করিতে চায়, জীবনের মধ্যেও তাহার নিয়মচক্রের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পায়। সে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মপ্রভাবকে দেখে না, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত গ্লানি ও প্রসাদকে দেখে, ইহজন্মের প্রত্যক্ষ আবেষ্টনকে দেখে। জীবনকে সে Heredity Environmentএর সাক্ষাৎ ফলসমষ্টিরূপে বিচার করে। ইহা বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক, তাহার এক তরফের বাণী। ইহারই সাধনপর্য্যায়ে দেখি বিজ্ঞান প্রাণ জাতি মাত্রেরই জাগ্রত পুরুষকার—আবেষ্টনকে অতিক্রম করিবার জন্য মানুষের দুরন্ত সংগ্রাম—শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা বাহিরের বিরুদ্ধশক্তিকে জয় করিবার অদম্য উৎসাহ। সুতরাং দৈবকে চূড়ান্তরূপে স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞান আপনার সাধনবলে তাহার বিষদাঁত ভাঙিয়া রাখে।

বিজ্ঞানের জুজু যখন টিকিতত্ত্ব ও গঙ্গাজল-মাহাত্ম্যের সমর্থনেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন দৈববাদ যে বিজ্ঞানের দোহাই দিবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের যথার্থ দরদ যেখানে আছে, সাক্ষাৎ জ্ঞানস্পৃহা যেখানে জাগ্রত, জীবন ও সংসার যেখানে কেবল মায়ার পরিহাস নয়, জীবন্ত প্রাণের উত্তাপ সেখানে দৈববাদের বীজকে ভর্জ্জিত করিয়া ফেলে। জীবনের ভূমিতে উপ্ত হইয়া সে বীজ আর তাহার ডালপালা বিস্তার করিতে পারে না, অন্ধতত্ত্বের জটিলজালে জীবনকে অভিভূত করিতে পারে না।

জীবনের যে-কোন দ্বন্দ্ব জীবনের মধ্যেই আপনার সর্ব্বোত্তম সমাধান লাভ করিয়া থাকে। কারণ, জীবনের একটা স্বতন্ত্র 'লজিক্' আছে, তাহা তত্ত্বের লজিক্‌কে চিরকালই অতিক্রম করিয়া চলে। দৈবের যে তত্ত্বরূপ তাহা ছাড়াও তাহার একটা পরিচিত জীবন্তরূপ আছে, সেই রূপটিকে অহরহ আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখি এবং তাহার মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের সহজ সমাধান পাই। দৈবের দ্বারাই যে দৈবের খণ্ডন হয়, কর্ম্মের দ্বারাই যে কর্ম্মবন্ধনের ছেদন হয়, ইহা কেবল শাস্ত্রের বচন নয়, ইহা প্রত্যক্ষ জীবনেরও সাক্ষ্য।

রোগের বীজই রোগের প্রতিষেধক জুটাইয়া দেয়। জীবন্ত দেহের ব্যবস্থা এমন বিচিত্র যে রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাণশক্তি তাহার প্রতিষেধক (anti-toxin) সৃজন করিতে থাকে। এই ব্যাপারকে চিকিৎসার কাজে লাগাইয়া মানুষ রোগের কাছ হইতেই তাহার সাক্ষাৎ ঔষধ আদায় করিয়া লয়। ঠিক সেইরূপ, তত্ত্বের বাদ প্রতিবাদ ভুলিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, দৈবই দৈবের খণ্ডনসঙ্কেত স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেয়।

তত্ত্বের বিচার যখন জীবনের মধ্যে পুরুষকারের কোন স্থান দেখে না, কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না, জীবনের জাগ্রত পুরুষকার তখনও সংসারের তুচ্ছতম সাধনের মধ্যে আপনাকে পরিপূর্ণ সত্যরূপে অনুভব করিতে থাকে। "বাঘ আসিতেছে" শুনিলে অতিবড় দৈববিৎ পণ্ডিতও পলায়নরূপ ব্যাকুল চেষ্টায় পৌরুষকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রে বলে দৈব আছেন, তত্ত্ব বলে দৈব আছেন, বিজ্ঞান বলে দৈব আছেন, আর সহজবুদ্ধিও সায় দিয়া বলিল যে "দৈব আছেন"। সমস্তই মানিলাম—কিন্তু আমার অনুভূতিকে, আমার আমিত্বকে, আমার জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়া যে পুরুষকার আছেন, একথাটা অস্বীকার করি কিসের জোরে? অদৃষ্টের ভাবনা ভাবিতে গিয়া খামখা আমার প্রত্যক্ষ পুরুষকারকে খোয়াইয়া বসি কেন? দৈবও মানিব পুরুষকারও মানিব, স্থূলবিচার বলে, এ কেমন স্ববিরুদ্ধ কথা! কিন্তু দৈবও আছেন পুরুষকারও আছেন, এই ত জীবনের সহজ সাক্ষ্য। বিচার করিয়া দেখিলাম আমি কিছু করি না, আমি কিছু করিতে পারি না, সব করে দৈবে; অথচ জীবনে এই আবার প্রত্যক্ষ দেখি, এই আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, এই আমার শক্তি ও সংগ্রাম। এই আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার শক্তি ক্ষয় করিয়া বক্তৃতা লিখিলাম, এই এখন মনের শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই বক্তৃতা পাঠ করিতেছি—ইহার সফলতার সুখ আমার, ইহার ব্যর্থতার দুঃখ আমার। যে শক্তি আমাকে ভাবাইয়া আমার দ্বারা বক্তৃতা লিখাইল, তাহাকে যে-নামই দেই না কেন, যে বস্তুটা 'আমি আমি' বলিতেছে তাহাকে কোন্ বুদ্ধিতে বলি যে, "তুমি কোথাকার কে? ইহার মধ্যে তুমি কেউ নও?"

তবে কি বলিব যে খানিকটা দৈবে করায়, আর খানিকটা পুরুষকার? জীবনের খানিকটা পৌরুষসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ আর খানিকটা দৈবসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ? তাহাতেই বা সমস্যা মিটিল কই? জড় ও চেতন সমগ্র জগৎ যদি একই অখণ্ড নিয়মসূত্রে গ্রথিত হয়, তবে পুরুষকারকে তাহার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করি কিরূপে? আর, নিয়মচক্রের অন্ধ নিষ্পেষণ যদি এড়াইতে না পারিলাম, তবে পুরুষকারের সার্থকতা কোথায়? অলঙ্ঘ্য দৈবই যদি সর্ব্বস্ব হয়, তবে জীবনে জীবনে পুরুষকারের এ অভিনয় কেন? পুরুষকারকে জাগ্রত করিয়া আবার তাহার কর্ত্তৃত্ব লোপ করা হয় কেন?

তত্ত্বের আসর ছাড়িয়া প্রশ্ন যখন জীবনের ক্ষেত্রে জাগ্রত হয়, জীবন যখন আপনার মধ্যে উত্তরের অন্বেষণ করিয়া দেখে, তখনই দেখে দৈবের আত্মসম্বৃত সম্মোহন মূর্ত্তি। আর সে বাহিরের নিষ্ঠুর শক্তিমাত্র নয়, অন্ধশক্তির নির্ম্মম পরিহাস নয়। জীবনে জীবনে পুরুষকাররূপে, হৃদয়ে হৃদয়ে অমোঘ প্রেরণারূপে, কালে কালে জাগ্রত মঙ্গলরূপে, দেশে দেশে প্রবুদ্ধ আত্মবিশ্বাসরূপে, সেই এক দৈবই আবির্ভূত। কোথাও দ্বন্দ্ব নাই, কোথাও বিরোধ নাই, ভিতরে বাহিরে একশক্তির জীবন্তলীলা প্রতি জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার বিরাটরূপকে আপনি প্রকাশ করিতেছে। প্রতিজীবনের বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে আপনাকে আপনি সন্ধান করিতেছে—বিশ্বশক্তিকে আত্মশক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

যে-কোন দিক দিয়াই জীবনের পথকে উন্মুক্ত করি না কেন, জ্ঞানের অন্বেষণই হউক কি প্রেমের চরিতার্থতাই হউক, জীবনের জাগ্রতবুদ্ধি যেখানে আপনার জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করে, সকল দ্বন্দ্বের সকল সন্দেহের মোহরূপ সেইখানেই খসিয়া যায়। স্বভাবশঙ্কিত দুর্ব্বল মন দৈবের স্পষ্ট রূপকে না দেখিয়াই আপোস করিতে চায়; জীবনকে বিশ্বজীবনের মধ্যে, আত্মশক্তিকে বিশ্বশক্তির মধ্যে বৃহত্তররূপে দর্শন করে না। পুরুষকারকে সে অবতীর্ণ দৈবশক্তিরূপে জানে না, তাই দৈব সেই বাহিরের নিষ্ঠুর বিভীষিকাই থাকিয়া যায়। দৈব তাহার জীবনের সুখদুঃখ সংগ্রাম আর বহন করিতে চায় না, কেবল দুঃস্বপ্নের মত নিদ্রিত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে মাত্র। মিথ্যা ভয়ের মোহকল্পনা বিস্তার করিয়া মানুষ বলে, "আমার স্বাধীন বুদ্ধিকে দৈবশক্তির প্রকাশ বলিলে, আমার কর্ত্তৃত্ববোধ থাকে কোথায়? আমার দায়িত্বজ্ঞান টিকিবে কিরূপে? অতটা স্বীকার করিলে মানুষ যে নিরঙ্কুশ বেপরোয়া হইয়া পাপপুণ্যের বিচার ছাড়িয়া দিবে, বিধাতার উপর আপনার দুষ্কৃতভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে!"

এই ত তন্ত্রতন্ত্রের জুজু! এই বিশ্বজীবন যদি এমন নিয়মেই গঠিত হয় যে সত্যকে সত্যরূপে দেখিতে গেলে মানুষের পৌরুষবুদ্ধিকে খোয়াইতে হয়, তবে সে সত্য-বঞ্চিত অক্ষম পৌরুষ আমার কোন্ কর্ম্মে লাগিবে? আর কোন্ পৌরুষকে আশ্রয় করিয়া মানুষ সত্যের অনশ্বর শাস্ত্রকে বিলুপ্ত করিবে? দৈবকে ফাঁকি দিয়া এড়াইবার কল্পনা পুরুষকারের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবারই চেষ্টা মাত্র। দৈবের বিশ্ববিস্তৃত শাসনযন্ত্র জীবনের ভিতরে-বাহিরে জাগ্রত রহিয়াছে, সে আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই। দৈব যদি সহায় না থাকে, তবে দৈবের কবল হইতে কে মানুষকে উদ্ধার করিবে? পুরুষকারকে যখন আশ্রয় করিতে যাই, তখন দৈবের উপরেই আস্থা রাখি—নতুবা পুরুষকার দাঁড়ায় কোথায়? দৈব আমার অদৃষ্ট কল্যাণ, দৈব আমার পুরুষকার; দৈব আমার সাধনবল, দৈব আমার কৃপাসম্বল। দৈবকে যখন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না—তখন পুরুষকারকেও বিশ্বাস করিতে জানি না। মিথ্যাসংস্কার ও অন্ধ অভ্যাসের মোহ ভাঙিয়া দেখি, দৈবের শাসন কি অপূর্ব্ব বিধান। বাহিরের প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলরূপে যে দৈব, সমাজের বিধিবিধানরূপে সেই দৈব, জীবনের সম্পর্কবন্ধনরূপে সেই দৈব। দেশের যুগসঞ্চিত কলঙ্কভার ও অবসাদের মধ্যে যে দৈব, সুপ্তোত্থিত জাতির জীবনপিপাসার মধ্যে সেই দৈব। পরমাণুর উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যে সংহত শক্তিরূপে যে দৈব, জীবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রশান্ত সংযমরূপে সেই দৈব। যে দৈব হতভাগ্যের সহস্রকণ্ঠে বলাইতে থাকে, "মানুষের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, আত্মার কোন স্বাধীনতা নাই," সেই দৈবই ক্ষুধার তাড়নায়, দারিদ্র্যের তাড়নায়, দয়ার তাড়নায়, প্রেমের তাড়নায় মানুষের পুরুষ-কারকে ও দায়িত্ববোধকে অজস্র ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখে।

মিথ্যাদৈবের অন্ধসংস্কারে মানুষ ডুবিয়া আছে, আগে তাহার মোহসংস্কার ভাঙিয়া দেখ, আগে জীবনকে এই অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার কর; তারপর জিজ্ঞাসা করিও, কে তাহার আচ্ছন্ন জীবনকে বন্ধনবিমুক্ত করিবে—বিকৃতদৈবের কবল হইতে কে মানুষের পুরুষকারকে জাগাইয়া তুলিবে?

দৈবের অভয়মূর্ত্তি যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দৈব যাহার মধ্যে আত্মশক্তির সার্থক বিরাটরূপে অনুভূত হইয়াছে, দৈবের জীবন্ত প্রেরণা যাহার পুরুষকারকে জাগ্রতরূপে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারই অন্তর্নিহিত দৈবশক্তি মুক্তির মোহনমন্ত্রে তাঁহার কণ্ঠের বাণী হইতে, তাহার সেবার অক্লান্তি হইতে, তাহার জীবনের পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য হইতে, মুক্তপাবনরূপে অবতীর্ণ হইবে। যুগে যুগে দৈবের আহ্বান বহন করিয়া দৈবের প্রতিনিধি সেই-সব মানুষ আসিয়াছে, সেই-সব মানুষ আসিতেছে, আরও আসিবে, যাহারা দৈবকেই পুরুষকারের সাক্ষী করিয়া, দ্বিধাহীন পরিপূর্ণ সাহসের অভয় বাণী শুনাইয়া বলিবে "দৈবেন দেয়ম্।"

শ্রীসুকুমার রায়।

হঠাতের হুল্লোড়

(বাউলের সুর)

(আমি) পাথার জলে সাঁতার দিতে
পেয়েছি ভেলা!
হঠাৎ! এ যে হঠাৎ!—এ যে—
হঠাতের খেলা।
হঠাৎ এল কাল্-বশেখী—
মৃত্যু-দারুণ, ভুলব সে কি,
(আবার) তেম্নি হঠাৎ টুট্‌ল কি মেঘ
(আলো) ফুট্‌ল গুলেলা!
(আমি) হঠাৎ পেলাম কৃপার কণা, ছিলনা হেতু,
(হেরি) স্বর্গে আর এই মর্ত্তে বাঁধা প্রেমেরি সেতু;
হঠাৎ আমার ফুট্‌ল আঁখি,
উঠ্‌ল গেয়ে অন্ধ পাখী
(কালো) ঘেরাটোপের ঘনঘটায়
আজ্‌কে অবেলা!
(ওগো) হঠাতের ওই অম্‌নি লীলায় দেখেছি আলো
(কত) হঠাৎ চেয়ে চোখ ফেরেনি, বেসেছি ভালো;
হঠাতের এই ভরসা নিয়ে
(আমি) হর্ষে চলি বুক বাজিয়ে
(ওগো) গর্-হিসাবে মাণিক পেয়ে
(আমার) হিসাবে হেলা!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ছন্দ

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কি তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। যা আমরা দেখ্‌চি শুন্‌চি জান্‌চি তার সঙ্গে যখন অনির্ব্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস—অর্থাৎ সে-জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই হচ্চে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—অনির্ব্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হত তাহলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিন্তু রস পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন তার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি; কিন্তু রস-পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন করে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না—কিন্তু তাই বলেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তু জ্ঞানের চেয়ে আরো প্রবলতর গভীরতর। এইজন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন সে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই করে থাকি। তফাৎ এই, বস্তু অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক। পুরুষের যে-পরিচয় হচ্চে তিনি আপিসের বড় বাবু সেটা আপিসের খাতা পত্র দেখ্‌লেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে-পরিচয় তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথের সিঁদুর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ এটার মধ্যে রূপক চাই, অলঙ্কার চাই, কেননা কেবল মাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে বেশি—এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয়, হৃদয়ে। ঐ যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই ত হল একটা কথার ইসারা মাত্র—অথচ আপিসের বড় বাবুকে ত আমাদের কেরাণী নারায়ণ বল্‌বার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্ম্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তাহলেই বোঝা যাচ্চে আপিসের বড় বাবুর মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা নেই—কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না, যে, ঐ বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা লক্ষ্মীকে বুঝি নে—বরঞ্চ উল্টো। কেবল কথা এই, যে, বোঝ্‌বার বেলায় মা লক্ষ্মী যত সহজ, বোঝাবার বেলায় তত নয়।

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেচে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এটুকু বল্‌বার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে—অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে জায়গা দেখা-শোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় করে নিতে হয়। অর্থাৎ আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম্ম হচ্চে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়-ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই ত আলোকের রং বদল হচ্চে, শব্দের সুর বদল হচ্চে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করচে। এমন কি সৃষ্টির বাইরের পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্য-নিকেতনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তু ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয় প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগ-বৈচিত্র্য। যদিদং সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্চে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠ্‌চে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্চে। এইজন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্ত্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেচে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেচে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেইজন্যে কবি ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থাম্‌বে না। "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" কেবলি ঢেউ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভালমানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে, কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েচে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেচে তা সবাই জানেন। দুটি পাখীর মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মার্‌লে তখন বাল্মীকি মনে যে-ব্যথা পেলেন সেই ব্যথা শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে পাখীটা মারা গেল এবং আর যে-একটি পাখী তার জন্যে কাঁদ্‌ল তারা কোন্‌কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণতার ব্যথাটিকে ত কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেইজন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটতে চাইলে। হায়রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্চে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বতকালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বত-কালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই ত ছন্দ।

আমরা ভাষার বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্চে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্ম্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয় ত বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বলতে হল যে, পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেম্‌নি ছন্দকে আশ্রয় করে আপন গতিকে প্রকাশ কর্‌বার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা করে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্চে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়—সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনি-বেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতি-বেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র—তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মত প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়—সেই নাড়ার প্রকার-ভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে-নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ্য দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত-ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দন-বেগেই নিজেকে জানে—বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রস-সাহিত্য মাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই-সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন বলি এইজন্যে, যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুনতে বুনতে নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে সরে যায় চলে যায়, তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম—তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্য্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর দুঃখ কোনখানেই নেই কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে—সে ঘটনা এখন ঘটচে না, বা সে ঘটনা কোনো কালেই ঘটেনি এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।

যাহোক্, দেখা যাচ্ছে, গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোন সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে-একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলচে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সে ত সুরের মত স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্চে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যে-হেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয় এইজন্যে সুরের মত কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান, কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেচি। বলেচি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কি অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্চে বিষয়কে অতিক্রম করা; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্চে অনির্ব্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্যথেকে সেই অনির্ব্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

"রজনী সাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্চে বিষয়টা এইমাত্র, কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠ্‌ল—এমন কি, জর্ম্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধরে এমন দুর্দান্ত প্রতাপে লড়াই করচে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ঐ লড়াইয়ের তথ্যটাকে একদিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের এক্‌জামিন পাস করতে হবে—কিন্তু পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে—এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি। এই কথাটাকেই আরেক ছন্দে লিখ্‌লে বিষয়টা ঠিকই থাক্‌বে কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশী যেটা, তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণ-মেঘে তিমির-ঘন শর্ব্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্ম্মরি'॥

জলদরব-ঝঙ্কারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখ-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি॥

এই ছন্দে হয়ত বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আর-এক জিনিস হল।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্ত্তন করচে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেই-রকম। গাছের বস্তু-পদার্থ তার ডালের মধ্যে গুঁড়ির মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েচে, কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল এ-সমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মত কাব্যে ছন্দের আবর্ত্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড় গতি আর একটি ছোট গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন, প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

"শারদচন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ"

এরই প্রত্যেকটি হল চলন। এমন আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্চে। অর্থাৎ ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেলচে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আসচে। "শারদ চন্দ্র" এই কথাটি ছয় মাত্রার, "শারদ" তিন এবং "চন্দ্র"ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে, এই কারণে "শারদ চন্দ্র" এবং "বিপিন ভরল" ওজনে একই।

১ ২ ৩ ৪
শারদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ,
৫ ৬ ৭ ৮
ফুল্ল মল্লি মালতি যুথি, মত্ত মধুপ ভোরণী।

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর কর্‌চে। কেননা এই আট পদক্ষেপেরি আবর্ত্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্চে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা,

১ ২ ৩ ৪
মহাভার- তের কথা অমৃত স- মান
৫ ৬ ৭ ৮
কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্য- বান।

এও আট পদক্ষেপ।

১ ২ ৩ ৪
(To) night the winds be- gin to rise
৫ ৬ ৭ ৮
(And) roar from yonder dropping day

এই কবিতার প্রদক্ষিণের মাত্রাভাগও আট, আবার

১ ২ ৩ ৪
When we two parted in silence and tears
৫ ৬ ৭ ৮
Half broken- hearted to sever for years

এ কবিতারও তাই। কিন্তু কানে শোন্‌বামাত্রই বোঝা যায় এরা ভিন্ন জাতের ছন্দ।

এই জাত নির্ণয় কর্‌তে হলে চালের দিকে তত টা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সম-চলনের ছন্দ, অসম-চলনের ছন্দ এবং বিষম-চলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসম-মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম-মাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়ন ধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভরে ওঠে,
চরণ বাধে, পরাণ কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই তিনের যোগে বিষম-মাত্রার ছন্দ।

তা হলেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি-ভেদ। আমরা যে দুটি ইংরেজি কবিতা উপরে উদ্ধৃত করেছি- তার মধ্যে একটার চলন সমমাত্রার অর্থাৎ দুই মাত্রার—অন্যটার চলন অসম-মাত্রার অর্থাৎ তিন মাত্রার—তাল দিয়ে গুণে দেখ্‌লেই সেটা ধরা পড়্‌বে। ইংরেজিতে বিষম-মাত্রার ছন্দ আমার চোখে পড়ে নি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েচে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দসংখ্যা বেশি নয়। সমমাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত :—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি।

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে—সেও সমমাত্রার ছন্দ। অসম-মাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়—

১। মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আওল রাইর পাশ।
কি কহব জ্ঞান দাস।

২। জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

৩। সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।

৪। বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥

বিষম মাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েচে—সেও কেবল গানের আরম্ভে—শেষ পর্য্যন্ত টেঁকেনি।

চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

বাংলায় সমমাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সবচেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামত চালাচালি কর্‌তে পারেন।

"পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।"

এর মধ্যে যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।"

ভারি হল না।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।"

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়্‌ল না।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এও বেশ সহ্য হয়।

"সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হল না।

"সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।"

অনুপ্রাসের ভিড় হল বটে কিন্তু এখনো অন্ধকূপ হত্যা হবার মত হয়নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না। তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তাহলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কি না হাঁপ ধরবে—যথা,

দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এই-রকম অসাধারণ শোষণশক্তি তা বল্‌তে পারিনে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন, সেখানে ঠিক উল্টো। যথা—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে,
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
দেবতার অবতার বসুধার তলে।

এও পয়ার; কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হাল্কা হতে হয়। যদি লেখা যায়,

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুক্তনের ছলে,
কংসারির শঙ্খ রব সংসারের তলে—

তাহলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখ, সমমাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি—যেমন—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
হরি রিহ বিহরতি সরস বসন্তে।

ইংরেজিতেও তাই—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
Ah dis- | tinctly | I re- | member |
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
It was | in the | bleak De- | cember |

বাংলা পয়ারের মত এদের গম্ভীর মন্থর চলন নয়। কিন্তু ঐ ইংরেজিতে দুইয়ের চলনের বদলে চারের চলন যেখানে আসে সেখানে কেবল যে মন্থরতা, তা নয়, ছন্দের স্বাধীনতা বাড়ে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(O) Goddess, hear these | tuneless numbers, | wrung
১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(By) sweet enforcement | and remembrance | dear, |

এইখানে বলা আবশ্যক wrung এবং dear শব্দকে দুই মাত্রা বলে গণ্য করেচি, তার কারণ উচ্চারিত syllableএর এক মাত্রার সঙ্গে বিরামের এক মাত্রা যোগ না করলে ছন্দ সম্পূর্ণ হয় না।

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে—

এর লয়টা দুরন্ত। পড়্‌লেই বোঝা যায় এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্ত্তী তিন মাত্রাকে চাচ্চে, কিছুতে তর সচ্চে না। তিনের মাত্রাটা টল্‌টলে—গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ করে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না। দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মত ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়্‌তে গেলেই ধরা পড়্‌বে। যথা—

গিরির গুহায় ঝরিছে নিঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্ব্বত-কন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তাহলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরিগুহাতল বেয়ে ঝরিছে নিঝর

এবং

পর্ব্বত-কন্দর-তলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুইই সমান।

বিষম-মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্চে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

"অহহ কল- য়ামি বল- য়াদি মণি- ভূষণং
হরি- বিরহ- দহন বহ- নেন বহু- দূষণং।"

তিন মাত্রার "অহহ" যে ছাঁদে চল্‌বার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার "কল" তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে—আবার পরক্ষণেই তিন সেই নিজমূর্ত্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত, তাহলে ছন্দই হত না—এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম-মাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক, আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্চে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ক'টি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্চে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে বলে থাকি যে, এটা চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, বা ওটা দশ মাত্রার, তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্ব্বেই বলেচি চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না—চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়। চোদ্দ মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয়, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

বসন্ত পাঠায় দূত রহিয়া রহিয়া,
যে কাল গিয়েছে তারি নিশ্বাস বহিয়া।

এই ত পয়ার—এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দ। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওয়ার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্ব্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দ-মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগ্‌ত না। নিম্নলিখিত চোদ্দ মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি করে পদক্ষেপ:—

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাৎ হল কিসে যাচাই করে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে এর প্রতি পদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতি পদক্ষেপের শেষে একটি করে দেওয়া যেতে পারে—যেমন,

"ফাগুন এল দ্বারে-এ কেহ যে ঘরে না আ-ই।"

কিম্বা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে, যেমন,

"ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আ ই।"

কিম্বা যতি একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপ-মাত্রার পরিবর্ত্তন করে যদি পড়া যায় তাহলে শ্লোকটি চোখে দেখ্‌তে একই রকম থাক্‌বে কিন্তু কানে শুনতে অন্য রকম হবে। এইখানে বলে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা করে তালি দিলে পড়্‌বার সুবিধা হবে এবং এই তালি-অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয় ধরা পড়্‌বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ করে পড়া যাক্—যেমন,

তালি	তালি	তালি	তালি
ফাগুন	এল দ্বারে	কেহ যে	ঘরে নাই
পরাণ	ডাকে কারে	ভাবিয়া	নাহি পাই।

তারপরে পাঁচ দুই ভাগ করা যাক্, যেমন,—

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এই চোদ্দ-মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আরো কত-রকম হতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাক্:—দুই পাঁচ দুই পাঁচ ভাগের ছন্দ—যথা—

সে যে আপন মনে শুধু দিবস গণে
তার চোখের বারি কাঁপে আঁখির কোণে।

এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ করে তাল দেওয়া আবশ্যক। চার তিন চার তিন ভাগ—

নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

কিম্বা এক ছয় এক ছয় ভাগ—

যে কথা নাহি শোনে সে থাক্ নিজমনে
কে বৃথা নিবেদনে রে ফিরে তার সনে।

সাত চার তিনের ভাগ—

চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

তিন তিন তিন তিন দুইয়ের ভাগ—

ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে।

এ'কেই ছয় আটের ভাগে পড়া যায়—

ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে।

পাঁচ চার পাঁচের ভাগ—

নীরবে গেলে ম্লান-মুখে আঁচল টানি,
কাঁদিছে দুখে মোর বুকে না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন ছয় পাঁচ ভাগ করা যায়—

নীরবে গেলে ম্লান-মুখে আঁচল টানি
কাঁদিছে দুখে মোর বুকে না বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে, প্রদক্ষিণের সমষ্টি-মাত্রা চোদ্দ হলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কিভাবে নিকাস করূচে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দ-রসায়নে নয়, বস্তু-রসায়নেও এইরকম উপাদানের মাত্রাভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতি-ভেদ ঘটে, রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা,—

ওহে পান্থ, চল পথে, পথে বন্ধু আছে,
একা বসে ম্লান-মুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

"ওহে পান্থ"—এইখানে একটা থাম্‌বার ষ্টেশন মেলে। তার পরে যথাক্রমে, "ওহে পান্থ চল",—"ওহে পান্থ চল পথে", "ওহে পান্থ চল পথে পথে।" তার পরে "বন্ধু আছে" এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়—যেমন, "বন্ধু আছে একা", "বন্ধু আছে একা বসে", "বন্ধু আছে একা বসে ম্লান মুখে," "বন্ধু আছে একা বসে ম্লান মুখে সে যে।" কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামত থামা চলে না। যেমন, "নিশি দিল ডুব অরুণ-সাগরে।" "নিশি দিল", এখানে থামা যায়—কিন্তু তাহলে তিনের ছন্দ ভেঙে যায়—"নিশি দিল ডুব" পর্য্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পুরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়্‌তে পারে? কিন্তু আবার, "নিশি দিল ডুব অরুণ" এখানেও থামা যায় না, কেননা, তিন এমন একটি মাত্রা, যা আর-একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে' পড়্‌তে চায়—এইজন্য "অরুণসাগর"-এর মাঝখানে থাম্‌তে গেলে রসনা কূল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভাল কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য্য এবং প্রসারতা অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়্‌তে হয়—সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলার চেষ্টা। পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত-রকমে চালানো যায় মেঘনাদবধকাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে' দেখা যাক্। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোট বড় নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থাম্‌তে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্য্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজ্‌ল—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু।" তার পরে তার অকাল-মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মত ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়্‌ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"—তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার কর্‌লে, "কহ হে দেবি অমৃত-ভাষিণি", তার পরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জ্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হ'ল—"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।"

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তি যোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদ-বিভাগটি এমন যে, দুই তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্ত বাহার,
বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার

চক্‌মকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়,
চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিক্‌রায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়।
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এইখানে দুই মাত্রার আয়োজন।

প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্য্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ।

এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি আর সেই জন্যেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা-দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলাকাব্যে চল্‌চে। স্বপ্ন-প্রয়াণে এর প্রথম প্রবর্ত্তন, দেখা গেছে। স্বপ্ন-প্রয়াণ থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই—

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি' রোষে; ঘোর-নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সজ্ঞ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত, এ তা নয়। এর একভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্যভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এই-রকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মত দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে। ইংরেজি কাব্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
(O) Wild West Wind, thou | breath of Autumn's
৫ ৬
being।

এর প্রথম ভাগে চার মাত্রা, দ্বিতীয়ভাগে যতিসমেত ছয় মাত্রা। মিল্টনের

Hail holy light, offspring of Heaven's first-born

এও এই ছন্দে। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য্য সবাই জানেন—

কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার মাত্রা। এমনতর ভাগে কানের কোনো সঙ্কীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্চে তার ধ্বনির দীর্ঘ হ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলচি। বইটির নাম ছন্দঃ-কুসুম। আজ চুয়ান্ন বছর পূর্ব্বের এটি রচনা। লেখক ভুবনমোহন রায় চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রংটারই দূষণীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে যখন কালো কোকিল কালো ভ্রমর কালো পাথর কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকীল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন—

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । ।
দেখহ সুন্দর লৌহর থে চড়ি লৌহ প থে কত লোক চ লে
ষষ্ঠ মু হূর্ত্তক মধ্যে করে গতি যোজন পঞ্চদশের পথে।
লৌহ-বিনির্ম্মিত তার তরে বহুদূর-অবস্থিত লোক সবে
দূর-অবস্থিত বন্ধুসনে সুখচিত্ত পরস্পর বাক্য কহে।

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্য্যের বিচারভার আধুনিক কালের বস্তুতান্ত্রিক উকীল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল—তা ছাড়া লোকশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোল্‌বার অধিকারীও আমি নই। আমি ছন্দের দিক দিয়ে বল্‌চি—এর প্রত্যেক পদভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা—সেই দীর্ঘ-হ্রস্বের ওঠাপড়ার পর্য্যায়ই হচ্চে এই ছন্দের প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নাই কিম্বা নাই বল্লেই হয় এবং যুক্ত ব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোনো গৌরব দেয় না—অযুক্তের সঙ্গে একই বাটখারায় তার ওজন চলে। অতএব মাত্রা-সংখ্যা মিলিয়ে ঐ লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তাহলে তার দশা হয় এই :—

দেখ দেখ মনোহর লোহার গা- ড়িতে চড়ি
লোহা পথে কত শত মানুষ চ- লিছে।
দেখিতে দে- খিতে তারা যোজন যো- জন পথ
অনায়াসে তরে' যায় টিকিট কি- নিয়া।
যে সব মানুষ আছে অনেক দূরের দেশে,
লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে বলিয়া
সুদূর বঁধুর সাথে কত যে মনের সুখে
কথা চালাচালি করে নিমেষে নিমেষে।

বাংলায় আর সবই রইল—মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয়নি—কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্চে—কিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায় নি। এ কেমন, যেমন ঢেউ-খেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েচে। এ হচ্চে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ডক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড-ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই, তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে, কেউবা তার নীচে নামে। ভাল শিক্ষা-প্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়—থার্ড-ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমান ভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্তই হোক্ হসন্তই হোক্ আর যুক্তবর্ণই হোক এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

অথচ প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক, নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউ খেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুতঃ পদে পদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে—সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তাহলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়। প্রাকৃত বাংলার দৃষ্টান্ত—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান্
শিব্ ঠাকুরের্ বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্
এক্ কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক্ কন্যে খান্
এক্ কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্।

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখ্‌বার আছে। এক হচ্চে বিসর্গের ঘট-কালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন—আর এক হচ্ছে "বৃষ্টি" এবং "কন্তে" কথার যুক্ত বর্ণকে যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধ্‌লে পালিস-করা আব্‌লুস কাঠের মত পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান,
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান।

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে, নবদ্বীপে বান,
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রান্ধিছেন, এক কন্যা খান,
এক কন্যা ঊর্দ্ধশ্বাসে পিতৃগৃহে যান।

এইসব যুক্তবর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেচে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয়নি—কেন না যুক্ত বর্ণ যথেচ্ছা ছড়ানো হয়েচে মাত্র, তাদের মর্য্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটর বড়য় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেম্‌নি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

ছন্দঃকুসুম বইটির লেখক প্রাকৃত বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ করে বল্‌চেন—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা, সাধারণ মনোরমা
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা।
দ্বিপাদে শ্লোক সম্পূর্ণ তুল্য সংখ্যার অক্ষরে,
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে।
পঠনে সে সব ছন্দঃ রাখিতে তাল গৌরব
পঠিছে সর্ব্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে।
লঘুকে গুরু সদ্ভাবে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু,
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্চি। কেবল আমি এই বল্‌তে চাই প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতর দুর্ঘটনা ঘটে না, এসব ঘটে সংস্কৃত বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘ-হ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্য্যয় দেখিনে কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায়, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েচে। কিন্তু সাধু সভায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেচে; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয়, তা স্থির হয়নি। এই সঙ্কোচে তার আত্ম-পরিচয়ের খর্ব্বতা হচ্চে। একদিন বাঙালীকে বলা হত বাঙালী কেরাণীগিরি কর্‌তে পারে, বিশুদ্ধ বিশেষত অবিশুদ্ধ ইংরেজি লিখ্‌তে ও বলতে তার বাহাদুরী আছে, কিন্তু সে রাষ্ট্রশাসন কিম্বা যুদ্ধ করতে পারে না। এমন অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা যতদিন বলা হবে, ততদিন আমাদের শক্তির প্রমাণ হবে না। প্রাকৃত বাংলাকেও সেইরকম অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের উপর রাখা হয়েচে, সেইজন্যে তার পূর্ণ পরিচয় হচ্চে না। আমরা একটা কথা ভুলে যাই—প্রাকৃত বাংলার লক্ষ্মীর পেট্‌রায় সংস্কৃত পারসী ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দ সঞ্চয় হচ্চে, সেইজন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি কর্‌তে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজন-বশত সংস্কৃত শব্দই সঙ্গত সেখানে প্রাকৃত বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে—কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ, এই কথা মনে রাখ্‌তে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(সবুজপত্র, চৈত্র।)

ভাট্‌নেরার যুদ্ধ

(ঠাকর্সি চোলাবৎ চারণ)

মহাকালের কণ্ঠ-লগন মুণ্ডমালার হারে
দেখ্‌তে হঠাৎ পেয়ে নারীর তরুণ তাজা মুখ
ঈষৎ যেন ঈর্ষ্যাভরে গৌরী বলেন তাঁরে,—
"তোমার ঘরে, ঠাকুর! আমার কেটেছে চার যুগ;—

যুদ্ধে যুদ্ধে বাজিয়ে শিঙা বেড়াও তুমি, জানি,
কুড়িয়ে আনো বীরের মুণ্ড মণ্ডিত যা' যশে,—
গলায় গেঁথে পর্‌তে, উজল কর্‌তে মালাখানি,
নারীর মুণ্ড আজ সে মালায় কোন্ খেয়ালের বশে?"

"রণস্থলেই গৌরী গো আজ পেয়েছি এই শির,"
কন্ মহাদেব, "গলায় গেঁথে পরার মতন ধন,
দাতা বটে রাও যশোমন্ত্ বীরের বেটা বীর
স্ত্রীর মাথা দান দেছে আমায় আর দেছে আপন।

ভাটনেরাতে চাপ্‌ল যখন যবন ভটের ভার,
লড়্‌তে এল শঙ্কাজয়ী মরণ জেনে স্থির,
ভীষণ যেমন যুদ্ধ তেম্‌নি ভীষণ সজ্জা তার,
পর ঘরণী চুকিয়ে এল কণ্ঠেতে শির স্ত্রীর।

জ্যান্তে যে অর্দ্ধাঙ্গভাগী ছিল গলার হার
মর্‌তে এল মুখখানি তার গলার মালা ক'রে,
একলা সে বীর দেছে আমায় যুগল অলঙ্কার,
বীরের রীতে স্বামী-স্ত্রীতে অমর হ'ল ম'রে।

লড়াই আমি ঢের দেখেছি, এমন দেখি নাই,
নাই তুলনা ভীতি-হরণ এমন পীরিতির।"
গৌরী বলেন, "কথায় তোমার ভয় বাসি গোসাঁই,
অমন ভালবেসে যেন নিয়োনা মোর-শির।"

উচ্চ হেসে বলেন মহেশ, "আমার কণ্ঠহারে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির বীরেরই শির শোভে;
ভীরুর মুণ্ড একটিও নাই, জানে তা' সংসারে।
ওগো ভীরু, তোমার মাথা নেব কিসের লোভে?

ভাটনেরাতে যা' দেখেছি তুলনা তার নাই,
বীরের প্রীতি, বীরের রীতি স্বামীর এবং স্ত্রীর,
অভয়ব্রতী বীর যশোমন্ত্ আর সে যোগী বাঈ।"
সমান উভয়, ঠাকরুসি কয়, সঙ্কটে সুধীর।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উদ্যানলতা

(৩)

শিবেশ্বরের ভবানীপুরের বাড়ীর চারদিক-ঘেরা বাগানে কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলি ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠেছিল। বাগানের উড়ে মালী প্রকাণ্ড একটা বাঁশের আঁকশী দিয়ে ফুল পেড়ে পেড়ে একটা ছোট বেতের সাজিতে রাখ্‌ছিল। বছর সাত-আটের একটি মেয়ে পায়ের মল বাজিয়ে, ডুরে শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে পাশেই একটা আম-গাছের ডালে টাঙানো দোল্‌নায় দোল খাচ্ছিল। দুই হাতে দুটো দড়ি ধরে সে মহা বিপদেই পড়েছিল। হাত ছেড়ে দিলে পড়ে যাবার ভয়, কিন্তু খোলা চুলগুলো ক্রমাগত মুখে এসে পড়াও কম অসুবিধা নয়। সে হঠাৎ একটা নূতন ফন্দি আবিষ্কার করে বলে উঠ্‌ল—"ও মালী, মালী, সাজির দড়িদুটো দাও না ভাই।"

উড়ে মালী বাঁশটা মাটিতে ফেলে পানদোক্তার তেল-চিটে বটুয়াটা হাতে করে লাল দাঁত বের করে হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এসে বল্লে—"দড়ি দিয়ে কি করিবি দিদিমণি?"

দিদিমণি চোখ ঘুরিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "তুমি নিয়েই এস না। আমার এখন তোমার সঙ্গে বক্‌বার সময় নেই।"

মালী অত্যন্ত ভীত অপরাধীর মত মুখ করে দুটো ছোট সরু নারকেল-দড়ি নিয়ে এল। দিদিমণি হুকুম দিলেন, "একটা দড়ি আমার গায়ের চারধারে জড়িয়ে দোল্‌নার সঙ্গে বেঁধে দাও, আর একটা দিয়ে আমার চুল-গুলোতে খুব কসে একটা গিট দিয়ে দাও।"

মালী ত হেসেই অস্থির! "আরে দিদিমণি কি বলে যে, ঠাকুমা আমায় বকুবে যে।"

দিদিমণি প্রবীণ বিচারকের মত গম্ভীর মুখে ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন "আমি বল্‌ছি, কথা শোন। ঠাকুমা বকেন আমায় বকবেন, তোমার তাতে কি?"

মালী অগত্যা বড় দড়িটা দিয়ে ক্ষুদে মনিবটিকে জড়িয়ে বেঁধে, ছোটটা দিয়ে তার দুরন্ত চুলগুলিকে নির্দ্দয় ভাবে পাকিয়ে একটা গিট বেঁধে দিলে। নিজের সাজে দিদিমণি তখন বেজায় খুসী! মালীকে পুরস্কার ঘোষণা করে তিনি বল্লেন, "এইবার ভাই, আমায় দোল দিয়ে দাও, তোমায় আমি এককৌটো কুলচুর খেতে দেবো!"

মালী বোধ হয় পুরস্কারের লোভে অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে মনিবকে এমন দোলা দিলে যে দোল্‌না উল্কার মত ছুটে গাছের মগ্‌ডালে গিয়ে ঠেক্‌লো। আমের মুকুল ধাক্কা খেয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে খুকীর গায়ে মাথায় ঝরে পড়্‌লো, ডাল-পালাগুলো সপ্‌সপ্ করে বেতের মত তাকে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিলে। হঠাৎ অত উপরে উঠে গিয়ে ভয়ে খুকীর মুখ শুকিয়ে গেল, সে একেবারে কেঁদে ফেলে চীৎকার করে উঠ্‌লো "ওরে বাবারে লক্ষ্মীছাড়া মালী আমায় মেরে ফেল্লেরে।"

সত্যিকারের মনিবের কানে চীৎকার পৌঁছবার ভয়ে মালী তাড়াতাড়ি খপ্ করে দোল্‌নাটা ধরে ফেলে খুকীকে কোলে করে নামিয়ে দিলে।

মনিবের কানে কিন্তু তার আগেই কান্না পৌঁছেছিল। বছর পঞ্চাশ কি বাহান্ন বয়সের একটি সুশ্রী বিধবা একটা কাঁসার বাটি হাতে করে ছুটে বেরিয়ে এসে কড়া গলায় ডেকে বল্লেন, "মুক্তো, এই দুপুর রোদে, ফাগুন মাসের দিনে

গরম হাওয়া গায়ে লাগানো হচ্ছে? ভরা রোদ্দুর, মা'গো মা, মেয়ে নয়ত, ধিঙ্গী! নাচ্‌বার আর সময় হ'ল না। শীগ্‌গির ঘরে আয় বলছি। মালী, তুমিও যাহোক ধন্যি লোক বাছা! ও না হয় ছেলেমানুষ, তা বলে তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? এই রোদে গাছের ডালে মেয়েটাকে দোলায় বসিয়ে কি ভয় দেখাচ্ছিলে? আঁৎকে মরে যেত যে?"

মালী তাড়াতাড়ি একটা বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে সরে পড়্‌ল। খুকী মুক্তি গোমড়া-মুখ করে ঠাকুমার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল! তার চুলের দশা দেখে ঠাকুরমা ত থ! "হ্যাঁরে! নিত্যি সাত কোশ দৌড় না করিয়ে ত বুড়ীকে চুলে হাত দিতে দিস্ না, আজ আবার ঝাঁকড়া মাথার একি রূপ বের করা হয়েছে? সাতজন্মে তেল জল পড়্‌তে পায় না, তার উপর আবার নার্‌কেল-দড়ির সিঁথিপাটি মাথায় উঠেছে। রূপ দেখে এখুনি লাটসাহেবের বৌ করে নিয়ে যাবে। খোল শীগ্‌গির দড়াদড়ি; যত কি ছিষ্টি-ছাড়া কাণ্ড! চল্ ঘরে, হাত-মুখগুলোর ছিরি ফিরোতে আমার দিন কেটে যাবে।"

মুক্তির মা কচি মেয়েটিকে শাশুড়ীর কোলে দিয়ে যেদিন সংসার থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন থেকেই মোক্ষদাদেবীকে আবার নূতন করে সংসার পাতাতে হয়েছে, শ্বশুরের ভিটে আঁক্‌ড়ে নারায়ণ শিলার দোরে পড়ে আর দিন কাটানো চল্‌লো না।। ম্লেচ্ছ হলেও পেটের ছেলে। তার মা-মরা মেয়েটাকে কি করে আর প্রাণ ধরে ঐ ঘাঘরাপরা খোট্টানীর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন? ছেলে ত এই বয়সেই সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বসে আছে। যদি বউ ঘরে আন্‌ত, তা হ'লেও বা কথা ছিল, সৎমা হলেও ভদ্রঘরের ঝি বউ কি আর আঁতুড়ের মা-খেকো মেয়েটাকে হেলাফেলা কর্‌ত? যাক্, কপালের লিখন কে আর খণ্ডাবে? অগত্যা মুক্তির ঠাকুরমাই তার মা হয়ে বসেছেন। মুক্তি তাঁকে মা বলেই সচরাচর ডাকে, খেয়াল-মত কখনো কখনো ঠাকুমাও বলে।

আজ প্রসাধন সম্বন্ধে ঠাকুরমার এ রকম সেকেলে মতামত শুনে মুক্তি মনে মনে খুবই হেসে তাঁকে বোঝাতে বস্‌ল। নিজের মাথার উপর থেকে ঠাকুরমার হাতখানা জোর করে সরাতে সরাতে সে বল্লে, "মা, তুমি কিচ্ছু জানো না। ছোট মেয়েরা বুঝি আবার চুলে তেল দিয়ে খোঁপা বাঁধে? তারা খোলা চুল দড়ি দিয়ে আমার মতন করে বাঁধে। তুমি দেখনি? সেই যে পরশু বেলা এসেছিল; তার কেমন সুন্দর লাল দড়ি দিয়ে চুল বাঁধা! তোমরা আমাকে ভাল কিচ্ছু দাও না; তাই ত আমি এইসব দিয়ে বাঁধি।"

ঠাকুরমা বল্লেন, "হ্যাঁগো পাকা বুড়ী, আমি ত কিচ্ছু জানিই না! যা কিছু জান্‌বার সব তুমিই জান। বেলার মত খিষ্টানী হবার সখ হয়েছে এরি মধ্যে? বাপ আয়ো নাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুল্লে হবেই বা না কেন? মেয়েমানুষের আবার জজের আর্দ্দালীর মত লাল ফিতের পাগ্‌ড়ী, থোপ্‌না, কোমরবন্ধ পরা কোন্-দেশী কেতা বাপু আমি ত জানি না। তেল দিয়ে চুলকটা আঁচ্‌ড়ে বেঁধে দেব, তা' না, তার বেলা গলা ফেড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে হাট বসাবে, আর নিজে বসে বসে মাথায় ভৈরবীর জট পাকানো হচ্ছে।"

ঠাকুরমা একটানে মুক্তির মাথার আর কোমরের দড়ি খুলে ফেলে দিলেন। মুক্তি গাল ফুলিয়ে ঘাড়টা গুঁজে ঠাকুরমাকে এক ঠেলা দিয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে বসে গেল।

আদুরে মেয়ের কান্না একবার সুরু হ'লে সহজে থাম্‌বে না। কাজেই ঠাকুরমা প্রমাদ গন্‌লেন। তাড়াতাড়ি তাকে কোলে করে চোখ মুছিয়ে বল্লেন, "ছি দিদি, কাঁদ্‌তে আছে কি? চল, কাপড়-চোপড় পরিয়ে সন্ধ্যে বেলা কার্ত্তিকবাবুর বাড়ী বৌ দেখাতে নিয়ে যাব। তোমার জন্যে কত গয়না এনেছি, বেছে নেবে চল, পুরোণো সিন্দুক খুলে কত শাড়ী বের করেছি। চল্ চল্ লক্ষ্মী মেয়ে, দেরী হয়ে যাবে।"

মুক্তি দুই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে জলভরা চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে চোখের জল শুকোবার আগেই একমুখ হাসি হেসে উঠে দাঁড়ালো!

বাগানের পাঁচিলের পিছন থেকে সানাইয়ের শব্দ আজ সকাল হতে না হতে লোককে কার্ত্তিকবাবুর পুত্রবধূর গৃহ-প্রবেশ ঘোষণা কর্‌ছিলো, পাড়ার ছেলেমেয়েরা কেউ জরির টুপি আর সেলার সুট, কেউবা মস্‌লিনের ফ্রক আর

ঝাঁঝমন, কেউবা উঁচু খোঁপার উপর পালক-দেওয়া গোলাপী টুপি পরে সকাল থেকেই বাজনদারদের কাছে উবু হয়ে বসে আহার নিদ্রা ভুলে তাদের গালগলা-ফোলানো সুর-চর্চ্চা দেখ্‌ছিলো। দুই একটি মেয়ে সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হবার আগেই দিগম্বরমূর্ত্তি মাদুলিপরা একটি ভাই কি বোন কোলে করে সেইখানে ঘোরাঘুরি করছে! বাগানের দোল্‌না আর সাজিভরা রাঙাফুলের লোভে মুক্তি এতক্ষণ সে দিকে কান দেয়নি। কিন্তু ঠাকুরমার ডাকে তার কানেও সানাইয়ের নিমন্ত্রণ মধুর সুরে বেজে উঠ্‌ল, বাধ্য মেয়ের মত মুক্তি হাত মুখ ধুয়ে মোক্ষদাদেবীর ধার-কর্‌া গয়নার বাক্স বাছাই কর্‌তে বসে গেল।

শিবেশ্বর মেয়েকে সেকেলে গহনা-গাটি পরানো মোটেই ভালবাসতেন না। এতটুকু মেয়ে আবার গয়না পরবে কি, তা আবার ওই ভারী ভারী গহনা? এ বিষয়ে কিন্তু মুক্তি ঠাকুরমার দলে ছিল। কাজেই নাতনীর সাজসজ্জার জন্য ঠাকুরমাকে প্রায়ই পরের কাছে গয়না ধার করতে হোতো।

মুক্তি কোলের উপর বাক্সটা তুলে একজোড়া পাইজোর, একটা মস্ত সাতনর হার, একখানা ঝাপ্‌টা, দুটো খুব চওড়া পিন্ চুড়ি প্রভৃতি যত বড় বড় গয়না বেছে নিলে। ছেলেকে লুকিয়ে মোক্ষদা একদিন মুক্তির কান বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন। মুক্তির শান্তপ্রকৃতির গুণে দুদিনেই তার ঘা এমন দগ্‌দগে হয়ে উঠেছিল যে শিবেশ্বরের বাড়ীতে সেদিন মাতাপুত্রের রাগারাগির চোটে কারুর মুখে ভাত ওঠেনি। আজ এই অবসরে মুক্তি অত অপমানের কানবিঁধোনোর ইতিহাস ভুলে একজোড়া ঝুম্‌কো নিতেও ভুল করেনি। সবুজ মক্‌মলের উপর কালো লেস দেওয়া একটা ঢল্‌ঢলে জামা আর হেমনলিনীর বৌভাতের জরির বুটিদার একখানা লাল বেণারসীও একপাশে রাখা হোলো।

এক বোতল মশ্‌লা দেওয়া তেল, গোটা-দুই চিরুণী শাদা কালো নানা রঙের এবং ছোট বড় বাঁকা সোজা নানা গড়নের গোটাকয়েক চুলের কাঁটা, তিনচারটে পেরেক, চিনেমাটির পাখী বসানো তিনটে লোহার শলা আর কয়েকটা চুলের গুছি নিয়ে ঠাকুরমা নাতনীর শ্রী ফেরাতে বস্‌লেন। মুক্তির আজ কিছুতে আপত্তি নেই। সে ইতিমধ্যেই সাতনর গলায় দিয়ে কোলের উপর তার বাবার গোল আরসীখানা নিয়ে নিজের রূপ দেখ্‌তে ব্যস্ত হয়েছিল। ঠাকুরমার টানে মাঝে মাঝে ঘাড়টা পিছন দিকে উল্টে পড়লে মুক্তি দুই হাতে আয়নাটা উঁচু করে ধর্‌ছিলো। নিজের রূপে সে তখন এম্‌নি মুগ্ধ।

মোক্ষদাদেবী মুক্তির ছোট ছোট কোঁক্‌ড়া চুলগুলি অনেক তেলজলে জবজবে করে কোনো-রকমে ভদ্ররকম সোজা করে সমস্ত কপালটা বের করে এবং বোধ হয় গায়ের জোরে আরো খানিকটা বড় করে তুলে গুছি ফিতে প্রভৃতির সহায়তায় আট-দশটা বিনুনি করে নাতনির ছোটখাট মাথার উপর সুদর্শন চক্রের মত একটি প্রকাণ্ড খাড়া খোঁপা রচনা করে তুল্লেন; কাঁটায় পেরেকে তা এমন শক্ত হয়ে উঠ্‌ল যে ঘাড় মাথা ছিঁড়ে পড়লেও সে অটল অচল হয়ে থাক্‌বে। আজ মাস চার পরে মুক্তি ঠাকুরমাকে মনের মত করে চুল বাঁধ্‌বার অবসর দিয়েছে; তবে এই শিল্পসৃষ্টিটি তার মনে মোটেই আনন্দস্রোত বইয়ে দেয়নি; নেহাৎ ঝাপ্‌টা আর ঝুম্‌কোর লোভেই বেচারা চুপ করে ছিল।

চুলবাঁধা সাঙ্গ করে মোক্ষদা নেত্য ঝিকে ডাক দিলেন। ঝি হাত দোলাতে দোলাতে এসেই বল্লে, "ওমা দিদিমণি! মস্ত বড় খোঁপা বেঁধেছ যে! দেখদিখি মুখখানি আজ কেমন সেজেছে; জটেবুড়ী হয়ে থাক্‌লে ভাল দেখাবে কেন?'

ঠাকুরমা ঝিকে তাড়া দিয়ে বল্লেন, "যা, যা, মুক্তোর মুখ ঘাড় গলা ভাল করে গামছা দিয়ে ঘসে মুছে নিয়ে আয়, এখন মেলা বাজে বকিস্‌নে।"

ঝির সঙ্গে মুক্তি চলে গেল। ঠাকুরমা বসে বসে চিরুণী পরিষ্কার কর্‌ছেন, এমন সময় পাশের ঘর থেকে শিবেশ্বর এসে দাঁড়ালেন।

"কি, মা, কি কর্‌ছ? মুক্তির জন্যে এইবার একজন মাষ্টার রাখ্‌তে হবে ভাব্‌ছি। বড় হয়ে উঠ্‌ছে কি না!"

মোক্ষদা ছেলের কেবল শেষ কথায় সায় দিয়ে বল্লেন, "হ্যাঁ বড় ত হয়ে উঠ্‌ছেই, এখন থেকেই সব ভেবে চিন্তে দেখা শোনার সময়। মাষ্টার রাখ্‌তে চাও রাখ, আমরা ত ওসব বড় বুঝি না। যা জানি তার ভাবনাই আগে ভাব্‌ছি। দ্যাখ্, তোকে যে গেল বছর সেই নিধু ভট্‌চায্যির মেয়ের কথা বলেছিলাম না,—সেই মেয়েটি বেশ ডাগর

হয়ে উঠেছে, বোধ হয় তের পেরিয়ে চোদ্দয় পা দেবে এই মাসেই—তাকে কার্ত্তিকবাবু বিষ্টুচরণের সঙ্গে বে-দিয়ে এনেছে। আহা বেশ মেয়েটি! কপালে থাক্‌লে ত অমন বউ হবে? কিছুতে তখন যদি ছেলে আমার কথা শুনূলে। কেন বাপু, দেখ্‌লে ত! বিষ্টু কিছু তোমার চেয়ে ছোট নয়,—তুই যখন পেটে বিষ্টু তখন ছয়ে পা দিয়ে পাঠশালে পড়্‌তে গেল; সে বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে, চারচারটে ছেলের বাপ হয়ে, ঐ মেয়েকেই ত! আর তোমার সব তাতে এক কথা—মেয়ের বাপ হয়ে একটা নাকেকাঁদা খুকী বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না। কোথায় নাকে কাঁদ্‌ছে দেখ্‌বি চল্‌ ত! কাল থেকে যদি সংসারটা মাথায় করে না বেড়ায় ত আমি বামুনের মেয়ে নই।"

শিবেশ্বর হঠাৎ এত কথার বন্যার মাঝে পড়ে একটু থতমত খেয়ে বল্লেন, "এত কথা শোনাচ্ছ কেন মিথ্যে? এখন আমি কর্‌তে চাইলেই ত আর সে-বউ পাবে না!"

মা তাড়াতাড়ি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, "কর্‌বি? তা হলে বল্‌! আমি ওর চেয়ে সাতগুণ সুন্দর, দিব্যি মস্ত ডাগর মেয়ে কালই এনে দেব, বিষ্টুর বউ তার কাছে লাগ্‌বেও না। ওর জন্যে আবার কিসের দুঃখ!"

শিবেশ্বর তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে বল্লেন, "না, না, তা' বল্‌ছি না, আমার বিশেষ দুঃখ উথ্‌লে ওঠেনি। আমি বিয়েটিয়ে কিছু কর্‌ব না। তুমি মুক্তির কথা কি বল্‌বে বল্‌ছিলে, তাই বলো।"

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "কেন মিথ্যে বুড়ো মাকে মিছে আশা দেওয়া! আমি কি আর জানি না, তুমি আমার তেমন ছেলেই নও যে আমার কথায় ঘরে বউ এনে দেবে।"

ছেলে মহা মুস্কিলে পড়ে কথা বদ্‌লাবার জন্যে বল্লেন, "আহা, মুক্তির কি হয়েছে তাই বল না!"

মা ঝঙ্কার দিয়ে বল্লেন, "কি আবার হবে? হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু।" তারপরেই একটু স্বর নামিয়ে বল্লেন, "আজ বিষ্টুর বৌভাত শুনেছিস্‌ ত? এ বেলাও লোকজন খাবে। ভাল করে এবার খাওয়ান-দাওয়ান কর্‌ছে। বিষ্টুর বড় ছেলে, দুধের ছেলে বল্লেই হয়, এই সবে পনের বচ্ছর বয়েস; এরি মধ্যে ইস্কুলের কত পাস দিয়েছে, মাসখানেক আগে নতুন কেলাশে উঠেছে। দু-বছর পরেই একটা বড় পাশ দেবে; তাইতেই ত আরো এত ঘটাপটা। ছেলেটি দেখ্‌তেও বেশ খাসা। তাই বল্‌ছিলাম, মুক্তোকে নিয়ে আজ সন্ধ্যে বেলা ওদের ওখানে যাব, যদিই তাদের সুনজরে পড়ে যায়; অমন ভাল ছেলেটা হাতছাড়া হয় কেন? নাত্‌নী আমার দেখ্‌তে ত কিছু মন্দ নয়, তায় বাপের এক মেয়ে, চোখে যদি একবার ওদের লাগে ত কোন ভাব্‌না থাক্‌বে না!"

শিবেশ্বর মহা বিরক্ত হয়ে হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "না না মা, তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে ওসব কার্ত্তিক গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণুর দরজায় যাচাই করে বেড়াতে পাবে না। সে আমি কিছুতেই দেব না। পনের বছরের ছেলে দু-বছর পরে এণ্ট্রান্স দিয়ে মাথা কিনে নেবে আর কি! আমার মেয়ের পায়ে অমন ঢের ঢের ছেলে গড়াগড়ি যাবে। এখন ছেলেমানুষ ওকে নিয়ে ওসব কিছু কর্‌তে হবে না। তা হলে মাথাটি একেবারে খাওয়া হবে; পড়াশুনো কিচ্ছু হবে না।"

মা বল্লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার মেয়ে আট বচ্ছর পেরতে বসেছে এখন লেখাপড়া কর্‌তে বসুক, কাজের কথা ধামা-চাপা থাক; তারপর বুড়ো বয়সে মেম করে বিয়ের ভাব্‌না ভাব্‌তে বোসো। তখন বামুনের বাড়ীর কেউ ছোঁবেও না অমন মেয়ে।"

শিবেশ্বর গর্ব্বিত স্বরে বল্লেন, "না ছুঁলে ত বয়েই গেল। আমি বামুনের ঘরে মেয়ে দিলে ত তারা ছুঁতে আস্‌বে।"

মোক্ষদা মহাভীত হয়ে বল্লেন, "ও মা গো, একি সর্ব্বনেশে কথা!"

এমন সময় নেত্য ঝির তদ্বারকে সজ্জিতা মুক্তি একগা গয়না আর হরেক রঙের পোসাক পরে ঝুম্‌ ঝুম্‌ কর্‌তে কর্‌তে ঘরে এসে ঢুক্‌ল। তার গায়ের প্রত্যেকটি জিনিষই মুক্তির মত আর-একজনের শরীর জোড়া দিয়ে পর্‌লে তবে জুতসই হয়েছে বলা চলে। মেয়ের ঢালের মত উঁচু খোঁপা আর অমন চোখজুড়োনো সাজ দেখে শিবেশ্বর লাফ দিয়ে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চেঁচিয়ে বল্লেন, "একি করেছ মা? ছি, ছি, ছি, মেয়ের যেমন রূপ

বেরোচ্ছে, তেমনি শিক্ষা হচ্ছে। এর চেয়ে বুধিয়া আয়ার হাতে মানুষ হওয়াও যে ওর ছিল ভাল। বাবা রে, যা বাঁধন বেঁধেছে, মেয়ের চুলকটা যদি এখনি উপ্‌ড়ে না আসে ত ঢের!"

মা কাঁদ-কাঁদ সুরে বল্লেন, "তা ত জানিই অনেক দিন। আমার চেয়ে তোমার হাড়ি চামার খোট্টা সবি ভাল। আমার কি না নাড়ীর টান, তাই ভিটে মাটি ছেড়ে এসে এখানে পড়ে আছি। আমি না হয় আজই বাড়ী যাচ্ছি, তুমি তোমার ঘাঘ্‌রা-পরা মেম ঝি নিয়ে এস-গে!"

শিবেশ্বর দেখ্‌লেন মহা বিপদ! অগত্যা একটু নরম হয়ে বল্লেন, "রাগের মাথায় যা বলেছি, তাই কি সত্যি হয়ে গেল! তুমি না হলে সাতদিনের মেয়ে আর কে মানুষ কর্‌তে আস্‌ত বল ত মা? তবে সত্যি বল্‌ছি মা, বাড়ী বসে আদর গিল্‌লে আর ওই কার্ত্তিক গণেশদের প্যাল্লায় পড়্‌লে ওর কিছু হবে না। মাষ্টার রেখেও হবে না। আমি ওকে ইস্কুলে দিয়ে আস্‌ব। কাল সোমবার আছে, কালই দেব।"

এমন নির্ব্বাসনের কথা শুনে মুক্তি তৎক্ষণাৎ গয়না পোষাক শুদ্ধ ঠাকুরমার কোলের কাছে মাটিতে আছ্‌ড়ে পড়ে কাঁদ্‌তে লাগিয়ে দিলে। তার কান্না আর থামেই না; ক্রমাগতই একসুর টেনে চলেছে, "ওগো মা গো, আমি ইস্কুলে যাব না। আমি কিছুতেই যাব না; আমি তোমার কাছে থাক্‌ব।"

মুক্তি এমন কান্না জুড়ে দিলে যে চোখের জলে জামা কাপড়ে দাগ ধরে গেল। ঠাকুরমা বল্লেন, "কি কর্‌ব বাছা; আমার কাছে থাক্‌লে তোমার শিক্ষে দীক্ষে হবে না। তোমার বাপ বিবিয়ানা চাল শেখাবে, আমি বুড়ো মানুষ তার কি জানি।" মোক্ষদা মুক্তিকে কোলে তুলে নিলেন। তার গয়না-গাঁটি খুলে পড়ে গেল। মুক্তি শোকে এম্‌নি কাতর হয়েছিল যে সেদিকে একবার চেয়েও দেখ্‌লে না। সে ঠাকুরমার কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

শিবেশ্বরের চোখেও জল আস্‌ছিল। আহা এতটুকু মেয়ে! ঠাকুরমাই সম্বল, কি করে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন! কিন্তু এটাও তিনি ঠিক বুঝেছিলেন যে ঠাকুরমার আদর্শে আর তাঁর আদরে আর বেশীদিন মানুষ হলে মেয়েকে মনের মত গড়ে তোলা শক্ত হবে। তাই মুক্তি তাঁর যতই আদরের হোক না কেন, তাকে আর বাড়ীতে রাখা চল্‌বে না।

শিবেশ্বর গম্ভীর মুখে বাইরে গিয়ে কেষ্টো বেহারাকে ডাক্‌লেন, "বেয়ারা, শীগ্‌গির একখানা ফাষ্টক্লাশ গাড়ী ডেকে আন, আমি মার্কেটে যাব। আজও ত বাড়ীর গাড়ী মেরামত হল না। কাল মিস বাবাকে নিয়ে ইস্কুলে যেতে হবে; মিস্ত্রীখানায় একবার তাগিদ দিয়ে এস।"

মুক্তিকে কোলে করে মোক্ষদা সব শুন্‌লেন; তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে মুক্তির মাথায় পড়্‌তে লাগ্‌ল। নাত্‌নীর অকল্যাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দিলেন। কিন্তু সেই সাতদিনের আঁতুড়ের কচি মেয়েকে যে আজ ৭৷৮ বছর পরে এমন এক কথায় তাঁর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, এ কথাটা তিনি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছিলেন না। স্বামী মারা যাবার পর একদিন সব ছেড়ে পাথর হয়ে পাথরের ঠাকুরকে সম্বল করেছিলেন; কিন্তু আজ আবার এই যে শিশু-দেবতার পূজায় সমস্ত মন জড়িয়ে ফেলেছিলেন, তার জাল থেকে তিনি কি করে নিজেকে ছাড়াবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

মুক্তি রাগে গয়না কাপড় চুলের কাঁটা ক্লিপ ফিতে সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে কেঁদে কেঁদে ঠাকুরমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাশের বাড়ীর বাজ্‌না ক্রমে জাঁকিয়ে উঠ্‌ছিল। লোকজনের কলরব এ বাড়ীতেও এসে পৌঁচচ্ছিল। কিন্তু এ বাড়ীর লোকের সে আনন্দধ্বনির দিকে কান দেবার অবসর ছিল না। বিষ্ণুর ছেলের রূপগুণ, তার নূতন বৌএর প্রশংসা তখন মোক্ষদার মনে আর ঢোক্‌বার পথ পাচ্ছিল না। তিনি ভাব্‌ছিলেন, তাঁর মুক্তোর নির্ব্বাসনের কথা। আহা মা-ছোড় মেয়েটা! কোন্ খিষ্টানীর হাতে পড়ে কেঁদেই মরে যাবে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুক্তি তখন স্বপ্নে দেখ্‌ছিল, বাবা তার গয়না কাপড় কেড়ে নিচ্ছেন আর সে ছুটে ঠাকুরমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছে।

শিবেশ্বর ততক্ষণ নিউ মার্কেটের অসংখ্য-আলো-জ্বালা

দোকানে দোকানে মুটে সঙ্গে করে ঘুরছিলেন। প্রতি দোকান থেকে পাঁচ-সাতজন সমস্বরে হাঁক দিচ্ছিল, "এদিকে বাবু, এই যে খুব ভাল এসেন্স", "আসুন না মশায় এষ্টকিং মোজা কি চাই", "ভাল ভাল সার্টের কাপড় আছে, এই সামনের দোকান, দেখেই যান না একবার।"

শিবেশ্বরের মনটা আজ খারাপ ছিল। অন্য দিন হলে হাঁকাহাকির চোটে হয়ত অনেক দোকানেই ঢুকতেন, আজ কিন্তু তাদের উচ্ছ্বসিত আহ্বানে কিছুমাত্র সাড়া না দিয়ে তিনি নিজের পরিচিত দোকানের দিকে চলে গেলেন। পিছন থেকে নিরাশ দোকানীরা বিদ্রূপ-পূর্ণ হাসি হেসে বল্লে, "হ্যাঁ ভারি ত সাহেব, তিনপয়সার! চিংড়ি মাছের কাটলেট খায়, কিনবে কি দিয়ে জিনিষ।"

শিবেশ্বর পাতলা বালীর কাগজে মোড়া অসংখ্য মোড়কে সাহেববাড়ীর ফ্রক, লেসের মোজা, ফুলকাটা রুমাল, রঙীন রেশমী ফিতে, গোলাপী পাউডার, উঁচু হিলের বুট, নীচু হিলের স্লিপার, পিনাফোর, স্কুলব্যাগ, বিস্কুট, চোকোলেট প্রভৃতি সাতবছরের ক্ষুদ্র মহিলার উপযোগী আরও অনেক জিনিষে ঝাঁকামুটের মাথা বোঝাই করে গাড়ীতে এসে উঠলেন! গাড়ীর মধ্যে সমস্তক্ষণ তাঁর কানে মুক্তির কান্না বাজছিল। তিনিই বা মুক্তিকে ছেড়ে থাকবেন কি করে? বন্ধনহীন মাতা পুত্র দুজনকেই ত ওই একটি শিশু দুই হাতে বেঁধে রেখেছে। সেই যদি চলে যায়, তবে কি নিয়ে তাঁদের দিন কাটবে? কিন্তু কর্ত্তব্য!

শিবেশ্বর বাড়ী এসে মায়ের ঘরে ঢুকে দেখলেন, মুক্তিকে কোলে করে মা খাটে শুয়ে আছেন। আজ এখনও এ বেলার রান্না চড়েনি, বামুন-ঠাকুর দরজার কাছে কখন থেকে মুখ বুজে ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারছে না। ছেলে ঘরে ঢুকতেই বুকের কাছে জড়ানো মুক্তিকে বালিশের উপর মাথা দিয়ে শুইয়ে রেখে মোক্ষদাদেবী উঠে বসলেন। শিবেশ্বর বল্লেন, "মা, মুক্তির জন্যে সব জিনিষপত্র কিনে আনলাম; কাল ইস্কুলে নিয়ে যাব। আবার শুক্রবার দিনেই নিয়ে আসব, তুমি ভেব না।"

মোক্ষদাদেবী কিছু বল্লেন না। যার মেয়ে সে নিজের ইচ্ছামত যা খুসী করুক না, তিনি বলবার কইবার কে? ভাববার জন্যেই বা তাঁর এত কি গরজ পড়ে গিয়েছে। শিবেশ্বরও মায়ের গম্ভীর মুখ দেখে আর কিছু না বলে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বাড়ীর তিনটি মানুষই সারারাত বিচ্ছেদের স্বপ্ন দেখে থেকে থেকে চমকে উঠছিল। পাশের বাড়ীর মিলনের আনন্দ-কোলাহল তাদের দুঃস্বপ্নের একটানা স্রোতের মাঝে মাঝে একটু সুখের চমক দিয়ে যাচ্ছিল।

(৪)

ভোরের আলো জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকবার আগেই শিবেশ্বরের ঘুম ভেঙে গেল। কর্ত্তব্যের দায়টা তাঁর বুকে এমন পাথরের মত চেপে ছিল, যে, তিনি কিছুতেই নিজের মনকে ধমক দিয়েও ঠিক সেই পথে আনতে পারছিলেন না। তাঁর চোখের সামনে কেবলি হেমনলিনীর মৃত্যুর দিনটা ভেসে উঠতে লাগল। সাতদিনের কচিমেয়ে মুক্তি সেদিন তাঁর অশ্রুউৎসের মুখে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল। আজ তিনি সেই মেয়েকে বাড়ী থেকে বিদায় করে দিচ্ছেন, তাই সেই অনেক দিনের সঞ্চিত চোখের জল আজ কেবলি ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে পড়ছে। আজ হেম থাকলে কে তার মেয়েকে সরাতে পারত?

মোক্ষদাদেবী আর মুক্তিরও ঘুমটা খুব ভোরেই ভেঙেছিল। মোক্ষদার মনে একটা দুর্জ্জয় অভিমান এসে তাঁর দুঃখের ভাগিদার হয়ে বসেছিল; তিনি তাই সকাল থেকেই ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন, এমন কি মুক্তির প্রাতরাশ বড় একবাটি দুধ, সেটাও আজ নিজে তাকে খাওয়ান নি; সে কাজটা ঠাকুরকেই করতে আদেশ দিয়েছেন। দুধ খাওয়াটা মুক্তির পক্ষে চুল বাঁধারই মত ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। সে পারতপক্ষে সকালে ঠাকুরমার সামনে আসতে চাইত না; জানত যে একবার তাঁর হাতে পড়লে হরেক রকমের বকুনি, অনুযোগ, আর রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে ঐ আধসেরখানিক দুধও কখন তার অজ্ঞাতে পেটের মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে!

কিন্তু ঠাকুরমার এই অসহ্য অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে আজ মুক্তির যে খুব একটা আনন্দ

হয়েছে তা তার ব্যবহারে মোটেই প্রকাশ পেলে না। ঠাকুরমা আজ না ডেকেই কখন খাট ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মুক্তি জেগে-জেগেই অনেকক্ষণ খাটে শুয়ে ছিল। মা যখন তাকে ডাক্‌তে আস্‌বেন তখন সে খুব কষে চোখ বুজে থাক্‌বে, হাজার ডাকেও সাড়া দেবে না, কখনো দেবে না। কিন্তু ঘর রোদে ভরে গেল; তবুও ত কৈ এলেন না? মোতি ঝি একবার বিছানা তোল্‌বার জন্যে তাকে উঠ্‌তে বলেছিল; তাকে একটা বালিশ ছুড়ে মেরে, মুক্তি পাশবালিশটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইল।

এমন সময় দুধের বাটি হাতে ঠাকুর এসে ঘরে ঢুক্‌ল। এই আর যায় কোথায়! দুধের বাটি এক নিমেষে ঠং ঠং শব্দ করে, মেঝেয় দুধ-সাগরের ঢেউ তুলে গড়িয়ে পড়ল, ঠাকুর ঘর ছেড়ে প্রস্থান কর্‌ল এবং মুক্তি উঠে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিলে। কাল সন্ধ্যের সময় থেকে তার ছোট বুকটি দুঃখে আর অভিমানে বোঝাই হয়ে ছিল, একটা ছিদ্র পেয়েই সব একসঙ্গে বেরিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু জগতে সব ব্যাপারেই দেখা যায় কারুর বা সর্ব্বনাশ কারু বা পৌষমাস। মুক্তির এত দুঃখে তার পোষা মেনী বেরালটা পরম আনন্দিত চিত্তে লেজ ফুলিয়ে ছুটে এসে দুধ খেতে আরম্ভ কর্‌ল।

বাটি আছ্‌ড়ানোর শব্দ আর তার পরেই ঠাকুরের নালিশ, দুটোর একটাও মোক্ষদাদেবীকে বিচলিত কর্‌তে পার্‌ল না। তিনি গম্ভীর মুখে যেমন তেঁতুল কাট্‌ছিলেন তেমনিই কেটে চল্লেন। মোতি ঝি একবার একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে বল্‌লে, "তা হ্যাঁ মা, খুকী দিদিমণির জন্যে কি তা হলে জলখাবার কিনে আন্‌ব?"

গৃহিণী উত্তর দিলেন, "বাবুকে জিগ্‌গেষ কর।"

এসব ব্যাপারে বাবুর দর্‌বারে হাজির হওয়াটা মোতির কাছে এমন প্রচণ্ড রকমের নূতনত্ব বলে মনে হল যে সে নীরবে সেখান থেকে প্রস্থান কর্‌ল।

কিন্তু মুক্তির দুঃখটা একেবারেই মাঠে মারা গেল না। শিবেশ্বর বোধ হয় এইদিকেই আস্‌ছিলেন, বাটি ফেলা এবং মেয়ের কান্নার শব্দ তাঁকে আরও শীঘ্র শোবার ঘরে এনে হাজির কর্‌ল। মুক্তির কান্না তখনও থামেনি। শিবেশ্বর ঘরে ঢুকে তাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "আমার ছোট্ট মায়ের সকাল বেলাই কি হল?"

এ কথার ত উত্তর দেওয়া বেজায় কঠিন; অন্ততঃ মুক্তির পক্ষে। সে বাবার কাঁধে মুখ গুঁজে চুপ করে রইল। সে কিছু না বলাতেই বোধ হয় শিবেশ্বর ব্যাপারটা ভাল করে বুঝ্‌লেন। তাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "চল ত দেখ্‌বে, তোমার জন্যে কাল কত জিনিষ কিনে এনেছি।" মুক্তির মাথাটা এইবার উঠ্‌ল।

শিবেশ্বরের ঘরে কাল্‌কের কেনা জিনিষগুলো তখনও কাগজের বাক্‌সে বন্দী হয়ে রয়েছে। তাদের ক্ষুদে অধিকারিণী ঘরে ঢুকেই অতিরিক্ত উৎসাহে বাক্‌সের বাঁধন দড়ি কেটে, পাত্‌লা কাগজের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে, সব টেনে বাইরে এনে ফেল্‌লেন। ওরে বাস্‌রে, একি অনন্ত ঐশ্বর্য্য! মুক্তির শোক দুঃখ যে কোন্ মুল্লুকে উড়ে গেল তার ঠিক নেই। কেমন সব চক্‌চকে রঙের জামা, কেমন সুন্দর ছোট ছোট জুতো! সব চেয়ে চমৎকার চুল বাঁধ্‌বার দড়িটা; বেলার দড়ির চেয়েও চওড়া আর চক্‌চকে! সে তৎক্ষণাৎ সেটা পাগড়ীর আকারে মাথার চারদিকে জড়িয়ে নিল। শিবেশ্বর ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সেটা খুলে নিয়ে বল্‌লেন "অমন করে বাঁধ্‌তে হয়না মণি, আগে মাথার চুলে সাবান দিয়ে স্নান করে এস, তারপর বেঁধো। তা না হলে এখুনি তেল লেগে খারাপ হয়ে যাবে।"

মুক্তি তখুনি স্নান করতে রাজি; সাজসজ্জার দেরী হয়, এ তার মোটেই ইচ্ছে নয়। শিবেশ্বরের বেয়ারা বাড়ীর ভিতর থেকে নেত্য ঝিকে ডেকে নিয়ে এল। মুক্তি একমুখ চকোলেট আর লজঞ্চুস নিয়ে তার সঙ্গে স্নান কর্‌তে চল্‌ল। ঠাকুরমা তাকে নাই বা নাইয়ে দিলেন, বয়ে গেল; সে এখন থেকে নিজেই নাইবে। নিজের নূতন জামাগুলো এমন লুকিয়ে রাখ্‌বে যে তিনি একটাও দেখ্‌তে পাবেন না।

মুক্তি স্নান করে এসে দেখ্‌লে যে তার বাবা সেই ঘরময় ছড়ানো জিনিষগুলোর মাঝখানে গম্ভীর মুখে চুপ

করে বসে আছেন; আর বেয়ারাটা সেই সুন্দর জামা-কাপড়গুলো পাট করে একটা মস্ত বড় বাক্‌সের মধ্যে ভরছে। গাড়ী-বারাণ্ডায় বাড়ীর গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে; সেটা আজই মেরামত হয়ে এসেছে।

চঞ্চল পবনের মত মুক্তি ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "হ্যাঁ বাবা, আমরা গাড়ী করে কোথায় যাব? মাকে কিন্তু নিয়ে যাব না, মা দুষ্টু।"

শিবেশ্বর বল্‌লেন, "আজ তোমায় ইস্কুলে নিয়ে যাব খুকী।"

আবার সেই ইস্কুল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার রাঙা ঠোঁট অভিমানে ফুলে উঠ্‌ল, চোখ দিয়ে জল বেরোয় আর কি? শিবেশ্বর তাড়াতাড়ি তাকে কাছে টেনে এনে বল্‌লেন, "ছিঃ লক্ষ্মী মা আমার, কাঁদ্‌তে নেই। ইস্কুলে গিয়ে কত পড়্‌তে শিখ্‌বে। দেখ্‌লে ত, বেলা সেদিন কত ইংরিজী বই পড়্‌লে, তুমি পার্‌লে না। এবার তুমি ইস্কুলে গিয়ে তার চেয়েও ভাল পড়্‌তে শিখ্‌বে। আমি তোমায় রোজ দেখ্‌তে যাব; প্রতি শুক্রবারে তোমাকে বাড়ী নিয়ে আস্‌ব। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাক্‌লে, তোমাকে কত পুতুল আর খেলনা কিনে দেব তার ঠিক নেই।"

এতবড় লোভ দেখালে কাজেই সান্ত্বনা লাভ কর্‌তে হয়। মুক্তি গম্ভীর মুখে বেয়ারাকে বাক্‌স গোছানো সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বস্‌ল।

বেলা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। বাবার কথামত মুক্তি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলে। তারপর তার সাজসজ্জা আরম্ভ হল। এইবারেই কিন্তু বিপদ বাধ্‌ল। মেয়ে এবং বাপে মিলে অবশেষে যে ব্যাপারটা করে তুল্‌লেন তাতে খুব একটা কলানৈপুণ্য প্রকাশ পেলে না। মুক্তি কিন্তু নিজের ঝাঁকড়া চুলে লাল ফিতে বাঁধার আনন্দে কাল্‌কের বাধাপ্রাপ্ত সাজের দুঃখও ভুলে গেল।

যাবার সময় হয়ে এল। বাক্‌স বিছানা প্রভৃতি গাড়ীর মাথায় উঠ্‌ল। শিবেশ্বর বল্‌লেন "চল খুকী, ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে আস্‌বে।"

দুজনে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন মোক্ষদা দেবী তখনও সেই একই কাজে ব্যস্ত। মুক্তি ছুটে গিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়ে বলে উঠ্‌ল "মা, আমি ইস্কুলে বেড়াতে যাচ্ছি।"

ঠাকুরমা তাড়াতাড়ি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "সকাল বেলাই জুতো মোজা নিয়ে ঘাড়ে এসে না পড়্‌লে বুঝি চল্‌ল না?"

শিবেশ্বরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল; তিনি তাড়াতাড়ি মেয়ের হাত ধরে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন। তাঁরা বেরিয়ে যেতেই ঠাকুরমা কাজকর্ম্ম ফেলে নিজের শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে মেঝের উপর শুয়ে পড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মুক্তিদের গাড়ী ফটক থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। গাড়ী চলেইছে; মুক্তি পাঁচ মিনিট অন্তর কেবলি বাবাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌ল "হ্যাঁ বাবা, ইস্কুলের বাড়ী আর কতদূরে?"

শিবেশ্বর কেবলি উত্তর দিতে লাগ্‌লেন "এই যে মা, এসে পৌঁছলাম বলে।"

শেষে যখন মুক্তি ঢুল্‌তে আরম্ভ করেছে, তখন হঠাৎ গাড়ীটা একটা মস্ত মস্ত থামওয়ালা বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। শিবেশ্বর মুক্তিকে নামিয়ে নিলেন। একটা দারোয়ান তাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। মুক্তি একটু অবাক হয়ে বল্‌লে, "কৈ বাবা, এখানে আর একটাও মেয়ে নেই?"

তার বাবা এবিষয়ে কিছু বল্‌বার আগেই ঘরের পর্দা তুলে একজন মহিলা এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। তাঁর চেহারার বহর আর চশমা-পরা গম্ভীর মুখ দেখেই ত ভয়ে মুক্তির প্রাণ উড়ে গেল। তিনি তার বাবাকে নমস্কার করে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লেন। শিবেশ্বরের সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হল। মুক্তি হাঁ করে তাঁদের দিকে চেয়ে রইল, এ কোন্ দেশী কথা, এর একটাও যে বুঝ্‌তে পারে না!

হঠাৎ সেই মহিলাটি মুক্তির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "খুকী, তোমার নাম কি?"

মুক্তি বাবার খুব কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে "মুক্তি।"

ঘরের সবাই উঠে দাঁড়াল, শিবেশ্বর বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুক্তিও তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাঁর হাত চেপে ধরে বল্‌লে "বাবা, বাড়ী চল।"

শিবেশ্বর বল্‌লেন "এখন ত মা, তুমি বাড়ী যাবে না, এইখানেই থাক্‌বে। আবার চার পাঁচ দিন পরে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব। এখন আমি তবে যাই, এখানে অনেক মেয়ে আছে তুমি তাদের সঙ্গে খেলা কর।"

শিবেশ্বর গাড়ীর দিকে এগোলেন, শিক্ষয়িত্রীও তখুনি মুক্তির হাত ধরে নিজের দিকে টেনে নিলেন। তাকে যে এখানেই থাক্‌তে হবে তা বোধহয় মুক্তি এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারেনি, কিন্তু তার বাবাকে গাড়ীতে উঠ্‌তে দেখেই সে একেবারে চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল "ওরে বাবারে, আমি এখানে থাক্‌ব না, আমি বাবার সঙ্গে যাব।"

শিবেশ্বর মুখ বার করে কোচম্যান্‌কে আদেশ কর্‌লেন "এই জল্‌দি হাঁকাও", তাঁর চোক দিয়ে তখন টপ্‌ টপ্‌ করে জল গড়াচ্ছিল। কোচম্যান ঘোড়াকে খুব জোরে চাবুক লাগিয়ে এক নিমেষের মধ্যে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মুক্তি তখনও কাঁদ্‌ছে। এর মধ্যে কখন্‌ যে একটা মস্ত ঘণ্টা বেজে উঠেছে তা সে খেয়ালই করে নি। হঠাৎ সে দেখ্‌তে পেলে দলে দলে বড় মাঝারি ছোট নানা-রকম মেয়ে পিল্‌পিল্‌ করে বেরিয়ে আস্‌ছে। কেউ বা শাড়ী-পরা, কেউ বা ঘাঘ্‌রা-পরা। অনেকে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত গয়না-পরা, আবার অনেকের মাথায় রঙীন একটি ফিতে ছাড়া কোনো সজ্জার চিহ্ন নেই। দলে ভারি হচ্ছে এই দুই দলের মাঝামাঝিরা। তাদের নাকে নোলক, কানে মাকড়ীও আছে কিন্তু জুতো মোজা এবং মাথায় তৈলসিক্ত রেশমী ফিতেও বাদ পড়েনি।

মেয়ের দলের কেউ বা ছোট ছোট কৌটো, কেউ বা টিনের বাক্‌স হাতে নিয়ে 'টিফিন' খেতে সিঁড়ির তলা, কপাটের আড়াল প্রভৃতি জায়গায় প্রস্থান করলে; আর যাদের খাওয়ার প্রতি ততটা মমতা ছিল না, তারা মস্ত বড় বারাণ্ডা আর চাতাল জুড়ে মহা কোলাহল সহকারে খেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

একটা প্রকাণ্ড দড়ির দু-দিক ধরে দু-জন মেয়ে জোরে ঘুরোচ্ছে আর তিন চার জন মেয়ে তালে তালে সেই দড়িটা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লাফিয়ে চলেছে। এ আবার কি-রকম খেলা! বিস্ময়ে মুক্তির কান্নাও বন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে শিক্ষয়িত্রী একটি লম্বা রোগা-মতন মেয়েকে কাছে ডেকে তার হাতে মুক্তিকে সঁপে দিয়ে বল্‌লেন "মলিনা, একে এখন তোমার কাছে রাখ, টিফিনের ঘণ্টার পর মিস্‌ নাগকে বলে গ্যালারি ক্লাশে বসিয়ে দিয়ে এসো।"

মলিনা মুক্তির হাতে ধরে চারিদিকে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। এই মেয়েটির হাতে পড়ে মুক্তির ভয় যেন একটু কমে গেল। একে চেষ্টা কর্‌লে বাড়ীর লোক বলেও মনে করা যায়। সে নির্ভয়ে মলিনার হাত চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগ্‌ল। মলিনা তাকে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে "খুকি, তুমি ঐ মেয়েদের সঙ্গে খেল্‌বে?" মুক্তি নিজের ছোট মাথাটা খুব জোরে নেড়ে আপত্তি জানালে।

মলিনার সঙ্গে বাগানে বেড়িয়ে ফুল তুল্‌তে তুল্‌তেই আর-একবার ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। সব মেয়েরা খাওয়া এবং খেলা ফেলে দৌড়ে ক্লাশের ঘরের দিকে চল্‌ল। মলিনাও মুক্তিকে নিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। সে ঘরখানায় মস্ত সিঁড়ির মত কি একটা রয়েছে, তার প্রতি তাকে তাকে একদল করে মেয়ে বসে। নীচে একটা চেয়ারে একজন বড় মেয়ে বসে রয়েছেন।

মলিনা তাঁকে আস্তে আস্তে কি যেন বলে মুক্তিকে সেই সিঁড়ির একটা ধাপে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার আশেপাশের ছোট ছোট মেয়েরা তাকে দেখে হাসাহাসি কর্‌তে লাগ্‌ল, এ ওর কানে কি সব ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্‌তে লাগ্‌ল। মুক্তির আবার কান্না আস্‌ছিল। মলিনা যে কেন তাকে এই মেয়েগুলোর মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল তা সে কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না।

কতক্ষণ যে সে ওখানে বসে ছিল তার ঠিক নেই। শেষে খুব জোরে একবার ঘণ্টা বাজ্‌ল, আর সব মেয়েরা নিজেদের বই খাতা শ্লেট তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। মলিনাও ঠিক সেই সময় এসে মুক্তিকে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

বাইরে গাড়ী-বারাণ্ডায় সারি সারি লম্বা গাড়ী দাঁড়িয়ে গিয়েছে; মেয়েরা দলে দলে গাড়ীতে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এক-একটা গাড়ীতে যে কতগুলো করে মেয়ে উঠ্‌ল তার ঠিক নেই। মুক্তি অত মেয়ে জীবনে দেখেনি। সে

হাজার চেষ্টা করেও তাদের গুনে উঠ্‌তে পারছিল না। মুক্তিকে একটুক্ষণ গাড়ী চড়ানো দেখিয়েই মলিনা তাকে নিয়ে আর-একদিকে চল্‌ল।

একটা মস্ত লম্বা ঘর, তাতে মস্ত মস্ত কাঠের আল্‌মারি আর বড় বড় দেরাজওয়ালা আয়্‌না। দেয়ালে সারি সারি লোহার আল্‌না টাঙানো। মুক্তি দেখ্‌লে তার নূতন বাক্‌সটাও এই ঘরে এসে হাজির হয়েছে। মলিনা বাক্‌স খুলে একটা নূতন জামা বার কর্‌লে, তারপর মুক্তির চুল বেঁধে মুখ ধুইয়ে সেই জামাটা পরিয়ে তাকে আর-একটা ঘরে নিয়ে গেল। সে-ঘরে বড় বড় টেবিলে ঢের মেয়ে খেতে বসেছে। উঁচু টুলে বসে মুক্তির পা-দুটো শূন্যেই থেকে গেল, সেই অবস্থাতেই সে কোনো-রকমে খাওয়াটা সেরে ফেল্‌লে।

তারপর বেড়ানো আর খেলার পালা। সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা মাঠের মত জায়গায় নিয়ে গিয়ে মলিনা মুক্তিকে বল্‌লে, "এইবার তুমি ছোট মেয়েদের সঙ্গে খেলা কর।" মুক্তি খুব জোরে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, ওরা দুষ্ট, ওরা আমাকে দেখে হাসে, আমি ওদের কাছে যাব না, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব। আচ্ছা, তোমায় কি বলে ডাক্‌ব?"

মলিনা একটু হেসে বল্‌লে, "আমায় মলিনা-দি বলে ডেকো।"

অনেক মেয়ে এসে তাদের চারদিকে জুটেছিল। একজন সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে মুক্তিকে হঠাৎ টপ্‌ করে কোলে তুলে নিয়ে বল্‌লে "বা রে! কেমন একটা পুতুল! তোর নাম রাখা গেল ডলি।"

মুক্তি খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে বল্‌লে, "না, আমার নাম মুক্তি।"

সেই বড় মেয়েটি ভারি সুন্দর দেখ্‌তে। রং খুব ফর্‌সা, চোখগুলো ঠিক নীলার টুক্‌রোর মত, গাল দুটো এমন গোলাপী যে মনে হয় টিপে দিলেই রক্ত ফেটে পড়্‌বে। মুক্তি তার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল "আচ্ছা তুমি এমন লাল গাল কর্‌লে কি করে?"

সে মেয়েটি খিল্‌খিল করে হেসে উঠে বল্‌লে, "তা বুঝি জাননা, আমি রোজ রাত্রে শোবার সময় মুখে লাল কালী আর মাথায় কালো কালী মাখি, তাই এম্‌নি হয়েছে। তোমায়ও আজ মাখিয়ে দেব, তা হলে দেখ্‌বে এখন সকালে কেমন লাল গাল হয়।"

মুক্তি ত অবাক! মলিনা সেই মেয়েটির পিঠে এক চড় লাগিয়ে বল্‌লে, "আঃ সুসী, কি কর্‌িস্‌, ছেলেমানুষকে জ্বালাস্‌নে।"

দু তিনটি ছোট মেয়েও এসে জুটেছিল। তারা এখন মুক্তির সঙ্গে ভাব কর্‌তে খুবই ব্যস্ত। একজন তার কাছে ঘেঁসে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্‌লে "আমার একটা মস্ত বড় মোমের ডলি আছে, তুমি দেখ্‌বে? তার পোষাকটা সত্যিকারের সিল্কের।"

মুক্তি এইবার তাদের দলে ভিড়্‌ল। খানিক পরে মলিনা তাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে তারা রেশমের পোষাকপরা পুতুল নিয়ে একেবারে বিশ্বসংসার ভুলে বসে আছে। মুক্তির অনর্গল গল্প করা দেখে একটুও মনে হচ্ছিল না যে এই মেয়েই দু ঘণ্টা আগে বাপকে ছাড়্‌তে কেঁদে আকাশ ফাটিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন আর শিবেশ্বর মেয়েকে দেখ্‌তে এলেন না, বোধ হয় প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বারণ করে দিয়ে থাক্‌বেন। দিন দুই পরে তিনি এসে সেই ছোট ঘরে বস্‌বামাত্র মুক্তি এসে হাজির। একটা ছোটখাট ঝড়ের মত সে এসে বাপের কোলের উপর পড়ে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগ্‌ল। বিস্মিত শিবেশ্বর তার কথার স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে এইটুকু আবিষ্কার কর্‌লেন যে তাঁর কন্যারত্নের অপর্ণা সুশীলা, বিমলা, কেষ্টোদাসী প্রভৃতি অনেকগুলি বন্ধু আছে, তাদের কারুর বা মাথার ফিতে খুব ভাল, কারুর হাতের চুড়ি এবং কারুর বা সিল্কের শাড়ী; এবং সেইরকম সব মুক্তিকে কিনে দিতে হবে, তা না হলে কিছুতেই চল্‌বে না। তা ছাড়া একটা মোমের পুতুল চাই, তার ঘাঘ্‌রাটা আসল লাল রেশমের হওয়া আবশ্যক।

শিবেশ্বর বোর্ডিঙে নির্ব্বাসিতা মেয়ের অবস্থাটা বোধ হয় একটু অন্যরকম কল্পনা করে এসেছিলেন। আসল ব্যাপার দেখে খুসী হলেন কি দুঃখিত হলেন বলা শক্ত। মেয়ে যে কাঁদ্‌ছে না এতে তাঁর খুসী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার এই প্রফুল্লতায় তাঁর মনের কোন্‌ কোণে যেন একটা ব্যথা সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছিল।

শুক্রবারে তিনি আবার এসে মেয়েকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। ঠাকুরমাকে বোর্ডিঙের মেয়েদের রূপ গুণ আর আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা শুনিয়ে মুক্তি এক ঘণ্টায়ই অস্থির করে তুল্‌লে। গাড়ী থেকে নাম্‌বার তরও তার সইছিল না, গাড়ী থেকে চেঁচিয়েই সে ঠাকুরমার উদ্দেশ্যে বল্লে, "জানো মা, সুশীদি বেলার চেয়েও ঢের ভাল দেখ্‌তে।"

ফিরে সোমবারে বোর্ডিঙে ফির্‌বার বেলা সে আর-এক পালা গোলমাল কর্‌লে। তবে শিবেশ্বর চট্ করে তার আকাঙ্ক্ষিত কতগুলো জিনিষ কিনে দেওয়ায় তার আপত্তিটা শীঘ্রই দূর হয়ে গেল। এসব ধনরত্ন যদি অপর্ণা কেষ্টোদাসী এবং বিমলাকে নাই দেখানো হল তা হলে ত জীবনই বৃথা! কাজেই ব্রাউন কাগজে মোড়া পোট্‌লাটা দুই হাতে বুকে চেপে ধরে সে গাড়ীতে উঠে পড়্‌ল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসংযুক্তা দেবী।

দিদির দুঃখ

(গল্প)

মন্দ মধুর বাসন্তী হাওয়ায় ধবল পাল তুলিয়া দিয়া অমল যে-লোকে উধাও হইত, দিদি ছিলেন তার নিয়ামক এবং কর্ণধার। রূপকের কথা ছাড়িয়া দিলে দাঁড়ায় এই,—পুত্রসম-বয়স্ক দেবর অমল ও সহচারিণী পিস্‌তুত বোন্ বাসন্তী যে লোকে বিচরণ করিত কড়ায়-ক্রান্তিতে তাহাদের কর্ম্মবহুল জীবনের ঘটনা-পরম্পরার ইতিহাস আয়ত্ত করিতে না পারিলেও কর্ণটির খোঁজ যে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে রাখিতে হইত ইহা খাঁটি সত্য।

এই দিদি-জীবটির আসল নামটা যে কি তাহার সন্ধান লইবার বড় একটা কাহারও প্রয়োজন হইত না। বাপের বাড়ীর দেশের ছেলে-মেয়েরা জন্মের পর হইতে তাহাকে দিদি বলিয়াই জানিত এবং শ্বশুরঘরে আসিয়া দেবর ও ননদিনীদের নিকট পর্য্যন্তও আখ্যাটি সমান ভাবেই বজায় রহিয়া গেল;—অবশ্য সেটি কম পুণ্যের কথা নহে।

দিদির হৃদয়-কন্দরে দয়ানামক জিনিষটির অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করিত, কিন্তু কথাটির বনিয়াদ্ শক্ত ছিল না। তিনি দৈনিক 'রাজরাণী' হইবার যে-সংখ্যক আশীর্ব্বাদ পাইতেন, শুনা যায় তাহার অনুপাতে তাঁহার লক্ষ্মী খুষ্টিয়ানী আচারের যে নিন্দাবাদ—তার ওজন ঢের বেশী। এখানে বলাই বেশীর ভাগ যে খিড়্‌কির পুকুরের সান্ধ্য-সম্মিলনীতে সভ্যাগণ তাহাদিগের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে যাহা পরিলক্ষণ করেন নাই এমন সমস্ত ব্যাপাররাজির যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিতেন দিদির আসন তাহার মধ্যে ছিল না। এই অনুপস্থিত থাকার কারণ যে তাঁর 'বড়মানুষের ঝি'গিরি তথা রূপের গর্ব্ব প্রভৃত 'দেমাক', এই অতি সহজ কথাগুলি তাহারা 'বিদ্যানী' না হইলেও জলের মত বুঝিয়া ফেলিয়াছিল!

'যাহারা অতি সাধারণ লোক তাহারা যেমন চক্ষু বুজিলে কেবল অন্ধকারই দেখিতে পায়, দিদি তেম্‌নি পুরুত-ঠাকুরের হাতে নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াই স্বর্গের রাস্তার 'শর্টকাট' দেখিতে পাইতেন না। অনেক সুযোগ থাকিলেও পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর সলিলে প্রকাশ্য ভাবে গাত্র ধাবনে তাঁহার রুচি ছিল না এবং সেই পুণ্য-সলিল তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষেও নাকি তেমন অনুকূল হইত না। শুনিতে পাওয়া যায় একবার কি একটা 'যোগে'র ফাঁকে যখন কোটি কোটি লোক ফাঁকি দিয়া হঠাৎ বৈকুণ্ঠের দুয়ার আল্‌গা করিয়া লইল, তিনি ছার এই নশ্বর দেহ এবং ততোধিক নশ্বর এই ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্যের মোহে এমন একটা সুযোগকে হেলায় হারাইয়াছিলেন! পুণ্যের দিকেও যেমন, সাংসারিক দিকেও নাকি তাঁর বুদ্ধির তেমন তারিফ করা যায় না। কারণ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নানা কারণে এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন যে তাঁহার হৃদয়নামক বস্তুটি অতীব 'দ্রবণ-প্রবণ'; শুধু বাক্য দ্বারা চিড়াকে সরস করিয়া লওয়া যায় না, যে দেশে ইহা একটি অতি দামী তত্ত্ব, সেই মাটীতে জন্মগ্রহণ করিলেও নাকি দুইটি বাক্য অথবা দুইবিন্দু লবণাম্বু দ্বারা তাঁহার ঐ প্রাগুক্ত হৃদয়নামক বস্তুটিকে অতি সহজে এবং সুবিধামত বেশ মোলায়েম করিয়া লওয়া যাইত!

দিদির শ্বশুর যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার এই ক্ষুদে বৌটির কাছে সংসারের ছোটখাট কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর মাম্‌লা মোকদ্দমার কথা পর্য্যন্ত তুলিতে ছাড়িতেন না। একবার দিদির পরামর্শ-মত একটা

মোকদ্দমায় অভাবনীয়রূপে জিত হইলে শত্রুপক্ষ তাঁহার শ্বশুর মহাশয়কে কটাক্ষ করিতে ছাড়িল না। দিদি যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেও শ্বশুর মহাশয়ের উৎসাহের কিন্তু কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তিনি কহিলেন, "বলুক না মা, তুমি যে আমার ঘরের লক্ষ্মী তা ত বেটারা জানে না।"

(২)

নিঃসন্তান দিদি যেদিন ও-তরফের ছোট দেবর অমলকে কোলে পাইয়াছিলেন, সে দিন তাঁর দুঃখের বেগ অনেকটা মিলাইয়া আসিতেছিল; তার উপর যখন বাসন্তীকে পাইয়াছিলেন তখন তাঁর আনন্দের স্রোত দু'জনকে বেড়িয়া হৃদয়ের কূল ছাপাইয়া উছলিয়া উঠিয়াছিল। অনেকদিন পর তাদের দু'জনকে একসঙ্গে আবার বুকের কাছে পাইলেন বটে কিন্তু তেমনটি আর বুঝি হইল না!

বাসন্তী ছেলেবেলা হইতে দিদির কাছেই মানুষ হইয়াছিল। দশ বছর পার না হইতেই হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া ফেলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে যেদিন আঙ্গিনার কোণে আসিয়া দাঁড়াইল, দিদি সেদিন গলা চড়াইয়া কাঁদিলেনও না, দুঃখও করিলেন না, কেবল দুই হাতের নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে তাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। ধর্ম্মভীত যে শ্বশুরগৃহে এই অপয়া মেয়েটির স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বুঝি তাহারাও ইহার মুখের দিকে চাহিয়া ইহার গায়ে থানের কাপড় জড়াইয়া দিতে পারে নাই। সর্ব্বনাশের কথা এই যে আত্মীয়-স্বজনের সুউচ্চ ক্রন্দন-রোলে সমস্ত পাড়াটা সচকিতা হইয়া উঠিলেও বাসন্তী তার অবস্থা-বৈপরিত্যে একটুও অসোয়াস্তি অনুভব করিতে পারে নাই, পরন্তু বছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই আবার দিদির স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয়ে আসিতে পাইয়া তার উৎসাহ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল।

দিদির সহিত বাসন্তীর আকৃতি বা প্রকৃতি কোনটাতেই বিশেষ সাদৃশ্য ছিল না; দিদির যা ছিল বাসন্তীর তা ছিল না, আবার বাসন্তীর মধ্যে যাহা ছিল দিদির মধ্যে হয়ত তার অভাব ঘটিয়াছিল।

দিদির মধ্যে ছিল শরতের আবহাওয়া;—শরতের আকাশ শরতের বাতাস, প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে স্নেহময়ী জননীর শ্যাম অঞ্চল বিছানো, আনন্দময়ীর আগমনে চারিদিকে শুধু আনন্দের হিল্লোল, আর তারই সঙ্গে মিশানো যেন বিজয়ার সেই করুণ তান। কোথাও তার চঞ্চলতা নাই, আকাশে মেঘ নাই বিদ্যুৎ নাই আর বসন্তের এলো-মেলো হাওয়াও বুঝি নাই। কিন্তু অপর দিকে, ঋতুরাজ তার উদ্দামতার প্রতি-কণাটুকু দিয়াই যেন গড়িয়াছিলেন এই বাসন্তীকে। তার হাসির ঝলক, তার তড়িৎ-চঞ্চল চাহনিটুকু, তার তরল গতিভঙ্গী, এমন কি তার কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়াও যেন এমনি চপলতার একটা আভাস ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু একখানে যেন তাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, মনে হইত একেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ—দুইই যেন মানুষের মনের খোরাক জোগায় এবং কোনটিকেই যেন একেবারে বাদ দিলে সংসার চলে না।

অমল যখন ছোট ছিল, বাসন্তীর বিয়ের পর তার এই সখীটির বিদায়ক্ষণে এমন কাঁদাকাটি এবং হাঙ্গাম করিয়াছিল যে দিদিকে তখন নানা অছিলায় তাকে সাম্‌লাইতে হইয়াছিল। দিদি তাহাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন বালক তাহার উপর গভীর আস্থা রাখিয়াছিল এবং বাসন্তী যে শুধু দুদিনের জন্যই গিয়াছিল এবং আর যে কোনদিন তাহার সঙ্গছাড়া হইবে না দিদির সেদিনকার এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিয়া সে আজ যথেষ্ট খুসী হইল।

(৩)

রায়পরিবারের বড়বৌ, খেয়ালী এই দিদিটি, অনাচার জীবনে অনেক করিয়াছিলেন। সেদিন যখন হঠাৎ কি ভাবিয়া গায়ের গয়নাগুলি একে একে খুলিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিতেছিলেন তখন খবরটি ওবাড়ীর মেজ গিন্নির পাইতে বড় দেরী হইল না। অবশ্য যাহার নিকট পাইলেন সে সেদিনকার বারটির বিষয় এবং এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে পাঁজিতে কি বলে তারও উল্লেখ করিতে ভুলে নাই। প্রবীণা গৃহিণীর ইহা বরদাস্ত হইল না। ঘরে তাঁহার অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা লইয়া বাস এবং কাহার মনে যে কি তাহাও তিনি অবগত নহেন, কাজেই অতিক্রুত তিনি ঘর হইতে বাহির হইলেন।

"হ্যাগা বৌ, বরত নিয়ম না হয় না-কর্‌লেই বাছা, কিন্তু

তাই বলে গেরস্ত-ঘরে রোববার-দিন গায়ের সোনা খসাতে হবে কোন্ শাস্তরে আছে বল ত?" গৃহিণী এক নিশ্বাসে অতি ঝাঁঝের সহিত কথা কয়টি বলিয়া ফেলিলেন।

দিদি মাথা অবনত করিলেন, তারপর একটু হাসিয়া নীচু গলায় কহিলেন, "হাতে বড় লাগে যে!"

এমন অনাসৃষ্টি কৈফিয়তে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু আদি পিতামহ ব্রহ্মার অতিবড় বৃদ্ধ প্রপিতামহ আসিলেও যে এ-কথার নড়চড় হইবে না তাহা সকলেই জানিত। গৃহিণী জোর জোর পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাসন্তী এবার আসিয়াছে অবধি দিদির মধ্যে হঠাৎ অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের যতগুলি ব্রতনিয়ম, এর আগে একটা একটা করিয়া যা তিনি উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সমস্তগুলিই আবার কঠোর অনুশাসনের সহিত পালন করিতে আরম্ভ করিলেন, বাসন্তীকেও ছাড় দিলেন না। বাসন্তীর কাঁচা বয়সের উল্লেখ করিয়া অনেকে তাঁহাকে বিরত করিতে চেষ্টা পাইল বটে কিন্তু তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। একাদশীর সমস্ত দিনের উপবাসের পর বাসন্তী যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্লান্তভাবে এলাইয়া পড়িত, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই সেদিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। সেই এলায়িত দেহযষ্টি এক-একদিন যখন ক্লান্তিভরে তাঁহারই অঙ্কে ঢলিয়া পড়িত, তিনি সেই ঘুমন্ত মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন আর এক-একটি তপ্তশ্বাসের সঙ্গে যেন তাঁহার বুকের এক এক ঝলক রক্ত শুকাইয়া যাইত। অন্যের কাছে তা তো গোপন ছিলই, এমন কি বাসন্তীকেও তিনি তা বুঝিতে দিতেন না।

দিন এমনি চলিতে লাগিল। এই স্বেচ্ছাচারী বৌটার মতিগতি কেন যে এমন করিয়া ফিরিয়া গেল তাহার সন্তোষজনক কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও, ধর্ম্ম যে চিরদিনই জাগ্রত আছেন, এবং অবশেষে যে মানুষের সুমতি না হইয়া পারে না, এই মূলতত্ত্বটুকু ধরিতে পারিয়া প্রবীণাদিগের মধ্যে গবেষণামূলক আলোচনা শান্ত হইয়া বাঁচিল।

(৪)

অমলের সহিত বাসন্তীর ছেলেবেলা হইতেই বড় ভাব। দু'জনে একসঙ্গে না মিলিলে সেদিন তাদের খেলা জমিত না। আমের দিনে দু'জনে ভোরে উঠিয়া আম কুড়াইতে যাইত—লভ্যে সন্তুষ্ট না হইলে অমল গাছে উঠিত আর বাসন্তী তলায় থাকিত। তাদের দিনের মধ্যে নূতন করিয়া অনেকবার যে-সব ঝগড়া-ঝাটি হইত দিদি তা মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দিতেন। কতবার তাদের জন্মশোধ আড়ি হইত; আবার সেই অতিদীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তর সঙ্কীর্ণতম হইয়া ভাব হইতেও বড় বেশী সময় লাগিত না। তারা দুপুরের রোদে পেয়ারা-তলায় থানা দিত, আবার চিলের ছাতে উঠিয়া দিদিকে লুকাইয়া কাসুন্দি সহযোগে অনেক ভদ্রুরুচি-বিগর্হিত বস্তু নির্ব্বিচারে পথ্য করিত। দুপুরে তারা একসঙ্গে সাঁতার কাটিত। কতদিন দিদি তাদের দু'জনকে সমানে দাঁড় করাইয়া শাস্তি দিতেন। কতদিন অমল বাসন্তীর কত অন্যায় আচরণ ঢাকিয়া দ্বিতীয়ভাগের সার অনুশাসনটি অমান্য করিয়া দোষের বোঝাটি নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া অতি সহজভাবে অনুচিত শাস্তি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত। এই দুইটি কিশোর কিশোরী হাত ধরাধরি করিয়া বিচারপ্রার্থীভাবে দিদির সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়ায়, দিদির মনটা তখন এমন আলোড়িত হইয়া উঠে যে তাঁহার মনের অতিবড় সংযম সত্ত্বেও যেন তাহা তিনি ঢাকিতে পারেন না।

জমিদার-ঘরের ছেলে অমল ষোড়শ বর্ষ পার হইতে চলিল, তবু তার বিবাহ হয় নাই; কথাটা লইয়া অমলের মাকে বর্ষীয়সীরা অনুযোগ দিতেও ছাড়িল না। প্রজাপতির দূতগণ বাড়ীতে ঘনঘন পদধূলি দিতে আরম্ভ করিল এবং ফলে নিকটবর্ত্তী এক পাল্টী ঘরে অষ্টম বর্ষের এক বালিকার সহিত শুভকার্য্য পাকা হইয়া গেল।

একথা শুনিয়া অবধি বাসন্তীর আনন্দ আর ধরে না। বিয়ের কথা লইয়া অমলকে সে এক-রকম প্রায় বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু অমল বুঝিল তার বিয়ের কথা লইয়া বাদানুবাদ বা হাস্যপরিহাস যেন তার তত ভাল লাগে না। প্রথম প্রথম সে বাসন্তীকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল, তারপর একদিন হঠাৎ নির্জ্জনে বাসন্তীর হাত দুখানি

ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—মুখে শুধু এইটুকু বলিতে পারিল "আমি তোমার কি করেছি।" বাসন্তী কিছুই ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিল না, কিন্তু একথা বুঝিল এ কণ্ঠস্বর আগে সে শুনে নাই। ঐ কথা ক'টি তার সমস্ত মনখানি জুড়িয়া তাহাকে এলোমেলো কতকি ভাবাইয়া দিল।

অবশেষে সেই শুভদিন আসিয়া পড়িল। সমস্ত বাড়ীময় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বাসন্তীও কম সুখী হইল না। সারা বাড়ীময় সে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, যেন আজ তার কত কাজ—যেন সে কত ব্যস্ত!

এমন সময় একটি করুণকণ্ঠ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেই বাসন্তী সমস্ত ফেলিয়া ছুটিয়া সেইদিকে গেল। দেখিল বিছানার উপর চুপ করিয়া দিদি পড়িয়া রহিয়াছেন আর চোখে তাঁর এক ফোঁটা জল তখনও মুক্তার মত টলটল করিতেছিল। বাসন্তী তাঁর মাথায় হাত দিয়া দেখিল, আগুন। বাসন্তী শিয়রে বসিয়া আস্তে-আস্তে তাঁর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। দিদি তেমনি নীরব রহিলেন। খোলা জানালার মধ্য দিয়া এক-একবার এক ঝাপ্‌টা বাহিরের তপ্তবায়ু প্রবেশ করিতেছিল। রসুনচৌকি বিনাইয়া-বিনাইয়া করুণকণ্ঠে নিজকে যেন কাহার পায়ে বিলাইয়া দিয়া ক্রমেই শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল।

বাসন্তী কহিল, "দিদি, একবার একটু বাইরে যাব? অমলদার যে যাত্রার সময় হয়ে এল?"

দিদি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "উঃ আমার যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে রে।"

বাসন্তী আস্তেব্যস্তে পথ্য তৈরী করিবার জন্য ছুটিল। দিদি বালিশে মুখ গুঁজিয়া তেমনি পড়িয়া রহিলেন।

দিদি ভাবিতে লাগিলেন। কতদিনের ছোট বড় কত কথা আজ তাঁর মনে পড়িতে লাগিল। বাড়ীর একটিমাত্র প্রাণী অভুক্ত থাকিতে দিদি কোন দিন জলস্পর্শ করিতেন না। বাসন্তী একদিন খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মাধ্যাহ্নিক পাড়া-পরিভ্রমণের পরও যখন দেখিল দিদির নাওয়াই হয় নাই, তখন সে দিদির সঙ্গে ঘটা করিয়া আড়ি পাতিল। সেদিন দিদি দক্ষিণ করে তার চিবুকখানি তুলিয়া লইয়া তাঁর সেই হাস্যমণ্ডিত মহৈশ্বর্য্যময় মুখখানি তার দিকে ফিরাইয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "যদি কোন দিন কোন সংসারের দিদি হবার ভাগ্যি থাকে, তবে এতে যে কি সুখ, তা সেই দিন বুঝবি, আজ নয়।" দিদি হয়ত আজ তাই পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতেছিলেন দিদি হইবার সুখ এবং দিদি হইবার গৌরব কতখানি।

দিদি আজ কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না কেমন করিয়া তাঁর এই ক্ষুদ্র বোন্‌টিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে দারুণ অপমানের আঘাত হইতে রক্ষা করিবেন। উনকোটি দেবতার অভিশাপে যে তার জীবন অভিশপ্ত, আজ তার নিশ্বাস লাগিলে যে বরণডালার সমস্ত মঙ্গল-শিখাগুলি অপবিত্রতার ছোঁয়াচ লাগিয়া ম্লান হইয়া যাইবে—এ কথা দিদি কেমন করিয়া এই অবোধ শিশুটিকে বুঝাইবেন। দিদি আকাশ এবং পাতাল অনেক ভাবিলেন, কিন্তু কূল তাঁর কোথাও মিলিল না।

দ্বারে একটা মৃদু আঘাত হইল 'দিদি'। দিদি উঠিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলেন। অমল ঘরে ঢুকিয়া টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল, তারপর মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাসন্তীর অনুপস্থিতির ব্যথা যে এই বালকটির বুকে কতখানি বাজিয়াছে তাহা যেন তার এই নীরবতার মধ্য দিয়া স্বতঃই রুদ্ধ আবেগে পরিস্ফুট হইতে চাহিতেছিল, দিদি তাহা বুঝিলেন। দিদির একটু আদরেই তার চোখের জল মুক্ত প্রস্রবণের মত ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দিদি তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া তার মুখখানি ঘন ঘন চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া কহিলেন "ওরে অভিমানী, দিদির বুকে তোদের জন্যে যে কতখানি দুঃখ তা যেদিন বুঝ্‌তে শিখবি, সেদিন দিদির কোন অপরাধই নিবি না।" দিদি আর বলিতে পারিলেন না। হঠাৎ বর্ষণোন্মুখ মেঘ হইতে একপশলা বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িয়া যেন চারিদিকের জমাট কুয়াসাকে একটু পরিষ্কার করিয়া দিল। অমল বাসন্তীর আর কোন খোঁজ না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আজ বাসন্তীর প্রাণে এই ছোটখাট ঘটনাটি বড় বাজিল। আগে তাদের মধ্যে যে-সব ঝগড়াঝাটি বাধিত, অমলই তাহা যাচিয়া ভাঙ্গিত। তাই সে এবারেও ভাবিল হয়তো এখনই সে আসিবে, কিন্তু অমল আর আসিল না। বাসন্তী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একই কথা অনেক রকম

করিয়া ভাবিল। একবার তার মনে হইল দোষটা তো তার নিজেরই সম্পূর্ণ, কারণ সারাটাদিনের মধ্যে একবারও সে অমলের খোঁজ লয় নাই। আবার ভাবিল, তা কেন, বাঃ রে, সে কি ইচ্ছা করিয়া এমনটি করিয়াছে? এ কেন সে বুঝিল না। আবার ভাবিল, বেশ তো রাগ করিয়াছে তাতে কার কি? কিন্তু আজ তার মনকে সে কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিল না। যখন সে নিজের মনে মনে অনেকবার হার মানিয়া দিদির পথ্য ফেলিয়া অমলের খোঁজে বাহিরে ছুটিল তখন বাদ্যভাণ্ড লইয়া সমস্ত বরযাত্রী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

(৫)

অমল বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিল। তার অভিমানের অতি মাত্রায় সে নিজেই অনুতপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু বাসন্তীর রাগ যে এত সহজে পড়িবে তা সেও মনে করে নাই বাসন্তীও হয়তো না। বাসন্তীর রাগ পড়িল বটে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মুখের সে হাসিটুকুও যেন চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। অমলের বিয়েতে সে যতখানি উল্লাস আমোদ করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল তাহা পারিল না। সমস্ত উৎসব-কোলাহলের মধ্য হইতে কে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে কেমন করিয়া সূচি বিদ্ধ করিয়া দিল। এ সম্বন্ধে সে আর মনকে লইয়া কোন বোঝাপড়া করিতে চাহিল না।

নূতন বৌ নোটন মেয়েটি ভারি চমৎকার। বাসন্তীর চেয়ে সে বয়সে অনেক ছোট ছিল এবং বাসন্তী ছোট বোন্‌টির মতই তাকে বুকে তুলিয়া লইল। সে সারাদিন তাকে লইয়াই ব্যস্ত। তাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া দিত, তার চুল বাঁধিয়া দিত, তাকে লেখাপড়া শিখাইত, কখনও বা খুব কড়া ব্যবহার করিত, আবার নির্জ্জনে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অকারণে কাঁদিত। আকর্ষণ জিনিষটা সংক্রামক, এবং তার ছোঁয়াচ নোটনকেও ছাড়িল না।

অমলের সহিত ব্যবহারে বাসন্তীর যেটুকু সঙ্কোচ আসিতেছিল, নোটনের স্বচ্ছন্দতায় বাসন্তী তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

একদিন অমল অনেকগুলি ফুল আনিয়া বাসন্তীর কোঁচড়ে ফেলিয়া দিল। আশা তার ব্যর্থ হইল,—চিরদিনের বরাদ্দকরা যত্নগ্রথিত মাল্যখানি আর তার ভাগ্যে মিলিল না, এবার বাসন্তী সেই ফুলের বলয় কঙ্কণ গড়িয়া পরিপাটিরূপে নোটনকে সাজাইয়া অমলের সম্মুখে আনিল, অমল পলাইবার পথ পাইল না।

বাসন্তীর এই দ্বিধাশূন্য ভাববৈচিত্র্যহীন ব্যবহারে অমল মনে-মনে সুখী হইতে পারিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দার্শনিকভাবে চিন্তা করিল, "হায় নারীর মন জিনিষটা কি সত্য-সত্যই এমনি হাল্কা, এমনি অপদার্থ!"

বালিকাপত্নী নোটনকে একদিন একটু বেশী আদর করিয়া অমল ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "নোটন আমি বুঝি তোমায় তেমন করে ভালবাসতে পারি না।" নোটন এ কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হইল। এমন কথা তো সে কোনদিন তার স্বামীর মুখে শুনে নাই। আর তেমন কথা যে কাহাকেও কটাক্ষ করিয়া হইতে পারে সেই সরলা নির্ব্বোধ বালিকা তাহা মনেও আনিতে পারিল না। ইহার চেয়ে মানুষ আর মানুষকে কত বেশী ভালবাসিতে পারে তাও ত তার জানা নাই। যখন প্রসঙ্গটি আরও একটু স্পষ্ট হইয়া পড়িল তখন যেন হেলাভরেই সে কহিল, "ওগো, কে আপন কে পর তা আর তোমায় নূতন করে চিনিয়ে দিতে হবে না।" তেমনি সহজগতিতে হাসিতে হাসিতে নোটন চলিয়া গেল। এই ক্ষুদ্র বালিকার সরলতার সম্মুখে নিজের দুর্ব্বলতার আঘাতে সে নিজেই পীড়িত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ পরদিন ব্যস্ত হইয়া তার কোন্ এক বিদ্রোহী মহালের তদন্তের জন্য অমল বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। দিদি বাধা দিলেন না, কাজেই নোটনও নীরব রহিল। বাসন্তীও কোনো কথা কহিল না।

(৬)

এদিকে যেন কারণ বিনাই বসন্তের এ লতিকাটি ক্রমেই শুকাইতে লাগিল। দিন দিনই অস্তমান শশীকলার মত ক্ষীণ হইয়া বাসন্তী শয্যাগ্রহণ করিল। ভিষকপ্রবর বাছিয়া-বাছিয়া অনেক ভুথড় ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। অমল তখনও মহালে। বাসন্তীর বহু নিষেধ সত্বেও নোটন অমলকে তার পীড়ার সংবাদ না দিয়া থাকিতে পারিল না, কিন্তু তবু অমলের কোনই সাড়া পাওয়া গেল না। দিদি নিশিদিন বাসন্তীকে বুকে

করিয়াই রাখিলেন, তারপর যখন একদিন বুঝিলেন সময় ক্রমেই নিকট হইয়া আসিতেছে তখন তাহাকে আবেগভরে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাসন্তী রে, জগতে হলেও-হ'তে-পারত এর চেয়ে করুণ কথা আর কিছু নেই। তোর দিদিকে তুই যত বড় করেই দেখিস্ না কেন, আজ সত্যিই বল্‌ছি সে অতি অতি অযোগ্য, অন্তরে যে কথা হাজারবার ফুলে ফুলে উঠেছে বাইরে তা কাজে দেখাতে পারেনি সে। আমি যে তোর কাছে কত অপরাধী, সে আমি তোকে বোঝাতে পার্‌বো না, যদি অন্তরতম কেউ থাকেন তবে তিনিই জানেন। বল বোন্, দিদিকে এত অক্ষমা জেনে তার কোন অপরাধই নিলি না—" দিদির কণ্ঠ ধরিয়া আসিল। বাসন্তীর চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই ম্লানমুখে একটি স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল,—সেই কি ক্ষমা?

নোটন পাগলের মত তার বুকে আছাড়িয়া পড়িয়া কহিল, "দিদি, কি দোষে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ দিদি?" বাসন্তী তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া স্নেহগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "আমি বড় অকৃতজ্ঞ ছিলাম রে নোটন! অনেক পেয়েও নিজকে বঞ্চিতা মনে করেছিলাম। তাই ভগবান্ আমার সে অপরাধ ক্ষমা করলেন না।" ক্ষণেক থামিয়া যেন একটু বল সংগ্রহ করিয়া কহিল, "নোটন, বোন্, আজ আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি তুই যেন সুখী হতে পারিস্।" তারপর বাড়ীর সকলের নিকট একে একে বিদায় লইয়া আন্‌মনে দুই-একবার দ্বারের দিকে চাহিয়া শ্রান্তিভরে গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল—পিছনের অনেক কান্নাকাটি অনেক ডাক হাঁক পিছনেই পড়িয়া রহিল—বাসন্তী একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

* * * * *

বাসন্তী মরিয়া গিয়াছে। রায়-বাবুদের পুরাতন সংসার তেমনি নিয়মিত চলিতেছে। কেউবা তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, কাহারও বা মনের কোণে এতটুকু স্মৃতি ধুক্‌ধুক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

অমনি একদিনে, বর্ষার এক মধ্যাহ্নে যখন বাহিরে ঝুপঝাপ করিয়া জলের ধারা একটা কাহার বিরাট কান্নার মত নির্ঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল, দিদি কি মনে করিয়া বাসন্তীর অতি যত্নে রক্ষিত ভাঙ্গা তোরঙ্গটির ডালা আস্তে-আস্তে খুলিয়া ফেলিলেন—তার মধ্যে কিশোর অন্তরের কত গোপন কথা! পুতুলের কাপড়, পুতুলের জামা, খানকয়েক ভাঙ্গা কাঁচ, গোটা দুই লাটিম, মরিচাপড়া একখানা ছুরি—আরও এমনি কত কি! সকলের নীচে কাপড়ের ভাঁজের মধ্য হইতে বাহির হইল একখানা পুরাতন খাতা। দিদি খুলিয়া দেখিলেন তা যে বাসন্তীরই হাতের বাঁকা ছাঁদের অক্ষরে ভরা। দিদির মনে হইতে লাগিল এ যেন সেদিনের কথা, এই ত কেবল সেদিন। তাঁর মনে হইল যেন বাসন্তী পাড়া ঘুরিয়া এখনি আসিয়া পড়িবে, আসিয়া আবার তেমনি করিয়া দিদি বলিয়া ডাকিবে।

খাতাখানি লইয়া আন্‌মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ পড়িতেই দিদি চম্‌কিয়া উঠিলেন। লেখা রহিয়াছে, "* * * * কপাল যখন আমার পুড়েছিল, কৈ তখনকার কথা তো আমার কিছুই মনে পড়ে না, এমনকি যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার কথাও তো আমার কিছুই মনে নাই। সে কথা না মনে পড়াতে তো আমার দুঃখ ছিল না যদি আমি তোমায় না দেখ্‌তাম। দিদি রে, তোর সমুদ্রের মত অগাধ ভালবাসা দিয়েও কি একজনের শূন্য ঠাঁই পূরণ কর্‌তে পারিস্‌না?"

আর-এক জায়গায়, "* * তুমি ভাব্‌ছ হয়ত স্ত্রীলোকের মন এমনি অসার আর এমনি পাষাণ। তা তুমি ভাব্‌তে পার। হায়রে অবোধ পুরুষ জাতি, এইটুকু বিশ্বাস নিয়ে তোমাদের কার্‌বার! যদি পাথরই হয়ে থাকি সেখানে একবার দাগ বসলে সে যে কোন দিনই মোছে না! * * *"

আর-এক স্থানে,—"* * নোটন সে যে অনিন্দ্যশুভ্র একটি শ্বেতপদ্ম, সে যে আমার দুধের বালিকা, সে যে আমার ছোট্ট বোন্‌টি, সে আমার কি করিয়াছে,—হে ঠাকুর আমার মন ভাল করিয়া দাও ঠাকুর! * *"

সর্ব্বশেষে দিদির যেখানে চক্ষু বসিল সেখানটা এইরূপ, "* * * নিজকে বলি দিতেই হবে। সমাজের ভয় আমি করি না, আমি যে চিরদিনের সেই অশান্ত দস্যি মেয়ে। আর অনাচে কানাচে কে কি কানাকানি করে তাই শুনে যে-মানুষ নিজের জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা সকল কামনা ছাড়তে পারে, সে মানুষ আমি নই। নোটন আমার প্রাণের নোটন, এসে পথে দাঁড়াল যে। তবুও বলি, এপারে

আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, ও-পারের অপেক্ষা করতে পার? যদি পার তবে আবার দেখা দিও। সে আশা কি এতই অপূরণীয়? আমি তো তা মনে করিনা। * * *"

দিদি আর পড়িলেন না, খাতাখানি ধীরে-ধীরে বুজাইলেন। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল।

তারপর সকলের অজ্ঞাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে একদিন গঙ্গার জলে তাহা ভাসাইয়া দিলেন।

কিন্তু একটি সন্দেহ তাঁর কিছুতেই গেল না। একটি আধফুটন্ত জীবন-কলি যখন অকালে এম্নি করিয়া ঝরিয়া পড়ে সে কি সেই বিশ্বনিয়ন্তারই কৌতুক খেয়াল, অথবা মানুষই তাকে জোর করিয়া ঝরাইয়া ফেলে বলিয়া!

শ্রীশিবশঙ্কর রায় চৌধুরী।

দেশের কথা

জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট কনফারেন্স ডাকিয়া সলাপরামর্শ করিতেছেন; দেশের লোককে সৈনিক দলে ভর্ত্তি হইবার পক্ষে প্রলুব্ধ করিবার জন্য সিপাহীর বেতন ১১৲ টাকা হইতে একলাফে একেবারে স তে রো টা কা করিয়া দিবার দরাজ হুকুম হইতেছে ও সেনানায়কের পদ পর্য্যন্ত দুচার জনকে দেওয়া হইতে পারেও চাইকি; বাংলার গভর্মেণ্ট মাসে-মাসে বেশ নিষ্ঠা শৃঙ্খলা ও জেদের সহিত অকস্মাৎ অকারণে কত লোককে ধরিয়া-ধরিয়া বন্দী করিতেছেন, তার জন্য কত ঘরে ঘরে নিরুপায় নারীদের অশ্রুজল ঝরিতেছে;—কিন্তু এসব দিকে নজর দিবার অবসর বাঙালীর নাই বলিলেই হয়; তার কাছে এখন প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে কাপড়ের দাম। বাংলা দেশের যে কাগজ খুলি সেই কাগজেই দেখি কেবল বস্ত্রসমস্যারই আলোচনা। ইহা হইতে বুঝা যায় বস্ত্রসমস্যা কিরকম কঠিন ও গুরু হইয়া লোকের সমস্ত মনোযোগ জুড়িয়া বসিয়াছে। এই বস্ত্রসঙ্কট কিরকম মারাত্মক ও ভয়ানক হইয়াছে তার পরিচয় ও এই সমস্যার সমাধানের উপায় কে কিরকম নির্দ্দেশ করিয়াছেন তার বিবরণ আমরা একত্র সঙ্কলন করিয়া উপস্থিত করিতেছি।—

আবার হাট-লুঠ।—ডিব্রুগড় হইতে জনৈক সংবাদদাতা তারযোগে জানাইতেছেন যে ডিব্রুগড়ের বড়বড়কা নামক একটি বৃহৎ হাট গত ১৪ই এপ্রিল রবিবার তারিখে লুঠ হইয়া গিয়াছে। লুণ্ঠনকারীরা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ১০,০০০৲ টাকা লুঠ করিয়াছে।'

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

কাপড় লুঠ—কাশীপুর-নিবাসী বলেন—কাশীপুর গ্রামের রাজকুমার জুগীর মুখে প্রকাশ—সম্প্রতি বাটাজোড় গ্রামের জনৈক জুগী দুই গাঁইট নূতন বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাওয়ার সময় লোকেরা তাহার মস্তকস্থিত গাঁইট দুইটি লইয়া গিয়াছে। গরীব জুগীর বড় ক্ষতি হইয়াছে। —ঢাকাপ্রকাশ।

—গত ৭ই এপ্রিল রাত্রি ২টার সময় সদর থানার তেঘরিয়া গ্রামের গোবিন্দ গোরাইয়ের বাড়ীতে এক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। অলঙ্কার, তৈজসপত্র, বস্ত্র ও নগদে তাহারা যাহা পাইয়াছিল তাহাই লইয়া গিয়াছে। —বঙ্গরত্ন।

—গত ৫ই এপ্রিল ভেড়ামারার এলেকায় গোলাপনগর বাজারে হরচন্দ্র আগরওয়ালার দোকানে আর-একটি ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। লোহার সিন্দুক ও একটা কাঠের বাক্স ভাঙ্গিয়া নগদে ১২০৲ টাকা ও কতকগুলি নূতন কাপড় লইয়া পলায়ন করিয়াছে। —বঙ্গরত্ন।

গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত শগুণা গ্রামে নাছের মণ্ডলের বাটীতে অনেক টাকা ও কাপড় চুরি গিয়াছে। —হিন্দুরঞ্জিকা।

'নায়কে' প্রকাশ—"বিগত রবিবার দিন উলুবেড়ের অন্তর্গত ধূলাগড়ের জনৈক বস্ত্র-ব্যবসায়ী বেগড়ীহাট হইতে কাপড় লইয়া যাইবার সময় পথে একদল ডাকাত বস্ত্রবাহী কুলীগণকে আক্রমণ করিয়া কাপড় লুঠ করিয়া নিয়াছে। —ঢাকাপ্রকাশ।

ডোমজুড় থানার অন্তর্গত আমড়া রোডের উপর সুরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক এক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর প্রায় ৫০০৲ টাকা মূল্যের কাপড় লুণ্ঠিত হইয়াছে। —ঢাকাপ্রকাশ।

দেশে বস্ত্রসমস্যা দিন-দিন যেরূপ জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে সমূহ বিপদাশঙ্কায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। দেশের দরিদ্র কুলবধূ লজ্জা নিবারণে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে; তাহার উপর সম্প্রতি আর এক বিপদ দেখা দিয়াছে;—দরিদ্র পরিবারের অধিস্বামী আপন পরিবারের বস্ত্রাভাব মোচনে অসমর্থ হইয়া অসহায়া নারীদিগের পরিধেয় বস্ত্র লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। খুলনা জেলার কয়েকটি গ্রামে উল্লিখিত রূপ কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এখনও এ সম্বন্ধে কোন সদুপায় অবলম্বন করিতেছেন না ইহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট আর কি দেখিতে চান, আমরা জানি না।

—যশোহর।

বস্ত্রসঙ্কট।—যশোহর চৌগাছা মাধবপুরের সংবাদদাতা গত ২২শে চৈত্র লিখিয়াছেন,—

"চৌগাছার নিকটবর্ত্তী দেবালয় গ্রামের বঙ্ক রজকের বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে ভাটি দেওয়া কাপড়ের মধ্যে ২৮ খানা কাপড় গত মাঘ মাসে চুরি যায়। তদনন্তর ফাল্গুন মাসে উহার বাটীর নিকটস্থ প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী মাণিক কারিকরের দোকান-ঘরে সিঁদ দিয়া ৪।৫ শত টাকার বস্ত্র চুরি হইয়াছিল। সম্প্রতি গত পরশ্ব তারিখে উক্ত চৌগাছা গ্রামবাসী বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী ছপি এব্রাহিম কারিকর এক গাড়ী বস্ত্র নিকটবর্ত্তী খাননার হাটে বিক্রয়ার্থে লইয়া যায়। তদনন্তর রাত্রিকালে উক্ত হাট হইতে প্রত্যাগমন সময়ে উক্ত চৌগাছার নিকটেই লস্করপুরের মাঠে ৮।১০ জন লোকে উক্ত গাড়ী আক্রমণ করিয়া সমস্ত কাপড় এবং হাটের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদি লুঠ করিয়া লইয়াছে।

—পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী।

জয়নগর গ্রামে একটি মুসলমানী স্ত্রীলোক একখানি জীর্ণবস্ত্র পরিয়া তাহার পুত্রকন্যাগণের জন্য ভাত রাঁধিতেছিল। ইতোমধ্যে তাহার জামাতা তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটি লজ্জায় জামাতার সম্মুখ হইতে যেমন পলাইতে যাইবে, অমনি, দৌড়িতে গিয়া তাহার অঙ্গ হইতে কাঁথাখানি খুলিয়া পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় জামাতা এমন লজ্জিত হইল যে, সে তাহার শাশুড়ীর জন্য বস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য গৃহত্যাগ করিল। আর স্ত্রীলোকটি জামাতার সম্মুখে এইভাবে অপদস্থ হইয়া এমন মর্ম্মাহত হইল যে, জামাতা বস্ত্র ক্রয় করি\ার জন্য তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিবামাত্র সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিল। —দর্শক।

বাগবাটীর সংবাদে প্রকাশ যে, দুইটি স্ত্রীলোক জনাই (সিরাজগঞ্জ) যাইতেছিল। পথে হঠাৎ একজন লোক তাহাদের দুই জনকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র দুইখানি কাড়িয়া নেয়। স্ত্রীলোক দুইটি লজ্জা রক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী একটা জঙ্গলের দিকে দৌড়িয়া যাইতে থাকে। সেই সময় এক ভদ্রলোক অশ্বারোহণে তথায় আগমন করেন। তিনি নিকটবর্ত্তী এক ঝোপের অন্তরালে সেই স্ত্রীলোকদ্বয়কে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাপার অবগত হইয়া ভদ্রলোক তাঁহার চাদর নিজে পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকদ্বয়কে তাঁহার কাপড়খানি ছিঁড়িয়া দিয়া তাহাদের লজ্জা রক্ষার উপায় করিয়া দেন। ভগবানের কৃপায় সেই সদয়হৃদয় ভদ্রলোক সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকদ্বয়কে সঙ্কটের দায় হইতে রক্ষা না করিলে তাহাদের কিরূপ অনুপায় হইত—তাহাদিগকে কয় দিন কয় রাত্রি জঙ্গলে থাকিতে হইত তাহা কে জানে। যে দুর্ব্বৃত্ত এই অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহারও যে কাপড়ের অভাব ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, কেননা সে স্ত্রীলোকদ্বয়ের নিকট হইতে কাপড় কাড়িয়া নিতে যতটুকু বল প্রয়োগের দরকার তাহার বেশী জুলুম করে নাই।—নায়ক।

গত বৃহস্পতিবার দুইজন মৎস্যব্যবসায়িনী স্ত্রীলোক সদর ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড রাস্তা দিয়া "চবচবের" হাটে বেলা আন্দাজ ৪টার সময় মৎস্য বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। তখন হঠাৎ একজন লোক সেই সদর রাস্তায় আসিয়া তাহাদের পরিহিত দুইখানি নূতন বস্ত্র বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়। তখন উলঙ্গ অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকদ্বয় রাস্তার ধারে একটি ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লয়। কিছু সময় পরে একটি লোক রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পান যে, রাস্তার উপর দুইখানি মাছের ডালি (মৎস্যে পরিপূর্ণ অবস্থায়) উল্টাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত অল্পসময় অপেক্ষা করিলে তৎপার্শ্বস্থ ঝোপের মধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক কাতর কণ্ঠে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা তাঁহাকে অবগত করাইলে, তিনি তাঁহার নিজের চাদরটি দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রীলোকদ্বয়কে পরিধানার্থ প্রদান করেন।

—খুলনাবাসী। মালদহ-সমাচার।

সহযোগী "বসুমতী" বলেন:—ফরিদপুর ভাঙ্গা হইতে তাঁহাদের জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—গত ২রা চৈত্র শনিবার অতি প্রত্যুষে ভাঙ্গা বন্দরের নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে এক দরিদ্র মোসলমান রমণী উক্ত বন্দরের কাপড়ের দোকানে উপস্থিত হয়। তাহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর হইবে। তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি অব্যবহার্য্য। তদ্দ্বারা সে অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ করিয়া আসিয়াছিল। দোকানের কর্ম্মচারী নিদ্রাভঙ্গের পর বাহিরে গেলে স্ত্রীলোকটি দোকানে প্রবেশ করিয়া একখানি টুলের উপর উপবেশন করে। কর্ম্মচারীরা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে "তুমি কি চাও?" সে উত্তরে বলে "কাপড় চাই।" একজন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করে "টাকা আনিয়াছ?" রমণী উত্তর দেয় "না।" তখন কর্ম্মচারী বলে "তবে আমরা কাপড় দিব কেন?" রমণী বলে—"আমি টাকা পাইব কোথায়? আজ প্রাতে আমার স্বামী আমাকে এই ছিন্ন বস্ত্রখানি দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে সে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দেখাইয়া বলে, "কাপড় দাও ত দাও—না দাও ত এই ছুরিকার দ্বারা এইখানেই আত্মহত্যা করিব। দিবে ত শীঘ্র দাও—এখনও বাজারের সব লোক জাগে নাই; পরে আমার বাড়ী যাওয়া দুঃসাধ্য হইবে।" কর্ম্মচারী দুইজন তাহাকে একখানি কাপড় দিয়া বিদায় করিয়াছিল। সহযোগী বঙ্গবাসীকে খুলনা জেলার শ্রীপুর হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—কয়েকদিন হইল স্থানীয় একজন ভদ্রলোকের পরিবার সন্ধ্যার সময় জল আনিবার জন্য পুকুরে যায়। যখন সে জল নিয়া বাটীতে ফিরিতেছিল তখন হঠাৎ পিছন হইতে একজন লোক আসিয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে উলঙ্গ করিয়া তাহার পরিধেয় কাপড়খানা নিয়া চম্পট দেয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে কাপড়ের অভাবেই ঐ লোকটি এমন অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।" বরিশাল হইতে আমাদের জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—ভোলা মহকুমার অন্তর্গত কেওয়াডগি গ্রামে নূর বক্স নামক এক ব্যক্তি আজ ১০।১২ দিন হইল কাপড় অভাবে লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সারাদিন গৃহে আবদ্ধ থাকে। পরদিন দেখা গেল, নিজ গৃহের নিকটবর্ত্তী এক গাছে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রাণহীন দেহ উলঙ্গ অবস্থায় গাছে ঝুলিতেছে। ফলতঃ লোকে মাতা-স্ত্রীর লজ্জা নিবারণ করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় সরকারের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কোন মতেই সমীচীন হইবে না। কাপড়ের অভাবে লজ্জার দায়ে আত্মহত্যা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার উপর আবার পথে ঘাটে অসহায় স্ত্রীলোকদের বীভৎস বস্ত্রহরণ আরম্ভ হইয়াছে।—মোহাম্মদী।

"বীরভূমবাসী" লিখিয়াছেন—কীর্ণাহারনিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র রায়ের কাপড়ের দোকানে একদল দস্যু প্রবেশ করিয়া প্রায় আট শত টাকা মূল্যের কাপড় ও নগদ দুই শত টাকা লইয়া গিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, ২৪ পরগণা, সোলাদানার হাটের প্রত্যাগত নৌকা হইতে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত হাটুরিয়াদিগকে মারপিট করিয়া হটিণ্ডা-নিবাসী যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের সাড়ে পাঁচশত টাকা মূল্যের একটা কাপড়ের গাঁট লইয়া গিয়াছে।

সহযোগী "বাঙ্গালী" লিখিয়াছেন—গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে হাওড়া জেলার এক বস্ত্রবিক্রেতা দুইটি কুলীর মাথায় অনুমান পাঁচ শত টাকা মূল্যের দুই গাঁট কাপড় দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। আমড়া গ্রামে সহসা কয়েকজন লোক দা' লাঠি আদি লইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করতঃ গাঁট দুইটি লইয়া গিয়াছে। —মোহাম্মদী।

পাবনা-সাথারিপাড়া-লক্ষ্মীপুর হইতে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ দাস আমাদিগকে লিখিয়াছেন কয়েক দিন হইল পাবনা জেলার অন্তর্গত মাধপুর গ্রামের মধ্য দিয়া দুইটি স্ত্রীলোক নূতন কাপড় পরিয়া আতাইকুলা গ্রামে ঔষধ আনিতে যাইতেছিল। রাস্তায় একটি দুষ্টলোক তাহাদিগকে উলঙ্গাবস্থায় রাখিয়া কাপড় লইয়া পলায়ন করে। ঐ দুই স্ত্রীলোক উলঙ্গাবস্থায় নিকটস্থ এক বাড়ী হইতে কাপড় লইয়া লজ্জা নিবারণ করে। —পাবনা বগুড়া-হিতৈষী।

ময়মনসিংহ দুল্ল-জমিদারবাড়ী হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ভিখারিণীরা বস্ত্র অভাবে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে না পারিয়া উপবাস করিয়া দিন কাটাইতেছে। পল্লী-রমণীদের অনেকেই এখন ক্রিয়া-কর্ম্ম উৎসবাদিতে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, গৃহের বাহির হইতে পর্য্যন্ত অসমর্থ। হিন্দুললনা প্রাণান্তেও সধবা অবস্থায় সাদা কাপড় (পাড় বিহীন) পরিধান করেন না—কিন্তু

এবার লজ্জা নিবারণের জন্ম আর দ্বিতীয় বস্ত্র না থাকায় স্বামীকে গামছা পরাইয়া ঐ একমাত্র বস্ত্র দ্বারা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই কার্য্য চালাইতেছে। আমি চিকিৎসার্থে বাহির হইয়া সুদূর মফঃস্বলে যে চিত্র দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় ৩০, বৎসর পূর্ব্বে অসভ্য গারো সাঁওতাল কুকী রমণীদের বসন-ভূষণের যে অবস্থা ছিল, বর্ত্তমান রমণীদের অবস্থা তাহাদের চেয়েও শোচনীয়! পল্লীবালকগণ অনেকে স্কুল পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহারা ৪ আঙুল চওড়া ও ১০হাত লম্বা নেকড়া (লেংটি) পরিয়া অতিকষ্টে স্ব স্ব গৃহে কালযাপন করিতেছে। এইসব বালকেরা লজ্জায় সমপাঠীদের কাছে গিয়া খেলাধূলা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। কি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। গবরমেণ্ট অবিলম্বেই এই সুদারুণ বস্ত্র-সমস্যার প্রতিকার করুন।

—পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী।

পাবনা জেলার অধীন মহিষাকোলা রেলষ্টেশনের কিছু দূরে একদিন অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় একটি স্ত্রীলোক যাইতেছিল। পথে অপর একটি নব-বস্ত্র-পরিহিতা স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তখন নববস্ত্র-পরিহিতা স্ত্রীলোক অপরার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহানুভূতিপ্রযুক্ত বলে "মাইরে আমিও এইপ্রকার হইয়াছিলাম, খোদার দয়ায় একখানা নূতন কাপড় পাইয়াছি।" তখন অপরা "দেখি কেমন" বলিয়া সজোরে আকর্ষণ-পূর্ব্বক বস্ত্র গ্রহণ করিয়া জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিধান করতঃ দৌড়িয়া যাইতে থাকে ও নগ্না স্ত্রীলোকটি ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। মাঠের লোক আততায়ী স্ত্রীলোক ধরিবার জন্ম প্রস্তুত হওয়ায় জমিদারের তহশীলদার তথায় উপস্থিত হইয়া নিরস্ত করে এবং নিকটস্থ গ্রামের কোন সদাশয় গৃহস্থের সাহায্যে পুরাতন একখানা বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দেয়। এই-প্রকার ঘটনা হইতেই বস্ত্রমূল্যের আধিক্যবশতঃ পল্লীর সাধারণ লোকের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা অনুমেয়। প্রতি ঘরে ঘরে বস্ত্রের জন্ম তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে ভবিষ্যতে আর যে কি হইবে তাহার চিন্তা করিতেও সাহস হয় না। গভর্ণমেণ্ট ও সুখে-প্রতিপালিত দেশনায়কগণের এ বিষয়ে সত্বর সুদৃষ্টি প্রার্থনীয়।

—সঞ্জীবনী।—সুরাজ।

পাবনা জেলার অধীন বাউলিয়া মুরদপুরের নিকটস্থ যমুনার চরের মধ্যে একটি ভয়াবহ ভীষণ আত্মহত্যা হইয়াছে। ঘটনা এই যে ঐ চরের কোন বিধবার জামাতা শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ করে যে তাহার শ্বশ্রূ অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় কন্থা দিয়া মাজা জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে। ঐ প্রকার দেখিয়াই জামাতা পশ্চাদ্পদ হয় এবং শ্বশ্রূও গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। জামাতা অতীব দুঃখিত হইয়া বাড়ী গিয়া বহু আয়াসে একখানি নববস্ত্র লইয়া আসিয়া দেখে তাহার শ্বশ্রূ অসহ্য ক্লেশ ও লজ্জায় আত্মহত্যা করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছে।—সঞ্জীবনী।—সুরাজ।

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা।—তজুমদ্দি থানার অন্তর্গত কেওরা ডগী কিসমতে মুরবক্স্‌ নামক এক ব্যক্তি বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার স্ত্রীর কাপড় ছিলনা, অতিকষ্টে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া কাপড়ের জন্ম বাজারে যায়, কিন্তু তাহাতে কাপড় খরিদ করিতে পারে না। বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে এই কথা বলায় সে আত্মহত্যা করিতে চাহে। তখন মুরবক্স্‌ বলে যে, "তুমি কেন মরিবে? আমিই মরি," এবং সুযোগমতে গলায় রশি দিয়া আত্মহত্যা করে। শুনিলাম ঐ অঞ্চলে নাকি আরও একটি লোক ঐরূপ আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এমন সময় কে দেখিতে পাইয়া রক্ষা করিয়াছে।

—বরিশাল হিতৈষী।

অনেক স্থানে দেখা যাইতেছে যে মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের রমণীগণ বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছেন না। ঘরে শত ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। মফঃস্বলের কৃষক ও গরীবদিগের অবস্থা দেখিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। যেদিকেই তাকান যায়, সেইদিকেই কেবল হা বস্ত্র, হা বস্ত্র রবে গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভিক্ষুক বস্ত্র-অভাবে ভিক্ষায় বাহির হইতে না পারিয়া অনশনে দিন যাপন করিতেছে। গ্রাম্য বিদ্যালয় বস্ত্রাভাবে ছাত্রশূন্য। বঙ্গের চারিদিকে বস্ত্রাভাব জন্ম আত্মহত্যা পর্য্যন্তও হইতেছে। শাশুড়ী বস্ত্রাভাবে জামাতার সম্মুখে বাহির হইতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সকল কষ্ট লোকে সহ্য করিতে পারে, পরিধান-বস্ত্রের কষ্ট সহ্য করা এক প্রকার অসম্ভব। লোকে ২।১ দিবস না খাইয়া সময় কাটাইতে পারে, কিন্তু কাপড় পরিধান না করিয়া এক পাও বাহিরে যাইবার উপায় নাই। —মালদহ সমাচার।

প্রতিকারের উপায়।—এদেশের বস্ত্রসমস্যাটা দিন দিন যেরূপ সঙ্কট-জনক হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে এখন গ্রামে গ্রামে এবং প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীতে অন্ততঃ আপনাপন পরিবারের বস্ত্রাভাব নিবারণ জন্ম কিছু কিছু কার্পাস চাষ ও চরকার প্রচলন করিতে না পারিলে আমাদের বস্ত্রাভাব-জনিত দুর্গতি নিবারণের উপায় নাই; স্থানে স্থানে লোকে এই দুইটি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে বটে, কিন্তু দেশের বস্ত্রাভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। এ অবস্থায় এখন দেশের প্রত্যেক অধিবাসীরই উক্ত দুইটি বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া একান্তই আবশ্যক। পূর্ব্বে এদেশ-জাত কার্পাস হইতে স্ত্রীলোক-গণের দ্বারা চরকায় প্রস্তুত সূত্রেই এদেশবাসীর বস্ত্রাভাব সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইত, অধিকন্তু তখন এদেশের প্রস্তুত বস্ত্রই নানা দিগ্‌দেশে রপ্তানী হইয়া কত শত বিদেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিত। সে সময় এই চরকা-নির্ম্মিত সূতার এতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যে, এই চরকার সূতায়ই জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই মখমল (মস্‌লিন) প্রস্তুত হইত। এ দেশে এমন অনেক বিধবা ও অনাথ স্ত্রীলোক রহিয়াছেন, যাহাদিগকে পর-গলগ্রহ হইয়া নানাপ্রকার হীন কার্য্য দ্বারা কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। তাঁহারা যদি এই চরকায় সূতা-কাটা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের একটা পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই যেমন স্বীয় পরিবারের সাম্বৎসরিক অন্ন সংস্থান জন্ম ধান চাষ করিয়া থাকেন, এখন সেইরূপ স্বীয় পরিবারের বস্ত্রাভাব নিবারণ জন্মও সকলেরই কার্পাস চাষ এবং চরকার প্রচলনে বদ্ধপরিকর হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।—নীহার।

ভারতে অন্নদুর্ভিক্ষ পূর্ব্বেও কখন কখন হইত, বর্ত্তমানে ত নিত্য দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। কিন্তু বস্ত্রদুর্ভিক্ষ বোধ হয় সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগের মধ্যে এই-ই প্রথম।

এই যে লোক আত্মহত্যা করিতেছে, আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে, লজ্জা নিবারণ করিতে না পারিয়া কত কষ্ট অনুভব করিতেছে, কিন্তু তবু আমাদের সাড়া নাই, আমরা যেন অচেতন।

এখন এ বিষয়ে আমাদিগকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? প্রথম, নিতান্ত গরিবদিগের সন্ত লজ্জা নিবারণ করার উপায় বিধান। এইজন্ম সমর্থ ব্যক্তির অর্থ সাহায্য, এবং সাধারণের চাঁদা হইতে বস্ত্র বিতরণ, আর পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বিতরণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ বিপদে আর পতিত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে উপায় অবলম্বন। তাহার উপায় কি? ইহা বলিতে গেলে আবার সেই পুরাতন কথা "স্বদেশী" আসিয়া পড়ে! অর্থাৎ

স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে এরূপ অভ্যস্ত হইতে হইবে যে, বিদেশী বস্ত্র যে ব্যবহার করা যায়, তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে।

তারপরে দেশে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র বয়নের ব্যবস্থা করা। কার্পাস-বস্ত্রই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ইহারই উন্নতির চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। ইহা দুই উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমত কলের সাহায্যে, দ্বিতীয় দেশী হাতের তাঁতে। বড় বড় কল কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের বস্ত্রাভাব মোচন করা এই গরীব দেশের পক্ষে বড় কষ্টকর। সুতরাং আমাদিগকে হাতের তাঁতের প্রতিই বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

যৌথ ব্যবসায় ব্যতীত বড় বড় কাপড়ের কল স্থাপন করা সহজ-সাধ্য না হইলেও আমাদের দেশে এরূপ অনেক ধনী লোক আছেন, যাঁহারা অনন্যসাপেক্ষ হইয়া দশ বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিতে পারেন। এইসকল কারখানার কোনটায় সূতা প্রস্তুত, কোনটায় সূতা হইতে তানা দিয়া নরাজ করা, এবং কোনটায় বা প্রস্তুত করা কাপড় ইস্ত্রি করার কার্য্য হইতে পারে। তাহা হইলে, তন্তুবায়গণ কারখানা হইতে সূত্র নরাজ খরিদ করতঃ তাঁতে জুড়িয়া অনায়াসে বস্ত্র বয়ন করিতে পারে। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে বস্ত্রবয়ন-কার্য্য এত সহজ হইয়া আসিবে যে, ব্যবসায়ী তন্তুবায়গণ ব্যতীত সাধারণ গৃহস্থগণও অনেকে বস্ত্রবয়ন-কার্য্যে লিপ্ত হইবার সুযোগ পাইবে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে অনেক ভদ্রলোকের গৃহে মোজার কল এবং সেলাইর কল হইতে মোজা ও জামা প্রস্তুত হইতেছে, সেইরূপ বস্ত্রও প্রস্তুত হইতে পারিবে। যদি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এইরূপ একটি কারখানা স্থাপন করিয়া সূতা হইতে নরাজ করা পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দেন, তবে তন্তুবায়গণ সুবিধা পায়, ব্যবসায়ীগণ আদর্শ অনুকরণ করিতে পারে, এবং তাঁহাদেরও লাভ হয়। এক্ষেত্রে শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত দুএকজন যুবককে নিযুক্ত করিলে মন্দ হয় না।

—বরিশাল হিতৈষী।

এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? ১। আমাদের কর্ত্তব্য এখন আমাদের প্রত্যেক বাড়ীতে গড়ে ২০।২৫টি কাপাসের গাছ প্রস্তুত করা। ২। প্রত্যেক কৃষককে অন্ততঃ ৴৩।৴৪ কাঠা জমিতে কাপাসের চাষ করিতে উপদেশ দেওয়া। ৩। মিস্ত্রিরী দ্বারা চরকা প্রস্তুত করাইয়া দরিদ্র ও অনাথদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া। ৪। দেশের ইতরভদ্র ধনী নির্ধন সকল গৃহের মা-লক্ষ্মীরা যাহাতে চরকা কাটিতে আরম্ভ করেন, অবিলম্বে তাহার চেষ্টা করা। ৫। উন্নত প্রণালীর তাঁত যাহাতে আবার দেশ-মধ্যে বহুল পরিমাণে স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা করা। ৬। যতদিন নূতন গাছে কাপাস না হয়, ততদিন যাহারা চরকা কাটিবে, তাহাদিগকে তুলা সরবরাহ করা। এইরূপ ভাবে যদি দেশের জমিদার, ধনী, নেতা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলে এক যোগে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কার্য্য করেন, তাহা হইলে অচিরে বস্ত্রাভাব নিবারিত,—মাতা ও ভগিনী-স্ত্রী-কন্যার লজ্জা নিবারণ হইবে।

—খুলনাবাসী।

এই বস্ত্রাভাব নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

১। এদেশে যে-সকল কাপড়ের কল আছে, তাহাতে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে কাজ হইয়া যথেষ্ট সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করুন।

২। এদেশের কাপড়ের কলওয়ালা ও মহাজনদের গুদামে যে-সমস্ত কাপড় এখন মজুদ আছে, সরকার হইতে তাহা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে যাহাতে জনসাধারণ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন।

—খুলনাবাসী।

আত্মশক্তির সাহায্যেই আমাদিগকে এই বস্ত্রসঙ্কট দূর করিতে হইবে। কি উপায়ে, কোন্ পদ্ধতি মতে চলিলে তাহা হইবে, তাহা বলিতেছি—

(১) বাঙ্গালার মাটী এখনও তুলার চাষের অনুপযোগী হয় নাই। সাধারণ তুলা খুবই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত করা যাইতে পারে। এই সাধারণ জাতীয় তুলা হইতে মোটা কাপড়ের উপযোগী সূতা অনায়াসে চরকার সাহায্যে তৈয়ারী হইবে, এমন আশা এখনও আমরা করিতে পারি।

(২) চরকার চলন এখন বাঙ্গালার প্রতি গৃহস্থের বাটীতে নাই বটে। কিন্তু চরকা হইতে সূতা কাটিতে পারে এমন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এখনও প্রায় অনেক গ্রামেই আছে। তাহাদের সাহায্যে চরকায় সূতা তৈয়ার করার উপায় সহজেই শিক্ষা করা যায়।

(৩) পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, মেয়েরা সূতা কাটিবেন এবং সেই সূতা তাঁতিরা লইয়া তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনিবে। সে ব্যবস্থা খুব ভালই ছিল। সূতা প্রস্তুত করিলে সমাজের চক্ষে কেহ হেয় হইতেন না। যে স্ত্রীলোক যত সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী করিতে পারিতেন, তাঁহার তত বেশী সম্মান ও আয় হইত। চরকায় সূতা কাটিয়া অনেক ভদ্রঘরের বিধবা সংসার প্রতিপালন করিয়াও যথেষ্ট পরিমাণ 'স্ত্রীধন' রাখিয়া যাইতেন। সেকালে কেবল তন্তুবায় জাতির সন্তানেরাই যে তাঁত চালাইত তাহা নহে, অন্যান্য জাতির লোকেও তাঁত বুনিত এবং তাহাতে লজ্জা ছিল না। এখন যেমন স্বর্ণকার প্রভৃতির দোকানে অনেক উচ্চ জাতির ছেলেরা কর্ম্মশিক্ষা করে, ছাপাখানায় ব্রাহ্মণ-বৈদ্য কায়স্থ-সন্তানেরাও যেমন কম্পোজ করে, তখনও তেমনই তাঁত বুনায় লজ্জা ছিল না। বাস্তবিকই শ্রমের কার্য্যে লজ্জা কি? যে জাতি নিজেদের অভাব নিজেরা কায়িক শ্রম দ্বারা পূরণ করিতে পারে, অথচ বাহিরের কাহারও সাহায্য লয় না, তাহারাই জগতে প্রকৃত সম্মানার্হ।

(৫) বাঙ্গালা দেশের কৃষকদিগকে তুলার চাষে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক পল্লীগৃহস্থকেও তাঁহার প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে দুইচারিটি তুলার গাছ রোপণ করিতে হইবে। এই গাছের তুলা হইতে তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীরা সূতা তৈয়ারী করিবেন। এই ভাবে কার্য্য করিলে আমরা বস্ত্রব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মবশ হইতে পারিব।

(৬) নিজেদের অভাব নিজেরা বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূরণ করিতে পারিলেই তাহাকে 'আত্মবশতা' বলে। যে জাতি যতদূর আত্মবশ, সে জাতি তত বেশী স্বায়ত্তশাসনক্ষম। ইহা খাঁটি কথা।

আমরা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দাবী করি। বস্ত্রসঙ্কট এই ভাবে নিবারণ করিতে পারিলে আমাদের সে দাবী আরও বলবৎ হইবে। আর যে জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে চায়, ভগবান সে জাতিকে সাহায্য করিয়া থাকেন—এ কথাটিও আমাদের স্মরণ করা উচিত।

—বাঙ্গালী।

বস্ত্র দান কর।—নগরের মুষ্টিমেয় লোক আজও ফিন্‌ফিনে ধুতি পরে—ইস্ত্রি-করা সার্ট কোট গায়ে দেয়—পল্লীগ্রামে বস্ত্রাভাবে কি কষ্ট হইতেছে তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অনেকে গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করিতেছে—অপরের প্রাণের জ্বালা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। শতগ্রন্থী মলিন বসন পরিহিত পুরুষ-রমণী দর্শনে তাহাদের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে না—উঠিলে, আজও কোনও চেষ্টা করা হয় না কেন? এই যে একজন ধনী অপর একজন জমিদারের খত ক্রয় করিল বলিয়া কালীবাড়ীতে ৪টী মহিষ বলি দিলেন, তিনি কি এই দুর্ব্বৎসরে একখানি বস্ত্রও তাঁহার দীন দেশ-

বাসীকে দিয়াছেন? এই যে বাসন্তী পূজা আসিতেছে ইহতে যে শত শত টাকা যাত্রায় ঢপে বা রং-তামাসায় উড়িয়া যাইবে, তদ্দারা একশত দরিদ্রকে বস্ত্র দান করিলে কি মা বাসন্তী দুঃখিতা হইবেন? না পূজার সাত্ত্বিকতা নষ্ট হইবে? এই যে বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষকে তাহাদের দাবী প্রদান করার পরও যাত্রাগানাদি উৎসবে ব্যাণ্ডাদি বাদ্যে বহু অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা না করিয়া কি দরিদ্রকে বস্ত্র দান করা সুশোভন কার্য্য নহে? আমরা আশা করি অচিরে একটি ফণ্ড করিয়া দরিদ্রের লজ্জা নিবারণ করিবার ব্যবস্থা হউক। কেবল গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা বা তাহাদের প্রতি ভরসা করিলে ফল কি হইবে। এই যে কয়েকটি স্ত্রীলোক বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিল তাহাতেও কাহারও দয়ার উদ্রেক হয় নাই—সিন্ধুবালা দ্বয়ের জন্য ক্রন্দন যেমন আবশ্যক, এই নিবস্ত্রা মাতা-ভগ্নীদের জন্যও ততোধিক ক্রন্দন আবশ্যক। তাই বলি ভারতবাসী—বাঙ্গালী আর উদাসীন থাকিও না—বিলাসব্যসনে অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার তোমার নাই। হে জমিদার, লাট-কাউন্সিলে ভোটের বলে কৃষিজাতের উপরে আয়কর রহিত করিয়াছ বটে, কিন্তু কালের চক্রের নিকটে নিরঙ্কুশ ফিরিতে পারিবে না।

—বরিশাল-হিতৈষী।

অপর সকল কাগজেও এইরূপ উপায়ই বস্ত্রসঙ্কট নিবারণের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। বস্ত্রাভাব নিবারণের যেসব উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রতিপালনের মাত্র দুটি দৃষ্টান্তের সংবাদ আমরা পাইয়াছি।—

কার্পাস চাষে প্রবৃত্তি—মুক্তাকান্দু অঞ্চলে প্রজাগণ অত্যধিক বস্ত্রাভাব অনুভব করিয়া কার্পাস চাষের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে বীজ আনয়নের চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক।—বরিশাল হিতৈষী।

বস্ত্রদান।—গত ৩০শে চৈত্র ২৪ পরগণা লস্করপুর গ্রামের শ্রীসাগরচন্দ্র মান্না তাঁহার বাৎসরিক দেব গোষ্ঠ পর্ব্বোপলক্ষে সাত আট শত দরিদ্র কাঙ্গালীকে পরিতৃপ্তরূপে আহার করাইয়া এক খানি করিয়া প্রমাণ ১০ হাতি কাপড় বিতরণ করিয়াছেন।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

দেশের অন্যান্য বিবিধ জ্ঞাতব্য সংবাদের ছিটেফোঁটা আমরা এইসমস্ত জানিতে পারিয়াছি।—

শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।—স্থানীয় জজ আদালতের উকিল বাবু শরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত নোয়াখালি সদর মহকুমার অধীন সেনবাগ থানার কাদরা গ্রামে ইণ্টার্ণড হইয়া গত ২৫এ এপ্রেল রাত্রির ট্রেনে খুলনা হইতে রওয়ানা হইয়াছে।—খুলনাবাসী।

দান।—কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য দানশীল ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় গত মঙ্গলবার দিন স্থানীয় 'বিধবা আশ্রমের' সাহায্যকল্পে এককালীন ১০০্ টাকা এবং ঢাকা জিলা সমিতির জন্য ৫০০্ টাকা দান করিয়াছেন। 'দাতা শতং জীবতু' ইহাই আমাদের আশীর্ব্বাদ।—ঢাকাপ্রকাশ।

জিতেন্দ্রনাথের দান।—প্রসিদ্ধ নেতা অনরেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয়কে জানাইয়াছেন যে:—যুদ্ধের পরে যদি বাঙ্গালী পণ্টনকে স্থায়ী করা হয় তাহা হইলে তিনি লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। জিতেন্দ্রনাথ বাহুবলে বরাবরই প্রসিদ্ধ, তিনি যখন বিলাতে অবস্থান করিতেন তখন সেখানেও তিনি বিশেষ বলবান ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। আজ বাঙ্গালায় বীরধর্ম্মের উন্মেষ ও সাধনা কল্পে তিনি যে দান করিতেছেন তাহা তাঁহার যোগ্যই হইয়াছে।—মোহাম্মাদী।

ঢাকায় চামড়ার কারবার।—স্বদেশশিল্পসমিতির প্রযত্নে ঢাকায় চৌধুরী বাজারে সংপ্রতি চামড়ার একটি নূতন কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এইস্থলে মুচি বালকদিগকে চামড়া পাকা করা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।—বরিশাল-হিতৈষী।

বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের হিসাবে দেখা যায় রাজসাহী জেলায় শতকরা ৫জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে। —হিন্দুরঞ্জিকা।

গবর্ণমেণ্ট রাজসাহী টাউনে নূতন একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করিতেছেন, তজ্জন্য বর্ত্তমান সরকারী হাঁসপাতালের উত্তর ধারে ৫০ বিঘা জমি acquire করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।—হিন্দুরঞ্জিকা।

সহযোগী "চারুমিহির" জনরব-মুখে শুনিয়াছেন, ময়মনসিংহ-করটীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ওয়াজেদালী খাঁ পাণি সাহেব নিজ গ্রামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সত্য হইলে জমিদার সাহেব দ্বারা টাঙ্গাইলের একটি গুরুতর অভাব দূরীভূত হইবে।—ঢাকা-গেজেট। —মোহাম্মাদী।

মক্তবে আনোয়ারিয়া।—যাহারা আফিসে দপ্তরীর কার্য্য করে অথবা দিনের বেলায় অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকে সেই-সকল লোকের মধ্যে শিক্ষার বিমল আলোক প্রবেশ করাইবার জন্য মৌলবী গোলাম রাজ্জাক খান নামক জনৈক কর্ম্মী কলিকাতা ১০ নং করিসচার্চ্চ লেনে একটি নৈশ মক্তব-স্থাপন করিয়াছেন। এই মক্তবটি গত মার্চ্চ মাসে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠার্থীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে,—কোরআন শরীফ, উর্দ্দু ও পারিবারিক জীবনে আবশ্যকীয় হিসাব পত্র শিখান হইয়া থাকে। গত ৩ বৎসর হইতে অনেক অশিক্ষিত লোক এই মক্তবে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে। এদেশের সহরসমূহের স্থানে স্থানে এবং প্রত্যেক পল্লীতে এইরূপ অসংখ্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। পল্লীগ্রামের যে-সকল ধড়িবাজ গুরুমহাশয়রা দাগাবাজি করিয়া নাইট স্কুলের নামে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা আদায় করেন, তাঁহারা যদি শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইত।

—মোহাম্মাদী।

বিধবা বিবাহ—ময়মনসিংহ হিন্দু হিতসাধিনী সভার সাহায্যে বিগত ৬ই বৈশাখ শনিবার মাস্কা-নিবাসী স্বর্গীয় কমল তিলক দাসের পুত্র শ্রীমান শ্রীবশিষ্ঠ তিলক দাসের সহিত মেছুয়ারী-নিবাসী স্বর্গীয় সাচুনী তিলক দাসের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা বালবিধবা কন্যা শ্রীমতী সত্যময়ীর হিন্দু পদ্ধতি মতে বিবাহ হইয়াছে।—ঢাকা-গেজেট।

"সঞ্জীবনী" পত্রিকায় "বঙ্গীয় অবনত জাতির উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি" সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীরাজমোহন দাস যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তার স্থূল মর্ম্ম এই—

গত ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাসের মধ্যে যতগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও যত টাকা সাহায্য করা হইয়াছে তার বৃত্তান্ত—

এই বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই নৈশ শিক্ষালয় এবং তাহার অনেকগুলি বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় অবস্থিত। এই মহকুমার অধিবাসীগণ নৈশ বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী। নৈশ বিদ্যালয়ে ইহাদের অল্পবয়স্ক সন্তানগণ সহ পূর্ণবয়স্ক যুবকেরা, কখনও প্রৌঢ়েরাও,

পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে ;—দিবাভাগে বালকগণ সহ সকলেই জীবিকার জন্য আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এখানে শিক্ষার জন্য সকলেরই যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। ২।৩টি টাকা সাহায্য করিলে ঐ অঞ্চল স্কুলজাকেআচ্ছাদন করা যাইতে পারে। আমাদের কতটুকু অধ্যবসায় আছে এবার তাহারই পরীক্ষা হইবে।

বর্দ্ধমান জিলা।

১। গড়নৈশ ২৲ ডিসেম্বর হইতে।
২। কাননাড়া ২৲ ঐ।
৩। ঝিকরভাঙ্গা ২৲ জানুয়ারী হইতে।
৪। ঝিকরভাঙ্গা নৈশ ২৲ ঐ।

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ।

১। রত্নাগরদী মুচি ২৲ ডিসেম্বর হইতে।

ত্রিপুরা সদর।

১। মণিপুরা নৈশ ২৲ ডিসেম্বর হইতে।

বীরভূম রামপুরহাট।

১। পালসা নৈশ ২৲ ডিসেম্বর হইতে।
২। আয়াস নৈশ ২৲ ভাল রিপোর্ট পাইলে মার্চ্চ হইতে।
৩। মহেন্দ্রপুর নৈশ ২৲ ডিসেম্বর হইতে।
৪। জয়দেবপুর বালিকা ৩৲ জানুয়ারী হইতে।
৫। জয়দেবপুর নৈশ ৩৲ ঐ।
৬। কাওরা বেলিয়া নৈশ ২৲ ডিসেম্বর হইতে।
৭। সাশপুর নৈশ ২৲ জানুয়ারী হইতে।

আমি বামুনভাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মৈনন এবং ঘাটমিন্‌সে গ্রাম পরিদর্শন করিয়া উক্ত উভয় গ্রামে সমিতির স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছি। এই দুইটি গ্রাম অনধিক একমাইল দূরে অবস্থিত।

এই এক মাইলের মধ্যে আমি আরও দুইটি পাঠশালার সূত্রপাত দেখিয়াছি। বিপুল ভাঙ্গা বাজারে একজন দোকানদার ১৪।১৫ জন কাওরা পোদ এবং কুমারের ছোট-ছোট ছেলেকে তালপাতায় দুইবেলা শিখাইয়া থাকে। এজন্য উক্ত দোকানদার প্রত্যেক ছেলের নিকট মাসে ৵০ আনা মাসিক পায়। এইস্থান হইতে পোয়া মাইল দূরে একজন লোক ঐ শ্রেণীর কৃষক বালক ১১।১২ জনকে লেখাপড়া কিছু-কিছু শিখাইয়া থাকে। আমিও ঐ স্থানের এক মাইলের মধ্যে দুইটি পাঠশালা সমিতির পক্ষ হইতে গ্রহণ করিলাম। তাহার এক একটিতে প্রায় ৩০ জন বালক বালিকা হইবে। ইহা ছাড়া ধম বোর্ডের সাহায্য-কৃত একটি নিম্নপ্রাইমারী পাঠশালা ঐ স্থানটুকুর অন্তর্গত অম্বলছাড়া গ্রামে আছে। ইহাতে দেখা যায় মাত্র এক বর্গ মাইল স্থানের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ ৫টি নিম্নপ্রাইমারী স্কুল আছে এবং ইহার প্রত্যেক স্থানে বালকেরা শিক্ষার জন্য কিছু-কিছু ব্যয় করিয়া থাকে। দেশের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদিগের উপরোক্ত প্রকার আত্ম-চেষ্টা কি শিক্ষার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নহে? তালপাতায় লেখা শিখিতে তাহারা মাসে ৵০ দিতে প্রস্তুত আছে। যদি কেহ দয়া করিয়া প্রতিমাসে ২।৪ দিন ইহাদের সহিত বাস করিয়া শিক্ষা বিষয়ে সৎপরামর্শ দেন, পাঠশালা গঠন করিবার প্রণালী এবং একপ্রাণ হইবার উপায় শিক্ষা দেন, তাহা হইলে এই অজ্ঞান কৃষকেরা বিনা অর্থ-সাহায্যেও আপন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের উপর অতটুকু দাবীও কি দেশবাসীদের নাই? অযাচিতভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রামে আসিতে দেখিয়া এই নিরক্ষর হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরা আমাকে কেবল ইহাই বলিয়াছে,যে "ঈশ্বর আজ আপনাকে আমাদের গ্রামে পাঠাইয়াছেন।"

একজন যুবকের আহ্বানে আমি বর্ত্তমান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হুগলি জিলায় সদর মহকুমাস্থিত গুপ্তিপাড়া গ্রামে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন জন্য গিয়াছিলাম। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার জন্য উচ্চবংশীয়েরা ডাকিয়া নেওয়ার দৃষ্টান্ত আমার নিকট এই সর্ব্ব-প্রথম। যত স্কুল করা হইয়াছে সমুদায়গুলিই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গিয়া তাহাদের সাহায্য ও সমিতির কর্ত্তব্য জ্ঞানে স্থাপিত হইয়াছে।

ইঁহাদের যত্নে আমি গুপ্তিপাড়ার চতুর্দ্দিকে দূরে এবং নিকটে ৩টি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনে সমর্থ হইয়াছি। এই তিনটি গ্রামের নাম বাধাগাছি, মিরডাঙ্গা এবং গোসাঁইডাঙ্গা। এখানেও পিতা মাতা বালকদিগকে রাখালী কাজ ছাড়াইয়া দিবাভাগে স্কুলে দিতে অনিচ্ছুক, তাই নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। তবে গোসাঁইডাঙ্গাতে দিবাভাগে স্কুল চলিবে এরূপ আশা করা যায়।

আমি গুপ্তিপাড়ার যে যুবকের আহ্বানে তথায় গিয়াছিলাম তিনি কলিকাতা সিটী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, এবার বি-এ পরীক্ষা দিবেন। ইনি ২০ বৎসর বয়স্ক। ইঁহার প্রকাণ্ড চকমেলান পাকা বাড়ী। ইঁহারা স্থানীয় সমৃদ্ধিশালী লোক। বাড়ীতে ২।৩জন চাকর এবং বাগানে মালী অনুক্ষণ কাজ করে। কোনও দিকে কোন প্রকার অভাব নাই। বিছানা সহ আমার জিনিসপত্রের ওজন অন্যূন আধমন হইবে, তাহা ছাড়া ৫।৬ সের ওজনের কয়েকটা পেঁপে। এ বাড়ী হইতে রেল ষ্টেসন আধ মাইলের উপর হইবে। যখন ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল যুবকটি আমাকে বিস্মিত করিয়া সেই বিছানাসহ জিনিস-পত্র একেবারে মাথায় তুলিয়া রওনা হইল। ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ তাঁহার অপর বন্ধু আমার পেঁপেগুলি হাতে করাতে আমার পক্ষে এত হজম করা অসম্ভব হইল। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া পেঁপেগুলি আমি হাতে রাখিলাম। ইঁহারা উভয়েই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রথমোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শেষেরটি মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের চাকর ডাকিতে বলায় যুবক উত্তর করিল—চাকরেরা দুই প্রহরের পর একটুকু ঘুমায়, এই সামান্য কাজ যাহা অনায়াসে আমরাই করিতে পারি তজ্জন্য তাহাদের ঘুম ভাঙ্গান কি উচিত হইবে? চাকরের আরাম ভাঙ্গা উচিত নহে এরূপ সহৃদয়তাপূর্ণ পুণ্যকথা পুস্তকে পড়িয়াছি, কিন্তু কখনও নিজ কানে শুনি নাই। অভিজাত শ্রেণীর কথা দূরে থাকুক, সাধারণ ভদ্রলোকেরও উপরোক্ত অবস্থায় কুলীর অভাবে রেলযাত্রা স্থগিত থাকে। নিজের বোঝা বহিয়া নেওয়াই যখন লজ্জা ও অপমান, বিদেশী লোকের মোটের ত কোন কথাই হইতে পারে না। আমি এ গ্রামে সম্পূর্ণ বিদেশী লোক। যুবকেরা যখন মোট মাথায় চলিতে লাগিলেন, সূর্য্যালোকে মলিন তারকার মত আমি তাহাদের পশ্চাৎ নিজের পেঁপে কয়টির ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া চলিতে লাগিলাম। আমার বৃদ্ধ বয়সের ওজুহাত দেখাইয়া অনেকবার অপর যুবকটি পেঁপেগুলি আমার হাত হইতে নিয়া আমাকে আরাম প্রদান করিতে চাহিলেন। আমি কি করিয়া অতদূর নির্লজ্জ হইতে পারি? অভ্যাস না থাকিলেও যুবকেরা যে সৎসাহসের দৃষ্টান্ত আমার সম্মুখে ধরিয়াছিলেন তদ্দ্বারা সেই দিনের কার্য্য একপ্রকার চালাইয়া লইলাম। কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া তাহার পরদিন হেয়ারস্কুলের ছেলেদিগের মেগাজিনে পড়িলাম—"When Rome was a flourishing city, her great generals after coming out victorious at the battle-fields repaired to their ploughs to earn their livelihood by manual labor. They felt no shame to work." আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা পুস্তকে উহা পড়ি কিন্তু সৎসাহস-বিহীন হওয়ায় প্রাণ মন বিন্দুমাত্রও ঐ ভাবে গঠিত হয় না। শারীরিক পরিশ্রমের কাজকে অতিশয় ঘৃণ্য বলিয়া আমরা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করি,

এবং অন্য কেহ করিলেও তাহাকে হীনলোক বলিয়া মনে করি। নিজে কোন একটা দ্রব্য বহন করিয়া রাস্তায় মনে মনে ভাবি কেহ বুঝি দেখিল। আমি পদস্থ লোক, আমার হাতে কতকগুলি কলা ও মূলা বহন করিয়া নেওয়া ত দূরের কথা, বাজারে গিয়া খাদ্যদ্রব্য খরিদ করাও অপমান মনে করি। যদি অবস্থার তাড়নে কোন জিনিষ হাতে করিয়া নিতে বাধ্য হই তাহা এরূপভাবে কাপড় বা কাগজ দিয়া জড়াইয়া লই যেন কেহ উহা অতি সামান্য বা হেয় জিনিস বলিয়া মনে করিতে না পারে। উপরোক্ত প্রকার প্রচলিত ব্যবহারের মধ্যে একজন বিদেশী অতিথির অনূন আধ মোন বোঝা মাথায় তুলিয়া চৈত্র মাসের রৌদ্রে ৩টার সময় আধ মাইল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বহন করিয়া নেওয়া কি এক অপূর্ব্ব চিত্র তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে লোকের অনুভব করা অসম্ভব। উচ্চ শিক্ষিত কুলীন ব্রাহ্মণ যুবকগণ মোট মাথায় করিয়া বহিয়া নেয় বঙ্গদেশের পক্ষে কি উহা পুণ্যকাহিনী নহে? কখন্ সমুদায় বঙ্গদেশে সেইদিন আসিবে যখন মনে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ না করিয়া অতি স্বাভাবিকভাবে সর্ব্বপ্রকার শ্রমের কার্য্য আনন্দের সহিত উচ্চনীচ সমুদায় শ্রেণীর লোকে সমভাবে বরণ করিয়া নিবে। অত্যল্প সময়ের জন্য হইলেও এই যুবকদ্বয়ের আচরণ ও কার্য্য দেখিবার সুযোগ পাইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছি, তাঁহাদের সংস্পর্শে আমার একটি দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, আপনাকে উচ্চতর স্থানে স্থাপিত করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে। ঈশ্বর এই আকাঙ্ক্ষা সবল রাখুন এই প্রার্থনা।

চারু।

পুস্তক-পরিচয়

ঋতুলীলা—শ্রীরসময় লাহা. ৭ জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য বারো আনা।

কবিতার বই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ভূমিকায় "কাব্য পরিচয়" এইরূপ দিয়াছেন—

"প্রকৃতির উৎসবে মাতিয়া মানুষ সেকালে যে উৎসব করিয়াছে, একালে যে উৎসব করিতেছে, এই দুই চিত্রই কবি রসময়ের ঋতুলীলা-কাব্যে দেখিতে পাই। একালের চিত্রগুলি কাব্যখানির পূর্ব্বভাগে, কবির নিজের তুলিতে আঁকা মৌলিক ছবি; আর সেকালের চিত্রগুলি কাব্যখানির উত্তরভাগে মহাকবি কালিদাসের তুলিতে আঁকা ছবির প্রতিলিপি—ঋতুসংহারের পদ্যানুবাদ ষড়্‌ঋতু।"

কবিতাগুলিতে ছন্দঃস্খলন হওয়াতে পাঠের সময় পদে পদে বিঘ্ন জন্মায়। অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ ও কর্কশ যুক্তাক্ষর শব্দের অপব্যবহারে কবিত্বেরও হানি হইয়াছে। আমরা পড়িয়া কোনো রসই আস্বাদন করিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে এক-একটি বচনবিন্যাসে কবিত্ব ও সরসতার আভাস মরুভূমিতে জলবিন্দুর মতন ধরিতে না-ধরিতে হারাইয়া ফেলিতে হয়।

ত্যাগ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীগোবর্দ্ধন বল্লভ, গরলগাছা চণ্ডীতলা পোষ্ট, হুগলি। দাম নয় আনা।

এই বইয়ে সাধু এব্রাহাম, তুলসীদাস, সাধু বার্ণার্ড, রাধাগোবিন্দ প্রভৃতির জীবনীপ্রসঙ্গে, এবং শ্মশান ও মৃত্যুর তত্ত্ব প্রভৃতি মামুলি বচনের দোহাই দিয়া, ত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও সংস্কৃত বচনরাশির দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। লেখার ভঙ্গী খানিকটা বঙ্গবাসীর নেকামি ঢঙে ও খানিকটা থিয়েটারী রকমে। সাহিত্যরসিক কেহ ইহার মধ্যে আনন্দ পাইবেন না।° যাঁরা তত্ত্বান্বেষী তাঁরা ধৈর্য্য ধরিয়া পাঠ করিলে কিছু উপদেশ পাইতে পারিবেন।

সাধক ও সাধনা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীতুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় গরলগাছা। মূল্য চার আনা।

এই বইএ বুদ্ধ, হরিদাস, শঙ্করাচার্য্য, পল, আন্তনি প্রভৃতি সাধকদের সাধনার কাহিনী একটি ছাত্রকে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। উপদেশগুলি সংস্কৃত বচনের দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। উপদেশের কথা সেই সেকেলে পুরাতন কথারই পুনরবতারণা। রচনার ভঙ্গী এমন প্রাণবর্জিত যে পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায় না। শিক্ষক নরেন্দ্র একদিন ছাত্রদের বাড়ী গিয়া শুনিলেন যে ছাত্রেরা গাহিতেছে—

"নরেন্দ্র-শিষ্য মোরা, মোদের নাইক কিছু কাম্য,
জগৎবাসী সবাই সমান, (মোদের) মূলমন্ত্র সাম্য।"

ইহা শিক্ষক নিজের বইএ নিজের সার্টিফিকেট লোককে দেখাইবার জন্য তুলিয়াছেন কি না, এবং ছাত্রদের কাছে জগৎবাসী সবাই কতখানি সমান, তার খবর আমরা পাই নাই। ছাত্রেরা জগৎবাসী দূরের কথা স্বদেশবাসী স্বগ্রামবাসী হাড়ি মুচি ডোম চাঁড়াল প্রভৃতি অবনত জাতিদের অস্পৃশ্যতা ঘুচাইয়া তাদেরও নিজেদের সমান প্রতিষ্ঠা দিতে যদি চেষ্টাও করিয়া থাকেন তবে তাঁদের সাধনার মূল্য আছে বলিতে হইবে।

আলেয়ার আলো—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা। এক টাকা ছয় আনা।

বাংলা দেশের সামাজিক উপন্যাস। মোটের উপর উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মুরারি-বাবুর সরল বালকের মতন স্বভাব ও সাংসারিক অনভিজ্ঞতা যেমন ফুটিয়াছে তেমনি ফুটিয়াছে তাঁর কন্যাবাৎসল্য; হরেনের বলিষ্ঠ দেহ ও মনের পরিচয়, মোহনের ও সরমার প্রণয়ের চিত্র সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। যমুনার সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলমণির ছায়া পড়িয়াছে ও তার কথাবার্ত্তা একটু অস্বাভাবিক ও নেকামিভরা বলিয়া পাঠে বিরক্তি জন্মায়। পাত্রপাত্রীর কথাবার্ত্তার মধ্যে স্থানে স্থানে একটু আধটু বাহুল্য ও জোর করিয়া রসিকতা বর্জ্জন করিতে পারিলে বইখানি বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার হইত। মোটের উপর উপাখ্যান ও রচনার ভাষা এবং বাক্যের ব্যঞ্জনা ও বিন্যাস উত্তম সরস ও মধুর হইয়াছে।

মুদ্রারাক্ষস।

অক্ষর ও কাগজ

অক্ষর কাগজে কহে,—"আমার জীবন বহে
তব পদে শত নমস্কার।
তুমিই আমার স্থিতি, তুমিই আমার গতি,
তুমি প্রভু আশ্রয় আমার॥"
কহিলা কাগজ দুখে,—"ওহে বর্ণ প্রাণসখে,
দাসেরে দিওনা হেন লাজ।
তুমিই আমার প্রাণ, তুমিই আমার মান,
তুমি বিনা মোর কিবা কাজ?"

আশ্‌রাফ্ আলি খাঁ।

যেনাস্যাঃ পিতরো যাতাঃ

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জুলী মোর ঐ ত কচি মেয়ে,
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে?—বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুণো সে বড়;—
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘটতে দেবো না কো!"

বাপ বল্লে, "কান্না তোমার রাখো!
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জানো না কি মস্ত কুলীন ও যে!
সমাজে ত উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাবো?
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাবো?"

মা বল্লে, "কেন ঐ যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
নাইবা হল কুলীন,—
দেখতে যেমন তেম্নি স্বভাবখানি,
পাস করে ফের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুক্‌রো ছেলে।
এক-পাড়াতে থাকে ওরা—ওরি সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হল; ওকে যদি বলি আমি আজই
এখ্‌খনি হয় রাজি।"

বাপ বল্লে, "থামো,
আরে আরে রামোঃ!
ওরা আছে সমাজের সব তলায়।
বামুন কি হয় পৈতে দিলেই গলায়?
দেখ্‌তে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল! রাধে!
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে!"

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখ্‌লে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক

প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে ত রয়না কিছুই ঢাকা ;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চল্‌তে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হান্‌চে যেন বেদনা-বিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব্ব বাপের মনে জাগে,—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্ব্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চল্‌ল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিখানেক এদিক-ওদিক হবার জো নেই।
তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়ই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য,
মেয়েমানুষ বুঝ্‌বে না তার মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়-বেলায় মেয়েকে বাপ বলে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি
"হও তুমি সাবিত্রীর মত এই কামনা করি।"

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্ব্বাদের প্রথম অংশ দুমাস যেতেই ফল্‌ল কেমন করে—
পঞ্চাননকে ধর্‌ল এসে যমে ;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফল্‌ল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে,
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদূর মুছে শিরে।

দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মত,

অবশেষে হোলো
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
কখন্ শিশুকালে
হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি ;
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি
জান্ত না ত আপ্‌নাকে সে,
শুধায়নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে ক্ষ্যাপা বাতাস এসে,
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠ্‌ছে ফুটে'
মধুর রসে ভরে' উঠে'।
সে যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপ্‌ড়িভারে আপ্‌নি সমাকুল।
আপ্‌নাকে তার চিন্‌তে যে আর নাই কো বাকি
তাইত থাকি থাকি
চম্‌কে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশপারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝর্‌ণা বেয়ে ;
রাতের অন্ধকারে
কোন্ অসীমের রোদনভরা বেদন লাগে তারে।
বাহির হতে তার
ঘুচে গেছে সকল অলঙ্কার ;
অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
তাই দেখে সে আপ্‌নি ভেবে মরে।
কখন্ কাজের ফাঁকে
জান্‌লা ধরে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
যেখানে ঐ সজ্‌নে-গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি।
যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথী
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে !
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।

পায়ের শব্দ তারি
মর্ম্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি'।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুনগুনানি।
মেয়ের নীরব মুখে
কি দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া ;
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিলে অধরে তার শরৎনিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে না কো—
কেঁদে বলে, "হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাকো!"

একদা বাপ দুপুর বেলায় ভোজন সাঙ্গ করে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধরে',
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়্তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বল্লেন, বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
"যার খুসি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্বরে'
আমি কিন্তু পারি যেমন করে'
মঞ্জুলিকার দেবোই দেবো বিয়ে!"

বাপ বল্লেন, কঠিন হেসে, "তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে,
সেই ক'টা দিন থাকো ধৈর্য্য ধরে'।"
এই বলে' তাঁর গুড়্গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।

মা বল্লেন, "উঃ কি পাষাণ প্রাণ,
স্নেহ মায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে?"

বাপ বল্লেন, "আমি পাষাণ বটে।
ধর্ম্মের পথ কঠিন বড়, ননির পুতুল হলে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গলে'।"

মা বল্লেন, "হায়রে কপাল! বোঝাবই বা কারে!
তোমার ঘরে ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মর্‌বে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ঐ মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুক্‌নো পাতায় নেই ত কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান।"

বাপ একটু হাস্‌লে কেবল, ভাব্‌লে, "মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানুস্‌।
জীবন একটা কঠিন সাধন—নেই সে ওদের জ্ঞান।"
এই বলে ফের চল্‌ল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।

দুখের তাপে জ্বলে জ্বলে অবশেষে নিব্‌ল মায়ের তাপ;
সংসারেতে একা পড়্‌লেন বাপ।
বড় ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাটনাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্‌ বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়্‌ল মঞ্জুলিকার পরে বাপের সেবাভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হত না তাঁর রুচি।
সকাল-বেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলা রুটি কিম্বা লুচি;
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হত পাঁচটা ছটা;
পাঁঠা হত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দুবেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।

একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ্দ এই।
বাপের ঘরটি আপ্‌নি মোছে ঝাড়ে
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোষাক আপ্‌নি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ীর ফর্দ্দ টুকে রাখে।
গয়লানী আর মুদির হিসাব রাখ্‌তে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মত,
তাই নিয়ে তার কত
নালিস শুন্‌তে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মত নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদেপদেই ঘটে যে তার ত্রুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মত।
হয়ে নীরব নত,
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্ব্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন করে' মাতা বারম্বার
শিশু ছেলের সহস্র আব্‌দার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে
তেম্‌নি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিস্ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান
সেই কথাটা মনে করে গর্ব্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ।
"আমার মায়ের যত্ন যেজন পেয়েছে একবার
আর কিছু কি পছন্দ হয় তার ?"

হোলির সময় বাপকে সে যার বাতে ধরল ভারি।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,

ডাক্‌তে হল তারে .
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আস্‌তে যেতে হয়।
মঞ্জুলী তার সনে
সহজ ভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো !
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনো দিন ?
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুন্‌তে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টল্‌চে কেন এমনতর ধরা-পড়ার মুখে ?

ব্যামো সেরে আস্‌চে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে'।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরাণখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বল্‌তে যেয়ে
চুপ করে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগী-সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—
"জানো তুমি তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।
সে ইচ্ছাটি তাঁরি
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি !"

না, না, ছিছি, ছিছি!"
এই বলে সে মঞ্জুলিকা দুহাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে,
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়্‌ল মেঝের পরে—
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝরে' পড়ে।
ভাব্‌লে, "পোড়া মনের কথা এড়ায়নি ওঁর চোখ!
আর কেন গো! এবার মরণ হোক!"

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগ্‌ল দ্বিগুণ করে'
অষ্টপ্রহর ধরে'।
আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে।
দুতিন ঘণ্টা পর
একবার যে ঘর ঝেড়েচে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন্ যে স্নান, কখন্ যে তার আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল না কো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শ্রান্ত হয়ে আপ্‌নি ঘুমে মেঝের পরে লোটায়।
যে দেখ্‌ল সেই অবাক হয়ে রইল চেয়ে,
বল্লে "ধন্যি মেয়ে!"

বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, "গর্ব্ব করিনেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর! নইলে দেখ্‌তে অন্যরকম হ'ত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয়না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখ্‌ছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।"

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবে মাত্র এগারো মাস হবে,

গুজব গেল শোনা
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয়নিকো বিশ্বাস,
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়্‌লে সে নিশ্বাস
ব্যস্ত সবাই, কেমনতর ভাব,
আস্‌চে ঘরে নানারকম বিলিতি আস্‌বাব।
দেখ্‌লে বাপের নতুন করে সাজসজ্জা সুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকাচুল সব কখন্ হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা।

মার্ কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়্‌ল মনে
বুকভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হোক্ না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই ত কভু
কল্যাণী সেই মূর্ত্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্ম্মে ছিল আঁকা;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরি পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়্‌ল প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জা ভয়
কন্যা তখন নিঃসঙ্কোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,—
"তুমি নাকি কর্‌তে যাবে বিয়ে!
আমরা তোমার ছেলে মেয়ে নাৎনি নাতি যত
সবার মাথা করবে নত?
মায়ের কথা ভুল্‌বে তবে?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে?"

বাবা বল্লে শুষ্ক হাসে,
"কঠিন আমি কেই বা জানে না সে ?
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ ত নয় ধর্ম্মপথে হাঁটা
এ ত কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে বরে ভয় দুঃখ নিতে দুঃখ দিতে
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে ?"

বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের ক'দিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাত্বে বলে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মালাচন্দন

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে)

বাংলা দেশের হৃদ্-কমলে গন্ধ-রূপে নিলীন হ'য়ে ছিলে,
মূর্ত্তি কখন্ নিলে
কোন্ মাহেন্দ্র ক্ষণে!
ওগো কবি! তোমার আগমনে
নিখিল-হৃদয় উঠ্‌ল দুলে নূতন স্ফূর্ত্তিভরে,
কাননে ফুল ফুট্‌ল থরে থরে,
চাঁপার হ'ল তড়িৎকান্তি,
অশোক যেন আলোয় আলো করে!
ওগো চমৎকার!
উঠ্‌ল ভ'রে কানায় কানায় আনন্দে সংসার!
গুমট্ কেটে বইল দখিন হাওয়া,
পাথর-চাপা কপাল যাদের তুমি তাদের নিধি হঠাৎ-পাওয়া।
ওগো গন্ধরাজ!
এ কি পুলক রাজে তোমার ওই পরিমল-মণ্ডলেরি মাঝ!

স্বর্গে মর্ত্ত্যে একি আসা যাওয়া!
তুমি এলে, বইল যেন বোধন-বেলার হাওয়া!
হাজার পাখীর কূজন গানে শেষ অবসাদ কোথায় গেল ভেসে
বিস্মরণী লতায় ঘেরা কোন্ স্বপনের দেশে।

ছয় ঋতু গায় তোমার আগে ফুল-মুকুলে পল্লবিত পালা,
স্থবির স্থাবর জগৎ জাগে উচ্চকিত চক্ষে কি তার আলা;
মুক্তিকামর পৃথ্বী-ছাড়া দূর গগনে কৃত্তিকা ছয় বোন্
পীযূষ-ব্যথা বক্ষে নিয়ে হ'ল যে উন্মন
ধাত্রী তোমার হ'তে;
হৃদয়-রসের সকল ধারা তোমায় ঘিরে বইল উছল স্রোতে;
পান ক'রে তায়, স্নান ক'রে তায়,
দান ক'রে তায় দু'হাত ভ'রে ভ'রে
তৃষার্ত্ত প্রাণ সুধার ধারায়
দিলে সরস ক'রে।

সরস্বতীর হৃদয়-বীণায় স্পন্দ-রূপে লুকিয়ে ছিলে তুমি,
কোন্ উষসী জাগিয়ে দিল চুমি'—
তোমায় ওগো মঞ্জু-গায়ন্ কবি,
ভালে কি তার এম্নি ধারা চাঁপার দিনের চাঁপার বরণ রবি
মূর্ত্তি ধ'রে সপ্তম রাগ উদয় হ'লে রাগ-রাগিণীর মেলায়,
বাঁশীতে বশ কর্‌লে বিশ্ব হেলায়।
তোমার গানের পেতে সুধার কণা
এল বনের হরিণ ধেয়ে, সাপ নোয়াল ফণা!

দূর-গগনে নিকট করে তোমার গানের আলো,
ভালোবেসে যে দীপ তুমি জ্বালো
অচেনারে চিনিয়ে সে দ্যায়, পরকে আপন করে;
তোমার হিয়ার চিন্তা-মণি-ঘরে
বিশ্ব-মানব জল্‌সা করে, ওঠে বিপুল পুলক-ভরা গীতি,
দুখের মূল্যে আনন্দ ক্রয় চল্‌ছে সেথা নিতি,
ছন্দে নাচে জন্ম-মরণ পতন-অভ্যুদয়
মিলিয়ে হাতে হাত,
ছন্দ-ছাড়া নয় সেথা কেউ নয়;
মন্ত্রে পূত রাখীর সূতায় সেথা সবাই মিল্‌ছে সবার সাথ।

বিশ্ব-নরের জীবন-যজ্ঞে দীপ্ত ভালে তারার তিলক এঁকে
চক্ষুর পাত্র হাতে
উঠ্‌লে তুমি কবি;—
সকল হানাহানির উর্দ্ধে থেকে
দৃষ্টি হানো নিশাচরের নৃশংস উৎপাতে
দিব্য পাবক ছবি!
তোমায় হেরে হাল্‌কা হ'ল চির ব্যথার জগদ্দল শিলা,
অন্তরায়ণ-অন্তরালে বন্দীমনের শিকল হল ঢিলা!
অসুন্দরের শোধন তুমি, অসত্য আর অমঙ্গলের অরি!
তোমায় বরণ করি।
আশার গানে আলোর বানে সকল দিলে ভরি',
প্রাণের প্রভায় সংশয়েরি ঘুচালে শর্ব্বরী,
নূতন আলো দিলে নূতন আঁখি
উর্দ্ধ-শিকড় অধঃশাখা অশথ্-চারী পাখী।
মুগ্ধ হৃদয়—হারাই ভাষা—মূর্চ্ছি পড়ে মন,
বনের পুলক ফুল দিয়ে তাই মনের পুলক কর্‌ছি নিবেদন।
প্রণাম তোমায় কর্‌ছি অনুপ কবি!
যার হৃদয়ের মুকুর-আগে বিশ্বপতি দ্যাখেন বিশ্ব-ছবি
নিত্য দিনই নূতন রাগে নূতনতর ছাঁদে;—
চিত্তলোকে পুলক যে দ্যায়, নূতন আলোক পৌর্ণমাসী চাঁদে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পৃথিবীব্যাপী বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস।

এক জাতির প্রতি আর-এক জাতির বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ উৎপাদন করিয়াছে, না, যুদ্ধ তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জন্মাইয়াছে, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা কঠিন। পাখীর আগে ডিম, না, ডিমের আগে পাখী; গাছের আগে বীজ, না, বীজের আগে গাছ;—এইরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, যুদ্ধের আগে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস, না, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের আগে যুদ্ধ, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেরূপ কঠিন না হইলেও, ইতিহাস-

পাঠকেরা জানেন, যুদ্ধ ঘটিবার আগে জাতিতে জাতিতে যতটুকু বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস থাকে, যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পর তাহা বহুপরিমাণে বাড়িয়া যায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের মত বড় যুদ্ধ আর কখনও হয় নাই। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় বড় ও শক্তিশালী দেশ ইহাতে কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে-কয়টি দেশ এখনও নিরপেক্ষ আছে, তাহাদেরও মনের ভাব এক পক্ষের দিকে এবং অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে ঝুঁকিয়া আছে। কারণ, এমন কোন জাতিই নাই, যুদ্ধ দ্বারা যাহারা লাভবান কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত না হইতেছে।

যে-যে দেশের ঝগড়া লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহারা, বলিতে গেলে, এখন পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে; এখন লোকে তাহাদের কথা ভাবিতেছে না। এখন একদিকে প্রধানতঃ জার্ম্মেনী, এবং অন্যদিকে প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। আমরা এতদিন পরে যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে, বা ন্যায় কোন্ পক্ষে, তাহা নির্ণয় করিতে যাইতেছি না। আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, সার্বিয়ার একজন বালকের দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর প্রাণবধ উপলক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহাতে সাক্ষাৎভাবে জার্ম্মেনী ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। নানা কারণে এখন বহু জাতি যুদ্ধের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জগদ্ব্যাপী হইয়াছে।

যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক আহত, অঙ্গহীন ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে, লক্ষ লক্ষ নারী বিধবা ও শিশু অনাথ হইতেছে। ধনের অপব্যয় ও ক্ষতির পরিমাণ করিতে গেলে, লক্ষ ছাড়িয়া বলিতে হয়, কোটি কোটি টাকা নষ্ট হইতেছে। কিন্তু এ-সকল ক্ষতি অপেক্ষা গুরুতর ও স্থায়ী ক্ষতি অন্য দিকে হইতেছে। এই ক্ষতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিন রকমের। এক ক্ষতি এই যে, মানুষ আবার বর্ব্বরতায় উপনীত হইতেছে। মানুষের সমুদয় বুদ্ধি, সমুদয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দল বাঁধিবার সমুদয় শক্তি, সমুদয় সাহস, সমুদয় স্বার্থত্যাগ-প্রবৃত্তি, যে-কোন উপায়ে মানুষ মারিবার দিকে প্রযুক্ত হইতেছে। প্রথমে যে-যে জাতি জার্ম্মেনীর মত গর্হিত উপায়ে মানুষ-মারার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাও এখন জার্ম্মেনীর অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেছে। ইতিমধ্যেই "সভ্য"- শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে ভবিষ্যৎ বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য মন্ত্রণা ও উত্তেজনা দিবার লোক দেখা দিয়াছে। বাস্তবিক, মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হইলে, আবার যুদ্ধ হইবে, এবং সম্ভবতঃ তাহা বৃহত্তর হইবে। তাহা হইলে, মানুষ যুদ্ধকেই জীবনের প্রধান কাজ মনে করিবে। শুধু যে তাহার দেহটাকেই যুদ্ধের জন্য দৃঢ় ও শিক্ষিত করা হইবে, তাহা নয়; তাহার মনকে, হৃদয়কে, ধর্ম্মকে ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে শৈশব হইতে যুদ্ধের অনুকূল করিয়া গড়া হইবে।

দ্বিতীয় ক্ষতি এই হইবে যে, মানুষের স্বাধীনতা, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কমিবে। ইহা সহজেই বুঝা যায়, এবং অতীত ও আধুনিক ইতিহাসেও দেখা যাইতেছে, যে, যে-সব দেশে একনায়কত্ব আছে, তাহারা যুদ্ধের জন্য যেরূপ প্রস্তুত হইতে ও থাকিতে পারে, গণতন্ত্র রাষ্ট্রের লোকেরা তত সহজে ও তত শীঘ্র ততটা প্রস্তুত হইতে ও থাকিতে পারে না। এইজন্য বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ইংরেজরা নিজের দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বহুপরিমাণে হারাইয়াছে, দেশের কাজ বস্তুতঃ কয়েকজন লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, এবং আমেরিকার মত সম্পূর্ণ গণতন্ত্র দেশেও যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভার এক এক জন মানুষের উপর দেওয়া হইয়াছে, বা দিবার প্রয়োজন অনুভূত এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত ও সমর্থিত হইতেছে। আমরা ভারতবর্ষেই দেখিতে পাইতেছি, যে, বিদেশ যাতায়াত, বাণিজ্য, সংবাদপত্রে সংবাদ ও মন্তব্যপ্রকাশ, প্রভৃতি কতদিকে আগে আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা ছিল, এখন ততটুকুও নাই। যুদ্ধ দ্বারা নর-হিংসা না করিবার অধিকার পর্য্যন্ত অনেক স্বাধীন দেশে লুপ্ত হইয়াছে, এবং তথায় সমুদয় সমর্থ পুরুষকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত বাধ্য করিবার কথা উঠিয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে "জোর যার মুলুক তার" নীতি এখনকার মত প্রবল থাকিলে ভবিষ্যতে নারীদিগকেও যুদ্ধ করিবার জন্য কিম্বা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্য বাধ্য করা হইবে।

তৃতীয় ক্ষতি এই, যে, বিদ্বেষ অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস

জগৎ জুড়িয়া ফেলিতেছে। মুখে যিনি যাহাই বলুন, কোন জাতির লোক অন্য কোন জাতির লোকের সদভিপ্রায়ে বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছে না। সকলেই ভাবিতেছে, অন্যের কোন কুমৎলব আছে। সমসাময়িক ইতিহাস তো মিথ্যার কুহেলিকায় এরূপ আচ্ছন্ন, যে, খাঁটি সত্য যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। জগতের এবং স্বদেশের ও শত্রুর দেশের অতীত ইতিহাসও নিশ্চয়ই মিথ্যা করিয়া লিখিত হইতেছে ও হইবে। এই মিথ্যার সৃষ্টি কতক জ্ঞাতসারে, কতক অজ্ঞাতসারে হইবে। শিশুরা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে মিথ্যা ইতিহাস পড়িবে ও তদ্দ্বারা তাহাদের মন নানা জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। যুদ্ধের আগে যে-সব ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তাহাতেও মিথ্যা কথা, জ্ঞানকৃত মিথ্যারচনা, ছিল; কিন্তু এখন মিথ্যার মাত্রা ও পরিমাণ খুব বাড়িবে। সত্য জানিতে ও লিখিতে বলিতে না পারা খুব বড় ক্ষতি। আমরা যত অধিক সংখ্যক মানুষকে মহৎ ও সৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ততই উচ্চ হয়, এবং আমরা নিজেও মহৎ ও সৎ হইবার সাধনায় তত অধিক সাহায্য পাই। পক্ষান্তরে যত বেশী মানুষকে আমরা বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করি, সেই পরিমাণে আমরাও ক্ষুদ্রাশয় ও শক্তিহীন হই। মানবজীবনের একটি প্রধান সার্থকতা ও আনন্দ প্রীতিমূলক সামাজিকতায়। যাহারা যত বেশী লোকের সহিত, যত বেশী দেশের ও জাতির লোকের সঙ্গে আন্তরিক প্রীতির সহিত সামাজিকতা রক্ষা করিতে পারে, তাহাদের জীবন সেই পরিমাণে সার্থক ও আনন্দময় হয়। জাতিতে-জাতিতে জগৎ-জোড়া অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ থাকিলে, সামাজিকতা খুব সংকীর্ণ-সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহা কম ক্ষতি নয়।

শুধু ক্ষতির কথা ভাবিলে চলিবে না; প্রতিকারের কথা, উপায়ের কথাও ভাবিতে হইবে।

জগতের যে-সব সাধু মহাত্মা ব্যক্তিগত বা জাতিগত সাংসারিক লাভালাভ গণনা করেন নাই; স্বদেশপ্রেমের-ছদ্মবেশ-ধারী বিদেশীবিদ্বেষে যাঁহাদের চিত্তবিকার ঘটে নাই; "আমার দেশ ন্যায়পথেই থাকুক বা অন্যায়পথই অবলম্বন করুক, আমি আমার দেশের পক্ষে" (Right or wrong, my country), ইহা যাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল না; যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত ও মানবপ্রেমিক ছিলেন;—তাঁহারা যাহা বলেন, আমাদিগকে তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে। এরূপ লোক এখনও জগতে আছেন। তাঁহারা বলেন বলিয়াই যে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা নয়, আমাদের অন্তরাত্মাও তাহাতে সায় দেয়। তাঁহারা মানুষকে ভালবাসিতে ও মানবপ্রকৃতিতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে বলেন।

সব মানুষকে সাধু বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা বলিতেছি না। কিন্তু "শত্রু জাতির" প্রত্যেক মানুষই দুরাত্মা, এরূপ ধারণাও মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত নয়।

যুদ্ধ অনিবার্য্য কি না।

পৃথিবীতে যুদ্ধ চিরকাল থাকিবে ও ঘটিবে, আমরা এরূপ মনে করি না। কিন্তু "সভ্যতা"র বর্ত্তমান অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা ভিন্ন আর কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা বলা কঠিন। যুদ্ধ নানা কারণে ঘটে। আগে অন্তর্জ্জাতিক বিবাদ ও মনোমালিন্যে যত যুদ্ধ হইত, আধুনিক যুগে তাহা অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছে; সালিসী দ্বারা কোন কোন স্থলে বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে। প্রবল রাজা বা প্রবল জাতিরা লোভ অহঙ্কার যশোলিপ্সা প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া অন্য জাতির সহিত যুদ্ধ করে। এরূপ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকা অসাধ্য নয়, দুঃসাধ্যও নয়। কিন্তু যে-দেশ অকারণে ও অন্যায় রকমে আক্রান্ত হয়, যেমন বর্ত্তমান যুদ্ধে বেলজিয়ম জার্ম্মেনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার পক্ষে যুদ্ধ ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষার আর কোন উপায়ের কার্য্যকারিতার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য যুদ্ধ করিয়াও অনেক দেশ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে এবং নারীগণকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই; কিন্তু অনেক দেশ পারিয়াছে। যুদ্ধ না করিলে, তিন পথ আছে। এক আত্মসমর্পণ। তাহা জঘন্য কাপুরুষতা, তাহাতে স্বাধীনতা ত লুপ্ত হয়ই, নারীর লাঞ্ছনাও অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় পন্থা, আততায়ীদিগকে বলা আমরা যুদ্ধও করিব না, পরাধীনতা স্বীকারও করিব না। আততায়ী মহানুভব হইলে এমন

জাতিকে আর কষ্ট দেয় না; কিন্তু এমন মহানুভবটা প্রবলতম জাতিদের মধ্যে কোথায়? সুতরাং, রুশিয়া জার্ম্মেনীর সহিত যুদ্ধ করিতে না চাওয়ায় তাহার যে-দশা ঘটিয়াছে, আক্রান্ত যুদ্ধবিমুখ জাতির সেই দশাই ঘটিবার সম্ভাবনা। তৃতীয় পন্থা, জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা সমুদয় লোকের আত্মহত্যা। কিন্তু ইহা কি কোন জাতি করিতে পারে? না, তাহা করা কি উচিত? যাহারা অন্যায় করিয়া কোন দেশ আক্রমণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই দুরাত্মা। "যুদ্ধ করিয়া সেই দুরাত্মাদের প্রাণবধ করিও না, কিন্তু তোমরা নিরপরাধ আক্রান্ত জাতির লোক সকলে নিজের প্রাণ বধ কর," এরূপ পরামর্শ ত দেওয়া যায় না। অতএব, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় কোন জাতি আক্রান্ত হইলে তাহার পক্ষে যুদ্ধ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহা শেষ কথা নহে। মন বলিতেছে, অন্যায় আক্রমণ বন্ধ করিবার উপায় ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হইবে, সুতরাং তখন যুদ্ধ করিবার প্রয়োজনও থাকিবে না। যাহা এখন আমাদের মনে আসিতেছে না, স্বাধীনতা রক্ষার এরূপ অন্য উপায়ও হইতে পারে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য অনেক পরাধীন জাতিকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ভবিষ্যতে বিনা যুদ্ধে পরাধীন জাতি স্বাধীন হইতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

দেশ কি সকলের উপরে?

যে মানুষ নিজের সুখ ও স্বার্থকে নিজের পরিবারবর্গের সুখসুবিধার উপরে স্থান দেয়, তাহাকে শ্রদ্ধা করা যায় না। যে ব্যক্তি দেশের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের পরিবারবর্গের সাংসারিক সুবিধা আগে দেখে, তাহার চরিত্র অনুকরণ-যোগ্য নহে। কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতি অপেক্ষাও জগৎ ও মানবজাতি বড়, এবং ভগবান্ ও ধর্ম্ম সকলের উপরে, ইহাও ভুলিলে চলিবে না। স্বদেশপ্রেমের সহিত ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু গর্হিত উপায়ে পৃথিবীর অনেক জাতির লোক স্বজাতির উপকার করিতে চাহিয়াছে। এইজন্য মনে রাখা দরকার যে, যাহা সমগ্র মানব-জাতির ও সমুদয় জগতের পক্ষে কল্যাণকর নহে, এবং যাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, তাহা স্বদেশের পক্ষেও কল্যাণকর নহে। কেহ-কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিতে পারেন, "আমরা দেশের লোকের কথা না ভাবিয়া আগে গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের কথা ভাবিতে পারি না।" কিন্তু তাহা করিতে বলা হইতেছে না। নিজের, নিজের পরিবারবর্গের, নিজের গ্রামের বা শহরের, ও নিজের দেশের কল্যাণ কিসে হয়, তাহা আগে ভাবাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং যাহারা যত নিকটে আছে তাহাদের মঙ্গল-সাধন তত সহজ। যাহা স্বাভাবিক ও সহজ, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে, যাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, তাহাতে কল্যাণ হইতে পারে না, এবং যাহা দ্বারা অপরের অনিষ্ট ও অকল্যাণ হয়, তাহাতে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে না। অনিষ্ট ও অকল্যাণ কথাগুলির মানে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। একজন চোর যদি আমার বাড়ী হইতে আমার জিনিষ মধ্যে-মধ্যে চুরি করে, তাহা হইলে তাহার চুরির পথ বন্ধ করা নিশ্চয় উচিত। তখন এ আপত্তি করা চলিবে না, যে, তাহার চুরি বন্ধ হইলে তাহার আয় কমিবে ও তাহার ক্ষতি হইবে, সুতরাং তাহার ক্ষতি করিয়া নিজের সম্পত্তি রক্ষা করা অনুচিত। কেননা, চোরের আর্থিক লাভটা তাহার কল্যাণের কারণ নয়, অকল্যাণেরই কারণ। এইরূপ অনেক জাতি অন্য জাতিদের ধন লুণ্ঠন করিয়া বা অন্য জাতিদের ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করিয়া আপনারা ধনশালী হইয়াছে। এইসব পরস্বাপহারক জাতিদের ক্ষতি হইবে বলিয়া, কোন জাতিকে নিজের ধন রক্ষা করিতে ও নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করিতে নিষেধ করা যায় না। জার্ম্মেনী বা অষ্ট্রিয়া নিজের জন্য চিনি উৎপন্ন করুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমাদের গুড়-চিনির ব্যবসা যে-কেহ নষ্ট করিয়া ধনবান্ হইবে, তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আমাদের আছে। আমরা নিজের সুতা ও কাপড় নিজে উৎপন্ন করিব, তাহাতে কোন দেশের লোকের লোক্‌সান হইলে আমাদের তাহাতে কোন অপরাধ নাই; কিন্তু আমাদের যেন এ-ইচ্ছা না হয় যে চীন দেশের বা ঐরূপ অন্য কোন দেশের সুতা-কাপড়ের ব্যবসা নষ্ট করিয়া বা তাহাকে বাড়িতে না দিয়া আমরা ধনশালী হইব।

"রাষ্ট্র-দেবতা"।

যুদ্ধের সময় দেশ যেরূপ বিপন্ন হয় তাহাতে দেশরক্ষার জন্য অধিবাসীদিগকে অনেক বিষয়ে ব্যক্তিগত সুখসুবিধা ও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়। প্রত্যেক মানুষে কোন্ জিনিষ কতটুকু খাইতে পাইবে, পরিচ্ছদ কিরূপ ব্যবহার করিতে পারিবে, বিলাসদ্রব্য দেশে কি পরিমাণে উৎপন্ন বা আমদানী হইবে না-হইবে, ট্যাক্সের আকারে বা অন্য প্রকারে মানুষের আয় ও সম্পত্তির কত অংশ রাষ্ট্রকে দিতে হইবে, কোন্-কোন্ ব্যবসা মানুষ করিতে পাইবে বা পাইবে না, মানুষ যানবাহন কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে পাইবে, দেশে বিদেশে মানুষের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি কতটা সীমাবদ্ধ হইবে, এইরূপ নানাদিক দিয়া মানুষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হ্রাস প্রাপ্ত ও কখন কখন লুপ্ত হইয়া যায়। তাহাতে অসুবিধা হইলেও, স্বাধীন দেশের লোকদের তাহাতে আপত্তি করা উচিত নয়, এবং তাহারা আপত্তি করেও না। পরাধীন দেশের লোকদিগকে যদি পরাধীনই থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে বলা তাহাদের প্রভুদের উচিত নহে; কেননা মানুষ স্বার্থত্যাগ করে উচ্চতর কোন জিনিষের জন্য, পরাধীন অবস্থা কাটিয়া না গেলে সেই উচ্চতর জিনিষটি পাওয়া যায় না। কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের এই আপত্তির কোন সার্থকতা নাই; কারণ পরাধীন দেশের লোকেরা যাহা স্বেচ্ছায় করিতে রাজী নয়, বলপূর্ব্বক তাহা তাহাদিগকে করান যায়। পরাধীন লোকের প্রভুরা তাহাদিগকে যে-পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত, সেই পরিমাণে তাহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে বলিবার অধিকার তাঁহাদের আছে।

যাহা হউক, দেশ স্বাধীন হউক আর পরাধীনই হউক, বাহ্য সুখসুবিধা সম্বন্ধে রাষ্ট্রের হুকুম দেবতার আদেশের মত মানিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু যাহা ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্যায় বলিয়া মানুষ বুঝে, যুদ্ধের সময়ও রাষ্ট্রের হুকুমে তাহা মানুষের করা উচিত নয়। রাষ্ট্রকে ভগবানের জায়গায়, অন্তরাত্মার ধর্ম্মবোধের জায়গায়, কোন অবস্থাতেই বসান যায় না। রাষ্ট্রের হুকুম এবং অন্তরাত্মার প্রেরণা উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, রাষ্ট্রের হুকুম ধার্ম্মিকদিগকে অমান্য করিতেই হয়। এ অবস্থায় অবশ্য রাষ্ট্র অবাধ্য ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিতে পারেন, এমন কি তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলেও, ভগবান মানুষকে যে ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। স্বাধীনদেশের অনেক লোক এই পথ অবলম্বন করায় দণ্ড ভোগ করিতেছেন।

তর্কে অপ্রবৃত্তি।

যুদ্ধের প্রথম অবস্থা হইতেই ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা বলিয়া আসিতেছেন, "এখন বড় বিপদের সময়, যুদ্ধে জয়লাভের উপায় অবলম্বন ছাড়া ইংরেজ জাতির অন্য কিছু ভাবিবার সময় নাই; আমরা ভারী ব্যস্ত, তোমাদের অভাব অভিযোগের কথা রাখিয়া দাও, এখন কেবল আমরা যাহা বলি তাহাই কর, তর্কবিতর্ক করিও না।" ইহার উত্তরে আমরা বরাবর প্রমাণ সহ বলিয়া আসিতেছি, যে, "বিলাতের লোকদের বিপদ আমাদের চেয়ে কম নয়; কিন্তু তাহারা বরাবর যুদ্ধ ছাড়া আরও নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছে, তর্কবিতর্ক করিতেছে, নানা বিষয়ে আইন করিতেছে, ধর্ম্মঘট ও অন্যান্য উপায়ে নিজেদের বেতন বাড়াইয়া লইতেছে, নিজের দাবী আদায় করিতেছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরাও যাহাতে তর্কবিতর্ক উঠিতে পারে এমন বিস্তর কাজ করিতেছেন, আমাদের আপত্তির বিরুদ্ধে অনেক আইন পাস করিয়াছেন, এবং নিজেদের সুবিধা এবং বেতন বা অন্যবিধ পাওনাও অনেক কর্ম্মচারী বাড়াইয়া লইয়াছেন। সুতরাং এ সমুদয় উপদেশের বোঝা আমাদেরই ঘাড়ে কেন চাপান হয়?" এসব কথা রাজকর্ম্মচারীদের কানে পৌছে না বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু কোন ফলও ত হয় না। এই কয়েক দিন আগে দিল্লীর যুদ্ধসভাতে বড়লাট পুরাতন এমন অনেক কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যাহার উত্তর বহু সংবাদপত্রে বহু বার দেওয়া হইয়াছে। এই-সব কারণে রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহাদিগকে তর্কে পর্য্যন্ত করিয়া নিরস্ত করা যায় না। অবস্থাচক্র ও ঘটনাসমবায়ের কাছেই তাঁহাদিগকে পরাজয় মানিতে হয়। ভারতবাসীদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে তাঁহাদের বড়ই অনিচ্ছা

অনেকের আন্তরিক বিশ্বাসও সম্ভবতঃ এইরূপ যে আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার অযোগ্য। কিন্তু তাঁহাদের অনিচ্ছা এবং আমাদের "অযোগ্যতা" সত্ত্বেও অনেক রাজকর্ম্মচারীকে ভারতীয় স্বরাজ্যের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিতে হইতেছে। এমন কি পঞ্জাবের ছোটলাটও সেদিন প্রাদেশিক যুদ্ধসভায় বলিয়াছেন যে প্রজার নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্ট (Responsible Government) মহৎ আদর্শ এবং অনেকে তাঁহাদের জীবিতকালের মধ্যেই যে এই আদর্শ ভারতবর্ষে বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিবার আশা করেন, তাহা স্বাভাবিক। অবশ্য তাহার পর তিনি একটা "কিন্তু" এবং পরোক্ষ ভাবে একটা ধমক জুড়িয়া দিয়াছেন; তাহার আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

কৈসর কলিকাতায় আসিলে কি হইবে?

১৯শে বৈশাখ (২রা মে) কলিকাতায় লাট সাহেবের প্রাসাদে যে যুদ্ধসভা হয়, তাহাতে লাট সাহেব বলেন যে তিনি কাহাকেও এখন রাজনৈতিক আন্দোলন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রাজনৈতিক অভিলাষ পূর্ণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে বেশী পীড়াপীড়ি করা আমাদের পক্ষে কেন সুবিবেচনার কাজ হইবে না, তাহার তিনটি প্রধান কারণ তিনি দেখান। লাট সাহেবের কথার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে দিতেছি। প্রথম কারণ এই, যে, জার্ম্মেনী যদি দেখে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব শ্রেণীর লোক জার্মেনদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য একমত হইয়াছে, যুদ্ধে জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলে গৃহবিবাদ, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তর্কবিতর্ক স্থগিত রাখিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের উৎসাহ বাড়িবে না, বরং কমিতে পারে; পক্ষান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আভ্যন্তরীণ ঝগড়া আছে লক্ষ্য করিলে জার্মেনীর উৎসাহ বাড়িবে। দ্বিতীয় কারণ এই, যে, জার্মেনী জয়লাভ করিলে সভ্যতার ভিত্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে, এবং কাহারও স্বাধীনতা থাকিবে না, সকলকেই জার্মেনীর ইচ্ছার অধীন হইতে হইবে। তাহার পর লাট সাহেব বলেন :—If the Kaiser came to Calcutta what would all the talk of freedom of the individual, of the liberty of the subject, of the right of this people or that people to self-determination, of this constitutional *reform or that constitutional reform,*—what would be the value of all such talk if the Kaiser came to Calcutta? অর্থাৎ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, প্রজার স্বাধীনতা, এ-জাতি বা ও-জাতির নিজ-নিজ দেশের শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচনের অধিকার, মৌলিক রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনবিধির এ-সংস্কার ও-সংস্কার,—কৈসর কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে এ-সব জল্পনা ও বিতর্কের কি দশা হইবে, ইহাতে কি লাভ হইবে? তৃতীয় কারণ এই, যে, "ব্রিটিশ জাতির মেজাজ স্বতন্ত্র রকমের। কেহ কেহ তাহাদিগকে একগুঁয়ে জা'ত বলে। আমি মনে করি যে তাহারা বেশ বিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ জাতি। তুমি অনায়াসে তাহাদের সহিত তর্ক করিতে পার, তুমি অনায়াসে তাহাদের সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পার, এবং, সর্ব্বোপরি, তাহাদের মনে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিতে পার। কিন্তু যদি তাদের এরূপ সন্দেহ হয় যে তাদের বিপদের সময় কেহ সেই সুযোগে কিছু লাভের চেষ্টায় আছে, তাহা হইলে তাহারা ভারী চটিয়া যায়।"

আমরা জানি লাট সাহেবের সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই; আমাদের কথা তাঁহার কানেও পৌঁছিবে না। আমরা কেবল আমাদের জাতভাইদের অবগতির জন্য দু-একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। জার্মেনরা অত্যন্ত প্রভুত্বপ্রিয় বর্ব্বর ও নৃশংস না হইয়া, যদি ইংরেজদের মত সাম্য-ও-ভ্রাতৃত্ব প্রিয় সুসভ্য এবং দয়ালু হইত, তাহা হইলেও তাহাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত ও অধিকৃত হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করিতাম না। কারণ, স্বাধীনতাই বাঞ্ছনীয়, প্রভুপরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে; পরাধীনতা পরাধীনতাই, তাহার উনিশ বিশে খুব বেশী কিছু আসিয়া যায় না; কোন দেশে যুদ্ধ হইলে, কোন দেশ পরাজিত ও বিজেতার দ্বারা অধিকৃত হইলে, সে-খানে অত্যাচার হইবেই; ইংরেজ যখন প্রথম এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছিল, তখনও অত্যাচার হইয়াছিল। এই জন্য জার্মেনদের দ্বারা ভারতবর্ষ জয় আমরা চাই না। এবিষয়ে কোন মতভেদ নাই। অন্যান্য অপ্রধান বিষয়ে মতভেদ

আছে, থাকিবে, এবং উহা চাপা দিবার সামান্য চেষ্টা করিলেও উহা বাড়িবে বই কমিবে না। আমরা দেখিতেছি, যুদ্ধের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত বিলাতে নানা বিষয়ের আলোচনা ও আন্দোলন এবং তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে; নানা রকমের আইন পাস হইতেছে; এবং এখনও হইবে; তাহার মধ্যে অনেকগুলির সহিত যুদ্ধে জয়লাভের কোন সম্পর্ক নাই। জার্ম্মেনীর সহিত শান্তিস্থাপনের জন্য লেখা বা বক্তৃতা করা পর্য্যন্ত বিলাতে আইন দ্বারা বন্ধ করা হয় নাই। আয়ার্ল্যাণ্ডে হোমরূল স্থাপন লইয়া, এবং তথায়, ইংলণ্ডের মত, প্রত্যেক সমর্থ পুরুষকে সিপাহী হইতে বাধ্য করিবার আইন চালাইবার প্রস্তাব লইয়া, নানা দলের মধ্যে খুব মনকষাকষি চলিতেছে। এই প্রচণ্ড অন্তর্বিবাদে জার্ম্মেনীর উৎসাহ যদি না বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের আধমরা লোকদের সামান্য আন্দোলনে তাহার উৎসাহ বাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। আর যদি বিলাতী অন্তর্বিবাদে জার্ম্মেনীর উৎসাহ বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ রোধ করিবার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ চেষ্টার আগে বিলাতের অন্তর্বিবাদের সিংহনাদ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। সেখানে বিবাদ থামাইবার চেষ্টা হইতেছে, যে যাহা চায় যথাসম্ভব তাহাকে তাহা দিয়া; এখানে আমাদিগকে সে উপায়ে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে না। এখানে বলা হইতেছে, "তোমরা এখন চুপ কর; যত টাকা চাই ও অন্যান্য জিনিষ চাই, দাও; যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও; যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে তোমাদের বিষয় বিবেচনা করিব।" রাজকর্ম্মচারীরা সম্ভবতঃ মনে করেন যে, বিলাতের প্রণালী ও এখানকার প্রণালী, এবং এখানে যাহা বলা ও করা হইতেছে, সমুদয় বিবেচনা করিয়া আমাদের উৎসাহের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠা উচিত।

দ্বিতীয় কারণটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে বলিতেছি।

তৃতীয় কারণটির সোজা মানে এই যে, ইংরেজ বলিতেছেন, "দেখ, আমি ভারী জবরদস্ত ও একগুঁয়ে মানুষ। যদি তোমরা আমাদের খোসামোদ কর ও জোড় হাত করিয়া কিছু ভিক্ষা চাও, তাহা হইলে দয়া করিয়া (কিছু দিয়া ফেলিব মনে করিও না) দুটা মিষ্টি কথা বলিতে পারি, আগে আগে যেমন করিয়াছিলাম সেইরূপ কিছু অঙ্গীকার করিতে পারি, এমন কি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করিতে পারি। কিন্তু তোমরা যদি মনে করিয়া থাক যে আমি বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া সেই সুযোগে আমার নিকট হইতে কিছু অধিকার আদায় করিয়া লইবে, তাহা হইলে আমি ভয়ঙ্কর চটিয়া যাইব।" বলা বাহুল্য, ইংরেজকে বিপন্ন দেখিয়া আমরা এমন কিছু পাইবার চেষ্টা করিতেছি না যাহাতে ইংরেজ দুর্ব্বল হন বা তাঁহার অকল্যাণ হয়। আমরা কেবল মানুষের জন্মগত অধিকার আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছি।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজের মেজাজ কিরূপ, ইংরেজ তাহা অবশ্যই ঠিক বুঝেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, যে, আয়ার্ল্যাণ্ড এই বিপদের সময়ও হোমরূল চাওয়ায় আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর ইংরেজ চটিতেছেন না; আমেরিকা এই যুদ্ধের মধ্যেই আইরিশদিগকে হোমরূল দিতে হইবেই বলায় ইংরেজ চটিতেছেন না; অন্ততঃ আইরিশ ও আমেরিকানদের উপর চটিয়া থাকিলেও তাহা প্রকাশ না করিয়া হোমরূল দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকার জেদে যে ইংরেজ আইরিশদিগকে যুদ্ধের মধ্যেই শীঘ্র শীঘ্র হোমরূল দিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ অসঙ্কোচে পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন। যুদ্ধের মধ্যেই নারীদের, সৈন্যদের, রণতরীর নাবিকদের, কারখানার শ্রমজীবীদের, কৃষিক্ষেত্রের মালিক ও মজুরদের এবং আরও কোন কোন শ্রেণীর লোকদের দাবী ইংরেজ স্বদেশে মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

লর্ড রোনাল্ড্‌শে যাহাই বলুন, পাশ্চাত্য রাজনীতির একটা নিগূঢ় তত্ত্বই এই, যে, অনেক সময় যাহারা বেশী ত্যক্ত বা দিক্ করিতে পারে না, তাহাদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয় না। এটা আমাদের একটা অনুমান নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ বোনার ল গত বৎসর ভারতীয় কার্পাসসূত্র ও বস্ত্রের উপর শুল্ক সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে তর্কবিতর্কের সময় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন :—

"This was the position in which they were placed. They knew there would be some trouble in Lanca-

shire, though they did not anticipate it would be so great. But what they had to decide from the point of view of the war was whether there was likely to be more trouble at home or in India. That was the question, and it was on that basis that they gave their vote." (Mr. Dillon: Where there is most trouble, you give in?) "That is another way of putting it (Laughter). Whatever did give trouble politically was a thing which, if it could be avoided, ought to be avoided."

তাৎপর্য্য—"আমাদের অবস্থাটা এই-রকম দাঁড়াইয়াছিল। আমরা জানিতাম ল্যাঙ্কেশায়ারে কিছু মুস্কিল হইবে, কিন্তু তাহা এত বেশী হইবে, আগে হইতে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যুদ্ধের দিক্ হইতে আমাদিগকে ইহাই স্থির করিতে হইয়াছিল, যে, এদেশে (বিলাতে) বা ভারতবর্ষে, কোথায় বেশী ঝঞ্ঝাট হইবে? প্রশ্নটা হচ্চে এই, এবং ইহা মনে রাখিয়া আমরা ভোট দিয়াছি।" (আইরিশ নেতা মিঃ ডিলন এই সময় বলিয়া ফেলিলেন—"যেখানে সকলের চেয়ে বেশী দিক্ হইতে হয়, সেইখানেই আপনারা নরম হন?") মিঃ বোনার ল বলিলেন—"আমার কথাটা ও-রকমেও বলা যায় (হাস্য)। যাহাতে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাটে পড়িবার সম্ভাবনা, তাহা এড়াইতে পারিলে এড়ানই উচিত।"

অতএব, লর্ড রোনাল্ড্‌শের মত অনুযায়ী, ইংরেজদের একগুঁয়েমি ও চটা-মেজাজ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লর্ড রোনাল্ড্‌শে অপেক্ষা অনেক উচ্চপদস্থ ও বিচক্ষণ ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ বোনার ল এবং আইরিশ নেতা ডিলনের মতে অবস্থাবিশেষে নরম হইবার মত সুবুদ্ধিও ইংরেজদের আছে। অবশ্য ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নয়, তাহা আমরা জানি। ইহা ভাবিয়াই ত, যে-কথা কেহ ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদিগকে বা আয়ার্ল্যাণ্ডের ন্যাশন্যালিষ্টদিগকে বলিতে সাহস করেন না, তাহা এখানে অনায়াসে বলা হয়।

বঙ্গের লাটের উল্লিখিত দ্বিতীয় কারণটি সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। তিনি কৈসরের কলিকাতা আগমন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের মনে হয়, যে, বিজয়ীরূপে এখানে কৈসরের আসার সম্ভাবনা অতি-অতি-অল্প, বন্দীরূপে আসার সম্ভাবনাও তদ্রূপ। তবে এবিষয়ে খাঁটি খবর আমরা কিছুই জানি না; হয়ত শাসনকর্ত্তারা জানেন এবং তাঁহারা হয়ত মনে করেন জার্ম্মেন-সম্রাটের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। যাহোক্, এগুলা সব অনুমান ও কল্পনামাত্র। যদি অনুমান ও কল্পনা করিয়া আশঙ্কা করিতে হয়, তাহা হইলে ইউরোপের ও এসিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, যে, জার্ম্মেনরা কলিকাতা অপেক্ষা লণ্ডনের অধিক নিকটে আছে, এবং ইংলণ্ড আক্রমণ অপেক্ষা ভারতবর্ষ আক্রমণ জার্ম্মেনীর পক্ষে খুববেশী সোজা নয়। জার্ম্মেনীর ইংলণ্ড আক্রমণের যে কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহাও নয়। এ-বিষয়ে পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, এবং তাহার উত্তর হইতে জানা গিয়াছে, যে, আক্রমণ নিবারণের জন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। অবস্থা ত এইরূপ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের ও আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, পৌর ও জানপদবর্গের অধিকার, প্রত্যেক দেশের লোকদের স্বদেশের শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারণের অধিকার, এবং মৌলিক রাষ্ট্রীয়বিধির পরিবর্ত্তন, ইত্যাকার সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতেছে; নানা রকম আইন হইতেছে; একটা আইন দ্বারা ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচকদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইয়াছে (নূতন নির্ব্বাচকদের সংখ্যা আশি লক্ষ, তন্মধ্যে ষাট লক্ষ স্ত্রীলোক); হাউস অব্ লর্ডসের সংস্কারের জন্য কমিটি বসিয়াছিল, তাহাদের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে; যুদ্ধের অবসানের পর অন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে কিরূপ নিয়ম করা দরকার তাহার জন্য কমিটি বসিয়াছিল, তাহাদের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে; বিলাতের শিক্ষণ-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও উন্নতির জন্য শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার ফিশার (তাঁহার প্রথম বিল সকলের মনঃপূত না হওয়ায়) দ্বিতীয়বার একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। আর কত বলিব? ইংরেজদের স্বদেশে সবই চলিতেছে, এবং খুব জোরে চলিতেছে। কেবল আমরা টুঁশব্দ করিলেই নানা বাজে কারণ দেখাইয়া আমাদিগকে চুপ করিতে বলা হয়।

কৈসরের কলিকাতা আগমন সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, জার্ম্মেন-সম্রাট এতদূর পৌঁছিতে পারিলে কেবল আমাদের মুখই যে বন্ধ হইবে, আমরাই যে কেবল আমাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন এবং সংস্কারের দাবী করিতে পারিব না, তাহা নয়; যাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন এবং চুপ করিতে বলিতেছেন, তাঁহাদেরও কিঞ্চিৎ

অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। তাহাও ভাবিবার বিষয়, এবং তাহা যাহাতে না ঘটে, তাহার উপায় করা কেবল আমাদেরই চিন্তিতব্য ও কর্ত্তব্য নয়, যাঁহারা আপনাদিগকে ভারতবর্ষের প্রভু ও ভাগ্যবিধাতা মনে করেন, তাঁহাদেরও ভাবিবার এবং করিবার আছে।

উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের দ্বারা আমাদের কর্ত্তব্য বা তাঁহাদের কার্য্য-উদ্ধার করাইবার জন্য তাঁহারা যে-ভাবে কাজ করিতেছেন, তাহা বিজ্ঞজনোচিত মনে হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন, জার্ম্মেন শাসন যে কিরূপ ভয়ানক হইবে, প্রধানতঃ তাহার বিভীষিকা দ্বারা আমাদের প্রাণে আতঙ্ক জন্মাইয়া দিতে পারিলে, দলে দলে সৈন্য পাওয়া যাইবে, অন্য রকম সাহায্যও মিলিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা জার্ম্মেনদিগকে বিজেতা প্রভু রূপে চাই না। কিন্তু ইহাও ইংরেজদের জানা উচিত, যে, যে-জাতি অনেক রকমের পরাধীনতার অপমান ও ক্লেশ সহ্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের পক্ষে আর-এক রকমের পরাধীনতা তত বড় বিভীষিকা না হইতেও পারে, স্বাধীনতায় অভ্যস্ত জাতির পক্ষে উহা যত বড় বিভীষিকা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্বয়ংপ্রভু উপনিবেশগুলি যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে, যুদ্ধের আগে অন্ততঃ দশ পাঁচ বৎসরের জন্যও সেই স্বাধীনতার সুখ ও গৌরব অনুভব করা যদি ভারতবর্ষের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকিত, তাহা হইলে জার্ম্মেনীর অধীনতার বিভীষিকা আমাদের প্রাণে এখন যতটা ভয়ের উদ্রেক করিতেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ত্রাসের সঞ্চার করিত; কারণ স্বাধীনতার সুখ ও গৌরব একবার অনুভব করিয়া থাকিলে তাহা হারাইবার ভয়টা আমাদিগকে খুবই সন্ত্রস্ত করিত। যার ধন আছে, ডাকাতের ভয় তারি বেশী; যার স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনতা-অপহারক দস্যুকে সেই বেশী ভয় করে। সত্য বটে, আমরা কিঞ্চিৎ স্বাধীনতার আশা পাইয়াছি; কিন্তু তাহা যে কতটুকু ও কি প্রকারের হইবে, এবং আশা যে কবে পূর্ণ হইবে, কিম্বা পূর্ণ হইবেই কি না, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিলে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা বুঝিতে পারিতেও পারেন, যে, কেবল ভয় দেখাইয়া ভারতবর্ষের লোকদিগকে খুব বেশী উৎসাহিত করা যাইবে না। অন্য কোন কোন রকম কার্য্যপ্রণালী তাঁহাদিগকে উদ্ভাবন করিতে হইবে।

শাসনকর্ত্তাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করা ছাড়া আর-একটা বুদ্ধি রাজকর্ম্মচারীরা স্থির করিয়াছেন। এক কথায় সেটা হচ্চে, "তোমরা চুপ কর।" অর্থাৎ কিনা তাঁহারা চান, আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন, অর্থনৈতিক আন্দোলন, সব-রকম আন্দোলন বন্ধ করি; আমরা কি চাই, আমাদের কি কষ্ট আছে, কি অভাব আছে, এসব বিষয়ে বক্তৃতা, এসব বিষয়ে খবরের কাগজে লেখা সব বন্ধ থাক্। রাজপুরুষদের ও ভারতপ্রবাসী ইংরেজ সংবাদপত্রপরিচালকদের এই প্রস্তাবে আমরা একটি কারণে আমোদ অনুভব করিয়াছি। তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন, দরকার হইলে আবার বলিবেন, যে, ভারতবর্ষের আন্দোলনকারী শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশাল ভারতীয় লোকবৃন্দের অতি সামান্য অংশ, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অণুবীক্ষণের দরকার হয়, তাহারা কোটি কোটি নিরক্ষর লোকদের প্রতিনিধি নহে, তাহারা এই কোটি কোটি লোকদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখে না এবং তাহাদের মন জানে না, তাহাদের অভাব কষ্ট দূর করা এই অতিস্বার্থপর স্বকার্য্যোদ্ধারপরায়ণ শিক্ষিতশ্রেণীর উদ্দেশ্য নহে, নিরক্ষরেরা ইহাদিগকে বিশ্বাস করে না, দেশের "স্বাভাবিক নেতা" যে ভূস্বামী ও ধনী সম্প্রদায় তাহারা এই শিক্ষিত আন্দোলনকারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা আন্দোলন করিলেই কি, আর না করিলেই কি? আমাদের কথা ও মত যদি দেশের কথা ও মত না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া রাজকর্ম্মচারীরা আসল দেশবাসী যাহারা ও স্বাভাবিক নেতা যাহারা তাহাদিগকেই নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুন। আমাদের আন্দোলনে রাজপুরুষদের কাজ পণ্ড হইবে, এই ভয় যদি তাঁহাদের থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি ইহাই স্বীকার করা হয় না, যে, আমরা

নগণ্য নহি, দেশবাসীদের উপর আমাদের প্রভাব আছে, দেশবাসীরা আমাদের মতের অনুসরণ করে? তা, সে প্রভাব ভালই হউক বা মন্দই হউক?

জগতে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের কাজ আছে, ব্রিটিশসাম্রাজ্যে আমাদের যতটুকু সুবিধা আছে তাহা তুচ্ছ নহে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ও এই সুবিধা রক্ষা করার জন্য যদি আমাদের মুখ বন্ধ করা বাস্তবিক রাজপুরুষেরা দরকার মনে করেন, তাহা হইলে তাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আমরা চুপ করা দরকার মনে করিতেছি না; এইজন্য স্বেচ্ছায় চুপ করিব না। আইন করিলে অগত্যা চুপ করিতে হইবে। আমাদের চুপ করা দরকার, এটা যদি ইংরেজদের আন্তরিক ধারণা হয়, তাহা হইলে আইন হওয়া চাই। তাঁরা ত আমাদের মতের বিরুদ্ধে অনেক আইন করিয়াছেন, এটাও করিয়া দেখুন না। তাহা হইলে ঠিক্ বুঝিতে পারিবেন, আন্দোলনকারীরা তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধারের অন্তরায় হইয়া আছে কি না। যদি বক্তৃতা ও খবরের কাগজে লেখা বন্ধ হইলে দলে দলে লোক স্বেচ্ছায় পল্টনে ভর্ত্তি হয়, এবং দলে দলে সকলে যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তাহাদের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবার জন্য লাটসাহেবকে অনুরোধ করে, তাহা হইলে আমরাও বুঝিব যে আমাদের চুপ করা দরকার ছিল।

বাস্তবিক ভারতবর্ষের আন্দোলনকারীরা যাহা চাহিতেছেন, ভারতীয়দিগকে তাহা দিলে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সাহায্য করিতে লোকের উৎসাহ বাড়িবে বই কমিবে না। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সহিত যোগ থাকায় ভারতবর্ষের যে যে সুবিধা আছে, তাহা আন্দোলনকারীদের অজ্ঞাত নহে। তাঁহারা জানেন, এবং অনেকে একথা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেনও, যে, ভারতবর্ষের পরোক্ষ বা সাক্ষাৎ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনাস্থলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাহায্য করা ত ভারতীয়দের উচিতই, কেবলমাত্র ইংলণ্ডের বিপদেও বন্ধুভাবে সাহায্য করা কর্ত্তব্য,—দাস-ভাবে কিম্বা বখ্‌শিশের আশায় নহে।

আন্দোলনকারীদের মুখ বন্ধ ও কলম বন্ধ করুন বা না করুন, কর্ত্তৃপক্ষের একটা কাজ করা উচিত। তাঁহারা এখন যত সৈন্য চাহিতেছেন, এবং অন্যবিধ সাহায্যও যত চাহিতেছেন, তাহা কেবলমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য হইতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ভারতবর্ষে সকল প্রদেশের চেয়ে অধিক সিপাহী জুটিয়াছে পঞ্জাব হইতে। এইসব সিপাহীর অধিকাংশ নিরক্ষর। পঞ্জাবে লোকে বরাবর সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত ও করিয়া আসিয়াছে। তাহার ইতিহাস ও আর্থিক অবস্থা এরূপ যে মানুষকে বরাবর যোদ্ধা হইতে হইয়াছে। এখনও পেশা হিসাবে তথায় সিপাহী হওয়া সাধারণ লোকদের পোষায়। সিপাহীদের বেতন বাড়াইয়া দিলে সৈনিকবৃত্তি অন্য কোন কোন প্রদেশের সাধারণ নিরক্ষর লোকদের আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে। কিন্তু শুধু টাকাতে যথেষ্ট উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গের ভাব জন্মিতে পারে না। লোকের বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে পারা চাই, যে, দেশ ও গবর্ণমেণ্ট অভিন্ন, দেশের মঙ্গলে গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল, গবর্ণমেণ্ট দেশের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক সমস্তই করিতেছেন বা করিতে প্রস্তুত, এবং সেইজন্য দেশবাসী প্রত্যেক মানুষের আত্মোৎসর্গের উপর গবর্ণমেণ্টের দাবী আছে। এইরূপ বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষে নানা বাধা আছে। যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইবে, তাহা সত্য হওয়া চাই। তাহার পর যাহাদিগকে উহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইবে, তাহাদের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য থাকা চাই। যদি দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল লোক শিক্ষিত ও লিখনপঠনক্ষম হইত, তাহা হইলে বুঝাইবার কাজ অপেক্ষাকৃত সোজা হইত। কিন্তু আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরা নির্ব্বোধ নয়, এবং কথাটাও খুব দুরূহ ও জটিল নহে; সুতরাং মৌখিক বুঝান যাইতে পারে। অতএব সৈন্য সংগ্রহের জন্য গ্রামে-গ্রামে উপযুক্ত লোক দ্বারা গ্রামবাসীদিগকে বুঝান হউক, যে, তাহারা ও গবর্ণমেণ্ট স্বার্থে অভিন্ন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কল্যাণার্থ সব কিছু করিতে প্রস্তুত, এবং সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আত্মোৎসর্গ দাবী করিতেছেন।

দিল্লীতে যুদ্ধসভা বসিবার আগে দৈনিক কাগজে, উহা আহ্বান করিবার যে-তিনটি উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার তৃতীয়টি হইতেছে "to invite the co-operation of all classes in cheerfully making the sacrifices which may be necessary to achieve

victory," অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য যে স্বার্থত্যাগ করা দরকার তাহা প্রফুল্লচিত্তে করিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা চাওয়া। এইরূপ অনুরোধ বড় লাটের বক্তৃতাতেও ছিল। এক রকম সহযোগিতা সাম্রাজ্যকে টাকা দেওয়া। ভারতীয়েরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ট্যাক্স দিতেছে; তা ছাড়া তাহারা দেড়শত কোটি টাকা বিলাতের গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছে। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা যদি এখন কম বেতন লইতেন তাহা হইলে যে টাকাটা বাঁচিত তাহা যুদ্ধের জন্য ব্যয় হইতে পারিত। কিন্তু বড় লাট হইতে আরম্ভ করিয়া কোন সরকারী কর্ম্মচারী কম বেতন লইতেছেন না, বরং অনেক কর্ম্মচারীর পাওনা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাটের কলের লাভ আশাতীত হইতেছে। সম্প্রতি এক একটা কলের ১০০৲ টাকার অংশের ছয় মাসের লাভ দেওয়া হইয়াছে ৭৫৲ হইতে ১৫০৲ টাকা, অর্থাৎ বার্ষিক ১৫০৲ হইতে ৩০০৲। শতকরা দেড়শত হইতে তিনশত টাকা লাভ যুদ্ধের জন্যই হইতেছে, কেননা গবর্ণমেণ্ট চটের থলি খুব বেশী দামে খুব বেশী পরিমাণে লইতেছেন। এক একটা কলে ছয় মাসে ১৩।১৪ হইতে ২২ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। যুদ্ধজনিত এই লাভের উপর খুব বেশী ট্যাক্স বসান উচিত। পাটের কল ওয়ালাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই স্বার্থত্যাগের প্রস্তাব করা উচিত। কিন্তু ট্যাক্স বসান হয় নাই, ইংরেজ পাট-বণিকেরাও স্বার্থত্যাগের প্রস্তাব করেন নাই। চা-করদেরও খুব লাভ হইতেছে; কিন্তু এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলিকে চা-করদের চায়ের লাভের উপর ইন্‌কমট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাবের খুব তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। অন্যদিকে, দরিদ্র চাষাভুষাদের ও মজুরদের কথা দূরে থাক, মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা পর্য্যন্ত কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতায় চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। বস্ত্রাভাবে নারীর লজ্জা রক্ষা করিতে না পারায় আত্মহত্যার সত্য সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। পাটচাষীদের পাট যথেষ্ট মূল্যে ও যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রী না হওয়ায় তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, এবং পাটোৎপাদক পরগণা ও গ্রামসকলের জমীদারদের খাজনা আদায় হইতেছে না। প্রফুল্লচিত্তে স্বার্থত্যাগ কাহারা করিতে পারে, সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা চেষ্টা করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা পারেন, তাঁহারা আগে নিজে স্বার্থত্যাগ করিয়া পরে অন্যকে অনুরোধ করিলে ও উপদেশ দিলে সুফল ফলিতে পারে।

ব্রিটিশ মন্ত্রীরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন এবং বড়লাটও দিল্লীর যুদ্ধসভায় বলিয়াছেন, পৃথিবীর স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ হইতেছে। ভারতীয়দিগকে পৃথিবীর স্বাধীনতার জন্য লড়িতে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করা হইতেছে। ইংরেজরা পরাধীন নহেন বলিয়া হয়ত এ আহ্বান আমাদের কানে কিরূপ শুনাইতেছে বুঝিতে পারিতেছেন না। কতকগুলি সুপুষ্ট লোক অন্য কতকগুলি অনশনক্লিষ্ট উপবাসী লোককে যদি বলে, "এসো হে আমরা পৃথিবীর লোককে অন্নদানের জন্য অন্নসত্র খুলি", অথচ ঐ উপবাসী লোকেরা কখন্ খাইতে পাইবে, কতটুকু খাইতে পাইবে, এবং মোটেই খাইতে পাইবে কি না, তাহার স্থিরতা না থাকে, তাহা হইলে তাহারা খুব উৎসাহিত হয় না, এবং তাহাদের সহিত পরিহাস করা হইতেছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহও হইতে পারে। পরাধীন আমরা আত্মকর্তৃত্ববিহীন আমরা লড়িব পৃথিবীর স্বাধীনতার জন্য, অথচ আমরা কতটুকু স্বাধীনতা কবে পাইব এবং মোটেই কিছু পাইব কি না, তাহা অনিশ্চিত! ভারতবর্ষ পৃথিবীর অংশ; ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দিয়া পৃথিবীকে স্বাধীন করা যায় না। কিন্তু বড়লাট বলিতেছেন, আগে সমস্ত পৃথিবীর স্বাধীনতার বিপদটা কাটিয়া যাক্, তবে পৃথিবীর অংশগুলার স্বাধীনতার কথা উঠিবে। আমরা বলি, পৃথিবীর অনেক অংশই যে পরাধীন; সুতরাং পৃথিবীর স্বাধীনতার বা পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতার বিপদের কথাটাই উঠিতে পারে না, যতক্ষণ না অংশগুলাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। অতএব, অন্ততঃ যাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্যাপৃত আছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের অধীন অংশগুলাকে আত্মকর্তৃত্ব প্রদান করুন (যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডকে দিবার চেষ্টা হইতেছে), নতুবা "পৃথিবীর স্বাধীনতার সংগ্রাম" কথাগুলি তাঁহাদের মুখে অশোভন হইতেছে। ইংরেজরা যদি বলেন, "আমাদের প্রভুত্ব অপেক্ষা জার্মেনীর প্রভুত্ব অনেক খারাপ; তোমরা এই অপকৃষ্টতর অধীনতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য লড়," তাহা হইলে ভারতীয় সমালোচকের মুখ বন্ধ হয়।

মাতৃগৃহ ও মাতৃকারাগার।

বড়লাট আমাদিগকে আমাদের মাতৃভূমি রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেও একথা অনেক ইংরেজ ও ভারতীয় বলিয়াছেন। ভারতবর্ষ যে আমাদের মাতৃভূমি তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভূমিকে অভিনব আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইহাও নিশ্চিত যে জার্মেনী যদি ভারতবর্ষে আসে, উদ্ধারকর্ত্তা রূপে আসিবে না।

যে-সব স্বাধীন জাতির দেশে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত, তাহাদের মাতৃভূমি মাতৃগৃহের মত। মাতৃগৃহে সন্তানেরা স্নেহ ও যত্ন পায়, সুখে ও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, মায়ের বাড়ীর সব জিনিষেই তাহাদের অধিকার থাকে,

তাহারা মায়ের সন্তান, দাসীর সন্তান নয়, বলিয়া গৌরব অনুভব করে; ঐ-সব স্বাধীনজাতিও তাহাদের মাতৃভূমিতে মাতৃগৃহে বাসের সুখ-সুবিধা স্বাধীনতা ও গৌরব অনুভব করে। ভারতবর্ষে আমাদের কোন সুখ সুবিধা নাই, ইহা বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না; কিন্তু ইহাও ঠিক, যে, স্বাধীন জাতিদের মাতৃভূমি যেমন মাতৃগৃহের মত আমাদের মাতৃভূমি সেরূপ মাতৃগৃহের মত নহে। আমাদের দেশজননী অন্ন যথেষ্ট উৎপাদন করেন, তাহাতে অনেক বিদেশের লোক পর্য্যন্ত পুষ্ট হয়, এবং দুর্ভিক্ষের সময়ও এদেশ হইতে শস্য রপ্তানী হয়। কিন্তু দেশমাতার লক্ষ লক্ষ সন্তান পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। মা নিজের বাড়ীতে খাদ্য থাকিতে ছেলেকে অভুক্ত থাকিতে দেন না। কিন্তু আমাদের দেশমাতার সে ক্ষমতা ও অধিকার নাই। মাতৃগৃহে সন্তানদের বস্ত্রের ব্যবস্থা হয়। আমাদের দেশমাতৃকার গৃহে লক্ষ লক্ষ সন্তান প্রায় নগ্ন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে, অথচ এদেশের তুলা সুতা ও কাপড় উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। মাতৃগৃহে সন্তানদের নীরোগ রাখিবার চেষ্টা হয়, এবং রোগ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা মাতা করেন। আমাদের দেশজননীর এ বিষয়ে পর্য্যাপ্তরূপ ব্যবস্থা করিবার অধিকার নাই। মা সন্তানগুলিকে জ্ঞানী দেখিতে চান। আমাদের দেশমাতা সন্তানদের শিক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে অধিকারী নহেন। দেশের সব কাজে সব গৌরবে আমাদের অধিকার নাই। সব জায়গায় যাইবার, সব জায়গায় বাড়ী ঘর বাঁধিবার অধিকার আমাদের নাই। সুতরাং দেশজননী যে আমাদের জননী তাহাতে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, আমাদের স্বদেশ ঠিক্ মাতৃগৃহের মত নহে। কয়েদীদের মত আমাদের কোন স্বাধীনতাই নাই, তাহা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে, কিন্তু ইহাও ঠিক্ যে আমাদের মাতৃগৃহ কিয়ৎপরিমাণে মাতৃকারাগারের মত। যুদ্ধের আগেও ছাড়পত্র লইয়া তবে আমরা বিদেশে যাইতে পারিতাম, তাহাও সব দেশে যাইতে পারিতাম না। এখন ত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোথাও যাইবার জো নাই; ইংলণ্ডে আমাদের বিরুদ্ধে যে-সব মিথ্যা ও অর্দ্ধসত্য কথা প্রচারিত হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ করিতে যাঁহারা যাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত যাইতে দেওয়া হইল না। কয়েদীকে অন্যের তৈরী নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়; আমাদিগকেও সেই-সব আইন মানিতে হয়, যে-সব আমরা প্রণয়ন করি নাই। সকল দিকে আমাদের কথা চেষ্টা ও কাজ একটা গণ্ডীর মধ্যে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা; এই-জন্য চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট।

ভারতবর্ষ যে-পরিমাণে মাতৃগৃহের মত, উহা রক্ষা করিবার উৎসাহ সেই পরিমাণে আমাদের হইবার কথা; আমাদের স্বাধীনতা থাকিলে যতটা উৎসাহ হইত, ততটা উৎসাহ হইবার কথা নয়। যে মাতৃকারাগারেই মানুষ, যাহার আর কোন বাসস্থল নাই, সে ঐ কারাগারের প্রতিও মমতা অনুভব করিতে পারে, এবং তাহাই রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইতে পারে। আমাদের মাতৃভূমির অবস্থা যতই হীন হউক, উহা মাতৃভূমি বলিয়া উহার প্রতি আমাদের টান আছে। উহার অধিকতর দুর্দ্দশা আমরা দেখিতে চাই না। বরং ধর্ম্মসঙ্গত এরূপ সব কাজহ করিতে আমাদের প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য, যাহা করিলে উহার সহিত মাতৃকারাগারের আংশিক সাদৃশ্য কমিবে, এবং মাতৃভবনের সহিত আংশিক সাদৃশ্য বাড়িবে।

জেলের নির্জ্জন কক্ষ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হুইলার সাহেব বলিয়াছেন, জেলের যেসকল নির্জ্জন কক্ষে কোন কোন কয়েদীকে রাখা হয়, তাহা খুব ভাল। আমরা এইসব কক্ষ, রাজনৈতিক বন্দী ও অন্তরায়িতদের প্রতি ব্যবহার, প্রভৃতি বিষয়ে একটি চিঠি পাইয়াছি, লেখক নাম ও ঠিকানা দিয়া লিখিয়াছেন। তাহাতে জেলের নির্জ্জন কক্ষের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যে লেখকের এবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। এইজন্য তাঁহার চিঠির কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বাংলাদেশের অন্যান্য জেল অপেক্ষা প্রেসিডেন্সী জেলেই অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক বন্দী রাখা হয়। অতএব এই জেলের সেল্ (কক্ষ) ও কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের কথা শুনিলেই অপরাপর জেলের ও কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের আভাস পাইতে পারিবেন।

"প্রেসিডেন্সী জেলের ৪৪নং প্রাঙ্গণেই (yard 44) অধিকাংশ নানাবিধ রাজনৈতিক বন্দী রাখা হয়। এই য়ার্ডের সেলগুলির আয়তন নিতান্ত ছোট; দৈর্ঘ্যে আনুমানিক ৩॥০ গজ ও প্রস্থে আনুমানিক ২॥০ গজ। সম্মুখদিকে রেলিঙের প্রশস্ত দরজা থাকিলেও পশ্চাৎদিকে জানালা না থাকায় এবং সেল-সংলগ্ন বেষ্টনীবদ্ধ অতি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের দ্বার অধিকাংশ সময়ে বন্ধ থাকায় সেলে বায়ু-চলাচল একেবারেই রুদ্ধ। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে উত্তপ্ত বদ্ধ বায়ু বন্দীজীবন যে কতটা দুর্বিষহ করিয়া তুলে প্রাসাদের প্রশস্ত সুরম্য কক্ষে বৈদ্যুতিক হাওয়ার নীচে বসিয়া হুইলার সাহেব তাহা কেমন করিয়া অনুভব করিবেন? গ্রীষ্মে যেমন উত্তপ্ত হাওয়ায় দগ্ধ হইতে হয়, বর্ষায় আবার তেমনই রেলিঙের দ্বার দিয়া বৃষ্টির ঝাপ্টা আসিয়া ছাদের ফুটা বহিয়া জল পড়িয়া বন্দীদিগকে কত রজনী বিনিদ্র কাটাইতে বাধ্য করে। একে ত সূর্য্যের কিরণ কস্মিন্-কালেও সেলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, তাহাতে আবার সেলগুলির ভিটি (ভিত্তিভূমি) নিতান্ত নীচু হওয়ায়

মেঝেটা যে কেমন স্যাঁতসেঁতে হইতে পারে, তাহা বলিয়া বুঝান সম্ভব নহে। স্যাঁৎসেঁতে ঘরে রেলিংএর দরজা দিয়া শীতকালে শিশির ঢুকিলে সে ঘরে কি মানুষ থাকা সম্ভব? অথচ একখানা ছেঁড়া কম্বল বিছাইবার জন্য ও আর একখানা গায়ে দিবার জন্য দিয়াই বর্ত্তমান অবস্থায় শীতনিবারণের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হয়। এই ত সেল্; তার উপর আবার মলমূত্র ত্যাগের জন্য দুইটি টুকরী এই অন্ধকূপের মধ্যেই রক্ষিত হয় বলিয়া, উহাদের দুর্গন্ধে বন্দীদিগকে কতই না অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বন্দীদিগকে ঐ সমস্ত টুকরীর উপর বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয় এবং দিনে মোটে তিনবার টুকরী পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা আছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে এই ব্যবস্থা যে কিরূপ তাহা কি আর সাধারণকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে? হুইলার সাহেব যে attached enclosureএর কথা বলিয়াছেন সেই সেল-সংলগ্ন বেষ্টনীবদ্ধ উঠানটি অতি ক্ষুদ্র। তাহার চারিদিকের বেষ্টনী-প্রাচীর এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে বন্দী কদাচিৎ ঐ উঠানে আসিতে পাইলেও আকাশের কতকটা অংশ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যেন তার ভাগ্যে না ঘটে। এই বেষ্টনীবদ্ধ উঠানের বাহিরে অনধিক তিনগজ প্রশস্ত একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তাকেই হুইলার সাহেব court-yard আখ্যা দিয়া থাকিবেন। এই রাস্তার এক পার্শ্বে সেল ও অপর পার্শ্বে অতি উচ্চ প্রাচীর (main wall)। অপর দুই দিকের দুটি দরজা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। এই রাস্তার ঠিক্ মধ্যস্থলে আর-একটি দরজা থাকায় রাস্তাটি দুটি স্বতন্ত্র রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। এহেন court-yardএ বাহির হইলেও ঊর্দ্ধে আকাশের খানিকটা অংশ, একজন মেথর কয়েদী, একজন পরিবেশক কয়েদী এবং সিপাহী ও ওয়ার্ডারের তীব্র নজর ছাড়া অপর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। এহেন সেলে থাকিয়াও নাকি বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্ক রাজনৈতিক বন্দীদের ঘোচে নাই। অবশ্যই ইউরোপীয়ান য়ার্ডের সেল ও আলিপুর সেণ্ট্র্যাল জেলের কয়েকটি সেলের কথা স্বতন্ত্র। এই সমস্ত সেলগুলি যে কতকটা মনুষ্যবাসের যোগ্য, এই সমস্ত সেলগুলি শ্বেতকায়দিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল এই কথা বলিলেই বুঝা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ এইরূপ সেলের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

"এই ত বড় জেল প্রেসিডেন্সী জেলের কথা। অন্যান্য জেলের কথা আর কি বলিব? মেদিনীপুর জেলে পরস্পর সম্মুখীন সেলগুলির মধ্যে একটা সরু রাস্তা মাত্র ব্যবধান। এই সমস্ত সেলে সংলগ্ন উঠান নাই। সেলগুলির মধ্যে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, উহাতে যেন বাতাসেরও নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। বাঁকুড়ার পশ্চিমাস্য সেলগুলিতে দিবসের অর্দ্ধাংশকাল রৌদ্র খাইয়া অবরুদ্ধ রাজবন্দী(state prisoner)দের অবস্থা কত শোচনীয় করিয়া তুলে ভুক্তভোগী ব্যতীত আমরা তাহা কি বুঝিব? শত আবেদন নিবেদনেও তাহাদিগকে খুলিয়া রাখা হয় না। সর্ব্বত্রই সেলগুলি আবার, জেলের সুবৃহৎ প্রাচীর যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায়, বহুসংখ্যক প্রাচীরশ্রেণীতে বেষ্টিত করিয়া, সেলকে জেলের অপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। রাজসাহী জেলের বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক সেলকে আবার অপরাপর সেল হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য court-yardকেও অনেকগুলি প্রাচীর দ্বারা ছোট ছোট করিয়া খণ্ডিত করা হইয়াছে। অধিকাংশ ডিষ্ট্রিক্ট জেলের সেলগুলির দৈর্ঘ্য আনুমানিক তিন গজ এবং প্রস্থ আনুমানিক দুই গজ। এই সমস্ত সেলের ভীষণতা উপলব্ধি করিতে হইলে বেত্রাহিনী দণ্ডপ্রাপ্ত দস্যু তস্করেরা এই সমস্ত সেলে আবদ্ধ হওয়াকে কতটা ভয় করে তাহা জানা আবশ্যক। বাস্তবিক সেগুলি না থাকিলে ঐ সমস্ত বেত্রাহিনী লোক জেলে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কষ্টকর করিয়া তুলিত। এহেন সেলে আবদ্ধ থাকিয়া রাজনৈতিক বন্দীরা দিন কাটাইতেছেন। কেবল স্নানের সময়, খাওয়ার সময় ও মুখ ধুইবার সময় তাঁহারা সেলের সংলগ্ন উঠানে আসিতে পান। ব্যায়ামের সময় সকলকে সমান দেওয়া হয় না।

"Special convict ও undertrial prisoner-দিগকে সেল ও তৎসংলগ্ন উঠান উভয়ের দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। জেল কোড অনুসারে ইহারই নাম সলিটারী কন্‌ফাইন্‌মেণ্ট। ইহারা ব্যায়াম করিবার জন্য কিম্বা হাওয়া খাইবার জন্য বাহিরে আসিতে পায় না।

"ভারত-রক্ষা আইনের কয়েদীদিগকে সেলসংলগ্ন উঠানে অনধিক ১০।১৫ মিনিটের জন্য হাওয়া খাইতে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু অপর কোনও কয়েদীর সহিত কথা কহিতে কিম্বা তাহার মুখ দেখিতে দেওয়া হয় না। এমন কি মেথর বা পরিবেশক কয়েদীর (সমস্ত য়ার্ডের জন্য একজন মেথর এবং দুই একজন পরিবেশক থাকে) সহিতও দুই একটা কথা কহিতে পায় না। যে সিপাহী পাহারায় নিযুক্ত থাকে, তাহার সহিত কথা বলিলে উহার অর্থদণ্ড হয়।"

ইহার পর চিঠিতে কতকগুলি ভীষণ অত্যাচারের বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহা কাহার কাহার উপর কোথায় কখন হইয়াছে তাহা লিখিত না থাকায় আমরা তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। গুজব শুনিয়া এরূপ গুরুতর কথা ছাপা উচিত নয়। "সর্ব্বপ্রথমে রাজবন্দী(state prisoner)দিগকে হাওয়া খাওয়ার জন্য মোটে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হইত। ক্রমে নানা স্থানে গোলযোগ হওয়ায় সময় একটু একটু বাড়িতে থাকিল। নিয়ম যাহাই হউক না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে যে জেলে যতটুকু সময় না দিলে চলে না, সেই জেলে ততটুকুই দেওয়া হইতেছে। সকালে

১৫ মিনিট ও বৈকালে ১৫ মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া সকালে এক ঘণ্টা ও বৈকালে এক ঘণ্টা ইহাই বিভিন্ন জেলে ষ্টেট প্রিজনারদিগের হাওয়া খাইবার সময়ের হার। ব্যবস্থাপক সভায়, অন্যূন দুই ঘণ্টা হাওয়া খাইতে দেওয়া হয়, এইরূপ ঘোষণা করিবার পর কোন কোন জেলে সময় কিছু বাড়িলেও দু ঘণ্টার উপর কোথাও দেওয়া হয় না। পূর্ব্বে পরস্পরের সঙ্গ করা (association) ত দূরের কথা, অনেক স্থলে পরস্পরের মুখ দেখাই ভয়ানক অন্যায় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। দেশবাসীর আন্দোলনের ফলেই হউক বা বিভিন্ন জেলে প্রায়োপবেশনের জন্যই হউক অল্প কয়েকদিন যাবৎ কোন কোন জেলে পরস্পরের সংসর্গ করিতে দেওয়া হইয়াছে; সর্ব্বত্র কিন্তু এখনও দেওয়া হয় নাই।"

হুইলার সাহেবের বর্ণিত special furniture এবং home comforts সম্বন্ধে পত্রলেখক বলেন:—"এতকাল special furniture ছিল একটা জলের পাত্র, একটা পেয়ালা, ও মলমূত্র ত্যাগের দুইটি টুক্‌রী। কোন কোন জেলে লোহার খাটও একটা দিত বটে, কিন্তু সব জেলে নহে। ইহার পর অল্প কয়েকদিন যাবৎ একটা খারাপ চেয়ার ও একটা খারাপ টেবিল দেওয়া হইয়াছে।" চিঠিতে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। স্থানাভাবে ছাপিতে পারিলাম না। চিঠিখানি সিবিল রাইট্‌স্ কমিটিকে পাঠাইয়া দিলাম।

পিয়ার্সন সাহেবের গ্রেপ্তার সংবাদ।

কাগজে দেখিলাম চীনের রাজধানী পেকিং শহরে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক অপরাধে পিয়ার্সন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া শাংঘাই লইয়া গিয়াছেন। তিনি কি "অপরাধ" করিয়াছেন, এখনও জানা যায় নাই। আমরা তাঁহাকে সাধু, শান্ত, ও মহৎপ্রকৃতির লোক বলিয়া জানি। তিনি ভারতবর্ষের লোকদের অকৃত্রিম বন্ধু। দক্ষিণআফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি ও মিঃ এণ্ড্রুজ্ তাহাদের দুঃখ ও লাঞ্ছনা নিবারণের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কিছু ফলও হইয়াছিল। যাহারা একটি মাছিকেও আঘাত করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ হন না, পিয়ার্সন সাহেবকে আমরা সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করি।

আবার প্রায়োপবেশন।

চর লরেন্সে আটক ৯জন অন্তরায়িতের মধ্যে একজনের খাইবার কোন বন্দোবস্ত না থাকায় আর-একজনের সঙ্গে আহার করে। এই অপরাধে উভয়ের তিন মাস করিয়া কঠোর (rigorous) কারাদণ্ড হইয়াছে। বাকী সাতজন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া ঐ চর হইতে চলিয়া আসায় তাহাদের দুই তিন বা চারি মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে। প্রথম দুজনের একজন বলে, যে, উপায়ান্তর না থাকায় ক্ষুধার জ্বালায় তাহাকে আর-একজনের সঙ্গে খাইতে হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, একজন খাইতে না পাইয়া মরিবে, তাহা আমি কেমন করিয়া দেখিব? এইজন্য তাহাকে খাইতে দিয়াছি। আমরা সাক্ষীদের জবানবন্দী পড়িয়া ইহাদের কথা সত্য বলিয়া মনে করি। হইতে পারে যে তাহারা আইনের অক্ষরটা ভাঙ্গিয়াছে; তাহাতে এরূপ কঠোর দণ্ড দেওয়া কখনই উচিত হয় নাই। অন্য সাতজন চরলরেন্সে পুলিসের সব নিয়ম পালন করিয়া সুস্থদেহে বাস ভদ্রলোকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া চলিয়া আসে। তাহাদের কথাও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তাহাদের দণ্ডও গুরুতর হইয়াছে। অমৃতবাজার-পত্রিকায় দেখিলাম, জেলে আবদ্ধ হইবার পর অন্তরায়িতদের মধ্যে পাঁচজন প্রায়োপবেশন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তথাপি তাহাদিগকে জেলের শক্ত খাটুনি খাটিতে হইতেছে। কুতবদিয়ায় আটক সতের জন অন্তরায়িত সরকারের বিনা অনুমতিতে তথা হইতে চলিয়া আসায় চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ আছে। তাহারাও প্রায়োপবেশন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। মানুষ ইচ্ছা করিয়া নূতন নূতন কষ্ট ডাকিয়া আনে না, মরিবার জন্য প্রস্তুত হয় না। সরকারী কর্ম্মচারীরা কেবল দণ্ডকে একমাত্র উপায় না ভাবিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখুন অন্তরায়িতেরা কেন এমন মরীয়া হইতেছে; তাহারা পাগল নয়।

গ্রাহক নম্বর পরিবর্ত্তন।

এবার গ্রাহকদিগের নম্বর পরিবর্ত্তিত হইল। সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা টুকিয়া রাখিবেন, এবং কাগজ না-পাওয়া, ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, প্রভৃতি যে-কোন বিষয়ে চিঠি লিখিবেন, তাহাতে নূতন গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন। "Reg. No. C 277" কাহারও গ্রাহক নম্বর নহে। প্রবাসীর মোড়কের উপর প্রত্যেক গ্রাহকের নামের সঙ্গে গ্রাহক নম্বর হাতে লেখা থাকে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্যায়।

[চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে]
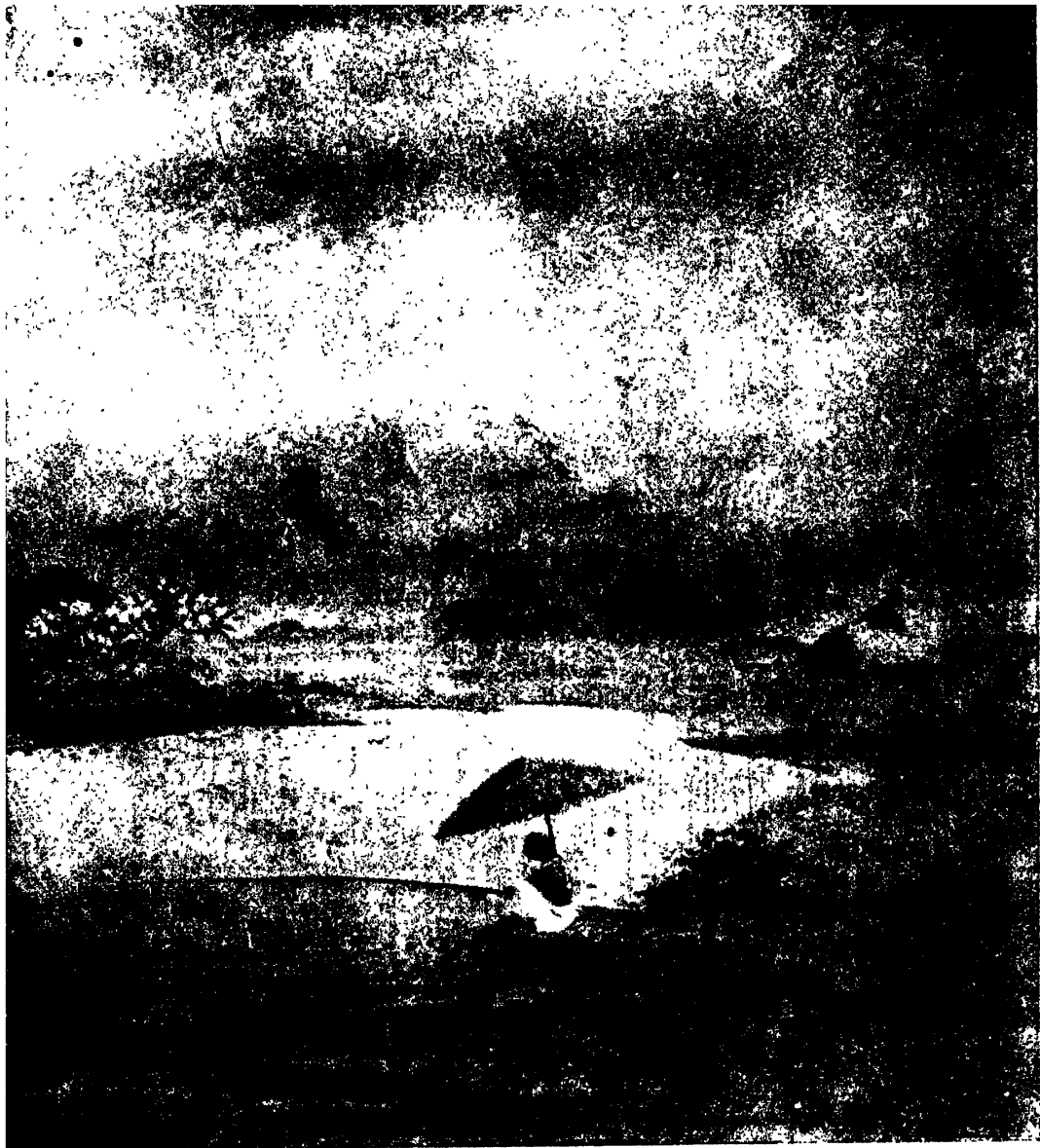
প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৮শ ভাগ
১ম খণ্ড | আষাঢ় ১৩২৫ | ৩য় সংখ্যা

মালা

আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে,
সিংহাসনে রাণীর হাতে
ছিল সোনার থালা,
তারি পরে একটি শুধু ছিল মণির মালা।

কাশী কাঞ্চি কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
বহুমুখী জলধারার স্রোতে
দলে দলে যাত্রী আসে
ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।
যারে শুধাই "কোথায় যাবে?" সেই তখনি বলে
"রাণীর সভাতলে।"
যারে শুধাই "কেন যাবে?" কয় সে তেজে চক্ষে দীপ্ত জ্বালা
"নেব বিজয়মালা!"

কেউবা ঘোড়ায় কেউবা রথে
ছুটে চলে, বিরাম্ চায় না পথে।
মনে যেন আগুন উঠ্‌ল ক্ষেপে,
চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠ্‌ল কেঁপে কেঁপে।

মনে মনে কইনু হর্ষে, "ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী,
তোমার সভায় হব আমি জয়ী!
শূন্য করে থালা
নেব বিজয়মালা!"

একটি ছিল তরুণ যাত্রী, করুণ তাহার মুখ,
প্রভাত-তারার মত যে তার নয়ন দুটি কি লাগি উৎসুক।
সবাই যখন ছুটে চলে
সে যে তরুর তলে
আপন মনে বসে থাকে।
আকাশ যেন শুধায় তাকে—
যার কথা সে ভাবে কি তার নাম?
আমি তারে যখন শুধালাম—
"মালার আশায় যাও বুঝি ঐ হাতে নিয়ে শূন্য তোমার ডালা?"
সে বলে "ভাই, চাইনে বিজয়মালা।"

তারে দেখে সবাই হাসে;
মনে ভাবে, "এও কেন মোদের সাথে আসে
আশা করার ভরসাও যার নাইক মনে,
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে!"
সবার তরে জায়্গা সে দেয় মেলে,
আগেভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে।
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে;
পথ চলেচে যেন রে কার বাঁশীর অধীর ডাকে
হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা;
তবু বলে, চায় না বিজয়মালা।

সিংহাসনে একলা বসে রাণী
মূর্ত্তিমতী বাণী।
ঝঙ্কারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে
আমার বীণা বাজে।

কখনো বা দীপক রাগে
চমক লাগে,
তারা বৃষ্টি করে ;
কখনো বা মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে।
আর সকলে গান শুনিয়ে নত শিরে
সন্ধ্যা বেলার অন্ধকারে ধীরে ধীরে
গেছে ঘরে ফিরে।
তা'রা জানে, যেই ফুরাবে আমার পালা,
আমি পাব রাণীর বিজয়মালা।

আমাদের সেই তরুণ সাথী বসে থাকে ধূলায় আসনতলে ;
কথাটি না বলে।
দৈবে যদি একটি আধটি চাঁপার কলি
পড়ে স্খলি
রাণীর আঁচল হতে মাটির পরে,
সবার অগোচরে
সেইটি যত্নে নিয়ে তুলে
পরে কর্ণমূলে।
সভাভঙ্গ হবার বেলায় দিনের শেষে
যদি তারে বলি হেসে—
"প্রদীপ জ্বালার সময় হল সাঁঝে,
এখনো কি রইবে সভামাঝে ?"
সে হেসে কয়, "সব সময়েই আমার পালা,
আমি যে ভাই চাইনে বিজয়মালা।"

আষাঢ় শ্রাবণ অবশেষে
গেলে ভেসে
ছিন্ন মেঘের পালে,—
গুরু গুরু মৃদঙ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে
শরৎ এল, শরৎ গেল চলে ;
নীল আকাশের কোলে

রৌদ্রজলের কান্নাহাসি হল সারা ;
আমার সুরের থরে থরে ছড়িয়ে গেল শিউলিফুলের ঝারা।
ফাগুন-চৈত্র আম-মউলের সৌরভে আতুর,
দখিন হাওয়ার আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের সুর।
কণ্ঠে আমার একে একে সকল ঋতুর গান
হল অবসান।
তখন রাণী আসন হতে উঠে
আমার করপুটে
তুলে দিলেন, শূন্য করে থালা,
আপন বিজয়মালা।

পথে যখন বাহির হলেম মালা মাথায় পরে,
মনে হল বিশ্ব আমার চতুর্দ্দিকে ঘোরে
ঘূর্ণী ধূলার মত।
মানুষ শত শত
ঘিরল আমায় দলে দলে—
কেউবা কৌতূহলে,
কেউবা স্তুতিচ্ছলে,
কেউবা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়।
হায় রে হায়
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়।
এই ধরণীর লাজুক যত সুখ
ছোটখাটো আনন্দেরি সরল হাসিটুক
নদীচরের ভীরু হংসদলের মত
কোথায় হল গত।
আমি মনে মনে ভাবি, "একি দহনজ্বালা
আমার বিজয়মালা।"

ওগো রাণী, তোমার হাতে আর কিছু কি নেই?
শুধু কেবল বিজয়মালা এই?
জীবন আমার জুড়ায় না যে :
বক্ষে বাজে

তোমার মালার ভার ;—
এই কি পুরস্কার ?
এ ত কেবল বাইরে আমার গলায় মাথায় পরি ;
কি দিয়ে যে হৃদয় ভরি
সেই ত খুঁজে মরি।
তৃষ্ণা আমার বাড়ে শুধু মালার তাপে ;
কিসের শাপে
ওগো রাণী শূন্য করে তোমার সোনার থালা
পেলেম বিজয়মালা ?

আমার কেমন মনে হল আরো যেন অনেক আছে বাকি—
সে নইলে সব ফাঁকি।
এ শুধু আধখানা,
কোন্ মাণিকের অভাব আছে এ মালা তাই কাণা !
হয়নি পাওয়া, সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে
এমন করে বাজে ?
চল্‌রে ফিরে বিড়ম্বিত আবার ফিরে চল্,
দেখ্‌বি খুঁজে বিজন সভাতল,—
যদি রে তোর ভাগ্যদোষে
ধূলায় কিছু পড়ে থাকে খসে !
যদি সোনার থালা
লুকিয়ে রাখে আর কোনো এক মালা !

সন্ধ্যাকাশে শান্ত তখন হাওয়া ;
দেখি সভার দুয়ার বন্ধ, ক্ষান্ত তখন সকল চাওয়া পাওয়া।
নাই কোলাহল, নাইক ঠেলাঠেলি,
তরুশ্রেণী স্তব্ধ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি।
বিজন পথে আঁধার গগনতলে
আমার মালার রতনগুলি আর কি তেমন জ্বলে ?
আকাশের ঐ তারার কাছে
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে আছে !

দিনের আলোয় ভুলিয়েছিল মুগ্ধ আঁখি,
আঁধারে তার ধরা পড়ল ফাঁকি !
এরি লাগি এত বিবাদ, সারা দিনের এত দুখের পালা ?
লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা।

ঘনিয়ে এল রাতি।
হঠাৎ দেখি তারার আলোয় সেই যে আমার পথের তরুণ সাথী
আপন মনে
গান গেয়ে যায় রাণীর কুঞ্জবনে।
আমি তারে শুধাই ধীরে, "কোথায় তুমি এই নিভৃতের মাঝে
রয়েছ কোন্ কাজে ?"
সে হেসে কয়, "ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
তখন রাণীর আসন হল বকুল-বীথিকাতে,
আমি একা বীণা বাজাই রাতে।"
শুধাই তারে, "কি পেলে তাঁর কাছে ?"
সে কয় শুনে, "এই যে আমার বুকের মাঝে আলো করে আছে।
কেউ দেখেনি রাণীর কোলে পদ্মপাতার ডালা,
তারি মধ্যে গোপন ছিল আপন হাতের বরণমালা !"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিত্বের ত্রিধারা

[১]

ইউরোপীয় প্রতিভার তিনটি ধারা। তিনটি জাতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে যে দীক্ষা দিয়াছে তাহারই প্রভাবে ইউরোপের শিক্ষা সভ্যতা, তাহার সকল শিল্পসৃষ্টি, গড়িয়া উঠিয়াছে, অনুরঞ্জিত হইয়াছে। ইউরোপের কবি-প্রতিভাও চলিয়াছে এই তিনটি ধারায়, গঠিত হইয়াছে এই তিনটি ভঙ্গিমায়। প্রথম দীক্ষা আসিয়াছে গ্রীস হইতে। শান্ত স্বচ্ছ মতি, পরিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি, সরস চিন্তা-নৈপুণ্য—sweet reasonableness—ইহাই গ্রীক প্রতিভা। ইউরোপের দ্বিতীয় দীক্ষা রোমের নিকটে। রোম দিয়াছে স্থূল বস্তুর উপর সুদৃঢ় আধিপত্য—সংযম, শক্তি, পুরুষত্ব, তেজঘন মহত্ত্ব। আর এই দুইটির পশ্চাতে রহিয়াছে একটা অতীত যুগের দীক্ষা, একটা প্রাচীনতর প্রতিভা, যাহার মধ্যে ইউরোপ সন্ধান পাইয়াছে এসিয়ার অন্তরাত্মা, যাহা পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া ধরিয়াছে প্রাচ্যের সহিত—এটি হইতেছে কেল্টিক প্রতিভা। কেল্টিক প্রতিভা চাহিয়াছে যাহা মানুষের বিচারবুদ্ধি সম্যক ধারণা করিতে পারে না, তপঃশক্তির তীব্র পীড়নের মধ্যেও যাহা ধরা দিতে চায় না, এমনি একটা মুক্ত অসীম অমূর্ত্তের আভাস, একটা ইন্দ্রিয়াতীত প্রতিষ্ঠানের রহস্যময় লাঞ্ছনা। কেল্টিক,

রোমক ও গ্রীক—এই তিনটি দীক্ষা লইয়া ইউরোপ। ইউরোপের কাব্য-জগতেও খেলিয়াছে এই তিন প্রকার সুর।

কিন্তু শুধু ইউরোপের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া, বিশেষ কোন জাতির সহিত সংযুক্ত না করিয়া, এই তিনটি নামকে আমরা কবিত্বের তিনটি সাধারণ আদর্শের প্রতীক স্বরূপ লইতে পারি। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে কাব্যজগতে আমরা দেখিতে পাই এই তিন প্রকার আদর্শের এই তিন প্রকার ভঙ্গিমার উদাহরণ। ভাষা ও ভাবের লীলাভিরাম প্রাঞ্জলতা, অর্থের স্ফুট অভিব্যঞ্জনা, কল্পনা আছে কিন্তু সে কল্পনা বিচারবুদ্ধিরই সুনিপুণ সম্প্রসারণ—তাহার উপর অশরীরী অতীন্দ্রিয় প্রহেলিকার ছায়া কিছু পড়ে নাই, তাহা অতিমাত্র মানুষেরই। বস্তুকে স্পষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ প্রকট করিয়া, সুভঙ্গিম চারুতায় ভরিয়া মানসনয়নের সম্মুখে গোচর করিয়া ধরা, কাব্যের ইহাই গ্রীক আদর্শ—ঠিক যেন স্থির নির্ম্মল জলের উপর প্রতিবিম্বিত তীরবর্ত্তী বনস্থলীর একখানি ছবি। কাব্যের রোমক আদর্শ হইতেছে কবিতাকে মন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলা—সেখানে বাহুল্য কিছু নাই, নিরর্থক কিছু নাই, সবই সংক্ষিপ্ত, দৃঢ়বদ্ধ, গুরু, গাঢ়, ওজঃপূর্ণ, তপঃশক্তিতে ভরাট। দেখিয়া মনে হয় যেন প্রখর সূর্য্য-কিরণ-দীপ্ত নিথর প্রস্তর-প্রতিমা। আর কেল্টিক আদর্শ হইতেছে বাক্য অর্থ ছাড়াইয়া, কল্পনার আবরণকেও ভেদ করিয়া একটা তুরীয়ের বার্ত্তা, অনন্তের প্রহেলিকা, অনির্দ্দেশ্যের অপার লক্ষণাকে ফুটাইয়া তুলা,—বস্তুর, রূপের সহায়ে বস্তুর রূপের অন্তরালে শুধু নিবিড় ভাবগম্য একটা যে অরূপের, অবাঙ্মনসগোচর সত্তা ছাইয়া আছে তাহার কিছু ইঙ্গিত দেওয়া।

কেল্টিকের এই অরূপ ভাবগর্ভ কবিত্বের উদাহরণ কীট্সের

> Magic casements opening on the foam
> Of perilous seas in fairy-lands forlorn

এখানে আমরা বোধ করি যেন এই স্থূল অতিস্পষ্ট এই সসীম খণ্ডিত জগৎকে ছাড়াইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য কোন্ অতিসূক্ষ্ম জগতের অতলতায় ডুবিয়া যাইতেছি, সৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত কি এক অনন্ত ইঙ্গিতে ভরপুর রহস্যটি উঁকি দিয়া দেখা দিতেছে। মানুষ অন্তরাত্মা দিয়া সে বস্তুটিকে ধরিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারে না, যাহার একটা ব্যথা দেওয়া যায় না অথচ যাহা ব্যথার অপেক্ষাও রাখে না, অতিজগতের চেতনা লইয়া যাহা স্বপ্রকাশ। অথবা যখন শুনি সেক্সপীয়র বলিতেছেন

> Daffodils
> That come before the swallow dares and take
> The winds of March with beauty—

তখন কথাগুলি আমাদের বুঝিবার বৃত্তি বা কল্পনাশক্তিকে স্পর্শ না করিয়াই একেবারে অন্তরের কি এক নিভৃত তন্ত্রীতে যাইয়া আঘাত করে, নাচাইয়া তুলে আর-এক জগতের মোহন মূর্চ্ছনা—সে যেন দিব্য অপরোক্ষানুভূতি যাহা বস্তুর কি যেন অশরীরী দিব্যভাব খুলিয়া ধরিতেছে। গ্রীকের সে প্রসাদগুণ, সে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট প্রতীতি, নিপুণ-কারিগর-সুলভ যথাযথ বস্তুবিন্যাস, প্রত্যক্ষের স্ফুট ব্যঞ্জনা—তাহার উদাহরণ ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের

> Fair as a star, when only one
> Is shining in the sky.

অথবা ম্যাথু আর্ণল্ডের

> The day in his hotness,
> The strife with the palm ;
> The night in her silence,
> The stars in their calm.

কেল্টিক প্রতিভার সে অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্রজাল এখানে নাই। বস্তুর অন্তরের, সত্যের যে বিপুল প্রহেলিকা, যে অচিন্ত্য অপ্রকাশ দিব্য চেতনা, তাহার আভাস কিছু দিবার চেষ্টা এখানে হয় নাই—সহজ বোধের মধ্যে একটা সরল সৌন্দর্য্য লইয়া সত্য গোচর প্রকট হইয়াছে, নিঃশেষে আপনাকে ধরা দিতেছে। আর কবিত্বের তাপসশক্তি, ব্রহ্মবাণীর জ্বলন্ত তেজ, রোমকের বজ্রসার স্থাণুত্ব দেখাইতেছে মিলটনের

> Fall'n Cherub ! to be weak is miserable—

অথবা দান্তের

> Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.

(দূরে ফেল আশা যত কে তুমি পশিছ হেথা।)

ইউরোপীয় কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতীয় কাব্য যদি লই তবে সেখানেও কবিত্বের এই তিনটি ভঙ্গিমার উদাহরণ আমরা পাই। বৈদিক কবি কুৎস যখন গাহিতেছেন

পরায়তীনামন্বেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাং।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্তী উষা মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী॥

(পরপারে চলিয়া যাইতেছে যাহারা তাহাদেরই পথখানি যে অনুসরণ করিতেছে, অনন্তশ্রেণীভরে আসিতেছে যাহারা তাহাদের যে সর্ব্বপ্রথম, এই সে উষা আপনাকে উদার প্রসারিত করিয়া দিতেছে, প্রাণবন্ত যাহা তাহাকে সে বাহিরে আনিয়া ধরিতেছে, মৃত কি যেন আবার কাহাকে সম্বুদ্ধ করিতেছে।)

তখন তিনি কিনা একটা নিগূঢ় সত্যের মুখ হইতে আবরণটি খুলিয়া দিতেছেন—বিশ্বের সমস্ত রহস্য, সমস্ত প্রহেলিকা অনন্তের প্রসারে যেন তরঙ্গায়িত হইয়া যাইতেছে। মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী—বাস্তবিকই ত আমাদের চেতনার মাঝে কি অজ্ঞানা অচেনা অপার্থিব কিছু জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তাহার রূপ একটা নির্ণয় করিয়া দিতে পারি না, দেওয়ার প্রয়োজনও কিছু নাই। অর্থগৌরবে এ বাক্যটি ভরপুর, কিন্তু এই অর্থের মধ্যেই উহা শেষ হইয়া যায় নাই; অর্থকে ছাড়াইয়া একটা অশরীরী ভাব, অনির্দ্দেশ্যের দ্যোতনা সেখানে ভাসিয়া উঠিয়াছে এবং অর্থ অপেক্ষা বিশেষরূপে এই জিনিষটিতেই রহিয়াছে কবিতাটির প্রাণ। আর উহারই নাম আমরা দিয়াছি কেল্টিকের সম্মোহিনী বিদ্যা, দিব্যভাব। তারপর বাল্মীকির

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেৎ তু মম জীবিতম্॥

এখানে পাই গ্রীকের স্নিগ্ধ মনীষা। কেল্টিকের সে যাদু এখানে নাই, ইহার সবই স্পষ্ট যথাযথ অর্থগৌরবে পরিপূর্ণ, একটা সুবিমল স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া উহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে—অর্থকে রহস্যময়ী কুহেলিকার মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। আর কবিতাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ করিয়া তুলিয়াছেন মহাভারতকার—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ—

এ-কথাটির বর্ণে-বর্ণে দৃপ্ত তেজ ছুটিয়া বাহির হইতেছে, যতির কৃচ্ছ্রসাধনার কি একটা নিথরতা উহার পর্ব্বে-পর্ব্বে—মন্ত্রেরই মত উহা নিরেট, মন্ত্রেরই মত অব্যর্থ শক্তিতে ভরপুর।

কবি-প্রতিভার এই তিনটি ভঙ্গিমাকে আমরা তিনরকম বিভিন্ন আদর্শ রূপেই দেখাইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহারা তেমন সম্পূর্ণ পৃথক-পৃথক বস্তু নহে। বস্তুতঃ সকল কবিতার মধ্যেই এই তিনটি ধারা থাকা প্রয়োজন, এই ত্রয়ীর সমবায়েই কবিত্বের পূর্ণতম শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। প্রথমে চাহি একটা অনন্তের অভিব্যঞ্জনা, বিরাটের লক্ষণা, অনির্দ্দেশ্যের ইঙ্গিত। কারণ সকল শিল্পই হইতেছে সত্যকে সুন্দরকে রসবৎকে ফুটাইয়া তোলা। আর এই যে সত্য সুন্দর রসবৎ তাহার মূল তাহার প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে সৃষ্টির পরার্দ্ধে, অনন্তের অসীমের মধ্যে। এই অনন্ত অসীম, এই তুরীয়ের ভিতর হইতেই শিল্পী তাঁহার শিল্পবস্তুকে কাটিয়া তুলিতেছেন। যে নিগূঢ় ভাব বস্তুর প্রকট লীলার অন্তরালে, কোন বিশেষ রূপের মধ্যে যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, বৃহতের প্রসারে যাহা লীলায়িত—সেই অজ্ঞাত অরূপ অনন্তের ইঙ্গিত ব্যতিরেকে বস্তুটির যতটুকু পাই তাহা অতিমাত্র স্থূল খণ্ডিত অচল; তাহা জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে, কবি কিন্তু তাহাকে কখনই একান্ত করিয়া লইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই যে অনন্ত তাহা শুধু আবার অশরীরী অনন্তই নয়, তাহা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে একটা বিশেষ বিগ্রহ। এই অনন্তের মধ্যেই একটা বিশেষ ভাব, বিশেষ রস জমিয়া উঠিয়াছে একটা বিশেষ অর্থের সংস্পর্শে। অর্থের চিন্তার রেখাপাতেই কুহেলিকাময় ভাবুকতা মানসপটে গোচর হইয়া দেখা দিয়াছে, স্ফুট বদ্ধ বহুভঙ্গিমরুচির হইয়া চলিয়াছে। অরূপ যখন রূপের প্রতি-লেখায় সুবলয়িত হইয়া উঠিতেছে, সীমার টানে টানে যখন অসীম আসিয়া ধরা দিতেছে, তখনই না আনন্দের খেলা? কেল্টিক প্রতিভা হইতেছে বস্তুর যে নিগূঢ় প্রহেলিকা, বস্তুর অন্তরাত্মায় মিশিয়া রহিয়াছে যে অনন্তের ছায়া; আর গ্রীক প্রতিভা হইতেছে বস্তুর যে আনন্দ, রূপের মাঝে প্রকাশের মাঝে যে রসলাস্য। কিন্তু এই দুইটিকে লইয়াই কবিপ্রতিভা সম্পূর্ণ নহে। কবিত্ব হইতেছে আবার শক্তির পরিস্ফুরণ,

সৃজনের মধ্যে রহিয়াছে যে বীর্য্যের অনুপ্রেরণা। বস্তুর এই শক্তির দিকটি দেখাইতেছে লাতিন প্রতিভা। লাতিনে বাক্যের গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে যে একটা ওজঃ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, ভাব যে সেখানে নিবিড়, অর্থ অব্যর্থ শৃঙ্খলায় সম্বদ্ধ, তাহাতে আমরা অনুভব করি সত্যের গীর্ব্বাণীর যে তপঃশক্তি। ফলতঃ, সকল প্রকার সৃজনের জন্য চাই যুগপৎ এই তিনটি জিনিষ—(১) দৃষ্টি, (২) মনীষা, (৩) প্রাণশক্তি বা তপস্। দৃষ্টিতে পাই বস্তুর আত্মা, তাহার ভাগবত সত্তা; মনীষা দেয় বস্তুর অন্তঃকরণ, তাহার প্রকট মনোভাবরাজী; আর তপঃশক্তি বস্তুকে শরীরী করিয়াছে, যথাবিন্যস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভরিয়া জাগ্রত জীবন্ত বীর্য্যবান করিয়া ধরিয়াছে।

আমরা উপরে যে-সকল উদাহরণ দিয়াছি তাহা হইতেই আমাদের এই বক্তব্যটি স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তাহাদের যে-কোনটি লইয়া যদি একটু ধ্যান দিয়া দেখি তবে দেখিব উহার মধ্যে এই তিনটি ধারাই রহিয়াছে। তবে তিনটিই যে সমানভাবে স্ফুট তাহা নয়—একটিই হইতেছে মুখ্য সুর আর সেই অনুসারেই শ্রেণীবিভাগ করিতে পারিয়াছি; তবুও আর-দুইটিও তাহার পশ্চাতেই রহিয়াছে। আমরা বলিয়াছি

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা…

অথবা

The night in her silence,
The stars in their calm—

হইতেছে গ্রীকসুলভ প্রসাদগুণাত্মক কবিতা। সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইসঙ্গেই এখানে, এই সুব্যক্ত সুবোধ্য অর্থদ্যোতনারই পশ্চাতে একটা অতীন্দ্রিয় লোকের বিপুলতা, একটা অনন্তচেতনার রহস্য কি প্রসারিত হইয়া চলে নাই? শুধু তাহাই নয়, কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে করিতে উহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে মন্ত্র-শক্তিরই ওজস্ আমরা অনুভব করি না? আর বৈদিক ঋষির

পরায়তীনামন্বেতি পাথ…

কেল্টিক বা দিব্যভাবের সেই আদর্শ কবিত্ব, উহা ত অর্থে অর্থে সুষীম—আর উহা যে অনির্ব্বচনীয় অমোঘ মন্ত্র তাহাও কি আবার বলিবার প্রয়োজন?

[২]

মনীষার যে প্রসাদগুণের যে নির্ম্মলতার যে দক্ষতার আদর্শ স্বরূপ ছিল প্রাচীন্ গ্রীক, আধুনিক জাতি-সকলের মধ্যে ফরাসী যেমন তাহা আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে এমনটি আর কেহ পারে নাই। ফরাসীর মানস প্রকৃতি যেমন লঘুপ্রকাশক তেমনি তাহা অতুলনীয়। এই ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—le vêtement le plus transparent de la pensée, চিন্তাকে পরাইবার এমন স্বচ্ছ পরিধান আর কোন ভাষায় মিলে না। ব্যাখ্যার জন্য, বিবৃতির জন্য, বুঝিবার বুঝাইবার জন্য এটি একেবারে আদর্শ ভাষা। এখানে হেঁয়ালী, অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থতার স্থান নাই—নাই এখানে জটিল গ্রন্থি, নাই ব্যাসকূট। কিন্তু ঠিক এই জন্যই ফরাসীর গদ্য যেমন অপরূপ পদার্থ, তাহার কাব্য সেই অনুপাতে মহনীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। চিন্তার বুদ্ধির বিচারের সহজ-অনুভূতির মধ্যে সব জিনিষ ফেলিয়া সরল সুস্পষ্ট মনোজ্ঞ করিয়া তোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু আত্মার সে রহস্য, অজ্ঞাতের অসীমের মধ্যে যে বিরাট বস্তুরিক্ত ভাবঘন দ্যোতনা—তাহার সন্ধান সেখানে তেমন পাওয়া যায় না। আর এইখানেই গ্রীক হইতে ফরাসীর পার্থক্য। গ্রীকের মনীষা একদিকে যেমন বস্তুতন্ত্র ছিল, প্রত্যক্ষকে রেখায় রেখায় ফুটাইয়া ধরাতেই তাহার বিশেষত্ব, অন্য দিকে তেমনি তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল আর-একটি লোকের দীপ্তি, আর-এক প্রকার অনুভূতির ছায়াসম্পাতের জন্য তাহার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশই ছিল। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে গ্রীক তাহার প্রাণের দীক্ষা পায় মিশর হইতে—মিশরের প্রাচ্যের যে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম সম্পদ, তাহারই একটা ছায়া বুঝি সে কিঞ্চিৎ ধরিতে পাইয়াছিল। যে যাহা হউক, আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে বলিতে গেলে বলিব, ফরাসী গ্রীক-প্রতিভা পাইয়াছে কিন্তু গ্রীকেরও অন্তরালে ছিল যে একটা কেল্টিক প্রতিভা সেটিকে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফরাসীর মধ্যে নাই কেল্টিক-সুলভ সেই তুরীয় প্রহেলিকা-বোধ, যেটি হইতেছে কবিত্বের মূল প্রতিষ্ঠা। তাই ফরাসী কাব্যে পাই না কবিত্বের সে অতলস্পর্শতা, সে অনন্তের ইন্দ্রজাল। সবই সেখানে অতিমাত্র ব্যক্ত, সহজেই শেষ

হইয়া যায়, অল্পেতেই ফুরাইয়া যায়—তাই বুঝি সেন্ত্-ব্যভ্ (Sainte-Beuve) বলিয়াছেন, Our french poets are too soon read—আমাদের ফরাসী কবিদের চট্ করিয়া বুঝা যায়।

ফরাসী সাহিত্যে ভিক্তর হিউগোর বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এইখানে যে তিনি ফরাসীর ঠিক এই অভাবটিই কথঞ্চিৎ পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি ফরাসী সাহিত্যে দিতে চাহিয়াছিলেন একটা বিরাটের বোধ, প্রহেলিকার ইঙ্গিত, একটা অতল অন্তর্মুখীনতা। হিউগোর অখ্যাতি তাঁহার বাগাড়ম্বরের জন্য, সুখ্যাতি তাঁহার অদ্ভুত শব্দসম্পদ—বাক্যের সহায়ে জ্বলন্ত চিত্রাঙ্কনের জন্য। কিন্তু এ সকলের মধ্য দিয়া প্রকৃত ভিক্তর হিউগোর নিভৃত কবিপ্রাণ ছুটিয়াছিল একটা উদার প্রসারিত অধ্যাত্ম জগতের ইন্দ্রজাল সৃজন করিতে। ফরাসীর স্বভাবসিদ্ধ তাহার আদিম প্রকৃতির যে সহজ বিগলিত টলটল লঘুতা, তাহাকে সংহত সংযত গাঢ়সত্ত্ব করিয়া তুলেন কর্ণেই—কর্ণেই ফরাসীকে দিয়াছেন রোমকের পুঞ্জ তেজোরাশি আর ভিক্তর হিউগো দিয়াছেন কেল্টিকের অসীমতার বোধ, একটা ভাগবত তুরীয় দৃষ্টি। তাই ফরাসীর সাহিত্যজগতে কর্ণেই ও ভিক্তর হিউগো এক-একটা স্বতন্ত্র স্থানই অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তবুও, কি কর্ণেই, কি হিউগো, কেহই ফরাসীকে একেবারে শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর কাব্য দিতে পারেন নাই। ইংরেজীতে সেক্সপীয়র ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ অথবা কীট্‌সের মধ্যে কবিত্বের আপনারই যে একটা অতি স্বতন্ত্র রস, একটা নিজস্ব রহস্যময় ভঙ্গীর সন্ধান পাই, হিউগো বা কর্ণেইতে তাহা ঠিক পাই না। ফরাসীতে কাব্যের মধ্যেও কেমন একটা টান আছে গদ্যেরই প্রকৃতি লইয়া গড়িয়া উঠিতে। কর্ণেই কবিত্বের সমুচ্চ ভঙ্গিমাটি ধরিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার মধ্যে রোমকের বস্তুতন্ত্রতা অতিমাত্র প্রবল—রোমক প্রতিভার সেই নিথর স্থূলত্ব যাহা হইতে শক্তি আসিয়াছে, বীর্য্য আসিয়াছে, কিন্তু যাহার ভিতর দিয়া মুক্ত উদার প্রতিষ্ঠানের জ্যোতি, আলোক, সে তুরীয় ভাবসূক্ষ্মতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ভিক্তর হিউগো অনেকখানি এই মুক্তির জ্যোতির আলোকের রেখাপাত করিয়াছেন, কিন্তু সে-সকলের সহিত প্রায়শঃই মিশিয়া রহিয়াছে নবীর আগ্রহাতিশয্য, প্রচারকের তত্ত্ববাদের আবর্জ্জনা—আপন অনুভূতির মধ্যে সত্যকে উদাত্তকে জোর করিয়া, শেষ করিয়া ধরিবার প্রয়াস; ঋষির দ্রষ্টার নিগূঢ় শান্ত নিরপেক্ষ উদাসীনতা, নিবিড় ধ্যানপরতা সেখানে যথেষ্ট নাই। ফরাসীতে সে পূর্ণ কবিত্বের ইঙ্গিত আর কোথাও যে নাই তাহা বলা দুঃসাহস। অনেক তথাকথিত সাধারণ কবির মধ্যেও সে ইঙ্গিতটি পাই, যেমন—শেনিয়ে, ভিঞি। কিন্তু কবিত্বের এই তুরীয় প্রকৃতি ফরাসী প্রতিভার স্বভাবগত ধাতুগত হইয়া উঠিতে পারে নাই। আধুনিক সময়ে মেটারলিঙ্ক ও Libres Vers সম্প্রদায়ের কবিগণ ফরাসী সাহিত্যে বিশুদ্ধরূপে দিতে চাহিতেছেন কেল্টিকের সে ইন্দ্রজাল বিদ্যা, মানসজগৎ অতিক্রম করিয়া দিব্য অনুভূতির ভঙ্গিমা; কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টিতে এখনও সন্দেহের অনেক আঁধার রহিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় নাই।

ফরাসীর সহিত এ বিষয়ে আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যের অতি আশ্চর্য্য রকম মিল দেখিতে পাই। ফরাসীর ন্যায় বাঙ্গলাতেও আমরা পাই অতিমাত্র স্পষ্টতা স্বচ্ছতা প্রাঞ্জলতা। দেখ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, দেখ ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত—সর্ব্বত্র ভাবে অর্থে ভাষায় শরৎগগনের প্রসন্নতা নির্ম্মলতা মাখা রহিয়াছে। কিন্তু ঠিক এই জন্যই ইহার মধ্যে পাই না তুরীয়ের অতলস্পর্শতা, অজানার প্রহেলিকা, অনন্তের বিপুলত্ব। সেন্ত ব্যভের মতনই আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় "Our Bengali poets are too soon read"—গ্রীকের স্নিগ্ধ তরলতা সেখানে রহিয়াছে, কিন্তু নাই কেল্টিকের সে অসীমের প্রসারে মুক্ত বিচরণ, সে অফুরন্ত অনির্ব্বচনীয় ভাববৈদগ্ধ্য। যাহা বলা হইয়াছে সবই নিঃশেষ করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, অব্যক্তের জন্য কোন স্থান রাখা হয় নাই। বিপুলকে বিরাটকে কোন্ যাদুবলে বাক্যের মধ্যে বাঁধিতে পারা যায় সে গুপ্তবিদ্যা বাঙ্গালী কবি অধিগত করিতে পারে নাই। বিদ্যাপতির সেই

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—

এখানে সে যাদুবিদ্যার একটা আভাস পাই। বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের মধ্যে আরও বেশী পাই। কিন্তু তবুও কেমন মনে হয় মোটের উপর সর্ব্বত্রই, একটা পঙ্গুতা,

অসম্পূর্ণতার ছায়া মিশিয়া রহিয়াছে। দিব্যভাবের কবিত্বের যে আবহাওয়া, যে প্রাণ, তাহা যেন সেখানে মুক্ত অব্যর্থ রূপে খেলিতে পারে নাই। কাব্য একেবারে ঋষির মুখের গীর্ব্বাণী হইয়া উঠে নাই। আধারের স্বচ্ছতা-কোমলতার ভিতর দিয়া অনুভূতি স্পষ্ট জাগ্রত, এমন কি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তুরীয় সারস্বত প্রতিভার বিরাট গভীর আবেগটি ধারণ করিবার সামর্থ্য সে পায় নাই।

বঙ্গীয় কবিপ্রতিভার এই অতিমাত্র প্রাঞ্জলতা সরলতা তরলতাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া একটা পূর্ণতর, মহত্তর অভিব্যঞ্জনায় ভরপুর করিয়া তুলিবার দুইটি চেষ্টা হইয়াছে। প্রথমে মধুসূদন। ফরাসীতে কর্ণেই যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় মধুসূদন সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। মধুসূদন যে পরিবর্ত্তন সাধন করেন তাহা মুখ্যতঃ ভাষার দিক দিয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দান কেবল ভাষার ওজঃশক্তি নহে, তাঁহার দান ভঙ্গিমার তেজ। মধুসূদন বাঙ্গলার প্রাণে দিয়াছেন রোমক প্রতিভার স্থাণুত্ব, কবিত্বের যে আত্মপ্রতিষ্ঠ সংহতি। তবুও মধুসূদনের মধ্যে বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা একেবারে সমুচ্চগ্রামে উঠিতে পারে নাই। তাঁহার কবি-প্রেরণার প্রতিষ্ঠা প্রাণশক্তি, যে প্রাণশক্তি ছুটিয়াছে কেবলই বাহিরের দিকে স্থূল বস্তুর প্রতি—সে প্রাণশক্তি চিৎশক্তিতে পরিণত হইতে পারে নাই। ছান্দস সাগরের বিপুল কল্লোল তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু ভাবের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি সে সাগরকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে নাই, বস্তুর অন্তরতম যে রহস্য-কথা, যে বিচিত্র লক্ষণা, সেটি তাঁহার চৈতন্যে তার গগনবিসারী ইন্দ্রধনু রচিয়া দিতে পারে নাই। এই দ্বিতীয় চেষ্টা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

পাশ্চাত্যে আজ রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক (mystic) কবি নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য যে হিসাবে এই নামটি দিয়াছে তাহার সবখানি সঙ্গত হউক বা না হউক, উহা যে একেবারে নিরর্থক তাহা আমরা বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের ধাতুতে স্থূলত্ব বা কাঠিন্য বলিয়া জিনিষটি যেন আদৌ নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠান এ জগতে নয়, যেন কোন কল্পলোকের শুভ্রবিগলিত লাঞ্ছনায়। তাঁহার প্রাণের তন্ত্রী আশ্চর্য্য রকম সূক্ষ্ম সজাগ, তাঁহার অনুভূতি অতি তীক্ষ্ণ অতি গভীর, তাঁহার কল্পনা সর্ব্বদা জগতের স্থূল হস্ত এড়াইয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছে, অন্বেষণ করিয়াছে নূতন কিছু, সুদূরের কিছু, অজানা অচেনা কিছু। তাই বাস্তবিকই তাঁহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে অতীন্দ্রিয়ের অশরীরীর, সেই অজ্ঞাতের অনন্তের একটা 'কিমিব কিমিব' স্পর্শ—তাঁহার বাক্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে বাক্যে যাহা ধরা যায় না এমনি একটা তুরীয় অথচ অতি অন্তরঙ্গ ভাবের আবেশ। স্থূল ইন্দ্রিয় যাহাকে অঙ্গে অঙ্গে অতিমাত্র প্রকট করিয়া ধরিয়াছে, বুদ্ধি যাহার সকল অর্থই নিঃশেষ করিয়া অধিগত করিয়াছে, এমন কিছুতে রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তি নাই। তিনি খুঁজিয়াছেন কেল্টিকের সেই অনন্তের দ্যোতনা, সব শেষ করিয়া বুঝার পরেও যাহার শেষ হয় না, জিনিষের সেই দিকটি যাহা অন্তরাত্মার পরতে পরতে লুকাইয়া আছে, যেটিকে ধরিয়াই আমরা অসীমের কোলে মনপ্রাণ লইয়া উধাও হইয়া চলি।

কিন্তু এই যে অসীমের স্পর্শ অনন্তের ইঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন কেমন গৌণভাবে—একটা মৃদুল প্রাণের আবেশ, একটা ভাববিমুগ্ধতার মধ্য দিয়া। দৃষ্টির যে স্পষ্টতা পূর্ণতা দৃঢ়তা,—সে জিনিষটি রবীন্দ্রনাথে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার লক্ষ্য অনন্তের আনন্ত্যটুকু, বস্তুর নিবিড় রহস্যটুকু, সৃষ্টির যে অবক্তব্য প্রহেলিকা তাহাই কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ জাগ্রত রাখা যায়,—তাই যেন তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিতে চাহেন নাই, পাছে দৃষ্টির পূর্ণালোকের রূঢ়স্পর্শে সে আনন্ত্য, সে রহস্য, সে প্রহেলিকা কিছু মলিন খর্ব্ব হইয়া যায়। তাই তাঁহার মধ্যে পাই অতি-সন্তর্পণতা, একটা দ্বিধা। অজানাকে জানিতে চাহেন নাই, চাহিয়াছেন কেবল অনুভব করিতে, অনন্তের পথে চলিতে চাহিয়াছেন কুহেলিকার আবৃত হইয়া, শিশুটির মত চারিদিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া। সহজবোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতির সহায়ে যে গভীর সত্য যে দিব্য ভাবটি পাইয়াছেন তাহার মধ্যে অনন্তের অবাঙ্মনসগোচরের অভিব্যঞ্জনাটি অব্যাহত রাখিবার জন্যই একটা পর্দ্দা একটা অবগুণ্ঠন তাহার উপর টানিয়া দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তাই দেখি তাঁহার সত্য অতি গভীর অতি সূক্ষ্ম অতি উদার হইলেও তাহাতে মিশিয়া রহিয়াছে একটা সন্দেহেরই অস্পষ্টতা, তাঁহার

অনুভূতিতে রহিয়াছে কি এক আবছায়া, কেমন এক নেশার ঘোর। তাঁহার ভাব ও ভাষা চলিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া লতাইয়া লতাইয়া—তাঁহার ভঙ্গিমায় পাই এক রহস্যগর্ভ চতুরতা, কিন্তু পাই না দ্রষ্টার চোখে ফুটিয়া উঠে যে অব্যর্থ রেখাসম্পাত, আত্মার যে মূর্ত্ত বিগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ বস্তুকে দেখাইতে চাহিয়াছেন কেবল ইঙ্গিতে, লক্ষণার সহায়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে অনেকখানি অবান্তর অতিরিক্ত নিষ্প্রয়োজনীয়কে লইয়া খেলাধূলা। কিন্তু সত্যকে অনন্তকে বৃহৎকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন যে ঋষিকল্প শিল্পী তাঁহার সৃষ্টিতে সন্দেহের সন্তর্পণতার কুহেলিকা নাই, সেখানে পূর্ণ যথাযথ অর্থ আছে, আছে বস্তুটিকে ঋজুভাবে স্ফুটভাবে নির্দ্দেশ করা, অথচ সে রহস্য সে প্রহেলিকার কিছু অঙ্গহানি সেখানে হয় নাই, সেটি অবিকৃতই রহিয়াছে। মানস জগৎ ছাড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন তুরীয় জগৎ, কিন্তু তুরীয়েরও যে একটা মানসসত্তা সেইটুকু রবীন্দ্রনাথ ধরিতে পারেন নাই—তিনি তুরীয়কে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছেন কেবল ভাবুকতার আবেগে, তপঃশক্তির তীব্রলেখায় তাহাকে জাজ্বল্যমান করিয়া ধরিতে চান নাই। বস্তুতঃ আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথও মুমুক্ষু মাত্র—মুক্ত নহেন। সারস্বত সাধনার তিনি বোধ হয় শেষ সোপানে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও আছে একটা যবনিকা যাহা তিনি ভেদ করিতে পারেন নাই—ভেদ করিতে চাহিতেছেন না, তাঁহার যেন কেমন আশঙ্কা সে যবনিকা না থাকিলে সমুচ্চের রহস্যও কিছু থাকিবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ভাবুকতার চরম, কিন্তু তিনি ভাবসিদ্ধ হইতে পারেন নাই—তাঁহার ভাবুকতা দিব্যদৃষ্টির সে অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বে জাগ্রত স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় নাই।

মধুসূদন রোমকের শক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু পান নাই গ্রীকের ছিল যে অর্থগৌরবের গভীরতা, মুক্ত সুবলয়িত চারুতা, পান নাই তিনি কেল্টিকের ভাবস্থির রহস্য। রবীন্দ্রনাথ কেল্টিকের সে অনন্ত লক্ষণা, গ্রীকের অর্থ-মনোজ্ঞতা পাইয়াছেন, কিন্তু রোমকের তপঃশক্তির অভাবে সে ভাব-রহস্য পর্য্যবসিত হইয়াছে গৌণ অনিশ্চিত ইঙ্গিতের কুয়াসায়, সে অর্থসম্পদ পরিণত হইয়াছে কেমন সামর্থ্যহীন তরলিত স্বপ্নের বিহ্বলতায়।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

পঞ্চ দশা

শৈশব

অল্পে খুসি, অল্পে হাসি, অল্পে আঁখি-বর্ষণ;
সকল তাতেই অবাক্ হওয়া, ব্যাকুল চোখে দর্শন।
মায়ের কোলে নানান্ কথা, সুখটি পাওয়া এন্তার;
সময় কাটে হেসে খেলে, নেইক কিছু চিন্তার।

কৈশোর

সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে খেলা, ফড়িং ধরা দুপুর বেলা,
পুকুর-জলে সাঁতার কাটা, বর্ষাকালে কলার ভেলা।
পূজোর আগেই নেচে ওঠা, নবান্নতে আমোদ লোটা,
ভয়ে-ভয়ে পড়্‌তে শেখা, সুযোগ পেলেই খেল্‌তে ছোটা।

যৌবন

বিহঙ্গসঙ্গীত-চন্দ্রিকাপুলকিত-উচ্ছল-চঞ্চল প্রাণ;
প্রাপ্ত সে বন্দিত সুরনরবাঞ্ছিত মঞ্জুল অজানিত দান।
মানবের কথা যেন মধুকরগুঞ্জন, বিস্তৃত বক্ষের দ্বার;
অন্যায়ে গর্জ্জন, ন্যায়ে হৃদি অর্পণ, সুস্বপন দর্শন সার।

প্রৌঢ়

স্বপন টুটে গেছে, ভেঙেছে হৃদিমন,
বিঘ্ন পদে-পদে সহসা;
জীবনে কিছু আলো, অধিক আঁধিয়ার,
নয়নে লেগে আছে বরষা।
কেবলি লাভ ক্ষতি চলিছে গণাগণি,
কখনো টানাটানি কত না!
প্রাণটি বাণাহত পাখিটি ঠিক যেন,
এড়াতে চাওয়া দুখ-যাতনা।

বার্দ্ধক্য

দিনগুলা ভার বোঝাই তরী, জীবন একটা দুঃস্বপন;
অতীত্—প্রাণের পুষ্প-পরী, বর্ত্তমানটা—বিস্মরণ।
আশা-পথে সঙ্গীহারা, বাঁচা শ্বাসের নিঃসরণ;
ভাব্‌না নেহাৎ সৃষ্টিছাড়া, মৃত্যু বাতির নির্ব্বাপণ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

শ্যামলী

(৭)

শ্যামলী মায়ের কোল ছাড়িয়া এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং কেনই বা আসিয়াছে ভাবিয়া তাঁহার কোন ঠিক ঠিকানা পাইতেছিল না। বিজলীর দেখাদেখি সে সেদিন অনেক কাজই করিয়াছে, মাথায় মাথায় কাপড় দিয়া একখানা পাল্কীর মধ্যেও বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে একি হইল! কতকগুলা অপরিচিত লোকে মিলিয়া তাহাকে এ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে! এত বড় বাড়ী এবং এমন সব গৃহসজ্জা, এমন সব লোক সে জীবনে কখনো দেখে নাই। কিন্তু সেদিকে তাহার মন বা দৃষ্টি কিছুই ছিল না। আজ তিন দিন তিন রাত সে তাহার মাকে দেখে নাই। তাহার মা কোথায় গেল, তাহার মা? ইহারা কেনই বা তাহাকে ভোগা দিয়া তাহার আজন্মের নীড় সেই বাড়ী, সেই গ্রাম হইতে এই দূর দেশে আনিয়া ফেলিয়াছে! ইহার কারণই বা কি! শ্যামলী ইহাদের বিরক্তি ও ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবভঙ্গীতে বুঝিতেছিল, তাহার উপরে ইহাদের বিদ্বেষের সীমা নাই। তাহার মাতার মতই একজন গৃহিণী, কিন্তু উঃ তাঁহার মুখভাব কি ভয়ানক! শ্যামলীকে এই বাড়ীতে ইহারা নামাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহার ভীষণ মুখকান্তি শ্যামলীকে আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারই ইঙ্গিতে কয়েকজন স্ত্রীলোকে একটা ঘরে সেই যে শ্যামলীকে আনিয়া পুরিয়াছে, সেই হইতে শ্যামলী সেই ঘরেই বন্দীর মত আছে। শ্যামলী বুঝিতে পারিতেছিল তাহাকে লইয়াই এ বাড়ীতে কি যেন একটা চলিতেছে। তাহাদের বাড়ীতে সেই রাত্রে তাহার পিতাকে কতকগুলা অপরিচিত লোক আসিয়া যেমন লাঞ্ছনা করিয়াছিল, ইহাদেরও মুখে চোখে সেই পরুষ ভাব! সেইরকম ভঙ্গীতে কোন অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে ইহারা যেরকম হাত পা নাড়িতেছে, মুখভাব মুহুর্মুহু আকুঞ্চিত বিস্ফারিত করিতেছে, ওষ্ঠাধরকে অশ্রান্ত দ্রুতভাবে কম্পিত করিয়া চলিয়াছে, ঘৃণায় রাগে বিদ্বেষে তাহাদের দুই চক্ষু যেরূপ জ্বলিতেছে, তাহাতে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে নিকটে পাইলে তাহারা যেন টিপিয়াই মারিবে, শ্যামলীর এইরকম বোধ হইতেছিল। একবার একবার তাহার মনে হইতেছিল তাহারই উপর তাহাদের এরূপ ক্রুদ্ধ ভাব; কিন্তু সে তো তাহাদের হাতের মধ্যেই রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই তাহারা এখনি তো তাহাকে মারিতে পারে—এই কথা ভাবিতেই শ্যামলী আতঙ্কে দ্বিগুণ জড়প্রায় হইয়া ঘরের এককোণে বসিয়া বিস্ফারিত চক্ষে ইহাদের পানে চাহিতেছিল। কিন্তু শ্যামলী ক্রমে বুঝিল তাহার সহিত তাহাদের ক্রোধের সম্পর্ক থাকিলেও তাহাদের প্রধান ক্রোধের পাত্র সে নয়, —যাহাকে পাইলে তাহারা টিপিয়া মারিতে প্রস্তুত সে তাহাদের নিকটে নাই। শ্যামলীর তখন আশঙ্কা হইল তবে কি তাহার পিতার উদ্দেশেই তাহাদের এরকম ভঙ্গী চলিতেছে?—তাঁহাকেও যদি ইহারা শ্যামলীর মত পাল্কীতে করিয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়া থাকে! তিনি কোথায় আছেন, কত দূরে? গবাক্ষ দিয়া শ্যামলী বাহিরে চাহিয়া দ্বিগুণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এ কি, এ কোথায় সে আসিয়াছে! তাহাদের সে গ্রাম কই? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় রাস্তা, তাতে অগণ্য লোকজন, কত চলমান অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু, এ কোন্ দেশ? এখানে গাছপালার শ্যাম শোভা নাই, এখানকার আকাশ চক্ষে নীলাঞ্জন বুলাইয়া দেয় না। এখান হইতে তাহার সে গ্রাম—তাহাদের সে বাড়ী কতদূর? তার মা কোথায়? সে যে আর এমন করিয়া ভয়ে জমাট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না! কিন্তু এ ঘর হইতেও যে তাহার বাহির হইবার উপায় নাই। একবার বাহির হইয়া সেই গৃহিণীর মত স্ত্রীলোকটির সাম্‌নে পড়িবামাত্র তিনি এমনিভাবে মুখ ফিরাইলেন যে তাঁহার মুখ চোখ দেখিয়া শ্যামলীর বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তিনি দারুণ ঘৃণার ভাবে একজনকে শ্যামলীর দিকে দেখাইয়া তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্যই যেন সঙ্কেত করিলেন। অম্‌নি সে লোকটি হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আবার সেই গৃহে তাহাকে পুরিয়া দিল। সেই ঘরটি ছাড়া ইহারা তাহাকে অন্য কোথাও একটু বাহির হইতে দিতেও রাজী নয়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, এমন করিয়া তো সে জীবনে কখনো থাকে নাই। সে যে মুক্ত প্রকৃতির জীব, এমন বন্ধ ঘরে তাহার তো একদিনেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

প্রথম প্রথম কতকগুলা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, তাহার মত বিজলীর মত বয়সের কতকগুলা বৌ ঝি তাহার কাছে আসিয়া বসিত এবং কিরকম এক অদ্ভুতভাবে তাহার পানে চাহিয়া নানারকম মুখভঙ্গী ও হস্তের ইঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। তাহারা যে শ্যামলীকে বিদ্রূপ ও উপহাস করিত তাহা শ্যামলীর বুঝিতে বাকী থাকিত না, তাহাদের সেই অস্বস্তিকর সঙ্গে তখন শ্যামলীর কষ্টেরও সীমা থাকিত না। সে তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য এক কোণে গিয়া মুখ লুকাইয়া বসিত, কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার ছিল!—তাহারা টানাটানি করিয়াও তাহাকে সমান জ্বালাতন করিত। তখন সেই নিরুপায় মূক জীবের হৃদয় হইতে বড় আর্ত্তভাবেই যেন মা শব্দ ফুটিয়া টুটিয়া বাহির হইতে চাহিত। মাগো—কোথায় তুমি! এ আমি কোথায় আসিলাম মা? ইহারা আমাকে তোমার কাছ ছাড়াইয়া এ কোথায় লইয়া আসিল! এখানে যে আমি আর একদণ্ডও বাঁচিতে পারিতেছি না। কোথায় আছ তুমি! তোমার মতন দৃষ্টি যে আমি ইহাদের কাহারো চোখে দেখিতে পাই না!

তাহার ভাষাহীন মূক হৃদয় বুঝি এমনি ভাবের আন্দোলনেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিত। কি যেন তাহার হৃদয় ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়, কিন্তু কোথা দিয়া বাহির হইবে? হায় প্রকাশের পথই যে তাহার অনুভবের মধ্যে নাই। কেবল একটা পথ তাহার জীবনে সহসা এমন নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এতদিন এ-পথের কথাও সে জানিত না! ইহাদের নিষ্ঠুর মুখভাব এবং ব্যবহারে যখন শ্যামলীর হৃদয় তাহার মাতাকে স্মরণ করিয়া ফাটিয়া যাইবার মত হইত তখন সে দেখিত তাহার চক্ষু হইতে ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া কতকগুলা জল পড়িয়া পড়িয়া ক্রমে বুকের সে যন্ত্রণা যেন লাঘব হইয়া আসিতেছে। তাই যখনি মার জন্য কষ্ট হইত তখনি কাঁদিবার জন্য সে এককোণে লুটাইয়া পড়িত।

একদিন যখন এরকমে তাহাকে কতকগুলা ছেলে-মেয়ে মুখ ভাঙাইয়া ভাঙাইয়া বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং সেও কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে একজন যুবা সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের উপর মুখ চোখ্‌ রাঙাইয়া তাহাদের বাহির হইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল আর তখনি দলকে-দল ছেলে মেয়ে জড়সড় হইয়া সেই যে দৌড় দিল—আড়াল হইতে মাঝে মাঝে উকিঝুঁকি মারিলেও সেই অবধি আর তাহারা শ্যামলীর সেই নির্দ্দিষ্ট কারাগারের মধ্যে পদার্পণ করিতে সাহস করিত না। সেই হইতে শ্যামলী একাই সেই ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি একভাবে কাটাইতেছে। মাঝে মাঝে কেবল একজন বর্ষীয়সী আসিয়া তাহাকে খাইবার জিনিষ দিয়া যাইত এবং তাহার কিছু চাই কি না তাহার জন্য এক-একবার ইঙ্গিত করিত। মাঝে-মাঝে আসিয়া তাহারও কোন ইঙ্গিতের অপেক্ষায় তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু শ্যামলী লোক দেখিলেই মুখ ফিরাইয়া দেয়ালের পানে চাহিয়া বসে। তাহাদের কি এক রকম দৃষ্টি, শ্যামলীর গায়ে তাহা মোটে সহিত না। এই বর্ষীয়সী রাত্রেও আসিয়া শয্যার একধারে শুইয়া থাকে, কিন্তু শ্যামলী তাহাতে অসহিষ্ণু বই সুখী হয় না। তাহার মায়ের জায়গায় ইহাকে শুইতে দেখিয়া তাহার একটা অব্যক্ত কষ্ট হইতে থাকে। ইহার দত্ত খাবার জিনিষও সে প্রথম দিন মুখে তোলে নাই, শেষে যেমন অনুপায় হইয়া খাইয়াছে তেমনি এখন অনুপায় ভাবে তাহার শয্যার একপাশে শুইয়া চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে ক্রমে ঘুমাইয়াও পড়ে। এই লোকটা যে একজন কাহারো আজ্ঞাবাহী মাত্র, ইহার যে শ্যামলীর উপরে ঘৃণা ও বিরক্তি ছাড়া বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই, তাহা শ্যামলীও বেশ বুঝিতে পারে যে।

প্রথম দুই চারি দিন একটু বিমূঢ়ভাবে থাকিয়া শ্যামলীর দুর্দ্দম স্বভাব ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। নূতনত্বের বিস্ময় এবং স্তব্ধ সঙ্কোচ ক্রমেই সরিয়া গেল। সে আর কিছুতেই এখানে থাকিবে না, তাহার মার কাছে যাইবে। সে যে এমন করিয়া মা-ছাড়া হইয়া এই একটা ঘরে কোথায় কোন্‌খানে বন্দী হইয়া আছে, একি তাহার মা জানিতে পারিতেছে না? কেন তবে মা তাহাকে আজও খুঁজিতে আসিলেন না! সে যে একদণ্ডও মার কাছ ছাড়া হইয়া থাকে না; আর মাও যে তাহাকে নিজের ঘরে বসাইয়া রাখিয়াও স্বস্তি পান না, সাতবার আসিয়া দেখিয়া যান। সেই মা আর সেই শ্যামলী আজ কদিনই দুজনে দুজনার কাছছাড়া! মাকেও বুঝি এরা এমনি করিয়া

কোথাও পুরিয়া রাখিয়াছে! কোথায় তাহার মা! মার কাছে যাইতে না পাইলে সে আজ কিছুতেই ছাড়িবে না। এ ঘরে কিছুতেই আর থাকিবে না। মা যেখানেই থাকুক না কেন সেইখানেই আজ সে যাইবে। শ্যামলী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র চারিদিক হইতে কতকগুলা রমণী আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল, হাস্য বিদ্রূপ এবং পরুষভাবের সহিত নানা রকম ভঙ্গীতে শ্যামলীকে কিএকটা ভয়ের আভাস জানাইয়া পুনঃপুনঃ তাহাকে সেই ঘরে ঢুকিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু শ্যামলী তাহাতে দৃকপাত না করিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া একদিকে পলাইবার জন্যই যে আজ সে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সে আর কিছুতেই থাকিবে না। তাহারাও এই বোবা মেয়েটির বিষম রোখ দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষণপরেই যাঁহার মুখভাবে শ্যামলী সবচেয়ে বেশীরকম শঙ্কিত হইয়াছিল তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া শ্যামলীর সেই উত্তেজিতভাব সহসা দমিয়া গেল। উজ্জ্বল দিবালোকে শ্যামলী তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিল সত্যই তাঁহার মুখের চেহারায় ভয়ের মত তো এমন কিছু নাই, এই যে সব স্ত্রীলোক এবং তাহাদের গ্রামে যে-সব রমণীদের দেখিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা ইহাঁতে কি একটা বিশিষ্টতা আছে যাহাতে সকলেরই মন সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই উজ্জ্বল সুন্দর মুখের বিশাল চক্ষু যেমন শ্যামলীর মুখের উপর পড়িল অমনি তাহা যেন আগুনের মত ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া তাহা হইতে জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে লাগিল। সেই মহীয়সী মুখকান্তি মুহূর্ত্তে এমনি পরুষ কঠিন হইয়া উঠিল যে ভয়ে শ্যামলী আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তিনিও শ্যামলীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তীব্রতম ভাবে সকলকে এমন একটা ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন যে সকলে একযোগে শ্যামলীকে ধরিয়া প্রায় টানিতে-টানিতে ঠেলিতে-ঠেলিতে সেই ঘরের মধ্যে পুরিয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

শ্যামলী বুঝিল তাহার মার কাছে তাহাকে ইহারা যাইতে দিবে না। সেইজন্যই তাহাদের এ শাসন। এমনি করিয়া চিরকাল তাহাকে ইহারা এই ঘরে বন্দী রাখিবে, এই ষড়যন্ত্রই ইহারা করিয়াছে। শ্যামলী ক্ষোভে ক্রোধে উত্তেজিত জন্তুর মত নিঃশব্দে গজ্‌রাইতে লাগিল। যদি তাহার কোন সাধ্য থাকিত তাহা হইলে ইহাদের এই ঘরটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া এবং যাহারা তাহাকে এই ঘরে পুরিয়াছে তাহাদিগকেও সেইরকম একটা কিছু প্রতিফল দিয়া সে মায়ের উদ্দেশে ছুটিত। কিন্তু হায় তাহার ক্ষীণশক্তি ঐ রুদ্ধ দ্বারটাই যে টানিয়া খুলিতে পারিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্যামলী একভাবে বসিয়া ছিল, তারপরে দেখিল সেই স্ত্রীলোকটা ঘরের শিকল খুলিয়া তাহার আহার্য্য আনিয়া সম্মুখে ধরিল। শ্যামলী এতক্ষণে এমন একটা জিনিষ হাতের কাছে পাইল যাহা লইয়া সে যাহা খুসি করিতে পারে। সমস্ত খাবারগুলা ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্তভাবে সেই রমণীটির পানে চাহিল। স্ত্রীলোকটি তখন তাহার কাণ্ডে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র শ্যামলী তাহার কক্ষের দ্বার এবার নিজেই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল এবং তখন গৃহতলে পড়িয়া নির্ব্বাক ভাষায় কাঁদিতে লাগিল, মা ওমা মাগো!

দিনের পর রাত এবং তারপরে আবার দিন হইল, কিন্তু শ্যামলী সে ঘরের দরজা খুলিল না। কেহ তাহার দ্বারও একবার ঠেলিল না। ক্রমে শ্যামলীর ক্ষুধায় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তথাপি সে দ্বার খুলিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেয় ক্লান্ত হতাশাচ্ছন্ন বুক পেট পাতিয়া পড়িয়া পড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ক্রমে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিল যেন তাহার মা আসিয়া তাহার শিয়রে বসিয়াছেন এবং কত খাবার লইয়া কত আদরে শ্যামলীর ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সত্যই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল কে একজন তাহার শিয়রে বসিয়া আছে বটে কিন্তু এ তো তাহার মা নয়। মা যদি নয় তবে এ কেন এমন করিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতেছে!

শ্যামলী চোখ মেলিয়া দেখিল তাহার কাছে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ফল, কি কি খাবার, আরও নানা রকম জিনিষ। বিজলীকে যেমন একদিন সে পাইতে

দেখিয়াছিল তেমনি সুন্দর সুন্দর কতকগুলা খেলনা, কয়টা ছবি! কিন্তু এসব কেন এরা আনিয়াছে? আর এই লোকটা, এ বাড়ীর মধ্যে ইহাকেই সে একটু চিনিতে পারিতেছে। সেই রাত্রে তাহার পিতা ইহারই সঙ্গে তাহাকে লইয়া কি সব করিয়াছিলেন এবং শেষে কাপড়ে কাপড়ে বাঁধিয়া ইহারই পাশে বসাইয়া দিয়াছিলেন, মনে হইতেছে। কিন্তু তাহার ফলে সেই রাত্রে তাহার পিতার কি লাঞ্ছনাই না হইয়াছিল! এই লোকটাই তাহাকে তাহাদের বাড়ী হইতে নিশ্চয় এখানে আনিয়াছে। এইই তাহার যত জ্বালা-যন্ত্রণার এবং তাহার মা হারাইবার কারণ। এ আবার কিসের জন্য বন্ধ দুয়ার খুলিয়া এমন করিয়া এইসব লইয়া তাহার কাছে আসিয়াছে? তাহাকে ভোগা দিয়া যেমন পাল্কীতে চড়াইয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে আবার তেমনি করিয়া বুঝি মার কাছেও যাইতে না দিবারই ইহার মতলব! তাই এইসব খেলনা, এইসব ছবি! মুহূর্ত্তে শ্যামলী দীপ্ত ভাবে উঠিয়া বসিল এবং দুই হাতে মাথার শিয়রের জিনিষগুলা তছনচ্ করিয়া ছিটাইয়া ছড়াইয়া দিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তির দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল তথাপি আর তাহার কোন বিরক্তির কারণ ঘটিল না দেখিয়া অসহিষ্ণুভাবে শ্যামলী অগত্যা সেই লোকটার পানে ফিরিল। দেখিল সে একই ভাবে বসিয়া আছে। চক্ষু নত, মুখ একান্ত বিষণ্ণ। কি শ্যামলীর দিকে, কি ছড়ানো জিনিষগুলার দিকে, কোন দিকেই তাহার লক্ষ্য নাই। তাহার এই নিশ্চেষ্টতা যখন শ্যামলীকে ক্রমে বিরক্তি ও চাঞ্চল্যের শেষ সীমায় আনিয়াছে তখন সেই লোকটা চোখ তুলিয়া শ্যামলীর পানে চাহিল। এমন বিষণ্ণ দৃষ্টি শ্যামলী আর যেন কাহারও চোখে দেখে নাই। শ্যামলী অনুসন্ধিৎসু ভাবে তাহার মৎলবটা বুঝিবার জন্যই রোখের সহিত তাহার দিকে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার এই বিষণ্ণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে বাধিয়া সহসা তাহার চক্ষু আপনিই নত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে শ্যামলী আবার যখন দৃষ্টি তুলিল তখন শ্যামলীর দৃষ্টি কোমল এবং অপরাধীর মত ভীত হইয়া উঠিয়াছে।

সম্মুখের দ্বার খুলিয়া সেই গৃহিণী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শ্যামলী দেখিল ইঁহাকে দেখিয়া কেবল সেই মাত্র যে ভীত হয় তাহা নয়—যে এতক্ষণ সম্মুখে বসিয়া ছিল তাহারও মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত দোষীর মত সেও তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। কিন্তু সেই গৃহিণী সে সব দিকে লক্ষ্য করিলেন না। একেবারে আসিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তির হাত ধরিয়া সেস্থান হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন এবং সেই রকম জ্বলন্ত চক্ষে একবার শ্যামলীর পানে চাহিয়া আবার যুবকের দিকে ফিরিয়া ঘৃণায় বিদ্বেষে ওষ্ঠাধর মুহুর্মুহু কম্পিত করিতে লাগিলেন। যুবকও তাঁহার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত অনুনয়ের সহিত মাঝে মাঝে কি যেন প্রার্থনা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁর ক্রুদ্ধ ভাবের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি যেন কিছুতেই তাহাকে সেখানে থাকিতে দিবেন না এই ভাবে পুনঃ পুনঃ যুবককে আকর্ষণ করিতে থাকিলেন এবং মাঝে মাঝে নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া ক্রমে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্যামলী এইবার দ্বিগুণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ইহারা কেন তাহার ঘরে ঢুকিয়া এমন করিতেছে। ঐ লোকটা না আসিলে তো ইনিও এ ঘরে পা দিতেন না। যত নষ্টের মূল ঐ লোকটা! শ্যামলী সশঙ্ক বিরক্তিতে ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া দেওয়ালের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

আবার কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে স্কন্ধদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া শ্যামলী ঈষৎ ফিরিয়া দেখিল ঘরে সেই যুবক ছাড়া আর কেহ নাই। সে-ই তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কি ইঙ্গিত করিতেছে, তাহার হস্তে আরও ফল ও খাবার। আহার্য্যগুলা শ্যামলীর সম্মুখে অত্যন্ত নিকটে রাখিয়া যুবক দ্বারের নিকটে চলিয়া গেল এবং একবার আবার একটু তাহার পানে চাহিয়া দ্বারপথে অপসৃত হইল। সেই করুণ সহানুভূতির বেদনাভরা দৃষ্টি দেখিয়া শ্যামলী আবার বিমূঢ় হইয়া রহিল। এত দুঃখের সঙ্গে কেহ ত কখনো তাহার পানে চাহে নাই, মা ছাড়া আর কাহারও চক্ষে সে এমন দৃষ্টি ত দেখে নাই!

অনিলের মাতা আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। অনিলের বিবাহের ফল যে এমন হইবে ইহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। কত কত দরিদ্র অক্ষম মূর্খও বিবাহ করিয়া সুন্দর সুন্দরী বউ ঘরে আনিতেছে আর

তাঁহার বিদ্বান বুদ্ধিমান স্কন্দোপমকান্তি লক্ষপতি যুবা সন্তানের এ কিসের সহিত বিবাহ হইল? তাঁহার এত বড় সাধে এমন বাদ কে সাধিল! কে আর? ঐ জন্তুটার সেই জুয়াচোর পিতা। একটা সুন্দর মেয়ে দেখাইয়া তাঁহার ছেলের সঙ্গে নিজের একটি কালা বোবা মেয়ের বিবাহ দেয় এতবড় তাহার আস্পর্দ্ধা! কিন্তু অনিল কি বলিয়া তাহাকে রেহাই দিয়া আসিয়াছে? তাহার সে সুন্দর মেয়ে যে অনিল বিবাহ করে নাই সে ভালই করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রতারকের ঘরের মেয়েকে কি বলিয়া সে শিশিরের সঙ্গেই বা বিবাহ দিল এবং মিথ্যাবাদী জুয়াচোরকে জেলে না দিয়া, তাহার জাতি মান নষ্ট না করিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তির পরিবর্ত্তে সে তাহাকে ক্ষমা করিয়া আসিল। শুধু কি তাই? না হয় তুই খুব হৃদয়বান্ ক্ষমাশীল আছিস্—চিরকালই তোর এমনি স্বভাব। বড় বড় অন্যায় করিয়াও যদি কেহ তোর কাছে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায় তুই অম্‌নি গলিয়া যাস্, এ তো চিরকাল দেখিয়া এবং সহিয়া আসিতেছি—কিন্তু তাই বলিয়া কি এতদূরই করিতে হয়। কুকুরকে স্পর্দ্ধা দেওয়া—এও যে রক্তমাংসের শরীরে সহে না! বিবাহের স্থলে তোকে যে এতবড় উপহাস করিল—তাহাকে ক্ষমা করিলি বেশ্, কিন্তু সেই জন্তুটাকে আবার সঙ্গে করিয়া কোন্ মুখে বাড়ী আনিলি? ওটাকে স্ত্রী বলিয়া আবার ঘরে আনিতে তোর কি একটু লজ্জাও হইল না? সকলে যে অবাক্ হইয়া গিয়াছে! মিত্রতে কত দুঃখ করিতেছে, শত্রুতে কত হাসিতেছে। আর তোর মা? তার কথাও কি অনিল তোর একবার মনে হইল না? কত কত লক্ষপতির শিক্ষিতা সুন্দরী গুণবতী দুহিতাকেও যে সে নিজের ছেলের উপযুক্ত মনে করে নাই। কত কত ধনী ও দরিদ্রের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া সে যে তোর মতের অপেক্ষাতেই এতদিন বিবাহ দেয় নাই। তোর বৌকে সাজাইয়া আদর করিয়া কত সুখে যে সংসার পাতাইবার আশায় সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বুকে এমন শেল বিঁধিতে বিধাতা বা মানুষ কাহারই দয়া হইল না বটে, কিন্তু তুই যে তাহার বুকের ধন! ওরে তোরও কি মনে হইল না যে মা এ কি-রকমে সহিবে? তোর মত ছেলের পাশে ঐ একটা জন্তু! মায়ের প্রাণে এ কি কেহ সহ্য করিতে পারে, না কেহ কখনো সহিয়াছে? যা-হবার তা হইয়াছিল, কিন্তু ওটাকে আবার ঘাড়ে করিয়া কেন আনিলি! এখনো ওটাকে কি বলিয়া বাড়ীতে রাখিতেছিস? সে খাইতেছে কি না, কাঁদিতেছে কি না, একা আছে কি না, এইসব তত্ত্ব লইতেছিস? ওটাকে যতশীঘ্র সম্ভব বিদায় করিয়া দিয়া এই অপমানের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার উদ্যোগও কি শীঘ্র করিতে হইবে না?—এ অপমান ও লজ্জার বস্তুকে এমন করিয়া চোখের উপর বুকের উপর রাখার উদ্দেশ্য কি তোর? তুই কি ভাবিয়াছিস্—ওরে বাপ্‌রে সে কথা যে মনের কোণেও আনিতে গেলে এখনি আমার বুক ফাটিয়া যাইবে! তোর মা বাঁচিয়া থাকিতে এই দয়ার খেয়ালে তুই যে তোর অমন জীবনটার একটা দিনও নষ্ট করিবি মার প্রাণে তা কিছুতেই সহিবে না। মা যেমন করিয়া পারে তোর এ দুর্গ্রহকে তোর চোখের সাম্‌নে হইতে —জীবনের পাশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তোর বিবাহ দিবার আগে তোর মা যে জগতের অজস্র প্রমাণে কত সাধের সঙ্গে সুখের বেদনায় কাঁদিয়াছিল যে এইবার তুই মা-ছাড়া জগতে একে একে স্ত্রীপুত্রকন্যা প্রভৃতি আরও অনেককে ক্রমশঃ জানিবি; একা মায়ের আছিস, আরও অনেকের হইবি। কিন্তু ভগবান একি করিলেন? ভগবান নয়—মানুষে! মানুষাধম দানবে তাঁহার সেই আশার সাজানো বাগানে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি ক্ষমতা থাকিতে সে আগুন নিভাইতে হইবে না। অনিল কি করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে তাহার মাতার বুকের এই প্রধূমিত অগ্নিশিখার জ্বালা এই অবিরল অশ্রুজল দেখিতেছে! ইহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইতেছে না? মাতা যা সাধ করিয়াছিলেন তেমন করিয়া ছেলে পর হইলে তিনি আজ চরিতার্থ হইতেন। তাহা হইল না, কিন্তু মাঝ হইতে একি একটা আপদ জুটিয়া তাঁহার সেই অনিলকে এমন করিয়া দিল? যে অনিল মাতার ম্লান মুখ একদণ্ড সহিতে পারে না, সে আজ তাঁর এ যন্ত্রণার কি অনুভবও পাইতেছে না? পাইতেছে নিশ্চয়, কেননা তাহার মুখে সে হাসি নাই, তাঁহার ফুলের মত কোমল শিশু এই আকস্মিক অভাবনীয় বিপৎপাতে যে কতখানি

শুকাইয়া উঠিয়াছে তাহাও তো তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন! সে মা বলিয়া ডাকিতে আসিলে তিনি ঘরের কোণে লুকাইতেছেন, আর সে যে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া যাইতেছে—সে দৃষ্টিতে, সে মুখের ছবিতে কষ্টের কথা মায়ের বুঝিতে তো বাকী থাকিতেছে না। কিন্তু তবু অনিল কি যেন একটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় মন বাঁধিয়াছে—যাহার জন্য সে সবই সহিবে, এই যেন তাহার পণ; আর তাহার মাও ছেলের মুখে সেই প্রতিজ্ঞার ছায়া দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন—বুক ভরিয়া কাঁদিতেছেন এবং নিজের প্রাণান্ত পণেই যে অনিলের এ ঝোঁক দূর করিতে হইবে ইহা স্থির করিয়া মেয়েটাকে দূর করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্রের ও তাঁহার মধ্যের এই সহসা জাগরিত বিচ্ছেদকে আর তিনি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না।

অনিলের মাতার আহ্বানে শিশির সেখানে আসিল বটে কিন্তু তাঁহার ভাব বুঝিয়া সভয়ে সঙ্কোচে দূরে-দূরেই রহিল। অনিল ম্লান হাসিয়া বন্ধুকে বলিল "মার কাছে তোমায়ও ত্যাজ্য পুত্র করে দিলাম দেখ্‌ছি আমি।" কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শিশিরকে মাতা অন্দরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনিল এইবার তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিল।

ঘণ্টা দুই পরে শিশির ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মাতা কি বলিয়াছেন সে কথার উচ্চবাচ্য না করিয়া সে আশ্‌পাশের কথা পাড়িতেছে দেখিয়া অনিল হাসিয়া বলিল "কি হে, আমায় তুমিও ত্যাগ কর্‌বার ফন্দীতে আছ দেখ্‌ছি যে! মা তো করেছেনই!"

অন্তরালে মাতার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, হায় তাঁর এমন ছেলের কেন এমন কুগ্রহ জুটিল। শিশির এইবার গম্ভীর মুখে বলিল "সৃষ্টিছাড়া কাজ কর্‌লেই তাকে সৃষ্টির বাইরে যেতে হয়।"

"কি সৃষ্টিছাড়া কাজটা আমার দেখ্‌লে?"

"সবই! আমায়ও নিজের সঙ্গে জুটিয়ে জগতের কাছে তেম্‌নি করে তুলেছ।"

"বটে? বন্ধু বন্ধুর, ভাই ভাইয়ের বিভ্রাটে সাহায্য করে না, এইই তোমার নতুন মত, না?"

"আঃ—আমার দিক্ থেকে কি বল্‌ছি! আমি তা হলে কি রাজী হতাম! সংসারের দিক্ থেকে দ্যাখ!"

"তোমার মাবাপও অসন্তুষ্ট হন্‌নি শুনেছি। তোমায়ও এমন বিপদে ফেলিনি যাতে ভবিষ্যতে তুমি—"

"ওহে না না, আমার দিকের কথা বল্‌ছি না কি? কিন্তু তোমার বাড়ীও কি আমার বাড়ী বলে জান্‌তাম না? সেখানের সকলের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ছি না যে!"

"আমি যখন পার্‌ছি তখন তুমিও নিশ্চয় পার্‌বে। সকলেই এ জানে যে আমার দায়েই তুমি বিপন্ন লোকের সাহায্য রূপ এত বড় দুষ্কর্ম্মটা করেছ। যাক, মা সত্যই আমার মুখ দ্যাখেন না জানো?"

অন্তরালস্থিতা মাতার চক্ষু আবার সজল হইল।

শিশির উত্তর দিল—"কিন্তু তাঁর মনস্তাপের কথা তুমি কেন একবারও ভাব্‌ছ না?"

"কেন ভাব্‌ব না? কিন্তু ভগবানের হাতের কাজের ওপর মানুষে কি ভেবে কিছু কর্‌তে পারে ভাই?"

মাতা আর অন্তরালে থাকিতে পারিলেন না—"ভগবানের কাজ! মানুষের অধম চামারের কাজ! জুয়াচোর ধাপ্পাবাজের কাজ!"—বলিতে বলিতে তিনি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। অনিল তাঁহাকে দেখিয়া সবেগে "মা" বলিয়া নিকটস্থ হইয়া পায়ের নিকট বসিয়া পড়িল এবং ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল! মা যে এমন করিয়া এতদিন একবারও তাহার কাছে আসেন নাই। মাতাও কতদিন পরে পুত্রকে এমনভাবে কোলের মধ্যে মুখ লুকাইতে দেখিয়া গত কয়দিনের দুঃখে বেদনায় অভিমানে দ্বিগুণ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শিশিরও যেন নিজেকে মহা অপরাধী জ্ঞানে নতমস্তকে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাতা কিছু শান্ত হইলে শিশিরই প্রথমে কথা কহিল। কণ্ঠের জড়তা পরিষ্কার করিয়া বলিল "যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর কেন।—ওঁকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।"

অনিল একভাবে মাতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়াই রহিল। পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া মাতা তখন ডাকিলেন—"অনিল!"

"মা ?"

"আর আমায় তুইও কষ্ট দিস্‌নে অনিল! শিশির কি বল্‌ছে শুন্‌ছিস ?"

"শিশির তো বল্‌ছে না মা—ও তুমিই বল্‌ছ!"

"আচ্ছা আমিই বল্‌ছি। আমার কথা কি আজ তোর কাছে তুচ্ছ হল রে ?"

"না মা, তুচ্ছ হলে কি এত ভাবি ? ভগবানের বিধান সেই রাত্রেই মাথায় নিয়েছি কিন্তু তোমার কষ্ট হবে, হচ্ছে, এই ভাবনাতেই তো আমার এত—"

"আমার কষ্টের কথা তুই ভাব্‌ছিস ? ওরে তা যদি ভাব্‌তিস তা হলে আর ওকে বাড়ী আন্‌তিস না!"

অনিল তাহার মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শান্তস্বরে বলিল "কি করব মা! আগে ত কিছু জানা যায় নি। বিয়ের মন্তর সব পড়া হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রদান আর গ্রহণের কিছুই বাকি ছিল না।"

"হলই বা! তুই কি অঙ্গহীন মেয়ে জেনে বিয়ে কর্‌ছিলি! তুই যাকে জান্‌ছিলি সে যখন নয় তখন কিসের বিয়ে—কিসেরই বা সম্প্রদান, আর কিসেরই বা গ্রহণ ? এ বিয়ে বিয়েই নয়। ওই কি বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে ? ওর কি বিয়ে হয় কখনো!"

"ও-ও কি একটা মানুষ নয় মা। ওরও কি আত্মা নেই ? অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হলেও ঐ মন্ত্রেই তো ওর সম্প্রদান হত। আমরা যদি ওকে ঠিক জানিনি বলে এ গ্রহণকে গ্রহণ না বলি, তবু ওর সম্প্রদান ঠিকই হয়ে গেছে। ওও সে মন্ত্রের যা না বুঝেছে আমাদের ঘরের মেয়েরা কেহই তা বোঝে না—কিন্তু তাতেও যখন তাদের বিয়ে হয় তখন ওরও হয়েছে। আর আমরাই বা গ্রহণ করিনি বল্‌ব কি বলে ? ধর্ম্ম ঈশ্বর সমাজ সকলকে সাক্ষী করে—একটা ভাল মেয়ে বিয়ে কর্‌তেও যা যা শপথ উচ্চারণ কর্‌তে হয়, যা যা দায়িত্ব নিতে হয়, যে যে কথা বল্‌তে হয়, সবই বলেছি করেছি মা।"

"আচ্ছা, তা যা হয়েছে, হয়েছে, তুই ওকে ঘাড়ে করে নিয়ে এলি কেন ?"

"ভগবান ওকে আমার ঘাড়ে দিলেন কেন মা ? ওর মতই একটা কালা বোবা কি কাণা খোঁড়ার সঙ্গে ওর ঐ রকম মন্ত্র-পড়া সিঁদুর-দেওয়া ঘটে গেল না কেন মা! তোমার ছেলের মত একটু-লেখা-পড়া-জানা একটু-পয়সাওলা একটা লোকের হাতেই ভগবান ওকে এমন কাণ্ড করে ফেলে দিলেন কেন ?"

"ভগবান ভগবান বলিস্‌নে অনিল—এ সেই বদ্‌মাস বাট্‌পাড়—জুয়াচোর—"

"আমার কথাগুলো আগে শোন মা একটু। ভগবান এই ভেবে দিলেন যে,—এই একটা হতভাগ্য জীবের ভাগ্যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে দুরদৃষ্টবশতঃ কিম্বা জড়প্রকৃতিরই অপূর্ণতার দরুন, যাই বলি আমরা, এইরকম পাশা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ওগো একটি পূর্ণমনুষ্যত্বাভিমানী জীব, তুমি কি তোমার জ্ঞান দয়া বিদ্যা বুদ্ধি এবং মনুষ্যত্বের সার মায়া মমতা দিয়ে একটা প্রাণীর এই দারুণ অভাব যথাসাধ্য কিছু মোচন কর্‌তে পার না ? যদি পার তা হলে চেষ্টা দ্যাখ। তোমার হাতে সেইরকম একটি জীব আমি দিচ্ছি। দেখি তুমি এর ওপর কতখানি মনুষ্যত্ব দিতে পার। ভগবানের এই ইচ্ছা ভিন্ন এতে আর কিছু আমি দেখ্‌ছি না। তাই আমি কেবল ভাব্‌ছি মা যে আমি ওর কি কর্‌তে পারি।"

শিশির স্তব্ধ ভাবে বন্ধুর পানে চাহিয়া রহিল। মাতাও ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "কি কর্‌বি তুই ওকে নিয়ে এর আবার ভাবনাই বা কি ?"

"কেন মা, কর্‌তে পার্‌লে তো অনেকই কর্‌বার আছে। মূক-বধির বিদ্যালয়ের কথা তো জান। যদিও ওর একটু বয়স হয়েছে তা হলেও যদি একটা কৃতবিদ্য মানুষ আন্তরিক চেষ্টা নিয়ে ওর সঙ্গে সর্ব্বদা থেকে ওকে কথার উচ্চারণ শেখায়, উচ্চারণের ইঙ্গিত দেখায়, ভাবপ্রকাশের উপায় বোঝার সঙ্গে-সঙ্গে অক্ষর পরিচয় করায়, তা হলে কালে ক্রমশঃ ওকে বেশ লেখাপড়া শিখিয়ে মনের ভাব প্রকাশ কর্‌তেও শিখিয়ে দিতে পারে, কিছু কিছু কথা কইতেও শেখাতে পারে। তা হলেই ওর অর্দ্ধেক অভাব কমিয়ে দিতে পারা যায়।"

"তুই বুঝি মৎলব করেছিস্‌ অম্‌নি করে ওকে সব শেখাবি ? ওরে এইজন্যে তোকে আমি এত লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম! আমার প্রাণ থাক্‌তে আমি তোকে

এ কালা বোবা জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ার হয়ে ফির্‌তে দেব না, এ তুই জেনে রাখিস্‌।"

অনিল মৃদুস্বরে বলিল "মা, তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর অগৌরব হত না এতে।"

"রেখে দে ও গৌরবের কথা। আর যদি এমন হবার কথা মনেও আন্‌বি তা হলে তোর সাম্‌নে আমি গলায় দড়ি দেব। ওকে আমি তোর পাশে একদিনও এ চক্ষে দেখ্‌তে পারব না! ভগবান! আমি কি পাপ করেছিলাম যে আমার এমন চাঁদের পাশে এমন রাহু জুটিয়ে দিলে। শিশির, যদি মা বলে এখনো আমায় মনে করিস্‌, বল্‌ছি আজই ওকে ওর বাপের বাড়ী নিয়ে যা—আর একদিনও যদি ঐ বৌ আমার ঘরে থাকে তা হলে আমিই পাগল হয়ে ঘর ছাড়ব।"

শিশির অনিলের পানে চাহিয়া বলিল "আচ্ছা, তোমার টাকার অভাব নেই, একটা জীবের দুর্ভাগ্যে তোমার কষ্ট হয়েছে, বিশেষ যখন সে এমনভাবে তোমার হাতে এসে পড়েছে, তখন ওর জন্যে কিছু টাকা খরচই না হয় কর। ওঁরা সহরে এসে থেকে তাঁদের মেয়েটিকে মূকবধির বিদ্যালয়ে পড়ান।"

"ছেলেমানুষের মত কথা বল্‌ছ কেন শিশির। ওর মা বাপ কি ঐ একটি সন্তানের জন্যে আর-সব সন্তান আর বাসভূমি ছাড়্‌বেন? তাতে আবার তাঁরা পাড়াগাঁয়ের হিন্দু—মেয়েটি তাঁদের বয়স্থা, তাতে বিবাহিতা, তাকে অপরিচিত পুরুষদের মধ্যে দিলে সমাজে তাদের জাতই কি থাক্‌বে? তা দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া বলেছি ত অত অল্প চেষ্টায় তো ফল পাবার সময় এখন নেই। যদি কেউ আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে কিছুকাল ধরে চেষ্টা কর্‌তে পারে তবেই যদি কিছু ফললাভ ঘটে। একটা জীবনের অভাব দূর কর্‌তে হলে আর-একটা জীবনকেও কিছু আত্মদান কর্‌তে হবে বইকি।"

"সেই চেষ্টায় তুই নিজের জীবনটা উৎসর্গ কর্‌বি? আর যদি তুই এ কথা বল্‌বি বা ওর কথা মনেও ভাব্‌বি, জানিস্‌ তোর মাতৃহত্যার পাতক হবে।"

শিশির স্তম্ভিত ভীত হইয়া মাতার পানে চাহিয়া ছিল। অনিল ধীরে ধীরে "কি করলে মা" বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। মাতা কোন দিকে গ্রাহ্য না করিয়া শিশিরকে কঠিন স্বরে বলিলেন "যথার্থ বন্ধুর উপকার শুধু তার কথা শুনে সুন্দর মেয়ে বিয়ে কর্‌লেই হয় না বাপু, সে যদি না বুঝে নিজের জীবনটা নষ্ট কর্‌তে বসে তাতে একটু শক্ত হয়ে বাধা দিতে হয়। আজই যদি তুমি সেটাকে সে গ্রামে না নিয়ে যাবে তা হলে পাগল ত হয়েছি, আরও হব; আজ থেকে আমি হত্যা দেব অনিলের ওপর! যতদিন না তাকে এ বাড়ী থেকে নিয়ে যায় ততদিন—"

অনিল মাতার পায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে বলিল "একটা ভিক্ষা দাও মা শুধু আমায়। এর পরে—যা দিব্যি দিয়েছ তাই মেনে চল্‌ব। আমি ওকে রেখে আসি, এক দিনের জন্যে। এইটুকু শুধু—তারপরে কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না—"

মাতা পুত্রের অবশ স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া একটু যেন থমকিয়া গেলেন, আবার তখনি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, মনে রেখো একটি দিন মাত্র, পৌঁছে দিয়ে সেই দিনই—"

"হাঁ তাই হবে মা।"

(ক্রমশ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সৌখীন বাংলা দেশ

বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব বেশী নয়। প্রত্যেক বৎসর ছাপাখানা হইতে যে-সমস্ত বহি বাহির হয়, তাহার সংখ্যা শিক্ষিতের সংখ্যার তুলনায় বড় কম নয়। বাংলাদেশে যতগুলি লোক লেখাপড়া জানে তাহার এক-চতুর্থাংশ লোক লেখক নামে পরিচিত হইবার জন্য ব্যস্ত। খ্যাতি সকল লোকেই চায়। মহৎ লোকের চরিত্রেও যশের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। কিন্তু খ্যাতি অর্জ্জন করিতে হইলে যে স্বার্থত্যাগের দরকার, গৌরব লাভ করিতে হইলে যে পরিশ্রম অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় না। যে লোক কোন নিয়মিত শিক্ষা না পাইয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করে, লোকে তাহাকে হাতুড়ে ডাক্তার বলে। তাহার স্থান গুণীগণের নিম্নস্তরে এবং

তাহার কর্ম্মশক্তি সীমাবদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যের দরবারে কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। যাহার খুসি সেই আসিয়া বেচারা পাঠকদিগকে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিতেছেন। সকল ব্যবসায়ে, সকল রকম চাকরীতে সকল লোককে কিছুদিন এপ্রেন্টিসী করিতে হয়। কিন্তু আমাদের তথাকথিত সাহিত্যসেবীরা এপ্রেন্টিসী করিতে চান না। অহীরাবণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং অভিমন্যু মায়ের পেটে থাকিয়াই সমস্ত যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এতবড় রামায়ণ-মহাভারতে, সেই ভীমার্জ্জুন, ঘটোৎকচ কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ ভস্মলোচন, বালি হনুমানের যুগেও একটিমাত্র অভিমন্যু ও একটিমাত্র অহীরাবণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আর আজকাল, বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের জঠর হইতে বাহির হইবামাত্র বঙ্গীয় যুবকমাত্রই আপনাকে বিদ্যাদিগ্‌গজ মনে করিতেছেন। এইজন্যই তাঁহারা আর এপ্রেন্টিসগিরি করিতে চান না। প্রবাদ আছে যে কালিদাস মালিনীকে বলিয়াছিলেন যে স্বর্গে যাইতে হইলে অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়। যজ্ঞ করিতে হইলে অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের নব্য লেখক-সম্প্রদায় মনে করেন যে তাঁহারা শিখিবার ও লিখিবার ইচ্ছা করিলেই যথেষ্ট হইবে। আলাদিনের প্রদীপের মত কোন অনৈসর্গিক উপায়ে তাঁহারা হঠাৎ কৃতবিদ্য হইয়া পড়িবেন এবং আপনাদের উজ্জ্বল প্রতিভার সমুচিত প্রমাণ দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত ও আশ্চর্য্য করিবেন।

এই কথাগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে না। ব্যক্তিগত ভাবে দেখিতে গেলে, বলিতে বাধ্য যে এসিয়াখণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকও বাঙ্গালী। বাঙ্গালী খুব বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া পরিচিত। বাংলা-দেশের লোকের মধ্যে যে গুণ আছে তাহার সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া উচিত নয়। কেন না, বর্ত্তমানযুগে, জাতীয় নবোন্মেষের সময়, আত্মশক্তি আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা একান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গালীদের গুণ কি তাহারও বিশ্লেষণ দরকার। বাঙ্গালীদের কি দোষ তদ্বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। মিথ্যা মোহে আত্মবিস্মৃত হওয়ার মত দুর্বুদ্ধির কাজ আর নাই। বাংলাদেশে দুই একজন খুব উচ্চ শ্রেণীর লোক থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের বিচার করা উচিত নয়। তাঁহাদের বাদ দিলে প্রথম শ্রেণীর লোক ত পাওয়া যায়ই না, একেবারে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে আসিয়া পড়িতে হয়।

আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। তাহার ফলে লোকের মনে একটা জানিবার ও শিখিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। সকলেই শিখিতে চায়। সকলেই পৃথিবীর খবর জানিতে চায়। কূপমণ্ডুক কেহ আর নাই, সকলেই জগতের সংবাদের জন্য ব্যস্ত। তাহার জন্য মাসিক পত্র ও পুস্তকাবলীর এত প্রচার। বাংলাদেশে ছাত্র বাড়িতেছে, স্কুল কলেজে স্থান হইতেছে না। পাঠক বাড়িয়াছে কিন্তু উপযুক্ত লেখকের সংখ্যা সেই পরিমাণে বাড়িতেছে না। কাজেই মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অযোগ্য রচনাকেও সম্মানের সহিত ছাপাইতেছেন। তাহাতে এই কুফল ফলিতেছে যে অনায়াসে নিজের নাম ছাপায় উঠিতে দেখিয়া আর কষ্ট করিয়া উন্নতি করিতে ইচ্ছা হয় না। আমাদের সকল সাহিত্যসেবীদের মধ্যে একটা সৌখীন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে যে পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য আয়োজন চাই, সাহিত্যরচনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন আছে, সাহিত্য যে একটা তুচ্ছ খেলা বা সময় কাটাইবার যন্ত্র নয়, ইহার যে একটা উদ্দেশ্য আছে, ইহার যে একটা গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব আছে--তাহা অনেকেই ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যান। তাহাতে হয় এই যে যাঁহারা সুলেখক, তাঁহাদের লেখার মধ্যেও অসাবধানতা অশৃঙ্খলতা ও অপ্রত্যাশিত দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলায় সুলেখক এত কম যে এইসব সাহিত্যরথীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়া তাঁহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়া, মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে, অনেক সময়েই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

একদিন ছিল যখন বাংলা ভাষায় কিছু লিখিলেই বাংলা ভাষা কৃতার্থ হইত। সেদিন আর নাই। এক্ষণে সৌখীন সাহিত্যালোচনাব প্রশ্রয় দিলে বঙ্গভাষার প্রতি অন্যায়

করা হয়। অনেক শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় ব্যক্তি ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস রচনার পথ উন্মুক্ত করিতে চেষ্টিত আছেন। কিন্তু ইতিহাসের নামে যে-সমস্ত প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরে পাঠকদিগকে অভিভূত করিতে চায়, নিজের দৈন্য ঢাকিবার জন্য অনাবশ্যক বিদ্যাজাহির ও অসংলগ্ন বাগ্‌বিন্যাস দ্বারা প্রবন্ধটিকে জটিল অপাঠ্য ও ভীতিকর করিয়া তুলে,—অনুমান যাহার ভিত্তি, যুক্তি যাহার আশ্রয় নয়,—সেই ঐতিহাসিক প্রবন্ধরূপ রক্তবীজের ঝাড়কে নিয়মিত করিবার সময় আসিয়াছে। পুরাতনের আলোচনা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উহার ভান কখনও সমর্থনযোগ্য নহে। সমালোচকের কার্য্য সম্বন্ধেও আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। দুই একজন বাদ দিলে, বাংলাদেশে সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না, সমালোচকের হস্তে যে গুরুভার অর্পিত আছে তাহার সুষ্ঠু সম্পাদনে অনেকগুলি গুণের একত্র সমাবেশ চাই। নানাভাষায় জ্ঞান, বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির সহিত বিশেষ পরিচয়, নিজ দেশের সাহিত্য ও বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকা বিশেষ দর্‌কার। আমাদের দেশের সমালোচকেরা কখনই সমালোচনা কার্য্যটিকে দায়িত্বপূর্ণ বা সাধনা-সাপেক্ষ বলিয়া মনে করেন নাই। কবির সমস্ত গ্রন্থ না পড়িয়াই তাঁহার গ্রন্থবিশেষ লইয়া গালাগালি করা একপ্রকার ফ্যাসান হইয়াছে। তাহার পর, তাঁহার সহিত সমসাময়িক কবির তুলনা করিয়া, যুগের ও দেশের উপর কবির প্রভাব এবং কবির উপর সাময়িক উত্তেজনা ও সামাজিক পরিবেষ্টনের নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া, দেশীয় সাহিত্যে কবির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার সমকক্ষ সাহিত্যিকগণের সহিত তুলনা দ্বারা আলোচনা করা প্রকৃত সমালোচনা। এই কাজ যে কত কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। বাংলাদেশে যে এখনও সৌখীন ভাবে সাহিত্যালোচনা চলিবে, তাহার কারণ যথার্থ সাহিত্যালোচনার সুযোগ বা সুবিধা এখানে নাই। অল্প লোকের নিকট সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী (উপহার গ্রন্থাবলী ব্যতীত) আছে। প্রধান প্রধান বা বিখ্যাত বহি থাকিতে পারে। কিন্তু প্রধান বই বা চয়নগ্রন্থ পাঠ করিয়া সৌখীন সাহিত্যিক হওয়া যায়—প্রকৃত সমালোচক হওয়া যায় না। এ কথা নিতান্ত সাধারণ কথা। কিন্তু ইহাও যে বলিতে হইতেছে ইহার দ্বারা আমাদের দেশের দুর্দ্দশার পরিমাণ কিছুটা বুঝিতে পারা যায়।

বাঙ্গালীরা সৌখীন বাবু। তাই সমালোচকেরা নিজের হাতে ধূলা লাগিবে বলিয়া বইগুলি নাড়িয়া দেখিতে পারেন-না; তাই ঐতিহাসিক কষ্ট করিয়া ইতিহাসের উপকরণ সন্ধান না করিয়াই ঘরে বসিয়াই কল্পনার সাহায্যে ঐতিহাসিক গবেষণা করিতেছেন; তাই দৈনিক পত্রের সম্পাদক গালি দিয়া ও সাধারণভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত। নিজের মস্তিষ্কচালনা করিয়া কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্য করিবার কোন সরল প্রণালী আবিষ্কার ও তাহার কার্য্যকারিতা প্রমাণ করা অপেক্ষা বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সাধারণের অকর্ম্মণ্যতার বিরুদ্ধে বাগাড়ম্বর করিয়া বাহবা পাওয়া সহজ দেখিয়া এই আশু মনোরম পথই সম্পাদকেরা অবলম্বন করিয়াছেন। বাংলা দেশের শিল্প ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া আবশ্যক এ কথা সকলেই পঞ্চমুখে বলিতেছেন, কিন্তু কেহ উপদেশ ছাড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন না। সৌখীন বাবু গায়ে কাদা লাগা পছন্দ করেন না, গায়ে রৌদ্র লাগা ভাল বাসেন না—কাজেই ব্যবসা সম্বন্ধে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার তলায় বসিয়া খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখেন ও বক্তৃতা করেন ও নিশ্চিন্ত মনে ভিন্ন দেশের লোকের দ্বারা নিজের লজ্জা নিবারণ ও অভাব মোচন করেন।

কিছুদিন হইতে শোনা যাইতেছে যে বাংলা দেশ গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষের মধ্যে যে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল এখন ক্রমশই তাহা হইতে পতিত হইতেছে এবং অন্যান্য প্রদেশ যেরূপ দ্রুতগতিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজ সংস্কার ও সংরক্ষণে, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে ও সাহিত্য-পুষ্টির জন্য সম্মিলিত পরিশ্রমের দ্বারা অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, বাংলা দেশের লোকেরা, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক আলস্য ও বাবুগিরি ছাড়িয়া যদি পুনর্ব্বার আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব

পুনঃস্থাপিত করিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট না হন, তাহা হইলে আমরা মহারাষ্ট্র ও মান্দ্রাজের তুলনায় অনেক পিছাইয়া থাকিব। মনুষ্যজীবন সখের জিনিষ নয়। ফাঁকি দিয়া গৌরব লাভ করা, বাহবা পাওয়া ও লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া অবশ্য নির্ব্বোধ লোকের কাজ নয়। কিন্তু ফাঁকিবাজ লোক যতই বুদ্ধিমান হউন না কেন, তাঁহার ফাঁকি বেশী দিন চলিবে না। আমাদের দেশে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা ক্রমশই খুব বেশী হইতেছে। কাজ করিব না অথচ ফলভোগ করিব, এই ইচ্ছাকে দমন করিতে হইবে। উপরে উঠিতে গেলে, মইএর শেষ ধাপের সাহায্যে উঠিতে হয়, এ কথাটাও আমরা ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যাই। একবারে শীর্ষস্থানে পৌছান যায় না। বটবৃক্ষকেও মাটির তলায় কিছুদিন বাস করিতে হয়, সে একেবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সকল কাজের আরম্ভ-কালে আমরা প্রসংশা স্তুতি বা অনুমোদন আশা করিতে পারি না। সে সময়ে ঔদাসীন্যই স্বাভাবিক। অনেক সময়েই অবজ্ঞা নিন্দা বাধা বিপত্তি এবং কঠিন সংগ্রাম— অনুষ্ঠানের সহচর হয়। পূর্ব্বে যখন কেহ বর পাইবার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতির ধ্যান করিত, তখন নানাপ্রকার ভীতি-প্রদর্শন করিয়া তাহার নিষ্ঠা একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করা হইত। ইতিহাসে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কোথাও বিনা চেষ্টায় সফলতা দেখা যায় না। আমাদের দেশের লোকের এই শিক্ষাটি বিশেষ দরকার। প্রথম চেষ্টায় ঔদাসীন্য বাধা ও অবজ্ঞা অনিবার্য্য। এই উৎসাহের অভাব বা ঘৃণার ভয়ে যাঁহারা প্রথম হইতেই কার্য্যে বিরত হন, তাঁহারা জগতে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। জগতে, যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা চাই, বিঘ্ন অতিক্রম করিবার সাহস ধৈর্য্য ও শক্তি চাই, অবজ্ঞা ও নিন্দা সহ্য করিবার মনের বল চাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অবিলম্বিত নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত অধ্যবসায় দরকার। এই কয়েকটি জিনিষ আমাদের নাই। দেশের নেতাগণ, দেশের সাহিত্যরথীগণ, জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান পুরোহিত সংবাদপত্র-পরিচালকগণের চেষ্টায় যাহাতে বাংলা দেশের সৌখীন ভাব ঘুচিয়া যায়; অবজ্ঞার ভাবে নয়, উদাসীন ভাবে নয়, তাচ্ছিল্য ভাবে নয়,—ভক্তির সহিত, আবেগের সহিত, প্রতিজ্ঞার সহিত, কার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যাহাতে এদেশের লোক সকল-কার্য্যেই মনোনিবেশ করিতে পারেন;—ইহাই আমাদের নিবেদন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। জাতীয় জীবনের উন্মেষের সময়ে, তন্দ্রাজড়িত অলস লোচনের সাধের ঘুমঘোর একবার ভাঙ্গিলে, শরীরে বল ও হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি, মনের মধ্যে উদ্দীপনা ও ভবিষ্যতের উপর আশা, কার্য্য করিবার জন্য একটা অদম্য ইচ্ছা, এবং পরিশ্রমের দ্বারা সুপ্তাবস্থার সমস্ত অসমাপ্তি ও দৈন্যের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য একটা মহতী চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়! জাতীয় জীবনে সুযোগ বহুবার দেখা দেয় না। আমাদের দেশ এখন জাগিয়াছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এ সময়ে যদি বঙ্গদেশের জাগ্রত শক্তিকে নিয়মিত না করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে দিয়া নিস্ফল প্রয়াসে ও পরিণামহীন পণ্ডতায় পর্য্যবসিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই শক্তি আমাদের উন্নতির কারণ না হইয়া অনিষ্টের কারণ হইবে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার আশা অত্যন্ত সুদূরপরাহত হইবে।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী।

উদ্যানলতা

(৫)

মানুষের বয়স যত কম হয়, জগতের সে ততই কাছে থাকে। সুখ দুঃখ তার মনে তখন যেমন গভীর ভাবে ছায়া ফেলে, বয়স বাড়লে আর তেমন ফেলে না। অল্প আনন্দ কি ক্ষুদ্র বেদনার আঘাতেই তার প্রাণ সাড়া দেয়, প্রাণের স্পন্দন তখন তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় চলে। তবে বয়স বাড়লে দুঃখ যেমন গভীর ক্ষত রেখে যায়, অল্প বয়সে তা পারে না, কারণ তার প্রাণশক্তি সে ক্ষতি শীঘ্রই পূর্ণ করে, সমস্ত অতীত ব্যথা মুছে ফেলে।

মুক্তির বিচ্ছেদ-ব্যথাও অল্প দিনেই সয়ে গেল। নূতন খেলার সাথীদের পেয়ে সে সেখানেই তার সুখদুঃখের ঘর আবার নূতন করে বেঁধে বসল। তার সুশালা, অপর্ণা, বিমলা, তার কেষ্টোদাসী সুসীদিদি, এদের সবাইকে

ঘিরেই সে তার নূতন জগৎ সৃষ্টি করল। সে জগতে সদাসর্ব্বদা ঠাকুরমা বাবা কি বেলার প্রবেশ ছিল না। এমন কি মালীভাই তার রাঙা ফুলের তোড়া নিয়েও সেখানে যখন-তখন এসে পৌঁছতে পারত না। সে রাজ্যে বেলার বদলে কেষ্টোদাসীই তার হিংসার পাত্র হয়ে উঠেছিল। বেলার মত লাল ফিতে কি সুন্দর জামা কেষ্টোদাসীর নেই বটে, কিন্তু তার কি সুন্দর গলা! মিস্ নাগ তারই গানের প্রশংসা করেন সব চেয়ে বেশী। তিনি বলেন, "মুক্তির বেশ গলা আছে বটে, তবে কেষ্টোদাসীর মত অমন সুন্দর নয়।" কেষ্টোদাসীটা ইস্কুল ছেড়ে গেলেই ত পারে! তা হলে মুক্তি কেমন প্রাইজ পায়। তার গায়ের রংটাও মুক্তির চেয়ে অনেক ফরসা; সুসীদিই ত সেদিন বল্লে। সুসীদির কাছে আর কেউ প্রশংসা পায় এটা মুক্তির অসহ্য। তার ইচ্ছে করে সারাদিন সুসীদিকে সে জড়িয়ে রাখে; বড় বড় কলেজের মেয়েগুলো টিফিনের ঘণ্টা পড়লেই সুসীদির হাত ধরে বারাণ্ডায় পাইচারি করে, হেসে তার গায়ে গড়িয়ে পড়ে, গলা জড়িয়ে তার কানে কানে কি সব বলে, আর সুসীদির সুন্দর মুখখানা আরো সুন্দর হয়ে ওঠে; আর সে হাস্তে হাস্তে ওই মেয়েগুলোকে কত কিল চড় মারতে আরম্ভ করে। তারা কিন্তু একটুও রাগ না করে সুসীদিকে নিয়ে আরো ফূর্ত্তি করতে থাকে। সুসীদির তখনকার চেহারা, অমন প্রাণভরে গল্প করা, মুক্তির দেখতে খুব ভালো লাগে। সত্যি, সুসীদি তার সঙ্গে গল্প করবার সময় ত অমন সুন্দর হয়ে ওঠে না, অত হাসিও ত তখন তার আসে না। তাই ঐ কলেজের মেয়েগুলো মুক্তির দু চক্ষের বিষ। ওগুলোকে পেলে মুক্তির সুসীদি যে মুক্তির দিকে একবার ফিরেও তাকায় না। একদিন ওদের মাঝখানে গিয়ে সে সুসীদির হাত ধরে টেনে কি বলতে গিয়েছিল, তাইতে সবাই এমন হেসে উঠল, যেন সুসীদি মুক্তির কেউ নয়। সেদিন থেকে মুক্তি আর ওদের কাছে যায় না। কিন্তু বড় বড় গাড়ী চড়ে তারা যখন চলে যায়, তখনও যদি সুসীদি মুক্তিকে ফেলে কেষ্টোদাসীর রূপের প্রশংসা করতে বসে তা হলে কার না রাগ হয়! রাগের চোটে মুক্তি সুসীর সঙ্গে সেদিন বিকেলে কথাই বলেনি। মলিনা মুক্তির চুলের প্রশংসা করছিল, তার কাছেই সে তাই ঘেঁসে বসেছিল।

বাড়ীতে ঠাকুরমা যেমন তার পেছনে দুধ খাওয়ানো আর চুলবাঁধা নিয়ে লেগে থাকতেন, এখানেও তেমনি মলিনাদি ছুটি হলেই কালো ফিতে নিয়ে চুল বেঁধে দিতে আর সাবান নিয়ে মুখ ধোওয়াতে আসে। মুক্তির একটুও ওসব ভাল লাগে না। তবে মলিনাদি মায়ের মত অমন টেনে চুল বাঁধে না, সে বেশ ফিতের ফুল ঝুলিয়ে বিনুনি বেঁধে দেয়।

একটা জিনিস এই ইস্কুলে মুক্তির ভয়ানক অদ্ভুত লাগত —এখানে কেউ মা নেই, বাবা নেই,—খালি মাসিমা, দিদি, আর নগেন বাবু, হীরেন বাবু। অত বড় বড় মেয়ে কেউ সিঁদুর পরে না, মাথায় কাপড় দেয় না, মুখ গোমড়া করে বসে থাকে না, সবাই কেমন হাসে, বড় হয়েও মুক্তির মত ছবি-দেওয়া বই পড়ে, লজঞ্চুস খায়। বাড়ীতে থাকতে পাড়ায় গিয়ে কিন্তু সে দেখেছে, বড় বড় মেয়েরা খালি তরকারী কোটে, সবাইকে বকে আর বুড়োমানুষদের সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গল্প করে। তাদের একজনেরও ছবির বই নেই, খালি চাবি আছে, বাক্স আছে আর খোকা আছে।

এখন কিন্তু সে এ রহস্যের কারণ বুঝতে পেরেছে। এটা যে বোর্ডিং আর সেগুলো যে বাড়ী! বোর্ডিঙে দিদিরা থাকে, বই পড়ে। আগে মুক্তি বোকা ছিল তাই বুঝতে পারত না। এখন সে সব বুঝতে পেরেছে, সব জানে। সেও ত বড় হয়ে সুসীদি মলিনাদির মত বড় বড় মোটা মোটা লাল বই নিয়ে কলেজে গিয়ে চশমাপরা মেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিতে পড়াশুনো করবে, তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ নাগের কাছে পড়া দিতে হবে না। কোট-প্যাণ্ট-পরা মাষ্টাররা খালি পড়বে, আর সে বেঞ্চে বসে মিস্ নাগের মত শুনবে, মাঝে মাঝে খাতায় একটু একটু লিখবে। কেমন রোজ দু তিন ঘণ্টা ছুটি পাবে। তখন কিন্তু সুসীদি মলিনাদি যেমন গোল টেবিল ঘিরে বকবক্ করে বই খাতা নিয়ে পড়ে, সে মোটেই তা করবে না; সে দড়ি ঘুরিয়ে লতা পাতা কেটে 'স্কিপ' করবে, কলের ঘরে গিয়ে খুব জল ঘাঁটবে, মিস্ নাগকে লুকিয়ে ছাদে গিয়ে কুলের আচার খাবে।

এমনি নানা কল্পনা-জল্পনায় মুক্তির দিন কেটে যাচ্ছিল। সারাদিনের মধ্যে বাবা কি ঠাকুরমার কথা তার একবারও মনে পড়ত না। কিন্তু সাড়ে তিনটার সময় যখন ঢং ঢং করে বড় ঘণ্টা বেজে উঠত, আর ঘড়্‌ঘড়্ করে বড় বড় গাড়ীগুলো গাড়ীবারাণ্ডার তলায় এসে দাঁড়াত, অপর্ণা আর বিমলা শ্লেট বই টিফিনবাক্স নিয়ে কল্‌কল্ করতে করতে আরো অনেক ছোট বড় মেয়ের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠত, তখন তাদের মুখে বাড়ীর আর মা-বাবার গল্প শুনে মুক্তির মনটাও কেমন করে উঠত। তার ইচ্ছে করত সেও গাড়ীতে উঠে মার কাছে চলে যায়। কিন্তু গাড়ীগুলো ত মুক্তিদের বাড়ীর দিকে যায় না। তা ছাড়া সুসীদি বলেছে, বোর্ডিঙের মেয়ের রোজ বাড়ী যেতে নেই। তা' হলে সবাই রাগ করে, বকে। তবুও মুক্তি যেত, যদি পীতাম্বর কোচ্‌ম্যান নিয়ে যেত। সে বলে, "না খুকী বাবা, আমি অতদূর যেতে পারবে না। আমার ঘোড়াগুলো থক্ যাবে, ফির কালকে গাড়ী টান্‌বে কে? মেম-সাহেব হামাকে দম্‌তক বক্‌বে যে!"

তখন মুক্তির এমন রাগ হয় যে ইচ্ছে করে নিজের চুল ছিঁড়ে পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে কাঁদে। মলিনাদি ডাক্‌তে এলে তাকে ধরে মার্‌তে ইচ্ছে করে। কিন্তু এ যে বোর্ডিং! কি আর করে বেচারা! মলিনাদির পেছন পেছন লোহার সিঁড়ি দিয়ে কাপড় ছাড়্‌বার ঘরে চলে যায়। তখন কিন্তু কেউ যদি বলে, "মুক্তি, মায়ের জন্যে মন-কেমন কর্‌ছে?" তা হলেই মুক্তির চোখে বান ডেকে যায়। কতদিন এম্‌নি কান্নার সময় সুসীদি তাকে কোলে নিয়ে, চুমু দিয়ে, আয়নায় মুখ দেখিয়ে হাসিয়ে শান্ত করেছে। সুসীদির সুন্দর মুখের উপর মুখ দিয়ে, তার আদরে মুক্তি তার সব দুঃখ ভুলে যায়।

রাত্রে যখন বোর্ডিঙের সেমিজ-পরা খৃষ্টান ঝি শোবার ঘণ্টা বাজিয়ে চা আর দুধের পেয়ালা নিয়ে উপরের লম্বা ঘরের লোহার খাটের পাশে পাশে মেয়েদের খাইয়ে বেড়ায়, তখন ছোট খাটের উপর একলা পা ঝুলিয়ে বসে মুক্তির মনে পড়ে তার ঠাকুরমার মুখ, আর তাদের মস্ত বড় ছাপর-খাট। মা কেমন তাকে রোজ খাবার-ঘর থেকে কোলে করে তুলে সেই খাটে শুইয়ে দিতেন, তারপর আরো অনেক রাত্রে, কি সব কাজটাজ সেরে, তাকে বুকে জড়িয়ে গায়ের উপর একখানা হাত রেখে ঘুমোতেন। রোজই যে সে খাবার-ঘরে বাবার পাশে খেতে বসে তাঁর কোলের উপর ঘুমিয়ে ঢলে পড়ত। এখানে খাবার টেবিলে ঘুমোলে পাশের মেয়েরা হেসে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়; তারপর ছোট খাটে একলা এসে ঘুমোতে হয়। যদি একসঙ্গে দুজন শুলে মিস্ দত্ত না রাগ করতেন, যদি ইংরিজি বাংলা মিশিয়ে সুসীদিকে চোখ রাঙিয়ে অমন করে না বক্‌তেন, তা হলে খাটটা ছোট হলেও, সে সুসীদি না ডাক্‌তেই নিজের বালিশটা নিয়ে সুসীদির খাটে গিয়ে শুত। একলা ঘুমোতে তার বড্ড ভয় করে, কেমন কান্না আসে। অনেক রাত্রে যখন আঁধার ঘরে সব মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে, রাস্তার আলো গাছের ফাঁক দিয়ে এসে সারি সারি কালো খাটের চেহারাগুলো কেমন ভূতের মত করে তোলে, তখন কতদিন সে জেগে উঠেছে। একলা জেগে থাক্‌তে ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে, কিন্তু বালিশের তলায় মুখ গুঁজে শক্ত করে চোখ দুটো বুজেও তখন কিছুতেই ঘুম আসে না। আবার তখন যদি রাস্তার দুষ্টু লোকগুলো মুক্তিকে ভয় দেখাবার জন্যে মোটা গলায় "বল হরি, হরি বোল" বলে চেঁচিয়ে ওঠে তবেই ত সর্ব্বনাশ। মুক্তির হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভয়ে নড়্‌তেও পারে না, চেঁচাতেও পারে না। একদিন কেমন করে জানি না সে খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে চেয়ে দেখ্‌ল, মাসিমা সুসীদি মলিনাদি সবাই তাকে হাওয়া করে মাথায় জল দিয়ে কি যেন করছে। তারপর দিন-কত সে মাসিমার ঘরে শুত, সেও কিন্তু আলাদা খাটে। এখন আবার সেই বড় ঘরেই শোয়। তবে আর পড়ে যায় না। দু-একদিন দ্যাখে ঐ-রকম বিকট চীৎকার শুন্‌লে মেয়েরা এ ওর খাটে লাফিয়ে গিয়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। মুক্তি কিন্তু কোথাও যায় না। একলা চুপ্‌টি করে নিজের খাটেই পড়ে থাকে।

আবার রোজ ভোরে যখন ঢংঢং করে ঘণ্টা বেজে ওঠে, ছোট বড় মেয়েরা উস্কোখুস্কো চুলে বিছানা ছেড়ে ওঠে;

কেউবা ছবি-আঁকা জাপানী চটি, কেউবা আঙুল-বের-করা চাম্‌ড়ার চটি পরে, কেউবা খালি পায়ে মুখ ধুতে চলে যায়; তখন মুক্তি চেয়ে দেখে সুসীদিরা কয়েকজনে ওই সকালেই বই হাতে করে দোতলার বারাণ্ডায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে পড়্‌ছে; মুখ দেখ্‌লে মনে হয় যেন কোন্ দুপুর রাত্রে উঠে পড়্‌তে লেগে গেছে, কিন্তু একদিনও মুক্তি তাদের ওঠা টের পায় না। ওরা অত আগে উঠেছে দেখে লজ্জায় মুক্তি ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বসে। মলিনাদি এসে তার ঘুম-ভরা চোখের উপর একটি চুমু দিয়ে তাকে মুখ ধোওয়াতে নিয়ে যায়। যদি কোনো দিন তার উঠ্‌তে দেরী হয়ে যায়, যদি ভোর বেলার মিষ্টি স্বপ্নের মায়া কাটিয়ে তার উঠ্‌তে ইচ্ছে না করে, তা হলে মলিনাদি এসে কত ঠেলা দিয়ে দিয়ে, জলে-ভেজা হাত চোখে বুলিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে, কানে কানে বলে, "মুক্তি ওঠ, নইলে মিস্ দত্ত বক্‌বেন এখুনি।"

একদিন মলিনাদির কথা না শুনে জোর করে সে শুয়ে ছিল, মিস্ দত্ত এসে তাকে এমন ঝাঁকড়ানি দিয়ে টেনে তুলে দিলেন যে তার হাড় পাঁজর যেন সরে গেল। মনে হল বাড়ীতে কতদিন সে এমন করে শুয়ে থাকে, তাতে ত মা কিচ্ছু বলেন না, দুএক দিন কেবল চোখে জল ছিটিয়ে দেন। মিস্ দত্ত শুধু তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, মলিনাদিকে কি রকম বক্‌লেন, "আহ্লাদ দিয়ে মেয়েটার মাথা খাচ্ছ। ওরকম আদরের খুকী বানাবার জন্যে কি আমি তোমার ওপর ওর ভার দিয়েছি?" তারপর ইংরেজিতে খুব চেঁচিয়ে একটা কি বল্লেন; মুক্তি সেটা বুঝ্‌তে পারে নি। কেবল দেখ্‌ল মলিনাদি মুখটা লাল করে তাকে টেনে নিয়ে স্নানের ঘরের দিকে গট্‌গট্ করে চল্‌ল।

সারাদিনের গোলমালে খেলায় পড়ায় গানে গল্পে মুক্তি তার ছোট-খাটো দুঃখগুলি ভুলে যায়; দুঃখের সময় যে মায়ের মুখ মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে জেগে ওঠে, আনন্দের আলোয় তা আবার ছায়ার মত মিলিয়ে যায়। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে একটি দিন সকাল থেকেই তার মন সেই ভবানীপুরের বাগান-ঘেরা বাড়ীর পথ চেয়ে পড়ে থাকে। শুক্রবার দিন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই মুক্তি ছুটে নীচে নেমে আল্‌মারির চাবি খুলিয়ে একখানা ফর্‌সা তোয়ালে আর একটা বড় সেফ্‌টিপিন নিয়ে মলিনাকে সাধ্‌তে বসে, "দাওনা ভাই মলিনাদি, আমার কাপড় গুছিয়ে দাও, আমি বাড়ী যাব।" মলিনাদি হেসে বলে, "দূর পাগ্‌লি, এখুনি কিসের বাড়ী যাবি। আগে সন্ধ্যে হোক, এই ত সবে সকাল হোলো।" মুক্তি কিন্তু না-ছোড়্‌বান্দা। অগত্যা মলিনা খানকয়েক জামা তোয়ালেতে জড়িয়ে পিন দিয়ে আট্‌কে হেসে মুক্তির গাল টিপে বলে "যাঃ তোর পোঁট্‌লা নিয়ে বেরিয়ে পড়্ এইবার।" মুক্তি ক্লাশ বস্‌বার আগে পর্য্যন্ত সেইটা কোলে করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়; আর বাড়ী গিয়ে বাবাকে আর ঠাকুরমাকে কি কি গল্প বল্‌বে, মনে মনে সেই সব আবৃত্তি কর্‌তে থাকে। ক্লাশের সময় বইগুলো গুছিয়ে পোঁট্‌লাটা শুদ্ধ নিয়ে পড়্‌তে যায়; পাছে আবার ছুটি হলে সেটা নিতে এতখানি ঘুরে আস্‌তে হয়। মিস নাগ এইজন্যে কত বকেন, তবু মুক্তি প্রত্যেকবারই পুঁটুলি নিয়ে ক্লাশে আসে; বাড়ী যেতে অতটা দেরী করার ইচ্ছা তার মোটেই নেই।

(৬)

মুক্তিকে পড়্‌তে পাঠিয়ে মোক্ষদা দেবীর দিন ত কাটাই ভার হয়েছিল। মস্ত বড় বাড়ীটা সারাদিন খাঁ খাঁ করে, গেরস্তর বাড়ী কোথাও জনমনিষ্যির সাড়া নেই, একটা ছেলে নেই, বৌ নেই, মানুষের প্রাণ তিষ্ঠয় কেমন করে এমন জায়গায়! ছেলেকে বিবাহ কর্‌বার জন্য তিনি আজকাল আবার নূতন করে তাগাদা দিতে সুরু করেছেন। একটা ক্ষুদ-কুঁড়োর মত মেয়ে ঘরের কোণে পড়ে ছিল, তবু যাহোক ঘরটা এক-রকম সাজন্ত ছিল, তা সেটাকে শুদ্ধ খ্রীষ্টানীদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছেলে ঘর দোর ভূতের বাসা করে দিয়ে বসে আছেন, এ কোন্ মার প্রাণে সয়! এই বয়সে বিয়ে থা কর্‌বে না, এই বা কি-রকম কথা! মেয়েছেলে ত আর জমিজমা ভোগ কর্‌বে না, বাপের বংশও বজায় রাখ্‌বে না; এ-সব বিবেচনা করে ছেলের আবার বিয়ে করা উচিত।

ছেলে কিন্তু মায়ের ও-সব কথায় কানই দেয় না। কাজেই মোক্ষদা দেবী মাঝে মাঝে বাড়ী যাবার ধুয়া তোলেন; আর বাকী সময় বসে বসে মুক্তির জন্যে কুলের

আচার, ছড়া তেঁতুল, কাসন্দি ইত্যাদি তার মুখ-রোচক নানা জিনিস তৈরি করেন। এই কুপথ্যগুলি শিবেশ্বরের দুচক্ষের বিষ। তিনি চোকোলেট বিস্কিট লোজেন্স প্রভৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার ঢেলে দিলেও তবু মুক্তি ঠাকুরমার কুপথ্যের ভাণ্ডারের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। চুলবাধা বিষয়ে সে বাবার দলে হলেও খাবার সময় ঠাকুরমার দলে।

ছুটির দিনে বাড়ী এলে মুক্তি কি খাবে কি পর্‌বে, সেই চিন্তাতেই এখন তার ঠাকুরমা বিভোর। প্রতি সপ্তাহে দুটি দিনের জন্য তাঁর উমা বাপের বাড়ী আসে, আগমনীর আয়োজন সম্পূর্ণ করে বোধন কর্‌তে না কর্‌তে আবার বিদায় দিতে হয়। এই বিচ্ছেদ-মিলনের মালাই এখন তাঁর জপমালা। তাঁতিনী ডেকে ঠাকুরমা প্রায়ই লাল সবুজ নানা রংবেরঙের কাপড় কিনে রাখেন; বাড়ী এসেই যে মুক্তি ঘাঘরা জুতো ছেড়ে খুসীদিদির মত লুটিয়ে কাপড় পর্‌তে ভালবাসে। নাপ্‌তিনীকে শনিবারে আস্‌বার জন্যে রোজ কড়া তাগিদ দিয়ে পাঠান, ঠিক এসে মুক্তোকে যেন আল্‌তা দিয়ে যায়। মুক্তির রোজকার বরাদ্দ দুধ ঘন করে সর তুলে মাখন করে রাখেন, বাছা পরের হাতে ভাল খেতে পায় না, বাড়ীতে দুদিন পাতে টাট্‌কা মাখন খাবে।

এই-রকম আয়োজনে পাঁচ দিন কাটিয়ে ছ'দিনের দিন একরত্তি মেয়ের জন্যে যজ্ঞির জিনিষ নিয়ে মুক্তির অভ্যর্থনা হয়।

শিবেশ্বরের সময় আরো মৃদুগতি হয়ে উঠ্‌ছিল। বাড়ী এলে এখন আর কেউ কলহাস্যে ঘর মাতিয়ে গাড়ীর পা-দানিতে ছুটে এসে দাঁড়ায় না, খাবার সময় কেউ পাতের উপর হুমড়ি খেয়ে সঙ্গে খেতে আসে না, গাড়ী চড়ে হাওয়া খেতে যাবার জন্যেও কেউ তাগিদ দেয় না। মুক্তির ট্রাইসিকল্‌, দোল্‌না, খেলার বন্দুক সব পাঁচদিন মুখভার করে কোণে পড়ে থাকে, কবে তার স্পর্শে আনন্দে জেগে উঠ্‌বে এই আশায়। ভাত খেয়ে উঠে এখন শিবেশ্বরের মুখে কেউ পান ভরে দিতে যায় না, রেকাবীতে সাজানো পান নিজেই তুলে খেতে হয়।

মুক্তিকে নিজে লেখাপড়া শিখিয়ে মনের মত করে গড়ে তোলবার যে ইচ্ছা ছিল, সেটাও হল না; বাধা হয়েছে তাকে পরের হাতে দিতে হল। ছুটির দুদিন মাত্র সে বাড়ীতে আসে, তখন তাকে পড়াতে বসানো নিতান্ত নির্দ্দয় না হ'লে কেউ পারে না; অথচ শূন্য ঘরে কি নিয়েই বা তাঁর দিন কাটে। মা ত ঘরে পা দিতে না দিতেই রোজ সেই চির-পুরাতন খেদের সুর ধর্‌বেন—বুড়ো বয়সে এত সাধ্‌ছি তবু একটা বৌ এনে দিলে না। বৌ আনা যখন তার দ্বারা হবে না, আর মুক্তিকে বাড়ী এনে রাখাও সুবিধাজনক নয়, তখন আর কি তৃতীয় উপায়ে দিনগুলো সহজ করে তোলা যায়?

শিবেশ্বরের এম্‌নি ভাবনায় মাথা যখন গজ্‌গজ কর্‌ছে, তখন একদিন মোক্ষদা বল্লেন, "জানিস্‌ রে, সেই বিষ্ণুর ছেলের সঙ্গে বিশু তার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছে, মেয়েটি আমাদের মুক্তোর চেয়ে মাত্র দেড়বছরের বড়। তোমায় তখন বলাতে তুমি ত সংসার ওলট-পালট করে ফেল্লে, কেন কি মন্দটা হ'ত? মেয়ের বিয়ে ত সেই দিতেই হবে, তা আজই দাও আর কালই দাও।"

শিবেশ্বরের কি মনে হল জানি না, তিনি বলে বস্‌লেন, "হ্যাঁ, আমিও শীগ্‌গির সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল্‌ব।"

মা আনন্দিত হয়ে বল্লেন, "কার সঙ্গে রে?"

শিবেশ্বর বল্লেন, "সে পরে বল্‌ব, আগে ঠিক হোক!"

মোক্ষদা দেবী খুসী হয়ে রান্নার জোগাড় কর্‌তে চলে গেলেন।

শিবেশ্বর বাইরে এসে কেষ্ট বেয়ারাকে ডাক দিলেন, "বেয়ারা।" কেষ্ট নাম শিবেশ্বর পছন্দ কর্‌তেন না।

বেয়ারা জোড় হাতে "আজ্ঞে হুজুর" বল্‌তে বল্‌তে ছুটে এল।

শিবেশ্বর বল্লেন, "তুমি না একদিন দেশে যাবে বল্‌-ছিলে। কবে থেকে ছুটি চাও বল। যে দিন যেতে চাও সেই দিনই পাবে।"

বেচারা ত অবাক। এ কি-রকম আদেশ! জন্মেও সে কখনো এমন যেচে ছুটি-দেওয়া দেখেনি। কবে মাস খানেক আগে কি বলেছিল, তাই মনে করে মনিব ছুটি দিচ্ছেন, তাজ্জব কাণ্ড বটে। সে মাথাটা অনেকখানি নীচু করে হাত দুখানা জোড় করেই বল্লে, "আজ্ঞে আপনি যা হুকুম করেন।"

শিবেশ্বর বল্লেন, "আচ্ছা, কাল যেতে পার।"

লোকটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। শিবেশ্বর হঠাৎ বল্লেন, "তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা সব কি জাত ?"

বেয়ারা একটু থতমত খেয়ে বল্লে, "আজ্ঞে এই আমাদেরই মত হাড়ি ডোম, তা ছাড়া তেলী কুমোর আর দু'একটা ছোট জাত আছে।"

শিবেশ্বর কিছুক্ষণের জন্যে ভুরু দুটো খুব কুঁচ্‌কালেন।

বেয়ারা ভাব্‌লে ঠাকুরমা ত আমায় চৌকাঠ মাড়াতে দেন না, আবার বাবুর কি হল তিনিও দেখি রাগ কর্‌ছেন। সে তাঁকে খুসী কর্‌বার জন্যে বলে বস্‌ল, "আজ্ঞে কাছাকাছি দুটো চারটে ভাল জাতও আছে।"

শিবেশ্বর বল্লেন, "থাক। তুমি আস্‌বার সময় একটু আধটু লেখাপড়া জানে এমন যদি কোনো মা বাপ-মরা ভাল ছেলে তোমাদের গাঁয়ে পাও ত তোমার সঙ্গে নিয়ে এস।"

বেয়ারা ভাব্‌লে, "বুঝেছি, বাবুর ছেলে নেই, পাল্‌বার সখ হয়েছে, তাই ভাল জাতের ছেলে খুঁজ্‌ছেন।" তৎক্ষণাৎ "যে আজ্ঞে" বলে সে বাক্স পেঁট্‌রা গোছাতে চলে গেল।

দিন কতক পরে মোক্ষদা দেবী একদিন কচি কচি আমের ঝোল রাঁধ্‌বার জন্যে মালীকে আম পাড়্‌তে হুকুম কর্‌ছেন, আর সে নানান ছুতো দেখাচ্ছে, এমন সময় নেত্য ঝি চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এল "মা-ঠাক্‌রুণ, বাবুর বেয়ারার সঙ্গে বেশ একটা সুন্দর-পানা ছোঁড়া আস্‌ছে দেখ-সে।" মা-ঠাক্‌রুণ তখন নাত্‌নীর আগমনের আশায় অম্বলের ব্যবস্থা কর্‌ছেন, ঝির কথায় বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "আস্‌ছে ত কি—শঙ্খটা বাজাতে হবে নাকি ? জামাই আস্‌ছে না ত যে অত নাচ !" নেত্য ঝি নিরুৎসাহ হয়ে চলে গেল। একটু পরে সত্যি-সত্যিই একটা থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে চড়ে কেষ্টর সঙ্গে একটি বেশ সুন্দর-মুখের শ্যামবর্ণ পাড়াগাঁয়ের ছেলে এসে সদর দরজায় হাজির হল। মোক্ষদা দূর থেকে একবার দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কেষ্টর ভাই-পো ভাগ্নে দেখ্‌বার অবসর এখন তাঁর নেই, একটু পরেই মুক্তো আস্‌বে; তার জন্যে ডাব কাটিয়ে রাখ্‌তে হবে।

একটু পরে বাড়ীর গাড়ী চড়ে হাসিমুখে মুক্তি এসে নেমেই দেখ্‌ল, তার চেয়ে একটু বড় একটি মাতলি পরা ছেলে তার বাবার ঘরে বসে কি সব কথার উত্তর দেবার চেষ্টা কর্‌ছে।

মুক্তি অবাক হয়ে তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে "মা আমি এসেছি" বলে হাঁক দিয়ে ভিতর-বাড়ীতে চলে গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসংযুক্তা দেবী।

কষ্টিপাথর

চিরদিনের দাগা

ও পার হতে এ পার পানে খেয়া নৌকো বেয়ে
ভাগ্য নেয়ে
দলে দলে আন্‌চে ছেলে মেয়ে।
সবাই সমান তা'রা
এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপা-ফুলের পারা।
তাহার পরে অন্ধকারে
কোন্ ঘরে সে পৌঁছিয়ে দেয় কারে !
তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনী জাল বোনা—
দুঃখে সুখে দিন মুহূর্ত্ত গোনা।

একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে,
জননী তার লজ্জা পেল ; ভাব্‌ল কোথা থেকে
অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আন্‌ল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইচে যখন চাষী
নাম্‌ল যেন শিলাবৃষ্টিরাশি।

বিনা দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হ'ল সুরু,
পদে পদে অপরাধের বোঝা হ'ল গুরু।
কারণ বিনা যে-অনাদর আপ্‌নি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় "পোড়ারমুখী," শাসন করে বাপ,—
এ কোন্ অভিশাপ
হতভাগী আন্‌লি বয়ে—শুধু কেবল বেঁচে-থাকার পাপ !
সতই তারা দিত ও'রে গালি
নির্ম্মলারে দেখ্‌ত মলিন মাখিয়ে তারে আপন কথার কালী।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিনু ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামেশি।
"দাদা" বলে
গলা আমার জড়িয়ে ধরে বসত আমার কোলে।

নাম শুধালে শৈল আমায় বল্‌ত হাসি হাসি—
"আমার নাম যে দুষ্টু, সর্ব্বনাশী !"
যখন তারে শুধাতেম তার মুখটি তুলে ধরে
"আমি কে তোর বল্‌ দেখি ভাই মোরে ?"
বল্‌ত "দাদা, তুই যে আমার বর !"—
এম্‌নি করে হাসাহাসি হ'ত পরস্পর।

বিয়ের বয়স হল তবু কোনোমতেই হয়না বিয়ে তার—
তাহে বাড়ায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্ম্মা থেকে পাত্র গেল জুটি।
অল্পদিনের ছুটি ;
শুভকর্ম্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেয়েটিরে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বল্‌তে গেলেম হেসে—
"বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে ভাই বরণ করলি শেষে ?"
অমনি যে তার দু'চোখ গেল ভেসে
ঝরঝরিয়ে চোখের জলে। আমি বলি, "ছি, ছি,
কেন, শৈল, কাঁদিস মিছিমিছি,
করিস্‌ অমঙ্গল ?"
বল্‌তে গিয়ে চক্ষে আমার রাখ্‌তে নারি জল।

বাজ্‌ল বিয়ের বাঁশি,
অনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল দুষ্টু সর্ব্বনাশী।
যাবার বেলা বলে গেল, "দাদা, তোমার রইল নিমন্ত্রণ,
তিন-সত্যি—যেয়ো যেয়ো !" "যাব, যাব, যাব বৈ কি, বোন !"
আর কিছু না বলে'
আশীর্ব্বাদের মোতির মালা পরিয়ে দিলেম গলে।

চতুর্থ দিন প্রাতে
খবর এল, ইরাবতীর সাগর-মোহানাতে
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে !
আবার ভাগ্য নেয়ে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্‌ পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে !
কেন এল কেনই গেল কেইবা তাহা জানে !
নিমন্ত্রণটি রেখে গেল শুধু আমার প্রাণে।
"যাব, যাব, যাব, দিদি, অধিক দেরি নাই,
তিন-সত্যি আছে তোমার, সে কথা কি ভুল্‌তে পারি ভাই ?"
আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে
খবর পেলেম পরে।
গালিয়ে বুকের ব্যথা
লিখে রাখি এইখানে সেই কথা।

দিনের পরে দিন চলে যায়, ওদের বাড়ি যাইনে আমি আর।
নিয়ে আপন একলা প্রাণের ভার
আপন মনে
থাকি আপন কোণে।
হেন কালে একদা মোর ঘরে
সন্ধ্যাবেলায় বাপ এল তার বিশীর্ণ ঘরে।
বল্লে, "খুড়ো, একটা কথা আছে,
বলি তোমার কাছে।
শৈল যখন ছোট ছিল, একদা মোর বাক্স খুলে দেখি
হিসাব-লেখা খাতার পরে এ কি
হিজিবিজি কালীর আঁচড় ! মাথায় যেন পড়্‌ল ক্রোধের বাজ !
বোঝা গেল শৈলরি এ কাজ !
মারা ধরা গালি মন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল,—
হঠাৎ তখন মনে এল শাস্তির কৌশল।
মানা করে দিলেম তারে
তোমার বাড়ি যাওয়া একেবারে !
সবার চেয়ে কঠিন দণ্ড ! চুপ করে সে রইল বাক্যহীন
বিদ্রোহিনী বিষম ক্রোধে ! অবশেষে বারো দিনের দিন
গরবিণী গর্ব্ব ভেঙে বল্লে এসে, 'আমি
আর কখনো করব না দুষ্টামি !'
আঁচড় কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই ক'খানা পাতা
আজ্‌কে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মত।
হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত ;—
সে শাস্তি নেই, সে দুষ্টু নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশুহাতের আঁচড় ক'টি আমার বুকে লাগা !"

(ভারতী, বৈশাখ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক না কো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিওরের ঐ জানলা দুটো,—গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া !
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে !
বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ ,
কত রকম কবিরাজী, কতই মুষ্টিযোগ,
একটু মাত্র অসাবধানেই বিষম কর্ম্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোম্‌টা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই ত ঘরে পরে,
সবাই আমায় বলে লক্ষ্মী সতী,
ভালো মানুষ অতি !
এ সংসারে এসেছিলেম ন' বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুঃখের কথা
একটুখানি ভাব্‌ব এমন সময় ছিল কোথা !
এই জীবনটা ভালো, কিম্বা মন্দ, কিম্বা যা-হোক্‌-একটা কিছু,
সে কথাটি বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগু পিছু।

একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চল্‌চে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা,
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই ত আমি যে কি, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কি অর্থে যে ভরা!
শুনি নাই ত মানুষের কি বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্চে সেই চাকাটা—ঐ যে থাম্‌ল যেন;
থামুক তবে! আবার ওষুধ কেন?

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম্ম-দোলায় দোল;
হেঁকেছিল, "খোল্‌রে দুয়ার খোল্!"
সে যে কখন আস্‌ত যেত জান্‌তে পেতেম না যে।
হয় ত মনের মাঝে
সঙ্গোপনে দিত নাড়া; হয় ত ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত; হয় ত বাজ্‌ত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ ভোলা দুঃখে সুখে
হয় ত পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আস্‌তে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যা-বেলায়
পাড়ায় কোথা সতরঞ্চ খেলায়।
থাক্ সে কথা!
আজ্‌কে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা!

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌চে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা।

বাইশ বছর ধরে'
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেচে, আরো কাট্‌ত আরো বাঁচ্‌লে পরে!
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা!
আজ্‌কে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর।

জনম মরণ এক হয়েচে ঐ যে অকূল বিরাট মোহনায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেওয়াল যত
একটু ফেনার মত।
এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় পড়ে থাক!
মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েচে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু!
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার করে দাও কালের পারাবার!

(সবুজপত্র, বৈশাখ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

--

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধর্‌ল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বল্লে, "হাওয়া বদল কর!"
এই সুযোগে বিনু এবার চাপ্‌ল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়্‌ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি।
নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আব্‌ডালে
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে;
মিলন ছিল ছাড়া ছাড়া,
চাপা হাসি টুক্‌রো কথার নানান্ জোড়াতাড়া।
আজ্‌কে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশভরা সকল আলো ধরে
বর বধূরে নিলে বরণ করে'।
রোগা মুখের মস্ত বড় দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে।
রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা শিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় তাহাদের ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপ্‌নারি ভার বইবে কেমন করে'?
সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের বাঁধন হ'তে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে,—

তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগ্‌চে বারেবার
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার ;
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাশুর সাম্‌নে পিছে ডাইনে বাঁয়ে ;
সেই কথাটা মনে করে পুলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইষ্টেশনে বদল হবে গাড়ী ;
তাড়াতাড়ি
নাম্‌তে হল, ছ ঘণ্টা কাল থাম্‌তে হবে যাত্রীশালায়,
মনে হল এ এক বিষম বালাই !
বিনু বল্লে, "কেন, এই ত বেশ্ !"
তার মনে আজ নেই যে খুসীর শেষ !
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা,—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছনো আর চলা।
যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,—
"দেখ, দেখ, এক্কাগাড়ী কেমন চলে !
আর দেখেচ বাছুরটি ঐ, আ মরে যাই, চিক্কন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কি সুগভীর স্নেহ !
ঐ যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,—
সিসুগাছের তলাটিতে, পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ঐ যে রেলের কাছে,—
ইষ্টেশনের বাবু থাকে ?—আহা ওরা কেমন সুখে আছে !"

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
বলে দিলেম, "বিনু, এবার চুপ্‌টি করে ঘুমোও আরামেতে !"
প্ল্যাট্‌ফরমে চেয়ার টেনে
পড়্‌তে সুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ী, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বল্লে বিনু,—"কথা একটা আছে !"
ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।
বিনু বল্লে, "রুক্‌মিনী ওর নাম।
ঐ যে হোথায় কুয়োর ধারে সার-বাঁধা ঘরগুলি
ঐখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি।
তেরোশো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল,—স্বামীস্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্‌-এক গাঁয়ে কি-এক নদীর ধারে—"
বাধা দিয়ে আমি বল্লেম হেসে
"রুক্‌মিনীর এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়্‌বে এসে।
আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবেনা তায় কারো।"
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু, বিনু বল্লে ক্ষেপে—,
"কক্‌খনো না, বল্‌বনা সংক্ষেপে !
আপিস যাবার তাড়া ত নেই, ভাবনা কিসের তবে ?
আগাগোড়া সবটা শুন্‌তে হবে।"
নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে !
রেলের-কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামী।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পৈঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়ানো চাই ;
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি ;
সে ভাব্‌নাটা ভারী
রুক্‌মিনীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মত
আমার পরে ভার
কুলি নারীর ভাব্‌না ঘোচাবার।
আজ্‌কে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে !

অবাক্ কাণ্ড এ কি !
এমন কথা মানুষ শুনেচে কি !
জাতে হয়ত মেথর হবে, কিম্বা নেহাৎ ওঁচা,
যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশটাকা দিতেই হবে তাকে !
এমন হলে দেউলে হতে ক'দিন বাকি থাকে ?
"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে ! আমি দেখ্‌চি মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই !"
বিনু বলে, "এই
ইষ্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেব তবে"
এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,—
আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে,—
"কেমন তোমার নোক্‌রি থাকে দেখ্‌ব আমি !
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাব নষ্টামি !"
কেঁদে যখন পড়্‌ল পায়ে ধরে
দু টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে।

জীবন-দেউল আঁধার করে নিব্‌ল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু মাস যেই ফুরালো।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধুলি
বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনে আর যা-কিছু ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় র'বে মম,
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের পরে নিত্য-সিঁদুর সম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে'
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে'।"
ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি

কানাই বল্‌লে, "মনে কি নেই ?" অপূর্ব্ব কয় নতমুখে
"অনেকদিন সে গেছে চুকেবুকে।"
"চুকে গেছে ?" কানাই উঠ্‌ল বিষম রাগে জ্বলে',
"এতদিনের পরে যেন আশা হচ্চে চুকে যাবে বলে'।"
নীচের তলায় বলাই আপিস করে—
অপূর্ব্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুক্‌ল তারি ঘরে।
বল্‌লে, "আমায় রক্ষা কর !"
বলাই কেঁপে উঠ্‌ল থরথর।
অধিক কথা কয়না সে যে ; ঘণ্টা নেড়ে ডাক্‌ল দরোয়ানে।
অপূর্ব্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে মানে।

অপূর্ব্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে
এদের ঘরে নিজে
আস্‌তে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।
অনেক রকম করে ইতস্তত
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।
পূর্ণ বল্‌লে, "রক্ষা কর মাসি !"

এরি পরে কাশী থেকে মা আস্‌লেন ফিরে।
কানাই তাঁরে বল্‌লে ধীরে ধীরে—
"জান ত, মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য্য,
এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য্য।
বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,
উচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে।"
কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে
অপ্রসন্ন মুখে।
বল্‌লে, "হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে
দেখ্‌ব তখন বিবেচনা করে।"
মা বল্‌লেন, "তোরা বলিস্ কি এ !
একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে
আরেক দুঃখে বিদ্ধ কর্‌বি মর্ম্ম !
এই কি তোদের ধর্ম্ম !"
এত বলি' বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি ;
তারা বলে, "যাচ্চ কোথায় ?" মা বল্‌লেন, "অপূর্ব্বদের বাড়ি।
দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে,
রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে !"
"রোস, রোস, থাম, থাম, কর্‌চ এ কি !
আচ্ছা, ভেবে দেখি !
তোমার ইচ্ছা যবে
আচ্ছা না হয় যা বল্‌চ তাই হবে !"
আর কি থামেন তিনি!
গেলেন একাকিনী
অপূর্ব্বদের ঘরে তাদের মাসি।
ছিল না আর দোবে চোবে, ছিল না চাপ্‌রাসি।
প্রণাম কর্‌ল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী।

(ভারতী, জ্যৈষ্ঠ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন মুসলমানদের উদারতা ও ভারতবর্ষের প্রতি সম্মান ও প্রীতি।

মোসলমানগণ যেরূপ অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের সহিত হিন্দুদের ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে যেরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে।

আবু মাআশার ফালাকী ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া যেরূপে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু-শাস্ত্র শিক্ষা করেন, আবু রায়হান বেরুনী যেরূপে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, এবং হিন্দুদের জ্যোতিষ ও দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্ববিশ্রুত "কেতাবুল হিন্দ্" রচনা করেন, ফিরোজ শাহ যে-সকল হিন্দু পুস্তকের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, আক্‌বরের দরবার হইতে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রদত্ত হয়, রাজকুমার দানিয়াল হিন্দু ভাষার প্রতি যেরূপ অনুরাগী ছিলেন, আজাদ বেলগ্রামী হিন্দুদের অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে-সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কাসেম ফেরেস্তা 'এখ্‌তিয়ারাতে কাসেমী' গ্রন্থ লিখিয়া হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে যেরূপে ফারেসী ভাষায় অনূদিত করেন, সে সকল অতি পুরাতন কাহিনী। অনেকের ধারণা যে, ভারতবর্ষের মোসলমান অধীশ্বরদিগের মধ্যে সম্রাট আক্‌বরই সর্ব্ব প্রথম হিন্দু পণ্ডিতদিগকে দরবারে স্থান দেন ; এবং সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাবলী অনুবাদ করিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু সম্রাট আক্‌বরের শত বৎসরেরও পূর্ব্বে, কাশ্মীরাধিপতি সোল্‌তান জায়েন উল-আবেদীন ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। হিন্দুদের নিকট হইতে জিজ্‌ইয়া গ্রহণ করাও তিনিই সর্ব্বপ্রথম রহিত করিয়াছিলেন, গো-হত্যাও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

"তারিখে ফেরেস্তা"তে সোল্‌তান জায়েন-উল-আবেদীন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"জায়েন-উল-আবেদীন হিন্দুদের দেবালয়ের জন্য দেবোত্তর (ওয়াক্‌ফ্) দান করেন, জিজ্‌ইয়া উঠাইয়া দেন, গো-হত্যা নিবারণ করেন। ফারেসী হিন্দি তিব্বতি ইত্যাদি ভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। এই সকল ভাষায় তিনি অনর্গল ভাবে কথোপকথন করিতে পারিতেন। তাঁহার আদেশে আরবী ও ফারেসী ভাষার বহু গ্রন্থ হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়, এইরূপ হিন্দুদের পুস্তকের ফারেসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ভারতের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহাভারত'ও তাঁহারই আদেশে অনুবাদিত হয়। কাশ্মীর-রাজগণের ইতিহাস "রাজ-তরঙ্গিণী" তাঁহারই সময় লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল হয় নাই বলিয়া, আক্‌বর বাদশাহের সময় পুনরায় বিশুদ্ধ ভাষায় তাহার অনুবাদ করা হয়। কাশ্মীরের ইতিহাস (রাজতরঙ্গিণী)ও ফারেসীতে ভাষান্তরিত হয়।"

হিন্দুদিগকে উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করাও আক্‌বরের 'আবিষ্কার' নহে। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত বাদশাহ এব্রাহিম আদেল শাহ, সম্রাট আক্‌বরের ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে (৯৪২ হিঃ) সিংহাসনা-রোহণ করেন। এব্রাহিম আদেল তাঁহার রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই হিন্দুদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, এমনকি আফিস আদালতের ভাষাও ফারেসীর পরিবর্ত্তে হিন্দি করিয়াছিলেন। ফেরেস্তা বলিতেছেন :—"রাজ সেরেস্তা হইতে ফারেসী ভাষাকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দু ভাষা প্রচলিত করেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া তুলেন।" স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এব্রাহিম আদেল আক্‌বরের ন্যায়

ছিলেন না, পরন্তু খুব গোঁড়া মোসলমান ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

জায়েন-উল-আবেদীন, এব্রাহিম আদেল, আক্‌বর, ফিরোজশাহ, আবুমাআশার ফালাকী, আবুরায়হান বেরুনী, ফয়েজী, গোলাম আলী, আজাদ প্রভৃতি হিন্দুদের ভাষা ও সাহিত্যের যে সেবা করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয়—হিন্দুগণ মোসলমানদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার শতাংশের নয়—সহস্রাংশের এক অংশও করেন নাই।

মোসলমানগণ কেবল হিন্দুদের সাহিত্য এবং দর্শন ইত্যাদিকেই সমাদর ও সম্মান করিতেন না, হিন্দুদের দেশ—ভারতবর্ষকেও তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

'মসালেকুল আব্‌সার' নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে :—

"ভারতভূমি এক বিরাট মহিমান্বিত দেশ। তাহার বিস্তৃত সীমা, বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিশাল বাহিনী এবং অতুলনীয় শাসন-প্রণালীর সহিত কোন দেশেরই তুলনা হইতে পারে না।

"যে দেশের জলে মুক্তা, স্থলে স্বর্ণ, পর্ব্বতে হীরক ও পদ্মরাগ, অধিত্যকায় অগুরু ও কর্পুর, উপত্যকায় জাফ্রান, খনীতে পারদ লৌহ ও সীসক, অরণ্যে হস্তী ও গণ্ডার এবং লৌহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তরবারি; যে দেশের উৎপন্ন অফুরন্ত, সৈন্য অসংখ্য এবং রাজা ন্যায়পরায়ণ; সে দেশ সম্বন্ধে অধিক কি বর্ণনা করা যায়। ভারতবর্ষের বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিতে হইলে বহু খণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে।" হাজিরাতুল কোদস্, ৩৭৮, ৩৭৯ পৃঃ।

যাঁহারা মোসলমানদের লেখা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, মোসলমানগণ কেবল নিজে ভারতবর্ষকে ভাল বাসিয়া ও সম্মান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পরন্তু ভারতভূমির গৌরব ও সম্মান সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা হাদিস পর্য্যন্ত রচনা করিয়া, তফ্‌সীর ও হাদিসের গ্রন্থে যত্নের সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আজাদ বেল্‌গ্রামী তাঁহার 'গেজ্‌লানুল হেন্দ' নামক পুস্তকের উপক্রমণিকায়, রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"স্বর্গাদপি গরীয়ান হিন্দুস্থানের বর্ণনা তফ্‌সীর ও হাদিসের গ্রন্থাবলীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।"

আল্লামা জালালুদ্দীন সায়ুতী তফ্‌সীর 'দুরের মন্‌সুরে' এবনজারীর, হাকেম, বয়হাকী এবং এবন আসাকের হইতে, হজরত আলীর এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল বায়ু ভারতভূমির।"

তফ্‌সীর দোরের মনসুর বদউল্‌খাল্‌ক্ তারিখুল ওমামে ওয়াল মলুক গেজ্‌লানুল হেন্দ, শমামতুল আম্বার ফিম ওয়ারাদা ফিল হেন্দে মিন সই য়েদিল বশর, সাবহাতুল মরজান ফি আসারে হিন্দুস্তান, এবং হাজীরাতুল কোদস্ ইত্যাদি গ্রন্থে বহু রেওয়ায়াৎ (Tradition) উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, হজ্‌রত আদম বেহেশৎ হইতে বহির্গত হইয়া, ভারতবর্ষেই আগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং ভারতের গগনেই সর্ব্বপ্রথম নবুওয়াতের সূর্য্য উদিত হইয়াছিল।

মীর গোলাম আলী ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তিনি বলিয়াছেন :—ভারতবর্ষেই নুরে মোহাম্মাদীর বিকাশ হইয়াছে। কারণ বিশ্বস্ত হাদিস-সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নুরে মোহাম্মাদী হজ্‌রাত আদমের নিকটে গচ্ছিত ছিল। হজ্‌রাত আদম সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন; সুতরাং নুরে মোহাম্মাদীর প্রথম বিকাশ ভারতবর্ষে—তৎপরে আরবদেশে। ইহা অপেক্ষা সম্মানের ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

হজ্‌রাত আদম সর্ব্বপ্রথম ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই রেওয়ায়াত অবলম্বন করিয়া জনৈক কবি লিখিয়াছেন :—

"এ ভারত স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম বিনিময়। দেখ, আদম স্বর্গ হইতে এই ভারতেই নিপতিত হইলেন।"

অন্য একজন বলিতেছেন :—

"ভারতের উদ্যান যদি স্বর্গাপেক্ষা অধিকতর মনোরম না হইত, তবে আদম স্বর্গের সুখ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিলেন কেন?"

যদিও এই-সকল হাদিস এবং রেওয়ায়াৎ মাওজু ও প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, মোসলমানগণ ভারতবর্ষকে কি চক্ষে দেখিতেন।

হিন্দুদের বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্বন্ধে মোসলমানদের মনের ভাব কিরূপ ছিল?

শায়েখ আলী রুমী তাঁহার 'মোহাজেরাতুল আওয়ায়েল' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন :—

"সর্ব্ব প্রথমে যে দেশে গ্রন্থাদি লিখিত হয়, এবং যে স্থান হইতে জ্ঞানের উৎস-সমূহ প্রবাহিত হয়, তাহা ভারতবর্ষ।"

দার্শনিক জামাল উদ্দীন ফেক্‌তী 'আখ্‌বারুল হোকামা' গ্রন্থে লিখিতেছেন :—"ভারতবর্ষকে চিরকাল সকল জাতি জ্ঞানের খনি এবং ন্যায় ও রাজনীতির প্রস্রবণ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।"

আজাদ বেল্‌গ্রামী 'গেজ্‌লানুল্ হেন্দ' পুস্তকে লিখিতেছেন :—

"অঙ্ক এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে ভারতবাসীরাই অগ্রণী। তাঁহারা এই দুই বিষয়ের এরূপ উন্নতি করিয়াছেন যে, তাহার অধিক সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। অন্যদেশবাসীগণ অঙ্ক-শাস্ত্রের অধিকাংশ নিয়ম ভারতীয়দের নিকটে শিক্ষা করিয়াছেন।"

এই গ্রন্থেরই অন্য স্থানে লিখিত হইয়াছে :—"ভারতীয় পণ্ডিতগণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্ভাবনায় আরবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই, পারসীকদের নিকটও কৃপা-ভিখারী হন নাই। ইহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যে যুগে জ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল, ইতিহাস তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম।"

ভারতবিখ্যাত তাপস মির্জ্জা জানেজা (র) হিন্দু পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—"সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা, যোগ, ধ্যান এবং দার্শনিক জ্ঞান ও গবেষণায় হিন্দুদের বিশেষ কৃতিত্ব আছে।"

আজাদ বেলগ্রামী গেজ্‌লানুল্ হেন্দ পুস্তকের ভূমিকায় গ্রন্থের যে-সকল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে দুইটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

"৩য় কারণ এই যে—ভারতীয় সাহিত্যের কোন কোন ভাব ও অলঙ্কার-শাস্ত্র আরব্য ভাষায় অনুদিত করিতে হইবে। ৪র্থ এই যে—'নায়িকা ভেদ' বিষয়টি আরবীতে ভাষান্তরিত করিতে হইবে, এবং ভারতীয় সাহিত্যের এই অপূর্ব্ব দ্রব্যটি আরবী-ভাষীদিগকে উপহার দিতে হইবে।"

মোসলমান আলেমগণের মতে হিন্দু শাস্ত্রকারগণই কাফের নহেন, পরন্তু তাঁহাদের অনেকেই জ্ঞানী, ঋষি, মোজ্‌তাহেদ এবং নবী ও রসুল। মোসলমানদের অন্যতম ধর্ম্মনেতা মহাত্মা মজহার জানেজাঁ তাহার মকতুবাতে লিখিতেছেন :—

"কোরআন মজিদের 'এবং এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে সতর্ককারীর (নবীর) আবির্ভাব হয় নাই' 'এবং প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল প্রেরিত হইয়াছেন' ও অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষেও নবী ও রসুল প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা হিন্দুদের গ্রন্থে নির্ভুল রূপে বর্ণিত আছে। ভারতীয় নবীদের গ্রন্থাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহাদের জ্ঞান অতি গভীর এবং শিক্ষা খুব সম্পূর্ণ ছিল।" ৪৯২ পৃষ্ঠা।

সোল্‌তান ফিরোজ শাহ হিজ্‌রী ৭৭২ সালে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি যে সময় কাংড়া অধিকারের জন্য অভিযান

করিয়াছিলেন, সেই সময় জ্বালামুখীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার পুস্তকালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। 'সিয়ার-উল মাতা আক্কেরীন' ইতিহাসে এই ঘটনার বিবরণে লিখিত হইয়াছে :—

তথায় (জ্বালামুখীতে) প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক রচিত বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। [ফেরেস্তা বলিয়াছেন, গ্রন্থের সংখ্যা ১৩০০, তন্মধ্যে কতগুলির অনুবাদ করা হয়। ২য় অধ্যায় ১৪৮ পৃঃ।] সোল্‌তান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করেন,এবং গ্রন্থের ভাব ও বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হন। ঐ ভাবগুলি সহজে সকলের বোধগম্য হয় এই উদ্দেশ্যে, তন্মধ্য হইতে কতিপয় পুস্তক ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। মাওলানা আ'আজ্‌জুদ্দীন তদনুযায়ী, একখানি দর্শন-শাস্ত্রের পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া, পদ্যে তাহার অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের নাম "কেতাবে ফিরোজশাহী" রাখা হয়। সোল্‌তান ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হন ; এবং অনুবাদককে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ও জায়গীর (ভূসম্পত্তি) দান করেন। এই গ্রন্থের বিষয়গুলি লইয়া সোলতানের সভায় অনেক সময়ে আলোচনা হইত।"

হিন্দু সাহিত্য এবং শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে মোসলমানগণ রাজ অনুগ্রহ, সম্মান, অর্থ এবং ভূসম্পত্তী প্রাপ্ত হইতেন, ধর্ম্মদ্রোহী (কাফের) বলিয়া লাঞ্ছিত হইতেন না।

(আল্‌-এস্‌লাম, ফাল্গুন) মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী।

হতচ্ছাড়া

জুজুর নামে ভয় পায় না এমন ছেলে-মেয়ে বাংলাদেশে বেশী মিলে না, আবার দুই একটা নষ্ট ছেলে জুজুকে প্রত্যক্ষ করিতেও চাহে। খতাইয়া দেখিলে মুখুজ্যেদের বাড়ীর ফটিকচাঁদ হয়ত শেষোক্ত পর্য্যায়েই পড়িবে।

তিলফুল জিনি নাসা এবং চম্পক জিনিয়া বর্ণ, এক কথায় আখ্যায়িকার নায়কের পক্ষে যাহা একান্ত না হইলেই নয় এমন সব বালাই ফটিকচাঁদের ভিতর ছিল কি না খবর রাখি না ;—তবে তাহার পেশীবহুল আঁটাসাটা দেহ, মাথায় একরাশ ঝাঁক্‌ড়া চুল আর বড় বড় দুইটি চক্ষুর কৃষ্ণ তারকার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা এই বাংলা দেশে একটু বিশেষ করিয়া চোখে ঠেকে। বৈদিক পিতামহগণ হইতে তাঁহাদের ধ্যানস্তিমিত নেত্রের নিস্পন্দতার পূর্ণতম অংশটুকু যে আমরাই বিশেষ করিয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছি তাহা সম্পূর্ণ মানিলেও মুখুজ্যেদের ফটিকচাঁদ কেমন করিয়া যে সেই নিজস্ব পরম সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইল তাহা বুঝিতে পারি না।

সত্য কথা সরলভাবে স্বীকার করিলে ফটিকচাঁদকে তাহার পাঠাপুঁথির সুবোধের মত সুশীল আখ্যা দেওয়া চলে না।

বাগ্‌দেবীর সহিত সম্যক পরিচয় করিতে হইলে অস্মদ্দেশে যে দৌবারিকটির স্মরণাপন্ন হইতে হয়, তাঁহার হ্রস্বায়মান বেতসী যষ্টিখানা ফটিকের তেমন উপকারে আসিল না। বর্ণমালার 'ক' এবং 'খ'এর মধ্যে কি যে ছাই পার্থক্য তাহা সেদিন অনেক চিন্তা করিয়াও ফটিকচাঁদ ঠাহর করিতে পারিল না। জীবনীসংগ্রাহক ইহা হইতে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার সাম্যদর্শনের প্রামাণ্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলেও, আত্মীয় স্বজন মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিলেন না। এবং অবশেষে ইহা স্পষ্ট অবধারিত হইল যে বিধাতা তাহার অতিবড় মস্তকের মগজের অভাবটুকু কোন এক অতি পবিত্র গব্য দ্বারা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে সকলেই যখন হাল ছাড়িল, ফটিকচাঁদ তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পাঠশালার চারিটি বেড়ার গণ্ডী হইতে যে দিন ফটিকচাঁদ নিজেকে মুক্ত মনে করিল, সে দিন তাহার জীবনে একটি বিশেষ আনন্দের দিন। মুক্তির আনন্দ তাহাকে এতই পাইয়া বসিল যে তাহার ভাগ্যের উপরওয়ালা তাহার অতি দূর-সম্পর্কীয়া পিসিরূপ জীর্ণ বাঁধনটিও ছিন্ন করিয়া দিলেন!

পাড়াগাঁয়ে একটা সুবিধা এই যে সৃষ্টিকর্ত্তা যাহাকে আত্মজন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এমন লোকের কেবল মাত্র বোধ হয় অহেতুক স্নেহের টানেই আত্মীয় বান্ধব অনেক জুটে। ফলে, ব্যক্তি-বিশেষের না হইয়া বেওয়ারিশী ভাবে সে গ্রামের সর্ব্বসাধারণের হইয়া দাঁড়ায়। আত্মীয়তার বোঝাই তখন তাহাকে কেবল বহিতে হয় না, আনুসঙ্গিক ছোটখাট দুই একটা ফাই-ফরমাস হইতে আরম্ভ করিয়া ধান-চালের বড় বড় বস্তাগুলিও ক্রমে মাথায় চাপিতে থাকে। এবং সমর্থ বয়সে না খাটিতে শিখিলে ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকার এই-সমস্ত অমূল্য উপদেশ শুধু আত্মীয়তার খাতিরেই ও তাহার অতিবড় হিত করিবার উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ও-পাড়ার মাতব্বর তারাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন হিসাব করিয়া দেখিলেন যে যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে চাকরটির খোরাক ও মাহিয়ানা

অতি অতিরিক্ত। কাজেই এমন একজন আত্মীয়ের তাঁহার বড়ই প্রয়োজন হইল যে তাঁহাকে চাকর পোষার দায় হইতে সহজেই মুক্তি দিতে পারে, এবং একদিন এই বৃদ্ধের বাৎসল্যরস উথলিয়া উঠিয়া সহসা ফটিকচাঁদকে অভিষিক্ত করিতে চাহিল। সুযোগমত একদিন তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে তাহার পর নহেন এবং কি সম্পর্কে যে কি হয়েন তাহা বিশেষ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। কাজকর্ম্ম? আরে রামঃ! ছোট ছোট ছেলে-পিলেদের একটু দেখা শুনা—আর সে কথা বল্‌তেই বা হবে কেন; গরু কয়টাকে একটু নাড়াচাড়া—আরে সে ত পরলোকের কাজ, সে আর কয় জনের ভাগ্যে হয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইহা বলাই বাহুল্য যে স্বেচ্ছাচারী ফটিকচাঁদ এই নিছক স্নেহের টান তেমন জোর করিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিল না। ফলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখ হইতে যে-সব ভাষণ বাহির হইল তাহাকে আর যাহাই হউক সু বলা চলে না। দুঃখের বিষয় এই বকাটে ছেলেটার সেজন্য একটুও আপ্‌শোষ হইতে দেখা গেল না।

অতি শৈশব হইতেই যখন ফটিক দেখিল যে গাঁয়ে বুদ্ধিমান বলিয়া যাহাদের খ্যাতি তাহারা তাহার স্থান গোল্লারূপ কোন এক অপূর্ব্ব লোকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত, তখন তাহার জীবনটাও কেমন ঐ এক ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল যেখানে কোনরূপ শাসন মানিয়া চলা জিনিসটার স্থান একেবারেই নাই। সংক্ষেপে ইহাই উত্তর কালের হতচ্ছাড়া ফটিক ঠাকুরের আদ্যলীলা!

(২)

বাল্যে দৈবজ্ঞঠাকুর ফটিকের জন্ম-লগ্ন মিলাইয়া তাহার অদৃষ্টের যে ফর্দ্দ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মর্ত্ত্যজীব মনুষ্য ত ছার, সদা ভ্রাম্যমান ব্যোমচারী গ্রহ-উপগ্রহগণও যে তাহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিল না তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ফটিক ঠাকুরের ইহা অজ্ঞাত ছিল না এবং অজ্ঞাত ছিল না বলিয়াই হয়ত স্বভাবকুটিল নিয়তির গতিরোধ করিতে কোন দিন কোন চেষ্টাও সে পায় নাই। অদৃষ্টের চাকাটা তাহার আগে আগে আপন নির্দ্দিষ্টপথে ছুটিতেছিল আর ফটিক ঠাকুর একেবারে নির্ব্বিকারচিত্তে স্রোতে-টানা খড়কুটার মত বেশ একটানা ভাসিয়া চলিতেছিল। উদ্দাম দুই একটি তরঙ্গের প্রবল আঘাত আসিয়া কোন দিন তাহাকে একটুকুও চঞ্চল করে নাই এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ফটিক ঠাকুর তাহার পাথরের মত ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার তেমনি দ্বিধাশূন্যচিত্তে সমানভাবে তাহার অনুসরণ করিয়াছে। এইরূপে ফটিকঠাকুর তাহার জীবনের ত্রিশটি বৎসর অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিল।

বাধাহীন ফটিক ঠাকুরের এইরূপ চলিবার পথে কোন-রূপ অসুবিধাও ছিল না, কারণ তাহার অদৃষ্টের দেবতাটি বাধনের দড়াদড়ি আগু হইতেই বেশ পরিষ্কার করিয়া কাটিয়া রাখিয়াছিলেন। ভগবান তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বভাবটা তাহার ছিল এমনি কু যে ভগবানের বিধানের উপরও কারিকুরি খাটাইতে সে চাহিত। বেকার জীবনটা তাহার শেষে আশ্রয় পাইল তাহার মতন বেকারদের সেবায়। যতরাজ্যের লক্ষ্মীছাড়া ও হতভাগ্যদের লইয়াই যেন তাহার কারবার! ওপাড়ার নাপিত-বুড়ীকে ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার না দেখিলেই নয়, কারণ কবে বুড়ী মরিয়া ঘরের ভিতর পচিয়া থাকিবে আর পরে তাহাকেই ত তাহা কাঁধে করিতে হইবে। একঘরে হইলে কি হয়, আহা উমাপদ ঘোষ যে বড় গরীব। মড়াপোড়ার ঘাটে ত তারই থাকা চাই-ই। উঃ, সেবার কামার-খুড়ীর বিধবা মেয়েটা ক্ষোভে দুঃখে গলায় দড়ি দিয়াছিল; সে হতভাগিনীর জীবনের সে করুণ ইতিহাসটি সে কি আর এত সহজেই ভুলিতে পারে, সে যে তাহার পাথরের মত হৃদয়ের পাতেও চিরদিনের তরে একটা রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। কলঙ্কিতার মৃতদেহটা স্পর্শ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিবার মত লোক যখন একজনও মিলিল না, বখাটের সেরা এই ফটিক ঠাকুরই যে তখন কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়া পড়িয়াছিল! বামুনের ছেলে হইয়াও যত ছোটলোক ইতরের সঙ্গে যাহার সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক, আর ডোম-মুদ্দোফরাসের কাজই যাহার পেশা, এহেন ফটিক ঠাকুরকে দুঃখী পতিত আর নিরাশ্রয় ছাড়া আর-কাহারও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লোকের 'অনুরাগ' ছিল তাহার উপর যথেষ্টই। ইহাতে তাহার বড় কিছু আসিয়া যাইত না, কারণ সংসারে সে ছিল একা

এবং পীড়ন সহিবার ও না দমিবার শক্তিও তাহার ছিল প্রচণ্ড। সে যে কেন বিবাহ করে নাই এবং বিবাহের উপর তাহার কোনরূপ বীতশ্রদ্ধা ছিল কি না তাহা স্বরূপ বলিতে পারিব না; তবে মনে হয় হয়ত সে নিজকে এতদিনে পাঁচজনের মাপকাঠিতে চিনিতে শিখিয়াছিল এবং হয়ত খামাখা অসহায়া নির্দ্দোষ একটি বালিকার অদৃষ্টকে নিজ অদৃষ্টের সহিত যুক্ত করিয়া চিরদিনের মত ভারাক্রান্ত করিতে তাহার মন সরে নাই!

(৩)

পাড়ার বহুদর্শী লোকেরা ফটিক ঠাকুরের জন্য যে লোকের ব্যবস্থা করিয়াছিল সেই অভিমুখে সে কতখানি বেগে অগ্রসর হইতেছিল তাহা দেখিবার তাহার সময়ই হইল না যে দিন হইতে তাহার মজুর বৃদ্ধ করিম মিঞার ফুলের কুঁড়ির মত ছোট্ট নাত্‌নিটি আসিয়া তাহার কোলকে কায়েমী করিয়া তুলিল।

বাড়ীতে সকলে তাহাকে ফুলি বলিয়া ডাকিত। তবে তাহার নামটি যে ঠিক কি ছিল ফটিক ঠাকুর তাহা অনেক ভাবিয়াও নির্ণয় করিতে পারিল না। তাই সে নূতন নাম-করণ করিল 'ফুল'।

ফুল বড় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ফটিক ঠাকুরের ভাবনা হইল ফুলকে লেখাপড়া শিখাইবে সে কেমন করিয়া? তখন সে বই কিনিয়া নিজেই লেখাপড়া শিখিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

তাহার ফুল যখন ক্রমে এক পা দুই পা করিয়া চলিতে শিখিল তখন হইতেই সে নিয়তই তাহার কোলের পুঁথি টানিয়া, ছবির পাতা উল্টাইয়া তাহার নিঃসঙ্গ অবসন্ন জীবনটাকে যেন সজীব করিয়া তুলিল।

ক্রমে সে বড় হইল, তাহাদের সমাজের রীতি অনুসারে অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিবার বয়স তাহার পার হইয়া গেল, তবুও তাহার এই মূক সঙ্গহীন দাদাটির সঙ্গ ছাড়িবার কথা সে কোনদিন ভাবিতে পারিল না এবং বৃদ্ধ করিম মিঞাও ইহাতে দোষ দেখিতে পাইল না। দুপুর বেলায় ছোট্ট মাদুরটি পাতিয়া স্লেট্ পেন্‌সিল লইয়া কেবলমাত্র তাহার দাদাটিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই যখন সে না জানি কত মনোযোগী ছাত্রীর মত অধ্যয়নে আসক্তি দেখাইত, তখন ঠাকুর মধ্যে মধ্যে নিজের পড়া বন্ধ করিয়া তাহার সেই স্নেহনিবিড় মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া দেখিত।

চির-উদাসীন ফটিকঠাকুরের অবস্থা এমনতর হইয়া পড়িল যে তাহার নিজের সংসারের কোথায় যে কি আছে তাহাও ক্রমে তাহার জ্ঞানের বাহিরে যাইয়া পড়িতে লাগিল। এবং এ-সময় ও-সময়, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, তাহার ফুলের দুইটি নিপুণ হাতের সোনার কাঠির পরশ ছাড়া যেন তাহার সংসার অচল হইয়া পড়িবে এমন সম্ভাবনা দেখাইতে লাগিল।

সময় ও সংসার কাহারও সুবিধা অসুবিধা মানিয়া চলে না। তাহার যে ফুল একদিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল তাহার এই অসহায় দাদাটিকে ফেলিয়া সে কোথায়ও যাইতে পারিবে না, নির্ম্মম বাস্তব জগতে নামিয়া সে দেখিল তাহার সেই ফটিকদার উপর যে স্নেহ নিষ্ঠা ও ভক্তি বুঝি তাহাই মায়িক, বুঝি তাহাই অসত্য। অর্থাৎ এক শুভক্ষণে তাহার বিবাহ হইয়া গেল এবং সত্য সত্যই কত সুখে দুঃখে স্নেহে মমতায় ঘেরা, শৈশবের কত হাসি-কান্নায় জড়ানো, সেই চিরপুরাতন অথচ চির মধুময় আবাস ছাড়িয়া কোন্ অচেনা অজানার উদ্দেশে তাহাকে যাত্রা করিতে হইল।

গদ্যময় ফটিকঠাকুর চির অভ্যস্তের মত আবার তাহার সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পুঁথিগুলির ধূলা ঝাড়িতে লাগিয়া গেল। এবং আবার সেই কাহার ঘরে কিসের অনাটন, কাহার বাড়ীতে দুই ক্রোশ দূর হইতে দুপুর রাত্রে বৈদ্য ডাকিতে হইবে, এই লইয়া ভবঘুরে ফটিকঠাকুরের সেই সনাতন কবিত্বহীন জীবন বেশ্ চলিতে আরম্ভ করিল।

(৪)

সে বছর বৈশাখ মাসে গরমও পড়িয়াছিল যেমন অতিরিক্ত আর খালবিল শুকাইয়া চাষীদের জলকষ্টও হইয়াছিল তেমনি। সাথের সাথী বিসূচিকাদেবী ক্ষুদ্র দুগাজানি গ্রামটির মুসলমানপাড়া জুড়িয়া নিত্য প্রতাপ জারি করিতে কোন কসুর করিলেন না। চারিদিকে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। শবদেহগুলি মাঠ ঘাট পূর্ণ করিয়া তাহাদের পলকহীন বিস্ফারিত দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলিয়া দুঃখ বেদনার শেষ কাহিনী কাহার পায়ে নিবেদন করিয়া

নিঃস্রোত ক্ষীণ লৌহজংএর জলে ভাসিতে লাগিল এবং পচিতে লাগিল।

করিম মিঞার রোগের সংবাদ যখন ফটিক ঠাকুরের নিকট পৌঁছিল, সেই অবধি যে সে নীরবে এই দুঃস্থ পরিবারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মৃত্যুর দেবতার সহিত প্রাণপণে এমন যুঝিলে যে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সে ভঙ্গ দিল না। মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সহস্রযন্ত্রণাময় এক চিন্তা যখন শ্রান্ত বৃদ্ধকে ক্ষণেকের জন্যও সোয়াস্তি দিতেছিল না, সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাহার হতাশ দুইটি চক্ষু যাহার উপর পড়িল এবং যাহার উপর পূর্ণ নির্ভর খুঁজিল তিনি আকাশের কোন দেবতা নহেন। মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও একটা অসীম নির্ভর ও একটা তৃপ্তির নিশ্বাস পশ্চাতে ফেলিয়া করিম মিঞা চক্ষু মুদিল।

এই রোগের আক্রমণে করিম মিঞার দুই পুত্র পত্নী ও জামাতা ইহলোক হইতে বিদায় লইল। তালিকায় বাকী রহিল জরাজীর্ণা অতি বৃদ্ধা মাতা ও ছিন্নমুকুলের মত সদ্যবিধবা ষোড়শবর্ষীয়া নাত্‌নী ফুলি। ফটিকঠাকুরের মনটাই ছিল এমন যে দুঃখ দেখিলেই প্রাণে বাজিত, বড় ও ছোটর তারতম্য তাহার মনে স্থান পাইত না। বোধ হয় সেই কারণেই তাহার ফুলের জন্যও তাহার প্রাণে দয়ার অভাব হইল না। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ফুলি যেদিন পথে দাঁড়াইল, ফটিকঠাকুর তাহার দুই স্নেহকর বাড়াইয়া সেই দুঃসহ ভার তুল্যাংশে বাঁটিয়া লইল।

বছরের ঢেউয়ের সঙ্গে ফুলির মুখে আবার হাসি দেখা দিল। আবার সে একে একে তাহার দাদার এলোমেলো সংসারটি গুছাইয়া হাতে তুলিয়া লইল। আবার সেই শৈশবের অতি বাধ্য ছোট বোন্‌টির মত তাহার পুঁথিপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল, তাহার নিকট হইতে পড়া বুঝাইয়া লইতে লাগিল। ফুলিদের বাড়ী হইতে ফটিক ঠাকুরের ঘর বেশী দূর ছিল না, কেবল মাঝখানে একটা ছোট্ট বাগানের মত একটা বাঁশঝাড় পার হইতে হইত। উভয়ের বাড়ীই গ্রামের এক সীমান্তে ছিল, কাজেই লোকে তখনও এ সম্বন্ধে তেমন চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। মান অভিমান আদর আব্দার লইয়া দিনগুলি তাহাদের বেশ্ কাটিতেছিল। কিন্তু বুঝি গ্রহ-উপগ্রহদের কড়া নজর তখনও ফটিকঠাকুরের অদৃষ্টকে আচ্ছন্ন করিয়াই ছিল।

(৫)

এই নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিটি মাঝে আসিয়া না পড়িলে দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ পরম বৈষ্ণব মৃগাঙ্ক বাবুর ক্ষুদ্র সাধটি যে ততদিন অপূর্ণ থাকিয়া যাইত না একথা যেদিন পাইকের সেরা কৈলাস চাঁড়াল আসিয়া নানা বর্ণনা সহকারে বিবৃত করিল সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার-বাবুর মস্তকের ভিতর যে ভাবোদ্রেক হইল হয়ত তাহা নিতান্ত সদিচ্ছা-প্রণোদিত নহে।

পরদিবস ঠিক খড়ের ঘরে আগুনের মত বৈঠকখানায় চণ্ডীমণ্ডপে এবং স্নানের ঘাটে এমন একটি রুচিকর সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে যাহার টীকা টিপ্পনীর জের মিটিতে সপ্তাহখানেকেরও বেশী লাগিয়া গেল।

এই-সব পাপের আলোচনায় যখন লোকের ধর্ম্মকর্ম্ম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবার জোগাড় হইল, তখন একদিন চৌধুরীবাবুদের ব্রজেন্দ্রবাবুর পাশার আড্ডায় গ্রামের গণ্যমান্য মুরুব্বি লোকেরা প্রতিকারের জন্য সমবেত হইলেন। নানা হট্টগোল চলিতে লাগিল, যাহার যেরূপ অভিরুচি এবং অভিজ্ঞতা সে সেইরূপই বলিতে লাগিল। দিন দিন গরুর দুগ্ধ যে কেন কমিয়া যাইতেছে, ধরিত্রীদেবী যে আর কেন আগের মত শস্য দান করেন না, কলির পরমায়ু যে কেন ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, তাহার অকাট্য কারণ আলোচিত হইল। উপসংহারে চাটুজ্যে-মহাশয় এইরূপ পাপ এবং অনাচারের ভার দেবী বসুন্ধরা যে সেদিন পর্য্যন্তও কেমন করিয়া বহন করিতেছেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই ফটিক ঠাকুর সমাজচ্যুত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন্ অশুভক্ষণে যে জাতি নামক পদার্থটি হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছিল হতভাগ্য ফটিক-ঠাকুর তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশপুরুষ কস্মিন্‌কালে তাম্রকূটরূপ মহাদ্রব্য স্পর্শ না করিলেও তাহাকে হুঁকাপ্রদানের নিষেধাজ্ঞা প্রচার হইয়া গেল।

পল্লবিত হইয়া কথাটি ফুলির কানে পৌঁছিতেও বেশী

সময় লাগিল না। ঘৃণার অপমানে তাহার পায়ের ডগা হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে লাগিল।

তারপর বন্ধ ঘরের বাতাস তাহার কাছে অসহনীয় হইয়া উঠিল। এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে সঙ্কুচিতভাবে সে ফটিক ঠাকুরের দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। ফটিক ঠাকুর নির্ব্বিকার চিত্তে প্রদীপটি জ্বালাইয়া তখন অতি নিবিষ্টমনে কি একখানা পুঁথি পাঠ করিতেছিল। ফুলি দরজার ফাঁক দিয়া সেই অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় চাহিয়া দেখিল সে মুখ তেমনি প্রশান্ত, সে চোখ দুইটি তেমনি আয়ত, কুণ্ঠা বা লজ্জার অতি ক্ষীণ ছায়াও তাহাতে প্রতিফলিত হয় নাই। গভীর ভক্তিভরে তাহার দুইটি হাত জোড় হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়ের সকল ক্ষুব্ধ চঞ্চলতাকে এই বিরাট মহিমাময় চরিত্রের সম্মুখে শান্ত করিয়া লইয়া একবার মাথা অবনত করিল।

আজ ইহাতেও যেন তাহার তৃপ্তি হইল না। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া ঠাকুরের দুইখানি পায়ের নীচে বিপুল কেশভারসহ মস্তকখানি লুণ্ঠিত করিয়া দিল। ঠাকুর চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মাথার উপর দুইখানি স্নেহহস্ত রক্ষা করিয়া হাসিয়া কহিল "একিরে?" ফুলির চোখে জল ছল্‌ছল্‌ করিল। ফুলি কহিল "দাদা, শুধু আমার জন্যেই যখন তোমার ওপর এই অত্যাচার, আমি তা কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। তুমি আর আমার দিকে ফিরে চেয়ো না। যিনি সকলকে দেখেন তিনি নিশ্চয়ই আমায়ও ফেল্‌তে পার্‌বেন না।" মুহূর্ত্তে ফটিক ঠাকুরের হাস্যময় মুখ গম্ভীর হইল। কহিল "না ফুল, এই একটা বিষয়ে আমি ভগবানের উপর ভার দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পার্‌ব না।" ফুলি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। ফটিক ঠাকুর আবার তেমনি সহজ কণ্ঠে কহিল "ওরে ফুল, মিছামিছি ভাবিস্‌ না; যা শুধু কাল্পনিক, তাকে নিজের মনে বাস্তব করে তুলে, যে দুঃখ রচনা করে, বল্‌ দেখি তার জন্যে দায়ী সে নিজেই কি না।"

তখন একটা দুইটা করিয়া নিবিড় আকাশে তারার ফুল ফুটিতেছিল। ফটিক ঠাকুর খোলা জানালা দিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কহিল "চেয়ে দেখ দেখি বোন্‌, ঐ যে অযুত চক্ষুর প্রশান্ত দৃষ্টি আমাদের উপর আশীর্ব্বাদের মতন বর্ষিত হচ্ছে, সেই দৃষ্টির সম্মুখে আমরা মুক্ত এই আশ্বাসই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়!" ফুলি আর-একবার সেই অগাধবিশ্বাসভরা নির্ম্মল মুখখানির দিকে চাহিয়া সম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল।

কিন্তু হইলে কি হয়, নারী চিরদিনই নারী! অভিমানিনী বালিকা তাহার নারীত্বের অবমাননা নির্ব্বিকারভাবে সমানে সহ্য করিয়া আসিতে পারিল না।

গ্রামে হৈচৈ পড়িয়া গেল, সেদিন খামাখা কামার-ছুঁড়িটা গলায় দড়ি দিল, আজ আবার মোছলমান-ছুঁড়িটা এই কাণ্ড বাধাইল। নানা আলোচনার পর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহা বুঝিল যে ছলাকলাময়ী নারীর এই মরণ ব্যাপারটার মধ্যেও একটা ভান রহিয়া গিয়াছে!

(৬)

গভীর নিশীথে অরণ্যানীর প্রান্তভাগে একটি লোক ধীরে ধীরে ভূমি খনন করিতেছিল। শবাধারে একটি নারীর মৃতদেহ শয়ান। স্ফুট চন্দ্রালোকে কবর-খননকারী লোকটির স্কন্ধের যজ্ঞোপবীত তখনও ধব্‌ধব্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। আর পার্শ্বে একমাত্র সঙ্গী একজন মুসলমান মোল্লা নীরবে দণ্ডায়মান ছিল।

ভূমি খনন শেষ হইলে লোকটি শবাধারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার উপর তাহার পলকহীন চক্ষু দুইটির দৃষ্টি স্থাপন করিল। মনে হইল সেই নিস্তব্ধ নিশীথে শূন্য প্রান্তরে আকাশভরা জ্যোৎস্নাকে যেন সেই দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তেই নিষ্প্রভ করিয়া দিল। তাহার নিকট তখন পৃথিবী নাই, আলো নাই, বাতাস নাই। মনে হইল এক বিরাট নিস্তব্ধতা আসিয়া যেন এখনই সমস্ত বিশ্বচরাচরকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে!

মোল্লা ধীরে ধীরে যথারীতি মৃতার শেষকৃত্য সমাপন করিল। তারপর বহু আদরের বহু যত্নের ধনটিকে চিরদিনের দুর্ভেদ্য মৃত্তিকার কারাগারে নিহিত করিবার সেই নিদারুণ ক্ষণ যখন উপস্থিত হইল, তখন মোল্লার আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিল। পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা যেন ক্ষীণ ভাবে দূর স্বপ্নাগতের মত স্মরণ হইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল তাহাকে যে এখনও আশীর্ব্বাদ করাই

হয় নাই,—যেমন করিয়া একদিন এই পৃথিবীর ধূলিতে থাকিতে হাসিকান্নার মধ্য দিয়া বিদায়ক্ষণে স্নেহময় দুইখানি হাত তাহার মাথার উপর রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছে। কঠিন বাস্তবতার আঘাতে আবার তাহার চমক ভাঙ্গিল, এখন যে আর তাহাকে ছুঁইবার অধিকার তাঁহার নাই—পৃথিবীর সব মায়া, সব বন্ধন কাটিয়া দিয়া এখন যে তাহাদিগের মধ্যে দুশ্ছেদ্য অনন্ত ব্যবধান! শুধু তাহার সেই অসহায় বিষাদ-করুণ দুইটি চক্ষুর অর্থভরা দৃষ্টি ফুলের কবরের উপর নিবদ্ধ রহিল। –

হে নির্ম্মলা, হে শুচিস্মিতা, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। অন্তরীক্ষের পরপার হইতে আজিও তেমনি তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ করখানি বাড়াইয়া দাও এবং তাহা গ্রহণ কর যাহা অমৃত—চির অনাহত।

দুগাজানি গ্রামের বনের পাখীরা প্রভাতী গাহিল, গৃহস্থেরা ঈশ্বরের নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিল। কেবল উঠিল না ফটিক ঠাকুর। সংসার-পথের পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের বুঝি এতদিনে পারের খেয়ার সন্ধান মিলিয়াছে।

নূতন উষার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ফটিক ঠাকুরের দুয়ারে তেমনি ঘা পড়িল, দুঃখী ও দুঃস্থ সংসার আজিও তেমনি পিছন হইতে মাথা কুটিতেছে—ঠাকুর! ঠাকুর!

কেবল তারাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় চৌধুরীবাবুদের পাশার আড্ডা হইতে ফিরিবার সময় সংবাদটি পাইয়া এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কোন একটি বিশেষ ঘটনার সহিত মিলাইয়া উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "নারায়ণ তার বিচার করেছেন,—নচ্ছার, বখাটে, হতচ্ছাড়া!—"

শ্রীশিবশঙ্কর রায়চৌধুরী।

হিন্দুস্থান সিনেমা ফিল্‌ম্‌স্‌

হিন্দুস্থানেরই উপদেশ—উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ। অথচ সারা হিন্দুস্থান কাপুরুষের মতন দৈবের মুখ চাহিয়া নিরুদ্যম হইয়া দারিদ্র্যের অন্ধতামস গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। এই অনুদ্যমতা পরিহার করিয়া যে পুরুষসিংহ নূতন ব্রতে যত্নবান হন তিনিই লক্ষ্মীকে লাভ করেন। এই জাতীয় পুরুষ শ্রীযুক্ত

শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় গোবিন্দ ফল্‌কে

দত্তাত্রেয় গোবিন্দ ফল্‌কে। ইনি সাহস করিয়া ভারতবর্ষেই চলন্ত ছবির ফিল্‌ম্ তৈরী করিবার কাজে লিপ্ত হইয়া দেশে একটি নূতন ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ও নিজে ধনবান হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ফল্‌কে ভারতবর্ষে প্রথম চলন্ত ছবির ফিল্‌মে নাটক অভিনয় তুলিয়া বায়োস্কোপ থিয়েটারে প্রদর্শন করিবার পথ দেখাইয়াছেন। তাঁর তোলা হরিশ্চন্দ্র, সাবিত্রী-সত্যবান, লঙ্কাদাহন, মোহিনী-ভস্মাসুর প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানের অভিনয়াত্মক চলন্ত ছবির বিষয় বায়োস্কোপ-দর্শক অনেকের নিকটই সুপরিচিত। তিনি এইরূপ এক কুড়িরও বেশী পালা অভিনয় করাইয়া ফিল্‌ম্ তুলিয়াছেন। তাঁর তোলা ছবি য়ুরোপ আমেরিকার তোলা ছবির চেয়ে অপকৃষ্ট নয়; প্রাকৃতিক দৃশ্য নির্ব্বাচন, ছায়াসুষমা নির্দ্ধারণ, বাড়ীঘরের বাস্তবিকতা বিদেশী ওস্তাদদের তোলা ছবির তুল্যই সুন্দর ও সুনিপুণ হইয়াছে;—অভিনয়ে যদি ত্রুটি ও আড়ষ্টভাব থাকিয়া থাকে ত তার জন্য দায়ী তিনি নন, তার জন্য দায়ী আমাদের দেশের আনাড়ি অভিনেতারা।

এই কৃতকার্য্যতার জন্য শ্রীযুক্ত ফল্‌কে অধিকতর প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মনে হয় যখন আমরা তুলনা

সাবিত্রী-সত্যবান নাটক অভিনয়ে সাবিত্রীর স্থূল-শরীর স্বামী সত্যবানের মৃত্যুতে শোক করিতেছে ও সূক্ষ্মশরীর যমরাজের অনুসরণ করিয়া পতির জীবন ভিক্ষা করিতেছে। এই অভিনয়ের ছবিতে সাবিত্রীর সূক্ষ্মশরীর চমৎকার কৌশলে স্থূলশরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া আসে।

করিয়া দেখি য়ুরোপ-আমেরিকার সমবায়-সংবদ্ধ মূলধনের পরিমাণের সঙ্গে একজন সামান্য ব্যক্তির পুঁজি, য়ুরোপ-আমেরিকার বৈজ্ঞানিক-কলকব্জা-পৃষ্ঠপোষিত নগর-প্রাসাদ-তুল্য চলন্ত ছবি তুলিবার কারখানার সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বল্প আয়োজন ও বিরাট অসুবিধা, সহস্র সহস্র ব্যবসাদার সিনেমা-নাটক-লেখক ও পেশাদার দক্ষ অভিনেতাদের সঙ্গে নূতন ব্রতী নাটক-প্রণেতা আর আনাড়ি আড়ষ্ট অভিনেতা।

বুদ্ধিমান ফল্‌কে প্রথমে কাল্পনিক নূতন নাটক অবলম্বন না করিয়া, নাট্যবস্তুর খনি রামায়ণ মহাভারত পুরাণের শরণাপন্ন হইয়াছেন। এইসব পুরাণে কাব্যে এত নাটকীয়-ঘটনাবহুল উপাখ্যান আছে যে সহজে বাছিয়া অল্প চেষ্টাতেই অভিনয়যোগ্য ও সুদর্শন মনোহর করা যায়। আর এইসব উপাখ্যানের আর-একটি সুবিধা এই যে দর্শকদের মনে বহুশতাব্দীর ও পুরুষানুক্রমের সঞ্চিত পুঞ্জিত ভাবরস এই উপাখ্যানগুলির সঙ্গে দানা বাঁধিয়া থাকাতে অভিনয়ের অনেক ত্রুটি দর্শক নিজের মনের কল্পনায় ও ভাবমাধুর্য্যে পূরণ করিয়া লয়।

বাস্তবিকও এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার চলন্ত ছবিগুলি উৎকৃষ্টই হইয়াছে। দি বায়োস্কোপ নামক চলন্ত ছবির বিষয়েরই কাগজ এইসব ছবির সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল—

"ভস্মাসুর-মোহিনী ও সাবিত্রী নামক ফিল্ম্ দুটি ভারতবর্ষের বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে তোলা। উভয়েরই ঘটনা সরল সুন্দর, রঙ্গরস স্বাভাবিক, ও কল্পনা কবিত্বময়, যেমন সেই আশ্চর্য্য দেশের সকল সাহিত্যেরই লক্ষণ। শুধু গল্প হিসাবেও ছবিগুলি সৌন্দর্য্য আর আকর্ষণীতে ভরা, তার উপর এগুলি স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে দেশী অভিনেতাদের অভিনয় বলিয়া অধিকতর মনোজ্ঞ। বাস্তবিক, ভারতের জীবনযাত্রা ও চিন্তাপ্রণালীর স্পষ্ট পরিচয় হিসাবে এই ফিল্ম্‌গুলির জোড়া নাই।"

বিশেষজ্ঞ পত্রিকার এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার নয়।

ভারতবর্ষে বায়োস্কোপের আদর দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে; এক এক শহরে একাধিক বায়োস্কোপ থিয়েটার চলিতেছে; সুতরাং ভারতবর্ষে এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র যে বিস্তৃত তাতে কোনো সন্দেহ নাই। বিদেশী ঘটনা ও আচার-ব্যবহারের ছবি দেখার চেয়ে দর্শকেরা দেশী ঘটনা দেখিতে বেশী ভালোবাসিবার কথা; তার উপর যদি সেইসব ঘটনা সুপরিচিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার হয়, তবে ত কথাই নাই। এই শাদা সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফল্‌কে এই ব্যবসায়কে ফলাও করিবার চেষ্টায় আছেন।

হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সর্ব্বস্ব দিয়া স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিতেছেন।

ফল্‌কের প্রথম ফিল্‌ম্‌ হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের। ১৯১৩ সালে বোম্বাইএর সিনেমা থিয়েটারে যখন এই ছবি দেখানো হয়, তখন লোকের ভিড়. এমন আগ্রহ করিয়া ঝুঁকিত যে দুই মাস ক্রমাগত এই ছবিই দেখাইতে হইয়াছিল। এই ফিল্‌ম্‌ দেখাইয়া ও ভাড়া দিয়া এ পর্য্যন্ত ফল্‌কে ৭০ হাজার টাকা লাভ পাইয়াছেন! এখনো ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ইহা ভাড়া করিবার বায়না ও তাগাদা আসিতেছে। প্রত্যেক রাত্রে এই ছবি দেখিবার জন্য সব থিয়েটারেই ৮০০।৯০০ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়। তাঁর এই ফিল্‌ম্‌ যে যে স্থানে দেখানো হইয়াছে তার মধ্যে প্রধান কতকগুলি—বোম্বাই, পুনা, সুরাট, কলিকাতা, কলম্বো, গোয়া, ভাবনগর, আহমদাবাদ, নাগপুর, ইন্দোর, বড়োদা, গোয়ালিয়র, অমৃতসর, জামখিঁড়ি, ঔন্ধ, সোলাপুর। ফিল্‌ম্‌ দেখাইবার জন্য থিয়েটারওয়ালারা

হনুমান সাগর লঙ্ঘন করিবার সময় আকাশমার্গে যাইতেছেন।

১২০০০ হইতে ৬০০০০ টাকা বাৎসরিক ভাড়া দ্যায়। বোম্বাইএ এক-একটা ফিল্‌ম্‌ হাজারো বার দেখানো হয়।

এক-একটা ফিল্‌ম্‌ তুলিতে খরচও কম হয় না। লঙ্কাদাহন অভিনয়ে স্বর্ণলঙ্কা গড়িয়া তাহা পুড়াইয়া ছবি তুলিতে হইয়াছিল। এই অভিনয়ে যে লোক হনুমান

চলন্ত ছবির অভিনয়ের জন্য বাড়ী খাটানো হইতেছে।

সাজিয়াছিল তার অভিনয় এমন স্বাভাবিক হইয়াছিল যে নাসিকের কাছে এক জঙ্গলে যখন সে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করিতেছিল তখন সেই বনবাসী বানরের পাল তাকে আপনাদেরই একজন মনে করিয়া এমন করিয়া ঘিরিয়াছিল যে অনেক কষ্টে তাকে তাদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল।

এই ছবি বোম্বাইএ এমন লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে প্রত্যহ সাতবার করিয়া দেখাইয়াও লোকের ভিড় কমানো যাইত না। পুনাতে প্রত্যহ আটবার করিয়া দেখাইয়াও লোকের আগ্রহ মিটানো যায় নাই। সকাল আটটা হইতে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন চলিত। হপ্তায় টিকিট বিক্রয় হইত ১২০০০ হইতে ১৫০০০ টাকা! এই আশাতীত সফলতায় মুগ্ধ হইয়া বোম্বাই ও পুনার থিয়েটারওয়ালারা ফল্‌কেকে স্বর্ণপদক উপহার দিয়া আপনাদের খুসী জ্ঞাপন করিয়াছে।

চোখ ও কানের সাহায্যে যে অভিনয় উপভোগ করা যায় তার চেয়ে যে অভিনয় কেবল মাত্র চোখে দেখিয়া বুঝিতে হয় তার নাটক রচনা করা বেশী কঠিন, শুধু ঘটনাসংস্থান ও অঙ্গভঙ্গীতে হর্ষবিষাদ প্রকাশ করিয়া দর্শকের মনে তারই প্রতিধ্বনি তুলিতে পারা নিপুণ শিল্পী ভিন্ন অপরের সাধ্য নয়। ফল্‌কে তাঁর সিনেমা-নাটক রচনায় এই নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন।

ফল্‌কে বাস্তবিক একজন শিল্পীই। তিনি ১৮৮৬ সালে বড়োদার কলাভবন হইতে চিত্রাঙ্কনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে মন দেন ও থিয়েটারের সিন বা দৃশ্যপট অঙ্কন করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের অন্তর্গত কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। ১৮৯০ সালে তাঁর ঝোঁক ফটোগ্রাফের দিকে পড়ে ও শীঘ্র দক্ষ ফটোগ্রাফার হইয়া উঠেন। তারপর হাফটোন ব্লক তৈয়ারী, ফটোলিথো, কলোটাইপ, ফটো-গ্রেভিওর ও তিন রঙের ব্লক তৈয়ারী প্রভৃতি ছবি ছাপার বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেন। এই বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়া তিনি একটি আর্টপ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন; এই প্রেসের লেখা ও ছবির ছাপা লণ্ডন ও নিউইয়র্কের ছাপাখানার বিষয়ের বিশেষ পত্রিকায় প্রশংসিত হইয়াছিল ও তাঁর প্রেস এই সুন্দর সুনিপুণ ছাপার জন্য পদক পুরস্কারও পাইয়াছিল।

এইরূপ বিবিধ গুণপনা লইয়া ফল্‌কে সিনেমা ফিলম্ তৈয়ারীতে হাত দিয়াছেন; এবং নিজেই অভিনয়ের ক্রমাগত ফটোগ্রাফ তোলা, নেগেটিভ ডেভেলাপ করা, ফিল্‌ম্ প্রিণ্ট করা, সিনেমা প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন ও পোষ্টার ছাপা যাবতীয় কাজ করিয়াছেন।

ফল্‌কে এই নূতন প্রচেষ্টায় শুধু যে নিজেই ধনী হইয়াছেন তা নয়; তিনি ভারতের নরনারীর চোখ খুলিয়া দিয়াছেন, বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগসাধনের সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন। দূর দেশের মানুষকে জানিবার উপায় তার সাহিত্য; কিন্তু সকল দেশের ভাষা আয়ত্ত করিয়া সাহিত্য পাঠ সাধারণ লোকের সাধ্য নয়; সেই সাহিত্যের উপাখ্যান যদি চোখে দেখিয়া বিদেশীর চিন্তা-প্রণালী ও জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় তবে দেশে দেশে পরিচয়ের দ্বারা ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে পারে। সেই পথ ফল্‌কে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

বাতাসহীন ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান—

সায়েণ্টিফিক এমেরিক্যান কাগজে এক রকম নূতন ইলেক্‌ট্রিক পাখার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পাখায় বাতাস হয় না, ঘরের বাতাস ঠাণ্ডা হয়। সাধারণ পাখায় ঘরের বাতাসে আলোড়ন তুলিয়া ঘুলাইয়া দেওয়া হয়, ঘরের বাতাস গরম হইয়া থাকিলে গরম বাতাসের ঝাপ্‌টা গায়ে লাগে, কাগজপত্র উড়িয়া বেড়ায়, মেঝের

বাতাসহীন ইলেক্‌ট্রিক পাখা।

ধুলা নাকে ঢুকে; কিন্তু এই নূতন পাখার ডানাগুলি নৌকার দাঁড়ের মতন না হইয়া গুটানো পাকানো হওয়াতে মেঝে হইতে বাতাস ছাদের দিকে আস্তে আস্তে শুষিয়া উঠিয়া যায়। নীচের বাতাস সর্ব্বদা উপরের বাতাসের চেয়ে ঠাণ্ডা থাকে। সুতরাং ক্রমাগত নীচের বাতাস উপর দিকে উঠিতে থাকে বলিয়া ঘরের বাতাস ঠাণ্ডা লাগে। এবং এই বায়ুস্রোত এত ধীরমন্থর যে ইহাতে ধুলা ওড়ে না, কাগজপত্র ডানা মেলে না।

জাপানী ব্যঙ্গচিত্র—

জাপানী চিত্রকলা প্রধানত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে উৎপন্ন বলিয়া তার অন্তরতম লক্ষণ হইয়াছে আধ্যাত্মিকতা। সেই কারণে জাপানী

জাপানী রঙ্গচিত্রকর হোকুসাই'র আঁকা পিঠে-পার্ব্বণের ব্যঙ্গচিত্র।
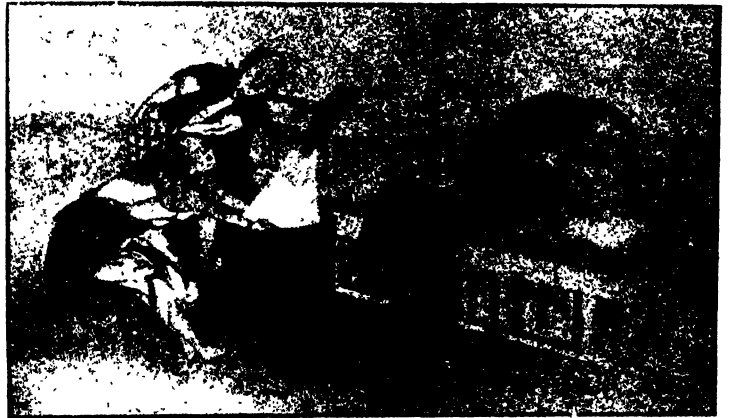
চিত্রকলায় ব্যঙ্গচিত্র তেমন স্থান পায় নাই। প্রাচীনতম ব্যঙ্গচিত্রকর ছিলেন পুরোহিত তোবা। সেইজন্ত জাপানী পঞ্চানন্দের নাম তোবা-এ। তোবা যেমন তাঁর তুলির দক্ষতার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন, তেমনি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁর ধর্ম্মপ্রাণতার জন্ত; কিন্তু এখন তাঁর নাম বিখ্যাত হইয়া আছে ব্যঙ্গচিত্রের জন্মদাতা বলিয়াই। কিয়োতোর নিকটে তাকায়ামা মন্দিরে তাঁর চার ভলুম ছবির সংগ্রহ রক্ষিত আছে; প্রথম দু ভলুমে বানর খরগোশ শেয়াল ব্যাং প্রভৃতির ব্যঙ্গচিত্র, তৃতীয় ভলুমে ড্রাগন বাঘ ষাঁড় ঘোড়া মোরগ ইত্যাদির ব্যঙ্গচিত্র, ও চতুর্থ ভলুমে মানুষের ব্যঙ্গচিত্র আছে। এই ছবিগুলি এখন দেশের জাতীয় সম্পত্তি। ব্যাঙের কুস্তি, ব্যাং আর খরগোশের লড়াই প্রভৃতি ছবি মজাদার হাস্ত উদ্দীপক। খরগোশ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে আর খরগোশ শ্রোতারা শুনিতেছে বড় রঙ্গ করিয়া আঁকা হইয়াছে।

জাপানের বর্ত্তমান প্রধান চিত্রকরদের অন্ততম শ্রীযুক্ত নাকামুরা ফুসেৎস্থ বলেন—"জাপানী চিত্রের এই একটি প্রধান দোষ যে জীবজন্তর ছবি হুবহু বাস্তবিক হয় না, কারণ প্রকৃত জীবজন্তু দেখিয়া ছবি না আঁকিয়া মন হইতে তাদের ছবি আঁকা হয়। কিন্তু তোবা প্রকৃতির জীবন্ত পশুপক্ষী দেখিয়াই ছবি আঁকিতেন; সেইজন্ত তিনি প্রত্যেক জন্তুর আনন্দ বিষাদ ভয় প্রভৃতি মানসিক অবস্থার বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গী হুবহু প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাতে ব্যঙ্গ ও রঙ্গ আরো ভালো করিয়া ফুটিয়াছে। তোবা'র শিল্পচাতুরীর গুণগরিমা কথায় প্রকাশ করা যায় না।"

তোবা'র আঁকা মানুষের ব্যঙ্গচিত্রগুলি আধুনিক রুচিসঙ্গত নয় যেসব বিষয় এখন ভব্যসমাজে অকথ্য তাই সেকালের রঙ্গ-তামাসার বিষয় ছিল। তাঁর মতন ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিতও যে সেই সব বিষয়ই আঁকিয়া গিয়াছেন তাতে এই প্রমাণ হয় যে সেকালে ঐ সব বিষয় তত দূষ্য বা গর্হিত বিবেচিত হইত না এবং পুরোহিত চিত্রকরও মানবীয় ভাবরাজ্য হইতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করেন নাই।

তোবা'র একখানি ছবির বিষয় এই যে—চালের বস্তা ঝড়ে উড়িয়া চলিয়াছে। সেই ছবি দেখিয়া রাজা বলিলেন—অসম্ভব! তোবা বলিলেন—না হুজুর, আপনার কর্ম্মচারীদের ফুঁ'এর জোর বড় বিষম। বস্তা বস্তা চাল টাকা প্রতিদিনই উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

এইরূপ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ তোবা'র চিত্রের বিশেষত্ব। তোবা'র এইরূপ চিত্রে অত্যুক্তির অনুকরণ করিয়া তাঁর এক ছাত্র একটা খুনের ছবি আঁকিয়াছিল, তাতে দেখানো হইয়াছে যে খুনী এমন জোরে তরোয়াল বিঁধিয়াছে যে তার হাতের মুঠো পর্য্যন্ত বুক ফুঁড়িয়া পিঠ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তোবা এতখানি অত্যুক্তি অসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

তোবা-এ বা ব্যঙ্গচিত্র এখন জাপানের সাময়িক পত্রিকায় খুব চলিতেছে। সকল চিত্রকরই সেই আদি শিল্পী তোবার শিষ্য। তোবার পর তকুগাওা যুগে ব্যঙ্গচিত্রের খুব প্রচলন হয়। তোবার পর অনেক ব্যঙ্গচিত্রকর প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে সামান্ত একটু নাম করিয়াছিলেন হকুসাই ও গিয়োসাই। গিয়োসাই ভূতপ্রেত ও মাতাল প্রভৃতি অমানুষের ছবিতে খুব রঙ্গ প্রকাশ করিতে পারিতেন।

আধুনিক ব্যঙ্গচিত্রকরদের মধ্যে প্রধান কোবায়াশী কিয়োচিকা। তিনিই জাপানে পাশ্চাত্য রীতিতে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আর-একজন বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রকর কিতাজাওা রাকুতেন, তিনি তোকিয়োর দৈনিক 'জিজি শিম্পো' খবরের কাগজে ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া থাকেন। জাপানে আজকাল ব্যঙ্গচিত্রকর অনেক, কিন্তু তাদের অধিকাংশের ছবিই অত্যন্ত crude অর্থাৎ আড়ষ্ট আনাড়ি ধরণের এবং যারপর নাই অভদ্র, যাকে ইংরেজিতে vulgar বলা যায়।
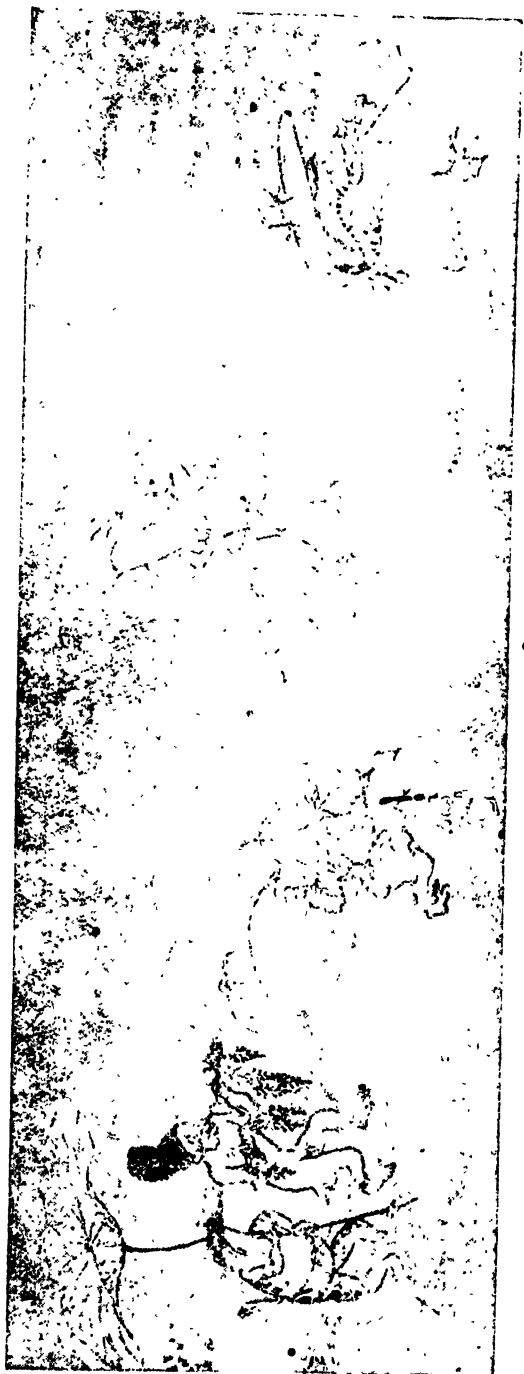
জাপানী ব্যঙ্গচিত্রকর তোবা'র আঁকা হংস বানর ও শেয়ালের রঙ্গচিত্র।

জাপানের ব্যঙ্গচিত্রের কাগজের মধ্যে 'তোকিয়ো পাক' ও 'ওসাকা পাক্' প্রধান। তাছাড়া 'মাঙ্গা' এবং 'বোকেই' হাসিতামাসার কাগজ।

জাপানী ব্যঙ্গচিত্রকর তোবা'র আঁকা ব্যাং খরগোশ ও বাঁদরের ব্যঙ্গচিত্র।

প্রাচীনতম হাসিতামাসার কাগজের নাম 'মারুমারু চিম্বুন'। জাপানের অধিকাংশ ব্যঙ্গচিত্রকর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ব্যঙ্গচিত্র আঁকে; ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে প্রাচ্য চিত্রপদ্ধতি ব্যঙ্গরস প্রকাশের অনুকূল নয়?

জাপানী খেল্‌নার ব্যবসায়—

কারো বা সর্ব্বনাশ, কারো বা পৌষ মাস। য়ুরোপের যুদ্ধে সমস্ত য়ুরোপ ধনে প্রাণে মজিতে বসিয়াছে; ভারতবর্ষ ত মজিয়াই আছে—য়ুরোপ চাঙ্গা থাকিলে তার রক্ত মজ্জা পর্য্যন্ত শুষিয়া খায়, য়ুরোপ কাবু হওয়াতে পঙ্গু তার অভাবের অন্ত নাই। কিন্তু এই কাকতালে জুৎ করিয়া লইল জাপান। জাপানী রথো জিনিস দিয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। জাপানী গেঞ্জি একদিন গায়ে দিলেই পরদিন সব সেলাই এলাইয়া খুলিয়া পড়ে; জাপানী সব জিনিসই এম্‌নি রদি ফঙ্গবেনে। জাপানের যতরকম শিল্পপ্রচেষ্টা, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফলাও হইয়াছে খেল্‌নার ব্যবসায়। চার বছর আগে গোটাকতক পুতুল খেলনা জাপান হইতে রফ্‌তানী হইত। কিন্তু এই যুদ্ধে জার্ম্মানীর খেলনা আমদানী বন্ধ হওয়াতে জাপানের পোয়া-বারো হইয়াছে—গত বৎসর জাপান থেকে ৮৪ লক্ষ ইয়েন দামের খেলনা রফ্‌তানী হয়; এ বৎসর ১ কোটি ইয়েনের হইবে মনে হইতেছে।

এই-যে ব্যবসায়ের বিস্তার, ইহা কারিগর বা ব্যাপারীদের চেষ্টায় হয় নাই; গভর্মেণ্ট কারিগরদের ফরমাস দিয়া ও ব্যাপারীদের সাহায্য করিয়া বিদেশে জাপানী মালের কাট্‌তির সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গভর্মেণ্ট বিদেশী খেলনার নমুনা জোগাড় করিয়া সেই আদর্শে কারিগরদের দ্বারা খেলনা তৈয়ার করাইয়াছেন।

জাপানের খেলনার ব্যবসায়ে লাভের হিসাব দেখিলে বোঝা যাইবে গভর্মেণ্টের সাহায্যে ব্যবসায় কেমন ফলাও ও লাভের ব্যাপার হইয়া উঠে।

১৮৯৭ সালে	২৪২৭৬৪ ইয়েন
১৯০৭	৭৮৯৮১৯
১৯১৩	২৪৮৯৭৯২
১৯১৪	২৫৯১৭১৫
১৯১৫	৪৫৩৩৪৮৬
১৯১৬	৭৬৪০০২০
১৯১৭	৮৪০৯৫১৮

১৯১৭ সালে ভারতবর্ষে ৯৩৪৯৭১ ইয়েন দামের জাপানী খেলনা আমদানী হইয়াছে। কুড়ি বছরে জাপানী খেলনার ব্যবসায় ৩২ গুণ ফলাও হইয়াছে। এখন জাপান জগতের মধ্যে প্রধান খেলনা-গড়ার জায়গা।

জাপানে কাঠ বাঁশ প্রচুর ও শস্তা; ছুতোরেরা হাতে কাঠ ও বাঁশ দিয়া খেলনা গড়ে। ছুতোর-পরিবারের সবাই কাজে সাহায্য করে বলিয়া হাতের গড়নও প্রচুর হয়। এখন খেলনাগুলির সৌষ্ঠব ভালো ও মজবুত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

জাপানীরা দেখিয়াছে যে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকারের খেলনা পছন্দ করে। য়ুরোপীয়ানেরা পছন্দ করে—বাঁশের বাঁশী, পুতুল, মাটির বাসন, পাখা, কাঠের পুতুল, তুলোর পশুপক্ষী; আমেরিকানেরা—পাখী, ঘুড়ি, খেলনা চেয়ার-টেবিল, আসবাব, কাঠের পুতুল, কাগজ ও সেলুলয়েড দিয়া গড়া খেলনা; অষ্ট্রেলিয়া—বাঁশী, কাঁচের খেলনা, রবারের পুতুল, খেলনা আয়না, বাজ্‌না; ওলন্দাজী ভারত—ধাতুর পাতে তৈরী গহনা আর কাগজের ও সেলুলয়েডের জিনিস; ব্রিটিশ ভারত—মাটির পুতুল, জন্তুজানোয়ারের মূর্ত্তি; দক্ষিণ আমেরিকা—খেলনা ছাতা, লণ্ঠন, বাঁশের খেলনা পুতুল; চীন—খেলনা পোকামাকড়, রবারের পুতুল, যুদ্ধজাহাজ আর ইলেক্‌ট্রিক কার।

ভারতবর্ষে বাঁশ কাঠ কাদা কারিগর ছুতোর এখনো যথেষ্ট আছে; নেই কেবল দেশের প্রতি মমতাযুক্ত দেশী গভর্মেণ্ট। এই সময়ে

ভারতের স্বরাজ থাকিলে এই সুযোগ কম্বাইতে কখনো দিতেন না; কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, কাশীর কাঠের খেলনা, জয়পুরের পাথরের খেলনা, লক্ষৌএর মাটির পুতুল, মোরাদাবাদের বিদ্‌রীর খেলনা, মহীশূর ত্রিবাঙ্কুরের কাঠের খেলনা, মুর্শিদাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুরের হাতীর দাঁতের খেলনা আজ সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িত ও ভারতের দরিদ্রতা অনেক পরিমাণে ঘুচিতে পারিত।

বাজে জিনিস কাজে লাগানো—

বড় বড় কাঠের কলে এত করাত-গুঁড়ো জমে যে অর্দ্ধেক তারা জ্বালাইয়া শেষ করিতে পারে না, অর্দ্ধেক ঘরের কড়ি খরচ করিয়া বিদায় করিতে হয়। আমেরিকানেরা এখন সেই করাত-গুঁড়ো চোলাই করিয়া মদ, জ্বালানী স্পিরিট, রং, তার্পিণ তেল, রজন, চামড়া কষ করিবার মস্‌লা প্রস্তুত করিতেছে। আর তাহা হইতে প্রস্তুত করিতেছে রেশমের মতন মসৃণ উজ্জ্বল সুতো, এবং তাই দিয়া গালিচা কার্পেট নেক্‌টাই মোজা গেঞ্জি প্রভৃতি তৈরী করিতেছে। আজকাল বাজারে যে-সব নকল রেশমী জিনিস বিক্রয় হয়, সব কাঠের গুঁড়ো হইতে তৈরী।

কলা খাও—

দি জার্নাল অফ্ দি এমেরিক্যান্ মেডিক্যাল এসোসিয়েসান বলেন যে কলার খোসা তার শাঁসের চমৎকার বর্ম্ম—আঁস্তাকুড়-কুড়ানো আবর্জ্জনার গাড়ী থেকেও লইয়া কলা স্বচ্ছন্দে খাওয়া যায়, কোনো জীবাণু কলার খোসা ভেদ করিয়া শাঁসে বাসা বাঁধিতে পারে না। সেই কলা সুপক, যার খোসার রং হল্‌দে উৎরাইয়া পাট্‌কিলে ধরিতেছে; সেই সুপক কলা খোসা ছাড়াইয়া অথবা কাঁচা কলা রাঁধিয়া খাইলে কান্তি পুষ্টি লাভ হয়।

মাতালদের কি মারিয়া ফেলা উচিত?—

এমেরিক্যান মেডিসিন নামক ডাক্তারী কাগজে ডাক্তার ক্রোথার্স এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। গত বৎসর মার্কিন যুক্তরাজ্যে এক শতেরও বেশী মাতালের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল—অবশ্য কেবল মাতাল হওয়ার অপরাধে নয়, মাতাল অবস্থায় অপরের প্রাণবধ করার অপরাধে। ডাক্তার ক্রোথার্স বলেন যে যারা মদ খায় তারা মস্তিষ্ককে বিষপ্রয়োগ করিতে করিতে এমন পঙ্গু করিয়া ফেলে যে তাদের ইচ্ছার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে না, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বোধ থাকে না; এই কারণে তারা ক্রমে মদ খাইবার ইচ্ছাকেও দমন করিতে না পারিয়া মাতাল, জড়বুদ্ধি ও অপকর্ম্মা অপরাধী হইয়া উঠে। সুতরাং তারা যে অপরাধ করে তার জন্ম তাদের ইচ্ছাশক্তি দায়ী নয়। সেই অপরাধের জন্ম সামাজিক উপহাস ও ঘৃণা আর আইনের কঠোর দণ্ড বিধান করা ন্যায়সঙ্গত নয়; মাতালরা পাগলেরই সামিল, তাদের বধ না করিয়া পাগ্‌লা-গারদের মতন একটা মাতাল-গারদে রাখিয়া তাদের চিকিৎসা করানো উচিত। তাদের যে অবনতি তা নৈতিক অপেক্ষা দৈহিকই অধিক। এবং ইহাও সত্য যে সমাজে যত অপকর্ম্ম হয় তার অর্দ্ধেক মাতালদেরই কুকীর্ত্তি। মদ খাইলে হয় প্লীহা পাকিয়া নয় ফাঁশিকাঠে অপঘাতে মৃত্যু অবধারিত।

চারু।

কোটা অমৃত দেশলাইয়ের কারখানা

দেশীয় সামগ্রীতে দেশের অভাব দূর করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা এই যুদ্ধের সময়ে সকলেই বিশেষরূপে অনুভব করিতেছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বাস্তবিক কার্য্য করিতে পারেন এরূপ কর্ম্মবীর অতি বিরল। যে কয়বৎসর কলিকাতায় "স্বদেশী মেলা" হইয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্‌লাদেশে অনেক প্রকার কেশতৈল ও সুবাসিত তরল আল্‌তার আবির্ভাব হইয়াছে। বিলাসিতার উপকরণের জন্য যে চেষ্টা হইয়াছে তাহার কতকাংশও প্রয়োজনীয় শিল্পের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইত।

দেশলাই প্রত্যেক গৃহস্থের প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রয়োজনীয় দ্রব্য। অথচ এই দেশলাইয়ের জন্য চিরকালই আমাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, যদিও আমাদের দেশে ইহার উপকরণের অভাব নাই। সুইডেন হইতে যে দেশলাই আসিত, যুদ্ধের জন্য তাহার আমদানী বন্ধ হইয়াছে। জাপানের অপেক্ষাকৃত ভাল দেশলাইও আজকাল পাওয়া যায় না। এখন নিকৃষ্টজাতীয় জাপানী দেশলাই উচ্চদরে বিক্রীত হইতেছে ও তাহাই বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে।

দেশের এই আর্থিক দুর্দ্দিনে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দেশের এই অভাব দূরীকরণে অগ্রসর হইয়া দেশের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে রাজপুতানার কোনো রেলওয়েতে সিগ্‌নালার ছিলেন; পরে বি এন্ রেলওয়ের কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন।

ইং ১৯০০ সালে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। অমৃতলাল সেই অবস্থায় ইহার ভার গ্রহণ করেন ও নিজের সমস্ত সম্পত্তি ইহাতে নিয়োজিত করেন। তখন তাঁহার এ কার্য্যে কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। অন্য কোনো সাহায্যের অভাবে—পুস্তকের সাহায্যে ও ততোধিক স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকেন ও পাঁচ

বৎসর ধরিয়া অনেক ক্ষতি স্বীকার করেন। এখন তিনি এই কারখানাটিকে প্রকৃত কার্য্যকরী অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন।

আমরা এই কারখানা দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। সুজন অমৃতলাল আমাদিগকে তাঁহার কারখানার প্রত্যেক অংশটি দেখাইয়া তাহার কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দেন।

শিমুল কাঠ হইতে বাক্স কাঠি সমস্তই প্রস্তুত হয়। বাক্সগুলি সুদৃশ্য ও সুদৃঢ়, কাঠিগুলিও উপযুক্ত—প্রত্যেকটিই অব্যর্থ। কাঠিতে ও বাক্সের গায়ে যে বারুদ থাকে তাহা সেঁৎসেঁতে জায়গায় রাখিলেও নষ্ট হয় না। কাঠি ফুরাইয়া গেলেও বাক্সের গায়ের বারুদ নিঃশেষ হয় না।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য যে-সমস্ত দ্রব্যের অভাবে আমরা কষ্ট পাইতেছি তাহার মধ্যে দেশলাই একটি প্রধান দ্রব্য। এই সময়ে অমৃত ফ্যাক্টরীর দেশলাই বহুলভাবে প্রচলিত থাকিলে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু উপস্থিত রেলওয়েতে মালগাড়ীর অভাবে দেশলাই সরবরাহের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। এই কারখানায় প্রতিদিন সহস্র গ্রোস অর্থাৎ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বাক্স প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তিনশত গ্রোসের অর্থাৎ ৪৩,২০০ বাক্সের অধিক রপ্তানী হইবার সম্ভাবনা না থাকায় তাহার অধিক প্রস্তুত করা হয় না। এই সম্বন্ধে একখানি চিঠির নকল নীচে দিতেছি।

From C. G. Leftwich, Esq., I.C.S.,
Director of Industries, Commerce and of Munitions,
C. P. & Berar, Nagpur.

To
The Superintendent of Goods,
Bengal Nagpur Railway,
Kidderpore, Calcutta
Nagpur, 2nd April 1918.

Sir,

I beg to bring to your notice the case of a match factory at Kota in the Bilaspur District, Railway Station Kargi Road, B. N. R. Owing to lack of Railway waggons the stock of matches has accumulated greatly and the management is in danger of losing its custom, laboriously built up in adverse circumstances.

The Japanese have been able to take advantage of war conditions to capture a large portion of the Indian market for matches and have flooded the country with stuff greatly inferior to the produce of the Kota factory. I shall be much obliged if you can see your way to instruct the D. T. S. Bilaspur to let the Manager of the Match Factory, Kota, have two waggons weekly for the consignment of matches for Kargi Road Station B. N. R.

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ জাপানী দেশলাইয়ের বাক্স এই কারখানায় মেরামত হইবার জন্য আসিয়াছে। ঐ সকল বাক্সের গায়ের ও ভিতরকার কাঠির বারুদও এই কারখানায় নূতন করিয়া লাগান হইবে।

আমাদের দেশে এই দেশী দেশলাইয়ের বিস্তার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। যদি প্রত্যেক জিলায় এক এক ব্যক্তি এজেন্ট হইয়া নিজের জেলাস্থ দোকানদারগণকে পাইকারী বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তিনিও লাভবান্ হইতে পারেন ও এই অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের প্রচারের বিশেষ সুবিধা হয়। আমাদের দেশে এরূপ সুশৃঙ্খল পরস্পর-সাহায্যের আশা আছে কি?

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

৫৭ অধ্যায়

বীভৎস মৃতসৎকার, বীভৎসতর ঔষধ।

মাসিক মৌখিক পরীক্ষার পূর্ব্বেই আমি সেরা বিহারে ফিরিয়া আসিলাম। আমি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি এবং পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত আছি; এমন সময়ে আমার পরিচিত একজনের মৃত্যু হইল এবং আমাকে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত হইতে হইল। ঘটনাচক্রে আমায়ও কিছু কিছু অনুষ্ঠান করিতে হইল। জগতে এমন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আর কোথায়ও দেখি নাই। তিব্বতে মৃতদেহ রক্ষার জন্য কোন প্রকার আধার নাই। দুইটি কাঠ বাঁধিয়া তাহার মধ্যে দেহটি রাখা হয়—দুই জন মানুষ তাহার মধ্যে গলা ঢুকাইয়া দিয়া তাহা বহন করে। শ্বেতবস্ত্র দিয়া মৃতদেহটি ঢাকিয়া রাখা হয়।

মৃত্যুর ৩।৪ দিন পরে মৃতদেহের সৎকার হয়। এই সময় নানাপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্মে অতিবাহিত হয়। সর্ব্বপ্রথমে একজন লামাকে ডাকা হয়, তিনি সৎকারের সময়, কি ভাবে সৎকার করা হইবে, তাহা বলিয়া দেন। তিব্বতে মৃতদেহ

সৎকারের চারি প্রকার বিধি আছে—যথা জলসাৎ, অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ, এবং বায়ুসাৎ করিবার ব্যবস্থা। এই চারি প্রকার সৎকারের বিধির মধ্যে মৃতদেহ শকুনি গৃধিনী প্রভৃতি শবাহারী পক্ষীকে আহার করিতে দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা—ইহাকে বায়ুসাৎ করা বলে। তাহার পরে অগ্নিসাৎ বা মৃতদেহ দাহ করা। তৃতীয়তঃ জলসাৎ বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করা। চতুর্থতঃ ভূমিসাৎ বা ভূগর্ভে প্রোথিত করা। বসন্তরোগে যদি কাহার মৃত্যু হয়, তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়। পাছে বসন্ত রোগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এই ভয়ে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়।

তিব্বতে মৃতদেহ দাহ করা এক কঠিন ব্যাপার—সে দেশে কাষ্ঠ নাই—চমরীর করীষই একমাত্র ইন্ধন। অত্যন্ত ধনী না হইলে মৃতদেহ দাহ করা সম্ভবপর নহে। যেখানে নদী আছে, সেখানে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দেহ পঞ্চভূতে গঠিত, অতএব এইপ্রকারে সৎকার করিলে তবে পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলাইয়া যায়, তিব্বতীদের এই বিশ্বাস। সচরাচর লামাদিগের দেহ শবাহারী পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। দলাইলামা এবং অত্যন্ত উচ্চপদস্থ লামাদিগের সৎকারের বিশেষ বিধি আছে।

আমার বন্ধুর মৃতদেহটি বায়ুসাৎ করিবার ব্যবস্থা হইল। সেরা বিহার হইতে মৃতদেহটি বহন করিয়া পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিলাম। ক্রমে এক নদীর ধারে দুই পর্ব্বতের মধ্যে ২৪ হাত উচ্চ এক প্রস্তরের নিকট শব নীত হইল। পাথরখানির উপর সমতল—এখানেই মৃতদেহটি রক্ষিত হইবে। পর্ব্বতের চারিদিকে সতৃষ্ণনয়নে অনেক শবাহারী পক্ষী বসিয়া আছে। মৃতদেহ ভক্ষণ করিবার আশায় তাহারা এখানে বসিয়া থাকে। মৃতদেহটি প্রস্তরের উপর রাখিয়া তাহার উপর হইতে সাদা চাদরখানি সরাইয়া রাখা হইল। তখন ঢাক ঢোল করতাল বাজাইয়া লামা মহাশয় মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। ওদিকে শাণিত অস্ত্র হস্তে লইয়া আর-একজন মৃতদেহ কাটিবার জন্য উপস্থিত। প্রথমেই উদরে ছুরি বসাইয়া দেওয়া হইল, এবং অন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিয়া একে একে সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলা হইল। তাহার পর হাড় হইতে মাংস কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিতে লাগিল। এতক্ষণে শকুনি প্রভৃতি চারিদিকে আসিয়া বসিয়াছে, তাহাদিগকে মাংস আহার করিতে দেওয়া হইল। এখন অস্থিমাত্র অবশিষ্ট। সেগুলি পাথর দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া গুঁড়া করা হইল। সে কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার! সেই অস্থিচূর্ণের সহিত ময়দা মিশাইয়া পক্ষীদিগকে খাইতে দিল। অবশেষে দেখি চুল কগাছি ছাড়া মৃতদেহের কিছুমাত্র আর বাকি নাই।

তিব্বতীদের নরমাংসভোজী রাক্ষস বলিলেই চলে। যখন তাহারা মৃতদেহ কাটিতেছিল, তখন আমার এই কথাই মনে হইতেছিল। লামারাও এই হাড়মাসকাটার সাহায্য করিয়া থাকে। এই-সকল কর্ম্ম করিতে-করিতেই তাহারা সেই নোংরা হাতে চা রুটী খাইতে লাগিল। হাত ধোয়া রীতি ত এদেশে নাই। আমি হাত ধুইবার কথা বলাতে আমায় ঠাট্টা করিয়া বলিল যে মৃতদেহের কিছু কিছু উদরস্থ হইলে মৃতব্যক্তি বড়ই সন্তুষ্ট হইবে। তিব্বতীরা যে রাক্ষসজাতি তাহাতে আর সংশয় নাই। এদিকে যখন এইপ্রকারে মৃতদেহের সৎকার হইতেছে, তখন মৃত ব্যক্তির গৃহেও মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্ম চলিতেছিল। সৎকারান্তে সকলে মৃত ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইয়া উত্তমরূপে ভোজন করিল। কিন্তু লামাদিগকে মদ্যপান করিতে দেওয়া হয় না, অন্য সকলে মদ্যপান করিয়া থাকে।

দলাইলামা বা তদ্রূপ উচ্চপদস্থ কোন লামার মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ কাষ্ঠের আধারে রক্ষিত হয়। মৃতদেহটির উপরে অপর্য্যাপ্ত লবণ ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে ঢাক ঢোল বাজাইয়া মন্ত্রপাঠ চলিতে থাকে। লবণাক্ত করিয়া দেহটি কোন মন্দিরে তিন মাস রাখা হয়। সেই সময় প্রতিদিন তাহার সম্মুখে নানাপ্রকার নৈবেদ্য দেওয়া হয় এবং শিষ্যগণ ক্রমাগত পালা করিয়া দেহটির নিকট প্রহরীর ন্যায় বসিয়া থাকে। শবের সম্মুখে দিবারাত্র ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, এবং ৭টি রৌপ্যপাত্রে পবিত্র বারি রক্ষিত হয়। যে কেহ সেখানে পূজা করিতে আসে সেই কিছু কিছু অর্ঘ্য এবং অর্থ দান করে। তিন মাস পরে মৃতদেহটি সম্পূর্ণ লবণাক্ত হইয়া শুষ্ক এবং কঠিন হইয়া যায়। দেহখানি ঠিক কাষ্ঠের মত এবং চক্ষু দুটি কোটরগত। এই অবস্থায় দেহটি বাহির করিয়া

এক প্রকার মাটির সহিত চন্দনের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া সমুদয় দেহের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। তাহার পর সোনার পাতে দেহটি আচ্ছাদিত করা হয়। এই অবস্থায় দেহটি ক্ষুদ্র মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার উপর কারুকার্য্য-খচিত মঠ নির্ম্মিত হয়। তিব্বতের নানা স্থানে এই প্রকার বিচিত্র মঠ আছে—সিগাট্‌সিতে আমি এই প্রকার পাঁচটি মঠ দেখিয়াছি—তাহাদের ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত। চীনের মন্দিরের দোতলা ছাদের মত এই-সকল ছাদ। যে ব্যক্তি যত সম্মানিত তাহার মঠও তদ্রূপ বিচিত্র এবং স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত। তিব্বতে এই প্রকারে যে-সকল মৃতদেহ রক্ষিত হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণ দ্বারা পূজিত হয়।

মৃতদেহ যে লবণরসে সিক্ত থাকে তাহাই এ দেশের এক মহৌষধি। এ মহৌষধি যে-সে লোকের ভাগ্যে জোটে না। অত্যন্ত ধনী, অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছাড়া এই দেবদুর্লভ ঔষধ সাধারণে পায় না। অনেক আরাধনা, অনেক চেষ্টার পর এই কদর্য্য বস্তু কিছু মাত্র লাভ করা যায়। তিব্বতীদের বিশ্বাস এ জগতে এমন কোন কঠিন ব্যাধি নাই যাহা এই দিব্য ঔষধে আরাম না হয়। হায় হায়! বিশ্বাসে কিনা হয়। "আমি সারিয়া গিয়াছি" এই বিশ্বাসে পৃথিবীর অর্দ্ধেক ব্যাধি সারিয়া যায়। এই বারে আর-এক বীভৎস ঔষধের উল্লেখ করিব,—যাহা স্মরণ করিলে ন্যাকার আসে। সে ঔষধ যে উপাদানে নির্ম্মিত তাহাতে তিব্বতের লোক ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোকের রোগ না সারিয়া রোগ জন্মে—সে ঔষধের কথা কি বলিব? দলাই লামার মলমূত্রই সে ঔষধের প্রধান উপকরণ—এই দুই বস্তুর সহিত অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বড়ি নির্ম্মিত হয়, সেই বড়িগুলি লাল রংএ চিত্রিত হয় এবং সময়ে সময়ে সোনার পাতে মোড়া হয়। তিব্বতে ইহাকে "মহামৃত্য বড়ি" বলে। ইহা এতদূর দুর্লভ বস্তু যে সহজে কেহ পায় না—বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া ইহা সংগ্রহ করিতে হয়। যাহাদের গৃহে এই মহৌষধি থাকে তাহারা অমূল্য সামগ্রীর মত তাহা রক্ষা করে। বাঁচিবার আশা যখন থাকে না তখন সেই আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিকে অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে একটি গুলি খাইতে দেওয়া হয়। যদি বিশ্বাসের জোরে কেহ বাঁচিয়া উঠে তবে আর বড়ির মহিমা বর্ণনা করিয়া লোকে ক্লান্ত হয় না—যদি একান্তই সে ব্যক্তি সারিয়া না উঠিয়া সরিয়াইয়া যায় তবে তাহা তার অদৃষ্টের ফল বলা হয়।

৫৮ অধ্যায়।

বিদেশী পর্য্যটক ও তিব্বতের বর্জ্জননীতি।

১৯০১ সনের নবেম্বর মাসের প্রথমেই আমি লাসার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মহাশয়ের গৃহে আতিথ্যসুখ সম্ভোগ করিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। তখনকার অর্থসচিব এই মন্ত্রী মহাশয়ের পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র, সুতরাং সর্ব্বদাই এই বাড়ীতে তাঁহার গতিবিধি ছিল। তিনি যখন-তখন আসিয়া আমাদের সহিত গল্প করিতেন। একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে একজন ইংরেজ প্রচারিকার তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। তিনি বলিলেন "আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি না ইংরেজেরা আমাদের দেশে প্রবেশ করিবার জন্য এত উৎসুক কেন? —আট নয় বৎসর পূর্ব্বে একজন ইংরেজ মহিলা তিব্বত ও চীনের মধ্যে নাকচুখা নামক স্থানে আসিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল।" আমি তখন বুঝিতে পারিলাম যে মন্ত্রী মহাশয় কুমারী এনি টেলারের কথা বলিতেছেন—যিনি চীন হইতে লাসা হইয়া দার্জ্জিলিং আসিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি এই রমণীর তিব্বত প্রবেশের কথা সবই জানিতাম। দার্জ্জিলিং থাকিতেই উঁহার কথা শুনিয়াছি এবং তাঁহার সঙ্গে যে পথপ্রদর্শক ছিল তাহাকেও দেখিয়াছি। যাহা হউক আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জানিতে দিলাম না যে আমি ইঁহার কথা জানি। আমি ঔৎসুক্যসহকারে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন কি প্রকারে স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল; সেখানকার শাসনকর্ত্তা অতি সদয় প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাই রক্ষা, নচেৎ নিশ্চয়ই সেই ইংরেজ রমণী সেখানেই প্রাণ হারাইতেন। এই রমণীর কথা লাসার রাজ-সরকারে জ্ঞাপন করা হইল। তখনই মন্ত্রী মহাশয় প্রেরিত হইলেন। ইঁহার সঙ্গে প্রায় ৩০ জন লোক আসিল। নাকচুখাতে পৌঁছিয়াই মন্ত্রী মহাশয় ইংরেজ মহিলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে তিনি কিছুতেই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। যদিও ইংরেজ মহিলা তিব্বতী ভাষায় কথা বলিতেছিলেন তথাপি লাসার

ভাষার সহিত ইহার অনেক পার্থক্য। অনেক কষ্টে এই মর্ম্ম বুঝা গেল যে তিনি লাসায় গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় জানিতে চান। চীন সম্রাটের ছাড়পত্র তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, কিছুতেই নিরস্ত হইবার পাত্রী নন। তাঁহাকে যে কোন প্রকারে হউক তিব্বতে প্রবেশ করিতেই হইবে। মন্ত্রী মহাশয় শতবার নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন তিনি নিরস্ত হইতে চাহিলেন না, তখন তিনি বলিলেন যে তিব্বতে প্রবেশ করিলে যদি তাঁর প্রাণহানি হয় তাহা হইলে তিনি দায়ী হইবেন না। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর মহিলাটি নিরস্ত হইলেন। তখন উঁহাকে লোকজন দিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পথে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব চুরি হইয়া গিয়াছিল—তিব্বত রাজ-সরকার হইতে তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য দেওয়া হইল।

বিদেশী পর্য্যটকের তিব্বতরাজ্যে আগমন সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ১৩২৮ সালে পোবডিনো হইতে ওডোরিক (Friar Odoric) নামে একজন রোমান কেথোলিক ধর্ম্মপ্রচারক তিব্বতে প্রথম আগমন করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্ম প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিব্বতীগণ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, বরং তিনি লামাদিগের অলৌকিক ক্রিয়া কর্ম্ম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের কিছু কিছু অদ্যাবধি আছে, অধিকাংশই তিনি অগ্নিসাৎ করিয়াছিলেন।

(২) ১৬৬১ সালে দুইজন ফরাসী যুবক (Grueber এবং D 'Orville)—দুই ভ্রাতা, তিব্বতে প্রবেশ করেন। তাঁহারা লাসায় গিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না, তবে পিকিন হইতে লাসা দিয়া নেপাল যাইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

(৩) ১৭৭৪ সালে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গবর্ণর ছিলেন তখন তিব্বতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য বগ্‌ল্ (Bogle) নামক জনৈক ব্যক্তিকে তথায় প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি সস্ত্রীক সিগাট্‌সি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু লাসা পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই।

(৪) ১৭৮১ সালে হেষ্টিংস কাপ্তেন টারনারকে (Turner) আবার তিব্বতে প্রেরণ করেন। তিনি দুই বৎসর তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন।

(৫) ১৮১১ সালে টমাস মেনিং (Thomas Manning) ইংরেজদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লাসায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। হেষ্টিংসের বিলাতে প্রত্যাগমনের সঙ্গে ইংরেজদিগের সহিত তিব্বতের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যান্য ইউরোপীয়গণ তিব্বতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তাহাতেই তিব্বতের লোকের সন্দেহ উপস্থিত হয়, এবং তাহারা বিধিমতে তিব্বতে অপর জাতির প্রবেশের পথে বাধা দিতে আরম্ভ করিল।

(৬) ১৮৭১ সালে একজন রুষ (Colonel Prejevalsky) পূর্ব্ব সীমান্ত দিয়া খামের পথে তিব্বতে প্রবেশ করেন। লাসার ৫০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত আসিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। এই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আগমন করিয়া লাসার ১৭০ মাইল দূর পর্য্যন্ত আসিয়া তিব্বত রাজ্যের প্রবল প্রতিবন্ধকতার জন্য ফিরিয়া যান।

(৭) ১৮৭৯ সালে কাপ্তেন হিল (Captain Hill) নামক একব্যক্তি চীনের সীমান্ত হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। তাঁর পরেও ঐ পথে দুইজন জাপানী ধর্ম্মযাজক আসিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিবার অনুমতি না পাইয়া দেশে ফিরিয়া যান।

১৮৮১ এবং ১৮৮২ সালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের তিব্বতে প্রবেশের পর হইতে তিব্বতে অপর জাতির বর্জ্জননীতি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখন ছিল না। ১৮৮১ সালে শরৎবাবু সিগাট্‌সি পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসেন—১৮৮২ সালে লাসায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। তিনি নানা কলেকৌশলে ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়া নানা ছদ্মবেশে তিব্বতে ছিলেন—কিন্তু তথায় বেশীদিন ছিলেন না—এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসেন। শরৎবাবুর তিব্বতে আগমনের প্রকৃত তত্ত্ব যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন সমুদায় তিব্বতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; যে যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি তাঁর কোনরূপ সংসর্গে আসিয়াছিল তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইল। তাহাদের সমুদায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। তাহা ছাড়া কারাদণ্ড ভোগ

ইত্যাদি নির্য্যাতনের একশেষ হইল। অনেকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। সে-সমুদায় বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। শরৎবাবুর তিব্বত প্রবেশের পর হইতে তিব্বত রাজ্যের বর্জ্জননীতি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। এখন যেন তিব্বতের বালক বৃদ্ধ যুবা ডিটেক্‌টিভ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সময় হইতে অনেক বিদেশী তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তিব্বত সম্বন্ধে যে-সকল বৃত্তান্ত ভ্রমণকারীরা লিখিয়াছেন তাহা অনেক সময় অতিরঞ্জিত এবং সম্পূর্ণ কল্পিত। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় চীন সম্রাট দলাই লামাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে যদি তিব্বতে বিদেশীদিগের গতিবিধি অপ্রতিহত হয় তাহা হইলে অচিরে তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবাহিত হইবে। তদবধি তিব্বতীরা বিদেশীদিগের গতিবিধি সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তিব্বতের লোকের বিশ্বাস তিব্বতে বিস্তর স্বর্ণখনি আছে বলিয়া ইংরেজগণ তিব্বত অধিকার করিবার চেষ্টায় আছেন—কিন্তু রুষের প্রভাব যাহাতে তিব্বতে প্রবেশ করিতে না পারে এইজন্যই বোধ হয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত। তিব্বতরাজ্যের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে বিদেশীদিগকে কোন প্রকারে তিব্বতরাজ্যে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই তিব্বতের স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়। সম্প্রতি বিদেশী-বর্জ্জন-নীতি তিব্বতে অত্যন্ত প্রবল।

৫৯ অধ্যায়।

আবর্জ্জনাময় সহর।

আমি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে লাসার বাহিরের পথে ভ্রমণ করিতে গেলাম। পথটি সমুদায় সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছে। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ মাইল হইবে। এই পথটি ঘুরিয়া আসা তিব্বতীদের নিকট অতিশয় পুণ্যকার্য্য। এই প্রকার প্রদক্ষিণের দ্বারা সহরের সমুদায় মন্দির প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়। সচরাচর এই প্রকার প্রদক্ষিণের সময় প্রতি পাদক্ষেপে নমস্কার করিতে হয় কিম্বা প্রতি তৃতীয় পাদক্ষেপে প্রণিপাত করিতে হয়। আমরা কেবল বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, কেবল বেড়াইয়া আসিলাম—কিন্তু আমার পক্ষে মন্ত্রীমহাশয়ের সহিত হাঁটিয়া উঠা এক কঠিন ব্যাপার হইল। তিনি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিলেন, আমাকে রীতিমত তাঁর সঙ্গে ছুটিতে হইল।

লাসার পূর্ব্বদিকে এই পথের ধারে, এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম। চমরীর শিং দিয়া ঘেরা এক জায়গা; স্থানটি ১২০ কি ১৩০ গজ দীর্ঘ হইবে। এই স্থানটি বেড়া দিতে কত চমরীর শিংএর দরকার হইয়াছে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আমি মন্ত্রীমহাশয়ের নিকট এ কথা উল্লেখ করিলে তিনি পশুগুলির হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শিংএর বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিলাম ৩০টি চমরী বলির জন্য আনীত হইয়াছে—আমার সম্মুখে একটির বলিদান হইল। চীনে মুসলমানগণই না কি এই কসাইখানার অধ্যক্ষ। মন্ত্রীমহাশয় দুঃখিতভাবে বলিতে লাগিলেন "এ সব দৃশ্য দেখিলে আর মাংস খাইতে প্রবৃত্তি থাকে না, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি কি হীন—গৃহে গিয়াই যদি দেখি মাংস হয় নাই তাহা হইলে কত না বিরক্ত হই।" বাস্তবিকই তিব্বতীরা রাক্ষসের জাতি।

লাসার অন্যান্য রাস্তার ইহার সহিত তুলনাই হয় না। এমন জঘন্য ব্যাপার কখন দেখি নাই,—রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত্ত, আবর্জ্জনা, জল, কাদা—সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। পালে পালে কুকুর স্তূপাকার আবর্জ্জনা হইতে আহার্য্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। আবার ইহার আশেপাশেই অগভীর কূপের জল জনসাধারণে পান করে। "লাসা" কথাটির অর্থ দেবতার বিহার-ভূমি—এমন স্থানেও দেবতা বিহার করেন! শুনিয়াছি চীনের কোন কোন সহর অত্যন্ত কদর্য্য এবং অপরিষ্কার। কিন্তু লাসাকে হার মানাইতে পারে, এমন আবর্জ্জনাময় কদর্য্য সহর জগতে কোথায়ও নাই। তিব্বতীরা স্বাস্থ্যের কোন নিয়মই জানে না—কোন প্রকার সৌষ্ঠবজ্ঞান ইহাদের নাই। আমি অবাক হইয়া গিয়াছি, স্বাস্থ্যের সকল নিয়ম ভঙ্গ করিয়াও ইহারা কেমন করিয়া অব্যাহতি পায়। অন্য কোন দেশে হইলে, এখানকার আংশিকভাবে স্বাস্থ্যের নিয়মের হানি হইলেও মহামারিতে লোকে উৎসন্ন যায়। তিব্বতীদের কিছুই হয় না—বড় আশ্চর্য্যের কথা। বোধ হয় লাসা বড় স্বাস্থ্যকর স্থান। লাসায় শীত বড় প্রচণ্ড—গ্রীষ্মকালে কদাচ ৮০° ডিগ্রীর উপর উত্তাপ হয় না। আমি

বিস্তর দেশে ভ্রমণ করিয়াছি,কিন্তু লাসার মত স্বাস্থ্যকর স্থান দেখি নাই। এইজন্য তিব্বতীরা এমন কদর্য্য স্থানে বাস করিয়াও স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করে। লাসার পথে যখনই বেড়াইতাম, তখনই এই কথাই ভাবিতাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা দেবী।

কবি এ, ই'র স্বাজাত্যের আদর্শ

(১)

আইরিশ কবি এ,ই'র কাব্য-পরিচয় গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে প্রবাসীর পাঠকগণ পাইয়াছেন। এই প্রচ্ছন্ননামা কবি, যাঁর আসল নাম জর্জ্জ উইলিয়ম্ রাসেল, শুধু যে কাব্যের ভাব-সুধা পরিবেষণ করিয়া আয়র্লণ্ডবাসীর মন হরণ করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি আয়র্লণ্ড-চাষীর উন্নতি সাধনের জন্য নানা আয়োজন করিয়া তার মনোদৈন্যেরও পূরণ করিয়াছেন। বোধহয় তাঁর পরিচয়-হিসাবে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, জর্জ্জ রাসেল আয়র্লণ্ডের বিস্তর হিত-কর্ম্মে সমবায় ও যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী সুবিখ্যাত স্যর হোরেস্ প্লাঙ্কেটের সহযোগী।

সম্প্রতি কবি এ,ই'র "The National Being" অর্থাৎ জাতীয় সত্তা নামক এক বই বাহির হইয়াছে। এ বইখানি তাঁর অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফল, অথচ ইহা কবির রচনা বলিয়া ইহার মধ্যে যেমন শাঁসও আছে তেমনি রসও আছে। তিনি আয়র্লণ্ডের চাষা রায়তদের মধ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাদের অবস্থার উন্নতি কি ভাবে সাধিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থে অনেক কেজো প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—কিন্তু চাষাদের উন্নতি সাধনের সমস্যাটা তাঁর কাছে অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাও নয়। তিনি অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতিকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া খোপে-খোপে ভাগ করিয়া দেখেন নাই; যে এক মহামনুষ্যত্ব-নীতি প্রতি মানবকে তার স্বাতন্ত্র্যে স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত করিবার দিকে নীত করে, সেই নীতির তরফ হইতেই তাঁর এসব আলোচনা। মানুষ একই কালে কি করিয়া স্বতন্ত্র হইয়াও সমগ্রের যোগে পূর্ণ হইতে পারে, কবি এ, ই'র কাছে এইটেই সকলের চেয়ে বড় সমস্যা, অন্য সমস্ত সমস্যাই এরি অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং আলোচ্য বইখানিতে আমরা মানব-সভ্যতা তথৈব জাতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কবির মানসের পরিচয় পাইব। তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমিদং অসৃজত। মানসের দ্বারা তিনি এই সমস্তই সৃজন করিলেন। সকল সৃজনের মূলেই এই মানস —এই ভাব-বস্তুই কর্ম্মের মধ্যে তিলে-তিলে রূপ-বস্তু হইয়া উঠে।

আমার মনে আছে কিছুকাল পূর্ব্বে বেঞ্জামিন কিডের "Principles of Western Civilisation" নামক একখানি সুবিখ্যাত বই পড়িয়াছিলাম—তাতে প্রতীচ্য সভ্যতার মূলতত্ত্ব যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে, লেখক তার সংজ্ঞা দিয়াছেন—"Projected efficiency" অর্থাৎ প্রসর্পিত সাফল্যলাভের শক্তি। তার মানে, যে শক্তি শুধু বর্ত্তমান কালটুকুর মধ্যেই ফল ফলায় না, ভবিষ্যৎপর্য্যন্ত সেই ফলকে প্রসর্পিত করে। অর্থাৎ প্রতীচ্য সভ্যতার ভিতরকার কথা এই যে, তাহা আপনার রাজ্য সাম্রাজ্য, কলবল এবং সকল রকম ঐহিক সমৃদ্ধিকে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত দম দিয়া জাগাইয়া রাখিতে পারে।

এ,ই বলেন—ওটা ত সভ্যতার দেহের কথা, দেহীর কথা নয়। তিনি বলেন, সকল জাতির যেমন একটা দেহ আছে, তেমনি সেই দেহের অধিষ্ঠাতা একটি আত্মাও আছে। জাতীয় আত্মার অধিষ্ঠান সেই দেহটা—অভিজাততন্ত্র বা গণতন্ত্র, সৈন্যতন্ত্র বা সমূহতন্ত্র যে-কোন তন্ত্রের রূপ ধারণ করিতে পারে। কিন্তু সেটা তার দেহের রূপ। ঐ জাতীয় দেহ-রূপটা জাতীয় আত্মার স্বরূপেরই বহিঃপ্রকাশ। একটা জাতির অন্তরের মধ্যে যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য কল্পনা চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি সঞ্চিত থাকে, সেই পরিমাণেই সে বড় হয় বা ছোট হয়। কেহ যদি মনে করেন যে, ইংলণ্ড বা জার্ম্মানী কেবল ক্ষাত্রশক্তির জোরেই বড় হইয়াছে, তবে সেটা তাঁর ভুল। কেননা, কত দীর্ঘকালের জ্ঞানবিজ্ঞানের তপস্যা, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, কত যুগের কত ধ্যানের পরে তবে ইংলণ্ড-জার্ম্মানীর

শক্তি-সমৃদ্ধির বাহ্য বিকাশ দেখা দিয়াছে। সুতরাং কোন জাতির বাহিরের অবস্থাটাও তার ভিতরকার জীবনের পরিমাপক হয়। আয়র্লণ্ডের দীনহীন ও শ্রীহীন শহরগুলো সৌন্দর্য্য-শ্রীর প্রতি তাদের উপেক্ষার দ্বারাই আয়র্লণ্ড-বাসীর চরিত্রকেও জ্ঞাপন করে। মনে হয়, ঐ রকম নাগরিকই যেন ঐ রকম নগরের সঙ্গে ঠিক্ খাপ খায়। জাতীয় আত্মার মধ্যে যখন আমরা একটা মহোচ্চ জগৎ সৃষ্টি করিতে বসিয়া যাই, তখনই দেখিতে-দেখিতে সমস্ত দেশটার বাহিরের চেহারারও বদল হইতে থাকে; তাহা লাবণ্যের মণ্ডনে ও শ্রদ্ধার স্রকৃচন্দনে ভূষিত হইয়া উঠে।

এই উপলক্ষ্যে রাসেল আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। সেখানকার অবস্থার সঙ্গে আমাদের অবস্থার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই। রাসেলের কথা হইতেই পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

রাসেল বলেন, স্বারাজ্য সম্বন্ধে আমরা যতই উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করি না কেন, আয়র্লণ্ডে আমরা যে কি ধরণের সভ্যতা গড়িতে চাই, সে সম্বন্ধে আমাদের কারো কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। তার কারণ, আয়র্লণ্ডের জাতীয় আত্মার মধ্যে সেই বৃহৎ আন্তর জগৎ এখনো সৃষ্ট হইয়া উঠে নাই। খ্যাতিমান্ আইরিশদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া শক্ত যিনি কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যাকে বেশ সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিতে পারেন। এই কারণে আয়র্লণ্ডে এখন কেজো লোকের চেয়ে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ্, ভাবুক, অধ্যাপক ও সাহিত্যিকের প্রয়োজন বেশি। তাঁরা জাতীয় চেতনার এই ধূসর ঊষরতাকে যথার্থ চিন্তার দ্বারা আকীর্ণ করিয়া দিবেন, শূন্যতাকে পূর্ণতায় পরিণত করিবেন। এ কথা অনেকেই স্বীকার করিতে না চাহিলেও ইহা সত্য যে, আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোকই ভাল এবং মন্দ চিন্তার মধ্যে বিশেষ করিতে জানে না। তাদের কাছে সব রকমের চিন্তারই তুল্য মূল্য—সেই জন্য অধিকাংশ লোক হৃদয়াবেগের প্রকাশকে চিন্তার প্রকাশ বলিয়া ভুল করে। তারা কুলক্রমাগত সংস্কার, রুচি ও রাগদ্বেষ প্রভৃতিকে ভাষার মুখে ছাড়িয়া দিয়া মনে করে যে চিন্তাকেই তারা ভাষিত করিল। তাই দেখিতে পাই যে, হৃদয়াবেগ জিনিস আয়র্লণ্ডের পলিটিক্সে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে জগতে হৃদয়াবেগের শক্তি যথেষ্ট; কিন্তু স্বাজাত্য-সংগঠনে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। জাতীয় জীবন-যাত্রা হৃদয়াবেগের মত ভয়ানক চালক আর কেহই হইতে পারে না। অথচ এই চালকের হাতেই আয়র্লণ্ড আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। আমাদের বলা হয় যে, পোলিটিক্যাল নেতাদের উপর আস্থা রাখা কর্ত্তব্য। কেননা, আর যাই হোক্ তারা দেশকে ভালবাসে। তার ফলে হইয়াছে এই যে, স্বাজাত্য গড়ার আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের বোধ ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহা ব্যাপ্ত হইবার সুযোগ পায় নাই। মহত্ত্বের পরে যে ভালবাসার নির্ভর নয় সে আপনার হীনবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য আপন প্রিয়জনের জীবনই যে বিনষ্ট করিয়া বসে, ইহার উদাহরণ পৃথিবীতে কি আমরা দেখি নাই?

সুতরাং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া জর্ম্মান ভাবুক, বৈজ্ঞানিক, কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ জর্ম্মানীর জন্য যাহা করিয়াছেন, কিম্বা প্রাচীন গ্রীসের কবি ও শিল্পীর দল এথেন্সের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, আয়র্লণ্ডের জন্য আইরিশদিগকে তাহাই করিতে হইবে। অর্থাৎ এমন-সকল বড় বড় জাতীয় আদর্শকে সৃষ্টি করিতে হইবে যাহা রাষ্ট্রনৈতিকের নীতিকে সুনীত করিবে, দেশবাসীসকলের কাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবে, বিশ্ববিদ্যালয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রশাসনবিভাগ, সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিবে এবং গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনকে সমভাবসূত্রে গাঁথিয়া তুলিবে। এ যদি না হয়, তবে আয়র্লণ্ডের স্বাজাত্য পর্টুগাল প্রভৃতির মতো সেই-সমস্ত বিকৃত, খর্ব্ব, কাণাকড়ির দরের স্বাজাত্যের সদৃশ হইবে মাত্র—তার বাহিরে উপদ্রব ও তার ভিতরে বিপ্লব নাড়া দিতে থাকিবে। তখন তার স্বাজাত্য প্রাণহীন, তাহা যান্ত্রিক বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

(২)

পুরোহিত-তন্ত্র-দেশে জাতীয়সত্তা দেবতা-বিশেষে প্রকাশ পায়; অভিজাততন্ত্র দেশে তাহা বীরচরিত্রকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু গণতন্ত্রে জাতীয়সত্তার মানে অগণনজনের সমষ্টিগত সত্তা। এ যুগ গণতান্ত্রিক যুগ;

পুরোহিততন্ত্র, অভিজাততন্ত্র কোনটাই এ যুগে আর চলিবে না। কিন্তু এ যুগে গণতন্ত্রের বোধন হইলেও যজ্ঞবেদিকায় তার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেই কারণে গণতন্ত্র যে আমাদের মনে খুব একটা ভরসা জাগায় তা নয়। প্রাচীন-কালে এথেন্সেও গণতন্ত্র ছিল; কিন্তু তার ভিত্তিতে ছিল ক্রীতদাস ও দাসশ্রেণী। সেই বহুসংখ্যক শূদ্রজাতির কায়িক শ্রমের ফল এথেন্সের অল্পসংখ্যক নাগরিকগণ ভোগ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র-জীবনের ভূমিকা পত্তন করিয়া-ছিল। একালে গণতন্ত্রের চেহারার যে বিশেষ বদল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতন্ত্র আছে বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র কোথায়? শ্রম-শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এখনও দেখি সেকালের অভিজাত-তন্ত্রের মত একদল ধনী রাজতক্তে বসিয়া আছে। তাদের সেই উচ্চ মঞ্চটার নীচে কারখানার কারারুদ্ধ শ্রমীর দল; তারা ভোট্ দিবার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাদের প্রাণান্ত পরিশ্রমের সকল ফল সেই একালের ধন-দেবতাগণের চরণেই অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদিত হইতেছে। শুধু রাষ্ট্র-জীবনে এই বিপুল জন-বাহিনীকে ভোটের শরিক মাত্র না করিয়া সামাজিক জীবনে —অর্থের অর্জ্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে—ইহাদিগকে যদি আমরা আমাদের ভোগের ও আনন্দের যথার্থ শরিক করিতে পারি, তবেই রক্ষা, নতুবা ঐ বিশ্লিষ্ট-বিচ্ছিন্ন সমাজ-ভিতের উপর যে অত্যুচ্চ-বিরাট্ রাষ্ট্র ইমারত্ রচনা করিয়া আমরা গণতন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিয়াছি, তাহা কোন্ দিন চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যাইবে। বর্ত্তমান সভ্যতার এইখানেই সবচেয়ে বড় গলদ। একালে শিক্ষার দ্বার শুধু অভিজাতের জন্য উন্মুক্ত, আর হীনজাতের জন্য রুদ্ধ থাকিবে, ইহা যখন হওয়া অসম্ভব, তখন শিক্ষার হাওয়ায় সমভাবে বর্দ্ধিত মানুষগুলির মধ্যে কোন রকমের কৃত্রিম ব্যবধান আর টেঁকে কি? শ্রমীরা করিবে শ্রম আর অশ্রমীরা করিবে ভোগ এবং অশ্রমীদের সেই ভোগের উচ্ছিষ্টে শ্রমীদিগকে হইতে হইবে সন্তুষ্ট—এ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চলা শক্ত। আয়র্লণ্ডে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে, রাসেল বলেন—তাহা এই শূদ্রদিগকেই মর্য্যাদা দান করিবে। এই শূদ্ররাই হইবে সেই সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। কেননা এই শূদ্রদিগকে লইয়াই ত আয়র্লণ্ডের আয়র্লণ্ডত্ব। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষক বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী বাকি থাকে? কথাটা বাংলাদেশের লোকেরও ভাবিয়া দেখা উচিত।

তাই রাসেল লিখিতেছেন যে আয়র্লণ্ডের "Primitive economic Cave-man" ঐ আদিম গুহাবাসী চাষীটিকে তার গুহা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাকে বৃহৎ বিশ্বের লেনা-দেনার সহস্রধারার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। সার হোরেস প্লাঙ্কেট্ কৃষি-সমবায়-সমিতি গড়ার দ্বারা আয়র্লণ্ডের কৃষি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই মুক্তির সংবাদ আনিয়া দিয়াছেন। এই সমবায় সমিতির কাজের পত্তনের আগে গ্রাম্য আয়র্লণ্ডের অবস্থাই বা কি ছিল আর এই সমিতির কাজের পত্তনের পরেই বা তার অবস্থাটা কি দাঁড়াইল, তাহা তুলনা করিয়া দেখিলেই 'পথ ও পাথেয়' সম্বন্ধে আর দ্বিধার স্থান থাকিবে না।

প্লাঙ্কেটের সমবায়ের মুক্তির সংবাদ পৌঁছিবার আগে আইরিশ চাষীর শ্রম-গুহার ভিতরকার তত্ত্বটা লওয়া যাক। ধরা যাক সে চাষীর নাম যেন প্যাট্রিক মেলনি। তার সম্বলের মধ্যে বিঘা কতক জমি, গোটা পাঁচ সাত গরু ভেড়া আছে। পুরুষানুক্রমে তার কৃষিকার্য্যে কোন পরিবর্ত্তন নাই। গ্রামের পাইকেড়দের সঙ্গে তার কার্‌বার —তাদের খুদে খুদে অসংখ্য দোকান গ্রামটিতে আকীর্ণ এবং সেই-সব দোকান হইতেই চাষীরা তাদের নিত্য প্রয়োজনের সামগ্রী আহরণ করে। সুতরাং এ অবস্থায় জিনিসের দাম ত কমেই না, বরং ক্রমশ বাড়িয়াই চলে; আর সেই-সব গ্রাম্য মহাজনদের কাছে ধারে মাল কিনিয়া ক্রমশ চাষীদের ঋণ ও তার সুদের মাত্রা এমনি বাড়ে যে তার জোত-জমা পর্য্যন্ত হয়ত চিরতরেই বাঁধা রাখিতে হয়। কৃষির ফসল যে কোথায় যায়, এবং কি ভাবে খরচ হয়, তাহা প্যাট্রিক মেলনি জানে না—কেননা economic জ্ঞান তার আদৌ নাই। সে ঐ গুহাটুকুর মধ্যেই তার মহাজনের পাহারায় চিরকাল নজরবন্দী হইয়া আছে; তার বাইরে অর্থনৈতিক জগতের যাচাই-জোগানের বৃহৎ কার্‌বারের খবর তার গুহার মধ্যে পৌঁছেই না।

কিন্তু সমবায়ের বার্ত্তাটা কানের ভিতর দিয়া তার

মরমে পশিবার পর ঐ প্যাট্রিক মেলনির গুহা হইতে মুক্তি হয় কি উপায়ে? সমবায়-কৃষি-সমিতির সভ্য হইয়া সে কৃষি-বিজ্ঞানের বিচিত্র তথ্যের খবর পায়। সে তখন 'ব্যাক্‌টিরিয়া'-তত্ত্ব জানিল। আগে যে-সব অঘটন সে দুষ্টু পরীদের কাণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করিত, বিজ্ঞানের অঞ্জন-শলাকায় তার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিতেই সে তার কারণ-করণ সবই সম্‌ঝিয়া লইল। 'এক্‌স্‌পার্ট' বা বিশেষজ্ঞদের পরে তার শ্রদ্ধা জন্মিল। ক্ষেত্রের অজন্মা, পোকার উপদ্রব, গোরু-ভেড়ার রোগ, দুধ দই মাখমের বিকারের সংস্কারের বা প্রতীকারের জন্য সে আর বাপ-পিতামহের আমলের ব্যবস্থার দোহাই পাড়ে না; ঐ বিশেষজ্ঞদেরই শরণাপন্ন হয়। তারপর সমিতির সাহায্যে তার economic জ্ঞান জন্মিল; সে এখন জানে যে তার কৃষির ফসল বা তার গোয়ালের রসদ্‌গুলো যায় কোথায়। জগতের হাটের ছবি এখন তার চোখের সাম্‌নে; সে জানে যে আমেরিকান্‌, ইউরোপীয় ও কলোনিবাসীদের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা। ঐ প্রশস্ত হাটের দৃশ্যটাকে এতকাল পর্য্যন্ত যে-সব মহাজন-রূপী মধ্যবর্ত্তী ছোট বড় পাহাড় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাদের সেই অবরোধ হইতে তার দৃষ্টির মুক্তি হইতেই সে জানিল যে, সে সমস্ত জগতেরই একজন অধিবাসী। তখন সে বুঝিল যে, ঐ জগতের লেনাদেনার মধ্যে তার স্থানটা ফলাও করিতে গেলে তার দেশের সঙ্গে তার যোগটা আগে নিবিড় হওয়া চাই। কাজেই শুধু গ্রাম্য সমিতি নয়, দশটা গ্রাম্য সমিতি মিলিয়া জেলাসমিতি, জেলাসমিতি হইতে প্রাদেশিক সমিতির বৃহৎ সম্মিলনের ভিতর দিয়া ঐ প্যাট্রিক মেলনি সমস্ত আয়র্লণ্ডের শ্রম শিল্প-ব্যবসায়ের একটা সমগ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। এতদিন পর্য্যন্ত যার কাছে আয়র্লণ্ড নামক দেশ-পদার্থটা একটা পৌরাণিক কাহিনীগত সত্তা ছিল, কাব্যে গানে লোক-গাথায় যার স্তবস্তুতি সে শুনিয়াছিল, এখন সেই অবাস্তব কল্পিত দেশটাই তার কাছে বাস্তব প্রত্যক্ষ বহুজনসত্তাময় জাতি-রূপ ধারণ করিয়া দাঁড়াইল।

কল্পিত প্যাট্রিক মেলনির এই মুক্তির চিত্রটা একেবারেই কল্পিত নয়। আয়র্লণ্ডের উত্তরপশ্চিমে একটা জেলায় এই পতিত্‌ 'মানব জমীন্‌' আবাদ্‌ করিয়া সত্যসত্য সোনা ফলানো গেছে। সেখানে চাষীদের সমবায়-সমিতি দ্বারাই আম্‌দানী-রপ্তানি লেনাদেনা সমস্তই স্থিরীকৃত হয় লাভ যাহা দাঁড়ায় তাহা সমিতির সমবায় সম্পত্তি বলি[য়া] গণ্য হয়। গ্রামের মাঝে তাদের নাটমন্দির রচি[ত] হইয়াছে; সন্ধ্যার পর অবকাশের সময়ে সেখানে কন্‌সা[র্ট] নাচ গান আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। কোন কো[ন] জায়গায় কৃষির সমস্ত কার্‌খানাগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে;—যে-সকল মিতশ্রমিক য[ন্ত্র] এখনকার কালে উদ্ভাবিত হইতেছে, সেগুলি সেখানে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু সেগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষে[র] সম্পত্তি নয়,—সমিতির সম্পত্তি। গ্রামের সকল অভা[ব] মোচনের পর উদ্‌বৃত্ত ফসল ও অন্যান্য বস্তু জেলা-সমিতি বা অন্য কোন বড় সমবায়-সমিতির কাছে পাঠানো হয় সেখান হইতে তাদের রপ্তানির ব্যবস্থা হয়। এম্‌নি করিয়া যারা আগে শুধু চাষ জানিত, তারা এখন বিজ্ঞানের শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্র ব্যবহারে ওস্তাদ-কারিগর হইয়া উঠিয়াছে। সমবায়-সমিতির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্‌খানা—ছুতোরের কার্‌খানা, কামারের কার্‌খানা প্রভৃতি স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে। গ্রামে স্কুল, লাইব্রেরী, কুস্তির আখ্‌ড়া, স্ত্রীলোকদের শিল্প সমিতি, এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদের কাজ সুচারুরূপে চলিতেছে। বড় বড় সমবায়ের কেন্দ্র তাদের পরিধিস্থ ছোট ছোট গ্রাম্য সমবায়ের আম্‌দানি-রপ্তানি ক্রয়-বিক্রয় স্থির করিয়া দিতেছে বলিয়া সেই কেন্দ্রগত সমবায় এই-সকল শিরা-উপশিরারূপী ছোট ছোট সমবায়ের হৃৎপিণ্ডের মতো হইয়াছে। এই সমবায়-কেন্দ্রগুলিই ত সমস্ত জাতির যথার্থ প্রাণ-কেন্দ্র; ইহাদের সম্মিলন বা সঙ্ঘকেই ত যথার্থ পার্লিয়ামেণ্ট বলা উচিত। একদিন ইহাদের দ্বারাই জাতির নূতন রাষ্ট্রসভা গঠিত হইবে। কেননা, এই সমবায়-কেন্দ্রগুলি ভোট্‌ দিবার কেন্দ্র নয়; ইহারা জীবন-কেন্দ্র; সমস্ত জাতির হৃদ্‌-স্পন্দন এইখানে অনুভব করা যায়।

(৩)

কবি এ, ই'র এই National Beingএর আলোচনার সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে

ও সমসমকালে লিখিত প্রবন্ধাবলীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। কবি রবীন্দ্রনাথের সে-সকল রচনা তের চৌদ্দ বছর পূর্ব্বে লিখিত ; এ, ই'র গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত ; নহিলে আমাদের দেশের অনেক ষট্‌পদ সমালোচক এই সাদৃশ্যকে কুদৃশ্যে পরিণত করিয়া ছাড়িতেন। Plagiarism এর অপবাদ যদি কাহাকেও দিতে হয় তবে রবিবাবুকেই দেওয়া উচিত ; কেননা এযুগের সাহিত্যে এমন কোন আইডিয়া—অনেক সময় উপমা ও রূপক—দেখিতে পাই না যাহা তাঁর শিল্প-প্রাসাদের অঙ্গে কোথাও না কোথাও ভূষণের মতো সাজিয়া না আছে। শুধু এ যুগের সাহিত্যের কথা বলি কেন, ক্লাসিক সাহিত্যের রত্নরাজিকেও তিনি ছাড়েন নাই। তবে এ ভূষণকে যিনি দূষণ মনে করেন, আর যাই হোক্ সাহিত্যের হাটে তাঁকে পাকা জহরী মনে করা চলে না।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক জাতির যেমন একটা দেহ আছে তেম্‌নি একটা আত্মা বা প্রাণ আছে এবং দেহটা যে সেই প্রাণেরই বহিঃপ্রকাশ, রাসেলের মতো এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের সেই প্রাণ-বস্তুটি কি তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে তিনি লিখিতেছেন :—

"ইংরেজ বল, ফরাসী বল, কোন দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কি, দেশের মূল মর্ম্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে।"

ভারতবর্ষের এই 'প্রাণ'টির অভিব্যঞ্জনা কবি ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য-পুরাণ, লোক-গাথা, সামাজিক আচার ব্যবহার, সমস্তের ভিতর হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন —তাঁর পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন।

রাসেল যে আয়র্লণ্ডের দেশহিতৈষীদের অসারতা ও শূন্য ভাবোন্মাদের বর্ণন করিয়াছেন, সে বর্ণনার সার কবির প্রবন্ধাবলীতে বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—"মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা বড় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষীর নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছিল।......দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশ-হিতৈষিতার একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম।...... স্বদেশকে মুখ্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না।"—"শিক্ষা" পৃঃ ৩৪, ২৪।

তারপর, দেশহিতব্রতে হৃদয়াবেগের দ্বারা চালিত হওয়া যে অনিষ্টজনক, এ সম্বন্ধেও রাসেলের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ বহুবার আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—"হৃদয়াবেগ জিনিসটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলি অন্তরে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মত কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্ম্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।"—"রাজাপ্রজা" ১২৭ পৃঃ।

রাসেল যে লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ডিমোক্র্যাসিতে শ্রমীরা স্বাধীন নয় এবং ভোট দিবার স্বাধীনতা যথার্থ স্বাধীনতা নামের যোগ্য নয়, রবীন্দ্রনাথের রচনায় সে কথার সায়ও নানা জায়গাতেই আছে। তিনি লিখিতেছেন :— "বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন এক জায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোট ছোট সামর্থ্যগুলিকে বল-পূর্ব্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না।... বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে।" "ইউরোপ যাহাকে 'ফ্রীডাম' বলে...তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে।"—"স্বদেশ" —৩৫,৩৬,৪৩।

রাসেল যেটা আয়র্লণ্ডের প্রধান সমস্যা মনে করেন, তাহা এই যে, আয়র্লণ্ডের গ্রাম ও গ্রামবাসীকে তার ক্ষুদ্র-স্বার্থবদ্ধ economic গুহা হইতে মুক্ত করিয়া বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে আদানপ্রদানের বিচিত্র সম্বন্ধে যুক্ত করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথও ভারতবর্ষেরও তাহাই প্রধান সমস্যা বলিয়া

মনে করেন। তাঁর 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি সেই কথাই লিখিয়াছেন :—"প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে।...আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম, আচার-ব্যবহারের, আমাদের সর্ব্বপ্রকার আদানপ্রদানের বড় বড় রাজপথ এক-একটা ছোট ছোট মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই।"

তারপর যে কৃষিসমবায়ের দ্বারা আয়র্লণ্ডে এই সমস্যার সমাধান হইতেছে বলিয়া রাসেল লিখিয়াছেন, তার 'প্ল্যান্' রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে দিয়াছিলেন। রাসেল যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াছেন, সে অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের না থাকিলেও উভয়ের 'প্ল্যান্' হুবহু এক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই অভিভাষণে লিখিয়াছেন :—

"কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্ম্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

"জোৎদার ও চাষা রায়ৎ যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অস্বচ্ছল অবস্থা ঘুচিবে না।...য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানা প্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে...যদি এক-একটি মণ্ডলী নিজের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে।...

"এম্নি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে।"

রাসেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা গড়ার আদর্শের এবং তার প্রকরণ-পদ্ধতির যে সাদৃশ্য দেখানো গেল, তাহাতে সংশয়ী পাঠকের মনে অনেক প্রশ্ন ওঠা অনিবার্য্য। প্রধান প্রশ্ন এই যে, আয়র্লণ্ডে যে উদ্যোগ সহজেই খাড়া করিয়া তোলা যায়, এদেশে তাহা কি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে না? কেননা, আমাদের সরকার এ-সকল উদ্যোগকে ত একমুহূর্ত্তও প্রশ্রয় দিবেন না। কথাটা সত্য হইলেও বলি, যে, দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা সত্যসত্যই যদি প্রস্তুত হই, তবে নিগ্রহ সহিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। নিগ্রহ যত বড়ই হোক, দেশকে সেবা করিবার আগ্রহ প্রবল থাকিলে তাকে নিরস্ত হইতেই হইবে। স্বায়ত্তশাসন আমরা বাহির হইতে পাইতে পারি, কিন্তু যথার্থ আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ভিতর হইতেই গড়িয়া না উঠিলে পরদত্ত অনুগ্রহ আমাদের স্বায়ত্ত সম্পদ্‌রূপে কোন দিনই পরিগণিত হইবে না। এ সম্বন্ধে রাসেলের একটি পাকা কথা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই। তিনি লিখিতেছেন :—"Europe by its conflicts to-day is reducing itself to barbarism and powerlessness, and these conflicts arose out of the internal conflicts in society, for individuals and nations act outside themselves as they act inside themselves. The problem for Europe is to create a harmonious life and the creation of a harmonious life among a people must come from WITHIN."

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

গৌরী

গৌরী ছিল নাম সে মেয়েটির ;
নামের মতন রূপও ছিল চোখের অরুচির
অব্যর্থ আরাম।
খুঁজ্‌লে সকল গ্রাম
তেমন আঁখি কালো জ্যোতির্ম্ময়
তারি মুখে মিল্‌বে কেবল, আর কোথাও নয় ;—
বড় বড় তেমন টানা চোখ
চিত্রে যদি দেখে' থাকে লোক ;
ভুরু দুটি তুলি-আঁকা ;
কোঁক্‌ড়া ঘন কেশের রাশি ফিঙে পাখীর পাখা—
ঢেউ খেলিয়ে কালো ঝর্‌ণা পড়্‌ছে যেন ঝরে'
মাথা হ'তে পা পর্য্যন্ত বর্ণটি তার আরো সরস করে'।
চটুল চপল চরণ দুটি, কণ্ঠখানি কলস্বরে ভরা,
হিমগিরির নির্ঝরিণী রবির তেজে প্রথম তুষার-ঝরা।

এই ত গেল গৌরী ;
এদিকে তার পাষাণ পিতার নাইক কাণা কৌড়ি ;
তাই সে পিলে-বোঝাই-করা শ্মশানমুখো বরে
নানানরকম ফন্দী-ফিকির করে'
মেয়েটিরে গছিয়ে দিলে বাপে ;
বরণকালে জামাই দেখে' মায়ের পরাণ আতঙ্কেতে কাঁপে।

আট বছরের মেয়ে—
চুপটি করে' ভয়ে-ভয়ে দেখ্‌লে শুধু চেয়ে ;
চক্ষে তাহার উঠ্‌ল জ্বলে কি এক দহন-জ্বালা !
সাঙ্গ হ'লে স্ত্রী-আচারের পালা,
অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়্‌ল বাসরঘরে—গলায় ফুলের মালা।

পরের দিনে বাজ্‌না বাজে ; কনে' তুল্‌তে আসে—
কিন্তু যাবে না সে
কোনমতেই শ্বশুরবাড়ী ; সবাই যেমন কাঁদে,
যাত্রাকালে মায়ের গলা দুহাত দিয়ে ছাঁদে,
তেমনতর কর্‌লনাক ঠিক,
সে শুধু তাঁর কাতর চোখে তাকিয়ে মায়ের দিক

পাথর হয়ে রইল বসে' বুকের বোঝা বয়ে ;
মুখ দেখে' তার বাপও কেমন ভয়ে যেন রইল অবাক হয়ে !
চোখ দুটি তার নীরব ভাষায় বাপেরে বল্লে সে—
এমনি করে' তাড়িয়ে দেবে শেষে !
বেশী কিছুই চাহিনি আমি, ওগো ! একটু ঠাঁই
এইখানেতে চাই ;
তাও আমায় পার্‌লে নাকি দিতে—
এম্‌নি করেই বিদায় করে দিলে পৃথিবীতে !
ওদিক থেকে পড়্‌ল তাড়া—আকাল পড়্‌বে যাবার !
মা কেঁদে কয়, অমন করে' থাকিস্‌নাক, লক্ষ্মী মাণিক আমার,
দুদিন বাদেই ফিরিয়ে আন্‌ব আবার।

শুভ কাজের শান্তি বহি' শিরে
যেতেই হ'ল ; সেথান থেকে যেদিন এল ফিরে,'
সবাই দেখ্‌লে চেয়ে--
কেমন যেন বদ্‌লে গেছে মেয়ে !
আর সে সহজ চলন নাইক, ভয়ে যেন আস্তে ফেলে পা ;
কথা হাসি, সবই আস্তে ; লোকে বলে, বোসের মেয়ে না ?

সাথের দাসী শ্বশুর-ঘরের বল্লে অনেক কথা--
মস্ত বাড়ী, অমুক-তমুক, আদর লৌকিকতা,
মায়ের কাছে ; শোনেন তিনি কানে,
মেয়ে শুধু গলাটি তাঁর জড়িয়ে ধরে' কি ভাবে কে জানে !
বল্লে দাসী—আপন বড় কিন্তু কেহ নাই,
ছিলাম বটে—ক'দিন বড় ফাঁকা ঠেক্‌ল তাই।

বাপের হাতের লাগান' গাছ ফল্‌ল সত্য, মায়ের মনের ভয়,
গৌরী হ'লেও স্বামী ত তার নয়ক মৃত্যুঞ্জয় !
দুটি মাসও না ফুরাতেই তাই,
সত্য লোহা ভাঙ্‌তে হ'ল, সিথার সিঁদুর মুছ্‌তে হল, হায় !
'হার্টে' নাকি রোগ
ঘটালে এই নিতান্ত দুর্ভোগ।
পাড়ার লোকে বল্লে নানান্ কথা,
কেউ বা বল্লে—মানুষ নয়ক ; এমন বর্ব্বরতা
কর্‌তে পারে হয়ে আপন পিতা !
কেউবা একটু হেসে বল্লে—তোমরা বুঝবে কি তা'—

টাকার জন্যে কি না করছে লোকে ?
দেখ্‌লেনাক—সকল দেনা দিব্যি কেমন দিলে একটি রোখে !

পিতা কিন্তু কথা কয়না বড়,
মায়ের মাথায় বজ্র পড়্‌ল ; নারীর পরাণ দড়,
তাই সে চেপে রইল কোনমতে,
কন্যারে তার বক্ষে টেনে, পা বাড়িয়ে সর্ব্বনাশের পথে।
মেয়ের চোখে অশ্রু বড় নাই,
মাকে কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে কভু কখনো বা সঙ্গে কাঁদে তাই।
তারি কাছে রইল পড়ে' মেয়েটি তার,
পোড়া কপাল শ্বশুর-বাড়ীর! কার কাছে সে দাঁড়ায় তখন আর ?

কাল কি কারেও ছাড়ে ?
বছর-বছর মেয়ের বয়স বাড়ে।
আট থেকে সে ষোলয় প'ল, বুঝ্‌ল ক্রমে নিজে—
অবস্থা তার কি যে !
অশন বসন শাসন হয়ে ক্রমেই চারিধারে
উঠ্‌ল জেগে পদে-পদে—আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন দিয়ে তারে ;
ঘাটে যাওয়া বন্ধ হ'ল কবে,
ছাতের হাওয়া—পরশ তারো ধর্ম্মে নাহি স'বে ;
বাহির দোরের সিউলি গাছের ছায়া—
সেও যে কখন সরে' গেছে সঙ্গে নিয়ে কত দিনের মায়া।
ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘরটি খোলা ;
কুট্‌নো কোটা, বাট্‌না বাঁটা, জিনিষ পাড়া তোলা—
এই শুধু কাজ ; অনেক সময় তাও যে রয় বাকী!
কথা কবার লোকটিও নেই ; মাসী জেঠী কাকী
ঠাকুমা-পিসী—কোনো বুড়ীই নাই ত্রিসীমানাতে—
কইবে কথা আর তবে কার সাথে!
দুটি একটি ভাগ্‌নে ভাইপো যদি বা কেউ আসে,
আত্মীয় হোক্‌—তা সে,
তাদের সামনে বাহির হওয়া, তাও কি কভু হয় ?
নেহাৎ কচি নয়ক তারা, নেহাৎ বুড়োও নয়!
— কথা কওয়া—পাগল নাকি ? এমন অবস্থাতে!
লোকে শুন্‌লে বল্‌বে বা কি তা'তে ?
দাসী একটি অনেক দিনের—সেও যে জাতে মালো—
তারো সঙ্গে ফিসির-ফিসির পিতা তাহার বাসেননাক ভালো।

সাবেক মানুষ তাঁরা—
চারিদিকেই সতর্ক পাহারা!
মায়েঝিয়ে কি আর কথা! বিশেষ যখন পরস্পরে বোঝে ;
মুখ যে তখন মূক হয়ে যায়, মন যে তখন চুপ করাটাই খোঁজে।

এ ত গেল বাহির দিকের কথা ;
একা শুয়ে রাত্রে যখন চেয়ে দেখে গোপন মনের ব্যথা,
দম যে তাহার বন্ধ হয়ে আসে—
কি হয়েছে, বুঝ্‌তে পারে না সে!
সেই ত সবি তেম্‌নি আছে—পিতা মাতা সেই ত বাড়ী ঘর,
সহজ স্নেহ তেম্‌নি পরস্পর ;
চিরদিনই থাক্‌তে যাদের কাছে
প্রাণের ইচ্ছা, সেই ত তারা বুকের কাছেই আছে!
যেদিন থেকে জীবনটি তার প্রথম মনে পড়ে,
সমস্ত সুখ সকল আশা বাঁধা যাদের পরে—
তেম্‌নি তারা, হায়!
তবে কেন ফাঁপর ঠেকে, হৃদয় তবু ফাট্‌তে কেন চায় ?
মনে করে কে-যেন তার বুকের বাঁদিক মুষ্টিতলে চাপে ;
অশ্রুবারি বয়না চোখে, সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে কাঁপে!
ধড়্‌ফড়িয়ে শয্যাতলে অম্‌নি বসে উঠে'
নিঝুম গৃহ—সেই ব্যথাটা তবু বক্ষপুটে
তেম্‌নি করে' আঁক্‌ড়ে যেন থাকে ;
বারেক ভাবে, মাকে
ডেকে তোলাই—আবার ফিরে' ভাবে,
কি বল্‌বে যে তাহার কাছে—বল্লে সে কি যাবে!
দূরে কোথায় কথার মত ঐ না কানে আসে—
চুপ করে' তাই শোনে খানিক ; বাতায়নের পাশে,
বাহির ধারে,
বকুলগাছের ঘনশাখার অন্ধকারে,
বাতাস কি যে গোপন কথা বলে—
বুঝ্‌তে কিছুই পারেনাক ; দ্বিগুণ ব্যথা বাজে বুকের তলে!
শয্যা ছেড়ে হঠাৎ দাঁড়ায় উঠে',
জান্‌লা দিয়ে দেখে চেয়ে—জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটে—
একটি ফালি তারি আলোক-রেখা
বুকের পরে আঁকে তারি যৌবনেরি প্রথম জয়লেখা ;

হাত দিয়ে তাই মুছ্‌তে চাহে—হাতের উপর আসি
কে যেন তার করটি হানে হাসি'।
বায়ু এসে হঠাৎ হেসে পরশ করে চুলে ;
চম্‌কে উঠে' ভুলে'
কেশের গোছা জড়িয়ে রাখে ফাঁসে ;
জ্বালার মত জ্বলে' উঠে বুকের মাঝে ; আঁধার হয়ে আসে
চোখের দৃষ্টি ; বুকের পাঁজর চাপি' আপন করে
অবশ তনু কোনমতে টেনে এনে বিছায় শয্যাপরে।
এম্‌নিতর রাতের পরে রাত
অজানা সেই ব্যথার বোঝা বয়ে বেড়ায়—অদৃষ্ট আঘাত।

এদিকে তার পিতা
নানান্‌রকম ধর্ম্মগ্রন্থ—শাস্ত্র পুরাণ গীতা—
কোথায় থেকে জুটিয়ে একে-একে,
গৃহিণী আর গৌরীরে তাঁর নিত্য বলেন ডেকে—
অমৃত এই গ্রন্থরাশি ; সকল দুঃখশোক
ভুল্‌তে পারে এর মাহাত্ম্যে মর্ত্তবাসী লোক।

চারুপাঠ-আর-পদ্যমালা-পড়া,
শিক্ষা মাত্র সবে দুটি সহজ শোলক-ছড়া,
তারি মাথায় পড়্‌ল একেবারে
হাজার-মণে' জ্ঞানের বন্যা জটিল ছন্দে বদ্ধ চারিধারে !
পিতার আদেশ ধর্ম্মে দিতে মন—
হৃদয়ধর্ম্ম যতই কাঁদুক, কর্‌তে হবে তবু পরাণপণ !
আদেশ যখন, কি কর্‌বে সে আর !
কেতাব-কোলে রইত বসে' যতটুকুন সাধ্যশক্তি তার—
সমস্তটুকু উজাড় করে' সংহিতা আর গীতার পাতার উপর ;
সন্ধ্যা থেকে কখন্‌ রাত্রি দুপর
বেজে যেত ; তবু তারা এম্‌নি কঠিন ! গোপন রসের চাবি
কোনমতেই খুল্‌তনাক ; স্বর্গসুধার দাবী
ছাড়্‌তনাক কিছুতে সেই শক্তসেনার সারি—
সঙীন-কাঁধে যেন হাজার দুর্গদ্বারের দ্বারী।

অনেক রাতে মায়ের তাড়া খেয়ে
শেষে যখন শুতে যেত, তারার আলো শূন্য আকাশ বেয়ে
তেম্‌নি করে' পড়্‌ত তাহার পায়ের তলায় এসে ;
ফুলের গন্ধ ভেসে
তেম্‌নি আস্‌ত জান্‌লা দিয়ে ;
বাতাস কাহার ব্যাকুল ব্যথা নিয়ে
তেম্‌নি করে' পরশ কর্‌ত তারে—
যেন প্রাণের পরিচিত প্রিয়জনের প্রণয়-অধিকারে !
হঠাৎ যেন মনে হ'ত, কে বুঝি ঐ সোহাগভরে সাধে,
ব্যথা দেওয়ার গোপন অপরাধে !
বক্ষতলে তীব্র বেদন বহি'
সারাটি রাত রইত জেগে দণ্ডে-দণ্ডে দণ্ড তাহার সহি'।
কেমন করে' থাকিবে সে গো ! কি করে' এই প্রাণের বোঝা যায় ?
কতদিন আর—কতদিন আর সইতে হবে হায় !

এম্‌নি করে দিনের পরে দিন
অনাঘ্রাত স্বর্ণচাঁপা—বৃন্ত যে তার হয়ে আসে ক্ষীণ !
গৌরী বলে' যায় না চেনা মোটে—
ঝরা-কুসুম ভুঁয়ের পরে লোটে।
তবু জেনো, গৌরী এরি নাম—
রূপে গুণে নামের মতন—চোখের তৃপ্তি চিত্তের বিশ্রাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

হায়দ্রাবাদে উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়

হায়দ্রাবাদ উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক্‌ উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে, আলীগড় অথবা দিল্লীতে ইহা হইলে মানাইত। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ১৮টি জেলা আছে। তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ তেলেঙ্গেনা অর্থাৎ খাঁটি তৈলঙ্গ দেশ ; পশ্চিমার্দ্ধ মরহট্‌ওয়ারি অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশ। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমের দেড়খানি জেলা (রাইচুর, এবং গুলবর্গার কিয়দংশ) কর্ণাট বা কনড়ি দেশ। রাজ্য মধ্যে গোল্‌কুণ্ডা (হায়দ্রাবাদ), বীদর, গুল্‌বর্গা, ও অওরঙ্গাবাদ এই চারিটি বহু পুরাতন মুসলমান রাজধানী। এই চারিটি নগরে সকলেই উর্দু বলিতে পারে কিন্তু হায়দ্রাবাদ নগরেও হিন্দুরা বাড়ীতে উর্দু বলে না, আপন আপন মাতৃভাষা বলে (অবশ্য যুক্ত-প্রদেশের নূতন-আমদানি লোক ছাড়া)। চাকর ইত্যাদিও দুই

প্রকার পাওয়া যায়। যাহারা উর্দ্দু বুঝিতে পারে তাহারা কিছু বেশী বেতন পায়। এখানকার দেশের ভাষা তৈলঙ্গী। এখানে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত আফিসের ভাষা পার্সি ছিল। সেই সময়ে সার্ সালার জঙ্গের মৃত্যু হয় ও যুক্ত-প্রদেশবাসী কর্ম্মচারীরা চেষ্টা করিয়া উর্দ্দু চালাইয়াছেন। কেননা কেরানিগিরি এখানকার হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল; তাহারা মাতৃভাষা (মহারাষ্ট্রীয় অথবা তেলেগু) ও অর্থকরী পার্সি শিক্ষা করিত, উর্দ্দু বুঝিত না। আফিসে উর্দ্দু প্রচলিত করিয়া এ অঞ্চলের হিন্দুদের দ্বাররোধ ও যুক্ত-প্রদেশ-বাসীদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। আজকাল জেলার সদরেও অনেকে উর্দ্দু বুঝিতে পারে। পল্লীগ্রামে হিন্দু মুসলমান কেহই উর্দ্দু বুঝিতে পারে না। নগরে যাহারা বুঝিতে পারে তাহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু নহে, বুঝিতে পারে মাত্র। কলিকাতায় সাধারণ হিন্দু বালক যতটা উর্দ্দু বুঝিতে পারে এখানকার বালক তাহা অপেক্ষা বোধ হয় কিছু বেশী বুঝিতে পারে মাত্র। কলিকাতাবাসী ছাত্রদের যদি বলা হয়, "তোমাদের মাতৃভাষা উর্দ্দুতে শিক্ষা করিতে হইবে", তবে তাহাদের প্রতি যতটা অবিচার করা হয়, এখানকার হিন্দুদের প্রতিও তাহাই হইতেছে। এখানে তিন চারি বৎসর হইতে মধ্য পরীক্ষায় উর্দ্দু অবশ্যশিক্ষণীয় করা হইয়াছে। ফলে হিন্দু ছাত্র কমিতেছে। হায়দ্রাবাদের দক্ষিণে গুলগুণ্ডা একটা জেলা। ঐ জেলার হিন্দু জমিদারেরা পুনাতে রাখিয়া আপন পুত্রদের পড়াইতেছে। পুনার ছাত্রাবাসে এখন ১২৫টি হিন্দু বালক থাকিয়া পড়িতেছে। এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জীতে (Calendarএ) বলা হয়—মরাঠি, গুজরাতি, হিন্দি ইত্যাদি দ্বিতীয় ভাষা পড়িতে পার; কিন্তু কোন গবর্মেন্ট স্কুলে পাঠ দিবার বন্দোবস্ত নাই, ছাত্রদের বলা হয় তোমরা ঘরে পড়িয়া লইও। হায়দ্রাবাদে মাড়ওয়ারি-সম্প্রদায় বড় ধনী, কোটিপতি কয়েক জন ও লক্ষপতি ত অনেক; কিন্তু একটিও মাড়োয়ারি ছাত্র কোন স্কুলে নাই। সহরে অন্যূন ১৮টি মাড়োয়ারী বালকদের পাঠশালা আছে। গুজরাতি বণিক লক্ষপতি অনেক, কিন্তু তাহাদের ছেলেরা স্কুলে যায় না। তাহারা কতবার চেষ্টা করিয়াছে যে স্কুলে গুজরাতি ভাষায় পাঠ দিবার বন্দোবস্ত হউক, কিন্তু হয় নাই। ১৯০১ সালের সেন্সস্ অনুসারে রাজ্য মধ্যে

হিন্দু	শতকরা	৮২·৮২
ভীল ইত্যাদি ভূতপ্রেত উপাসক	„	·৫৮
মুসলমান	„	১০·৩৮
পার্সি, খৃষ্টিয়ান, ইহুদী ইত্যাদি	„	·২২
		১০০·

১৯১১র সংখ্যা ধারলে দশমিকে কিছু প্রভেদ হইতে পারে মাত্র। এখানে প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ম করা হইয়াছে

মুসলমান বালক—মাতৃভাষা + উর্দ্দু + ইংরেজি

হিন্দু বালক—মাতৃভাষা + উর্দ্দু + ইংরেজি

শিখিবে। অর্থাৎ হিন্দু বালককে একটা বিদেশী ভাষা বেশী শিখিয়া সমবয়স্ক মুসলমানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। সেই জন্য তাহারা পারিয়া ওঠে না। তাহারা স্কুল ছাড়িয়া আবার টোল স্থাপন করিতেছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা হিসাবে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য। কিন্তু ছাত্রেরা (অন্ততঃ পশ্চিমাংশের ছাত্রেরা) মান্দ্রাজের পরীক্ষা দিতে চাহে না, তাহারা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে চাহে। পূর্ব্বার্দ্ধের ছাত্রেরা মান্দ্রাজের পাঠ্যও পড়িতে চাহে। সম্প্রতি অন্যূন ৭০ জন ছাত্র পঞ্জাবে পরীক্ষা দিতে দিল্লী গিয়াছিল। এখানকার অধিবাসী ১০০র উপর ছাত্র এলাহাবাদে কায়স্থ কলেজে ও আলিগড়ে আছে।

উর্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তকদের মধ্যে অনেকে আলিগড়ের লোক। তাঁহাদের উদ্দেশ্য বোধ হয় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। তবে মুসলমান শব্দটি ব্যবহার না করিয়া উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর এখানকার অনেকে আপত্তি করিয়াছিল। নিজামের নাম করিয়া এক সার্কুলার-পত্র ছাপা হয় যে এটা আমার নূতন ধরণের উদ্যম, তোমরা কেহ আপত্তি করিও না, দেখ কি হয়। সকলে চুপ করিয়া আছে। হায়দ্রাবাদের হিন্দুরা ত উর্দ্দু শিখিতে চাহে না, কেননা তাহা তাহাদের কোন কাজে লাগে না; তাহারা মাতৃভাষা ও ইংরেজি চাহে। নিজাম-গবর্মেন্টে চাকরি পাইবার তাহাদের বড় আশা নাই; ও তাহারা চাকরির জন্য বড় লালায়িতও নহে। হিন্দু বালকেরা প্রায়ই ব্যবসা বাণিজ্য

অথবা বিদেশে গিয়া ওকালতী আদি বৃত্তি শিখিতেছে। রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী জেলার ছাত্রেরা ইংরেজ-রাজ্যের মধ্যে গিয়া শিক্ষা লাভ করে। এখানে যেমন পাঠের সুবিধা নাই, তাহারাও কেহ সুবিধা করিবার চেষ্টাও করে না। বড় বড় নগরে গবর্মেন্ট-স্কুলে যদি ১০০ ছাত্র থাকে, সেই নগরের প্রাইভেট হিন্দু স্কুলে ৪।৫ শত ছাত্র পাওয়া যায়, কারণ প্রাইভেট স্কুলে হিন্দু ছাত্রেরা মাতৃভাষা শিখিবার সুবিধা পায়।

ইহাতে বুঝা যায় যে হায়দ্রাবাদ উর্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। ইহাতে কেবল যুক্তপ্রদেশবাসী ও মুসলমানদের সুবিধা হইবে; আবার সেই অনুপাতে এখানকার হিন্দু ছাত্রদের ক্ষতি হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সকল পুস্তক ভাষান্তরিত ও রচিত হইতেছে, তাহাতে উর্দ্দু ভাষা স্কুলকলেজপাঠ্য গ্রন্থাবলীতে বাঙ্গালাকে ছাড়াইয়া শীঘ্রই অগ্রসর হইবে। এদিকে সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন। ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার পাঠ্য সব পুস্তক প্রায় অনুবাদিত হইয়াছে; বোধ হয় জুলাই মাসে পুস্তক ছাপা হইয়া যাইবে। তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি, ইংলণ্ড গ্রীস্ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রস্তুত হইয়াছে। বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান বোধ হয় জুন মাসে শেষ হইবে। মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতিবিজ্ঞান জুলাই মাসে শেষ হইবে।

সরকারী অনুবাদ-কর্ম্মালয় ছাড়াও অপর অনেকে পুস্তক ভাষান্তরিত করিতেছে। একটি লোক এরিষ্টটল্ ও তাঁহার তর্কবিজ্ঞান বিষয়ক দুই ভাগের পুস্তক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় এত ব্যয় কে করিবে? কিন্তু না করিলেও নয়। সাহিত্যপরিষদে যদি এক অনুবাদক কমিটি স্থাপন করা হয় ও যত সস্তায় সম্ভব ইংরেজি ছয় আনার গ্রন্থাবলীর মত পুস্তক প্রকাশিত করা হয় ও ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বড়লোকদের সাহায্য চাওয়া হয়, তবে কিছু হইতে পারে। তবে কাজটি ব্যয়-ও-কষ্ট-সাপেক্ষ। এক জনের কাজ নহে। নিজাম-গবর্ণমেণ্ট আজকাল অনুবাদ-কার্য্যে প্রায় ৩০০০৲ মাসে কেবল বেতনে ব্যয় করিতেছেন। অবশ্য পরিষৎ এত ব্যয় করিতে পারেন না। তবে বাঙ্গালা দেশে অল্প লাভে অনেক সাহিত্য-সেবক ভাষার উৎকর্ষের জন্য খাটিতে প্রস্তুত হইতে পারেন। উপযুক্ত পরিচালক চাই মাত্র। একবার পিছাইয়া পড়িলে আর অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব না হইলেও বহুকষ্টসাপেক্ষ। এখন অল্প আয়াসে যাহা হইতে পারে, পরে তাহা হইবে না। পরিষদে ত গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় যে বিশ্বসাহিত্য-গ্রন্থাবলী বাহির হইবার কথা, তাহার আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইল, জানা যায় নাই। উর্দ্দু ভাষার গত দশ বৎসরে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

শ্রীঃ—

অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ*

আমি এখনও নিজেকে ছাত্র ব'লে গণ্য করি। ঐ জীবন ত্যাগ ক'রে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ করেছি ব'লে মনে হয় না। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—বাস্তবিক এই ঋষিবাক্য বড় সত্য—বড় সার কথা। আর আমাদের এই ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্যজীবনের পার্থক্যের প্রাচীর বড়ই অমঙ্গলকর।

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি ষ্টডী অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ কর্‌বার অর্থ এই—আর যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুর-ঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুরঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত কর্‌তে হ'বে, তাকে নিভৃতে স্থাপন কর্‌তে হবে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র বাড়ীতে থাকেন, আবার অনেকে মেসে থাকেন। এখানে ছাত্রের প্রধান বিপদ এই যে তার কোন স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকে না। বড়লোকে বড় বাড়ীতে থাকেন—নানাকার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য তাঁদের অনেক ব্যয় কর্‌তে হয়। কিন্তু বাড়ীর ছেলে

* বিগত ৭ই এপ্রিল রবিবার বালী সাধারণ পাঠাগারের উৎসব উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় মৌখিক (Extempore) যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ।

কিরূপে কোলাহলের বাইরে নির্জ্জনে ব'সে পড়্‌বে সাধারণতঃ কোন বাড়ীতেই তার বন্দোবস্ত থাকে না—এরূপ বন্দোবস্ত যে থাকা দর্‌কার তাও কেউ ভাল ক'রে উপলব্ধি করেন না। আর মেসের ত কথাই নেই। আমাদের দেশে কথা আছে—'একে উস্‌খুস্ দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট।' মেসে অনেকে একত্র জোটে—কাজেই প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। হাটে হয় হট্টগোল, সরস্বতী সেখানে টিক্‌তে পারেন না; মন্দিরে যেরূপ ভক্তের জপতপ আরাধনা—পাঠাগারে সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা। ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য অধ্যয়ন; আর এই অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধি দান করে।

প্রথম কথা এই যে—কি ক'রে পড়্‌তে হয়? ক ঘণ্টা পড় তার হিসাব রাখ্‌বার দরকার নেই, কিরূপ একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন কর সেইটাই সবার চেয়ে দর্‌কারি জিনিস। পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে হ'লে—ঘণ্টার উপর নয়—একাগ্রতার উপর নির্ভর কর্‌তে হয়। আমি আজ সকালে 'খুব' পড়েছি—কিন্তু মোটে একঘণ্টা কি তার কিছু বেশী।—এই ভাবে আমি রোজই পড়ি, তা রবিবার নেই, ছুটীও নেই, অবকাশও নেই। এই ভাবে সমানে (নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত) পড়ে যেতে হবে। কিন্তু এদেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ গল্প খেলা আর আড্ডা। একাগ্রতার ত সম্পূর্ণই অভাব; তার উপর খেয়াল ও হুজুগে পড়্‌বার সব সময়টা কেটে যায়। পরে যখন পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসে তখন আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে তার জন্যে প্রস্তুত হবার বিপুল প্রয়াস। এ-কে লেখা পড়া বলে না, এ লেখা পড়া নয়, এ ইউনিভার-সিটিকে ফাঁকি। কেবল মুখস্থ আর উদরস্থ; পেটুকের মিষ্টান্ন ভক্ষণের মত—একপণ সন্দেশ টপাটপ্ করে গেলা, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি। সব সময়টা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা কাছে এলেই টপাটপ্ মুখস্থ ও উদরস্থ কর্‌বার প্রয়াস; তারপর পরীক্ষামন্দিরে গিয়ে একেবারে বমি। পরীক্ষার পরই সরস্বতীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ লোপ। আর পাশ হ'লে 'হকার' চাচার দোকানে পুস্তক বিসর্জ্জন। মনে পড়ে ছেলে-বেলায় জ্বর হ'ত, আর কেবল মিছ্‌রী বেদানা ও কুইনীন্ খেতে হ'ত। বাল্যজ্বর মনে ক[illegible] দেয় ব'লে ঐ জিনিসগুলোয় আমার একটা ভয়া[illegible] বিতৃষ্ণা আছে—ও-গুলো আমার কাছে বিভীষি[illegible] পাশকর্‌বার পর এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর[illegible] ঐ রকমই তীব্র বিতৃষ্ণা হয়—বইগুলো তাদের ক[illegible] আতঙ্ক উপস্থিত করে। পুস্তককে আজীবন সঙ্গী কর্[illegible] হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পরীক্ষার পর বই ত[illegible] পাবার জো নেই! শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার কে[illegible] ছাত্রকে বলেছিলেন 'ব্লাকীর "সেল্‌ফ্-কাল্‌চ্যর" বইখ[illegible] দাও ত।' সে জবাব দিলে 'সে বই তালা বন্ধ, দেখ্‌লে[illegible] হয়।' এ বড় দুঃখের কথা। সৎপুস্তককে আজী[illegible] সহচর কর্‌তে হবে, আজীবন ধ'রে সৎপুস্তক পাঠে ভ[illegible] সংগ্রহ কর্‌তে হবে, হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখ্‌তে হ[illegible] এবং প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন কর্‌তে হবে। ইংরেজ ক[illegible] সাদি পুস্তককে লক্ষ্য করে যথার্থই বলেছেন

"The mighty minds of old"
"My never-failing friends are they."

পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে হ'লে খুব বেশী [illegible] পড়্‌বার দর্‌কার হয় না। অনেকে যা পায় তাই প[illegible] পরিণত বয়সেও তাদের এই অভ্যাস থেকে যায়। তা[illegible] কখন পুস্তক নির্ব্বাচন করে পড়ে না। ছুটী পেলে তা[illegible] অনেক রকমে অনেক পয়সা ব্যয় কর্‌বে। বেড়াবার [illegible] মেটাবার জন্যে দামী পোষাক ট্রাঙ্ক গ্লাড্‌ষ্টোন্-ব্যা[illegible] কিন্‌বে, কিন্তু ছুটীতে পড়্‌বার জন্যে কি বই সঙ্গে নি[illegible] যাবে কখনই তার কিছু স্থির কর্‌বে না। হাতে [illegible] পাবে তাই পড়বে, কিছু বিচার করবে না। বায়রনে[illegible] পদ্য থেকে এমার্সন বলেন "He knew not what t[illegible] say and so he swore।" প্রথম মনে হ'ল কি পড়্‌ব[illegible] খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম, আগে খবর পড়্‌লা[illegible] তারপর অন্য কথা পড়া হ'ল, শেষ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ পর্য্য[illegible] নিঃশেষ করা গেল। কি পাওয়া গেল, কি বোঝা গে[illegible] তার কোন চিন্তাই কর্‌লাম না। কিন্তু এরকম ঠিক্ ন[illegible] উদ্দেশ্যবিহীন পাঠ কোনমতেই ঠিক নয়। সবার আ[illegible] পড়্‌বার উদ্দেশ্য খুব ভাল ক'রে বুঝ্‌তে হবে, তারপ[illegible] রুচি অনুসারে পুস্তক নির্ব্বাচন কর্‌তে হবে, কারণ সকলে[illegible]

সব বই ভাল লাগে না, কিন্তু একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তারই উপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচন করা এদেশের ছাত্রদের মধ্যে নেই বল্লেই চলে। যে-কোনো লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যদি জিজ্ঞাসা করে দেখেন "পাঠকগণ নভেল নাটকই বা কত পড়েন আর ইতিহাস ও জীবনীই বা কখানা পড়েন," দেখ্‌বেন তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যাবে না।

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে নভেলের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর আগ্রহ দেখা যায়। ভাল-পাশ-করা শিক্ষিত-ছেলে ছুটীতে যদি নভেল পেলে ত স্নানাহার বন্ধ—যতক্ষণ না বইখানা শেষ হয়। কিন্তু একখানা বড় নভেল পড়্‌তে আমার ছ মাস লাগে, কারণ আমাকে ঠিক সময়-মত কাজ কর্‌তে হয়, ল্যাবরেটরীতে কাজ করার পর আধ ঘণ্টা সময় পেলে পড়ি, নইলে নয়। সব কাজেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা চাই—সকলেরই এই প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ আমাদের দেশে, যেখানে স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোকে আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত; দেশে খাবার নেই, শরীরে পুষ্টি নেই। সকলেই দীন দরিদ্র, অন্নসংস্থানের ভাবনায় সবাই অস্থির। বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য মাছ ও দুধ সর্ব্বত্রই দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে। একে অস্বাস্থ্যের এইসব কারণ উপস্থিত রয়েছে, তার উপর ছাত্রের অতিরিক্ত পাঠ, কাজেই অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সে কাজের বার হ'য়ে পড়ে। ২৪ ঘণ্টায় একদিন। ছেলেমানুষের আট ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হয়। ১৬ ঘণ্টা হাতে থাকে। তার মধ্যে রোজ ৪ ঘণ্টা পড়্‌লেই প্রচুর। কিন্তু পড়্‌তে হবে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হবে না। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রধান শত্রু—পড়্‌বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ কর্‌লে গল্প আস্‌বেই—অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আস্‌বে। আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে আড্ডা। বেশী বয়সে আমরা সবাই বসে কাটাই, বাহিরে উঠে হেঁটে বেড়াতে উৎসাহ আসে না, প্রবৃত্তিও হয় না; তাস-পাশাতেই কত সময় কেটে যায়। আবার এই তাসপাশার আড্ডার পাশে অনেক সময় ছেলেরা পড়াশুনা করে। বিপদ্ কি ভয়ানক! ইউরোপীয়ান্ যখন পাঠাগারে একমনে অধ্যয়ন করে তখন তার স্ত্রীকেও ("May I come in") "আমি কি ভিতরে যেতে পারি" এই ব'লে দরজায় (knock) ঠোকা দিতে হয়। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরে যেতে হচ্ছে যেন শুধু বিরক্ত কর্‌তে। কারণ পাঠাগার ঠাকুরঘরের মত পবিত্র স্থান, সেখানে কথা কওয়া পাপ।

তার পরের কথা—

"Work while you work, play while you play,
This is the way to be cheerful and gay"—

কাজের সময় কাজ কর্‌তে হয়, খেলার সময় খেলা; তা হলেই মনে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে। আমি সর্ব্বদাই কাজ করি, আবার অবসর-মত করি না। একজন বড় ইংরেজ দোকানদার আফিসে একমনে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম ক'রে কাজ করে, কিন্তু যেমনি কাজ শেষ হয় অমনি গঙ্গার ধারে—খোলা মাঠে মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যায়। তারা সে সময়ে বসে থাকে না—কুড়েমি করে না, আড্ডা বা মজ্‌লিসে জমে না। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য রাখ্‌তে জানি না, সময়ে কাজ করি না, তাই শরীর ও সময় দুইএরই অপব্যবহার হয়; স্বাস্থ্যও থাকে না, কাজও ওঠে না।

এদেশে শুধু বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপে সাধারণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ ক'রে জ্ঞানার্জ্জন কর্‌বার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু বই প'ড়ে কত শেখা যায়? নিজের চেষ্টায় বিশ্বরাজ্যের নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা নিপুণচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়, তবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হয়। পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় কখনই বেশী হয় না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স্ সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে মদের দোকানে গিয়ে বসে থাকৃতেন। উদ্দেশ্য মাতালের কথাবার্ত্তা শুনে তার প্রকৃতি বুঝে দেখা। এই ভাবে নানা রকমে বিখ্যাত ইউরোপীয়েরা মানবপ্রকৃতি নিখুঁত করে জান্‌বার চেষ্টা করেন। এ-ই প্রকৃত অধ্যয়ন। মানবপ্রকৃতির পর জড়প্রকৃতি। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাও বুঝ্‌তে হবে। লণ্ডনের কাছে এক বটানিকেল গার্ডেন আছে, তার নাম কিউ গার্ডেন্‌স্ (Kew Gardens), পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ কর্‌বার জন্যে শত সহস্র বিদ্যার্থী সেখানে যান। নানা রকমের গাছ,

তাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিয়ম—নিজের চোখে সুকৌশলে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তাঁরা অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। আর আমাদের এই সুজলা সুফলা দেশে, এই ভারতবর্ষে গাছের ত অভাব নেই। কিন্তু উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কি তত্ত্ব জান্‌তে পেরেছি আমরা? বিলাতে তিন মাস কি তার কিছু বেশী দিন ধ'রে গাছ-পালার সবুজ পাতা থাকে। অন্য সময়ে কাঁচের ঘরের মধ্যে কলাগাছ প্রভৃতি বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কয়মাসের সুবিধায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন ক'রে সেই সম্বন্ধে নানা সত্য আবিষ্কার করে। আর আমরা এই চিরসবুজ দেশে চিরকালই চুপ ক'রে বসে থাকি। চক্ষুষ্মান কারা? ১৮৪৫ সালে হুকার নামে এক ইউরোপীয়ান্ এদেশে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ করতে এসে-ছিলেন। তখন দার্জ্জিলিঙ্গের রেল হয়নি। কিন্তু তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে গাছগাছড়া দেখ্‌বার জন্যে সিকিম গেলেন। তারপর সে দেশে বন্দী হলেন; সেই কারণে সিকিমের সঙ্গে যুদ্ধই বেধে গেল। যা হোক্ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি ১০০০০ (দশ হাজার) রকম আবশ্যকীয় গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে বিলাতে ফিরে গেলেন; সে-সব এখনও কিউ গার্ডেন্সে (Kew Gardens) আছে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে ভারতের উদ্ভিদ্‌জ্ঞান ইংরেজের বই প'ড়ে শিখ্‌তে হয়।

রক্‌স্‌বর্গের Flora Indica নামে এক অমূল্য গ্রন্থ আছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সমস্ত ভারত পদ-ব্রজে ভ্রমণ করে নানা রকম গাছ সংগ্রহ করেছিলেন। এবং প্রত্যেকটির বাঙ্গালা হিন্দি তামিল নাম জোগাড় করেছিলেন। তাঁর বই সকলে পড়ে। এঁরা ইউরোপীয়ান্ ম্লেচ্ছ, কিন্তু আমাদের চিরস্মরণীয়।

জুঅলজিক্যাল গার্ডেনে ইউরোপীয়েরা নানা রকম পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির জীবন-যাপন-প্রণালী অধ্যয়ন করেন। ফরাসী দেশের একজন উকিল কুড়ি বৎসর ধ'রে শুঁয়োপোকা ও প্রজাপতি কেমন ক'রে এক থেকে অপরে পরিণত হয় তা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন, আর তার একটি কৌতূহলপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি নিজের চোখে গুটি ও তুঁত-পোকার জীবনযাত্রা দেখে ঐ-সকল কীট থেকে রেশম উৎপন্ন করা সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় নূতন কথা সভ্যজগৎকে জানিয়েছেন। আর একজন অন্ধ, মধুমক্ষিকার ইতিহাস লিখেছেন। তিনি যৌবনে অন্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্য মধু-মক্ষিকার জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে সেই-সব কথা তাঁর কাছে বল্‌তেন এবং তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তা লিপিবদ্ধ করতেন। এই প্রকারে হিউবার (Huber) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক মৌমাছির ইতিবৃত্ত (History of the Bees) লিখেছেন।

ইংরেজ ও আমেরিকানের এক-একটা Hobby অর্থাৎ খেয়াল আছে। কেউ গার্ডেনিং করেন, বাগানে নানারকম ফলফুল উৎপন্ন করেন। এ একটা সুন্দর খেয়াল। কেউ বা প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, আবার কেউ বা পতঙ্গবিজ্ঞান (Entomology) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল নিজে পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ইংরেজ কখনো ব'সে থাকে না। এই রকম একটা খেয়ালে থাকে। এই-সকল ব্যাপার অধ্যয়ন করে তাদের সকলেই যে কলেজের অধ্যাপক হয় তা নয়, কিন্তু এই-সব কথা পুস্তকে প্রকাশ ক'রে তাঁরা জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন, তাঁদের বিলক্ষণ আয়ও হয়।

এদেশে গবর্ণমেণ্ট পুনা কৃষিকলেজে লেফ্রয় (Lefroy) নামক একজন মস্ত পতঙ্গবিজ্ঞানবিৎ(Entomologist)কে আনিয়াছেন। তিনি কোন্ কোন্ পতঙ্গ শস্য নষ্ট করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। আমরা জানি শুধু পঙ্গপালই ফসল নষ্ট করে দেয়; কিন্তু আরও অনেক রকম পতঙ্গ আছে যারা ফসলের বড় কম ক্ষতি করে না। ইনি তাদেরই জীবনচরিত আলোচনা করছেন আর কিসে তাদের নষ্ট করে শস্য বাঁচানো যায় তার উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। এই-সকল ব্যাপারের আলোচনা ও অধ্যয়ন আমাদের ব্যবসা ও ধনাগম সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করে। যাঁরা পতঙ্গবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কি করে তুঁতপোকাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা ক'রে বর্দ্ধিত করতে হয় তা জানেন। গুটিপোকার রোগ হলে তা থেকে ভাল রেশম হয় না। ফ্রান্সে "Disease

of Silkworm" অর্থাৎ গুটিপোকার রোগ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সে বই পড়ে যাঁরা রেশমের চাষ করেন তাঁরা গুটিপোকাকে বর্দ্ধিত কর্‌বার নানারকম উপায় জান্‌তে পেরেছেন, আর সেই কারণে রেশমের চাষে খুব লাভবান হয়েছেন। আর আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে—যেখানকার উৎকৃষ্ট রেশম এক সময়ে সব দেশে আদৃত হ'ত—সেখানে রেশমের চাষ দিন দিন উঠে যাচ্ছে; কারণ আমরা ঐ কাজ অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলে রেখে দিয়েছি, যাদের গুটিপোকা সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জ্ঞান নেই।

এই-সমস্ত কারণেই বল্‌ছি যে শেখ্‌বার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়্‌লেই হয় না। আমি এলবার্ট স্কুলে পড়্‌তাম। সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশবসেনের বক্তৃতা হত। তিনি একসময়ে বলেছিলেন, "বাঙ্গালীর ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিসের খোলে তুলো পুরে দেওয়া; কেবল ঠাসো আর গাদো।" তার উপর অভিভাবক সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন—স্কুলের ছুটী হলেই মাষ্টারবাবুকে ছেলের পিছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখ্‌বে। এঁরা হচ্ছেন murderer of boys অর্থাৎ বালকহন্তা; কারণ স্কুলের ছুটীর পর অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোটো, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও। তবে ত স্বাস্থ্য থাক্‌বে, মনে প্রফুল্লতা আস্‌বে। তা নয়, বাড়ী এসেই কেতাব নিয়ে বসো। তার পর কোন্ ছেলে কোন্ বিষয়ে backward অর্থাৎ কাঁচা, অমনি প্রাইভেট্ টিউটর লাগাও,—ইংলিসে একটি, সংস্কৃতে একটি, সববিষয়ে একটি একটি। টিউটরের ঠেলায় বেচারি ছাত্র একেবারে dull অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে, নিজে ভাব্‌বার বা নিজের উপর নির্ভর কর্‌বার শক্তি তার একেবারে লোপ পায়। তাই বলি এ প্রথার অনেক দোষ। এমার্সন বলেন, "Guardians are benefactors but sometimes they act like the worst malefactors",—অভিভাবকগণ ছেলের উপকার করেন বটে কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর অপকার সাধন করে থাকেন। বেশী পড়্‌লেই বিদ্যে হয় না। আমি আজীবন ধরে সামান্য একটি বিদ্যা আয়ত্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু পাঠ ঐ একঘণ্টা।

আমাদের বাঙ্গালীর ছেলের জীবন যেন একটা ভার বওয়া। বেদান্ত-মতে জীবন কিছুই নয়, দুহাজার বছর ধরে আমরা চিরকাল শুনে আস্‌ছি, জীবন মানে কিছুই নয়—নলিনীদলগত জলমিব—এর একটা প্রভাব জাতীয় চরিত্রে ত আছেই। আমরা সকলেই খানিকটা স্বীকার করে নিই যে জীবন একটা দুর্ব্বহ ভার। তার উপর আবার এই ভয়ঙ্কর জীবনসংগ্রাম। সকালে আটটার সময় বাড়ী থেকে দৌড়োদৌড়ি করে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ শরীরখানি নিয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা অর্থাৎ কলমপিষে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য সহরের দিকে ছুটোছুটি করা। দিন যে কোথা দিয়ে চলে যায়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী তা জান্‌তে পারে না—পৃথিবীর কোন আনন্দই সে উপভোগ করে না। আকাশের উন্মুক্ততা, আলোকের হাসি বা বাতাসের সুখময় স্পর্শ কিছুই তার প্রাণে সজীবতা ও নবীনতা আনয়ন করে না। লাবকের 'জীবনের সুখ' নামে একখানি পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকে তিনি বল্‌ছেন—জীবন কি শুধু ঔষধ গেলা? জীবনে আনন্দ উপভোগই বিধাতার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে সেই উদ্দেশ্য বিফল করি। পাখী গায় কেন, প্রজাপতি মধু আহরণ করে কেন, যদি বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকে।

লাবক একজন ধনী মহাজন (broker) ছিলেন। অতুল তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য, কিন্তু তিনি লেখাপড়া যথেষ্ট জান্‌তেন। তিনি আজীবন ছাত্র ("student")। অনেক ইউরোপীয় ধনী মৌমাছি-পিঁপ্‌ড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করেছেন। আমরা তা বই পড়ে জানি, কিন্তু তাঁরা নিজের চোখে দেখে ঐসব কথা লিখে গেছেন। আমরা চোখ থাক্‌তেও অন্ধ। শুধু চোখ থাক্‌লেই হয় না, সূক্ষ্ম দর্শন চাই। ইউরোপীয়ান্ লেখক লাবক মৌমাছিদের সাধারণ-তন্ত্র (Republic) সম্বন্ধে এক চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মৌচাকে কেমন করে সকলে কাজ করে সে অদ্ভুত বিবরণ পড়্‌লে মাতোয়ারা হয়ে উঠ্‌তে হয়। লর্ড এভ্‌বেরী (Sir John Lubbock) যে শুধু ধনী ছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক। আমাদের দেশের ধনী সাধারণতঃ জবড়্‌জং জানোয়ার হয়। তার নাকের ডগা থেকে ওলন-দড়ি

ঝুলিয়ে দিলে ভুঁড়ির দরুন perpendicular অর্থাৎ লম্ব রেখার যে বিচ্যুতি হয় তাই তাঁর ধনশালিতার মাপ। ধনী জুড়ি চড়েন আর আয়েসে বিলাসে ডুবে থাকেন। কিন্তু ইউরোপে অনেক স্থলে এরূপ হয় না। বিলাতে মাটীর তলায় রেল (underground railway) আছে। তাতে প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী নেই। লাখ্‌পতি ও সাধারণ লোক সব এক সঙ্গে এক জায়গায় বসে। এণ্ড্রু কার্ণেগী একজন ক্রোড়পতি; পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোহের মালিক। আমেরিকার পিট্‌স্‌বর্গে তাঁর লোহার কারখানা ছিল। প্রথম বয়সে তিনি খবরের কাগজ রাস্তায় বেচ্‌তেন। তারপর অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে আমেরিকায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। পরে টাকা রোজ্‌গার ত্যাগ করে অধ্যয়নে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তাঁর ব্যবসা এত বড় ছিল যে একজনে নয়—অনেকে প'ড়ে ৯০ কোটি টাকা দিয়ে সেই ব্যবসাটি কিনেছেন; তার বাৎসরিক আয় হচ্চে সাড়ে চারকোটি টাকা। তিনি শ্রমজীবীদের জন্যে আমেরিকা ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক সহরে বিনাব্যয়ে অধিগম্য পাঠাগার স্থাপন করেছেন। মজুরগণ সন্ধ্যার পর যখন অবসর পায় তখন ঐ-সমস্ত লাইব্রেরীতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ ক'রে আত্মোন্নতি সাধন করে। কার্নেগী এখনও (এই বছর দু তিন নয়) অনেক বই লিখ্‌ছেন। নাইন্‌টিন্থ্‌ সেঞ্চুরী পত্রিকায় তিনি শ্রমজীবীদের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি তাঁর আয় ছিল সাড়ে চারকোটি টাকা। আমাদের এই বাঙ্গালা বেহার ও অন্য জায়গার সকল জমিদারের বাৎসরিক আয় জড়িয়ে সাড়ে চারকোটি নয়। এখানকার সকল জমিদারকে একদিকে আর কার্ণেগীকে একদিকে রেখে ওজন করলে টাকায় তিনিই ভারী হবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে তিনি এখনও পড়েন। ছিলেন "ষ্ট্রীটবয়", রাস্তায় কাগজ বেচ্‌তেন, কেবল স্বাবলম্বনের জোরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হয়েছেন।

তোমরা অনেকেই ইউনিভারসিটির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হও; সেটা ভাল; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ। কারণ পাশের পর তোমরা নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। এ রকম ভাল-পাশ-করা ছেলের যজ্জীবনম্‌ তন্মরণম্‌। ইংলণ্ডে কিন্তু তা নয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা খুব বেশী পড়ে না, অকালপক্ব হয় না, এঁচোড়ে পাকে না। ১৮৭৫ সালে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাশ করে আমরা আজীবন তার দোহাই দিয়ে থাকি, যদিও এই পাশ করার পর লেখা-পড়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই আমাদের থাকে না। তারপর এই ফার্ষ্ট ক্লাস পাশ করাটাই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের যা Academic year তাতে ত দুবছরে দশমাস মাত্র পড়া হয়। এই দশমাস পড়ে সব বিদ্যা আয়ত্ত হয়ে যায় কি? আজীবন না পড়্‌লে শেখা যায় না। প্রত্যেক দিন নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্চে, সে-সকলের খবর রাখ্‌তে হবে। ফার্ষ্ট হও আর না হও, আজীবন পড়্‌বে, পাশ হবার পরেই কেতাবের সঙ্গে সেলাম আলেকম্‌ ক'রে তার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কি ভয়ঙ্কর! কি সর্ব্বনাশ! এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দেখ্‌লে আতঙ্কে আমার প্রাণ শিউরে ওঠে।' তারা ছদ্মবেশী মূর্খ।

এমার্সন বলেন "কোন ছেলে backward অর্থাৎ পড়াশুনায় কাঁচা হলে তিরস্কার করবে না। সাধারণতঃ ছেলেরা সব বিষয়ে ভাল বা চৌকস হয় না। যে সব-বিষয়ে ভাল, সে ত একটা miracle—একটা অদ্ভুত কিছু, যা ভূতলে অতুল।" এমার্সন আরও বলেন "কোন ছেলে যদি চুরি করে ক্লাসের বই ছাড়া অন্য বই পড়ে, মাষ্টার তাকে বেত মারেন; আমি হলে পুরস্কার দিই।" ছাত্র হয়ত নেপোলিয়নের জীবনী বা গোল্ডস্মিথের ইতিহাস বা যা তার স্কুলপাঠ্য নয় এমন কিছু পড়্‌ছে, তাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, উৎসাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, কারণ সে অনেক নূতন বিষয় শিখ্‌তে পারবে। ছাত্রের প্রতি চাপ দেওয়া উচিত নয়, তার প্রতিভার যাতে বিকাশ হয় শিক্ষকদের তাই করা চাই। ইউনিভার্‌সিটির বাঁধা বই পড়্‌লে বা গোটাকতক পাশ করলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। হালিসহরে রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন, তাঁর কথা সবাই জান। তিনি হিসাবলেখার এক চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু খাতার পিঠে পিঠে কালী-সংকীর্ত্তন লিখ্‌তেন। এমন কি ভারতের যে দুজন জগতে অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন

করুছেন,—রবীন্দ্রনাথ ও রামানুজম্ (ইনি সম্প্রতি রয়েল সোসাইটির সভ্য হয়েছেন) তাঁদের কেউই ইউনিভার্‌সিটি-এডুকেশনের ধার ধারেন না, তাঁরা পাশ-করা নন। কিন্তু এই পাশ না করুতে পারুলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। মা বলেন—পোড়াকপাল আমার, ছেলে পাশ হলো না। আবার সময় সময় ছেলে আত্মহত্যা ক'রে বসে। আমি বলি—তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। উৎসাহের সহিত একটা নূতন কিছু আরম্ভ করে দাও। কারণ উকিল ডাক্তার ও কেরাণী এই নিয়ে জাতি টেঁকে না। আমাদের চরম দুর্গতি হয়েছে। এখন আমাদের নানা বিষয়ে, অর্থকর বিষয়ে, ব্যবসাবাণিজ্যে মন দিতে হবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার লিখিত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক পুস্তিকায় কয়েকটা কথা লিখেছি, তোমরা সেটা প'ড়ে দেখো। আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় বিধাতা যেন বলেন, "বাঙ্গালীর ছেলে, শরীর নষ্ট করুবি আর কেরাণীগিরি করুবি ; তার বেশী কিছুই নয়।" এ অবস্থায় থাকুলে চল্‌বে না, এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ ; এ পথ থেকে ফির্‌তেই হবে।

দেশের কথা

আমরা গত মাসের প্রবাসীতে দেশের বস্ত্রসঙ্কটের পরিচয় বিস্তারিতভাবে দিয়াছিলাম। তাই এবার মনে করিয়াছিলাম ঐ বিষয়টা বাদ দিয়া অন্য বিষয়ের যাহা জ্ঞাতব্য সংবাদ পাই সংগ্রহ করিব। কিন্তু দেখিলাম বস্ত্রসমস্যাই দেশে এখনো প্রধান হইয়া আছে। মানুষ সহজে মরিতে চায় না ; বড় দুঃখেই সে আত্মহত্যা করে। বস্ত্রাভাবে একাধিক আত্মহত্যার সংবাদ আমরা পাইয়াছি—

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা। নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ থানার সীমানায় একটি দরিদ্র কায়স্থের ছেলে বস্ত্রাভাবে গত বৈশাখ মাসে গলায় ফাঁসি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ। পুরুলিয়া-দর্পণ।

পাবনা জেলার উল্লাপাড়া থানার এলাকাধীন রাখালগাছা গ্রামের জনৈক কৃষক মুসলমান যুবকের স্ত্রীর পরিধানে কাপড় না থাকায় সে ঘরের বাহির হইতে পারে না, লজ্জা নিবারণ করিতে পারে না। যুবক এই অভাব দূর করিবার জন্য প্রাণপণ করে ; কিন্তু কিছুতেই একখানি কাপড় সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীকে দিতে পারে না। কাজেই যুবক নিজের প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। দারোগা বাবু বিভূতিমোহন বসু তদন্তে আসিয়া এই শোচনীয়কাণ্ড দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট একটিমাত্র টাকা ছিল। বস্ত্র খরিদ করিবার জন্য তিনি তাঁহা দুঃখিনী বিধবাকে প্রদান করেন।

—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ। মোহাম্মদী। সম্মিলন।

"নোয়াখালি সম্মিলনী"তে প্রকাশ :—"আজ কয়েক দিন, হইল নলচিরা অন্তর্গত ফজর আলি মোল্লার বাড়ীতে আচলাম নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী বস্ত্রাভাবে গৃহের বাহির হইতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।"

—খুলনাবাসী।

যাহারা মরিতেছে না তাহারাও যে কিরূপ ক্লেশ অনুভব করিতেছে তাহা নিম্নের খবরগুলি হইতে বোঝা যাইবে।

বস্ত্রাভাবে মফঃস্বলে যে-সকল লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা শুনিলেও আতঙ্কের সঞ্চার হয়। সেদিন কালীগঞ্জ হাটে একটি অনাথা বৃদ্ধা কাপড়ের দোকানে গিয়া একটি ফোতা (স্ত্রীলোকের পরিধানের জন্য ৪ হাত পরিমিত কাপড়) ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। দোকানদার তাহার মূল্য ১।০ চাহিল, ইহার মূল্য পূর্ব্বে ।৵০ আনা ছিল। স্ত্রীলোকটি ৪ দিন না খাইয়া ধান ভানিয়া অতিকষ্টে একটি টাকা যোগাড় করিয়াছে, তাহাতেও পরিধেয় বস্ত্র হইল না দেখিয়া হাটে বসিয়া উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। অগত্যা দোকানদার দয়াপরবশ হইয়া ১৲ টাকাতেই কাপড়খানি দিল।

—রঙ্গপুর-দর্পণ।

কয়েক দিন গত হইল একটি কৃষক বারুইপুর বাজারে কয়েক পালী চাউল বিক্রয় করিয়া কাপড়ের দোকানে যায় এবং একখানি কাপড় দর করে, কিন্তু সে বিক্রীত চাউলের মূল্য যাহা পাইয়াছিল তাহাতে তাহার প্রার্থিত একখানি ৯ হাত কাপড়ও হইল না। অগত্যা পরে ৮ হাত একখানি কাপড় ক্রয় করিয়া লোকটি দোকানের বাহিরে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলে। অন্যান্য লোক জন তাহাকে কাঁদিতেছে কেন জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমার পরিধানে যে বস্ত্রটুকু দেখিতেছেন, বাজারে আসিবার জন্য এইটুকু মাত্র পরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমার পরিবারবর্গ বাটীতে একখানি কাপড় দুইখণ্ড করিয়া পরিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতেছে, তাহাও ইহা অপেক্ষাও অতি জীর্ণ। আমি বাটী গিয়া কি বলিব, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। বলা বাহুল্য সেই কৃষকটি যে বস্ত্রখানি পরিয়া ছিল তাহাতে তাহার কোন রকমে লজ্জা নিবারণ হইতেছিল মাত্র। সেই বস্ত্রখানি লম্বায় বোধ হয় ২।৩ হাত হইবে, তাহাও স্থানে-স্থানে ছিন্ন ও গাঁইট দেওয়া।

—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

যারা এই দারুণ অভাব সহ্য করিতেছে না, তারা চুরি ডাকাতি করিতেছে। এরূপ ঘটনাও বিস্তর—

বস্ত্রাভাবে দস্যুতা—কাঁথি মহকুমার পটাশপুর থানার অন্তর্গত চন্দনপুর গ্রামের শ্রীকেদারনাথ নন্দী নামক এক বস্ত্র বিক্রেতা গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় একারুখি হাটে কাপড় বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল। সেই সময় পথিমধ্যে জনকয়েক লোক তাহাকে ধরিয়া তাহার নিকট হইতে কাপড়ের গাঁটটি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। তাহার ঐ কাপড়ের গাঁটে প্রায় তিন শত টাকার কাপড় ছিল।

—নীহার।

গড়বেতা থানার অন্তগত গুইদা গ্রামের ভুতু খাঁ রামগড়ের হাট হইতে একগাড়ী কাপড় লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে জন

দশেক সাঁওতাল তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক কাপড়গুলি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। —নীহার।

গত ৩০শে বৈশাখ সাঁইথিয়া-নিবাসী জনৈক নাপিতের জননী বাড়ী ফিরিতেছিল। ময়ূরাক্ষী নদীর নিকটে আসিলে কয়েকটি দস্যু তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র কাড়িয়া লয়। —বরিশাল হিতৈষী।

কয়েক দিন হইল রামপুরহাট হইতে দুমকা যাইবার পথে তিনটি শূদ্রা যাইতেছিল। তাহারা একটি সেতুর নিকটে উপস্থিত হইলে দস্যুরা তাহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি যাহা কিছু ছিল সমস্ত কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। রমণী তিনটি বেলা দ্বিপ্রহরে উলঙ্গ অবস্থায় সেতুর নিম্নে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। —বরিশাল-হিতৈষী।

বস্ত্র চুরি। জেলা বীরভূম হইতে জনৈক ভদ্রলোক সংবাদ দিয়াছেন তত্রত্য ময়ুরেশ্বর গ্রামে থানার পার্শ্বস্থ এক মুসলমানের বাটীতে গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রাত্রিকালে চুরি হইয়া গিয়াছে। তাহার বস্ত্র ও অর্থাদি সমস্তই চোরে লইয়া গিয়াছে। —বরিশালহিতৈষী।

ডাকাতি—বাখরগঞ্জ জিলার মাদারবাড়ী খালে এক নৌকায় ডাকাতি হইয়াছে। ভীষণ অস্ত্রধারী ডাকাতেরা রাত্রিকালে অকস্মাৎ নৌকায় উঠিয়া নৌকার আরোহীকে জলে ফেলিয়া দেয়। তাহারা কাপড়ে ও নগদে প্রায় ১২৫০ টাকা লুণ্ঠন করিয়াছে। —কাশীপুরনিবাসী।

বস্ত্র সঙ্কট—রাজসাহী ধলাগ্রামে এক গৃহস্থবাড়ীতে সন্তান প্রসব করাইতে গিয়া এক ধাত্রী একখানা নূতন ও একখানা পুরাতন কাপড় ও দুইটি টাকা পায়—পথে দুইজন লোক তাহাকে ধরিয়া কাপড় ও টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। —পুরুলিয়াদর্পণ।

বস্ত্রহরণ।—সাহোড়া ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার মহোদয়ের জনৈক আত্মীয় কার্য্যোপলক্ষে সাঁইথিয়ায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে তিলপাড়া নামক স্থানে রাত্রিকালে কয়েকজন দস্যু তাঁহার ৭টি টাকা ও পরিধেয় বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। —বীরভূমবার্ত্তা।

আবাইপুর কুমিরাদহার নিকটবর্ত্তী রায়গ্রাদাপুর গ্রামে একটি রমণী স্নানার্থে নদীতে গিয়াছিলেন। নির্জ্জন ঘাটে দ্বিপ্রহরে একাকী পাইয়া, কোন নৌকার দাঁড়ি-মাঝিগণ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার কাপড়খানা লইয়া গিয়াছে। রজকালয় হইতে বস্ত্র অপহৃত হইতেছে। শৈলকুপার থানার অন্তঃপাতী পুলুমবাড়ী এবং গাঁড়াশোলার বাজার হইতে বহু মূল্যের বস্ত্র অপহৃত হইয়াছে। সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া গৃহের বাহির হওয়া যেরূপ দায় হইয়াছে, একাকী কোন স্থানে যাতায়াত তদপেক্ষাও গুরুতর হইয়াছে, বহু দরিদ্র স্কুলছাত্র বস্ত্রাভাবে স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। —যশোহর।

এই যে বস্ত্রাভাব তার প্রধান কারণ অনুৎপাদন নহে; ব্যাপারীদের অন্যায় লাভ করিবার লোভ।—

ভারতে যত গজ কাপড় তৈয়ার হয়, যত গজ কাপড় বিদেশ হইতে আইসে, তার তালিকা এই:—

	ভারতজাত	বিদেশজাত
১৯১৪—১৫	১১২৩৫০ লক্ষ গজ	২৪১৮০ লক্ষ গজ
১৯১৫—১৬	১৪৪০০ „	২১১৬০ „
১৯১৬—১৭	১৫৭৬০ „	১৮৯০০ „
১৯১৭—১৮		
	দশ মাসে ১৩৭৫ „	১৩৫৩ „

দেখা যাইতেছে বিলাতি আমদানি যত কমিতেছে দেশী বস্ত্রের উৎপাদন প্রায় সেই হারে বাড়িতেছে। মোটের উপর বস্ত্র কিছু কম হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দাম ৩ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, বস্ত্রের পরিমাণ ৩ গুণ হ্রাস হয় নাই: ইহাতেই বোধ হয় ব্যবসায়ীদের লোভেই দাম অত্যধিক বাড়িয়াছে। ব্যবসায়ীদের কথায় বস্ত্রের মূল্য নিয়মিত করিতে আর এক দিনও বিলম্ব করা উচিত নয়।

—সঞ্জীবনী। রত্নাকর।

ইহার প্রতিকারের উপায় গভর্মেন্টের হাতে। গভর্মেন্ট যদি নুনের ন্যায় কাপড়েরও দাম বাঁধিয়া দেন তাহা হইলে আর কোনো গোলযোগই থাকে না। তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন আমাদের অন্যদিকে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমত, ধনীরা কাপড় বেশী দামে কিনিয়া হয় বিতরণ নয় অল্প দামে বিক্রয় করিবেন। দ্বিতীয়ত, দেশে কর্পাস চাষ ও ঘরে-ঘরে চরকার প্রচলন করিতে হইবে। এই দুই দিকেই চেষ্টা হইতেছে দেখিতেছি।—

সুরাজ (পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী প্রভৃতিও) লিখিয়াছেন—"পাবনা দুলাইর সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা শরিফন্ নেছা খাতুন চৌধুরাণী সাহেবা গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে ৫০০ অনাথ ভিক্ষুককে বস্ত্র দান করিয়াছেন।" বস্ত্রসমস্যার এই দুর্দ্দিনে তাঁহার এই বস্ত্রদান সময়োচিত দান হইয়াছে। যখন লোকের যে জিনিষের দরকার, বিশেষতঃ যে জিনিষের অভাবে লোকে লজ্জা নিবারণ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে, সেই বস্ত্র দানই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। এই বস্ত্র দান করিয়া উল্লিখিত চৌধুরাণী সাহেবা কেবল দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে; অধিকন্তু তিনি বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দিয়াছেন। দেশের অনেক হিন্দু মুসলমান ধনী এখনও নানা প্রকার উৎসবে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তাঁহারা যদি অনর্থক টাকা ব্যয় না করিয়া ঐ টাকা দ্বারা গরীবদিগকে বস্ত্র দান করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। দেশের ধনীগণ, দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দান করিবার এই উপযুক্ত সময়, এরূপ সময় আর আসিবে না।

—মোসলেম-হিতৈষী।

বস্ত্রের মহার্ঘ্যতা জন্য এ জেলার (ময়মনসিংহ) সর্ব্বত্র সকল লোকেরই ঘোরতর কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। স্থানীয় শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অভাব নিবারণের পক্ষে চেষ্টিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আশ্বস্ত ও সুখী হইয়াছি। জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ ইছমাইল খাঁ বাহাদুরের আহ্বান মতে ডিঃ বোর্ডের সভাগৃহে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এই বিষয়ের প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হপকিন্স এই আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা-সভায় স্থির হয় যে, এই জেলাতে যাহাতে সুতা প্রস্তুত হইতে পারে এবং জেলার তন্তুবায়গণ যাহাতে পরিধানের উপযোগী কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড একশত মণ তুলার বীজ আনাইয়া কৃষকগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপাততঃ কতকগুলি চরকা প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত মূল্যে তাহা বিক্রয় এবং অবস্থা বিশেষে বিতরণ করিয়া সুতা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হইবে। এখন তুলা চাষ আরম্ভ করিলে সেই তুলা প্রাপ্ত হইতে আরও ৯।১০ মাস অপেক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু বস্ত্রাভাবের কষ্ট

আমরা অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ভুগিতেছি। বিশেষতঃ লোকের এই সময়ে এ বিষয়ে যে আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নষ্ট হইতে দেওয়া সঙ্গত নহে মনে করিয়া আলোচনা-সভা স্থির করিয়াছেন যে, গারোপাহাড়ে ও মধুপুরের জঙ্গলে যে তুলা হয় নানাপ্রকারে উৎসাহ দিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং গ্রামের স্ত্রীলোকদের দ্বারা পূর্ব্বকালের ন্যায় ঐ তুলা দ্বারা সূতা প্রস্তুত করাইতে হইবে। যাহাতে স্ত্রীলোকগণ সূতা প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য পুরস্কারাদি দেওয়ার প্রস্তাবও হইয়াছে। তৃতীয় উদ্দেশ্যসাধন জন্য দেশের তাঁতি জোলা ইত্যাদিকে উপযুক্ত মাকু ইত্যাদি প্রস্তুত ও পরিধেয় কাপড় তৈয়ার নিমিত্ত উৎসাহ দেওয়ার কথা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত কার্য্য সাধনের জন্য তিনটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। একটি কমিটি এই-সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্য-প্রণালী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবেন। দ্বিতীয় কমিটি আবশ্যকীয় অর্থাদি সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। তৃতীয় কমিটি এ জেলার তুলা উৎপাদন বিষয়ে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা সাধারণকে অবগত করাইবেন। কমিটিগুলি তাঁহাদের প্রস্তাবিত উপায় সম্বন্ধে আলোচনা-সমিতির নিকট এক সপ্তাহ মধ্যে রিপোর্ট করিবেন। আমরা আশা করি, তাঁহাদের এই শুভ উদ্যম দ্বারা অন্ততঃ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও এই জেলার বস্ত্রাভাব দূর হইতে পারিবে।

—চারুমিহির।

ময়মনসিংহ জেলার কটন-কমিটিতে সব-কমিটিগুলির প্রস্তাব আলোচিত হইয়া নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হয়:—(১) চরকা দ্বারা সূতা প্রস্তুতের কার্য্য অতি ত্বরায় আরম্ভ করা হউক। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কমিটির মেম্বর ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হউক। ঐ টাকা দ্বারা চরকা ও তুলা ক্রয় করিয়া সূতা প্রস্তুতের জন্য দেওয়া হইবে। ঐ সূতা বিক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা আবার আরও অধিক চরকা ও তুলা ক্রয় করা হইবে। (২) প্রত্যেক মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে মহকুমার সদরে এবং মফস্বলে উপযুক্ত স্থানে এইরূপ কমিটি গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। (৩) এই সম্বন্ধে শিক্ষাদান-কার্য্যের ভার গ্রহণ নিমিত্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে অনুরোধ করা হউক। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য করিবেন:—(ক) চরকা দ্বারা সূতা প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে পুরস্কার দেওয়া। (খ) তত্রত্য কাশীকিশোর টেক্‌নিক্যাল স্কুলে সস্তায় চরকা ও ভাল তাঁত প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা। (গ) বালিকা-বিদ্যালয়ে দশ কিম্বা ততোধিক বৎসরের বালিকাদিগকে শিক্ষার জন্য চরকা প্রদান করা। (ঘ) স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যে অর্থ ব্যয় করেন উহার কিয়দংশ দ্বারা সূতা কাটায় যে-সকল মেয়েরা পারদর্শিতা প্রদর্শন করিবে তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া। (ঙ) বোর্ডের সাহায্যকৃত স্কুলসমূহের গৃহসংলগ্ন বাগানে তুলা উৎপন্ন করা। এবং (চ) সূতা কাটার জন্য যে চরকা ও তুলা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় তাহা জোগাইবার নিমিত্ত মহকুমা-কমিটি ও অন্যান্য মফস্বলের কমিটির হস্তে বোর্ড হইতে টাকা দাদন করা। কমিটির মেম্বর-বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক মহকুমা-কমিটিকে ১০০৲ টাকা এবং মফস্বল-কমিটিকে ৫০৲ টাকা দাদন দেওয়া যাইতে পারে। (৪) তুলার বীজ ও তুলা বিতরণ করিয়া তুলার চাষ ও চরকা দ্বারা সূতা প্রস্তুত বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীদিগকে অনুরোধ করা হউক। (৫) তুলার চাষ ও চরকা দ্বারা সূতা প্রস্তুত বিষয়ে সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করা হউক এবং সংবাদপত্রে ঐ-সকল আলোচনা ও সংবাদ প্রকাশিত হউক। (৬) কমিটির মেম্বারগণ এবং শিক্ষাবিভাগের কৃষিবিভাগের ও কো-অপারেটিভ বিভাগের অফিসরগণ সুযোগ মতে সর্ব্বত্র তুলার চাষ ও চরকা দ্বারা সূতার প্রস্তুত বিষয়ে সকল কথা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। (৭) কো-অপারেটিভ সোসাইটি-সকল ইহাদের মেম্বারদিগকে তুলার চাষ ও চরকা দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন। (৮) কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের মতে গারো তুলা দ্বারা চরকায় সূতা প্রস্তুত বিশেষ সুবিধাজনক। সুতরাং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যে অর্থ সাহায্য করিবেন উহার কতকাংশ দ্বারা গারো তুলা ক্রয় করা হউক। (৯) যে তুলার গাছ ভাদ্র আশ্বিন মাসে রোপণ করিলে অল্প সময় মধ্যে তুলা উৎপন্ন হয় সেই তুলা যাহাতে আগামী ভাদ্র মাসে ময়মনসিংহ জেলার কৃষকগণ বেশী পরিমাণে আবাদ করে তাহার চেষ্টা করা হউক এবং কৃষি-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ভূমি নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। (১০) ময়মনসিংহ জেলার কোন্ স্থানে কি পরিমাণ তাঁতি জোলা ইত্যাদি বস্ত্রবয়নকারী সম্প্রদায় আছে তাহা নির্ণয় করা হউক।—ঢাকা গেজেট।

এ (ময়মনসিংহ) জেলায় তুলার চাষের জন্য এবং চরকা দ্বারা সূতা প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট কটন কমিটি নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তুলার বীজ বিতরণ জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ১২০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত কমিটী ঐ টাকা দ্বারা তুলার বীজ ক্রয় করিয়া তাহা উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিকাল্‌চারেল অফিসার কিম্বা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট হইতে যে-কেহ ইচ্ছা করিলে ঐ বীজ গ্রহণ করিতে পারেন। এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই বীজ বপন করিবার সময়। আমরা ভরসা করি, সকলেই সত্বর বীজ গ্রহণ করিয়া কিছু কিছু কার্পাসের চাষ করিবার চেষ্টা করিবেন।

ডিষ্ট্রীক্ট কটন কমিটী ১৸৵০ মূল্যে ভাল চরকা প্রস্তুত করাইতেছেন। যে-কেহ ঐ মূল্য দিয়া চরকা ক্রয় করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে যাঁহার যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় তাহা ঐ কমিটীর সেক্রেটারিগণের নিকট জানিতে পারিবেন। তুলা কিনিয়া দাদন করিবার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কটন কমিটীর হস্তে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। যাহার আবশ্যক হইবে তিনি ঐ তুলা ক্রয় করিয়া নিতে পারেন। ডিঃ কটন কমিটীর নিকট কিম্বা মফঃস্বলে নিকটবর্ত্তী স্থানে কমিটী গঠিত হইয়া থাকিলে সেই কমিটীর নিকট অনুসন্ধান করিলে যে-কেহ তুলা ক্রয় করিতে পারিবেন। যাহাতে উন্নত প্রণালীর তাঁত দ্বারা কাপড় তৈয়ার হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যও ডিষ্ট্রীক্ট কটন কমিটী বন্দোবস্ত করিতেছেন।—চারুমিহির।

"চারুমিহিরে" আমার পত্র দেখিয়া ময়মনসিংহের রামকৃষ্ণ মিশনের সদাশয় ও মহাপ্রাণ সেবকবৃন্দ এই-সকল অবলাদের লজ্জা নিবারণ কল্পে যথার্থই কায়-মন বাক্যে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ মিসন হইতে ২টি সেবক ২খানি নূতন এবং ৫৪খানি পুরাতন বস্ত্র নিয়া আসিয়া যে-সকল রমণী বস্ত্রাভাবে গৃহের বাহির হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল, তাহাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। পুনশ্চ তাঁহারা নূতন ও পুরাতন এই উভয়বিধ বস্ত্রাদি সহ রবিবারে আসিবেন। সেবকদের মধ্যে একজন ইহাদের অবস্থা দর্শনে এতদূর বিচলিত হন যে তখনই আমাকে জানান—তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে ২০৲ করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন তাহার ১ মাসের টাকা আনন্দের সহিত মাতৃস্থানীয়া রমণীবৃন্দের লজ্জা নিবারণকল্পে ব্যয় করিবেন। এই উদার-হৃদয় সদাশয় যুবক সকলের আদর্শস্থানীয়।

মিশনের সেবকবৃন্দের ভিক্ষাই মূলধন। সুতরাং যদি দেশের

জনসাধারণ ইঁহাদিগকে যথোচিত সাহায্য না করেন তবে কিরূপে ইঁহারা এই মহাব্রত সম্পন্ন করিবেন ?

গতবারে ১২।১৩ বৎসরের বালিকাদিগকে একখানি কাপড় ২।৩ খণ্ড করিয়া কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিতে দেওয়া হইয়াছে। সাহারা মরুতে বারিবর্ষণের ন্যায় বর্ত্তমান অবস্থায় এই সাহায্য কিছুই ফলদায়ী হইবে না। এই বস্ত্র-বিতরণ-সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর প্রতিদিন বহু রমণী শতছিন্ন ও শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া দুঃখের কাহিনী জ্ঞাপন করিতেছে। এই সকল দুর্ভাগ্য রমণীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র নিবেদন। শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার, ডুল্লা, ময়মনসিংহ।—চারুমিহির।

কার্পাস কৃষি কমিটী Cotton Culture Committee গঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ-নিবারণ। দেশের সম্রান্ত মান্য গণ্য মহোদয়গণ এই কমিটির অভিভাবক। তাঁহাদের অনুগ্রহে কমিটি দেশময় তুলার চাষের ও চরখায়-সুতাকাটা-লুপ্তশিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তন দ্বারা সুতা প্রস্তুত করিয়া, কাপড় বুনাইয়া উচিত মূল্যে সরবরাহ করিয়া, দরিদ্র ও সঙ্গতিহীন গৃহস্থদিগের কাপড়ের অভাব ও লাঞ্ছনা নিবারণ করিবার জন্য মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ক্ষুদ্র আমি, আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন এই লজ্জানিবারণ মহাব্রতের সফলতায় উৎসর্গ করিয়াছি। গত বৎসরের তুলা কিনিয়া চরখার সুতা কাটাইতেছি। ছয় মাসের মধ্যে, দরিদ্র ভাই-ভগিনীদিগকে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরাইয়া, আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিতে প্রাণপণ করিয়াছি। কার্পাস-কৃষি কমিটি। অফিস—বিদ্যাসাগর-বাটী, কলিকাতা। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র। —মেদিনীপুর-হিতৈষী।

আশার কথা -বস্ত্রাভাবে দেশের লোক যে দারুণ আঘাত পাইয়াছে তাহাতে একটু জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে—আমরা অনেক গ্রাম হইতে সংবাদ পাইতেছি সর্ব্বত্র কার্পাস রোপণের চেষ্টা হইতেছে। সায়েস্তাবাদ গ্রামে কয়েকজন জোলা চরকায় তুলা কাটিয়া কাপড় বয়ন করিয়াছে। কোনও কোনও ভদ্রলোক আবার তাঁত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। বরিশাল কমিটি বরিশাল সহর হইতে প্রায় ২০০ শত টাকা ও ১২৫ টাকা মূল্যের কাপড় সংগ্রহ করিয়াছেন। আশা করি গ্রামে গ্রামে এই আদর্শ অনুসৃত হইবে।—বরিশালহিতৈষী।

বঙ্গমহিলার হাতে আবার চরকা।—সহযোগী 'খুলনা' বলেন,—তত্রত্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ও মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের জননী তাঁহাদের বাসা-বাটীতে উৎপন্ন কার্পাস তুলা হইতে স্বহস্তে সুতা কাটিয়া তন্তুবায়-বাড়ী পাঠাইয়া এক জোড়া অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করাইয়াছেন। ইতিমধ্যে একদিন এই বস্ত্র বার লাইব্রেরী-গৃহে আনাইয়া সকলকে দেখান হইয়াছে। দিন দিন দেশে যেরূপ বস্ত্রের অভাব বোধ হইতেছে তাহাতে বড় বড় ঘরের গৃহিণীগণেরই সর্ব্বপ্রথমে এপথ দেখান কর্ত্তব্য।

—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

পাবনা রায়পুর ক্ষেতুপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ পাটাদার মহাশয় স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহে কার্পাস প্রচলনের জন্য বৎসরাধিক হইল চেষ্টা করিতেছেন। তিনি 'কার্পাস আবাদ' নামক একখানি পুস্তক ৫ শত কপি মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে স্থানীয় অধিবাসী-বর্গের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। যাহাতে কৃষকগণ প্রত্যেকে কার্পাস চাষ করে তাহার জন্য নানাপ্রকার উপদেশ দিতেছেন। নিজেও বিভিন্ন স্থান হইতে নানাপ্রকার কার্পাসের বীজ আনিয়া আবাদ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফল আশানুরূপ কিছুই হইতেছে না। প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট বীজের অভাব, কোন প্রকারেই ইহা পাওয়া যাইতেছে না। আমরাও নানাস্থানে লিখিয়া নানা প্রকার অনুসন্ধান করিয়া বীজ পাইতেছি না। যদি কেহ এ সম্বন্ধে আমাদিগকে কোন সংবাদ দিতে পারেন তবে বাধিত হইব। দ্বিতীয়তঃ পাটের আবাদে কৃষক ঠেকিয়া এখন আর তুলার আবাদে সহসা যাইতে চায় না। তাহারা বলে, পরিশ্রম ব্যয়বাহুল্য করিয়া জমিতে তুলার আবাদ করিলাম, ইহার মধ্যে যুদ্ধ মিটিয়া গেল, বিদেশ হইতে পূর্ব্বের ন্যায় সস্তা দরে সুতা কাপড় আসিতে লাগিল, তখন আমাদের তুলার দশা হইবে কি? দেশের সমগ্র অধিবাসী নিরক্ষর, তাহাদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া কে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবে?

গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সামান্য সাহায্য করিলেই কাজটা বোধ হয় এতদিন অনেকদূর অগ্রসর হইত। আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশে গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করা হয়। মূলধন দিয়া কৃষকগণকে সাহায্য করা হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ আছে। ইহার কার্য্যপ্রণালী জনসাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই বিভাগ কি কার্য্য করে আমরা তাহা কিছুই জানি না। তুলার বীজের জন্য কৃষিবিভাগের হেড অফিসে চিঠি লিখিয়া আমরা চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত পাই নাই। আমরা এখনও মনে করি গবর্ণমেণ্ট একটু অবহিত হইলেই দেশের বস্ত্রসমস্যা অনেকটা নিরাকৃত হইতে পারিবে।—সুরাজ।

বাস্তবিক যতদিন পর্য্যন্ত না গভর্মেণ্টে এই ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সাহায্য করিবেন, ততদিন সুফল ফলিবে না, তার সাক্ষী—

আমরা অবগত হইলাম, মফঃস্বলের কোনও কোনও স্থানে তাঁত দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতে অনেক লোকই নাকি ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহারা তাঁতি দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া পুলিশের কোপানলে পতিত হইয়াছিল। এখন ঐরূপ করিতে গেলেও পুলিশ আবার তাহাদিগকে উৎপাত করিবে বলিয়া তাহাদের মনে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশীর উন্নতিকর যে কোনও কার্য্যেই পুলিশ অসাধারণ দৃষ্টি রাখিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা নূতন তাঁত স্থাপন করিয়া তখন বস্ত্র বয়নের চেষ্টা করিয়াছিল তাহারাও পুলিশের দৃষ্টিভাজন হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর সেই অবস্থা নাই। —চারুমিহির।

এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার একটি নূতন পন্থা "যশোহর" নির্দ্দেশ করিতেছেন।—

দেশের বস্ত্রসমস্যা দূর করিতে হইলে অবিলম্বে প্রত্যেক জেলায় একটি শিল্প ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা উচিত; এই-সকল ব্যাঙ্ক হইতে তন্তুবায়দিগকে স্বল্প সুদে টাকা ধার দিয়া তাহাদের তাঁত চরকা প্রভৃতি ক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে, সূত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁতি জোলাদিগকে দাদন করিতে হইবে, শিক্ষিত লোকের উপদেশানুসারে তাঁতি এবং জোলারা যাহাতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার ব্যাঙ্ক তাঁতি জোলাদের নিকটে বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া যাহাতে জনসাধারণ ঐ-সকল তাঁতের বস্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহার ব্যবস্থা করিবে। অন্য দিকে তুলার চাষ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া কার্পাসের অভাব দূর করিতে হইবে। এরূপ ভাবে ২ বৎসর কাল যত্ন লইলে দেশের বস্ত্র-শিল্প এমন ভাবে জাগিয়া উঠিবে যে তখন আমাদিগকে আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। দেশের

লোক একবার বিদেশী বস্ত্রের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিলে স্থায়ী ভাবে দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। —যশোহর।

কুমিল্লার কৃষকেরা এই বস্ত্রসঙ্কটে উত্যক্ত হইয়া প্রতিকারের উপায় এই স্থির করিয়াছে—

যদি বস্ত্র ও লবণ সস্তা না হয়, তবে তাহারা চাউলাদি বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ধর্ম্মঘট করিবে।—পুরুলিয়া-দর্পণ।

দেশের এই দুর্দ্দিন দুঃসময়েও দেশের মধ্যে নানা স্থানে অল্প স্বল্প সদনুষ্ঠান হইতেছে খবর পাইয়াছি।—

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ফরিদপুরে কলেজ খুলিবার মঞ্জুরী দিয়াছেন। এই কলেজে আই, এ পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। মফঃস্বলে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে।—মোসলেমহিতৈষী।

১৯১৮ অব্দের জানুয়ারী হইতে পাবনা জেলার রায় দৌলতপুর গ্রামে একটি হাই স্কুল খোলা হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় এই মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। এই স্কুলের স্থায়িত্বের জন্য কর্ণসুতি গ্রাম-নিবাসী স্বদেশ-হিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী মুন্সী মহাম্মদ মজিবর রহমান তালুকদার সাহেব দুই খাদা জমি দান করিয়াছেন। এই জমির মূল্য ১৫০০০ টাকা। ইহা একটি আত্মোৎসর্গের চরম দৃষ্টান্ত। এখনও অনেক স্থানে অনেক মুসলমান জমিদার, তালুকদার, অনেক ধনী লোক আছেন, কিন্তু অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমানের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য কয় জনে কয় খাদা জমি দান করিয়াছেন? আজ যুবক মজিবর রহমান যাহা দেখাইলেন, তাহা অতি অল্প লোকই দেখাইতে পারে। তাঁহার জীবন কীর্ত্তিময় হউক। তিনি সমাজ-সেবায় ব্রতী হইয়া প্রকৃত মানবপদবাচ্য হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।—

মোসলেম-হিতৈষী।

যুবক মুজিবর রহমান সাহেবের এই আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়। যাহার টাকা দেশের সমাজের কাজে লাগিল না তাহার জীবন ও টাকা দুইই বৃথা।—মোহাম্মাদী।

আবু বকর জুনিয়র মাদ্রাসা।—পাংশা ফরিদপুর জেলার একটি বৃহৎ থানা। হিন্দু অপেক্ষা এখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। দুঃখের বিষয়, শিক্ষাভাবে এই অঞ্চলের মুসলমানগণ পূর্ণমাত্রায় ধর্ম্মদ্রোহী। শেরেক, বেদাত, সুদ, ঘুষ এখানকার অধিকাংশ মুসলমানের অঙ্গভূষণ। মুসলমানের ঘরে কালী পূজা, পুত্রকন্যার বিবাহে ঢাক ঢোল, সুদ-ঘুষের তাণ্ডব নৃত্য, বেহুদা নাস্তিক মোল্লাদের কাণ্ড কারখানা। মুসলমান নামধারী ব্যক্তিগণকে প্রকৃত মুসলমানে পরিণত করিবার জন্য, দেশের মধ্যে ধর্ম্মের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য, বঙ্গ-বিখ্যাত পীর ও মোর্শেদ জনাব মওলানা শাহ সুফী মহম্মদ আবু বকর সাহেবের প্রস্তাব মত এক বিরাট সভায় শিক্ষিত অশিক্ষিত পাঁচ সহস্র মুসলমানের সম্মতিতে এখানে একটি জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপনের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। সেই প্রস্তাব-মত বিগত ১লা চৈত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রণালী-মত "আবু বকর জুনিয়র মাদ্রাসা" নামে এক মাদ্রাসার দ্বারোদ্ঘাটন করা হইয়াছে। যথারীতি উপযুক্ত মাষ্টার ও মৌলবী দ্বারা মাদ্রাসার অধ্যাপনা-কার্য্য চলিতেছে। এখন সকলেই গা-ঢাকা দিয়াছেন। সমাজের খাতিরে, জাতীয়তার খাতিরে কেবল মাত্র মাদ্রাসার দরিদ্র সেক্রেটারী প্রাণপণ করিয়া ইহার জন্য খাটিতেছেন এবং ইহার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন।

—মোসলেম-হিতৈষী।

সৎকার্য্য।—রেঙ্গুনপ্রবাসী চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ চট্টল বৌদ্ধ সমিতি নামে এক সমিতি ও একটি স্থায়ী শিক্ষা-তহবিল স্থাপন করিয়াছেন। এই তহবিল হইতে প্রতি মাসে অন্যূন দুইটি ছাত্রকে শিক্ষার জন্য ঋণদান করা হইবে। উপার্জ্জনক্ষম হইয়া এই-সকল ছাত্র উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবে। —বিশ্ববার্ত্তা।

অবনতজাতির উন্নতিবিধায়িনী সমিতি।—সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় অতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আপাততঃ তাঁহার নিজ তহবিল হইতে আমার হস্তে কিছু অর্থ সমর্পণ করিয়াছেন। আমি ঐ টাকা হইতে নিম্নলিখিত ২০টি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় গত দুই মাসের মধ্যে স্থাপন করিয়াছি; এই বিদ্যালয়গুলি তাঁহাদের অর্থে সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইবে। বিগত ১৮ই মে তারিখে সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এই বিদ্যালয়-গুলির পার্শ্বে লিখিত মাসিক সাহায্য অনুমোদন করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে গড়ে ছাত্রসংখ্যা অন্যূন ৩০ জন হইবে। বিগত মার্চ্চ মাস হইতে এই পাঠশালাগুলিতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

হুগলী জেলা।

১। গুপ্তিপাড়া মিরডাঙ্গা নৈশবিদ্যালয় ২৲
২। গুপ্তিপাড়া গোসাইডাঙ্গা ২৲

বর্দ্ধমান।

৩। সোনাপলাসী ২৲

বীরভূম।

৪। পলাশ, নৈশবিদ্যালয় ২৲
৫। সাশপুর বালিকা বিদ্যালয় ২৲

চব্বিশপরগণা।

৬। মেরুং ২৲
৭। সাট মিনসে ২৲
৮। নৈহাটা কাপালিপাড়া ২৲
৯। দক্ষিণ পিফা ২৲

যশোহর।

১০। কুশখালি ৩৲
১১। নিরাইল ২৲
১২। বামনহাটা ২৲

ঢাকা।

১৩। মুক্তীশপুর ২৲
১৪। চর মোহনপুর ২৲
১৫। যায়রা গ্রাম ২৲
১৬। দুপতারা সাও ঘাট মুচি ৩৲

মৈমনসিংহ।

১৭। বাইমাইল ২৲
১৮। চামরী গ্রাম, বালিয়া ২৲

নোয়াখালী।

১৯। সিরাজউদ্দিনপুর, বালিকা-বিদ্যালয় ২৲

ত্রিপুরা।

২০। চর যোলাদি বালিকা-বিদ্যালয় ২৲

সমিতির বিদ্যালয়-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য স্থানীয় শিক্ষিত লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক। সমিতির যথেষ্ট অর্থ নাই যে মাসিক বেতনে পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে

পারেন। তজ্জন্য এই অধিবেশনে ইহাই স্থির হইয়াছে যে প্রত্যেক মহকুমায় আবশ্যক-মত একাধিক শিক্ষিত লোককে পরিদর্শনের ভার দেওয়া হইবে। পরিদর্শকেরা প্রতিমাসে একবার পরিদর্শন করিবেন। সমিতি তাঁহাদিগকে প্রতি পরিদর্শনের জন্য ৳৹ আনা পারিতোষিক দিবেন। কিন্তু তাঁহাদের অন্য কোন প্রকার ব্যয়ভার বহন করিবেন না।

মুচিদের উন্নতির উপায়।

বিগত ১৭ই মে তারিখে ঢাকা নারান্দিয়া বয়র বাজার মুচিপাড়া-নিবাসী রামচন্দ্র দাস নিত্যানন্দ দাস ও শনিরাম দাস নামক তিনজন মুচি যুবক সমিতির যত্নে এবং অর্থে কলিকাতায় আসিয়াছে। আসিবামাত্র তাহাদিগকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে এক বড় চর্ম্মসংস্কার কারখানায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষা করিলে এই সমিতি তাহাদিগকে মাসিক ৩৲ টাকা হারে বৃত্তি দিবেন। পরিশ্রমশীল হইলে ইহাদের বেতন পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে ১৫ হইতে ২০৲ টাকা হইবে। এই কারখানায় বাঙ্গালী মুচি যুবক পাইলে পশ্চিমদেশবাসী লোক নিযুক্ত করা হইবে না, এইরূপ জানা গিয়াছে। বাঙ্গালী মুচিগণ অতিশয় অলস। এইরূপ কারখানায় কাজ করিতে হইলে অলসতা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। কলিকাতায় এই শ্রেণীর যুবকদিগের মাসে ৸৹ হইলে খোরাক চলে। উপরি উক্ত যুবকদিগের মধ্যে দুই জন সমিতির স্থাপিত ঢাকা বয়র বাজার মুচি স্কুলের ছাত্র। ইহারা দুই এক অক্ষর ইংরাজীও জানে। বাঙ্গালায় পত্র লিখিতে জানে। ইহারা নিম্ন প্রাথমিক পুস্তক পড়িয়া উন্নততর প্রণালীতে আপন ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া লাভবান হইতে আসিয়াছে। যাঁহারা "ছোট লোক" বলিয়া ইহাদিগকে সম্বোধন করতঃ আপন রসনা তৃপ্ত করেন এবং বলেন যে "ছোট লোককে" লেখা পড়া শিখাইলে ইহারা সমাজ বিধ্বস্ত করিবে, তাঁহারা অচিরে দেখিতে পাইবেন বিধ্বস্ত করা দূরে থাকুক এই প্রাইমারী বিদ্যা শিখিয়া ইহারা সমাজকে সুপরিচালিত করিয়া অগ্রসর করিবে। ইতি-মধ্যেই রামচন্দ্র ও নিত্যানন্দ আমার নিকট হইতে ঠাকুরমার ঝুলি গল্পের বহি লইয়া গিয়াছে। ঐ বইখানা শেষ করিলে প্রতি সপ্তাহেই নূতন নূতন গল্পের বই দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তাহারা আনন্দমনে বই লইয়া আমার বাড়ীতে বসিয়াই কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের সঙ্গী শনিরামকে বর্ণপরিচয় পড়াইতে বলিয়া দিয়াছি। দেশবাসীগণ অতিশীঘ্র দেখিবেন সেই দিন অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে যখন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করিয়া জনসাধারণ অগ্রসর হইবে এবং আপন আপন সমাজকে গড়িয়া তুলিবে।

শ্রীরাজমোহন দাস, সম্পাদক।—সঞ্জীবনী।

সাহায্য দান।—বাবু জে, এন, ঠাকুর ফরিদপুর দামধ্যা বাজারের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৪ গণ্ডা জমি, মাসিক ১০৲ ও এককালীন একশত টাকা দান করিয়াছেন। —এডুকেশন গেজেট।

হিন্দু সমাজের উদারতা। -সুভাষিণী নাম্নী যে ব্রাহ্মণ-ঘরের কুল-বধূকে অপহরণ করিয়া কয়েকমাস যাবৎ বেশ্যালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া অসৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করায় সুরবালা ও গায়িত্রী নাম্নী দুই বারবনিতার শাস্তি হইয়া গিয়াছে, সেই সুভাষিণীর ব্যাপার লইয়া হিন্দু সমাজে বেশ একটা চাঞ্চল্য ও কর্ত্তব্যানুভূতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সুভাষিণীর শ্বশুর ও স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সামাজিক শাসনের ভয়ে তাঁহারা তাহাতে সাহসী হন নাই। এজন্য মোকদ্দমার পরে সুভাষিণীকে খৃষ্টান মিশনারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পরে দুঃস্থ উৎপীড়িতের অকৃত্রিম বন্ধু লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম ডি, আই, এম, এস, (অবসর প্রাপ্ত) মহাশয় সুভাষিণীকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া স্থান দিয়াছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম নবদ্বীপ ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও শাস্ত্র-যুক্তি-অনুসারে সুভাষিণীকে গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবে এজন্য প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেই প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেড় হাজার টাকার দরকার। সেজন্য চাঁদা উঠিতেছে। খুব সম্ভব সত্বরই ঐ টাকা সংগ্রহ হইবে। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এই ফণ্ডে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আরও অনেকে চাঁদা দিতেছেন। হিন্দু সমাজের এই কার্য্যে আমরা খুব প্রীত হইয়াছি। কেননা যে-সমস্ত অজ্ঞ অবোধ অসহায়া বালিকাদিগকে শয়তান-শয়তানীরা ছলে বলে কৌশলে পাপ-পুরীতে নিয়া ফেলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করা হয় না বলিয়াই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে ঐ পাপে মজিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা যেমন একদিকে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অন্যদিকে নিরপরাধের প্রতি অন্যায়াচরণও করা হয়। যে নিজের ইচ্ছায় পাপের সংস্পর্শে যায় নাই, অন্যে জোরপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ না করিলে যে মহা অন্যায় ও অত্যাচার করা হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাতে সমাজের সংহত শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়।

—মোহাম্মদী।

বগুড়ায় দুইটি সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

—মোসলেমহিতৈষী।

নাটোরে জলের কলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সমাধা হইতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। নাটোরে জলের কলে ৮৭০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ২০০০০৲ টাকা দিবেন ও রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ১৫০০০৲ টাকা দিবেন। বক্রী টাকা চাঁদা আদায় করিয়া সংগ্রহ হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরেই নাটোরের অধিবাসীরা কলের জল পান করিয়া পরম চরিতার্থ হইবেন। —হিন্দুরঞ্জিকা।

বালিগঞ্জে "ইণ্ডিয়ান অরফ্যানেজ" ও "রেসকুহোম্"।—প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ সি আর দাসের সভাপতিত্বে বালিগঞ্জে ১১ নং পণ্ডিতিয়া রোডে "ইণ্ডিয়ান অরফ্যানেজ ও রেসকুহোম্" নামে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য

(১) অভিভাবক-ও আশ্রয়হীন অনাথ বালক-বালিকাগণকে আশ্রয় দান এবং অভিভাবক স্বরূপ হইয়া ভরণপোষণ এবং সত্য ও ন্যায় পথে থাকিয়া জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা। সাধারণ দরিদ্র পল্লীবাসীগণের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(২) অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা, অন্ধ অক্ষম, আশ্রয়হীন আতুরদিগের ভরণপোষণ এবং আশ্রয় দান।

(৩) Rescue Home (রেসকুহোম্)

অভিভাবকহীন বয়ঃপ্রাপ্ত অবিবাহিতা বা বিধবা স্ত্রীলোকগণ যাঁহারা কুসংসর্গে পড়িয়া বা অন্নাভাবে সাময়িক প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন বা সমাজচ্যুত হইয়াছেন তাঁহাদের আশ্রয়দান এবং অভিভাবকস্বরূপ হইয়া সম্পূর্ণ দেশীয় আদর্শে স্বাধীন ভাবে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের সহায়তা করা।

গত চৈত্র মাস হইতে এই আশ্রমের কোন কোনও বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্রই অন্যান্য কার্য্যগুলি আরম্ভ করা হইবে।

উপস্থিত আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দৈনিক খরচ বাদে পরিধেয় বস্ত্র; আহারের বাসন, বিছানা, বেঞ্চ ইত্যাদি, সমস্তই আবশ্যক। আপনারাই সম্মুখে যদি এই অবস্থায় বালক বালিকা বা বৃদ্ধ

বৃদ্ধা কাহাকেও পান নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট পাঠাইয়া দিলে সাদরে গৃহীত হইবে। এক্ষণে ইহার স্থায়িত্ব সাধারণের সহানুভূতি এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিতেছে। সকলে প্রার্থনা করুন, যেন আপনাদের পরিত্যক্ত ভ্রাতাভগিনীদের মঙ্গলকল্পে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন (ব্যারিষ্টার) ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ রায় (ব্যারিষ্টার) অথবা শ্রীযুক্ত শুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

সাময়িক দান।—মিষ্টার এম, সরকার (ব্যারিষ্টার); মিঃ পি, সি, মিত্র (উকীল); মিঃ এ, সি, কুপার; মিঃ কালুরাম শেঠ; ডাক্তার এস, এন, চৌধুরী; কুমার এস, ডি, ঘোষাল (ভূকৈলাস রাজবাটী); মিঃ আই, বি, সেন (ব্যারিষ্টার)—১০৲ টাকা হিসাবে।

প্রফেসার এন, মৈত্র; মিঃ বি, এন, মিত্র (ব্যারিষ্টার); শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী; মিঃ ডব্লিউ চৌধুরী; মিঃ জে চৌধুরী, (ব্যারিষ্টার); প্রফেসার এ, সি, দত্ত; মিঃ আর, এইচ এম, রোস্তমজী; জষ্টীস এন, আর চ্যাটার্জি; জনৈক অপরিচিত দাতা—৫৲ টাকা হিসাবে।

মিঃ অরবিন্দ রায় (ব্যারিষ্টার) ৪৷৷৹। মিঃ এ, এম, আহির; শ্রীযুক্ত মননকুমার মৈত্র; অনারেবল মিষ্টার বি, সি, রায় (জমিদার); জনৈক বন্ধু, শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী—৪৲ টাকা হিসাবে।

ডাক্তার বি, সি, রায় ৩৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (উকিল); মিঃ বি, দে; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন; মিঃ এচ ডি বসু (ব্যারিষ্টার); ডাক্তার বি, সি, মিত্র; মিঃ এস, রায় (ব্যারিষ্টার); মিঃ এস কে দাস গুপ্ত (ব্যারিষ্টার); মিঃ এস চাটার্জি; জনৈক মহিলা (তারাবাস). মিঃ ইও সি দাস গুপ্ত (উকিল); শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও মিঃ পি সি দত্ত; শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মৈত্র,—১৲ টাকা হিসাবে।

এতদ্ব্যতীত ছেলেদের খেলিবার বল ইত্যাদি বাবদ নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সাহায্য করিয়াছেন—মিঃ সি জে স্মিথ—৫৲; জনৈক সাহেব ৩৲; মিঃ এ, কে, রায় ১৲; খুচরা আদায় ১০৲।

অর্দ্ধ মূল্যে শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমের বালকগণকে একদিন প্রীতিভোজ দিয়াছেন।

মাসিক চাঁদা।—মিষ্টার ই, সি, হোয়াইট-হেড্; বাবু সুকুমার বেনার্জি; শ্রীযুক্ত অরবিন্দ রায় (ব্যারিষ্টার), শ্রীযুক্ত আই, বি, সেন (ব্যারিষ্টার)—মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে।

শ্রীযুক্ত নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালা ভকৎরাম, ও বি, এন, শাশমল (ব্যারিষ্টার)—মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে।

মিঃ টি,সি, বেনার্জি, জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী গরীবলোক; মিঃ পি,এন, মুখার্জি; শ্রীযুক্ত মননকুমার মৈত্র; ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী (উকিল); শ্রীযুক্ত মোহিত মুখার্জি; শ্রীযুক্ত সুরেশ মৈত্র; শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বেনার্জি; শ্রীমতী শোভা দেবী; মিষ্টার এন বেনার্জি; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চৌধুরী; ডাক্তার বীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র MB; শাস্ত্রী মেধানাথ; শ্রীমতী ইলা দেবী; প্রফেসার মুরলীধর বেনার্জি; শ্রীযুক্ত পরেশ মিত্র; শ্রীযুক্ত শ্রীধর রায়; দি মেট্রপলিট্যান ফডার কোং ও প্রভাসচন্দ্র দত্ত—মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী; মিঃ পি, সি, দত্ত; শ্রীযুক্ত সুকুমার মুখার্জি; শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ গাঙ্গুলী, মাসিক ৷৷৹ হিসাবে।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির তালিকা।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শিবচন্দ্র গাঙ্গুলীর চেষ্টায় পাড়া হইতে মুষ্টিভিক্ষা ১ মাসে আদায় দুই মণ দশ সের চাউল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ২খানা ধুতি। মেট্রপলিট্যান ফডার কোং—৫ খানা তক্তাপোষ।—২৪-পরগণা-বার্ত্তাবহ।

শিক্ষার জন্য দান—ঢাকা জিলার বিক্রমপুর সানিহাটা-গ্রাম-নিবাসী ভোলা মহকুমার অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত রজনীনাথ কর মহাশয় প্রায় ৪৪ বৎসর যাবত প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের সহিত ওকালতি করিতেছেন। রজনীবাবু ধনী শ্রেণীর লোক নহেন। কিন্তু তিনি আজ যে মহানুভবতা ও উচ্চহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনেক ধনকুবেরের অনুকরণীয়। রজনীবাবুর ওকালতি ব্যবসায়ে যে কিছু অর্থ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ভোলার সাধারণ শ্রেণীর অধিবাসী হইতে হইয়াছে। ভোলার ঐ সাধারণ শ্রেণীর দরিদ্র অধিবাসীদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধার জন্য তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইয়াছে, তাই তিনি তাঁহার পিতা ও মাতার নামে মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে ২টি বৃত্তি স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫৫০০ টাকা গচ্ছিত করিয়াছেন। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ঐ ২টি বৃত্তি ভোলার কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসীদেরই প্রাপ্য হইবে। আমরা এই সংবাদ শুনিয়া রজনীবাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি। ভগবান রজনীবাবুকে দীর্ঘজীবী করুন। তিনি সৎকার্য্যে মুক্তহস্ত, এই দান দ্বারা তাঁহার এবং তাঁহার বংশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।—কাশীপুর-নিবাসী।

দেশী ও বিলাতী আদর্শের তুলনায় তারতম্য বুঝাইবার জন্য নিম্নে দুটি সংবাদ পর পর সঙ্কলন করিয়া দেশের কথার উপসংহার করিতেছি—

লবণ এবং কাপড়ের মূল্য আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের নানারূপ কষ্টের কারণ হইয়াছে। সম্প্রতি যশোহর মনিরামপুরের কয়েকজন লোক বিচালী পোড়াইয়া সেই ছাই হইতে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিতেছিল। এই অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় প্রত্যেকের ২৲ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড হইয়া গিয়াছে। যাহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য নয়, কিন্তু কেবল নিজের ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করে, তাহাদিগের প্রতি দণ্ডদানের ব্যবস্থা রহিত করাই উচিত। তবু সুখের বিষয় যে সহৃদয় বিচারক মহোদয় অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি যথেষ্ট করুণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা দেশ-কাল-পাত্রানুসারে কেবল আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিচারকার্য্য পরিচালন করিতে পারেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

--যশোহর।

সহযোগী দৈনিক "বসুমতী" হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি পত্রস্থ করিলাম। বগুড়ার নিহত পুলিশ ইন্স্পেক্টর হরিদাস মৈত্রের মৃত্যুর পর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার বার্ট ও তাঁহার পত্নী প্রায়ই তাহার বিপন্ন পরিবারবর্গকে সান্ত্বনাদানে চেষ্টা করিতেন। যে দিন হরিদাস-বাবুর পরিবারবর্গ বগুড়া হইতে চলিয়া যাইবে, সে দিন মিষ্টার বার্ট ও তাহার পত্নী যাইয়া দেখিলেন, হরিদাসের পত্নীর মস্তক মুণ্ডিত; তাহার নিরাভরণ দেহ বিধবার বেশে আবৃত। তাহাকে দেখিয়া মিষ্টার বার্ট অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"কন্যা তোমার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন?" তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমরা যদি তোমার স্বামীর হত্যাকারীকে ধরিয়া শাস্তি দিতে পারি তবে বোধ হয় তোমার কিছু সান্ত্বনালাভ হইবে।" উত্তরে হিন্দুবিধবা বলিলেন যে "তিনি যাহা হারাইয়াছেন, তাহা আর পাইবার নহে। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি যে দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন—

ভগবান্ যেন আর কাহাকেও সে দুর্দ্দশা না দেন। হত্যাকারী ধৃত হইলে তাহার পরিবারের এমনই দুর্দ্দশা হইবে। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবেন হত্যাকারী যেন ধৃত না হয়; তাঁহার সুখের আশা শেষ হইয়াছে; মিষ্টার বার্ট যেন তাঁহায় সন্তানদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন।" এই উত্তরে মিষ্টার বার্ট মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছেন,--"কি উদার উক্তি। এ সময়েও হিন্দু-বিধবার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে প্রতিহিংসা স্থান পায় নাই।" —২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

চারু।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাটের কলের অতিরিক্ত লাভ।

গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল বিভাগ হইতে গত চারি বৎসরে বাংলাদেশের ৪৮টি পাটের কলের যে লাভ হইয়াছে তাহার অঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা, খরচ-খরচা ইন্‌কম-ট্যাক্স সুপার-ট্যাক্স ধার-করা টাকার সুদ সমুদয় বাদে খাঁটি লাভ। লাভের অঙ্ক নীচে পাউণ্ডে দেওয়া হইল। এক পাউণ্ড মোটামুটি ১৫ টাকার সমান।

বৎসর	লাভ
১৯১৪	৮২৩০০০
১৯১৫	৪৬৬১০০০
১৯১৬	৬১১৫০০০
১৯১৭	৪৬৮৯০০০
৪ বৎসরের মোট লাভ	১৬২৮৮০০০

যুদ্ধের পূর্ব্বে বার্ষিক লাভ মোটামুটি দশলক্ষ পাউণ্ড হইত। যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে লক্ষ লক্ষ চটের থলিয়ার ফরমাইস পাওয়ায় অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধ না ঘটিলে চারি বৎসরে চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড লাভ হইত। ১৬২৮৮০০০ পাউণ্ড হইতে চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড বাদ দিলে, ১২২৮৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ আঠার কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে। পাটের কলগুলি সমস্তই বিদেশীদের। সুতরাং এই-সমস্ত লাভ বিদেশীদের পকেটে গিয়াছে।

যে-যে দেশ বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যাপৃত, তথায় যুদ্ধের জন্য যে-যে ব্যবসাতে অতিরিক্ত লাভ হইতেছে, সেই লাভের উপর শতকরা ৫০ হইতে ১০০ টাকা ট্যাক্স বসান হইয়াছে; কোন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ব্যবসাটাই নিজের হাতে লইয়াছেন। এখানেও পাটের কলের অতিরিক্ত লাভের উপর গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স বসান উচিত ছিল। অন্যূন শতকরা ৫০ টাকা হারে ট্যাক্স বসাইলে গত চারি বৎসরে গবর্ণমেণ্ট নয় কোটি টাকার উপর এই উপায়ে পাইতে পারিতেন। তাহা একটুও অন্যায় হইত না, এবং তাহা করিলেও বিদেশী পাটব্যবসায়ীদের হাতে অতিরিক্ত নয় কোটি টাকা লাভ থাকিত। কিন্তু প্রবল ও ধনী জা'ত-ভাই পাটের কলওয়ালাদের অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স বসাইতে হইলে যতটা ন্যায়বুদ্ধি ও সাহসের দরকার ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিবের তাহা না থাকায়, তিনি গরীবের নুনের উপর ট্যাক্স বাড়াইয়াছেন, কাপাসের সুতা ও কাপড় এবং অন্যান্য অনেক জিনিষের উপর শুল্ক বাড়াইয়াছেন, রেলের ভাড়া বাড়াইয়াছেন, এবং এই-সব উপায়ে গরীব লোকদের বোঝা দুর্বহ করিয়া তুলিয়াছেন। এই রাজস্ব-সচিব মেয়ার সাহেবের গুণে বড়লাটের সভায় প্রায় সব "নির্ব্বাচিত" সভ্য এমন মুগ্ধ যে তাঁহার চাকরীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। অথচ তিনি যদি ধনীদের অতিরিক্ত লাভের উপর অন্যান্য যুদ্ধে-লিপ্ত দেশের মত অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইতেন তাহা হইলে গরীব লোকদের ক্লেশ বাড়িত না। কারণ, যুদ্ধের জন্য শুধু যে পাটের কলেই খুব বেশী লাভ হইয়াছে, তাহা নয়; লোহা-ইস্পাতের কারখানা, সুতী ও পশমী কাপড়ের কল, চামড়া কষ করিবার ও জুতা বুট প্রস্তুত করিবার কারখানা, প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ব্যবসাতেও এইরূপ হইয়াছে। সব-গুলির অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০ টাকা হারে ট্যাক্স বসাইলে বার্ষিক অন্ততঃ পনের কোটি টাকা আদায় হইত। গবর্ণমেণ্টের ইহার বেশী অতিরিক্ত-আয়ের এখন নিশ্চয়ই প্রয়োজন নাই।

লর্ড কর্জ্জন একবার তাঁহার একটা বক্তৃতায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, যে, ইংরেজদের ভারত-শাসন এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা অর্থলাভ, এই দুটি একই জিনিষের দুই পিঠ। ইহা ঠিক কথা। এই জন্য ভারত-বর্ষের ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা ইংরেজ বণিকদের অতিরিক্ত লাভের উপরও হাত দিতে রাজী হন না। এবং এই জন্য

ইংরেজ আমলা ও ইংরেজ বণিক্ ভারতবর্ষে হোমরুল প্রবর্ত্তনের বিরোধিতায় একমত।

সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল বিভাগ হইতে ইহাও দেখান হইয়াছে যে ১৯১৪ সালের জুলাই মাসের শেষে (যখন সবে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল) ৩২টি পাটের কলের অংশের যেরূপ মূল্য ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। তখনকার মূল্য ১০০ ধরিলে ১৯১৭ সালে তাহা ৩১১ হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে তাহা ৪৬৭ হইয়াছে। অর্থাৎ পাটের কলের অংশের দাম সাড়ে চারিগুণেরও অধিক হইয়াছে।

কিন্তু পাটচাষীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছি।

পাটের কল ও কাপড়ের কল।

বাংলা দেশের পাটের কলগুলি সমস্তই বিদেশীদের এবং ম্যানেজারেরাও সবাই বিদেশী। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সুতা ও কাপড়ের কল আছে ১৪৭টি। তাহার মধ্যে ১১০টি সম্পূর্ণ দেশী লোকদের, ২৫টিতে বিদেশীদের অংশ আছে, এবং ১২টি সম্পূর্ণ বিদেশীদের। এই ১৪৭টি কলের মধ্যে ৪৩টি ছাড়া আর সবগুলির ম্যানেজার দেশী। বোম্বাইয়ের লোকেরা কল-কারখানা স্থাপনে ও পরিচালনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই জন্য, বাঙালীদের একটিও পাটের কল না থাকায়, আমাদের এবিষয়ে অকর্ম্মণ্যতা তাঁহাদের একটি উপহাসের বিষয় হইয়া আছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যাপ্তি।

ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকাতে এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার মত ব্যাপক ও ভীষণ যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। জগতের অধিবাসী-সমূহের নয়-দশমাংশ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেকের উপর রাষ্ট্র জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে লড়িতেছে কিম্বা তাহার সহিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী নিরপেক্ষ আছে; ইহাদের অধিকাংশই সেই-সব ছোট ছোট দেশ যাহাদের অবস্থা এরূপ যে তাহারা যুদ্ধে যোগ দিতে পারে না, কিম্বা যোগ দিলেও কোন পক্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

রাষ্ট্রের সংখ্যা	লোক সংখ্যা
যুদ্ধে ব্যাপৃত, ১৯টি রাষ্ট্র	১৩৭,০২,২৫,০০০
জার্ম্মেনীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন, ১১টি	২,১৮,৭০,০০০
জার্ম্মেনীর বিপক্ষে, ৩০টি	১৩৯,২০,৯৫,০০০
জার্ম্মেন পক্ষ, ৪টি	১৫,৬৫,৭২,০০০
নিরপেক্ষ, ১৯টি	১৪,৩৯,৬১,০০০
জগতের মোট রাষ্ট্র, ৫৩টি	১৬৯,২৬,২৮,০০০

অন্তরায়িতদের বিষয়ে পরামর্শ-কমিটি।

গবর্ণমেণ্ট অন্তরায়িতদের বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটির সভ্য দু জন। একজন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ সাহেব, আর একজন বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার্ নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর। এরূপ কমিটির তদন্ত প্রকাশ্য বিচারের সমতুল্য হইতে পারে না। যাহা হউক, অন্যূন তিন জন বেসরকারী স্বাধীনচেতা আইনজ্ঞ লোক লইয়া কমিটি করিলে মন্দের ভাল হইত। বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ সাহেব সিবিলিয়ান-জজ। তাঁহাকে নিযুক্ত না করিয়া একজন ব্যারিষ্টার-জজকে নিযুক্ত করিলে ঠিক হইত। তদ্ভিন্ন তিনি আলিপুরের বৎসরাধিক-কালব্যাপী বোমার মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার বাংলা দেশে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র এবং কোন কোন শ্রেণীর ও ব্যক্তির সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা থাকা সম্ভব। হয়ত উক্ত মোকদ্দমায় অভিযুক্ত কেহ কেহ এখন অন্তরায়িত ও আবদ্ধ আছেন। এই কারণেও তাঁহার নিয়োগের অনুমোদন করা যায় না। সার্ নারায়ণ চন্দাবরকরকে আমরা জানি। তাঁহার আইন-জ্ঞান, বিচারশক্তি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপর আমাদের আস্থা আছে। তাহা হইলেও তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে গবর্ণমেণ্টের মতের দিকে ঝোঁক থাকা অসম্ভব নহে; কারণ তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারী। অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী হাইকোর্টের জজ কয়েকজন আছেন। তাঁহারা কি কেহই এই কাজ করিতে রাজী হন নাই? না, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন নাই? তাঁহারা বাংলাদেশে থাকায় মনে মনে কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এরূপ সন্দেহ যদি তাঁহাদিগকে বাদ দিবার কারণ হয়, তাহা হইলে বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ সাহেবও ত বাংলাদেশে আছেন, এবং রাজদ্রোহের মোকদ্দমাও করিয়াছেন, তাঁহার

মনটিকে শাদা কাগজের মত কোন-প্রকারের-ধারণা-বর্জ্জিত মনে করিবার কি কারণ আছে?

গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পরামর্শ-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার সভ্য যাঁহারাই হউন, তাহার বিরুদ্ধে আমাদের মন্তব্য আমরা বৈশাখের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম। পাঠকেরা ইচ্ছা হইলে তাহা পুনর্ব্বার পড়িতে পারেন। কমিটির সভ্য অন্ততঃ তিন জন হওয়া উচিত ছিল; কারণ দুজনের মধ্যে মতভেদ হইলে কাহার মত কমিটির মত বলিয়া বিবেচিত হইবে? এবং কমিটির তিন জন সভ্যের মধ্যে দুজন বেসরকারী ও এক জন সরকারী লোক হইলে ভাল হইত। অবশ্য, যখন কমিটি কেবল পরামর্শই দিবেন, গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে চলিতে বাধ্য থাকিবেন না, তখন (যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি) তিন জনই বেসরকারী আইনজ্ঞ লোক হইলেই ঠিক্ হইত, এবং তাহাতে কোন ক্ষতি হইত না। গবর্ণমেণ্ট কমিটির পরামর্শ অনুসারে চলিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে ঠিক্ হইত।

সমুদয় সভ্য বে-সরকারী হইলেই ঠিক্ হইত, মনে করায়, কেহ বিস্মিত হইবেন না। খবরের কাগজের পাঠকেরা জানেন গত মে-মাসে জেনারেল মরিস ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ব্রিটিশসেনাসম্বন্ধীয় কতকগুলি উক্তি অলীক বলিয়া সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন। তাহা লইয়া পার্লেমেণ্টে তর্কবিতর্ক হয়। মন্ত্রীসভা প্রস্তাব করেন যে, দুজন অভিজ্ঞ জজ বিষয়টি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রায় দিবেন। তাহাতে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আস্কুইথ সাহেব আপত্তি করিয়া প্রস্তাব করেন (৯ই মে) যে হাউস্ অব্ কমন্সের পাঁচজন সভ্য লইয়া একটি নিরপেক্ষ কমিটি হউক, সেই কমিটির উপর তদন্তের ভার দেওয়া হউক। রয়টার তাঁহার বক্তৃতার এই অংশটির চুম্বক নিম্নলিখিতরূপ টেলিগ্রাফ করেন:—

"The Government had admitted that there was a case for enquiry. He regarded the proposal that two judges of experience should hold such an enquiry in such circumstances as unsatisfactory. Such a tribunal would be impotent unless it had statutory powers, and he suggested a non-party committee of five members of the House of Commons, who could probably reach a decision which would be respected by the House and the country in two or three days...... He hoped regarding some of these matters that there had been honest misunderstanding, but the clearer the case the Ministers had for proving the accuracy of the impugned statements the more cogent was the argument in favour of an enquiry under conditions which nobody could suspect of partiality or prejudice. (Laughter, in which Mr. Bonar Law joined).

"Mr. Asquith, turning to Mr. Bonar Law, asked whether Mr. Bonar Law thought that a Select Committee of the House was not an unsuspected tribunal.

"Mr. Bonar Law replied that every member of the House of Commons was either friendly or unfriendly to the Government, and therefore prejudiced.

"Mr. Asquith retorted, 'I am very sorry to hear the leader of the House suggest that there cannot be five members of the House of Commons who are not so steeped in party prejudice that they cannot be trusted to judge a pure issue of fact. I leave it there"

যদিও বিলাতের এই তদন্তের বিষয়, এবং অন্তরায়িত-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ এক রকম জিনিষ নয়, তথাপি, কে পক্ষপাতশূন্য হইতে পারে, কে পারে না, এই সাধারণ বিচার্য্য বিষয়টি পার্লেমেণ্টে উঠিয়াছিল এবং এখানেও মানুষের মনের মধ্যে রহিয়াছে। বিলাতে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আস্কুইথ সাহেব রাজবেতনভোগী দুজন অভিজ্ঞ জজ নিরপেক্ষ হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই; পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান অন্যতম মন্ত্রী বোনার ল সাহেব মনে করিলেন যে, হাউস অব্ কমন্সের প্রায় সাতশত সভ্যের মধ্যেও পাঁচজন এমন লোক পাওয়া যাইবে না যাঁহারা তথ্যের সত্যতা অসত্যতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে মত দিতে পারিবেন। ইঁহারা সবাই বিলাতের লোক। বিলাতের লোকেরাই আপনাদের জা'তভাইদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান। সুতরাং এখানকার সরকারী ইংরেজ বা দেশী কর্ম্মচারী মাত্রেই ভ্রমপ্রমাদশূন্য ও পক্ষপাতশূন্য হইবেনই, ইহা যদি আমরা মনে না করি, তাহা হইলে বেয়াদবী হয় না।

তাহার পর আর-একটি প্রধান কথা এই, যে, কমিটিকে যে-ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। যে-সব কাগজপত্রের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট অন্তরায়ণ বা জেলে আবদ্ধ করিবার হুকুম দিয়াছেন, কমিটির কাছে তাহা উপস্থিত করা হইবে; এবং তা-ছাড়া অন্তরায়িত বা আবদ্ধ ব্যক্তিদের দরখাস্তও বিবেচিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন কমিটির সম্মুখে উকীল ব্যারিষ্টার উপস্থিত হইতে পারিবেন না (there can be no question of pleaders or advocates appearing before it)। যে সব রাজ-নৈতিক বা অন্য মোকদ্দমায় পুলিশের মিথ্যাবাদিতা বা

জাল দলিল ধরা পড়িয়াছে, ও আসামী খালাস পাইয়াছে, উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত না হইলে তাহা হইত না। সুতরাং আইনজীবীর অনুপস্থিতি সত্য নির্দ্ধারণের পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় হইবে। সাক্ষীকে জেরা করিতে, তাহার সাক্ষ্য মিথ্যা বা অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিপরীত সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে, দলিল পরীক্ষা করিয়া তাহা জাল বলিয়া প্রমাণ করিতে কিম্বা তাহার বিপরীত অন্য দলিল উপস্থিত করিতে না পাইলে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য ;—বিশেষতঃ যখন পুলিশ তাহাদের মালমসলা যথাসাধ্য নিখুঁত করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া দিবে। তথাপি, যদি কমিটি প্রত্যেক অন্তরায়িত ও আবদ্ধ ব্যক্তির বিষয়ে তদন্ত করিবার নিমিত্ত বেশী সময় দিতে পারেন, তাহা হইলে কোন কোন স্থলে সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

কমিটির সামনে উকীল ব্যারিষ্টার ত উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না ; অভিযুক্তরা স্বয়ং উপস্থিত হইতে পাইবে কি ? পাইবে না, গবর্ণমেণ্ট এরূপ বলেন নাই বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। দেশের লোকের মত নিশ্চয়ই এই যে অভিযুক্তদিগকে যেন নিশ্চয়ই কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয়। সমুদয় কাগজে এবং সাধারণের প্রতিনিধি সমুদয় সভাসমিতি হইতে এই দাবী করা হউক। অভিযুক্তরা উপস্থিত হইতে পারিলে ঠিক্ বুঝিতে পারিবে কি কারণে তাহাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে ; এবং নিজেদের বক্তব্য বলিতে পারিবে। তাহারা যদি এইরূপে জানিতে পারে যে তাহাদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে, তাহা হইলে কমিটির নিকট যুক্তি-ও-প্রমাণপূর্ণ দরখাস্তও করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে কমিটি আবদ্ধদের দরখাস্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন। কিন্তু দরখাস্ত কল্পনা বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করা যায় না। অতএব, এইরূপ ব্যবস্থা হউক যে প্রত্যেক অন্তরায়িত ও আবদ্ধকে তাহাদের বিরুদ্ধে যে-যে প্রমাণ আছে, তাহা জানান হইবে, এবং দরখাস্ত দ্বারা ও স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মৌখিক ঐসব প্রমাণ খণ্ডন করিবার অধিকার ও সুবিধা তাহাদিগকে দেওয়া হউক। কমিটি সাক্ষাৎভাবে প্রত্যেক অন্তরায়িত আবদ্ধ ব্যক্তিকে মৌখিক জিজ্ঞাসা করুন যে তাহাদের দরখাস্ত করিবার বা মুখে বলিবার কি আছে।

অন্তরায়িত ও আবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অন্ততঃ এই অধিকারটুকুও না দিলে, কমিটির তদন্তের মূল্য কতটুকু হইবে ? তাহারা স্বয়ং উপস্থিত হইতে পাইলে, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখিতে পাইলে, এবং তৎসম্বন্ধে মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য জানাইতে পাইলেও, তাহা উকীল ব্যারিষ্টার নিয়োগের অধিকারের সমান হইবে না। কারণ, অভিযুক্ত মানুষ যদি স্বয়ং নিজের মোকদ্দমা চালাইতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে সকল সভ্যদেশে লোকে এত টাকা খরচ করিয়া আইনব্যবসায়ীদের সাহায্য লইত না।

সম্প্রতি আয়ার্ল্যাণ্ডে শিন-ফেন দলের শতাধিক নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরায়িত করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে বলা হয় যে তাঁহাদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার হইবে না, কিন্তু দুজন হাইকোর্ট জজের দ্বারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাগজপত্র পরীক্ষিত হইবে, এবং এই ব্যবস্থায় তাঁহারা রাজি কি না জিজ্ঞাসা করা হয়। প্রত্যেকে এরূপ তদন্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যেরূপ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কোন স্থলেই কোন অন্তরায়িতের সুবিধা হইবে না, এমন বলা যায় না ; কোন কোন স্থলে হইতেও পারে। কিন্তু যাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নাই, বা সন্দেহের কারণও অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহাদের অনেককে ইতিমধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বা স্ব স্ব গৃহে অন্তরায়িত করা হইয়াছে। সুতরাং কিরূপ সামান্য কারণে বা অকারণে অনেকের স্বাধীনতা হৃত হইয়া থাকে, তাহার খুব বেশী দৃষ্টান্ত কমিটি সম্ভবতঃ পাইবেন না। তথাপি, যদি এখন পর্য্যন্ত আবদ্ধ কাহারও কাহারও স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা সুখের বিষয় হইবে। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে কমিটির তদন্তের পরও যাহারা আবদ্ধ থাকিবে, তাহারা নিশ্চয় দোষী। প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষী লইয়া ও জেরা হইয়া উকীল ব্যারিষ্টারের সাহায্যে বিচার হইলে অভিযুক্তদের দোষ বা নিরপরাধতা সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক করা যায়। তাহা না হইলে কাহাকেও দোষী বা নির্দোষ মনে করা সঙ্গত ও উচিত নয়। যেরূপ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রধান একটি

আপত্তি এই যে ইহার দ্বারা অন্তরায়িতদের প্রকৃত বিচার হইবে না, অথচ গবর্ণমেণ্ট সাধারণের মনে এইরূপ একটা ধারণা জন্মাইবার উপায় পাইবেন, যে, তদন্তের পরও যাহারা আবদ্ধ থাকিবে তাহারা অপরাধী। কিন্তু সেরূপ ধারণাটা দুটি কারণে অন্যায় হইবে। প্রথম, কমিটির দ্বারা প্রকৃত বিচার হইবে না; দ্বিতীয়, কমিটির পরামর্শ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। কমিটি যদি কতকগুলি লোককে নির্দোষ বলেন, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সকলকে বা কাহাকেও কাহাকেও আটক করিয়া রাখিতে পারেন। তদন্তের পরও যাহারা আবদ্ধ থাকিবে, কমিটি যে তাহাদের কাহাকেও নিরপরাধ বলেন নাই, তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব? গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক অন্তরায়িত ও আবদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে কমিটির মত মুদ্রিত করিবেন কি? এই সব কথা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে কমিটির কাজ শেষ হইয়া যাইবার পরও যাহারা স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অপরাধী মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই জন্য এখন সর্ব্বসাধারণ আবদ্ধ ও অন্তরায়িতদিগকে যে অনুকম্পা করিতেছেন, ভবিষ্যতে তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না।

বস্ত্র-সঙ্কট।

গত ও বর্ত্তমান মাসের প্রবাসীতে আমরা নানা সংবাদ-পত্র হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে যথেষ্ট কাপড় বাজারে না থাকার জন্যই হউক, কিম্বা যুদ্ধের পূর্ব্বের তিনগুণ দামে এখন কাপড় কিনিবার মত যথেষ্ট টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও গরীব লোকদের না থাকার জন্যই হউক, বহুসংখ্যক লোকের লজ্জা রক্ষা হইতেছে না। বস্ত্রের অভাবে আত্মহত্যার সংবাদও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। নারীদিগকে বলপূর্ব্বক বিবস্ত্র করিয়া তাহাদের বস্ত্র লইয়া পলায়নের খবরও অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বাজারে মাল একেবারে নাই, এমন নয়; কিন্তু ইহাও ঠিক যে ম্যাঞ্চেষ্টারে পূর্ব্বের চেয়ে মাল কম প্রস্তুত হইতেছে, এবং জাহাজের সংখ্যা কম হইয়া যাওয়ায় এবং যত জাহাজ আছে তাহারও অনেকগুলি যুদ্ধসম্বন্ধীয় নানা কাজে ব্যবহৃত হওয়ায়, বিলাতী কাপড়ের আমদানী আগেকার চেয়ে কম হইতেছে। কাপড়-ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝিয়া অতিরিক্ত লাভও করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ কারণে বস্ত্রসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অন্যদিকে পাট ও চাউল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় রপ্তানী না হওয়ায় কৃষিজীবীদের হাতে নগদ টাকা আগেকার চেয়ে কম আসিতেছে; এবং দেশের অধিকাংশ লোকেরই কৃষির উপর নির্ভর। এইজন্য অধিকাংশ লোক দুর্মূল্য কাপড় কিনিতে কষ্ট বোধ করিতেছে, অনেকে কিনিতে পারিতেছে না।

এখন সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য টাকা সংগ্রহ করিয়া নূতন কাপড় কিনিয়া একান্ত নিঃসম্বল লোকদিগকে বস্ত্রদান। সচ্ছল অবস্থার লোকদের নিকট হইতে পুরাতন অথচ ব্যবহারযোগ্য কাপড় জোগাড় করিয়া দিলেও বিস্তর লোকের উপকার করিতে পারা যাইবে। যতদিন বর্ষা নামে নাই, ততদিন কাপড়ের অভাবে কেবল লজ্জারক্ষাই হইতেছিল না; কিন্তু এখন বর্ষা নামিয়াছে, এবং ক্রমশঃ ঠাণ্ডা বাড়িতে বাড়িতে শীত আসিবে, এখন যথেষ্ট কাপড় না পাইলে নানাপ্রকারের পীড়া হইতে থাকিবে। তাহাতে দেশের শ্রমশক্তি এবং শস্য ও নানাবিধ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের শক্তি কমিবে, দারিদ্র্য বাড়িবে, এবং মৃত্যুসংখ্যাও বাড়িবে। যে দিক দিয়াই দেখা যাক্, কাপড় জোগান খুব জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। অনেক জেলার সহৃদয় লোকেরা ইহা অনুভব করিতেছেন, এবং কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

এমন সময় ছিল যখন দেশের লোকদের আটপৌরে ব্যবহারের সমস্ত কাপড় দেশেই প্রস্তুত হইত, এবং সৌখীন কাপড়ও হইত;—যদিও চীন দেশ হইতে সূক্ষ্ম রেশমী কাপড় আমদানী বোধ হয় খুব প্রাচীন কালেও হইত। আমরা বস্ত্রের জন্য কি কি কারণে খুব বেশী পরিমাণে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি, নূতন করিয়া তাহার আলোচনার দরকার নাই, তাহা স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুরামাত্রায় হইয়া গিয়াছে। আমাদের দরকারী সমস্ত কাপড় যে ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডে ও জাপানে তুলা জন্মে না; অথচ ইংলণ্ড বস্ত্রনির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে, জাপানও হইতে

চলিয়াছে। ভারতবর্ষে আমেরিকার ও মিশরের খুব ভাল তুলা ছাড়া আর সব তুলাই জন্মে। ইংলণ্ড ও জাপান সকল রকম তুলা বিদেশ হইতে আম্‌দানী করিয়াও যদি ব্যবসায়ে লাভবান হইতে পারে, তাহা হইলে আমরা মোটা ও মাঝারী রকমের সব তুলা উৎপন্ন করিয়া এবং কেবল খুব সরেস তুলা আম্‌দানী করিয়া নিজেদের কাপড়ের অভাব কেন দূর করিতে পারিব না? মানুষের পক্ষে আকাশে উড়া এবং সমুদ্রের জলের তল দিয়া জাহাজ চালানর মত অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হইয়াছে; আর, যাহা আমাদের দেশে ছিল, কতক পরিমাণে এখনও আছে, এবং অন্য দেশে স্বাভাবিক বাধা সত্ত্বেও হইয়াছে, তাহা কি হইতে পারে না? নিশ্চয় পারে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা কেহ কেহ যে-সব ভুল করিয়াছি, তাহা না করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বুদ্ধিমানের মত কাজ করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। সে সময়ে অনেকের প্রধান ভুল একটা এই হইয়াছিল যে তাহারা জোর করিয়া, অন্যের স্বাধীনতার উপর হাত দিয়া, স্বদেশী চালাইতে চাহিয়াছিল। তাহাতে, স্বদেশীতে পুলিশের বাধা দিবার খুব সুযোগও হইয়াছিল। আর একটা ভুল হইয়াছিল, ব্যবসা না বুঝিয়া ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হওয়া। কোন ব্যবসা করিতে হইলে একটু জানিয়া শুনিয়া লওয়া দরকার। অভিজ্ঞতা অবশ্য ব্যবসা না করিলে হইতে পারে না।

কাপাসের চাষ অনেক জায়গায় আরম্ভ হইতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের পরামর্শ পাওয়া যাই-তেছে। চরকাও নানাস্থানে প্রস্তুত হইয়া দেড় টাকা এক টাকা দশ আনা মূল্যে বিক্রী হইতেছে। ইহাতেও সরকারী কর্ম্মচারীদের যোগ আছে। যুদ্ধ থামিবার পর বিলাতী ব্যবসাদাররা যখন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ভারত-বর্ষের বাজারে মাল পাঠাইতে আরম্ভ করিবে, তখন রাজকর্ম্মচারীদের সাহায্য পাওয়া না যাইবার সম্ভাবনা, এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণও অসম্ভব নয়। কিন্তু যতদিন সাহায্য পাওয়া যায়, ভাল; তবে, তাহার উপর একান্ত নির্ভর করা অনুচিত।

সুতা কাটিবার কলের সঙ্গে চরকা এবং কলের তাঁতের সঙ্গে হাতের তাঁত টক্কর দিতে পারে কি না, সে কথা উঠিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক, এখন যে-দরে মিলের কাপড় বিক্রী হইতেছে, আমাদের তাঁতিরা সে দরে কাপড় আপাততঃ দিতে পারিবে; সম্ভবতঃ কিছু সস্তাও পারিবে। মেয়েরা অবসর সময়ে সুতা কাটিলে সেই সুতা কলের সুতার দরে দিলেও লোক্‌সান নাই। যে-সব তাঁতি জাতি-ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় চাষ করে, চাষে তাহাদের সকল ঋতুর সমস্তটা সময় লাগে না। চাষ করিয়া যে-সময় উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা তাঁতে লাগাইলে তাহারা কাপড়ের যে দাম পাইবে, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি হইবে না। শ্রমশীলতা ও কাজের শৃঙ্খলা থাকিলে হাতের তাঁতের ব্যবসা দাঁড়াইতে পারে।

যাহারা তাঁতের উপরই নির্ভর করে, মিলের প্রতি-যোগিতা সত্ত্বেও তাহাদের কাহারো কাহারো ব্যবসা টিকিয়া রহিয়াছে। মূলধন সরবরাহ এবং সাক্ষাৎভাবে খুচরা ক্রেতার কাছে মাল উপস্থিত করিবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা হইলে, আরো অনেক তাঁতি প্রতিপালিত হইতে পারে।

দেশে আরো কাপড়ের কল স্থাপন করা উচিত কি না, তাহার আলোচনা আপাততঃ স্থগিত থাকাই ভাল। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন, তাহাতে বড় রকমের যৌথ কারবারের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ধনীরা সব টাকা যুদ্ধঋণে প্রদান করুন; আইনও তদনুরূপ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, টাকা সংগ্রহ হইলেও আজকাল সুতার ও কাপড়ের কল পাওয়া ও জাহাজে আমদানী করা কঠিন হইয়াছে।

যে-কোন উপায়ে হউক, যত কাপড় বাজারে আছে ও আসিতেছে, তার চেয়ে বেশী কাপড় বাজারে উপস্থিত করিতে হইবে। এ অবস্থায় চলিত হাতের তাঁত এবং ঠক্‌ঠকি বা অন্যবিধ অপেক্ষাকৃত দ্রুততর বুনিবার তাঁত চালাইতে হইবে। সুতার জন্য চলিত চরকা ও উন্নত রকমের চরকার উপর নির্ভর করিতে হইবে। কটকের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কয়েক বৎসর হইল উন্নততর চরকার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি হয়ত এ সময় সাহায্য করিতে পারেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকেই বলিয়াছিলেন, কেবল সস্তা দেখিলে চলিবে না; তাহাতে শেষে পস্তাইতে

হইতে পারে। এখনও, আবার নূতন রকম অর্থে, মনে হইতেছে "সস্তার তিন অবস্থা।" সস্তার মানে কি? তাহাই সস্তা যাহাতে সর্ব্বসাধারণের সুখ সুবিধা বাড়ে। এখনকার কথা না হয় ছাড়িয়া দিন্। যখন যুদ্ধ ছিল না, তখনও কি আমাদের বিদেশী সস্তা জিনিষের প্রতি অনুরাগ দেশের লোকের অন্নাভাব বস্ত্রাভাব স্বাস্থ্যাভাব শিক্ষাভাব দূর করিতে পারিয়াছিল? আমাদের সস্তাপ্রিয়তা দেশের তাঁতিকুল আংশিক ভাবে লুপ্ত ও আংশিক ভাবে বৃত্তিহীন হইবার অন্যতম কারণ। খুব মামুলী কথাগুলাও মধ্যে মধ্যে স্মরণ করা ভাল। "যাকে রাখা যায় সেই রাখে", এইরূপ একটা কথা আছে। আমরা যদি একটু বেশী দাম দিয়াও দেশী কাপড় পরিয়া তাঁতিকুলকে রক্ষা করিতাম,তাহা হইলে তাহারাও আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিত। মানুষের মোহ সহজে কাটে না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জোড়া-প্রতি চারি আনা আট আনা বেশী দেওয়াও অনেক চতুর "অর্থনীতিজ্ঞ" বা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কঠিন অসম্ভব বা "অবৈজ্ঞানিক" মনে করিতেন। এখন জোড়া-প্রতি সাড়ে তিন টাকা চারি টাকা বেশী তাঁহারাও দিতেছেন।

কোন দেশে নূতন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করিতে, কিম্বা পুরাতন ম্রিয়মাণ কোন ব্যবসাকে নবজীবন দিতে হইলে, স্বাধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক-মত বিদেশী কোন কোন জিনিষের উপর বেশী করিয়া শুল্ক বসাইয়া থাকেন। স্বদেশী ব্যবসার সংরক্ষণ জন্য বিদেশী জিনিষের উপর এইরূপ শুল্ক বসাইবার জন্য আইন জাপানে আছে। ভারতবর্ষে স্বদেশী জিনিষ সংরক্ষণার্থ এরূপ কোন শুল্ক বা আইন নাই; যে সামান্য শুল্ক আছে, তাহাতে কেবল কিছু রাজস্ব বৃদ্ধি হয়, স্বদেশী সংরক্ষণের কাজ হয় না। সে-কাজ আমাদের স্বদেশী-প্রিয়তাকে করিতে হইবে।

পাপের ব্যবসা।

কলিকাতায় সম্প্রতি পুলিশ একপ্রকারের খুব ভাল কাজ করিতেছেন। দুষ্ট স্ত্রীলোকে পাপ-ব্যবসা দ্বারা লাভবান হইবার জন্য শিশু বালিকা ক্রয় করে, এবং দুর্বৃত্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা বালিকা ও যুবতীদিগকে ছলে বলে কৌশলে কুস্থানে লইয়া আসিয়া তাহাদিগের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে। পুলিশ এইরূপ অনেক বালিকা ও যুবতীকে উদ্ধার করিতেছেন, এবং দুর্বৃত্ত লোকেরা কোন কোন স্থলে দণ্ডিত হইয়াছে। এই বালিকা ও যুবতী-দের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই আছে। যাহাদের অভিভাবক জানা আছে ও খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহাদিগকে যদি অভিভাবকেরা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। যাহারা পাপে প্রবৃত্ত হয় নাই, কিম্বা যাহারা এখনও নিতান্ত অল্প-বয়স্ক, তাহাদিগকে লইতে কোনও আপত্তি হওয়া উচিত নয়। যাহারা ভয়ে বা পাশব বলে পরাস্ত ও অভিভূত হইয়া পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাদিগকেও অভিভাবকগণ আবার সদাচার অবলম্বন করিবার সুযোগ দিলে তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল হয়, না দিলে অমঙ্গল হয়। অভিভাবক-গণ এই সুযোগ না দিলে, তাহারা আত্মহত্যা, পাপ-ব্যবসা অবলম্বন, কিম্বা কোন উদ্ধার-আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ, এই তিনের কোন একটি উপায় অবলম্বন করিতে পারে। প্রথম উপায়টি ত উপায়ই নয়। দ্বিতীয় উপায় পাপের পন্থা; ইহা অবলম্বন তাহাদের ও সমাজের পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গলের কারণ। তৃতীয় উপায় সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, উদ্ধারাশ্রমগুলি প্রায় সবই খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের। কেহ বুঝিয়া সুঝিয়া ধর্ম্মের জন্য খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ, আদি যাহাই হউন, তাহাতে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু নিরুপায় হইয়া একধর্ম্মের লোকের অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের আশ্রিত হওয়া কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষেই কল্যাণকর নহে। এই জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র লোকদের দ্বারা চালিত এরূপ যথেষ্টসংখ্যক আশ্রম থাকা উচিত যাহাতে অভিভাবক বা সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নারীরা আশ্রয় পাইতে পারে, এবং সদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার মত শিক্ষা পাইতে পারে। তাহা যতদিন না হইতেছে, ততদিন যে-কোন-ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের চালিত আশ্রমে এই-সকল স্ত্রীলোকের আশ্রয় লওয়া ও পাওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

অসচ্চরিত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত পুরুষেরা সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় না, অধিকন্তু টাকা ও পদমর্য্যাদা থাকিলে তাহারা সর্ব্বত্র সমাদর পায়; অথচ নারীদের নিজের কোন দোষ না থাকিলেও কেবলমাত্র তাহারা ঘটনাচক্রে কুস্থানে

গিয়া পড়িলে বা দুর্বৃত্ত লোকদের দ্বারা স্পৃষ্ট ও অপহৃত হইলে, কিম্বা অন্যে তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিলে, তাহারা সমাজকর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইবে, ইহা পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়, এবং সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। অসচ্চরিত্র পুরুষ যেমন প্রশ্রয় পায়, অসচ্চরিত্রা নারীও তেমনি প্রশ্রয় পাক্, ইহা কোন প্রকৃতিস্থ লোক চায় না। কিন্তু যে-সব বালিকা বা স্ত্রীলোকের কোন দোষ নাই, কিম্বা কোন অনিবার্য্য কারণে পদস্খলন হইয়া থাকিলেও যাহারা অনুতপ্ত ও সৎপথে থাকিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে কোন সহৃদয় সমাজহিতৈষীর পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। অনেক স্থলে নারীর প্রতি যে কঠোর বা নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, তাহার কারণ, অংশতঃ, নারীচরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে রাজী আছি। কিন্তু, নারী পুরুষের সম্ভোগের জিনিষ, এই কুভাব হইতে যে একটা কলুষিত ঈর্ষ্যা পুরুষের হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা যে অনেক স্থলে অত্যাচরিতা নারীদের বর্জ্জনের কারণ ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

সামাজিক অপবিত্রতা দমনের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, নারীদের সুশিক্ষা হইলে সে চেষ্টা আরও সহজে সফল হয়। অনেক সময় দুষ্ট লোকেরা এই বলিয়া বালিকা ও নারীদের ভুলাইয়া আনে যে তাহাদের পিতা বা মাতা পীড়িত, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিয়াছেন ও পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এরূপ স্থলে, যাহারা লেখাপড়া জানে, তাহারা নিশ্চয়ই চিঠি দেখিতে চায়, বা চিঠির অপেক্ষা করে; সুতরাং তাহাদিগকে ঠকান যায় না। যাহারা লিখিতে পড়িতে পারে, তাহারা ঘটনাক্রমে কুস্থানে নিরুপায় হইয়া পড়িলেও কোনপ্রকারে আত্মীয়দিগকে চিঠি লিখিয়া নিজের অবস্থা জানাইতে পারে। নারীর সুশিক্ষা যে কেন দরকার, তাহার আরও অনেক কারণের মধ্যে ইহা একটি। সত্য বটে, পাশ্চাত্য দেশে লিখনপঠনসমর্থ নারীরাও প্রতারিত ও কুস্থানে নীত হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের গঠন ও অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে সাধারণতঃ চাকরী করাইয়া দিবার লোভ দেখাইয়া ঐরূপ গরীব মেয়েদের ঠকান হয়। আমাদের দেশে যে-সব বালিকা ও নারী প্রতারিত হয়, তাহাদের প্রতারিত হইবার উপায় এরূপ নয়।

নিতান্ত ঘরকুনো হইয়া থাকাতেও এদেশের মেয়েরা কোন অপরিচিত স্থানে বা অচিন্তিত নূতন অবস্থায় পড়িলে দিশাহারা হইয়া পড়ে। এই কারণে অবরোধপ্রথার কঠোরতা নারীচরিত্রে দৃঢ়তা জন্মিবার অন্তরায়; সারা জীবন ঘরের মধ্যে থাকিলে বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জন্মে না। নারীচরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়াসে অবরোধপ্রথা সমর্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু নারী বিপদে পড়িলে দেখা যায়, এই অবরোধপ্রথাই তাহাকে আত্মরক্ষায় ও আত্মোদ্ধারে কতটা অক্ষম করিয়াছে। নারী পুরুষের সম্ভোগের বস্তু, এই নিকৃষ্ট ভাব ও তজ্জনিত ঈর্ষ্যাও অবরোধপ্রথার মূলে আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতেছে এবং বর্ত্তমানে যে-সব ঘটনা ঘটিতেছে তাহাতেও দেখা যাইতেছে, যে, অবরোধ-প্রথা নিরপরাধা নারীদিগকে পিশাচ ও পিশাচীদের কবল হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। অবরোধের অন্য দোষ দেখান অপ্রাসঙ্গিক হইবে; নতুবা দেখান যাইত ইহাতে কলিকাতায় নারীর মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ ভয়ানক হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ-সকলে পুরুষ অপেক্ষা নারী মরে কম। কলিকাতায় নারী মরে পুরুষের দেড়গুণ।

কলিকাতায় বিস্তর লোক পরিবারবর্গ হইতে দূরে বাসা করিয়া থাকে। তাহারা পারিবারিক জীবনের সুপ্রভাব হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অনেকের পতন হয়। কলিকাতায় বাড়ীভাড়া ও বাসা-খরচ যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে এখানে সপরিবারে থাকা ক্রমশঃ আরও কঠিন হইবে। কলিকাতার উপকণ্ঠে যে-সকল স্থান আছে, সেগুলির স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়া, তথা হইতে প্রত্যহ সস্তায় যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, এখন যাহারা মেসে থাকিয়া আফিস করে, বা অন্য প্রকারে বাসা করিয়া থাকে, এরূপ বিস্তর লোক সপরিবারে থাকিতে পারে। তাহাতে সামাজিক পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। সেরূপ ব্যবস্থা কখনো হইবে কি না, বা কখন্ হইবে বলা যায় না। নারী প্রধানতঃ পুরুষের সম্ভোগের বস্তু, এই জঘন্য ভাবটি দূর না করিলে, বিবাহিত জীবনে অসংযম পরিহার না করিলে, নারীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ

না দিলে, এবং গৃহে সমাজে ও রাষ্ট্রে মানবের শ্রেয়স্কর কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার নারীর উপর না পড়িলে, সামাজিক অপবিত্রতা সম্পূর্ণ নিবারিত হইতে পারে না।

কলিকাতায় যাহারা দাসীবৃত্তি করে, এবং যাহারা পাচক ও চাকরের কাজ করে, তাহাদের মধ্যে পাপ প্রবল আকারে বিদ্যমান। চাকর বা পাচক এবং "ঝী"দের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রচলিত, তাহা একটু খবর লইলেই বুঝা যায়। ইহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বা অন্য কোন নূতন আইন করিয়া বিবাহ প্রচলিত করিলে মানবের কল্যাণ হয়। নতুবা এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কেবল যে নিজেরাই কলঙ্কিত জীবন যাপন করে তাহা নয়, অন্য স্ত্রীলোক ও পুরুষদেরও পতনের কারণ হয়।

বালিকা ও যুবতী বিধবাদের পুনর্বিবাহের সামাজিক বাধা সামাজিক অপবিত্রতার একটি কারণ। সকলের বিবাহ না হইতে পারে, কিন্তু সকলেই যাহাতে সৎপথে থাকিয়া স্বাবলম্বিনী হইতে পারেন, অন্নবস্ত্রের জন্য যাহাতে কাহাকেও অন্যের গলগ্রহ হইতে না হয়, তাহার মত শিক্ষা সকলে পাইলে প্রভৃত অমঙ্গল নিবারিত হয়। জ্ঞানের ও সমাজের হিতসাধনের আনন্দ মানুষের মনকে পূর্ণ রাখিলে নিকৃষ্ট সুখের মোহ হ্রাস পাইয়া লুপ্ত হয়।

স্বর্গীয়া মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী।

ত্রিপুরার মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরলোকগত বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের প্রথমা কন্যা ছিলেন। মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীর কবিত্ব-শক্তি ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। কণিকা, শোকগাথা ও প্রীতি তাঁহার তিনখানি কবিতা-পুস্তক। কোন কোন মাসিক পত্রে তাঁহার কবিতা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। তদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত অনেক কবিতা আছে। আগরতলা হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। বৈধব্যাবস্থায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। ইঁহার পতির শ্মশানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে প্রস্তরফলকে একটি কবিতা লিখাইয়া রাখেন। কত লোক যে তাঁহার সাহায্যে বিপন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। বৈষয়িক ব্যাপারেও তাঁহার অশেষ দক্ষতা ছিল। বৈধব্যাবস্থায় তাঁহার স্বীয় জমিদারীর কার্য্যাদি নিজ হস্তে বিশেষ দক্ষতার সহিত করিতেন।"

স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ সিংহ।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন সৎকর্ম্মোৎসাহী, বিদ্বান, অমায়িক ও সচ্চরিত্র কৃতী পুরুষ সম্প্রতি অকালে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরলোকে গিয়াছেন। ইঁহার নাম ব্রহ্মানন্দ সিংহ। ইনি এম্-এ উপাধিধারী ছিলেন। অনেক বৎসর রামপুর রাজ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এলাহাবাদে বহুবৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন নামক যে খবরের কাগজ ছিল, ইনি কয়েক বৎসর তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইংরেজীতে শিক্ষাবিষয়ক একটি মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ শহরে যে আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিল্‌স্ নামক কাগজের কল আছে, তিনি অনেক বৎসর তাহার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার প্রায় সমস্ত মূলধন দেশী লোকের। তিনি কিছুকাল হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। অর্থকর শিল্প সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ১৯১৪ সালে আগ্রা-অযোধ্যার প্রাদেশিক শিল্পসম্বন্ধীয় আলোচনাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন। সার্ব্বজনিক সমুদয় বিষয়ে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, এবং তৎসম্বন্ধে তিনি সংবাদপত্রে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনবসর।

ইতিমধ্যে ভারতশাসনবিধির সংস্কারের প্রস্তাব সম্বন্ধে কয়েকবার বিলাতের পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন হইয়া গিয়াছে। একজন সভ্য প্রশ্ন করেন, যে, নূতন যে ব্যবস্থা হইবে, তাহা ভারতসচিব সকৌন্সিল অনুজ্ঞাপত্র (ordinance in council) দ্বারা চালাইবেন, না পার্লেমেণ্টে তাহা আলোচনা করিবার অবসর দেওয়া হইবে? তদুত্তরে মণ্টেগু সাহেব বলেন, এ বিষয়ে যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা পালিত হইবে। কিন্তু তিনি পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই, যে, নূতন ব্যবস্থা বিলের আকারে পার্লেমেণ্টে উপস্থিত

করা হইবে, এবং তর্কবিতর্ক ও আবশ্যকমত পরিবর্ত্তনের পর তাহা আইনে পরিণত হইবে। যদিও পার্লেমেণ্টে আমাদের একজনও প্রতিনিধি নাই, তথাপি নূতন ব্যবস্থা পার্লেমেণ্টে আলোচিত হইয়া আইনের আকারে বিধিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে, যে, ভারত-সচিব ও বড়লাট একযোগে নূতন শাসনবিধির যে খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়াছেন যুদ্ধমন্ত্রণাসভা (war cabinet) নামধারী ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা তাহা এখন অনবসর-প্রযুক্ত বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না, কারণ তাঁহাদের সমুদয় শক্তি ও সময় এখন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রযুক্ত হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, মণ্টেগু সাহেব ও বড়লাট যে খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা মন্ত্রীসভার দ্বারা বিবেচিত এবং, আবশ্যক হইলে, পরিবর্ত্তিত হইয়া শীঘ্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিলাতের মন্ত্রীসভা যে যুদ্ধ লইয়া খুব বিব্রত আছেন, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, এবং বিপন্ন লোককে চাপিয়া ধরা ও পীড়াপীড়ি করা আমাদের প্রাচ্য সৌজন্যের বিরুদ্ধও বটে। চাপিয়া ধরিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। কিন্তু কথা এই, যে, মন্ত্রীসভার যদি অবসর না হইবে, তাহা হইলে যুদ্ধের মধ্যে ভারতসচিবের ভারত-ভ্রমণ, নানা সভাসমিতির আবেদন গ্রহণ, নানা লোকের সহিত আলোচনা, ইত্যাদি ব্যাপারের প্রয়োজন কি ছিল? স্বয়ং ভারতসচিবের এজন্য ভারতে আগমন একটা নূতন ঘটনা। মন্ত্রীসভা হঠাৎ অনবসর হইয়া পড়েন নাই; যুদ্ধ প্রায় চারিবৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

আর একটা কথা এই, যে, মন্ত্রীসভার অনবসর কেবল ভারতবর্ষের বেলাই কেন হইল? ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয়বিধির কত গুরুতর পরিবর্ত্তন এই যুদ্ধের মধ্যেই হইয়া গেল, তাহা আগে আগে বলিয়াছি। এখনও বিলাতের সমুদয় বালক-বালিকা-যুবক-যুবতীকে শিক্ষার দ্বারা দেহমনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ করিয়া তুলিবার জন্য নূতন আইনের খস্‌ড়া আলোচিত হইতেছে। উহা শীঘ্র আইনে পরিণত হইবে। যুদ্ধের পরে শ্রমজীবীদের জন্য ভাল ঘরবাড়ী প্রস্তুত কি প্রকারে হইবে, তাহার আলোচনা হইতেছে। যুদ্ধের পরে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যবহার কিরূপ হইবে তাহার কমিটি বসিয়াছিল, এবং উহার রিপোর্টের আলোচনা চলিতেছে; পার্লেমেণ্টের হাউস্ অব্ লর্ড্‌স্ বা অভিজাত সভার আমূল পরিবর্ত্তন জন্য কমিটি বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্টেরও আলোচনা হইতেছে; খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইংলণ্ডীয় (Anglican) শাখার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। যুদ্ধের অবসানে লক্ষলক্ষ সৈন্য বেকার হইবে, তাহাদিগের জন্য বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত এখন হইতে চেষ্টা হইতেছে; কতক সৈন্যকে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের পরাধীনতার কথা স্মৃতিপটে মুদ্রিত রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। সর্ব্বোপরি, আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য স্বরাজ-বিধির (Home Rule Bill) খস্‌ড়া প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দিকে একটু মন দিবার সময় নাই! ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা কাহার প্রতি মন দেন, তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা রাষ্ট্রীয় বিধি পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। এ বিষয়ে ব্রিটিশনীতি কি, তাহা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে উদ্ধৃত মন্ত্রী বোনার ল সাহেবের উক্তি হইতে বুঝা যাইবে।

পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ।

রয়টার লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—

London, June 5.

The Press Bureau announces that the Prime Ministers of Great Britain, France and Italy at a meeting at Versailles agreed to the following declarations :—

Firstly, that the creation of a united independent Polish State with free access to the sea constitutes one of the conditions of a solid and just peace and the rule of right in Europe.

Secondly, that Great Britain, France and Italy associate themselves with America in the expression of earnest sympathy for nationalistic aspirations towards the freedom of the Czecho-Slav and Yugo-Slav peoples.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালীর প্রধান মন্ত্রীরা ফ্রান্সের ভার্সেঈ নগরে একটি মন্ত্রণাসভায় দুটি প্রস্তাব সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। তাহা বুঝিবার জন্য জানা দরকার যে পোল্যাণ্ড দেশ বহুকাল তিন টুক্‌রা হইয়া রুশিয়া জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়ার অধীন আছে, এবং অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যে যে-সব নানাভাষাভাষী ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক কতকটা পরাধীন হইয়া আছে চেকো-

স্লাভ (Czecho-Slav) এবং যুগো-স্লাভরা (Yugo-Slav) তাহার অন্যতম। প্রস্তাব দুটি এই :—

প্রথম। পোল্যাণ্ডের টুক্‌রাগুলিকে একত্র করিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এই রাষ্ট্রের সমুদ্রে যাতায়াতের অবাধ মুক্ত পথ থাকা চাই। স্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি স্থাপন এবং ইউরোপে ন্যায়ধর্ম্মানুমোদিত নিয়মের রাজত্ব স্থাপন ইহা ভিন্ন হইতে পারে না।

দ্বিতীয়। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অধিবাসী চেকো-স্লাভ ও যুগো-স্লাভদিগের জাতীয়-স্বাধীনতা-লিপ্সার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী আমেরিকার সহিত যোগ দিতেছেন।

বলা বাহুল্য যে-জাতিগুলিকে স্বাধীন করিবার জন্য ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইটালীর প্রধান মন্ত্রীরা একযোগে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহারা কখনও ব্রিটিশ ফরাশি বা ইটালীয়দের অধীন ছিল না, এখনও নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা কম। ব্রিটিশ ফরাশি ও ইতালীয়রা যদি নিজের নিজের অধীন এক একটি জাতিকেও স্বাধীন করিয়া দিত, বা অন্ততঃ করিয়া দিবার প্রস্তাবও করিত, তাহা হইলে তাহাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইত। "আমাদের প্রভুত্ব বজায় থাক, অন্যের প্রভুত্ব লুপ্ত হউক," এরূপ প্রস্তাব বেশ সুবিধাজনক ও আরামদায়ক হইলেও আদর্শ হিসাবে ইহার এক কানা-কড়িও দাম নাই।

যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সৈন্যেরা কি করিবে ?

যুদ্ধের শেষে শত্রুপক্ষের সহিত যখন সন্ধি স্থাপিত হইয়া যাইবে, তখন আর ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ সৈন্য রাখার প্রয়োজন থাকিবে না কিন্তু তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের একটা বন্দোবস্ত ত চাই ? সেই জন্য সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রামিক দলের মন্ত্রীরা (the military authorities and the Labour Ministry) এখন হইতে তাহার ভাবনা ভাবিতেছেন। "সৈনিক হইবার আগে যে-সব লোকের কোন ব্যবসা বা উপার্জ্জনের উপায় ছিল না, তাহাদিগকে ইচ্ছামত আরও কিছুকাল সেনাদলে থাকিতে দেওয়া হইবে; এবং তাহাদের দ্বারা ভারতবর্ষকে গ্যারিসন করা হইবে"। রয়টারের তারের খবরের এই অংশের ঠিক্ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

> Many may desire to remain with the colours and with those it may be necessary to garrison India, replacing men there who are anxious to get home.

গ্যারিসন্ কথাটির একটি মানে বিজিত দেশের লোককে অধীন করিয়া রাখিবার জন্য তথায় সৈন্য রাখা। ইংরেজী সাহিত্য হইতে এই অর্থে কথাটির প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

> To the States of Greece
> The Roman People, unconfin'd, restore
> Their countries, cities, liberties, and laws;
> Taxes remit and garrisons withdraw.
> *Thomson*, Liberty, iii.

ভারতবর্ষের অনেক লোক অচিরে স্বরাজ প্রাপ্তির আশা রাখেন। গ্যারিসন্ কথাটি রয়টারের খবরে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা জানিতে তাঁহাদের কৌতূহল হইতে পারে। কিন্তু প্রামাণিক ব্যাখ্যা করিবার লোক কোথায় ? গ্যারিসনের অর্থ শুধু শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষাও হইতে পারে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর শান্তির সময়েও সে কাজটা কি দেশী সৈন্য দ্বারাই হইতে পারে না ?—বিশেষতঃ যখন সেনাপতিরা ইংরেজ ? দেশী সিপাহীদিগকে স্বদেশ রক্ষার উপযুক্ত করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষা ও সমরসজ্জা দেওয়া দরকার, তাহা দেওয়া কি সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় নহে ?

বোম্বাইয়ের গবর্ণরের ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তা।

বোম্বাইয়ের যুদ্ধমন্ত্রণাসভা সম্বন্ধে এসোশিয়েটেড্ প্রেস্ যে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, যে, উহার সভাপতি বোম্বাইয়ের গবর্ণর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় হোমরুল-প্রার্থীদিগের নিন্দা করেন, তাহাদের অকপটতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং বলেন যে তাহারা সৈন্যসংগ্রহ-কার্য্যে নানা বাধা উপস্থিত করে। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলককে তাঁহার বক্তব্য বলিতে বলায় তিনি সম্রাটের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন যে সভার গ্রহণীয় প্রস্তাবসকলের কোন সংশোধনের সূচনাও করিতে দেওয়া হইবে না। তাহার পর তিনি গবর্ণর যে-যে বিষয়ে হোমরুল-প্রার্থীদের সমালোচনা করিয়াছেন, সেই-সেই বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃত মনোভাব

ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গবর্ণর তাঁহাকে এই বলিয়া থামাইয়া দেন যে তিনি কোন রকম রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক সভায় হইতে দিবেন না; অথচ গবর্ণর স্বয়ং নিজের বক্তৃতায় এরূপ রাজনৈতিক কথা বলেন যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, সুতরাং তর্কের বিষয়। তখন শ্রীযুক্ত টিলক বলিলেন যে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার এখন সভাগৃহ ছাড়িয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই, এবং এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত কেলকরও বলিতে অনুরুদ্ধ হইবার পর বলিতে উঠিলে গবর্ণর তাঁহাকেও থামাইয়া দিলেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত কেলকর, বোমানজি, হর্নিম্যান ও যমুনাদাস সভা হইতে চলিয়া আসিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত জিন্না গবর্ণরের হোমরুলপ্রার্থীদের সমালোচনার—বিশেষতঃ তাঁহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায়—সক্রোধ প্রতিবাদ করেন। তাহাতে গবর্ণরের সহিত তাঁহার খুব তীব্র ও গরম বাদানুবাদ হয়, কিন্তু শ্রীযুক্ত জিন্না না থামিয়া বলিতেই থাকেন। তিনি সভার সমুদয় কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, এবং বলেন যে গবর্ণমেণ্ট যে রকমে দেশবাসীদের সহযোগিতা চান, তাহা অসম্ভব। সার্ নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর গবর্ণরের মন্তব্যের সমর্থন করেন। কোন্ মন্তব্যের, বুঝিলাম না। সার্ নারায়ণ কি মনে করেন যে সমস্ত হোমরুলাররা কপটাচারী এবং রাজদ্রোহী? শেষে গবর্ণর অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, এখন গবর্ণমেণ্টের পোষকতা করাই উচিত, কিন্তু দেখিতেছি কোন কোন লোক সাহায্যের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্টকে সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চায়। হোমরুল-নেতাদের ভারি অপরাধ! কেননা তাঁহারা বলেন, গবর্ণমেণ্ট ঠিক্ কখন স্বরাজ দিবেন, অঙ্গীকার করিলে বিস্তর সৈন্য পাওয়া যাইবে। লর্ড উইলিংডন ও তাঁহার ভ্রাতারা চান যে ভারতবর্ষীয়রা নিষ্কামভাবে প্রাণটা দিক্। ইংরেজেরা কি নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করিতেছেন? তাঁহাদের দেশের চাষা, শ্রমজীবী, নারী, সবাই নিজেদের কোট বজায় থাকায়, তবে না সমস্ত হৃদয়-মনের সহিত যুদ্ধে সাহায্য করিতেছে? আইরিশরা কি বলিতেছে না, আগে আমাদিগকে স্বরাজ দাও তবে যত সৈন্য চাও তত পাইবে? আইরিশদের বন্ধু আমেরিকানরা ও তাঁহাদের দেশপতি ডাক্তার উইল্‌সন কি প্রকারান্তরে বলেন নাই যে আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বাতন্ত্র্য না দিলে তাঁহারা বর্ত্তমান যুদ্ধকে স্বাধীনতার যুদ্ধ মনে করিয়া ইহাতে যোগ দিতে পারেন না, এবং আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বরাজ দেওয়া হইবে এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া তবে কি তাঁহারা যুদ্ধে নামেন নাই? এই-সব কথা কি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ সাহেব পার্লেমেণ্টে প্রকাশ্য সভায় বলেন নাই? ইংরেজরা স্বাধীনতার জন্য অর্থাৎ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য লড়িতেছেন। আমরা দেখিতেছি ভারতে ইংরেজ বণিক্ ও আম্‌লারা বরাবর আমাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। লর্ড লিটন স্বয়ং বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। এই-সব দেখিয়া যদি এই দেশের লোকে এই "স্বাধীনতার সমরে" প্রাণ দিতে হইলে তাহাদের ভাগ্যেও কতকটা স্বাধীনতা মিলিবে কি না তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে চায়, তাহা হইলেই ইংরেজ আম্‌লারা খাপা হইয়া শাসান, "তোমরা আমাদিগকে সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চাও?" ইহার সোজা উত্তর এই, যে, "তোমরা ত নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধ করিতেছ না, অন্যে নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধ করিবে সে আশা কেন কর?" ইংরেজরা এই লাভের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, যে, তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে, সাম্রাজ্য থাকিবে, এবং কোথাও কোথাও সাম্রাজ্য বাড়িবে। এদেশের লোকদের কি লাভ হইবে, তাহা তাহারা কেন দেখিবে না? তাহাদের প্রাণটা তাহাদের নিকট তেমনি প্রিয় ইংরেজদের প্রাণ তাঁহাদের কাছে যেমন প্রিয়। তাঁহারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য অর্থাৎ নিজেদের স্বাধীনতা **রক্ষার** জন্য প্রাণ দিতেছেন। ভারতের লোকেরাও স্বাধীনতার জন্য অর্থাৎ স্বাধীনতা **লাভের** জন্য প্রাণ দিতে পারে। প্রভেদ, **রক্ষা** ও **লাভ** এই দুটি কথায়। সেদিন নদিয়ায় মোনাহান সাহেব বলেন যে ভারতবর্ষ ফ্রী অর্থাৎ মুক্ত বা স্বাধীন। ইহা অপ্রকৃত কথা। আয়র্ল্যাণ্ডের লোকের রাজনৈতিক অধিকার আমাদের চেয়ে ঢের বেশী, অনেক বিষয়ে ইংরেজদের সমান সমান। তথাপি প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ সাহেব তাহাদিগকে নিজের দেশে ফ্রী করিবার অর্থাৎ মানুষের শক্তিসাধ্য অনুসারে স্বদেশে আত্মভাগ্যবিধাতা হইবার অধিকার (right of self-determination) দিবার

আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা স্বদেশে কোন্ ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আত্মভাগ্যবিধাতা যে আমাদিগকে ফ্রী মনেকরা হয়? আসল কথাটা এই যে আমরা ফ্রী নহি বলিয়াই আমরা পরাধীন বলিয়াই, ইংরেজ আম্‌লারা প্রাণ দিবার আগে দরদস্তর করা (bargaining) বা সর্ত্তে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা (wish to have terms) ভারি অশিষ্টতা, পাপ, বা রাজদ্রোহিতা বলিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিতে সাহস করেন। এই রকম কথা আইরিশ-দিগকে, ধর্ম্মঘটকারী ইংরেজ শ্রামিকদিগকে কেহ বলুন দেখি?

যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে প্রকারান্তরে রাজদ্রোহী ও কপট বলা কিরূপ ভদ্রতা বুঝি না। ইহা রাজনীতিজ্ঞতা ত নহেই, সাধারণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেও এরূপ ব্যবহার করে না। কারণ কাহাকেও গালাগালি দিলে তাহার সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি বাড়ে না।

নারীর পার্লেমেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার।

অন্যতম ব্রিটিশমন্ত্রী বোনার ল সাহেব পার্লেমেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, যে, নারীরা পার্লেমেণ্টের সভ্য হইতে পারেন কি না তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। নারীরা পার্লেমেণ্টের সভ্য সদ্যসদ্যই না হইলে যুদ্ধে জয়লাভ কি অসম্ভব হইবে? ভারতবর্ষের কথা উঠিলে এখানকার ও বিলাতের গবর্ণমেণ্ট বলেন, "এখন ফুরসুৎ নাই, আমরা কেবল যুদ্ধচিন্তা করিতেছি।" কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বিলাতে অন্যরকম চিন্তাও চলিতেছে।

যুদ্ধঋণ সম্বন্ধে লর্ড রোনাল্ড্‌শের বক্তৃতা।

যুদ্ধ-ঋণের টাকা গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে তুলিতে না পারিলে বিলাতে তুলিবেন। তাহা হইলে সুদের টাকাটা বিলাতের লোকে পাইবে। ভারতবর্ষের লোকেরা ঋণ দিলে সুদটা দেশের লোকে পাইবে। ইহা খুব সোজা কথা। অতএব গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দেওয়ায় যে লাভ আছে, তাহা স্বীকার্য্য। একটা কথা উঠিতে পারে যে ব্যবসা-বাণিজ্যে বা মহাজনী তেজারতী করিলে শতকরা ৫½ টাকা অপেক্ষা অধিক সুদ পাওয়া যায়; সুতরাং যদি শুধু লাভের দিক্ দিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে ঋণ না দিয়া ব্যবসা বা তেজারতী করা ভাল। কিন্তু একথা অল্পস্বল্প টাকা সম্বন্ধেই খাটে। একলাখ-দুলাখ টাকা ধার লইবার লোক বেশী নাই, লইলেও তাহারা শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকার বেশী সুদ সচরাচর দেয় না। এবং এখন বড় রকম ব্যবসা বাণিজ্যও কিছু করিবার জো নাই, গবর্ণমেণ্টের নূতন আইনে তাহাতে বাধা পড়িয়াছে। লোকে সাধারণতঃ অল্প টাকা ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে রাখে; তাহা অপেক্ষা যুদ্ধ-ঋণের সুদ বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। বেশী টাকা হইলে লোকে কোম্পানীর কাগজ কিনে; তাহা অপেক্ষাও যুদ্ধ-ঋণের সুদ বেশী।

যুদ্ধঋণ সংগ্রহের জন্য কালকাতার সভায় লর্ড রোনাল্ড্‌শে যে বক্তৃতা করেন, তাহার কয়েকটি কথার সমালোচনা করিতে চাই। তিনি বলেন:—"First, for the moment let us consider what is the financial aid which India has promised to the Empire." ভারতবর্ষ কোন অঙ্গীকার করে নাই; কারণ ভারতবর্ষের দিব কিম্বা দিব না কিছুই বলিবার অধিকার নাই। অঙ্গীকার ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। লাট সাহেব বলিয়াছেন যে নূতন ট্যাক্স স্থাপন বা পুরাতন ট্যাক্স বৃদ্ধি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ-ঋণ দেওয়াই একমাত্র উপায়। ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। গবর্ণর ত নিজেই বলিয়াছেন যে যুদ্ধ-ঋণের সুদ দিবার জন্য এবং আসলের কিছু কিছু বৎসর বৎসর কিস্তিবন্দী করিয়া শোধ দিবার জন্য বৎসরে নয় কোটি টাকা দরকার। লবণ কাপড় প্রভৃতির শুল্ক বৃদ্ধি, ইত্যাদি উপায়ে গবর্ণমেণ্ট ত ইহার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছেন। ট্যাক্স বাড়াইয়া তাহার পর বলা, যে, ঋণ না দিলে ট্যাক্স বাড়িবে, কিরূপ কথা বুঝিলাম না। যদি বলেন, এবং বঙ্গের লাট এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, "এ বৎসর যে ত্রিশ কোটি টাকা ঋণ চাহিতেছি তাহা না দিলে ট্যাক্স দ্বারা ঐ ত্রিশ কোটি টাকা তুলিব, তাহা ভিন্ন উপায় নাই," তাহা হইলে বলি, ট্যাক্স দ্বারা অতিরিক্ত ত্রিশকোটি টাকা তুলিতে গেলে খুব বেশী উৎপীড়ন করিতে হইবে ও প্রকারান্তরে গরীবের গ্রাসাচ্ছাদনে বেশী করিয়া হাত দিতে হইবে, এবং ট্যাক্স

না বসাইয়া টাকা তুলিবার সোজা উপায় এই রহিয়াছে যে যুদ্ধঋণ ভারতবর্ষে না পাইলে বিলাতে পাওয়া যাইবে। মোট কথা, ঋণ এখানে লওয়া হউক, বা বিলাতেই লওয়া হউক, তাহার সুদ আমাদিগকেই দিতে হইবে এবং কিস্তিবন্দী করিয়া তাহা আমাদিগকেই শোধ দিতে হইবে। এই সুদ ও শোধের টাকা ট্যাক্স হইতেই দিতে হইবে। হয় যুদ্ধ-ঋণ দাও নতুবা ট্যাক্স দিতে হইবে, লাটসাহেব এইভাবের কথা বলিয়াছেন। এটাতে লোকের ভ্রম জন্মিবে। আসল কথা, ঋণ আমরাই দি বা বিলাতের লোকই দিক্, অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতেই হইবে ও হইতেছে। গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দিলেও ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে না। তবে একথা আংশিক সত্য যে ভারতবর্ষ হইতে ঋণের টাকা উঠিলে সুদের টাকাটা ভারতবর্ষের লোকেরা পাইবে। আংশিক সত্য বলিবার কারণ এই। সকলে দেখিতেছেন, ভারত প্রবাসী ইংরেজ বণিকরা যুদ্ধ-ঋণে বিস্তর টাকা দিতেছেন। তাঁহারা তজ্জন্য যে সুদ পাইবেন, সে লাভটা ত ভারতবর্ষের লোকদের নয়। বরং ঐ সুদের টাকা ইংরেজ বণিকরা আবার ভারতবর্ষে ব্যবসাতে খাটাইবেনই ও তদ্দ্বারা লাভবান্ হইয়া আমাদের টাকা আরও বেশী পরিমাণে স্বদেশে লইয়া যাইতে পারিবেন। মাড়োয়ারী ব্যবসাদাররাও যুদ্ধঋণে খুব টাকা দিতেছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের লোক বটে; কিন্তু তাঁহারা ইংরেজ বণিকদের আমদানী-করা বিদেশী মাল বেচিয়া বড়মানুষ। সুতরাং তাঁহারা ব্যবসাসূত্রে ভারতবর্ষের টাকা বিলাতে যাইবার ইংরেজ বণিকদের হাতের একটা যন্ত্রস্বরূপ। মাড়োয়ারীরা সুদ পাইয়া তাহা বিদেশী জিনিষের ব্যবসাতেই খাটাইবেন, এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে নূতন ধন উৎপন্ন না হইয়া বরং অন্য উপায়ে উৎপন্ন ধন বিদেশে নীত হইবার পক্ষে সুবিধা হইবে। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ বণিক এবং বিদেশী জিনিষের মাড়োয়ারী বা অন্য জাতীয় ব্যবসাদার ছাড়া অন্য যে-সব ভারতবাসী যুদ্ধ-ঋণ দিবেন, তাঁহাদের প্রাপ্ত সুদ সম্বন্ধে প্রায় পুরাপুরি বলা যায় যে ট্যাক্সের আকারে যাহা দেওয়া গেল, তাহা সুদের আকারে ফিরিয়া আসিল। প্রায় পুরাপুরি এইজন্য বলিতেছি যে ট্যাক্স ধনী দরিদ্র সকলকেই দিতে হইবে, কিন্তু সুদ কেবল ঋণদাতা ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লোকেরা পাইবে। অবশ্য যদি দরিদ্রেরাও অল্প স্বল্প টাকা ঋণ দিতে পারে তাহা হইলে তাহারাও কিছু সুদ পাইবে।

তাহার পর বলা হইয়াছে, যে, যুদ্ধঋণের টাকাটা ভারতবর্ষেই নানা রকম জিনিষ, যেমন তাঁবু বুট জুতা ঘোড়ার সাজ, ইত্যাদি, কিনিতে খরচ হইবে। তদ্দ্বারা দেশের শিল্পের উন্নতি হইবে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য, এই, যে-সব জিনিষ কেনা হইবে, সেগুলা কাহাদের কারখানায় প্রস্তুত হয়? দেশীলোকদের, না ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের? যদি উভয়েরই, তাহা হইলে জানা দরকার, ইংরেজরা গবর্ণমেণ্টের অর্ডার কত পান, কারখানার দেশী মালিকরাই বা কত পান? দেশীলোকদের কারখানা যত জিনিষ প্রস্তুত করিতে সমর্থ সেই পরিমাণ অর্ডার তাহাদিগকে দেওয়া হয় কি? বোম্বাইয়ে যখন অর্থকর শিল্প কমিশন (Industrial Commission) সাক্ষ্য লইতেছিলেন তখন শ্রীযুক্ত করীমভাই আদমজী পীরভাই পুনঃপুনঃ বাধা পাইয়াও প্রমাণ সহ বলেন যে গবর্ণমেণ্ট অর্ডার দিবার সময় ইংরেজদের কারখানার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন, দেশী লোকদের কারখানায় তাহাদের উৎপাদিকা-শক্তির অনুযায়ী অর্ডার দেন না। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এ কথার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। যে যে কারখানা বা সওদাগরী আফিস গবর্ণমেণ্টের অর্ডার পাইতেছেন, গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের তালিকা ও তাহাদের প্রাপ্ত সরকারী অর্ডারের পরিমাণ মুদ্রিত করিয়া দেখাইতে পারেন, যে, দেশী লোকেরাও যথেষ্ট অর্ডার পাইতেছে, তাহা হইলে ঋণ পাইবার সুবিধা বৃদ্ধি হইবে।

বঙ্গের যুদ্ধঋণ আফিস হইতে যে বৃহৎ বিজ্ঞাপন ইংরেজী দৈনিক কাগজে বাহির হইতেছে, তাহাতে লেখা আছে :—

(1) ALL MONEY SPENT IN INDIA.

Probably the greatest advantage to India of the Loan will be the fact that the War Loan will be spent in India. The money will be used to provide Wheat, Rice and other foodstuffs, Jute, Cotton, Tea, Hides, Boots and Shoes, Tents, etc, for the use of the Army and the Allies. Therefore, the cultivators, manufacturers, merchants and every community in India will benefit.

কারখানায় প্রস্তুত জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ও জিজ্ঞাস্য পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। কৃষিজাত জিনিষের উপরের তালিকার মধ্যে চাউল ও পাট বঙ্গের চাষীদের প্রধান উৎপন্ন জিনিষ। আমরা জানিতে চাই, যুদ্ধঋণের টাকা ভারতবর্ষেই ব্যয়িত হওয়ায় পাটচাষীরা ও ধানচাষীরা বিশেষ কি উপকার পাইতেছে। পাটের রপ্তানী জার্ম্মেনী অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে বন্ধ হওয়ায় এবং বাংলার পাটের কলওয়ালা ইংরেজ বণিকরাই একমাত্র ক্রেতা হওয়ায়, তাহারা আগেকার চেয়ে সস্তায় কাঁচা মাল পাইতেছে এবং খুব বেশী লাভ করিতেছে। অপরদিকে চাষীরা সস্তায় মাল ছাড়িতে বাধ্য হওয়ায় এবং সমুদয় মাল সুবিধামত বেচিতে না পারায়, টাকার অভাবে খাজানা দিতে পারিতেছে না, বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে পারিতেছে না। ধানচাষীদের ধানচালের আগেকার মত কাট্তি না থাকায় চাউলের দর সস্তা আছে, কিন্তু কৃষক-সম্প্রদায় খাজানা দেওয়া, বস্ত্রাদি কেনা, প্রভৃতির জন্য নগদ টাকার অভাব অনুভব করিতেছে। এই জন্য আমরা

জানিতে চাহিতেছি, যে, যুদ্ধ-ঋণ দ্বারা পাটচাষী ও ধানচাষীদের বিশেষ কি উপকার হইতেছে। তাহাদের জমিদারদেরও অর্থকষ্ট হইয়াছে। বাংলার ও আসামের চাষের আর-একটি জিনিষ চা। কিন্তু অধিকাংশ চা-বাগান ইংরেজদের সম্পত্তি। চা-বাগান আসামেই বেশী; তন্মধ্যে ৫৪৭টির মালিক ইংরেজরা, ৬০টির মালিক দেশী লোকেরা।

লর্ড রোনাল্ড্‌শে বলিয়াছেন যুদ্ধ-ঋণে টাকা দিবার জন্য অযথা চাপ (undue pressure) দেওয়ার তিনি বিরোধী। আমরা বলি কোন রকম চাপই যেন দেওয়া না হয়। প্রথম বারের যুদ্ধ-ঋণে কোন কোন জেলায় পাঠশালার গুরুমহাশয়রা পর্য্যন্ত যুদ্ধ ঋণ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। চাপ জিনিষের কতটুকু ঠিক্ আর কতটুকু বেঠিক্ তাহা স্থির করা বড় শক্ত।

আমেরিকার নিগ্রোদের একখানি মাসিক।

আমেরিকার নিগ্রোদের ক্রাইসিস (The Crisis) নামক একখানি মাসিকপত্র সাত বৎসর আট মাস পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার কাটতি এখন মাসে এক-লক্ষ। আমেরিকার নিগ্রোদের সংখ্যা এককোটি কুড়ি লক্ষ। বাঙালীদের সংখ্যা চারি কোটি আশি লক্ষের উপর, অর্থাৎ আমেরিকার নিগ্রোদের চারিগুণ। বাংলা দেশে কোন একখানি মাসিক কাগজের একলক্ষ কাট্‌তি ত হয়ই না, সমুদয় মাসিকগুলি জড়াইলেও তাহাদের মোট কাট্‌তি একলক্ষ হইবে না, অনেক কম হইবে। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে বাঙালীদের মধ্যে যতটা লেখা-পড়ার বিস্তার হইয়াছে, আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে তদপেক্ষা লেখাপড়ার প্রচলন বেশী হইয়াছে, এবং পাঠে অনুরাগও তাহাদের বেশী। আর একটা কথা;—কিনিবার সামর্থ্য থাকিতে ধার করিয়া কাগজ পড়া আমেরিকায় সম্মানবর্দ্ধক বিবেচিত হয় না।

বাঁকুড়াসম্মিলনী ও বস্ত্রসঙ্কট।

বাংলার সর্ব্বত্র কাপড়ের অভাবে গরীব লোকেরা কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া বাঁকুড়াসম্মিলনী বাঁকুড়াজেলার কয়েকটি স্থান হইতে যথাসাধ্য কাপড় বিতরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অর্থভিক্ষা করিতেছেন। যিনি যাহা দিবেন তাহা (১) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন পোঃ আঃ, জেলা বীরভূম, কিম্বা (২) শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার, হাইকোর্টের উকীল, ২০ শাঁখারীটোলা ঈষ্ট লেন, ইটালী, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা বস্ত্রবিতরণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

মিঃ পিয়ার্সনের সংবাদ।

মিঃ পিয়ার্সন জাপানে থাকিতে "For India" বা "ভারতবর্ষের পক্ষে" নামক একখানি বহি লেখেন। তাহা ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে আসিতে দেন নাই। তাহাতে তাঁহাদের মতে আপত্তিজনক কথা আছে। চীনদেশে তাঁহাকে সেই কারণেই গেরেপ্তার করা হয়। চীনদেশস্থ ব্রিটিশ মন্ত্রী বলেন যে ঐ পুস্তকে এমন কথা লিখিত আছে, যদ্দ্বারা সাম্রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে ও উহা বিপন্ন হইতে পারে। মিঃ পিয়ার্সন তাহা অস্বীকার করেন। সাংঘাইয়ের সুপ্রীম কোর্ট ব্রিটিশ মন্ত্রীর কথার উপর নির্ভর করিয়া মিঃ পিয়ার্সনকে তাঁহার স্বদেশ ইংলণ্ডে চালান করিয়াছেন। তথায় সম্ভবতঃ দেশরক্ষা আইন অনুসারে তাঁহার উপর হুকুম জারী হইবে। তাঁহার বিশেষ কোন শাস্তি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তবে আপাততঃ তাঁহার ভারতবর্ষে না আসিতে পাইবারই সম্ভাবনা।

তিনি পুস্তক লেখার পর অনেক দিন জাপানে ছিলেন; কিন্তু তথায় তাঁহাকে গেরেপ্তার করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হয় নাই। চীনের রাজধানী পেকিঙে গেরেপ্তার করা হয়। চীনও স্বাধীন দেশ। প্রভেদ এই যে জাপান প্রবল, চীন অন্তর্বি-বাদে দুর্ব্বল। জাপানে যখন কয়েক জন ভারতীয় বিপ্লব-প্রয়াসী গিয়াছিল, তখন তথায় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ধরিতে বা ভারতে চালান করিতে পারেন নাই; জাপানী গবর্ণমেণ্টই তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া-ছিলেন। আমেরিকাতেও যে ভারতীয় বিপ্লবপ্রয়াসীদের বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই, আমেরিকার গবর্ণমেণ্টই করিয়াছেন। ইহাও হইতে পারে যে চীন গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের সন্ধিপত্রে এরূপ সর্ত্ত আছে, যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নিজ রাষ্ট্রের কোন অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন লোককে ধরিতে ও তাহার বিচার করিতে পারিবেন। তাহা যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাও চীনের দুর্ব্বলতার জন্যই হইতে পারিয়াছে।

কাইরা জেলায় সত্যাগ্রহের জয়।

গুজরাটের কাইরা জেলায় অজন্মা হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট অল্প কয়েকটি গ্রামে খাজনা মাফ করেন বা আদায় স্থগিত রাখেন। রায়তদের এবং শ্রীযুক্ত গান্ধির মতে অধিকাংশ গ্রামেই খুব কম শস্য হইয়াছে, অতএব সেই সমস্ত গ্রামেই খাজনা মাফ করা বা আদায় স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে রাজী না হওয়ায় গান্ধি মহাশয়ের পরামর্শে প্রজারা অনেকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে, এবং গবর্ণমেণ্ট ক্রোক বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি নানা উপায়ে আদায় করিতে থাকেন। তাহাতেও প্রায় সব প্রজা প্রতিজ্ঞায় অটল থাকায় গবর্ণমেণ্ট নরম হইয়া এই হুকুম প্রচার

করিয়াছেন যে যাহারা পারিবে তাঁহারা এই বৎসরের খাজনা দিবে, যাহারা দারিদ্র্যবশতঃ পারিবে না, তাহাদিগকে দিতে হইবে না। এই প্রকারে কাইরায় সত্যাগ্রহের জয় হইয়াছে। তথাকার নারী ও পুরুষগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, নির্ভীকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা গুণে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অপর ভারতীয়দিগের আদর্শস্থল হইয়াছেন তাঁহারা ধন্য। শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধি ও শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পাটেল মহাশয়দিগের নেতৃত্ব অতীব প্রশংসনীয়।

অন্তরায়িত ও রাজবন্দীদের কথা।

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের দেহমনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিবার জন্য যে গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত চিকিৎসক-কমিটি বসিয়াছিল, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে জ্যোতিষবাবু এখন পাগল এবং বিমর্ষতা-জাত সংজ্ঞাহীনতা (melancholic stupor) গ্রস্ত। কমিটির তিনজন সভ্য সরকারী ইংরেজ ডাক্তার, এবং বেসরকারী সভ্য ছিলেন ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, এম-ডী। ডাঃ মিত্র স্বতন্ত্র মত দিয়াছেন। মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ সরকারী ডাক্তার মেজর পীব্‌ল্‌স্ একাধিকবার বলিয়াছিলেন, জ্যোতিষবাবু পাগলামির ভান করিতেছেন। এখন তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে বন্দী সত্যসত্যই পাগল ও সংজ্ঞাহীন; তাঁহার মত সুতরাং এই দাঁড়ায় যে বন্দী পাগলামির ভান করিতে করিতে সত্যসত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে। ডাঃ মিত্র এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বন্দী পাগলামির ভান করে নাই, এবং ভান করিতে করিতে পাগল হইয়াছে, এ মত সমর্থন করা যায় না। তিনি মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে তথ্য উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বন্দীদশা ঘুচাইয়া ও বন্দীর পরিবেষ্টন হইতে সরাইয়া জ্যোতিষ বাবুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলে হয়ত তিনি সারিয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়াছেন কি না, জানি না। বন্দীদশাই তাঁহার সংজ্ঞাহীনতা জন্মাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের লোকেরা দায়ী।

অরুণচন্দ্র গুহ নামক একজন অন্তরায়িত যুবক নালিশ করে যে পুলিশ তাহার উপর নৃশংস অত্যাচার করিয়াছে। এই অভিযোগের তদন্ত গবর্ণমেণ্ট দেড় বৎসর পরে মিঃ ষ্টীভেনসন ও সার বিনোদচন্দ্র মিত্র দ্বারা করাইয়াছেন। ফল কি হইয়াছে জানি না। কিন্তু প্রহার বা অন্যবিধ নির্য্যাতনের চিহ্ন ও প্রমাণ সম্ভবতঃ লুপ্ত হইয়া যাইবার পর তদন্ত অদ্ভুত বটে।

কুতুবদিয়ায় অন্তরায়িত ১৭ জন যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটকে আপনাদের অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য সেইস্থান ছাড়িয়া আসে। গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে অন্তরায়ণের স্থান ত্যাগ আইনবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের বিচার হইতেছে।

হাজারীবাগ জেলে আবদ্ধ ৩৬জন রাজবন্দীদের পক্ষ হইতে একখানি ইংরেজী চিঠি আমরা পাইয়াছি। তাহাতে তাঁহাদের কষ্ট ও অসুবিধা এবং নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জেলারের দুর্ব্যবহারের বৃত্তান্ত আছে। এই চিঠি ইংরেজী কোন কোন দৈনিকেও আসিয়াছে, এবং তাহার মর্ম্ম মুদ্রিত হইয়াছে। হাজারীবাগের বন্দীরা প্রায়োপবেশন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো আত্মীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিয়া ঠিক্ খবর পাইতেছেন না যে তাঁহারা স্বয়ং খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, না তাঁহাদিগকে জোর করিয়া কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হইতেছে।

বিনা বিচারে স্বাধীনতা হারাইয়া এতগুলি স্বদেশবাসী কষ্ট পাইতেছে; আমরা তাহার প্রতিকার করিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু ভুলিয়াও থাকিতে পারি না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, প্রভৃতিকে যখন রাজবন্দী করা হয়, তখন তাঁহাদের অনেকের খাওয়া পরা থাকা পড়াশুনার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমান রাজবন্দীদের দশার তুলনায় তাহাকে রাজার হাল বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না। আইন ত পূর্ব্বের মতই আছে। তাহা হইলে কি এখন যাঁহারা আইনের প্রয়োগ করেন তাঁহারা আগেকার প্রয়োগকর্ত্তাদের চেয়ে বেপরোআ সুতরাং নির্ম্মম হইয়াছেন?

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন।

নূতন ভারতশাসন-বিধির খসড়া প্রকাশিত হইলে তৎসম্বন্ধে ভারতবাসীদের মত জানাইবার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইবে। তাহার সভাপতি কে হইবেন, তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ হইতেছে। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক এবং মামুদাবাদের রাজা এই দুজনের নাম হইয়াছে। দুজনেই উপযুক্ত লোক। শ্রীযুক্ত টিলক মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি করার পক্ষে। টিলক কংগ্রেস-মস্‌লেম-লীগের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তাঁহার সভাপতিত্বেও আপত্তি হওয়া উচিত নয়। যাহা হউক, ভারত-সচিব ও বড়লাটের খসড়া কখন্ প্রকাশিত হইবে, তাহারই যখন স্থিরতা নাই, তখন সভাপতি বিষয়ক বাদানুবাদ বন্ধ করিয়া খসড়া শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য আন্দোলন করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

নূতন শাসনবিধি "গ্রহণ"।

কথা উঠিয়াছে, ভারতসচিব ও বড়লাটের নূতন শাসনবিধির খস্‌ড়া যদি কংগ্রেস-মস্লেমলীগের দাবী অপেক্ষা খুব কম হয়, তাহা হইলে আমরা তাহা "গ্রহণ" করিব কি না। "গ্রহণ" কথাটা এস্থলে প্রযুজ্য নহে; কারণ নূতন বিধির প্রবর্ত্তন আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করে না। আমরা গ্রহণ করি বা না করি তাহা চলিবে। আমাদের মতানুযায়ী না হইলে আমরা তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিব, এবং উৎকৃষ্টতর বিধির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিব।

কথা উঠিতে পারে যে নূতন বিধি যদি খুব অসন্তোষ-জনক হয়, তাহা হইলে তদনুসারে গঠিত ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য কংগ্রেস মস্লেমলীগ হোমরুল লীগের লোকেরা চেষ্টা করিবেন, না, ঐ সভাগুলিকে "বয়কট" করা হইবে। এ প্রশ্নও উঠিতে পারে না। কারণ ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভাগুলি যেমনই হউক, বর্ত্তমান সভাগুলি অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইবে না। বর্ত্তমান সভাগুলির সভ্যদের মধ্যে কংগ্রেস মস্লেম লীগ হোমরুল লীগের সভ্য আছেন। সুতরাং ভবিষ্যৎ সভাগুলিতে তাঁহারা কেন যাইবেন না?

নূতন গ্রাহক-নম্বর।

গ্রাহকগণ নূতন গ্রাহক-নম্বর টুকিয়া রাখিলে বাধিত হইব। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের চিঠি লিখিতে হইলে গ্রাহক-নম্বর এবং পুরাতন ও নূতন ঠিকানা দিতে হয়। এরূপ চিঠি নূতন মাস আরম্ভ হইবার পাঁচদিন আগে আমাদের হাতে পৌঁছা আবশ্যক। কাগজ অপ্রাপ্তির অভিযোগেও গ্রাহক-নম্বর এবং পুরাতন ও বর্ত্তমান ঠিকানা দেওয়া আবশ্যক। কোন মাসের কাগজ না পাওয়ার অভিযোগ ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছা দরকার।

আলোচনা

একলব্য।

নবম সাহিত্য সম্মিলনে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে স্বীয় অভিভাষণে মহাবীর একলব্যকে আর্য্যেতর জাতির অন্তর্নিবিষ্ট করেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করা কেবল গবেষণাহীন প্রচলিত মতের অভিব্যক্তি মাত্র। সম্প্রতি সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের অভিভাষণ "যশোহর-সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ" ১ম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতেও দেখিলাম মহাবীর একলব্যকে আর্য্যেতর সভ্যজাতি বলা হইয়াছে। সাধারণে একলব্যকে নিষাদ-তনয় বলিয়া জানেন ও তাঁহাকে নিষাদ-রাজ বলেন। বাস্তবিক তিনি নিষাদ-তনয় নহেন। যেমন মহাবীর কর্ণ অধিরথ নামক সূত জাতি দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া সূতপুত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর একলব্যও কোন কারণে নিষাদরাজ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া নৈষাদি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মহাত্মা একলব্য জাতিতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, ভগবান বাসুদেবের সাক্ষাৎ খুল্লতাত-পুত্র। যথা—

দেবশ্রবাঃ প্রজাতস্তু নৈষাদির্যঃ প্রতিশ্রুতঃ।
একলব্যো মহারাজ নিষাদৈঃ পরিবর্দ্ধিতঃ॥

হরিবংশ। ৩৪ অং ৩৩।

দেবশ্রবাঃ বসুদেবস্য তৃতীয়ো ভ্রাতা। (নীলকণ্ঠ,)

বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবাঃ মহাবীর একলব্যের পিতা। এই একলব্যই নৈষাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ও তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ৩০৯ পৃষ্ঠায় হরিবংশ হইতে যে চন্দ্র-বংশের বংশলতা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও একলব্য যদুবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বংশলতা দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইবে একলব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত-পুত্র। একলব্যের পিতা দেবশ্রবা যে বসুদেবের তৃতীয় সহোদর তাহা বহু পুরাণেই লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মপুরাণের চন্দ্রবংশ-সম্ভূত যদুবংশের বংশলতা দ্রষ্টব্য। পৃথিবীর ইতিহাস ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা ও ৩২৭ পৃষ্ঠা।

এই সমস্ত প্রমাণ-পরম্পরায় মহাবীর একলব্য বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। যদিও পৌরাণিকী প্রভৃতি আধুনিক কাব্যে ও কাশীদাসী মহাভারতে দ্রোণ-প্রত্যাখ্যাত মহাবীর একলব্যকে নিষাদ জাতি বলা হইয়াছে, তথাপি ইতিহাস চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইতেছে মহাত্মা একলব্য বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত-সম্ভূত ক্ষত্রজাতি। আমরা জানি একলব্য নিষাদ হইলে কাব্যামোদীর যত আনন্দ হইবে, যত গল্প জমিবে, ক্ষত্রিয় হইলে তত আনন্দ হইবে না, তত গল্প জমিবে না। কিন্তু ইতিহাস কাহারও আনন্দ-নিরানন্দের ধার ধারে না, কাহারও গল্প জমা না জমার অপেক্ষা রাখে না।

হাবাসপুর, ফরিদপুর। শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

বাংলার বস্ত্রসমস্যা।

এবারকার প্রবাসীতে দেশে বস্ত্রসঙ্কটের কথা পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

দেশে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গরীব লোকদের মধ্যে যথাসম্ভব বস্ত্রবিতরণ অবশ্যকরণীয়। কার্পাসের চাষ করিয়া তুলা সংগ্রহ করা, ঘরে ঘরে চরকার বন্দোবস্ত করিয়া সূতা তৈয়ারী করা, দেশে কাপড়ের কলের উন্নতি বিধান করা, এসব ব্যবস্থা দেশের পক্ষে অতি কল্যাণকর এবং স্থায়ী ফলপ্রদ হইলেও একার্য্য সময়সাপেক্ষ। কাজেই এসব দিকে শক্তি প্রয়োগের যথেষ্ট আবশ্যকতা থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থার একটা আশু প্রতীকারেরও চেষ্টা দেখিতে হইবে।

আমাদের মনে হয় দেশে পুরুষদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য ধুতির পরিবর্ত্তে ঢিলা পা-জামার প্রচলন করা মন্দ পরামর্শ নয়। পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে এ প্রথা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—(পঞ্জাবে রমণীরাও পা-জামা ব্যবহার করেন)। ইহঁারা যে শুধু বাড়ীতেই পা-জামা ব্যবহার করেন তা নয়। বাহিরের কাজ-কর্ম্মে, দপ্তরখানার নিত্য অধিবেশনে, উৎসব ইত্যাদি সম্মিলনেও ইহাঁদের পরিধানে সেই পা-জামাই দেখিতে পাই।

দেশের অর্দ্ধেক লোক (সকল পুরুষই) যদি পা-জামা ব্যবহার

করিতে থাকেন তবে ধুতির অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা (demand) অনেকটা কমিয়া আসিবে। সঙ্গে সঙ্গে পা-জামা ব্যবহারের দরুন প্রত্যেকেই নিজ পরিবারের মধ্যে ব্যয়-সংক্ষেপও স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। কারণ আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি সাধারণতঃ ২ জোড়া ধুতিতে (ব্যয়=১০৲—১২৲ টাকা) ৬।৭।৮ মাস চলে, কিন্তু ৪টি পা-জামাতে (ব্যয়=৬৲—৭৲ টাকা) ১০।১২ মাস অনায়াসেই চলিয়া যায়। যাঁহারা একটু মোটা কাপড় পরিতে রাজী আছেন তাঁহারা তদনুরূপ কাপড় দেখিয়া তৈয়ারী করিলে ৪টি পা-জামায় ১।০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কাটাইতে পারেন। দেশে বহুল প্রচলন হইলে পা-জামা তৈয়ার করিবার খরচ কিছু বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু ধুতির সমানন্তর পর্য্যন্ত বোধ হয় উঠিবে না। এদিকে ধুতির প্রয়োজনীয়তা (demand) যথাসম্ভব কমাইয়া আনিতে পারিলে ধুতির মূল্যও অবশ্যই কমিয়া আসিবে।

অবস্থা অনুসারে যে কেহ পা-জামার পরিবর্ত্তে ২।১ খানা লুঙি ব্যবহার করিয়াও আরও ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারেন।

যাঁহারা ধুতিকে বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিবার কথা। কিন্তু এরূপ কোন উপায় অবলম্বন না করিলে অচিরেই বস্ত্রসঙ্কটের লজ্জাকর পরিণামের কথা বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে থাকিবে, তখন কি লজ্জায় দেশ সুদ্ধ লোকের শির নত হইয়া পড়িবে না ?

আমাদের দেশে যাঁহারা বড়লোক এবং মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোক বর্ত্তমানে তাঁহাদেরও এ বিলাস পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ ধুতির প্রয়োজনীয়তা (demand) যতটা কমানো যায় দেশের পক্ষে তাহাই মঙ্গলকর। বড়লোকেরা এসব আদর্শ দেখাইলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কোন আপত্তি থাকিবে না ; বরং সকলে তাঁহাদেরই আদর্শের অনুসরণ করিবে। এ প্রস্তাব গ্রহণীয় বলিয়া মনে হইলে দেশের সকলেরই কর্ত্তব্য একনিষ্ঠভাবে এ প্রথার সম্যক্ প্রচলনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন সকলে ব্রত গ্রহণ করিয়া একনিষ্ঠতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এখনও আবার সেরূপ করিতে হইবে। স্বদেশী-প্রচেষ্টার চেয়ে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা একটুকুও কম নয়।

কোয়েটা বেঙ্গল হোমের পক্ষ হইতে
শ্রীসত্যভূষণ সেন।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (প্রথম প্রস্থান, কর্ম্মমীমাংসা)। **শ্রী-সচ্চিদানন্দ বালব্রহ্মচারি**-বিরচিত **স্বয়ংপ্রকাশ**-ভাষ্য-সমেতা, বঙ্গানুবাদসমেতা। প্রকাশক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩৯।৪, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ১৮০ × ১২ × ১৩৮, মূল্য ১৮০।

ইহাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল বড় বড় অক্ষরে দিয়া, তাহার নীচে আবশ্যক স্থানসমূহে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত ভাষ্য দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার গীতারই কথায় গীতাকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই এই ব্যাখ্যার নাম দেওয়া হইয়াছে স্বয়ং-প্রকাশ,—যাহা গীতায় স্বয়ং অর্থাৎ নিজে নিজেই প্রকাশ পাইতেছে। ইহা অতি সুন্দর কথা। ইহার পূর্ব্বে এরূপ চেষ্টা বোধ হয় আর কেহই করেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে একদল বেদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এইরূপ পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন, বেদেরই কথায় বেদকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমরা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের যে ভাষ্যের কথা বলিতেছি ইহা তাঁহার বৃহৎ স্বয়ংপ্রকাশ ভাষ্যের সংক্ষিপ্তসার, উহা এখনো প্রকাশিত হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিলে পাঠককে বলিতেই হইবে যে, গ্রন্থকার বহু স্থলেই গীতার উক্তিসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতে গিয়া নিজের সবিশেষ চিন্তাশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বহুস্থলে তাহা সত্য-সত্যই প্রশংসনীয়। মানুষের একটা স্বভাব আছে যে, কোনো একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে তাহাকে প্রমাণ করিবার জন্য কেমন একটা নির্ব্বন্ধ বা আগ্রহ জাগিয়া উঠে, এবং তাহাতে অনেক সময়ে যাহা বস্তুত যাহা নহে, তাহাকে তাহাই বলিয়া প্রতিপাদন করিতে গেলেও কোনো দোষ বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ব্যাখ্যাতেও এইরূপ হইয়াছে বোধ হয়। তাহার পর, শ্লোকগুলির খণ্ড-খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা পড়িয়া আমরা যতটা আমোদ লাভ করিয়াছি, তাহাদের মোট সমগ্র অর্থটা পড়িয়া আমরা তাহার কিছুই পাই নাই, বরং পূর্ব্বে যাহা পাইয়াছিলাম তাহাও বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। হইতে পারে ইহা আমাদেরই দোষ। নিরুক্তের ভাষায় অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, এবং হয়ত কেহ বলিবেনও—"নৈষ স্থাণোরপরাধো যদ্ এনম্ অন্ধো ন পশ্যতীতি !" তাই তাঁহার ভূমিকা হইতে একটু তুলিয়া দিতেছি, পাঠকেরা স্বয়ংই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। ইহা গীতার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা, বলা বাহুল্য :—

"ডুকৃঞ্ করণে" হইতে লোট্ 'কুরু'। কুরু অর্থাৎ বিধিরূপ কর্ম্ম। 'কুরুক্ষেত্র' অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্র—কর্ম্মভূমি। সমগ্র ভারতবর্ষই সেই কর্ম্মক্ষেত্র—কর্ম্মভূমি। ভারতবর্ষ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রও ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের অন্তর্গত। তাহা হইলে "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ইহার অর্থ হইল—'ধর্ম্মক্ষেত্রে জ্ঞানকর্ম্মাত্মকস্য ধর্ম্মস্য ক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ডে স্থিতং যৎ কুরুক্ষেত্রং কর্ম্মক্ষেত্রং কর্ম্মভূমিঃ ভারতবর্ষং তস্মিন্।' প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এ কথা থাকে। তাহার অর্থ ইহারই অনুরূপ, অর্থাৎ যোগ ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত—ব্রহ্মবিদ্যাধিকার লাভের যোগ সাধন। গীতারূপ সংবাদের বিষয় যোগই। এই সমস্ত বিবেচনের ইত্যর্থ (!) এই হইল যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানভূমি (দেব-লোক) ও কর্ম্মভূমি (মনুষ্যলোক), এই দুই ভাগ ; ভারতবর্ষই সেই কর্ম্মভূমি, অর্থাৎ এইখানেই কর্ম্মের অধিকার, এইরূপে সামান্যতঃ কর্ম্মের দেশ কথিত হইল। ইহারই একটু বিশেষ কহিতেছেন—"সমবেতাঃ। অর্থাৎ যাহারা সমবায় সম্বন্ধে থাকেন, চতুর্ব্বর্ণ্যসমাজে তদঙ্গীভূত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডে—ভারতবর্ষে—চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজেই কর্ম্মের 'দেশ' ইহা পিণ্ডিতার্থ (!)।"

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

সত্য ও সংস্কার—শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম্ এ। মূল্য দুই আনা।

সত্য ও সংস্কার একটি সুযুক্তিপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক বক্তৃতা। সত্য নির্ণয়ের অন্তরায় কি, ন্যায়পরায়ণ মানুষ কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া সত্য নির্ণয় করিবে এবং কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইবে, বক্তা তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এই-সকল গুরুতর বিষয় অতি উৎকৃষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন। বক্তৃতাটি সময়োপযোগী ; আমরা পাঠক-দিগকে উহা পড়িতে অনুরোধ করি। প্রাচীনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগবশতঃ, মানুষ কি রকম অন্ধ হইয়া কুরীতি ও কুসংস্কার রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং যখন সুশিক্ষিত স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ দেশের কল্যাণের জন্য কোন নূতন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন যে ঐ-সকল লোক দল বাঁধিয়া একমাত্র প্রাচীনের দোহাই দিয়া কিরূপে স্বদেশানুরাগী মানুষদিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়,—বক্তা সেই কথাটি বিস্তর ঐতিহাসিক

দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা দুইটি দৃষ্টান্তের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"সপ্তদশ শতাব্দীর শেষযাম পর্য্যন্ত লণ্ডনের রাস্তায় রাত্রিকালে আলো দিবার ব্যবস্থা ছিল না। এজন্ত সন্ধ্যার পরেই রাস্তাগুলি পথিকের পক্ষে একান্ত বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়িত; নিরীহ পথিকগণের ধনপ্রাণ যাহাতে কিঞ্চিৎ নিরাপদ হয়, সেই অভিপ্রায়ে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে এডোয়ার্ড হেমিঙ্গ নামক এক ব্যক্তিকে কয়েক বৎসরের জন্ত সামান্যলাভে রাস্তায় আলো দিবার একচেটিয়া অধিকার প্রদত্ত হইল যে, তিনি ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৫শে মার্চ এই ছয়মাস কৃষ্ণপক্ষে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত দশ দশ বাড়ী অন্তর এক একটি বাতি জ্বালিয়া রাখিবেন। যাহারা উন্নতির পক্ষপাতী, তাহারা এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইল বটে; কিন্তু একান্ত রক্ষণশীল বহুসংখ্যক নগরবাসী যেই শুনিতে পাইল যে, রাত্রিতে রাস্তায় আলো দিবার কথা উঠিয়াছে, অমনি তাহারা সেই সৃষ্টিছাড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। "আমরা নব আলো চাই না। আমরা নব আলো চাই না," এই বলিয়া চীৎকার করিয়া করিয়া তাহারা ব্যোম মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল। সে কি ভীষণ কোলাহল? "শত শত বৎসর ধরিয়া আমাদিগের পূর্ব্বগামিগণ এই নগরে নিশার প্রগাঢ় তিমিরে বিনা আলোকে রাজপথে যাতায়াত করিতে পারিলেন, আর তোমরা কোন্ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলে যে, তোমাদিগের আলোক না হইলে চলিবে না? না, তাহা হইবে না, কিছুতেই রাস্তায় আলো দিতে দিব না।"

"স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের ব্যাপার ইহা অপেক্ষাও কৌতুকাবহ। আবহমানকাল হইতে সেখানকার অধিবাসীরা রাজপথে যত আবর্জ্জনা ও অনুচ্চার্য্য ঘৃকারজনক পদার্থ নিক্ষেপ করিত। এই সনাতন প্রথার ফলে রাস্তায় দুই ধারে ঐ পদার্থগুলি স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বৈদেশিকেরা ঐ নগরে তিষ্ঠিতে পারিত না। ১৭৬০ সালে কতিপয় রাজপুরুষ প্রস্তাব করিলেন, যে, আবর্জ্জনাগুলি নগরের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া পথঘাট পরিষ্কার করা হউক। আর যাও কোথায়? যেই প্রস্তাবটি নগরবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল, অমনি তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। * * চিকিৎসকগণ সবিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে বিষয়টির আলোচনা সমাধা করিয়া এই অভিমত প্রদান করিলেন— "আবর্জ্জনাগুলি যেখানে আছে সেইখানেই থাক। ওগুলি নিক্ষেপ করিতে গেলেই একটা নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হইবে; তাহার কি ফল হইবে, কে জানে? আমাদিগের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, সকলে ঐ আবর্জ্জনারাশির মধ্যে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

এলাহাবাদের পাণিনি-কার্য্যালয় হইতে সম্প্রতি একটি মূল্যবান্ ইংরেজী পুস্তক বাহির হইয়াছে। ইহার নাম Indian Medicinal Plants বা ভারতবর্ষীয় ওষধিনিচয়। ঔষধার্থে বা ঔষধস্বরূপে ব্যবহৃত যত প্রকার গাছ-গাছড়া ভারতবর্ষে জন্মে, ইহাতে তাহাদের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানানুমোদিত বর্ণনা আছে, উৎপত্তির ও প্রাপ্তির স্থানসমূহের নাম আছে; ওষধিগুলির সংস্কৃত নাম থাকিলে তাহা দেওয়া আছে; যে-যে প্রদেশে জন্মে তত্তৎস্থানপ্রচলিত দেশী নাম আছে; এবং গাছগাছড়ার ফুল, ফল, পত্র, মূল, ত্বক আদির যে-যে গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস থাকায় যে-যে ব্যাধি আরোগ্য ও উপসর্গ দূর করিবার জন্ম তৎসমুদয় ব্যবহৃত হয়, তাহার বৃত্তান্ত আছে। সর্ব্বসমেত এই প্রকার ১৩৮১টি গাছগাছড়ার বিবরণ আছে।

কেবল উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানানুযায়ী বর্ণনা, এবং সংস্কৃত ও দেশী নাম থাকিলেই গাছগাছড়া চেনা যায় না। বস্তুতঃ আয়ুর্ব্বেদোক্ত এরূপ কোন-কোন ওষধি আছে, যাহাকে এক প্রদেশে বা জেলায় যে উদ্ভিদ্ বলিয়া চিকিৎসকেরা মনে করেন, অন্য প্রদেশ বা জেলার চিকিৎসকেরা তাহা মনে করেন না। এমন কি, প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকদিগের উল্লিখিত কোন-কোন গাছগাছড়া এখন পাওয়াই যায় না;—যথা, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, মেধা, মহামেধা, জীবক, ঋষভ, ইত্যাদি। হইতে পারে যে এগুলি চিনিবার কোন উপায় না থাকায়, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান থাকিলেও কেহ সংগ্রহ করিতে পারে না। বক্ষ্যমান গ্রন্থে বর্ণিত সমুদয় গাছগাছড়া চিনিবার পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়-সমুদয় ভিন্ন, সবগুলির পরিষ্কার ও নির্ভরযোগ্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। ১০৩৩টি স্বতন্ত্র মুদ্রিত পাতায় এই ছবিগুলি আছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৯৪। ছবির পাতাগুলির মাপ সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ১১ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৮½ ইঞ্চি; কোন-কোন পাতা ইহা অপেক্ষাও বড়। বহিখানি উৎকৃষ্ট পুরু আর্ট পেপারে, এবং ছবিগুলি উৎকৃষ্ট পুরু লিথো কাগজে ছাপা। ছবিগুলি চারিটি সুদৃশ্য পোর্টফোলিও বা চিত্রাধারে রক্ষিত।

গ্রন্থকারদের নাম পরলোকগত সাজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল কাহ্লোবা রণছোড়দাস কীর্ত্তিকর, আই-এম্-এস্, মেজর বামনদাস বসু, আই এম্-এস্, এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান। কীর্ত্তিকর মহাশয় বোম্বাইয়ের মেডিক্যাল কলেজে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ও শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু মহাশয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান মহাশয় উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে পারদর্শী।

এই গ্রন্থ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিদ, কৃষিজীবী, চিকিৎসক, ওষধপ্রস্তুতকারক, অরণ্যবিভাগের কর্ম্মচারী, প্রভৃতির কাজে লাগিবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বেও পাশ্চাত্য কোন কোন দেশে ওষধি-ক্ষেত্র ছিল। যুদ্ধের সময় নানাপ্রকার গাছগাছড়ার খুব বেশী প্রয়োজন হইয়াছে; অন্যদিকে জার্মেনীর বহির্বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীর প্রধান ঔষধ-উৎপাদক দেশ জার্মেনী হইতে ঔষধ পাওয়া যাইতেছে না। এইকারণে হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে ওষধি-বাগানের দিকে লোকে খুব মন দিতেছে। ভারতবর্ষে কবিরাজ ও হাকিমেরা নিজেই ঔষধ প্রস্তুত করেন। তাঁহাদের মধ্যে ২।৪ জনের সামান্য রকমের ওষধি-উদ্যান আছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকই গাছগাছড়া সংগ্রহের জন্য বেদিয়া মালী প্রভৃতির উপর নির্ভর করেন। ইহা সন্তোষজনক নহে। গাছগাছড়া প্রাপ্তির বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ঠিক্ জিনিষটি পাওয়া গেল কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়, এবং পাওয়া গেলেও অনেক সময় তাজা পাওয়া যায় না। ওষধি-ক্ষেত্রের সুবিধা প্রসিদ্ধ ঔষধব্যবসায়ী বারোজ্ ওয়েলকাম্ এণ্ড কোম্পানী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"1. A drug may be treated or worked up immediately it has been collected.

"2. Herbs may be dried, if necessary, directly they are cut, before fermentation and deteriorative changes have set in.

"3. Freedom is ensured from caprice on the part of collectors, who, in gathering wild herbs, are very difficult to control in the matter of adulteration, both accidental and intentional.

"4. Opportunity is provided to select and cultivate that particular strain of a plant which has been found by chemical and physiological tests to be the most

active, and which gives the most satisfactory preparations."

চিকিৎসক হউন বা না হউন, যে-কেহ ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহার ওষধি-ক্ষেত্র থাকা খুব সুবিধাজনক। কেবল সুবিধাজনক নহে, খাঁটি বিশ্বাসযোগ্য ঔষধ দিতে হইলে ঔষধে-প্রযুক্ত গাছ-গাছড়ার চাষ করা একান্ত দরকার।

কেবল কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসাতেই যে ভারতীয় গাছ-গাছড়া ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া অনুযায়ী ঔষধের জন্য ব্যবহৃত গাছগাছড়ার অর্দ্ধেক ভারতবর্ষে স্বভাবতঃ জন্মে, এবং বাকী অর্দ্ধেকেরও অধিকাংশ ভারতবর্ষে জন্মাইতে পারা যায়; কারণ ভারতবর্ষ এত বড় ও বিচিত্র দেশ যে এখানে পার্ব্বত্য, সমতল, শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান, নাতিশীতোষ্ণ, সবদেশের উদ্ভিদই জন্মিতে পারে। এইজন্য উদ্ভিদ্ হইতে প্রস্তুত যে-সব এলোপ্যাথী ঔষধ ভারতবর্ষে আমদানী হয়, তাহাতে ব্যবহৃত গাছগাছড়া ভারতবর্ষেই উৎপাদিত ও সংগৃহীত এবং তৎসমুদয় হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। কৃষকের পক্ষে এবং রাসায়নিকের পক্ষে ইহা কত বড় কার্য্যক্ষেত্র ভাবিয়া দেখুন। বড় বড় কবিরাজ, ঔষধনির্মাতা, কৃষিজীবী, ও জমীদার এইরূপ কৃষিক্ষেত্র রাখিতে পারেন। আমরা যদি গাছগাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে না-ও পারি, তাহা হইলেও গাছগাছড়াগুলি রপ্তানী করিয়াও বিস্তর টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ফ্রান্সে এই ব্যবসা খুব চলিতেছে। গত মে মাসের মডার্ণ-রিভিউ কাগজের ৫৭১-৭২ পৃষ্ঠায় ইহার কিছু বিবরণ আছে। ফ্রান্সে ধুতুরা, লজ্জাবতী, কদলী, প্রভৃতি সাধারণ উদ্ভিদেরও কাট্‌তি আছে।

ভারতবর্ষের অরণ্যে এমন বিস্তর গাছগাছড়া জন্মে যাহা ঔষধে ব্যবহৃত হয় ও হইতে পারে। ব্রিটিশ ভারতের সমুদয় প্রাদেশিক আরণ্য বিভাগের এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের আরণ্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা ইহা অনবগত নহেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এদিকে সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। এই গ্রন্থ আরণ্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা ব্যবহার করিলে সুফল ফলিবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাঁহারা ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহারা এই পুস্তকে বর্ণিত গাছগাছড়ার রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা গুণ নির্ণয় ও পরীক্ষা করিতে পারেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয় রাজ্যসকলের এইজন্য রাসায়নিক পরীক্ষাগার থাকা উচিত। কোন কোন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অল্পসংখ্যক গাছগাছড়ার বিশ্লেষণ হইয়াছে ও হইতেছে। এই প্রকার বিশ্লেষণের ফল যদি আবার চিকিৎসকদিগের দ্বারা রোগের চিকিৎসায় পরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে যেমন প্রচলিত কোন কোন ঔষধ অকেজো বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে তেমনি নূতন-নূতন ঔষধও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাগ্রন্থে স্থান পাইতে পারে।

গ্রন্থকারগণের পরিশ্রমের ফল দেশের লোকে কাজে লাগাইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই-পুস্তক প্রকাশের আংশিক ব্যয় স্বরূপ দশহাজার টাকা দিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পুস্তকের মূল্য আড়াই শত টাকা। প্রাপ্তিস্থান, পাণিনি-কার্য্যালয়, বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ।

ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্‌সী (ইলিনয়)। ৫৫ আপার চিৎপুর রোড হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুটাকা চারি আনা।

বহিখানির ভূমিকায় কৃষিবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, এফ্-আর্-এ-এস্ মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, গ্রন্থকার "অন্যান্য সভ্য দেশের কৃষককুলের সমৃদ্ধির সহিত আমাদের দেশের কৃষককুলের দুর্দ্দশার তুলনা করিয়া ব্যথিত অন্তরে বর্ত্তমান গ্রন্থে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিজের চিন্তার ফলগুলি বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে শিখিবার ও ভাবিবার কথা অনেক আছে।" এই মন্তব্যে আমরা সম্পূর্ণ সায় দিতেছি।' মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তকখানির লক্ষ্য সম্বন্ধে বলেন :—

"কি কি উপায়ে বিঘাপ্রতি কত বেশী ধান বা গম, তুলা বা পাট জন্মাইতে পারা যাইবে, তাহা নির্দ্দেশ করা পুস্তকের লক্ষ্য নহে। কিন্তু কোন্ পথে কৃষিতত্ত্বের গবেষণা হওয়া উচিত, কি করিলে সরকারী কৃষিবিভাগের কথা মূর্খ ও দরিদ্র কৃষকগণের নিকট পৌঁছিবে, কি উপায়ে ঋণজালে জড়িত কৃষকগণকে সেই জাল হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত করা যাইবে, কিরূপে দেশমধ্যে কৃষিশিক্ষার বিস্তার হইবে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষকগণের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন—এই-সকল মৌলিক সমস্যার আলোচনাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।"

বহিখানি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলিতে, সরকারী কৃষিবিভাগের জন্মবৃত্তান্ত, সরকারী কৃষিবিভাগের কার্য্যপ্রণালী, শস্যের উন্নতি, কৃষি-উন্নতি বিধায়ক কয়েকটি প্রণালী, গো-পালন ও গোষ্ঠসমস্যা, কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন, এবং যৌথ ঋণদান-সমিতি ও কৃষিসমবায়, এই সকল বিষয় বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পরিশিষ্টে আছে, (ক) কৃষিই আমাদের প্রধান পেশা, (খ) ভারতবর্ষের জমির খতিয়ান, (গ) প্রধান শস্যের আবাদ, (ঘ) ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাত, (ঙ) কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী, (চ) পাটের জাতিগত প্রভেদ, (ছ) সরকারী কৃষিক্ষেত্র (তালিকা সহ), (জ) সরকারী কৃষি-বিদ্যালয়, (ঝ), সরকারী কৃষিবিভাগে ভারতবাসীর স্থান, (ঞ) গরু-মহিষের খোরাক, (ট) গরু মহিষের আহার্য্য দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, (ঠ) ভারতবর্ষে সমবায়-সমিতির বিস্তার, (ড) সম্রাট আলাউদ্দীন খিলিজির অনুশাসন, (ঢ) জল-দেওয়া জমীর ফসল, এবং (ণ) ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধীয় কয়েকখানি বই।

পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝা যায় যে গ্রন্থকারকে খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তিনি যে কেবল বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নয়; সেগুলি যথাযোগ্য ভাবে সাজাইয়া পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ চিন্তাপ্রসূত মন্তব্য আছে। ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের জীবিকা চাষ। উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসাদার, প্রভৃতি যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে চাষের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহাদেরও শেষ ভরসা কৃষক। সুতরাং এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়গুলিতে শিক্ষিত লোকদের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিস্তর জিনিষ আছে। সাধারণহিতকর বিষয়ে খবর রাখা সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য। আমরা যথাশক্তি এই কাজ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু এই বহি পড়িয়া দেখিলাম, দেশের অন্নদাতা ও ভরসাস্থল কৃষককুলের হিতসাধনের উপায় সম্বন্ধে আমরা কত কম জানি। সম্পাদক ছাড়া অন্য যে-সব লোক দেশের ভিতের বিষয় ভাবেন, বা ভাবেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের এই প্রকার বহি পড়া দরকার। বাংলা বা ইংরেজী কোন বহিতে কৃষির উন্নতি বিষয়ে এত তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যাইবে না।

দেশহিতৈষী অপর শিক্ষিত লোকদের মত গ্রন্থকার বুঝিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের বুঝা উচিত যে সরকারী কৃষিবিভাগের যতই উন্নতি হউক না কেন, কৃষকগণ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত থাকিলে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইবে না, দেশও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

কৃষিসমবায় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেন :—

"কেবলমাত্র টাকা কর্জ্জ করায় আর তাহার সময়মত পরিশোধ করিয়া দেওয়াতে সমবায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হয় না। চাষীরা জোট বাঁধিয়া সার, লাঙ্গল, বীজ খরিদ করিবে; একত্রে সমবায় সমিতির সাহায্যে ফসল বিক্রয় করিবে; ব্যয়সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি অনুসরণ করিবে; উদ্ভিদব্যাধি ও কীট পতঙ্গাদি শত্রু হইতে ফসল রক্ষণ করিবে; প্রয়োজন হইলে ফসল গোলাজাত করিয়া রাখিবে; গরু বাছুরের উন্নতি বিধান করা ব্যয়বহুল বলিয়া জোট বাঁধিয়াই ইহার চেষ্টা করিবে। তারপর, ক্রমে ক্রমে পল্লীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাহারাই দলবদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে।"

ডেন্‌মার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপায়ে প্রবল প্রতিবেশী জাতিসকলের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন:—"বেচাকেনার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সরকারী নজীরে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। অথচ যাঁহারা পল্লীর হাট-বাজারের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, পাইকার ব্যাপারী ও দালালের আক্রমণ মহাজনের উৎপাত অপেক্ষা কিছু কম নহে। অনেকস্থলে মহাজনই দালাল, অতএব ক্রেডিট সোসাইটী হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া কৃষক যে টুকু লাভ করে, ফসল বিক্রী করিতে গিয়া তাহা খোয়াইতে হয়। খোঁজ লইলে জানা যায় প্রায় বারো আনা দালাল ইংরেজ বণিকের প্রসাদপুষ্ট। ইহাদের সাহায্যেই তাহারা পাট, তৈলশস্য, গম ও অন্যান্য রপ্তানীর যোগ্য ফসল সুবিধাদরে খরিদ করে। শুনিতেছি তিন চার বৎসর মধ্যে এই ধরণের কয়েকটি সমবায়-সমিতিও এ দেশে স্থান পাইয়াছে। বর্ম্মাতে ধান, চীনাবাদাম প্রভৃতি ফসল বিক্রয় করিবার জন্য নাকি ৫২টি এবং মধ্য প্রদেশে দুই একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু বাংলার পাট, মান্দ্রাজের তৈলশস্য, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গম ও বোম্বাইর তুলা বিক্রয় করিবার কোনো ব্যবস্থা হইয়াছে কি? জোট বাঁধিয়া কৃষকেরাই যদি য়ুরোপীয় দেশে ফসল রপ্তানী করে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট মন খুলিয়া ইহাতে সায় দিতে পারিবেন কি?"

পুস্তকখানিতে "সৌজন্যতা", "দারিদ্রতা", "সমবায়তা", প্রভৃতি ভুল দৃষ্ট হইল;—যদিও ইহা সাহিত্যপুস্তক নহে বলিয়া এরূপ ভুলে গ্রন্থের উৎকর্ষ নষ্ট হয় নাই।

গুরু নানক কৃত জপজী—টাকা ও ভাষ্য সহ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক অনুবাদিত। পাণিনি কার্যালয়, এলাহাবাদ। মূল্য আট আনা। এণ্টীক কাগজে মুদ্রিত।

ইংরেজের দেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচলিত। একসময়ে সমুদয় গোঁড়া খৃষ্টিয়ান বিশ্বাস করিতেন, যে, আর-সব ধর্ম্ম শয়তানপ্রবর্ত্তিত, এবং কোন অখৃষ্টিয়ানের উদ্ধার হইবে না, তাহাদের সকলের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা আছে। এখন সমুদয় খৃষ্টিয়ান এরূপ মতে বিশ্বাস না করিলেও অনেকে করেন, এবং মোটের উপর খৃষ্টীয় জগতের ধারণা এই, যে, অন্য-সব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও বাইবেল হইতে নিকৃষ্ট। তথাপি দেখা যাইতেছে, যে, খৃষ্টীয় জগতের অন্তর্গত ইংলণ্ডে ও ইংরেজী ভাষাতে জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের প্রধান প্রধান গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা ইংরেজ ও খৃষ্টিয়ানদের গৌরবের বিষয়। ইহার ফলে ইংরেজী সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে, ইংরেজের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সংকীর্ণ-সীমায় আবদ্ধ না থাকিবার উপায় হইয়াছে, এবং ইংরেজী-জানা অন্যজাতির যে কোন লোকের কাছে জগতের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্য এখনও ইংরেজী সাহিত্যের সহিত তুলনায় যোগ্য না হইলেও, সুখের বিষয়, বাংলাতেও ক্রমে ক্রমে নানাধর্ম্মের ধর্ম্মপুস্তক-সকল অনুবাদিত হইতেছে। শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার কর্ম্মজীবন পঞ্জাবে যাপন করিয়াছেন। তিনি তথাকার ভাষা জানেন। তাঁহার সেবাপরায়ণতা ও ভগবদ্ভক্তিও তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদের যোগ্যতা দিয়াছে। অনেক শিখ ভক্ত ও জ্ঞানীর সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। শিখদিগের অন্যতম ধর্ম্মগ্রন্থ "জপজী" অনুবাদ করিয়া তিনি বাঙালীর উপকার করিয়াছেন। ইহা ধর্ম্মপিপাসু ও ধর্ম্মবিষয়ে জিজ্ঞাসু লোকদের কাজে লাগিবে। ইহাতে মূল, টীকা, ভাষ্য, ভাবানুবাদ, এবং শেষে অনুবাদকের লেখা "জপজী-সার" আছে।

বিধি-নির্ব্বন্ধ—কালোবরণ ঘোষ। ১৭৬ নং রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া। মূল্য একটাকা।

সচিত্র সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাস হিসাবে বইখানির প্রশংসা করা শক্ত; কারণ সমস্ত বইখানির মধ্যে এমন একটিও মানুষ পাওয়া যায় না, যাহার টানে আগাগোড়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। কৌতূহল উদ্রেক করিবার মত সমস্যা কি ঘটনার সমাবেশও নাই। নায়ক-নায়িকার আসন্ন বিচ্ছেদে বেদনা কিম্বা আকস্মিক মিলনে আনন্দ জাগিয়া উঠে না। উপন্যাসের নায়িকার নাম 'সবিতা'। ইহার অর্থ কিন্তু সূর্য্য। সবিতার দাদা, নায়ক অমলেন্দুর প্রথম পরিচয় পাইয়াই, ভগিনীর নানা গুণ ও তাহার পারিতোষিক-সকল তাঁহাকে দেখাইতে ব্যস্ত। সুশিক্ষিত যুবকের পক্ষে কাজটা অদ্ভুত। অমলের মা সর্ব্বমঙ্গলার পুত্রের বিবাহে আপত্তি করা এবং হঠাৎ মত দেওয়া, দুটোর একটা কাজেও কোনো বিশেষত্ব ফোটে নাই। মোটের উপর ব্যাপারটা একটুও জমাট বাঁধে নাই। পুস্তকে ছাপার ভুল ও বানান ভুল অনেক। 'অভিমান-স্বর' 'সান্ত্বনা-স্বর' প্রভৃতি কথাগুলির ব্যবহার দেখা যায় না। সমাসবহুল ভারী ভারী শব্দও প্রায়ই বইটিতে মেলে। গ্রন্থকারের পণপ্রথা নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ, প্রভৃতি সমাজসংস্কারের দিকে ঝোঁক আছে। বইটির কাগজ, রঙ্গীন কালী, প্রভৃতি বাহ্যদৃশ্য ভাল।

হাতে চাঁদ কপালে সূয্যি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রায় এম্ সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ইহা গল্পের বই, শিশুদের জন্য লিখিত। ইহাতে ছয়টি উপকথা আছে। সব কয়েকটিরই ভাষা খুব সোজা। তবে গোড়ার দিকে মাঝে মাঝে প্রাকৃত ও "সাধু" বাংলার মিশ্রণে পড়িতে পড়িতে বাধা পাইতে হয়। একই কথার দুই রকম বানান একই গল্পের মধ্যে আছে। ছাপার ভুল ও বানান ভুলও কিছু কিছু আছে। ভাষার আড়ষ্ট ভাব মাঝে মাঝে থাকিলেও বইটির ভাষা শিশুদের উপযোগী। কটমট শব্দ ও লম্বা-চওড়া সমাস খুঁজিলেও পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় উপকথাটির নামে বইখানির নামকরণ হইয়াছে; সেটি প্রথম স্থান পাইলেই বোধ হয় মানানসই হইত। বইখানির মলাটে একখানি ও ভিতরে তিনখানি ছবি আছে। বাংলা উপকথার ধরাবাঁধা গতের উপর কিছু কিছু নূতন কল্পনার আমদানীও এই বইখানিতে দেখা যায়। বইটির বাঁধাই ভাল; অক্ষরগুলিও বড় বড়। বর্ণনা এক এক জায়গায় বেশ ছবির মত হইয়াছে। মোটের উপর বলিতে গেলে যাহাদের জন্য বই লেখা তাহারা ইহা পাইলে খুসী হইবে। আজকাল শিশু সাহিত্যের নামে বিস্তর কিম্ভূতকিমাকার পণ্যের প্রচার দেখা যায়; এ বইখানি যে সে দলভুক্ত নয় ইহা আনন্দের বিষয়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আকাশ-বাসরে

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে
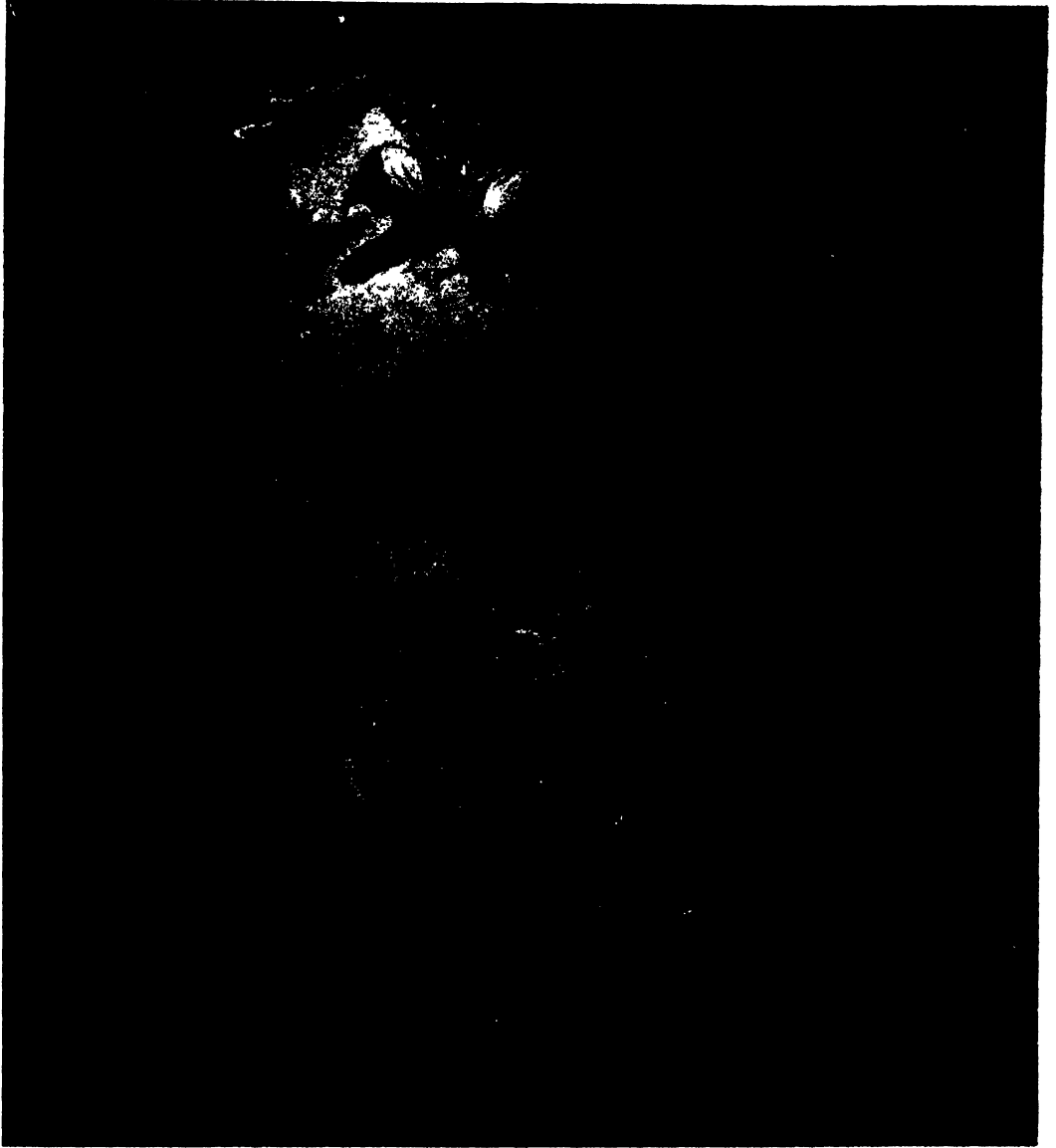
প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।"

১৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ ১৩২৫

৪র্থ সংখ্যা

আসল

বয়স ছিল আট,
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ ।
জান্‌লা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্জেদের বাড়ীর পাশে
একটুখানি পোড়ো জমি, শুক্‌নো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মত ।
পাড়ার আবর্জ্জনা যত
ঐখানেতেই উঠ্‌চে জমে ;
একধারেতে ক্রমে
পাহাড়-সমান উঁচু হল প্রতিবেশীর রান্নাঘরের ছাই ;
গোটা-কয়েক আকন্দ-গাছ, আর কোনো গাছ নাই ;
দশ-বারোটা শালিখ-পাখী
তুমুল ঝগ্‌ড়া বাধিয়ে দিয়ে কর্‌ত ডাকাডাকি ;
দুপুর বেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে
কি যে প্রশ্ন হাঁক্‌ত শূন্যে কিসের কৌতূহলে !

পাড়ার মধ্যে ঐ জমিটাই কোনো কাজের নয় ;
সবার যাতে নাই প্রয়োজন লক্ষ্মীছাড়ার তাই ছিল সঞ্চয় ;

তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুক্‌রো হাঁড়ির কানা,
অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা,
ফুটো এনামেলের গেলাস, থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন,
মড়্‌চে-পড়া টিনের লণ্ঠন,
সিগারেটের শূন্য বাক্‌স, খোলা চিঠির খাম,
অ-দর্‌কারের মুক্তি হোথায়, অনাদরের অমর স্বর্গধাম।

তখন আমার বয়স ছিল আট,
কর্‌তে হত ভূবৃত্তান্ত পাঠ।
পড়ার ঘরের দেয়ালে চার পাশে
ম্যাপ্‌গুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ কর্‌ত নীরব পরিহাসে;
পাহাড়গুলো মরে'-যাওয়া সুঁয়োপোকার মত,
নদীগুলো যত
অচল রেখার মিথ্যা কথায় আবাক্ হয়ে রইত থতমত,
সাগরগুলো ফাঁকা,
দেশগুলো সব জীবনশূন্য কালো-আখর-আঁকা।
হাঁপিয়ে উঠ্‌ত পরাণ আমার ধরণীর এই শিকল-রেখার রূপে,—
আমি চুপে চুপে
মেঝের পরে বসে যেতেম ঐ জান্‌লার পাশে।
ঐ যেখানে শুক্‌নো জমি শুক্‌নো শীর্ণ ঘাসে
পড়ে আছে এলোগেলো, তাকিয়ে ওরি পানে
কার সাথে মোর মনের কথা চল্‌ত কানে কানে।
ঐ যেখানে ছাইয়ের গাদা আছে
বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলেটির কাছে।
মাথার পরে উদার নীলাঞ্চল
সোনার আভায় কর্‌ত ঝলমল।
সাত সমুদ্র তেরো নদীর সুদূর পারের বাণী
আমার কাছে দিতেন আনি।
ম্যাপের সঙ্গে হত না তার মিল,
বইয়ের সঙ্গে ঐক্য তাহার ছিল না এক তিল।
তার চেহারা নয় ত অমন মস্ত ফাঁকা
আঁচড়-কাটা আখর-আঁকা,—

নয় সে ত কোন্ মাইল-মাপা বিশ্ব,
অসীম যে তার দৃশ্য ; আবার অসীম সে অদৃশ্য ।

এখন আমার বয়স হল ষাট,—
গুরুতর কাজের ঝঞ্ঝাট ।
পাগল করে দিল পলিটিক্‌সে,
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা স্বপ্ন আজকে-নাগাদ হয়নি জানা ঠিক সে ;
ইতিহাসের নজির টেনে, সোজা
একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্ম্মফলের বোঝা,
সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব
মাসিকপত্রে প্রবন্ধ উন্মত্ত ।
যত লিখ্‌চি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য ।
কথায় কেবল কথারি ফল ফলে,
পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে পুঁথি কেবল মাত্র পুঁথিই বেড়ে চলে ।

আজ আমার এই ষাট বছরের বয়সকালে
পুঁথির সৃষ্টি জগৎটার এই বন্দীশালে
হাঁপিয়ে উঠ্‌লে প্রাণ
পালিয়ে যাবার একটি আছে স্থান ।
সেই মহেশের পাশে
পাড়ায় যারে পাগল বলে হাসে ;
পাছে পাছে
ছেলেগুলো সঙ্গে যে তার লেগেই আছে ।
তাদের কলরবে
নানান্ উপদ্রবে
এক মুহূর্ত্ত পায় না শান্তি,
তবু তাহার নাই কিছুতেই ক্লান্তি ।
বেগার-খাটা কাজ
তারি ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কেউ মানে না লাজ ।
সকাল বেলায় ধরে ভজন গলা ছেড়ে,
যতই সে গায়, বেসুর ততই চলে বেড়ে ।

তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা কর্‌লে এসে
মহেশ বলে হেসে
"আমার এ গান শোনাই যাঁরে,
বেসুর শুনে হাসেন তিনি, বুক ভরে সেই হাসির পুরস্কারে।
তিনি জানেন, সুর রয়েছে প্রাণের গভীর তলায়,
বেসুর কেবল পাগলের এই গলায়।"
সকল প্রয়োজনের বাহির সৃষ্টিছাড়া,
তার ঘরে তাই সকলে পায় সাড়া।
একটা রোগা কুকুর ছিল, নাম ছিল তার ভুতো,
একদা কার ঘরের দাওয়ায় ঢুকেছিল অনাহূত,—
মারের চোটে জরজর
পথের ধারে পড়ে ছিল মরমর,
খোঁড়া কুকুরটারে
বাঁচিয়ে তুলে রাখ্‌লে মহেশ আপন ঘরের দ্বারে।
আরেকটি তার পোষ্য ছিল, ডাকনাম তার সুর্ম্মি,
কেউ জানে না জাত যে কি তার, মুসলমান কি কাহার্ কিম্বা কুর্ম্মি।
সে বছরে প্রয়াগেতে কুম্ভমেলায় নেয়ে
ফিরে আস্‌তে পথে দেখে চার বছরের মেয়ে
কেঁদে বেড়ায় বেলা দুপুর দুটোয়।
মা নাকি তার ওলাউঠোয়
মরেছে সেই সকাল বেলায়;
মেয়েটি তাই বিষম ভিড়ের ঠেলায়
পাক খেয়ে সে বেড়াচ্ছিল ভয়েই ভেবাচেকা,—
মহেশকে যেই দেখা
কি ভেবে যে হাত বাড়ালো জানি না কোন্ ভুলে;
অম্‌নি পাগল নিল তারে কাঁধের পরে তুলে,
ভোলানাথের জটায় যেন ধুতুরোফুলের কুঁড়ি:
সে অব্‌ধি তার ঘরের কোণটি জুড়ি
সুর্ম্মি আছে ঐ পাগলের পাগ্‌লামির এক স্বচ্ছ শীতল ধারা
হিমালয়ে নির্ঝরিণীর পারা।
এখন তাহার বয়স হবে দশ,
খেতে শুতে অষ্টপ্রহর মহেশ তারি বশ।

আছে পাগল ঐ মেয়েটির খেলার পুতুল হয়ে
যত্ন-সেবার অত্যাচারটা সয়ে।
সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার থেকে ফিরে'
যেম্‌নি মহেশ ঘরের মধ্যে ঢোকে ধীরে
পথ-হারানো মেয়ের বুকে আজো যেন জাগায় ব্যাকুলতা—
বুকের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে' গলা ধরে' আবোল-তাবোল কথা।
এই আদরের প্রথম বানের টান
হলে অবসান
ওদের বাসায় আমি যেতেম রাতে।
সামান্য কোন্‌ কথা হত এই পাগলের সাথে।
নাইক পুঁথি, নাইক ছবি, নাই কোনো আস্‌বাব,
চিরকালের মানুষ যিনি ঐ ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।
তারার মত আপন আলো নিয়ে বুকের তলে—
যে মানুষটি যুগ হতে যুগান্তরে চলে,
প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মত সীমাহীনের হাতে
সরল সুরে বাজে দিনে রাতে,
যাঁর চরণের স্পর্শে
ধূলায় ধূলায় বসুন্ধরা উঠ্‌ল কেঁপে হর্ষে,—
আমি যেন দেখ্‌তে পেতেম তাঁরে
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে।
রাজনীতি আর সমাজনীতি পুঁথির যত বুলি
যেতেম সবই ভুলি।
ভুলে যেতেম রাজার কারা মস্ত বড় প্রতিনিধি
বালুর পরে রেখার মত গড়্‌চে রাজ্য, লিখ্‌চে বিধানবিধি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

আমাদের (?) বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানটায় বিশ্বটা এমনি করে' হাত-পা-ছড়িয়ে সমস্ত জায়গা জুড়ে পড়ে' আছে যে সেখানে বিদ্যা-বেচারী একটু দাঁড়াবারও স্থান পাচ্ছে না। তরুণমতি শিশুরা যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়িতে প্রবেশ করে, তখন থেকে তাদের তরুণ মনের ওপরে বিশ্বের বোঝাটা এম্‌নি করে' চেপে বস্‌তে থাকে যে তাতে করে' তাদের কাঁচা মন ও দেহ হয় বৈঁকৃত থাকে, নয় ইঁচড়ে পাক্‌তে থাকে। তাই যখন তারা সেখানে পনর ষোল বছর কাটিয়ে একুশ বাইশ বছর বয়সে এসে রাজার পথে দাঁড়ায়, তখন আমরা বেশ দেখ্‌তে পাই যে

ডিগ্রি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনুষ্যত্বটাও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আর এইটে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ।

সবাই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয় অনেক বিষয়, কিন্তু আমরা শিখি মাত্র দুটো জিনিস। আমরা তিন চা'টে ভাষা, ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য গণিত, হরেক রকমের "logy", ফিজিক্স কেমিষ্ট্রী ফিলজফি ইত্যাদি ইত্যাদি করে' অনেক বিষয় সেখানে অধ্যয়ন করি, কিন্তু তাতে আমাদের মনের জোরও বাড়ে না, বুদ্ধির জোরও বাড়ে না—জোর বাড়ে আর দুটি জিনিসের— দুঃখের বিষয় দুটোই নিতান্তই দৈহিক—একটি হচ্ছে আঙুলের, আর অপরটি হচ্ছে জিহ্বার। অর্থাৎ আমরা কেউ হই লিখনপটু আর কেউ হই কথনপটু। তাই আমরা যখন স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, তখন এই যে দুটি জিনিস আমরা শিখেছি তারি চর্চ্চায় মন দি। তাই আমরা কেউ হই কেরানী আর কেউ হই উকিল ব্যারিষ্টার। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য ডাক্তার হন, কিন্তু সেটা আমাদের জাতীয় জীবনের একটা প্রক্ষিপ্ত অংশ বলেই ধর্তে হবে; আর আমাদের মধ্যে যে কেউ কেউ কচিৎ কদাচিৎ ব্যবসা বাণিজ্যে মন দেন সেটা একেবারেই নিপাতনে সিদ্ধ; আবার তার চাইতেও কচিৎ কদাচিৎ যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সর্ব্বস্বান্ত হন না সেটা নিতান্তই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" বলে—নইলে তার আর কোন কারণ নেই।

অনেকে বিরক্ত হয়ে মনে মনে বল্বেন যে বিদ্যাশিক্ষার কথায় ওকালতি ব্যারিষ্টারি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তুলি কেন? Art for art's sake—knowledge for the sake of knowledge—এ-সব কথা শুনতে শুনতে ত এক-রকম শাস্ত্রবাক্যের মতোই দাঁড়িয়ে গেছে, তবুও জ্ঞানার্জ্জনের আলোচনায় অর্থ উপার্জ্জনের পন্থার কথা টেনে এনে দুর্জ্জনতার পরিচয় দেই কেন? কিন্তু পাঠক, এর একটু মানে আছে। বল্ছি—শুনুন।

পূর্ব্বপুরুষের আমল থেকে আমাদের একটা অভ্যাস জন্মে গেছে—সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা—অর্থাৎ আমরা সবাই বাঁচ্তে চাই; কেউই মর্তে যেতে চাইনে। এই সনাতন ভারতবর্ষে অনেক অনেক আধ্যাত্মিকের মতে এটা একটা নাকি মস্ত কু-অভ্যাস। কিন্তু এ অভ্যাসটা কু না সু সেটা আমরা এখানে বিচার কর্তে বস্ব না। আমরা শুধুই দেখ্তে পাচ্ছি যে এ অভ্যাসটা সত্য, খুবই পুরাতন, সুতরাং চাই কি সনাতন হবারও আটক নেই। মানুষের বাঁচাই দর্কার প্রথমে, তারপর তার আর যা কিছু—তার জ্ঞান বিজ্ঞান, ধন ঐশ্বর্য্য, মহত্ত্ব গৌরব সব। সুতরাং এটা সবাই মান্বেন যে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাটাই আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ। আর সেই জন্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-ফের্তা যুবকবৃন্দের সম্মুখে প্রথম যে কাজটা পড়ে সেটা হচ্ছে এই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। আর তাঁরা এ কাজটা কে কি রকমে হাসিল্ করেন তা দেখ্লেই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি হয়ে বেরিয়েছেন তার একটা হিসেব বেশ পাওয়া যায়।

এই যে আমাদের অধিকাংশেরই কেরানীগিরি ওকালতি বা ব্যারিষ্টারির দিকে ঝোঁক তার একটা ভিতরের কারণ আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, এই দুটি ব্যবসায়ে আমাদের কিছু গড়ে' নিতে হয় না—কিছু তৈরী করে' তুল্তে হয় না। এ-দুটোর রাস্তাই একেবারে পাকা সড়ক—আমাদের পিতৃপিতামহের আমলেও ছিল আবার আমাদের পৌত্র প্রপৌত্রদের আমলেও থাক্বে—এখনও যেমন তখনও তেমন—রামেরও আরামলভ্য শ্যামেরও অনায়াসসেব্য। শুধু কেবল একবার এ-রাস্তা ধর্তে পার্লে হয়—তারপর এখানে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার কোন দর্কার নেই, নিজের মাথা খাটানোর কোন প্রয়োজন নেই, নিজের initiativeএর কোনই তোয়াক্কা রাখ্তে হয় না;—অর্থাৎ মানুষের যা থাক্লে মনুষ্যত্ব তার কোনই দরকার নেই—কেন না তার জোগান দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে ডিগ্রির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্বও বিক্রি হয়ে যায়। তাই আমরা যখন "মাষ্টার অব আর্টস"এর ডিপ্লোমাখানি বুকপকেটে ফেলে সেনেট-হল থেকে বেরিয়ে এসে গোলদিঘিতে একটু হাওয়া খেতে বসি, তখন অপর পারে সিটি কলেজের মাথার উপরে দু'একটি সদ্য-ফোটা সান্ধ্য তারার পানে চেয়ে

চেয়ে আমাদের পরিষ্কার মালুম হয়ে যায় যে art for art's sake একটা কতবড় সত্য কথা।

সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে মানুষ করে তুল্‌তে পারুছে না। আর এই অভিযোগটা প্রথমে দাখিল করলে আর-কোন অভিযোগ আন্‌বার দর্‌কারই হয় না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোঠা বাড়ীর অন্ত নেই, বিদ্বান অধ্যাপকের সংখ্যা নেই, অধ্যয়ন অধ্যাপনার সীমা নেই, সাজ সরঞ্জামের ইয়ত্তা নেই, কিন্তু আসল জিনিস যেটা শুধু সেইটে হয়ে উঠ্‌ছে না—অর্থাৎ এখানে মানুষ মানুষ হয়ে উঠ্‌ছে না। গল্প শুনেছি, সেকালের পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা এই বলে বড়াই করতেন যে তাঁরা কত গাধা পিটিয়ে মানুষ করেছেন; কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গাধা ত দূরের কথা, মানুষই মানুষ হ'য়ে বেরুচ্ছে না;—বেরুচ্ছে হয়ে—অতিমানুষ, নয়—অমানুষ। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ভীষণ রকমের গলদ কোথাও আছে—আর সেটা বাইরে নয়, এর detailএ নয়, এর উপকরণে অধিকরণে নয়—সেটা এর অত্যন্ত অন্তরে—নইলে বাইরের চুন-সুর্‌কির এতবড় ক্ষমতা নেই যে মানুষকে অমানুষ করে' তুল্‌তে পারে—বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে "অচলায়তনে"ও পঞ্চকের জন্ম হয়। সুতরাং আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়াটি আকাশে ঠিক সোজা হয়ে উঠেছে কি না তা দেখ্‌বার আমাদের ততটা দর্‌কার নেই—আমাদের দেখ্‌তে হবে যে এর ভিত্তিটা কোন্ সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম—একটা বিশিষ্ট সত্য আছে। যদি সেই অনুষ্ঠান তার সেই বিশিষ্ট ধর্ম্ম—বিশিষ্ট সত্যের ওপরে স্থাপিত না হয়, তবে তা কিছুতেই মানুষকে সফলতা দান করতে পারে না। কারণ সত্যেই সফলতা নিহিত—অন্যত্র নয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে যদিও সেটা আমরা অনেকেই মানি না বা জানি না। তাই আমরা কাব্য সমালোচনার কালে টিকি দুলিয়ে যোগশাস্ত্রের সূত্র আওড়াই—আর সাহিত্য বিচারের কালে সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতামতের পিণ্ডির ব্যবস্থা করি।

(২)

বিদ্যা দান কর্‌বার অধিকার ও সামর্থ্য আছে শুধু একজনের—যিনি ব্রাহ্মণ। কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দেউড়ীর দেবতা রঘুবীর তেওয়ারী বা রন্ধনকর্ম্মের ঋষি চক্রধর মিশ্র প্রমুখ ব্রাহ্মণের কথা বল্‌ছি। আমি বল্‌ছি তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রাহ্মণ পৈতের জোরে নয়, প্রকৃতির জোরে। কারণ জ্ঞানের চর্চ্চা জ্ঞানের আলোচনাতেই ব্রাহ্মণের আনন্দ। আর আনন্দের ভিতর দিয়ে যা দত্ত হয় সেই দানই মঙ্গলময়—সেইটে সবার চাইতে সোজা গ্রহীতার পক্ষে সত্য করে পাওয়া। ছাত্রের দিক থেকে ত কিছু শেখা অনেক সময়ই কষ্টকর—তারপর শিক্ষকের দিক থেকেও যদি সে-শিক্ষাটা নিরানন্দের ভিতর দিয়েই ছাত্রের কাছে এসে পৌঁছে তবে শিক্ষক ও ছাত্র দু'জনে সারাজীবন খালি অকৃতার্থতার ভিতর দিয়েই কাটিয়ে পরস্পর পরস্পরকে শুধু ঘৃণা কর্‌তেই শিখ্‌বে—তাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ক্ষতি।

সুতরাং যে বিদ্যার মন্দির এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ওপরে দাঁড়িয়ে না আছে সে-মন্দিরে জ্ঞানের সত্য-বিগ্রহ আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌বে না। আর যেখানে সত্য-দেবতা আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে না পেরেছে সেখান থেকে মঙ্গলের আশা করা চিরকাল ব্যর্থই হবে। কেননা সত্য ছাড়া মঙ্গল নেই। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাগুলো খাটে। কারণ আমাদের যে বিশ্ব-বিদ্যালয় তা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ওপরে দাঁড়িয়ে নেই—তার ভিত্তি হচ্ছে বৈশ্যবুদ্ধির ওপরে। আর এইটেই হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল গলদ। এইটে আগে দূর না হলে, আর যা কিছু পরিবর্ত্তন হোক্ না কেন, তাতে একই ফল ফল্‌বে, না হয় একটু উনিশ আর বিশ।

বৈশ্যের ধর্ম্ম নয় কোন কিছু নিঃশেষ করে' দান করা। তবে প্রত্যেক দানের পিছনে পিছনে তার ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির একটা হিসেব থাক্‌বেই থাক্‌বে—তা সে কথায় যতই উদার হোক না কেন। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়টা যে বৈশ্যবুদ্ধির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে-সঙ্গে এমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে সেটা প্রমাণ কর্‌তে

আর বেশী বিচারতর্কের আবশ্যক করে না। এখন যতদিন এই বৈশ্যবুদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি থেকে না খস্‌বে ততদিন তার দেয়ালে যতই চুনকাম করা হোক্ না কেন তাতে ছাত্রজীবন একটুও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে না।

পরাধীন জাতির দুঃখের অন্ত নেই। তার মধ্যে সবার চাইতে বড় দুঃখ হচ্ছে এই যে সে কারও কাছেই সম্মানের দাবী কর্‌তে পারে না। সে যখন অপরের কাছ থেকে কিছু পায় সেটাকে সে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে, ভালবাসার ভিতর দিয়ে পায় না; সেটাকে সে পায় অবজ্ঞার ভিতর দিয়ে—বড় জোর কৃপার ভিতর দিয়ে। আর যে-দান অবজ্ঞার দান, সে-দান অমৃত নয়—সে-দান বিষ। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দত্ত জ্ঞান মন্থন করে' অমৃত উঠ্‌ছে না—উঠ্‌ছে বিষ। এই বিষে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর দেহ জর্জ্জরিত। তাই যৌবনের প্রারম্ভে যখন তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের চোখে মুখে আমরা দেখ্‌তে পাই মৃত্যুর নিরানন্দময় ছায়া,—আর বাকি একজন বেরিয়ে আসে নীলকণ্ঠ হয়ে রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে। সুতরাং আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কি শিখি ও কতখানি শিখি সেটা ততবড় কথা নয় যতবড় কথা হচ্ছে কার কাছে শিখি ও কেমন করে' শিখি।

এই ডেমোক্রেসির যুগে কোন কিছুই কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়ে উঠ্‌ছে না। যে-কোন অনুষ্ঠানের পিছনেই তাই আজকাল কোন একটা বোর্ড বা কাউন্সিল বা কমিটি কর্ম্মকর্ত্তা হয়ে রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা আত্মা আছে, তেমনি এই যে বোর্ড কাউন্সিল বা কমিটি—অর্থাৎ মানুষের সমষ্টিগত অবস্থা—তারও তেম্‌নি একটা আত্মা আছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌রা যখন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রের British character-এর উল্লেখ করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে ঐ শাসনযন্ত্রের পিছনে যে একটা সমষ্টিগত মানুষের সত্তা আছে তারই কথা বলে। এটাকেই আমি বল্‌ছি সমষ্টির আত্মা। এই হিসেবে যেমন আমাদের গভর্ণমেণ্টের একটা আত্মা আছে তেম্‌নি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটা আত্মা আছে। এখন এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মা—এই আত্মার মধ্যে সেই জিনিসটি একেবারেই নেই যে-জিনিসটি মানুষকে মানুষ করে তুল্‌বার আসল মন্ত্র—সেটি হচ্ছে ছাত্রমণ্ডলীর জন্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহানুভূতি ও প্রচুর পরিমাণে ভালবাসা। এই ভালবাসার অভাব যতদিন থাক্‌বে ততদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমণ্ডলী মানুষ হয়ে উঠ্‌তে কিছুতেই পার্‌বে না। কারণ স্নেহ ভালবাসা শিশুর পক্ষে যেমন দর্‌কার- বালক কিশোর যুবক সবার পক্ষেই তেমনি প্রয়োজনীয়। একমাত্র ভালবাসার বাতাসেই মানুষ-শতদলটি পরিপূর্ণ রূপে, পরিপূর্ণ গুণে ফুটে উঠ্‌তে পারে।

সুতরাং যত উঁচু করেই হোষ্টেল গড়া হোক্ না কেন, যত নীচু হয়েই তার ছাদে ছাদে ইলেকট্রিক ফ্যান্ ঝুলুক না কেন, পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা যত বাড়িয়ে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়াই হোক্ না কেন, যত ইংরেজী-জানা সংস্কৃত পণ্ডিত বা সংস্কৃত-জানা ইংরেজী মাষ্টার নিযুক্ত করা যাক না কেন, যতদিন গোড়ায় ঐ মন্ত্রটির অভাব থাক্‌বে, ততদিন আমাদের পাঠ্যাবস্থা কোন দিন সজীব হয়ে উঠে আমাদের জীবন দান কর্‌তে পার্‌বে না। আর ঐ মন্ত্রটির চিরদিনই অভাব থাক্‌বে যতদিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার বৈশ্য-আত্মা নবজন্ম লাভ করে' ব্রাহ্মণের আত্মায় পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যেহেতু এ জগতে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান সাধারণ নিয়ম নয় এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে বসে' যাঁরা সুতো টান্‌ছেন তাঁরাও অসাধারণ নন, সুতরাং এই বৈশ্য-আত্মার ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা অতি সুদূর-পরাহত। সুতরাং বাকি রইল শুধু এক পন্থা—সেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষার ভার বিল্‌কুল নেওয়া আমাদের নিজের হাতে। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজের হাতে নিয়ে আমরা যে ভুলভ্রান্তিই করি না কেন তার পিছনে এমন একটা জিনিস থাক্‌বে যে তা সমস্ত ভুলভ্রান্তির ক্ষতিপূরণ করেও অনেকখানি উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। সে জিনিসটা হচ্ছে—আমাদের আপনার জনের জন্যে দরদ, আমাদের উত্তরবংশীয়দের জন্যে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ ও ভালবাসা।

(৩)

বছর বারো আগে এই বাংলাদেশে আমরা একবার আমাদের শিক্ষার ভার বাস্তবিকই আমাদের নিজের হাতে

নিয়েছিলেম। কিন্তু তা সত্য হয়ে উঠ্‌ল না—হয়ে উঠ্‌বার কথাও নয়। কারণ আমরা সেদিন যে বিদ্যার মন্দির খাড়া করে তুলেছিলেম তার আবাহন বীণাপাণির বীণার তানে হয় নি—তার উদ্বোধন হয়েছিল রুদ্রের ডমরুর ডিমি ডিমি নাদে। আর রুদ্রদেব যাই হন,—এটা আমরা সবাই জানি—যে তিনি জ্ঞানের দেবতা নন।

উত্তেজনা আর উৎসাহ যে এক বস্তু নয় এটা মান্‌বার মতো মন আর বুঝ্‌বার মতো বুদ্ধি আমাদের অনেকেরই নেই। কিন্তু তাই বলে' উৎসাহ আর উত্তেজনা এক হয়ে যায় না। এর প্রভেদ যা তা থেকেই যায়—আর এর ফল যা তা পেয়েই থাকে।

উত্তেজনাটা সাময়িক কোন দুষ্টসাধ্য বা কষ্টসাধ্য কাজ কর্‌বার পক্ষে যতই কার্য্যকরী হোক না কেন, কোন কিছু স্থায়ী গড়্‌বার পক্ষে এর মতো বাধা আর কিছু নেই। যে জিনিসটা এক দিনের নয়, দু'দিনের নয়—কিন্তু চিরদিনের করে রাখ্‌তে চাই, সেটা চিরদিনের হয়ে থাক্‌তে পারে শুধু তখনই যখন আমার অন্তর-দেবতার একটা গভীর সত্যের ভিতরে তার জন্ম হয়। মানুষের অন্তর-দেবতার সে সত্য, সেই সত্যই স্থিতধী—শক্তিমান—সৎ। মানুষের উত্তেজনা হচ্ছে তার স্নায়বিক একটা ওলোট পালোট। এই ওলোট পালোটের মধ্যে মানুষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ যে তার অন্তরের সত্যের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌তে পারে না। সুতরাং তখন তার পদে পদে সম্ভাবনা সব জিনিসকে একটা বিরাট মিথ্যার ওপরে গড়ে তোলা। আর মিথ্যার ওপরে যা গড়া তার ধ্বজা যত উঁচু করেই খাড়া করা যাক না কেন সে ধ্বজা একদিন-না-একদিন ধূলোতে লুটবেই।

আমরা যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ গড়ে তুলেছিলেম সেটা উত্তেজনার ভিতর দিয়ে। উত্তেজনার দাপটে ভিতরের সত্যটা আমাদের চোখেই পড়ে নি। জাতীয় শিক্ষাকে আমরা সেদিন শিক্ষার দিক থেকে মোটেই দেখিনি—দেখেছিলেম সেটাকে পলিটিক্সের দিক থেকে। গভর্ণমেন্টের স্কুল কলেজ থেকে যে আমরা মানুষ হয়ে বেরুচ্ছি না সে অভাবটা আমরা সেদিন মোটেও প্রাণ দিয়ে অনুভব করিনি; সেখান থেকে যে পলিটিক্স করা চল্‌বে না—এইটে ছিল আমাদের জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের সত্যময় ভিত্তিটা। রেষারেষি করে' আমরা সেদিন যেটা গড়ে' তুল্‌লেম সেটা অবশেষে হাসাহাসিতেই শেষ হয়ে গেল। দ্বেষের ওপরে ভিত্তি করে আমরা যেটা খাড়া করেছিলেম সেটা স্থায়ী হয়ে আমাদের সফলতা দান কর্‌তে পার্‌ল না। কৃতকার্য্য হবার যে রাস্তা- সেটা পরের ওপরে বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে নেই, সেটা আছে আপন-জনের প্রতি ভালবাসার ভিতর দিয়ে। পরের উপরে দ্বেষে হয় মানুষের শক্তির বাজে খরচ; এক ভালবাসাই মানুষকে সক্ষম করে গুরুভার বহন কর্‌তে।

শিক্ষা-ব্যাপারের ভিতরের আসল সত্যটা আমাদের অন্তরে সেদিন সত্য হয়ে ওঠেনি বলে', আমরা যে গভর্ণমেন্টের স্কুল কলেজ থেকে প্রকৃত মানুষ হয়ে বেরুচ্ছি না—এই অভাবটা দুঃখের সঙ্গে বেদনার সঙ্গে আপনার অন্তরে অন্তরে গভীর করে' অনুভব কর্‌তে পারিনি বলে' সেদিন আমাদের মনের সাম্‌নে সামান্য সামান্য সমস্যা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাধার মূর্ত্তি ধরে' হিমাদ্রির মতো দাঁড়িয়ে গেল। প্রশ্ন উঠ্‌ল—আমাদের গড়া স্কুল-কলেজে যদি ছেলে পাঠাই তবে ত তাদের মধ্যে হাজার-করা দশজনের যে গভর্ণমেন্টের দপ্তরখানায় কুড়ি ত্রিশ টাকা মাইনের চাক্‌রী পাবার আশা আছে তা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের উত্তেজনা কমার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের বাধাটা এত বর্দ্ধিতায়তন হয়ে উঠ্‌ল যে তার পাশে আমাদের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদটা একেবারে ছোট হয়ে গেল। কিন্তু সেদিন যদি আমাদের অন্তরে নিশ্চিত মনুষ্যত্ব হারাণোর দুঃখ অনিশ্চিত কুড়ি টাকা হারাণোর দুঃখের চাইতে বেশী সত্য হয়ে উঠ্‌ত, তবে আমরা সহজেই এ কথাটা মনে কর্‌তে পার্‌তেম যে মানুষ যদি প্রকৃত মানুষই হয়ে ওঠে তবে মাসিক কুড়ি টাকা উপার্জ্জন ত অতি তুচ্ছ কথা, তার চাইতে অনেক বড় জিনিস সে উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে—নিজের জন্যে বা পরের জন্যে। কারণ মানুষের মনের যুক্তিতর্ক তার অন্তরের যে সত্য সেই সত্যেরই পিছনে পিছনে চলে—সেই সত্যেরই মনরাখা ও মানরাখা কথা কয়ে কয়ে। আর এইটে ছিল মূল কারণ যে জন্যে আমরা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ সেদিন খাড়া করে তুলে তা দাঁড় করিয়ে রাখ্‌তে পারলেম না।

বারো বছর আগে আমরা বাংলাদেশে যেটা গড়্‌তে গিয়ে ফেল হয়ে গেলেম, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার আয়োজন চল্‌ছে। এই আয়োজনের সম্বন্ধে সবার চাইতে একটা আরামের কথা এই যে এর পিছনে কোন উত্তেজনা কর্ম্মের দেবতা হয়ে বসে' নেই। সুতরাং এই অনুষ্ঠানের সফলতার আশা আজ আমরা অনেক বেশী করে কর্‌তে পারি। কিন্তু তবুও আজকার বিদ্যামন্দিরও যদি দেশবাসীর হৃদয়ের ওপরে, তার অন্তর-দেবতার দুঃখের ওপরে, বেদনার ওপরে গড়ে না ওঠে তবে পরিণামে এও একটা হাস্যজনক ব্যাপারেই পরিণতি লাভ কর্‌বে।

মানুষ বাস্তবিক যা পায় তার চাইতে তার পাবার আশার বন্ধন অনেক বেশী। সুতরাং আজ যদি আমরা দেশবাসীকে অঙ্ক কসে একথা বুঝিয়েও দি যে তাদের ছেলেদের মধ্যে শতকরা একজনও গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় প্রবেশ কর্‌তে পারে না, তবে তাতে যে বড় বিশেষ ফল হবে তা বোধ হয় না; যতদিন না তাদের মধ্যে ঐ বিশ ত্রিশ টাকার লোভের চাইতে মনুষ্যত্বের লোভ প্রবল হয়ে ওঠে। যতদিন না তাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের মূল্য গভর্ণমেণ্টের ত্রিশ টাকার চাইতে বেশী হয়ে উঠ্‌বে—যতদিন না তারা বুঝ্‌তে শিখ্‌বে যে মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য দেশকালের অতীত, কিন্তু জায়গা-বিশেষের ত্রিশ টাকার মূল্য দেশকাল ও অবস্থার অধীন—যতদিন না তারা উপলব্ধি করে যে মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কর্‌লে তার কোন দিনই সংসারে ফাঁকি পড়্‌বার আশঙ্কা নেই—ততদিন জাতীয় শিক্ষার অনুষ্ঠানকে কিছুতেই তারা বিশ্বাসের চোখে স্নেহের চোখে দেখ্‌তে পার্‌বে না—ফলে জাতীয়-শিক্ষা-যজ্ঞের হোমানল নিভে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান হয়ে থাকবে।

সুতরাং বাহিরের আয়োজনকেই পরম বলে' মনে না করে' ভিতরের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তাও আমাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌তে হবে। আমাদের দেশবাসীর এমন একটা মন গড়ে তুল্‌তে হবে যে-মনে মনুষ্যত্বের প্রতি একটা দুর্দ্ধর্ষ লোভ জন্মে যায়। আর এ-কাজের ভার হচ্ছে সাহিত্যের। কারণ সাহিত্য হচ্ছে একাধারেই যন্ত্র ও মন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে একটা জাতি আপনাকে ব্যক্ত করে—আর এই মন্ত্রের সাহায্যে একটা জাতি আপনাকে গড়ে' তোলে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উদ্যানলতা

(৭)

মা-মরা ছেলে গোপালকে যে দিন বিপিনবাবু বাড়ী এনে হাজির কর্‌লেন সেদিন থেকেই তাঁর স্ত্রী মনোমোহিনী লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটার উপর চটে গেলেন। তাঁর সাজানো গোছানো সংসারে সে অত্যন্তই খাপ্‌ছাড়া হয়ে পড়েছিল। তাঁর ছোট দুটি ছেলে মেয়ে আর স্বামীটিকে নিয়ে তিনি বেশ নির্ব্বিবাদেই ছিলেন; এমন সময় তাঁর অতিরিক্ত দয়ালু স্বামী পীড়িত বন্ধু উমেশকে দেখ্‌তে গিয়ে একরাশ টাকার শ্রাদ্ধ ত করেই এলেন তার উপর একটা মা-বাপ-মরা, ছিঁচকাঁদুনে পাঁচবছরের ছেলে এনে ঘাড়ে ফেলে দিলেন। এই কাণ্ড ঘটানোতে গোপালের চেয়ে বিপিন-বাবুরই দোষ বেশী ছিল, কিন্তু গৃহিণী তাঁর সমস্ত রাগের ধাক্কাটা নির্ব্বিচারে ঐ হতভাগা ছেলেটার ঘাড়ে ফেলেই নিশ্চিন্ত হলেন।

এই বাড়ীটাতে গোপালের অবস্থা হল একটু অদ্ভুত ধরণের। সে ঠিক ঘরের ছেলেও হতে পার্‌ল না অথচ অতিথির স্থানও পেলে না। আলোকলতার মত শূন্যে ঝুলেই তার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল, তার মনটা কোনোখানেই শিকড় গাড়্‌তে পার্‌ল না। মনোমোহিনী নিজের ছেলেকে গোপালের কাছ থেকে খুব সযত্নেই আলাদা করে রাখ্‌তেন এবং নিজেও কখনও তার কাছে ধরা-ছোঁওয়া দিতেন না। বিপিনবাবু গোপালকে বাড়ীতে এনেই বোধ হয় তার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, অন্ততঃ এ বিষয়ে তাঁকে কখনও বিশেষ সজাগ দেখা যেত না। তা-ছাড়া তাঁকে কার্য্যগতিকে বছরের অধিকাংশ সময়ই কল্‌কাতায় কাটাতে হত।

এই গৃহবাসী নির্ব্বাসিত ছেলেটার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল তার কামিনীমাসীর বাড়ী। কামিনীর সঙ্গেই তার যা কিছু সুখ-দুঃখের কথা হত। তবে তাঁর বাড়ীর পথটা গোপালের পক্ষে বিশেষ সুগম ছিল না, কারণ মনোমোহিনী বিধবা কামিনীকে সুনজরে দেখ্‌তেন না। যে পাড়ায় পাড়ায় মুড়ী বেচে দিন কাটায় তার বাড়ীতে কখনও বিপিন দত্তের ঘরের ছেলে যেতে পারে না। না হয় পালিত ছেলেই হল, তা হলেও পরিবারটার ত একটা মানসম্ভ্রম আছে?

পাঁচ-ছটা বছর এমনি করেই কেটে গেল। গোপালের অবস্থার কিছু তারতম্য ঘটেনি। পড়ার বই আর কামিনী-মাসীর লুকানো স্নেহ আশ্রয় করে তার নিরানন্দ দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। পড়াতে যে সে বিপিনবাবুর ছেলে সুবোধের চেয়ে অনেক ভাল ছিল এই সংবাদটাতে অবশ্য তার প্রতি মনোমোহিনীর ভালবাসা কিছুমাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি।

এমন সময় হটাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল। আট-দিনের জ্বরে বিপিনবাবু মারা গেলেন। সংবাদ পাবামাত্র মনোমোহিনীর বাপের বাড়ীর লোক দলবেঁধে এসে উপস্থিত হল, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বাপের বাড়ী যাওয়া স্থির হয়ে গেল। গোপালকে নিয়ে যে কি করা হবে সেটা তাড়াতাড়িতে ঠিক হল না, কিন্তু তাকে যে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না এটা ঠিক করতে খুব বেশী সময়ের দরকার হল না। বাপের বাড়ী পৌছে তিনি যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন এই রকম একটা আশ্বাস দিয়ে যেন নিতান্তই দিনকয়েকের মত তাকে কামিনীর বাড়ী রেখে প্রস্থান করলেন।

তাঁর বাপের বাড়ী পৌছানর সময় অনেক কাল পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মনোমোহিনীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কামিনীর স্নেহ যতখানি ছিল, ক্ষমতা ছিল তার অনেক কম, কাজেই তাঁকে শেষে নিরুপায় হয়ে মনোমোহিনীর বাপের বাড়ীর ঠিকানায় পাড়ার লোককে দিয়ে চিঠি লেখাতে হল। কিছুদিন পরে তার উত্তর এল, কিন্তু তাতে কামিনীর সান্ত্বনালাভের মত কিছু ছিল না। মনোমোহিনীর হয়ে তাঁর ভাই জবাব দিয়েছেন যে, বিপিন-বাবু জীবিতকালে যা কিছু পাগলামি করে গিয়েছেন তার জন্য তিনি একেবারেই দায়ী নন। একে বিধবা বোন এবং ভাগ্নে ভাগ্নী ঘাড়ে এসে পড়েছে, তার উপর যদি বাড়ীতে অনাথ-আশ্রম খুলতে হয়, তা হলে তাঁকে দুদিনেই ঝুলি হাতে করে রাস্তায় বেরতে হবে।

কামিনী পর হলেও মা-বাপ মরা ছেলেটাকে দূর করে দিতে পারলেন না, তাকে শুধু পেটের ভাত দেবার জন্যেই তাঁকে এক গৃহস্থবাড়ী রাঁধুনীর কাজ নিতে হল। কিন্তু গোপালের পড়াশুনা ঐখানেই সাঙ্গ হল। সে ইস্কুলে গিয়ে শুনল যে দুমাসের মাইনে বাকী পড়াতে তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। সব মাইনে চুকিয়ে না দিয়ে সে যেন ইস্কুলে আর না আসে।

গোপাল ছলছল চোখে তার ছেঁড়া বই আর খাতা নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। কামিনী তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁরে এখুনি ফিরে এলি যে?" গোপাল তাঁর কোলের উপর আছড়ে পড়ে বললে "মাসি, ওরা আর আমাকে ইস্কুলে পড়তে দেবে না, আমার মাইনে দেওয়া হয়নি।"

কামিনীর কোন সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা ছিল না, তিনি চোখ মুছতে মুছতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

বিকেলবেলা কামিনী তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে ফেলে মনিববাড়ী যাবার জোগাড় করছেন এমন সময় সদর দরজার কাছে রব উঠল, "মা-লক্ষ্মী বাড়ী আছ?"

"ও মা কেষ্টোকাকা যে, কখন এলে?" বলতে বলতে কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গোপাল একজন নূতন লোক দেখে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইল।

কেষ্টো ঘরের গোবর-মাটি-দিয়ে-লেপা পরিষ্কার তকতকে দাওয়ার উপর উঠে বসে বললে "এই আজই এনু মা-লক্ষ্মী। আসতে কি অসাধ, তা যে মনিবের হাতে পড়েছি ছুটি কি পাবার জো আছে? এবার কি ভাগ্যি, দিনকতকের জন্যে ছাড়ন দিয়েছেন। হ্যাঁ মা, এ ছেলেটি কে গা?"

কামিনী গোপালের ইতিহাসটা আগাগোড়া বলে গেলেন। কৃষ্ণধন দুচারবার মুরুব্বির মত মাথা নেড়ে, "আজ তবে আসি মা," বলে বিদায় গ্রহণ করলেন।

তার পরদিন সকালে আবার সে কামিনীর বাড়ী এসে হাজির। কামিনীকে দেখেই মুখখানা খুব মাতব্বরের মত করে আরম্ভ করল "দেখ মা, তোমায় একটা কথা বলি। তুমি বিধবা মানুষ, কাহাতক পরের ছেলে পুষবে? তার চেয়ে আমি বলি, ওকে আমাকে দাও, আমার মনিব মস্ত বড়মানুষ, কত লোক তাঁর খেয়ে মানুষ হচ্ছে, সেখানে গিয়ে পড়লে ছেলেটার একটা হিল্লে লেগেই যাবে। তিনি সেদিন আমায় বলছিলেনও ঐ কথা। আমায় বললেন কি কেষ্টো একটা ছোট দেখে ছেলে পাই ত রাখি।'"

কামিনী একটু অবাক হয়ে বল্‌লেন "তাই নাকি! বাবুর বুঝি নিজের ছেলেপিলে কিছু নেই?"

"প্রায় তাই, থাক্‌বার মধ্যে এক মেয়ে, তা সেটাকেও কোন্ এক মেমের ইস্কুলে দিয়ে এসেছেন। অতবড় বাড়ীটা খাঁ খাঁ কর্‌ছে, কাজেই ঐ কথা বল্লেন আর কি!"

কামিনী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন "তাই নিয়ে যাও কাকা, এই ক দিনেই ও আমার পেটের ছেলের মত হয়ে উঠেছিল, ওকে ছাড়্‌তে আমার বুক ফেটে যাবে। কিন্তু আমি ওর শত্রুতা কর্‌ব না, আমার কাছে থাক্‌লে ওর দুবেলা পেটের ভাতও জুট্‌বে না, আমার চোখের উপরেই যে ও শুকিয়ে উঠ্‌ছে!"

কামিনীকে ছেড়ে যেতে হবে শুনে গোপালের দুই চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু সে যেতে আপত্তি কর্‌ল না। পৃথিবীতে যে কারও উপরে তার দাবী আছে, একথা সে ভাব্‌তে শেখেনি। তার হতভাগ্য শিশুজীবনে কাঁদ্‌বার অবসর অনেক ঘটেছে, কিন্তু রাগ বা অভিমানের সুযোগ সে কখনও পায়নি। সে জান্‌ত যে দুঃখ পাওয়াটাই তার স্বাভাবিক, সুখটা নেহাৎ যদি পথ ভুলে দু একবার তার কাছে এসে পড়ে।

দিন চার পরে এক ধূমাচ্ছন্ন রাত্রে গরুর গাড়ী চড়ে গোপাল নিজের নূতন বাসস্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়্‌ল। গ্রামের অধিকাংশ ঘরের দরজাই তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সংকীর্ণ পল্লীপথে গরুরগাড়ীর তলায় বাঁধা ফাটা-চিম্‌নি-ওয়ালা হ্যারিকেন লণ্ঠনটা একটুখানি ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে চলেছে। গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ ছাড়া আর বিশেষ কোনো শব্দ নেই, মাঝে মাঝে কেবল দুএকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চৌকিদারী কর্‌ছে।

কেষ্টোধন একটা হুঁকো হাতে করে একমনে তামাক টান্‌ছে। গোপাল কামিনী-মাসীর দেওয়া ছোট পুঁট্‌লিটার উপর মাথা দিয়ে গাড়ীর দোলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গালে চোখের জলের দাগ এখনও একেবারে শুকিয়ে যায়নি।

(৮)

আধঘুমন্ত অবস্থায়, কেষ্টো যে কখন গোপালকে ট্রেনের একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ীতে টেনে তুলেছিল, তা গোপালের মনেও নেই। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের থার্ডক্লাশ গাড়ীর অতি বিচিত্র কলরবেও তার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাতে পারেনি। ভোরবেলা যখন তার ঘুম ভেঙে গেল তখন সে একেবারে লাফিয়ে উঠে বস্‌ল। এ আবার কি রকম কাণ্ড! এমন গাড়ী ত সে কখনও দেখেনি! বাপ্ রে কি রকম লোকের ভীড়! আবার লোকগুলোও যে কত রকমের তার ঠিক নেই। কিন্তু নিজের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুটোর সদ্ব্যবহার কর্‌বার সময় সে বেশী পেলে না। একটু পরেই গাড়ীটা থেমে গেল এবং কেষ্টো তাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিল। যেখানে তারা নাম্‌ল ততবড় বাড়ী গোপাল সাতজন্মেও দেখেনি, আর সেরকম গোলমাল বোধ হয় তাদের গাঁয়ের গাজনের মেলাতেও হয় না। সেই প্রকাণ্ড বড় বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে তারা দুজন একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে বস্‌ল। সে গাড়ীটা যে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল আর থামেই না। কত বড় বড় রাস্তা, আর তার দুধারে কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী। কোথাও কিন্তু মাঠও নেই পুকুরও নেই। সব বাড়ীগুলোই খুব বড়লোকদের, তারা কত সুন্দর সুন্দর সব জিনিষ বাড়ীর সাম্‌নের ঘরে আর জান্‌লায় সাজিয়ে রেখেছে। রাস্তায়ও কত ট্রেন চল্‌ছে, তবে সে একটু আগে যেটায় চড়েছিল, তার চেয়ে এগুলো একটু ছোট ছোট।

গাড়ীটা শেষকালে একটা মস্ত বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। তার পিছনে আর পাশে মস্ত বাগান। কেষ্টো গাড়ী থেকে নেমেই চট্‌পট্ নিজের পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি সব গাড়ীর মাথা থেকে নামিয়ে ফেল্‌লে। তারপর গাড়োয়ানের সঙ্গে এক টাকা কি আঠারো আনা তার ন্যায্য প্রাপ্য তাই নিয়ে তুমুল কোলাহল বাধিয়ে দিল। গোপাল নিজের ছোট পুঁট্‌লি হাতে করে অত্যন্তই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় সাহেবী-পোষাক-পরা একজন ভদ্রলোক সাম্‌নের হলঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত দৃশ্যটা একেবারে বদ্‌লে গেল। কেষ্টো এতক্ষণ গাড়োয়ানের দাড়ীর বিঘৎ খানিক দূরে ঘন ঘন হাত নেড়ে নিজের বাগ্মিতার পরিচয় দিচ্ছিলেন, গাড়োয়ান মিঞার ভাষার দখল কিছু কম থাক্‌লেও তিনি গলার

জোরে সেটা পুষিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু শিবেশ্বরের আবির্ভাব মাত্র কেষ্টো একেবারে শান্তমূর্ত্তি ধরে মনিবের পায়ের গোড়ায় টিপ্ করে একটা প্রণাম ঠুকে ফেল্‌ল. গাড়োয়ানের গলাও উচ্চ সপ্তক থেকে একেবারেই নীরব রাগিণীতে লয় পেল।

কেষ্টোর ভক্তির ঘটা দেখেই গোপাল বুঝেছিল যে ইনিই বাড়ীর কর্ত্তা, কাজেই সেও এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম কর্‌ল। শিবেশ্বর তার হাত ধরে টেনে তুল্‌তে তুল্‌তে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলে উঠ্‌লেন, "বেহারা, তোমাকে আমি না একশ-বার বলেছি যে আমার আফিস-ঘরের সাম্‌নে গোলমাল বাধিও না? এক্ষুনি গাড়োয়ানকে বিদায় কর, এই মিনিটে।"

কেষ্টোধনের মূর্ত্তিই তখন বদ্‌লে গিয়েছে, তিনি ধীরে ধীরে ট্যাঁক্ থেকে আঠার আনা পয়সা বার কর্‌লেন, তারপর একবার কাতরচক্ষে হস্তস্থিত পয়সা এবং আর-একবার মনিবের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত চিত্তে সেটা গাড়োয়ানের হাতেই সমর্পণ করে দিলেন।

ঠিকা গাড়ীখানা ফটকের বার হয়ে যাবামাত্র শিবেশ্বরের চোখ গোপালের মুখের উপর এসে পড়্‌ল। তিনি এতক্ষণ তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু চোখদুটো তাঁর কেষ্টো এবং গাড়োয়ানকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

গোপালের দিকে চেয়েই শিবেশ্বর কেষ্টোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "এই ছেলে বুঝি?"

কেষ্টো অতিরিক্ত বিনয়সহকারে হাত জোড় করে আরম্ভ কর্‌লে, "আজ্ঞে হুজুর, মা-বাপ-মরা ছেলে ওটি, তাই ভাব্‌লাম যদি হুজুরের ছি-চরণের কের্‌পায়—"

হুজুর বিরক্তমুখে বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লেন "থাক্ থাক্ হয়েছে। তোমাদের গাঁয়েরি ছেলে ত?"

"আজ্ঞে হাঁ, বেশ ভাল ঘরের ভাল জা......" কেষ্টোর সেদিন কথা শেষ হওয়াটা কপালে ছিল না, শিবেশ্বর তার কথা আরম্ভ হবামাত্রই গোপালের হাত ধরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়্‌লেন। গোপালের কাহিনী বর্ণনা করে একটুখানি করুণরস সঞ্চারের চেষ্টাটা এ রকম বাধা পাওয়াতে কেষ্টো বিরক্ত হয়ে নিজের টীনের বাক্স আর কম্বলে-জড়ানো পুঁটুলি মাথায় করে চাকরদের ঘরের দিকে প্রস্থান কর্‌ল।

শিবেশ্বর নিজের আফিস-ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ারে বসে পড়্‌লেন, আর একখানা চেয়ার দেখিয়ে গোপালকে বল্‌লেন "ঐ খানে বোসো। তোমার নাম কি?"

একটু ইতস্তত করে, গোপাল চেয়ারে বসে বল্‌লে, "শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।"

শিবেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করে বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন "আঃ এ এ সব গোপালচন্দ্র আর রাখালচন্দ্রের কি আর শেষ নেই? সারা দেশটাই জুড়ে বসে আছে!"

তার নামটার উপর এ হেন বিরক্তির কারণ গোপাল কিছুই ঠিক করতে পার্‌লে না। তার উপর অধিকাংশ পরিচিত ব্যক্তিই চটা বটে, কিন্তু নাম শুনেই চটে যেতে সে এ পর্য্যন্ত কাউকে দেখেনি।

শিবেশ্বর খানিকক্ষণ একমনে কি ভেবে যেন মনে মনেই বল্‌লেন "যাক সে পরে হবে এখন। তুমি পড়াশুনো কিছু করেছ?"

গোপাল বল্‌লে, "আজ্ঞে হাঁ, আমি গাঁয়ের ইস্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়্‌তাম।"

শিবেশ্বর খুসী হয়ে গেলেন। যদিচ ঘোড়া তৈরি করার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল, তবু একেবারে গাধার বাচ্চা পিটনো থেকে যে তাঁকে আরম্ভ কর্‌তে হবে না, এ খবরটায় তিনি একটু আরাম অনুভব কর্‌লেন। গোপালের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "বেশ, বেশ, আমি কালই তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব, দেরি করে কাজ নেই। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার, গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও, অনেকদূর এসে বোধ হয় ক্লান্ত আছ।" এই বলেই তিনি একখানা মোটা বই নিজের দিকে টেনে নিলেন।

বাড়ীর কর্ত্তা তাকে যেতে অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু গোপাল মোটেই ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ল না যে তাকে কোনদিকে যেতে হবে এবং হাত মুখ ধোওয়ার কাজটাই বা কোথায় সম্পন্ন হবে। শিবেশ্বর যদিও তার সঙ্গে বেশ ভালভাবেই কথাবার্ত্তা বল্‌ছিলেন, তবুও এই সাহেবের মত চেহারার ব্যক্তিটিকে সে-কথাটা জিজ্ঞাসা করে নিতে তার সাহসে কুলিয়ে উঠ্‌ল না।

এমন সময় বাইরে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীখানা প্রকাণ্ড দেখ্‌তে। সেটার দরজা সহিস খুলে

দেবা মাত্র একটি সাত আট বছরের ছোট মেয়ে চট্ করে নেমে পড়্‌ল, এবং এক মিনিটও না দাঁড়িয়ে একছুটে সিঁড়ি কটা অতিক্রম করে আফিস-ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটি ভারি চমৎকার দেখ্‌তে। গোপাল নেহাৎ ছেলেমানুষ হলেও তার এ কথাটা মনে লাগ্‌তে দেরি হল না। এমন সাজ-করা আর এমন সুন্দর মেয়ে তাদের গাঁয়ে একটাও ছিল না।

মেয়েটির হাতে একটা তোয়ালে-জড়ানো পুঁট্‌লি। তার গায়ের রং প্রায় বাবুরই মত, তবে অত সাদা নয়, তার হাত পা মুখ থেকে যেন গোলাপফুলের আভা ফুটে বেরচ্ছে। চোখ দুটি তারার মত জ্বলজ্বলে, তাতে লজ্জা কি সঙ্কোচের লেশও নেই। তার কালো চুলের রাশ থোপা থোপা হয়ে পিঠের মাঝামাঝি ঝুল্‌ছে।

মুক্তি বোধ হয় বাবাকে কেষ্টোদাসী কি অপর্ণা সম্বন্ধে কোনো অতিপ্রয়োজনীয় এবং গোপনীয় সংবাদ দেবার জন্যেই অত জোরে ছুটে এসেছিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে কে একটা ছেলেকে বসে থাকৃতে দেখে তার কথাটা মুখেই থেকে গেল। সব কথা ত আর সকলের সাম্‌নে বলা যায় না? এখানে যখন দেরি করে কোনো লাভ নেই, তখন চীৎকার করে ঠাকুরমাকে এক ডাক দিয়ে সে এক দৌড়ে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল।

মেয়ের গলার স্বরে শিবেশ্বর চম্‌কে মুখ তুলে চাইলেন। মেয়েকে দেখ্‌তে পেলেন না, কিন্তু দেখ্‌লেন সেই বিরক্তি-কর-নামধারী ছেলেটি তখনও চুপ করে বসে আছে। তিনি একটু অবাক হয়েই বল্‌লেন "কি, তুমি গেলে না যে?"

গোপাল একটু যেন ভীতভাবেই বল্‌লে "কোন দিক দিয়ে যাব?"

শিবেশ্বর তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লেন "ওঃ, তাইত! এই বেয়ারা।"

কেষ্টো বেহারা তৎক্ষণাৎ দরজার কাছে হাজির। মনিবের হুকুমে সে গোপালের পথ-প্রদর্শক হয়ে তাকে উপর তলায় কর্ত্তার খাস কামরার দিকে নিয়ে চল্‌ল!

ছোট পুঁট্‌লি বগলে নিয়ে গোপাল সে ঘরের সাজসজ্জা দেখে ত অবাক। কোথাও দাঁড়াতে কি বস্‌তেও তার সাহস হচ্ছিল না। সেই ঘরখানার পাশেই আর-একটা ছোট ঘর। সেটা আয়তনে ছোট বটে কিন্তু সাজে-সজ্জায় তার সমান পদ।

সেই ঘরে এনে কেষ্টো গোপালের হাত ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, "এই তোমার ঘর। পাশেই চ্যানের ঘর আছে। এখনি চান কর্‌বে না শুধু হাত পা ধোবে?"

আনন্দ ভয় এবং বিস্ময় মিলে গোপালের বুকে তখন এমন তুফান উঠেছিল যে সে উত্তর দিতেই ভুলে গেল। এমন কোনও শিশুই বোধ হয় এ পর্য্যন্ত জন্মায়নি যে কোন না কোন সময়ে নিজেকে কল্পনার সাহায্যে হারুন আল-রসীদের রাজত্বের ভাগীদার করে না তুলেছে। আর সেই কল্পনা যদি অন্ততঃ আংশিক ভাবেও বাস্তবমূর্ত্তি ধরে দাঁড়ায়, তখনকার পুলকের বন্যা কি সোজা জিনিস?

কেষ্টো আবার প্রশ্ন করাতে গোপাল যেন হঠাৎ আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এল, তাড়াতাড়ি বলে ফেল্‌ল "হ্যাঁ, চানই কর্‌ব।"

স্নানের ঘরে গিয়ে আর-এক বিপদ! টোপা পানা আর পাঁকে ভরা পুকুর ছাড়া আর কোনো যে স্নান কর্‌বার স্থান হতে পারে এ সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি। যাক এখানে সবই যখন নূতন রকম তখন প্রত্যেক জিনিসে আলাদা করে অবাক হয়ে লাভ নেই।

কেষ্টোর সাহায্যে সে কোনো রকমে স্নানের পর্ব্ব শেষ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, এমন সময় একটি ছোক্‌রা-মত চাকর এসে খবর দিল, "বাবু খোকাবাবুকে ডেকে পাঠালেন, টেবিলে খানা দেওয়া হয়েছে।"

স্নান সেইখানেই শেষ হল। গা মাথা মুছে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে সে খাবার-ঘরে হাজির হল। শিবেশ্বর তার খালি গা আর গলায় মাদুলি দেখে প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। এই শ্রেণীর অসভ্যতার উপর তাঁর রাগ ছিল মর্ম্মান্তিক। কেষ্টোকে আদেশ কর্‌লেন "এই বেয়ারা, আমার ঘর থেকে যা হয় একটা কিছু জামা নিয়ে এস, আর ওর ওই গলার তেলচিটে দড়িটা খুলে ফেলে দাও।"

কেষ্টোধন গোপালের মাদুলিটা খুলে অনেক বুদ্ধি খরচ করে মিনিট পাঁচ পরে শিবেশ্বরের একটা উঁচু কলার-ওয়ালা সার্ট এনে হাজির কর্‌ল। গোপাল বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা

পরে ফেল্‌ল। তার কলারটা পরিধানকারীর মাথার চেয়ে উঁচু হয়ে উঠ্‌ল। হাতাদুটো তার হাতকে ছাড়িয়ে শূন্যে ব্যাকুলভাবে আস্ফালন কর্‌তে লাগ্‌ল। নিজের এই পোষাকে তার অত্যন্ত হাসি পাওয়া সত্ত্বেও শিবেশ্বরের ভয়ে সে চুপ করে বসে রইল।

টেবিলে খাওয়াটা, বিশেষ করে এ হেন পরিচ্ছদে ভূষিত একজন আনাড়ি ছেলের পক্ষে, খুবই শক্ত ব্যাপার। শিবেশ্বর ছাড়া আর যে-কেউ সেটা চট করেই বুঝ্‌তে পার্‌ত। কিন্তু একে তিনি চিরকালই সামান্য বিষয়ে নজর দিতেন কম, তার উপর এই নবাগত পোষ্যটিকে কি ভাবে গড়ে তুল্‌তে হবে সেই সম্বন্ধে অনেক অতি আধুনিক রকমের প্ল্যান তাঁর মাথায় হু হু করে ঢুক্‌ছিল বলে তিনি নিজেই প্রায় খেতে ভুলে গিয়েছিলেন। হাত দুটো নেহাৎ অভ্যাস বশতঃ ছুরী কাঁটা চালিয়ে যাচ্ছিল।

গোপালের ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব, তা ছাড়া সাম্‌নে যে-সব আহার্য্য সাজানো তা দেখে এবং গন্ধ শুঁকে লোভ সাম্‌লানো দুষ্কর। কাজেই সে জামার প্রয়োজনাতীত লম্বা অংশটাকে কোনোরকমে গুঁজে রেখে একটা চামচ তুলে নিয়ে অল্প অল্প খেতে আরম্ভ করে দিল।

এমন সময় বাইরে চঞ্চল পদধ্বনি শোনা গেল এবং চোখের পাতা ফেল্‌তে না ফেল্‌তে সেই অপরূপ ঘাঘরা-পরা সুন্দর ছোট মেয়েটি একটি ছোটখাটো ঘূর্ণী বাতা-সের মত ঘরে ঢুকে শিবেশ্বরের কোলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌ল।

শিবেশ্বরের চিন্তাস্রোত মাঝপথেই আট্‌কে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোলের উপর তুলে নিয়ে বল্‌-লেন, "কি ছোট মা, আজ যে সকাল বেলাই ?"

"বা-রে, এরি মধ্যে ভুলে গেলে ? আর বারে যে বলে গেলুম যে শুক্রবারে আমার ছুটী আছে, বেশ উপ্‌রি উপ্‌রি তিন দিন বাড়ী থাক্‌ব! আমাকে কিন্তু নূতন মটর-গাড়ী চড়িয়ে একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হবে তা বলে রাখ্‌ছি। আমি গাড়ীটায় একবারও চড়িনি যে এখনও।"

শিবেশ্বর বল্‌লেন "আচ্ছা, সে হবে এখন। এই দ্যাখ্‌, কেমন একটি ছেলে এসেছে, এর সঙ্গে খেলা কর্‌বি ?"

মুক্তি এইবার মুখ ফিরিয়ে ভাল করে নূতন মানুষটিকে দেখে নিলে। পরের মুহূর্ত্তেই সে একেবারে হেসে কুটপাট হবার জোগাড়!

শিবেশ্বর বল্‌লেন, "কি রে, এত হাস্‌ছিস কেন ?"

মুক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "বাবা, ও কি অদ্ভুত জামা পরেছে!"

শিবেশ্বর হেসে বল্‌লেন, "ওটা আমার জামা, তাই অমন দেখাচ্ছে, দেখিস্‌ এখন কাল ওর কত ভাল ভাল জামা আস্‌বে।"

এই হীরার টুক্‌রোর মত ঝিক্‌মিকে মেয়েটির হাসির স্রোতে গোপাল বেচারা একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল। তার ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌ল যে সব অনর্থের মূল এই জামাটাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে।

(৯)

তার পরদিন সকালে মুক্তি যখন তাদের বাড়ীর এই নূতন মানুষটির সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর্‌বার অতিরিক্ত আগ্রহে ঠাকুরমার নিষেধ সত্ত্বেও শিবেশ্বরের উপরের ঘরের পাশের ঘরে ঢোক্‌বার একটা কিছু ছল খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন হঠাৎ ছোট্ট মানুষটির বদলে তার দীর্ঘকায় বাবাই বাইরে যাবার উপযুক্ত সাজ সজ্জা করে মেয়ের সাম্‌নে এসে হাজির হলেন। শিবেশ্বর বল্‌লেন, "কি গো মা-লক্ষ্মী, কিছু মৎলব আছে নাকি ?"

মুক্তি বল্‌লে, "বাবা, সেই মস্ত-বড়-জামা-পরা ছেলেটি কি আমাদের বাড়ী থাক্‌বে ? সে আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না ? তাদের ইস্কুলে পড়্‌তে যাবে না ? ভাল ভাল জামা পর্‌বে না ?

শিবেশ্বর মেয়েকে টপ্‌ করে কোলে তুলে নিয়ে বল্‌লেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবই হবে, সবই কর্‌বে। চল, আজই তোমায় নতুন গাড়ী চড়িয়ে আর মস্ত-জামা-পরা ছেলের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিচ্ছি। একটা ভাল জামা পরে এস, আমি ততক্ষণ ওকে ডাকি।"

মুক্তি কোল থেকে নেমে ছুটে ভাল জামা পর্‌বার উদ্দেশে চলে গেল। নীচের ঘরে যেতেই মোক্ষদা দেবী বল্‌লেন, "সকালবেলা অত ছুটোছুটি করে কোথায় যাচ্ছিস ?"

মুক্তি ময়লা জামার উপর একটা ধোপ-দেওয়া জামা পরে হাত দুটো পিছনে দিয়ে বোতাম লাগাবার চেষ্টায় কসরৎ কর্‌তে কর্‌তে উত্তর দিলে, "বাবার নতুন গাড়ী চড়ে বড়-জামাপরা ছেলের সঙ্গে ভাব কর্‌তে যাচ্ছি!"

ঠাকুরমা কপাল কুঁচ্‌কিয়ে অবাক হয়ে নাৎনীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ও কি রকম ঢঙের কথা হোলো?"

মুক্তি বল্‌লে, "হ্যাঁ, বাবা ত তাই বল্‌লেন।"

ঠাকুরমাকে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে ধোপ-দেওয়া লেসের জামার তলার লম্বা ময়লা গোলাপী জামাটা কোনো রকমে একটু ঢাকা দেবার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তেই মুক্তি ছুটে আবার বাবার ঘরের দিকে চলে গেল। গোলাপী জামা পাড়ের মত লেসের জামার তলা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ঠাকুরমা আর-একটু খবর নেবার জন্যে চেঁচাতে লাগ্‌লেন, "মুক্তো রে, একটা কথা শুনে যা।" মুক্তোর কিন্তু কোনো দিকে নজর দেবার সময় ছিল না; সে ঝাঁক্‌ড়া চুল দুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে প্রাণপণে বাবার সন্ধানে ছুটছিল।

মোক্ষদা কাল থেকে ছেলের কাণ্ড দেখ্‌ছেন, কিন্তু বিরক্তি আর অভিমান তাঁকে এম্‌নি চেপে ধরে ছিল, যে, বাড়ীর মধ্যে হঠাৎ এমন একটা পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছেলেকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি। যেন নূতন কিছুই ঘটেনি, এমনিভাবে দুটো একটা কথা বলে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হয় নি, এইটা তাঁকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি ত জান্‌তেনই যে ও-বয়সে মানুষের ঘর-সংসার কর্‌তে, ছেলেপিলে মানুষ কর্‌তে সাধ হয়। যখন-কার যা, তা না কর্‌লে চল্‌বে কেন? তাই জন্যেই ত আজ পাঁচ বছর ধরে জোঁকের মত ছেলের পেছনে লেগে আছেন—শুধু তাকে একটা বিয়ে দেবার জন্যে। তা এম্‌নি ছেলে যে বুড়ো বিধবা মায়ের মুখ চেয়ে এক-বারটি হুঁ কর্‌লে না। উপরন্তু বাদ সেধে, যে একটা কচি মেয়ে তবু ঘরের নাম রাখ্‌ছিল, সেটাকে পর্য্যন্ত খিষ্টানী ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিলে! বিয়ে কর্‌তে বল্‌লে বল্‌বে কি—তুমিও ত' এক ছেলে কোলে করে বিধবা হয়েছিলে। মাগো! কি ঘেন্নার কথা! ঘর-সংসারের সাধ কি এমনই হল যে বিধবা মানুষকে ঐসব কথা ভাব্‌তে হবে?

মোক্ষদা ভাব্‌ছিলেন—তা' ছাড়া মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ কি এক হল? এ বাপু গা-জুরি কথা! মেয়ে-মানুষে কি না পারে, কি না করে? আর-সবাই কি তাই বলে তা পার্‌বে? তাদের বাপপিতেমর বংশও ত বজায় রাখ্‌তে হবে। টাকা কড়ি রোজ্‌গার করে দু-পাঁচজনকে হাত তুলে দিতে থুতে হবে। আপনার লোক না থাক্‌লে নাড়া-চাড়া কর্‌বে কাকে নিয়ে? মেয়েমানুষ ত নয় যে চরণ স্মরণ করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে? এই ত বাপু, আমার কথা রাখ্‌লে না, শেষকালে কোন্ এক অজাত-কুজাতের ছেলে কুড়িয়ে এনে পাল্‌তে বস্‌ল। একলা মন টিক্‌বে কেন ঘরে? এখন একটা খিষ্টানী বউ না আন্‌লে বাঁচি। তা ছেলে আমার সে দিকে শক্ত। ওসব হয়ত কর্‌বে না। এতই যদি ছেলে পড়াবার সখ, মেয়ের সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে জামাই এনে লাখ টাকা খরচ কর্‌লেই ত হত। জান্‌তুম একটা কাজ হল। পরের ছেলের পেছনে কেন বাপু,—জলাঞ্জলি যাক্, আমি আর কিছু বল্‌ছিনে। যার জিনিস সে যা বুঝ্‌বে করুক-গে।

কিছু না বল্‌লেও কিছু না ভেবে মোক্ষদা থাক্‌তে পার্‌ছিলেন না। আবার মনে হল—ছেলেটা বামুনের কি না জান্‌লে হত। কেষ্টা লক্ষ্মীছাড়াকে মনিব হয়ে কি করেই বা জিগেস করি! মুক্তো লক্ষ্মীছাড়ীকে ডেকে দু-কথা জান্‌তে গেলুম, না, সুন্দরী পাখ্‌না উড়িয়ে চলে গেলেন। যাক, আমার আর কি, দেশে গিয়ে এইবার শ্বশুরের ভিটে আগ্‌লে ঠাকুরঘরের দোরে পড়ে থাক্‌ব; ওদের কথায় কেনই বা থাক্‌তে যাব; নিজের পেটের ছেলে বলেই যা একটু টান্‌তে যাই।

মোক্ষদাসুন্দরী এই-রকম পরস্পর-বিরোধী নানা চিন্তায় মন ঢেলে দিয়ে নিজের সংসার-আসক্তিটা অপ্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলেন; এমন সময় সংসারের কুট্‌নো কোটা ভাঁড়ার দেওয়ার ভাবনা জাগিয়ে নেত্য ঝি চেঁচাতে চেঁচাতে এসে হাজির, "ওগো, মা-ঠাকরুণ, খুকীদিদির অম্বল, বাবুর ইষ্টু, কিছুরই জোগাড় দাওনি, দিব্যি নিচিন্দি বসে আছ, ঠাকুর যে এদিকে আমার মাথা খেয়ে ফেল্‌ছে!"

মোক্ষদা দেবী তাড়াতাড়ি উঠে ভাঁড়ারের চাবি পিঠে ফেলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। তখনকার মত

সংসার তাঁর নিরাসক্ত মনটা সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করে বসল।

বেলা আন্দাজ বারোটার সময় শিবেশ্বর তাঁর শিশু সাথী দুটিকে নিয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন গাড়ীটা মুক্তির পড়তে যাবার দিনের মতই বোঝাই হয়ে এসেছে, কিন্তু আরোহীদের মধ্যে সে দিনকার বিষাদের কোনো-রকম ছায়াও পাওয়া যায় না। মুক্তি অনেকদিন পরে একটি নূতন বন্ধু পেয়ে গল্পের স্রোতে তাকে একদিনেই পুরাতন করে ভাসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, তার পুরুষ বন্ধু মালী ভাই, কেষ্টা, পীতাম্বর কোচম্যান এবং মেয়ে বন্ধু অর্পণা, কেষ্টোদাসী, সুনীদি, মলিনাদি, সকলের চেয়েই এই বন্ধুটি একটু অন্য রকমের, কাজেই এ-কে পছন্দ না হয়ে যায় কোথায়। বন্ধু কিন্তু অকস্মাৎ তার ঘর বাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদ, বন্ধু বান্ধব, এমন কি নামটা পর্য্যন্ত বদলে যাওয়াতে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, কাজেই সে মুক্তির গল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে মোটেই পারছিল না। সে ভাবছিল, তার এই দীর্ঘ দশ না সাড়ে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে একদিনও ত সে এমন ঐশ্বর্য্য দেখেনি, একদিনও ত তার নিজের বলে এত কিছু পায়নি, জন্মে অবধি কেউ কোনো দিন ত তাকে গোপাল ছাড়া জ্যোতির্ম্ময় নামে ডাকেনি; এই সুবেশ ভদ্রলোকটি অদ্ভুত খামখেয়ালী হলেও কিসের স্পর্শে তার সব কিছুই উজ্জ্বল করে দিলেন!

গরমে রোদে ঘেমে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শিবেশ্বর যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন মোক্ষদা দেবী বললেন, "হ্যাঁরে শিবু, এই ভর্ত্তি রোদে এত বেলা করে মেয়েটাকে তাতিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে এলি, তোর কি আজও আক্কেল হল না। কচি ছেলের প্রাণ! তেষ্টায় যে শুকিয়ে যাবে!"

শিবেশ্বর একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "জ্যোতির জন্যে কাপড়-চোপড় কিনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল মা; তা ওদের আমি পথে খাইয়ে এনেছি কিছু।"

মা আর বেশীক্ষণ নিজেকে চেপে রাখতে পারছিলেন না। যে কথাটায় তাঁর কোনো কিছু আগ্রহ নেই এতক্ষণ মনে করছিলেন, সেই কথাটাই পাড়বার জন্য তাঁর মন এখন ছটফট করতে লাগল। তবু অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করে বললেন, "জ্যোতি আবার কে এল? মুক্তিই ত এত-কাল জানতাম।"

শিবেশ্বর মাথাটা একটু নীচু করে বললেন, "মুক্তি ত আমার মেয়ে। জ্যোতি একটি ছেলে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করব বলে এনেছি। তুমি দেখনি? কাল তাড়াতাড়িতে দেখান হয় নি। আজ এনে দেখাব এখন।"

মা অভিমানের সুরে বললেন, "কি জানি বাছা, তুমি ত আমায় বলে দেখিয়েই আজকাল সব কর কি না, তাই ছেলে দেখাবে! আমি দাসী বাঁদী ঘরের কোণে পড়ে আছি, তোমাদের লেখাপড়া-জানা ছেলেদের সঙ্গে সব কথায় কথা কইতে যাব কেন?"

শিবেশ্বর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "না মা, তোমায় কি আর বলব-না বলেই বলিনি। তবে পরের ছেলে নিচ্ছি, শুনলে তুমি রাগ করবে মনে করে বলতে সাহস করিনি।"

মোক্ষদা ঠোট উলটিয়ে বললেন, "ওরে বাবা, আমার ভয়ে ত ছেলে আমার কাঁটা কি না! বেশ ত, বিয়ে করবে না, পুষ্যি নেবে এই ত কথা। তা সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলে হয়, পুরুত ডেকে, তাই না হয় নাও। আমার আর তাতে কি।"

মোক্ষদার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ছেলেটি ব্রাহ্মণের নয়, তা হলে শিবেশ্বরের অত ঝোঁক চাপত না। কিন্তু কথাটা যাচাই করে নেবার জন্যই তিনি ওকথা বললেন।

শিবেশ্বর এবার একটু উঁচু গলায় বললেন, "সৎব্রাহ্মণ কি সৎহাড়ি, তা আমার ঠিক জানা নেই মা। শেষেরটা হওয়াই সম্ভব। তবে ওসম্বন্ধে কোনো খোঁজ নেবার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু ও নিজে সৎছেলে কি না তার খোঁজ ওর কাছেই আমি পাব।"

মা কানে হাত দিয়ে বললেন, "সর্ব্বরক্ষে! হাড়ির ছেলে বামুনের বাপপিতেম'কে জল দেবে! বলিস্ কি রে! হাড়ি কখনো বামুনের ছেলে হয়?"

শিবেশ্বর বললেন, "তা ত জানিই মা। ও যার ছেলে হয়ে জন্মেছিল, তার ছাড়া অন্য লোকের এতদিন পরে হবে কি করে? অতিবড় ব্রাহ্মণ হলেও পারত না!

ও যার ছিল, তারই থাকবে, আমি কেবল ওকে মানুষ করে তুলতে চাই। তারপর আমার পিতা, পিতামহ, কি আমি স্বয়ং যদি কোনো দিন স্বর্গ থেকে জল খেতে নীচে নামি, জ্যোতি বেঁচে থাকলে আশা করি সেটুকু দয়া আমাদের করবে।

ছেলের কথা শুনে মা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ও যদি হাড়ি হয়, তবে আমি আজই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। পেটে ধরেছি বলে হিন্দুঘরের বিধবা হয়ে আমি তোমার সব অনাচার সইতে পারব না।"

শিবেশ্বর একটু নরম হয়ে বললেন, "ও যে নিশ্চয়ই হাড়ি, এ কথা তোমায় ত আমি বলিনি মা।"

মা বললেন, "তবে ও কি জাত তুমি খোঁজ নাও।"

ছেলে বললেন, "ও মানুষের জাত, তা আমি জানি, আর কিছু খোঁজ নিতে আমি পারব না মা, তুমি আমায় অনুরোধ কোরো না।"

মা রেগে চেঁচিয়ে বললেন, "অনুরোধ করব না! মায়ের কথা রাখবে না বল? আচ্ছা, আমিই ওকে ডাকিয়ে খবর নিচ্ছি।"

শিবেশ্বর শক্ত হয়ে বললেন, "ছেলেমানুষকে এখন থেকে ওসব শেখাতে আমি কিছুতেই দেব না মা। সে তুমি আমায় যাই বল না কেন।"

"এতবড় কথা আমায়। কেন, আমি কি তোমার কেনাকালের দাসী। আজ থেকে আমি আর তোমাদের সংসারের কোনো কথায় থাকছি না। গরজ কি আমার। আমি বলে তাই অমন ছেলের জন্যে কেঁদে মরি।" অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে হন্‌হন্‌ করে মোক্ষদা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। শিবেশ্বর সন্ধির চেষ্টায় তাঁর পিছন পিছন চললেন।

উপরের ঘরে জ্যোতি আর মুক্তি তখন সহজ আনন্দে পরস্পরের সহায় হোয়ে জিনিষপত্র সাজাচ্ছে গোছাচ্ছে। জাত, কুল, বংশ, কিম্বা আদর্শ, মনুষ্যত্ব কি সংস্কার, কোনো ভাবনাই তাদের গল্পের বা আনন্দের ক্ষতিবৃদ্ধি করতে পারছিল না।

জানলার দিকে পা ঝুলিয়ে মস্ত একটা ইজিচেয়ারে এক-সঙ্গে ঠেসে বসে কাজকর্ম্মের অবসানে দুজনে যখন Royal Natural Historyর ছবি দেখছে এবং জ্যোতির ইংরেজি-জ্ঞানের পরিচয়ে মুক্তি বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় পুলকিত হয়ে উঠছে তখন কেষ্টো বেয়ারা তাদের শিবেশ্বরের ডাইনিংরুমে খেতে ডেকে নিয়ে গেল। আজ ঠাকুরমার ঘরে খাবার কথা থাকা সত্ত্বেও সেখানে মুক্তিকে কেউ ডাকল না, বাবার ঘরেও তাঁকে অনুপস্থিত দেখা গেল। বিস্মিত মুক্তি একবার কেষ্টোকে "বাবা কই", জিজ্ঞাসা করে কোনো সদুত্তর না পেয়ে পাকা গিন্নির মত জ্যোতিকে টেবিলে খাওয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করল।

ইষ্টারের ছুটিতে বাড়ী এসে এবার মুক্তির কোথাও বেড়াতে যাওয়া হল না, কারণ বাবা সারাদিন হাঁড়িমুখ করে' হয় গাড়ী করে বেরিয়ে যান, নয় ঠাকুরমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে নিজের বসবার ঘরে বসে থাকেন। ঠাকুরমার ঘরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া আব্দার গল্পও চলে না; তিনিও তেমন প্রসন্ন নন। অগত্যা মুক্তি বেশ আনন্দের সঙ্গেই তার সমস্ত অবসরকালটা এই নূতন বন্ধু জ্যোতির সঙ্গে কাটিয়ে দিল।

এ কদিন জ্যোতি আর মুক্তির রোদে রোদে বাগানে বেড়ান, যখন-তখন দোল খাওয়া, কাঁচা আমে রসনা তৃপ্তি করা কোনো কাজেই কেউ বাধা দেয়নি। জ্যোতির বাধা দেবার লোক কেউ ছিলই না কোনো কালে, মুক্তির থাকলেও এখন তাঁদের কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তাই এই শিশু দুটি বয়স্কদের তর্ক যুক্তি বিরোধ দ্বন্দ্ব সুসংস্কার কুসংস্কার প্রভৃতিতে পূর্ণ জগতের আড়ালে প্রকৃতির কোলে নিজেদের আনন্দ জমাট করে তুলছিল। মুক্তি এখন স্বচ্ছন্দে জ্যোতির সঙ্গে গাছের ডালে চড়ে, আম জাম খায়, কেউ তাকে "মদ্দা ভগবতী" বলে গাল দেয় না, জ্যোতিও মুক্তির ইস্কুলের মেয়েদের মত দড়ি ঘুরিয়ে স্কিপ করতে এরি মধ্যে শিখে ফেলেছে; তাকে লজ্জা দেবার জন্য কোনো বীরপুরুষকে সেখানে উপস্থিত দেখা যায় না। এমন কি দুজনের একসঙ্গে লাট্টু ঘোরান পুতুলখেলা দেখেও কেউ হাসেনি।

এমনি আনন্দে ছুটি কাটিয়ে মুক্তি আবার ইস্কুলে চলে গেল। জ্যোতিও দিন কয়েক পরে কলকাতার নূতন ইস্কুলে ভর্ত্তি হল।

শিবেশ্বরের বাড়ীর মেঘ কিন্তু সহজে কাট্‌ল না, প্রায়ই কোনো না কোনো ছুতো করে ঝড় ওঠে। ছেলের ম্লেচ্ছ ব্যবহার, শাস্ত্রে অভক্তি এতদিন যে-মাকে বড় বেশী কিছু আঘাত দিতে পারে নি, এই পালিত ছেলেটিকে অবলম্বন করে সেই-সব কালাপাহাড়ী কাণ্ডকারখানা এখন সেই নিষ্ঠাবতী মাকে এমনি বিব্রত করে তুল্‌ল যে তিনি কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পার্‌ছিলেন না। কারণে-অকারণে মাতা-পুত্রে অশান্তির সৃষ্টি করে তুল্‌তে লাগ্‌লেন, কারণ এখন যে একজন পর এসে তাঁদের দুজনের মনের ও মতামতের দর্পণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোক্ষদা সংসার ছেড়ে যেতেও পার্‌ছিলেন না, পাছে ছেলেটা ভাল করে জুড়ে বসে; আবার নিজের নিরাসক্ত মন ও আচার-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বেশী দিন ওই ছেলেটার সঙ্গে একবাড়ীতে এক পরিবারে থাক্‌তেও তাঁর সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল্। তিনি মনে কর্‌ছিলেন—হয়ত শিবেশ্বর এত ঝগড়াঝাঁটির পর ছেলে-টাকে দশ বিশ টাকা মাসোহারা দিয়ে কোন ইস্কুলে রেখে আস্‌বে। কিন্তু সংস্কারক শিবেশ্বর নিজের মেয়েকে অনায়াসে ইস্কুলে রেখে এলেও, নিজের মত খর্ব্ব করে পরের ছেলেকে বিদায় দিতে পার্‌ছিলেন না।

গরমের ছুটিতে মুক্তিদের ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। বেতের বাক্স, টিনের বাক্স, শ্লেট, বই, খাতা, কাপড়-চোপড়, মুকুল, সখা-সাথী, হাসিখুসি, Basket of Flowers, Nursery Rhymes সব নিয়ে সে বাড়ী এসে পৌঁছল। জ্যোতি তাকে তার Little Arthur's History ও Royal Readersএর গল্প বল্‌বার লোভ দেখিয়ে এবং মাটি দিয়ে ভারতবর্ষ গড়া শেখাবার প্রতিজ্ঞা করে অভ্যর্থনা করে নিল। কিন্তু মুক্তির সে সব সাধ পূর্ণ হল না। ঠাকুরমা বল্‌লেন, "মুক্তোকে নিয়ে আমি দেশে যাব।" মুক্তি যাবে না সঙ্কল্প করে কান্নাকাটি জুড়্‌ল। কিন্তু শিবেশ্বর বল্‌লেন "যাও ছোট মা, মায়ের কথা শুন্‌তে হয়।"

মুক্তি ঠাকুরমার সঙ্গে চলে গেল; কিন্তু শিবেশ্বর ফাঁদে পা দিলেন না; তিনি জ্যোতিকে নিয়ে কল্‌কাতায় রয়ে গেলেন।

ছুটির পরে মুক্তি বাড়ীর সরকারের সঙ্গে ফিরে এল। মোক্ষদা দেবী রাগ করে এলেন না। ঝি-চাকরের ঝঞ্ঝাট পোয়াতে শিবেশ্বর মোটেই রাজি নন। তিনি মুক্তিকে বোর্ডিঙে পাঠিয়ে জ্যোতিকে নিয়ে হোটেলে চলে গেলেন। বাড়ী তালা-লাগান পড়ে রইল। মা যদি আসেন তবেই খোলা হবে।

মুক্তি এখন আর বাড়ী আসে না। তার বাবাই তার সঙ্গে প্রতি শনিবারে একটা টুল কি চেয়ারে বসে ঘণ্টা-খানেকের জন্যে দেখা করে আসেন। মেয়েদের বেড়াবার ঘণ্টা পড়্‌লেই তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। মুক্তির কাছে বিদায় নিয়ে তাঁকে একদল হাসিমাখা মুখের কলরবের ভিতর দিয়ে হোটেলের কেতাদুরস্ত খান্‌সামা waiterদের গুরুগম্ভীর মুখ ও সেলামের স্রোতে এসে পড়্‌তে হয়।

শ্রীসংযুক্তা দেবী।

ন্যায়দর্শন*

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-অধ্যাপক-সমাজে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নাম সুপরিচিত। তিনি নামে অধ্যাপক নহেন, আমরা জানি, তিনি তাঁহার দর্শন টোলে (পাবনা) প্রতিদিন বহুবিষয়ে বহু বিদ্যার্থীকে পড়াইয়া থাকেন। এবিষয়ে ইঁহার সামান্য প্রতিষ্ঠা নহে।

সংস্কৃত পণ্ডিত ও মৌলবীগণের উন্নতির পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে শিমলা শৈলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (জুলাই, ১৯১১) প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের একটা বৈঠক (The Conference of Orientalists) বসান হইয়াছিল। তাহার কার্য্যবিবরণে দেখা যায়, অধিকাংশ সভ্যই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে ভাবে শাস্ত্র আলোচনা করেন, তাহা অব্যাহত রাখিতে হইবে। সেখানে প্রশ্নটা হইয়াছিল, ইঁহাদিগকে পশ্চিমী বা ইউরোপীয় ধরণের পণ্ডিত করিতে হইবে, না যেমন তাঁহারা চলিতেছেন, সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিয়া সেইরূপই ভালভাবে চালাইতে হইবে। ইউরোপীয় অধ্যয়ন-পদ্ধতি প্রশস্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশী পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। বিদ্যাই লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রাচীন দুরূহ গ্রন্থসমূহে কাহারো দন্তস্ফুটই হইবে না। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলন মণিকাঞ্চনযোগ, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরূপেই হউক, যতদিন ইহা ঘটিয়া না উঠিতেছে, ততদিন আমাদের এই স্বীয় পদ্ধতিকে অনুসরণ

---

* সাহিত্যপরিষদ্-গ্রন্থাবলী, সং ৬৩। ন্যায়দর্শন, গৌতম-সূত্র ও বাৎস্যায়নভাষ্য, বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত, প্রথম খণ্ড, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। কলিকাতা, ২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্-মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৪৮ + ৪৩০। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১।০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ২৲, সাধারণপক্ষে ২॥০।

না করিলে আমাদিগকে ঠকিতে হইবে। বর্ত্তমান সংস্কৃতপরীক্ষা আমাদিগকে এইদিকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছে। এখনো কয়েকজন প্রগাঢ় পণ্ডিত দেখা যাইতেছেন, পরে কি দাঁড়াইবে ভাবনার বিষয়। আমরা আজ যে পুস্তকখানি সমালোচনা করিতেছি, ইহা কেবল এই শ্রেণীরই পণ্ডিতের নিকট আশা করা যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই বৈঠকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেমন সাধারণ লোক-জনের সহিত মিলা-মিশা করিতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটেরা সে-রকম পারেন না। অতএব তাঁহাদিগকে যদি এই সমস্ত লোকের মধ্যে প্রচলিত আচার-বিচার, রীতি-নীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কার বিশ্বাস প্রভৃতির, অথবা নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র দেবতাসমূহের পূজাপদ্ধতির বিবরণ-সংগ্রহে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের একটা কার্য্যকারিতা পাওয়া যাইতে পারে। আর যদি তাঁহাদিগকে আদমসুমারীর লোক-গণনার কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে গেইট সাহেবকে ঐ কার্য্যে যে অসুবিধা বা কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছে, পরবর্ত্তী আদমসুমারীসমূহে আর সেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।* শাস্ত্রী মহাশয়ের মত লোকের এরূপ অনাবশ্যক মন্তব্য প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত। এখনও ভাল হয়, যদি তিনি ইহা প্রত্যাহার করিয়া লন। ইহাতে তাঁহার নিজের বা দশের বা দেশের বা সরকার বাহাদুরের কোনো লাভ হয় নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অন্য উপযোগিতা না-ও দেখিতে পান, তাঁহারা তর্কবাগীশ মহাশয়ের আলোচ্য ন্যায়দর্শনখানি দেখিলে অন্তত একটা উপযোগিতাও দেখিতে পাইবেন। এসব কাজের জন্য তাঁহা-দিগকে এই "টুলো" পণ্ডিতদেরই নিকট আসিতে হইবে, এ পর্য্যন্ত ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বড় জোর দুই-একটি বাদে,—ইহাও হইবে কি না বড় সন্দেহ) এমন কোনো গ্রাজুয়েটেরই নাম জানি না, যিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের মত ন্যায়সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ বস্তুতই মন্থন করিয়া এইরূপ পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন। সাহিত্যপরিষদ্ উপযুক্ত হস্তে এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, বিশেষত নৈয়ায়িকেরা, সাধারণত যেমন প্রচলিত কয়েকখানিমাত্র গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, বাহিরের, এমন কি সেই বিষয়েরই অন্যান্য পুস্তক বা নব-নব আলোচনার, কোনো ধার ধারেন না, কোনো খবরই রাখিতে চান না, দেখিতেছি তর্কবাগীশ মহাশয় সেরূপ নহেন। তাঁহার এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, তিনি তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের নব-নব প্রকাশিত গ্রন্থও আলোচনা করিয়া থাকেন, এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিবিধ আলোচনাদিরও সংবাদ রাখেন। "আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফল দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্" (১।১-৯) এই সূত্রের টিপ্পনীতে (১৬৫ পৃঃ) হরিভদ্রসূরিকৃত ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়ের উল্লেখে, প্রমেয়সূত্রে মূলত সুখ অথবা দুঃখ পাঠ ছিল, ইহা লইয়া তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি নাম নির্দ্দেশ না করিলেও, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে, এবং ১-১-৩২ সূত্রে, ২৪১ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপশঙ্করবিজয়ের বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক মুক্তির পার্থক্য উল্লেখে সম্ভবত বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, এম, এ, মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবন্ধে (An Examination of the Nyayasutras, J A S B, Vol I, No-10, 1905, pp. 245-250) বলিয়াছেন যে, প্রচলিত ন্যায়সূত্র এক জনের ত রচনা নহেই এক সময়েরও রচনা নহে। দার্শনিক, তার্কিক ও অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ ইহার ভিন্ন-ভিন্ন অংশ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার যুক্তিসমূহ প্রণিধানযোগ্য, বিচার্য্য ও পরীক্ষ্য। তর্কবাগীশ মহাশয় এই কাজটি করিলে ভাল হয়। তিনি ইহার একটা কথা উল্লিখিত স্থলে আলোচনা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রমেয়সূত্রে এককালে মূল পাঠে দুঃখ শব্দের স্থলে সুখ ছিল, পরে তাহা কেহ পরিবর্ত্তন করিয়া দুঃখ করিয়া দিয়াছেন। কারণ, (১) প্রথমত, হরিভদ্রের ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে নৈয়ায়িকমতবর্ণনায় (২৪শ শ্লোক) প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে সুখই উক্ত হইয়াছে, দুঃখ নহে। * (২) দ্বিতীয়তঃ, তিনি মনে করেন, প্রাচীন হিন্দুরা কখনো জগৎকে অত্যন্ত দুঃখময় বলিয়া মনে করেন নাই।—"The logical treatise was an ancient Hindu treatise, and Hindus never took an ultra-pessimistic view of the world." বেদান্তী ও মীমাংসকদের শেষ লক্ষ্য হইতেছে সুখ। অতএব নৈয়ায়িক কি করিয়া দুঃখবাদী (pessimistic) হইতে পারেন? বৌদ্ধরা অত্যন্ত দুঃখবাদী।...ইহাতে প্রতীতি হয়, মূল ন্যায়সূত্র (যাহার প্রমেয়সূত্রে সুখ ছিল) কোনো বৌদ্ধ দার্শনিকের হাতে প্রথমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং এইরূপেই আলোচ্যস্থলে দুঃখ শব্দটি আসিয়া পড়িয়াছে।

নৈয়ায়িকেরা যে, বস্তুতই সর্ব্বশুভবাদী (optimistic), বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাহাই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিয়া (J. A. S. B., Vol. I, No. 10, 1905, pp. 251-252) শাস্ত্রী মহাশয়কে সমর্থন করেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম যুক্তির বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়াছেন। আরো দিতে পারা যায়। ন্যায়সূত্রের পাঠের যে, অনেক গোলমাল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলেই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য, এবং করিতেছেনও। কিন্তু কেবল ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়ের ঐ কথাতে স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, প্রমেয়সূত্রে দুঃখ ছিল না, সুখ ছিল। প্রথমত, তর্কবাগীশ মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, হরিভদ্র "সংক্ষেপে কয়েকটি মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে কোন মতেরই উল্লেখ করেন নাই।" তিনি সংক্ষেপের সুবিধার জন্য, এবং পদ্যে রচনা করায় ছন্দোরক্ষার জন্য গৌতমের মূল সূত্রের পারিভাষিক শব্দকেও দুই-এক স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন। যেমন, "প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি" (গৌতমসূত্র, ১. ১-৩), এখানে অন্যতম প্রমাণ শব্দ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু হরিভদ্র লিখিয়াছেন শাব্দিক, "প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চোপমানং

---

* "There is one point of usefulness of the Pandits. They come in contact with all classes of people and mix freely with all of them, a thing which graduates of the universities cannot do. They can therefore do an invaluable work in collection of folklore, information about the worship of inferior deities and so on, and if they can be made enumerators, much of the trouble experienced by Mr. Gait in the present census work, will be avoided in future censuses."—The Conference of Orientalists including Museums and Archaeology Conference held at Simla, July, 1911, p. 59.

* "প্রমেয়ং ত্বাত্মদেহাদ্যংবুদ্ধীন্দ্রিয়সুখাদি চ।"—এসিয়াটিক সোইসাটি মুদ্রিত পাঠ। "প্রমেয়ং ত্বাত্মদেহার্থবুদ্ধীন্দ্রিয়সুখাদি চ।"—চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ। "চ" শব্দ থাকায় পূর্ব্বপাঠই সাধুতর বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে উভয় পাঠেই, "দ" স্থলে ভুলে "ন" ছাপা হইয়াছে।

শান্দিকং তথা।" ১৩ শ্লোক। আবার পরে (২৪) তিনি শান্দ ও বলিয়াছেন। সংশয়ের লক্ষণ তিনি একই কথায় সারিয়া দিয়াছেন; ফলত ইহা ঠিক হইলেও মূল ন্যায়সূত্রে যেরূপ ভাবে ইহা বলা হইয়াছে, সেরূপ তিনি বলেন নাই। এখানে কেহ বলিয়া বসিতে পারেন, হরিভদ্র যখন সংশয়ের লক্ষণ বলিতেছেন "কিমেতদিতি সন্দিগ্ধঃ প্রত্যয়ঃ সংশয়ো মতঃ", তখন প্রাচীন মূল গৌতম সূত্রেও ইহাই, অথবা ইহারই অনুরূপ কিছু পাঠ ছিল, "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ -" ইত্যাদি সূত্রটি পরে কেহ সেইস্থানে বসাইয়া দিয়াছেন। হরিভদ্রের দৃষ্টান্তের লক্ষণেও এই কথা বলিতে পারা যায়। স্পষ্টতই হরিভদ্র এই-সকল স্থানে ফল-কথাটি লিখিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য সুখ শব্দটিকেও তিনি এইরূপই কোন এক ভাবে লিখিয়াছেন। ন্যায়দর্শনে কেবল দুঃখই প্রমেয় নহে, দুঃখ হইতে অপবর্গও (মুক্তিও) প্রমেয়। আমাদের মনে হইতেছে, হরিভদ্র সুখ বলিয়া দুঃখ ও তাহা হইতে অপবর্গ এই উভয়কেই একত্র ভঙ্গীতে সূচনা করিয়া থাকিবেন। দুঃখাপবর্গ – দুঃখমুক্তি – দুঃখচ্ছেদ – দুঃখাভাব = সুখ। দুঃখাভাব-অর্থে সুখ শব্দ অনেকে অনেক স্থানে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বাৎস্যায়ন ভাষ্যেই একথা সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে (১. ১. ২২)—"আত্যন্তিকে চ সংসারদুঃখাভাবে সুখবচনাদাগমেঽপি সত্যবিরোধঃ, যদ্যপি কশ্চিদাগমঃ স্যাৎ মুক্তস্যাত্যন্তিকং সুখমিতি, সুখশব্দ আত্যন্তিকে দুঃখাভাবে প্রযুক্ত ইত্যেবমুপপদ্যতে, দৃষ্টো হি দুঃখাভাবে সুখশব্দ-প্রয়োগো বহুলং লোকে।" অনুবাদ, ২০১ পৃঃ। আরো, ঐ শ্লোকে "বুদ্ধীন্দ্রিয়- -" শব্দের পর দুঃখ শব্দটা বসাইয়া ছন্দো রক্ষা করাও কষ্ট ছিল। তাই তিনি সাধারণভাবে বক্তব্য বিষয়টা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আর একটা কথা ভাবিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় জানা যায় (পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী প্রবন্ধ, p. 250), হরিভদ্রের সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী, কেহ বা ইহার পরেও ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী বলেন (পণ্ডিত হরগোবিন্দ দাস কৃত হরিভদ্রসূরিচরিত্রম্, কাশী)। পঞ্চম শতাব্দীই ধরা যাউক। বাৎস্যায়ন ভাষ্য নিশ্চয়ই ইহার পূর্ব্বে। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে ত স্পষ্টই ঐ সূত্রে দুঃখ শব্দ ধরা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে, এবং বলাও হইয়াছে সেখানে দুঃখ শব্দ দেওয়া হইয়াছে কেন। হরিভদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক যখন বলিতেছেন মূলে দুঃখ শব্দই ছিল, তখন হরিভদ্রের উপর কিরূপে ততটা বিশ্বাস করিতে পারা যায়?

হরিভদ্র সুখ শব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার টীকাকারেরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। বরং গুণরত্নের (১৪০৯ খ্রী অ.) ব্যাখ্যায় প্রচলিত "দুঃখ-"পাঠযুক্ত সমগ্র ন্যায়সূত্রটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বাৎস্যায়নকেই অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "সুখস্যাপি দুঃখাবিনাভাবিত্বাৎ দুঃখত্বভাবনার্থমুপদিশ্যতে।" হরিভদ্রের সুখ শব্দ প্রয়োগ করিবার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকিলে, জৈনাচার্য্য-পরম্পরায় গুণরত্নের নিকট তাহা পৌঁছিবার সম্ভাবনা ছিল। আরো ভাবিতে হইবে। যখন বাৎস্যায়ন-সম্প্রদায়ে সুস্পষ্ট দুঃখ শব্দ ও তাহার ঐরূপ ব্যাখ্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন হরিভদ্র সুখ শব্দ প্রয়োগ করিলেও তাঁহার টীকাকারেরা বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না কেন? ন্যায়শাস্ত্রের কথা, ইহা ত যেমন-তেমন উপেক্ষণীয় বিষয় নহে। ইহার ঐ একমাত্র সমাধান আমাদের মনে হয় যে, হরিভদ্র সুখ শব্দ ঐ পূর্ব্ববর্ণিত ভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার-প্রভৃতি হরিভদ্রের পরবর্ত্তী। হরিভদ্রের সুখ-শব্দ প্রয়োগের তাদৃশ বিশেষ কোন একটা উদ্দেশ্য থাকিলে তাঁহাদের তাহা আলোচনা করার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, তাহাও ত কিছু দেখা যায় না।

শাস্ত্রী ও বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের কথা হইতেছে নৈয়ায়িকেরা সর্ব্বশুভবাদী (optimistic) ছিলেন, দুঃখবাদী (pessimistic) নহেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এসম্বন্ধে এইমাত্র যুক্তি যে, হিন্দুরা কখন অত্যন্ত দুঃখবাদী ছিলেন না, আর মীমাংসক ও বৈদান্তিক উভয়েরই চরম লক্ষ্য যখন সুখ, তখন নৈয়ায়িকেরও সেরূপ হইবে না কেন? ইহার ত কারণ দেখা যায় না—"Sukha is the ultimate goal of the Mimamsakas, of the Vedantins, the two orthodox systems of Hindu philosophy. Why should Nyaya be so pessimistic? There is no reason for it,......" এ-যুক্তি বিচারসহ নহে। এক জাতির কোন একটা বিশেষ মত থাকিলেও পরে তাহার মধ্যে কাহারো কাহারো সেই মতের পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। নানা মুনির নানা মতটা এইরূপেই হইয়াছে। বেদান্ত ও মীমাংসায় দুঃখবাদ থাকা বা না থাকার উপর ন্যায়ের দুঃখবাদ থাকা বা না থাকা নির্ভর করিতে পারে না। কেহ ত ঐরূপ নিয়মও করিয়া দেয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় যেভাবে বিচার করিয়া প্রচলিত ন্যায়দর্শনকে দুঃখবাদের (pessimism-এর) কোঠায় ফেলিয়াছেন, সেইরূপে দেখিলে মীমাংসা ও বেদান্তকেও সেই কোঠায় ফেলিতে হয়। রোগ-শোক ও জরা মৃত্যুর যন্ত্রণা সংসারে অনিবার্য্য, অপবর্গে ইহা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আমাদের সব দর্শনেরই ইহা সাধারণ কথা। সংসারে তুমি যে সুখ পাইতেছ, তাহা বিশুদ্ধ বা পূর্ণ সুখ নহে; কিন্তু এমন সুখ আছে যাহার অবসান নাই, যাহা সব সময়েই ইচ্ছামাত্রেই পাওয়া যায়। অথবা, এটা স্পষ্টই দেখা যায়, রোগ-শোক জরা মৃত্যুর যন্ত্রণা কোনো না কোন প্রকারে তোমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেই। এমন একটা স্থান আছে, বা এমন একটা অবস্থা লাভ করিতে পারা যায়, যেখানে ও-সকলের কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তুমি ইহা লাভ করিতে পার। তাহার উপায় আছে। দর্শনগুলি ত সবই এই শিক্ষা দিতেছে। এইরূপ শিক্ষা দেওয়ায়, সকলেই পরবর্ত্তী অবস্থাকে, বা অপর কথায়, মুক্তিকেই যখন পরম উপাদেয় বলিয়া মনে করে; তখন সংসারের উপভোগ্যতা, রমণীয়তা, বা উপাদেয়তা স্বভাবতই দূরীভূত হয়, তাহাতে আসক্তি কমিয়া যায়। পূর্ণানন্দের নিকট খণ্ডানন্দের কোন আদরই থাকে না। সংসারভোগে এই যে অনাসক্তির উদ্দীপন, আমাদের দর্শনগুলি তাহা না করিয়া পারে নাই। করিতেই হইবে, অন্যথা জীবকে পূর্ণানন্দের অধিকারী করিবে কি প্রকারে? প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রে ইহা করা হইয়াছে, ইহাতেই যদি ইহাকে দুঃখবাদী (pessimistic) বলিতে হয়, বলিয়াছি মীমাংসা-বেদান্তকেও তাহাই বলিতে হয়। নারদ সনৎকুমারের নিকট গিয়া বলিতেছেন, পড়া শুনার আর কিছু তাঁহার বাকী নাই, সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি শোক উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, শোকের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তিনি যেন তাঁহাকে আত্মবিদ্ করিয়া শোকের পরপারে লইয়া যান (ছান্দোগ্য, ৭১৩)। ইহাতে শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে মনে করা যাইতে পারে, অত বিদ্যার অধ্যয়নেও যখন বস্তুতঃ কিছু হয় না, শোকেই ডুবিয়া থাকিতে হয়, সুখ পাওয়া যায় না, তখন উপনিষৎ স্পষ্টতই এখানে pessimism প্রচার করিয়াছেন। সংসারে জরা মৃত্যু-শোক ভরিয়া আছে, কিন্তু আত্মার নিকটে "ন জরা মৃত্যু র্ন শোকঃ" (ঐ, ৮.১.১)। এই-সব শুনিয়া বুঝিয়া সংসারকে কে উপভোগ্য বলিয়া মনে করিবে? অতএব এখানে pessimism। একজন লেখক বস্তুতও ভারতের দুঃখবাদ (Indian pessimism) সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন:—"Its roots are to be found in that monistic tendency of thought which made its appearance so early, and which is expressed in the '*Upanisads*' with so rigorous

finality. If only the '*atman*' is real, it follows that existence otherwise must be illusory and evil. In the language of Vedanta philosophy, it is *avam* (?) 'emptiness,' 'vanity'; it is '*maya*,' 'mirage."—Alexander Martin in the article 'Pessimism and Optimism' in the Encyclopadia of Religion and Ethics, Vol 9.p 804. মীমাংসাও মুক্তির কথা বলে, তাহা বলিতে গিয়া ও তাহার উপাদেয়তা দেখিতে গিয়া লৌকিক ক্রিয়া কর্ম্মের ও সুখের দোষ ও অলৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের ও স্বর্গ বা মুক্তির সুখ-বিশেষের গুণবর্ণনা করিয়া এই দিকেই লোককে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। সাংসারিক বা লৌকিক সুখকে ইহা শুভ বলিতে পারে নাই। তাই ইহাকেও optimistic না বলিয়া pessimistic বলাই পূর্ব্বোক্তরূপে সঙ্গত হয়। সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, সবই এই দলে আসিয়া পড়ে। কিন্তু ইহারা কি বস্তুতই pessimistic? ইহারা কি সংসারটাকে একবারে অশুভ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া লোককে দিনরাত 'হা, হুতাশ' করিতে শিক্ষা দিয়াছে, অথবা যাহাতে বস্তুতঃ এই সংসারেই সুখ শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহার কৌশল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে? গীতার উপদেশটা ইহাদের সহিত মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। এখানে স্পষ্টই "জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্" করিতে বলা হইয়াছে, আবার অর্জ্জুনকে যুদ্ধেও প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের মন্তব্য সঙ্গত মনে হয়। তিনি ইহাকে pessimism না বলিয়া endæmonism (i. e the system of ethics that maintains that happiness is the test of rectitude) বলা ভাল মনে করেন। একটু দীর্ঘ হইলেও আমরা এখানে তাহা তুলিয়া দেওয়া ভাল মনে করিতেছি:—

"All the Indian philosophers have been charged with pessimism, and in some cases such a charge may seem well founded, but not in all. People who derived their name for good from a word which originally meant nothing but being or real, Sat, are not likely to have looked upon what is as what ought not to be. Indian philosophers by no means dwelling for ever on the miseries of life. They are not always whining and protesting that life is not worth living. That is not their pessimism. They simply state that they received the first impulse to philosophical reflection from the fact that there is suffering in the world. They evidently thought that in a perfect world suffering had no place, that it is something anomalous, something that ought at all events to be accounted for, and, if possible, overcome Pain, certainly, seems to be an imperfection, and, as such, may well have caused the question why it existed, and how it could be annihilated. But this is not the disposition which we are accustomed to call pessimism. Indian philosophy contains no outcry against divine injustice, and in no way encourages suicidal expedients. They would, in fact, be of no avail, because, according to Indian views, the same troubles and the same problems would have to be faced again and again in another life. Considering that the aim of all Indian philosophy was the removal of suffering, which was caused by nescience, and the attainment of the highest happiness, which was produced by knowledge, we should have more right to call it endæmonistic than pessimistic."—*The Six Systems of Indian Philosophy*, 1899, pp. 139 140.

বন্ধুবর বেদান্ততীর্থ মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে সমর্থন করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। প্রচলিত ন্যায়সূত্রে দুঃখের অত্যন্ত বিমুক্তিকেই অপবর্গ বলা হইয়াছে ("তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ," ১-১-২২)। এই অপবর্গে আনন্দ থাকে বলিয়া ইহাতে কিছু বলা হয় নাই। তাই ন্যায়মতে দুঃখের অত্যন্ত ধ্বংসই মুক্তি এই মত প্রচলিত আছে। কিন্তু মাধবাচার্য্যের সংক্ষেপশঙ্করবিজয়ে বলা হইয়াছে যে, গৌতমের মুক্তিতে আনন্দ-সংবিৎ থাকে। বেদান্ততীর্থ মহাশয় ইহা দেখিয়া বলিতে চাহেন যে, মুক্তিবিষয়ে নৈয়ায়িকেরা মূলত সর্ব্বশুভবাদী ছিলেন ("the Naiyayikas are credited with an optimistic view of salvation"), এবং এইরূপে শাস্ত্রী মহাশয়কে সমর্থন করিয়া বলেন যে, মূলত ন্যায়ের প্রমেয়সূত্রে সুখ শব্দই ছিল, দুঃখ শব্দ নহে। এখানে বলিতে পারা যায়, প্রচলিত ন্যায়সূত্রে দুঃখধ্বংসকেই মুক্তি বলা হইয়াছে; যদি মুক্তিতে আনন্দের সম্বন্ধ দেখিয়া সেখানে optimism বলা যায়, তবে দুঃখধ্বংস দেখিয়াও কি তাহা বলা যাইতে পারে না? যদি দুঃখকেই মুক্তি বলা হইত, এবং সেই মুক্তিই সকলের উপাদেয় বলিয়া প্রচার করা হইত, তবে সেখানে pessimism বলিতে পারা যাইত। অতএব সংক্ষেপ-শঙ্করবিজয়েরই কথায় যে, মুক্তিবিষয়ে নৈয়ায়িকদের optimistic view বুঝা যাইতেছে, তাহা নহে।

সংক্ষেপশঙ্করবিজয়ে ন্যায় বৈশেষিকের মুক্তির ভেদে বলা হইয়াছে:—

"অত্যন্তনাশে গুণসঙ্গতেযা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসংবিৎসহিতা বিমুক্তিঃ॥"

এখানে বলা হইতেছে, গুণসঙ্গতির অত্যন্তনাশে অকাশের ন্যায় যে অবস্থিতি, ইহাই কণাদ বা বৈশেষিকের মতে মুক্তি; আর গৌতমের মুক্তিও তাহাই, কেবল এইমাত্র ভেদ যে, ইহাতে আনন্দের অনুভব থাকে, বৈশেষিকের মুক্তিতে তাহা থাকে না। গুণ-সঙ্গতির অত্যন্ত নাশ অর্থে স্পষ্টতই বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ গুণের আত্যন্তিক উচ্ছেদ। বৈশেষিক সম্প্রদায়ে মুক্তির এই অবস্থা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু গৌতম সম্প্রদায়ে কি ইহা এইরূপ স্বীকৃত হয়? হইলে, কোথায়? প্রমাণ কি? সংক্ষেপশঙ্করবিজয়কার গৌতমের মুক্তিতে কেবল আনন্দের অনুভবমাত্র বিশেষ দেখাইয়া উভয়ের মুক্তিকে অন্যান্য অংশে একই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যতদূর বলিতে পারি তাহাতে বস্তুত তাহা নহে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বেদান্ততীর্থ মহাশয় যেরূপ বলিয়াছেন, ন্যায় বৈশেষিকের মত পরবর্ত্তীকালে এমন মিশিয়া গিয়াছে যে, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যেরও রচয়িতা শ্রীহর্ষ পর্য্যন্ত স্থানবিশেষে (নৈষধ, ১৭৭৫) গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। সংক্ষেপশঙ্করবিজয়কারেরও এখানে সেই দশা হইয়াছে। ইঁহার এই গ্রন্থখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর আমাদের হয় নাই; কিন্তু এই একটি শ্লোকেই যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইঁহার মতামতের উপর নির্ভর করিয়া মূল ন্যায়সূত্রের পাঠ বিচার করা কোনোরূপেই নিরাপদ নহে।

ভাল, সংক্ষেপশঙ্করবিজয়কার কোথায় পাইলেন যে, গৌতমের মুক্তিতে আনন্দ-সংবিদ্ থাকে? আমাদের মনে হইতেছে, হয় ভাসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়সার (Bibliotheca Indica, 1910; and Vishvanatha P. Vaidya, Bombay 1910), অথবা তাহারই অন্যতম টীকাকার ভূষণ বা ন্যায়ভূষণের মতের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে (ঐ, Introduction, p. 5) ভাসর্ব্বজ্ঞ নবম শতাব্দীর লোক। তিনি নিজের ন্যায়সারের শেষ পঙ্‌ক্তিতে লিখিয়াছেন—"তৎ সিদ্ধমেতন্ নিত্যসংবেদ্যমানেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য

মোক্ষঃ।" ন্যায়সারের জয়সিংহকৃত টীকায় এখানে লিখিত হইয়াছে—"সুখেনেতি পদেন কণাদাদিমতে মোক্ষপ্রতিক্ষেপঃ।" যদিও বৈশেষিক দর্শনেরই টীকাকার (শঙ্করমিশ্র, ১.১.৪) বলিয়াছেন—"নিঃশ্রেয়সম্ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ", তথাপি, ইহা বৈশেষিক দর্শনের ফলিতার্থ হইলেও মূল কথা নহে। ইহা যতটা গৌতমের মত প্রকাশ করে, কণাদের ততটা করে না। কণাদসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ", (৫, ২, ১৮)। দ্রষ্টব্য—প্রশস্তপাদ, "তদা নিরোধাৎ নির্বীজস্যাত্মনঃ শরীরাদিনিবৃত্তিঃ পুনঃ শরীরাদ্যনুৎপত্তৌ দগ্ধেন্ধনানলবদ্ উপশমো মোক্ষ" (কাশী, ২৮২)। তাই দেখা যাইতেছে, কণাদ ও গৌতমের মুক্তিবাদ বহুদিন হইতেই স্থানে-স্থানে গোলমালে পরস্পরে মিশিয়া গিয়াছে।

ভাসর্ব্বজ্ঞ ন্যায়ের মুক্তিতে সুখানুভবের কথা বলিয়াছেন বলিলাম। তাঁহার টীকাকার ন্যায়ভূষণও যে ইহা এইরূপ প্রচার করিবেন, তাহা খুবই স্বাভাবিক। তাঁহার টীকা আমরা দেখি নাই। কিন্তু তিনি যে বস্তুতই ইহা করিয়াছিলেন, এবং লোকে তাহা প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহা ন্যায়পরিশুদ্ধিতে (চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ, ১৭ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে :—"অতএব হি ভূ ষ ণ ম তে নিত্যসুখসংবেদনসম্বন্ধসিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা।" ন্যায়পরিশুদ্ধিকারও এই মত পোষণ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ন্যায়দর্শনে দুঃখের অত্যন্ত বিমুক্তিকে অপবর্গ বলা হইয়াছে। সেখানে এরূপ কিছু বলা হয় নাই যে, অপবর্গে আনন্দ থাকে না। অপবর্গে যে আনন্দ থাকে, শ্রুতিতে তাহা বলা হইয়াছে। অতএব বলিতে পারা যায়, ন্যায়ের মুক্তিতে আনন্দও থাকে।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করি। প্রাচীন ন্যায়ে প্রধানত পাঁচখানি গ্রন্থ ধরা হইয়া থাকে ; (১) গৌতমের ন্যায়সূত্র, (২) বাৎস্যায়নের ভাষ্য, (৩) উদ্যোতকরের বার্ত্তিক, (৪) বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা, ও (৫) উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি। ইহাদের পর-পর গ্রন্থগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থসমূহের টীকা। নব্য ন্যায়ের প্রভাবে প্রাচীন ন্যায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, সর্ব্বত্রই ইহার পঠন পাঠন একরূপ বন্ধই হইয়া পড়িয়াছিল। পরে গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হওয়ায়, অল্প কিছুদিন হইল এখানে ওখানে-সেখানে আবার ইহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এলাহাবাদের "Indian Thought" পত্রিকায় (Ed. Pandit Ganganath Jha, M. A. etc.) বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে, আর "Sacred Books of the Hindus" নামক গ্রন্থাবলীতে (Panini Office, Allahabad) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ইংরেজীতে রচিত নূতন ব্যাখ্যার সহিত ন্যায়সূত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই আলোচ্য পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যে কেহ ইহা দেখিবেন তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, ইহা যেরূপ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের সহিত রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত অপর দুইখানির তুলনাই হইতে পারে না। সূত্রের বা ভাষ্যের প্রত্যেকটি পদ ব্যাখ্যা করিতে বার্ত্তিক, তাৎপর্য্যটীকা, ও পরিশুদ্ধিতে যেখানে যাহা পাওয়া যায়, বা যেখানে যাহা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে, তিনি তাহা উল্লেখ বা ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটি করেন নাই। নৈয়ায়িক অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভবের ভয়ে প্রত্যেকটি পদ বিচার করিয়া মাপিয়া-জুখিয়া প্রয়োগ করেন। কোথায় কি ত্রুটি হইতেছে না হইতেছে, কে কি সন্দেহ করিবে, না-করিবে, এই সব এড়াইবার জন্য যেখানে যতটুকু যা নিবেশ-প্রবেশ যোগ-বিয়োগ করিতে হয়, তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুস্তকে সর্ব্বত্রই তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া তিনি এক-একটা বিষয়ের এত বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন যে, তাহা যেন ফুরাইবার নহে। এত বলিয়াও যেন নিজে পরিতৃপ্ত নহেন, আরো বলিতে ইচ্ছা হয়। ইহাতে একদিকে বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ায় উপকার হইলেও, অপর দিকে গ্রন্থখানি এত বিপুলায়তন হইয়া পড়িয়াছে যে, আকার দেখিয়াই অনেকে ভয় পাইবেন। মূল পুস্তকের পাঁচ অধ্যায়ের মধ্যে মোটে এই প্রথম অধ্যায়মাত্র বাহির হইয়াছে, ইহার আকার রয়াল ৮ পেজ ফর্ম্মার পৌনে পাঁচ শ পৃষ্ঠা। আমাদের মনে হয়, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অত ফেনাইয়া না লিখিয়া আরো সংক্ষেপে লিখিতে পারা যাইত। স্থানে-স্থানে পুনরুক্তিও আছে, ইহাও বর্জ্জন করিলে ভাল হইত।

আলোচ্য পুস্তকে প্রথমে এক-একটি করিয়া (১) গৌতম সূত্র, ও (২) তাহার বঙ্গানুবাদ, পরে (৩) মূল বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ও (৪) তাহার বঙ্গানুবাদ, তাহার পর স্থানে-স্থানে (৫) বিবৃতি, এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বত্র (৬) টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয় যাহাকে অনুবাদ বলিয়াছেন, বস্তুত তাহাকে অ নু বা দ না বলিয়া বঙ্গভাষায় একরূপ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বলিলেই সঙ্গততর হয়। একটু আদর্শ দেওয়া যাউক, ভাষ্যের সর্ব্বপ্রথম পঙ্‌ক্তিই তুলিতেছি :—

ভাষ্য

প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদ্ অর্থবৎ প্রমাণম্।

অনুবাদ

প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে প্রবৃত্তির সফলতা হয়, অতএব প্রমাণ ঐ পদার্থের অব্যভিচারী (এবং) সর্ব্বাপেক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যেহেতু গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকে প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সেই প্রবৃত্তিই সফল হয়, অতএব বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থকে যাহা এবং যেরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেইরূপই হয়, কখনও তাহার অন্যথা হয় না, এবং সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণেরই প্রয়োজন অধিক।

ইহার পর প্রায় ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বিবৃতি।

এখানে ইহা ঠিক অনুবাদ নহে। বার্ত্তিক-প্রভৃতিতে ঐ পঙ্‌ক্তিটি লইয়া যে-সব কথা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহারও সংক্ষেপে কিছু-কিছু ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, ঐ পঙ্‌ক্তিটির ঠিক আক্ষরিক অর্থ সরল ভাষায় দিয়া পরে বিবৃতিতে অন্যান্য বক্তব্য প্রকাশ করিলে ভাল হইত। এইরূপ একটা-কিছু আক্ষরিক অনুবাদ করা যাইতে পারে :—

প্রমাণের দ্বারা (কোনো) পদার্থের জ্ঞান হইলে, (লোকের সেই পদার্থ গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবার) প্রবৃত্তি সফল হয়, এবং ইহাতেই প্রমাণ সার্থক হইয়া থাকে।

এত বড় গ্রন্থের আলোচনায় স্বভাবতই প্রত্যেকেরই বহু কথা বলিবার থাকে, এবং সর্ব্বত্রই যে সকলে একমত হইবেন, তাহাও হয় না। তাই যদিও আমাদের এটা-সেটা করিয়া অনেক বলিবার ছিল, তথাপি বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আর দুই-একটি কথা বলিয়াই এই আলোচনা শেষ করিব।

প্রথম সূত্রে উক্ত হইয়াছে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে নিঃ শ্রে য় স লাভ হয়। এই নিঃ শ্রে য় স শব্দের বিবক্ষিত অর্থ কি, তর্কবাগীশ মহাশয় তাহা বেশ আলোচনা করিয়াছেন। মূলগ্রন্থকার কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে লিখিয়াছেন, তাহা সেই গ্রন্থে ঐ শব্দের অপরাপর প্রয়োগ দেখিয়াও নির্ণয় করিতে পারা যায়, এবং অনেক স্থলে ইহা খুবই ঠিক হয়। গ্রন্থকারের নিজেরই কথায় তাঁহার গ্রন্থের অর্থ লাভ করিতে পারা যায়। গৌতমসূত্রে যেখানে-যেখানে মুক্তির কথা আসিয়াছে, সেখানে সর্ব্বত্রই অ প ব র্গ এই একটি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ; সমগ্র গ্রন্থে ৮ বার (১.১,২,৯,২২ ; ৩.২.১৩ ; ইত্যাদি)

এইরূপ দেখা যায়। তর্কবাগীশ মহাশয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাতে বলা যাইতে পারে, সূত্রকার যদি প্রথমসূত্রে মুক্তি বুঝাইতে চাহিতেন, তাহা হইলে অপবর্গই প্রয়োগ করিতেন। প্রথম সূত্রে নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা সাধারণত সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও দ্বিতীয় সূত্রে অপবর্গ শব্দের দ্বারা মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাই আমাদের ভাল মনে হয়।

এই প্রথম সূত্রেরই ভাষ্যে আছে (২২ পৃঃ)—

"হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং, হানমাত্যন্তিকং, তস্যোপায়োঽধিগন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যক্ বুদ্ধা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি,।"

ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে :—

'(১) "হেয়" অর্থাৎ দুঃখ, সেই দুঃখের নিষ্পাদক অর্থাৎ হেতু অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি, (২) "আত্যন্তিক" হান অর্থাৎ সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সাধন তত্ত্বজ্ঞান, (৩) তাহার "উপায়" অর্থাৎ ঐ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শাস্ত্র, (৪) "অধিগন্তব্য" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লভ্য, মোক্ষ, এই চারিটি (হেয়, হান, উপায়, অধিগন্তব্য) "অর্থপদ" অর্থাৎ পুরুষার্থ স্থান সম্যক্ বুঝিয়া মোক্ষ লাভ করে।'

এখানে অনেক ত্রুটি হইয়াছে, এবং পরে (৮৬ পৃঃ) এই ত্রুটি আবার করা হইয়াছে। এখানে মূল চারিটি বিষয়ের কথা বলা হইতেছে, (১) প্রথম, হেয়, অর্থাৎ পরিত্যাজ্য দুঃখ ; (২) দ্বিতীয়, হেয়হেতু অর্থাৎ পরিত্যাজ্য দুঃখের হেতু, কারণ ; (৩) তৃতীয়, হান অর্থাৎ পরিত্যাজ্য দুঃখের হানি, বিচ্ছেদ, ধ্বংস ; (৪) চতুর্থ, হানের উপায়, অর্থাৎ সেই দুঃখ ধ্বংসের উপায়। অপর কথায় (১) দুঃখ, (২) দুঃখের কারণ, (৩) দুঃখের ধ্বংস, এবং (৪) দুঃখ ধ্বংসের উপায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাই আর্য্যসত্যচতুষ্টয় নামে প্রসিদ্ধ, যথা, "দুক্খং অরিয়সচ্চং, দুক্খসমুদয়ং অরিয়সচ্চং দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং।" পাতঞ্জলদর্শনেরও সম্বন্ধে ভাষ্যকার ব্যাসদেব (২,১৫) চিকিৎসাশাস্ত্রের উপমা দিয়া ইহাই বলিয়াছেন :—

"যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং—(১) রোগঃ, (২) রোগহেতুঃ, (৩) আরোগ্যং, (৪) ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব ; তদ্‌যথা—(১) সংসারঃ, (২) সংসারহেতুঃ, (৩) মোক্ষঃ, (৪) মোক্ষোপায় ইতি। তত্র (১) দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, (২) প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, (৩) সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্, (৪) হানোপায়ঃ সম্যগ্ দর্শনম্।"

ভাসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়সারেও (কলিকাতা, ৩৪-৩৫ পৃঃ ; বোম্বাই ২৬ ২৭ পৃঃ) ভাষ্যের ঐ পঙ্‌ক্তি ধরিয়া এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :— "হেয়ং দুঃখম্ ··, তস্য নির্ব্বর্ত্তকম্ অসাধারণং কারণম্ ·, হানং দুঃখ বিচ্ছেদঃ,...তস্যোপায়ঃ তত্ত্বজ্ঞানমাত্মবিষয়ম্।"

অতএব আলোচ্য পুস্তকে ঐ উদ্ধৃত ভাষ্যপঙ্‌ক্তির পদচ্ছেদ-চিহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া অনুবাদ পর্য্যন্ত সমস্তই সংশোধন করা আবশ্যক।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের পক্ষে এখানে একটা কথা বলিতে পারা যায়, এবং তিনি বলিবেনও। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তিনি এখানে বার্ত্তিককে (দ্রষ্টব্য—ন্যায়বার্ত্তিক: কলিকাতা, ১৩পৃঃ) অনুসরণ করিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, নম আচার্য্যেভ্যঃ! সত্যকামা বয়ম্, ন পুনঃ স্পর্দ্ধালবো, জিগীষবঃ। আমাদের মনে হইতেছে, হয় বার্ত্তিককার এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য যথাযথরূপে গ্রহণ করেন নাই, অথবা বার্ত্তিকের পাঠ বিশুদ্ধ নহে, ইহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ভাষ্যকারের পঙ্‌ক্তিটি প্রথমে কোনোরূপ পদচ্ছেদ-চিহ্ন না দিয়া উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং হানমাত্যন্তিকং তস্যোপায়োঽধিগন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যক্ বুদ্ধা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি।"

আমরা ইহাতে এইরূপ পদচ্ছেদচিহ্ন দিতে ইচ্ছা করি :—

"(১) হেয়ং, (২) তস্য নির্ব্বর্ত্তকং, (৩) হানমাত্যন্তিকং, (৪) তস্যোপায়োঽধিগন্তব্যঃ,—ইতি এতানি চত্বারি অর্থপদানি সম্যক্...।"

পূর্ব্বপ্রদর্শিত যোগশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৈদ্যকশাস্ত্রের, এবং ভাসর্ব্বজ্ঞের কথাটা এখানে মনে করিয়া দেখুন। আর অব্যবহিত পরেই উদ্ধৃত বার্ত্তিকের শেষ বাক্যটিও ("এতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সর্ব্বাসু অধ্যাত্মবিদ্যাসু সর্ব্বাচার্য্যৈ "বর্ণ্যন্তে") অনুধাবন করুন। বার্ত্তিকে এই ভাষ্যটুকু ব্যাখ্যা করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে—

"(ক) হেয়হানোপায়াধিগন্তব্যভেদাচ্চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যগ্ বুদ্ধা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতীতি। (খ) হেয়ং দুঃখং তস্য নির্ব্বর্ত্তকম্ অবিদ্যা-তৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ইতি। হানং তত্ত্বজ্ঞানং তস্যোপায়ঃ শাস্ত্রম্। অধিগন্তব্যো মোক্ষঃ। এতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সর্ব্বাস্বধ্যাত্মবিদ্যাসু সর্ব্বাচার্য্যৈর্ব্বর্ণ্যন্তে ইতি।"

আমরা নিজে কোনো পদচ্ছেদচিহ্ন না দিয়া মূল পাঠ যেরূপ মুদ্রিত আছে (Bibliotheca Indica Ed.) সেইরূপই তুলিলাম। এই অংশটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই আমাদের মত সমর্থিত হইবে।

প্রথমত, উদ্ধৃত (ক) চিহ্নিত অংশটি ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার শেষভাগটা (অর্থাৎ "চত্বারি অর্থপদানি··· গচ্ছতীতি) যে, ভাষ্য হইতে গৃহীত তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু প্রথম অংশটুকু ("হেয়হানোপাধিগন্তব্যভেদাচ্") ভাষ্যের পঙ্‌ক্তি হইতে গৃহীত নহে, ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এখানে নানা তর্ক উঠিতে পারে। (১) যদি বলা যায়, বার্ত্তিককার এখানে বাক্যটি সমগ্রই ভাষ্য হইতে তুলিয়াছেন, তাহা হইলে, বলিতে হইবে, আমরা প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকসমূহে এখানে যে ভাষ্যপাঠ পাইতেছি, তাহা সবই ভুল ; বার্ত্তিকধৃত পাঠই বিশুদ্ধ। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, নানাকারণে কেহই ইহা স্বীকার করিবেন না। (২) কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে, বার্ত্তিকের (ক)-চিহ্নিত অংশের শেষ অংশটুকুই বার্ত্তিককার মূল ভাষ্য হইতে অবিকল তুলিয়াছেন, আর প্রথমটুকু ভাষ্যের অর্থানুসারে নিজেনিজেই রচনা করিয়া লিখিয়াছেন। ইহা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, (/০) হয় বার্ত্তিককার ভাষ্যকারের সমগ্র কথাটি ভুলক্রমে গ্রহণ করেন নাই, অথবা (৵০) গ্রহণ করিলেও বার্ত্তিকের পাঠে তাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের পরের আলোচনায় ইহা স্পষ্ট হইবে।

এইবার বার্ত্তিকের পরের (খ)-চিহ্নিত অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখুন। বলা বাহুল্য, বার্ত্তিককার এই অংশে পূর্ব্ববর্ত্তী (ক)-অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন। (ক)-চিহ্নিত অংশে চারিটি কথা দেখান হইয়াছে এইরূপ—(১) হেয়, (২) হান, (৩) উপায়, ও (৪) অধিগন্তব্য ("হেয়হানোপায়াধিগন্তব্য ভেদাচ্চ")। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, (খ) চিহ্নিত অংশে চারিটির পরিবর্ত্তে বস্তুত পাঁচটি, কথা বলা হইয়াছে। যথা, (১) "হেয়ং দুঃখম্।" (২) তস্য নির্ব্বর্ত্তকম্ অবিদ্যাতৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ।" (৩) "হানং তত্ত্বজ্ঞানম্।" (৪) তস্যোপায়ঃ শাস্ত্রম্।" (৫) "অধিগন্তব্যো মোক্ষঃ।" এস্থানে আরো দেখিবার আছে। (ক)-চিহ্নিত অংশে (১) হেয়, (২) হান, (৩) উপায়, (৪) অধিগন্তব্য, এই চারিটি-মাত্র ধরা হইয়াছে, কিন্তু হেয়হেতু (=ভাষ্যের "তস্য নির্ব্বর্ত্তকম্") মোটেই ধরা হয় নাই। অথচ (খ)-অংশে "তস্য নির্ব্বর্ত্তকম্ অবিদ্যাতৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ" বলা হইয়াছে। আবার শেষে গিয়া "এতানি চত্বারি অর্থপদানি" বলিয়া

মূল কথাটা ঠিক রাখা হইয়াছে। আরো দেখিতে হইবে। মূল চারিটি কথার মধ্যে অন্যতম যে, দুঃখধ্বংস, (খ)-অংশে তাহার কিছুই বলা হইল না। অথচ অধ্যাত্মবিদ্যা হিসাবে ন্যায়ের মূল লক্ষ্যই হইল ঐ কথা ("বাধনা লক্ষণং দুঃখম্॥" "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ॥" ১-১-২১-২২)। ভাষ্যকারও "হানম্ আত্যন্তিকম্" বলিয়া ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপর দিকে দুঃখহানির উপায় দুইবার বলা হইয়াছে, (/০) "হানং তত্ত্বজ্ঞানং", (৶০) "তস্যোপায় শাস্ত্রম্।" হা ন শব্দে স্পষ্টতই এখানে করণে ল্যুট্ বলিতে হয়। আবার দেখুন, ভাষ্যের "হানম্ আত্যন্তিকম্" এই স্থলের হা ন শব্দে যদি উল্লিখিত বার্ত্তিকের মতে ত ত্ত্ব জ্ঞা ন ই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আ ত্য ন্তি ক কথাটা ইহার সহিত তত ভাল খাটে না। তত্ত্বজ্ঞান আত্যন্তিক হা ন অর্থাৎ আত্যন্তিক হানির সাধন, ইহা একরূপে বলা যাইতে পারে, এবং তর্কবাগীশ মহাশয় ইহা বলিতে বাধ্যও হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ আলোচিত হইল, তাহাতে ইহা মোটেই ভাল হয় না। হা ন শব্দে এখানে যে, দুঃখধ্বংস বুঝাইতেছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এবং এইরূপে আ ত্য ন্তি ক পদের সহিত ইহার অন্বয়ে কোনো বাধা থাকে না। আরো একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বার্ত্তিকে বলা হইয়াছে যে, এই চারিটি কথা সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যাতে সমস্ত আচার্য্যেই বর্ণনা করিয়া থাকেন ("এতানি চত্বারি অর্থপদানি সর্ব্বাস্বধ্যাত্মবিদ্যাসু সর্ব্বাচার্য্যৈর্ব্বর্ণ্যন্তে")। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, যোগশাস্ত্রপ্রভৃতিতে ঐ চারিটি কথা হইতেছে (১) হেয় অর্থাৎ দুঃখ; (২) তাহার হেতু, অর্থাৎ দুঃখের কারণ, (৩) তাহার হান, অর্থাৎ দুঃখের ধ্বংস, এবং (৪) তাহার উপায়, অর্থাৎ দুঃখধ্বংসের উপায়। অধ্যাত্মবিদ্যার অন্যান্য আচার্য্যেরা এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রান্তরের এমন কি স্বশাস্ত্রেরও অপর গ্রন্থের সহিত (যেমন, ভাসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়সার) সামঞ্জস্য করিতে হইলে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হয়। তাই মনে হয়, হয় এখানে বার্ত্তিককারই গোলমাল করিয়াছেন, অথবা কাল-প্রভাবে তাঁহার এই স্থানের পাঠেরই গোলমাল হইয়াছে। কিন্তু এখানে যে, বস্তুত পাঠের গোলমাল হয় নাই, তাহা বার্ত্তিকেই বুঝা যায়। পূর্ব্বে (৪ পৃঃ) আরো একবার এইরূপেই ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয় বার্ত্তিকের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা স্থাপন করাতেই এইরূপ করিয়া ফেলিয়াছেন। ভাষ্যের পঙ্‌ক্তি এখানে খুব পরিষ্কার। ভাষ্যের সহিত বার্ত্তিকের যে, এখানে মিল নাই, বাচস্পতি মিশ্রের কথাতেও তাহা সূচিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন (তাৎপর্য্যটীকা, ১১ পৃঃ) "এতদ্ বার্ত্তিকগ্রন্থস্য এতাদৃশং ব্যাখ্যানং, ভাষ্যগতস্য তু অন্যথা ভবিষ্যতি।"

এই আলোচ্যস্থলেই অনুবাদে লিখিত হইয়াছে (২২পৃঃ) "সেই দুঃখের নিষ্পাদক অর্থাৎ হেতু অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রভৃতি।" বলা বাহুল্য ইহা ভাষ্যের অনুবাদ নহে, বার্ত্তিককারের ব্যাখ্যা, বা সেই ব্যাখ্যার অনুবাদ। কিন্তু প্র ভৃ তি শব্দটি অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে? বার্ত্তিকে ইহা নাই।

১৭৩ পৃষ্ঠে আলয়বিজ্ঞানের প্রবাহকেই বি জ্ঞা ন স্ক ন্ধ বলা হইয়াছে। বস্তুত বি জ্ঞা ন স্ক ন্ধ বলিতে বৌদ্ধশাস্ত্রে যাহা বুঝা যায়, আমাদের বেদপন্থীর সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে তাহার সবিশেষ বিবরণ কোথাও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রে ৮৯টি চিত্তধর্ম্মের সমষ্টি বা রাশি বা সমূহকে বি জ্ঞা ন স্ক ন্ধ বলা হইয়া থাকে। স্ক ন্ধ শব্দের অর্থ রাশি, সমূহ। আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দার্শনিকগণকে বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণভঙ্গবাদ ও শূন্যবাদের বিপক্ষে বহু আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু স্বয়ং বৌদ্ধেরা নিজের মতকে কিরূপ বর্ণনা বা স্থাপন করেন, তাহা তাঁহাদের মূলগ্রন্থ হইতে প্রায়ই আলোচনা করিয়া দেখেন না, বা দেখিবার সুবিধা পান না। বেদপন্থীদের দর্শনশাস্ত্রে খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের দুর্ব্বল অংশসমূহই উদ্ধৃত হইয়াছে; অথবা যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও উপযুক্তরূপে হয় নাই, বা খণ্ডনের উপযোগী করিয়াই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাই বস্তুত ঐ-সকলের মত কি, তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার সুবিধা হয় না। অতএব আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দার্শনিকগণের এ বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।

তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন (১৭৩ পৃঃ) "পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তপ্রকার বুদ্ধি ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কিছু মানেন নাই: তাই তাঁহাদিগকে 'বৌদ্ধ' বলা হইয়াছে।" কোথায় ইহা বলা হইয়াছে? বু দ্ধ দে বে র প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলেন বলিয়াই ত তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ বলা হয়। তর্কবাগীশ মহাশয়ের ঐ ব্যাখ্যা যদি নিজের না হয়, তবে তিনি যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হইত, কেননা ইহা নূতন ব্যাখ্যা।

৪০ পৃষ্ঠায় বহুবার আ হ্নৈ নৈ বু ক লেখা হইয়াছে। খুব সম্ভব ইহা তাৎপর্য্যটীকার একস্থানে (৩১ পৃঃ) মুদ্রিত পাঠ (আহ্নৈনৈবুকাদিলক্ষণা ক্রিয়া") দেখিয়াই করা গিয়াছে। কিন্তু আমরা মীমাংসাদর্শনের নানাস্থানে মুদ্রিত শবরভাষ্য-প্রভৃতি বহু পুস্তকে আ হ্নী নৈ বু ক পড়িয়াছি ও দেখিতেছি। (১৮) ও ২৪২ পৃষ্ঠায় ত ত্ত্ব নি র্ণি নী ষু, স্থলে ভুলক্রমে ত ত্ত্ব নি র্ণী ষু, এবং বার্ত্তিককারের নাম সর্ব্বত্র উ দ্দ্যো ত ক র স্থানে উ দ্যো ত ক র মুদ্রিত হইয়াছে।

পুস্তকখানির অনুবাদ-অংশের ভাষাটা জটিল।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

জাতীয় শিক্ষা

দেশে আবার নূতন করিয়া জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন সুরু হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত সকল-রকম বিলাসিতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যাহা বাঁচাইতে পারিয়াছেন, জাতীয়-শিক্ষার সাহায্যার্থ তাহাই দান করিয়া দেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এই উপায়ে কি পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা জ্ঞাত না থাকিলেও, শিক্ষায় স্বাবলম্বনের চেষ্টা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তারা সেইই প্রথম ইস্তাহার জারি করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মাতৃমন্দির-দুয়ার হইতে দূরে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাঙালীর চিত্তনদ প্লাবিত করিয়া তখন ভাবের বন্যা আসিয়াছিল—বাঁধ ভাঙিবার শক্তিও তাহার জন্মিয়াছিল। তাই দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ছাত্রমণ্ডলী শিক্ষা-বিভাগের আইন অমান্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিলেন না। ফলে রংপুরের সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বাণীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইলেন—স্বদেশী-সভায় যোগদান করিবার অমার্জ্জনীয় অপরাধে!

নিরীহ ছাত্র বেচারাদের শিক্ষার পথ যখন এইরূপে রুদ্ধ হইয়া গেল, দেশের নেতৃ-বৃন্দ নিজেদের ছেলেদের শিক্ষার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। সর্ব্বাগ্রেই রংপুরে একটি জাতীয়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে কলিকাতায় বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ গঠিত এবং একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইল। মফঃস্বলেও পনের-কুড়িটি জাতীয়-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কলিকাতার বিদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি বাংলাদেশে খুব কমই ছিলেন। প্রথম প্রথম বেশ ছেলে জুটিতে লাগিল। সকলেই মনে করিলেন বেশ কাজ হইবে।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের বয়স যত বাড়িতে লাগিল, অনুপাতে ছাত্রসংখ্যা ততই কমিয়া গেল। অনেক ছাত্র কাঁচিয়া গণ্ডুষ করিয়া সরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যেও একে একে অনেকে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সাত আট বৎসরের মধ্যেই জাতীয়-বিদ্যালয় নামক একটা বিশেষ কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে বাংলাদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সাধারণ বাঙালী তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল।

মাদ্রাজ হইতে নূতন করিয়া এই আন্দোলন সুরু হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেও বাংলায় জাতীয়-শিক্ষা সম্বন্ধে বেশি কিছু শুনা যাইত না—যদিও মাণিকতলার পঞ্চবটী উদ্যানে তখনও দেশভক্ত সাধকগণ জ্ঞানদানে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাংলায় জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন সাফল্যলাভ করে নাই। কেহ কেহ এ কথা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তাঁহারা যে-সব নজীর উপস্থিত করেন, তাহার উপর নিভর করিয়া জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন সফল হইয়াছে—এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। তাঁহারা বলেন, যেহেতু জাতীয়-বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত অনেক ছাত্র কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ভূষিত অনেক ছাত্রকে পরাভূত করিয়া আপন যোগ্যতার পরিচয় দিয়া সরকারী যাদুঘরে চাকরী পাইয়াছেন এবং শিল্পবিভাগের ছাত্রেরাও জীবিকার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, সেই হেতু বলিতেই হইবে যে, জাতীয়-শিক্ষার প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হইয়াছে।

উদরের দাবী অবশ্য অবহেলা করা চলে না। কিন্তু জাতীয়-শিক্ষার উদ্দেশ্যও যদি কেবলই চাকরীলাভ হয়, তাহা হইলে দেশে ভিন্ন-একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক কি? সে হিসাবে বরং বঙ্গীয়-শিল্প বিদ্যালয়ের (Bengal Technical Institute) মত অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে শিক্ষার চরম লক্ষ্যই হইতেছে চাকরীলাভ, সে শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় কথাটা প্রয়োগ না করাই ভাল। কারণ, এই দুর্ভাগা দেশে—যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব খুবই বেশি এবং প্রজার অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যই যেখানে রাজপুরুষদের নিকট কুঅভিপ্রায়-প্রণোদিত বলিয়াই মনে হয়, সেখানে—জাতীয়-বিদ্যালয়ের ছাপমারা ছাত্রদের আদর যে শুধু কম হইবে তাহাই নয়, সতত-ছিদ্রান্বেষণে-নিযুক্ত সি-আই-ডির জাগ্রত কর্ম্মচারীদের কুনজরেও তাহারা নিশ্চিতই পড়িবে। প্রকৃত পক্ষে হইয়াছেও তাহাই। সরকারের এই সব জাস্তা বিভাগ হইতে যখন-তখন জাতীয়-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নামধামের তালিকা তলব করা এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষক বা অধ্যাপকদের কার্য্য হইতে অপসারিত করিবার অনুরোধ—প্রকারান্তরে আদেশ—জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিরল নহে। এমত অবস্থায় ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় ক'টি ছাত্রের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করিবার জন্য জাতীয়-শিক্ষার নামে অনর্থক অর্থব্যয় না করিয়া সে অর্থ সরকারী বিদ্যালয়ে দান করিলে অধিক-সংখ্যক ছাত্রের উপকার হওয়াই সম্ভব। আমাদের মনে হয়, এই জন্যই স্বর্গীয় পালিত মহোদয় জাতীয়-বিদ্যালয়ের দান রহিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অধিক অর্থ দিয়া গিয়াছেন এবং স্বয়ং জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের সভাপতি হইয়াও ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও তদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন করিয়া কিছু লাভ হইবে না? জাতীয়-শিক্ষা চাই-ই—কিন্তু তার লক্ষ্য হইবে না চাকরীর অন্বেষণ। সে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে, তৎসম্বন্ধে দেশের অনেকে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কেহ কেহ জাতীয়শিক্ষার সাহায্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতঃ ছাত্রদের ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া

ভারতের গরিমাময় অতীত ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নাই। কিন্তু হাজারো চেষ্টা করিয়া কখনও কি অতীতকে ঠিক তাহার পুরাতন মূর্ত্তিতে ফিরাইয়া আনা যায়? আমাদের মনের এককোণেও এই ভাব পোষণ করা সঙ্গত হইবে না যে, আবার ভারতের পল্লীতে পল্লীতে নব নব তপোবন রচিত হইবে—সেখানে ঋষিরা সব তপস্যায় মগ্ন থাকিবেন, সামগানে গগন পবন মুখরিত হইবে—এক কথায় সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে। শিক্ষা, সে যতটা খাঁটিভাবেই 'জাতীয়' হউক না কেন, ভারতে আর কখনো সেদিন ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না।

এখন আমরা জাতীয়শিক্ষার যতই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করি না কেন, রাষ্ট্রীয় উন্নতির সহায়তা করিবে বলিয়াই যে বাংলাদেশে এই শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। তখন আমরা চাহিয়াছিলাম জাতির প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে বাদ সাধিয়াছিলেন বলিয়াই না আমরা বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম—সরকারী বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া বাহির হইলে চাকরী পাওয়া যায় না, অথবা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না, এ কথা বিচার করিয়া নহে।

মূলের এই কথাটা গোপন রাখিয়া দেশে জাতীয়শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা পুরাতনের প্রতি যত বেশি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলাম—দেশের লোক দূর হইতে ততই শিক্ষাবিধিকে নমস্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কারণ দেশের লোক পুরাতনের পুনরাগমনের অপেক্ষায় তত ব্যাকুল হইয়া বসিয়া নাই, যত তাহাদের ব্যাকুলতা রাষ্ট্রীয় লাভের জন্য।

লোকমান্য তিলক মহোদয় দেশে সু-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছেন। জাতীয়-শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"...... But where the people and the Government have different ideals of Citizenship before them, where the governing class wants to keep the people down inspite of their desire to rise to the status of full citizenship in the Empire, there arises the necessity of National Education as distinguished from Governmental Education. Viewed in the light, National Education is only a means to the attainment of self-government and those who demand Home-Rule for India cannot but zealously support a movement for the establishment of National Education in this country."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেশে জাতীয়-শিক্ষার আবশ্যকতা তখনই উপলব্ধ হয়, যখনই প্রজার স্বত্ব ও দাবী লইয়া শাসক ও শাসিতদের মত-বৈষম্য উপস্থিত হয় এবং রাজশক্তি যখন প্রজার অন্তরের আশা ও আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। এই হিসাবে যে শিক্ষার দ্বারা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের যোগ্য হওয়া যায়, তাহাই হইতেছে জাতীয়-শিক্ষা ; এবং তিনিই এই শিক্ষাবিধির সমর্থন করিবেন, যিনি হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন প্রার্থনা করেন।

বাংলায় জাতীয়শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ এ কথাটা এমন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন নাই। অথচ শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ হর্ণেল বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

"......It is so utterly inadequate to the progressive realisation of Responsible Government, that nothing less than a change throughout the entire structure will suffice to secure the objects now envisaged."

অর্থাৎ, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দেশের লোকদিগকে স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত করিয়া গড়িবার পক্ষে এতই অনুপযোগী, যে, ইহার আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আসন্ন শাসন-সংস্কার কিছুতেই সফল হইবে না।

জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন সফল করিতে হইলে বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের আদর্শ স্পষ্ট করিয়া দেশের লোকদিগকে বুঝাইতে হইবে। কলিকাতা অথবা বড় বড় সহরে সরকারী বিদ্যালয়ের অনুরূপ—কেবল একটু পরিবর্ত্তিত আকারে—দু'দশটা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয়-শিক্ষা সার্থক হইবে না। জাতীয়-শিক্ষা সফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে হর্নেল সাহেব সত্যই বলিয়াছেন :—

"......If the people are to govern, and ultimately it is the people that must govern always and everywhere, then the people must be educated and that as quickly as possible."

অর্থাৎ, দেশের লোকদিগকেই যদি দেশ শাসন করিতে

হয়—যাহা সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বত্রই তাহাদিগেরই করা উচিত—তাহা হইলে দেশের লোকদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সর্কারের কৃপাকণা প্রার্থনা করিয়া পাই নাই, নিজেরাও এ পর্য্যন্ত কোনপ্রকার চেষ্টা করি নাই। বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ চেষ্টা করিলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কৃষি ও ব্যবসা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শিল্প ও ফলিত বিজ্ঞান (applied sciences) শিক্ষার সুবন্দোবস্তও যাহাতে হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের ইহার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে না।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অধীনে কলিকাতায় একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজমাত্র থাকিবে। বাণীর এই পবিত্র মন্দির হইতে নবীন কর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত যুবকের দল বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হইবে উপেক্ষিত অনাদৃত কোটী কোটী নরনারীর অভাব মোচন করা—তাদের কাজ হইবে জ্ঞান-দান, অন্নদান, পতিতের পরিত্রাণ। তাদের সুখের আদর্শ থাকিবে একটু নূতন ধরণের—স্বেচ্ছায় নব নব অভাবের সৃষ্টি করিয়া তাহারা জীবন-যাত্রা দুর্গম করিয়া তুলিবে না। তাহাদের মাঝে কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা থাকিবে না। অবসরকালে চিত্তবিনোদন করিবার জন্যই তাহারা দেশের কাজে নিযুক্ত হইবে না। যতটুকু শক্তি তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে তার সবটুকুই নিঃশেষ করিয়া ব্যয় করিবে দেশের ও দশের জন্য।

বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় কোনদিন যদি বাংলাদেশে এমন ক'জনা কর্ম্মীর সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে—কেবল তাহা হইলেই মাত্র জাতীয়-শিক্ষা সার্থক ও সফল হইবে। নতুবা তাহারা সর্কারের যাদুঘরে চাকরী কেন, লাটসাহেবের শাসনপরিষদের প্রধান সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত হইলেও বাংলাদেশের বেশি কিছু আসিয়া যাইবে না।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

শ্যামলী

(৯)

শ্যামলী ও বিজলীর বিবাহ লইয়া তাহাদের গ্রামে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন থামিয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারে গ্রামের লোক যাহা যাহা আশা করিয়াছিল তাহার একটাও সফল হয় নাই। ধনীর সন্তান অনিল বিজলীকে গ্রহণ না করিলেও শিশিরের মত পাত্র যে জগতে বড় সুলভ নয় তাহা তাহারা বুঝিয়াছে। অষ্টমঙ্গলায় বিজলীর সঙ্গে শিশিরও সে গ্রামে আসিয়া দুই চারিদিন থাকিয়া বিদ্যা-বুদ্ধি ও স্বভাবে শ্বশুরালয়ের সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছে। তেমন ধনবানের হস্তে না পড়িলেও বিজলীর ভবিষ্যৎ ভাগ্য যে অত্যন্ত উজ্জ্বল তাহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিয়াছে। বাকী এখন শ্যামলী, তা তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন তাহার একটাও অপ্রত্যাশিত বা আশ্চর্য্যের কিছু ত হইবে না। এই যে অনিল তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছে ইহাই বরং আশ্চর্য্যের কথা। যাক, বড়-লোকের ছেলের সখ! তার আর-একটা বিবাহ করিতেই বা কতক্ষণ আর কালা-বোবাটাকেও দুটা ভাতকাপড় দিতেও কি সে অক্ষম! মাঝে হতে বাপ-মায়ের একটা মহাভার মস্তক হইতে নামিয়া গিয়াছে, ভালই! "যা শত্রু পরে পরে!" শ্যামলীর জন্য চিন্তার বাজে খরচ করিতে কেহই আর রাজী নয়। বিজলীর সৌভাগ্যেই সকলে সন্তুষ্ট। এমন কি তাহাদের পিতারও মুখ এবং মস্তক এখন প্রায় চিন্তামুক্ত। অনিলের মহত্ত্বে তাঁহার মনে যে অনুতাপ এবং লজ্জা জাগিয়া উঠিয়াছিল, অনিলের সে দেবোপম মুখের দিকে চাহিয়া নিজের কার্য্য স্মরণে তাঁহার যে বেদনা আসিতেছিল, তাহা এখন নিজের নিশ্চিন্ততার সুযোগে মন হইতে একরকম সরিয়াই গিয়াছে। তাঁহার জাতি কুল মান সব বজায় রহিয়াছে, বিজলীও সৎপাত্রে পড়িয়াছে; তবে অনিল দয়া করিয়া শ্যামলীকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেও তাহাকে জামাই বলিয়া মনে ভাবিতেও অন্তর একটু পীড়িত হইয়া উঠে বটে! এ সম্বন্ধ সে চিরদিন কখনই রাখিতে পারিবে না এবং তা আশা করাও অন্যায়; দুঃখ এই যে অমন ছেলেটিকে তেমন আপনার

জন করিতে পারা গেল না। যাক, তাহার জন্য আর এখন দুঃখ করিয়া কি হইবে। জাতি মান সম্ভ্রমের জন্য জীবনে এমন কতই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আর লোক্‌সানের চেয়ে লাভই ত তাঁহার বেশী হইয়াছে।

দিন যাইতেছিল না কেবল শ্যামলীর মার। ইহা অপেক্ষা যদি অনিল শ্যামলীকে সেখানে ফেলিয়া যাইত তাহা হইলে বুঝি তাঁর এমন হইত না। স্বামীর কুলমান রক্ষা করিয়াছে স্মরণ করিয়া সেই বালক দেবতাটির উদ্দেশে দিনান্তে সকৃতজ্ঞ মস্তক নত করিয়া একরকমে তাঁহারও নিশ্চিন্ততা আসিত। কিন্তু সে অসমসাহসী বালক এ করিল কি! তাহার মত সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত জীবনের পাশে শ্যামলীকে স্থান দেওয়া—একি জগতে সম্ভব—না এ কেহ কথনো পারিয়াছে? কেন সে শ্যামলীকে সঙ্গে লইয়া গেল। ইহার ফলে নাজানি তাহার কতখানিই সহিতে হইতেছে! এমন অনুপযুক্ত সাহস সে কেন করিল। কেন সে বাড়ী গিয়া এতদিন উপযুক্ত বধূ ঘরে আনিল না। যেজন্য সে শ্যামলীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে তাহা যে ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। একি জগতে সম্ভব? বিশেষতঃ তাহার মত ধনে মানে কুলে শীলে অগ্রণী, বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে অত্যুন্নত যুবকের পক্ষে! সেও যদি এত বড় উদারতা দেখাইতে চাহে, তাহার আত্মীয় স্বজন তাহা করিতে দিবে কেন? না, অমন তরুণ-জীবন অমন দেবোপম যুবকের যেন এমন বিধিলিপি না হয়। সে যেন তাঁহার হতভাগিনী কন্যাকে শীঘ্র তাঁহার কাছে রাখিয়া গিয়া আবার বিবাহ করে। এই অভাগিনীদের জন্য তার জীবন যেন অসুখী না হয়, বিধাতা এমন যেন না করেন। দুদিনে যেন তাহার এ খেয়াল মিটিয়া যায়। কিন্তু লোকে যাহা বলিতেছে যদি তাহাই ঘটে? পিতা-মাতার কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ যদি সে শ্যামলীকে গৃহের এক কোণে দুই মুঠা খাইতে ও পরিতে দিয়া ফেলিয়া রাখিয়া নিজের যথোপযুক্ত জীবনযাত্রা গ্রহণ করে, এবং তাঁহাদের প্রতিফল দিবার জন্য শ্যামলীকে আর তার মাপমায়ের কাছে না পাঠায়, যদি এই উদ্দেশ্যেই শ্যামলীকে সে লইয়া গিয়া থাকে! কিন্তু মন তো এ কথা মানিতে চাহে না। তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে শিশিরের সঙ্গে বিজলীর বিবাহ না দিয়া তাহারা সেই রাত্রে চলিয়া গেলেই যে এ কার্য্যের চূড়ান্ত প্রতিফল ফলিতে পারিত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে যাহা করিয়াছে তাহাতে কি তাহার উপর এ সন্দেহ করা চলে? কিন্তু তবু শ্যামলীকে সে না লইয়া গেলে সব দিকেই ভাল করিত। সেই হতভাগীটা যে কচি শিশুর মত মা ভিন্ন জানে না। তার সেই অর্দ্ধমাত্রিক মানবজীবন লইয়া পরের ঘরে নিতান্ত অপরিচিতগণের সংঘর্ষে কি করিয়া তার দিন কাটিতেছে? যতই যা হউক, এই কার্য্যের কিছু না কিছু প্রতিফল নিশ্চয় তারই উপর গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সে যে একান্ত শিশুর মত, তাহাকে যে লোকে পাগল বলে, সে কি করিয়া সে তাপ সহ্য করিতেছে? শুনিতে না পাইলেও সে তো দেখিতে পায়; স্নেহ অস্নেহ, দয়া অনুকম্পা, বা ক্রূরতা নির্দ্দয়তা—ইহার প্রভেদ তো একটু একটু সে বুঝিতে পারে। মায়ের কোল নহিলে, মায়ের হাত নহিলে যে তার শোওয়া খাওয়া হয় না। সে কি করিয়া খাইতেছে ঘুমাইতেছে? কি করিয়া তার দিন যাইতেছে? সে কি কিছু বুঝিতে পারিতেছে যে তাহার মা কেন তাহাকে এমন করিয়া কোথায় পাঠাইয়াছে? অনিলের সহিত তাহার সম্বন্ধ, অনিলের দেবত্ব মহত্ত্ব, হায় তাহার বুঝি বুঝিবারও শক্তি নাই। ভগবান যে তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের খর্ব্বতা করিয়া মনের গঠন এবং গ্রহণ-শক্তিকেও অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন। যে জগতের সব পায় না, সব দিতেও যে সে জানে না। কেবল জানে সে মাকে। মারই সব সে পাইয়াছে এবং তাই তাঁহাকে তাহার সবটুকু দিতেও সে পারে। সেই মা ছাড়া হইয়া সে কেমন করিয়া আছে! হায় সে যে মা বলিয়া কাঁদিতেও জানে না, অভাব যে সে প্রকাশ করিবার পথ পায় নাই! অধিকারে এমন বঞ্চিত যে হতভাগ্য তার কি মা ছাড়া বাঁচার উপায় আছে! অনিল তুমি দেবতা, কিন্তু মানুষের সব ব্যথা সব কথা বুঝি জান না—তাই এমন ভুল করিয়া ফেলিলে।

এমনি চিন্তায় যখন শ্যামলীর মাতার দিন আর কাটিতেছে না, স্বামী ও বিজলীর কথনো প্রবোধ কথনো তিরস্কারেও তাঁহার দেহ আর খাড়া করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে একদিন শ্যামলী শিবিকা হইতে নামিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। জগতে

যাহার আর কোথাও স্থান নাই, যাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই সকলে বাঁচে, যার স্থান কেবল প্রিয়জনের হৃদয়ের ভিতরেই, সে যদি এমনি অতর্কিতে আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরে, তাহাকে যেমন সেই আত্মজন সচকিতে সানন্দে সশঙ্কায় হৃদয়ের ভিতরেই চাপিয়া ধরিতে চায়, তেমনি করিয়া শ্যামলীর মা শ্যামলীকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। যেন আর কেহ দেখিতে না পায়,—তাহার বাপ নয়, আত্মীয় স্বজন নয়, কেহ নয়,—সে যেন এমনি করিয়া তাঁহার বুকের মধ্যেই লুকাইয়া থাকে।

শ্যামলী তাঁহার বুকের উপরে হাসিয়া কাঁদিয়া গলা জড়াইয়া চুমো খাইয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে আর মাতা ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছেন, কৃশ মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, তাঁহারও চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রু ঝরিতেছে। এমন সময়ে স্বামী আসিয়া নতমুখে সংবাদ দিলেন "জামাই এসেছেন।" শ্যামলীকে একটু পাশের দিকে আড়াল করিয়া মাতা তাঁহার পানে চাহিলেন "জামাই? শিশির?"

"না—অনিল-বাবাজী।" কর্ত্তা কষ্টের সহিত উচ্চারণ করিলেন। মাতা তখন চেষ্টার সহিত শ্যামলীকে বিজলীর নিকটে বসাইয়া দিলেন। সে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না,মাতা তাহাকে বিজলীকে দেখাইয়া দুএকটা সস্নেহ সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্যামলী কতদিনের পরে বিজলীকেও যে দেখিল। অন্যের পক্ষে এমন বেশী দিন না হইলেও শ্যামলীর পক্ষে যে কত যুগ! সে হাসিমুখে তখন বিজলীরও গলা জড়াইয়া ধরিল।

যাহার মুখ যাহার চিন্তা তাঁহার সন্তানের ভাবনারও অগ্রস্থান অধিকার করিয়াছে তাহাকে সন্তানের মত করিয়া জল খাওয়াইতে বা অভ্যর্থনা করিতে শ্যামলীর মাতার সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। হায় একি অনুপযুক্ত সৌভাগ্য তাঁর, আর এই দেবোপম যুবকের কি অভাগ্য! যাহাকে সন্তান বলিয়া ভাবিতে, 'বাছা' বলিয়া ডাকিতে সমস্ত অন্তর আকুল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু হায় তাহার পক্ষে ইহা কেবল অপমান মাত্র। যাহা পাইবার নয় এমন রত্ন ঈশ্বর কেন তবে দেখাইলেন!

জল খাইয়া উঠিয়া অনিল পুনশ্চ তাঁহাকে প্রণাম করায় তিনি বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। অনিল মৃদুস্বরে বলিল "আমাকে এখনি যেতে হবে।"

"এখনি?" অতিকষ্টে শ্যামলীর মাতা উচ্চারণ করিলেন। এপর্য্যন্ত তিনি অনিলের সঙ্গে একটি কথাও কহিতে পারেন নাই। বলিবার কিইবা তাঁহার আছে?

"এখনি না গেলে পরের ট্রেন ধরতে পারব না।" অনিল তেমনি নত মুখে উত্তর করিল।

"আর খানিকক্ষণ মাত্র থেকে দুটি খেয়ে যাও।" অতি কষ্টে শ্যামলীর মাতা উচ্চারণ করিলেন।

অনিল একটু ভাবিয়া একটু থামিয়া শেষে সম্মতির ভাবে নিকটস্থ একখানা আসন টানিয়া বসিয়া পড়িল।

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকার পরে মাতা সহসা ঈষৎ উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিলেন, "তুমি আবার কেন এলে বাবা? কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হত।"

অনিল তেমনি ভাবে কেবল উত্তর দিল—"না।"

মাত্র দুটি খাইয়া যাও, এর বেশী অনুরোধ করিবার শ্যামলীর মাতার কি আর আছে! 'একটি দিন থাকিয়া যাও' এ কথা কোন্ মুখে তিনি বলিবেন। এই যুবকের মুখ দেখিয়া পুত্রস্নেহে বুক উথলিয়া উঠিলেও ইহার ও তাঁহাদের মধ্যে যে এক ভাষাহীন শব্দহীন অতল অপার সমুদ্রের ব্যবধান!

অনিলরা যখন আসিয়াছিল তখন বেলা বেশী ছিল না, তাই খাওয়া সারা হইতেই বিকাল হইয়া আসিল। যতক্ষণ অনিল আহার করিতেছিল শ্যামলীর মাতা একপাশে দাঁড়াইয়া অপলকনেত্রে জামাতাকে দেখিতেছিলেন, আবশ্যক মত সম্মুখে আসিয়া পরিবেষণও করিতেছিলেন। কি এক লজ্জায় বিজলী ভগ্নীপতির সম্মুখে আসিতে পারিল না। অনিলকে জামাতা ভাবিয়া আনন্দের সঙ্গে নিজের সন্তানকেও সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে যে বিজলীদের মাতার উৎসাহ ছিল না, তাই তিনি একাই যথাকর্ত্তব্য সমস্ত করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতেছিলেন শ্যামলীকে এই রাখিয়া গিয়াই অনিল এইবার এই বিসদৃশ সম্বন্ধের শেষ করিবে। কেনই বা না করিবে! এতদিন যে করে নাই—এই মূক-বধিরকেই পরিণীতা স্ত্রী বলিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া আবার নিজেই যে রাখিতে আসিয়াছে এ যে

রম আশ্চর্য্যেরই বিষয়! যাহা হওয়া একান্ত উচিত তাহাই এইবার হইবে ইহাতে ক্ষোভের বা দুঃখের ত কিছুই নাই। যে ইহাতে বেদনা বোধ করিবে তাহাকে ভগবান দণ্ড দিবেন, মাতা হইলেও সে অন্যায়-দাবীদারকে তিনি ক্ষমা করিবেন না। শ্যামলীর মাতা মনে মনে অনিলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এইবার যেন তুমি উপযুক্ত শ্রী লাভ কর। এ অপমানের স্মৃতিও তোমার এর পরে ভগবান আর রাখিবেন না। কিন্তু যাহাকে, যে অভিশপ্ত হতভাগ্য জীবটিকে এত বড় সম্পদ ভগবান দুদিনের জন্যও দিয়াছিলেন সে যেন এই কয়দিনের স্মৃতি ইহজীবনে না ভোলে! তার গভীর দুর্ভাগ্যের অন্ধকারের উপর এই সহসা-সমুদিত সমুজ্জ্বল অরুণ—ইহার রশ্মি, ইহার মহিমা, যেন তার জড়-জীবনকেও জীবন্ত করে, আলোকিত করে দিও এ সূর্য্য তার জীবন-পথ হইতে চকিতেই অপসৃত হইতেছে, তবু ইহাকে মনে করিতে পারা, মনে রাখিতে পারার সৌভাগ্য যেন শ্যামলী লাভ করে। এ স্মৃতির দুঃখও তাহার জীবনকে যে শ্লাঘনীয় করিবে। কিন্তু শ্যামলীর মাতার সন্দেহ হইতেছিল হতভাগিনী শ্যামলী তাহাকে জানিয়াছে কি একটুও? একটু কিছু পাইয়াছে কি? বুঝিয়াছে কি যে ভগবান যে লোকটির সহিত অতর্কিতে তাহার এই সম্বন্ধ ঘটাইয়া দিয়াছেন সে কত বড় বস্তু? সে তাহাদের পাইবার ছুঁইবার নয়। ইহাতে শ্যামলী তারে বেদনা পাইবে বটে, কিন্তু তাহার সেই অন্ধকারময় জীবনযাত্রার সম্বল এ বেদনাটুকুও শ্যামলীর মাতা তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। হায় নহিলে তাহার জীবন কি লইয়া কাটিবে!

আহারান্তে বিদায়ের জন্য অনিল উঠিয়া দাঁড়াইতেই শ্যামলীর মাতা রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন "বাবা।"

অনিল তাঁহার স্বর শুনিয়া মুখ নামাইয়া মনের ভিতর যেন চোখ বুজিল।

"আর কি কখনো তোমায় আমরা দেখ্‌তে পাব?"

"ভগবান জানেন মা" অতি মৃদুস্বরে অনিল উত্তর দিল।

"এতদিন নিজেদেরই দোষী করে এসেছি, কিন্তু আজ বল্‌ছি এ ভগবানেরই কাজ বটে। তিনি যখন ঐ হতভাগীর সঙ্গে সম্বন্ধ ধরিয়ে দিয়েও তোমায় আবার আমাদের দেখালেন—তুমি যখন এই বাড়ীতে যতটুকুর জন্যই হোক্ আবারও পা দিলে, তখন আর আমার এ কথা বল্‌তে লজ্জা হচ্চে না। ভগবান করুন এইবার যেন তুমি সুখী হও—আত্মীয়স্বজনকেও সুখী কর। কিন্তু যার জন্যে তুমি এত সহ্য কর্‌লে তার জন্যে আরও একটু কিছু তোমায় কর্‌তে হবে।"

"আমার আর যে কিছু কর্‌বার সাধ্য নেই মা,—আমার মা......" বলিতে বলিতে অনিল থামিল।

"বেশী কিছু নয় বাবা, এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না—সামান্য একটু দয়া মাত্র।"

"বলুন, কিন্তু আমায় আজই ফির্‌তে হবে।"

"তাই যেও—কিন্তু ওকে এমন একটু কিছু দিয়ো যাতে সে চিরকাল তার এ সৌভাগ্য মনে রাখ্‌তে পারে। তুমি তোমার এ দুর্ভাগ্য ভুলে যেও—কিন্তু তার ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বনের জন্যে—" বলিতে বলিতে তিনি ক্রমে থামিয়া গেলেন।

অনিলও কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া শেষে ভগ্নস্বরে বলিল, "তার আর দরকার কি বলুন। থাক্‌ত—যদি আমি তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে পেতাম। যখন আমিই তা পাব না, তখন তারই বা এ কথা মনে থাকার দরকার কি? আর, তার তা হয়ত মনে থাক্‌বেও না;—এ ব্যাপারের পর হতে তার পক্ষে যে কেবল কষ্টের কারণই ঘটেছে।"

"তা ঘটুক—তবু একটু পরিচয়ও কি তোমার সে পায়নি বাবা?"

"না মা, তার সঙ্গে আগন্তুকের পরিচয় তো সহজে হবার নয়।"

শ্যামলীর মাতা কিছুক্ষণ পরে একটু থামিয়া একটু বাধ-বাধ ভাবে বলিলেন, "তোমার কোনো ছবি আছে কি বাবা?"

অনিল এইবার তাহার দুই আর্দ্রদৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া বলিল, "কি আমি কর্‌তে পার্‌লাম তার জন্যে যে আপনার এ চেষ্টা! ভেবেছিলাম—অনেক কথাই,—কিন্তু তার যখন একটিও কর্‌তে পার্‌লাম না—তখন কিসের জন্যে আর আপনি এত কথা ভাব্‌ছেন?"

"তার জন্যে অনেক কথা ভাবা—এও যে আজ পর্য্যন্ত

জগতে কেউ করেনি। তোমার এই দয়ার কথাই আমি তাকে চিরজীবন ধরে বোঝাব! সে যেন জানে যে এমন একজন লোকও এ জগতে আছে যে তার জন্যে একদিনও ভেবেছে।"

"কি দরকার তার বলুন? আমি যখন আর তার কিছু কর্‌তেই পারব না—কোন চিন্তা পর্য্যন্ত না—তখন আমার কথা আর তার জীবনের সঙ্গে কেন জড়াবেন! তার জীবনে হয়ত এসবের কোন দরকারও হবে না কখনো।"

"এখনো সমস্ত জীবনই পড়ে আছে যে তার। এমন হয়ে যে চিরদিনই থাক্‌বে—এ যে মনে কর্‌তে পারি না। ভগবানই যে তাকে তোমার সঙ্গে জড়িয়েছেন। তুমি মনে কোরো না আর তার কথা, কিন্তু সে যদি কখনো মনে কর্‌তে পারে—আমি মা, আমার সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকাই উচিত! তাই ত বল্‌ছিলাম—যদি একটা ছবি—"

"আচ্ছা পারি তো দেখ্‌ব।" অগত্যা অনিল এইটুকু মাত্র উচ্চারণ করিল—কিন্তু তাহার মন এ কথায় সায় দিল না। সে-ই যখন এই হতভাগ্যের সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করিতে পারিবে তখন শ্যামলীরই বা তাহার সঙ্গে কিসের যোগ থাকিল? সমাজ পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিবে আর স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা খাটিবে না, সেই জন্যই কি এ ব্যবস্থা? এই অর্দ্ধমনুষ্য 'প্রাণীটির পক্ষেও কি এই নিয়ম! অনিলের যদি এ বিবাহ অসিদ্ধ হয়, তাহারই বা কেন না হইবে? তাহাকে আর কেহ বিবাহও করিবে না এবং যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহারও গ্রহণযোগ্যা সে হইবে না? তবু অনিলকে মনে মনে স্বামী বলিয়া তাহাকে চিরদিন জানিতে হইবে! তাহার বিবাহের সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্য ভয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, সেইজন্য তাহার জানিতে হইবে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার স্বামী আছে, অমুক তাহার স্বামী! আর অনিলকে সকলে বলিবে সে তোমার স্ত্রী নয়, তাহার জন্য তোমার কোনো কর্ত্তব্য নাই, অন্য স্ত্রী গ্রহণই তোমার কর্ত্তব্য! মানুষের এ রহস্য বড় মন্দ নয়। শ্যামলীর অপরাধ কি? না ভগবান তাহার সহিত এক নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া মানুষ করিয়াও তাহাকে মানুষের ভোগের সর্ব্ববস্তু ভোগ করিতে দেন নাই, তাই সে মানুষের কাছেও তাহার প্রাপ্য অধিকারে চিরবঞ্চিত থাকিতে বাধ্য। আর যাহাদের ভগবান সর্ব্বভোগে তুষ্ট ও পুষ্ট করিয়াছেন তাহাদের পান হইতে চুন খসিলেই তাহারা সহ্য করিতে স্বীকৃত নয়। হায়রে মানুষ? তোমার মনুষ্যত্বের মহা অভিমানের মূল্য এই!

শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া অনিল সিঁড়ির নিকটে আসিয়া অন্যমনে সম্মুখের খোলা ছাতের পানে চাহিতেই দেখিল সম্মুখে আসন্নবর্ষণ মেঘভারসজ্জিত আকাশের কি অপরূপ শোভা! অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আভায় সেই পেঁজা-তুলার মত লঘু, হেমন্তের মেঘগুলা হরিদ্রোজ্জ্বল সুবর্ণ-জ্যোতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেন কাহার মাথার সুবর্ণের গুচ্ছ গুচ্ছ কেশভার কে যেন প্রকাণ্ড একখানা চিরুণী দিয়া অতি সুবিন্যস্ত ভাবে পাতলা পাতলা করিয়া আঁচড়াইয়া দিগন্তর ঢাকিয়া এলাইয়া দিয়াছে! সন্ধ্যার সেই অপরূপ আভায় পৃথিবী পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত। তাহারই মধ্যে সেই ছোট ছাতের এক-কোণে দাঁড়াইয়া শ্যামলীর ক্ষীণ শরীরটি একেবারে স্তব্ধ হইয়া আলিসার গায়ে অবশ ভাবে বিন্যস্ত, অথচ দুই চক্ষে সম্মুখের সেই স্বর্ণাভার দীপ্ত জ্যোতি চ্ছুরিত, মুখকান্তি আনন্দে অত্যধিক রক্তিম, যেন সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া প্রকৃতির সেই অপরূপ রূপরাশিকে পান করিতেছে!

অনিল একটু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এমন করিয়া দেখা যেন সে কখনো দেখে নাই। যে এমন করিয়া দেখিতে জানে,—দেখিবার আনন্দকে অনুভব করিবার শক্তি যার এত তীব্র, তার একটা ইন্দ্রিয় অচেতন থাকিলেও বাকীগুলার দ্বারা তাহার মনও কি ক্রমে প্রস্তুত হইবে না? সাধারণ মানুষের অপেক্ষা বিলম্বে হইলেও তাহার মন কি একদিন আপনিই অন্য সমস্ত প্রাণীর মতই স্নেহ ভালবাসা আদর যত্ন পাইতে বা কাহাকেও দিতে উন্মুখ হইয়া উঠিবে না? হায়, চেষ্টা করিলে কি এ-কে আরও শীঘ্র আরও ভালরূপে একটা মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা যাইত না? ইহার অভাব কিছুও কি পুরাইতে পারা যাইত না? নিশ্চয়ই যাইত। বিশেষ যার মনের এতখানি অনুভব, তন্ময়তা—তাহাকে তো খুবই পারা যাইত। কিন্তু তাহা হইল না। সে

যেমন অবহেলে সেদিন তাহার সহিত অনিলের বিবাহগ্রন্থি খুলিয়া দিয়াছিল অনিলও আজ তাহাই করিতেছে।

শ্যামলীর একা সে শোভা দেখিয়া আশ মিটিতেছিল না। মাতা বা ভগ্নীর প্রত্যাশায় মুখ ফিরাইতে যেমন অনিলের প্রতি দৃষ্টি পড়িল অমনি তাহার মুখের সে আনন্দজ্যোতি যেন মিলাইয়া গেল। দারুণ বিরক্তি ও অসন্তোষচিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। এ সেই লোকটা—যে তাহাকে ধরিয়া কোথায় লইয়া গিয়া এতদিন আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল। আবার এখানেও সে কেন আসিয়াছে? মা কেন তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছেন না? শ্যামলীর মনে হইল লোকটা যেন তাহার নিকটে আসিতেছে। অমনি বিরক্তিতে ক্রোধে তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া শ্যামলী তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এখানে মা আছে—এখান হইতে তো জোর করিয়া সে লইয়া যাইতে পারিবে না,—এখনি মার কাছে সে ছুটিয়া চলিয়া যাইবে। সাহসে ও ক্রোধের বেগে শ্যামলী উত্তেজিত ভাবে আগন্তুকের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু লোকটার ধরিয়া লইয়া যাইবার মত অভিপ্রায় তো দেখিল না। স্তব্ধভাবে লোকটা তাহারই চক্ষের পানে মুখের দিকে চাহিয়া আছে মাত্র এবং চোখে কি এক রকমের দৃষ্টি! শ্যামলীর মনে পড়িল এই দৃষ্টি সে আরও ক'বার দেখিয়াছে, কিন্তু আজিকার মত এমন করুণ, এমন প্রাণভরা, বুঝি আর কোন দিনই দেখে নাই। বেদনায় আর্দ্র, স্নেহে কোমল, সহানুভূতিতে বিস্ফারিত, আরও আরও কত কি যাহা শ্যামলী বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।—কেবল তাহার মনে হইল তাহার মায়ের চোখের দৃষ্টির সঙ্গেও ইহার যেন কোথায় সাদৃশ্য আছে। অমনি শ্যামলীর বিদ্রোহী মন ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল।

শেষ হেমন্তের মেঘ ক্রমে ঘনিভূত হইয়া সন্ধ্যার আঁধারে একটা বৃষ্টির সূচনা করিল। সেই মেঘ ও অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে অনিল ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেলে শ্যামলীর মাতা গৃহকোণে পড়িয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন, আর শ্যামলী অবাক্ হইয়া মার কাছে বসিয়া শিশুর মত মাঝে মাঝে মার মুখ তুলিয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল। মায়ের চোখের জলে ক্রমে তাহারও চোখে যেন একটা মেঘ ঘনাইতেছিল।

(১০)

একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের হাত হইতে নিস্তার পাইলে মানুষ যেমন ঘুমভাঙার পর "আঃ" বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে অনিলের মাতা শ্যামলীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া তেমনি ভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার ছেলে আপাততঃ তাহার এই একটা নূতন খেয়ালে বাধা পাইয়া দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছে বটে কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যেদিন সে বুঝিবে যে তাহার মাতা তাহাকেও কি একটা বিষম দুঃস্বপ্নের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া চিরকালের জন্য বাঁচাইয়া দিয়াছে। এই বিপন্মুক্তির কথা মনে পড়িলে সেও তখন এমনি "আঃ" বলিয়া নিশ্বাস ফেলিবে। এখনও সে তাহার এ খেয়ালকে ভুলিতে পারিতেছে না বটে—তাই সেটাকে বাপের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া পর্য্যন্ত আর কাহারো সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে না,—ঘরের বাহিরই প্রায় হয় না—নিজের পড়িবার ঘরেই দিনরাত কাটাইতেছে। মা এখন তাহার নিকটস্থ হইবার জন্য অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ছেলে তাঁহাকে সে সুযোগ দিতেছে না। পাঠাগারের মধ্যে এককোণে সেই যে মুখের কাছে বই ধরিয়া সে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছে—তাহাতে আর তাহার বিরক্তি নাই। কিন্তু মা চিরদিন জানেন, দুতিন ঘণ্টা পড়ার পরই সে একবার ছুটিয়া মায়ের কাছে আসে—শিশিরের সহিত বা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে খানিক গল্প করে, নয়ত বাহিরেও খানিকটা বেড়াইয়া লয়। একভাবে দীর্ঘকাল থাকা একেবারে তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন—এই যে অনিল ও তাঁহাদের মধ্যে একটা মূকবধির জড়ের প্রাচীর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে ইহাকে সরাইতে না জানি তাঁহার কতদিন লাগিবে। তাঁহার যে আর একদিনও বিলম্ব সহিতেছে না। কিন্তু হায় এ দুঃস্বপ্ন যে কাটিয়াও কাটিতে চাহে না। অনিল ও তাঁহার মধ্যের এই অভিমানের দুরন্ত যে-উপায়ে শীঘ্র কাটিতে পারে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে তাহারও উদ্‌যোগ করিতে যে তাঁহার মনে আর বল নাই। তিনি যদি অনিলের জানিত কোন ঘরে পুত্রের বিবাহ দিতেন তাহা হইলে এমন বুঝি হইত না। তাঁহার ব্যস্ততাতেই

এ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এবার অনিলের পছন্দ-মত স্থান হইতেই কন্যা আনিতে হইবে, কিন্তু সে পছন্দ করিতে যে অনিল কতদিনে উদ্‌যোগী হইবে তাহা ভাবিয়া মাতা যে কুল পাইতেছেন না!

শিশিরেরও অনিলের এ ব্যবহারকে ক্রমে বাড়াবাড়ি বলিয়া লাগিতেছিল। শ্যামলীর সঙ্গে তাহারও একটু সম্বন্ধ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু অনিলের সঙ্গে তাহার যে চিরন্তন সম্বন্ধ তাহার উপরে তো কেহ নয়। বড় সাধের বিবাহে একটা এমন বিপৎপাত ঘটিলে কিছুদিন সে সংসার এমনি উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায় বটে এবং অনিলের মত আশৈশব হৃদয়বান কোমলমনা তরুণ যুবকের পক্ষেও ইহাতে একটু আঘাত লাগিতে পারে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি চিরদিন এমনি ভাবে কাটাইতে হইবে? শ্যামলীর উপর দয়া করিয়া শ্যামলীকে কাছে রাখিলেও অনিলকে একটি উপযুক্ত পাত্রী তো বিবাহ করিতেই হইত, শ্যামলীকে লইয়া তো তাহার এমন জীবন কাটিতে পারিত না। মায়ের কঠিন দিব্যে অনিল শ্যামলীর সঙ্গে সেই দয়ার সম্বন্ধটুকু যে রাখিতে পাইল না ইহা তাহার পক্ষে একটু ক্ষোভের কারণ হইলেও তাহা লইয়া এত মুহ্যমান হওয়া কিসের জন্য? লোকে প্রথম জীবনে তো কত উচ্চ সঙ্কল্প কত মহৎ আদর্শ মনে লইয়াই সংসারে পদার্পণ করে, কিন্তু কয়টা লোকের সে সব কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে? শ্যামলীর সঙ্গে তাহার একটু করুণার সম্পর্ক ছাড়া হৃদয়ের তো কোন যোগ সম্ভব হইতে পারে না। এমন কত অনাথ হতভাগ্য অন্ধ বধির আতুর জগতে আছে! অনিলের সঙ্গে ঘটনাক্রমে সে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই কি তাহার জন্য অনিলকে সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে? এ যে দয়ার অতি বাড়াবাড়ি-রকম আব্দার! মা তাহার না হয় একটু বেশী রকম কঠিন ও অসহিষ্ণু হইয়া অনিলকে কিছু মনঃক্ষুণ্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তা কি এত অন্যায় হইয়াছে? অনিলের দয়ার এই অতি বাড়াবাড়ির ভয়েই তিনি অত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া সে হতভাগা মেয়েটার কথা আর ভাবিতে পারেন নাই! অনিলের অনিষ্টের আশঙ্কাতেই না তাঁর এ কাঠিন্য? সেই আজন্মশুভার্থিনী পরম স্নেহময়ী মা ঘরে ঘরে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন, ইহাতে অনিলের মত মায়ের আঁচলধরা ছেলের দৃক্‌পাত নাই। এর চেয়ে অনিলের আর কি অন্যায় হইতে পারে! আর সে? শিশির না তাহার বুকের আধখানা? শিশির যে মর্ম্মান্তিক লজ্জায় তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকটে মুখ দেখাইতে পারিতেছে না, বিজলীর মত স্ত্রী এমন অতর্কিত সৌভাগ্যে লাভ করিয়াও সে সৌভাগ্য এ বাড়ীতে আসিলে আর যার সহ্য করিতে সাধ্য হয় না,—এ কথাও কি অনিল একবার ভাবিতেছে না? অনিল এমন করিবে জানিলে হয়ত শিশির এ প্রলোভনও ত্যাগ করিত। শিশিরকে এ লজ্জা হইতে মুক্তি দিবার কথাও কি একবার তাহার মনে হয় না? অনিলকে এ কি খেয়ালে পাইয়া বসিল?

সজোর পদবিক্ষেপে অনিলের পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া শিশির তাহাকে আল্‌মারীকুঞ্জের এক নিভৃত স্থান হইতে গেরেফ্‌তার করিল এবং হাতের বইখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল "তোমার মৎলবটা কি স্পষ্ট করে বল দেখি আমাদের?"

"মৎলব? বইখানার দিকে কষ্ট করে একটু নজর দিলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে! পি-আর-এস্‌টা যদি—"

"একসঙ্গে ছাত্রবৃত্তি থেকে আরম্ভ করে এম-এ পর্য্যন্ত চলেছি দুজনে, আর আজ আমি কি করেছি অনিল যে তুমি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার হতে চাইছ অথচ আমি তার খবরটাও জানি না!"

"জান না কি বল্‌ছ শিশির? এ কি আমাদের বহুদিনের স্থির করা বিষয় নয়?"

"হ্যাঁ, তা বটে, কিন্তু মাঝের এই কাণ্ডগুলোর পর এ কথা তো আর হয়নি আমাদের মধ্যে।"

"মাঝের কাণ্ড মাঝেই মিলিয়ে গেছে—এখন আবার তার আগের সূত্র টেনে জীবনকে গাঁথ্‌তে হবে ত।"

"আর আমি? তোমারি আদেশে আমার মাঝের ব্যাপারটা সকলের চোখে জ্বলজ্বলেই হল, অথচ সেই তুমিই আমায় এম্‌নি করে ছাড়্‌ছ। একবারও ভাবছ না যে কার কথায় আমি—"

শিশিরের কাঁধে হাত দিয়া অনিল বলিল, "সে কি ভাই? এমন কথা কেন ভাব্‌ছ?"

"কেন ভাব্‌ব না? কি দোষ করেছি তোমার কাছে যে মাকে আর আমাকে এমন করে ত্যাগ কর্‌ছ?"

সবিষাদনেত্রে বন্ধুর পানে চাহিয়া অনিল বলিল, "তোমরা তা দোষী নও শিশির—দোষী আমি! তোমাদের মনের ভাবের সঙ্গে মতের সঙ্গে আজ আমার মন যে সায় দিচ্চে না, এ কি আমারই দোষ নয় ভাই! আর তুমি? তুমি আমার জন্য যা সইবে বইবে তাও কি আমায় মুখে বলে তোমায় ধন্যবাদ দিতে হবে?"

শিশির লজ্জিত হইয়া বলিল, "তা বল্‌ছি না,—আমার কথা নয়, মার বিষয়ে কেন তুমি একটু ভাব্‌ছ না অনিল? তুমি মার কাছে যাও না—চেয়ে খাও না—এই ঘরে সর্ব্বদা মনি করে রয়েছ, এতে মা যে কষ্ট পাচ্চেন।"

"আমার কি দোষে তিনি এত রাগ কর্‌লেন? সে ব্যাপার কি আমার ইচ্ছাকৃত?"

"না, সে তো ইচ্ছাকৃত নয় বটেই। বাদ্‌বাকী যাতে তাঁর তোমার ওপর অভিমান হয়েছিল তাও তো তুমি ঘটিয়ে দিয়েছ। কিন্তু ভেবে দ্যাখ একবার তিনি যা করেছেন তা কি জগতের পক্ষে এত বেশী বিরল ঘটনা?"

"না, কিন্তু আমার মাকে যে আমি জগতের চেয়ে অনেক উঁচু বলে জান্‌তাম।"

"অবুঝের মত কথা বোলো না। তিনি স্ত্রীলোক, তিনি মা। তুমি যে কত সময়ে নিজে মা হয়ে তাঁর পক্ষের কত কথার অনুমোদন কর্‌তে—আর আজ তাঁর কষ্ট বুঝ্‌তে পারছ না। এ কষ্ট কি কেবল তাঁর নিজের জন্যেই! তোমার মত ছেলের পাশে ঐ রকম স্ত্রী—এ কি—"

অনিল একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আঃ শিশির—সে যে বিজলীর বোন ভুলে যাচ্ছ বুঝি? আত্মীয়-স্বজনের দুর্ভাগ্যের কথা আত্মীয়ের কি অমন নিষ্ঠুর ভাবে উচ্চারণ কর্‌তে আছে!

শিশির লজ্জা পাইয়া নীরব হইল। অনিল বলিল, "না, আমি যে মাকে খুব বেশী দোষী কর্‌ছি—তা ভেব না; সাধারণ মায়ে যা করেন তিনিও তাই করেছেন।"

"তুমিই বা তাঁর পেটে হয়ে এত অসাধারণ কেন হবে।"

অনিল তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল "কই তা হলাম? আমিও তো জগতের রীতিতেই চল্‌ছি।"

"আচ্ছা কিসেই তোমার মন এত অন্যায় বল্‌ছে আমায় বাঝাও আগে। যার সঙ্গে বিয়ের কথা তার সঙ্গে না দিয়ে তোমায় লুকিয়ে একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে; তুমি কি তাকে স্ত্রী বল্‌তে, গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য?"

"নিজের কথায় নিজেই হার্‌লে যে! ধর যদি শ্যামলী কালা বোবা না হয়ে খুব কুৎসিতা হত—আর তার বাপ কুৎসিত মেয়ে পার কর্‌বার জন্যে এই রকম কাজ কর্‌ত তাতে কি সে আমার স্ত্রী বলে গণ্য হত না? আমি না হয় তাকেও ত্যাগ করে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে কর্‌তে পারি—যেমন আমাদের দেশে আথ্‌সার ঘটে থাকে—যা তুমিও বল্‌ছ—ধর্ম্মের কথাও যদি ছেড়ে দাও,—কিন্তু মনের সঙ্গে বল দেখি সেই কালো স্ত্রীরও আমায় স্বামী বলে জান্‌তে বা পেতে অধিকার থাকৃত কি না?"

"কিন্তু এ যে তা নয় অনিল—এ যে—"

"কালা এবং বোবা, কিন্তু তবু আত্মা আছে, মন আছে। একটা ইন্দ্রিয় না থাকৃলে আরও এমন সব বস্তু তাতে নিশ্চয়ই আছে যার দ্বারা প্রত্যেক মানুষের মতই সুখ দুঃখ বেদনা অভাব আনন্দ তৃষ্ণা সে অনুভব করে! তার ওপরে সে নারীস্বভাবা, যে নারী একদিন স্বামীর স্ত্রী, প্রণয়ীর প্রণয়িনী, সন্তানের মাতা হবার জন্যে আপনা হতেই লালায়িতা হয়ে ওঠে। কালাবোবা বলে কি শ্যামলীর মনে কখনো নারীত্বের এসব বৃত্তি জাগ্‌বে না ভাব?"

"মানি,—কিন্তু তবু তোমাকে স্বামীরূপে সে কি পেতে পারৃত—যদি না তার বাপ—"

"আমিও মানি এ কথা,—কিন্তু যখন বিধির চক্রে এই রকমই হয়েছে তখন একটা আত্মাকে—বিশেষ যাকে ধর্ম্ম ঈশ্বর সমাজকে সাক্ষী করে বিয়ে কর্‌তে হয়েছে তাকে..."

"কিসের বিয়ে! তুমি কি জান্‌তে তুমি ঐ রকম মেয়ে বিয়ে কর্‌ছ? তা হলে কি কর্‌তে?"

"না। কিন্তু—কিসের বিয়ে কি করে বল্‌ছ শিশির? তুমিও তো তখনি বিজলীকে না চিনেই অনিচ্ছাতেই মন্ত্রগুলো পড়েছ। বল দেখি কোন সভ্যতম জাতিতে, কোন দেশে, কোন সমাজে, এমনি কেবল কথা বলে স্ত্রী গ্রহণ চলে? আমাদের দেশে স্ত্রী বা স্বামী ত্যাগ কোনমতেই হতে পারে না। অন্য দেশের কথা এ ক্ষেত্রে চলে না।"

"স্বামী ত্যাগ স্ত্রীদের ক্ষমতায় নেই বটে, কিন্তু উপযুক্ত স্ত্রী ত্যাগই দেশে কত বল দেখি? এ তো তোমার—"

"জানি, সেটা দেশের মহা পাপের মধ্যেই গণ্য জেনো। নানা পাপ না জড়ালে কি সে দেশের সে জাতের এত অধঃপতন হয়? কিন্তু যদি এ কাজ কেউ পাপ বলে বোঝে সেও কি তাই করবে? ভগবান সাক্ষী করে যার সমস্ত দায়িত্ব এমন করে নিলাম, তারপরে যেই জান্‌লাম—যা ভেবে তাকে গ্রহণ করছি সে তার চেয়ে শতগুণে দুর্ভাগা, মহা অভাবগ্রস্ত, অমনি তাকে আমার ত্যাগ করতে হবে? যদি আমার সাহায্যে তার ঐ দুর্ভাগ্যের একটুও কমে, আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে, আমার মন দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে যদি তার সে অভাবের কিছুও পূরণ হয় তা আমি একটুও করব না? আমার হৃদয় তোমার হোক, আমার ধর্ম্মকর্ম্ম পাপপুণ্য সমস্তের তুমি অংশভাগিনী হও, আমার কুলে প্রতিষ্ঠিত হও—এসব কথা কি তুমি আমিও অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কতকগুলো শব্দমাত্র মনে করব শিশির?"

"তোমার আমার চেয়ে কত বড় বড় লোকেরা তা মনে করে গেছেন এবং এখনো করছেন—"

"করুন,—তাঁরা অন্য সবদিকে বড়লোক হতে পারেন, এখানে নন!"

"কেন, আমাদের শাস্ত্রেও এ রকম স্ত্রী ত্যাগ করবার বিধি আছে।"

"শুধু স্ত্রী কেন বল্‌ছ—সে রকম স্বামী ত্যাগেরও তো ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা কেন সমাজে চলে না?"

"আমরা তো সমাজসংস্কার করতে বসিনি—আমরা যা চলে তাই কেবল মেনে চল্‌তে চাই।"

"না, আমি নিজেকে অত হীন মনে করি না শিশির, তোমার আমার সমাজসংস্কার করবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। সমাজকে দৃষ্টান্ত দিয়েই সংশোধন করতে হয়। স্ত্রীদের দ্বারা যাকে সনাতনধর্ম্ম বলে মানিয়ে নেওয়া হচ্চে—পুরুষদেরও সেই ধর্ম্ম পালন করতে হবে। তারা যখন ক্লীব পতিত জড় অন্ধ স্বামী ত্যাগ করতে পারে না, তখন পুরুষও তা পারে না।"

"তোমার এ সাম্যবাদের ফাঁকে ফাঁকে এমন গলদ বেরুবে অনিল যাতে সমাজ তো পরের কথা জাতেরই চিহ্ন থাকবে না। স্ত্রীলোকেরা এ সমাজে দ্বিতীয় বিয়ের অধিকার পায় না বলে পুরুষেরও যদি বারণ হয় তা হলে দুই দিকের ব্রহ্মচর্য্যে এ জাতকে আর ধরাধামে একশ বছরও টিক্‌তে হবে না। তুমি বল্‌বে জানি—তা হলে স্ত্রীকেও সেই অধিকার দাও, কিন্তু সে কথা তোমার এখনকার হৃদয়বৃত্তির উত্তেজনার কথা মাত্র হবে। তুমিও জান এবং আমিও জানি যে স্ত্রীপুরুষের এ সাম্যবাদের নীতি বহু দেশে বহু তর্কের সঙ্গে চল্‌লেও সমস্ত কখনই মানুষে তাদের দিতে পারবে না। কিসে পারবে—প্রকৃতিই যে তাদের দুর্ব্বল করে রেখেছে। হয়ত তুমি এখনি সব দেশের সব কালের জোট্ করে গণ্ডাকতক নারীর দৃষ্টান্ত সকলের সাম্‌নে ধরবে—কিন্তু সব শস্য বা সব গাছের ফলের মধ্যেই অমন গোটাদুচ্চার বড় হয়ে যায়, তাদের নিয়ে সমস্ত ফলের বিচার চলে না। হাজার শিক্ষা দাও, সুবিধা দাও, স্বাধীনতা দাও, ভগবান তাদের নীড় বাঁধ্‌বার জন্যেই তৈরী করেছেন; তর্ক মীমাংসা শ্রুতি স্মৃতি ঘাঁট্‌বার জন্যে বা যুদ্ধ করবার জন্যে নয়। এদের মধ্যে যারা তা করেছেন বা এখনো করবেন আমাদের দেশের কি অন্য দেশের সেই প্রাতঃস্মরণীয়াদের আমি অমান্য করি না, তাও তো জান, কিন্তু তাঁরা হলেন শস্যের মধ্যের বৃহত্তম কটিমাত্র। তাঁদের কোন দেশে কোন কালের নিয়মে কেউ বাঁধ্‌তে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ নারীদের ভগবান স্নেহদুর্ব্বল স্বভাবদুর্ব্বল করে যে সৃষ্টিই করেছেন। তাদের স্বভাব অতিক্রম করাবার চেষ্টা—তারই নাম সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ করা। একটি সন্তান পালন করতে কি রকম একমনা হতে হয় স্ত্রীলোককে দেখেছ তো? তা না করে সে স্ত্রী যদি পুরুষের সঙ্গে সকল অধিকারের দাবী করত, তা হলে, না হত তার সন্তান পালন, না হত তার গৃহধর্ম্ম। বল্‌বে পশুপাখীরা তো সমান অধিকারে স্ত্রী-পুরুষেই সন্তানপালন করে—কিন্তু মানবের এই যে গৃহধর্ম্ম, যে গৃহে বাস করে (তা সে তপোবনের কুটীরেই হোক কি রাজপ্রাসাদেই হোক), যে গৃহাশ্রয়ী মানুষ মনুষ্যত্বে জগতের সমস্ত জীবের ওপর আধিপত্য করছে, সেই গৃহের মেরুদণ্ড স্বরূপেই ভগবান্ স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা শিক্ষাদীক্ষা বা অন্যান্য সব অধিকারে পুরুষের তুল্য হোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁরা এই গৃহকে না অতিক্রম

রেন, তাঁদের নারীত্ব না ভুলে যান।? তা হলেই ধর্ম্মনাশ ব। যাক—কোথা থেকে কোথায় এসে পড়্লাম,—র্কের এই বড় দোষ। তুমি কি তা হলে তারও আবার বিয়ে দিতে পার তবেই বিয়ে করবে এই মনে কর্ছ?"

অনিল সবিষাদে হাসিয়া বলিল, "তর্কে মানুষকে এমনি রে বটে। আমি পুরুষেরই স্বেচ্ছাচার পছন্দ করি না, স্ত্রীলোকের, যারা মায়ের জাত? একি তুমিও দিন জান না? কিন্তু যাকে নিয়ে আমাদের এ তর্ক র এই নারীত্বই যে কতটুকু আছে তাই যে সন্দেহ। ধর দ তার বিয়ে দেওয়াও সম্ভব হত, স্বেচ্ছায় কে তাকে বলে গ্রহণ করত শিশির?"

"ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অসাধারণ দয়বান শ্রীমান অনিলচন্দ্র!"

"হ্যাঁ শিশির, ঠাট্টা করলেও সত্যই বলেছ। শিক্ষার ভিমান, হৃদয়ের অভিমান যার আছে সেই তার ভার তে পারে—তা ছাড়া আর কেউ নয়। আমায় যদি গবান যথার্থই শিক্ষিত এবং হৃদয়বান্ করে থাকেন হলে তাকে ত্যাগ করা নিশ্চয়ই আমার অধর্ম্ম।"

"আচ্ছা, তুমি তোমার হৃদয়নীতিও মান—দেশরীতি স্ত্ররীতিও মেনে চল, আমি মাকে বুঝিয়ে শ্যামলীকে াবার এখানে আনাই,—তুমি তাকেও ত্যাগ কোরো না -আবার উপযুক্ত স্ত্রীও গ্রহণ কর একটি।"

"আহা সে হতভাগী আমাদের কাছে এমন কি দোষ রেছে যে তাকে তার মার কোল ছাড়িয়ে এই সহায়-হানুভূতি-হীন এখানে এনে আছ্ড়ে মার্ব? বিধাতা কে যা মেরেছেন সেই যথেষ্ট—আর কেন!"

"কেন, তুমি থাক্বে,—তোমার যা করা কর্ত্তব্য মনে বৃছ তাই করবে।"

"আর একটি উপযুক্ত স্ত্রীও গ্রহণ কর্ব (অবশ্য সে তো পেগুণে চমৎকারা হবেই), আবার শ্যামলীর ওপরও কর্ত্তব্য ালন কর্ব! কর্ত্তব্য এত সোজা কথা নয় শিশির। ক শ্যামলী, কি যে—বেচারাকে আবার বিয়ে কর্ব, দুজনার পরেই তা হলে অতি চমৎকার রকম কর্ত্তব্যই পালন বে। তার ওপরে নিজেকে এত মহাপুরুষ বলে আমার ারণা নেই যাতে তখনো আমার শ্যামলীর ওপরে উচিত কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান এখনকার মতই থাক্তে পারে ভাবতে পারি।"

"তা হলে তোমার কথা এই যে, শ্যামলীকে ত্যাগই কর, আর গ্রহণই কর, বিয়ে আর কর্ছ না, কেমন?"

"যে একটা স্ত্রীর ওপরই যথাকর্ত্তব্য পালন কর্তে পার্লে না তার আবারও কি বিয়ে করা উচিত? তুমিই বল দেখি? ধর যদি সে স্ত্রীটিও অন্ধ কিম্বা কোন গুরুতর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে? তখনো আমার আরো একটা বিয়ে করা কর্ত্তব্য হবে ত। তাই মনে করছি যে এই কর্ব আর এই কর্ব না এ সঙ্কল্পও আর [illegible] শিশির। যা কর্ব না ভেবেছিলাম তাও যখন কর্তে হল—তখন আরও যে কিছু কর্তে হবে না তাই বা কে বল্তে পারে?"

"অতদূর না ভেবে সম্মুখে উপস্থিত যে কর্ত্তব্য তারই সমাধান কর আগে। কুতর্ক ছেড়ে মনে কর যে এ বংশের প্রথম সন্তান তুমি! তার দায়িত্বজ্ঞানটুকু রেখো, শুধু নিজের হৃদয়কেই সব চেয়ে বড় কোরো না!"

"বংশের দায়িত্ব ত্যাগ এক যদি বংশরক্ষা নিয়েই বল—তা হলে সলিলের ওপর সেইটুকুমাত্র থাক, বাদবাকী সব আমারই।"

"মায়ের কথাও একবার ভাব্বে না? তাঁর যে তুমি সবচেয়ে বড় অনিল।"

"তাঁর তো আমিই থাক্লাম! এ শরীর তাঁরই তো। তিনি ইচ্ছে করলে, জোর কর্লে এর দ্বারা সবই তো করাতে পার্বেন। একটিকে ত্যাগ কর্লাম—আবারও একটিকে অমনি ধর্ম্মসাক্ষী করে গ্রহণও করাতে পারবেন ইচ্ছে করলে। কিন্তু সে অধর্ম্মের ভাগী একা আমিই হব না, এবারে তাঁকেও হতে হবে।"

শিশির কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া শেষে বন্ধুর মুখে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আজীবন তোমার কাছে-কাছে আছি, তোমার হৃদয়ের বন্ধু বলেই নিজেকে জানি, কিন্তু আজ বুঝ্ছি—তোমাকে আমিও কিছু জানি না। তাই ভেবে পাচ্ছি না যেখানে ভালবাসারও কোন সম্ভাবনা নেই সেখানে মাত্র কর্ত্তব্য আর দয়া কি করে তোমার হৃদয়কে এত বিগলিত কর্তে পেরেছে?"

"শিশির, ভালবাসার জন্ম যেখানে—সেই হৃদয়েই দয়ারও

তো জন্ম। তবে তাকে তোমার ও ভালবাসা থেকে নিকৃষ্ট কিসে ভাবছ! দয়া স্নেহ ভালবাসা একই জিনিসের তর তম অবস্থা বই তো নয়। ওর মধ্যে যার ওপরে যত অনুশীলন চালাবে সেইই কি মনের কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াবে না? আর কর্ত্তব্য যদি তার সঙ্গে থাকে, তার ওপরে কেউ তো দাঁড়াতে পারে না ভাই।" (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

তিব্বতে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণ বৃত্তান্ত।)

৬০ অধ্যায়।

তিব্বতের লামাবাদ।

তিব্বতের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিতে হইলে সে দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেই জন্য এস্থলে তিব্বতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তিব্বতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমি প্রচলিত ধর্ম্মের কথাই বলিব, মতবাদ বা ধর্ম্মতত্ত্বের কোন প্রসঙ্গের আলোচনা করিব না।

তিব্বতে যে লামাবাদ প্রচলিত আছে তাহার ভিতর দুই সম্প্রদায় আছে, প্রাচীন এবং নবীন। প্রাচীন তন্ত্রের সম্প্রদায়কে "লালটুপী" এবং নবীনদের "হলদেটুপী" বলে। প্রাচীন সম্প্রদায় নানা শাখায় বিভক্ত। নানা পার্থক্য থাকিলেও সকল সম্প্রদায়ের মূল মতে কোন প্রভেদ নাই।

লোবন পদ্মচুঙ্গি নামক একব্যক্তি প্রাচীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। উরকেনের রাজার বাগানে ধনকোষ নামক সরোবরে এক প্রস্ফুটিত পদ্ম হইতে লোবন পদ্মচুঙ্গির জন্ম,—এইরূপ প্রবাদ আছে। উরকেন, কাবুলের অন্তর্গত এক স্থান। পদ্মচুঙ্গির নামে অনেক গল্প আছে। পদ্মচুঙ্গি তিব্বতের লামাসম্প্রদায়ের ভিতর ভোগসুখ ও মদ্যমাংসের প্রচলন করিয়াছেন। তিনি এই মত প্রচার করেন, যে, আনন্দময় জীবনযাপন করাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা, এবং বুদ্ধত্ব লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। লোবন পদ্মচুঙ্গি একজন ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে যে-সকল পুস্তক আছে তাহা অপাঠ্য, অতি অশ্লীল। জাপানেও এক সময় এই-প্রকার তান্ত্রিক মতাবলম্বী এক সম্প্রদায় ছিল, কিন্তু এখন তাহার কথা আর বড় শোনা যায় না। তিব্বতে লোবন পদ্মচুঙ্গির সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল। ইহাদের যে সকল পুস্তকাদি আছে, তাহার অনেকগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আমার নিকটও কয়েকখানি পুস্তক আছে, কিন্তু অশ্লীল ও অপাঠ্য বলিয়া আমি বাক্সের ভিতর তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। এমন জঘন্য ধর্ম্মও তিব্বতে এতাবৎকাল আদৃত হইয়া আসিয়াছে। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে একজন ধর্ম্মসংস্কারক উত্থান করেন—তিনি সাধ্যমত চেষ্টায় তিব্বতের এই বিকৃত ধর্ম্মকে সুসংস্কৃত করিবার চেষ্টা করেন। এই মহাত্মার নাম অতীষ। ইনি একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে আগমন করেন। তাঁহার তিনশত বৎসর পরে জি-সং-খা-পা আর-একজন সংস্কারকের দ্বারা প্রচলিত-ধর্ম্ম সুসংস্কৃত হয়। এই ব্যক্তি চীন সীমান্তে আমড়ো নামক স্থানে পলাণ্ডুক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রচলিত ধর্ম্মের ভিতর যে সকল দুর্নীতি স্থানলাভ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ইনি প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা পরিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি এই মত প্রচার করেন যে বৈরাগ্য এবং নিবৃত্তিই লামাদিগের প্রধান গুণ হওয়া উচিত। লামাদিগকে সুনীতি-পরায়ণ করিবার জন্য এই মহাত্মা প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা বড় সহজ চেষ্টা নয়। নবসম্প্রদায়ের এই এক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা প্রাচীন সম্প্রদায়ের সকল ক্রিয়াকর্ম্ম মূর্ত্তি নূতন অর্থ দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বাহ্যিক পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। প্রাচীন সম্প্রদায়ের বাহ্যিক চিহ্ন ও মূর্ত্তি-সকল নবীন সম্প্রদায়ও গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকার গ্রহণ করিবার অর্থ কি? বোধ হয় বদ্ধমূল দেশাচার উন্মূলিত করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের সুসঙ্গত ও ভদ্র অর্থ দিয়া সে-সকল গ্রহণ করা হইয়াছে।

এস্থলে তিব্বতের অবতারবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিব্বতে অবতারবাদ অত্যন্ত প্রবল। একজন সাধু বা বুদ্ধের মৃত্যু হইলে তিনি যে আবার সাধু হইয়া জীবের উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করেন ইহা সে-দেশের লোকের

্ বিশ্বাস। যে-কোন ব্যক্তির ি তর কিছু বিশেষত্ব কিলেই তাঁহাকে আবার জীবের কল্যাণের জন্য অব- ার্ণ হইতে হইবে। সে দেশে যে-সে লোকও অবতার হয়। প্রতি কিছুদিন হইতে এই মতের তত বাড়াবাড়ি নাই। র্ব্বের ন্যায় সহজে কেহ আর অবতার হয় না।

৬১ অধ্যায়।

তিব্বতের পুরোহিত-পদবীর ক্রম।

চারিশত বৎসরের অধিক হইল গেনতুনটাব নামে বসম্প্রদায়ের এক ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিব্বতে যে বজ্ঞ নিয়োগের প্রথা প্রচলিত আছে ইনিই তাহার বর্ত্তক। ইহাই কালক্রমে অবতারবাদে পরিণত হই- ছে। কথিত আছে গেনতুনটাব মৃত্যুর সময় বলিয়া ন, যে, অমুক স্থানে অমুক গৃহে তিনি আবার জন্মগ্রহণ রিবেন। অনুসন্ধানের পর ঠিক সেই স্থানে, সেই ঘরে কটি বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে জানা যায়। আরও াশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে বালক যখন কথা বলিতে াখিল তখন-তখনি লাম্‌পু মন্দিরে শয়ন করিবার ইচ্ছা কাশ করিল, এই বিহারেই গেনতুনটাবের মৃত্যু হয়। খন গেনতুনের ভক্ত শিষ্যদিগের আর সংশয় রহিল না, , তাহাদের গুরু এই বালকের ভিতর অবতীর্ণ হইয়া- ্েন। সেই বালক সেই মন্দিরে দ্বিতীয় প্রধান লামারূপে জিত হইতে লাগিল। তৃতীয় চতুর্থ লামার সময় অবতার- াদ তত প্রবল হয় নাই—কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ লামার ময় হইতে এই অবতারবাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া বর্ত্তমান বস্থায় আসিয়াছে। পঞ্চম দলাইলামা দৈবজ্ঞ নিয়োগের ধি অত্যন্ত প্রবল করিয়া তোলেন। পঞ্চম প্রধান লামার াম গাঁকওয়াং গমাটসো। যদিও তিনি নূতন সম্প্রদায়ের তিনিধি ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের স্তক-সকল পাঠ করিয়া প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনেক ধি নূতন সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার ময়ে দৈবজ্ঞ নিয়োগ বিধি অত্যন্ত প্রবল হয়। তিনি চোং সাম্যে লানো ও গাটোং বিহারের লামাদিগকে বজ্ঞের পদে নিয়োগ করেন, অর্থাৎ সেই-সকল বিহারের াধিষ্ঠাতৃ দেবতারা দৈবজ্ঞ দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকেন।

পঞ্চম লামার সময় হইতেই পুরোহিত-শাসনপ্রণালী তিব্বতে প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রধান লামাদিগের অধ্যাত্ম অধিকার মাত্র ছিল; দেশশাসন, রাজ্য শাসন, রাজ্য পালনের কোন দায়িত্বই ছিল না। লামাদিগের রাজ্যই ছিল না তা রাজ্যশাসন। লামার রাজ্যাধিকার কিপ্রকারে সম্ভব হইয়াছিল তাহাই বলিতেছি। পঞ্চম লামার সময়ে শ্রীগৌমি টেনজিন চো গয়াল নামক মোঙ্গল বীর তিব্বত আক্রমণ করেন, এবং তিব্বতের ১৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে পদানত করেন। প্রত্যেক জাতিতে দশসহস্র পরিবার ছিল। এই প্রকারে তিব্বত রাজ্য অধিকার করিয়া তদা- নীন্তন প্রধান লামাকেই সমুদায় অধিকৃত দেশের অধীশ্বর করিয়া দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন হইতে তিব্বত রাজ্যের অধীশ্বর প্রধান লামা—তখন হইতে পুরোহিত-শাসনপ্রণালী তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তিন শতাব্দী হইল তিব্বতে পুরোহিত-শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এখন দৈবজ্ঞ নিয়োগ ব্যাপারখানা কিরূপ তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। প্রথম লামা গেনডুন- টাব বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কোথায় আবার জন্ম- গ্রহণ করিবেন, কিন্তু পরের লামারা সেটুকু আর করিলেন না। কোথায় যে তাঁহারা আবার জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা অজ্ঞাত রহিল। তিব্বতের লোকের বিশ্বাস যে প্রধান লামার মৃত্যুর ৪৯ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি আবার কোথাও জন্মগ্রহণ করিবেন। এখন কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই নির্ণয় করা এক কঠিন সমস্যার মত হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি তিব্বতের চারিটি প্রধান দেবা- লয়ের পুরোহিতগণই দৈবজ্ঞরূপে এই দুরূহ বিষয়টির মীমাংসা করিবার অধিকারী। এখন দৈবজ্ঞরা যে প্রকারে এই প্রধান লামার নবজন্ম আবিষ্কার করেন তাহা বড় অদ্ভুত। যাহাদিগকে দৈবজ্ঞ বলিয়া নিয়োগ করা হয় তাঁদের আচরণ দেখিলে সাধারণ লোক তাঁহাদিগকে উন্মাদ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারে না। সাধারণতঃ একদল পুরোহিত (লামা) দৈবজ্ঞরূপে নির্ব্বাচিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে আবার একজন মধ্যস্থ বা মুখপাত্র হয়, অপর সকলে তাঁহাকে সাহায্য করে,

অর্থাৎ মন্ত্র পড়ে, ঢাক ঢোল করতাল বাজায়। মুখপাত্র অতি জমকাল সাজ পরিয়া উপস্থিত হয়, এবং অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চক্ষু নিমীলিত করিয়া দেবতার নির্দ্দেশ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে, আর সকলে ঢাক ঢোল বাজাইয়া মহা কোলাহল উপস্থিত করে। কিছুক্ষণ পরে সে ব্যক্তি থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। কম্পও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তারপর হঠাৎ সে লম্ফ দিয়া উঠে, তখনই তাহার ভিতর দেবতার আবির্ভাব হয়। তখন তাহাকে যে-সকল প্রশ্ন করা হয় সে তাহার উত্তর দিতে থাকে, সে তখন দৈবজ্ঞ হইয়া বলিতে থাকে কোন্ স্থানে কোন্ পরিবারে কোন্ দিনে মৃত লামা আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন সেই লামার অবতার শিশুটিকে আবিষ্কার করিয়া বাহির করা হয়। যতদিন না স্তনত্যাগ করে ততদিন সেই শিশুটিকে তার জননীর নিকট রাখা হয়। স্তনত্যাগ করিলেই সেই শিশুটিকে বিহারে আনিয়া যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুর মনে এই ভাব বদ্ধমূল করা হয়, যে, সে প্রধান লামার অবতার। পঞ্চম লামার সময় হইতে এই প্রকার দৈবজ্ঞ নিয়োগের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তিব্বতের চারিটি বিহারের এই প্রকার দৈবজ্ঞ নিয়োগের অধিকার আছে, তন্মধ্যে নিচাং বিহারের সম্মান অধিক। প্রধান লামার মৃত্যুর পর চারিটি বিহারের লামাদিগের উপর লামার অবতার নির্ণয়ের ভার দেওয়া হয়। অধিকাংশ সময়েই প্রত্যেক বিহার স্বতন্ত্র অবতারের কথা বলে, একজন বালকই সকলের মনোনীত হয় না; এই প্রকার তিনচারটি বালকের মধ্য হইতে একজনকে পছন্দ করা হয়। অনেক সময় এমন হয়, বিহার-চতুষ্টয়ের মনোনীত তিনচারিটি বালককে ৫ বৎসর বয়স হইলেই লাসায় আনা হয়। তখন রাজ্যের সমুদায় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হন, যথা, লাসার চীনের প্রতিনিধি, প্রধান লামা, প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান লামাগণ। তখন সকল বালক-অবতারের নাম ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিখিয়া একটা স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ৭ দিন ধরিয়া সেই পাত্রের নিকট নানা প্রকার পূজা অর্চ্চনা মন্ত্রপাঠ চলিতে থাকে। সাত দিনের পর সকলে আবার সেখানে উপস্থিত হন, তখন লাসার চীন-প্রতিনিধি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দুইটি সরু কাঠি লইয়া আবদ্ধচক্ষু হইয়া একটি কাগজের টুক্‌রা বাহির করেন। যে বালকের নাম উঠে সেই প্রধান লামার পদে অভিষিক্ত হইয়া সেই আসনে উপবেশন করে।

আমার বর্ণনা হইতে সকলেরই মনে হইতে পারে, যে, প্রধান লামা নিয়োগের ভিতর কোন প্রকার চাতুরী থাকিতে পারে না। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, চীন-প্রতিনিধিকে অনেক উৎকোচ দিয়া বালকদিগের পিতা আপনার পুত্রের নির্ব্বাচনের জন্য চেষ্টা করেন। কারণ প্রধান লামার পিতা চীনসম্রাটের নিকট হইতে সম্মানিত উপাধি এবং তদ্‌ভিন্ন বিস্তর অর্থ ও সম্পত্তি লাভ করে। কিন্তু উৎকোচের কথা আমার শোনা কথা, বাস্তবিক উৎকোচ চলে কি না জানি না। যে দেশে এমন দৈবজ্ঞ নিয়োগের বিধি আছে সে দেশে যে দৈবজ্ঞের ক্ষমতা এবং প্রতাপ অধিক হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তিব্বতের দৈবজ্ঞরা অত্যন্ত ধনী। নিচাং বিহারের লামাগণ লক্ষপতি—অর্থাৎ লক্ষপতি বলিতে তিব্বতে যাহা বোঝায়। বড় আশ্চর্য্যের কথা এই—ধনীর সন্তানগণই লামার অবতার হয়, গরিবের ঘরে লামা কদাচ অবতীর্ণ হন না। এই জন্যও উৎকোচের কথা লোকে বিশ্বাস করে। যাহা হউক আমি যতদূর বুঝিয়াছি লামার অবতারগুলি সকল প্রকার দুর্নীতির অবতার।

আমি তিব্বতের কোন প্রধান ব্যক্তিকে একবার বলিয়াছিলাম যে এই লামার অবতারের ব্যাপারখানা সর্ব্বৈব ফাঁকি। তিনি ত তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

একটি কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, দশটির মধ্যে আটটি লামার অবতার জনসাধারণের চেয়ে অনেক উন্নতপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকেন, ইহার প্রধান কারণ এই তাহাদিগকে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিষ্যগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রাণে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ মহত্ত্বের, উন্নত জন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, কদাচ লামার অবতারকে কঠোর কথা বলা হয় না, ইহা দেখিয়া আমার মনে হয়, শিক্ষার জন্য কঠোর ব্যবহার এবং

্রহারের পরিবর্ত্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে অধিক ফল লাভ হয়। শিক্ষকগণ বালক লামাকে বুদ্ধের অবতার ানে সম্ভ্রম করিয়া থাকে। সেইজন্য কদাচ কঠোর ব্যবহার রে না। লামার অবতার নির্ব্বাচনের জন্যই যে কেবল ্রৈবজ্ঞ নিয়োগ হয় তাহা নয়, সকল ব্যাপারেই দৈবজ্ঞের য়োজন। যদি কোন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী কোন অন্যায় কার্য্য রিয়া বসেন, তখনই তিনি দৈবজ্ঞের নিকট উপস্থিত ইয়া বিস্তর উৎকোচ দিয়া, যাহাতে তাঁহার অপরাধের বুদণ্ড হয় তাহার বিধান করিতে অনুরোধ করেন। বজ্ঞকে উৎকোচ দিয়া তিনি নিরুপদ্রবে বাস রিতে থাকেন। পরে যখন তাঁহার অপরাধের কথা কাশ হইয়া পড়ে তখন কর্ত্তৃপক্ষ দৈবজ্ঞের নিকট পরাধের কিরূপ শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে তাহার র্ণয়ের জন্য উপস্থিত হন। এদিকে অপরাধী ব্যক্তি গ্রেই তাহাকে উৎকোচ দিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং তিনি ছুমাত্র বিচলিত হন না, দৈবজ্ঞ তাঁহাকে শাস্তি হইতে ক্ষা করিবেই করিবে। দৈবজ্ঞ যথাসময়ে পূজা-অর্চ্চনার র গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিতে থাকে, "লোকটা অপরাধ রিয়াছে বটে, কিন্তু দেবতার অনুগ্রহ উহার উপর। শাস্তি লে দেবতা অপ্রসন্ন হইবেন, সে বড় বিষম অশান্তি, তএব উহাকে ছাড়িয়া দাও।" যদি এমন ঘটে যে কোন ক্তি উৎকোচ না দেয়, তাহা হইলে নিচাংএর লামাদিগের স্তে তাঁহার আর উদ্ধার নাই। দলাই লামার নিকটও । ব্যক্তির লাঞ্ছনার একশেষ হয়। নিচাংএর লামা-গের অসীম ক্ষমতা, এমন কি দলাই লামার চেয়েও াহারা ক্ষমতাশালী, কারণ দলাই লামাগণ আবহমান াল তাহাদিগের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। কন্তু বর্ত্তমান দলাই লামা বড় চতুর ব্যক্তি, তিনি নিচাংএর ামাদিগের মতে সকল সময় কার্য্য করেন না—কিন্তু হা সে দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। নিচাংএর দৈবজ্ঞ-ামাগণ প্রকৃত সঙ্কটকালে যখন কোন বিহিত উপায় বলিয়া াতে পারে না, তখন প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া মূর্চ্ছা ায়, আর তার সঙ্গীরা বলিতে থাকে দেবতা এ প্রশ্নে দ্ধ হইয়াছেন, অতএব আর কোন প্রশ্ন করা উচিত নয়। মনই দৈবজ্ঞ ইহারা। তিব্বতের ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত লোকেরা এই দৈবজ্ঞদিগকেও অন্তরে অন্তরে ঘৃণা এবং অবিশ্বাস করে—বলে ইহারা শয়তানের চর—কিন্তু বাহিরে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার জো নাই।

তিব্বতে দুইজন প্রধান লামা আছে—দলাই লামা ও তাসি লামা। বর্ত্তমান তাসি লামা এক মূক রমণীর সন্তান। তাঁর পিতা কে তা কেহ জানে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা সরকার।

নূতন নক্ষত্র

বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ ভাগে, সম্ভবতঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর রাত্রে নয় ঘটিকার সময়ে আমরা কয়েকটি বন্ধু বাহিরে বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হইল চন্দ্র-বিহীন রাত্রে যেরূপ অন্ধকার হওয়া উচিত তাহা হয় নাই, দিঙ্মণ্ডল যেন কেমন একটু মৃদু আলোকে আলোকিত হইয়াছে, শুক্রগ্রহ পৃথিবীর খুব নিকটে আসিলে যে প্রকার হয় কতকটা সেইরূপ। এই সময়ে আকাশে শুক্র নাই, বৃহস্পতিও নাই; শনৈশ্চর ও মঙ্গল এবং প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র স্বাতী ও অভিজিৎ ত প্রতিরাত্রেই এ সময়ে আকাশে থাকে; তবে আজ কেন এরূপ আলো বোধ হইতেছে। এই কথা লইয়া আমরা বেশ একটু আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। উহা যে নভোমণ্ডলের কোন নৈসর্গিক ঘটনাপ্রসূত তাহা মনে হইলেও তখন আকাশ পর্য্যবেক্ষণে মনোযোগ দেই নাই, আকাশের অবস্থাও তত ভাল ছিল না। একবার মনে হইল সাদা মেঘে সূর্য্যালোক প্রতি-ফলিত হইলে এইপ্রকার হয়, কিন্তু তাহা সচরাচর সন্ধ্যা-কালেই ঘটিয়া থাকে। আবার মনে হইল ছায়াপথের আলোকেও এইপ্রকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাও শরৎ কালে আকাশ নির্ম্মল না হইলে সম্ভব নহে। যাহা হউক মনের সন্দেহ দূর হইল না।

পরদিন রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে পূর্ব্বাকাশে একবার দৃষ্টি পড়ায় একটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইলাম। তখন সেখানে বেশ একটু মেঘ ছিল, তথাপি মেঘের অন্তরাল হইতে উহার জ্যোতি বেশ দেখিতে পাইলাম। তখন আমি উহাকে শ্রবণানক্ষত্রের যোগতারা বাসুদেব (a Aquilae)

মনে করিলাম। (ঐ তারাটির পাশ্চাত্য নাম Altair)। পরক্ষণেই মেঘ অপসারিত হওয়ায় বাসুদেব ও ঐ উজ্জ্বল তারা উভয়কেই স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। পরক্ষণেই আবার মেঘে ঢাকিয়া গেল। তখনও আমি মনে করি নাই যে উহা কোন নূতন নক্ষত্র। মনে হইল উহা বুঝি গরুড় রাশির, অথবা সর্পরাশির কোন নক্ষত্র (Delta Aquilae অথবা Eta Serpentis) হইবে। কিন্তু উহাদের উজ্জ্বলতার তুলনায় মনে অত্যন্ত সন্দেহ হইল। গতিশীল মেঘের অবকাশ-পথে উহাদিগকে যে ক্ষণকালমাত্র দেখিয়াছিলাম তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে উহার উজ্জ্বলতা বাসুদেব হইতে বেশী; এমন কি অভিজিৎ (Vega) হইতেও বেশী। ইহার পরেও দুই তিনদিন রাত্রে দিঙ্মণ্ডল পূর্ব্ববৎ মৃদু আলোকে আলোকিত দেখিয়াছিলাম এবং ঐ তারাটিকেও লক্ষ্য করিতাম।

পরে ১২ জুনের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রে, ৯ জুন ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে লণ্ডন হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে (A new star in the constellation of Aquila) গরুড় রাশিতে একটি নূতন তারার আবির্ভাবের কথা পাঠ করিয়া আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইল, এবং বুঝিতে পারিলাম যে আমার দৃষ্ট ঐ উজ্জ্বল তারাটিই নূতন নক্ষত্র এবং উহারই জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল এ প্রকার মৃদু আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। অতঃপর ২রা আষাঢ় পর্য্যন্ত আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল এবং দিবারাত্রি অবিরত বৃষ্টি হইতেছিল; তজ্জন্য উহাকে দেখিবার আর সুযোগ ঘটে নাই। ২রা আষাঢ় রাত্রি ১টা হইতে ১॥টা পর্য্যন্ত মস্তকোপরিস্থ আকাশ বেশ নির্ম্মল ছিল, নবতারাটিও ঐ সময়ে মধ্যাকাশে উপনীত হইয়াছিল, ঐ সময়ে উহাকে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি। নূতন তারাটি সর্পরাশির পূর্ব্ব-বিভাগের Eta Serpentis হইতে কিছু উত্তরপূর্ব্বে এবং Theta Serpentis হইতে কিছু দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ঐ স্থানে ছায়াপথ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, বিভক্ত বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী গাঢ় নীল আকাশে নূতন তারাটি অবস্থিত। কৌতূহলী পাঠকগণ, সন্ধ্যার পর আকাশ মেঘশূন্য থাকিলে পূর্ব্বগগনে দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রাবণানক্ষত্র ও নূতন তারাটি সহজে চিনিতে পারিবেন। আজকাল উহার জ্যোতি কমিয়া গিয়াছে, তথাপি উহার নিকটে ওরূপ উজ্জ্বল তারা আর নাই। তারাটি প্রথমে নীলের আভাযুক্ত উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের এবং প্রথম শ্রেণীর তারা হইতেও একটু বেশী জ্যোতিষ্মান ছিল। ঐ সময়ে উহার স্থূলত্ব ‧০৯ ছিল। প্রায় সপ্তাহকাল ঐরূপ থাকিয়া উহার জ্যোতি কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং উহার বর্ণও কমলাবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজকাল উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর রক্তাভ তারার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

বিধাতার রাজ্যে কোথায় কি আছে না-আছে দার্শনিক এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সতত তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গভীর গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে নভোমণ্ডলের অগণিত জ্যোতিষ্কের মধ্যে এমন অনেক জ্যোতিষ্ক আছে যাহাদের জ্যোতি বহুকাল পূর্ব্বে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে; তাহারা এক্ষণে আর জ্যোতিষ্ক নহে; তথাপি বিধাতার অলঙ্ঘ্যবিধানে পিণ্ডাকারে অসীম গগনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দূর গগনে ঐরূপ বিভিন্নমুখ দুইটি নির্ব্বাপিত জ্যোতিষ্ক নিকট দিয়া গমন করিবার সময়ে নৈকট্য বশতঃ তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষণ সংঘটিত হয়। ঐ সংঘর্ষণের ফলে তাহারা প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া দীপ্তিমান হইয়া উঠে। এইরূপে সময়ে সময়ে আকাশে নূতন তারার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই প্রকার নূতন তারার আকস্মিক আবির্ভাব নভোমণ্ডলের ঘটনাবলীর মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে। অগণিত নক্ষত্রের মধ্যে যে-সকল ক্ষুদ্র বা অতি ক্ষুদ্র নূতন তারার আবির্ভাব হয় অনেক সময়ে তাহারা নরচক্ষুর অগোচর থাকিয়া যায়। কখনও বা উহারা ফটোগ্রাফের প্লেটে ধরা পড়ে। কিন্তু যে-সকল নূতন নক্ষত্র খালি চক্ষে দেখিবার উপযুক্ত উজ্জ্বলতায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষের জনক হিপার্কাস দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এইরূপ একটি নূতন নক্ষত্রের প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৫৭২ খৃঃ অঃ ৬ই নবেম্বর টাইকো ব্রা কাশ্যপীয় রাশিতে একটি নূতন তারা দেখিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত যতগুলি নূতন তারার আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ঐটিই উজ্জ্বলতায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিল এবং উজ্জ্বল দিবালোকেও উহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত। ১৬০৪ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসে কেপ্‌লার এবং গালিলিও

তিন ইঞ্চি দূরবীনের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নূতন তারা তাহার নিকটে কয়েকটী ক্ষুদ্র তারা। ইং ২৫. ৬. ১৮. তারিখের দৃশ্য।
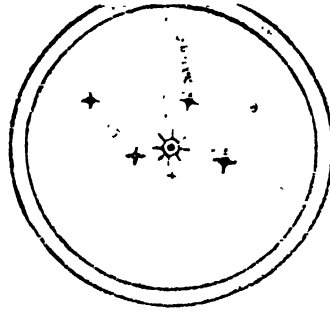
তারা চিহ্ন।

নূতন তারা।
প্রথম শ্রেণী।
দ্বিতীয় শ্রেণী।
তৃতীয় শ্রেণী।
চতুর্থ শ্রেণী।
পঞ্চম শ্রেণী।
ষষ্ঠ শ্রেণী।

নূতন তারা-ক্ষেত্রের বড়ো চিত্র।
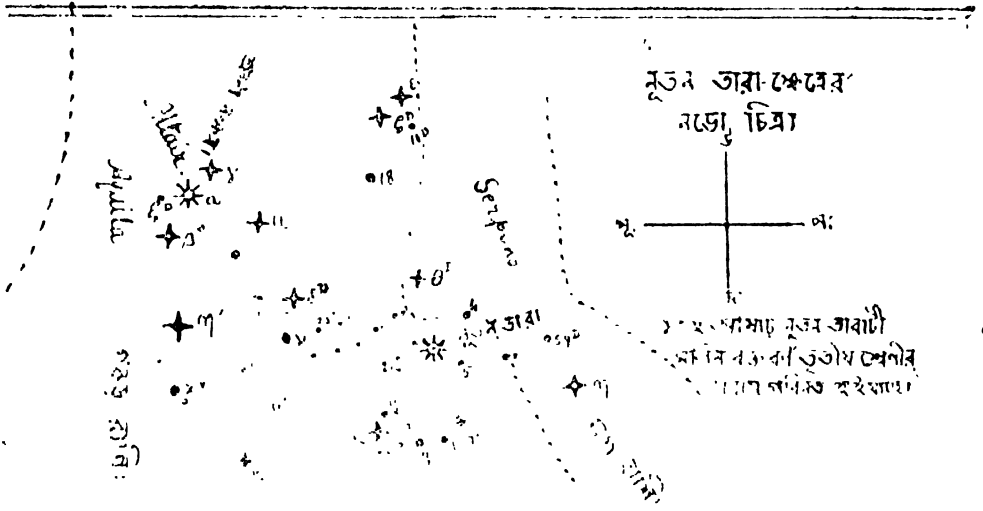
ধারী (Ophinchus) রাশিতে একটি নূতন তারা খিয়াছিলেন। ঐ তারাটি যেখানে দেখা গিয়াছিল, বর্ত্তমান ন তারাটি তথা হইতে খুব বেশী দূরে নহে, পাঠকগণ রাচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ১৬৭০ খৃঃ অঃ ন্থেলস্ শৃগাল-রাশিতে একটি নূতন তারা দেখিয়া-লেন। ঐ দুইটি সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য নূতন রা। উনবিংশ শতাব্দীতে আটটি নূতন তারার বির্ভাবের ইতিহাস পাওয়া যায়। তৎপরে বিংশ শতাব্দীর রম্ভে ১৯০১ খৃঃ অঃর ২২শে ফেব্রুয়ারী এডিনবার্গ নগরে ক্তার এণ্ডারসন্ পরশু রাশিতে খালিচক্ষে একটি নূতন রা দেখিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ অঃ জ্যোতিষী এস্পিন ধা রাশিতে আর-একটি নূতন তারা আবিষ্কার করেন। ঃপর গরুড় রাশির বর্ত্তমান নূতন তারাটি বিংশশতাব্দীর ীয় নূতন তারা।

নূতন নক্ষত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে উহারা অকস্মাৎ প্রচণ্ডতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু কতিপয় দিবসের মধ্যেই উহাদের উজ্জ্বলতা কমিতে আরম্ভ করে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়। গহন গগনের দূরতর প্রদেশে দুইটি অদৃশ্য বস্তুপিণ্ড যখন পরস্পরের সংঘর্ষে প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া উঠে তখনই যে আমরা উহা দেখিতে পাই তাহা নহে। এই সংঘর্ষণ আকাশের এত দূরতম প্রদেশে ঘটে যে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল হইলেও ঐ আলোক আমাদের নিকট আসিতে, একশত, দুইশত, এমন কি বহুসহস্র বৎসরও অতীত হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন এমন ঘটনাও বিরল নহে যে ঐরূপ নূতন নক্ষত্রের আলোক যখন আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছে, অর্থাৎ যখন আমরা উহাকে দেখিতে পাই, তখন উহার উৎপত্তিস্থানের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে আকাশের সুদূরতম প্রদেশে দুইটি জড়পিণ্ডের সংঘর্ষণে

যে অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা তথায় কতিপয় দিবস অথবা কতিপয় মাস বা বৎসর প্রচণ্ড তেজে জ্বলিতে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উহার তেজ হ্রাস হইয়া নিবিয়া যায়। কিন্তু উহাতে যে আলোকের উৎপত্তি হইল তাহা সেখান হইতে দিগ্বিদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া অগণিত গ্রহনক্ষত্রের অবকাশ-পথে নিয়ত ছুটিয়া ছুটিয়া দুই বা তিন শতাব্দী পরে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইবে। এইখানেই কি উহার গতির শেষ? কে বলিবে যে ঐ আলোক অনন্তকাল অনন্তের পথে অনবরত চলিবে না এবং অপর গ্রহনক্ষত্রে অবস্থিত জীবের নয়নপথে পতিত হইবে না? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে আকাশে এমন নক্ষত্র আছে বা জন্মগ্রহণ করিয়াছে যাহাদের আলোক এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই, হয়ত বহুশতাব্দী পরে আসিবে, হয়ত তাহাদের অনেকের জ্যোতি পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাহাদের জ্যোতি আমরা এক্ষণে দেখিতেছি বটে, কিন্তু কালবশে তাহারা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে এবং বহুশত বর্ষকাল পরে উহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এমন নক্ষত্রও আছে যাহাদের মৌলিক অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইতেছে এবং বহু শতাব্দী এইরূপে প্রতিভাত হইয়া হয়ত চিরতরে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আমাদের সূর্য্যও হয়ত কালবশে ঐরূপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, এবং আকাশের যেসকল দূরতম প্রদেশে এখনও উহার আলোক যায় নাই, নির্ব্বাপিত হইবার পরে সেইসকল স্থানে উহার জ্যোতি যাইয়া পৌঁছিবে। বাস্তবিক জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতির এইসকল লীলাখেলার কথা ভাবিতে গেলে মন চমৎকার-সম্বলিত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

মানুষের প্রেম

(গল্প)

হাওড়ের কালো জল আমাদের গাঁটিকে এসে ঘিরেছে। যেদিকে চোখ যায় সেই ধূ ধূ কালো নীলাভ পাহাড়ের রেখাতে গিয়ে ঠেকেছে। তারই নীচে একটা অন্তহীন সবুজের সম্পদ জলো হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে শিউরে সলিল-সমাধি থেকে জেগে উঠ্‌বার প্রতীক্ষা করুচে।

ভোর; ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্চে; কালো জল দুলে উঠেছে। একটা গলা-অবধি-ডোবা হিজল-গাছের ডালে পাতায় দুখাই তার গলুইভাঙা নৌকাটিকে জড়িয়ে বেঁধে, ধারাল দা'টিকে কাছে করে বসে হুঁকো ফুঁকছিল। নাজিম-দা যেতে যেতে তাকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করুলে "এ মাঠটায় মাছ কেমন পড়েছে ভাই?"

নাজিম-দার নৌকায় আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি হুঁকোটাকে লুকিয়ে দুখাই জবাব দিলে "তা তো জানিনে ভাই, মাছটাছ ছোট ছেলেটাই যা দুএকটা ধরেটরে বেড়ায়। তবে শুনেছি পূবের মাঠটা মাছের দাপটে নাকি ঘোলা হয়ে গিয়েছে।"

ঢেউগুলো দিনের সোনালি ছায়াকে যেদিক থেকে ঠেলে ঠেলে আন্‌ছে, সেই দিকে নৌকোর গলুই ঘুরিয়ে দিয়ে নাজিম-দা গলা ছেড়ে গেয়ে উঠ্‌ল—

"এমন পয়লা পহরে
পাল নড়ে না নায়ের বহরে…"

দুপুরের রোদ তেতে উঠ্‌বার আগেই খুব বড় বড় তিনটে আড়মাছ নৌকোর বাতায় বেঁধে আমরা বাড়ী ফির্‌লুম। খাওয়া দাওয়া সেরে নাজিম-দা যখন পাড়ায় বেরুল, তখন তার সঙ্গে কথা রইল বিকেলে বঁড়শীর অভিযান আবার চল্‌বে, কিছু বেলা হাতে রেখেই সে যেন ফেরে।

ছেলেবেলায় নাজিম-দার কোলেপিঠে আমি মানুষ। লোকে বল্‌ত তার এত টাকা-কড়ি, মরে' সে খেয়ে না হয়ে যায় না। তবু চাক্‌রীর ছুতো করে সারাটা জীবন সে আমাদেরই দরজার গোড়ায় পড়ে রইল, আমার ওপর এম্‌নি তার টান! পাছে আমরা কিছু মনে করি, এই

য়ে মাইনের টাকাটা কড়াক্রান্তি হিসাব করে সে চুকিয়ে াত; তারপর তাই দিয়ে ময়রার দোকান থেকে লাড়ু ার বাতাসা কিনে, পাড়ার ছেলেদের চুপিচুপি ডেকে ড়ো করে, তাদেরও বিলোত, নিজেও খেত। শিশুর মতো র মনটা—শিশুদের জন্যেই বেশী কাঁদে দেখ্‌তুম। মাঝে ঝে সে আফ্‌শোষ করে বল্‌ত, আমি কেন বড় হয়ে লুম, আগেকার মতো ছোট্টটি কেন থাক্‌লুম না।

বিকেলে নাজিম-দার পথ চেয়ে বইগুলোকে খামকা ঘাঁটে ঘেঁটে শ্রান্ত হয়ে গেলুম, সে আর আসেই না। কটা চুরুট ধরিয়ে আস্তে আস্তে ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালুম। খন পূজো, গাঁয়ের লোকেরা সারাটা বছরের পুঁজিতে ামোদের নেশা জমিয়ে তুল্‌বার আয়োজন করুচে। অনেক-ণ উন্মনা হয়ে এসব দেখ্‌লুম। সন্ধ্যার স্তিমিত আলো ২লা কুয়াসার মিশলে যখন ঘোলাটে হয়ে উঠ্‌ল, ভস্মাবশেষ রুটটিকে আস্তে জলে ছুড়ে দিয়ে আবার অন্ধকার রটিতে এসে টেবিলে মাথা গুঁজে বস্‌লুম।

সহসা চাকরবাকররা চেঁচামেচি করুতে করুতে এসে বর দিলে একটা নাচুনে ছোক্‌রার ওপর দখল নিয়ে পাড়ায় দুটো দলে ভয়ানক মারপিট হচ্চে; কেউ বল্‌লে াঁচজন খুন হয়েছে, কেউ বল্‌লে পঁচিশ জন; একটা ক্তারক্তি ব্যাপার যে হচ্চে তাতে আর ভুল থাক্‌ল না। কটুখানি তত্ত্ব নেব মনে করে চশ্‌মাটাকে পরে নিয়ে কবল বেরুব মনে কর্‌চি, এমন সময় সেই ছেলেটাকে াড়কোলা করে নিয়ে নাজিম-দা আমাকে প্রায় ঠেলে ারিয়ে ঘরে এসে ঢুক্‌ল।

শুন্‌লুম দুচার জন সামান্য জখম হয়েছে, তাও আমার ষ্টিছাড়া দাদাটিরই বীরপনায়। দু দলের হেঁচ্‌কা টানাটানির ধ্যে থেকে অম্‌নি করে বিপন্ন ছেলেটাকে সে বাঁচিয়েছে।

পুরো দুটি দিন ছেলেটা বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল। রাষে ক্ষোভে নাজিম-দার মুখে কথা নেই, তবু ক্ষিপ্র াগ্রহে এই স্বজনহারা কাঙাল ছেলেটিকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে সে লড়ছে।

ছেলেটার মুখে এমন একটা কিছু আছে যাতে করে প্রথম দেখাতেই তাকে কতকালের চেনা বলে মনে হয়। কালো হাওড়েরই মতো একটা দিশেহারা অশ্রুর অতলতা যেন তার চোখে। আর-যাকিছু যার তারই, কেবল অশ্রুই সব-মানুষের; তাই অশ্রুর ভেতর দিয়ে মানুষে মানুষে পরিচয় এত সহজ হয়। তার বাপমা বুঝি এ কথাটা বুঝেছিল, তাই টাকা ধরার টোপ করে তুফান-ভরা হাওড়ের জলে তাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে।

কদিন ধরে নাজিম-দাকে দেখে আমার ভয় হচ্চে; ও যেন কেমনধারা হয়ে পড়েছে, থ হয়ে বসে থাকে, থেকে থেকে চম্‌কায়। একদিন সে বল্‌লে ওর বাপমাকে পেলে ছিঁড়ে সে টুক্‌রো টুক্‌রো করুবে; দেবতার দানকে অমন করে যারা পায় ঠেলেছে, তারা দুনিয়ার কলঙ্ক, তারা কি মানুষ?

এর পর থেকে তাকে চোখে চোখে রাখি। মানুষ হোক না-হোক তারা বাপমা ত; যাকে তারা পায় ঠেলেছে, তাদের বলেই। কৃপণ টাকার কদর জানে না বলেই তাকে এড়িয়ে আর কেউ যদি সে টাকার হিতার্থী হয়ে ওঠে, তবে সেটা তার বা কৃপণের কারো পক্ষেই সুবিধের কথা হয় না।

ছেলেটি যেদিন বিছানায় উঠে বস্‌ল সেদিন কেউ তার আছে কি না একথা তাকে জিজ্ঞেস কর্‌লুম। শুন্‌লুম তারা বামুন, পূবের হাওড় পাড়ি দিয়ে তাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। তার বাপ গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে গুরুগিরি করে বেড়ায়, বছরের এ সময়টাতে বাড়ীতেই থাকে।

নাজিম-দা জিদ করে বল্‌লে "এমন বাপমার কাছে ওকে না পাঠানোই ভালো।"

শুনে ছেলেটার দুচোখ থেকে দর্‌দর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল। নাজিম-দাকে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লুম "দেখ্‌, দেখ্‌, তুই চোখ পাকিয়ে করুবি কি? এ চোখের জল ত শুকোতে পার্‌বিনি?" যুক্তিতে যা না হবার, অশ্রুতে তা হলো দেখ্‌লুম। তার মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো আমার এই ক্ষ্যাপা দুরন্ত দাদাটি এক মুহূর্ত্তেই দাদা-মশায়দের মতো ভারিক্কি হয়ে পড়েছে। ছেলেটার বাপমার খোঁজ নিয়ে তাদের কাছে লোক পাঠালুম।

এর পর থেকে নাজিম-দা একটু একটু করে তফাৎ হয়ে পড়্‌ছে, বাড়ীতে বড় একটা থাকে না, দুবেলা খাওয়ার সময় তাকে কেবল দেখি, তখনো চুপিচুপি আসে, আবার

চোরের মতো পালায়। বাইরে আল্‌সের গায়ে বঁড়্‌শী-গুলোতে মাকড়্‌সা বাসা করেছে, ছেলেটাকে নিয়েই সে ব্যস্ত।

সেদিন সকাল থেকেই দিনটা কেমন ঘোর ঘোর। কালো মেঘের ছায়া পড়েছে, কিন্তু গাছের পাতাটি অবধি কাঁপ্‌ছে না। এক একবার পশ্চিমের পাহাড়গুলো থেকে গুড়্‌গুড়্ করে প্রলয়ের সাড়া ক্ষীণ হয়ে কানে আস্‌চে। সেই দুপুরের পর থেকেই ছেলেটা বিছানার ওপর উঠে বসেছে, অনেক করেও তাকে শোয়াতে পারিনি। তার বাপ আজ এসে তাকে নিয়ে যাবে। ঐ পূবের হাওড়, তার ওপারে ছোট্ট তাদের গাঁ-খানি। ঐ যে একটু একটু করে জল দুলে উঠ্‌চে, এ দোলানি সে-গাঁয়ের নিভৃত ঘাটটিতে গিয়েও ত লাগ্‌ছে। সেইদিকে অপলক চোখে চেয়ে সে বসে ছিল, তার চোখেমুখে আকাশের আর জলের কালোর ছায়া পড়েছিল।

বিকেলের দিকে গাছে গাছে পাখীদের কলরব ধরিয়ে বাতাসটা হঠাৎ জোরালো হয়ে উঠ্‌ল, খসা পাতায় উঠোনটা ছেয়ে গেল। একবার বাইরেটাকে ভালো করে দেখে নিতে বেরিয়ে এসে দেখি, ঘরের দাওয়ায় গুড়িমেরে নাজিম-দা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বাইরের কোলাহলে নিজেকে হারাতে সে গিয়েছিল, তাড়া খেয়ে ফিরে এসে তার আসন্ন দুঃখকেই প্রতীক্ষা করে বসে আছে! হায়রে! সেদিন চকিতের মতো মনে হলো রক্তের সম্পর্কের চাইতে অশ্রুর সম্পর্ক বুঝি ছোট নয়। তাকে ডেকে ঘরে নিয়ে গেলুম।

তারপর সে কি বৃষ্টি! অত অশ্রুও কি আকাশের চোখে ছিল! জলের ঝাপ্‌টা জানালার সার্শিগুলোর গায়ে ব্যর্থ অনুনয়ে মাথা কুটে মরছে। আমরা তিনটি প্রাণী, তিনের দুর্ভাগ্য নিয়ে অত্যন্ত কাছাকাছি জড়সড় হয়ে বসেছি।

বৃষ্টিটা যখন কিছু ধরে এল, তখন দূরে এবং কাছে কড়্-কড়্ করে বাজ পড়্‌তে সুরু হয়েছে। ছেলেটা ভয়ানক ভীতু; যতবার বিদ্যুৎ চম্‌কায়, আচম্‌কা সে আমায় জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে। মনে করেছিলুম এই ফাঁকে উঠে গিয়ে কিছু খেয়ে নেব, কিন্তু সে আমায় নড়্‌তেও দেবে না। বসে থেকে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লুম। নাজিম-দা মিনতি করে বল্‌লে সে একটু বস্‌বে, আমি ততক্ষণ দুটি মুখে গুঁজে আস্‌ব; তাকে সেখানে বসিয়ে ছেলেটাকে রাজি করে চলে গেলুম।

খেতে বস্‌তে না বস্‌তে ঝড় এল। হাওড়ের জল গর্জ্জে উঠে তীরে এসে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, ছোট্ট গাঁ-খানিকে ধুয়ে মুছে না দিয়ে যেন ফির্‌বে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ঝড়বৃষ্টিকে মাথায় করে নিয়েই উঠোনটা পার হয়ে এলুম, শোবার ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে দেখি আলো নেই, দরজা খোলা পড়ে আছে। অন্ধকারে হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে চেঁচিয়ে ডাক্‌লুম "নাজিমদা!" সাড়া পাওয়া গেল না। ছেলেটাকে ডাক্‌লুম, সেও সাড়া দিলে না। আবার ঝড়বৃষ্টি মাথায় কোরে বেরোলুম, বারকয় চেঁচিয়ে তাদের ডাক্‌লুম, হাওড়ের জল উচ্ছল ফেনার হাসিতে সাদা হয়ে উঠ্‌ল—কোথায় তারা?

(২)

ল রিপোর্ট আর আইনের বইয়ে বিছানা টেবিল আল্‌মারি ভারাক্রান্ত করে সহরে এসে বসেছি। অনেক করেও মক্কেল বাগাতে পারিনি। নাজিম-দা বঁড়্‌শীতে খুব ওস্তাদ ছিল, কোন্ মাছ কোন্ টোপ বেশী খায় তার কাছ থেকে ঢের শিখেছিলুম; আজ যদি তাকে পাওয়া যেত!—

আমি মাছ বাধাতেই জান্‌তুম, ছিপ বাঁচাতে জান্‌তুম না। কাজেই নাজিমদাকে সঙ্গে নিতে হতো, মুস্কিল বাধ্‌লেই তার হাতে ছিপখানিকে ছেড়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতুম। আজ যদি তার সঙ্গে দেখা হতো, আমার এই বে-সিজিল জীবনটাকে তার হাতে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচ্‌তুম। আর যে পারিনে। সেই তার সঙ্গে বিল থেকে বিলে ছুটোছুটি, সেই তার দূর জলে নৌকো দুলিয়ে কপট ভয় দেখানো, এ সমস্তের জন্যে প্রাণটা তৃষিত হয়ে আছে যে!

নথি নজিরের ফ্যাসাদ বেশী নেই, কাজেই যখন খুসী পথে বেরিয়ে পড়ি। একদিন সকাল নটা-দশটায় ওয়েলেস্‌লির দিকে বেড়িয়ে ফির্‌বার পথে ট্রামে চাপ্‌তে যাব হঠাৎ আমার জামার হাতা মুঠো করে ধরে পনেরো ষোল বছরের ফুট্‌ফুটে একটি ছোক্‌রা পেছন থেকে আমায় টান্‌লে।

কিছুক্ষণ দুজনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম; গোছা-গোছা চুল গড়িয়ে পড়ে তার বড় বড় চোখদুটিকে প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, তন্দ্রার মতো অস্ফুট গোঁপের আভাসের নীচে ছোট ঠোঁট দুখানি কী একটা গভীর যাতনাকে চাপা দিয়ে রাখ্তে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্ছে। সহসা ছিন্ন কোঁচার প্রান্তে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্ল। অশ্রুর মধ্যে দিয়েই নূতন করে তাকে আবার চিন্লুম, এ সেই ছেলে যাকে বুকে করে তুমুল ঝড়ের রাত্রে নাজিম-দা ক্ষ্যাপা হাওড় পাড়ি দিয়ে পালিয়েছিল।

তাকে সঙ্গে করে পার্কে গিয়ে বস্লুম। সে যা বল্লে তা এই :—

সে রাতটার কথা আমার কিছু মনে নেই। যখন ভালো করে চোখ চাইলুম, দিনের আলো সহস্র ধারায় পৃথিবীর ওপর এসে পড়েছে, কালো হাওড়ের পাশ ঘেঁষে ক্ষীণ নদীটির লাল্‌চে জলের রেখাটুকু, তার ওপারে জাহাজ-ঘাটার কাৎ-হয়ে-পড়া বহু পুরোনো ফ্ল্যাটখানি আবছায়ার মতো চোখে পড়ছে।

একটুখানি বাদলভেজা হাওয়া জলের ওপর দিয়ে তর্‌তর করে ছুটে এসে আমাদের গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে গেল, মনে পড়্ল আমরা ভিজে কাপড়ে আছি, মনে পড়্ল রোদজল থেকে মাথা বাঁচাবার ঠাঁই আমাদের নেই। একটি কাণাকড়িকেও সম্বল না করে সে পথে বেরিয়েছে, যে পথে মানুষ কেবল চলেই যায়, ভিড়ে পড়ে কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পায় না।

সারাটা দিন জাহাজঘাটার ময়লা একটা কোণে কিছু না খেয়ে পড়ে রইলুম। পহরেক রাত পরে বিজলীর আলোয় চোখ ঝল্‌সে দিয়ে একটা জাহাজ ঘাটে এসে নোঙর করলে। আমার একটু ঘুমের মতো এসেছিল, সে এসে আমায় ডেকে জাগালে, খবর দিলে এই জাহাজে আমরা যাব, কোথায় যাব তা সে নিজেও জানে না। আমি সেই প্রথম ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্লুম, বল্লুম "তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও, আমি যাব না।"

সে চকিত চোখে একবার চারিদিক চেয়ে দেখ্লে, তারপর মুখটিকে কালো করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল। বাতির আলোয় দূরের অন্ধকার আরো বেশী কালো হয়ে উঠেছে, এর পর ত সমস্ত আলো নিব্‌বে, আশে-পাশে কেউ নেই, কেমন ভয়-ভয় করতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ করে মাথা গুঁজে পড়ে রইলুম, তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলে উৎকর্ণ হয়ে রইলুম, সে যদি আসে। শেষটা ভয়ে ভয়ে তাকে ডাক্‌লুম—আমার পাশটিতেই অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল, ছুটে এসে আমায় বুকে চেপে ধর্‌লে।

জাহাজে করে অনেক পথ আমরা পার হয়ে এলুম, দুদিনে দুমাসের পথ,—আমার মনে হলো একটা জন্ম-জন্মান্তরের পথ; আমি যেন আর আগের মানুষ নেই, পুরোণো যা কিছু সেদিনকার ঝড়জল সব ধুয়েমুছে রেখে গেছে, জন্ম হয়ে অবধি জাহাজখানাতেই যেন আছি—আমরণ থাক্‌ব।

আগুনঘরে সে কাজ কর্‌ত, দিনেরেতে দুটিবার ছুটি পেয়ে গায়ের ঘাম মুছে আমাকে এসে বুকে নিত। এক-দিন সময় উৎরে গেলেও আমাকে বুক থেকে সে নামালে না। সারেং খোঁজ নিতে এসে শুনে গেল, আমার বসন্ত।

জাহাজে এসে তার কাছে শুনেছিলুম—আমরা কল্‌-কাতা গিয়ে নাম্‌ব, সেটা ধনরত্নের জায়গা, কুড়িয়ে নিতে জান্‌লেই হলো। কিন্তু যখন মোটে দুটি দিন আর বাকী, পাড়াগাঁয়ের মতো একটা জায়গায় মাঠের মধ্যখানে তারা জোর করে আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল, কোনো কথা শুন্‌লে না।

নদীর পাড় ধরে গিয়ে গাঁ থেকে অনেকখানি দূরে একটা খালি পাঠশালা-ঘরে আমরা আশ্রয় নিলুম। পূজোর ছুটি, ছেলেরা কেউ নেই। ভাঙা দুটো বেঞ্চি জড়ো করে সে আমার শোবার জায়গা করে দিলে।—চলার শক্তি ত ফুরিয়েছে; দেবতা যদি জুটিয়ে দিলেন, এইখানেই কষ্টেস্‌ষ্টে কটা দিন কাটিয়ে দিয়ে যাব।

একটা কঞ্চিকে চোখা ধারালো করে নিয়ে সারাদিন জলের ধারে ধারে সে ঘুরে বেড়াত, দুটো-একটা মাছ না জুটত এমন দিন প্রায় যেত না। সেগুলোকে হাটে বেচে চালডাল কিনে আনা হতো, আমি খেয়ে কিছু বাকী থাক্‌লে, সে খেত—নয়ত খেত না।

সারাটা গা গুটিতে ছেয়ে গিয়েছিল, কী সে যন্ত্রণা! যে শত্রু তার জন্যেও এ রোগের কামনা করিনে।

তবু ত সেরে উঠ্‌লুম! মলে যে কপালের ভোগ ফুরোয়। গুটিগুলো শুকোবার মুখে গাঁয়ে ছেলেদের কাছে খবর পৌঁছল। ভাগ্যিস তখন রাত্তির! তবু সারারাত ঘরের চালে, ঝাঁপে, উঠোনে ঢিলের পর ঢিল পড়ার জ্বালায় আমাদের সোয়াস্তি থাক্‌ল না। ভোর না হতেই লুকিয়ে সেখান থেকে চলে এলুম।

এর পর রেল। আমরা বিনাটিকিটের যাত্রী, কল্‌কাতা চলেছি। মাছ বেচে যা পাওয়া যেত, তার থেকে পুঁজি ত কিছু হয়নি, দুটি দিন কিছু মুখে পর্য্যন্ত দিইনি। একটি চশ্‌মা-পরা ছোক্‌রা-মতন বাবু আমাকে দুটো লেবু খেতে দিলেন, তাই খেয়ে কতক জুড়োলুম। উনি বিশেষ করে আমাকেই খুঁটে খুঁটে অনেক কথা জিজ্ঞেস কর্‌লেন। সে তন্ময় হয়ে বসে ছিল, আমাদের কথায় কান দিলে না। তাঁকে বল্‌লুম, আমরা গরীব, ঘরে খেতে নেই, সহরে চলেছি। এ সমস্ত সেই আমায় আগে থেকে শিখিয়ে রেখেছিল।

বাবুটির চোখদুটিতে কেমন একটা করুণার ভাব। ওতে করে মানুষের ব্যথাটুকুই যেন কেবল তাঁর চোখে পড়ে।

কল্‌কাতায় গাড়ী পৌঁছতেই কাপড় এঁটে প'রে আমাকে বুকে নিয়ে সব পাহারাকে অগ্রাহ্য করে সে ছুটে বেরিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু যাদের কাছে অপরাধ তারা আমাদের ধর্‌লে না; ধর্‌লে অন্য লোকে, যাদের পথ আমরা কোনোদিন মাড়াইনি, হয়ত মাড়াবও না।

তারা ষ্টেশনে আমাদের ধরে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি সেই বাবুটি একটা রসিদ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দয়াতে আমরা ছাড়া পেলুম। বাইরে বেরিয়ে তিনি বল্‌লেন "তোমরা নতুন এখানে এসেছ, কোথায় আর যাবে? আজকে আপাতত আমার সঙ্গে এস, কাজটাজের সুবিধে হলে পরে যা হয় কোরো।" কিন্তু তখন দেখ্‌লুম, এর পরও দেখেছি, কৃপা জিনিসটাকে তার বড় ভয়। আর সব সে সইতে পারে, এইটুকুকে পারে না। সে কিছুতেই রাজি হলো না।

দুএকটা দিন পথে পথে ঘুরে শেষটা আমরা দুজনেই এক জায়গাতে কাজ নিলুম। হায়রে কাজ! দয়া নেই, ক্ষমা নেই, ছুটি নেই, একটু নিরিবিলি বসে চোখের জল ফেল্‌বার অবকাশ তাও সে দেবে না! সেই কুল ভালো করে না থাক্‌তেই বাগানে বাগানে ছুটোছুটি, বধূরা নিয়ে কাড়াকাড়ি মনে পড়্‌ত। থেকে থেকে বাপমাকেও মনে পড়্‌ত। যত দিন যায় বর্ত্তমানের মোহ একটু একটু করে ছোটে; যে ঝড়জল জীবনের পাতাটাকে ঝাপ্‌সা করে রেখেছে, পুরোনো সব কথা তার নীচে থেকে ফুটে বেরোয়।—কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌তে লাগ্‌ল।

মাসের শেষে মুনিবের কাছে মাইনে নিতে গিয়ে দেখি মুনিব সেই চশমাপরা বাবুটি!—তাঁকে সেদিন যা খুসী দেখ্‌লুম; তিনি দেড়গুণ মাইনে দিতে চাইলেন, একটিও কথা না বলে মাথা নেড়ে সে তা প্রত্যাখ্যান কর্‌লে। পরদিন তিনি তাঁর ঘরে আমায় ডাকালেন, তার পরদিনও......তারও পরের দিন......

দেখ্‌তুম তার মুখ দিনের পর দিন আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো হয়ে উঠ্‌চে। কিন্তু একদিনও মুখ ফুটে সে আমায় কিছু বল্‌লে না।

বাবুটি আমায় দেশের কথা, কেউ আমার আছে কি না এ সব কথা জিজ্ঞেস কর্‌তেন। সব তাঁর কাছে লুকোতুম। একদিন তাঁর কাছ থেকে ফিরে আস্‌চি, দেখি নীচে সিঁড়ির গোড়ায় স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। আমি নাম্‌তেই আমার হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে হিড়্ হিড়্ করে রাস্তা থেকে রাস্তা, গলি থেকে গলি সারাটা বেলা খামকা আমায় টেনে নিয়ে বেড়ালে, তারপর একটা ছোট গলির মোড়ে শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে আমায় বুকে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

আগেকার সে কাজটাতে আমরা আর ফিরে গেলুম না। তার স্নেহসোহাগ সেদিন থেকেই দ্বিগুণিত করে সে ঢেলে দিচ্ছিল; কিন্তু ঐ দুটি কড়া চোখের পাহারায়! তার বুকের কাছে শুতে এর পর আমার কেমন ভয় ভয় লাগ্‌ত, মনে হতো তার চোখদুটি অন্ধকারের ভেতর দিয়েও অনিমেষ হয়ে যেন আমাকে দেখ্‌চে। মাঝে মাঝে মনে হতো তার বুকটিতে করে সেদিনকার ঝড়কে, সেদিনকার নিবিড় কালো অন্ধকারকে সে যেন বয়ে নিয়ে এসেছে; যত পালাই যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে,—আমার আকাশ সেদিনকার বর্ষার আকাশের স্মৃতিতে তেমনিতর কালো হয়েই থাক্‌বে।

কটা দিন ছটফট করে কাটল। তারপর থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে সেই বাবুটির খোঁজে উঠে পড়ে লাগলুম। পথঘাট মোটেই চিনতুম না, তবু দিশা রেখে রেখে খুঁজে বেড়াতে আরম্ভ করলুম। মাসের পর মাস কাটে, খানিকটা করে খোঁজা হয়; ভাবতুম না এ খোঁজা কতদিন চলবে, ভরসা ছিল চিরদিন চলবে না, একদিন না একদিন তাঁকে পাবই।

একদিন তাঁকে পেলুমও। পথেই তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি সমাদর করে আমায় তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেইখানে সেদিন সব কথা তাঁকে বললুম। তিনি চুপ করে বসে সব শুনলেন, তারপর বললেন "এমনি ধারা একটা কথা যে তুমি লুকোচ্চ, তোমার সঙ্গে প্রথম কথা হতেই আমি তা টের পেয়েছিলুম।"

তাঁর পা দুটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমি বললুম "এ ভয় থেকে—তার এই জোরের দখল থেকে আমায় বাঁচান। আমি আপনার বাড়ীর ছায়াটুকুতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকব, তবু তার কাছে আর ফিরে যাব না।"

তিনি হাতদুটি ধরে আমায় উঠিয়ে বললেন "তুমি এখন থেকে কিছুদিন আমার এখানেই থাকবে, তোমার বাপকে আমি চিঠি লিখচি......এখানে যতদিন আছ তোমার কিছু ভয় নেই।"

কী আরামেই সে ক'টা দিন কেটেছিল! বাপমার স্নেহযত্ন কোনো দিন পাইনি, যার পেয়েছিলুম কেমন একটা অতিশয়তা সে স্নেহযত্নকে উগ্র করে রেখেছিল, কিন্তু এখানে যা পেলুম তার আর তুলনা নেই।—তাকে যে ফেলে এসেছি, আমায় হারিয়ে দুহাতে সে যে মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়ছে—এসব কথা মনেও হলো না।

একদিন সন্ধ্যার পর ছাতে উঠে দেখি নীচে আধ-অন্ধকারে সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, খাঁচায় পড়ে বাঘ যেমন পায়চারি করে বেড়ায়। সেদিন রাত্তিরে পথে গাড়ী-বারান্দার নীচে সে শুল। সারারাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে ভোরে উঠে আবার ছাতে গেলুম, দেখলুম পথের ওপারে একটা বাতির থামে ভর রেখে নিষ্কর্ম্মা হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। রাত্তিরে সেদিনও গাড়ীবারান্দার নীচে সে শুল। বাড়ীর একটা চাকরকে অনেক খোসামোদ করে কিছু খাবার তাকে পাঠালুম, একটুখানি হেসে খাবারের থালাটাকে সে সরিয়ে দিলে; চাকরটা তাকে গাল দিতে দিতে ফিরে এল।

পরদিনও দেখলুম তেমনি ভাবে থামের গা-ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে আছে; তার পরদিনও ঐরকম গেল। বিকেলে দেখলুম একটা পুলিসের সঙ্গে তার বচসা হচ্চে, ভয়ে জানালার কাছ থেকে পালিয়ে এলুম। সেদিনকার সেই চাকরটা হঠাৎ এসে বললে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্চে। আমার কি হলো, পথে ছুটে বেরোলুম, একেবারে তার বুকের ওপর গিয়ে ছুটে পড়লুম।

তার হাতে হাতকড়ি ছিল না, দুটি হাত আমার দুটি কাঁধে রেখে বার-দু-তিন সে আমায় ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখলে, তারপর নিমেষ না ফেলতেই আমার গলাটাকে মুঠো করে চেপে ধরল। সে কী মুঠো! ..প্রথমতঃ সব রক্তের মতো লাল...তারপর সব আগুন...তারপর সব অন্ধকার···

পাঁচদিন হাঁসপাতালে বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিলুম, হুঁস হতেই শুনলুম আমায় হত্যা করতে চেষ্টা করার অপরাধে সে জেলে গেছে; যতদিন বেঁচে আছে সেইখানে তাকে পচে মরতে হবে, তার হয়ে দুটো কথা বলে এমনও কেউ তার জোটেনি।

কতকটা সেরে উঠতেই হাঁসপাতাল থেকে চলে এলুম। সে বাবুটির খোঁজ আর করিনি। কি জন্যে করব? বাপ-মা? বাপমাকে সে ভোলাতে চেয়েছিল, বাপমাকে আমি ভুলব। আমার জন্যে সে অত করলে, আমি এইটুকু পারব না?

সে আমার গলা টিপে ধরেছিল কেন আজও তা বুঝিনি, আরো বয়স হলে বোধ হয় বুঝব। তবে এইটুকু আমি জেনেছি—ভালোবাসার সবই ভালো,—তার সেই কঠোরতাকেও তাই আমি চেখে চেখে আজ উপভোগ করচি। এ যে কী জিনিস, মুঠোর মুখে গলা পেতে যারা দেয়নি, তারা তা বুঝবে না। আমি হারিয়ে তাকে আজ বুঝেছি গো, তাকে জন্মের মতো হারিয়ে!

(৩)

সেদিন বিকেলেই ছোকরাটিকে সঙ্গে করে আলিপুর

জেলে গিয়ে হাজির হলুম। এই নাজিমদা! তার মাথার প্রায় সবগুলো চুলে পাক ধরেছে, যেখানে একদিন অশ্রু আর আগুন লুকোচুরি খেলত সেই তার ভাসা ভাসা চোখছুটি কোটরের গভীরতায় আসন বিছিয়ে স্তিমিত হয়ে মৃত্যুর ধ্যান করচে। তাকে চিন্‌তে আমার কষ্ট হতো, কিন্তু চম্‌কে উঠে ছেলেটির দিকে সে যখন চাইল, তার সেই দৃষ্টির আলোতে আমার সেই বহু আগেকার হারিয়ে-যাওয়া নাজিম-দাকে আমি আবার দেখ্‌লুম, আমার সেই স্নেহে দুরন্তকে, প্রতিশোধে ভয়ঙ্করকে।

কিন্তু অত করে তাকে ভরসা দিয়ে এসেও কিছু হয়ে উঠ্‌ল না। যখন প্রায় সব গুছিয়ে এনেছি, একদিন অকস্মাৎ খবর পেলুম দুদিনের জ্বরে সে মারা গিয়েছে।

দেশে সে অনেক টাকাকড়ি রেখে গিয়েছে, তার সেই যখের সঞ্চয়। নিজের জীবনে এগুলোকে তো সে ছুঁল না। কথা উঠেছে এখন সেগুলো কার? ছেলেটা দুমুঠো চালের জন্যে পথে দাঁড়াবে? যে স্নেহের অধিকারে মা-বাপের কোল থেকে নাজিম-দা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তিল তিল করে বুকের রক্ত জল করলে, শেষটা জেলে পচে মর্‌ল, সে অধিকারের দাবী দেবতার দরজায় টেঁকে কি না জানিনে, আইনের দরজায় ত টেঁকে না! এততেও সে তার কেউ নয়। মানুষের তৈরি বিধিবিধান—মানুষকেই নিয়ে তার কত বিচিত্র পরিহাস!

তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌লি, নাজিম্‌-দার বুকে যার অতখানি অধিকার ছিল, তার টাকাগুলোর অন্ততঃ কিছু অংশেও তার অধিকারকে যদি সাব্যস্ত করে দিতে পারি।

কেমন করে খবর পেয়ে একদিন তার বাপ মা এসে উপস্থিত। সে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে খুব সতর্ক হয়ে এড়িয়ে তারা আমার ঘরে এসে উঠ্‌ল; ও যে মুসলমানের ছোঁয়া খেয়েছে,—যে-মুসলমান যমের মুখ থেকে বুক দিয়ে পড়ে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল, যে-মুসলমান তাকে বুকে করে ঝড়ের রাত্রে পাগলপারা হাওড়ের জলে ভেসেছিল, আর সেই মুসলমান যে জেলে পচে মর্‌ল সেও ত—থাক, অতসব কথা আর বলে কাজ কি?

বাইরে থেকে তৃষিত উৎসুক চোখে এই দুটি জীবকে অনেকক্ষণ ধরে সে দেখ্‌লে। বিধাতা কত আপন করে তাদের কাছে এক দিন তাকে পাঠিয়েছিলেন। আর আজ? শাস্তি...শাস্তি! অপরাধের ত শাস্তি? অপরাধ কিছু যদি থাকে তবে তা কার?

রাত্রিতে এতদিন আমার পাশের ঘরে সে শুত। আমার ত কেউ নেই, দুটি মোটে ঘর; এইবার এঁরা এসে সে ঘরটিকে দখল কর্‌লেন। ছেলেটিকে আমার সঙ্গে নিতে গেলুম, সে কিছুতেই রাজি হলো না। কত করে বোঝালুম, ভয়কে ত আমি মানিনে, জাত খোআ যাওয়ার ভয়কেও না; ভয়ই যে আমাদের পাপ, যে ভয়ে মায়ের স্নেহ অবধি জড়সড় হয়ে পড়ে। জোর করে বারান্দায় মাদুর পেতে সে শুল।

ভোরে উঠে শুন্‌লাম তার মা গলাটিকে যতদূর পারা যায় মোলায়েম করে তাকে বল্‌ছেন "আমাদের বাড়ীতে তোমায় কিছু আর দাওয়ায় পড়ে হিম লাগাতে হবে না—আলাদা ঘর তোমায় আমরা দেব······সে অবিশ্যি একটু দূরে। তুমি আমাদের ছুঁতেটুতে কিন্তু পার্‌বে না...... ভোরে উঠে প্রণাম কর্‌তে চাও দূর থেকে গড় করে চলে যেও, সে জন্যে আমরা কিছু মনে কর্‌ব না...... আমরা তোমার বাপ মা কিনা!"

এ সব কথার জবাবে তার মুখে হাঁ বা না কিছু শোনা গেল না। বেশী কৃতজ্ঞতা মানুষকে এমনি বোবা করেই দেয়।

কোর্টে আমার দুনম্বর কেস্‌টার সেদিন নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আইন তার মুঠো একটুখানি শিথিল করেছে, ছেলেটা একেবারে পথে দাঁড়াবে না, এই সুবিচারের জন্য সকলে বিধানদাতাকে ধন্য ধন্য করচে—এমন অযাচিত অনুগ্রহ! কিন্তু সে যা পাচ্চে স্নেহের দাবীতে পাচ্চে না, পাচ্চে প্রতিশোধের দাবীতে—নাজিম-দা তাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল সে অন্যায়ের প্রতিশোধ, তার জাত মেরেছিল সে অন্যায়ের প্রতিশোধ! বাড়ী ফিরেই খবরটা তাকে দেব মনে করে এসেছি, কিন্তু এসে তাকে দেখ্‌লুম না। রাত্রিতেও তার দেখা পাওয়া গেল না......পরদিনও না......তার পরদিনও না......

যে-কৃপাটুকু দেখাতে আইনের চোখ ঠিক্‌রে পড়্‌বার

জোগাড় হয়েছিল, সে কৃপাকে সে তুচ্ছ করে গেছে; তবু এই বিধি-বিধানই চিরকাল থাক্‌বে, তার কথা দুটিদিনও কেউ মনে করবে না!

......তার বাপমা আজ দেশে ফিরে গেল। তারা এই বলে আপশোষ করে গেল যে ছেলেটা থাকলে অতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়ে যেত না।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু

পাণিনি কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিন্দুধর্ম্ম সাহিত্য প্রচারক রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর ধর্ম্মজগতের একজন নিভৃত সাধক, কর্ম্মজগতের অনাড়ম্বর কর্ম্মী, সমাজের প্রচ্ছন্ন সংস্কারক এবং বীণাপাণির নীরব সেবক ছিলেন। তিনি যদি সভা-সমিতির পীঠস্থানে বক্তৃতার ঝঙ্কারে সহস্র চক্ষুর লক্ষ্য হইতেন, অথবা সাহিত্যসেবাব্রতে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেন, তাহা হইলে আজ গুণিগণের অগ্রণীদিগের চরিতাভিধানের প্রকৃষ্ট স্থান তাঁহার প্রাপ্য হইত। বঙ্গের সাহিত্যরসগ্রাহিবর্গ তাঁহার প্রতিভার কতদূর আদর করিয়াছেন তাহার নিদর্শন পাই নাই, কিন্তু তিনি যে য়ুরোপীয় সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

শ্রীশবাবু ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২১শে মার্চ্চ, পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি ৬ বৎসরের শিশু, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জননীই তাঁহার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। বাল্যে ফরীদকোটের সুপ্রসিদ্ধ রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। ১৮৭৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়, তাহাতে শ্রীশবাবু পঞ্জাবপ্রদেশের মধ্যে প্রথম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক পুরস্কার পান। আরবী ভাষা তাঁহার শিক্ষণীয় দ্বিতীয় ভাষা (Second language) ছিল। ১৮৮১ অব্দের বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহাতে ইংরেজি, জড়বিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব, এবং গণিত তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল। এই সময়ে লাহোরে শিক্ষাদান-কার্য্য শিখাইবার জন্য সেন্‌ট্রাল ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশবাবু প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তথায় অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৮৩ অব্দের মে মাসে শিক্ষকতা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং লাহোর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় ট্রেনিং স্কুলের সংসৃষ্ট "মডেল স্কুল" বা আদর্শ বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু শ্রীশবাবু এমনই লোকপ্রিয় ছিলেন এবং ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণের হৃদয় এতদূর অধিকার করিয়াছিলেন যে যতদিন তিনি গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ছিলেন, ততদিন নবপ্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলটি অচলপ্রায় হইয়া ছিল। কোন ছাত্রই তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য বিদ্যালয়ে গমন করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা অবশেষে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে, শ্রীশবাবুকে যদি ঐ নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের হেডমাষ্টার করা হয়, তবেই তাহারা তথায় যাইবে, অন্যথা নহে। ছাত্রগণের এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইলে বিদ্যালয়টির শ্রী ফিরিয়া যায়। শ্রীশবাবু তথায় সুব্যবস্থা, সংস্কার ও উন্নত-প্রণালীর শিক্ষা-প্রবর্ত্তন দ্বারা স্কুলটিকে প্রকৃতই "আদর্শ-স্কুলে" পরিণত করেন। এই বিদ্যালয়টি এখনও বিদ্যমান।

লাহোরে অবস্থানকালে তিনি ষ্টুডেণ্টস্ ক্লব্ নামে একটি ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং "ষ্টুডেণ্টস্ ফ্রেণ্ড" নামে একখানি সাময়িক পত্রও বাহির করেন। এই সময় তিনি যে উর্দ্দূ ভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন তাহা তথাকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়। পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ রায় সাহেব গোলাপ সিংহ শ্রীশবাবুর উক্ত সাময়িক পত্র এবং গ্রন্থ লইয়া স্বীয় যন্ত্রালয়ের কার্য্যারম্ভ করেন। শ্রীশবাবু পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার সম্বন্ধে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বহুলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে "Lahore Bengali School" নামে একটি বিদ্যালয় ছিল, তিনি ঐ স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। স্কুলটি এখন নাই।

শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশবাবু আইন অধ্যয়নও করিতেছিলেন। তিনি ১৮৮৬ অব্দে এলাহাবাদে আসিয়া

আইন পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরের শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়া মীরাট আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি বেরেলীর অস্থায়ী মুন্‌সেফ মনোনীত হন এবং ছয় মাস মুন্‌সেফী করিয়া ১৮৮৯ অব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন। এখানে রায় লিখিবার জন্য সাঙ্কেতিক-লিখন-কলাভিজ্ঞ জনৈক রিপোর্টারের (Judgment Reporter) প্রয়োজন হইলে সেই পদে শ্রীশবাবুই মনোনীত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রেখাক্ষর বা সাঙ্কেতিক (Shorthand) লেখা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার চর্চ্চাও রাখিয়াছিলেন, সুতরাং হাইকোর্টের রায়লেখক রিপোর্টারের কার্য্য তিনি অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতে থাকেন।

শ্রীশবাবু যখন মীরাটে ওকালতী করিতেছিলেন, তখনই সংস্কৃতভাষানুশীলনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে এবং এলাহাবাদে আসিয়া অধিক উদ্‌যোগ ও আগ্রহের সহিত এই দুরূহ ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভে যত্নপর হন। পরে তিনি বৈদিক সাহিত্যানুশীলন করিতে উদ্যত হন এবং পাণিনি আয়ত্ত না হইলে বেদাধ্যয়ন বৃথা, ইহা বুঝিতে পারিয়া, প্রথমে পাণিনি অধ্যয়নেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই সুবিশাল এবং সুকঠিন শাস্ত্রানুশীলনে যথেষ্ট শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীশবাবু ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুন্সেফী পদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইয়া গাজীপুর গমন করেন। তখন সূর্য্যসিদ্ধান্ত, জল সরবরাহ-কারখানা (Water Works), বৃহৎ জাতকের ইংরেজী অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বামী, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে, গাজীপুরে ইঞ্জিনিয়ারী করিতেছিলেন। এখানে তাঁহার সহিত শ্রীশবাবুর হৃদ্যতা জন্মে এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাবলী ও হিন্দুসাহিত্য প্রচার-কার্য্যে শ্রীশবাবুর সহিত স্বামীজীর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সূত্রপাত হয়।

১৮৯৬ অব্দে তিনি বারাণসী বদ্‌লি হন। তাঁহার পক্ষে ইহা মাহেন্দ্র-যোগ বলা যাইতে পারে। তিনি কাশীর বিখ্যাত তাত্যা শাস্ত্রী প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যাকরণবিদ্ ও বৈদিকভাষাতত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট পাণিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিতে থাকেন তিন বৎসরের অক্লান্তশ্রমে, একাগ্র সাধনায় তিনি বৈদিক ব্যাকরণশাস্ত্র সমাপ্ত করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৮৯৬ অব্দে শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট বারাণসী আগমন করিলে, শ্রীশবাবু ইঁহার সহিত একযোগে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীমতীর বক্তৃতা রেখাক্ষর-লিখনপ্রণালীতে লিখিয়া প্রচার করিতে থাকেন। অল্প-দিনের মধ্যে শ্রীমতী বেসাণ্টের যে দিগন্তব্যাপী যশ ও কৃতকার্য্যতা প্রচার হইয়া পড়িল—শ্রীশবাবুর ক্ষিপ্র লিখনদক্ষতা ও আন্তরিক চেষ্টাই তাহার মূল। শুনা যায় সাঙ্কেতিক লিখনে তৎকালীন ভারতে শ্রীশবাবুর ন্যায় নির্ভুল ক্ষিপ্র লেখক আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার নিকট শ্রীমতী বেসাণ্ট স্বীয় ঋণ স্বীকারচ্ছলে ১৮৯৬ অব্দের অক্টোবর মাসে থিওসফিক্যাল সোসাইটী সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে বারাণসীধামে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছিলেন—

> "I am indebted to Babu Srish Chandra Bose, Munsif of Benares, for the wonderfully accurate report which he most kindly took of the discourses. I have been reported by the best London men, but have never sent a report to the press with less correction than that supplied by my amateur friend."

বারাণসীর সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা ও তাহার উন্নতিকল্পে শ্রীশবাবু গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ন্যাসরক্ষক ছিলেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামক সম্প্রদায়ের তিনি একজন অকপট কর্ম্মী। উহার উন্নতি, বৃদ্ধি এবং সর্ব্ববিধ হিতসাধনে তিনি কখন কুণ্ঠিত ছিলেন না।

শ্রীশবাবু ১৯০১ অব্দে এলাহাবাদে বদ্‌লি হন। এখানে আসিয়া তিনি হিন্দুশাস্ত্র ও বৈদিক ব্যাকরণ সাধারণের সুগম করিবার মানসে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে থাকেন। ইংরেজি ভাষা ভারতের সর্ব্বত্র এবং জগতের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত বলিয়া তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইংরেজিতে প্রণয়ন ও অনুবাদ করিয়া প্রয়াগস্থ স্বীয় ভদ্রাসন "ভুবনেশ্বরী আশ্রমের" একান্তে স্থাপিত "পাণিনি কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। এখানে তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী * সমাপ্ত

* The Astadhyayi of Panini—complete in 1682 pages, Royal Octavo: containing Sanskrit Sutras and Vrittis with Notes and explanations in English.

স্বৰ্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু।

করেন। উহা রয়াল আটপেজী আকারে ১৬৮২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার অপর কীর্ত্তি "সিদ্ধান্তকৌমুদীর" সটীক সানুবাদ সংস্করণ। এই বিরাট গ্রন্থও উক্ত আকারের ২৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী প্রকাশিত হইলে কাশীর মহামহোপাধ্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ, ভারতের নানা প্রদেশের প্রধান প্রধান পত্রসম্পাদকগণ এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার জগদ্‌বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীশবাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার শতমুখে প্রশংসা করেন। আমরা সেই রাশীকৃত প্রশংসাপত্র হইতে বিদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিতের কয়েকখানি পত্রাংশ প্রকাশ করিলাম।

The Right Hon'ble F. Maxmuller, Oxford, 30th April, 1896.—" ... ... Allow me to congratulate you on your successful termination of Panini's Grammar. It was a great undertaking, and you have done your part of the work most admirably. I say once more what should I have given for such an edition of Panini when I was young, and how much time would it have saved me and others. Whatever people may say, no one knows Sanskrit, who does not know Panini."

Professor T. Jolly, Ph. D, Wurzburg (Germany), 23rd. April, 1893—" ...... Nothing could have been more gratifying to me no doubt, than to get hold of a trustworthy translation of Panini's Ashtadhyayi, the standard work of Sanskrit literature, and I shall gladly do my best to make this valuable work known to lovers and students of the immortal literature of ancient India in this country."

Professor W. D. Whitney, New Haven, U. S. A., 17th June 1893—"... ... The work seems to me to be very well planned and executed, doing credit to the translator and publisher. It is also, in my opinion, a very valuable (production), undertaking as it does to give the European student of the native grammar more help than he can find anywhere else. It ought to have a good sale in Europe (and correspondingly in America)."

Professor V. Fausbol, Copenhagen, 15th June, 1893—"... ... It appears to me to be a splendid production of Indian industry and scholarship and I value it particularly on account of the extracts from the Kasika."

Professor Dr. R. Pischle, Halle (Saals), 27th May, 1893.—"......I have gone through it and find it an extremely valuable and useful book, all the more so as there are very few Sanskrit scholars in Europe who understand Panini."

শ্রীশবাবুর অপর কীর্ত্তি সিদ্ধান্তকৌমুদী সম্বন্ধে The Indian Mirror, The Hindoo, The Indian People প্রভৃতি পত্রে উক্ত হইয়াছে—

"The next great undertaking of the Panini Office was the publication of the Siddhanta Kaumudi of Bhattoji Diksit. This is a standard work on Sanskrit grammar and Sanskrit scholars spend at least a dozen years in mastering its intricacies......It may be mentioned that the Oriental Translation Fund of England advertised about three quarters of a century ago as under preparation the English translation of the Siddhanta Kaumudi by Professor Horace Hayman Wilson. But perhaps he found the work too laborious for him, for the advertised translation was never published."

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল (Prof. A. A. Macdonell, M. A., Oxford), অধ্যাপক বেণ্ডল (Prof. Cecil Bendall, M. A., Cambridge) প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীশবাবুর এই গ্রন্থ এবং পাণিনি যে প্রখ্যাত পণ্ডিত বথ্‌লিঙ্কের পাণিনি অপেক্ষা সরল এবং সুখবোধ্য তাহাও পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক পৌসুই লিখিয়াছেন—

"I have duly received the first volume of your Siddhanta Kaumudi. I was much pleased to get such a nice present from you. I have no hesitation to confess that I found inextricable difficulties in the use of Bohtlingk's Panini before I was so fortunate as to obtain from my friend......a spare copy he had of your Ashtadhyayi. It is a capital book for reference, and the Siddhanta Kaumudi for study."—Professor Louis de la Vallee Poussin, Professor at Ghent, Curator of the Museum, 13 Boulevard du Parc, 2 December, 1902.

উক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত তিনি বেদান্ত, উপনিষদ, যোগ, স্মৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহু দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের সটীক ইংরেজি অনুবাদ এবং ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ * রচনা করিয়াছিলেন। সে-সকল পুস্তক বহুপ্রশংসিত এবং যুক্তপ্রদেশে ও প্রদেশান্তরের হিন্দুসমাজে সমাদৃত হইতেছে। এই-সকল গ্রন্থের অনেকগুলি শ্রীশবাবুর প্রকাশিত "Sacred Books of the Hindus" নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীশবাবুই প্রথমে মধ্বাচার্য্যের সভাষ্য উপনিষদ

based on the celebrated Commentary called the Kasika.

* The Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, and Manduka Upanishads with Madhva's commentary.

Yajnavalkya Smriti, with the commentary Mitakshara and notes from the gloss Balambhatti.

The Chhandogya Upanishad with Madhva's Bhasya.

The Vedanta Sutras with Baladeva's commentary.

An Easy Introduction to Yoga Philosophy.

Tattwa Traya of Ramanuja School.

Gheranda Sanhita.

Shiva Sanhita.

The Three Truths of Theosophy.

Daily Practice of the Hindus.

Catechism of Hinduism.

ইংরেজিতে অনুবাদিত করিয়া য়ুরোপীয় বেদান্তাধ্যায়ী-দিগের সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞানগোচর করেন। তাঁহার লিখিত পাণিনির সটীক ইংরেজি গ্রন্থ কতদূর সম্মান ও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত মতগুলি হইতে জানা যায়। উহা কেবল গ্রন্থেরই প্রশংসা নহে কিন্তু গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা এবং মনস্বিতার চিরস্মারক—তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি। এপর্য্যন্ত কোন য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবাসীর গ্রন্থ এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীশবাবুর পাণিনি লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির এম-এ কোর্স নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তিনি যে শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্মোদ্ভেদে নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বলে তিনি যে-ভাষা, যে-বিদ্যা, যে-বিষয় শিক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতেই গভীরভাবে প্রবেশ করিয়া নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "Folk-Tales of Hindoostan" নামক গল্পগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশবিদেশের গল্পপাঠক সমালোচক এবং সম্পাদকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। লণ্ডনের "Review of Reviews" পত্র, উহাকে জগৎ-বিখ্যাত আরব্যোপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লণ্ডনের "Folklore" পত্রে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান (M. M. Longworth Daine, I. C. S.) ইহার গল্পাংশ, ভাষা, কল্পনা এবং চমৎকারিত্বের প্রশংসা করিয়া ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ "আলিফ্ লায়লার" সমকক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

> "It is to be hoped that Shaikh Chilli will make known to the world some more gems from his treasurehouse."

পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগ ও বড়োদা রাজ্য এই পুস্তকখানিকে ছাত্রগণকে পুরস্কার দিবার ও পাঠাগারে রাখিবার উপযোগী বলিয়া অনুমোদন এবং ক্রয় করিয়াছেন।

শ্রীশবাবু হিন্দী বর্ণপরিচয়, হিন্দীতে Alphabetical Cards প্রভৃতি বাহির করেন এবং হিন্দী সাঙ্কেতিক লিখনপ্রণালী (Hindi Shorthand) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এদেশে আবশ্যকীয় টাইপ না থাকায় উহা পিট্‌ম্যানের "শর্টহ্যাণ্ড প্রেসে" মুদ্রিত হয়।

আরবী ভাষা এবং মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া অনেক মৌলবীকেও বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তিনি যেমন বৈদান্তিক পণ্ডিত, অপরদিকে তেমনি সুফিদিগের ভাবে তন্ময়; আরবী ফারসীতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। একবার ওহাবী সম্প্রদায় সুন্নিসম্প্রদায়ের সহিত একই মস্‌জিদে উপাসনা করিবার অধিকারী কি না এই বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলির সরল ও সঙ্গত মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে* প্রকাশিত হয়। বড় বেশীদিনের কথা নহে, বারাণসীর আদালতে বিলাতফেরত কোন ভদ্রলোকের সমাজচ্যুতি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার কথা সংবাদ-পত্রে অনেকেই পড়িয়াছেন। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাদীর বিপক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু সুপণ্ডিত শ্রীশবাবুর জেরায় তাঁহাদের কোন যুক্তিই টিকে নাই। বিশাল হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান এবং অকাট্যযুক্তির সম্মুখে কাশীর সেই প্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়দিগকে হার মানিতে হইয়াছিল। বিচারপতি শ্রীশবাবু সুচিন্তিত ও সুবিস্তৃত রায় লিখিয়া এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সাধারণের পক্ষেও উপাদেয় পাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই।

জনহিতকর কার্য্যেও শ্রীশবাবুর অনুরাগ বড় অল্প ছিল না, তিনি অধ্যয়ন গ্রন্থলিখন এবং বিচারকার্য্যে কঠোর শ্রম করিয়াও সার্ব্বজনিক মঙ্গল কর্ম্মে যোগদান করিতেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কার্য্যে, বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যে সহায়তা তাহার অন্যতম নিদর্শন। তিনি যখন বেরিলীর সবজজ ছিলেন তখন সম্রাট সপ্তম এডবার্ড পরলোকগত হন। তিনি সম্রাটের স্মারকস্বরূপ তথায় "Edward Memorial School" প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী হন। এলাহাবাদে "Indian Girl's High School" নামে যে

* The Right of Wahabis to Pray in the Same Mosque with the Sunnies—an Important Judgment on a very disputed question of Muhammadan Law.

বালিকাবিদ্যালয় আছে শ্রীশবাবুই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই কার্য্য যথাসাধ্য প্রচ্ছন্নভাবে করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণে প্রায়ই অজ্ঞাত আছে।

শ্রীশবাবু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ফ্রীমেসন সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ও পদস্থ সভ্য, থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সম্মানিত সভ্য ও উৎকর্ষবিধায়ক, জনসাধারণের প্রিয়, ব্যবহারে অমায়িক, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী, সুবিচারক, ধর্ম্মপ্রাণ এবং সাহিত্যের অকপট ও অক্লান্ত সেবক ছিলেন। ১৯১০ অব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশবাবু স্মল কজ কোর্টের জজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় বারাণসী গমন করেন। পরে তিনি ডিষ্ট্রীক্টএর সেসন্স জজ হইয়াছিলেন। সম্রাটের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট শ্রীশবাবুকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়া তাঁহার গুণের সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে জানেন তাঁহাদের মত এই যে "মহামহোপাধ্যায়" বা "শম্স্‌-উল্‌-উলামা" বা উভয় উপাধি একসঙ্গে দিলেই তাঁহার উপযুক্ত হইত।

তাঁহার পিতা পরলোকগত শ্যামাচরণ বসু মহাশয় পঞ্জাব প্রদেশের শিক্ষাসংস্কারক, এবং নানা বিষয়ের উন্নতি বিধায়ক ছিলেন। শ্রীশবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক মেজর বামনদাস বসু, এম, ডি; আই, এম, এস।

কথিত আছে, একদা শ্রীশবাবুর জননী ঠাকুরাণী গঙ্গাস্নান করিতে যাইলে, খৃষ্টান মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা কয়েকটি বালিকা তাঁহাকে গঙ্গাস্নানের নিষ্ফলতা, কুসংস্কার এবং সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করে। তাহাতে সেই হিন্দুধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাসবতী প্রাচীনা হিন্দুরমণীর হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। তিনি পুত্রকে জানাইয়া বলিলেন, "এই যে মিশনরীরা আমাদের দেশের মেয়েদের দুর্ব্বিনীত, জাতীয়ত্বহীন করিয়া দেশে অবিশ্বাসীর দল বৃদ্ধি করিতেছে, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?" জননীর এই বাক্য মাতৃভক্ত পুত্রকে প্রবুদ্ধ করিয়া দিল। শ্রীশবাবু ব্যারিষ্টার মিঃ রোশন লাল এবং স্থানীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী, মুসলমান ও বাঙ্গালীর সহযোগে Association for the Encouragement of Female Education in the N. W. P. and Oudh নাম দিয়া একটি স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারিণী সভা সংস্থাপন করেন। ১৮৮৮ অব্দের ১লা জানুয়ারী এই সভার তত্ত্বাবধানে The Indian Girl's Free High School স্থাপিত হয়।

("বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

ঝুলন

নববর্ষের দিন থেকে আরম্ভ করে বৎসরের গতির সঙ্গে সঙ্গে ধরণীর গায়ে যে নিত্য নূতন রূপ ফুটে ওঠে মানুষের চোখ তা এড়াতে পারে না। প্রতি ঋতুতে যে নবীন অতিথি তার পূর্ণসাজি নিয়ে বিচিত্ররূপে আমাদের নয়ন মন ভুলিয়ে এসে দাঁড়ায়, তার সে মোহনমূর্ত্তি দেখে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ না করে মানুষ পারে না। যে মানুষের দৃষ্টি ইট-কাঠের সীমানা ছাড়িয়ে উঠতে এখনো পারে, প্রকৃতি যার কাছে প্রাণময়ী, তার শুধু মন নয়, তার কথা বার্ত্তা কাজকর্ম্ম সমস্তই তার এই বন্ধুদের রচিত কাব্যের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলে। গানের সুর যেমন তার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে জড়িত, প্রকৃতির মুগ্ধ ভক্তের জীবনও তেমনি করে তার সঙ্গে জড়িত। যে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে যত দূরে চলে যায়, অভিমানিনী প্রকৃতি রাণী তার কাছে ততই নীরব হয়ে আসে। সে মানুষ বৈশাখের ঝড়ে ঝঞ্ঝায়, রুদ্র রৌদ্রে, কোনো মহা তপস্বীকে স্মরণ করে না; আষাঢ়ের আকাশভরা কাজল মেঘের দিকে চেয়ে আকাশ-গঙ্গার মুক্ত শতধারায় স্নান করে তার তৃষিত মন ময়ূরের মত নেচে ওঠে না; ভরা ভাদ্রের পরিপূর্ণ শ্যাম শোভায়, হাল্কা মেঘের অলস লীলায় তার অবসরের দিন কোনো গান খুঁজে পায় না; ফাল্গুনের ফুলের রঙে তার অন্তর রঙীন হয়ে ওঠে না।

আজ আমাদের বাংলার মানুষ এমনি অসাড় এমনি প্রাণহীন হয়ে গিয়েছে। একদিন কিন্তু ভারতমাতার কোলের সকল ছেলেই ঋতুতে ঋতুতে নানা রাগরাগিণীতে সেই বিচিত্রবরণীর বন্দনা করেছে।

আজ আষাঢ়ের ঘনমেঘ জলভারে দিগন্তরেখার শেষে সবুজ গাছের মাথায় মাথায় নুয়ে পড়ছে, কিন্তু কেউ তাকে

কলকণ্ঠের মুখর গানে সাদরে ডেকে নিচ্ছে না; কালো মেঘের আড়াল থেকে সহস্রমুখী ঝারির জল মাটির ধরণীকে সরস করে তুল্‌ছে, কিন্তু জীবন্ত মানুষ এই ঝরঝর বারিধারার সুরে পুলকিত হচ্ছে না। মাঠে ঘাটে পথে বৃষ্টির জল কত ভঙ্গীতে ঘুরে ফিরে কলকলশব্দে মানুষকে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, মানুষের আজ ফিরে তাকাবার সময় নেই। বিজ্ঞ মানুষ এখন আর ছেলেখেলায় মাতে না। কিন্তু আমাদের এই ভারতেই এখনো এমন ছেলেমানুষ কোনো কোনো জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপের পর ফাটাচটা শুক্‌নো দেশের কঠিন মাটির উপর যখন নবীন মেঘের জলাঞ্জলি প্রথম ঝরে পড়ে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দেখেছি তখন মহা উৎসব লেগে যায়। নীলমেঘের রূপ দেখেই সমস্ত তৃষিত দেশ চাতকের মত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বড় বড় নিমগাছের ডালে ডালে দোল্‌না টাঙানোর ধুম পড়ে যায়। দরিদ্রের প্রাঙ্গণেও এ উৎসব-সজ্জার অভাব হয় না। জলের সঙ্গে মেয়েদেরই বোধ হয় একটা বিশেষ কিছু যোগ আছে, তাই এ ঝুলন-যজ্ঞে মেয়েরাই সবার আগে ঘর ছেড়ে যোগ দিতে ছুটে আসে। কত হরেক রকম রঙের কাপড় পরে তারা পা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দোল্‌নার তক্তার উপর এক সঙ্গে সার দিয়ে বসে যায়। তাদের সে ঝুলন-উৎসবে প্রবীণাও নবীন হয়ে ওঠে। রঙীন 'চুনরী' শাড়ীর বাহার দিয়ে তরুণী সখীদের সঙ্গে সেদিন তারা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। দোলার দুধারের দড়ি ধরে তক্তার শেষদিকে পা দিয়ে দুটি ছেলে যেই দোল দিতে সুরু করে অমনি "শ্যামলিয়া"র বন্দনায় সমস্ত পল্লী ধ্বনিত হয়ে ওঠে। বর্ষার জল তাদের মুখে চোখে চুলে রঙীন 'ওড়নি' 'আঙিয়া' 'চুনরী'তে ঝরে পড়ে, তবু তাদের গানেরও বিরাম হয় না, দোলও থামে না। বর্ষার উৎসব বর্ষণে আরো মেতে ওঠে। শূন্যে অর্দ্ধচন্দ্রের মত পথ কেটে দোলা গাছের এক ডাল থেকে আর-এক ডালে গিয়ে ঠেকে; ছোট্ট মেয়েটিও তাতে ভয় না পেয়ে গানের আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকে। সেসব গানে ক্ষণেক্ষণে "যমুনা-কিনারের" কথা, "কানাইয়ার" কথা আর শ্রাবণ-সাঁঝের কথা কানে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

এই যে নবীন প্রবীণ সকলের আপনার ঝুলন-উৎসব, এ যে কেবল খোলা মাঠের মাঝখানে পল্লীপথের ধারেই হয়, তা নয়। ইটে কাঠে আর পাথরে গড়া যে নীরস রাজধানী, তারও আনাচে কানাচে যেখানেই আইন-কানুনের শাসন না মেনে মেঘের মত ঘন একরাশ পাতা নিয়ে বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে ডালপালা মেলে উঠেছে, সেখানেই বর্ষার আগমনী গাইতে ঝুলনের দোলা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

আমাদের বাংলা দেশে প্রকৃতির রূপমুগ্ধ মানুষের যেমন অভাব, সে দেশে এখনও তা হয় নি। বর্ষার দিনে আপনার অজ্ঞাতেই তারা আজো হরষিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতি ভারতে যে রূপের খেলা খেলেছেন, যে গান গন্ধ শতহস্তে বিলিয়েছেন, তার মর্য্যাদা সে দেশের লোকে আজও কিছু কিছু রাখে। তারা আজও শস্য কাট্‌তে কাট্‌তে গান গায়; নূতন গম ভেঙে আটা করতে পা-ছড়িয়ে বসে গান করে। সকল ঋতুতে, সকল পূজায়, সকল উৎসবে, কাজে কর্ম্মে আনন্দের মাত্রা তাদের আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। আজ ঝুলনের দিনে নিরানন্দ বাংলার বর্ষায় তাই সেই উৎসবের স্মৃতি মনে পড়্‌ছে।

শ্রীশান্তা দেবী।

চিরফাঁকা

মনটি আমার ফাঁকা হয়ে
হাওয়ার মত যাবে উড়ে,
খোলা বুকের দোলা পেয়ে
থাক্‌বে বিশ্ব আকাশ জুড়ে।
কত কথা কত ব্যথা
কত শত দুঃখ সুখ
রইবে পড়ে এধার ওধার,
শূন্য যে তার ভরবে বুক।
লোকে এসে বল্‌বে হেসে
রুচিটি তোর কেমন হা রে,
ভাব করেছিস শূন্য সনে,
শূন্য সুখের কি ধার ধারে?

ভোলা আমার শূন্যখানা,
খোলা যে তার সকল দিক,
যা আছে তার বুকের পরে
যার খুসী সে লুটে নিক ;
হারিয়ে যাবার ফুরিয়ে যাবার
ভয় কোথা তার শূন্য সে যে,
লক্ষ ভুবন লয় পেয়ে যায়
নিত্য তাহার বুকে বেজে ;
সে যে অবাধ সে যে অগাধ
সে যে অসীম শূন্য আমার,
ঢালা সুখের আলাটুকু
জ্বালা গো তার নিত্য ব্যাপার ;
কত আরাম কত বিরাম
আছে আমার শূন্যে ভরা,
জানে না আঁধারের স্বপন
জানে না জাগ্রত ধরা ;
নিত্য ভরে দেয় সে মোরে
অসীম সুখের শান্তি সোয়াদ,
ছেড়ে যেতে চায় না পরাণ ।—
ফুরিয়ে গেলে কালের মেয়াদ
ভেসে ভেসে যদি এসে
ঠেকি আবার বাঁধা ঘরে
উঠ্‌বে কেঁদে পরাণ আমার
মহাশূন্য পাবার তরে ।
শূন্য আমার শূন্য আমার
রাখ্‌ব তোমায় স্মরণ করি,
তবেই আমার চিত্ত রবে
নিত্য চির ফাঁকায় ভরি ।

শ্রীহেমলতা দেবী ।

বেলুচিস্থান

সাধারণ অবস্থান ।

যে দেশে বেলুচিদের বাস তার নাম বেলুচিস্থান । বেলুচিস্থান ভারতীয় গভর্মেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের অন্তর্গত বৃহত্তম প্রদেশ । এর চৌহদ্দির দক্ষিণে আরব সাগর ও গদরের চারিদিকে মক্রট প্রদেশের একাংশ ; পূর্ব্বে সিন্ধু, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ; উত্তরে স্বাধীন রাজ্য য়াঘিস্তান ও আফগানিস্তান ; পশ্চিমে পারস্য । উত্তরপশ্চিমে দেশের যে শৃঙ্গাকৃতি অংশ আছে তার চূড়ায় কোহ্-ই-মালিক-সিয়াহ অবস্থিত ; ইহা বেলুচিস্থানের রাজধানী কোয়েটা হইতে ৪৬২ মাইল দূর । কোহ্-ই-মালিক-সিয়াহ্ মরুভূমি হইলেও এর খ্যাতির দুটি কারণ বিদ্যমান,—প্রথম, ইহা ভারতের পশ্চিমতম স্থান ; ও দ্বিতীয়, এখানে তিনটি দেশের মিলনবিন্দু—ভারতসাম্রাজ্য, আফগানিস্তান ও পারস্য এখানে পরস্পরের সন্নিহিত হইয়াছে । ভারতের সীমান্তপ্রদেশের মধ্যেও এর খ্যাতি ও আবশ্যকতা যথেষ্ট—ইহা পারস্যের সঙ্গে ৫২০ মাইল, আফগানিস্তানের সঙ্গে ৭২৩ মাইল এবং য়াঘিস্তানের সঙ্গে ৩৮ মাইল সংযুক্ত এবং আরব সাগরের উপকূল ৪৭১ মাইল এই প্রদেশেরই অন্তর্গত ।

ভারতের কোনো পথিক বেলুচিস্থানের গিরিরন্ধ্র দিয়া এদেশে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পায় সকল কিছুতেই ভারতের সঙ্গে গরমিল । দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য কতকটা ইরাণের অধিত্যকার মতন এবং মোটের উপর চিত্তাকর্ষক নয়, যদিও তার মধ্যেও একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । বন্ধুর অনুর্ব্বর রোদপোড়া পাহাড়গুলা গভীর খাদ ও গিরিকন্দরে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পাশাপাশি ঊষর মরু ও কঙ্কর-পাষাণময় সমতল স্থান, সমস্তটারই বর্ণ ধূসর ও পাংশু । এই রিক্ততার মাঝে মাঝে হরের পাশে পার্ব্বতীর মতন বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সেচনকরা জল পাইয়া বিবিধ শস্য ও ফলের ফসলে সবুজ রঙে ঝলমল করিতেছে দেখা যায় । পাহাড়ের মাঝে মাঝে সরু শুঁড়ি পথ আছে, তারই উপর দিয়া নির্ঝরের জলধারা বহিয়া যায় আর তারই দুধারি ধাপে ধাপে শস্যক্ষেত্র গ্রীষ্মকালে সবুজ রঙের মেলা বসায় । স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণীগুলির কূলে কূলে ঝাউগাছের থামে থামে আঙুরলতার দোলানো মালা আর তারই তলায় তলায় ডালিম-দানার মতন ছেলেমেয়েগুলি ও সুশ্রী সুন্দরী রমণীরা নীল ও লাল রঙের ঘাঘ্‌রা ও ওড়্‌না পরিয়া দেশটির সকল অনুর্ব্বরতা ঢাকিয়া অনির্ব্বচনীয় শ্রী দান করে । উজ্জ্বল প্রভাতে যখন

তুষারপাত হয় তখনকার কোয়েটার দৃশ্যও বড় মনোরম; পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফের উপর আলোর হাজার রঙের খেলা আর সমস্ত শুভ্রতার মাঝে খেজুর-গাছের কুঞ্জগুলি মনকে মুগ্ধ করে। উঁচু পাহাড়ের উপর হইতে নীচের দৃশ্যও চমৎকার—খাদ ও কন্দরের ভ্রূকুটির পাশে সমতল ক্ষেত্রের মধুর হাস্য বৈপরীত্যে সুন্দর।

একজন বেলুচি সর্দ্দার।

ইতিহাস।

এ প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। তবে কালাটের অধিনায়ক সর্দ্দারেরা কখনো সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না; তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত তারা এক সার্ব্বভৌম রাজ-শক্তির অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ইহাদের কতক দিল্লির সম্রাটের ও কতক কান্দাহারের অধিপতির অধীন ছিল, এবং দর্‌কার হইলে অধিপতিদের সশস্ত্র যোদ্ধা (সান) জোগাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিত। দিল্লির রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আহমদজাই সর্দ্দারেরা পরাধীনতা হইতে আপনা-আপনি মুক্ত হইয়া পড়ে ও মীর নাসির খাঁ প্রথম (১৭৫০-৫১) স্বাধীনতার শক্তিকে সংহত করিয়া তোলেন।

মীর নাসির খাঁ দ্বিতীয় ১৮৫৪ সালে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর উত্তরাধিকারী ১৮৫৭ সালে সর্দ্দারী পাইয়া দেশের দলপতিদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন; সেই উপলক্ষ্যে ১৮৭৫ সালে প্রথম ব্রিটিশ মিশন কালাটে উপনীত হয়। ১৮৭৬ সালে দ্বিতীয় ব্রিটিশ মিশনের সঙ্গে শিখ ফৌজ পৃষ্ঠবল হইয়া গিয়া সহজেই সন্ধি-স্থাপনের সাহায্য করে এবং বেলুচিস্থানের খাঁয়েরা স্বতন্ত্র ও নির্দ্বন্দ্ব থাকিয়া ব্রিটিশশক্তির আনুগত্য স্বীকার করিবে বলিয়া সন্ধি করে। ঐ সমস্ত মিশনের নায়ক সার্ রবার্ট স্যাণ্ডম্যান ১৮৭৭ সালে প্রথম ইংরেজ-এজেণ্ট হইয়া বেলুচিস্থানে স্থাপিত হন।

১৮৭৯ সালে দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধের পর বেলুচিস্থানের চারটি জেলা বেলুচিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং কোয়েটা ও বোলান গিরিপথের শাসনভার দেওয়া হয় কালাটের খাঁকে ১৮৮৩ সালে। তারপর হইতে অনেক সর্দ্দার তাদের অধিকার ছাড়িয়া ব্রিটিশশক্তির অধীনতা স্বীকার করে এবং তাদের উৎসৃষ্ট প্রদেশগুলি লইয়া ব্রিটিশ বেলুচি-স্থান হয় ও তখন হইতে গভর্ণর-জেনারেলের এজেণ্টের নাম হয় চীফ কমিশনার।

আয়তন ও জনসংখ্যা।

বেলুচিস্থানের আয়তন ১৩৪২৩৮ মাইল; লোকসংখ্যা ৮৩৪৭০৩; প্রত্যেক বর্গমাইলে মাত্র ৬ জন লোকের বাস। সমস্ত বাসিন্দাদের তিনভাগে ভাগ করা যায়—

খাঁটি সেই দেশী—৭৫২৩৯১
প্রায় সেই দেশী—২৫৪১১১
বিদেশী — ৫৬৮৯৮।

বিদেশীদের মধ্যে ৪২১০ জন য়ুরোপীয়, ১২৩ জন ফিরিঙ্গি, ৭১৪০ জন সিন্ধুনদের ওপারের লোক, ৪৫৪২৫ জন সিন্ধুনদের এপারের লোক।

সেইদেশী লোকদের জাতি হিসাবে বিভাগ এইরূপ—

পাঠান —১৮৮০৯৩
বালোচ —১৬৯১৯০
ব্রাহুই —১৬৭৭৮৭
লাসি — ২৭৭৭৯
জাঠ — ৭৮৪০০
সৈয়দ — ২২১৮৩
মুসলমান— ৮২০৮৬
হিন্দু — ১৪৯৮৫
শিখ — ২৭২৯

জাতিদের ঐতিহ্য।

পাঠানদের বিশ্বাস তাদের আদিম আবাস ছিল তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান পাহাড়ে। মালিক তালুৎ (King Saul) হইতে ৩৭ পুরুষ পরে কইস আবদুর রশিদের তিন ছেলে ছিল; তাদেরই বংশধরেরা পাঠান। গোত্রভেদে পাঠানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম মান্দোখেল, বুবী, কাকার, পনি, তরীন, শিরানি ইত্যাদি।

বালোচদের বিশ্বাস তারা আলেপ্পো হইতে আগত। মিঃ ডেম্‌স্ বিশেষ গবেষণায় স্থির করিয়াছেন উহারা আসলে ইরাণী। তাদের গোত্রনামে পারস্যের বহু প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। অনেক পাঠান ও জাঠের সংমিশ্রণ সঙ্করজাতিও বালোচ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রাহুইদের কোনো আদিম বাসস্থানের ঐতিহ্য নাই। উহারা বালোচ পারসীক পাঠান জাঠ ও অন্যান্য জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়াই ঐতিহ্যহীন বোধ হয়।

সৈয়দেরা সংখ্যায় কম হইলেও সকলের খুব সম্মানভাজন। কারণ তারা পয়গম্বরের বংশধর।

জাতি ও গোত্র বিভেদ।

পাঠান বালোচ ও ব্রাহুই সকলেরই মধ্যে গোত্র ও দল হিসাবে বহু বিভাগ আছে। পাঠানদের মধ্যে একই দলের লোক হইলেই আত্মীয়তা হয়; ব্রাহুইদের আত্মীয়তার বন্ধন একই শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা হইতে। ওয়াস্‌লি অর্থাৎ একত্র মিলিত বাস, বা হম্‌সায়া অর্থাৎ একই ছায়া হইতে পাঠানদের আত্মীয়তার বন্ধন যেমন, একই বংশে বা গোত্রে জন্ম হইতেও তেমন। কিন্তু ব্রাহুইদের আত্মীয়তা হয় সর্দ্দারের আনুগত্য হইতে—বিভিন্ন জাতির বংশের ও গোত্রের লোক যে একটি সর্দ্দার-খেল অর্থাৎ সর্দ্দার-পরিবার হইয়া উঠে তারাই সকলে আত্মীয় হয়। পাঠানদের মধ্যে সর্দ্দারী পুরুষানুক্রম নয়; উপযুক্ত সেই সর্দ্দারী পায় বা হয়। বালোচ ও ব্রাহুইদের সর্দ্দার পুরুষানুক্রমে চলে ও প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মোড়ল থাকে, তাদের ওাদেরা বলে।

একজন ব্রাহুই সর্দ্দার
৬ ফুট ৩ ইঞ্চি।

আকৃতি ও প্রকৃতি।

পাঠানেরা বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ, সুঠাম ও কষ্টসহ। তাদের কঠোর চোখা দেহের কাঠামো ও ঝাড়ালো ভ্রু তাদের আকৃতিতে একটা বন্য হিংস্রতার ভাব দেখায়। তাদের

গায়ের রং লাল্‌চে। চুল আর দাড়ি খাটো করিয়া কাটিয়া রাখে। চালচলন দৃঢ়, প্রায় গর্ব্বিত। তাদের মতে শ্রেষ্ঠ গুণ সাহস; তারা নিষ্ঠুর নির্দ্দয় কঠোর কর্কশ। দয়া বা ক্ষমা তারা বোঝে না, তারা সে-সব দুর্ব্বলতার চিহ্ন মনে করে; নিজেরাও কারে পড়িলেই কাবু হয়। প্রতিহিংসা ওদের একটা বাতিক বিশেষ। লোভ ও ধন-লিপ্সাও বড় কম নয়।

একজন শেরানি পাঠান

৬ ফুট।

বালোচেরা পাঠানদের ঠিক বিপরীত রকমের। তারা খাটো, রোগা পাৎলা। তাদের চালচলন বেশ নির্ভীক, ব্যবহার খোলাখুলি সরলতাব্যঞ্জক, ও তারা মোটের উপর সত্যবাদী। প্রাচীন কালে কোনো বালোচ কাহাকেও তার হাল বা খবর দিবার সময় কোথায় কাকে খুন করিয়াছে তারও সংবাদ অকপটে নির্ভয়ে দিত। তাদের যদি সর্দ্দারের দাড়ির শপথ করানো যায় তবে তাদের দিয়া সব-কিছু কাজ করানো যায়। এদেরও কাছে সাহসই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ ও আতিথেয়তা শ্রেষ্ঠ গৃহস্থকর্ত্তব্য। বালোচেরা খুব পাকা ঘোড়সোয়ার। এদের মুখ লম্বা বাদামী আকারের, নাক টিকলো। তারা চুল লম্বা রাখে, ও তেল মাখাইয়া গুচ্ছ গুচ্ছ বাবরী করে। এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেয়েলিপনা বলিয়া মনে করে। বালোচ ছোরা ও ঢালতলোয়ার লইয়া বেড়ায়। ইহারা ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধে গিয়া মাটিতে দাঁড়াইয়া লড়ে। পাঠানদের মতন এরা ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হয় না।

ব্রাহুই মাঝারি আকারের, গাঁটাগোঁটা, মজ্‌বুত। তাদের মুখভাব চোখা, হনু উঁচু, চোখ ফালি ফালি, নাক উঁচু ও ছুঁচলো। তাদের ব্যবহার বেশ সরল খোলাখুলি। যদিও এরা চট্‌পটে পরিশ্রমী ও সর্ব্বদা টোটো করিয়া বেড়ায় তবু এরা বালোচদের মতন যোদ্ধা নয়; তবে এরা চর আর্দ্দালী রক্ষীর কাজ বেশ করে। এরা প্রায়ই ক্ষুদ্রচেতা লোভী অর্থগৃধ্নু হয়; কিন্তু এরা চোর নয়। প্রতিহিংসা-পরায়ণ, কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতক নয়; জেদী, কিন্তু ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত নয়। এদের অজ্ঞতা সেদেশে প্রবাদ হইয়া উঠিয়াছে; লোকে বলে—যদি বোকা ভূত আর পাহাড়ে প্রেত না দেখে থাকো ত একটা ব্রাহুইকে দ্যাখো।

ভাষা।

বেলুচিস্থানের দেশভাষা পশ্‌তো, ব্রাহুই, পূবে ও পশ্চিমে বালোচি, জট্‌কি-সিরৈকি, জট্‌কি-সিন্ধি ও লাসি। পশ্‌তো ও বালোচি ভাষা ইরাণি শাখা ও অপরগুলি ভারতীয় শাখা বলিয়া গণ্য হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্রাহুই ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের তামিল ও তেলেগু ভাষার যথেষ্ট জ্ঞাতিত্ব আছে।

ব্যবসায়।

অধিকাংশ লোকেরই পেশা চাষ ও সঙ্গে সঙ্গে পশু-পালন। পশুর মধ্যে ভেড়া ছাগল ও উট প্রধান। শিল্প বা কারিগরী কাজ দেশে নাই বলিলেই হয়; যদিও

নাম্‌দা কার্পেট, খুর্জিন ও কিঝ্‌দি কম্বল আর তালপাতার বোনা ঝুড়ি পেটারী চাটাই মেয়েরা তৈরি করে, কিন্তু সে-সব ঘরে ব্যবহারের জন্য, বিক্রয় বা বাণিজ্যের জন্য নয়। মেয়েরা কোথাও কোথাও বেশ্‌ সূচিকর্ম্ম করিতে পটু; এককালে বার্থান গালিচার খুব নামডাক ছিল।

বেলুচিস্থানের একজন হিন্দু।
৫ ফুট ৭ ইঞ্চি।

ধর্ম্ম।

অধিকাংশ বাসিন্দাই সুন্নিসম্প্রদায়ের মুসলমান; বালোচদের মধ্যে একটি ছোট শাখা শিয়া মুসলমান; তা ছাড়া হাজার-পনেরো জিক্‌রী-ধর্ম্মাবলম্বী আছে। হিন্দু ও শিখের সংখ্যা সামান্য।

যদিও বেশীর ভাগ লোকই মুসলমান, কিন্তু তারা কেউ ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ঠিক জানে না। অথচ যারা সুন্নি তারা শিয়াদের ঘৃণার চক্ষে দেখে। প্রত্যেক মুসলমান কাফেরকে ঘৃণা করে। পাঠানেরা ইস্‌লাম ধর্ম্মের গূঢ় অর্থ না বুঝিলেও, ও পিতৃপূজা প্রভৃতি করিলেও, বাহ্য অনুষ্ঠানে তারা মুসলমানত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে—তাদের নিয়মিত নমাজ ও রোজা, জকাৎ ও জিয়ারৎ, বাদ পড়ে না। অন্তরে ও আত্মায় যা তারা না পায়, তা তারা গায়ের জোরে পোষাইয়া লইতে চায়—তারা কাফের মারিয়া গাজি হয়, আর এমন গাজি তাদের মধ্যে অনেকই ছিল আগে। কিন্তু ১৯০১ সালে খুনের চেষ্টা করিলেই বেত মারিবার ব্যবস্থা হওয়াতে গাজি হওয়ার লোভটা এখন অনেক সংযত করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠান গ্রামে ও বস্তিতে একটা মস্‌জিদ ও এক জন মোল্লা আছেই। মোল্লাগিরি কোনো বিশেষ বংশের একচেটে নয়, হীনতম লোকও যোগ্য হইলে মোল্লার পদবী পায়।

বালোচেরা ধর্ম্মের ধার বড় একটা ধারে না; তারা মনে করে ধর্ম্ম পূর্ণমনুষ্যত্ব লাভের আদর্শ মাত্র, কিন্তু তাহা পালন করা অসম্ভব; ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্মান আদায়ের ভড়ং মাত্র।

ব্রাহুইদের মধ্যে যথার্থ মুসলমান আরো দুর্ল্লভ। সাধারণ লোকদের কাছে ইস্‌লামের ধর্ম্মমতের সঙ্গে নানাবিধ দেশীয় কুসংস্কার জড়াইয়া ধর্ম্ম কিম্ভূতকিমাকার হইয়া আছে। ১৯১১ সালে আদমশুমারির সময় ধর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করিয়া আদম-শুমারেরা এই রকম উত্তর পাইয়াছিল—"সর্দ্দারের যে ধর্ম্ম আমারও সেই ধর্ম্ম লিখে নাও।" "আমি আগে মেঙ্গলে সর্দ্দারের ধর্ম্মে ছিলাম; কিন্তু এখন আমি বাসা বদল করেছি—বাজুলজাই সর্দ্দারের ধর্ম্মে আছি।" "আমি কাকর জাতে জন্মেছি, ধর্ম্মেও আমি কাকর।" ইত্যাদি। যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা যায়—তুমি মুসলমান, না কাকর? তুমি মুসলমান, না ব্রাহুই? তবে তারা প্রায়ই বলে—আমি কাকর বা ব্রাহুই। তারা তাঁদের গোত্র-নামটাই জানে শুধু, ধর্ম্মের খোঁজ বড় একটা রাখে না। একমাত্র সুন্নৎ করা তারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে ও সৈয়দ কেত্রান ও জাঠেরা তাহা মেয়েদেরও কর্ত্তব্য মনে করে।

বেলুচ এবং বোখারা উট।

সাধারণ লোকের চল্‌তি ধর্ম্ম পিতৃপূজা, পীরের দর্‌গা পূজা ও এবম্বিধ কুসংস্কার। ব্রাহুইদের ঘরে ঘরে এক একটি নিজস্ব গৃহদেবতা ও তার মন্দির আছে, গৃহদেবতা সেই পরিবারের পূজা পাইয়া তাদের মঙ্গল বিধান করে। সন্তানহীনা রমণীরা এইসব মন্দিরে খেল্‌না দোল্‌না ভেট দিয়া সন্তানের মানত করে; রোগীরা বলি দিয়া রোগমুক্তি প্রার্থনা করে, বিপদে আপদে পড়িলেও এই-সব মন্দিরেই মানসিক করিতে হয়। বার্খানের কাছে সিহ্‌-তকি-সিং নামে একখানা পাথর আছে; লোকের বিশ্বাস তার কাছে গিয়া পিঠার ভোগ দিয়া ও সেই পাথরে গড়াগড়ি দিয়া সেখানকার মাটি খাইলে একজ্বরী ভালো হয়। কালাট থেকে আধ মাইল দূরে পীর চালান শাহের মন্দির আছে—সে পীর গাঁজা ভাং তামাকের উপর চটা বলিয়া সে তল্লাটে এসব মাদক দ্রব্যের চাষ নিষিদ্ধ। বিবি মেকনাম তাঁর মন্দিরের মাইল খানেক বেড়ের মধ্যে কেউ যদি চারপাইএ শোয় ত খাপ্পা হইয়া তার টুঁটি টিপিয়া ধরেন। লাপ বেলা গ্রামে মং গোজ্রানির মন্দিরে কেউ ছরাত্রির বেশী বাস করিলে স্বর্গ থেকে তার উপর ঢেলা বৃষ্টি হয়। ঝাল্লাওান প্রদেশে কির্থা পাহাড়ের চূড়ায় একটি কুকুরের মন্দির আছে; ব্রাহুইরা সেখানে গিয়া কুকুরের কাছে ভেড়া বলি দিয়া মাংস বিতরণ করিয়া দরিদ্রদের ভিক্ষা দ্যায়; এই কুকুর নাকি কল্পতরুর মতন সকলকার সকল মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারে। কাকর প্রদেশে পীর হুসেন নিকা'র মন্দিরের পাশে আর-একটি কুকুরের মন্দির আছে; এই কুকুর ঐ পীরেরই প্রিয় ছিল; যখন লোকে পীরকে ভেট করিতে আসিত তখন কুকুর প্রত্যেক লোকের পিছে একবার করিয়া ডাকিয়া প্রভুকে জানাইয়া দিত কজন লোক আসিতেছে। একদা কুকুর তিনবার ডাকিল; কিন্তু দর্শনার্থীরা আসিলে পীর দেখিলেন তারা চারজন। এই মিথ্যাবাদী কুকুরের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পীর তখনি তাকে বধ করিলেন। পরে দর্শকদের সঙ্গে কথা কহিয়া জানিলেন তাদের তিনজন মুসলমান ও একজন কাফের হিন্দু। তখন পীর কুকুরের গুণ বুঝিতে পারিয়া কুকুরের সমাধি নির্ম্মাণ করাইলেন ও আজ্ঞা দিলেন তাঁরও সমাধি ঐ সমাধির পাশেই হইবে, আর যে-কেউ তাঁর সমাধিতে পূজা দিতে আসিবে তাকে আগে কুকুরের মন্দিরে পূজা করিতে হইবে। সেই আজ্ঞা আজও পালিত হইতেছে।

পাঠান দেশের মধ্যে প্রধান মন্দির তিনটি—সঞ্জর নিকা'র—সঞ্জর নিকা সঞ্জর খেল কাকরদের আদি পুরুষ;

কোয়েটাতে পীর বুখারীর মন্দির; চোটিয়ালিতে নানা সাহেবের মন্দির—এই মন্দিরে সীমান্ত পার হইতেও তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে। সিংসিলা'র কাছে পাহাড়ের উপর বুগ্‌টিদের কুলদেবতা পীর সোহ্‌রী'র মন্দির আছে। মরীদের সর্দ্দারবংশের আদিপুরুষ বাহাওলান অন্য এক মন্দিরে পূজিত হন। কহানে শেখ গোলাম হায়দরের মন্দিরের চৌহদ্দিতে কলেরা রোগের প্রবেশাধিকার নাই বলিয়া সকলের বিশ্বাস। সেই মন্দিরের ধূলা কলেরার ঔষধ বলিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখে। পাহাড়ের বাসিন্দা মরীরা সমতল দেশকে বড় ডরায়; তারা পাহাড় থেকে নীচে নামিবার সময় কতকগুলা ঢেলা ফেলিয়া সমতল দেশকে গম্ভীর ভাবে সাবধান করিয়া দ্যায়, সে যেন তাদের স্বাস্থ্যকে আক্রমণ না করে। মাক্‌রী শেখ পঙ্গপাল তাড়াইয়া শস্য রক্ষা করে, নাঙ্গওয়ালা সাপের কামড়ের বিষ ঝাড়ায়, হুদ্দাওয়ালা গোরু-ভেড়ার রোগ নাশ করে, টুকাওয়ালা বসন্তর টীকা দিয়া বেড়ায়। এদের কাজের জন্য টাকা পয়সা বা জিনিস ফসল প্রত্যেক পরিবার নিয়মমত নির্দ্দিষ্ট সময়ে জোগাইয়া থাকে। কোনো কোনো মন্দিরের ধুলো রাখালদের খুব কাজে লাগে; ভেড়া-ছাগলের অসুখ হইলে তাদের গায়ে ঐ ধুলা ছড়াইয়া দিলেই তারা চাঙ্গা হইয়া উঠে। এ রকম মন্দিরের মধ্যে জিয়ারতের কাছে পীর সারংজাইএর মন্দির প্রধান।

এই দেশে জিক্‌রী নামে এক রকম ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে; ইহাতে মুসলমান-ধর্ম্মের বিধিকে স্থানীয় সংস্কারে পরিণত করা হইয়াছে; এদের মত—পরমেশ্বর ছাড়া ঈশ্বর নাই ও মাহ্‌দী তাঁর পয়গম্বর। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা কোরান মান্য করে, কিন্তু কোরানের অর্থ করে নিজেদের মনগড়া মতন। তারা মক্কায় না গিয়া কোহ্‌-ই-মুরাদ নামক পাহাড়ে হজ করিতে যায়; আয়ের চল্লিশ ভাগ দান করা উচিত না বলিয়া দশ ভাগ দাতব্য মনে করে। তারা তিন ওক্ত নমাজ পড়ে, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে জিক্‌রানা করিয়া ধর্ম্মের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠাতা মাহ্‌দীর স্তব গান করে। এইসব সম্মিলনে প্রথমে সকলে বেশ ভক্তিমান ও শান্ত শিষ্ট হইয়া আসে, কিন্তু ক্রমে ভাব লাগিয়া হট্টগোল ও তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া উঠে। এই কীর্ত্তনের পর বামাচারী শাক্তদের ও কোনো কোনো বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতন ইহাদের মধ্যে অবাধ ব্যভিচার ও গুরুপ্রসাদী ধর্ম্মের নামে চলিয়া থাকে। জিক্‌রীদের বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইলে বর যদি দূরদেশে থাকে, তবে মোল্লা কনের সাক্ষাতে একটা মোশকের মধ্যে নিকার মন্ত্র পড়িয়া সেই মোশকটা ফুঁ দিয়া ফুলাইয়া তোলে ও সেই ফোলানো মোশকটা বরের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; বর সেই মোশকের মুখ খুলিয়া মন্ত্র ছাড়িয়া দিলেই বিবাহ সিদ্ধ ও সম্পন্ন হইয়া যায়।

এই রকম অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হইবারই কথা যে দেশে ১০০০০ মুসলমানের মধ্যে মাত্র ৪৭ জন লেখাপড়া জানে; শিক্ষিত লোক ত দেশে নাই বলিলেও চলে; মোল্লারা পর্য্যন্ত শিক্ষিত নয়, ত সাধারণ লোক। সৈয়দদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী লেখাপড়া-জানা লোক (হাজারকরা ১৭ জন) ও ব্রাহুইদের মধ্যে সবচেয়ে কম (হাজারে ৩ জন) দেখা যায়; বালোচদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা হাজারে ৪। ব্রিটিশ-অধিকৃত দেশে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে, করিবার বাকী এখনো অনেক। ১৯১[illegible] সালে ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে ১১৫টি স্কুলে ৪০১৫ জন ছাত্র ও ৪১ মক্তবে ৪৬১ ছাত্র পড়িতেছিল।

সামাজিক অবস্থা।

সাধারণ লোকের প্রায় সকলেই গরিব। সুতরাং তাদের আহার ও বেশ মোটামুটি ধরণের। যারা যাযাবর তাদের পোষাক একটা কোযাই (পশমী কোট), সুতী পাজামা, ও একটা টুপি; আর তাদের খাদ্য জলে বা ঘোলে সিদ্ধ করা জোয়ার বা মাকই (ভুট্টা)। স্ত্রীলোকেরা লম্বা ঘাঘ্‌রা পরে ও মাথায় ঘোম্‌টা দিবার জন্য তাক্‌রাই বা ওড়্‌না ব্যবহার করে। এইসব পোষাক দশ বারো বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত পরে, আর যেখানে যেখানে ছেঁড়ে সেইখানে সেইখানে সেলাই বা তালি লাগায়। যখন সেই পোষাক পচিয়া গা থেকে আপনি খসিয়া পড়ে তখনই তারা তা ছাড়ে, আর সেটা ক্ষেতে বাঁশের গায়ে টাঙাইয়া পশুপক্ষীদের তাড়াইবার ব্যবস্থা করে। অনেকের মাথা গুঁজিবার একটা কুঁড়ে ঘরও নাই; কাহারো খাটিয়া বা প্রদীপ দর্‌কার হয় না। একটা তিন-ঠেঙা কাঠামোর উপর কম্বল বা পচ্‌ (চেটাই) বিছাইয়া তাদের ঘর হয়—যেন বেদের টোল।

সম্পত্তির মধ্যে একটা জাঁতা, জল দুধ ও ঘি রাখিবার জন্য গোটাকত মোশক, একটা কড়াই ও খানকতক কেঠো বা মেটে বাসন। যখন একজায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘর তুলিয়া যাওয়া দরকার হয়, তখন গৃহস্থালির সব সম্পত্তি একটা গাধার পিঠেই বহিয়া লওয়া যায়—গাধাও দরকার হয় না, মেয়েরাই বেশীর ভাগ বোঝা ঘাড়ে করে। ব্রিটিশ অধিকারে যে-সব লোক স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া ঘরবাড়ী ফাঁদিতেছে তাদের খাদ্য ও পোষাকের পারিপাট্য হইতেছে দেখা যায়।

গৃহস্থালির পরিশ্রমের সব কাজ মেয়েদেরই করিতে হয়—বাড়ী ঝাঁট, ময়দা পেষা, দূর দূরান্তর হইতে জল ও কাঠ সংগ্রহ করা, কাপড় কাচা ও সেলাই, রান্না, কাপড় বোনা, পশমের সুতো কাটা, ক্ষেতে ফসল কাটা, শস্য ও ভুষা বাড়ীতে লওয়া, সবই মেয়েদেরই কাজ।

দেশে ধোবা বা নাপিত নাই; পুরুষেরা পরস্পরে পরস্পরকে কামায় আর ছেলেদেরও কামায়।

তাদের দেশেও "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি।" তাদেরও শাস্ত্র বলে "পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে, বার্দ্ধক্যে রক্ষতি পুত্র ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি!" সকল জাতই, বিশেষতঃ পাঠানেরা, স্ত্রীলোককে ঘটীবাটির মতন সম্পত্তি মনে করে, টাকা পাইলেই বা লাভ দেখিলেই তারা মেয়ে বিক্রী করে; অন্যের মেয়ের সঙ্গে মেয়ে বদল করিয়া বিবাহ করে; ক্ষতি বা খুনের দণ্ড স্বরূপ কুমারী মেয়ে—মেয়ে না থাকিলে ভবিষ্যতে যে মেয়ে হইবে তাহাকে—দিবার অঙ্গীকার করিয়া অব্যাহতি লাভ করে। বালোচ ও ব্রাহুই জাতের মধ্যে স্ত্রীলোকের সতীত্বহানির দণ্ড—স্ত্রীলোকটির মৃত্যু ও পুরুষের সেই স্ত্রীলোকের স্বামী বা অভিভাবককে একটি কন্যা দিয়া রফা নতুবা মৃত্যু। যদি স্ত্রীলোকটি পালাইয়া দেশত্যাগ করে বা আত্মহত্যা করে তবেই সে বধ হইতে রক্ষা পায়। বালোচদের মধ্যে কোনো কোনো গোত্রের মেয়েদের এই সর্ত্তে বিবাহ দেওয়া হয় যে সে বিধবা হইলে পুনরায় সে তার বাপমায়েরই সম্পত্তি হইবে ও তারা নিজেদের ইচ্ছানুরূপ তাকে অপরের কাছে বিক্রয় বা বন্ধক বা খেসারতের দাবী মিটাইতে দান করিতে পারিবে।

অধিকাংশ জাতের মধ্যেই মেয়েরা উত্তরাধিকারে সম্পত্তির অংশ পায় না, কেবল শরিয়ৎ বা আইনসঙ্গত খোরপোষ পায়। কুমারী কন্যা বাপের ও বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হইতে কেবল নস্ (খোর্) ও পোষ পায়। যেই সেই স্ত্রীলোক বিবাহ করে অমনি তার সেই খোর্‌পোষের দাবী ঘুচিয়া যায়। পাঠানদের মধ্যে বিধবা আবার বিবাহ করিলে তার নূতন বর স্ত্রীর ছেলে বা অভিভাবকদের দাম দিতে বাধ্য; তবে যদি বিধবার ভাসুর বা দেওর তাকে বিবাহ করে তবে কোনো খেসারতের দাম দিতে হয় না; এদের এরকম বিবাহে প্রণয়ের কোনো মর্য্যাদা বা স্থান নাই।

চ।

স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু *

আজ যে মহাত্মার স্মরণের উদ্দেশ্যে আমরা এই সভায় সমবেত হইয়াছি তাঁহার অভাব শুধু এই প্রদেশে কেন সমগ্র ভারতবর্ষ সমভাবেই অনুভব করিতেছেন। বাঙ্গালী শ্রীশচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপে শুধু বঙ্গদেশ বা এই প্রদেশ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"তে পরলোকগত শ্রীশচন্দ্রের সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন যে "তিনি ধর্ম্মজগতের একজন নিভৃত সাধক, কর্ম্মজগতের অনাড়ম্বর কর্ম্মী, সমাজের প্রচ্ছন্ন সংস্কারক এবং বীণাপাণির নীরব সেবক" ছিলেন। এখনও তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিবার সময় আসে নাই। আমরা এখন তাহার আলোচনা করিবার মাত্র অধিকারী। তাঁহার বিয়োগজনিত শোক আমাদের হৃদয়ে এখনও এত অত্যুগ্র, তাঁহার স্মৃতি আমাদের চিত্তে এখনও এত জাজ্বল্যমান যে তিনি এখনো আমাদের অন্তরের বস্তু হইয়া আছেন। তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া সমালোচনার বিষয়ীভূত করিতে আমরা পারি না। আমরা আমাদের অন্তরের প্রীতি ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতে পারি। তিনি শুধু জ্ঞানবীর বলিয়া নহেন, কর্ম্মবীর

* প্রয়াগে শোকসভায় পঠিত।

বলিয়া নহেন; তাঁহার ভিতরে আন্তরিকতা, সৌজন্য ও অমায়িকতা-বিমিশ্র এমন একটি মধুর ভাব ছিল যে তাঁহার নিকট যিনি একবার গিয়াছেন তিনি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার শিশু-তুল্য সারল্য ও আত্মপর-ভেদ-জ্ঞানের অভাব পরকে আপনার করিয়া লইতে জানিত এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে তাঁহার সংস্রবে আসিলে অপরের আত্মবিস্মৃতি ঘটিত। লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিলে বা তাঁহাকে চিনিতে আসিলে রবিকিরণ-সমক্ষে দীপশিখার ন্যায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িত। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" অথবা "Learn to labour" তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ তাঁহাকে অলস বা কর্ম্মহীন দেখে নাই। তিনি সময়ের দ্বারা জীবনের পরিমাণ করিতেন না, কর্ম্ম ও কর্ম্ম করিবার শক্তি তাঁহার জীবনের পরিমাপক ছিল। উৎসাহগুণ তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিকাশলাভ করিয়াছিল। তিনি কখনও নিরুৎসাহ হইতেন না এবং সেই নিমিত্ত সফলতা তাঁহার অনিবার্য্য ছিল। বাণীর বরপুত্র হইয়াও "উদ্‌যোগী পুরুষ" বলিয়া তিনি লক্ষ্মীর প্রসাদলাভে বঞ্চিত হন নাই। তিনি "আফলোদয়কর্ম্মা" বলিয়া সর্ব্বত্রই বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল সাফল্যের মূলে একনিষ্ঠ সাধনা, প্রণালীবদ্ধ শৃঙ্খলা এবং শ্রদ্ধা ও আস্তিক্যবুদ্ধি নিহিত ছিল। কার্য্য আরম্ভ ও তাহা সমাপ্ত না করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। কোনও কার্য্য আংশিকভাবে করিয়া তাহাকে ফেলিয়া রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। ক্ষিপ্রকারিতা তাঁহার একটি প্রধান গুণ ছিল। আলস্য বা দীর্ঘসূত্রিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষিপ্রকারিতা তাঁহার বুদ্ধিকে অসামান্য তীক্ষ্ণতা প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার মনীষা অপ্রতিহত অকুণ্ঠিতগতি ছিল। কি দর্শন, কি সাহিত্য, কি ভাষাজ্ঞান, কি জ্যোতিষ, কি গণিত সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিভা সমান প্রসার লাভ করিয়াছিল। এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি বাণীর বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন।

আবাল্য তিনি শিক্ষালাভে কৃতিত্ব ও শিক্ষাদানে আগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছিলেন। ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মীরাটে ওকালতি করিবার সময়ে কোন মকদ্দমায় পরলোকগত সার্ সুন্দরলাল মীরাটে গমন করেন। সেই মকদ্দমায় অপর পক্ষে শ্রীশ বাবু ছিলেন। সার্ সুন্দরলাল তাঁহার গভীর আইন-জ্ঞান এবং ব্যবহার পরিচালনার দ্বারা এরূপ প্রীত ও মুগ্ধ হন যে তাঁহাকে মীরাট জেলা কোর্ট হইতে হাইকোর্টে লইয়া আসেন। এইবার শ্রীশবাবু এলাহাবাদে বাস করিবার জন্য আসেন এবং বাদসাইমণ্ডিতে সার্ সুন্দরলালের প্রতিবেশী হয়েন। এই সময়ে তাঁহারা উভয়ে সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ চর্চ্চা করিতে থাকেন ও কঠোপনিষৎ পাঠ করেন ও শ্রীশ বাবু রীতিমত সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দ্যান। তাঁহার আইন অপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থে অধিকতর মনোযোগ দেখিয়া কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানের বাজশ্রবা ঋষির অকর্ম্মণ্য গাভী দানের কথা উল্লেখ করিয়া সার্ সুন্দরলাল তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলিতেন, "Srish, you are giving your lean cows to the profession"। কারণ সার্ সুন্দরলালের বিশ্বাস ছিল যে অনন্যসাধনা না হইলে আইনে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তিনি প্রায়ই বলিতেন "Law is a jealous mistress"। কিন্তু জ্ঞান-পিপাসু শ্রীশচন্দ্রের আইন অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন প্রিয়তর বস্তু ছিল এবং সেই নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে ধাবিত হয়। তাঁহার শ্রুতিপাঠে প্রবল অনুরাগ সঞ্জাত হয়। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে প্রাচীন সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতে হইলে ব্যাকারণশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। সুতরাং শ্রুতি পাঠের পূর্ব্বেই তিনি বৈয়াকরণিক-শ্রেষ্ঠ পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী" আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার কোন সরল পন্থা দেখিতে পান না। তখন তিনি পাণিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য পাণিনির ইংরেজিতে অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং সেই বিষয়ে সাফল্য লাভ করিবার জন্য তৎপূর্ব্বে জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিতপ্রবর বোয়েটলিঙ্কে (Boathlingek) কর্ত্তৃক জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদিত অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার ওকালতিতে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল; তিনি তখন হাইকোর্টে রায়-লেখকেরও কাজ করিতেন। তাঁহার রায়-লেখকের

পদপ্রাপ্তিও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই শর্ট-হ্যাণ্ড শিক্ষা করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে বসিয়া অবসর-কালে তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য জজদের রায় নকল করিয়া লইতেন। কোনও সময়ে সার্ জন্ ষ্ট্রাচি কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখেন এবং নিজের কাম্‌রায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে রায় দিবার সময় আপনি কি লেখেন? তদুত্তরে শ্রীশবাবু তাঁহার গৃহীত লেখা দেখান। তখন সার্ জন্ ষ্ট্রাচি তাঁহাকে উহা পড়িতে বলেন এবং উহার নির্ভুলতা দেখিয়া এত প্রীত হন যে তদ্দণ্ডে তাঁহাকে রায়-লেখক নিযুক্ত করেন।

তাঁহার শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষার নিকট থিওজফিক্যাল সোসাইটিও অনেকটা ঋণী। শ্রীমতী বেসাণ্ট স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীশবাবু যে-কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা অনেক দিক হইতে দেখিতে পারিতেন। তাঁহার এই শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা তাহার এক নিদর্শন। তিনি হিন্দি ভাষার শর্টহ্যাণ্ড আবিষ্কার করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীশবাবুর আইন অপেক্ষা বৈদিক সাহিত্যচর্চ্চা অধিকতর আদরের বস্তু ছিল। তিনি পাণিনি অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে আইন ব্যবসায়ে অবসরের অত্যন্ত অভাব। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এত প্রবল ছিল যে তিনি তাঁহার ব্যবসায়ের সুনাম ও প্রচুর অর্থাগম ত্যাগ করিয়া অবসর পাইবার আশায় মুন্‌সফি চাকরী গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার আয় অনেক সংক্ষেপ হইল, কিন্তু তিনি তাহা আদৌ গ্রাহ্য করেন নাই।

শ্রীশচন্দ্র শিক্ষাদান-কার্য্য অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। লাহোরে শিক্ষাকার্য্য হইতে বিরত হইয়া এলাহাবাদে আসিয়া তিনি পুনরায় শিক্ষাদান-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তাহার ফলে প্রয়াগে Indian Girls' Free High School নামে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সম্বন্ধে এলাহাবাদের হাইকোর্টের মাননীয় বিচারক সার্ জন্ নক্স বলিয়াছেন—

"The man who founded the schools left worthier descendants to perpetuate his name than one who merely left sons and daughters."

বারাণসীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের স্থাপনা হইতে শ্রীশচন্দ্র তাহার সহিত সংস্থষ্ট ছিলেন। তিনি ঐ কলেজের ট্রষ্টিগণের অন্যতম এবং তাহার "কার্য্যকরী সমিতির" একজন বাস্তবিক কার্য্যকর সভ্য ছিলেন। ইদানীং তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমতে সাহায্য করিতে-ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদ ইউনি-ভার্সিটির ফেলো নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞানের যশসৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকট প্রবন্ধাদি মতামত প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইত। হিন্দুশাস্ত্রের জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হাইকোর্টের বিচারকেরাও তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিতেন। বারাণসীতে বিলাত যাত্রা সম্বন্ধীয় মকদ্দমায় তিনি যে রায় দিয়াছিলেন তাহাতে উপরিতন বিচারালয়ে তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় বিখ্যাত ওহাবি কেস্ সম্বন্ধীয় রায়েও তাঁহার প্রগাঢ় গবেষণা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ মকদ্দমা বিচারের জন্য তিনি এতৎসম্বন্ধীয় আরব্যভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি সমগ্র বিশদভাবে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তেহেরান ইস্পাহান ও কায়রো হইতে ভারতবর্ষে দুর্ল্লভ গ্রন্থাদি আনয়ন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বেনারস-কেসে হিন্দুশাস্ত্রের ও ওহাবী কেসে মুসলমানী শাস্ত্রের গভীর আলোচনা তাঁহার সুচারুরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদনে আগ্রহ ও চেষ্টার পরিচায়ক।

বাল্যকাল হইতেই তিনি তিনজন মহাপুরুষকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; যথা—রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সার্ উইলিয়াম্ জোন্স। আজিও ইঁহাদের প্রভাব তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়, তথাপি তাঁহার ব্যক্তিত্বও তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে-সমস্ত মহাপুরুষ জগতের হিতার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীশবাবুর হৃদয়ে জাগরূক থাকিতেন। এবং তাঁহার পূজাগৃহে বুদ্ধ, জোরাষ্টার, যিশুখৃষ্ট প্রভৃতির প্রতিকৃতি বর্ত্তমান থাকিত।

আমি ব্যক্তিগতভাবে সংবাদপত্রের সহিত সংস্থষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী করিতে পারি।

তিনি লাহোরের "ট্রাইবিউন" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রে কিছুদিন সহকারী সম্পাদকও ছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের দিনগুলি কিরূপে অতিবাহিত হইত তাহার একদিনের পরিচয় দিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিতেন ও সেই সময়ে স্নান করিয়া উপাসনায় প্রায় একঘণ্টাকাল যাপন করিতেন। তাহার পরেই তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় নিমগ্ন হইতেন এবং তাহাতে এরূপ তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে যতই কেন নিকটে গোলযোগ হউক না তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ ঘটিত না। এমন কি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কেহ কিছু বলিলেও তাঁহার কানে সে শব্দ পৌঁছিত না। পরে যথাসময়ে তিনি কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং তিনি যতদিন কর্ম্ম করিয়াছিলেন কখনও নিয়মিত সময় অতিক্রম করিতেন না। তাহার পর সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধবের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় কাল-ক্ষেপ করিতেন। সমস্ত দিনই তিনি হয় শিক্ষা দান করিতেন, না হয় গ্রহণ করিতেন।

শ্রীশচন্দ্র সত্যান্বেষণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং ইহাই তাঁহার থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে প্রবেশ করিবার অন্যতম কারণ। সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণে তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি মূল হিব্রু ও গ্রীক বাইবেল, আরবী ভাষায় কোরান, সংস্কৃতে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র ও পালিতে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যখন এলাহাবাদে ধর্ম্মমহাসভার (Convention of Religions) অনুষ্ঠান হয় তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তৎ তৎ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন এবং সেইজন্য তাঁহার সাধুসঙ্গলিপ্সা অতিশয় প্রবল ছিল।

এই অসাম্প্রদায়িক উদারতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা (nationalism) তাঁহার চিত্তে প্রগাঢ়রূপে বিরাজমান ছিল এবং ২১ বৎসর বয়সে Indian National Songs and Lyrics নামে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন।

এরূপ মহাত্মার জীবনী বিশদরূপে আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথাই মনে উদিত হয়, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আর দুই একটি মাত্র কথা উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। তিনি পরলোকে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে আমাদের জন্য কি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের দেখিবার ও শিখিবার বিষয়। তাঁহার উদার মধুর চরিত্রে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, আতিথেয়তা, স্বদেশপ্রেম, জাতীয় ভবিষ্যৎ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান ছিল। তিনি সর্ব্বদাই মনুষ্যের ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। আত্মানুশীলন, পরার্থপরতা ও ভক্তি তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল এবং আজীবন তিনি অধ্যবসায়ের সহিত সেই সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার এই সাধনা নিষ্ফল হয় নাই। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীর জন্য যে কর্ম্মবীরের ও জ্ঞানপিপাসুর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন যদি একজনও সেই পথের পথিক হয়েন তাহা হইলে তাঁহার মহৎ জীবনের আলোচনা আমরা সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

ছিন্ন পত্র।

কর্ম্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাষাণ প্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দ্দিকেই থাকে ঘিরে;
তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে,
পায়না আলো, পায়না বাতাস, পায়না ফাঁকা, পায়না কোনো রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেচে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁশে,
বৃহৎ সর্ব্বনাশে
হারিয়েছিলেম বিশ্বজগৎখানি।
নীল আকাশের সোনার বাণী
সকাল-সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছত না মোর বাতায়ন-দ্বারে।
ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে,
আমার আঙিনাতে
আন্‌ত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।
অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কি যে সে ক্রন্দন
জান্‌ব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সঙ্গোপনে বহন করে' কর্ম্মরথে
সমারোহে চল্‌তেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে।

তিন্‌টে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়্‌তে হ'ত নকল সিংহনাদ ;
আীড্‌ন্ কুঞ্জে মীটিং হ'লে আমি হতেম বক্তা ;
রিপোর্ট লিখ্‌তে হত তক্তা তক্তা ;
যুদ্ধ হ'ত সেনেট সিণ্ডিকেটে,
তার উপরে আপিস আছে, এম্‌নি করে কেবল খেটে খেটে
দিন রাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বন্ধুরা সব বল্‌ত, "কর্‌চ কি এ ?
মারা যাবে শেষে !"
আমি বল্‌তেম হেসে,
"কি করি ভাই, খাটুতে কি হয় সাধে ?
একটু যদি ঢিল দিয়েছি অম্‌নি গলদ বাধে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কি করি তার উপায় বল্‌তে পারো ?"
বিশ্বকর্ম্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার পরেই ন্যস্ত,
অহোরাত্রি এম্‌নি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সে দিন তখন দু' তিন রাত্রি ধরে
গত সনের রিপোর্টখানা লিখেচি খুব জোরে।
বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি
হপ্তা তিনেক মর্‌তে হবে ভোট্ কুড়োতে তারি।
শীতের দিনে যেমন পত্র-ভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা-সার,
আমার হ'ল তেম্‌নি দশা ;
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা ;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
খবর আসে "খাবার তৈরি", নিইনে কথা কানে,
আবার যদি খবর আনে,
বলি ক্রোধের ভরে
"মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া ত থাক্ পরে।"

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হ'ল পাড়া,
আর সকলে শুদ্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখী ছাড়া ;
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
হাতে গেল দিয়ে।
জরুরি কোন্ কাজের চিঠি ভেবে
খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চল্‌চে উঠে নেবে,
নাইক দাঁড়ি কমা,
শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা।
আর হ'ল না পড়া,
মনে হ'ল কোন্ বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া,
চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
এম্‌নি করে কোন্ অতলের মাঝে
হপ্তা তিনেক গেল ডুবে।
সূর্য্য ওঠে পশ্চিমে কি পূবে,
সেই কথাটাই ভুলে গেচি, চল্‌চি এমন জোটে।
এমন সময় ভোটে

আমার হল হার,
শত্রুদলে আসন আমার কর্‌লে অধিকার ;
তাহার পরে খালি
কাগজ পত্রে চল্‌ল গালাগালি।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়্‌ল হাতে,
সেটা নিয়ে কি কর্‌ব তাই ভাব্‌চি বসে আরাম-কেদারাতে ;
এমন সময় হঠাৎ দখিন-পবন ভরে
ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রো এসে পড়্‌ল আমার কোলের পরে।
অন্য মনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়্‌ল চোখে, "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে ?"
মনু ? আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই ?
অম্‌নি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভরে',
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে।
সেই ত আমার অনেক কালের পড়োশিনী,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনি ঝিনি।
সেই ত আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেচে পথহারা ;
সেই ত আমার শিশুকালের শিউলি ফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই ত আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেম্‌নি জেগে ওঠা
অম্‌নি ওদের বাড়ীর পানে ছোটা।
ওরি সঙ্গে সুরু হ'ত দিনের প্রথম খেলা ;
মনে পড়ে, পিঠের পরে চুল্‌টি মেলা
সেই আনন্দ মূর্ত্তিখানি, স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি,
কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি।
অসীম ধৈর্য্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার,
সকল কথায় মান্‌ত মনু হার।
উঠে গাছের আগ্‌ডালেতে দোলা খেতেম জোরে,
ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি করে,
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে,
ভুল্‌তে পারি কি সে ?
মনে পড়ে নীরব ব্যথা তার,
বাবার কাছে যখন খেতেম মার ;
ফেলেচে সে কত চোখের জল,
মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজ্‌ত কত ছল।
আরো কিছু বড় হ'লে
আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া বলে'।
নাম্‌তাটা তার কেবল যেত বেধে,
তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠ্‌ত লাজে কেঁদে।
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরেজি বই দেখে'
ভাব্‌ত মনে গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা।
যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাৎ সোজা।
হেন কালে হঠাৎ সে-বার,
দশমীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার

রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর দরোয়ানে
বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।
তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মনুর বাবার বাধ্‌ল মকর্দ্দমা,
কেউ কাহারে কর্‌লে না আর ক্ষমা।
দুয়ার মোদের বন্ধ হল,
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল,
হঠাৎ এল কোন্ দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জ্জন,
মোর প্রতিমার হ'ল বিসর্জ্জন।
দেখা শোনা ঘুচ্‌ল যখন, এলেম যখন দূরে,
তখন প্রথম শুনতে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
মুখখানি তার উঠ্‌ল ফুটে আঁধার পটে সন্ধ্যা-তারার মত;
একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতখানিই নয়!
প্রেমের শিখা জ্বল্‌ল তখন, নিব্‌ল যখন চোখের পরিচয়।
কত বছর গেল চলে'
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হ'লে।
গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ী কিনেছে কোন পাটের কুঠিয়াল,
হ'ল অনেক কাল।
বিয়ে করে মনুর স্বামী
কোন্ দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।
সেই মনু আজ এত কালের অজ্ঞাতবাস টুটে'
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে?
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি? ক্ষতি সে কি? সে কি অত্যাচার?
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে
হৃদয়-ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে?
ছিন্ন চিঠির বাকি
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে, খুঁজে পাব নাকি?
মনুরে কি গেছ ভুলে?
এ প্রশ্ন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মত!
কত চিঠির জবাব লিখ্‌ব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বলবে বহ্নিশিখা
অক্ষরেতে হবে না আর-লিখা।

(সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ)　　শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চশস্য

মানুষের শিং—

আমেরিকান্ জেনেটিক এসোসিয়েসানের গত অক্টোবর মাসের Journal of Heredity তে Dr. Richard H. Wood শৃঙ্গবিশিষ্ট একটি রমণীর বিষয় লিখিয়াছেন:—

এইখানে প্রকাশিত শৃঙ্গের চিত্রখানি (আসল শৃঙ্গের দ্বিগুণিত আকারে) একটি রমণীর। সেই রমণীর কপালের উভয়পার্শ্বে একই আকৃতির

মানুষের শিং

দুইটি শৃঙ্গ দেখা গিয়াছিল। অপরটি এক বৎসর পূর্ব্বে কাটা হয়। অনেকে বলেন যে তাঁহারা এইরূপ অস্বাভাবিক সৃষ্টির কথা শুনিয়াছেন বটে কিন্তু কখনও দেখেন নাই। ডাঃ রিচার্ড ৩৫ বৎসর ধরিয়া নানারূপ অস্বাভাবিক সৃষ্টি দেখিয়াছেন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এইরূপ শৃঙ্গবিশিষ্ট মানুষ কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমেরিকাবাসিনী জার্ম্মান-বংশোদ্ভব ৭৮ বৎসরের এত বৃদ্ধার কপালদেশে ঐ শৃঙ্গদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। চিত্রের শৃঙ্গটি মাত্র ১৮ মাস পূর্ব্বে ঐ বৃদ্ধার কপালে জন্মিয়াছিল।

শৃঙ্গটি মস্তকের অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত নহে, কপালের চাম্‌ড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াই নাকি উহার উৎপত্তি হয়। একটি ক্ষুদ্র অর্ব্বুদের মধ্য দিয়া কপালের একটি ধমনী হইতে শৃঙ্গের মধ্যে রক্ত চলাচল করিত। রক্ত দ্বারা ইহা এত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল যে যখন ইহা কপাল হইতে কাটিয়া লওয়া হয় তখন ইহা হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়াছিল। ঐ দুইটি ক্ষতচিহ্নের স্থান সদৃশ আকারে মিলিত, ইহা হইতে বুঝা যায় জন্তুদের ন্যায় মনুষ্যেরও শৃঙ্গগুলি Bilaterally Symmetrical অর্থাৎ উভয় দিকেই সুসমঞ্জস।

শ্রীসুষমা সিংহ।

কোন্ বয়সে মানুষ শ্রেষ্ঠ বই লেখে?—

সার্ এডোয়ার্ড ক্লার্ক নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ৩৭ বৎসর বয়সেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ রচনা লিখে। প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক হল কেন্ ইহা আংশিক সত্য বলিয়া মানিয়া

দেখাইয়াছেন যে ৩৭ বৎসর বয়সে নিম্নলিখিত লেখকেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা করেন—

শেক্‌স্‌পীয়ার—হ্যাম্‌লেট।
স্পেন্সার—ফেয়ারী কুইন।
থ্যাকারে—ভ্যানিটি ফেয়ার।
জোলা—ল্‌'আসোমোয়ার (ড্রিঙ্ক)।

কিন্তু আবার দেখা যায় নিম্নলিখিত লেখকেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা করেন ৪৭ বৎসর বয়সে—

স্কট—দি হার্ট অফ্ মিড্‌লোথিয়ান।
ডিকেন্স—দি টেল্ অফ্ টু সিটিজ্।
চার্লস্ রীড্—দি ক্লয়্‌ষ্টার অ্যাণ্ড দি হার্থ্।
হথর্ণ—দি স্কার্লেট লেটার।

অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনাও ৪৭ বৎসরের কাছ ঘেঁসিয়াই হইয়াছে দেখা যায়—

শেক্‌স্‌পীয়ার—৪১ বৎসরে—ম্যাক্‌বেথ।
ফীল্‌ডিং— ৪২ —টম্ জোন্‌স্।
টুর্গেনিভ— ৪৪ —ফাদার অ্যাণ্ড চিল্‌ড্রেন্।
ডুমা— ৪২ —মন্টি ক্রিষ্টো।
টলষ্টয়— ৪১ —আনা কারেনিনা।
কার্লাইল— ৪২ —ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশান্।
মিল্‌টন্— ৪৮ —প্যারাডাইস্ লষ্ট্।

অধিক বয়সেও অনেকের শ্রেষ্ঠ রচনা হইয়াছে দেখা যায়—

রিচার্ডসন্—৫৫—ক্লারিসা হার্লো।
ভিক্তর হুগো—৬০—লে মিজেরাব্‌ল্।

অনেক লেখক যৌবনেও যেমন বার্দ্ধক্যেও তেমনি শক্তির পরিচয় দিয়া গেছেন; যেমন, মেকলে যৌবনে লেখেন "এসে অন্ মিল্টন্", বার্দ্ধক্যের রচনাও তার তুল্যমূল্য; ব্রেক্, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, ইব্‌সেন্, বির্ন্‌র্ণসন্ দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রচনায় সমান শক্তির পরিচয় দিয়া গেছেন।

আবার কবিত্বশক্তির বিকাশ খুব অল্প বয়সেই হইতে দেখা যায়। কীট্‌স্ ২৪ বছরেই অমর রচনা রাখিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করেন; শেলী বায়রন, বার্ণ্‌স্ যৌবন উত্তীর্ণ হন নাই। আবার টেনিসনের "ক্রসিং দি বার" তাঁর সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোট কবিতা।

সুতরাং প্রতিভা বিকাশের কোনো ধরা বাঁধা বয়স নাই; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবেষ্টন, জীবনের সঙ্গে পরিচয় প্রভৃতির উপর লেখকের কৃতিত্ব নির্ভর করে।

মানুষ কতরকম চাম্‌ড়ার জুতো পরে?—

আগে কাঠের খড়ম ছিল, জুতার চলন হইলে গোরুর চাম্‌ড়ার জুতোই হইত। তারপর মোষ বাছুর ছাগলের চাম্‌ড়া চলিল। এখন বাজারে বাঘ, হরিণ, কুমীর, গোসাপ ও সাপের চামড়ার জুতারও অভাব নাই। কিন্তু য়ুরোপ আমেরিকায় তিমি, কড মাছ, হাঙর, সিন্ধু-ঘোটক, অষ্ট্রিচ পাখী, সমুদ্র-সিংহ এবং এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত জুতার জন্য নিজেদের চাম্‌ড়া জোগাইতেছে। বিভিন্ন জন্তুর চাম্‌ড়া কোমলতায় ও রঙে বিভিন্ন হয়; কোনো কোনো চাম্‌ড়ার গায়ে নানা দানা বা ফুটি ফুটি দাগ থাকে; এইসবের জন্যই বিভিন্ন জন্তুর চাম্‌ড়ার আদর বাড়িতেছে।

সূর্য্যের নির্ব্বাণ—

সূর্য্য বা তারা নভোমণ্ডলে অনেক আছে; প্রত্যেকেরই একটি করিয়া সৌরজগৎ আছে, যার উপর তার আধিপত্য। অনেক তারা আমাদের সূর্য্যেরই মতন এক একটি সূর্য্য, তারাও গ্রহাধিপতি। সূর্য্যের বা তারার যত বয়স হয়, তত তারা সঙ্কুচিত হয় ও উপরে ঠাণ্ডা ও ভিতরে বেশী গরম হইতে থাকে। আমাদের সূর্য্যের বয়স ঢের হইয়াছে। তরুণ তারার বর্ণ শ্বেত—গরম গ্যাস পিণ্ড পাকাইয়া যখন স্বতন্ত্র হইয়া উঠে তার পর কয়েকশত কোটি বৎসর পর্য্যন্ত তার ঐ তারুণ্য থাকে। প্রৌঢ় বয়সে তার রং হয় হলদে, আর বার্দ্ধক্যে হয় লাল; সেই বয়স মানুষের পরমায়ুর হিসাবে অনন্তকাল বলিয়াই মনে হইবে। বৃদ্ধ সূর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া ঘন ও আন্তরিক প্রতপ্ত হইতে হইতে একদিন ফাটিয়া আবার বাষ্পাকার নীহারিকায় পরিণত হয়। সূর্য্য-শরীর কতখানি সঙ্কুচিত হয় তারও একটা আন্দাজ দেওয়া যায়।—আমাদের পৃথিবী হইতে আমাদের সূর্য্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে এখন। এক সময়ে সূর্য্যশরীর এই ব্যবধান জুড়িয়া ত ছিলই, হয়ত আরো দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এখন তার শরীর দুই দিকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল বেশী ঘন হইয়াছে। এই দারুণ চাপের তাপে বৃদ্ধ বেচারার ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম যে হইয়াছে তাতে আর সন্দেহ নাই। তার উপর আবার আমাদের সূর্য্য পরিবর্ত্তনীয় তারা (variable star) শ্রেণীর, এবং এই শ্রেণীর তারার ফাটিয়া যাইবার কথা।

আমাদের সূর্য্য ফাটিয়া গেলে আমাদের দশা কি হইবে? সূর্য্যের শরীরের উপরকার স্তরে একটু ঢেউ খেলিলে (যাকে সৌর কলঙ্ক বলে) ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে পৃথিবীর বিদ্যুতের কারখানা বিকল হয়; যখন সূর্য্য ফাটিয়া পাথর লোহা প্রভৃতি কঠিন সামগ্রীও তাতে বাষ্প হইয়া যাইবে তখন যে আমাদের ধরণীর ধৈর্য্য কতখানি টলিবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। হয়ত পৃথিবী ও অপর গ্রহ উপগ্রহ জোনাকীর মতন একবার জ্বলিয়া উঠিয়া সেই বাষ্প-সমুদ্রে গলিয়া মিশিয়া যাইবে।

কিন্তু আপাততঃ আমাদের ভয় পাইবার কারণ নাই। আমাদের ছাপান্ন পুরুষ পরের বংশধরেরাও নিশ্চিন্তভাবে ধরণীর পৃষ্ঠে বিচরণ করিতে থাকিবে।

মাকড়্‌সা ও মাছি—

কীটতত্ত্ববিদেরা অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন যে মদ্দা মাকড়্‌সা বড় বোকা ও ঢিমে হয়; তারা প্রায়ই শিকার ধরিয়া কাবু করিতে পারে না। মাদি মাকড়্‌সা শিকার ধরিতে ওস্তাদ। মাদি যেমন করিয়া ফাঁদ পাতিয়া মাছি ধরিতে পারে মদ্দাটি তেমন পারে না। মদ্দাগুলো ভারী অসহিষ্ণু অধৈর্য্য ও ছট্‌ফটে হয়; এইজন্য তারা মন দিয়া জাল বুনিতে বা শিকারের জন্য যথেষ্ট সময় ওত পাতিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। মাকড়্‌সাদের মধ্যেও কেউ কেউ তার স্বজাতির মধ্যে খুব চালাকচতুর হয়। মাদিরা সাধারণত নিষ্ঠুর ও কঠোর হইয়া থাকে। মাদি কোনো শিকার ধরিলে মদ্দাটা গিয়া কাড়াকাড়ি লাগায়। কোনো কোনো জাতের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ, কোনো কোনো জাত মুখের কাছের মাছিও দেখিতে পায় না।

অন্ধের ইন্দ্রিয়—

লোকের বিশ্বাস যে অন্ধের দৃষ্টিহীনতা তার অপর ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণ বোধের দ্বারা সম্পূরণ হয়। এ কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু দৃষ্টিহীন হয় বলিয়াই অন্ধের অপর ইন্দ্রিয় আপনা-আপনি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে না; সে অভ্যাসের দ্বারা শ্রুতি ও স্পর্শশক্তিকে তীক্ষ্ণ করিয়া দৃষ্টিহীনতার অভাব কতকটা সম্পূরণ করিতে চেষ্টা করে। এই যে বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা তা দৈহিক অপেক্ষা মানসিকই বেশী—স্পর্শের স্মৃতি তাকে

শীঘ্র অনুভব করায়, কেবলমাত্র স্পর্শবোধ নয়। যাদের দৃষ্টিশক্তি আছে তারা স্পর্শের ছবিকে শীঘ্র দৃষ্টির ছবিতে বদল করিয়া লয়; এই জন্য দৃষ্টিসম্পন্নের স্পর্শছবি বেশ স্পষ্ট হইবার অবকাশ পায় না। কিন্তু দৃষ্টির অভাব ঘটিলে স্পর্শছবি দিয়াই কাজ সারিতে হয় বলিয়া সেই ছবি মনের মধ্যে অভ্যাসের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপে অন্ধের মস্তিষ্কে বহু নূতন ছাপ পড়িয়া স্পর্শানুভূতির একটি মিউজিয়াম তৈয়ারি হইয়া উঠে। এইজন্যই অন্ধেরা শুধু স্পর্শবোধের দ্বারা মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে। অল্পবয়সী অন্ধরা এই শক্তি আরো শীঘ্র অর্জ্জন করে। অন্ধ ব্যক্তির যদি শিক্ষা ও জ্ঞানবুদ্ধি প্রখর থাকে তবে সে তার এক ইন্দ্রিয়ের অভাব স্পর্শ ও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা ও মননশক্তির জোরে পূরণ করিতে সহজেই পারে। সুতরাং অন্ধকে শিক্ষা দিয়া তার জ্ঞানবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তার ইন্দ্রিয়ের অভাব পূরণে সাহায্য করা উচিত।

মৌমাছি পালনের উপকারিতা—

মৌচাক লাগাইয়া ব্যবসা করিতে পারিলে মধু ও মোম পাওয়া ত যায়ই, চাষেরও সুবিধা হয়। মৌমাছিরা ফুল হইতে অন্য ফুলে পরাগ নিষেকে সাহায্য করে। আমেরিকার একটা পিচফলের বাগানের মালিক বাগানে একটা মৌচাক লাগাইয়াছিল; ফসলের সময় সেই বাগানের ফলন আশাতীত বেশী হইয়াছিল, কিন্তু অন্য বাগানে যত ফুল ফুটিয়াছিল তত ফল ধরে নাই। আমেরিকার কমলালেবু ও আপেল ফলের বাগানের মালিকেরা মৌচাক লাগাইয়া প্রচুর ফল উৎপন্ন করিতেছে। যে বাগানে আগে ১৩ টন চেরী ফল ফলিত, সেখানে মৌচাক লাগাইয়া এখন ৩৯ টন ফল পাওয়া যাইতেছে—আগের তিন-গুণ বেশী। বিলাতী বেগুনের ক্ষেতেও মৌমাছির কৃপায় ফলন বেশী হইতেছে। শশা, স্কোয়াশ, তরমুজ, লাউ ও কুমড়ো, আঙুর, জাম, কুল, পীয়ার বা নাশপাতি প্রভৃতি সকল রকম ফলের ক্ষেতে বা বাগানে মৌমাছি লাগাইয়া প্রচুর ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে। নিউ-জীলাণ্ডে গোলমরিচের চাষ হইতেছিল না; তারপর ১৮৮৫ সালে প্রথম ক্ষেতে মৌচাক বসাইয়া চাষে ফলন হয়। এখন বছরে লক্ষ লক্ষ টন গোলমরিচ সেখানে উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের দেশের কৃষকদেরও এই সহজ উপায় অবলম্বন করা উচিত।

চ।

দেশের কথা

কাপড়ের অভাবই এখনো প্রধান দেশের কথা হইয়া আছে। বহু স্থানে কাপড় চুরি ও কাপড় লুটের খবর আমরা পাইয়াছি; একটি আত্মহত্যার খবরও আমরা পাইয়াছি—

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা—"নোয়াখালী-সম্মিলনীতে" প্রকাশ,—আজ কয়েকদিন হইল নলচিরার অন্তর্গত ফজর আলী মোল্লার বাড়ীতে আছলাম নামক একব্যক্তির স্ত্রী বস্ত্রাভাবে গৃহের বাহির হইতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।

—২৪-পরগণা-বার্ত্তাবহ।

বস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্য ময়মনসিংহের কার্পাস-সমিতি ও বরিশালের বস্ত্রসাহায্য-সমিতি যথেষ্ট উদ্‌যোগের সহিত উত্তম কার্য্য করিতেছেন; তাঁহাদের দৃষ্টান্ত প্রত্যেক জেলায় অনুসরণ করা উচিত। এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্য অনেকে ব্যক্তিগত ভাবেও চেষ্টা করিতেছেন, তাঁদেরও দৃষ্টান্ত অপরের অনুসরণীয়।

স্কুলে তাঁত। শুনিলাম নবরিয়া ইংরাজি স্কুলে তাঁতের প্রতিষ্ঠা জন্য হেড মাষ্টার মহাশয় চেষ্টা করিতেছেন।—মালদহ-সমাচার।

কালিয়াচক মডেল স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় পরম উদ্যোগ সহকারে নিজে তাঁত কিনিয়া বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিতেছেন। লাজ মান ত্যাগ করিয়া এইরূপ সকল স্কুলেই যদি একাধিক তাঁত চালাইতে পারা যায় এবং ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তদেবেতরে জনাঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকাস্তদনুবর্ত্ততে॥" অর্থাৎ সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন ইতরজনেরা সেই আচরণ অনুকরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ সহকারে বুঝাইয়া দেন, ইতরজনেরা তাহাই মানিয়া চলে। এক্ষেত্রে হেড্ মাষ্টার মহাশয় অগ্রণী হইয়াছেন ভালই হইয়াছে। তাঁহার প্রস্তুতীকৃত বস্ত্র দেখিয়াছি মন্দ হয় নাই। উনি নিজের তৈয়ারী হাফ্ প্যাণ্ট, গেঞ্জি ব্যবহার করিতেছেন। আশা করি অন্যান্য শিক্ষকগণ ছাত্রসহ ইহাতে লিপ্ত হইবেন।—গৌড়দূত।

অভিনব পরিধেয়:—অভাবে উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই দেশব্যাপী বস্ত্রসঙ্কটের সময় আমরা তাহারই একটি নূতন দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিলাম। ওসমান মালের বাড়ী বাবুগঞ্জ থানার এলাকাধীন ঠাকুরমল্লিক গ্রামে। সে ছালার চট দ্বারা লুঙ্গী, অঙ্গাবরণ এবং টুপি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অভিনব পোষাকে লজ্জা নিবারণ করিয়া সে হাটে বাজারেও চলা ফেরা করিয়া থাকে। আমাদের দেশের রাজপুত্র বৃক্ষবল্কল পরিধান করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। আমাদের জাতীয় জীবনের বানপ্রস্থের সময় আসিয়াছে কি? বস্ত্রসঙ্কট প্রশমিত করিবার জন্য সহরে সভা সমিতি, আন্দোলন আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতি কতই হইতেছে। এই-সমস্ত কার্য্য জয়যুক্ত করিবার জন্য পল্লীগ্রামে কোন প্রচেষ্টার নিদর্শনই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সহরের কার্য্যপ্রণালী গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত না হইলে তাহা সফল হইবে কি করিয়া?—বরিশালহিতৈষী।

"নায়ক" প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যদি তিন মাস সকলে একজোট হইয়া কাপড় কেনা একেবারে বন্ধ করিতে পারি তবে অতিরিক্ত লাভের লোভী মাড়োয়ারী ব্যবসাদারেরা কাপড়ের দাম কমাইতে বাধ্য হইবে।

এই উপায় সমীচীন, ও অবলম্বন করিয়া পালন করা কঠিনও নহে; ইহার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু দেশে উদ্‌যোগী কর্ম্মীরই যে একান্ত দুর্ভিক্ষ, আমরা যে সকল শক্তির কাঙাল হইয়া বসিয়া আছি। এই বিড়ালের গলায় ঘণ্টা কে বাঁধিবে?

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্‌যোগী হইয়া বাঁকুড়া জেলার কেঞ্জীকুড়া ছাতনা গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রামানুজ কর একটি "আধ্‌লা ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁর আদর্শ—

বোম্বাই প্রদেশে আন্তাজী দামোদর কেল স্থাপিত "পয়সা ফণ্ড"। সাধারণের নিকট দুই এক আনা সাহায্য লইয়া কিরূপ বৃহৎ কারখানা চালান যায়, কেল মহাশয়ের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতশাসনের প্রস্তাবিত নূতন ব্যবস্থা।

ভারতসচিব ও বড়লাট ভারতশাসনের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিলাতী গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহা গত ৮ই জুলাই ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

রিপোর্টটি সাড়ে তের ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে আট ইঞ্চি চৌড়া, এবং ১৮৫ পৃষ্ঠা পরিমিত। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৬২ পংক্তি লেখা আছে। এতবড় একটি জিনিসের সম্যক্ সমালোচনা করিবার জন্য দৈনিক কাগজে প্রতিদিন একটি করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেও অন্ততঃ দুই সপ্তাহ সময় লাগিবে। মাসিক কাগজে ইহার ভাল করিয়া সমালোচনা করা সহজ নয়। বাংলা কাগজে সমালোচনা করা আরো একটি কারণে কঠিন। রিপোর্টের যে-সব কথার সমালোচনা করা হইবে, তাহা শুধু ইংরেজীতে উদ্ধৃত করিলে, যাঁরা কেবল বাংলা জানেন, তাঁরা বুঝিবেন না; পক্ষান্তরে কেবল বাংলা অনুবাদ দিলে অনুবাদ ঠিক্ হইয়াছে কি না তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে। মূল ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ দুই দিতে গেলে সময়ও লাগে, জায়গাও অনেকটা যায়; এইসব নানা কারণে আমরা বিস্তৃত সমালোচনা না করিয়া মোটামুটি কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমাদের অনুরোধ এই যে কেবলমাত্র আমাদের কথার উপরই নির্ভর করিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, স্বয়ং চিন্তা করিয়া দেখিবেন; সেই জন্য মূল রিপোর্টখানি, যাঁহারা পারেন, সকলেরই পড়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষায় ইহার অনুবাদ অবিলম্বে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ, অতি সংক্ষিপ্ত যে চুম্বক ইংরেজী ও কোন-না-কোন দেশীভাষায় দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না।

ভিক্ষুকের স্বভাব ত্যাগ, শ্রেষ্ঠ সেবা।

অনেকের মনের ভাব যেন এইরূপ, যে, ভারতশাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে-কোনো অধিকার বা তথাকথিত অধিকার দিবেন, তাহাই লওয়া ভাল; কেন না, বেশী ওজর আপত্তি করিলে, চাই-কি তাঁহারা কিছুই না দিতে পারেন। ইহা ভিক্ষুকের ভাব। আমরা কি চাই, তাহা বলা ভিক্ষা নয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যা দিতে চান, তৎসম্বন্ধে মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া বলিতে যে-ভীরুতা বাধা জন্মায়, তাহা ভিক্ষুকের স্বভাব ভিন্ন আর কিছু নয়। কারণ, আমরা বাস্তবিক যাহার যোগ্য, তাহা হইতে বঞ্চিত আমাদিগকে কেহই রাখিতে পারে না; বিধাতার নিয়মে তাহা আমরা পাইবই। প্রত্যেক মানুষই নিজের প্রতিবেশীর, নিজের দেশের ও মানবজাতির সেবা করিতে অধিকারী। এই অধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না। একভাবে সেবার অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিলে, সে অন্যভাবে সেবা করিতে পারে। সেবার সব পথ রুদ্ধ করিয়া দিলে মানুষ সেবার অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার দুঃখ স্বীকার, এমন কি প্রাণপর্য্যন্ত পণ, করিতে পারে। যাহার প্রকৃতিতে যথেষ্ট পরার্থপরতা আছে, তাহাকে ভিক্ষুক হইতে হয় না। যাহার পরার্থপরতা নাই, সে দেশসেবক হইতে পারে না।

গবর্ণমেণ্ট যা-কিছু দিতে চাহিতেছেন তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ না করিলে, এবং তাহা সমালোচনা করিবার সময় বহুৎ বহুৎ সেলাম ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ পুরঃসর সমালোচনার কাজ আরম্ভ না করিলে, গবর্ণমেণ্ট চটিয়া আমাদিগকে কিছুই দিবেন না, এই ভিক্ষুকোচিত ভয়ের দ্বারা চালিত হওয়া কাপুরুষতা হইবে। যে বাহিরে স্বাধীন হইতে অর্থাৎ বাহিরের রাষ্ট্রীয়-বাধামুক্ত হইতে চায়, তাহাকে আগে ভিতরের বাধামুক্ত হইতে হইবে।

তাহাকে ভিক্ষুকের স্বভাব ছাড়িতে হইবে ; তাহাকে 'আমি স্বাধীন ও স্বাধীনতার উপযুক্ত' এই মজ্জাগত বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইতে হইবে ; যে যাহার যোগ্য তদুপযুক্ত অধিকার সে বিধাতার নিকট পাইবেই, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে।

আমরা কি চাই? জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব চাই। যে নিজেকে মানুষ বলিয়া সম্মান করিতে পারে না, যে মনে করে যে তাহার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ অন্য মানুষের কৃপার উপর নির্ভর করে, তাহাকে বাহির হইতে কেহ আত্ম-কর্তৃত্ব দিতে পারে না। আত্মকর্তৃত্বের খোসাটা যদি বা কেহ দেয়, তাহা হইলেও সে তাহা রাখিতে পারিবে না। আর যে জানে যে সে স্বাধীনতার যোগ্য, যে নিজেকে মানুষ বলিয়া সম্মান করিতে পারে, তদ্দ্বারাই তাহার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ বিধাতার নিয়মে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, মানুষ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

বিধাতার দিকে না তাকাইয়া শুধু মানবীয় ভাবেই ভারতশাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব-সকলের আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কেবল অনুগ্রহ করিয়া কিছু দিতে চাহিতেছেন না। তাঁহাদের নিজের গরজ আছে। সে গরজ দু-রকমের। (১) তাঁহাদের মিত্র-জাতিসকলকে দেখান যে তাঁহারা পৃথিবীতে স্বাধীনতা গণতন্ত্র আদির প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ যে ঘোষণা করিতেছেন, তদনুসারে নিজেদের সাম্রাজ্যেও কাজ করিতেছেন। (২) ভারতীয় লোকসকলকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে যুদ্ধজয়ের জন্য যথেষ্ট সাহায্য লাভ করা। ইহা মনে রাখিলেও ভিক্ষার ভাব কতকটা প্রশমিত হইতে পারে।

ভারতপ্রবাসী কোন কোন ইংরেজ সম্পাদক বলিয়াছেন এবং ইহা বোধ হয় ইংরেজ আমলাদেরও হৃদ্গত ভাব, যে, ভারতীয় লোকদের বুঝা উচিত যে তাহারা গবর্ণমেণ্টের দানে সন্তোষ প্রকাশ না করিলে কিছুই পাইবে না; কারণ, ভারতবর্ষের সাহায্য অপেক্ষাও আয়ার্ল্যাণ্ডের সাহায্য পাওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে আবশ্যক, তথাপি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আইরিশ হোমরূল বিল এখন স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থার এক্ষেত্রে সাদৃশ্য নাই। সেখানকার হোমরূল বিলের স্থগিত থাকার প্রকাশ্য কারণ শিন-ফেন দলের বিদ্রোহ-চেষ্টা ও শত্রুর সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করা। ভারতে শিন-ফেনের মত শক্তিতে ও জনসংখ্যায় প্রবল কোন দল নাই, এবং তাহাদের মত বিদ্রোহচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্রও এখানে হয় নাই। তা ছাড়া আয়ার্ল্যাণ্ড হোমরূল না পাইলেও, বর্ত্তমান অবস্থাতেও ব্রিটিশসম্রাজ্যের সমুদয় রাষ্ট্রীয় অধিকারে আইরিশরা ইংরেজদের ঠিক সমান অধিকারী। আমাদের সে-সব অধিকার কিছুই নাই। আয়ার্ল্যাণ্ড হোমরূল না পাইলেও তাহার ব্রিটিশ সম্রাজ্যকে আপনার জিনিস মনে করিবার যে সব কারণ আছে, ভারতবর্ষের তাহা নাই। ভারতবর্ষকে হোমরূল দিলে তাহা হইতে পারে। অতএব, ভারতবর্ষকে বন্ধু ও অংশীদারের পদে উন্নীত করিয়া তাহার আন্তরিক অনুরাগ ও সাহায্য পাওয়া যদি ইংলণ্ডের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভারতীয় লোকদিগকে হোমরূল দিতে হইবে।

আসল কথাটা এই। খাঁটি-স্বদেশপ্রেমিক যাঁহারা তাঁহারা চান দেশের সেবা করিতে। রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলে সে সেবার ক্ষেত্র ও সুযোগ বাড়ে। সুতরাং তাহা পাইবার চেষ্টা আমরা অবশ্যই করিব। (অবশ্য রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের চেষ্টার ইহাই একমাত্র কারণ নহে।) কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকার না পাইলেও আমাদের সেবা করিবার নানা ক্ষেত্র ও উপায় আছে। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগকে এমন কিছু দিতে চান, যাহাতে বাস্তবিক সেবার অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং সেবার সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত ক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে না, অধিকন্তু যাহাতে রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ হইবে, ইংরেজ কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা বাড়িবে, আমরা তাহাদের যথেচ্ছাচারিতা দমন করিতে পারিব না, প্রাদেশিক ও সমগ্রভারতীয় কোন বিষয়েরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ও নিশ্চিত আমাদের আয়ত্তাধীন হইবে না, এবং যাহা দ্বারা ভবিষ্যতে কাহারও বিনা অনুগ্রহে ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা সম্পূর্ণ স্বরাজ পাইব না, তাহা হইলে তাহাতে সম্মতি দিয়া ও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমরা কেন আমাদের ভবিষ্যতের পথে কাঁটা দিব?

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের মূলনীতি সম্বন্ধে আপত্তি।

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে না হইলেও একটি মূলনীতিতে ও অংশতঃ মিঃ কার্টিসের প্রস্তাবের মত।

গবর্ণমেণ্ট ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে আমরা আত্ম-কর্ত্তৃত্বের অযোগ্য। অতএব, ভারতগবর্ণমেণ্টের উপর আমাদের এখন যেমন কোন ক্ষমতা নাই, প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতেও তেমনি থাকিবে না; কেবল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা বৃহত্তর করিয়া এবং উহাতে নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা ও অনুপাত বাড়াইয়া আমাদিগকে সমগ্রভারতীয় কাজে গবর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব-বিস্তার (influence) করিবার অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইবে, কিন্তু সামান্যভাবেও ভারতগবর্ণমেণ্টকে আমাদের ইচ্ছামত চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে না। প্রাদেশিক প্রধান প্রধান বিষয়েও আমাদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, উহার কর্ত্তা হইবেন গবর্ণর ও মন্ত্রীসভা (যাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন মাত্র দেশীসভ্য, এবং গবর্ণর ছাড়া, দুই বা তিনজন ইংরেজ কর্ম্মচারী থাকিবেন)। অপ্রধান কি কি বিষয়ে আমাদের ক্ষমতা থাকিবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তাহা এক কমিটি দ্বারা স্থির হইবে। ঐ কমিটিতে ইংরেজ সভ্যের সংখ্যা বেশী এবং গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত দেশী সভ্যের সংখ্যা কম হইবে। যে-সব অপ্রধান বিষয়ে আমাদের ক্ষমতা থাকিবে, সে ক্ষমতাও সম্পূর্ণ নহে। গবর্ণর সে-সব বিষয়েও তাঁহার প্রয়োজন-মত নিজে বা গবর্ণর-জেনারেলের দ্বারা আইন করাইয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, রাষ্ট্রের সব রকম কাজ দুভাগে বিভক্ত করিয়া অপ্রধান একভাগের ভার প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের মধ্য হইতে গবর্ণর দ্বারা মনোনীত মন্ত্রীদের উপর প্রদান এবং প্রধান অন্য ভাগের ভার বিদেশী গবর্ণর ও বিদেশী প্রধান মন্ত্রীসভার হস্তে রক্ষণরূপ এই শাসনপ্রণালী কখনও কোন দেশে প্রচলিত ছিল না, এবং এখনও নাই। এই প্রণালীর মূলনীতিটাই অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত।

আমরা যত স্বশাসকদেশের শাসনপ্রণালীর কথা অবগত আছি, কোথাও এরূপ ভাগাভাগি করিয়া দেশের লোকদিগকে ক্ষমতা-হিসাবে-অপ্রধান কাজ দিয়া বিদেশী প্রভুদিগের হাতে আসল প্রভুত্ব রক্ষিত হয় নাই। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যে আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইয়াছে, তাহা তাহারা এই-রকম টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া পায় নাই; ফিলিপিনোরাও আমেরিকানদের নিকট হইতে এইরূপ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ক্ষমতা পায় নাই।

সব দেশেরই রাষ্ট্রীয় উন্নতির সমস্যাটি একটি সমগ্র অখণ্ড সমস্যা। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ, অঙ্গ, বা বিভাগ আছে বটে; কিন্তু সবগুলিরই পরস্পরের সঙ্গে যোগ আছে। একদিকে উন্নতি অন্যসব দিকে উন্নতির উপর নির্ভর করে। এইজন্য আমরা রাষ্ট্রীয়-উন্নতির সমস্যাটি সমগ্র ও অখণ্ডভাবে আয়ত্ত করিয়া, সমস্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, কাজে প্রবৃত্ত হইলে, তবে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, এবং আমাদেরও রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতার অবাধ এবং পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। এইভাবে সমগ্র সমস্যাটি একই কর্ত্তৃপক্ষ আয়ত্ত করিয়া, কোন্ দিকে কত শক্তি প্রয়োগ ও কত অর্থব্যয় করিতে হইবে, স্থির করিলে, সুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্রীয় কাজ হয়। কিন্তু কয়েকটি অপ্রধান বিষয়ের ভার আমাদের উপর এবং বাকীগুলির ভার ইংরেজ আমলাসমষ্টির উপর থাকিলে, সমগ্র সমস্যাটি না আমরা ভাবিব, না তাঁহারা ভাবিবেন। কি নীতি অনুসারে কোন্ কোন্ বিভাগে রাজস্বের কত অংশ ব্যয় হইবে, তাহাও দেশবাসীর নির্ব্বাচিত একই কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা নির্দ্ধারিত না হওয়ায় সব বিভাগগুলির প্রতি অপক্ষপাত সমদৃষ্টি থাকিবে না; আমাদের হাতের বিভাগগুলি এখনকার মত কম টাকাই পাইতে থাকিবে। রাষ্ট্রীয় সমগ্রসমস্যাটি আমাদিগকে আয়ত্ত করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে না দেওয়া সুপরামর্শ নয়। একটা মানুষের দেহের উন্নতি করিতে হইলে এক বা একাধিক চিকিৎসক সমগ্র দেহের কথা ভাবিয়া এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া ব্যবস্থা করেন। একজন পায়ের আঙুল, আর-একজন নাসিকাগ্র, তৃতীয় চিকিৎসক হাতের নখের চিকিৎসা করিলে, এবং তাহাদের নিকট দায়ী নহে এমন অন্য কয়েকজন চিকিৎসকের উপর চুল,

দাড়ী, উদর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, বাহু, প্রভৃতির কল্যাণের ভার দিলে, ব্যবস্থাটা খুব সমীচীন হয় না।

মানুষের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মত দেশের শাসন-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক আছে। পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত সমুদয় যন্ত্রটি চলিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাবিয়া দেখুন পুলিসের সাহায্য প্রায় আর-সব বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকেই লইতে হয়। পুলিসের উপর আমাদের নিশ্চয়ই কোন হাত থাকিবে না; খাজ্‌নার উপরও না। কেহ যদি তাহার হাত-পা'কে বলে, "হে হাত-পা, তুমি খুব কাজ কর, কিন্তু পেটের সাহায্যে পুষ্টি পাইবে না," তাহা হইলে কেমন ব্যবস্থা হয়? সম্ভবতঃ আমাদের উপর কেবল প্রাথমিক ও প্রবেশিকা-শ্রেণীর নীচের শিক্ষার ভার থাকিবে, উচ্চতর শিক্ষার ভার থাকিবে না। অর্থাৎ দেশের মানুষ গড়া যায় প্রধানতঃ যে শিক্ষা দ্বারা, বলিতে গেলে যাহা দেশের মস্তিষ্ক-যন্ত্র প্রস্তুত করিবে, তাহাতে আমাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না। মস্তিষ্কটা প্রকৃতিস্থ, সুস্থ, সবল, আত্মবশ না হইলে শরীরের কাজ ভাল করিয়া চলে কি? আমরা দেশের যে-সব ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের দ্বারা স্বরাজ পূর্ণাঙ্গ করিব, দেশকে ধর্ম্মে সাহিত্যে বিজ্ঞানে শিল্পে দর্শনে উন্নত করিব, তাহাদিগকে ঠিক সেই কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া দিবে অন্য সেইসব লোকে যাহারা এপর্য্যন্ত আমাদের উন্নতির জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা কখনও দেখায় নাই, ইহা কি মানবচরিত্রজ্ঞ ব্যক্তি আশা করিতে পারেন?

কেবলমাত্র যদি শিক্ষার ভারই আমরা পাই, তাহাও সহ্য হয় এবং তাহা হইতেও আমরা দেশের কিছু পূর্ণাঙ্গ সেবা করিবার চেষ্টা করিতে পারি যদি পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার ভার সবটা আমরা পাই। শিক্ষার নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তরে ধাপে ধাপে ছাত্রেরা উঠিতে পারে, এবং সকল স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রণালীতে একটা সামঞ্জস্য থাকে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। ইংলণ্ডের নূতন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার ফিশার ইংলণ্ডের সমগ্র শিক্ষাপ্রণালীকে পূর্ব্বাপেক্ষাও এক লক্ষ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অভিমুখীন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশে নিম্ন ও উচ্চশিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের অধীন হইলে এরূপ করা যাইবে না। নিম্নশিক্ষাকে বাধ্য হইয়াই উচ্চশিক্ষার অনুবর্ত্তী করিতে হইবে, এবং উচ্চশিক্ষায় আমাদের কর্তৃত্ব না থাকায় ও বিদেশীর কর্তৃত্ব থাকায়, তাহা আমাদের জাতীয় পূর্ণাঙ্গ সাধনায় সিদ্ধিলাভের অনুকূল হইবে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ গড়া। আমরা শিক্ষার ভার পাইলে লোকহিতৈষী, পরার্থপর, স্বার্থত্যাগী, সেবাপরায়ণ, সাহসী মানুষ গড়িতে চাহিব। কিন্তু পুলিসের গোয়েন্দার প্রাবল্যে স্বার্থপর নীচাশয় কাপুরুষদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অধিকতর নিরাপদ হওয়ায়, আমাদের চেষ্টায় বাধা পড়িবে। এই বাধা দূর করিবার ক্ষমতা আমাদের চাই। অর্থাৎ শিক্ষা ও পুলিস উভয় বিভাগেই আমাদের কর্তৃত্ব চাই। কিন্তু তাহা আমরা পাইব না।

আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত অপ্রধান যে কয়েকটি বিভাগের ভার দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে আমরা যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে বহু বৎসর পরে আরো কোন কোন বিষয়ের ভার পাইব; এই-প্রকারে সব বিভাগের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে আসিতে পারে, এইরূপ বলা হইতেছে। যত বেশী বিভাগের ভার আমাদের হাতে আসিবে, মোটের উপর ইংরেজ আম্‌লাদের প্রভুত্ব ও চাক্‌রী তত কমিবার সম্ভাবনা; অথচ এইসব বিভাগের কাজগুলিতে সুফলতা দেখান ইংরেজ রাজপুরুষদের আন্তরিক সহযোগিতা-সাপেক্ষ। বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করা, ঔদাসীন্য অবলম্বন করা, সহযোগিতা করা,—তিন-রকম ভাব দেখানই তাহাদের সাধ্যায়ত্ত থাকিবে। তাহারা বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না, উদাসীনও হইবে না, কিন্তু অন্তরের সহিত সহযোগিতা করিয়া আপনাদের ও আপনাদের জাত-ভাই ভবিষ্যৎবংশের প্রভুত্বের ও উপার্জ্জনের শেষদিন নিকটতর করিয়া দিবে, মানবপ্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থা ও ইংরেজ আম্‌লাবর্গের অতীত ও বর্ত্তমান আচরণের ইতিহাস হইতে ইহা আশা করা কি সঙ্গত? যাহারা এই সেদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের বিরোধী ছিল, যাহাদের মধ্যে উচ্চতম কর্ম্মচারীরাও এই সেদিন আমাদিগকে অতিদূর ভবিষ্যতে ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের আশা হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিতে বলিতেছিল, তাহাদের উপর আমাদের কোন প্রকৃত কর্তৃত্ব না থাকিলেও

তাহারা আমাদের কাজ আগাইয়া দিবে, ইহা কেমন করিয়া আশা করিব?

"সব দেশেরই রাষ্ট্রীয় উন্নতির সমস্যাটি একটি সমগ্র অখণ্ড সমস্যা," এই আপত্তি আমরা গত অগ্রহায়ণ মাসে করিয়াছিলাম। গত ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজেও আমরা লিখিয়াছিলাম "The problem of government is a problem which should be considered as an organic whole." ভারতসচিব ও বড়লাট এই আপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা রিপোর্টের ১১৬ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—

"No doubt we shall be told,—indeed we have often been told already,—that the business of government is one and indivisible, and that the attempt to divide it into spheres controlled by different authorities, who are inspired by different principles and amenable to different sanctions, even with the unifying provisions which we have described is doomed to encounter such confusion and friction as will make the arrangements unworkable. We feel the force of these objections. We have considered them very anxiously and have sought out every possible means of meeting them. But to those critics who press them to the point of condemning our scheme we would reply that we have examined many alternative plans, and found that they led either to deadlock or to more frequent and greater potentialities of friction."

ভারতসচিব ও বড়লাট এই রকম আরও দু চারটা কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আপত্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। প্রকৃত কথা এই, ইংরেজরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের যে-সব অংশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কোথাও প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। কারণ সে-সব দেশে যাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়াছেন, তাহারা প্রধানতঃ শ্বেতকায় ও খৃষ্টিয়ান, এবং তথায় তাঁহাদের প্রভুত্ব ও চাকরীবাণিজ্যাদির দ্বারা অর্থলাভ ভারতবর্ষে যেমন আছে তেমন ছিল না; এইসব কারণে, তাহারা স্বায়ত্তশাসন-অধিকারের অযোগ্য, এ কল্পনা করেন নাই। আমাদের বেলায় কল্পনা করিতেছেন বা ভান করিতেছেন যে আমরা অযোগ্য। এইজন্য এইসব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। আমাদিগকে অযোগ্য না ভাবিলে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে যে-প্রণালীতে "দায়ী গবর্ণমেণ্ট" (responsible government) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এখানেও তাহা হইতে পারিত। আমরা যোগ্য কি না, তাহার বিচার অনেক বার করিয়াছি। এ মাসে আর করিতে চাই না। যাঁহারা এ বিষয়ে সব রকমের প্রমাণ এবং সব রকমের প্রধান প্রধান আপত্তির খণ্ডন দেখিতে চান, তাঁহারা আমাদের "টুআর্ড্‌স্ হোমরূল" (Towards Home Rule) বহিগুলি পড়িবেন।

যাহা কখনও কোথাও ছিল না, এখনও নাই, তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা মাত্রেই যে খারাপ হইবে এমন কথা আমরা বলি না। আমরা বলি, ইতিহাসে যে পথে সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তাহা ছাড়িয়া নূতন পথে যাইবার প্রয়োজন কি? ভারতসচিব ও বড়লাটও জানেন যে তাঁহারা এমন নানা রকম প্রস্তাব করিয়াছেন পৃথিবীর ইতিহাসে যাহার কোন নজীর নাই। তাঁহারা রিপোর্টের ১৯০ প্যারাগ্রাফে বলিতেছেন :—

"......any attempt to establish equilibrium between the official and popular forces in government inevitably introduces additional complexity into the administration. For such hybrid arrangements precedents are wanting; their working must be experimental, and will depend on factors that are yet largely unknown."

আমাদিগকে যোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলে তাঁহাদিগকে আঁধারে ঢিল ছুঁড়িতে হইত না। বিশ্বাস করিতে না পারিবার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সমগ্রভারতের গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে প্রস্তাব।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা গবর্ণমেণ্ট-মনোনীত এবং সরকারী সভ্যদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইবে। কিন্তু তাহার মানে ইহা নয় যে আইন-প্রণয়ন আদি কার্য্যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মতই বজায় থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভা ছাড়া একটি কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ থাকিবে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট-মনোনীত ও সরকারী সভ্যদের সংখ্যা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে। আইন প্রণয়নের প্রস্তাবিত নিয়মাবলী ও প্রণালী এরূপ করা হইয়াছে যে কোন স্থলেই বড়লাটের অনভিপ্রেত কোন আইন হইতে পারিবে না। বজেটের উপরও ব্যবস্থাপক সভার কোন হাত থাকিবে না, যদিও বজেটের আলোচনা তথায় এখনকার মত হইতে পারিবে। মোটের উপর বলিতে গেলে সমগ্রভারতের ব্যাপারে এখনকারই মত

বিদেশী রাজপুরুষদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ভবিষ্যতে সমুদয় সমগ্রভারতীয় বিষয়ে লোকমতের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইবে কি না সে বিষয়ে রিপোর্ট কিছু বলে না। অপ্রধান কোন কোন বিষয়ে, যেমন প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায়, জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে কিছু ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে; সমগ্রভারতীয় শাসনব্যবস্থায় তদ্রূপ কোন কোন বিষয়েও লোকমতকে প্রবল হইতে কখনও যে দেওয়া হইবে, তাহারও পরিষ্কার কোন আভাস রিপোর্টের কোথাও নাই। অথচ, যখন কালক্রমে প্রাদেশিক সমুদয় ব্যাপারে প্রত্যেক বিভাগের মন্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের নিকট দায়ী হইবেন, তখনও এখনকার মত বড়লাট যে কোন আইনে সম্মতি না-দিতে পারিবেন, এবং তিনি সম্মতি না দিলে তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। সমগ্রভারতের গবর্ণমেণ্ট সমুদয় দেশের রাজস্ব হইতে নিজের দর্‌কার মত অংশ লইবার পর যাহা বাকী থাকিবে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি তাহাই পাইবে। সুতরাং টাকা সম্বন্ধেও নূতন প্রস্তাবে প্রাদেশিক বজেটের উপর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সামান্য কিছু কথা চলিলেও সমুদয় দেশের বেশীর ভাগ রাজস্ব সম্বন্ধে আমাদের এখন যেমন কোন ক্ষমতা নাই ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা একত্র হইয়া যদি সমগ্রভারতীয় ব্যাপারসমূহে একই নীতি একই প্রণালী প্রচলিত করিতে পারেন, তাহা হইলে কালে এই প্রকারে একরাষ্ট্রীয়তা ও একজাতীয়তা সম্পূর্ণ বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু রিপোর্টে তাহার কোন আশা দেখা যাইতেছে না। দেখা যাইতেছে, যে, প্রদেশগুলি নিজের নিজের পথে চলিবে বা চালিত হইবে, ও তদ্দ্বারা প্রাদেশিক ভাব (Provincial spirit) পুষ্ট হইবে, এবং সর্ব্বোপরি দিল্লী-ও-সিম্লায় অধিষ্ঠিত জনকয়েক বিদেশী রাজপুরুষ কর্ত্তৃত্ব করিবেন। ইহা স্বায়ত্তশাসন নহে, স্বরাজের তো পাশ দিয়াও যায় না। সমগ্রভারতের শাসনকার্য্যে একটুও নিশ্চিত কর্ত্তৃত্ব না পাওয়ায় আমরা যে স্বরাজের আসল জিনিসটি হইতেই বঞ্চিত হইতেছি, তাহা বুঝা কঠিন নহে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশের বড় বড় কাজ ও ব্যবস্থা সবই করেন। দেশের দেওয়ানী ফৌজদারী ও অন্য সব রকম সমগ্রদেশপ্রযুজ্য আইন করেন; সমস্ত দেশে টাকশাল স্থাপন, বৃদ্ধি ও খুব একটা মোটা অংশ ব্যয় করেন; বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও তদ্বিষয়ক আইন করেন; রেলওয়ে-নীতি স্থির করেন; বড় বড় রেল করেন; এবং আরও বড় বড় কাজ করেন। ভারতগবর্ণমেণ্টে আমাদের একটুও কর্ত্তৃত্ব না থাকার মানে যে কি, তাহা ত বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতেছি। কোন আইন যতই কড়া হউক, তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই; আমাদের সব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তাহার বিরোধী হইলেও তাহা পাস হইবে। রাজদ্রোহ-সম্বন্ধীয় আইনে ও প্রেস আইনে দেশের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইলেও তাহাতে আমাদের হাত নাই। রেলওয়েগুলির মাল-ভাড়ায় দেশী শিল্পের সম্যক্ উন্নতি অসম্ভব হইলেও এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা পশুর অধম ব্যবহার পাইলেও আমরা কিছু করিতে পারি না। দেশের বাণিজ্য-নীতি, কলকারখানাবিষয়ক নীতি, আমরা এখন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারি না; স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রার সম্বন্ধ, পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক, বা অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যাপারে আমাদের হাত নাই। নূতন প্রস্তাবে এ বিষয়ে আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না। দেশে কিরূপ শিক্ষা হওয়া চাই, কলেজ স্কুল আদি কি-প্রকারে আরও বাড়িতে পারে ও ভাল হইতে পারে, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে যেরূপ আইন করিয়া দিয়াছেন, সেই খোঁয়াড়ের ভিতরে যিনি যত ইচ্ছা লম্ফ ঝম্প করুন, শিং উঁচু করুন, কিন্তু খোঁয়াড়ের বাহিরে যাইবার জো নাই। লবণের কর বা অন্য কোন কর আমরা কমাইয়া বা উঠাইয়া দিতে পারি না। জমির খাজনা সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বা বহুকালস্থায়ী বন্দোবস্ত আমরা করিতে পারি না। পুলিসের হাতে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে, যে, তাহারা বিনা বিচারে বিনা কারণে যে-কোন লোককে পিষিয়া ফেলিতে পারে, তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। আমরা তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি না। ভারত-গবর্ণমেণ্টের বড় বড় মোটা মাহিনার কাজ এক আধটা ছাড়া ইংরেজের একচেটিয়া। আমাদের তাহাতে কোন হাত নাই। নূতন

প্রস্তাবে আমাদের অবস্থা সব বিষয়েই ঠিক এইরূপ থাকিবে। ইহাতে মানুষ কেমন করিয়া সম্মতি দিতে পারে জানি না।

একটা পরিহাসের কথা আছে, "সর্ব্বস্ব তোমার, চাবীটি আমার।" ভারতসচিব ও বড়লাট রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্ট দিবার প্রস্তাব করিতেছেন, কিন্তু রাজকোষের চাবিটি প্রধানতঃ থাকিতেছে ইংরেজদের হাতে, আমাদিগকে তাঁহাদের অনুগ্রহজীবী হইতে হইবে। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী লইয়া রাজায়-প্রজায় অতীতকালের দ্বন্দ্বের একটা অতিপ্রধান বিষয়ই ছিল, কে খাজ্‌নাখানার মালিক হইবে, কে সর্ব্ববিধ ব্যয় মঞ্জুর করিবে। রাজা না প্রজা? প্রজারই জিত হইয়াছে: ইংলণ্ড বহু শতাব্দীর চেষ্টায় যে রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছে, সরকার তাহা আমাদিগকে দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু চাবীটি প্রধানতঃ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের হাতেই থাকিবে। আমাদের মন্ত্রীদের বেশী টাকার দর্‌কার হইলে তাঁহারা নূতন ট্যাক্স বসাইতে পারিবেন, এবং তখন সেই-কারণে-অসন্তুষ্ট প্রজাগণ এংলো-ইণ্ডিয়ানদের চরদের প্ররোচনায় "আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই না" বলিয়া সরকার-বাহাদুরের নিকট দর্‌খাস্ত করিতে পারিবে।

আমরা যদি কখনও সব বিষয়ের ভার ও সব বিষয়ে ক্ষমতা পাই, তখনও যে প্রাদেশিক স্বকর্তৃত্ব (Provincial autonomy) পুরা হইবে না, তাহার কয়েকটি প্রমাণের মধ্যে একটি উদ্ধৃত করিতেছি। রিপোর্টের ২১২ প্যারাগ্রাফে আছে:—

"It is our intention to reserve to the Government of India a general overriding power of legislation for the discharge of all, functions which it will have to perform. It should be enabled under this power to itervene in any province for the protection and enforcement of the interests for which it is responsible; to legislate on any provincial matter in respect of which uniformity of legislation is desirable either for the whole of India or for any two or more provinces; and to pass legislation which may be adopted either *simpliciter* or with modifications by any province which may wish to make use of it. We think the Government of India must be the sole judge of the propriety of any legislation which it may undertake under any one of these categories, and that its competence so to legislate should not be open to challenge in the courts. Subject to these reservations we intend that within the field which may be marked off for provincial legislative control the sole legislative power shall rest with the provincial legislatures."

ইংরেজরা যেখানে যেখানে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখা দর্‌কার মনে করিবেন, তাহা বজায় রাখিবার জন্য এইরূপ নানা উপায় রিপোর্টের নানা জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। রিপোর্ট ভাল করিয়া যিনি পড়িবেন, তাঁহারই চোখে সেগুলি পড়িবে।

প্রাদেশিক "দায়ী" শাসনব্যবস্থা।

রিপোর্টটির প্রধান উদ্দেশ্য, কি-প্রকারে প্রাদেশিক ব্যাপার-সকলে ক্রমে ক্রমে দেশের লোকের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। এইজন্য গোড়াতেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, আমরা সমস্ত বিষয়ে বা প্রধান প্রধান বিষয়ে আংশিক ক্ষমতা পাইবারও অযোগ্য; কেবল অপ্রধান কয়েকটি বিষয়ে আমাদিগকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইবে। সে বিষয়গুলি যে কি তাহা রিপোর্টে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। যে মূল নীতি অনুসারে প্রধান ও অপ্রধান এই দুইভাগে সমস্ত রাষ্ট্রীয় বিষয় বিভক্ত হইবে, তাহা লিখিত আছে, এবং যেরূপ বিষয়সমূহে দেশের লোককে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার কয়েকটির একটি তালিকাও পরিশিষ্টে দেওয়া আছে। প্রধান বিষয়গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে রিজার্ভ্‌ড্ বা স্বহস্তে-রক্ষিত এবং অপ্রধান বিষয়গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে ট্রান্স্‌ফার্ড্ অর্থাৎ হস্তান্তরিত বা ন্যস্ত। কোন্ বিষয়গুলি ইংরেজ আম্‌লাদের হাতে থাকিবে এবং কোন্‌গুলি দেশী মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হইবে, তাহা একটি কমিটি স্থির করিবেন। ইহাতে ইংরেজ সভ্যের সংখ্যা বেশী থাকিবে। এই কমিটি কি নীতি অনুসারে কাজ করিবেন, তৎসম্বন্ধে রিপোর্টের ২৩৮ প্যারাগ্রাফে লেখা আছে:—

"Their guiding principle should be to include in the transferred list those departments which afford most opportunity for local knowledge and social service, those in which Indians have shown themselves keenly interested, those in which mistakes which may occur though serious would not be irremediable, and those which stand most in need of development. In pursuance of this principle we should not expect to find that departments primarily concerned with the maintenance of law and order were transferred. Nor should we expect the transfer of matters which vitally affect the well-being of the masses who may not be adequately represented in the new councils, such for example, as questions of land revenue or tenant rights."

রিপোর্টের পরিশিষ্টে দৃষ্টান্তস্বরূপ মুদ্রিত তালিকাটি পরে দিলাম।

1. Taxation for provincial purposes.
2. Local self-government, rural and urban; viz, provisions for public health, safety and convenience, constitution of local authorities—municipal rates, taxes, loans, roads, bridges, ferries, tolls, markets, pounds, fairs, exhibitions, parks, open spaces, museums, libraries, art galleries, reading rooms, building regulations, town planning, housing improvements, disorderly houses, loading houses, sarais, hackney carriages, registration of carts, nuisances, water-supply, prevention of fires, regulations for sale of food and drink, smoke-nuisance, disposal of the dead, bathing and washing places, warehouses, drains and sewers, control of animals, surveys for municipal purposes, advertisements and anything dealt with in existing municipal or local self-government Acts, and also any matters declared by the Government of India to be included in local self-government.
(The question of reserving to the Executive Council the power of suspending defaulting local bodies to be considered.)
3. Registration of births, deaths, and marriages, coroners, village courts—civil and criminal—statistics for provincial purposes.
4. Education:
Primary, secondary and technical.
5. Medical and sanitary.
6. Agriculture:
Civil veterinary, diseases of animals, etc.
7. Co-operative credit.
8. Forests (unclassed and some protected).
9. Fisheries and connected industries and river conservancy.
10. Public Works:
Roads and buildings, minor irrigation, tramways and light and feeder railways, drainage and embankments.
11. Excise.
Intoxicating liquors and drugs, including the control of breweries and distilleries.
12. Charitable endowments.
13. Development of arts and crafts and local industries.
14. Miscellaneous subjects, viz., preservation of wild birds and animals, cruelty to animals, prevention of gambling, motor vehicles, registration of deeds and documents.
15. Franchise, electoral law, and constituencies.
(Not till after the Commission has reported.)

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে দেশে শাসন-ও-পুলিশ-বিভাগের লোকদের কোন প্রকার অত্যাচার নিবারণ, বিচার-বিভ্রাট নিবারণ, ভূমিকর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিয়া কৃষকদিগের (যাহারা দেশের অধিকাংশ লোক) অবস্থার উন্নতি করণ, এগুলি আমাদের দেশী মন্ত্রীদের ক্ষমতার বহির্ভূত থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরাও তাহা করিতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহাদের সকলের বা অধিকাংশের মতে যেসব প্রস্তাব (resolutions) ধার্য্য হইবে, সেগুলি অনুরোধ (recommendations) বলিয়াই বিবেচিত হইবে; সকৌন্সিল গবর্ণর তদনুসারে কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার দেশী মন্ত্রীদের উপর থাকিবে না। তাহার নীচের শিক্ষার ভার তাঁহাদের হাতে থাকিবে বটে, কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হওয়ায়, ইংরেজী স্কুলগুলিকে প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি পরীক্ষায় বেশী পাশ করাইবার মত রীতিতে পড়াইতে হইবে। সুতরাং ইংরেজী স্কুলগুলির শিক্ষার বস্তু ও রীতিতে নূতন বেশী কিছু দেশী মন্ত্রী করিতে পারিবেন না। বাকী থাকে বাংলাবিদ্যালয় ও পাঠশালাগুলি। কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে বাংলাদেশে বাংলা শিক্ষা উন্নতিলাভ করিতেছে না। তাহার একটা প্রধান কারণ, উহা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করে না, উহা উচ্চতর শিক্ষার নিম্ন অঙ্গ নহে, উহা ছাত্রদিগকে উচ্চতর শিক্ষার অভিমুখে প্রেরণ করে না। নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষার পরস্পরের সহিত যোগ থাকা উচিত। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অন্যান্য কথা বলিয়াছি।

বড় বড় রেললাইন ও জলসেচনাদির জন্য বড় বড় খাল দ্বারা নানাপ্রদেশে দেশের স্বাস্থ্যের অবনতি হইয়াছে। সেগুলির উপর দেশের লোকদের কোনই কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। এইজন্য দেশী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চেষ্টা কতকটা বিফল হইবেই।

স্থানীয় শিল্পের ভার দেশী মন্ত্রীর উপর থাকিবে। কিন্তু আমরা দেশী কামার তাঁতি প্রভৃতিকে যতই উৎসাহ দি না কেন, রেলওয়ে-নীতি ও রেলওয়ের মালের ভাড়া, বাণিজ্যনীতি, রাজস্ব ও অর্থনীতি, দেশী জাহাজনির্ম্মাণ ও তাহাতে উৎসাহ দান, বিদেশী পণ্যের উপর আবশ্যকমত শুল্ক বসান, ইত্যাদি যতদিন আমাদের ইচ্ছাধীন না হইতেছে, ততদিন আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি অসম্ভব।

দেশী মন্ত্রীদের হাতে যে-সব কাজের ভার দেওয়া হইবে, তাহার প্রধান প্রধান অনেকগুলিতে সিদ্ধিলাভ বহু-অর্থব্যয়সাপেক্ষ। অথচ টাকা আমাদের মন্ত্রীরা যথেষ্ট পাইবেন না ইহা নিশ্চিত। প্রথমতঃ, ভারতগবর্ণমেণ্ট যত টাকা তাঁদের কাজের জন্য দরকার লইবেন। তারপর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ্‌ড্ বিষয়গুলির জন্য পর্য্যাপ্ত

পরিমাণে টাকা লইবেন। বাকী অল্প যাহা থাকিবে, তাহাতে শিক্ষা, চিকিৎসা; স্বাস্থ্যোন্নতি, ইত্যাদি বিভাগের কাজ চালাইতে হইবে। এসব কাজের জন্য বর্ত্তমান সময়ে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায় না বলিয়া এখন আমরা কাগজে ও সভায় অভিযোগ করি। ভবিষ্যতেও এই অবস্থা থাকিবে। এ বিষয়ে রিপোর্টটির ২৫৭ প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে :—

"The contribution to the Government of India will be set apart; the proposed allotments for the reserved subjects will then be carefully scrutinised and examined with a view to facing criticism in the legislative council, and the remainder of the revenue will be at the disposal of the [Indian] ministers. If such residue is not sufficient, it is open to the [Indian] ministers to suggest extra taxation, either within the schedule of permissible provincial taxation, or by obtaining the sanction of the Government of India to some tax not included in the schedule."

ইহার আগে ২৫৬ প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে :—

"We propose that the provincial budget should be framed by the executive Government as a whole. The first charge on provincial revenues will be the contribution to the Government of India; and after that the supply for the reserved subjects will have priority. The allocation of supply for the transferred subjects will be decided by the ministers If the revenue is insufficient for their needs, the question of new taxation will be decided by the Governor and the [Indian] ministers."

আমাদের ক্ষমতা থাকিলে আমরা বলিতাম, আগে দেশী মন্ত্রীদের বিষয়গুলির জন্য পর্য্যাপ্ত টাকা দিয়া বাকী যাহা থাকে তাহাতে না কুলাইলে ইংরেজ গবর্ণর নূতন ট্যাক্স বসাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। ট্যাক্স দেওয়াটা কোথাও সুখকর ব্যাপার নহে,—বিশেষতঃ গরীব দেশে। যে ট্যাক্স বাড়াইবে, সে-ই লোকের অপ্রিয় হইবে। জনসাধারণের বিরাগভাজন হইবার ভারটা দেশী মন্ত্রীদের ঘাড়ে চাপাইয়া স্বায়ত্তশাসনের এই নূতন পরীক্ষাটাকে (experimentকে) লোকের অপ্রিয় করা যদি একটা তামাসা হইত, তাহা হইলে আমরা হাসিয়াই খালাস হইতাম; কিন্তু তামাসা তো নয়, সুতরাং আমরা প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধিতা জানাইতেছি।

দেশী মন্ত্রীদিগকে দেশের লোকের উপর নূতন ট্যাক্স্ বসাইয়া আয় বাড়াইতে হইবে।' তখন দেশের লোকে বলিবে, "তোমরা বেশ স্বরাজ পাইয়াছ দেখিতেছি! প্রথম নম্বরেই ট্যাক্স বৃদ্ধি! বাপু, আমাদের কি আরও ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা আছে? কোন্ হাড়খানা ঠেঙ্গাইয়া টাকা বাহির করিবে, এই কঙ্কালখানা হইতে বাছিয়া ঠিক কর। আগে যে-টাকা দিয়াছি তাহা হইতে অপব্যয় নিবারণ, অনাবশ্যক মোটা মাহিনার চাকরের জায়গায় সমান যোগ্য দেশী অল্প মাহিনার চাকর নিয়োগ, প্রভৃতি উপায়ে, কতদূর ভাল কাজ হইতে পারে, দেখাও; তাহার পর না হয় আধপেটার জায়গায় সিকিপেটা খাইয়াও দেশের মঙ্গলের জন্য টাকা দিব।" তখন আমাদের সারডোবা ও পাঠশালার প্রধান মন্ত্রী বলিবেন, "দেখ বাপু, আমাদিগকে সর্‌কার-বাহাদুর দায়ী গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, কিন্তু যথেষ্ট টাকা দেন নাই; রাজস্বের উপর আমাদের কোন হাত নাই। দায়ী গবর্ণমেণ্ট পাওয়াটা বড়ই সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা; ইহা হারান কি উচিত? ট্যাক্স দিয়া আমাদের এই গৌরব ও ইজ্জত রাখ।" তখন পল্লীগ্রামের চতুর মোড়লেরা ভাবিবে, বর্ত্তমান ট্যাক্স ও অদায়ী গবর্ণমেণ্টই ভাল; বর্দ্ধিত ট্যাক্সসাপেক্ষ দায়ী গবর্ণমেণ্টরূপ গৌরব ও সৌভাগ্য হইতে, হে দরিদ্রের ভগবান, আমাদিগকে রক্ষা কর।" আমরা শুধু পরিহাস করিতেছি না, যে ব্যবস্থা গোড়াতেই অবশ্যম্ভাবী ট্যাক্সবৃদ্ধি দ্বারা স্বায়ত্তশাসনকে লোকের অপ্রিয় করিবে, তাহা কখনও সুফলপ্রদ হইবে না। রাজপুরুষেরাও নেতাদিগকে বলিতে পারেন, "তোমরা বলিয়াছিলে তোমরা ক্ষমতা পাইলে দেশের লোকে সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু দেখিতেছি দেশে অসন্তোষই বাড়িতেছে, কারণ লোকে ট্যাক্স দিতে চাহিতেছে না। অতএব, তোমরা কোন কাজের নও। সুতরাং তোমাদের স্বরাজের এইখানেই ইতি।" ইহার ভিতর কাহারও কোন গূঢ় অভিসন্ধি না থাকিলেও ফলটা এইরূপ দাঁড়াইবারই সম্ভাবনা।

আমরা স্বীকার করি, দেশের হিতকর নানা কাজে বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও অনেক টাকা খরচ না করিলে দেশের উন্নতি হইবে না। কতক টাকা অপব্যয়নিবারণ আদির দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও কুলাইবে না। ট্যাক্স বসাইতে হইবে। বর্ত্তমান রাজস্বের ঠিক সদ্ব্যয় করিলে এবং তাহা করা হইতেছে বলিয়া দেশবাসীকে বুঝাইতে পারিলে, তাহাদের বর্দ্ধিত ট্যাক্স্ দিবার ক্ষমতাও বাড়িবে, সম্মতিও পাওয়া যাইবে।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশের লোকদের ধনবৃদ্ধি প্রধান প্রধান যে-সব উপায়ে হইতে পারে, তাহার অধিকাংশ ভারতগবর্ণমেণ্টের এক্তিয়ারে থাকিবে, এবং ভারতগবর্ণমেণ্টে লোকমত প্রবল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ব্যয়সংকুলান ও অপব্যয় নিবারণের কথাটা ভারতসচিব ও বড়লাট তাঁহাদের রিপোর্টে প্রায় হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। ২৫৬ প্যারাগ্রাফে আছে, "We are bound to recognise that in time new taxation will be necessary, for no conceivable economies can finance the new developments which are to be anticipated."। আমরা ইহা আগেই স্বীকার করিয়াছি কিন্তু ব্যয়সংক্ষেপ দ্বারা কতটা হয়, তাহাও তো দেখা দরকার। তাহা করিবার তো কোন সুযোগই দেওয়া হইতেছে না। বরং ২৫৭ প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে, "We anticipate that anxiety may be felt as to the supply for the transferred subjects. We believe that this anxiety is largely based on an exaggerated view of the possibilities of economy in the reserved subjects."

গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, ব্যয়সংক্ষেপ যে বেশী হইতে পারে সেটা আমাদের ভ্রম। কিন্তু এখন ত অনেক বড় বড় ইংরেজ অনেক বিষয়ে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের দোহাই দেন; সেই গোখ্‌লে তাঁহার বজেটবক্তৃতাগুলিতে অনেকবার দেখাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের আয় যে-পরিমাণে বাড়ান হইতেছে, ব্যয় তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ও দ্রুতবেগে বাড়িতেছে, এবং তিনি ট্যাক্স বাড়াইয়া বজেটে বেশী টাকা উদ্বৃত্ত দেখানর এই জন্য বিরোধী ছিলেন যে উদ্বৃত্ত বেশী আছে দেখিলেই গবর্ণমেণ্টের ব্যয়কারী বিভাগগুলি (spending departments) ক্রমাগত ব্যয় বাড়াইয়া চলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় গত বৎসরের বজেট-বিতর্কের সময় স্যার দীনশা ওআচা দেখাইয়াছিলেন যে ১৯১৫-১৬ সালে যে দশ বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে রাজস্ব বাড়িয়াছে শতকরা ১৪ টাকা, কিন্তু ব্যয় বাড়িয়াছে শতকরা ২০ টাকা। এইসব ব্যয়বৃদ্ধি কি অনিবার্য্য ছিল? কখনই না। জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা ধনী দেশ, আমেরিকা ত খুব ধনী দেশ। অথচ এই উভয় দেশেই রাজকর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষ অপেক্ষা খুব কম বেতন পায়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও অঙ্ক লালা লাজপৎ রায় প্রণীত "The Evolution of Japan and other papers" * নামক বহিতে দৃষ্ট হইবে। ইণ্ডিয়ান্ ডেলী নিউস্ ইহা হইতে ভারতবর্ষের ও জাপানের ২১টি চাকরীর বেতন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের এই বহিটি পড়া উচিত।

রিপোর্টে ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা লক্ষিত হওয়া দূরে থাক, এরূপ অনেক প্রস্তাব করা হইয়াছে যাহাতে ভবিষ্যতে এখনকার চেয়ে ব্যয়বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এই যে ব্যয়বৃদ্ধির কথা বলিতেছি, তাহা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আদির উন্নতির জন্য ব্যয় নহে। ব্যয় কেন বাড়িবে তাহার দু একটি কারণের উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজদের জন্য বড় বড় চাকরী অনেকগুলি বাড়িবে। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা প্রথম হইতেই এখনকার চেয়ে বেশী বেতন পাইবেন। তাঁহাদের চাকরীতে নিযুক্ত থাকিবার সময় ক্রমিক বেতনবৃদ্ধি এখনকার চেয়ে সুনিশ্চিত ও শীঘ্র শীঘ্র হইবে। পেন্সানের ঊর্দ্ধসীমা বার্ষিক ৫০০০ হইতে ৬০০০ টাকা করা হইবে। ইংরেজরা বিলাতে বসিয়া যে পেন্সান পাইবেন, তাহাতে এক টাকাকে ১ শিলিং ৯ পেনীর সমান বলিয়া ধরা হইবে; যদিও এখন এক টাকার দাম এক শিলিং ৬ পেনী ও সাত পেনীর মাঝামাঝি। সিবিলিয়ানদিগকে এখন পেন্সান পাইবার জন্ম বরাবর বেতনের শতকরা ৪ টাকা জমা দিতে হয়। অতঃপর জমা ঐরূপ দিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহা পেন্সানের জন্য প্রদত্ত চাঁদা বলিয়া ধরা হইবে না; পেন্সান তাঁহারা এমনি পাইবেন, অধিকন্তু ঐ টাকা সুদসমেত জমিতে থাকিবে এবং তাঁহারা অবসর লইবার সময় উহা এককালান থোক ফেরত পাইবেন। পূরা বেতনে ছুটি পাইবার সুবিধা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

ইংরেজ ও দেশী উভয়শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন না বাড়াইয়া বরং কমানই উচিত। তাহা না করিলে এই দরিদ্র দেশে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি করা

* The Modern Review Office, price one Rupee.

দুঃসাধ্য। আমরা এইসব কর্ম্মচারীদের প্রতি অবিচার করিতে বলিতেছি না। অন্যান্য দেশে তাঁহাদের সমশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারীরা কিরূপ বেতন পান, তাহা বিবেচনা করিয়া বেতন স্থির করা হউক। আমরা স্বীকার করি, কিছু বেশী বেতন না পাইলে লোকে বিদেশে চাক্‌রী করিতে যাইতে চায় না। সেই জন্য যে যে-রকমের কাজের উপযুক্ত যোগ্যতা-বিশিষ্ট লোক ভারতবর্ষে এখন পাওয়া যায় না, সেই রকম অল্পসংখ্যক কাজের জন্য বিদেশী যোগ্য লোক পাইবার জন্য বেশী বেতনের ব্যবস্থা হউক; যখনই যোগ্য দেশী লোক পাওয়া যাইবে তখনই বেতন কম করা হইবে। বাকী এবং অধিকাংশ উচ্চ কাজের জন্য দেশী লোক নিযুক্ত হইবে, এই হিসাবে বেতন ঠিক হউক।

কংগ্রেস-লীগ ব্যবস্থায় সেনাবিভাগকে সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বাকী উপায় শাসনবিভাগ ও পুলিশবিভাগের লোক। ইঁহারা যে সঙ্কট অবস্থায় অধিকাংশ সময়ে শান্তি-ও-শৃঙ্খলাভঙ্গ নিবারণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা পারেন নাই। ইঁহাদের প্রভূত ক্ষমতাসত্ত্বেও দেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা ডাকাতী খুব হয়। ইঁহারা দেশে যে-পরিমাণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, দেশী মন্ত্রীরা এই দুই বিভাগের ভার পাইলে নিশ্চয়ই ততটা পারিবেন, বরং বেশী পারিবেন। তাহার একটা প্রমাণ, যে-সব জেলায় যখন যখন দেশী মাজিষ্ট্রেট ও দেশী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাজ করিয়াছেন, সেইসব জেলায় তখন তখন দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ই নাই, কিম্বা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা কম হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ময়মনসিংহের অত্যাচার দাঙ্গাহাঙ্গামা, কলিকাতায় বড় বাজার ও মেছুয়া বাজারের অরাজকতা, গতবৎসর আরায় হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গাহাঙ্গামা, তৎপূর্ব্বে পঞ্জাবের কোন কোন জেলায় ভীষণ অরাজকতা, এ সমস্তই ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আমলে হইয়াছে। দেশী মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনস্থ কোনও জেলায় এরূপ ভীষণ অরাজকতা ও দাঙ্গাহাঙ্গামার দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সুতরাং রিপোর্টে যে বলা হইয়াছে "In pursuance of this principle we should not expect to find that departments primarily concerned with the maintenance of law and order were transferred," ইহা নিতান্ত গাজুরি। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে আমাদের দেশী কর্ম্মচারীরা বেশ পারেন, কিন্তু ইংরেজ রাজনৈতিক কারণে তাহা স্বীকার করিতে পারেন না; স্বীকার করিলে তাঁহাদের গুরুত্ব বজায় থাকে কেমন করিয়া? কেমন করিয়া প্রমাণ করা যায় যে তাঁহারা প্রভুত্ব না করিলে শান্তির সময়েও দেশে শৃঙ্খলা থাকিতে পারে?

রিপোর্টে গুরুতর ভুলভ্রান্তির (serious mistakes) কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং আমাদের দেশী মন্ত্রীরা ভুল করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কোন কোন বিভাগের ভার দেওয়া যাইতে পারে না বলা হইয়াছে। যেন বড় বড় ইংরেজরা অতি গুরুতর ভুল করেন না! যেন লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে মেসোপোটেমিয়ায় ভারতবর্ষের বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বহুসংখ্যক বড় বড় কর্ম্মচারীর ভুলে পরাজয় ঘটে নাই, এবং সৈন্যেরা নারকীয় দুর্দ্দশা ভোগ করে নাই। যেন গালিপলিতে বিলাতী সমর ও রণতরী বিভাগ মারাত্মক ভুল করেন নাই! ভুল সব জাতিই করে। যে শিশুর কখনও পদস্খলন হয় নাই, সে কখনও চলিতে দৌড়িতে শিখে নাই। অন্যান্য দেশের লোকদের মত আমরাও কাজের ভার পাইলে প্রথম প্রথম অনেক ও বরাবরই কিছু কিছু ভুল করিব। কিন্তু ভুল করিবার সুযোগ পাওয়াই শিখিবার ও সিদ্ধিলাভ করিবার একমাত্র উপায়। আমরা ভুল করিতে পারি বলিয়া কাজের ভার পাইব না, ইহা অতি অদ্ভুত যুক্তি। যুক্তি যেমন অদ্ভুত, যুক্তি যাঁরা প্রয়োগ করেন তাঁহাদের স্বকল্পিত অভ্রান্ততার অহঙ্কার তেমনি অসাধারণ ও হাস্যকর।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "Nor should we expect the transfer of matters which vitally affect the well-being of the masses who may not be adequately represented in the new Councils, such for example as questions of

land revenue or tenant rights." আমাদের দেশের বিশিষ্ট বা "উচ্চ" জা'তের লোকেরা যদি বরাবর সাধারণ, দরিদ্র, "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদের হিত চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের দুর্গতি হইত না, সম্ভবতঃ দেশ পরাধীনও হইত না; ইহা স্বীকার করি। কিন্তু ইহা স্বীকার করি না, যে, ইংরেজ আম্‌লারা বা তাঁহাদের নিযুক্ত দেশী লোকেরা দেশের লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যদের চেয়ে সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিক উপযুক্ত। যার প্রতি যার দরদ আছে, সেই তার প্রতিনিধি হইবার যোগ্য। আমরা স্বীকার করি উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে এখনও নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি যথেষ্ট দরদ জন্মে নাই। কিন্তু এই দরদ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং গত কয়েক বৎসরে যে খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়াছে, তাহা সমালোচ্য রিপোর্টেই স্বীকৃত হইয়াছে। এবং জনসাধারণের প্রতি আমাদের দরদ ইংরেজ আম্‌লাদের চেয়ে বেশী তার প্রমাণ রহিয়াছে। খুব আধুনিক প্রমাণ, বেহারের চম্পারণে ও গুজরাতের কাইরা জেলায় পাওয়া গিয়াছে। সেখানে রায়তদের ভূমিকর এবং প্রজাস্বত্ব (land revenue and tenants' rights) সম্বন্ধীয় দুঃখ নিবারণের জন্য ইংরেজ আম্‌লারা চেষ্টা করেন নাই, চেষ্টা করিয়াছেন দেশী উচ্চশ্রেণীস্থ কতকগুলি শিক্ষিত লোক। পূর্ব্বে পূর্ব্বেও দেশী নেতারাই এইসব বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যার নারায়ণ চন্দাবরকার গবর্ণমেণ্টের "বিশ্বাসভাজন" লোক, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অন্তরায়িত ও রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ পরীক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি নটেশন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "What India Wants" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন:—

"The memorandum and the [Congress-League] scheme have been condemned in some quarters as being revolutionary on the main ground that their proposals transfer power from the Indian Civil service, who (it is said) are best fitted to represent the masses in India, to the Indian educated classes, who (it is maintained) are not the true representatives of the masses. We may, without fear of the result in favour of the Indian educated classes, invite one test which is a sure test, on this question. If we take the history of the administration from 1858 down to now, with special reference to the amelioration of the condition of the Indian agriculturists, who form 75 per cent of the people in India, we shall incontestably find that measures advocated in their interests by the educated Indians through their newspapers and public associations and at public meetings had been strenuously opposed as chimerical by the British officials in India for a long time and were ultimately more or less adopted under the stress of circumstances. It is the view of the Indian educated classes regarding the ryot's lot which, generally speaking, has after more or less painful experience to some extent won; and the official view has yielded in the end."

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ মিঃ আবদুর রহীম প্রধান জজের কাজও অস্থায়ীরূপে করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পাব্‌লিক সার্ভিস্ কমিশনের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সেই কমিশনের রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত নিজের রিপোর্টে লিখিয়াছেন:—

"In paragraph 18 of the majority report, allusion is made to the allegation that the western educated Indians do not reflect the views or represent the interests of the many scores of millions in India...... As for the representation of their interests, if the claim be that they are better represented by European officials than by educated Indian officials or non-officials, it is difficult to conceive how such a reckless claim has come to be urged."

শ্রীযুক্ত মহাদেব ভাস্কর চৌবল বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহক মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পাব্‌লিক সার্ভিস্ কমিশনের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। ঐ কমিশনের রিপোর্ট পুস্তকে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত মত দৃষ্ট হয়:—

"This is rather a shallow pretence—this attempt to take shelter behind the masses; and I think it only fair to state that the class of educated Indians from which only the higher posts can be filled is singularly free from this narrow-mindedness and class or caste-bias,......and I have no hesitation in endorsing the opinion of Sir Narayan Chandavarkar, in his recent contribution on village life in his tour through Southern India, that the interests of the masses are likely to be far better understood and taken care of by the educated Indian than by the foreigner. As a matter of fact all the measures proposed for the regeneration of the lower and depressed classes have emanated from the educated Indians of the higher castes. The scheme for the free and compulsory education of these masses was proposed by an educated Indian of a high caste and supported mainly by the western educated classes. High-souled and self-sacrificing men are every day coming forward from this class to work whole-heartedly in improving the condition of the masses."

শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে সমুদয় বালকবালিকাকে অবৈতনিক শিক্ষা দিবার জন্য যে আইন করাইতে চাহিয়াছিলেন, দরিদ্রের বন্ধু ইংরেজ আম্‌লাদের বিরোধিতায় সে আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। তাহার পর কোন্ কোন প্রদেশে

যে ঐরূপ আইন হইয়াছে, তাহা শিক্ষিত দেশী ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের চেষ্টায় হইয়াছে।

বাংলা বিহার উড়িষ্যায় জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। অন্য সব প্রদেশে চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী বন্দোবস্ত করাইবার জন্য শিক্ষিত লোকেরাই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষিত লোকেরা ক্ষমতা পাইলে চাষাদের দেয় খাজানা বাড়াইবার জন্য আইন করিতে পারে, এ আশঙ্কা অমূলক। বরং গবর্ণমেণ্টের এই ভয় থাকিতে পারে, যে, দেশী মন্ত্রীরা ভূমিকর ও প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ক্ষমতা পাইলে কোথাও কোথাও খাজানা কমাইয়া দিতে পারেন, এবং সর্ব্বত্র খাজনার বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী করিয়া দিতে পারেন। তাহা গবর্ণমেণ্ট চান না।

দরিদ্র চাষা ও মজুরদের প্রতি ইংরেজ আম্‌লাদের যদি এত দরদ, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই কেন দারিদ্র্য-ও-অজ্ঞতাজনিত প্লেগ-মহামারী বাইশ বৎসর ধরিয়া আড্ডা গাড়িয়া রহিয়াছে? সভ্য-গবর্ণমেণ্ট-শাসিত পৃথিবীর সমুদয় জাতির মধ্যে ভারতীয় লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা গরীব, নিরক্ষর ও অসুস্থ কেন? প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির জন্য বজেটে আরও বেশী করিয়া যাহাতে টাকা রাখা হয়, তাহার জন্য চেষ্টা প্রতিবৎসর শিক্ষিত ভারতবর্ষীয় সভ্যেরাই ত করেন; ইংরেজ আম্‌লারা করেন না।

পরিশিষ্টে "হস্তান্তরিত" বিষয়গুলির যে নমুনা-তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিচারবিভাগও নাই। কিন্তু সকলেই জানে দেশী শিক্ষিত লোকেরা বিচারকের কাজ উত্তমরূপে করিয়া থাকেন।

আমরা সংক্ষেপে দেখাইলাম যে যে-যে-কারণে ভারত-সচিব ও বড়লাট রাষ্ট্রীয় প্রধান কোন বিষয়েরই ভার দেশী কোন মন্ত্রীর হাতে দিতে চান না, সেই কারণগুলি ভিত্তি-হীন, অসার ও অমূলক।"

বড় বড় চাক্‌রী ও স্বরাজ।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমানে দেশী লোকেরা যে-পরিমাণে বড় চাক্‌রী পায়, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে পাইবে। ইহাকে কেহ যেন জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব (autonomy) বলিয়া ভ্রম না করেন। যে ব্যক্তি চাকর, সে বড় চাকর হইলেও ভৃত্য মাত্র, কর্ত্তা নহে। স্বাধীনতা, স্বরাজ, আত্মকর্ত্তৃত্ব, স্বায়ত্তশাসন,—যে-কোন শব্দের দ্বারাই আমরা জনসাধারণের রাষ্ট্রীয়কার্য্য পরিচালন ও নির্ব্বাহের অধিকার ও ক্ষমতার পরিমাণ বা মাত্রা প্রকাশ করি না কেন, তাহার মানে এই যে, দেশের লোকেরা কর্ত্তা হইবে, দেশের শাসন-প্রণালী অল্প বা অধিক পরিমাণে গণতন্ত্র হইবে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। বহু বহু শতাব্দী হইতে ইংলণ্ডের ছোট বড় সব সরকারী চাক্‌রীই ইংরেজরা পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাকে তাহারা কোনকালে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী (democratic form of government) বলিয়া ভ্রম করে নাই। তাহারা সব চাক্‌রীর অধিকারী থাকিলেও রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য বরাবর লড়িয়াছে। যখন রাজা জনের নিকট ইংরেজরা ম্যাগ্না কার্টা আদায় করিল, তখন সব চাক্‌রীই ইংরেজের ছিল। বিল্ অব্ রাইট্‌স্, পিটীশন অব্ রাইট্‌সের সময় সব চাক্‌রী ইংরেজের ছিল। যখন রাজা প্রথম চার্লসের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিবার জন্য রাজভক্ত দলের ও পার্লেমেণ্টের দলের মধ্যে যুদ্ধ হইল ও রাজা চার্লসের মাথা কাটা গেল, তখনও সব চাক্‌রী ইংরেজেরই ছিল। যখন দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্বকালে রাজার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করিবার চেষ্টা হওয়ায় বিপ্লব ঘটিল এবং দ্বিতীয় জেম্‌সের পদচ্যুতির পর উইলিয়ম ও মেরী সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন, তখনও সব চাক্‌রী ইংরেজরাই পাইত। তাহার পর আরো কতবার ইংলণ্ডে রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ হইয়াছে; তাহা চাক্‌রী লইয়া নহে। জাপানে ছোট বড় সব রকম চাক্‌রী বরাবর জাপানীরাই পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা ক্ষমতাশালী জাতি হইয়াছে চাক্‌রীর জোরে নহে, প্রজা-তন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এবং তাহারই গুণে। এইরূপ আরও অনেক দেশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বিদেশীর অধীন দেশে বড় বড় চাক্‌রীগুলি ক্রমে ক্রমে দেশী লোকদের হাতে আসা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। ইহার মূল্য আছে। কিন্তু যদি সমস্ত চাক্‌রীই আমাদের হাতে আসে, তাহা হইলেও সে অবস্থাকে আংশিক ভাবেও

জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব বা গণতন্ত্র বলা যাইবে না। ইহা ইংলণ্ডের ও জাপানের দৃষ্টান্ত হইতে দেখ ইয়াছি। এই ভ্রম কেহ যেন না করেন।

বড় বড় কতকগুলি চাক্‌রী যে আমাদের হাতে আসিবে, তাহা কি নীতি অনুসারে, কি পরিমাণে ও কত শীঘ্র আসিবে, তাহাও বুঝা দরকার।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকানরা চাক্‌রী সম্বন্ধে এই নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, যে, সমুদয় বিভাগের সমুদয় চাক্‌রী কালক্রমে ফিলিপিনোরা পাইবে, এবং তজ্জন্য প্রতিবৎসর বিস্তর আমেরিকানের চাক্‌রী যাইতেছে, এবং ফিলিপিনোরা সেইসব চাক্‌রী পাইতেছে। এই নীতি ও প্রণালীর নাম ফিলিপিনিজেশ্যন (Filipinisation) বা ফিলিপিনীকরণ। ভারতসচিব ও বড়লাটের রিপোর্টে এরূপ কোন নীতি ঘোষিত হয় নাই। তাঁহারা বলেন নাই যে সুদূর ভবিষ্যতেও সমুদয় বা প্রায় সমুদয় উচ্চপদ ভারতীয় লোকেরা পাইবে। তাঁহারা বলিতেছেন বটে—"We would remove from the regulations the few remaining distinctions that are based on race, and would make appointments to all branches of the public service without racial discrimination;" কিন্তু এই নীতিকে এত সর্ত্ত ও "কিন্তু" দ্বারা সংকীর্ণ করিয়া আনিয়াছেন যে উহার মূল্য খুব কমিয়া গিয়াছে।

চাক্‌রী পাইবার জাতিগত বাধা সমস্ত দূর করিয়া দেওয়ার সোজা মানে এই হয়, যে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যোগ্যতম লোকেরাই চাক্‌রী পাইবে। তাহা হইলে সিবিল সার্ভিস্ ও পুলিশবিভাগের মত বিভাগগুলির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিলাতে ও ভারতবর্ষে উভয়ত্র গ্রহণ করিতে হয়, এবং ভারতীয়-ও-ইংলণ্ডীয়-নির্ব্বিশেষে যোগ্যতম-লোকদিগকে চাক্‌রী দিতে হয়। কিন্তু তাহা করা হইবে না। বলা হইতেছে—

"It is obvious that we cannot rely on the present method of recruitment in England to supply a sufficiency of Indian candidates. That system must be supplemented in some way or other: and we propose to supplement it by fixing a definite percentage of recruitment to be made in India...... We have not been able to examine the question of the percentage of recruitment to be made in India for any service other than the Indian Civil Service...... We suggest that 33 per cent. of the superior posts should be recruited for in India, and that this percentage should be increased by 1½ per cent. annually until the periodic commission is appointed which will re-examine the whole subject."

কমিশন বসিবে নূতন প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার দশ বৎসর পরে। তখন শতকরা ৪৮টি কাজ ভারতবর্ষীয়েরা পাইতে পারিবে। তাহার পর কিন্তু এই অনুপাত কমিতেও পারে, বাড়িতেও পারে।

এখানে একটি কথা হঠাৎ সকলের চোখে পড়িবে না; কিন্তু তাহা লক্ষ্য করা উচিত। সিভিল সার্ভিসের সমস্ত চাক্‌রীর এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হইবে বলা হইতেছে না; বলা হইতেছে "33 per cent of the *superior* posts"। এই উচ্চতর ও উচ্চতম চাক্‌রী যে কোন্‌গুলি তাহা রিপোর্টের কোথাও লেখা নাই। সুতরাং বাস্তবিক কয়টি চাক্‌রী আমরা পাইব তাহা বুঝিবার জো নাই। সিভিলিয়ানদের সংখ্যা মোটামুটি ১৩০০। বৎসরে যদি মোটামুটি ৫০ জন অবসর লয়েন, এবং ৫০ জন নূতন চাক্‌রী পান (আজকাল তাহা হইতেছে না) তাহা হইলে ২৬ বৎসরে সার্ভিসটির মানুষগুলি নূতন হইয়া যাইতে পারে। যদি এরূপ নিয়ম হইত যে এখন হইতে যত চাক্‌রী খালি হইবে সবই দেশী লোকেরা পাইবে, তাহা হইলেও সমুদয় কর্ম্মচারী দেশী হইতে ২৫।৩০ বৎসর লাগিত। রাষ্ট্রীয় সমুদয় কাজ শিখিয়া লইবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট সময়; এবং ত্রিশ বৎসরে এরূপ একটা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহাকে হঠাৎ পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব বলা যায় না। যদি বৎসরে ৫০ জন নূতন চাক্‌রী পাইত, এবং এই সমস্ত চাকরীরই এক-তৃতীয়াংশ দেশী লোকে পাইত, তাহা হইলে বছর বছর কেবল মাত্র ১৭ জন করিয়া দেশী যুবক সিবিলিয়ান হইত। কিন্তু তাহাও হইবে না। কেবল মাত্র "সুপীরিয়র" অর্থাৎ উচ্চ পদগুলির এক-তৃতীয়াংশ দেশী লোককে দিবার মত লোক লওয়া হইবে। কিন্তু এই উচ্চ পদগুলি কি ও কয়টি? এবং নীচের পদগুলিই বা কয়টি এবং তাহার কত অংশ আমরা পাইব? রিপোর্টে কোথাও ইহার উত্তর নাই।

কিন্তু সকলের চেয়ে গুরুতর কথা যাহা রিপোর্টে আছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে চাক্‌রী পাইবার জাতি-

গত বাধা অপসারিত করা দূরে থাকুক, সেই বাধাকে বস্তুতঃ স্থায়ীই করা হইবে। রিপোর্টে ৩২৭ প্যারাগ্রাফে বলা হইতেছে,

"We are no longer seeking to govern a subject race by means of the services ; we are seeking to make the Indian people self-governing. To this end we believe that the continued presence of the English officer is vital, and we intend to act on that belief."

আমরা কার্য্যতঃ বড় চাকরী খুব কম পাইয়া থাকিলেও ভারতশাসনের ভিত্তিভূত মূল আইন ও ঘোষণাপত্র আদি দলিলে সব চাকরীতে আমাদের অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কেবল লর্ড কর্জন পরিষ্কার করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন যে ভারত শাসনের ব্রিটিশ প্রকৃতি (British character of the administration) রক্ষিত হওয়া চাই, অর্থাৎ, তাঁহার মতে, সমুদয় কর্তৃত্বের ও পরিচালনের কাজ ইংরেজের হাতে থাকা চাই। কিন্তু তাঁহার কথা পার্লেমেণ্টের বা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন আইনে বিধিবদ্ধ বা সম্রাটের কোন ঘোষণায় স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। অন্যদিকে কোম্পানীর আমলে বলা হইয়াছে, there shall be no governing caste in India, এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রেও আমাদের সব চাকরীতে অধিকার স্বীকৃত ও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য রিপোর্টে আছে :—

"At least so long as the Empire is charged with the defence of India a substantial element of Englishmen must remain and must be secured both in her Government and in her public services."

শুধু তাই নয় ; ইংরেজেরা বড় বড় পদে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কেন থাকিবেন, তাহার কারণ প্রকারান্তরে ইহাই বলা হইতেছে যে প্রত্যেক ইংরেজ কর্ম্মচারী তাহার জাতি ও রক্তের গুণে ভারতবর্ষীয় লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড়। লর্ড কর্জনের British character of the administration must be maintained উক্তিটিই রিপোর্টে ৩১৪ প্যারাগ্রাফে ভিন্ন কথায় বলা হইতেছে।—

"The characteristics which we have learned to associate with the Indian public services must as far as possible be maintained ; and the leaven of officers possessed of them should be strong enough to assure and develop them in the service as a whole. The qualities of courage, leadership, decision, fixity of purpose, detached judgment, and integrity in her public services will be as necessary as ever to India. There must be no such sudden swamping of any service with any new element that its whole character suffers a rapid alteration...... The solution lies therefore in recruiting year by year such a number of Indians as the existing members of the service will be able to train in an adequate manner and to inspire with the spirit of the whole."

যে-সব সদ্‌গুণের কথা বলা হইতেছে সেগুলি ইউরোপীয়দের একচেটিয়া ; এবং যে নূতন উপাদান (new element)টি বেশী পরিমাণে কোনো বিভাগে ঢুকাইলে তাহার সমুদয় প্রকৃতির উৎকর্ষ শীঘ্র বদ্‌লাইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে নূতন উচ্চপদ প্রাপ্ত ভারতীয় লোকেরা! অর্থাৎ যে রকমের ইংরেজ যুবক যতই চাকরী পাক, তাহাদের দ্বারা কোন বিভাগের প্রকৃতির অধোগতি ঘটিবে না ; ভারতীয় যুবকেরা ঢুকিলেই সেই আশঙ্কা আছে! ইহাকেই বলে জাতিগত বাধা (racial bar) দূর করা! এই রকমের কথা ভারতশাসনের ভিত্তিভূত কোন কাগজে পত্রে আগে ছিল না। এখন ক্রমশঃ শোনা যাইতেছে, এবং নূতন ভারতশাসন-ব্যবস্থা যখন বিধিবদ্ধ হইবে, তখন তাহাতে যদি লেখা থাকে যে কোন কালেই ভারতীয়রা নিজেদের দেশের কোন বিভাগের সমস্ত উচ্চ পদ পাইবে না, তাহা হইলে, এখন, কাজে যাই হউক, থিওরিতে যে অধিকার আমাদের আছে তাহার হ্রাস হইবে, তাহা লুপ্ত হইতেও পারে। কয়েকটি বড় চাকরী পাইবার উল্লাসে এই অতি গুরুতর কথাটা ভুলিলে চলিবে না।

যে কারণে কোন বিভাগে বেশী ভারতীয় কর্ম্মচারী লওয়া হইবে না, তাহা উপরে উদ্ধৃত শেষ ইংরেজী বাক্যটিতে আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, প্রতি বৎসর এত-সংখ্যক দেশী চাকরকে প্রত্যেক বিভাগে লওয়া হইবে, যাহাদিগকে ঐ ঐ বিভাগের বর্ত্তমান ইংরেজ কর্ম্মচারীরা যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত ও সেই বিভাগের কর্ম্মচারী-সমুদায়ের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারিবেন। ভাল কথা। সিবিল সার্ভিসের কথা ধরা যাক। ইহার কর্ম্মচারীর সংখ্যা মোটামুটি ১৩০০। তন্মধ্যে ৫০।৬০ জন মাত্র দেশী লোক, সুতরাং তাহারা ইংরেজদের মহদ্‌গুণ পাইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মনে করা যাক

যে যদি ২৫।২৬ বৎসরে সমুদয় সিবিল সার্ভিসটি কেবল মাত্র দেশীলোকে পূর্ণ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইত, এবং তজ্জন্য প্রতিবৎসর সমুদয় শূন্য পদগুলি দেশীয় যুবকদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে বৎসরে ৫০ জন করিয়া নূতন লোক আসিত। এই নূতন লোকগুলিকে কাজ শিখান এবং সিবিল সার্ভিসের ভাবে অনুপ্রাণিত করা কি সহস্রাধিক প্রাচীনতর কর্ম্মচারীদের পক্ষে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ? কখনই নহে। কেননা, পুরাতন সিবিলিয়ানরা নূতন সিবিলিয়ানদিগকে ত বরাবরই কাজ শিখাইতেছেন, এবং সার্ভিসের ভাবে অনুপ্রাণিত (inspired with the spirit of the whole service) করিতেছেন। তফাৎ এই যে এখন অধিকাংশ যুবা সিবিলিয়ান ইউরোপীয়; সার্ভিসটিকে ভারতীকৃত (Indianised) করিতে হইলে সমস্ত বা বেশীর ভাগ করিতে হইবে দেশী যুবক। এমন কোন্ কাজ আছে যাহা আমাদের যুবকেরা শিখিতে পারে না ? উপরে উদ্ধৃত ইংরেজী বাক্যগুলিতে উল্লিখিত এমন কোন্ গুণ আছে, যাহার দ্বারা আমাদের যুবকেরা অনুপ্রাণিত হইতে পারে না ? ভারতীয় যুবা চাকুরেদিগকে শিখাইবার ও মহদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার কঠিনতা এত অধিক যে তজ্জন্য খুব কম কম করিয়া তাহাদিগকে মোটা মাহিনার কাজগুলিতে নিযুক্ত করা উচিত, এরূপ মনে করিবার কোনই সত্য কারণ নাই। ক্রমে ক্রমে চাকরীগুলি পাইয়া সমুদয় চাকরী ভারতবাসীরা পাইলে, কোন বিশৃঙ্খলা বা বিপ্লব ঘটিবে না, তাহাতে ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদের কাজ শিখিবারও যথেষ্ট সময় হইবে। যদি কোন প্রকারের অনুপাত বাঁধিয়া না দিয়া, যোগ্যতমদিগকে সব বড় চাকরী দেওয়া হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম অর্দ্ধেক চাকরী দেশী এবং অর্দ্ধেক ইউরোপীয়রা পাইবে। ক্রমে দেশী লোকেরা আরো বেশী পাইবে। এইরূপে ৫০ বৎসরে সমুদয় বা অধিকাংশ বড় চাকরী দেশী লোকেরা পাইতে পারে। ইহা বিপ্লব নহে। ইহাও যদি হইতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দের উচ্চাভিলাষের সহিত "সহানুভূতি" প্রকাশ না করাই ভাল।

রিপোর্টের ৩২৩ প্যারাগ্রাফে বলা হইতেছে, হস্তান্তরিত বিভাগগুলিতে "English commissioners, magistrates doctors and engineers will be required to carry out the policy of Indian ministers." রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি যে-সব নীতি অনুসারে প্রধান ও অপ্রধান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, এবং অপ্রধান বিষয়গুলির যে নমুনা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ত এমন কিছু দেখিলাম না, যাহাতে ইংরেজ কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে দেশী মন্ত্রীর আদেশ পালন করিতে হইবে। বরং ভাগটি এমন ভাবেই হইবার সম্ভাবনা যাহাতে অধিকাংশ বিভাগের ইংরেজ কর্ম্মচারীরা দেশী মন্ত্রীদের এলাকার বাহিরেই থাকিবেন।

নির্ব্বাচক কাহারা হইবে ?

কি কি বিষয়ের জন্য দেশী মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন, তাহা যেমন একটি ইংরেজপ্রধান কমিটি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে, ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কাহারা করিবে, তাহাও একটি কমিটি দ্বারা নিরূপিত হইবে। ইহার উপর ব্যবস্থাপক সভাগুলির কার্য্যকারিতা বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে। নির্ব্বাচক বেশীর ভাগ এমন সব লোককে করা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা জো-হুকুম রকমের লোকই বেশী পরিমাণে প্রতিনিধি হইতে পারে। নির্ব্বাচক হইবার জন্য কিরূপ যোগ্যতা থাকা চাই, তাহা যতদিন জানা না যাইতেছে, ততদিন ব্যবস্থাপক সভাগুলি কিরূপ হইবে বলা যাইবে না।

নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া নির্ব্বাচকদিগের যোগ্যতা আদি স্থির করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইবে, তাহার সভাপতি মনোনীত হইবেন ভারতবর্ষের বাহির হইতে (chosen from outside India); দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাঁহার শুভাগমন হইবে না ত ? তারপর দুজন অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্ম্মচারী এবং দুজন মর্য্যাদা-ও-খ্যাতিমান দেশী লোক গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সভ্য নিযুক্ত হইবেন। কমিটি যখন যে প্রদেশে যাইবেন, তথাকার গবর্ণমেণ্ট সেই প্রদেশের কাজের জন্য একজন সিবিলিয়ান ও একজন দেশী লোককে কমিটিভুক্ত করিয়া দিয়া কাজ করিতে বলিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইংরেজ ও গবর্ণমেণ্ট পক্ষের লোকের সংখ্যাই এই কমিটিতে বেশী হইবে।

রিপোর্টের ১৮৭ প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে "No one would propose to prescribe an educational qualification for the vote." ইহার মানে যদি এই হয় যে নিরক্ষর লোকেরাও যথেষ্ট সম্পত্তিশালী এবং ট্যাক্সদাতা হইলে নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবে, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কারণ, মিস্ত্রীর কাজ করিতে, চাষ বাস করিতে, দোকান পাট চালাইতে বা সম্পত্তি রক্ষা করিতে যে পারে, সে নিরক্ষর হইলেও সামান্য-লেখাপড়া-জানা লোক অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান নহে, এবং ভোট পাইবার কম যোগ্য নহে। কিন্তু কথাগুলির মানে যদি এই হয় যে কেহ যদি খুব শিক্ষিত খুব বিদ্বান হয় অথচ যথেষ্ট সম্পত্তির মালিক না হয় বা যথেষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স না দেয়, তাহা হইলে তাহার ভোট থাকিবে না, তবে ইহাতে আমাদের আপত্তি আছে।

নির্ব্বাচকেরা সাক্ষাৎভাবে প্রতিনিধিদের জন্য ভোট দিবে, এই প্রস্তাব ভাল। কিন্তু রিপোর্টে যে বলা হইয়াছে, একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নির্ব্বাচকদের যোগ্যতা ভিন্ন রকমের হইতে পারিবে, ইহা মোটেই ভাল নয়। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের খুব সুবিধা হইবে। মনে করুন কোন প্রদেশের কতকগুলি জেলায় শিক্ষার বিস্তার অধিক হইয়াছে এবং লোকদের আয়ও বেশ আছে, এবং তাহারা বেশী ট্যাক্স দিয়া থাকে। অন্য কতকগুলি জেলাতে শিক্ষার বিস্তার কম হইয়াছে এবং লোকে তেমন সম্পন্ন নহে, ট্যাক্সও তত দেয় না। এমত স্থলে, সমান শিক্ষিত হইয়াও কোন জেলার কতকগুলি লোক ভোট দিবার ক্ষমতা পাইল না, অন্য জেলার লোকেরা পাইল, এমন কি তথাকার অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোকেরাও পাইল, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত হইবে? কতকগুলি জেলার লোক, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বার্ষিক ৩০ টাকা খাজানা দিয়াও নির্ব্বাচনাধিকার পাইল না, অন্য কোন কোন জেলার লোক বার্ষিক ১৫৲ টাকা খাজানা দিয়াও ভোট পাইল, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত হইবে? ইহা শুধু ন্যায়ের কথাও নহে। একই প্রদেশের সর্ব্বত্র একই রকম যোগ্যতা অনুসারে নির্ব্বাচকতালিকা প্রস্তুত না হইলে, সরকারী কর্ম্মচারীরা ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যোগ্যতার মাপকাঠিটি এরূপ করিতে পারেন, যাহাতে, নির্ব্বাচনের মানে ও গুরুত্ব বোঝে না, প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর আবশ্যকতা ও উপকারিতা বোঝে না, নির্ব্বাচন-অধিকারের দায়িত্ব বোঝে না, কেবলমাত্র আমলাদের হুকুম অনুসারে ভোট দিতে পারে, এরূপ নির্ব্বাচকের সংখ্যাই বেশী হয়। এইসব কারণে নির্ব্বাচন-অধিকার দিবার জন্য, একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের যোগ্যতার মাপকাঠি ব্যবহারের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

রিপোর্টে এক এক শ্রেণীকে বা ধর্ম্মসম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা প্রতিনিধি দিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ঠিক। ঠিকই বলা হইয়াছে যে—

"We conclude unhesitatingly that the history of self-government among the nations who developed it, and spread it through the world is decisively against the admission by the state of any divided allegiance; against the state's arranging its members in any way which encourages them to think of themselves primarily as citizens of any smaller unit than itself. ...... The British Government is often accused of dividing men in order to govern them. But if it unnecessarily divides them at the very moment when it professes to start them on the road to governing themselves, it will find it difficult to meet the charge of being hypocritical or short sighted.

"There is another important point. A minority which is given special representation owing to its weak and backward state, is positively encouraged to settle down into a feeling of satisfied security; it is under no inducement to educate and qualify itself to make good the ground which it has lost compared with the stronger majority......

"We regard any system of communal electorates, therefore, as a very serious hindrance to the development of the self-governing principle. The evils of any extension of the system are plain."

এইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত মত প্রকাশ করিবার পরও কিন্তু মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ইহা দুটি কারণে সমর্থিত হইয়াছে, (১) ১৯০৯ সালে মিণ্টোর আমলে তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে; এখন তাহা কাড়িয়া লওয়া যায় না; (২) কংগ্রেস-লীগ্ ব্যবস্থাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে এই সাম্প্রদায়িক অধিকার রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে বাদানুবাদ করা বৃথা। মুসলমানেরা যদি স্বয়ং এই অধিকারের অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া উহা ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলেই মঙ্গল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে শিখদিগকে নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি দিলেন, ইহার সম্পর্কে রিপোর্টে

যাহা বলা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই কাঁচা কথা। তাহা কি, রিপোর্টের ভাষায়, hypocritical and short-sighted নয়? আসল কারণ, স্যার মাইকেল ওডোআইয়ারের মত কর্ম্মচারীদের শিখদিগকে সমগ্র ভারতীয় জাতি হইতে আলাদা করিয়া রাখিবার ইচ্ছা, এবং সৈন্যসরবরাহকারী সম্প্রদায়কে অন্য সব সম্প্রদায় হইতে অধিক গৌরব ও অধিকার দানের আবশ্যকতা।

যেসব প্রদেশে মুসলমান ভোটদাতা অর্থাৎ নির্ব্বাচকদের সংখ্যা অন্য সকল নির্ব্বাচকদের চেয়ে বেশী, সেখানে মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার পাইবে না। এই ব্যবস্থা ভাল।

শিক্ষার অভাব।

শিক্ষার বিস্তার দেশে যথেষ্ট না হওয়ায় যে আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার শীঘ্র বেশী পাইতে পারি না, তাহা রিপোর্টে নানাভাবেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য গবর্ণমেন্ট যে কিরূপ দোষী ও দায়ী, তাহা সরলভাবে কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। দেশের লোকদেব উপর দোষ আরোপ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা আছে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"As regards the limited diffusion of education we must also take into account the conservative prejudices of the country...... in India social customs have greatly multiplied the difficulties in the way of female education."

ইহা সত্য বটে, কিন্তু বালক ও যুবকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ত এরূপ কোন সামাজিক বাধা ছিল না ও নাই। মানিয়া লইলাম যে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে আমরাই দি নাই, গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন (যদিও ইহা সত্য নহে)। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বালক ও যুবকদিগকে যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগ কেন দেন নাই?

তাহার পর রিপোর্টে লেখা হইয়াছে :—

"The spread of education among the lower classes is also attended by peculiar difficulties. India is a predominantly agricultural country, and an agricultural population is always and everywhere suspicious of the effect of education upon rural children."

কিন্তু গবর্ণমেন্ট কি দেখাইতে পারেন যে কৃষকবালকদিগের বাড়ীর কাছে কাছে পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, অথচ তাহাদের বাপমা তাহাদিগকে পাঠশালায় যাইতে দেয় নাই? আমরা বরং বাংলা ও আসাম প্রদেশের অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়িনী সমিতির রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাইতেছি, যে, সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই শিক্ষা পাইবার বেশ আগ্রহ রহিয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, সব দেশেই কৃষিজীবী শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার ফলকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। হইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, যে, কৃষিপ্রধান বহু দেশে শিক্ষার খুব বিস্তার হইয়াছে। যেমন আমেরিকায়। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা বলেন, agriculture is still the predominant industry of the United States। যেমন ফ্রান্সে; সেখানে কৃষিই সকলের চেয়ে বেশী লোকের জীবনোপায়। আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে হুইটেকারের পঞ্জিকায় আছে, "Ireland is essentially an agricultural country," সেখানেও কিন্তু শিক্ষার বিস্তার খুব হইয়াছে। আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। গবর্ণমেন্ট নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাহার সমুচিত প্রতীকারের চেষ্টা করিলে, তাহাই "অনেস্ট্" honest পন্থা হইত।

নূতন ট্যাক্স বসান সোজা নয়।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতির জন্য গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট টাকা দেন না। ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যেরা এ বিষয়ে প্রতি বৎসর প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং তর্ক বিতর্ক করেন। ভারতশাসনের প্রস্তাবিত নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে পরও যে দেশী মন্ত্রীদের হাতে অর্পিত নিম্নশিক্ষা আদি বিষয়ের জন্য যথেষ্ট টাকার বরাদ্দ হইবার সম্ভাবনা কম, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে টাকার অকুলান হইলে দেশী মন্ত্রীরা নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা প্রস্তাব মাত্র করিতে পারিবেন; ট্যাক্স নিশ্চয়ই বসাইতে পারিবেন, এমন ক্ষমতা তাঁহাদের কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার থাকিবে না। সুতরাং অর্থাভাবেই তাঁহাদের কৃতকার্য্য না হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। অথচ, তাঁহাদের ৫ বা ১০ বা ১২ বৎসর অন্তর অন্তর কাজ পরীক্ষা করিয়া অর্পিত কাজের ভার কাড়িয়া লওয়া হইবে, কিম্বা নূতন কাজের ভার দেওয়া হইবে! চমৎকার ব্যবস্থা। এই দরিদ্র দেশে ট্যাক্স বাড়ান বা নূতন ট্যাক্স বসানও যে কত কঠিন,

তাহা গবর্ণমেণ্টের অবিদিত নহে। এই রিপোর্টেরই ১৮৭ প্যারাগ্রাফে রহিয়াছে—

"The defects of the present [educational] system have often been discussed in the legislative councils but, as was inevitable so long as the councils had no responsibility, without due appreciation of financial difficulties, or serious consideration of the question how far fresh taxation for educational improvement would be acceptable."

অভিজ্ঞতার অভাব।

ভারতগবর্ণমেণ্টকে কোন বিষয়েই দেশের লোকদের কাছে "দায়ী" করা হইবে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে কোন কোন অপ্রধান বিষয়ে জনসাধারণের নিকট "দায়ী" করিবার প্রস্তাব রিপোর্টে আছে। সব বিষয়ে কিম্বা কোন প্রধান বিষয়ে দেশের লোকের নিকট "দায়ী" না করিবার কারণ এই বলা হইয়াছে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনে কোন অভিজ্ঞতা নাই, এবং নির্ব্বাচক ও প্রতিনিধিদিগকে এসকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে সময় লাগিবে। এই অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা বর্ত্তমান কালের আমেরিকান বা ইংরেজ বা ক্যানেডিয়ান বা ফরাশিদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অনুসারে বিচার করিলে হইবে না। দেখিতে হইবে যে তাহারা যখন আত্মকর্তৃত্ব প্রথম লাভ করিয়াছিল, সেই সময়ে তাহাদের যে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা ছিল, এখন আমাদের তাহা আছে কি না। ইংলণ্ড বহুশতাব্দী ধরিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে। অথচ বহু শতাব্দী ধরিয়া আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করার পরও সেখানকার মিউনিসিপালিটি আদিতে ১৮৩৫ সালেও লোকেরা নিজেদের কাজ কেমন করিয়া চালাইত দেখুন। রেড্‌লিক্‌ ও হার্ষ্ট (Redlich and Hirst) প্রণীত Local Government in England নামক পুস্তকে ঐ বৎসরের একটি পার্লেমেণ্টারী কমিশনের রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"In general the corporate funds are but partially applied to municipal purposes, such as the preservation of the peace by an efficient police, or in watching or lighting the town, &c.; but they are frequently expended in feasting, and in paying salaries of unimportant affairs. In some cases, in which the funds are expended on public purposes, such as building public works, or other objects of local improvement, an expense has been incurred much beyond what would be necessary if due care had been taken."

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক আগে হইতে ইংলণ্ড স্বশাসক ছিল; কিন্তু তখনও ইংরেজদের সার্ব্বজনিক বিষয়ে উৎসাহ এবং পরার্থপরতা কিরূপ কম ছিল, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক লেকী বলেন :—

"The fault of the time was not so much the amount of vice as the defect of virtue, the general depression of motives, the unusual absence of unselfish and disinterested action."

লর্ড ডার্হামের রিপোর্ট অনুসারে ১৮৪০ সালে কানাডাকে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীন আত্মকর্তৃত্ব (internal autonomy) দেওয়া হয়। তখন কানাডার অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড ডার্হামের রিপোর্টে আছে—

"It is impossible to exaggerate the want of education among the inhabitants. No means of instruction have ever been provided for them, and they are almost and universally destitute of the qualifications even of reading and writing."

তাহাদের শিক্ষকদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "a great proportion of the teachers could neither read nor write।" তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লর্ড ডার্হামের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে রাস্তাঘাটের এমন দুরবস্থা ছিল যে কখন কখন তাহা দিয়া যাতায়াত অসম্ভব হইত। পুলিস-কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম থাকায় অপরাধী ধরিবার ও তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার বন্দোবস্ত সন্তোষজনক ছিল না। লোকদের মধ্যে ভয়ানক অনৈক্য ও রেষারেষি ছিল; কারণ ইংরেজ ও ফ্রেঞ্চ অধিবাসীদের মধ্যে মিল ছিল না। অর্দ্ধেকেরও উপর অধিবাসীদের মাতৃভূমির, অর্থাৎ ফ্রান্সের, লোকেরা তখন "প্রজার নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্ট" কাহাকে বলে জানিত না। যে-সব ফরাশি সেখান হইতে আসিয়া কানাডায় বাস করিয়াছিল তাহাদের ও তাহাদের বংশধরদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না। লর্ড ডার্হামের রিপোর্টে আছে, "French and British combined for no public objects or improvements, and could not harmonise even in associations of charity।" এই রকম অবস্থায় তিনি কানাডার লোকদিগকে পুরা দায়ী গবর্ণমেণ্ট দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং তাহা দেওয়াও হইল। লর্ড ডার্হামের একটি যুক্তি এই :—

"The colonists may not always know what laws are best for them or which of their countrymen are

the fittest for conducting their affairs, but, at least, they have a greater interest in coming to a right judgment on these points, and will take greater pains to do so than those whose welfare is very remotely and slightly affected by the good or bad legislation of these portions of the Empire. If the colonists make bad laws, and select improper persons to conduct their affairs, they will generally be the only, always the greatest sufferers; and like the people of other countries, they must bear the ills which they bring on themselves, until they choose to apply the remedy."

এই যুক্তি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর বিচার করিবার সময় মনে রাখিবার ও প্রয়োগ করিবার মত সদাশয়, নিঃস্বার্থ ও দূরদর্শী ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ এখন বোধ হয় একজনও নাই। বরং ভারতসচিব ও বড়লাট তাঁহাদের রিপোর্টে আমাদের দেশের বিজ্ঞতম ও অভিজ্ঞতম লোককেও খোকা মনে করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আমাদের দেশের ৬০।৭০।১০০ জন বাছা-বাছা লোকও দেশের মঙ্গল তত্টা বুঝিবেন না, যতটা ১ জন বিদেশী গবর্ণর ও তাঁহার ২।১ জন বিদেশী পরামর্শদাতা বুঝিবেন। আমরা মনে করি, আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের দেশের মঙ্গল খুবই বুঝেন। ইংরেজরা তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই আমাদিগকে ক্ষমতা দিতেছেন না,—আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া নহে।

ভারতীয় লোকদের আত্মকর্তৃত্ব লাভের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান আপত্তি যাহা কিছু হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা টুয়ার্ড্‌স্ হোমরূল নামক আমাদের ইংরেজী বহি তিনখানিতে আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের আত্মকর্তৃত্বলাভের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে চান, তাঁহাদের এই তিনটি বহি পড়া উচিত। এই বহির পুনঃপুনঃ উল্লেখ করায় আমরা আত্মম্ভরী বিবেচিত হইতে পারি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই বই পড়িতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কিরূপ হইবে ?

ভারতবর্ষের প্রধান আটটি প্রদেশের শাসনকর্তার নাম হইবে গবর্ণর, যদিও সকল গবর্ণরের বেতন ও পদমর্য্যাদা সমান হইবে না। সিবিলিয়ানরাও গবর্ণর হইতে পারিবেন। ভারতীয়দের কিন্তু ইচ্ছা যে সব গবর্ণরই বিলাত হইতে আসেন। গবর্ণরের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (Executive council) থাকিবে। উহার একজন সভ্য ইংরেজ কর্ম্মচারী হইবেন, এবং অন্য একজন ভারতীয় সভ্যকেও গবর্ণর মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবেন। দেশের লোক চাহিয়াছিল যে দেশী সভ্যকে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যেরা নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। রিপোর্ট-লেখকগণ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। হস্তান্তরিত, অর্পিত বা ন্যস্ত বিষয়গুলির ভারপ্রাপ্ত এক বা একাধিক দেশী মন্ত্রী থাকিবেন। দেশী মন্ত্রীকেও গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবেন। ইংলণ্ডে হাউস্ অব কমন্সের যে দলপতি-সভ্যের অনুচরের সংখ্যা ও প্রভাব সকলের চেয়ে বেশী, রাজা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকেই অন্যান্য মন্ত্রী বাছিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিতে বলেন। এই ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা কোন বিষয়ে পার্লেমেণ্টে কম ভোট পাইয়া পরাজিত হইলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আমাদের দেশে প্রধান মন্ত্রী বলিয়া কেহ থাকিবেন না। একাধিক মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেও প্রত্যেক মন্ত্রীকেই গবর্ণর নিযুক্ত করিবেন। বিলাতী ব্যবস্থার গুণ এই যে তথায় বিশেষ প্রভাবশালী পার্লেমেণ্টের সভ্য ভিন্ন কেহ প্রধান মন্ত্রী বা সাধারণ মন্ত্রী হইতে পারেন না; এখানে গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভার যে-কোন সভ্যকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ব্যবস্থাপক সভার তাঁহার উপর ক্ষমতাও খুব কম থাকিবে। সুতরাং মন্ত্রিত্বলাভ গবর্ণরকে খুসী করার উপর, তাঁহার অনুগ্রহ লাভের উপর নির্ভর করিবে। এ অবস্থায় স্বাধীনচেতা ব্যবস্থাপকসভার সভ্যদের মন্ত্রী হইবার অর্থাৎ দেশের লোকে যাঁহাদিগকে বেশী শ্রদ্ধা করে তাঁহাদের মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা কত থাকিবে, বেশ বুঝা যাইতেছে। গবর্ণর আবার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হইবেন, এবং কোন সরকারী সভ্যকে সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। বিলাতী হাউস্ অব্ কমন্সে রাজা বা প্রধান মন্ত্রী সভাপতির কাজ করেন না; সে কাজ করেন স্পীকার (Speaker); তিনি কাহারও অধীন নহেন। আমাদের মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিবেন গবর্ণর, এবং ব্যবস্থাপক সভা তাহার জীবিতকাল তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। তবে যদি তিনি তিন বৎসর পরে

নূতন নির্ব্বাচনের সময় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত না হন, তাহা হইলে কাজে-কাজেই আর তাঁহার মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পুনর্ব্বার নির্ব্বাচিত হইলে গবর্ণর তাঁহাকে আবার মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন, নাও পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, কেহ যতদিন মন্ত্রী থাকিবেন, ততদিন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরাও তাঁহাকে সরাইতে পারিবেন না, অর্থাৎ তিনি ততদিন দেশের লোকদের কাছে বাস্তবিক দায়ী থাকিবেন না। রিজার্ভড্ অর্থাৎ প্রধান বিষয়গুলির উপর দেশী মন্ত্রীর বা মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। অপ্রধান যে বিষয়ের ভার তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতেও তাঁহাদের নির্দ্ধারণ চূড়ান্ত হইবে না। গবর্ণর তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ইচ্ছা করিলেই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আমরা ঠিক বলিতেছি কি না, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ২১৯ প্যারাগ্রাফটি পড়িলেই বুঝা যাইবে :—

"The portfolios dealing with the transferred subjects would be committed to the ministers, and on these subjects the minister together with the governor would form the administration. On such subjects their decisions would be final, *subject only* to the Governor's advice and control. We do not contemplate that from the outset the Governor should occupy the position of a purely constitutional Governor who is bound to accept the decisions of his ministers. Our hope and intention is that the ministers will gladly avail themselves of the Governor's trained advice upon administrative questions, while on his part he will be willing to meet their wishes to the furthest possible extent, in cases where he realises that they have the support of popular opinion * We reserve to him a power of control, because we regard him as generally responsible for his administration, but we should expect him to refuse assent to the proposals of his ministers only when the consequences of acquiescence would clearly be serious Also we do not think that he should accept without hesitation and discussion proposals which are clearly seen to be the result of inexperience. But we do not intend that he should be in a position to refuse assent at discretion to all his ministers' proposals. We recommend that for the guidance of Governors in relation to their ministers, and indeed on other matters also, an Instrument of Instructions be issued to them on appointment by the Secretary of State in Council."

এক্ষণে পাঠকেরা দেখিলেন, যে, মন্ত্রীদের ক্ষমতা কতটুকু হইবে, এবং দেশের লোকদের কাছে তাঁহাদের দায়িত্বই বা কি প্রকার হইবে। ইহারই নাম "জনসাধারণের নিকট দায়ী শাসনপ্রণালীর বাস্তবিক খাঁটি প্রথম ধাপ!"

* লোকমত মন্ত্রীকে সমর্থন করিতেছে কি না তাহা গবর্ণর কি প্রমাণ দ্বারা বুঝিবেন?

নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পর প্রথম পাঁচ বৎসর দেশী মন্ত্রীদের ক্ষমতা ও "দায়িত্ব" পূর্ব্ববর্ণিতরূপ থাকিবে। পাঁচ বৎসর পরে এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিবে, যে, দেশী মন্ত্রীদের বেতন প্রতিবৎসর ব্যবস্থাপক সভায় মঞ্জুর করাইতে হইবে। কোন মন্ত্রীর উপর ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যের আস্থা না থাকিলে, তাঁহারা তাঁহার বেতন মঞ্জুর করিবেন না; সুতরাং তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। ইহাকে বাস্তবিক "দায়ী হওয়া" বলা যায়। কিন্তু ইহা পাঁচ বৎসর পরে হইবে; কিন্তু তখনও দেশী মন্ত্রীদের কোন বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না; এবং তাঁহারা গবর্ণরের দ্বারাই নিযুক্ত হইতে থাকিবেন।

দেশী মন্ত্রীদের বেতন সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হইতেছে, "We make no recommendation in regard to pay. This is a matter which may be disposed of subsequently।" সম্ভবতঃ তাঁহাদের বেতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির (Executive Councilএর) সভ্যদের চেয়ে কম হইবে। তাঁহাদের পদমর্য্যাদাও ইহাঁদের মত হইবে না, কারণ, বলা হইয়াছে, "they [the ministers] would be members of the Executive Government, but not members of the Executive Council"।

ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রী হইতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে গবর্ণরকে খুসি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তা ছাড়া গবর্ণর প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট বা বিভাগের জন্য এক একজন আণ্ডার সেক্রেটরী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতেও তিনি এই কাজগুলির জন্য লোক মনোনীত করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, মন্ত্রিত্ব ও আণ্ডার সেক্রেটরীত্ব রূপ প্রলোভন থাকায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের স্বাধীনচিত্ততা হ্রাস হইতে পারিবে।

দেশী মন্ত্রী বা মন্ত্রীরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, নিম্নশিক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ের ভার পাইবেন। এখনও ত প্রাদেশিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির দেশী সভ্যের হাতে এইরূপ

বিভাগের ভার থাকে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের হাতে ছিল, বর্দ্ধমানের মহারাজার হাতে আছে। প্রস্তাবিত নূতন ব্যবস্থায় ঐসকল বিষয়ের চেয়ে বেশী গুরুতর বিষয় বা কঠিন কাজের ভার আমাদের মন্ত্রীদিগকে কই দেওয়া হইল ?

নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিচার করিয়া দেখিবেন, যে, আরও কোন কোন বিষয়ের ভার দেশী মন্ত্রীদিগকে দেওয়া যাইতে পারে কি না; কিম্বা যেগুলির ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কোন কোনটির বা সবগুলির ভার কাড়িয়া লওয়া উচিত কি না। ভারতগবর্ণমেণ্ট যাহা স্থির করিবেন, ভারতসচিবের সম্মতিক্রমে, তদনুসারে কাজ হইবে। সুতরাং আমাদের "দায়ী গবর্ণমেণ্ট" কতটা থাকিবে না-থাকিবে, তাহা পাঁচ বৎসর পরে ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহসাপেক্ষ হইবে। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার দশবৎসর পরে, এক পার্লেমেণ্টারী কমিশনও এইরূপ বিচার করিয়া অনুগ্রহ নিগ্রহ যাহা হউক একটা কিছুর ব্যবস্থা করিবেন। এই দশ-বার্ষিক পরীক্ষায় পাস্ ফেল একটা কিছু হইবার পর, আমাদিগকে বারো বারো বৎসর অন্তর এরূপ পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষা যে কবে ফুরাইবে, কবে যে আমরা প্রধান অপ্রধান সর্ব্ববিষয়ের ভার পাইয়া পূরা "দায়ী গবর্ণমেণ্ট" পাইব, তাহা কোথাও লেখা নাই। কিন্তু আমরা যাহাতে ভিক্ষুকোচিত বা গোলামসুলভ বেশী আশা করিয়া না ফেলি, তজ্জন্য রিপোর্টের ২৬৩ প্যারাগ্রাফে বহুৎ কথা লেখা হইয়াছে। গোড়ার দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"In proposing the appointment of a commission ten years after the new Act takes effect we wish to guard against possible misunderstanding. We would not be taken as implying that there can be established by that time complete responsible government in the provinces."

এখনই আমাদিগকে পূরা প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব দিলেই ঠিক হইত। অন্ততঃ, কতবৎসর পরে তাহা দেওয়া হইবে, তাহা এখনই নির্দ্দিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। বরাবর অনুগ্রহজীবী থাকা কেবল যে অপমানের বিষয় তাহা নহে; অন্য সব রকমের উঞ্ছবৃত্তির মত ইহার উপর একটুও নির্ভর করা যায় না। এখন ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে; ভারতবর্ষকে খুসি করিবার বা ভুলাইবার দরকার হইয়াছে। সুতরাং এখন যতটুকু দিবার বা অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা হইবে না। এখন যাহা নিশ্চিত পাওয়া যাইবে, তাহাই পাওয়া; অঙ্গীকার সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হইলেও কতকটা পাওয়ার মত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহা পাইলাম না, কিম্বা যাহা পাইবার ঠিক কোন অঙ্গীকারও পাইলাম না, তাহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক বা অন্যবিধ উন্নতি মানুষকে সন্দেহ না করিলেও হইতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে হইলে সন্দেহকে বাদ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

প্রাদেশিক কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট (Executive Government) কাহাকে কাহাকে লইয়া গঠিত হইবে, তাহা এখনও শেষ করিয়া বলা হয় নাই। গবর্ণর, একজন সরকারী ইংরেজ সভ্য, গবর্ণরের নিযুক্ত একজন দেশী সভ্য, এক বা একাধিক দেশী মন্ত্রী, ইঁহারা তো থাকিবেনই। অধিকন্তু গবর্ণর ইচ্ছা ও প্রয়োজন-মত এক বা একাধিক উচ্চপদস্থ সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীকে পরামর্শদাতা রূপে লইতে পারিবেন। তাঁহারা কোন দফ্‌তর বা ডিপার্টমেণ্টের ভার প্রাপ্ত হইবেন না। ইঁহাদের নিয়োগের কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, গবর্ণর যদি বিলাত হইতে একায়িক আসেন, তাহা হইলে তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিবে না। এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একমাত্র ইংরেজ আম্‌লার নিকট তিনি যথেষ্ট পরামর্শ না পাইতে পারেন। এইজন্য তাঁহাকে প্রয়োজনমত পরামর্শ-দাতা লইবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের সন্তান ও অধিবাসী দেশী মন্ত্রীদের বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের গবর্ণরকে পরামর্শ দিবার মত অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা নাই, কিম্বা তাঁহারা সুপরামর্শ দিবেন না, এবং কেবলমাত্র ইংরেজ আম্‌লাদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাই মহামূল্যবান্ ও নির্ভরযোগ্য। অবশ্য, আসল একটা প্রকৃত কারণের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা এই, যে, (১) গবর্ণর, (২) ইংরেজ সভ্য, (৩) দেশী সভ্য, (৪) (৫) দেশী মন্ত্রী দুজন লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট হইলে ইহাতে দেশী সভ্যের সংখ্যা বেশী হইয়া যায়।

এইজন্য উপযুক্ত সংখ্যক ইংরেজ আমলা লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টে ইংরেজপক্ষ প্রবল করা দরকার।

পার্লেমেণ্টারী কমিশনের কাজ।

উপরে যে পার্লেমেণ্টারী কমিশনের কথা বলিয়াছি, তাহা ভারতগবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কমিটি বা কমিশন কিম্বা রাজার নিযুক্ত রয়্যাল কমিশন অপেক্ষা ভাল হইবে। ভারতসচিব কমিশনের সভ্যদের নাম হাউস অব্ কমন্স এবং হাউস অব্ লর্ডসের অনুমোদনের জন্য তাঁহাদের নিকট পেশ করিবেন। আমাদের বিবেচনায় প্রথম নামনির্ব্বাচন ভারতসচিবের দ্বারা না হইয়া সমুদয় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা দ্বারা হইলে ভাল হয়। পার্লেমেণ্টারী কমিশন যে অনুসন্ধান ও কাজ করিবেন, তাহা, সর্ব্বাংশে, কোম্পানীর আমলের এক একবার নূতন করিয়া কোম্পানীকে সনন্দ দিবার পূর্ব্বে যে পার্লেমেণ্টারী অনুসন্ধান হইত, তাহার সমতুল্য বা তাহার মত ফলোপধায়ক হইবে না। কারণ সেকালের অনুসন্ধানের প্রধান বিষয় ছিল, ইংরেজ কর্ম্মচারীসম্প্রদায় ভারতশাসনকার্য্য ন্যায়পরতা, সততা, ও দক্ষতার সহিত করিয়াছেন কি না। সমালোচ্য রিপোর্টে প্রস্তাবিত কমিশনের কাজ হইবে, প্রধানতঃ দেশী মন্ত্রীদের হাতে অর্পিত বিষয়গুলির কাজ কিরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আরো বিষয়ের ভার দেওয়া যাইতে পারে কিম্বা পূর্ব্বে অর্পিত কোন কোন বিষয়ের ভার প্রত্যাহার করা দরকার কি না, ভোটদাতা নির্ব্বাচকদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির কিরূপ উন্মেষ হইয়াছে ও তাহাদের কার্য্যক্ষমতা কিরূপ বাড়িয়াছে, দেশী লোকেরা যথেষ্ট সংখ্যায় উচ্চপদ পাইয়াছে কি না, এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-গুলির রাজস্ব ভাগাভাগি যথাযোগ্য হইয়াছে কি না। ইহা খুব প্রয়োজনীয় কাজ। কমিশনের সভ্যেরা যদি অভিজ্ঞ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ লোক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কাজের ফল ভাল হইতে পারে।

প্রাদেশিক বজেট বা আয়ব্যয় নির্দ্ধারণ।

প্রাদেশিক বজেট-সম্বন্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বর্ত্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা সামান্য পরিমাণে ভাল মনে হইল, যদিও প্রস্তাবিত ব্যবস্থাও ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ, আগে, ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আবশ্যক টাকা পাইবেন, তাহার পর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের হাতে রক্ষিত (reserved) বিষয়গুলির জন্য যথেষ্ট টাকা লইবেন, তার পর বাকী টাকা দেশী মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত বিষয়গুলির জন্য বাঁটিয়া দেওয়া হইবে। বজেটটি ঠিক্ কি প্রকারে প্রস্তুত ও আলোচিত হইবে, তাহা জানা দরকার। রিপোর্টে আছে :—

> "......the provincial budget should be framed by the executive government as a whole. The first charge on provincial revenues will be the contribution to the Government of India; and after that the supply for the reserved subjects will have priority. The allocation of supply for the transferred subjects will be decided by the ministers. If the revenue is insufficient for their needs, the question of new taxation will be decided by the Governor and the ministers...... The budget will then be laid before the council which will discuss it and vote by resolution upon the allotments. If the legislative council rejects or modifies the proposed allotment for reserved subjects, the Governor should have power to insist on the whole or any part of the allotment originally provided, if for reasons to be stated he certifies its necessity in the terms which we have already suggested. We are emphatically of opinion that the Governor in Council must be empowered to obtain the supply which he declares to be necessary for the discharge of his responsibilities. Except in so far as the Governor exercises this power the budget would be altered in accordance with the resolutions carried in council.

ইহা পড়িলেই বুঝা যায় যে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রধান ভিত্তি যে দেশের রাজস্বের উপর লোকপ্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা, যাহাকে ইংরেজীতে power of the purse বলে, রিপোর্টে-প্রস্তাবিত ব্যবস্থা তাহার পাশ দিয়াও যায় না। গবর্ণর তাঁহার হাতের বিষয়গুলির জন্য যত টাকাই চান, তাহা তিনি পাইবেন। তিনি খুব অপব্যয়ী হইলেও ব্যবস্থাপক সভা অপব্যয় নিবারণ করিতে পারিবেন না। কেবল দশ বৎসর, এবং তাহার পর বারো বারো বৎসর, অন্তর যে পার্লেমেণ্টারী কমিশন বসিবে, তাহার দ্বারা, গবর্ণর বেশী টাকা লইয়াছেন কি না এবং অপব্যয় করিয়াছেন কি না, তাহার বিচার হইবে। তাহার ফল অনিশ্চিত ইহা যথেষ্ট নহে। প্রতি বৎসরই সদ্যসদ্য অপব্যয়ে বাধা পড়া দরকার। গবর্ণরের হাতের বিষয় বা ডিপার্টমেণ্টগুলির জন্য তিনি অতিরিক্ত ব্যয় করিতে থাকিবেন, এবং দেশী মন্ত্রীদের হাতের বিষয়-গুলির জন্য টাকার অকুলান হওয়ায় দেশের লোকের

উপর নূতন ট্যাক্স বসিবে, ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন।

ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যেরাই সংখ্যায় বেশী হইবেন। ইহা ভাল। কিন্তু সব আইন ব্যবস্থাপক সভার মত অনুসারে প্রণীত হইবে না, গবর্ণরের হাতের বিষয়গুলি সম্বন্ধীয় আইন তিনি গ্র্যাণ্ড কমিটির দ্বারা পাস করাইয়া লইতে পারিবেন। এই গ্র্যাণ্ডকমিটি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে তিনি মনোনীত করিবেন, এবং ইহাতে সরকারী সভ্যের সংখ্যা বেশী থাকিবে। গবর্ণরের হাতের বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়নেও তিনি যাহাতে বাধা দিতে পারেন, কিম্বা তাহা সংশোধন করিতে পারেন, তাহার উপায় আছে। তাহা করিতে হইলে তাঁহাকে বা তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কোন সভ্যকে বলিতে হইবে যে আইনে এমন বিধি আছে যাহা গবর্ণরের হাতের কোন না কোন রিজার্ভ্‌ড্‌ বিষয় সম্বন্ধীয়। ইহা বলা মোটেই কঠিন হইবে না। কারণ, সমুদয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের পরস্পরের সহিত যোগ আছে। এমন কোন দুটি ডিপার্টমেন্টের নাম করা কঠিন হইবে, যাহাদের পরস্পরের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই।

তা ছাড়া, কোন আইন ব্যবস্থাপক সভায় পাস্ হইলেই তাহা জারী হইবে না। উহা জারী হইবার জন্য গবর্ণরের, গবর্ণরজেনারেলের এবং, সম্রাটের পক্ষ হইতে, ভারতসচিবের অনুমোদন চাই। ইঁহারা যে-কেহ আইনটি নামঞ্জুর করিতে পারেন। সত্য বটে, বিলাতী আইন অনুমোদন না-করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডেও রাজার আছে; কিন্তু তিনি নিজের প্রজাদের স্বজাতীয় লোক, এবং প্রজাদের হাতে রাজকোষের চাবীটি (Power of the purse) থাকায় এবং অন্য প্রভূত ক্ষমতা থাকায় রাজা তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। আমাদের আইন অনুমোদন করা না-করার ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে রহিবে, তাঁহারা বিদেশী, তাঁহাদের সহিত আমাদের স্বার্থ এক নয়, এবং তাঁহাদের উপর আমাদের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোন ক্ষমতা নাই। ইহাও সত্য আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের (U. S. A.র) নির্ব্বাচিত দেশনায়কেরও (president) এই প্রকারে আইন অনুমোদন না করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তিনি আমেরিকানদের নিজের লোক ও তাহাদেরই দ্বারা নির্ব্বাচিত, এবং কোন আইন দেশের প্রতিনিধিরা উপর্য্যুপরি তিনবার পাস করিলে তাহাতে মত দিতে তিনি বাধ্য। আমাদের দেশের জন্য এরূপ কোন ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক বিষয়েও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে ডিঙাইয়া আইন করিতে পারিবেন।

এইরূপ নানাপ্রকারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা খুব সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করা হইয়াছে।

কোনও সময়ের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভার জীবন গবর্ণরের ইচ্ছাধীন থাকিবে। তিনি সভা বন্ধ বা ভঙ্গ (dissolve) করিতে পারিবেন। ইহার পর নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে কি না, এবং তাহা কখন কি প্রকারে হইবে, রিপোর্টে তৎসম্বন্ধে কোন প্রস্তাব নাই।

পার্লেমেণ্টের ক্ষমতা।

প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে, যেহেতু গবর্ণমেণ্টের উপর কোন কোন বিষয়ে দেশের লোক ক্ষমতা পাইবে, এবং গবর্ণমেণ্ট সেই সেই বিষয়ে দেশের লোকের নিকট দায়ী হইবে, সেই জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর পার্লেমেণ্টের বর্ত্তমান ক্ষমতা সেই সেই বিষয়ে উঠাইয়া বা কমাইয়া দেওয়া হইবে। আমরা দেখাইয়াছি, ভারতগবর্ণমেণ্টের উপর দেশের লোককে বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সুতরাং ভারতগবর্ণমেণ্টের উপর পার্লেমেণ্টের বর্ত্তমান কর্ত্তৃত্ব পূরামাত্রায় থাকা উচিত। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকলেও অপ্রধান বিষয়গুলিতেও দেশী মন্ত্রীদিগকে এবং ব্যবস্থাপক সভাকে চূড়ান্ত কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সুতরাং পার্লেমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব এই ক্ষেত্রেও কমাইবার সময় আসে নাই। সত্য, পার্লেমেণ্ট তাহার ক্ষমতার ব্যবহার কচিৎ করেন। কিন্তু তথাপি তাহা থাকা ভাল। তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইংরেজ আমলাদের কতকটা ভয় থাকে। তাঁহারা আমাদের কাছেও দায়ী হইবেন না, পার্লেমেণ্টের কাছেও দায়ী হইবেন না, এরূপ হইলে তাঁহাদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব এখনকার চেয়েও বাড়িবে। বাস্তবিক সমস্ত রিপোর্টটিতে গবর্ণর-জেনারেল ও গবর্ণরদের ক্ষমতা এখনকার চেয়ে বাড়ানই হইয়াছে।

পার্লেমেণ্টের এক একবার যখন বৈঠক আরম্ভ হইবে, তখন ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সব বিষয়ে সন্ধান লইয়া হাউস্ অব্ কমন্সে রিপোর্ট করিবার জন্য ঐ হাউসের একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইবে। এই প্রস্তাব ভাল।

ভারত-সচিব।

ভারতসচিবের বেতন ব্রিটিশ রাজকোষ হইতে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহা হইলে তাঁহার বেতন কমান বাড়ান, মঞ্জুর করা না-করা, লইয়া ভারতশাসন সম্বন্ধে

পার্লেমেণ্টে আলোচনা ও বিতর্ক হইতে পারিবে, এবং পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে দায়ী করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাব ভাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কনভোকেশ্যনে (উপাধিদান সভায়) লর্ড রোনাল্ড্‌শে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষার জন্য ভারতীয় দর্শন পড়াইবার কথা তুলিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে এই প্রস্তাবটির সম্যক্ আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। প্রবাসীতে অল্প কিছু লেখা হইয়াছিল, মডার্ণ-রিভিউতে তদপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে, এবং আরও আলোচনা হইবে। বিষয়টির আলোচনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, যে, ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কথা নয়। বি-এ ক্লাসেই ছাত্রেরা সব দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে। এই নূতন দর্শনশিক্ষার্থী-দিগকে গোড়াতেই ভারতীয় দর্শন পড়ান উচিত কি না, এবং পড়াইলে ফল ভাল হইবে কি না, তাহাই বিবেচ্য। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, ভারতীয় দর্শন বলিতে শুধু হিন্দুদর্শন বুঝায় না; হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, সব রকম দর্শনই বুঝায়। হিন্দুদর্শনও নানাবিধ; সবগুলি সমান মূল্যবান্ নহে, সুতরাং কোন্ কোন্ দর্শন অধ্যেতব্য, তাহাও যে সে বলিতে পারে না।

যদি বাংলা দেশে দার্শনিক আলোচনার উচ্চ অঙ্গের স্বতন্ত্র সাময়িক পত্র থাকিত, কিম্বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পত্রিকা থাকিত, তাহা হইলে হয় ত এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-দিগকে আলোচনা করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র দেওয়া যাইতে পারিত। দর্শনাচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত পণ্ডিত লোকদের মতই এরূপ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তিনি পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সর্ব্ববিধ দর্শনের পারদর্শী, এবং ছাত্রদিগকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অধিকন্তু তিনি আর্য্যামি-গ্রস্তও নহেন, সাহেবিয়ানা-গ্রস্তও নহেন। এইপ্রকার শ্রদ্ধেয় ও নিরপেক্ষ লোকের মত যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে কর্ত্তব্যনির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। অবশ্য এবিষয়ে মত প্রকাশ করিবার যোগ্যতা আরও কাহারও কাহারও আছে। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া তাঁহার সমান যোগ্য আর কাহারও নাম মনে না পড়ায় কেবল তাঁহারই নাম করিলাম।

নারীর উপর অত্যাচারী দুষ্টলোকের শাস্তি।

সুভাষিণী দেবী নাম্নী বিবাহিতা এক বালিকাকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য যে দুজন পতিতা স্ত্রীলোক তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার লাঞ্ছনা করিয়াছিল, তাহাদের কারাদণ্ড আগেই হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, প্রধানতঃ যে লোকটার টাকায় ও যাহার জন্য এই কুকাজ হইয়াছিল, হাইকোর্টের বিচারে তাহারও পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। এইরূপ মোকদ্দমা আরও চলিতেছে। পিশাচ-পিশাচীদিগকে শাস্তি দিয়া সমাজকে নিরুপদ্রবে নারীর বাসের যোগ্য করিবার চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। কয়েকজন পুলিস-কর্ম্মচারী এই বিষয়ে খুব দক্ষতার সহিত পরিশ্রম করিতেছেন।

বিবাহিতা-নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের একটি আঠার বৎসরের বিবাহিতা নারী, যে-কারণেই হউক, স্বামীর ঘর করিতে চায় নাই। স্বামী তাহাকে স্ত্রীরূপে পাইবার জন্য নালিশ করে। নীচের আদালতে স্ত্রীলোকটির উপর এই হুকুম হয় যে তাহাকে স্বামীর ঘর করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। স্ত্রীলোকটি ইহার বিরুদ্ধে হাই-কোর্টে আপীল করে। হাইকোর্ট বলিয়াছেন, যে, মানব-সভ্যতা এখন যে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর ঘর করে না বলিয়া আমরা তাহাকে জেলে পাঠাইতে পারি না। ঠিক বিচার হইয়াছে। স্ত্রী স্বামীর ঘর না করিলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন, এবং তাহাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু জোর করিয়া দাম্পত্য অধিকার স্থাপন করিতে চাওয়া বা তাহাকে জেলে পাঠান বর্ব্বরতা। অনেক স্বামী ত স্ত্রীকে লইয়া ঘর করে না; কিন্তু এরূপ আইন ত কোথাও নাই, যে, স্ত্রী আদালতে নালিশ করিয়া স্বামীকে তাহার সহিত বাস করিতে বাধ্য করিবে, নতুবা স্বামীকে জেলে যাইতে হইবে।

পাটচাষী ও ধানচাষীদের বর্ত্তমান অবস্থা।

আষাঢ় মাসের প্রবাসীর ২০১ পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম, "আমরা জানিতে চাই, যুদ্ধ-ঋণের টাকা ভারত-বর্ষেই ব্যয়িত হওয়ায় পাটচাষীরা ও ধানচাষীরা বিশেষ কি উপকার পাইতেছে", এবং দেখাইয়াছিলাম যে তাহাদের বরং দুর্দশাই হইয়াছে। বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য কি করিতেছেন, জানি না। কিন্তু বাংলা-গবর্ণমেণ্ট তাহাদের অবস্থার বিষয় অবগত আছেন। বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের মাননীয় সেক্রেটারী কার্ সাহেব লিখিয়াছেন:—

"It is not accurate to say that the income of the cultivators in this province has risen since the war. On the contrary, they have been badly hit by the prevailing low prices of rice and jute, while confronted simultaneously with unusually high prices, noticeably for cloth, salt and kerosene oil."

বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে সাধারণ লোকদের অবস্থা বুঝিয়াছেন, ইহা সন্তোষের বিষয়।

পাটের দাম কি বাঁধিয়া দেওয়া যায় না ?

মাননীয় অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, যে, পাটের কলের মালিকগণ এবং পাটের কৃষকগণ এই উভয়পক্ষের মধ্যে পাটব্যবসায়ের লাভের ভাগাভাগির একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করা হউক। পাটের কলে যে কিরূপ অসাধারণ লাভ হইতেছে তাহা আষাঢ়ের প্রবাসীর ২৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে। অন্যদিকে কিন্তু পাটচাষীরা যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এই জন্যই দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উহা কিন্তু গৃহীত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কিছু করা উচিত ছিল, এবং সাধ্যায়ত্তও ছিল। সরকার পাটের এরূপ একটা ন্যূনতম দাম বাঁধিয়া দিতে পারিতেন, যাহার কমে কেহ পাট কিনিতে পারিবে না। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে এইরূপ আইন হইয়াছে। লণ্ডনের রিভিউ অব্ রিভিউজ্ নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে দেখা যায় :—

"By the exercise of infinite patience and tact Mr. Prothero succeeded in carrying the Corn Production Act through a not too friendly House. By this Act minimum prices were fixed for wheat and oats for six years, a minimum wage guaranteed to agricultural workmen, and power given to the Board of Agriculture to enforce proper cultivation."

বিলাতে এই শস্যোৎপাদন-আইন দ্বারা ছয় বৎসরের জন্য গম ও ওটের ন্যূনতম মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই দুই শস্যের দাম বেশী হইতে পারিবে, কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম হইতে পারিবে না। তাহা হইলে এখানে পাটের ঐরূপ দাম কেন নিরূপিত হইতে পারিবে না? বিলাতে ও ভারতে যে প্রভেদ তাহাতেই বাধা পড়িয়া থাকিবে। সেখানকার চাষী ও আইনকর্ত্তা পার্লেমেণ্টের সভ্যেরা সবাই একই স্বাধীন জাতির লোক। এখানে আইনকর্ত্তারা ও পাটের ব্যবসায়ে অসাধারণ লাভবান বণিকেরা এক জাতি, এবং পাটচাষীরা তাহাদের অধীন অন্য এক জাতি।

যে-সব ইংরেজ কর্ম্মচারীর সমষ্টিকে গবর্ণমেণ্ট বলা হয় তাঁহারা আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল বেশী দেখেন, না, দেশী শিক্ষিত লোকেরা বেশী দেখেন; তাঁহারা জনসাধারণের বেশী প্রতিনিধিস্থানীয়, না দেশী শিক্ষিত শ্রেণীরা বেশী প্রতিনিধিস্থানীয়, কিছু আগে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছি। পাটের লাভের ভাগাভাগি সম্বন্ধীয় যে প্রশ্নটি ব্যবস্থাপক সভায় উঠিয়াছিল, তাহার ভাগ্য হইতে এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান জন্মে। উপরে রিভিউ অব্ রিভিউজ্ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বিলাতের হাউস্ অব্ কমন্সও চাষীর হিতকর শস্যোৎপাদন আইনটির খুব পক্ষে ছিলেন না। তাহা হইলে কি বলা হইবে, ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টের শিক্ষিত সভ্যেরা তথাকার চাষীদের প্রতিনিধি হইবার ঠিক যোগ্য নয়, সুতরাং তাহাদের প্রতিনিধি জাপান, আমেরিকা, কিম্বা অন্য কোন দেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে?

কুতুবদিয়ার অন্তরায়িতদের বিচার।

কুতবদিয়ার যে-সকল অন্তরায়িত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়াছিল, এই অপরাধের জন্য বিশেষ আদালতে (special tribunalএ) তাহাদের বিচার হয়। তাহাতে প্রমাণ হয়, যে, তাহারা পুলিসের জ্ঞাতসারে পুলিস-পাহারায় চট্টগ্রাম আসিয়াছিল, তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে আপনাদের দুঃখ জানাইতে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাল পানীয় জল ছিল না, তাহারা শীতকালে শীতবস্ত্র পায় নাই, তাহাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট জনকরা মাসিক ৪০৲ টাকা ভাতা কমাইয়া পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ৩০৲ টাকা করিয়া দেন, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদের কাহারও কাহারও অভিযোগের দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টকে পাঠান নাই, কন্‌ষ্টেবলরা তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও প্রহার করিয়াছিল, ইত্যাদি। কিন্তু তথাপি আদালত তাহাদিগকে জেলে পাঠাইয়াছেন, এবং এই বলিয়া তাহাদিগকে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন যে অশ্রম কারাদণ্ড দিলে তাহারা অন্তরায়িত-জীবন অপেক্ষা কারাগারের জীবনকে বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারে। বিশেষ-আদালতের বিচারকেরা যেমন বিবেচক তেমনি দয়ালু! অন্তরায়িতদের যে-সব অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে আদালত বলেন, ওসব বিশেষ কিছু নয়, তাহারা ছেঁচকাঁদুনে প্রকৃতির (oversensitive) বলিয়া ওসবকে বেশী গুরুতর মনে করিয়াছে!

অন্তরায়িত ও রাজবন্দীদের নির্য্যাতনের অভিযোগ।

কতকগুলি অন্তরায়িত ও রাজবন্দীকে পুলিস্ নিষ্ঠুর ও বীভৎসভাবে নির্য্যাতন করিয়াছে বলিয়া মিসেস্ বেসাণ্ট বড়লাটের কাছে গোপনে অভিযোগ জানান। তাহা বঙ্গের লাটের কাছে তদন্তের জন্য প্রেরিত হয়। গোপনে একজন ইংরেজ ও একজন বাঙালী তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন, অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। এইসব কথা বঙ্গের লাট তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন এবং মিসেস্ বেসাণ্টের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। মিসেস্ বেসাণ্টের

অভিযোগে অনেক ভ্রম ও অত্যুক্তি আছে, তিনি এরূপও বলিয়াছেন। উত্তরে মিসেস্ বেসাণ্ট লর্ড রোনাল্ড্‌শেরই ভুল দেখাইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন "পাশবভাবে অমৃতলাল সরকারের অঙ্গচ্ছেদ আমার অভিযোগের মধ্যে ছিল না; ইহা বঙ্গের লাট আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন।" তদ্ভিন্ন মিসেস্ বেসাণ্ট বলেন, "বড়লাট আমাকে কথা দিয়াছিলেন যে যাহাদের দুঃখের কথা বলা হইতেছে তাহাদের নাম প্রকাশিত হইবে না, কারণ তাহা প্রকাশিত হইলে পুলিস তাহাদের উপর আবার অত্যাচার করিতে পারে; কিন্তু বঙ্গের লাট তাহাদের নাম প্রকাশ করিয়াছেন!"

আমরা গোপন একতরফা তদন্তের ফলে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। পুলিসই ছিল অভিযুক্ত, অথচ সাক্ষ্য দিবার জন্য কুতুবদিয়া হইতে অন্তরায়িতদিগকে পুলিসের পাহারাতেই আনা হইল, পুলিসের আড্ডাতে নির্জনকক্ষে তাহাদিগকে রাখা হইল, এবং তাহাদিগকে পুলিসের জিম্মাতেই আবার কুতুবদিয়া পাঠান হইল। গোপনে তদন্ত হওয়ায় অভিযোক্তারা সম্ভবতঃ বিশ্বাস করিতেই পারে নাই যে তদন্তকারীরা পুলিসের লোক নহেন। কোনো জমীদারের বিরুদ্ধে যদি নালিশ হয় যে তিনি তাঁহার কাছারীতে লইয়া গিয়া তাঁহার রায়ত রাম শ্যাম হরিকে নির্য্যাতন করিয়াছেন, তাহা হইলে কি রাম শ্যাম হরিকে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে তাঁহারই নগদী ও গোমস্তাদের আড্ডাতে রাখা হয়? তাঁহাকে না জানাইয়াই কি তাঁহার কাছারী খানাতল্লাসী হয় না? পুলিসকে না জানাইয়া পুলিসের আড্ডা দুজন তদন্তকারী দেখিয়াছিলেন কি? লাটসাহেবের বক্তৃতায় প্রকাশ যে কেবল একজন দেখিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার আসিবার আগে পুলিস জানিত যে তিনি আসিতেছেন। অন্তরায়িত ও রাজবন্দীদের দুঃখের কথা লইয়া আন্দোলন করিলে গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করেন যে আন্দোলনকারীরা বিপ্লবপ্রয়াসীদের প্রচ্ছন্ন বন্ধু বা সমর্থক। কিন্তু ইহাও ত হইতে পারে, যে, অন্তরায়িত ও রাজবন্দীরা দোষী হউক বা নির্দ্দোষ হউক, তাহারা মানুষ এবং ভগবানের সৃষ্ট জীব এবং আমরাও মানুষ বলিয়া তাহাদের দুঃখের কথা শুনিলে তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানাই। দোষী যাহারা তাহাদের আইননির্দ্দিষ্ট দণ্ড হউক। তাহাদের কিম্বা সন্দেহভাজনদের অমানুষিক নিপীড়ন কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। আমরা চাই এ বিষয়ে প্রকাশ্য তদন্ত দ্বারা পুলিস নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হউন। তাহা খুব সন্তোষের বিষয় হইবে।

গবর্ণমেণ্ট নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে অনেকগুলি অন্তরায়িত ও রাজবন্দী পাগল হইয়া গিয়াছে, কয়েকজন আত্মহত্যা করিয়াছে, এবং কয়েকজনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে কি গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করেন না যে সম্ভবতঃ অন্তরায়িত ও রাজবন্দীরা সকলে ভাল ব্যবহার পায় না? দেশের লোকদের ত হয়।

রসিকলাল সরকারের আত্মহত্যা।

রাজসাহী জেলে রসিকলাল সরকার নামক একজন রাজবন্দী কাপড়ে কেরোসীন ঢালিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। রাজসাহীতে গুজব যে রসিকলাল বাড়ী হইতে এই চিঠি পায় যে তাহার বাড়ীর লোকেরা অর্থাভাবে অনাহারী আছে, কোনপ্রকারে চিঠি লিখিবার পয়সা জোগাড় করিয়া তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে। এই দুঃখে সে আত্মহত্যা করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই গুজব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিলে বড় ভাল হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স।

গত ৩০শে আষাঢ় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের বিশেষ অধিবেশনে প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে, কেবলমাত্র দশজনের আপত্তির বিরুদ্ধে, এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, এই কন্‌ফারেন্সের মতে ভারতসচিব ও বড়লাটের প্রস্তাবিত শাসনব্যবস্থায় লোকে যাহা আশা করিয়াছিল তাহা পায় নাই, উহা অসন্তোষজনক, এবং উহা জনসাধারণের নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্টের অভিমুখে দেশকে বাস্তবিক লইয়া যাইবে না।

আমাদের জাতীয় নেতা।

৺প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র ১৩২৫

৫ম সংখ্যা

প্রতিভার কথা

প্রতিভার কাজে সকলের আগে যে জিনিসটি চোখে লাগে তাহা হইতেছে নূতনত্ব, মৌলিকতা। মানুষ সাধারণত চলে, চলিতে পারে একটা ধরাবাঁধা পথে। প্রথাগত, সকলের অভ্যস্ত যে চিন্তা, যে কর্ম্ম, তাহারও সেই চিন্তা, সেই কর্ম্ম এবং চিন্তা ও কর্ম্মের সেই একই পদ্ধতি। এমন কি, তাহার অনুভব, তাহার হৃদয়াবেগও সকল সময় তাহার নিজের নয়—অপরের মধ্যে চারিদিকের আবহাওয়ায় যে অনুভব যে আবেগ খেলিতেছে তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র। জগৎ জুড়িয়া ভাবের, চিন্তার, কর্ম্মের যে একটা স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে সে তাহারই মধ্যে একটা অসহায় ঢেউ। অথবা সে যেন একখানা নিথর নিষ্ক্রিয় দর্পণ, তার কাজ তাহাকেই শুধু প্রতিফলিত প্রতিবিম্বিত করিয়া ধরা। কিন্তু প্রতিভার বিশেষত্ব এইখানে যে তিনি সংস্কারের গতানুগতিকের গড্ডলিকা-প্রবাহের বহির্ভূত একটা পদার্থ। সনাতনের মধ্যে তিনি লইয়া আসেন অভূতপূর্ব্ব, পরিচিত বিধিবিন্যাসের মধ্যে আনিয়া ফেলেন কি এক বেখাপ জিনিস। জগৎস্রোতে তিনি গা ভাসাইয়া দিয়া চলেন না, তাহার মধ্যে তিনি খাড়া হইয়া উঠেন, সেখানে তুলিয়া দেন বিপ্লব, হয়ত বা সে স্রোতকে ঠেলিয়া অন্য পথেই লইয়া চলেন।

এই নূতনত্ব জিনিসটি কি, ইহার মূল কোথায়? আমাদের দেশে প্রতিভাকে বলা হইয়াছে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'—যে বুদ্ধি নিত্য নূতন জ্ঞান বিকশিত করে, নূতন তথ্য বহিয়া আনে। কিন্তু ইহা প্রতিভার একটা দিক মাত্র। প্রতিভা সেই জ্ঞান সেই তথ্যের আস্বাদ, যে জ্ঞান যে তথ্য সৃজনক্ষম, যাহার প্রেরণা হইতেছে একটা কিছু গড়িয়া তোলা, তাহাকে শরীর দেওয়া, জীবন্ত করা, অর্থাৎ যে জ্ঞান শক্তির আধার। জ্ঞানের মধ্যে যে বস্তু প্রতিফলিত, শক্তির মধ্যে তাহাকে মূর্ত্ত, বাস্তব, প্রাণবন্ত করিয়া ধরাই প্রতিভার সবখানি;—ইহাই সৃজনের অর্থ। আর প্রকৃত সৃজন যাহা তাহা নূতনেরই সৃজন; পুরাতনকে সৃজন করা—এ কথার অর্থ নাই।

পাশ্চাত্যে প্রতিভা ও গুণীর (genius ও talent) মধ্যে একটা পার্থক্যের কথা প্রায়ই নির্দ্দেশ করা হয়। সে পার্থক্যটি কি? আমরা বলিয়াছি প্রতিভার কাজ হইতেছে নূতন সৃজন। কিন্তু গুণীর কাজ নূতন সৃজন করা ততখানি নয়, যতখানি নূতন করিয়া সাজান। যাহা আছে, যাহা অভ্যস্ত পরিচিত তাহাকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, তাহার বিন্যাসের ধারাটি পরিবর্ত্তিত করিয়া এমন ভাবে ধরা, যেন মনে হয় উহা একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিসই। যে উপকরণ দেওয়া আছে তাহার সমাবেশ-কৌশলেই গুণীর গুণ। বস্তুকে বিষয়কে উপকরণকে সে বদ্‌লাইতে চায় না বা বদ্‌লাইতে পারে না। আবশ্যকীয় সামগ্রী সব তাহার কাছে ধরিয়া দাও, সে বুঝিয়া মাপিয়া চারিদিক

দেখিয়া শুনিয়া একটা যথাযোগ্য নূতন ধরণেরই জিনিস খাড়া করিবে। কিন্তু প্রতিভার যে নূতনত্ব তাহা সম্পূর্ণ আর-এক রকমের—মনে হয় সে যেন সব ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে গোড়া হইতে পত্তন করিয়াছে। গুণীর হইতেছে কৌশল, প্রতিভার হইতেছে শক্তি। তাই প্রতিভার মধ্যে যে শুধু নূতনত্বই পাই তাহা নয়, সেখানে পাই একটা মহত্ত্ব, বিরাটত্ব, অলৌকিকত্ব। আর সেই জন্যই দেখি, গুণী যিনি তাঁহাকে তাঁহার নিজের দেশ, তাঁহার সমসাময়িক কাল সহজেই বুঝিতে পারে, আয়ত্ত করিতে পারে। কারণ তিনি উহাদের ফল, অন্যূনপক্ষে প্রতিনিধি মাত্র—সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে নিকটতর, একই স্তরের বলিয়া অনুভব করে। কিন্তু প্রতিভা যেন আর-একটি লোকের, তাঁহাকে বুঝিতে ধরিতে হইলে যাওয়া চাই দূরে,—পরদেশে, উত্তরকালে। অন্যদিকে দেখি, গুণীর কাজ সময়ের সাথে কেমন মলিন হইয়া উঠে, তাঁহার প্রভাব বিশেষতঃ নির্দ্দিষ্ট দেশের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু প্রতিভার প্রভাব দিনে দিনে উজ্জ্বল হইয়া চলে, সমস্ত পৃথিবীই তাঁহাকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করে। গুণীকে বিশেষভাবে চালাইয়া লইয়াছে যুগধর্ম্ম, কিন্তু বিশ্বের চিরন্তনের কি একটা নিত্যনূতন সার্থকতাই হইতেছে প্রতিভার প্রাণ।

অন্য কথায় আমরা বলিব, গুণীর মধ্যে প্রধান হইতেছে বুদ্ধি। আর বুদ্ধিই হইতেছে কারিগরী. শিল্পীর বৃত্তি। কিন্তু প্রতিভার মধ্যে, যেমন নেপোলিয়নে বা শেক্সপীয়রে, এই কারিগরের বৃত্তি কেমন নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, উহা পরিচালিত আর-একটা মহত্তর বৃত্তির দ্বারা। বুদ্ধির ধর্ম্ম হইতেছে বস্তুর রূপটি লইয়া খেলা। বুদ্ধি জিনিসকে ধরে, অধিকার করে, জিনিসের একটা বাহিরের অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া। সে ঘুরিয়া বেড়ায় জিনিসের চারিপাশে, সে একটা নূতন দিক দেখিলেও দেখিতে পারে, কিন্তু সে-নূতনত্বে পাই না স্থাণুত্ব, অতলস্পর্শতা। প্রতিভা কিন্তু বাহিরের প্রকাশের মধ্যেই আপনাকে বাঁধিয়া রাখেন না, সে-সকল অতিক্রম করিয়া তিনি চলিয়া যান একেবারে স্বরূপে, অন্তরাত্মায়। তাই বস্তুর উপর তাঁহার এমন সহজ অধিকার, অটুট প্রভুত্ব, সৃজনেও তাঁহার নৈসর্গিক ক্ষমতা। অবশ্য সর্ব্বসাধারণ যে বুদ্ধি লইয়া চলে, গুণীর ঠিক সেই বুদ্ধি নয়। গুণী চলেন একটা শুদ্ধবুদ্ধি লইয়া, তিনি একান্ত বাহ্য রূপই দেখেন না—তিনি দেখেন গুণ, তাই তাঁহার নাম গুণী। কিন্তু গুণও জিনিসের ভিতরের, অন্তরতম, আত্মার কথা নয়।

মানুষের সাধারণবুদ্ধি—তাহার প্রতীতি, প্রেরণা, হৃদয়াবেগ খেলিতেছে প্রকৃতির এপারের ভঙ্গীটি লইয়া। গুণীর যে বিশুদ্ধবুদ্ধি তাহা এপারের শেষ সীমায় পৌছিলেও, তাহা এপারেরই। প্রতিভার প্রতিভা কিন্তু এইখানে যে তিনি এপারের এ গণ্ডী কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন ওপারে—অর্থাৎ শরীর প্রাণ ও মনের উপরে যে চতুর্থ বা তুরীয় লোক সেইখানে, যাহা সত্যের ও ঋতের, অব্যর্থ জ্ঞান ও অটুট সৃজনশক্তির প্রতিষ্ঠান, উপনিষদ যাহার নাম দিয়াছেন 'বিজ্ঞান'—বৃহৎ জ্ঞান—যেখানে হইতেছে দিব্য-দৃষ্টি আর দিব্যশক্তি। ইহারই কিছু ঢালিয়া দিয়াছেন এপারের, এই শরীর প্রাণ ও মনের জগতের বস্তুরাশির উপর। এই বিজ্ঞান হইতেছে প্লেতোর সেই arche types, আইডিয়া বা ভাবের জগৎ, রূপময় সৃষ্টজগতের পশ্চাতে রহিয়াছে যেসব স্বরূপ তাহাদের সমষ্টি। প্রতিভার মধ্যে জাগিয়া উঠে, প্রতিভাত হয় এই এক-একটি আইডিয়া মূলভাব, এই স্বরূপের একএকটি নিগূঢ় সূক্ষ্ম বিগ্রহ এবং উহাকেই তিনি বাহিরে শরীরী করিয়া গোচর করিয়া ধরেন—সৃজন করেন। সৃষ্টির অর্থই হইতেছে এই তুরীয়ের মধ্যে অবস্থিত অগোচর অপ্রকাশ 'গুহাহিত' একএকটা ভাবের শরীরগ্রহণের প্রয়াস। কারণ, এই তুরীয় বা বিজ্ঞান হইতেছে সেই-সব মৌলিক আদিসত্যের অধিষ্ঠান যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর স্বয়ং এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদিগকে ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া স্ফুট জাগ্রত করিয়া ধরিতেছেন। প্রতিভার মধ্যে এই ঐশ্বরিক শক্তিই খেলিয়াছে, ইহারই জোরে তাঁহারও সৃষ্টি চলিয়াছে। প্রতিভার প্রতিভা যে সৃজনশক্তি লইয়া, তাহার কারণও এইখানে। প্রতিভার ধাম যে বিজ্ঞানলোক তাহা জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয়,—সমন্বয় শুধু নয়, সম্মিলন। ইহা হইতেছে তপঃ অর্থাৎ মূলজ্ঞানের সহজ-বিচ্ছুরিত শক্তি—চিৎশক্তি। বুদ্ধির সাথেও একটা যে শক্তি—ইচ্ছাশক্তি—নাই তাহা

নয়। কিন্তু সেখানে উভয়ের মধ্যে আছে সহচরের সতীর্থের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়কে টানিয়া আনিয়া মিলাইয়া ধরিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানে জ্ঞান ও শক্তি একই, চিৎ-শক্তির অপর নামই তপঃশক্তি।

কিন্তু শুধু নূতনত্বও নয়, শুধু সৃজনও নয়, প্রতিভার সাথে সচরাচর আর-একটি জিনিস নিত্যসঙ্গীরূপে আমরা জুড়িয়া দিয়া থাকি,—তাহা হইতেছে সহজ সৃজন, শক্তির অবাধ আয়াসহীন বিকাশ। প্রতিভার কাজ ভগবানেরই মত। God said let there be light and there was light—প্রতিভার মধ্যেও আমরা সর্ব্বদাই যেন এই-রকম একটা অনায়াস প্রভুত্ব দেখিতে পাই। তুমি আমি যদি সামান্যও একটা কিছু করিতে চাই, তবে কত চেষ্টা, কত শ্রম, কত গলদ্‌ঘর্ম্ম, তার পরেও সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহ। প্রতিভার কিন্তু এই-রকম প্রতিপদে প্রাণান্ত হইতে হয় না। তাঁহার কর্ম্ম মানুষী চেষ্টার ফল নয়, দিব্যপ্রসাদবলে তিনি নিত্যসিদ্ধ। তাই আমরা বলিয়া থাকি, কবি যিনি তিনি জন্ম হইতেই কবি, চেষ্টা করিয়া কেহ কবি হইতে পারে না। প্রতিভাবান সিদ্ধকর্ম্মীর নিকট হইতেও আমরা আশা করি সেই সফলতা যাহার জন্য কোন যুদ্ধ করিতে হয় নাই, সেই বিজয় যাহা পরাজয় কাহাকে বলে জানেও নাই। ক্রৌঞ্চমিথুনের সে করুণ দৃশ্যটি চোখে পড়িবামাত্র বাল্মীকির কবিত্বপ্রতিভা অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল আর রামায়ণ রচিত হইয়া গেল। আলেকসান্দরের সমস্ত জীবন একটানা বিজয়। নেপোলিয়ন সেই দিন প্রথম হটিতে আরম্ভ করিলেন, যে দিন তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল।

কিন্তু এ কথাটি কতখানি সত্য? প্রতিভাকেও কি কখন কখন কঠোর সাধনা, ঘোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়াই চলিতে হয় নাই; সাধারণ লোকেরই মত যুদ্ধসংঘর্ষ, এমন কি পরাজয় পর্য্যন্ত, স্বীকার করিতে হয় নাই? শুধু চেষ্টা করিয়া কেহ কবি হইতে পারে না, সত্য কথা। কিন্তু সে জন্য কি বলা যায় যে কবি হইতে গেলে চেষ্টার প্রয়োজনই নাই? ঘটে যাহা নাই, তাহা পটেও নাই—কিন্তু ঘটে যাহা আছে তাহাকে পটে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কোথাও যে যত্ন বা চেষ্টার দরকার হয় না, এমন নয়।

প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, প্রতিভাও আছে দুই শ্রেণীর। এক, যাঁহাদিগকে তেমন কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়া যেন যাইতে হয় নাই, যাঁহারা কেমন অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতেই যেন পাহাড় পর্ব্বত হটাইয়া চলিয়াছেন, গহন অরণ্যের স্থলে একমুহূর্ত্তে ইন্দ্রপুরী রচিয়া দিয়াছেন। আর, যাঁহারা চলিয়াছেন যেন সাধারণ মানুষের মত ধীরে ধীরে পদে পদে যুদ্ধ করিয়া, পঞ্চাগ্নির তাপে পুড়িয়া পুড়িয়া। একদিকে শেক্সপীয়র, আর একদিকে বাল্‌জাক। যে প্রতিভাকে আমাদের মতনই পরিশ্রম করিতে হইয়াছে দেখিতেছি, তাঁহাকে নিম্নতর শ্রেণীর বলিয়া মনে হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। কারণ মূল শক্তিটি উভয়ের মধ্যে একই, তারতম্য শুধু বিকাশের প্রণালীতে। দুইজনেই চলিয়াছেন বিজ্ঞানের, সেই তুরীয়ের শক্তির প্রেরণায়; তবে একজন গোড়া হইতেই সে শক্তি পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন, আর-একজন একটা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া সে শক্তি পাইয়াছেন। দুইজনকেই জন্মসিদ্ধ বলা যাইতে পারে—একজনের সিদ্ধি প্রথম হইতে বা অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—আর-একজনে তাহা ক্রমবিকশিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এ কথাও বলা বোধ হয় একেবারে নির্ভুল নয় যে, প্রথমোক্তশ্রেণীর প্রতিভায় কোন দ্বন্দ্ব, কোন সাধনা, কোন পরাজয়ের বা সন্দেহের ইঙ্গিত, কোন কৃচ্ছ্র তাই কিছু নাই। বরং তাঁহাদের অন্তরাত্মা যদি দেখিতে পাইতাম তবে হয়ত বুঝিতাম কি একটা গভীর কঠোর তপস্যা ঝড়ের মত তাঁহাদের ভিতরে বহিয়া গিয়াছে। প্রভেদ শুধু এইখানে, একজনের সাধনা হইয়াছে ক্ষিপ্রগতিতে, সে সাধনপ্রণালী অব্যক্ত সংহত, একটা involved process; আর একজনের সাধনা চলিয়াছে ব্যক্তভাবে, ধাপের পর ধাপে। কিন্তু যে সাধনা যত সংহত কেন্দ্রীকৃত দ্রুত তাহার বেদনাও কি ততই তীব্র নয়? এমন যে শেক্সপীয়র,—যাঁহার সৃজন এমন সহজ, এমন স্বতঃ-উৎসারিত, এমন অনর্গল উচ্ছ্বসিত, যাঁহার কোন কথার ভঙ্গিমায় প্রয়াসের পরিশ্রমের লেশমাত্র চিহ্ন পাই না, তিনিও দেখি প্রায় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতেছেন—

> Where art thou, Muse, that thou forget'st so long...
> Return, forgetful Muse, and straight redeem
> In gentle numbers time so idly spent—

বস্তুতঃ, যে শেক্সপীয়র ভিনস ও আদোনিস লিখিয়াছেন, আর যে শেক্সপীয়র হ্যামলেট লিখিয়াছেন, এই দুইএর মধ্যে যে ব্যবধান তাহা শিল্পীহৃদয়ের কত দ্বন্দ্ব কত দ্বৈধ কত কষ্ট কত যত্নের ইতিহাসে যে পরিপূর্ণ সে কথাটি জানা না থাকিলেও তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইয়া আমরা পারি না।

শুধু তাহাই নয়, আমরা বলিব এই চেষ্টা,—এই কৃচ্ছ্র-সাধনা—তাহা গুপ্ত হউক আর ব্যক্ত হউক—এই তপস্যাই প্রতিভাকে মণ্ডিত করিয়াছে একটা নিজস্ব বিশেষ আভায়। ইহা সকল প্রতিভার মধ্যেই আছে—যাঁহার মধ্যে এই তপশ্চর্য্যা সুস্পষ্ট তাঁহার মধ্যেও আছে, আর যাঁহার মধ্যে সুস্পষ্ট নয় তাঁহার মধ্যেও আছে। শেক্সপীয়র বা বাল্মীকির মধ্যেও আছে, আবার গ্যেতে বা ব্যাসের মধ্যেও আছে। স্ফুটভাবে আর অস্ফুটভাবে হউক, আছে তপঃশক্তির কেমন এক রৌদ্রভাব, একটা আত্মস্থ সংহত সামর্থ্য, একটা পুরুষোচিত দৃঢ়তা। একটা কঠিন সাধনা, আত্মদমই প্রতিভার শক্তিকে কেমন জমাট নিরেট একাগ্র করিয়া ধরিয়াছে; শাণিত তরবারিফলকের ন্যায় একদিকে সে যেমন নমনীয়, অন্যদিকে তেমনি সেই নমনীয়তার সাথে-সাথেই কেমন কাঠিন্যে ভরা। প্রতিভার উৎসই ত সেই বিজ্ঞানলোক, যেখানে তপঃশক্তি কেন্দ্রীভূত, আপন পূর্ণ বিশুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। সঃ তপস্তপ্ত্বা বিশ্বমসৃজত—প্রতিভাও যে সৃজন করিতেছেন এই রকম তপস্যার তাপে তপঃশক্তিকে ফুটাইয়া তুলিয়া। এই-তপঃশক্তি, এই তপস্যার তাপ যাঁহার নাই তাঁহার সৃজনশক্তিও নাই, তাঁহার প্রতিভাও সেই অনুপাতে বিশুদ্ধ পূর্ণ নহে।

তাই আমরা এমন অনেককে দেখিতে পাই যাঁহারা প্রতিভার একটা বীজ লইয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সে প্রতিভাকে সুপক্ক ঋদ্ধ মহনীয় করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে শক্তি খেলিয়াছে অতি সরল অতি সহজ প্রবাহে, নিঃসন্দেহে নির্ব্বিবাদে। শক্তি সেখানে কোন বাধা পায় নাই, শক্তির রাশ টানিয়া রাখিতে তাঁহারা পারেন নাই, তাই সে জিনিসটি জমাট বাঁধিয়া সামর্থ্যে ভরপুর হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। অন্য কথায়, তাঁহারা চলিয়াছেন বেশীরভাগ প্রাণের আবেগে, ভাবের উচ্ছ্বাসে। প্রাণের আবেগকে আদিশক্তির প্রেরণায়, ভাবের উচ্ছ্বাসকে স্থিতপ্রজ্ঞায় পরিণত করিতে পারেন নাই, তপঃলোকে উঠিয়া গিয়া তথাকার দিব্য-ঈষণায় সৃজন করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের রহিয়া গিয়াছে কেমন চাপল্য, কেমন ভাসাভাসা চাকচিক্য—সত্যের ভাবের স্বরূপটি উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগোর এই-রকম একটা fatal facility অতি সুলভ অনুপ্রেরণা ছিল, তাই এতখানি প্রতিভাসত্ত্বেও তাঁহার সৃষ্টি অসম্পূর্ণই থাকিয়া গিয়াছে। আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও যে এ কথা এক-একবার মনে না হয় এমন নয়। ইঁহাদের সাথে স্মরণ করা যাইতে পারে বাল্‌জাকের কথা। বাল্‌জাক যখন লিখিতে বসিতেন তখন তিনি খৃষ্টীয় (রোমান কাথলিক) যতির পোষাক (soutane) পরিয়া তবে লিখিতেন, তিনি বলিতেন ভগবৎ-সেবার ন্যায় শিল্পসেবাতেও প্রয়োজন সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রসাধনা (asceticism)। প্রতিভার মধ্যে অবশ্য কষ্টকল্পনা নাই, সেখানে খুবই আছে সরলতা, কিন্তু সে সরলতাকে বলা যাইতে পারে—একজন ফরাসী সমালোচকের কথায়—facilite difficile, কষ্টসাধ্য সরলতা। বাহির হইতে দেখিলে প্রতিভার সৃষ্টিকে বোধ হয় কেমন আঁটাসাঁটা, কোন ফাঁক নাই, কেমন নিটোল, অঙ্গে অঙ্গে কেমন সহজ সামঞ্জস্যে সম্মিলিত। কিন্তু ভিতর হইতে যে দেখিতেছে তাহার চক্ষে পড়িতেছে কত জায়গায় জোড়া দেওয়া হইয়াছে, কত গ্রন্থি সেখানে রহিয়াছে—যত্নের প্রয়াসের কত রেখা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে প্রতিভার সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশটি যে এত বিরল তাহার কারণও বোধ হয় এইখানে। নারী চলে একটা সহজ অতিসুলভ আবেগের ভরে,—ভাবিয়া চিন্তিয়া নয়, বাদ-বিচার করিয়া নয়, বুদ্ধির জোরেও নয়, সে একটা অন্তরঙ্গ নৈসর্গিক প্রেরণা বটে—Intuition হয়ত অনেকে বলিবেন, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা Intuition নয়, তাহা হইতেছে Instinct। নারীর মধ্যে পাই না পুরুষের আত্মস্থ তপঃশক্তি; ধ্যানীর যতির সেই একাগ্র স্ববশীভূত অথচ উদার প্রশান্ত শক্তির প্রয়োগ। অতিমাত্র নিজের অনুভব, অযত্নপ্রাপ্ত প্রতীতি, বাহ্য-

স্পর্শেরই একটা জাল, নারী নিজের চারিদিকে নিজে বুনিয়া চলে, তাহার মধ্যেই আপনাকে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু প্রতিভার, তুরীয় আবেগের মূলই হইতেছে নিজত্বের ব্যক্তিত্বের উপর শত জোর দেওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ছাড়াইয়া যাওয়া, উদাসীন নির্লিপ্ত হইয়া একটা ভূমার বৃহত্তর বিশ্বের ভাবে ভরপুর হওয়া। নীট্‌শে যে নারী-জাতিকে একটু তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিতেন তাহাও এই জন্যই—প্রতিভার যে সর্ব্বোচ্চতম যে চরম অদ্বিতীয় সৃষ্টি তাহা যেন নারী-প্রকৃতি দিয়া সম্ভব হয় না। শেক্সপীয়র, দান্তে, হোমর, বাল্মীকি—নারীজাতি ত এমন কাহাকেও দিতে পারে নাই। এ কথা অবশ্য বিশেষ ভাবে খাটে ভাবের বা চিন্তার জগৎ সম্বন্ধে। কিন্তু ভাব বা চিন্তার জগৎ অপেক্ষা নারীর প্রতিভা বেশী খেলে কর্ম্মের জগতে। কারণ, কর্ম্মের উৎস হইতেছে প্রাণে, আর নারীর মধ্যে যদি কিছু সজাগ সামর্থ্যে ভরপুর থাকে তাহা হইতেছে এই প্রাণ। আমরা বলিয়াছি প্রাণের আবেগ, উত্তেজনা প্রতিভার তপঃশক্তির অন্তরায়। কিন্তু একদিকে অন্তরায় হইলেও আর-একদিকে আবার সহায়। প্রাণ শক্তিরই উল্টা দিক, নিভৃত সত্তা হইতেছে তপঃশক্তি - প্রাণশক্তি যেখানে সচল জীবন্ত সেখানে সে তপঃশক্তি ফুটিয়া উঠিবার সুবিধা পায়, যদিও তপঃশক্তি সব সময়ে একেবারে বিশুদ্ধ, আপনার স্বরূপ সত্তাটি লইয়া বিকশিত হয় না। তবুও—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে। বস্তুতঃ এই কর্ম্মজগতেই দেখি নারী-প্রতিভার যত মহীয়সী কীর্ত্তি। কবিশ্রেষ্ঠের মধ্যে যদি পাই এক সাফো (Sapho), কর্ম্মীশ্রেষ্ঠের মধ্যে পাই—সেমিরামিস, ক্লেওপাত্রা, জান দার্ক।

প্রতিভাবানের স্বভাবে একটি বিচিত্রতার উল্লেখ করা পরিশেষে প্রয়োজন মনে করি। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাতে আর পাগলে ধাতুগত কোন পার্থক্য নাই, উভয়ে একই পদার্থে গঠিত। কথাটি শুধুই রূপক বা অলঙ্কার নয়। আমরা সত্য সত্যই দেখি প্রতিভাবান কোথাও একেবারে উন্মাদ, নতুবা অদ্ভুত খামখেয়ালের বশবর্ত্তী। প্রায় সকলেরই মধ্যে বোধ করি কেমন মস্তিষ্কের স্থিরতা নাই, সেখানে কি একটা গোলমাল অসামঞ্জস্য দেখা দিতেছে। এ কথারও সদর্থ আমরা প্রতিভার যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা হইতেই পাই।" আমরা বলিয়াছি, আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন যে সামঞ্জস্যকে, যে নিয়মকে, যে 'ধর্ম্ম'কে (poise) সৃষ্টি করিয়াছে, মস্তিষ্কের বিচারবুদ্ধি যাহাকে স্পষ্ট স্ফুট অচল অটল করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছে, সে সামঞ্জস্যকে, সে নিয়মকে, সে ধর্ম্মকে প্রতিভা চাহেন না। তিনি তাহার পরিবর্ত্তে দিতে চাহেন আর-একটা ধর্ম্ম, আর এ জিনিসটি তিনি আহরণ করেন আর-একটা উত্তর জগৎ হইতে। তাই প্রচলিত অভ্যস্ত নিয়মের মধ্যে যিনি আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, বিচারবুদ্ধির—যাহাকে আমরা বলি সুস্থির মতি, তাহার—যে বিধিবিন্যাস তাহাকে এতটুকু এড়াইয়া চলেন না, এমন ব্যক্তির মধ্যে সেই তুরীয় লোকের প্রেরণা যেন কোন প্রবেশের পথ পায় না, কি একটা কঠিন নিথর আবরণ যেন উহার সম্মুখে। কিন্তু যেখানে ধরাবাঁধার নিগড় তেমন নাই, যেখানে একটু বিশৃঙ্খলা, একটু শিথিলতা, যেখানে একটু আত্মবিস্মৃতি, সেখানেই অতর্কিতের, আকস্মিকের স্থান, সেখানেই প্রতিভার প্রেরণা ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। তাই দেখি বদ্ধপাগলের মধ্যেও অসাধারণ Intuition সব খেলে, শিশুর মুখেও শুনি দিব্যজ্ঞানের কথা। শুধু তাহাই নয়, অন্যদিকে আবার, প্রতিভার যে তুরীয় আবেগ তাহা এতই শক্তিমান, এতই অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত অপরিচিত যে জগতের মধ্যে সে যেমন একটা আলোড়ন তুলিয়া দেয়, প্রতিভাবানের নিজের আধারকেও তেমনি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। আধার যে-সমস্ত জিনিসে অভ্যস্ত, তাহার যে-সব সংস্কার অপেক্ষা সম্পূর্ণ নূতন মহান জিনিস প্রতিভা লইয়া আসে—পুরাতন আধার এই নূতন আবেগকে সহজে ধারণ করিতে পারে না। তাই দেখি কোথাও সে আধার একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—যেমন, নীট্‌শে—কোথাও বা দেখি সেখানে ফাটল ধরিয়াছে—যেমন, ওয়াগ্‌নের। প্রতিভাশালীদের মধ্যে এই যে বাতুলতা হউক আর বাতিকই হউক যাহা দেখি তাহা হইতেছে ধারণ-সামর্থ্যের অভাব। মস্তিষ্ককে সুস্থির, বুদ্ধিকে অটল রাখিয়া, তুরীয়ের স্বাস্থ্যেই ভরিয়া উহাদিগকে যে গড়িয়া তুলা যায় না তাহা নয়; আধারকে জীবনকেও আবার একটা জাগ্রত স্ফুট স্থিরপ্রতিষ্ঠ সামঞ্জস্যে নিয়মে বিধৃত করা যায়—কিন্তু সে অভিনব স্বভাবের জন্য চাই অন্য একরকম সাধনা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

উদ্যানলতা

(১০)

কলিকাতার শীতের ধোঁয়া প্রায় কেটে পচা গরমের পালা এসেছে। বসন্তদেব ত সেখানে ট্রামগাড়ী চাপা পড়বার ভয়ে ভাল করে দেখা দেবার সাহস পান না। মাঝে মাঝে পথের ধারে পোড়ো বাড়ীর পিছনে, রান্নাঘরের আনাচে কানাচে, বড়লোকের কেয়ারি-করা ময়দানে, গরীবের ছাদের টবে একটু উঁকিঝুঁকি মারেন মাত্র। বাতাসে ভর করে একটু আকাশ পথে আস্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও তেমন সুবিধা পান না; আকাশও যেমন বোঝাই, বাতাসও তেমনই বোঝাই, পথ মেলা ভার!

সহরেরই একটা মেয়েদের ইস্কুলে সারি সারি দেবদারু গাছ দেখে বসন্তরাজের মন বেজায় খুসী হয়ে উঠ্‌ল। ঋতুরাজ তরুণী কুমারীদের খুসী কর্‌বার জন্য গাছগুলোকে গুচ্ছ গুচ্ছ নবীন-কিসলয়ে মসৃণ কোমল করে তুল্‌লেন। দখিন পবনও তাঁর দেখাদেখি শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় দোলা দিতে সুরু কর্‌লেন।

মেয়েরা সকাল বিকেল যখন-তখন ভিড় করে তাদের তরু-সখাদের রূপ দেখ্‌তে আস্‌ত। পথের লোকেও একটু আধটু দেখ্‌বার জন্যে ভিড় করেই উঁকি দিত, তবে তরুর শ্রী দেখ্‌তে কি তরুণীর শ্রী দেখ্‌তে বলা যায় না।

ছুটির দিন। ছুটো আড়াইটের সঙ্গে চুড়িওয়ালা এসেছিল। সে মেয়েদের খুব চেনা। ছুটি হলেই ঝাঁকা মাথায় করে লাল নীল গোলাপী সবুজ ডালিম জর্‌দা হরেক রঙের, ফিকে গাঢ় নানা ভাবের, সরু মোটা নানা ছাঁদের, লতা-কাটা প্লেন বিচিত্র বাহারের কাঁচের চুড়ি দড়িতে গেঁথে ছোট ছোট শাদা কাগজের বাক্স করে নিয়ে আসে। আজও তেম্‌নি ভাবে এসেছিল। আর এসেছিল একজন কাশ্মীরী মুসলমান রেশমী কাপড় বেচ্‌তে। দু জায়গাতেই মেয়েদের ভিড় লেগে গেছে।

একটি মেয়ে চুড়িওয়ালার কাছে বসে ধপ্‌ধপে শাদা হাতে একগোছা করে কচি কলাপাতার রঙের সরু সরু চুড়ি পর্‌ছিল। কাপড়ওয়ালার কাছ থেকে একটা ফিকে বাদামী রেশমের টুক্‌রো হাতে করে আর-একটি বছর ষোল বয়সের মেয়ে আঁচল লুটিয়ে ছুটে এসে বল্‌লে, "মা গো মা! আচ্ছা ভাই, কেষ্টোদাসী, তোর কি ফর্‌সা রঙের গর্ব্বে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে? না হয় হলেই বা সুন্দরী! তা বলে কি ওই মোটা মোটা হাতে মেথ্‌রাণীদের মত একহাত চুড়ি পর্‌বি? ইস্ দেখিস, লোকে মূর্চ্ছা না যায়, আবার কচি কলাপাতার রঙের চুড়ি!"

কেষ্টোদাসী হাতটা টেনে বল্‌লে, "আচ্ছা বেশ! তোমার মত না হয় মৃণাল-বাহু নেই, তা বলে কি চুড়ি পর্‌ব না?"

চুড়িওয়ালা চেঁচিয়ে বল্‌লে, "বাবা, অমন করে হাত সরিও না, শক্ত হলে চুড়ি ভেঙে যাবে। আমি গরীব মানুষ অত কোথায় পাব?"

কাপড়ওয়ালা ডাক দিয়ে বল্‌লে, "মুক্তি বাবা, এদিকে এস না! আমি বল্‌ছি কোন্ কাপড়টা ভাল।"

ষোড়শী মুক্তি বাদামী কাপড়খানা হাতে করে ফিরে আস্‌তেই সে একটা সোনালি বুটি দেওয়া টক্‌টকে লাল বেণারসীর টুক্‌রো তার গায়ে ছুড়ে দিয়ে বল্‌লে, "সত্যি বল্‌ছি, মুক্তি বাবা, তোমাকে এতে এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে আমি কিছুতেই আর ওটা ফিরে নিয়ে যেতে পার্‌ব না। দাম না দাও ত অমনি দিয়ে যাচ্ছি। তোমায় ওর জামা পর্‌তেই হবে।"

মেয়েরা একসঙ্গে হেসে উঠে বল্‌লে, "দাও না অম্‌নি, আমাদের পয়সা বেঁচে যাবে।"

মুক্তি বল্‌লে, "হ্যাঁ, আমি এখন বুড়ো বয়সে টক্‌টকে লাল রং পরি! ও আমি নেব না।"

মুক্তির কথায় আর-একটু বড় মেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি। মুক্তি বুড়ী, তবেই হয়েছে! আমরা তবে নিমতলার ঘাটে বুঝি?

অনেক গোলমালের পর লাল কাপড়টাই নেওয়া স্থির হল। দাম নেবার বেলায় দাতা বেপারী পাচ টাকা গজের কমে ছাড়েই না। অনেকবার বাজিয়ে গোটা ছ সাত টাকা আদায় করে যেই সে উঠ্‌ল, অমনি উপরের ঘর থেকে খট্ খট্ শব্দ করে মিস দত্ত নেমে এসে বল্‌লেন, "আরম্ভ করেছ? সিল্ক আর জরি, চুড়ি আর বালা, এ ছাড়া কি তোমাদের কোনো কথাও নেই, কাজও নেই?"

মুক্তি তাড়াতাড়ি রেশমের টুক্‌রোটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেল্‌লে। শান্তিপুরে শাড়ীর তলা ভেদ করে তার লাল রং ফুটে বেরুচ্ছিল। সেদিকে না তাকিয়ে গাড়ী-বারাণ্ডার দিকে যেতে যেতে মিস্‌ দত্ত বল্‌লেন, "যাও শীগ্‌গির প্রস্তুত হও গিয়ে। এখানে জটলা পাকাতে হবে না। আজ বটানিকাল গার্ডেনে যেতে হবে মনে নেই? আমি পীতাম্বরকে গাড়ী ঠিক কর্‌তে বল্‌তে যাচ্ছি।"

মিস্‌ দত্ত চলে যেতেই মেয়েরা হুড়মুড় করে গিয়ে তাদের কাপড় ছাড়্‌বার ঘরে ঢুক্‌ল। কেউ সাবান-দেওয়া একরাশ এলো চুলে রঙিন ফিতে বেঁধে, কেউ হাড়ের বন্ধনী দিয়ে ফাঁপা খোঁপা বেঁধে, কেউ বা মোটা বিনুনির আগায় এক গোছা কালো ফিতের ফুল ঝুলিয়ে, কেউ বা বাঙালী ধরণে চেপ্টা খোঁপা বেঁধে, জুতো মোজা পরে, নানা রঙের নানা ফ্যাশানের সাজ সজ্জা করে মেয়েরা যখন বেরিয়ে পড়্‌ল, গাড়ী দুটো তখন ঘড়্‌ঘড় করে এসে গাড়ীবারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছে। সমস্ত বিকাল বাগানে কাটিয়ে জ্যোৎস্না উঠ্‌লে গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়িয়ে তারা ফির্‌বে।

সূর্য্যদেব যখন গাছের ফাঁকে ফাঁকে বঙ্কিম রশ্মি ফেলে পরিশ্রান্ত মেয়েগুলির মুখ রাঙিয়ে তুল্‌ছিলেন আর পবন-দেব ঘূর্ণা হাওয়ার খেলায় তাদের খোলা চুল আর শাড়ীর আঁচল তরঙ্গিত করে তুল্‌ছিলেন, তখন মুক্তি বল্‌লে, "হ্যাঁ ভাই বিমলা, মিস দত্ত না বলে দিয়েছিলেন—এই সময় সবাই গিয়ে বটগাছের তলায় জুট্‌তে হবে?"

বিমলা বল্‌লে, "হ্যাঁ বলেছিলেন ত! সুসীদি যদি আর-একটু বেড়াতে দেন, তাহলে একটু গঙ্গার ঘাটে যাই। এখন খেতে ভাল লাগে না। বেড়ানোটা মাটি হয় খালি।"

মুক্তি তাদের নূতন শিক্ষয়িত্রী তরুণী সুসীদির হাত ধরে ঝুলে বল্‌লে, "চল না ভাই সুসীদি, তুমি নিয়ে গেলে মিস্‌ দত্ত কিচ্ছু বল্‌বেন না।"

কেষ্টোদাসী বল্‌লে, "না সুসীদি, ওর কথা শুন্‌বেন না, মিস দত্ত নিশ্চয় বক্‌বেন; আমি জানি।"

হঠাৎ দুটি ছেলে সাইক্‌ল্‌ চড়ে মাথার চুল গায়ের চাদর সমস্ত হাওয়ায় উড়োতে উড়োতে প্রায় মেয়েদের সাম্‌নে এসে পড়্‌ল। একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "এই ধীরে, মেয়েদের ঘাড়ে পড়্‌বি নাকি গিয়ে?"

শব্দ শুনে চম্‌কে কেষ্টোদাসী ফিরে চেয়ে বল্‌লে, "দেখ্‌ ভাই মুক্তি, ওপাশের ছেলেটি কেমন সুন্দর দেখ্‌তে!"

মুক্তি চেয়ে দেখে বল্‌লে, "কৈ, ওই ছেলেটি? ও ত আমার দাদা।"

কেষ্টদাসী পরাজিত বোধ করে বল্‌লে, "ওমা দূর থেকে যেমন দেখাচ্ছিল, আসলে মোটেই তা নয়, একেবারে ফুল বাবু; কোঁক্‌ড়া চুল আর পালিস-করা মুখের বাহার খালি। পুরুষমানুষকে ওতে মোটেই মানায় না। তার চেয়ে এই দিকের ছেলেটি ভাল।"

ধীরেন তার বন্ধুকে চুপি চুপি বল্‌লে, "হ্যাঁরে জ্যোতি, ওই সুন্দর মেয়েটি তোর বোন নাকি? 'আমার দাদা' বল্‌লে মনে হল যেন!"

জ্যোতি বল্‌লে, "দূর পাগল, কি শুন্‌তে কি শুনিস তার ঠিক নেই। দাদা কেউ বলেনি কখ্‌খনো। ও ত মুক্তি। আমার বোন ত নয়।"

ধীরেন চোখ দুটো বড় বড় করে বল্‌লে "মুক্তি তোকে চেনে? ও কে?"

পিছন থেকে গোটা দুই গোরা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আস্‌ছিল। মেয়েদের দেখে তারা জ্যোতি ও ধীরেনের সঙ্গ ছেড়ে সেই দিকে চল্‌ল।

মেয়েদের মধ্যে একটু ভয়ের চাঞ্চল্য দেখা গেল। তবে তাদের তরুণী শিক্ষয়িত্রী সুসীদি তখনই একটা প্রবল রকমের আশ্বাস দিয়ে তাদের শান্ত করে দিলেন, অন্ততঃ বাইরে সেই রকমই দেখাল। ভিতরে হয়ত আশ্বাসদায়িনী নিজেই তেমন সুবিধা বোধ কর্‌ছিলেন না।

গোরাগুলো কিন্তু এগিয়েই চলেছিল। মেয়েদের ভয় দেখানো ছাড়া তাদের বোধ হয় অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, এবং তাও ছিল কি না তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক, মেয়েদের সেটা বুঝ্‌বার কোনো উপায় ছিল না। তারা ক্রমেই গা ঘেঁষে ঘেঁষে তাদের তরুণী রক্ষাকারিণীর চারধারে জমাট ভীড় করে দাঁড়াতে লাগ্‌ল। তাদের হাস্য কোলাহল তখন একে-বারেই থেমে গিয়েছিল।

হঠাৎ জ্যোতি আর ধীরেন প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠ্‌ল—"এই চল্‌ ত, একবার বাঁদরগুলোকে মজা দেখাই, ভারি আস্পর্দ্ধা পেয়ে গিয়েছে।"

তৎক্ষণাৎ দুজনেই সাইক্লে উঠে পড়ে, তীরের মত ছুটে প্রায় গোরাদুটোর ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়্‌ল। চাপা পড়ার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য তাদের কাজেই রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হল। তবে জ্যোতি এবং ধীরেনের উপর তারা যে খুব খুসী হয়ে উঠ্‌ল, তা নয়, একজন হাতের ছড়িটা সজোরে একবার চালিয়ে নিল, তবে আঘাতটা একটা বড় ফার্ণ গাছের মুণ্ডচ্ছেদ করা ছাড়া আর কিছু কাজে লাগ্‌ল না এবং আর-একজন একটা অশ্রাব্য গালি উচ্চারণ করেই নিরস্ত হল, সেটাও যাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত তাদের কানে পৌছল কি না সন্দেহ।

ধীরেন এবং জ্যোতি ততক্ষণ মেয়েদের দলের কাছে গিয়ে পৌঁছেচে। সাইক্‌ল্‌ থেকে নেমে পড়ে দুজনে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়্‌ল। জ্যোতি পকেট থেকে একখানা বই টেনে বের কর্‌ল এবং ধীরেন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নিজের দ্বিচক্রযানখানির চক্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। গোরা দুটোর মনে কি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হল তা বলা যায় না, তারা সোজা অন্য রাস্তা দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ধীরেন চাকার কাদা ছাড়াতে ছাড়াতে খুব নীচু গলায় বল্‌লে, "ইঃ, কি ষ্টুডিয়স ছেলে রে! বই নিয়ে একেবারে ডুবে গেলি? ইব্‌সেনের ডল্‌স্‌ হাউস্‌ কবে থেকে তোদের পাঠ্য হয়েছে রে?"

জ্যোতি বইয়ের পাতায় চোখ ফিরিয়েই উত্তর দিল "পাঠ্য ছাড়া আর বুঝি কিছু পড়্‌তে নেই? বেশী বক-ধার্ম্মিক সাজ্‌বে ত আমি এখুনি চীৎকার করে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে জানিয়ে দেব যে তুমি এখুনি মিস্ত্রিখানা থেকে সাইক্‌ল্‌ বের করে এনেছ। অত করুণ দৃষ্টিতে তার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বার কোনোই কারণ নেই।"

ধীরেন হার মেনে বল্‌লে "বল্‌ না দেখি কেমন! আচ্ছা, মাঝের ঐ মেয়েটি বোধ হয় টীচার; অন্ততঃ তাই ত মনে হচ্ছে। ওঁর চেহারাটা কিন্তু টীচারের মত লাগ্‌ছে না।"

জ্যোতি মাথা তুলে বল্‌লে "তবে তুই কি করে জান্‌লি যে টীচার?"

"সেটা তোমার মত গোমুখ্যু না হলে একটু আন্দাজ করা যায়। দেখ্‌ছ না উনিই ওদের দলে একমাত্র একটু বয়সে বড়, গোরা আস্‌তেই মেয়েরা কিরকম ওঁর চারপাশে ছেঁকে দাঁড়াল?"

"ইস্‌, তোমার power of observation ভয়ানক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি, ক্লাশে ত এত বিদ্যার পরিচয় কখনও দেও না? আচ্ছা আমি মুক্তির কাছে জেনে নেব এখন যে উনি কে। তুমি কত বড় শার্লক হোম্‌স্‌ হয়ে উঠেছ তার পরীক্ষা করা দর্‌কার।"

ধীরেন বল্‌লে "তা কর না পরীক্ষা, আমি তোমার চ্যালেঞ্জ অ্যাক্‌সেপ্ট্‌ কর্‌ছি। ভাল কথা, মুক্তি কে বল্‌লে না ত? তুমি তাঁকে কি করে চিন্‌লে? ঐ কালো-কাপড়-পরা মেয়েটি ত?"

জ্যোতি মুখখানা পরম গম্ভীর করে উত্তর দিলে "মিঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, উনি হচ্ছেন তাঁরি মেয়ে।"

ধীরেন হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লে, "তাই বল, আমি তোমার পরম গম্ভীর মুখ দেখে ভেবেছিলাম না জানি কে?"

এদিকে মেয়ের দল আসন্ন গোরার ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আবার খুব গল্প এবং হাসাহাসি জুড়ে দিয়েছিল। কোনো ভালমানুষ গোছের লোক তাদের দেখ্‌লে ভুলেও মনে কর্‌তে পারতেন না যে নিকটবর্ত্তী দুটি ছেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের একটুও জ্ঞান আছে। অবশ্য ছেলে দুটিকে দেখেও সেরকম কথা মনে করা শক্ত ছিল।"

কেষ্টোদাসী অপর্ণাকে এক ঠেলা দিয়ে শ্লেষের সুরে বল্‌লে, "এই দেখ মুক্তির দাদা কেমন মন দিয়ে পড়াশুনো কর্‌ছে। ছেলেরা বেজায় পড়ে, না ভাই? বাগানে বেড়াতে এসেও কেমন পড়্‌ছে?"

অপর্ণা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে "আমার ভাই, ওকে দেখে লে মিজেরাব্লের ফিল্‌মের মেরিয়াসের কথা মনে হচ্ছে। সে কেমন বেড়িয়ে বেড়িয়ে মন দিয়ে বই পড়ত।"

কেষ্টোদাসী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে অপর্ণাকে একটা খুব প্রচণ্ড চিম্‌টি কেটে বল্‌লে "আর নিজেকে বুঝি কোসেট বলে মনে হচ্ছে?"

"যাঃ, কি যে বাঁদ্‌রামি করিস্‌, এক্ষুনি সুসীদি শুন্‌তে পাবেন।"

মুক্তি এতক্ষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল "তোমাদের আলোচনাটা বোধ হয় থামাতে হবে, মিস্‌ দত্ত সেকেণ্ড ইয়ারের মেয়েদের নিয়ে এই দিকে আস্‌ছেন।"

অপর্ণা ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্‌লে "মুক্তিটা সব শুনেছে ভাই। মাগো, যদি ওর দাদাকে বলে দেয় ?"

কেষ্টোদাসীরও যে সে ভয়টা না ছিল তা নয়, তবে সে একটু জোর করে সাহস দেখিয়ে বল্‌লে "বলুক্‌গে না, আমাদের ত আর তার দাদা খেয়ে ফেল্‌বে না।"

মিস্‌ দত্ত এবং তার সঙ্গে একপাল মেয়ে এসে পৌঁছলেন। সুসীদির তত্ত্বাবধানে যে মেয়েগুলি ছিলেন, তাঁরা হাসিঠাট্টা একেবারে বন্ধ করে আদর্শ বালিকার মত হাত পা স্থির এবং মুখ গম্ভীর করে বসে পড়্‌লেন। এমন কি একজন কোথা থেকে একটা 'ওয়ার্ড মেকিং ওয়ার্ড টেকিং"এর বাক্‌স বের করে চটপট তার কার্ডবোর্ডে-আঁটা অক্ষরগুলো ঘাসের উপর সাজাতে সুরু করে দিলে।

মেয়েদের বস্‌বার জায়গার কাছাকাছি স্থানে যে দুটো অন্য জাতীয় জীব বসে আছে, মিস্‌ দত্ত এসেই সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি সুসীকে একটু তীক্ষ্ণ সুরেই বল্‌লেন, "মিস্‌ রায়, মেয়েদের নিয়ে এখানে বসাটা তোমার ঠিক হয়নি। বড় বটগাছতলায় গেলেই ঠিক হত। মেয়েরা সব কি কর্‌ছে, একটুও বেড়িয়েছে, না তখন থেকে এইখানেই বসে আছে ? মেয়েরা! এই বেড়ানোর বিষয়ে তোমাদের আস্‌চে সপ্তাহে রচনা লিখ্‌তে হবে তা যেন মনে থাকে।" সুসী মিস্‌ দত্তের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী হলেও তিনি মেয়েদের সাম্‌নে কখনও তাকে নাম ধরে ডাকৃতেন না।

এই নবাগতা মহিলা যে টীচার সে বিষয়ে ধীরেন অথবা জ্যোতি, কারো মনেই একটুও সন্দেহ হল না। জ্যোতির ইব্‌সেন তৎক্ষণাৎ পকেটে ঢুকল এবং ধীরেনের সাইকল সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাও অকস্মাৎ লোপ পেয়ে গেল। দুজনেই অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে অদৃশ্য। মিস্‌ দত্ত তাদের পলায়নে বিশেষ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ভাবলেন "এসব ছেলেমানুষ টীচারের হাতে মেয়েদের ভার দিয়ে কোনো লাভ নেই, তাদের কেই বা মানে ? টীচার বলে চিন্‌তে পার্‌লে ত ?"

মুক্তিদের বেড়ানো সেদিন আর জম্‌ল না। মিস্‌ দত্ত তাদের নিয়ে খানিকটা হেঁটে বেড়ালেন, এবং আশে-পাশের দুচারটে গাছের ল্যাটীন নামও বলে দিলেন। খানিক পরে, বড় বটগাছতলায় বসে বেতের টিফিনের বাক্স খুলে জলযোগ করা হল। মিস্‌ দত্তের কাছে যারা ছিল তারা শুধু জলযোগই কর্‌লে, দূরে যারা ছিল তারা একটু গোলোযোগও করে নিল। অতঃপর সূর্য্য অস্ত যাবার জোগাড় দেখে লম্বা গাড়ী চড়ে তারা বোর্ডিং অভিমুখে যাত্রা কর্‌লে।

(১১)

সেদিন স্কুল ছুটি হবার পরে মেয়েরা যখন বই-খাতার গাদায় নাক অবধি ঢেকে বোর্ডিং-বাড়ীর দিকে চলেছে, তখন হঠাৎ উপরের বারাণ্ডা থেকে মিস্‌ দত্তের গলা শোনা গেল, "মেয়েরা কে ওখানে আছ, একবার কৃষ্ণদাসীকে উপরে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

কৃষ্ণদাসী নিজেই সেই দলে উপস্থিত ছিলেন। তার নাম হবামাত্র দলের সকলেই তার দিকে একটু সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌লে, একটি মেয়ে বলে উঠ্‌ল, "আবার কি হল ? কাল তুই খালি পায়ে ক্লাশে গিয়েছিলি, নিশ্চয় দেখ্‌তে পেয়েছে। তখন বলেছিলাম না আমি ?"

কেষ্টোদাসী নিজের গোলগাল মুখখানা আরো একটুখানি ফুলিয়ে বল্‌লে "বেশ করেছিলাম! আমি ত আর মেম নয় তোমাদের মত, যে সারাদিন জুতো মোজা এঁটে বসে থাক্‌ব ?"

মন্তব্যকারিণী কিঞ্চিৎ চটে গিয়ে বল্‌লেন "আচ্ছা গো, আর্য্যনারি, এখন আর্য্যামির ঠেলা সাম্‌লাও গিয়ে।"

কেষ্টোদাসী রাগের মাথায় জোরে জোরে পা ফেলে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখ্‌বার জন্যে তার সঙ্গিনীরা সিঁড়ির মুখে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল।

মিনিট পাঁচেক পরে কেষ্টোদাসী ছুটে নেমে এল; তার ফর্শা মুখখানা একেবারে লাল হয়ে উঠেছে, মুখ চোখ দিয়ে একেবারে হাসি ফেটে পড়্‌ছে।

অপেক্ষাকারিনীর দল ত তার মূর্ত্তি দেখে অবাক! মিস্ দত্তের ঘর থেকে এত হাসি সঞ্চয় করা ত কম ব্যাপার নয়? সেখানে তার উল্টো জিনিসটাই বরং বেশ্ সস্তা।

কেষ্টোদাসী সিঁড়ির নীচের ধাপে পা দেবামাত্র বন্যার তরঙ্গের মত তার সঙ্গিনীরা এসে তার উপরে পড়্ল। সকলে মিলে সমস্বরে এতরকম প্রশ্ন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে যে একটা মানুষ, রামায়ণের একব্যক্তির মত দশটা মুখ থাক্‌লেও, তার উত্তর দিতে পার্‌ত না।

যাক্, প্রশ্ন করে করেই অনেকের মনের উচ্ছ্বসিত অবস্থা খানিকটা শান্ত হয়ে গেল। তখন আসল ব্যাপারটা জানা গেল। কেষ্টোদাসীর বাবা চিঠি লিখেছেন যে, তিনি মেয়েকে আর পড়াবেন না, দু তিন দিনের মধ্যেই তিনি মেয়েকে নিতে কল্‌কাতা যাচ্ছেন। মিস্ দত্ত যেন অনুগ্রহ করে কেষ্টোদাসীর স্কুল এবং বোর্ডিং ফি কত বাকী আছে তা তাঁকে জানান।

মেয়েরা মহা কোলাহল সহকারে কেষ্টোদাসীকে টান্‌তে টান্‌তে কাপড় ছাড়্‌বার ঘরে ঢুকে পড়্ল। কেষ্টোদাসী যে কেন বাড়ী যাচ্ছে তার কারণ বুঝ্‌তে একজনেরও এক মুহূর্ত্তের বেশী সময় লাগ্‌ল না। খবরটা আনন্দের হলেও সেটা শুন্‌বামাত্র অনেকের মনে এই কথাটাই এসে পড়্ল যে এই কলরবমুখর আনন্দস্রোতের কারণটা সে নিজে হলে বেশ ভাল হত। তা যখন হয়নি তখন যা হাতে পাওয়া গেল তাই নিয়েই খানিক ফুর্ত্তি করা যাক, এরকম সুখবর তাদের পুরু দেয়ালের বাধা এবং তার চেয়েও আর-একটা দুর্ভেদ্যতর বাধা ভেদ করে এখানে প্রায়ই ঢুক্‌তে পায় না।

কেষ্টোদাসীর বিশেষ বন্ধু অপর্ণা তাকে ঠাশ্ করে এক চড় লাগিয়ে বল্‌লে, "কি গো বিড়াল তপস্বি, তোমার না পরীক্ষার জন্যে ভারি ভাব্‌না হয়েছিল, রাত্তিরে না তারি ভাব্‌নায় ঘুম হত না?"

আর-একজন তার চুল ধরে এক টান দিয়ে বল্‌লে "তুই সেদিন কেন ওজনে আগের চেয়ে এক ছটাক কম হলি তা বুঝ্‌তে পেরেছি।"

কেষ্টোদাসীকে কেন্দ্র করে মস্ত একটা ঘূর্ণীর সৃষ্টি হল। বোর্ডিংএর ঘণ্টার দিকে লক্ষ্য না করে কেউ বা তার কাছে ভোজ আদায়ের চেষ্টায় বসে গেল, কেউ তার ভাবী বরের চেহারা সম্বন্ধে নানারকম কল্পনা আরম্ভ কর্‌ল, কেউ বা কনের পোষাকে কেষ্টোদাসীকে কিরকম দেখাবে সেই ভাবনায়ই আকুল হয়ে উঠ্‌ল।

এমন সময় যশোদা ঝি পর্দ্দা তুলে বল্‌লে "মুক্তিবাবা, মেমসাহেব তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

ঘরের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল। নিশ্চয়ই মুক্তির বাবাও তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছেন। মুক্তি সেটা মেনে নিয়েই বল্‌লে "তা হয়ত এসেছেন, কিন্তু কেষ্টোদাসীর মত চিরদিনের জন্যে নয়।"

মিস্ দত্তের কাছে সে হাজির হবা মাত্র তিনি বলে উঠ্‌লেন "কে একজন জ্যোতির্ম্ময় রায় তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন? এঁকে কি তুমি চেন? কৈ আগে ত কখনও এঁকে এখানে দেখিনি?"

জ্যোতি এর আগে একলা কখনও মুক্তির সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসেনি, শিবেশ্বর তাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌তেন। আজকে বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে না এসে তাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মুক্তি বল্‌লে, "হ্যাঁ, ওঁকে খুব চিনি, উনি ত আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। বাবার সঙ্গে অনেকবার আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তেও এসেছেন।" জ্যোতিকে এত সম্মান সহকারে উল্লেখ কর্‌তে হচ্ছে দেখে তার বেজায় হাসি পাচ্ছিল।

মিস্ দত্ত একটুক্ষণ কি ভেবে বল্‌লেন "আচ্ছা দেখা কর্‌তে পার।"

মুক্তি দেখা কর্‌বার উদ্দেশ্যে চল্‌ল। মিস্ দত্তও তার সঙ্গে খানিকদূর গিয়ে জ্যোতির্ম্ময় নামক জীবটাকে দেখে এলেন। এই ছেলেটাকে আগে কোথায় দেখেছেন বলে তাঁর মনে হল, কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছেন তা কিছুতেই মনে আন্‌তে পার্‌লেন না।

মুক্তি ঘরে ঢুক্‌তেই জ্যোতি বলে উঠ্‌ল "বাপ্ রে বাপ, তোমার আর আসাই হয় না।"

মুক্তি বল্‌লে "এসেছি যে সেই ঢের, কে না কে জ্যোতির্ম্ময় রায় বলে মিস্ দত্ত ত আস্‌তেই দিচ্ছিলেন না, আমি কত বলে কয়ে তবে না এলুম।"

"কি বল্‌লে শুনি? বল্‌লে বুঝি 'ও একটা হতভাগা

ছেলে আমাদের বাড়ীতে আগে থাক্‌ত, এখন হোটেলে থাকে?”

মুক্তি বল্‌লে “না, তা ত বলিনি, তোমার জন্যে অত কথা বল্‌তে ত আমার বয়ে গেছে। 'আমি বল্‌লুম 'ওটা আমাদের উড়ে মালী।' ”

জ্যোতি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে “ইঃ আমাকে দেখে কি না কেউ উড়ে বলে বিশ্বাস কর্‌বে?”

“ওরে বাস্‌রে, ভারি ত চেহারা, তার আবার অহঙ্কার দেখ! একটা তিন হাত লম্বা নাক আর কাফ্রির মত পাকানো পাকানো কতগুলো চুল আছে তার গর্ব্বে আর মাটিতে পা পড়ে না। সেদিন যে অত বাহার করে আমাদের দলের কাছে বসে ইবুসেন পড়ে এলে তাতে কেউ মূর্চ্ছা যায়নি গো, বুঝেছ? বরং একজন মেয়ে বল্‌লে 'ঐ ছেলেটার কি ফুলবাবুর মত চেহারা, মাগো! পাশের ছেলেটা ওর চেয়ে ঢের দেখ্‌তে ভাল।' ”

জ্যোতি বলে উঠ্‌ল, “কে ধীরেনটা আমার চেয়ে দেখ্‌তে ভাল? এমন না হলে আর মেয়েলি টেষ্ট! তাকে কিন্তু এ কথা আমি বল্‌ছি না, তা হলে সে মাথায় হাঁট্‌তে আরম্ভ কর্‌বে।”

মুক্তি একটা চেয়ার টেনে বসে বল্‌লে, “কি জ্বালা, তুমি কি আজ নিজের রূপের বিষয়েই গল্প কর্‌বে নাকি?”

জ্যোতি তাড়াতাড়ি অত্যন্ত অনুতপ্ত মুখ করে বলে উঠ্‌ল, “ও তাই ত, ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছে। এসেই তোমার রূপের বিষয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল।”

মুক্তি চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্‌লে “তোমাকে আজ ভূতে পেয়েছে নাকি? আমি চল্‌লাম এখন; বাবার কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই তোমার মত মূর্ত্তিমানকে দেখা কর্‌তে পাঠিয়েছেন।”

জ্যোতি একলাফে দর্‌জার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে “আরে যাও কোথায়, আসল কথাটাই যে বলা হল না।”

“আসল কথা কি শুনি? তোমার রং একটু ফর্সা হয়েছে, না চুল এক ইঞ্চি লম্বা হয়েছে?”

“না অত দর্‌কারী খবর নয়। তোমার বাবা তোমায় বল্‌তে বলেছিলেন যে তিনি হোটেল ছেড়ে আবার বাড়ীতে এসেছেন। কালই সবে এসেছেন। তাই নানা হাঙ্গামে আজ আর আস্‌তে পার্‌লেন না। ঠাকুরমাও নাকি তিন চার দিনের মধ্যে আস্‌ছেন। তাই তোমাকে কাল বাড়ী যেতে হবে, এখন বাড়ীতেই থাক্‌বে গ্রীষ্মের ছুটি পর্য্যন্ত, বুঝ্‌লে?”

জ্যোতি একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল। তার কথা শেষ হবা মাত্রই মুক্তি নিজের কোঁক্‌ড়াচুলের গোছা দুলিয়ে বলে উঠ্‌ল, “বেশ যাহোক্, শুধু আমায় বলে কি হবে? মিস্ দত্তকে বাবা চিঠি না দিলে আমায় যেতে দেবেন কেন?”

জ্যোতি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা নীল খাম বার করে বল্‌লে “এই নাও চিঠি। ভাগ্যে মনে করে দিলে তা না হলে ভুলেই যেতাম।”

মুক্তি চিঠিখানি হাতে নিয়ে বল্‌লে “সাধে কি লোকে তোমায় কবি বলে! সারাদিন কেবল আকাশের দিকেই চেয়ে আছ।”

“তাতে প্রমাণ হয় যে তোমার চেয়ে অন্য লোকে খাঁটি জহুরী।”

মেয়েদের বেড়াবার ঘণ্টা ঢংঢং করে উঠ্‌ল। “ঐ যা আমার এখনও চুল বাঁধা হয়নি, যা তাড়া খাব!” বল্‌তে বল্‌তে মুক্তি এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জ্যোতি নিজের মহিষের শিংএর ছড়িটা ঘুরোতে ঘুরোতে বেরিয়ে গেল।

মুক্তিও বাড়ী যাচ্ছে এ খবরটা পাবামাত্র তার সঙ্গিনীর দল তাকে ছেঁকে ধরে হাত এবং মুখ দুটোই প্রায় সমান চালিয়ে তাকে একবারে অস্থির করে তুল্‌ল। কেষ্টোদাসী মুক্তির কল্যাণে খানিকক্ষণের মত ছুটি পেয়ে বাক্স গোছাবার ছুতো করে সরে পড়্‌ল।

পরদিন ছিল শনিবার, সেদিন ক্লাশের তাড়া সকলেরই কম। মুক্তি একমনে ধোপার বাড়ীর কাপড় বাছ্‌ছে, এমন সময় মোটর-গাড়ীর বাঁশীর শব্দে পাড়া কেঁপে উঠ্‌ল, ধোপার গাধাগুলো যেন পরাজয়ের লজ্জাতেই অন্য দিকে দৌড় দিল।

অপর্ণা ছুটে এসে বল্‌লে “এই মুক্তি, তোর সেই 'দাদা, মোটরে করে তোকে নিতে এসেছে। বাপ্‌রে হর্ণটার কি শব্দ, কান কালা করে দেয়।”

লেখাপড়া শিখাইলেই যথেষ্ট হইল;—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের প্রয়োজন কি? ইহাই হইল মূল কথা। কিন্তু সব দেশেই আদার ব্যাপারীরা জাহাজের খবর লইয়া থাকে—আমাদেরও লইবার সময় আসিয়াছে।

মণ্টেগু সাহেব দেশের পলিটিক্যাল্ দাবী-দাওয়ার ধরণটা জানিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের নেতারা বলিয়াছেন স্বরাজ না হইলে আমাদের মন খুসি হইবে না, আর এই কথাটা লইয়াই পলিটিক্যাল্ রঙ্গালয়ে মতভেদের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে আমাদের আশা গোড়াতেই এত উঁচু হইলে চলিবে না, অতএব আমাদের প্রতি step by step ধাপে ধাপে চলিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া যে চলিতে হয় ইহা আমরা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া কি দৃষ্টির সম্মুখে আমাদের লক্ষ্য, আমাদের গম্যস্থান সুস্পষ্ট থাকিবে না? ভারতবর্ষে প্রায় ছয় লক্ষ গ্রাম আছে। গ্রামবাসাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়, অনেক দলাদলি। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে একদল যদি চেষ্টা করেন তবে একতার ভাবে ইহাদের অনুপ্রাণিত করা কঠিন হইবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ কখন চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না; আমাদের দেশে আজও যে ইহা রহিয়াছে তাহার কারণ শিক্ষার অভাবে আমাদের দৃষ্টিশক্তির উন্মেষ হইতেছে না আর আমাদের রাষ্ট্রদেবতা এই ব্যবধানকেই আশ্রয় করিয়া রাজনীতি পালন করিয়া আসিতেছেন। মণ্টেগু সাহেবের চোখের সাম্‌নে ইহা দেখাইবার জন্যই লালদীঘির পাড়ে নমশূদ্রদের লইয়া অভিনয়ের সূত্রপাত করা হইয়াছিল।

আমাদের দেখিতে হইবে—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান ব্যাধির আকার ধারণ না করিয়া বসে। পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাট চাষবাস ভাল হইতেছে কি না ইহা আসল কথা নহে; দেখিতে হইবে পল্লীসমাজের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না। আর সে-কাজ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের দারোগা দিয়া হইবে না। যখন প্রয়োজন পল্লীর অন্তরটাকে জাগাইয়া তোলা, তখন রাষ্ট্রীয় তক্‌মা পরিয়া ইহারা বাহিরটাকে একটু আধটু জাগাইয়া তুলিতে সামান্য চেষ্টা করে। এই আয়োজন হাজার ভালো হোক, ইহার দ্বারা পল্লীসভ্যতা বড়-জীবনের স্বাদ পাইবে না। যাহারা পলিটিক্যাল্ মুক্তির ব্যবস্থাপত্রের প্রতীক্ষায় পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহারা যেন জানেন মণ্টেগু সাহেব যাহাই দিন না, আমাদের জীবন দিয়াই পল্লী-জীবনকে জাগাইতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামোটা ভাল হইলেও ইহা মুক্তি দিতে পারে না—যে পথ দিয়া আমাদের সত্যকার জীবন বিকশিত হইবার সুযোগ হইবে আমরা যেন সেই পথের দিকেই তাকাইয়া থাকি। বর্ত্তমানের আশুফললাভের লোভে চিরদিনের জীবনযাত্রার খোরাক হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর

[জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত]

৬২ অধ্যায়।

তিব্বতের শাসনপ্রণালী।

এক্ষণে তিব্বতের পুরোহিত-শাসনপ্রণালীর বিষয় কিছু বলিতে চেষ্টা করিব; যদিও এ সম্বন্ধে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু জানি না। কি করিয়াই বা জানিব? তিব্বতের শাসনপ্রণালী জানিবার জন্য ত আর তিব্বতে যাই নাই, এবং পাছে ধরা পড়ি বলিয়া কাহাকেও এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও সাহস করি নাই। অতি সন্তর্পণে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিয়া বন্ধুদিগের নিকট যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব। তিব্বতের গূঢ়-রাজনীতি-সম্বন্ধে আমি নিজেই অনভিজ্ঞ।

তিব্বতের শাসকসম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত, পুরোহিত এবং অপুরোহিত। পুরোহিতদিগকে "সি ডাং' এবং অপুরোহিতদিগকে "ডাং কোর" বলে। উভয় বিভাগেই ১৬৫ জন কর্ম্মচারী আছেন। পুরোহিতদিগের ৪ জন প্রধান লামা আছেন, তাঁহারাই সকল কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন,—কিন্তু প্রধান পুরোহিতই কার্য্যতঃ সকলকে পরিচালিত করেন। অপুরোহিতদিগের ৪ জন প্রধান মন্ত্রী আছেন, তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথমে নিযুক্ত হইয়াছেন

তিনি সকলের প্রধান, তাঁরই নির্দ্দেশ অনুসারে অপর তিনজন পরিচালিত হন।

চারিজন প্রধান মন্ত্রী, তিনজন অর্থসচিব, একজন ধর্ম্মাধ্যক্ষ, একজন বিচারপতি, আর ২ জন প্রধান পুরোহিত লইয়া মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। শাসনসম্প্রদায়ের সকলেই সম্মানিত পরিবার হইতে মনোনীত হন। কদাচিৎ নাগপা, বনবো, বা শাল্‌নগো জাতির কেহ এ সম্মান লাভ করে।

তিব্বতের শাসনপ্রণালী এক জটিল ব্যাপার। ইহাতে রাষ্ট্রীয় শাসন এবং আভিজাত্যের শাসন দুইই মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি যে ভূখণ্ডের মালিক হন, তথাকার প্রজাগণের ধন মান প্রাণেরও মালিক হইয়া বসেন। প্রজাদিগের উপর ভূম্যধিকারীর অসীম ক্ষমতা। তিনিই তাহাদিগের নিকট হইতে ইচ্ছামত কর আদায় করেন। অত্যন্ত দরিদ্রও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পায় না, কেবল পুরোহিতদিগকে কিছুমাত্র রাজকর দিতে হয় না। অনেকে এই করভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পুরোহিত হইয়া থাকে। তিব্বতে যে এত অগণ্য পুরোহিত তাহার প্রধান কারণ এই। এই জন্যই পুরোহিতদিগের ভিতর যথার্থ জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক এত কম। তিব্বতের প্রজাসাধারণ যেরূপ নিগৃহীত এবং করভারে প্রপীড়িত তাহাতে অধিকাংশ লোকই যে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তিব্বতের লোকেরা নানারূপে করভারে প্রপীড়িত। পুরোহিতদিগের অবস্থা যতই কেন শোচনীয় হউক না—তাহারা মাসে মাসে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দরিদ্র প্রজাদিগের কোন উপায় নাই। তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া এক কঠিন ব্যাপার। যখন অচল হইয়া উঠে, তখন নিজ নিজ প্রদেশের ভূম্যধিকারীর নিকট ঋণ গ্রহণ করে, সে ঋণ আর কখন শোধ হয় না। দশ ইয়েন ঋণ লইলেও পুত্রকে বন্ধক দিয়া সেই ঋণ লইতে হয়। যদি পুত্র নিতান্ত অল্পবয়স্ক থাকে তাহা হইলে এইরূপ সর্ত্তে ঋণ গ্রহণ করা হয় যে পুত্র দশ বৎসরের হইলেই প্রভুর ভৃত্যরূপে প্রেরিত হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই হয়, সেই অভাগা বালককে চিরদিনই প্রভুর ক্রীতদাসের মত থাকিতে হয়। অধিকাংশ স্থলে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ লাসায় থাকেন; তাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। অধিকাংশ স্থলে কর্ম্মচারীগণ প্রধান লামা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক সময় এমনও ঘটে যে প্রজাগণ একদিকে রাজকর্ম্মচারীকে রাজকর দেয়, এবং সেই সঙ্গে প্রভুকেও স্থানীয় কর দেয়। এই প্রকারে তিব্বতে শাসনপ্রণালীর ভিতর দ্বিত্ব দেখা যায়। সেখানে রাজা বলিতেই দলাই লামা। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীগণ জায়গীর ছাড়া গমের আকারে মাহিনাও পাইয়া থাকেন,—যেমন প্রধানমন্ত্রী ৪ হাজার বুসেল গম পান। অর্থসচিব তাহা অপেক্ষা কম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই রাজকর্ম্মচারীগণ প্রায়ই, আপনাদের প্রাপ্য গম গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের না লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন আমাদের যে জায়গীর আছে তাহাতেই সকল অভাব পূর্ণ হয়—অনর্থক কেন রাজকোষ শোষণ করা! এদিকে কিন্তু উৎকোচ লইতে কোন দ্বিধা নাই, তাহা সকলেই লইয়া থাকেন। ১৬২ পুরোহিত ও ১৬৫ জন অপুরোহিত দ্বারা সকল প্রকার রাজকার্য্যই সাধিত হয়। তাঁহারা স্থানে স্থানে রাজপ্রতিনিধিত্ব পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। আবার বিচারপতির কার্য্য পর্য্যন্ত তাঁহারা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিচারপতিগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অবিচার করিতেন। বর্ত্তমান দলাই লামার এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ-দৃষ্টি থাকাতে তাহা আর হয় না। দলাই লামা একদিকে অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রধান গুরু, অপরদিকে দেশপতি শাসনকর্ত্তা; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বদাই এমন সকল কার্য্য করিতে হয় যাহা বৌদ্ধগুরুর পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত ও অশোভন। তাঁহাকে সর্ব্বদাই অপরাধীদিগের শাস্তি দিতে হয়—প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দলাই লামার আদেশে সম্পন্ন হয়। যেমন দলাই লামার অবস্থা তেমনি তিব্বতের সমুদায় লামার, তাঁহারা একদিকে পৌরোহিত্য করেন, অপর দিকে কৃষিকার্য্য, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই করিয়া থাকেন। পুরোহিত অপুরোহিতের কোনই পার্থক্য নাই—পার্থক্য কেবল মুণ্ডিত মস্তকে। পুরোহিতের মুণ্ডিত মস্তক, জনসাধারণের দীর্ঘ কেশ। তিব্বতের লামাবাদ যে অতি শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

৬৩ অধ্যায়।

শিক্ষা এবং জাতিবিভাগ।

তিব্বতে শিক্ষার বিস্তার তেমন নাই। সিগাট্সির সন্নিকটস্থ স্থানসমূহে বালকবালিকাদিগকে সাধারণতঃ লেখা পড়া এবং গণনা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানে বিহার ব্যতীত অন্যত্র শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং তিব্বতের অধিকাংশ লোক বর্ণজ্ঞানবিহীন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় নাই বলিলেও হয়। লাসায় এবং সিগাট্সির তাসি বিহার ভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিদ্যামন্দির তিব্বতে নাই।

তিব্বতের ন্যায় পুরোহিতপ্রধান দেশে পুরোহিত-দিগেরই শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সাধারণ লোকে পৌরোহিত্য গ্রহণ না করিলে আর সরকারি বিদ্যামন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। যাহাদের হীনকুলে জন্ম তাহাদিগের এসকল স্থলে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিব্বতে সর্ব্বাপেক্ষা যে হীনজাতি তাহা চারি শাখায় বিভক্ত, যথা—জেলে, মাঝি, কামার ও কসাই। ভারতবর্ষেও ঠিক এইরূপ, কামার অতি নীচজাতি (?)। এই চারি নীচ জাতির লোকে পুরোহিত হইতে পারে না। জাতি লুকাইয়া জন্মস্থান হইতে দূরে গিয়া মাঝে মাঝে ইহারা পুরোহিত শ্রেণীতে প্রবেশ করে। এই চারি জাতি ভিন্ন অপর সাধারণ লোকেদের মধ্যে কেহই ঘৃণার্হ নয়।

নিম্নলিখিত জাতির লোকেই কেবল রাজকর্ম্মচারী হইবার অধিকার লাভ করে।

(১) গেরপা, জমিদার; (২) নাগপা, মন্ত্রপাঠী; (৩) বনবো, প্রাচীন পুরোহিত সম্প্রদায়; (৪) শাল্ন্গো, প্রাচীন দলপতির বংশ। প্রথম সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৩টি প্রধান লামার বংশ, এবং তিব্বতের রাজবংশধরগণ গণ্য হইয়া থাকে। প্রধান প্রধান যোদ্ধা সেনাপতির বংশধরগণ তিব্বতে অত্যন্ত সম্মানিত। তিব্বত রাজ্যে যে-কেহ কেবল দেশহিতকর কার্য্য করেন, তাঁহার বংশধরগণ চিরদিনের মত সাধারণের সম্মানলাভ করেন। তিব্বতে উপযুক্ত লোকই যে বড় বড় রাজকার্য্য লাভ করে তাহা বলা যায় না, কারণ উৎকোচের দ্বারা এ দেশে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অনেক সময় এমনও হয় যোগ্য ব্যক্তি সকলের চক্ষুশূল হইয়া থাকে, নানা চক্রান্ত করিয়া তাহাকে অপদস্থ করা হয়। অর্থবলে তিব্বতে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। গেরপাদিগের পর নাগপা-দিগের সম্মান। নাগপাগণ মন্ত্রতন্ত্র-বলে অলৌকিক ব্যাপার-সকল সংঘটিত করিতে পারে, এইরূপ তিব্বতের জন-সাধারণের বিশ্বাস। তাহারা মন্ত্রবলে শিলাপাত নিবারণ করিতে পারে বলিয়া জনসাধারণের নিকট কর আদায় করে। নাগপা নিতান্ত দরিদ্র হইলেও তাহাকে সকলে সম্মান করে।

পদমর্য্যাদায় বনবো তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইহারা পুরাতন বন সম্প্রদায়ের পুরোহিতের বংশধর। আজ পর্য্যন্ত ইহাদের পূজা অর্চ্চনা মন্ত্রপাঠই কার্য্য। চতুর্থ শ্রেণী শাল্ন্গো প্রাচীন সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের বংশধর।

জনসাধারণ প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—টংবা ও টংডু। টংবাগণ টংডু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর—টংডুগণ অতি দরিদ্র, জনসাধারণের দাসত্ব করাই তাহাদের জীবনের কাজ। আমরা "ছোট লোক" বলিতে যাহা বুঝি তাহারা তাহাই। টংবা আর টংডুর প্রভেদ কিছুতেই ঘুচিবার নয়। টংবা শত দরিদ্র হইলেও সম্পন্ন টংডুর চেয়ে পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। টংবা আর টংডুর ভিতর আদান প্রদান চলে না। জেলে মাঝি কামার কসাই বড় হীন জাতি। কামার ও কসাইএর সঙ্গে একগৃহে কেহ আহার করে না, কারণ কামার প্রাণীবধের অস্ত্র গড়ে ও কসাই তাহা ব্যবহার করে। তিব্বতে জাতিভেদ এতদূর প্রবল যে কেহ নীচ জাতিতে বিবাহ করিলে সে চিরদিনের জন্য পতিত হয়; ইহাদের সন্তানসন্ততি জেলে মাঝি কসাইএর চেয়ে হীনজাতি বলিয়া গণ্য হয়। সে দেশে তাহাদিগকে "তাকতা রিল" বলে অর্থাৎ কালো-সাদার মিশ্রণ। কামার অতি নীচ জাতি, কিন্তু অন্য জাতি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কামারের কাজ করে সে নীচ বলিয়া গণ্য হয় না। তিব্বতে জাতিভেদ অত্যন্ত প্রবল। সম্ভ্রান্ত বংশের শিশুদিগকে পর্য্যন্ত তাহাদের খেলার সঙ্গীরা সমীহ করে। বালকে বালকে কলহ করিলে, নীচ বংশের ছেলেকে তিরস্কার করা হয়। বড় বংশের লোকের চেহারা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে

পারা যায়। তাহাদের চালচলন, আদব কায়দা, সকলই উৎকৃষ্ট। তিব্বতের জনসাধারণ যতই দরিদ্র হউক না কেন, অতি সৎ; কিন্তু পতিত জাতিরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ অতি দুর্দ্দান্ত, তাহাদের আকৃতি দেখিলে ভয় করে। ভিক্ষুকগণ তিব্বতের হীনতম জাতি, তাহাদের মূর্ত্তিই তাহাদের হীনতার পরিচায়ক।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিব্বতের উচ্চ জাতির সন্তানগণ সরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, সাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। তিব্বতের শিক্ষাপ্রণালী উৎকৃষ্ট নয়। মন্ত্র কণ্ঠস্থ করা, লিখন বিদ্যা, এবং সাদা কালো নুড়ির সাহায্যে গণনা করা ইহাই হইল বিদ্যা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। শব্দশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রও উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ। দুর্ব্বোধ্য কঠিন বাক্য প্রয়োগ করাই বিদ্যাবত্তার একমাত্র পরিচয়। যাহার রচনা কাহারও বোধগম্য হয় না তাহাকেই সকলে পণ্ডিত বলে। দালাই লামার নিকট যে-সকল লিপি উপস্থিত করা হয় তাহা সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাসের নমুনা বলিলেই হয়।

এই ত গেল শিক্ষার আদর্শ। এখন শিক্ষার প্রণালী কি তাহাই বলিতেছি। বেত্রদণ্ডের সাহায্য ভিন্ন সে দেশে শিক্ষার বিস্তার হয় না—বেত্রদণ্ড বলি কেন, বংশদণ্ড বলিলেই ঠিক হয়। শব্দশাস্ত্র শিক্ষা—শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। বেত্রাঘাত ভিন্ন স্মৃতিশক্তি জাগ্রত হয় না, সে দেশের গুরু-মহাশয়দিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কারারক্ষক এবং কয়েদীর ভিতর যে সম্পর্ক সে দেশের গুরু-শিষ্যে সেই সম্বন্ধ। শিক্ষকের আকৃতি দেখিলেই শিষ্যের হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিতে থাকে, যদি একটি ভুল হয় অমনি বেত্রদণ্ডের আস্ফালন দেখিতে হয়। সচরাচর বাম হস্তে ৩০ ঘা বেত্রাঘাত সাধারণ নিয়ম—শিক্ষকের আজ্ঞামাত্রে হাত প্রসারিত না করিলে দ্বিগুণ আঘাত সহ্য করিতে হয়। আমি যখন দেখিতাম সজল নয়নে বালক হস্ত পাতিয়া প্রহার খাইতেছে, তখন বড়ই কষ্ট বোধ করিতাম। ইহার নাম শিক্ষা নয়—নিষ্ঠুরতা। একদিন অর্থসচিব মহাশয়ের সঙ্গে তথায় এই বিষয় লইয়া ঘোর তর্ক উপস্থিত হইল। তিনিও অপর সাধারণের ন্যায় বেত্রদণ্ডের সাহায্যে পুত্রদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। আমি প্রতিবাদ করাতে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন যে "না প্রহার করিলে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।" কিন্তু আমার প্রতিবাদের সুফল ফলিল, আমি দেখি তিনি মিষ্ট কথায় পুত্রদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর একদিন স্বীকার করিয়া বসিলেন যে "আমি দেখিতেছি মিষ্ট কথায় কাজ হয় ভাল।" কেবল কি প্রহার! ছাত্রদিগকে অকথ্য গালাগালি দেওয়া শিক্ষকের আর-এক কাজ—সে কি গালি—'জানোয়ার', 'ভিক্ষুক', 'শয়তান', 'গাধা', 'মা-বাপের মাংসাহারী'—ইত্যাদি সে দেশের সাধারণ গালি। সাধারণ লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা এইরূপ, কিন্তু লামাদিগের প্রতি কোন রূঢ় ব্যবহার করা হয় না—এমন কি তিরস্কার পর্য্যন্ত করা হয় না, তাহারা যাহা ইচ্ছা করে। প্রায় ইহারা কিছুই করে না। তিব্বতে কণ্ঠস্থ করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। ১৫।১৬ বৎসরের বালকগণ ৩০০ হইতে ৫০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এক বৎসরে কণ্ঠস্থ করে। যাহাদিগের স্মৃতিশক্তি ততদূর তীক্ষ্ণ নহে তাহারা বৎসরে ১০০ পৃষ্ঠা শিক্ষা করে। বৎসরে হাজার পৃষ্ঠাও মুখস্থ করিতে পারে এমন উৎকৃষ্ট ছাত্রও সে দেশে আছে। সে দেশের বালকদিগের স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আমি অবাক। আমি ত ছয় মাসে ৫০ পাতাও মুখস্থ করিতে পারি না—এমনই স্মরণশক্তি আমার। আর সে দেশে ছাত্রেরা অনর্গল মুখস্থ করিয়া চলিয়াছে!

শ্রীহেমলতা দেবী।

অভিলাষ

নাহি যাচি উচ্চপদ,— সে যদি গৃধ্রের মত
রহি ঊর্দ্ধে, নিম্নে রহে মন;
রব নীচে, সেও ভাল; সে যদি চাতক সম
ঊর্দ্ধদৃষ্টি রহে অনুক্ষণ।

চাহি না বৃহৎ হতে, সে যদি তিমির মত
হেতুহীন সিন্ধু আন্দোলন;
ক্ষুদ্র হই, ক্ষতি নাই; প্রবাল কীটের সম
রত্নদ্বীপ করিব গঠন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

আমরা ও তাহারা

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র মানুষের মনে নানারূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। বিদেশী ও স্বদেশী মনীষিবৃন্দ ইউরোপীয় সমাজের কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা করিয়া কি যেন একটা অভাব বোধ করিতেছেন। সকলেই যেন বৈজ্ঞানিক যুগের কার্য্যপ্রণালী আধ্যাত্মিকতা-হীন দেখিয়া ভগবানের দিকে চাহিতেছেন। ফরাসী দার্শনিক বার্গসেঁা বলিয়াছেন যে এই যুদ্ধাবসানে জগৎময় ধর্ম্মের বন্যা ছুটিবে। এতদ্ব্যতীত অনেক গ্রন্থকার এই তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। সেদিন 'মডার্ণরিভিউ' পত্রিকায় কেম্প্‌বেল সাহেবের একখানা পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে 'কলকব্জার সভ্যতার প্রতি গভীর অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন, আমরা যুদ্ধাগ্নিতে পবিত্র হইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের চিন্তাজীবনের নায়ক রবীন্দ্রনাথ স্বাধিকার-প্রমত্ত পাশ্চাত্য জাতির জীবনেতিহাস খুলিয়া দেখাইয়াছেন যে "তাহাদের বিশ্বাস মানুষের সংসার একটা সতরঞ্চ খেলা, বড়েগুলিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক চালাইলে বাজী মাৎ করা যায়। তারা এটা বুঝিতে পারে না যে বুদ্ধির খেলায় যাকে জিৎ বলে মানুষের পক্ষে সেইটেই বড় হার হইতে পারে।" বস্তুতঃ পাশ্চাত্য জাতির এ অগ্নি-পরীক্ষার সময় মানুষের হার-জিৎ কোন্ পথে তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। এ সময় আমাদের ও তাহাদের জীবননীতি তুলনায় বিচার না করিলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাব-বিনিময় ও সম্মিলন কি ভাবে হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। আমাদের জীবনগতি কি ভাবে পরিচালিত, এ সম্বন্ধে ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধক স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি স্মরণ করা কর্ত্তব্য।—"ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড। প্রত্যেক জাতিই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে, আর ধর্ম্মই ভারতবাসীর সেই বিশেষত্ব। অন্যান্য স্থানে অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যে ধর্ম্ম একটি; প্রকৃতপক্ষে উহা জীবনের অল্পাংশ মাত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যথা, ইংলণ্ডে ধর্ম্ম তাহাদের রাজনীতি-চর্চ্চার অংশ-বিশেষ মাত্র—ইংলিশ চার্চ্চ ইংরেজ রাজবংশের অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইংরেজেরা উহাতে বিশ্বাস করুক আর না করুক, উহা তাহাদের চার্চ্চ মনে করিয়া উহার পোষকতা ও ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহা ভদ্রতার পরিচায়ক। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যেখানেই কোন প্রবল জাতীয় শক্তি দেখা যায়—উহা হয় রাজনীতি বা কোনরূপ বিদ্যা-চর্চ্চা বা সমরনীতি বা বাণিজ্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইটিই তাহার মুখ্য জিনিস; এতদ্ব্যতীত তাহাদের অনেক গৌণ পোষাকী জিনিস আছে, ধর্ম্ম তাহাদের অন্যতম। এখানে এই ভারতে ধর্ম্মই জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মস্থল। এই ভিত্তির উপরেই জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, প্রভুত্ব, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চাও এখানে গৌণ মাত্র। ধর্ম্ম এখানকার একমাত্র কার্য্য, একমাত্র চিন্তা।"

পাশ্চাত্য-সমাজ অন্য পথে চলিয়াছে। নানারূপ নূতন নূতন নিয়ম-প্রণালীর ভিতর দিয়া ইহা তাহার সমাজকেও গড়িয়া তুলিতেছে। পাশ্চাত্য-সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভূতবিজ্ঞানের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ভিদ ও নিম্নস্তরের জীবগণের জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীবনসংগ্রামের সন্ধান পাইল! সেই জীবন-সংগ্রামের সহায়ক ব্যক্তিত্বাভিমান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতীচ্য সমাজ-জীবনে প্রবেশলাভ করিয়া শাসন-যন্ত্রের নবীন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিল। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতি সাধনের জন্য তদ্বিরোধী বস্তুনিচয় নির্ম্মমভাবে পরিহার করিয়া ইউরোপের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমাজে তাহার আসন প্রতিষ্ঠা করিল। প্রথমতঃ সকলেই ভাবিলেন এই উপায়েই মানব তাহার অপ্রতিহত বাসনা চরিতার্থ করিয়া সুখভোগী হইবে; কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই নানা অসুবিধা ও অশান্তির সৃষ্টি হইল। কাজেই ইউরোপ ব্যক্তির জীবনকে সমাজ-জীবনের আনুগত্য স্বীকার করাইতে বাধ্য হইল। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়া প্রতীচ্য-প্রতিভা আবার নানারূপ মতবাদের সৃষ্টি করিল; জীবশরীরের সাদৃশ্যে (Physiological view) সমাজকে দেহ, ও ব্যক্তিকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিবেচনা করিয়া সামাজিক আইনকানুন বিধিবদ্ধ করিল। সমাজের ধনাগমে ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্য,

সমাজের সামরিক শক্তিবর্দ্ধনে ব্যক্তির নিরাপদ জীবন, শাসনযন্ত্রের পুষ্টিসাধনে ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা, এইরূপ চিন্তাপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া ব্যক্তিকে সমাজের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া তুলিল। ইহাতে ব্যক্তিস্বাভিমানের অনেক দোষ নিরাকৃত হইল বটে, কিন্তু জীবের দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রসূ ভাবুকতা ক্ষুণ্ণ হইল। আত্মার মহিমা ম্লান হইয়া পড়িল। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব স্বীকার করিলেও জাতীয়জীবনে সুবিধা অসুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধির কথাই বড় হইয়া উঠিল। সমাজের শাসননীতি বাণিজ্যনীতি ও অর্থনীতির অনুগামী নিয়মপ্রণালী মানবজীবনের উচ্চতম-নীতির—আধ্যাত্মিক-নীতির—উপরে আধিপত্য করিতে লাগিল। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার স্থলে জাতীয় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক জাতি অপরাপর জাতিপুঞ্জের উপর ধন বাণিজ্য ও সামরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য উন্মত্ত হইল। ইহাতে দেশে দেশে অভূতপূর্ব্ব জাতীয় শাসনযন্ত্র (nation-state) গড়িয়া উঠিল। জার্ম্মনজাতির অর্থগৃধ্নু ও ক্ষমতা-পিপাসু সামাজিকশক্তি উল্লিখিত প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক পরিণাম। ইউরোপীয় চিন্তাপ্রবাহগুলি যেন একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া জর্ম্মন-চিন্তারূপে দেখা দিয়াছে।

বস্তুতঃ প্রতীচ্য সমাজগঠন-প্রণালীতে অনেক বিসদৃশ-ভাব বর্ত্তমান। তাহার অর্থনীতির ফলে মানবের যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থার্জ্জন ও অপরের বিত্ত আত্মসাৎ করিয়া একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার (monopoly); তাহার নীতি-শাস্ত্রের ফলে সুবিধা-অসুবিধার (utility) মাপকাঠিতে সত্যনির্দ্ধারণ ও সাময়িক সুখদুঃখের দ্বারা চরিত্রবিচার, প্রভৃতি মতবাদ মানবের উচ্চ আদর্শকে অবনত করিয়াছে। দেহ ও মনের নিকট আত্মার মহিমা খর্ব্ব করিয়াছে।

আমরা বিপরীত পন্থার অনুসরণ করিয়াছি। আমাদের নীতিশাস্ত্র আত্মার মহিমা ম্লান করিতে চায় নাই, বরং প্রাণ দিয়াও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়াছে। আমাদের দশরথ রামকে বনবাসে দিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ শিবি নিজের মাংস কাটিয়া দিয়া কপোতের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এক পাউণ্ড মাংস দিবার ভয়ে কূটযুক্তির অবতারণা করিয়াছে। আমরা সুখে উল্লসিত ও দুঃখে অবসন্ন হই সত্য, কিন্তু তজ্জন্য সাময়িক সুখ-দুঃখকে আদর্শ করিয়া চলি নাই। জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সুখ-দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া পরম সুখের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছি। আমাদের অর্থনীতি মানবের সহজাত অর্থানুরাগকে উদ্দাম বেগে চলিতে না দিয়া আধ্যাত্মিক অনুশাসনে সংযত রাখিয়াছে। ভারতীয় অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত ধন সমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুর দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যেও কয়েক যামার্দ্ধ মাত্র অর্থচিন্তার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (আজকাল আমাদের ভাগ্যগুণে ২৪ ঘণ্টা অর্থচিন্তা করিয়াও অন্নচিন্তা দূর করিতে পারিতেছি না।) প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ধরিয়া ভারতীয় সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বলিয়াই ইহার গতি অনন্যসাধারণ। সম্প্রতি অধ্যাপক রাধাকমল দেখাইয়াছেন যে আমাদের অর্থশাস্ত্র আধ্যাত্মিক আদর্শে গঠিত হওয়া আবশ্যক। গ্রীস রোম ও তাহাদের মন্ত্রশিষ্য ইউরোপ যে ভাবে চলিয়াছে আমরা সে ভাবে চলিলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা ভারতের পরম্পরাগত সংস্কার মানিয়া এক নূতন অর্থনীতির (regional economics) সৃষ্টি করিব, যাহা বিশ্বের অর্থনীতির প্রতি-দ্বন্দ্বী হইবে না। ইউরোপীয় সমাজ একত্বে পঁহুছিবার জন্য বহুত্বকে অস্বীকার করিয়াছে। আমাদের সমাজ সামাজিক একত্বের নীতি (monistic principle of social grouping) স্বীকার করিয়াও বহুত্বকে (pluralistic principle of social grouping) অস্বীকার করে নাই। বরং ব্যক্তিগত দয়াদাক্ষিণ্য ভালবাসা প্রভৃতি উচ্চ-গুণাবলীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এক বৃহত্তর একত্বের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। সমাজশক্তিকে কোন বিশেষ কেন্দ্রগত না করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে। ইহাতে মানবের মন বাহ্যিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আমরা জানি অর্থই শক্তি নহে, সাধুতা ও পবিত্রতাই শক্তি। আমাদের সমাজ আধ্যাত্মিকতার উপাসক ব্রাহ্মণকে শীর্ষদেশে স্থাপিত করিয়া আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে। অনেকে এ কথায় অন্যরূপ ভাবিতে পারেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় আজ পর্য্যন্ত অন্যান্য জাত অপেক্ষা

ব্রাহ্মণদের মধ্যেই অধিকাংশ প্রকৃত-ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে; আমাদের শ্রীকৃষ্ণকথিত চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ (আধুনিক জাতিভেদ নহে) আমাদের জাতীয় প্রতিভার সুমধুর ফল। এরূপ বিভাগ সকল সমাজেই আছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও এইরূপ বর্ণবিভাগ সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের রাজারা শাস্ত্রানুশাসনে চলিয়া রাজধর্ম্মের যে অক্ষয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে নাই। রাজ্যে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার কর্ত্তব্য-পালনের ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়া সন্তপ্ত হইতেন। কত রাজা রাজ্যের পাপে আপনাকে পাপী জ্ঞান করিয়া স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রতিভা দুই বিভিন্নমুখী গতির অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়—"জগতের সকলজাতি দুইটি বড় বড় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত। ভারত উহার মধ্যে একটির এবং জগতের অন্যান্য সকলজাতি অপরটির মীমাংসায় নিযুক্ত। এখন প্রশ্ন এই, দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি জয়ী হইবে? কিসে এক জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে, কিসেই বা অপর জাতি অতি শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়? জীবন-সংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না ঘৃণার জয় হইবে? ভোগের জয় হইবে, না ত্যাগের জয় হইবে? জড় জয়ী হইবে, না চৈতন্য জয়ী হইবে? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন আমাদেরও সেই বিশ্বাস। কিম্বদন্তীও যে-অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমাময় পূর্ব্বপুরুষগণ এই সমস্যাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহারা জগতের নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, যদি কাহারও সাধ্য থাকে, উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত, এই ত্যাগ প্রেম ও অপ্রতীকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।" আমরা দেখিতেছি আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনাদর্শ। আমরা অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু জাতীয় জীবনে তেমন কোন মহান্ আদর্শের প্রয়োজনীয়তা সাধারণতঃ অনুভব করি না, কারণ বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মনীতির ফলাফল ভোগ করা সময়-সাপেক্ষ। সম্প্রতি ইউরোপের অগ্নিকাণ্ডে আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। যে-সকল কথার সত্যতা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, আজ তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতেছি। "আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। জড়বাদের অদৃঢ় বালুকাভিত্তির উপর স্থাপিত বড় বড় অট্টালিকা পর্য্যন্ত একদিন না একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয় তবে উহা আগামী ৫০ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।" স্বামী বিবেকানন্দের এ কথাগুলি আজ মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ভাব ও চিন্তা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিস্ফোরক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রীস রোম বড় বড় কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের মন্ত্রশিষ্য বর্ত্তমান ইউরোপও কর্ম্মের বিপুলতায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষও অতীত কালে তাহার উপযোগী কর্ম্মবহুল জীবন যাপন করিয়াছে; কিন্তু গ্রীস রোম ও বর্ত্তমান ইউরোপের মত আপনার কর্ম্মবিপুলতায় আপনি জর্জ্জরিত হয় নাই। তাহার কারণ কি? কর্ম্ম সকলেই করিয়াছে, কিন্তু প্রভেদ সেই ভাবসাধনে। ভারত কর্ম্ম করিলেও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়াছে। কর্ম্ম করিয়াছে সত্য, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে তাহার আত্মাকে জড়িত করে নাই। কথাটা গভীর অর্থদ্যোতক বলিয়া সহজে আমরা বুঝি না, কিন্তু কোন কর্ম্মীর জীবনেতিহাসে ইহার ফলাফল দেখিলে, ধারণা সুস্পষ্ট হয়। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন "যদি কেহ বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চান তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোন দিন দেখিতে পাইবেন বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সেই একদিন বিজয়ী।" কর্ম্মজীবনের প্রতি এরূপ গভীর শ্রদ্ধার ভাব আধ্যাত্মিকতা-প্রসূত। কর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গেই ফল দেখিতে চাহিলে অনেক সময় কুকার্য্যেরও সুফল ও সুকার্য্যেরও কুফল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বহুকাল পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা না করিলে নীতি বা নিয়মের পরিণাম হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভাবই মহান্, কার্য্য

তাহার তুলনায় ক্ষুদ্র। বহু কার্য্যের ফলাফল আত্মসাৎ করিয়া ভাব আত্মপ্রকাশ করে। ভাবিয়া দেখিলে, ভাবজগতই স্থূল জগৎকে ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে। আমরা যে তীর্থস্থানে গিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী দেখিয়া নয়ন সার্থক করি, তাহা জাতির ভাব-জীবনের বহিঃপ্রকাশ। এইরূপ যেখানে যে অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে সর্ব্বত্রই কোন বিশেষ ভাবকে আকার দানের চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা অনেক সময় মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হই, কারণ তাহা মহৎ ভাবের পরিচায়ক। কর্ম্মজীবনের বিপুলতায় ভাবজীবনকে সঙ্কুচিত করিলে চলিবে না। ভাব বা আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হইবে। কেবল কার্য্যের সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া কার্য্য করিলে পরিশেষে কার্য্য অবলম্বনহীন ও অবনত হইয়া পড়ে। আমাদের অন্যতম বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জর্ম্মনজাতির রসায়ন-শাস্ত্রের চর্চ্চার বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তাহারা প্রথমে কার্য্যকরী (applied) রসায়নের দিকে উন্নতিলাভ করিতে গিয়া ভাবের (theory) দিক অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে রসায়ন-চর্চ্চা অবনত হইয়া পড়িল। ভাব কার্য্যের প্রাণ। কার্য্যের পশ্চাতে যে ভাব রহিয়াছে তাহার মহত্ত্ব অস্বীকার করিলেই কর্ম্মবিপাকে পড়িতে হয়। আজকাল আমরা স্বায়ত্তশাসন (Home Rule) চাহিতেছি, কিন্তু তাহা কি-ভাবে গ্রহণ করিব ইহাই আমাদের বড় সমস্যা।

আমাদের দেশে রাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে গ্রাম্য পঞ্চায়েতেরও অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর প্রজাতন্ত্র ব্যাপক ভাবে আমাদের ছিল না। ইহার ধারণা আমরা পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে লাভ করিয়াছি। কাজেই ইহাকে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারা যে ভাবে এ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে এবং যে উদ্দেশ্যে ইহার কর্ম্মনীতি পরিচালিত করিয়াছে, আমরা তাহা চাহিতে পারি না। আমাদের সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্র আধ্যাত্মিকতা। মানুষের পরীক্ষা যেমন একদিনে হয় না, জাতির পরীক্ষাও তদ্রূপ কয়েক বৎসরে হয় না। ভারত বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে যে জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব। সুতরাং আমাদের স্বায়ত্তশাসনতন্ত্র কি প্রণালীতে গঠিত হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তানায়কগণের বিশদ আলোচনা আবশ্যক। তাঁহারা গ্রীক ও রোমক সভ্যতার উত্থান পতন ও বর্ত্তমান ইউরোপের জীবনলীলা দেখিয়াছেন; তাহাদের চিন্তাপ্রণালীর কোথায় কি ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া না দিলে পাশ্চাত্যের প্রদত্ত প্রজাতন্ত্র আমরা যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিব না। আমরা সাধারণতঃ স্বায়ত্তশাসনের যে ধারণা পাইয়াছি তাহা বিলাতী সমাজ ও পার্লেমেণ্টের অনুরূপ। পার্লামেণ্টের কার্য্য-প্রণালীতে অনেক সত্য নিহিত আছে; কিন্তু যে প্রণালী বাণিজ্যনৈতিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক, সুবিধা-অসুবিধার বিচারে অন্যদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আমা-দের জীবনের সহিত মিলিবে না। অধিকন্তু পাশ্চাত্য-দেশে জাতীয় শাসনযন্ত্র (nation state) ব্যক্তির জীবনকে কোন বৃহত্তর কালের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত করিয়া তুলিয়াছে এবং উহার ফলে মানুষ জড়বৎ যন্ত্রচালিত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তাহা নয়। ব্যক্তি সমাজের অংশভূত হইলেও তাহার আত্মা পূর্ণস্বভাব। সুতরাং সমাজ যদি এমন কোন প্রণালী অবলম্বন করে যাহাতে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবন ক্ষুণ্ণ হয় তবে তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা চাই ব্যক্তি তাহার আধ্যাত্মিক পূর্ণত্বের দিকে চলিবে এবং সমাজ তাহার পথ সুগম করিয়া দিবে। পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণায় কার্য্য করে নাই। ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থের বিরোধের মধ্যে যতদূর সম্ভব একতার সৃষ্টি করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ প্রতিনিধিশাসনতন্ত্র (representative government) গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সমাজদেহ যথার্থ স্বাস্থ্যলাভ করে নাই। শাসনশক্তি শ্রেণীবিশেষের হস্তগত হইয়া প্রতিপক্ষের স্বার্থ বিনাশে উদ্যত হয় এবং নানারূপ আত্মকলহের সৃষ্টি করে। ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এরূপ দলাদলি ও বিরোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আজ এ ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অতএব আমরা ইউরোপের অনুবর্ত্তন করিতে পারি না। ইউরোপের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ফরাসী

বিপ্লবের পরে একবার জগৎময় প্রজাতন্ত্রের ধ্বনি উঠিয়াছিল, কিন্তু পরে আবার কি জানি কেন সর্ব্বগ্রাসী রাজনীতি (imperialism) ইউরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে আবার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার তিরোভাবের সূচনা হইতেছে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাহাতে প্রজাতন্ত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবে। ইহাতে একটি কথা মনে হয় যে ইউরোপ জাতীয় জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নাই; যেন কোন্ ব্যবস্থা সত্য, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমরা কিন্তু সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি। তবে অসম্পূর্ণতা উভয় সমাজেই বর্ত্তমান।

এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার কথার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"আমি দেখিতে পাইতেছি যে ভারত অন্য সকল চেতন পদার্থের ন্যায় সজীব, কিন্তু এখনও চরম পরিণতি লাভ করে নাই। ইউরোপও সজীব ও অপরিণত। ইহাদের কেহই এমন অবস্থায় উপনীত হয় নাই যে উহাদের অনুষ্ঠানসমূহকে নিরাপদে সমালোচনা করা চলে। ইহারা যেন দুইটি বিরাট পরীক্ষা-ব্যাপার—তাহার কোনটিই এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষে সকলকেই সমাজের অধীনে থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দতা বণ্টন করিয়া লইতে হয় (social communism) আর অদ্বৈত জ্ঞানের আলোক তাহার উপরে এবং আশেপাশে বিকীর্ণ হইতেছে। অদ্বৈতবাদকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতন্ত্রতা (Spiritual individualism) বলিতে পারা যায়। ইউরোপে সামাজিক ব্যাপারে তোমরা স্ব স্ব-বাদী অর্থাৎ ব্যক্তিতন্ত্রতার (Social individualism) পক্ষপাতী; কিন্তু চিন্তা-রাজ্যে তোমরা দ্বৈতের পক্ষপাতী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তোমরা নিজের নিজের মত চালাও না, সকলে মিলিয়া কোন এক সাধারণ মতকে (Spiritual communism) মানিয়া চল। সুতরাং দেখা যাইতেছে—একটির যাহা কিছু অনুষ্ঠান সব সমাজতন্ত্র, কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা দ্বারা পরিরক্ষিত; আর অপরটির অনুষ্ঠানগুলি ব্যক্তিতন্ত্র, কিন্তু এক সাধারণ চিন্তার প্রভাবে সুনিয়ন্ত্রিত। এক্ষণে আমাদিগকে ভারতীয় পরীক্ষা-ব্যাপারটিকে তাহার নিজের ভাবেই সাহায্য করিতে হইবে। যে-সকল আন্দোলনে কোন ব্যক্তি বা কার্য্যকে সাহায্য করিতে গিয়া উহাদিগের নিজেদের ভাবটি বজায় রাখিবার চেষ্টা করা না হয় সে-সকল আন্দোলন ঐ হিসাবে নিরর্থক।"

সুতরাং আমাদের সভ্যতা ও সাধনার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইউরোপ যেমন রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের নিকট ব্যক্তিত্বকে বলিদান করিয়াছে, আমরা তাহা করিব না। আমরা আধ্যাত্মিক নিয়ম ও শিক্ষার শাসনে সমাজের আনুগত্য স্বীকার করিব। সমষ্টির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এমন ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিব যে তাহাতে আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব পরিণতি লাভ করিতে পারে। স্বাধীনতাই উন্নতির মূলমন্ত্র। ইউরোপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিচালনে স্বাধীনতা পাইয়াছিল বলিয়াই সেখানে গণতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরাও ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই ত্যাগবৈরাগ্য-প্রসূ ভাবুকতা এদেশে মহিমা বিস্তার করিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে সমস্যা—বাহ্যিক স্বাধীনতাপ্রদ প্রজাতন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাদাত্রী আধ্যাত্মিকতার সঙ্গতিসাধন। ইহা করিতে পারিলেই আমাদের দেশে প্রজাতন্ত্র সম্যক সফলতা লাভ করিবে। এই চিন্তা-প্রণালীর অনুসরণ করিলে, আমাদের পল্লীসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। পল্লী ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ। পল্লীকেন্দ্রেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক কার্য্যাবলী পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আমরা নাগরিক সভ্যতার পরিণাম দেখিয়াছি। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান নগরে আপনার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বেবিলন এথেন্স রোম কিভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা সুপরিজ্ঞাত। কাজেই আমাদের নবীন পল্লীজীবন এমনভাবে গঠিত হওয়া দরকার যাহাতে পাশ্চাত্য সাধনার সত্য স্থানলাভ করে, কিন্তু তাহার ভুল ভ্রান্তি প্রবেশ না করে। চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় আমাদের প্রাচীন সম্পত্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে এদেশে যে গ্রাম্যপঞ্চায়েতের ব্যবস্থা ছিল তাহাই আমাদের প্রয়োজন। তবে তিনি আইন-কানুন বিধি ব্যবস্থা সরকার বাহাদুরের হাত হইতে

পাইতে চান। এবিষয়ে কেহ কেহ বলেন, আমাদের আইন কানুন আমাদের পল্লীজীবন হইতে সমুদ্ভূত হইবে। 'প্রবুদ্ধভারত' বলেন

There is a world of difference between the spirit of getting people do their duty by the compulsion of law and the spirit of making them do it through their sense of Dharma. The former spirit can never be compatible with the old polity of the village life in India, the system of having the village governed from within.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে আইনকানুনের জোরে লোকদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য করান এবং তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাবে তাহাদিগকে কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করা এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ভারতীয় পল্লীজীবনের প্রাচীন শাসনতন্ত্রের—পল্লী তাহার আভ্যন্তরীণ নিয়মে শাসিত হওয়ার—সহিত সঙ্গত হয় না। সুতরাং এই মতে গবর্ণমেন্টের আইনকানুনে গঠিত পঞ্চায়ৎ ভারতীয় পল্লীজীবনের বিরুদ্ধ। যাহা হউক পল্লীকেন্দ্রের উপরেই যে আমাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠালাভ করিবে এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। পাশ্চাত্য-জগতের সুইজারলণ্ড আমাদের এ ধারণার পোষকতা করিতেছে। সুইজারলণ্ডের গণতন্ত্র অন্যান্য স্থানের গণতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হইয়াছে। ফরাসী বা মার্কিন গণতন্ত্রে যে অশুভ দেখা দিয়াছিল, সুইজারলণ্ডের গ্রাম্য কেন্দ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে তাহা দেখা দেয় নাই। এখন আমাদের সমস্যা এই—কিরূপে সুইজারলণ্ডের গণতন্ত্রে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা প্রবেশলাভ করিতে পারে। এরূপ সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেই আমাদের বিশিষ্ট সমাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে; অধিকন্তু ইহাতে জগতের রাষ্ট্রব্যবস্থার এক অপূর্ব্ব প্রণালী আবিষ্কৃতও হইবে। ইউরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় তথাকার জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি রুশিয়া তাহার জাতীয় জীবনে নৈতিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয় সাধক সন্ন্যাসী অরবিন্দ রুশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

The Russian principle belongs in fact to a possible future in which moral and psychological principle will have a real chance to dominate, and vital and physical necessities will have to suit themselves to them, instead of, as now, the other way round; it belongs to an arrangement of things the exact reverse of the present international system.

ইহার ভাবার্থ এই যে রুশিয়া যে মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহার সত্যতা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে। তখন দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কার্য্যাবলী সেই উচ্চতর নিয়মের অনুবর্ত্তন করিবে। সেই নীতি বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুতঃ জগতের অর্থনীতি বাণিজ্যনীতি শাসননীতি প্রভৃতির উপরে নব আধ্যাত্মিক নীতি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, রুশিয়ার কার্য্যপ্রণালী তাহার পরিচায়ক। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "জগৎ সভ্যতার অপেক্ষা করিতেছে। ভারতের অমূল্য রত্ন, তাহার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের জন্য জগৎ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে।" সেই সময় কি ঘনাইয়া আসিল যখন জগৎ মনু মহারাজের প্রতিষ্ঠিত পল্লীব্যবস্থার প্রতি দৃকপাত করিবে? এ সময় ভারতীয় চিন্তানায়কগণের দায়িত্ব অত্যধিক। তাঁহারা ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট পন্থার আলোচনা করিয়া আমাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করুন। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা যথার্থই বলিয়াছেন—

"The character of Indian civilisation may be spiritual, but the real question is are we living up to it?"

কিভাবে জীবন যাপন করিলে আমাদের জাতীয় জীবন আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুরূপ হইবে এই সমস্যার সমাধানই বর্ত্তমান ভারতের একমাত্র কার্য্য ও একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। এই চিন্তার ফলাফলের উপরই আমাদের ভাবী ব্যক্তিগত জীবন ও সমষ্টির জীবন গড়িয়া উঠিবে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাম।

বৈষ্ণব কবিতা

[১]

গত বৎসরের শ্রাবণ মাসে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখি। এই এক বৎসর ধরিয়া আমার সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদের পালা চলিয়াছে। আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয় এটা আমি খুবই ইচ্ছা করিয়াছিলাম; বাংলা মাসিক সাহিত্যে এই আলোচনা জিনিসটার অভাব আছে। কিন্তু কোন লেখকের মতের প্রতিবাদ করিতে গেলে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, তাঁর ধর্ম্মসম্প্রদায়, তাঁর পারিবারিক শিক্ষা, তাঁর সাধন-সম্বল প্রভৃতি নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাঁকে গালি-পাড়াটা প্রতিবাদের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আশা করি কেহই স্বীকার করিবেন না। বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে আমার মতের সঙ্গে অনেকেরই মতের অনৈক্য থাকা সম্ভব; সে অনৈক্যের কারণ কি তাহা আলোচনা করিয়া নির্দ্দেশ করাও তাঁদের কর্ত্তব্য। কিন্তু "যুক্তি-সিদ্ধান্তে চতুর্থ শ্রেণীর জ্যামিতির ছাত্রও তাঁহার (অজিতবাবুর) নিকট পরাজিত হয়," "ইঁহারা কি যে বলেন তাহা নিজেরাই বোঝেন না," (ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৪); "অশিক্ষিত-পটুত্বের নিদর্শন ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?" (উপাসনা, আশ্বিন ১৩২৪); "অজিত বাবুর ন্যায় যাঁহাদিগের পদাবলী-সমুদ্র মন্থন করিয়া রত্ন সংগ্রহ করার উপযুক্ত ধৈর্য্য বা চেষ্টা নাই" (নারায়ণ, পৌষ ১৩২৪); "অজিত ব্রাহ্ম। আর আমাদের ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে এবং সাধনে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের কোনও স্থান নাই।" (নারায়ণ, মাঘ ১৩২৪); "দেশের দিশকর্ম্ম হইতে বঞ্চিত—বহিষ্কৃত, বিতাড়িত—ফেরঙ্গভাবদাসত্বের আশ্রয়ে আজন্মপালিত মূর্খ বলে কিনা ইহা পাশব মিথুন রাগের সাহিত্য।" (নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২৫)—প্রভৃতি যে-সকল ব্যক্তিগত মধুর সম্ভাষণ আমার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, আমার আলোচনার প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে তাদের আবির্ভাব একেবারেই অহেতুক। বাংলা দেশে বাৎসল্যরসের একান্ত প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু বাংলা বৈষ্ণবকাব্যে সে-রসের যে-প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা খুব উচ্চদরের নয়, আমি এই কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া 'ভারতবর্ষের' সমালোচক চতুর্থ শ্রেণীর জ্যামিতির ছাত্রের কাছে যুক্তিসিদ্ধান্তে আমি হটিয়া যাই, ইহা প্রচার করিয়া বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যে, Satire, Lampoon প্রভৃতি নিছক ব্যঙ্গ-রচনার চমৎকার স্থান আছে জানি; জুভেনাল হইতে বার্ণার্ড শ পর্য্যন্ত বহু লেখক এই ধরণের রচনাকে সাহিত্যরসিকের রুচি-রোচন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন; কিন্তু তাঁরা কেহই মতবিশেষের প্রতিপক্ষকে ব্যক্তিগত অপবাদের ব্যাপার করিয়া তুলিয়া শস্তায় ব্যঙ্গরসিক নাম কিনিবার হাস্যকর চেষ্টাকে আশ্রয় করেন নাই। আমি কি যে বলি তাহা নিজেই বুঝি না—আমার বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে আমার প্রতিবাদী মহাশয়ের যদি এমনি গুরুতর আশঙ্কা হইয়া থাকে, তবে তিনি কষ্ট করিয়া দ্বাদশপৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ প্রতিবাদের অবতারণা করিয়া সে আশঙ্কা প্রকাশ না করিলেও পারিতেন। অত্যন্ত সংক্ষেপেই সে কথাটা বলা যাইত। কিন্তু ব্যঙ্গ-রচনায় কৃতিত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্য যদি তাঁর মনে ছিল, তবে তাঁর পরিহাসের স্থূলহস্তাবলেপ হইতেই প্রমাণ যে, তাঁর সে উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে।

কিন্তু আমার প্রতিবাদ উপলক্ষ্যেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে হাসাইবার চেষ্টায় হাস্যকররূপে যিনি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁর কথা ছাড়িয়া দি। যাঁরা বৈষ্ণব সাধনা-রসতত্ত্ব-পদাবলী-সমুদ্র চিরকাল ধরিয়া বহু "ধৈর্য্য ও চেষ্টা"সহকারে মন্থন করিতেছেন, তাঁরা এমনতর অ-বৈষ্ণব ব্যক্তিগত শ্লেষ ও খোঁচাকে আশ্রয় করিলেন কেন? আমি বৈষ্ণব রসতত্ত্ব পড়ি নাই এবং পড়িলেও তাহা বুঝিতে 'অনধিকারী'; পদাবলী না পড়িয়াই বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়াছি; আমি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, অতএব আমার অনধিকার চর্চ্চা এবং রসতত্ত্ব বুঝিবার অক্ষমতা আরও সপ্রমাণ হইল; আমার আলোচনার প্রতিবাদের উপলক্ষ্যে এ কথাগুলোও বলা অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে, ইহা আমার প্রতিবাদী মহাশয়দিগকে সবিনয়ে স্মরণ করিতে বলি। 'তোমার বুদ্ধি নাই' বলাও যেমনি, 'তোমার অধিকার নাই' বলাও তেমনি; কেননা অধিকার-অনধিকারের সীমারেখা টানিবেন কোথায়?

আমি জানিতাম যে, বিশুদ্ধ সাহিত্যের তরফ হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর বিচার করিতে গেলে এই কথাটাই উঠিবে যে, বৈষ্ণব কবিতা "সাধনার সামগ্রী, বৈঠকখানায় ও মাসিক পত্রে আলোচনার কাব্য নহে।"... (যিনি লিখিতেছেন তিনি কিন্তু মাসিক পত্রেই আলোচনা করিতেছেন!) ..."পদাবলীর শ্রোতা ও পাঠকগণ ভক্ত রসিক সাধক না হইলে তাহাদের ঠিক মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন না" (উপাসনা, আশ্বিন); "বৈষ্ণব কবিতার সহিত সাক্ষাৎভাবে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সম্বন্ধ" (নারায়ণ, পৌষ); এবং "এই রস-বস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভব যাঁর হয় নাই, সে বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম বুঝিবে কেমন করিয়া?" (নারায়ণ, মাঘ)। আমি বৈষ্ণব নই, 'ভক্ত রসিক সাধক' হইবারও কোন আশু সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যখন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন আমার পাঠকগণ সকলেই 'ভক্ত রসিক ও সাধক' এমনতর দুঃস্বপ্ন আমার মনে উদয় হয় নাই। এবং 'রস-বস্তু' অর্থাৎ 'ব্রহ্মেরই স্বরূপ-বস্তু' তথৈব ব্রহ্মের 'নিত্যসিদ্ধ দেহ' যে 'প্রত্যক্ষ' অনুভব করে নাই, বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম সে বুঝিতে পারিবে না—এই নিদারুণ সম্ভাবনাটাও আমার মনকে উদ্বিগ্ন করে নাই। কেননা, আমি জানিতাম যে, পৃথিবীর আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত 'ব্রহ্মের স্বরূপ-বস্তু' 'প্রত্যক্ষ' উপলব্ধি করিয়াছেন, এমন মহাপুরুষ "লাখে না মিলল এক।" লাখ কেন, লাখের চেয়েও অনেক বড় সংখ্যার দরকার। কোটি কোটি লোকের মধ্যেও না মিলল এক! এই কারণে ভক্ত-চূড়ামণি চৈতন্য মহাপ্রভু কিম্বা পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহাজনগণ কিভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর রস গ্রহণ করিয়া ভগবদ্‌প্রেমে তন্ময় হইয়াছিলেন, আমি তাহা দেখাইবার চেষ্টা মাত্র করি নাই; কেননা, সেরূপ চেষ্টা আমার পক্ষে দুশ্চেষ্টামাত্র। ভগবদ্‌ভক্তি যাঁদের মধ্যে স্বতোচ্ছ্বসিত, ভক্তির যে-কোন বাহ্য উপকরণ—যে-কোন প্রতীক-প্রতিমা, যে-কোন তন্ত্র-মন্ত্র, যে-কোন সঙ্গীত- বা কলামূর্ত্তি—তাঁদের কাছে পর্য্যাপ্ত। কেননা, উপকরণটা তাঁদের ভক্তির কিছুমাত্র আলম্বন বা আশ্রয় নয়। ভক্ত ভক্তির দ্বারাই উপকরণের অভাবকে পূরণ করিয়া লন; নিতান্ত তুচ্ছ উপকরণও তাঁর কাছে পরম বিস্ময়কর বস্তুরূপে বিরাজমান হইয়া উঠে। "কি কহবরে সখি আনন্দ ওর, চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর," বিদ্যাপতির এই দুটি ছত্র কীর্ত্তনের মধ্যে বারম্বার আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভু দশাপ্রাপ্ত হইতেন—যদি এই দুটি ছত্রের মধ্যে ছন্দোবন্ধ না থাকিত, কিম্বা শব্দলালিত্য না থাকিত, যদি বিদ্যাপতি না হইয়া অত্যন্ত অযোগ্য অ-কবি কোন পদকর্ত্তার রচনাতেও এই ভাবের কথা থাকিত, তবে তাহাতেও মহাপ্রভুর রসস্ফূর্ত্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। কোন পদকর্ত্তার রচনা সে-ভক্তির উৎসকে উৎসারিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে নাই; তাহা আপনি আপনার ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া যোগ্য-অযোগ্য কত পদকর্ত্তার পদাবলীকেই আপনার অহৈতুকী ভক্তির অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়াছে। অন্তরে যে-মাধুর্য্য থাকিলে ভক্ত বলেন, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—পৃথিবীর ধূলিও মধুতে পরিপূর্ণ—

ভক্ত মহাজনের সে মাধুর্য্য, আমরা অভাজনেরা সাহিত্যশিল্প, এবং সাহিত্যশিল্পের চিরন্তন অবলম্বন—মানুষকে—যে-সব মাপকাঠিতে বিচার করিয়া থাকি, সে-সব মাপকাঠিকে গ্রাহ্যই করে না। তার কাছে উৎকর্ষ-অপকর্ষের হিসাব কোথায়?

কিন্তু বৈষ্ণব কবিতাকে কবিতা হিসাবেই আমরা অধিকাংশ লোক পড়িয়া থাকি এবং তার রসমাধুর্য্য আস্বাদনও করিয়া থাকি। সেইজন্য কবিতা হিসাবেই তার বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিছুকাল ধরিয়া সাহিত্যের কোন কোন আসরে, বৈষ্ণব কবিতার মহিমা কীর্ত্তনের পালাটা কতকগুলি অদ্ভুত অত্যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া লোকের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অত্যুক্তির সেইসব কুহক-জাল বিদীর্ণ করিয়া বৈষ্ণব কবিতাকে বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে ফেলিয়া তার যথার্থ মূল্য নিরূপণের জন্য আমি প্রয়াস করি। এ প্রয়াস দুঃসাহসিক; ইহাতে এখনও আমরা রীতিমত প্রবৃত্ত হই নাই বলিয়া পাঠকদের পক্ষে এ ব্যাপারে আমার সফলতা-নিস্ফলতা বিচার করা কঠিন। প্রতীচ্যদেশে সাহিত্য-সমালোচনায় আমার বোধ হয় কবিকুলচূড়ামণি গ্যয়টেই প্রথম এই world-literature, বিশ্ব-সাহিত্যের দিক্ হইতে সাহিত্যকে পরখ করার কথাটা তোলেন। সাঁত বাভ্ ও তাঁর অনুবর্ত্তী ম্যাথু আর্নল্ড দাঁড়িপাল্লায় ওজন-করা সমালোচনার বেণে-পদ্ধতিকে ত্যাগ করিয়া synthetic criticism অথবা সম্যক্-রসগ্রাহী সমালোচনার নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেহই দৈশিক মানদণ্ডটার জায়গায় গ্যয়টে-নির্দ্দেশিত বিশ্ব-মানদণ্ডটাকে আশ্রয় করেন নাই। অথচ সাহিত্য যে দেশকালে বদ্ধ নয়, সে যে সর্ব্বদৈশিক ও সর্ব্বকালিক বস্তু, এ কথাটাও তাঁরা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন দেখিতে পাই। ম্যাথু আর্নল্ড 'কাল্চার'কে খুব ব্যাপক করিয়া তুলিলেও তাহা প্রধানতঃ প্রতীচ্য কাল্চারেই আবদ্ধ ছিল—তার দৌড় বড় জোর গ্রীক্ কাল্চার পর্য্যন্ত। খুব হালে, পারস্য সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্য প্রতীচ্য সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু আমাদের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, প্রাচ্যদেশীয় হইয়াও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় সাহিত্যের রসে আমরা সমান পুষ্ট হইতেছি বলিয়া সাহিত্যের বিশ্ব-'জল্সা'র আমন্ত্রণ-লিপিখানা আমাদের প্রত্যেকের কাছে বিনা বাধায় পৌঁছিয়া গেছে। বিদ্যাপতি পড়িতে গেলেই আমাদের স্বতই পূর্ব্ববর্ত্তী ট্রুবাদোরদের কথা, কীট্স হাইনে'র কথা মনে পড়ে। চণ্ডীদাস পড়িতে গেলেই আমাদের স্বতই পারস্য সূফী কবিদের কথা, পরবর্ত্তীকালের ট্রুবাদোরগণ ও দান্তের কথা, শেলি, বার্ন্স্, ব্রাউনিংএর কথা স্বতই মনে পড়ে। কালের পরিবর্ত্তন হিসাবে এ-সকল কবিদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য আছেই—তবু কোন না কোন জায়গায় বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্যও আছে। তাই আমি এইসব কবিদের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের—বিশেষভাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির—সারূপ্য দেখাইয়া দুটো কথা বলিয়াছিলাম। প্রথম কথা এই যে, একটা পুরাণ-কথাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া এবং রসতত্ত্ব ও রসসাধনার দিক দিয়া পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীকে সাজানো হইয়াছে বলিয়া, কৃষ্ণকাহিনীর বিবৃতির জন্য কবিদের আত্মকাহিনী একেবারেই চাপা পড়িয়া গেছে—কাব্যের ভিতর হইতে কবিদের জীবনের বিকাশ, ভাবের বিকাশ দেখিবার কোন উপায় নাই। চণ্ডীদাসের কোন্ লেখাটা আগেকার এবং কোন্টা পরের, তাহা কেমন করিয়া জানিব এবং তাঁর ভাব-জীবনের বিকাশ কেমন করিয়া ধরিব? এই কারণেই পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণব কবিদের মূল্য কিছু খর্ব্ব হয়। তবে বৈষ্ণব কবিতাকে যাঁরা কবিতা বলেন না, রসতত্ত্ব ও রসসাধনার দিক্ দিয়াই দেখেন, তাঁদের কাছে এ ক্ষতি মোটেই গ্রাহ্য নয়, জানি। আমার দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, "রাধাকৃষ্ণের গোপন প্রণয়ের কাহিনীটা এমনি ঘোরতর যৌন-সম্বন্ধের কাহিনী যে, তাহার বর্ণনায় কামশাস্ত্রের মালমসলা জোগানো ছাড়া উচ্চ মানবপ্রেমের বিশেষ কোন মালমসলা জোগানো যায় না।" বিদ্যাপতি দুএকটা কবিতায় এবং একা চণ্ডীদাসই কামের রাজ্য ছাড়াইয়া প্রেমের স্বাধীন রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। আমার বলিবার অভিপ্রায় ছিল এই যে, ঐ পুরাণ-কথাকে আশ্রয় করিলে উহার সংকীর্ণ সীমাটুকুকে মানিতে বাধ্য হইতে হয়। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস যে সময় সময় সেই সীমাকে বিদীর্ণ করিয়া প্রেমের মহোচ্চ বাণীকে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। সাধারণ ট্রুবাদোর সাহিত্যের সঙ্গে দান্তের যে তফাৎ, সাধারণ বৈষ্ণবকবিদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের এবং কখনো কখনো বিদ্যাপতিরও সেই তফাৎ।

আমার ভাগ্যদোষে, কিম্বা হয়ত আমার প্রকাশের জড়িমার জন্যই, আমার বিরুদ্ধে কথাটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমি বৈষ্ণব কবিতাকে "অশ্লীল" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। Erotic Literature অথবা লালসামূলক সাহিত্য যে সাহিত্যের অন্ততঃ বারো-আনা স্থান জুড়িয়া আছে, তাহা আমি জানি। বায়রন্, বোকাচিয়ো, রাবেলে, গোতিয়ে, ভ্যার্লেন্, প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরাজ-ইতালীয়-ফরাসীস লেখকদের রচনার চেয়ে বৈষ্ণবকবিতা অধিকতর লালসামূলক নয়। De Cameronএর গল্পগুলির চেয়েও কি বৈষ্ণবকবিতার কাহিনী স্থূলতর? কখনই নয়। আমার প্রবন্ধে আমি "অশ্লীল" শব্দটা কোথাও ব্যবহার করি নাই; অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিতাকে "কামের কবিতা" (erotic poems) বলিয়াছি। এবং যখন দর যাচাই করিতে বসিয়াছি তখন উচ্চপ্রেমের কবিতাকে যে কামের কবিতার চেয়ে উচ্চতর স্থান দিব, ইহাতে আর সন্দেহ কি? প্রেমের কাব্য সাহিত্যে শেলির এপিসিকিডিয়নের যে স্থান, দান্তের ভিটানুওভার যে স্থান, ব্রাউনিংএর কাব্যগুলির যে স্থান, সেই স্থান কি বায়রন বা বোকাচিয়োর রচনার হইতে পারে? কিন্তু তবু erotic সাহিত্যও সাহিত্য—লালসামূলক কাব্য বা উপন্যাসকে সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসন দিতে গেলে হয়ত বা ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যাইতে পারে। এই কারণেই কোন রীতিধারানুগামী (conventional) সমাজ-নীতির তরফ হইতে সাহিত্যের বিচার চলে না; কেননা তাহা যদি চলিত তবে শেক্সপীয়র হইতে সুরু করিয়া কোন কবিই বিচারে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। সাহিত্য কেবলমাত্র রসাত্মক; রসই তার প্রাণ। তবে রসের মধ্যে উনিশ-বিশ আছে; রসের মূল্যের সেই তারতম্য লইয়াই সাহিত্যের মধ্যেও বড়-ছোট'র বিচার হইয়া থাকে। কামের রসের চেয়ে প্রেমের রসের মূল্য বেশি। যে রস ব্যাপকতায় এবং গভীরতায় জীবনের অনেকখানি অংশকে অধিকার করে, সাহিত্যে সেই রসেরই স্থান উচ্চতর। সেই হিসাবেই অন্য সব বৈষ্ণব পদকর্ত্তার চেয়ে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব; এবং সেই হিসাবেই চণ্ডীদাসের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে দান্তে, শেলি, ব্রাউনিংয়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য চণ্ডীদাসের মধ্যেও এমন কোন কোন দিক্ আছে, যেখানে তাঁর তুলনা খুঁজিয়া পাই না।

[২]

কিন্তু সাহিত্যের তরফ হইতে এ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্ফল কেননা বৈষ্ণব রসতত্ত্ব না বুঝিলে বৈষ্ণব কবিতাকে বুঝা কারো সাধ্য নয়, আমার সকল সমালোচকেরাই এই কথা বলিয়া আমার বুদ্ধির পরে বিষমকটাক্ষপাত করিয়াছেন। শুধু বিপিনবাবু বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বই পড়িয়াও সকলে বুঝিতে পারে না—তার "প্রত্যক্ষ

অনুভব" হওয়া চাই। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের এই esoteric বা অতি গুহ্য রহস্যকে সাধনার বলে যে সুজন ভেদ করিতে পারিবেন, তিনিই বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, অন্যে নহে। বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম-গ্রহণ ব্যাপারে বিপিনবাবু যে-সকল criterion বা বিচার-সূত্র খাড়া করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, একা তিনি ভিন্ন বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে আর কেহ পারিবেন কি না সন্দেহ। "কচিৎ কোনও ভাগ্যবান সাধক প্রকৃত বৈষ্ণবতত্ত্বের সন্ধান পাইলেও, ...দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব ও মহাজন-পদের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ এতটাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।" অবশ্য আমি সেই কাচিৎক 'ভাগ্যবান সাধক' হইবার আশা কোন কালেই রাখি না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পৃথিবীর মধ্যে বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব বাদে এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা সকলেই বোঝে না, অল্প লোকেই যার রসগ্রহণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার সমজ্‌দারও দুর্লভ। কিন্তু "ভাগ্যবান" সাধক ভিন্ন এ-সকল বস্তুর রস গ্রহণে আর কারো অধিকার নাই, এমন অপূর্ব্ব কথা ত কোথাও শুনি নাই।

সাধকের কথা ছাড়িয়া দি, রসতত্ত্বের পাঠক ও সমজ্‌দার না হইলে বৈষ্ণব কবিতা বুঝা যায় না, এ মতেরও আমি প্রতিবাদ করিতে চাই। বৈষ্ণব কবিতা যদি কেবলমাত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির জিনিস হইত, তবে তার esoteric দিক বুঝিবার জন্য উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, প্রভৃতি অনুধাবন করার তাৎপর্য্য স্বীকার করিতাম। ইহা যখন কবিতা, তখন প্রতি পাঠকই ইহার রস-গ্রহীতা, ইহার আস্বাদয়িতা হইবার দাবী রাখে। যদি এ কথা অস্বীকার কর, তবে বৈষ্ণবপদাবলীকে কবিতা নাম দিয়ো না ; তাকে ভক্ত সাধকদের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া আল্‌গোছে তুলিয়া রাখ। প্রশ্ন উঠিবে যে দান্তের বা মিল্‌টনের কিম্বা মধ্যযুগীয় কোন খৃষ্টান মরমী (mystic) কবির কিম্বা পারস্য কোন সুফী কবির কাব্য পড়িতে গেলে খৃষ্টানধর্ম্ম বা সুফীধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনার পরিচয় কি আবশ্যক হয় না? অবশ্য যদি তাহা নিতান্ত সামান্য পরিমাণে আবশ্যক হয়, অর্থাৎ এত সামান্য পরিমাণে আবশ্যক হয়, যে, সে-সব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বা সাধনার খবর না রাখিলেও কাব্যের রসগ্রহণে কারো বাধা হয় না—তবেই কাব্য বা সাহিত্য হিসাবে উপরি-উক্ত কবিদের রচনার সার্থকতা থাকে। পরন্তু ঐ-সকল কবিদের কাব্যের যদি কোন esoteric বা প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব থাকে যাহা সর্ব্বসাধারণের গম্য হইতে পারে না, তবে কাব্য বা সাহিত্যহিসাবে তারা ধর্ত্তব্য হইতে বাধ্য। তার সোজা কারণ এই যে, কাব্য ধর্ম্ম-বিষয়ক কাব্য হইলেও, তাহা কাব্যই ; তাহা তত্ত্বগ্রন্থ বা সাধন-সংকেত নয়। সাহিত্যে যদি তার কোন মূল্য থাকে, তবে সে কাব্যহিসাবেই আছে। জলালুদ্দীন রুমি অথবা হাফেজের কাব্য-সুধা যে-সকল পাশ্চাত্য কাব্যরসিক পান করিয়া বিমুগ্ধ, তাঁরা তার মধ্যে সুফীতত্ত্ব বা সুফী সাধনার কোন সংকেত দেখিতে পাইয়া যে উক্ত কাব্যের পক্ষপাতী হইয়াছেন তাহা নয়। পক্ষান্তরে আমরা যখন মিল্‌টন্ পড়ি বা দান্তে পড়ি, তখন খৃষ্টান থিয়লজি পড়ি না এটা নিশ্চয়ই জানি। এমন কি খৃষ্টান ভক্তদের কাব্যও যখন পড়ি,—যেমন রিচার্ড রোলে কিম্বা সেণ্ট জন্ অব্ দি ক্রস্ প্রভৃতির কবিতা কিম্বা হার্বার্ট, ক্রসো, ভ্যগন্ প্রভৃতির কবিতা—তখনও তার কাব্যরসই আস্বাদন করি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিকে পাশ্চাত্য-দেশের কাব্যরসিকেরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত বলিয়া মোটেই গ্রহণ করেন নাই। এটা যে তাঁদের অপরাধ বা অজ্ঞতা, এমন কথা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও আমি বলিতে পারিব না।

তবু কাব্য হিসাবেই বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা করিতে গেলে ভক্তি-কাব্য বা অধ্যাত্ম কাব্যগুলির সঙ্গে তার তুলনা করা উচিত ছিল নাকি? আমি তাহা না করিয়া রোমাণ্টিক কবিতার সঙ্গে তার তুলনা করিলাম কেন? ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, রসতত্ত্ব যে ব্যক্তি না জানে, সে বৈষ্ণব কবিতা পড়িয়া তাহাতে ভক্তির রস পায় না, অধ্যাত্মতত্ত্বও পায় না ; সে ঐ-সব কবিতার মধ্যে দেখিতে পায়, erotic passion, কামজ হৃদয়াবেগের বিচিত্র লীলা ; কখনও কখনও চণ্ডীদাস প্রভৃতিতে উচ্চ মানব-প্রেমের আনন্দ-বেদনার অভিব্যঞ্জনাও দেখিতে পায়। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিশ্বাস যে, ইউরোপে ট্রুবাদোর কবিদের গান যেমন গোড়ায় মুখ্যতঃ কোন মহিমাময়ী সুন্দরী নারীর প্রতি প্রেমের স্তবগুঞ্জন ছিল এবং গৌণতঃ কচিৎ কখনও ধর্ম্মের কবিতা ছিল, কিন্তু ক্রমে Albigeois Crusadeএর পর হইতে তাহা Virgin Mary'র পূজার প্রভাবে সম্পূর্ণরূপেই অধ্যাত্ম রূপক কবিতার রূপ ধারণ করিল ; ঠিক তেমনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিতা মুখ্যত মানবপ্রেমের কবিতা ছিল এবং গৌণতঃ ধর্ম্মের কবিতা ছিল, কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপেই অধ্যাত্ম রূপক-কবিতায় রূপান্তর লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"কেই চণ্ডীদাসের "খাঁটি রচনা" বলিয়াছেন এবং ঐ মহাকবির অন্যান্য পদাবলীকে পরবর্ত্তী কালের রূপান্তর বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁর এ মত প্রতিষ্ঠা করিবার মত যুক্তির আটঘাট তাঁর রচনায় বড় দেখিতে পাইলাম না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সকল রচনাই হয়ত ন্যূনাধিক রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু তবুও তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁদের কাব্যে এত সুস্পষ্ট যে তাঁদের রচনাকে আর কারো রচনা বলিয়া ভ্রমের সুযোগ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্বের সেই একান্ত সুস্পষ্ট ছাপটি পাই না ; হইতে পারে তাহা অপর কোন চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া কিম্বা চণ্ডীদাসেরই অল্পবয়সের রচনা বলিয়া। কালিদাসের ঋতুসংহার যেমন কুমারসম্ভব বা মেঘদূত হইতে বিভিন্ন, তার মধ্যে অপরিণতির পরিচয় যেমন পরিষ্কার, তেমনি হয়ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চণ্ডীদাসের অপরিণত বয়সেরই রচনা। কেননা তাঁর পরবর্ত্তী রচনার সঙ্গে ইহার সাযুজ্য সারূপ্য বা সালোক্য কিছুই নাই। যাই হোক Cambridge University Press হইতে প্রকাশিত The Troubadours গ্রন্থে এই কথাগুলি পাইলাম :—"At the close of the Albigeois crusade the Virgin Mary becomes the theme of an increasing number of lyric poems.…The cult of the virgin had obvious attractions as a subject for troubadours whose profane songs would not have been countenanced by St. Dominic and his preachers and religious poetry dealing with the subject could easily borrow not only the metrical forms but also many technical expressions which troubadours had used in singing of worldly love." ট্রুবাদোরের এই ইতিহাস হইতে আমার মনে হইল যে, বাংলাদেশে বৈষ্ণব কবিতাতেও ঠিক এই কাণ্ডটিই ঘটিয়াছে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিথুন-রাগের (sexual) কবিতা সহজেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে অধ্যাত্ম-রাগের (spiritual) অথবা রাগাত্মিকা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে।

মিথুনতার (sex) সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার এই সাযুজ্যে চমকিত হইবার কোন কারণ নাই। মানুষের আদিম অসভ্য অবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত মিথুনতার ও আধ্যাত্মিকতার এই সাযুজ্য ধর্ম্মের বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

প্রাচীন মিশরের Isisএর পুজা-পর্ব্ব হইতে সুরু করিয়া গ্রীকদের Dionysian-Eleusinian festivals, রোমের Flora ও Bacchanalian festivals এবং আমাদের দেশের রাস-ঝুলন প্রভৃতি উৎসব পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াকাণ্ডেই মিথুনতা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, আধ্যাত্মিকতা মিথুনতাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হ্যাভ্‌লক এলিস্ কিম্বা যে কোন মিথুন-তত্ত্ব-রচয়িতার গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিথুনতার এই সাযুজ্যের মনস্তত্ত্ব ও তার বিচিত্র তথ্য-খবর পাওয়া যাইবে। এখানে সে আলোচনা উপস্থিত করিয়া অনাবশ্যক জায়গা জুড়িব না।

সেইজন্য গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব-বহির্গত পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের কবিতাকে ভক্তিকাব্যের সঙ্গে তুলনা না করিয়া আমি খাঁটি সাহিত্যের কবিতার সঙ্গেই তুলনা করিয়াছি। কেননা, খৃষ্টান মরমী কাব্যে, কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি ভক্তদের শব্দাবলীতে কোথাও এমনতর বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যমুগ্ধতা কিম্বা মানব-প্রেমের বিধুর বেদনা, প্রতীক্ষা, বিরহ ও মিলনাবেগের রসবিদগ্ধ বর্ণনা পাই না, যেমনটি পাই বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে।

বর্ষায় বিরহের গান :—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ
সঘন খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত-শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঁয়ায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

কিম্বা প্রেমের মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যথার গান :—

"এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
দুহুঁ কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥"—চণ্ডীদাস।

কিম্বা প্রেমের অপূর্ব্ব রূপান্তরের গান :—

"আমার পিয়ার কথা কি কহিব সোই।
যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই ॥
তাহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিল।
তাহার মত মোরে করি সে মোর মত হৈল ॥"—চণ্ডীদাস।

উপরে যে-সব কবিতার টুক্‌রা উদ্ধার করিলাম, তার অনুরূপ রোমান্টিক গীতলেখা কোন ভক্তিকাব্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নয়। এর সায় চিরন্তন মানুষের হৃদয় চিরকাল দিয়া থাকে; এ-সব কবিতার সায় পাইবার জন্য উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল নীলমণি পড়ার কোন আবশ্যকতা দেখি না।

[৩]

তবু রসতত্ত্বের দিক হইতে বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্মগ্রহণের চেষ্টা করাটা কর্ত্তব্য। আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম যে অন্য এক প্রবন্ধে সে কাজ করিব; আমার সমালোচকদের সেটুকু তর সহিল না। যাক। 'উপাসনার' সম্পাদক সেই রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তাকে "humanism" আখ্যা দিয়াছেন, এবং বিপিন বাবু তাঁর সমালোচনায় তাকে 'ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ দেহের' তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁদের কথাগুলো আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক—কেননা যাঁরা তাঁদের সমালোচনা পড়েন নাই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য ঠিক মত ধরিতে পারিবেন না। উপাসনার সম্পাদক লিখিয়াছেন :—"উচ্চদরের পাশ্চাত্য প্রেমসাহিত্যের সব স্থানেই যুগলপ্রেমের প্রতিষ্ঠা। সে হিসাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম যুগলের প্রেম নহে। কারণ রাধা ত প্রিয়ের ভুজবন্ধনে আবদ্ধা একটি নারী নহে, জগতের নিখিল জীবই সেই রাধার ভাবে কৃষ্ণানুগতা ও কৃষ্ণপ্রেমাধিকারিণী। কৃষ্ণ যে বহুবল্লভ।"

উপাসনার সম্পাদক যুগল প্রেমের একসম্বন্ধতার চেয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের Pluralism বা বহুনিষ্ঠতাকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন এবং এই উপলক্ষ্যে একটা বড়-গোচের সিদ্ধান্তও করিয়া বসিয়াছেন এই যে, "স্বীয় অধিকার হইতে আপনি আপনাকে বঞ্চিত করা, একের উৎকর্ষ সাধনকে বহুর ভোগের জন্য উৎসর্গ করা—সার্ব্বজনীন বিশ্বধর্ম্মের ভবিষ্য ক্রমবিকাশে এই ভাবের মর্য্যাদার ক্রমশঃ উপলব্ধি হইবে।...ইহার বিকাশলাভ আধুনিক সভ্যতাকে নূতন বলে বলীয়ান, নূতন সম্পদে গৌরবান্বিত করিবে, সন্দেহ নাই।" রাধাকৃষ্ণের ঐ বহুনিষ্ঠ, বহুরত প্রেমের আদর্শটাকে যখন 'সভ্যতা' পর্য্যন্ত অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তখন আশা করি লেখক এই কথাই বলিতে চান যে, সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমে এই বহুরতির অর্থাৎ pluralistic love-এর স্থান হইবে।—'উপাসনা'র সম্পাদক এ কথা বলিলে আমরা বলি, তথাস্তু, Amen, সাধু সাধু! কৃষ্ণরাধার বহুনিষ্ঠ প্রেমের ভাবটিকে যে শুধু transcendental বা অতিপ্রাকৃত ক্ষেত্রেই লেখক রাখেন নাই—মানবসভ্যতা-ক্ষেত্রেও তাকে নামাইয়া আনিয়াছেন, তার আরো প্রমাণ এই রবীন্দ্রনাথে পর্য্যন্ত (!!!) ঐ humanism ফোটে নাই বলিয়া তিনি রবীন্দ্র-প্রেম কাব্যগুলিকে নিন্দা করিয়াছেন।

অবশ্য বিপিন বাবু রসতত্ত্ব বলিতে এসব বহুরতির কথা বোঝেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মের একটা 'নিত্যসিদ্ধ দেহ' আছে। "এই রক্ত মাংস, এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশ, এই বর্ণের ভাস্বরতা, এই চোকের ভঙ্গিমা, এই স্বরের মাধুর্য্য, এই স্পর্শের কমনীয়তা, এই অঙ্গের গন্ধ—এ-সকল যে অপূর্ব্ব, যে অলোকসামান্য, যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সন্ধান দেয়, তাহা রক্ত-মাংসের নহে,...সে রূপ নিত্যসিদ্ধ···সে রূপ এই অশুদ্ধ দেহের নহে, কিন্তু ইহার অন্তরালে যে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ সিদ্ধ দেহ আছে, তাহার।···বৈষ্ণবেরা ঐ সিদ্ধ দেহকেই স্বরূপ আর এই প্রাকৃত দেহকে রূপ কহিতেন।···সেই নিত্য রসলীলার নিত্যসিদ্ধ সখ্যমূর্ত্তি, বাৎসল্যমূর্ত্তি, ও মাধুর্য্যমূর্ত্তিই আমাদের সখার, পুত্রের, প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর প্রত্যক্ষ পার্থিব দেহেতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণকে সতত আকর্ষণ করে।"

প্রকৃত বৈষ্ণব রসতত্ত্ব কিন্তু এই humanism-তত্ত্ব অথবা ভগবানের নিত্যসিদ্ধদেহ আমাদের প্রত্যক্ষ পার্থিব দেহে আত্মপ্রকাশ করে এই তত্ত্ব—এর কোনটাকেই স্বীকার করে না। আমি আমার প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বৈষ্ণব রস-তত্ত্বে "বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই।" কথাটা ঠিক কি না, তার প্রমাণ ও নজির হাজির করিয়া দেখানো যাক।

বৈষ্ণবাদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দে ৩৩শ অধ্যায়ে—শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের সহিত বিহারের বর্ণনা শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ ভগবান শুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন, "ব্রহ্মণ্! তিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা কর্ত্তা ও রক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে পরদার-

সম্ভোগরূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? যদুপতি আপ্তকাম। তথাপি তাঁহার এরূপ নিন্দনীয় আচরণের অভিপ্রায় কি? আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন।" (২৭-২৮ শ্লোক)। শুকদেব তার উত্তরে বলিলেন, "রাজন্! ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মব্যতিক্রম এবং সাহস দেখা গিয়াছে। তেজস্বীদিগের তাহাতে দোষ হয় না যেমন বহ্নি সমস্তই ভোজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঈশ্বর নহেন, তাঁহারা কখনই এতাদৃশ আচরণ মনের মধ্যেও করিবেন না (নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ); রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ বিষপান করিলেই মরিয়া যাইবে।" (২৯-৩০ শ্লোক)। তারপর শুকদেব বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াচ্ছলে দেহধারণ করিয়াছিলেন (৩৫ শ্লোক) এবং ব্রজবাসিগণ তাঁর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই, কারণ তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহারা মনে করিত—তাহাদিগের স্ব স্ব পত্নী তাহাদিগেরই পার্শ্বে অবস্থিত আছে।" (৩৭ শ্লোক)।

যেহেতু আমরা 'ঈশ্বর' নহি, সেহেতু ভাগবত আমাদিগকে মনে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শুধু ভাগবতেরই যে এই নিষেধ তাহা নয়; উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থেও এসম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি আছে। যথা:—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি ॥

১৬ শ্লোক। নায়কভেদঃ।

অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তা যে ঔপপত্য ভাবকে ঘৃণিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নয়। যে হেতু মধুর রস আস্বাদনার্থই তাঁহার অবতারত্ব।

এ সম্বন্ধে লোচনরোচনী-টীকাকার শ্রীমৎ জীব গোস্বামী ও আনন্দ-চন্দ্রিকা-টীকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে সে আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দার্শনিক হিসাবেও তার মূল্য খুব বেশী। কিন্তু সেই-সব আলোচনা পড়িয়া এই কথাই বারম্বার মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের এই-সব লীলা-ব্যাপারকে পাছে সহজেদের মত মানুষ প্রাকৃত ব্যাপার করিয়া তোলে এবং ধর্ম্ম দুর্নীতির দ্বারা আক্রান্ত হয়—এ আশঙ্কা মহাজন টীকাকারদিগের মনের মধ্যে ছিল। শ্রীজীবগোস্বামী উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় এবং অন্যত্র, গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাম্পত্যলীলাই সত্য—তিনি তাদের পতিই, উপপতি নন—ইহা যেমন করিয়া হোক প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঔপপত্য ও পরকীয়াত্বকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই; তিনি বলিয়াছেন যে কৃষ্ণের প্রকট লীলাও যেমন সত্য, অপ্রকট লীলাও তেমনি সত্য—তাঁর লীলার আবার নিত্য অনিত্য কি? তিনি আকারেও অনন্ত, প্রকাশেও অনন্ত, জন্মকর্ম্মলক্ষণলীলাতেও অনন্ত। সকল সময়েই তাঁর জন্মকর্ম্মলীলা বর্ত্তমান, একই কালে তাঁর লীলার এক অংশ সমাপ্ত, অন্য অংশ আরব্ধ (cyclic)। ("নত্ প্রকটা-প্রকটলীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষণ্যমস্তীতি"—প্রকট এবং অপ্রকট লীলার মধ্যে স্বরূপত কোন বৈলক্ষণ্য নাই)। বিশ্বনাথের লীলাতত্ত্বের ব্যাখ্যা এত চমৎকার যে জন্মকর্ম্মলীলার সদাবর্ত্তমানতা প্রসঙ্গে মনে হয় যেন ব্যার্গস'র কাল সম্বন্ধে ব্যাখ্যাই পড়িতেছি।

কিন্তু নিত্য হোক মায়িক হোক, অপ্রকট হোক, আর প্রকট হোক, কোন লীলাতত্ত্বেই প্রাকৃত নায়কের স্থান নাই। Sex-Psychology হিসাবে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের মধ্যে বিস্তর উপাদান-উপকরণ আছে; কিন্তু বৈষ্ণবেরা তাহাকে Divine Sex-Psychology হিসাবেই দেখিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সচ্চিৎ অংশ শ্রীকৃষ্ণ; আনন্দ অংশ হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা। সে শক্তি—"মহাশক্তিসমুদায়-পরমমুখ্যতমা শক্তি"—সকল মহাশক্তির মধ্যে পরমমুখ্যতম শক্তি। এই যে Divine sex—এই যে শ্রীভগবানের নায়ক-নায়িকা ভাব—ইহার বিচিত্র রসলীলা বৈষ্ণব রসগ্রন্থে প্রকট। এই রসতত্ত্বের মধ্যে তত্ত্বের যে আশ্চর্য্য গভীরতা দেখিতে পাই তাহা যদি বৈষ্ণব কবিতায় সম্যক্ প্রকাশ পাইত, তবে তাহা উৎকৃষ্ট তত্ত্বরসাত্মক কবিতা হিসাবে উপভোগ্য হইত সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব রসতত্ত্বে যে-সব উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব পাই, পদাবলীতে তার ব্যঞ্জনা দেখিতে পাই না। অথচ কেবল কাব্যরস হিসাবেও তাকে উপভোগ করা নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবচূড়ামণি বিশ্বনাথ বেশ পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়াছেন—"যল্লঘুত্বমুক্তং পূর্ব্বাচার্য্যৈ স্তৎপ্রাকৃত নায়ক এব তত্রৈবৌপপত্যস্য বৈধর্ম্ম্যাৎ, তস্য চ দুরদৃষ্টজনকত্বাৎ, তস্য চ নরকপাতনিদানত্বাৎ পর্য্যবসানে দুঃখমাত্রোপাদানত্বেন তস্য লঘুত্বং।" এ একেবারে consequential morality'র কথা—পরিণামদর্শী নীতির কথা। ঔপপত্য ব্যাপারে যে লঘুত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহা কেবল প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই খাটে। লঘুত্ব কেন? কারণ তাহাতে বৈধর্ম্ম্য হয়, দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, নরকপাত হয়, এবং পর্য্যবসানে তাহা বহু দুঃখের উপাদান হয়। বিশ্বনাথ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। "তথা তচ্চেষ্টিতস্য কাব্যনাট্যগতত্বেন উপাদেয়তয়া স্বাদনে…স্বাদচর্ব্বণদশায়াং সভ্যা-নামপি তাদ্রূপ্যাপত্তেশ্চ বিধর্ম্মস্পর্শাৎ।" কাব্য নাটকে এই প্রাকৃত নায়কদের ঔপপত্য বা প্রচ্ছন্ন প্রেমের বর্ণন স্বাদবিষয়ে উপাদেয় হইলেও যে-সকল সভ্য অথবা দর্শক ঐ প্রকার কাব্য নাটকের রস আস্বাদন করেন তাঁহাদিগকেও বৈধর্ম্ম্য স্পর্শ করে, বিশ্বনাথ এ কথাও বলিয়াছেন। অতএব, বিপিন বাবু যে বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ভগবানের সৌন্দর্য্য দেখে কিম্বা বালকবালিকার মুখচ্ছবিতে তাঁর অরূপ রূপ ধ্যান করে "কিন্তু প্রস্ফুটযৌবনা…রমণী-রূপের অথবা কন্দর্পতুল্য পুরুষের দেহসৌন্দর্য্যের মধ্যে যে, ভগবানের রূপলহরী ও রসলীলা তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া উঠে ও ফুটিয়া পড়ে… এই রূপ ও রসকে ভগবদারাধনার উপকরণ ও উদ্দীপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই"—সেজন্য ব্রাহ্ম-বেচারীদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কেননা স্বয়ং বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথ কাব্য নাটকেও প্রাকৃত নায়কের এ-সব প্রাকৃত প্রেমলীলা উপাদেয় হইলেও, যে ব্যক্তি সেই কাব্য নাটক উপভোগ করে, তার পর্য্যন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ভাগবত বলেন,—বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্—রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিষ পান করিলেই মরিয়া যাইবে। কি সর্ব্বনাশ! সুতরাং বিপিনবাবু-কথিত রসতত্ত্ব কি জীবগোস্বামী, কি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, কি বৈষ্ণব মহাজনশ্রেষ্ঠ রূপ-গোস্বামী সকলেরই হিসাবে heresy। তাঁর ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়ের মাখামাখি তত্ত্ব ও নরদেহের মধ্যে সিদ্ধ দেহের রসোপলব্ধির তত্ত্ব প্লেটো'র Prototypes বা Ideal typesএর তত্ত্ব হইতে পারে। প্লেটো thought বা চিন্তাকেও "Sublimated sex-impulse", শুদ্ধীকৃত মিথুন-প্রেরণা বলিয়াছেন। কিন্তু আর যাই হোক বিপিন বাবুর রসতত্ত্ব যে বৈষ্ণব মহাজনদের রসতত্ত্ব নয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। বিপিন বাবু উজ্জ্বলনীলমণি হইতেই সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা-সূচক একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য-সংজ্ঞা যে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই, সে কথাটার উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। যে পশ্চিমে তাঁর বর্ণিত রসতত্ত্বের স্ফুরণ এখনো হয় নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁর এ heresy গৃহীত হইতে পারে; বৈষ্ণব মহাজনদের কাছে নয়।

"যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
* * * * *
হে রমণী ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।"—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথের এই চারিটি পংক্তিতে যে কথা আছে, বিপিনবাবু নিত্যসিদ্ধ দেহ, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয়, প্রভৃতি নানা কথার অবতারণা করিয়া ঐ চারিটি মাত্র পংক্তিকেই তাঁর সমস্ত প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতটা ব্যাখ্যা-বাহুল্য না করিয়া যদি দুচারটে বস্তুতন্ত্র উদাহরণ দিয়া তিনি দেখাইতে পারিতেন যে, তাঁর ব্যাখ্যাত রসতত্ত্বই বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে, তবে তাঁর ব্যাখ্যা সার্থক হইতে পারিত।

অতঃপর বৈষ্ণব transcendentalism বা অতিপ্রাকৃতের কাছে উপাসনার humanism বা অত্যন্ত প্রাকৃতের কথাটাও ফাঁসিয়া যায় দেখা যাইতেছে। এ যুগের কোন আদর্শের কথাকে সে যুগের বৈষ্ণব কবিদের স্কন্ধে চাপানো আর কিছু নয় একটুখানি anachronism বা কালব্যতিক্রম দোষ মাত্র। Humanism-তত্ত্বের বিস্তর উপকরণ বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই রসতত্ত্বকে এই নবযুগে অপ্রাকৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্যে, myth হইতে বাস্তব সুখদুঃখউত্থানপতনময় জীবনের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই গড়ার কাজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কিছুটা দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে—অন্ততঃ আমাদের ত এইরূপ ধারণা। শ্রীমতী সরযূবালার রচনাবলীর মধ্যেও বৈষ্ণবরসতত্ত্বের সেই নব রূপান্তরের পরিচয় পাই। সময়ক্রমে সে সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বে ও রসসাধনায় যে প্রেম বৈধ তাহা সংসারের কৃত্রিম বিধিনিষেধের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ ; যে প্রেম রাগানুগ তাহাই যথার্থ প্রেম। এই সংসারের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াও সেই সংসার অতীত অপ্রাকৃত প্রেম-ধামের লীলার ধ্যান করিতে পারি। সেই অপ্রাকৃত প্রেমের ধ্যানে ও চিন্তনে আমাদের মনের মধ্যে অনুরূপ ভাব-সকল জাগিলে তবেই জন্মজন্মানি কোন সময়ে অহৈতুকী ভক্তি আসিতে পারে। এই তত্ত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে চাই না। সংসারের মধ্যে পারমার্থিকতার সাধনার মাহাত্ম্য যতই কীর্ত্তন করি, এটা বেশ বুঝি যে পারমার্থিকতার সাধনা সংসারেই পরিসমাপ্ত হইতে পারে না—তার একটি স্বক্ষূর্ত্ত স্বতন্ত্র ক্রমলীলা আছে, তার একটি নিত্য অভয় প্রতিষ্ঠা আছে। তবু মানব আমরা—এ প্রশ্ন তাই কিছুতেই মরিতে চায় না,—

"এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?"

কারণ দেখি যে, রসতত্ত্বের নিষেধ সত্ত্বেও—

"নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার ; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতি-গতি।"

"তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ !
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন ব'সে।" (রবীন্দ্রনাথ)

অতএব সাহিত্যহিসাবে বৈষ্ণব কবিতা শেষ পর্য্যন্তই পড়িব। হে সাধু পণ্ডিত, হে 'ভক্ত রসিক সাধক,' তুমি যত কেন কর রোষ এবং যত কেন ধর দোষ।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

যে প্রবন্ধ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাগজে আলোচনা হইয়াছে, তাহা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া উত্তরস্বরূপ এই প্রবন্ধটিও প্রবাসীতে মুদ্রিত হইল। অতঃপর মূল প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আর কোন প্রবন্ধ ছাপিব না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

কষ্টিপাথর

ভোলা

হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে ;—
থাম্‌ল তাহার হাস্য-উছল বাণী ;
থাম্‌ল তাহার নৃত্য নূপুর ঝঝ্‌ঝরানি ;
সূর্য্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি,
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্তব্ধ হল একনিমেষে
বিজু যখন চলে গেল মরণ-পারের দেশে
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।
মনে হল আমার ঘরের সকাল যেন মরেচে বুক ফেটে।
ভোরবেলা তার বিষম গণ্ডগোলে
ঘুম ভাঙনের সাগর মাঝে আর কি তুফান তোলে ?
ছুটোছুটির উপদ্রবে
ব্যস্ত হ'ত সবে,
হাঁ হাঁ করে ছুটে আস্‌ত "আরে আরে করিস্ কি তুই" বলে' ;
ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠ্‌ত যেন টলে'।
আজ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁক ডাক
চাক-ভরা মৌমাছির মত উড়ে গেছে শূন্য করে' চাক।
আমার এ সংসারে
অত্যাচারের সুধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ;
তাই এ ঘরের প্রাণ
লোটায় ম্রিয়মাণ
জল-পালানো দিঘির পদ্ম যেন।
খাট পালঙ্ক শূন্যে চেয়ে শুধায় শুধু, "কেন, নাই সে কেন ?"
সবাই তারে দুষ্টু বল্‌ত, ধর্‌ত আমার দোষ,
মনে কর্‌ত, শাসন বিনা বড় হলে ঘটাবে আপ্‌শোষ।
সমুদ্র-ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে'
ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জ্জে' ছুটে'
বারে বারে ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কূলে কূলে পড়ে লুটে'লুটে
ধরার বক্ষতলে,
দুরন্ত তা'র দুষ্টুমিটি তেম্‌নি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার করে'
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভরে'।

বয়সের এই পর্দ্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে
আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে ;
বিজুর হাতে পেলে নাড়া
সেই যে দিত সাড়া।
সমান-বয়স ছিল আমার কোন্‌খানে তার সনে,
সেইখানে তার সাথী ছিলেম সকল প্রাণে মনে।
আমার বক্ষ সেইখানে এক-তালে
উঠ্‌ত বেজে তারি খেলার অশান্ত গোলমালে।
বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা
কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে।
পাকা আমের কালে
তারে নিয়ে বসে' গাছের ডালে
দুপুর বেলায় খেয়েছি আম করে' কাড়াকাড়ি,—
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, "বিষম বাড়াবাড়ি।"
বারে বারে
আমার লেখার ব্যাঘাত হত, বিজুর মা তাই রেগে বল্‌ত তারে
"দেখিস্‌নে তোর বাবা আছেন কাজে ?"
বিজু তখন লাজে
বাইরে চলে যেত। আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায় ;
মনে হ'ত "টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায় !"

ভোর না হতে রাতি
সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথী,
মনে হল এতদিনে বুড়ো-বয়সখানা
পূর্‌ল ষোলো আনা।
কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
চল্‌ব এবার প্রবীণতার পাকা পথে
লক্ষ্য করে বৈতরণীর ঘাট,
গম্ভীরতার স্তম্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ।
সময় নষ্ট হবে না আর দিনে রাতে
দৌড়বে মন লেখার খাতার শুক্‌নো পাতে পাতে,—
বৈঠকেতে চল্‌বে আলোচনা
কেবলি সৎপরামর্শ কেবলি সদ্‌বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে
দারুণ শূন্য রয়েচে মোর চৌকি টেবিল চেপে।
তাই সেখানে টিক্‌তে নাহি পারি,
বৈরাগ্যে মন ভারী,
উঠোনেতে কর্‌ছিনু পায়চারী।
এমন সময় উঠ্‌ল মাটি কেঁপে
হঠাৎ কে এক ঝড়ের মত বুকের পরে পড়্‌ল আমার ঝেঁপে।
চমক লাগ্‌ল শিরে শিরে,
হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে।
আমি শুধাই, "কে রে, কি রে ?"
"আমি ভোলা" সে শুধু এই কয়,
এই যেন তার সকল পরিচয়,
আর কিছু নেই বাকি।
আমি তখন অচেনারে দু-হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি।
সে বল্‌লে "ঐ বাইরে তেঁতুল-গাছে
ঘুড়ি আমার আট্‌কে আছে
ছাড়িয়ে দাওনা এসে।"
এই বলে সে
হাত ধরে মোর চল্‌ল নিয়ে টেনে।

ওরে ওরে এই মত যার হাজার হুকুম মেনে
কেটেছিল ন'টা বছর, তারি হুকুম আজো মর্ত্ত্যতলে
ঘুরে বেড়ায় তেম্‌নি নানান ছলে !
ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ
ফুরোয়নি মোর কাজ !
আমার রাজা, আমার সখা, আমার বাছা আজো
কত সাজেই সাজো !
নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,
চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে !
আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল নড়ে',
আবার হঠাৎ উল্টে পড়ে'
দোয়াত হল খালি
খাতার পাতায় ছড়িয়ে গেল কালি।
আবার কুড়োই ঝিনুক শামুক নুড়ি,
গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছুঁড়ি।
আবার আমার নষ্ট সময় ভ্রষ্ট কাজে
উলট্‌পালট্ গণ্ডগোলের মাঝে
খেলা ছড়া ভাঙাচোরার পর
আমার প্রাণের চির-বালক নতুন করে' বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা !

(ভারতী, আষাঢ়।) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

কালো-মেয়ে

মরচে পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো-মেয়ে নন্দরাণী
এখানেতে বসে থাকে একা,
শুক্‌নো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে' ক্রমে
বয়স উঠচে জমে'।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ ;
সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবস রাত্রি কালো মেয়েটিরে।

সাম্‌নে-বাড়ির নীচের তলায় আমি থাকি "মেস্"-এ :
বহুকষ্টে শেষে
কলেজেতে পার হয়েচি একটা পরীক্ষায় ।
আর কি চলা যায়
এমন করে' এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে ?
দুই বেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েছি আধ্-পেটা ।
ভিক্ষা করা সেটা
সইত না একবারে,
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাৎ পক্ষে, আধা মাইনেয়, ভর্ত্তি হবার জন্যে ।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবী,
মনে ছিল ধন-মানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে ।
আজ্‌কে দেখি নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে ।
মনে হচ্চে ময়না-পাখীর খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায় ;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা ?
কোথায় মুক্ত অরণ্যানি, কোথায় মত্ত বাদল মেঘের ভেরী ?
এ কি বাঁধন রাখ্‌ল আমায় ঘেরি ?
ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে ।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোষে শুয়ে পড়ি ধপাস্ করে' ।
হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে,—
মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো-মেয়ে নন্দরাণী ।
মনে হয় যে রোদের পরে বৃষ্টিভরা থম্‌কে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরাণ জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে ।
আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা ;—
ও যেন জুঁই-ফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে ।
লাজুক ভীরু ঝরণখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি ।
রাত-জাগা এক পাখী,
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি ।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা ।

রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে ।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
একলা থাকি "মেস্"-এ ।
সকাল সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা' ছিল মনে ।
ঐ যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরাণী
যেমনতর ওর ভাঙা ঐ জান্‌লাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশাহারা ;
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলসভরে ;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী :
তেম্‌নি আমার বাঁশের বাঁশি আপনা-ভোলা,
চারদিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জান্‌লা খোলা ।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান ।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা ।
যে কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠল ফুটে বাঁশির মুখে ।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই-পাওয়া ।
(সবুজপত্র, আষাঢ়) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

—

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুন্‌তে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে ।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে চল্‌ছিল সাবধানী ।

আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে ।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখ্‌তে গেলেম ছুটে ।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেচে বাতাসেতে ।
শুধাই তারে, "কি হয়েছে বামি ?"
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি ।"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে
আমার বামীর মতই যেন অম্‌নি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চল্‌চে ধীরে ধীরে ।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি'
আকাশ ভরে' উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি !"
(ভারতী, শ্রাবণ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সমবায়

সকল দেশেই গরীব বেশী, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরীব বলিব? এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরীবের পক্ষে রোজ্গার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরীব ধনী হইবার ভরসা রাখে, সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের ভরসার অভাব। তাই যখন আমরা পেটের জ্বালায় মরি তখন কপালের দোষ দিই; বিধাতা কিম্বা মানুষ যদি বাহির হইতে দয়া করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব, এই বলিয়া ধূলার উপর আধমরা হইয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের নিজের হাতে যে কোন উপায় আছে এ কথা ভাবিতেও পারি না।

এই জন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে; শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে, হীন হইয়া থাকিবে;—এটা কখনই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেক স্থলেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দ্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই এমন কথা মনে করাই মানুষের ধর্ম্ম নয়। মানুষের ধর্ম্ম জয় করিবার ধর্ম্ম, হার মানিবার ধর্ম্ম নয়। মানুষ যেখানে আপনার সেই ধর্ম্ম ভুলিয়াছে, সেইখানেই সে আপনার দুর্দ্দশাকে চিরদিনের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ দুঃখ পায় দুঃখকে মানিয়া লইবার জন্য নয়, কিন্তু নূতন শক্তিতে নূতন নূতন রাস্তা বাহির করিবার জন্য। এমনি করিয়াই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে। যদি কোন দেশে এমন দেখা যায় যে, সেখানে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ অচল হইয়া পড়িয়া দৈবের পথ তাকাইয়া আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মানুষ সে দেশে মানুষের হিসাবে খাটো হইয়া গেছে।

মানুষ খাটো হয় কোথায়? যেখানে সে দশজনের সঙ্গে ভাল করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরে মিলিয়া যে-মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা মানুষ টুক্‌রা মাত্র। এটা ত দেখা গেছে, ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা-মানুষের নিজের দুর্ব্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়াকার কথাই এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছাড়াছাড়া হইয়া আছি। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিদ্যা বল, টাকা বল, প্রতাপ বল, ধর্ম্ম বল, মানুষের যা কিছু দামী এবং বড়, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি-জমিতে ফসল হয় না, কেননা তাহা আঁট বাঁধে না, তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতাপচা প্রভৃতি এমন কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটা হয়। মানুষেরও ঠিক তাই, তাদের মধ্যে ফাঁক বেশী হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না-থাকার মত হয়।

মানুষ যে পরস্পর মিলিয়া তবে সত্য মানুষ হইয়াছে তার গোড়াকার একটা কথা বিচার করিয়া দেখা যাক। মানুষ কথা বলে, মানুষের ভাষা আছে। জন্তুর ভাষা নাই। মানুষের এই ভাষার ফলটা কি? যে মনটা আমার নিজের মধ্যে বাঁধা সেই মনটাকে অন্যের মনের সঙ্গে ভাষার যোগে মিলাইয়া দিতে পারি। কথা-কওয়ার জোরে আমার মন দশজনের হয়, দশজনের মন আমার হয়। ইহাতেই মানুষ অনেকে মিলিয়া ভাবিতে পারে। তার ভাবনা বড় হইয়া উঠে। এই বড় ভাবনার ঐশ্বর্য্যেই মানুষের মনের গরীবয়ানা ঘুচিয়াছে।

তারপরে মানুষ যখন এই ভাষাকে অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে শিখিল, তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যোগ আরো অনেক বড় হইয়া উঠিল। কেন না মুখের কথা বেশী দূর পৌঁছায় না। মুখের কথা ক্রমে মানুষ ভুলিয়া যায়; মুখে মুখে এক কথা আর হইয়া উঠে। কিন্তু লেখার কথা সাগর পর্ব্বত পার হইয়া যায়, অথচ তার বদল হয় না। এমনি করিয়া যত বেশী মানুষের মনের যোগ হয়, তার ভাবনাও তত বড় হইয়া উঠে; তখন প্রত্যেক মানুষ হাজার হাজার মানুষের ভাবনার সামগ্রী লাভ করে। ইহাতেই তার মন ধনী হয়।

শুধু তাই নয়, অক্ষরে লেখা ভাষায় মানুষের মনের যোগ সজীব মানুষকেও ছাড়াইয়া যায়, যে মানুষ হাজার বছর আগে জন্মিয়াছিল তার মনের সঙ্গে আর আজকের দিনের আমার মনের আড়াল ঘুচিয়া যায়। এত বড় মনের যোগে তবে মানুষ যাকে বলে সভ্যতা তাই ঘটিয়াছে। সভ্যতা কি? আর কিছু নয়, যে অবস্থায় মানুষের এমন একটি যোগের ক্ষেত্র তৈরী হয় যেখানে প্রতি মানুষের শক্তি সকল মানুষকে শক্তি দেয় এবং সকল মানুষের শক্তি প্রতি মানুষকে শক্তিমান করিয়া তোলে।

আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরীব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি। ভারে যখন ভাঙিয়া পড়ি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জো থাকে না। য়ুরোপে যখন প্রথম আগুনের কল বাহির হইল তখন অনেক লোক যারা হাতচালাইয়া কাজ করিত তারা বেকার হইয়া পড়িল। কলের সঙ্গে শুধু-হাতে মানুষ লড়িবে কি করিয়া? য়ুরোপে মানুষ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না। সেখানে একের জন্য অন্যে ভাবিতে শিখিয়াছে; সে দেশে কোথাও ভাবনার কোন কারণ ঘটিলেই সেই ভাবনার দায় অনেকে মিলিয়া মাথা পাতিয়া লয়। তাই বেকার কারিগরদের জন্য সেখানে মানুষ ভাবিতে বসিয়া গেল। বড় বড় মূলধন নহিলে ত কল চলে না; তবে যার মূলধন নাই সে কি কেবল কারখানায় সস্তা মাহিনায় মজুরী করিয়াই মরিবে, এবং মজুরী না জুটিলে নিরুপায়ে না খাইয়া শুকাইতে থাকিবে? যেখানে সভ্যতার জোর আছে, প্রাণ আছে, সেখানে, দেশের কোন একদল লোক উপবাসে মরিবে, বা দুর্গতিতে তলাইয়া যাইবে, ইহা মানুষ সহ্য করিতে পারে না,—কেননা মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগে সকলের ভাল হওয়া ইহাই সভ্যতার প্রাণ। এই জন্যে য়ুরোপে যাঁরা কেবল গরীবদের জন্য ভাবিতে লাগিলেন তাঁরা এই বুঝিলেন, যে, যারা একলার দায় একলাই বহিয়া বেড়ায় তাদের লক্ষ্মীশ্রী কোনো উপায়েই হইতে পারে না, অনেক গরীব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকের ভাবনার যোগ ঘটিয়া সভ্য মানুষের ভাবনা বড় হইয়াছে। তেমনি অনেকের কাজের যোগ ঘটিলে কাজ আপনিই বড় হইয়া উঠিতে পারে। গরীবের সঙ্গতিলাভের উপায় এই যে মিলনের রাস্তা, য়ুরোপে ইহা ক্রমেই চওড়া হইতেছে। আমার বিশ্বাস এই রাস্তাই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় উপার্জ্জনের রাস্তা হইবে।

আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় পাঁচ ছয় মাইল ধরিয়া ক্ষেতের পরে ক্ষেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এই-সব জমি চাষ করে। কারো বা দুই বিঘা জমি, কারো বা চার, কারো বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকা বাঁকা। এই জমির যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয়, হালের গরু কোথাও বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও বা যথেষ্টর চেয়ে বেশী, কোথাও বা তার চেয়ে কম। চাষার অবস্থার গতিকে কোথাও বা চাষ যথাসময়ে আরম্ভ হয়, কোথাও সময় বহিয়া যায়। তার পরে আঁকা-

বাঁকা সীমানায় হাল বারবার ঘুরাইয়া লইতে গোরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়। যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোট জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে ঘরে গোলায় তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীর ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরী আছে, প্রত্যেক গৃহস্থের স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয়, এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও একজায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার বড় মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতেই সে বেশী মুনফা করিতে পারে, খুচরো খুচরো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় এবং অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

যত অল্প সময়ে যে যত বেশী কাজ করিতে পারে, তারই জিত। এই জন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়া কাজ করে। হাতিয়ার মানুষের একটা হাতকে পাঁচ-দশটা হাতের সমান করিয়া তোলে। যে অসভ্য শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাষ করে, তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। চাষবাস, কাপড়বোনা, বোঝাবহা, চলাফেরা, তেল বাহির করা, চিনি তৈরি করা, প্রভৃতি সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। লাঙ্গল, তাঁত, গোরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঘানি প্রভৃতি সমস্তই মানুষের সময়ের পরিমাণ কমাইয়া কাজের পরিমাণ বাড়াইয়াছে। ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে, নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশী তফাৎ থাকিত না।

এইরূপে হাতের সঙ্গে হাতিয়ারে মিলিয়া আমাদের কাজ চলিতে-ছিল। এমন সময় বাষ্প ও বিদ্যুতের যোগে এখনকার কালের কলকারখানার সৃষ্টি হইল। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু-হাতকে হার মানিতে হইয়াছে তেমনি কলের কাছে আজ শুধু-হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল। ইহা লইয়া যতই কান্নাকাটি করি, কপাল চাপড়াইয়া মরি, ইহার আর উপায় নাই।

এ কথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কিন্তু এসব কথা পরের কারখানাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবা যায় না। নিজে হাতে-কলমে ব্যবহার করিলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়। য়ুরোপ-আমেরিকার সকল চাষীই এই পথেই শুরু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার সুবিধা কি, তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়। ভালো করিয়া চাষ দিবার জন্য অনেক সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন বৃষ্টি আসিল, সেদিন অনেক কষ্টে হাল লাঙ্গলে অল্প জমিতে অল্প একটু আঁচড় দেওয়া হইল। ইহার পরে দীর্ঘকাল যদি ভালো বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সে বৎসর নাবী বুনানি হইয়া বর্ষার জলে হয়ত কাঁচা ফসল তলাইয়া যায়। তার পরে ফসল কাটিবার সময় দুর্গতি ঘটে। কাটিবার লোক কম, বাহির হইতে মজুরের আমদানী হয়। কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি আসিলে কাটা ফসল মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে। কলের লাঙ্গল, কলের ফসল-কাটা-যন্ত্র থাকিলে সুযোগমাত্রকে অবিলম্বে ও পুরাপুরি আদায় করিয়া লওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চাষ সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বাঁচে।

কিন্তু কল চালাইতে হইলে জমি বেশী এবং অর্থ বেশী চাই। অতএব গোড়াতেই যদি এই কথা বলিয়া আশা ছাড়িয়া বসিয়া থাকি যে, আমাদের গরীব চাষীদের পক্ষে ইহা অসম্ভব, তাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, আজ এই কলের যুগে আমাদের চাষী ও অন্যান্য কারীগরকে পিছন হটিতে হটিতে মস্ত একটা মরণের গর্ত্তে গিয়া পড়িতে হইবে।

যাহাদের মনে ভরসা নাই তাহারা এমন কথাই বলে, এবং এম্‌নি করিয়াই মরে। তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া সেবাশুশ্রূষা করিয়া কেহ বাঁচাইতে পারে না। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে, তাহা পঞ্চাশজনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশজনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল লাঙ্গল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরীব হইয়াও বড় মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়্‌তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যবসা করিতে পারে না। কিন্তু একশো দেড়শো চাষী আপন বাড়্‌তি দুধ একত্র করিলে মাখন-তোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি ছোট-ছোট দেশে সাধারণ লোকে এই-রূপে জোট বাঁধিয়া মাখন পনির ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। এই-সকল ব্যবসায়ের যোগে সেখানকার সামান্য চাষী ও সামান্য গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে। এম্‌নি করিয়া শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় সে বড় হইয়াছে। এমনি করিয়া অনেক গৃহস্থ, অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার যে উপায়, তাহাকেই য়ুরোপে আজকাল কো-অপারেটিভ্ প্রণালী এবং বাংলায় সমবায় নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয় এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড় হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়, ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক এক জায়গাতেই বড় হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড় টাকার আওতায় ছোট শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায় প্রণালীতে, চাতুরী কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে, পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড় হইতে চাহিবে না, মিলিয়া বড় হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে, তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ঙ্কর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ হইয়া সহায় হইয়া মিলিতে পারিবে।

আজ আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকে দেশের কাজ করিবার জন্য আগ্রহ বোধ করেন। কোন্ কাজটা বিশেষ দরকারী এ প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। অনেকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দেশের কাজ করিতে চান। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া আগুন নেবানোর চেষ্টা যেমন, ইহাও তেমনি। আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই, তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের

সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া। বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং এক-ঘরে হইয়া আছে, তাহাদিগকে সর্ব্ব-মানবের জাতে তুলিয়া গৌরব দিতে হইবে, ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড়-মানুষ করিতে হইবে। আর এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া। বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাংসারিক দিকে তাহারা দুর্ব্বল ও একঘরে হইয়া আছে। এখানেও তাহাদিগকে মানুষের বড় সংসারের মহাপ্রাঙ্গণে ডাক দিয়া আনিতে হইবে, অর্থের দিকে তাহাদিগকে বড়মানুষ করিতে হইবে। অর্থাৎ শিকড়ের দ্বারা যাহাতে মাটির দিকে তাহারা প্রশস্ত অধিকার পায় এবং ডালপালার দ্বারা বাতাস ও আলোকের দিকে তাহারা পরিপূর্ণ-রূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহাই করা চাই। তাহার পরে ফলফুল আপনিই ফলিতে থাকিবে, কাহাকেও সে জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে না।

(ভাণ্ডার, শ্রাবণ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

তরুলতার আত্মকথা

আমরা চিরকালই তোমাদের চারিদিক সবুজ করিয়া রহিয়াছি। মানুষ কেন, কোনও প্রকার জীবজন্তু পৃথিবীতে জন্মানর পূর্ব্ব হইতে আমরা পৃথিবীতে বাস করিতেছি। তোমরা যাহাকে কয়লা বল, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মৃতদেহ; কালের গতি, মাটির চাপ, পৃথিবীর উষ্ণতা, ইহারাই তাহাদের নশ্বর সবুজ দেহ অঙ্গারময় করিয়া ফেলিয়াছে।

আজীবন আমরা তোমাদের যে কত উপকার করি তাহা নিজ মুখে প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। আমাদের বীজ, পাতা, ডাঁটা, ছাল, শিকড়, পাতা, ফল প্রভৃতি তোমাদের খাদ্য। ছাল, শিকড়, পাতা, ফল প্রভৃতি হইতে ঔষধ তৈয়ারী হয়। তোমাদের বিবাহ-বাসরে প্রেমিকের মিলনে, দেব-আরাধনায়, রাজসভাতেও তোমরা আমাদের ভুলিতে পার না। আমাদের দেহ হইতে প্রস্তুত বস্ত্রে তোমরা লজ্জা-নিবারণ কর। রন্ধনের ইন্ধন, বন্ধনের রজ্জু, দারুময় গৃহসজ্জা এ সবই আমরা জোগাইয়া থাকি।

আমরাও সুখে, দুঃখে, অত্যাচারে, অনাদরে ঠিক তোমাদের মতই বিচলিত হইয়া পড়ি।

আমাদের সমাজ খুবই বড়, এতই বড় যে, তোমরা ধারণাই করিতে পার না। অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, নিবিড় তিমিরময় সাগরগর্ভ, বারিহীন মরু-উদ্যান, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ধরিত্রী-বক্ষ সর্ব্বত্রই আমাদের বাসস্থান।

আমাদের সমাজে যাহাদের বিবাহ-পদ্ধতি যত উন্নত তাহাদেরই আমরা তত বড় বলিয়া থাকি। যে-সব তরুলতার ফুল ধরে তাহারা আমাদের সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এ জাতিটিকে Phanero-gam (Phanero=প্রকাশ্য, gam=বিবাহ) বলিয়া থাকেন। যাহাদের ফুল হয় না, তাহাদের নাম দিয়াছে cryptogam (cryptos=গুপ্ত, gamos=বিবাহ)।

আম, কাঁঠাল, ধান, গম, ছোলা, সরিষা, নারিকেল, তাল, বেল,—ইহাদের বিবাহ প্রকাশ্যে হয়, অর্থাৎ ফুল ধরে। এই জন্য ইহারা উচ্চ শ্রেণীর গাছ। ইহাদের আবার মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ছোলা, মটর, কলাই মসুরি, খেঁসারী, সরিষা, তেঁতুল, প্রভৃতি জলে ভিজাইয়া রাখিলে বা যাঁতায় ভাঙ্গিলে প্রত্যেক বীজটি দুই ভাগ হইয়া যায়, কারণ বীজগুলিতে দুইটি করিয়া 'বীজদল' থাকে। এই জন্য ইহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। গম, যব, ধান, ভুট্টা, সুপারী, প্রভৃতির বীজে একটি করিয়া 'বীজদল' আছে। এই জন্য ইহারা অপর এক শ্রেণীভুক্ত। যাহাদের দুইটি করিয়া বীজদল—তাহাদের 'দ্বি-বীজদল' তরু এবং যাহাদের একটি করিয়া বীজদল তাহাদের 'এক-বীজদল' তরু বলা হয়।

তোমরা রাস্তার ধারে ঢেঁকীর গাছ দেখিয়াছ নিশ্চয়। ড্রেনের ধারে পুরাতন দেয়ালের পাশে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এই গাছগুলি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গাছগুলি ছোট ছোট। লতাগুলি যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতেছে। পাতার অগ্রভাগ শুঁড়ের মত জড়ান। এই গাছগুলি অপুষ্পক, অর্থাৎ ইহাদের ফুল ধরে না। তাহা বলিয়া যেন মনে করিও না এদের বীজ হয় না। একটি পাতা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে পাতার তলের পিঠে সারি সারি কাল কাল কি আছে। এগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ বীজ তৈয়ারী হয়। বীজগুলি এত ছোট যে অণুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন দেখা যায় না; কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর।

বর্ষার পর প্রাচীরের উপর সবুজ মখমলের মত কি একটা জন্মায় তোমরা সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছ। ঐ সবুজ মখমল আর কিছুই নহে কেবল অনেকগুলি ছোট-ছোট গাছ পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া ধরিয়া আছে। এরাও অপুষ্পক। এদের ফুল ধরে না বটে, কিন্তু ঘটের মত চেহারার একটি থলের মধ্যে খুব ছোট-ছোট বীজ থাকে। ঘটগুলা ভারী চমৎকার। তাহাতে একটি ঢাকনীও আছে। বীজগুলি পাকিলে ঢাকনীটি খুলিয়া যায় এবং বীজগুলি ঝরিয়া পড়ে।

এই দুই শ্রেণী ছাড়া আরও তিন শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে যাহাদের ফুল হয় না।

উঠানে সবুজ রংএর কি এক রকম জমে তাহা সকলে দেখিয়াছ। তাহাদের তোমরা ছ্যাৎলা বল। তাহাতে উঠান ভারী পিছল হয়। এগুলি অতি ক্ষুদ্র সুতার মত উদ্ভিদ; শিকড়ও নাই, পাতাও নাই। সুতাগুলি জড়াজড়ি করিয়া জমাট বাঁধিয়া থাকে। কখন কখন কোন-ক্রমে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেলে প্রত্যেক ছেঁড়া অংশ হইতে একটি একটি নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে। কখনও আবার দুইটি সুতার মত উদ্ভিদ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে একটিতে পুরুষ অঙ্গ ও অপরটিতে স্ত্রী-অঙ্গ গঠিত হয় এবং উভয়ের সংযোগ হইলে পর একটি গোলাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। অবশ্য ইহা অণুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন দেখা যায় না। এই গোলাকার পদার্থের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বীজ থাকে, সেই বীজ হইতে পুনরায় নূতন উদ্ভিদ জন্মায়। এই শ্রেণীর উদ্ভিদ পুরাতন পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের উপর প্রচুর দেখিতে পাইবে। এই শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে ইহাদের শিকড় বা পাতা কিছুই নাই, ফুল ত ধরেই না। রং সবুজ; তবে কখনও লোহিত বা বাদামী রংও হয়। ইহাদিগকে algae (আল্‌গি) বলে। লোহিত ও বাদামী রংয়ের আল্‌গি সমুদ্রেই পাওয়া যায়। পুরাতন পুষ্করিণীর জলে একপ্রকার সবুজ আল্‌গি জন্মিয়া থাকে। দেখিতে সেইগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র। সেগুলির জন্য জল সবুজ দেখায়। এরূপ জল বাল্‌তি করিয়া রাখিলে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

তোমরা শুনিয়া থাকিবে লোহিত সাগরের জল লাল। এ জলে একপ্রকার লোহিত আল্‌গি জন্মায়। এই জন্য জল রক্তবর্ণ ধারণ করে। অনেক আল্‌গি জলের মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারে। এজন্য তাহাদের দুইটি বা ততোধিক অতি সূক্ষ্ম শুঁয়ো আছে। ইহাদের শারীরিক যন্ত্রের মধ্যে এমনই একটা ব্যবস্থা আছে যে তাহারা আলোর দিকে ছুটিয়া চলে, কিন্তু খুব তীব্র আলোক হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে।

আর এক শ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদ আছে তাদের ফাংগাস বলে। তোমরা ব্যাংয়ের ছাতা দেখিয়াছ নিশ্চয়। পচা গোবরের ঢিপিতে বা সাঁৎসেতে গাছের তলায় প্রায়ই দেখিতে পাবে। ফাংগাস নানা জাতীয়। বর্ষাকালে ভিজা জুতা ঘরে রাখিয়া দিলে সাদা সাদা ছাতা পড়ে। এক টুকরা ভিজা পাঁউরুটী কয়েক দিনের মধ্যে সাদা ছাতায় ঢাকিয়া যায়। আমসত্ব, জ্যাম, আমচুর প্রভৃতিতেও ছাতা ধরিয়া যায় তা ত দেখিতে পাও। এরা সবই ফাংগাস। খেজুরের রস কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে মাতিয়া যায়, কলসীর মুখে ফেনা জমে। তখন তাহা দুর্গন্ধযুক্ত তাড়িতে পরিণত হয়। এক ফোটা তাড়ি অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলে দেখিতে পাইবে হাজার হাজার ছোট ছোট গোলাকার ফাংগাসে পরিপূর্ণ। এ ফাংগাসগুলির নাম 'স্যকোরো মাইসিস'। চলিত কথায় ইংরেজিতে 'ইষ্ট্‌' বলে। চিনির সরবতের মধ্যে একটু ইষ্ট্‌ দিয়া কয়েকদিন রাখিয়া দিলে মদ প্রস্তুত হয়। সব দেশেই মদ তৈয়ারী করিবার প্রথা মোটামুটি ইহাই। তাহা হইলে দেখিতেছ ইষ্ট্‌ কি ভয়ানক উদ্ভিদ। এত সূক্ষ্ম শরীর লইয়া চিনির মত সুমিষ্ট জিনিস থেকে মদ তৈয়ারী করিয়া ফেলিতেছে।

(যমুনা, শ্রাবণ) শ্রীঅনাদিকান্ত সান্যাল।

নব-যৌবন

ওরে নব-যৌবন বেঁধেছে আমায় বাহুর ডোরে,
নিবিড় ক'রে।
অঙ্গে অঙ্গে উথলে পুলক,
সকলি মধুর হেরে দুটি চোখ!
অন্তরে পশে অচেনা আলোক
আঁধার হ'রে।
মধু-যৌবন মধুতে দিয়েছে
পরাণ ভ'রে।

ওই আসে দুরন্ত! ভাদরের ভরা নদীর মত
অব্যাহত!
মহা-উচ্ছ্বাসে ভাঙে দুই কূল,
ডোবায়ে ভাসায়ে করিছে আকুল!
তবুও ফোটায় কত ফলফুল
অনবরত!
এল দুর্দ্দম! ক্ষ্যাপা যৌবন!
অসংযত!

আজি পরাণের মাঝে কি মহোৎসব, কী উল্লাস
করিছে বাস।
প্রেম-অঞ্জন লেগেছে নয়নে,
অজানা-সুখের সাড়া লাগে মনে,
জমিয়া উঠিছে মনের গোপনে
বিপুল আশ।
আজিকে পবন ফেলিছে কেবলি
সুরভি শ্বাস!

তবে এস সুন্দর! ভরে দাও মোর পরাণ মন,
হে যৌবন!
অন্তর-মাঝে তান দাও পুরে,
বাজুক তন্ত্রী বিচিত্র সুরে,
আকাশে বাতাসে উঠুক মধুরে
সে গুঞ্জন!
এস প্রাণে ওগো জীবনের মহা
শুভক্ষণ!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

জবানবন্দি

(গল্প)

ভাই নলু,

রমাদির ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যেরকম ঘোঁট পাকিয়েছিলুম, তাঁকে অপ্রস্তুতে ফেল্‌বার কোনো সুযোগকেই যে আমরা হেলা করি নি, সেই-সব কথা আজ তাঁর ইহলোক থেকে অপসরণের পর আমার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বস্‌ছে। তাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে ত কিছুতেই পার্‌ছি নে, তাই আজ তোর কাছে মনের ভারের ভাগ দিতে এসেছি।

বুড়ো হৃদয়-জেঠামশাই যখন বৃদ্ধবয়সের একমাত্র অবলম্বন কন্যাটিকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে রইলেন, তখন বাবা, মাকে আর আমাকে নিয়ে, তাঁর কাছে চলে গেলেন। আমি রমাদির পরিত্যক্ত জিনিসগুলো গোছগাছ করতে

গিয়ে একখানা খাতা পেলুম, তার থেকে কিছু আজ তোকে তুলে দিচ্ছি—পড়েই বুঝ্‌বি বিচারকের আসনে কিছু না জেনে শুনে হঠাৎ বসে পড়লে বিচার-বিভ্রাট কি রকম ভয়ানক ভাবে প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে। আজ আমার কেবল মনে হচ্ছে মানুষ মানুষকে এই রকম করে বিচার কর্‌বার কে, যেরকম করে আমরা এই মেয়েটিকে বিচার করেছিলুম? এমন কি গুরু অপরাধ তিনি করেছিলেন যে আমরা বোর্ডিং সুদ্ধ লোক তাঁর উপর এতদূর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলুম যে তাঁকে বোর্ডিং-ছাড়া হতে হল? শুধু তাই নয়, মানুষের বিদ্রূপবাণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তাঁকে মরণের আশ্রয় চাইতে হল? আজ আমরা দণ্ডিতার জবানবন্দি পাচ্ছি; কিন্তু কত পরে ভাই, কত পরে?

* * *

১১ই আগষ্ট ১৯১৫

বাড়ী এসেই আজ শুন্‌লাম যে বাবার চা-এর মজ্‌লিসে আজ র-বাবু ত আস্‌বেনই, নি-ও নাকি আস্‌ছেন! তাঁর সঙ্গে অনেক দিন পরে আজ দেখা হবে। বিলাত থেকে তিনি কেমন হয়ে এসেছেন জান্‌বার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল। ছোট্টবেলা থেকে তাঁকে জানি, কিন্তু মাঝেকার এই ব্যবধানটা আমাদেরকে দূরে ফেলেছে কি না জান্‌তে ইচ্ছা হল। নি— কিন্তু এসে এমন ব্যবহার কর্‌লেন যেন এই সবে কাল তাঁতে আমাতে বিচ্ছেদ হয়েছিল—মাঝেকার এ পাঁচবচ্ছর যেন কিছুই নয়। আমরা খুবই গল্প কর্‌ছিলাম, নি-র সেই অফুরন্ত হাসি সমানভাবেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছিল—মজার মজার গল্পে আসরটা জমেছিল বেশ। র-বাবু ছিলেন অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে। একটা উচ্চরোল হাসির মধ্যে হঠাৎ তিনি আমায় বল্‌লেন "রমা, এত জোরে হাসি তোমাদের শোভা পায় না। আর সমস্তক্ষণ হাসিঠাট্টাই বা কি রকম! গাম্ভীর্য্য জীবনে বড্ড দর্‌কার। তুমি একটা উঁচু ধরণের গান কর ত!"

আমি অবিশ্যি গান কর্‌লাম না।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

আজ চাএর সময় কথা উঠ্‌ল আমি বি-এ পাশ করে কি কর্‌ব! আমি ওকালতী শিখ্‌ব বলাতে র-বাবুর ভুরু আকাশে উঠ্‌ল। তিনি বল্‌লেন "ছিঃ রমা! তুমি এরকম স্ত্রী-জনোচিত যা নয় তা কখনই কর্‌বে না!"

র-বাবুর এই নরম নরম কথা আমার মোটে ভাল লাগে না। মনের যেন কোনও জোর নেই। এর মধ্যে নি— বাধিয়ে বস্‌লেন গণ্ডগোল। তিনি বল্‌লেন "কিছু ভয় নেই আপনার। ওকালতী শিখ্‌লে পরে আপনার নারীত্ব হারাবেন এ আশঙ্কা কর্‌বার কারণ কিছু নেই।" র-বাবুতে আর নি-তে তুমুল তর্ক হল। নি— এমন মিষ্টি মিষ্টি Sarcasm ছাড়্‌লেন যে কি বল্‌ব—র-বাবুকে হার্‌তেই হল। তিনি ত খুবই রেগে চুপ হয়ে গেলেন। নি— বিদায় নিয়ে চলে গেলে বল্‌লেন "ছেলেটি অত্যন্ত ফাজিল। গাম্ভীর্য্য একেবারেই নেই।"

গাম্ভীর্য্যের জ্বালায় গেলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর

আজ র-বাবু আমার জন্যে দুখানা চক্‌চকে বাঁধানো ইংরেজী বই এনেছেন। নাম দেখেই পড়্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না, একটার নাম With the Saints in Heaven, আরেকটা Get Thee Gone, Satan! বই দুটো দিয়ে বল্‌লেন "তোমার মানসিক উন্নতি হবে বলে এই বই দুটি অনেক আশায় তোমায় দিলাম। তোমাকে বিপথের দিকে ঝুঁক্‌তে দেখে আমার প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হচ্ছে।"

নি-র সঙ্গে আজ নারীর অধিকার নিয়ে অনেক কথা হল। তিনি বল্‌লেন নরনারীর সমান অধিকার বল্‌তে এ বুঝায় না যে নারী পুরুষের সমস্ত অভ্যাস বা কাজ গ্রহণ কর্‌বে—ইংরেজীতে যাকে aping বলে তা কর্‌বে—তার মানে এই, নারী এবং পুরুষ যেখানে দুজনেই মানুষ সেখানে তাদের অধিকার সমান—কিন্তু নারীর বিশেষত্ব তাঁকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে চল্‌তে হবে এবং তিনি স্বভাবতঃই তেমনি চল্‌বেনই। এই বিশেষত্ব সমাজ ঠিক করে দেবে না—নরনারীর সহজ মিলন থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌বে—তাঁরা নিজেরা ঠিক করে নেবেন—সমাজ সেটা মেনে নেবে।

১৯শে অক্টোবর

নি-র এখানে আসাটা র-বাবু যেন পছন্দ কর্‌তেই পারেন না। তিনি বড্ড রেগে ওঠেন আজকাল। কিন্তু নি-র গ্রাহ্যই নাই। তবু যদি র-বাবুর মত প্রতিদিনই তিনি আস্‌তেন—তা-হলে র-বাবু ক্ষেপেই যেতেন বোধ হয়।

র-বাবু বোর্ডিংএও আজকাল খুব যাচ্ছেন। বাবার যেমন বুদ্ধি—ওঁর সঙ্গে সব সময়েই দেখা করতে পারি অনুমতি দিয়ে বসে আছেন। কি যে ওতে দেখেন!

লীলার কিন্তু ওঁকে খুব ভাল লাগে।' আমার ত ওঁকে মানসিক শুচিবায়ুগ্রস্ত বলে মনে হয়। পাপ এলো, পাপ এলো, সব দুয়ার জানালা বন্ধ করে বসে থাক! কিন্তু সেই বন্ধ করার ফলে ভগবানকেও কি বন্ধ করা হবে না? তার চেয়ে দুয়ার খুলে থেকে পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করবার চেষ্টাটাই কি বড় নয়?

২৪শে অক্টোবর

আজ র-বাবু তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি আমায় বিয়ে করতে চান—আমায়! কিন্তু আমার মন যে তাঁর ভালবাসাকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ নারাজ! সে বলছে সে সুখী হবে না, হবে না।

তার চেয়ে—

২৫শে অক্টোবর

বলেছি "না"। তবু তিনি শুনছেন না। তাঁর মত সচ্চরিত্র গুণবানকে স্বামীরূপে পেলে নারীমাত্রেই ধন্যা হবে—এই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু আমি যে ধন্যা হব না এটা তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।

তিনি বললেন "নি-র এই-সব কাণ্ড! মাথায় যত কিছু উদ্ভট কল্পনা পুরে দেওয়া! বিয়ে হলেই স্ত্রীলোকে স্বামীকে ভালবাসে। সচ্চরিত্র গুণবান স্বামী—এর চেয়ে আবার কি চাওয়া যেতে পারে? মনের মিল—একসঙ্গে থাকতে থাকতেই মনের মিল হয়ে যায়।"

আমি রেগেই বললুম "নি-র কোনো কাণ্ড নয়—আমার নিজেরই এ কাণ্ড।"

র-বাবুর মতে গল্পের বই পড়ে—বিশেষ করে আজকাল-কার লেখকদের বই পড়ে আমার এ বুদ্ধি হয়েছে। সৎগ্রন্থ-সব পাঠ না করে এ-সব পড়লে এ হবেই।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন Smiles পড়েছি কি না। বললাম, হাঁ, ছেলেবেলায়।

—আমি ওকে বিয়ে করব না—কিছুতেই না। হাঁপিয়ে তা হলে মরে যাব।

২৭শে

কিছুতেই শোনেন না যে। কি করে হাত থেকে এড়াই। কি করব কেউ যদি বলে দিত। নি— যদি আসতেন ত জিজ্ঞাসা করতুম। কিন্তু তিনিও আসেন না।

আজ লীলা তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে অনেক ঠাট্টা করল—আর তাঁতে আর র-বাবুতে তুলনা করে বলল—"আকাশ পাতাল প্রভেদ।" আমি তা স্বীকার করলাম, তবে উল্টো অর্থে।

২৩শে জুন ১৯১৭

আজ ছোটকাকার ওখানে গিয়েছিলাম। র-বাবুকে নিয়ে অনেক কথা হল। অনেকে—বিশেষ করে বয়স্কা যাঁরা তাঁরা— বলতে লাগলেন, তাঁকে আমার এমন করে ঘোরানো ভাল হচ্ছে না! আমি ঘোরাচ্ছি নাকি? আমি ত বারণই করছি, তিনি শুনছেন না কেন? মেয়ের মাদের মধ্যে কেউ যদি তাঁকে জামাই করে ফেলেন ত আমি বাঁচি! আমি ত তাই চাই। অত ভাল লোক দিয়ে আমার পোষাবে না। আমার সব সময়ে যে মনে হবে তাঁর মানসিক শুভ্রতা আমার সংস্পর্শে ময়লা হয়ে যাচ্ছে, অথবা আমি মন্দিরে সারমন শুনছি!

নি—র কথাও আজ হল। এমন ভাবে কথা ওঠে যে আমার লজ্জা করে।

লতু এসে গলা জড়িয়ে বলল "বেশ করেছিস্ ভাই, র-বাবুকে বিয়ে করবি না বলেছিস। নি-র সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয় ত বেশ হবে!" আমি হাসছি দেখে শোভনা বললে "হাসি কিসের রে! হওয়া ত সম্ভব! তোরা যে দুজনেই একেবারে—" আমি রেগে গেলাম, বললাম "কখখনো না।" শোভনা বললে "ঐ রাগেই যে রে হাঁ প্রমাণ হচ্ছে!" আমি আরো রেগে বললাম "কখখনো না! আমি জানি—অর্থাৎ আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে আমি এমন কোনো প্রমাণ পাই নি যে তিনি আমায় ভাল বাসেন।" শোভনা বললে "তুই যে দেখছি এখন থেকেই তাঁর হয়ে লড়াই করছিস্।" লতু আমার দিক নিয়ে বললে "ও যেন লড়াই করছে, শোভনা-দি; এতে নয় বুঝলে যে ওই না হয়......!—কিন্তু নি-র কথা কি করে বল, তিনি ত কোনও দিন ওকে নিয়ে ঠাট্টা করলে রাগেন না, বা ওর হয়ে লড়াইও করেন না।" আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা

কর্‌লাম "তবে কি করেন?" লতু বল্‌লে "যা করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। মিষ্টি হেসে বলেন 'ঠিক বলেছিস লতু—তুই ভিন্ন আর আমার মনের কথা এত চট্ করে কে ধর্‌বে! আর কাকে ভালবাসি বল্ ত?'"

ভাল তা হলে বাসে কি? বন্ধুর মতই দেখে বোধ হয়। ভেবে ভেবে মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল, কোন এক মুহূর্ত্তে সে পাগল হয়েই গিয়েছিল বোধ হয়, তাই গোপনে যা এতদিন রেখেছিলাম তাকে প্রকাশ করে ফেল্‌লাম। এখন অনুতাপ (?) হচ্ছে লজ্জাও অনুভব কর্‌ছি। কিন্তু চিঠিখানা লিখ্‌বার সময় ত লজ্জাবোধ একটুও করি নি! কি জানি কি উত্তর পাব? কেন এত লজ্জাবোধ হচ্ছে? এখন জানি, যদি তিনি দেখা কর্‌তে আসেন তঁর সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌ব না, মাথা তুলে মুখের দিকে চাইতে পার্‌ব না। কিন্তু এটা যে বড় সত্যি যে আমি তাঁকে চাই—পৃথিবীতে যদি কাউকেও আমি চাই ত সেই তাঁকেই। কিন্তু মেয়ে বলে এমন হবে কেন? সে কেন যা পেলে সুখী হবে তা খুলে বল্‌তে পার্‌বে না? সত্য যা, তা বল্‌তে বাধ্‌বার কারণ কি? সত্য বল্‌লে সে নির্লজ্জা আখ্যাই বা পাবে কেন? তিনি অবাক হয়ে যাবেন এবং এ ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই-ই কর্‌বেন অর্থাৎ আমার চাওটাকে গ্রাহ্য কর্‌বেন না। আমি প্রত্যাখ্যাতই হব। জানি তা। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভয়টাতে বিকল হওয়ায় লাভ কি—তার সুমুখে আশা যাক নাই বা কেন? যে পাওয়াটা নিজের কাছে সার্থক হবে জানি, সে পাওয়ার চেষ্টা করায় কি দোষ? তবে এত লজ্জা কেন?

২৪শে

সারাদিন কি ভয়ে, কি বেদনায় কাটিয়েছি। কেন এত ভয়, কেন এ গভীর বেদনা? আমার আর কি উপায় ছিল? র-বাবু যেরকম পীড়াপীড়ি লাগিয়েছিলেন; তিনি যে কোন আপত্তিই গ্রাহ্য কর্‌ছিলেন না! আর তার উপর বাবার বন্ধুবর্গের অবিশ্রান্ত চেষ্টা—আমায় ধরে বেঁধে তাঁরই ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া—যদিও তাঁর সঙ্গে আমার কোনো বিষয়েই কোনো রকমেই মেলে না।

আর বাবাকে ত আমি একরকম জানিয়েইছিলাম—কিন্তু তিনি বল্‌লেন বামন হয়ে তিনি চাঁদের আশা কর্‌বেন না। বামনের হাতের কাছে যে চক্‌চকে রঙীন বাতিগুলো এসেছে তারি একটিকে নিয়ে তিনি তৃপ্ত হতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তাতে হাতই পুড়ুক আর মনই জলুক। সারাজীবন একটা অতৃপ্তির মধ্যে বাস কর্‌তে হবে!...মনের মধ্যে এ কথাটা সর্ব্বদাই উঁকি ঝুঁকি মারে যে চাঁদকে ডাক্‌লে হয়ত সে বামনের কাছে ধরা দেবে। সেই সংশয়টার অবসান কর্‌বার জন্যেই আমি এত বড় দুঃসাহসের কাজটা করেছি। পাব না—মনে মনে জান্‌ছি বাবার কথা ঠিক—তবু ঐ যে আশা,—কুহকিনী আশা যাকে বলা হয় সে যে—আবার আশ্বাস দেয়—তাই একেবারে সব পরিষ্কার করে জেনে নিতে চেয়েছিলাম। এখন ভয়ে কাতর হচ্ছি। এখন মনে হচ্ছে কিসের আশ্বাসে এই দুরাকাঙ্ক্ষা মনে আমার জেগেছিল? তাঁর কাছ থেকে যে বন্ধুত্ব আমি পেয়েছিলাম, তাও বুঝি আজ নিজের দোষে হারালাম।

চিঠি পেলে খুল্‌তে পার্‌ব না। তার মধ্যে শুধু একটি নিদারুণ "না"।

জানি "না" লিখ্‌বেন; তবু কেন, যদি "হাঁ" লেখেন তাহলে কি কর্‌ব ভাব্‌ছি? হায় মানুষের মন! যেখানে আশা নাই, সেখানেও আশা করে। "হাঁ"—কখ্‌খনো তা হবে না। তবে কেন ভাব্‌ছি? এরকম ভাব্‌লে যখন "না" শুন্‌ব তখন কান্না কি রাখ্‌তে পার্‌ব? এখনই যে কাঁদ্‌ছি। কাঁদ্‌ছিই ত! উঃ কী বুকফাটা এ কান্না!

২৫শে

মনে হচ্ছে কত বড় একটা অপরাধ করেছি। কিন্তু এটা কি অপরাধ? একজন পুরুষ নিঃসঙ্কোচে একটি মেয়েকে বল্‌তে পারে যে সে তাকে চায়—তাতে যদি অপরাধ না হয়ে থাকে, ত একটি মেয়ে একটি পুরুষকে বল্‌লেই হবে কেন? পুরুষেরা এ নিয়ে হাসাহাসি ত করেই। আমরা মেয়েরাও করি। করি না? আজ আমিই যদি শুন্‌তাম কোনো মেয়ে এম্‌নি করেছে তা হলে আমিই কি তাকে নির্লজ্জ বল্‌তাম না? বল্‌তাম বৈ কি! সমাজের শাসন-ধারার বাইরে যে সে কাজ কর্‌ত—তাই সমাজের জীব আমরা চোখ কপালে তুলে কত কি মন্তব্যই না প্রকাশ কর্‌তাম।

আজ আমার এই যে লজ্জাবোধ, এও ত সমাজের কথা ভেবেই।

২৬শে

বুক থেকে কি এ ভার নাম্‌বে না? আমার কি রকম যে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তা বলা যায় না।

ওগো, আমার উপর দয়া কর! না, আমি তোমার দয়া চাই না।

বড় গর্ব্ব ছিল আমার, যে, আমার প্রতি তোমার একটা অনাবিল স্নেহ আছে—সেটাকে মাটি করে দিয়েছি ত?

তিনি যদি আমায় ভালবাস্‌তেন ত আমায় জানাতেন। তা যখন জানান্ নি তখন কোন্ সাহসে আমি তাঁকে লিখ্‌তে গেলাম? তিনি আমায় কি ভাবছেন?—নির্লজ্জ, বেহায়া? না, না, তিনি আমায় নির্লজ্জ ভাব্‌বেন না। তিনি কি বুঝ্‌বেন না?

সমাজ কত বড় হয়ে মনের উপর বসে থাকে—আজ তার চাপে আমি আমার মানুষের অধিকারে যে কাজ করেছি সেটা কি রকম ছোটো হয়ে আমার চোখে দেখা দিচ্ছে, যে, লজ্জায় বেদনায় কাতর হয়ে পড়্‌ছি।

ওগো নারী! তোমার নারীত্ব বজায় রাখ্‌তে হলে তোমায় কত কিছুকেই দূরে সরাতে হয়, গণ্ডী এঁকে তার ভিতর কত ভয়ে, কত সঙ্কোচে দিন কাটাতে হয়।

২৭শে

কৈ চিঠিরও ত উত্তর পেলাম না। দিন আমার কি ভাবে যাচ্ছে, কেউ বুঝ্‌ছে না। অন্তরে প্রলয় নিয়ে বাইরে বেশ শান্তমূর্ত্তিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু অন্তর আমার লজ্জায় পীড়িত হয়ে উঠ্‌ছে—বিশ্ব-সংসারের কারো মুখের দিকে সে তাকাতে পার্‌ছে না। মনে হচ্ছে যেন সবাই-ই জানে—সে নিজেকে দিতে গিয়েছিল, যেচে, সেধে, কিন্তু যাকে দিতে গেল সে নিলে না।

যে নিলে না সে কি হাস্‌ল? না, সে হাসে নি, সেও ব্যথা পেলে। আমি যে তার বন্ধুত্বের উপর আঘাত কর্‌লাম। বন্ধুত্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে তাঁর কি দুঃখ হবে?—হবে বৈ কি! নিশ্চয়ই!

শুনেছিলাম একটি মেয়ের কথা, সেও নাকি আমারি মত কাজ করেছিল। সে কি এতদূর গিয়েছিল—কিছুতেই নয়। কেউ আমার মত এতটা নির্লজ্জ হতে পারে না যে প্রত্যাখ্যাত হবে জেনে শুনে নিজেকে দিতে যায়। আমি আশার কুহকে ভুলে জোর করে যখন কল্পনা করি যে "হাঁ" বলেছেন, তখন আমার মনের পিছন থেকে বুদ্ধি বলে "দূর বোকা! জানিস্ ত যে 'না' বল্‌বেন।" আর আমার কান্না পেতে থাকে। কেউ ঘরে না থাক্‌লে বালিশে মুখ গুঁজে খুব একচোট কাঁদি।

বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে তাতে মুখ গুঁজে আস্তে আস্তে বল্‌লাম "আমি যে চাই সেটা সত্যি, কিন্তু আপনি যে চান সেটা কি সত্যি?" বলেই আমার হাসি পেল—আমি কি পাগল? নিজেই উত্তর দিলাম "না, সেটা সত্যি নয়!"

কারো পায়ের শব্দ পেলে, কেউ কাছে এলে, ভয় করে, বুঝি বা সে সেই চিঠিখানা আন্‌ছে, যেটা আমার ভাগ্যলিপি বয়ে আন্‌বে। দিনের বেলাই যেন ভূতের ভয়ে গা ছম্‌ছম্ কর্‌ছে, সন্ধ্যাবেলা কি কর্‌ব? বড্ড ভয় কর্‌ছে।

কেউ বুঝ্‌বে না যে আমার জীবনের একটা crisis যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি পড়্‌ছে—বাইরে, আর ভিতরে বালিশে মুখ গুঁজে আমি গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌ছি। মনে করেছিলাম কাঁদ্‌ব না, কিন্তু বুকের ভিতর যে অস্থির হয়ে কি যেন তোলাপাড়া কর্‌ছে।

চিঠি নেই, দেখাও নেই। একটা ছোট্ট "না" লিখ্‌তে কি সময় পান না? রাগ করেছেন কি? রাগ কর্‌বার কি আছে? আমি ত শুধু জিজ্ঞাসা করেছি আমায় নিতে পার্‌বেন কি না। "না" লিখে দিলেই ত হয়। তিনি যদি লিখ্‌তেন আমি কি তবে উত্তর দিতাম না? সে ক্ষেত্রে সমাজ বল্‌বে, ও যে পুরুষ আর তুমি নারী। পুরুষ লিখ্‌লে তুমি উত্তর দিতে বাধ্য, কিন্তু তুমি লিখ্‌লে পুরুষ সেটা গ্রাহ্য না কর্‌তে পারে; উত্তর না দেওয়াতে তার দোষ নেই। তুমি নির্লজ্জতা করেছ তার শাস্তি পাও।

নারী বল্‌লেই যত দোষ—না? কেন, সে কি আর মানুষ নয়? তাঁকে পেলে আমি সুখী হব যখন আমি জানি তখন আমার সে কথা স্বীকার করায় কি দোষ হয়েছে যে চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া যায় না? নিতে পার্‌বেন কি না জিজ্ঞাসা করেছি—নিতে হবেই এমন কথা ত বলি নি। "না" বল্‌তে কি হয়?

তিনি হয়ত আমার চিঠি পেয়ে আমোদ অনুভব করেছেন—হয়ত বিদ্রূপের বাঁকা হাসি তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠেছে।—যাক গিয়ে, আমি ত আর দেখ্‌তে যাই নি।

থাক, এসব কথা আর ভাব্‌ব না। বুকের ভিতর ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ছে যে। উঃ কী ভয়ানক কষ্ট।

২৮শে

চিঠি পেয়েছি—চিঠি পেয়েছি। আমি তাঁর প্রতি অন্যায় করেছিলাম—বিদ্রূপ তিনি এসব বিষয় নিয়ে কর্‌তে পারেন না। তাই ত আমি তাঁকে ভালবাসি—তাঁর ঐ সুন্দর মনটিকে।

আমি তাঁকে ভালবাসি—ভালবাসি।

ছোট্ট একটি "না"। কিন্তু নিষ্করুণ নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার কি সহজ, কি সরল, কি গভীর বিশ্বাস।

২৯শে

কাল সর্ব্বনাশ হয়েচে। চিঠিখানা যখন পেয়েছিলাম তখন সেই ছোট্ট "না"-টি আমায় এমন আঘাত দিয়েছিল যে মরণাহতের মত বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিলাম, মুখখানা চিঠির কাগজটারই মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। লীলা তখন ঘরে ছিল। আমি জানি না—কিছু মনে নেই—কি হয়েছিল। তবে এইটুকু জানি যে সেই বেদনার মুহূর্ত্তে আমি এমন কিছু বলেছিলাম যাতে করে সে আমার হৃদয়ের এই গোপনতম রহস্যটুকু জান্‌তে পেরেছে। তার কি অন্যায়! সে নিজে জেনেই ক্ষান্ত হয় নি, সকলকে জানিয়ে দিয়েছে! অথচ সে নিজেকে আমার বন্ধু বলেই কব্‌লাত।

সে তাঁর চিঠিখানাও পড়েছে। তার থেকে সে যতটুকু আবিষ্কার কর্‌তে পারে, তার উপর মিথ্যা এবং অতিরঞ্জনের খড়ি এবং রং লাগিয়ে সত্যটুকুকে ঢেকে-ঢুকে বিচিত্র সং সাজিয়ে সকলের সাম্‌নে তুলে ধরে আমার চারদিকে এমন একটা বিশ্রী উপহাসের কলরব তুলেছে যে কি বল্‌ব। যেখানে যাচ্ছি সেখানে বাঁকা চোখের ঠারে চাওয়া এবং ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি। যেসব মেয়েদের গায়ে যৌবনের বাতাস এসে এই সবে লেগেছে—যারা মানব-হৃদয়ের এই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে কিছুই বল্‌তে গেলে জানে না—ওঃ তাদের কি হাসির ঘটা!

আমার মরে যেতে ইচ্ছা কর্‌ছে।

১০ই জুলাই

ব্যাপার এতদূর গড়িয়ে গেল যে আমার বোর্ডিংএ থাকা হল না। গত মাসের শেষ দিন বাবা এসে দেখা করে বল্‌লেন "তুমি বাক্‌স পেঁট্‌রা গুছিয়ে নিয়ে চল। আর তোমার এখানে থেকে দর্‌কার নেই! এই জন্যেই কি তোমায় লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল? এর চেয়ে তুমি মর্‌লেই যে ছিল ভাল।" আমি মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌লাম না "মৃত্যু ত আমি আকাঙ্ক্ষা কর্‌ছি, বাবা। প্রাণ দিয়ে যে তাকেই চাচ্ছি।" নীরবে বাক্‌স জিনিস উঠিয়ে চলে এলাম। আস্‌বার সময় একটি মেয়েও দুঃখ প্রকাশ কর্‌লে না বা সান্ত্বনার বাণী বল্‌লে না। কঠোর নির্ম্মম ভাবেই তারা আমায় পরিত্যাগ কর্‌লে।

যাক্‌ গিয়ে, র-বাবুর হাত থেকে ত বেঁচেছি। তিনি এরূপ লজ্জাহীনাকে পত্নী বলে গ্রহণ কর্‌তে রাজী নন। শুন্‌ছি নাকি লীলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার কথা হচ্ছে।

* * *

বাবা যেন সমাজের প্রতিনিধি। সব সময়ে চোখ রাঙিয়েই আছেন। আমি সবই সহ্য কর্‌তে রাজী আছি, কিন্তু বাড়ীতে সমাজের মাতব্বরদের যে অবাধ মেলা বস্‌ছে এবং তাতে আমার সম্বন্ধে সব বিচিত্র মন্তব্য প্রকাশ হচ্ছে সেইটাই অসহনীয় হয়ে উঠ্‌ছে।

নবীন পিসেমশাই—যার মতটা কিন্তু অতি প্রাচীন—এসে খুব গম্ভীর ভাবেই বল্‌লেন "তুমি ত শোন না কিছু, হৃদয়নাথ। লেখাপড়া শেখালেই মেয়েরা ঐ রকম হয়ে যায়। কলেজে পড়ে মেয়েরা ভাবে তারা যেন কি হয়ে উঠেছে—'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' করে ক্ষেপে গিয়ে তারা এই রকম 'পুরুষামি'ই করে। তাই ত বলি যে মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখানো কোনো কাজের নয়।"

আমি যে নারীত্বের সীমা-রেখা পার হয়ে গেছি এটা আমি স্বীকার এখনো কর্‌তে পার্‌ছি না। তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম যে তাই করেছি—তাই বলেই কি এটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেল যে যেহেতু একটি লেখাপড়া-শেখা মেয়ে তার নারীত্বটুকু বজায় রাখ্‌তে পারে নি তাই বলেই লেখাপড়া-শেখা মেয়ে মাত্রেই তা পার্‌বে না। এটা কোন্‌ ন্যায়-শাস্ত্রে লেখে?

:৫ই

জীবনটা দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌ছে। শরীরও দিন দিন অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আজকাল হঠাৎ এত লোকের চিন্তান্বিত হয়ে ওঠ্‌বার খুব বড় একটা কারণ যে কি ঘটেছে তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। বাবাকেও কন্যাদায়গ্রস্ত বলে হঠাৎ সব্বায়ের ঠাউরে ওঠ্‌বার কারণ কি?

আমি একজনকে ভালবেসেছি এবং তাকে পাই নি—তাই বলে যাকে ভালবাসি না এবং যার মন সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ জানি না এমন একটি লোককে আমার জীবনের সঙ্গীরূপে বরণ করে নিতেই হবে এর মানেই বা কি? আমার "পাপের" (?) বুঝি এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

অনেকে আমাকে অযাচিত উপদেশও দিয়ে যাচ্ছেন। উপদেশ মাথায় তুলে নিতে আমি রাজি আছি—কিন্তু যেখানে উপদেশ আমার বুদ্ধির আয়ত্তে কিছুতেই আসে না, আর যেখানে বুঝি সেটা উপদেশচ্ছলে আমায় এবং আমারই মত আরো কয়েকটি মেয়েকে—যারা মুক্তির আনন্দটা পাবার জন্যে, প্রকৃত স্বাধীনতা পাবার জন্যে ভুলচুকের মধ্যে দিয়েও যাচ্ছে তাদেরই,—উপহাস এবং নিন্দা, তখন উপদেশটা গ্রহণ করবার জন্যে প্রাণটা উন্মুখ না হয়ে বিদ্রোহী হয়েই ওঠে।

একজনের উপদেশের বিষয় ছিল "লজ্জাই নারীর ভূষণ এবং সংযমেই মানব-জীবনের সার্থকতা।" কিন্তু তাঁর মনের কথা এই যে তিনি যে ব্যক্তিটিকে সৎপাত্র বিবেচনা করে এনে উপস্থিত করেছেন তাঁকে, আমার সঙ্গে তাঁর মনের এবং আদর্শের কোনো প্রকার মিল আছে কি না না জেনেই, গ্রহণ করা। কিন্তু সেটাই যে আমি পারছি না।

৩১শে

আমার এরকম করাটা নারীর স্বভাব-বিরুদ্ধ হয়েছে, এবং শুধু এই নয়, এতে করে আর্টের অত্যন্ত ক্ষতি করা হয়েছে।

পুরুষ এসে ভিখারীর বেশে নারীর কাছে দাঁড়াবে—আর নারী অন্নপূর্ণার মত এই ভিখারী শিবের ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করবেন। গদ্যে, পদ্যে, চিত্রে, লেখায় এ ছবি কি সুন্দর?

কিন্তু আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, নারী কি তার লজ্জার আভায় রঙিয়ে সুন্দর করে তার মনের কথাটি বল্‌তে পারে না? সেই যে পুরাণে ইতিহাসে পড়া যায়, রুক্মিণী উষা সংযুক্তা প্রভৃতি কত কন্যা লেখন পাঠিয়েছিল বীরের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে, তার মধ্যে কি এমন সৌন্দর্য্য কিছু নেই যাকে আর্ট গ্রহণ করতে পারে?

চিরন্তন নারী-স্বভাবের অনুযায়ী কাজ আমি করি নি। দুর্ব্বলতা দেখাতে সে ভালবাসে, পুরুষ তাকে জয় করে নেবে এই সে চায়। শীকার হতে সে ভালবাসে, তার জন্যে এই যে মৃগয়া সে তাতে গৌরব অনুভব করে। পাথরের যুগের নারী ঐখানেই ত আমাদের মধ্যে উঁকি মারছে।

আমি ভাল করেছি বা মন্দ করেছি এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌ছি না। সে বিচার করবার ভার আমার একার উপর নেই—কিন্তু সেটার ভার এই বিচারক পদে স্বতঃ উপবিষ্টদের উপরও যে বেশী আছে তাও আমার মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয়, সেটা বিচার করবার ভার তাঁর উপর সব চেয়ে বেশী যাঁকে জড়িয়ে এ কাজটা দাঁড়াতে পেরেছে।

যাঁরা নির্ম্মম-ভাবে আমাকে বিচার করছেন তাঁদেরকে আমি "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে" বলে যে আমার কাজের সাফাই দেবো তাও নয়। আমার ভুল হয়ে থাক্‌তে পারে—কিন্তু এই ভুলটা যে একটা ভীষণ রকমের অন্যায় তা আমি স্বীকার করছি না।

৩রা আগষ্ট

স্কুলের বন্ধুদের চিঠি দিয়েছিলাম—তারা কেউ জবাব দেয় নি। আজ লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক কড়া চিঠি পেয়েছি। তিনি মনে করেন আমি অত্যন্ত খারাপ মেয়ে, অন্য মেয়েরা আমার সংস্রবে এলে খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমার সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণার পোষকরূপে তিনি দুটি বিশেষ কারণ দিয়েছেন:—

(১ম) বিবাহের চিন্তা অত্যন্ত খারাপ চিন্তা, আমি সেই চিন্তাকে মনে স্থান দিয়েছি।

(২য়) কোনও পুরুষকে কোনও নারীর প্রেম বা ভালবাসা সম্বন্ধে কিছু বলা অত্যন্ত ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ। আমি তাও করেছি।

অতএব আমার মত পচা রসাল ফলের সঙ্গে তিনি অন্য ভাল রসালগুলিকে কিছুতেই এক জায়গায় থাক্‌তে দিতে পারেন না।

তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য।

দেওঘর, ৫ই জানুয়ারী, ১৯১৭

নিন্দা এবং অপমানের বোঝা বয়ে বয়ে দিন কেটে গেল। মরণ তার নিবিড় কালো শান্তি নিয়ে ঘিরে আস্‌ছে আমায়।

এখানে এসে আমি শান্তি পেয়েছিলাম অনেকটা। প্রকৃতি যে মানুষ নয়—সকলকেই সে শ্যামল স্নেহে বুকে তুলে নেয়।

মনে করেছিলাম বাবার স্নেহ হারিয়েছি, কিন্তু সেটা আমার ভুল হয়েছিল। যে স্নেহের পক্ষপুটের নীচে আমার জীবন বেড়ে উঠেছে—সে স্নেহ যে অপরাজেয় এবং অপরিমেয়। আজ আসন্ন-মরণ কন্যাটিকে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে তাঁর মতে আমি অন্যায় কিছু করি নি—তবে চিরাগত যে প্রথাকে অবহেলা করেছি তাকে অবহেলা না কর্‌লেই ভাল ছিল। এটা নারীর লজ্জার বিরুদ্ধে বলে এটা লোকচক্ষে শোভন হয় না এবং লোকে বড্ড ভুলও বুঝ্‌তে পারে।

আর বিচারের ভার আমি নিজে যাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম—মনে মনে, অবিশ্যি—তাঁরও বিচার কি হয়েছে, তা, বোধ হচ্ছে, জেনেছি। তাঁর বন্ধুত্ব যখন আমার উপর অটুটই আছে—তখন তাঁর স্নেহও আমি হারাই নি। তাঁর চিঠিগুলি সব কি করুণ স্নেহে ভরা আর কোথায়ও আমার ব্যবহারের উল্লেখ নেই।

তাই মরণকে আজ হাসিমুখেই আমি বরণ কর্‌তে পার্‌ছি। যেন আমি কিছু করি নি, যাতে করে আমাদের মধ্যে র-বাবুর মত মানুষের মতে বন্ধুত্ব আর থাক্‌তে পারে না—অপরিচিতের মত হতে হয়।

* * * *

জানিনে ভাই রমাদির মন্তব্যগুলো সব ঠিক কি না। কিন্তু আমাদের এই স্বাভাবিকতা-নষ্ট-হয়-নি—নারীদের মধ্যে মিথ্যা লজ্জার ভড়ং—ইংরিজীতে যাকে false prudery বলি সেটা—যে অবাধে আপনার রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা ত কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি নে—প্রমাণ আমাদের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টটি।

একটা বিষয়ে একজন ভুল করেছে বলে যে সে আগাগোড়াই খারাপ আর তার সঙ্গ যে একদম পরিত্যাজ্য—এইটাই কি খুব ন্যায়-বিচার, তাই ভাব্‌ছি।

আজ ইচ্ছা কর্‌ছে যে রমাদির কাছে ক্ষমা চাই—কিন্তু তিনি যে আজ তার অতীত হয়ে গেছেন।

ইতি—

তোদের সুবু।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

যৌবন-বরণ

বরষের স্তরে স্তরে রাখিয়ে চরণ
অতি সঙ্গোপন
তব আগমন,
হে আমার উদ্দাম যৌবন!
কোন্ কুম্ভ হ'তে টানি পীযূষের ধারে
পলে-পলে গড়িলে তোমারে
বরষে বরষে অনুখন,
হে মোর যৌবন!
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে আপনার জীবন-মহিমা?—
আজি আচম্বিতে তাহারি গরিমা
পরাণে বয়ানে ফুটে ওঠে,
শোণিতে তড়িৎ-বেগে ছোটে!
তপস্বী শৈশব মোর কোন্ সাধনায়
জাগাল তোমায়?—
যখনি জাগিলে হৃদে প্রশান্ত সন্ন্যাসী,
উষার উদয় সম সৌম্য গরিমায় আপনা বিকাশি!

অতিথি নহ ত তুমি, ওহে পূর্ণ প্রাণ,
অন্তরে জাগায়ে অফুরান
লক্ষ দানে ভরিলে আমায়—
প্রাণে প্রেমে বিচিত্র শোভায়।
আমার শৈশব-সাথে-সাথে
এলে কিগো তুমি হাতে-হাতে
ভ'রে পূরে শতেক দীনতা,
হে যৌবন, পূর্ণ উদারতা!
আচম্বিত নহে সখা, তব আগমন,
তোমারি জীবন
আমারি জীবন সাথে-সাথে;
আমিও জাগিনু, তুমি জাগিলে আমাতে।
এমনি আমারি সবি নিয়ে তুমি গড়িলে তোমায়
অন্তরের নিভৃত গুহায়;
যা' নিলে পীযূষধারে ভরিলে সকলি,
জাগিছ আমারি মাঝে আপনা বিহ্বলি!
হে যৌবন, আশৈশব হে সখা আমার,
ঢেলে দিলে আজি মোরে বিচিত্র সম্ভার;—
আমা ছাড়া কোথা তুমি খুঁজিয়া না পাই,
তুমি আমি দোঁহে সদা রহি এক ঠাঁই।
অনন্তের জীবনের মহাকুম্ভ হতে, ওহে মহীয়ান,
আন নাই তুমি তব প্রাণ;
আমারি সর্ব্বস্ব নিয়ে তোমারি জীবন,
আজি শুধু দোঁহে তাই একান্ত মিলন।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

শ্যামলী

(১১)

মহা অভিমানিনী অনিলের মাতা শিশিরের নিকটে এবং নিজেও স্বকর্ণে অনিলের বক্তব্য শুনিয়া দারুণ অভিমানে পাথরের মত জমাট হইতে লাগিলেন। ছেলে এই সামান্য ঘটনায় তাঁহার উপর যখন এতখানি অবিচার করিতেছে, যাহাকে সুখী করিবার জন্য মায়ের এ জেদ তাহা সেই যখন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবেই গ্রহণ করিতেছে তখন তাঁহারই বা কেন এত যন্ত্রণা! যাক, অনিলেরও যদি আজ মা না হইলে চলে, তাঁহারও কি চলিবে না! এতখানি বয়সে কোন্ ছেলে আর মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়ায়। আজ অনিল যদি মায়ের মনোকষ্টের উপরও তাহার নিজের কর্ত্তব্যকে এত বড় বুঝিয়া থাকে—তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সে করুক, মা আর তাহাকে কিছুই বলিবে না। বিবাহ আর না করে না করুক—সেই জন্য স্ত্রীকে আনিয়া ঘর করিতে চায় তাহাই করুক—তিনি আর অনিলের কোন কথায়ই থাকিবেন না। শুধু কথায় কেন—অনিলের সংসারেই আর তিনি থাকিবেন না—তীর্থবাসে চলিয়া যাইবেন।

মহা সোরগোলের সহিত তাঁহার তীর্থ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অনিলের কর্ণেও এ কথা প্রবেশ করিল। সে একদিন বাড়ীর সরকারকে সত্যসত্যই কতগুলা লগেজ চালান করিতে দেখিয়া বই রাখিয়া মায়ের সন্ধানে গিয়া দেখিল—মা তখন কি একটা কাজ করিতেছেন। তাঁহার রুক্ষ কেশ, শীর্ণ শরীর, বিবর্ণ মুখ দেখিয়া অনিল চম্‌কিয়া উঠিল। এই কি তাহার জগদ্ধাত্রীর মত তেজস্বিনী সদাহাস্যময়ী মা? অনিল বুঝিল কোন্ অভিমানের বেদনায় মা এমন হইয়াছেন। অপরাধীর মত অনিল তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল—'মা!'

মা চম্‌কিয়া উঠিলেন। অনিলের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র রুদ্ধ বেদনায় তাঁহার মন একেবারে উত্তেজিত হইয়া ওঠায় তিনি ত্রস্তে সেস্থান ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র অনিল দুই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মা, আমিই না হয় দোষী, সলিল ত কোন দোষ করেনি? এ সংসার কেন ছাড়ছ, তাকে কেন ছেড়ে যাচ্ছ?"

মা সবেগে পা টানিয়া লইয়া অন্য ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সংসারের জন্য, সলিলের জন্য, অনিল তাঁহাকে নিবারণ করিতে আসিয়াছে—নিজের জন্য নয়! মাকে তাহার আর কোনই দরকার নাই!

যাত্রার দিন প্রভাতে সকলে দেখিল—গৃহিণী প্রবল জ্বরে একেবারে শয্যাগতা। কয়েক দিন-রাত্রি ধরিয়া যে তিনি অনাহারে অনিদ্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ান তাহা কেহ কেহ জানিত। তাই তাহারা গৃহিণীর এই জ্বর

আসায় যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গৃহিণী কিন্তু তাহাতেও নিরস্ত হইতে চাহিলেন না,—"আসুক জ্বর, আমি যাব! শিশির ঠিক্ হয়ে এসেছে ত?" বলিয়া গৃহিণী শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিবামাত্র একটি চিরপরিচিত স্পর্শ তাঁহাকে সজোরে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বুকে মাথা রাখিয়া ডাকিল—'মা—মা!'

মার সমস্ত শরীর সবেগে নড়িয়া উঠিল, তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "শিশির শিশির, আমায় নিয়ে চ -আমায় এখ্খুন থেকে নিয়ে চ—"

"আমাকে ফেলে কোথায় যাবে মা? আমিও তা হলে তোমার সঙ্গে যাব।"

কিছুক্ষণ পরে মায়ের নিস্পন্দ ভাব বুঝিয়া উদ্বিগ্ন অনিল তাঁহার বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল উত্তেজনার আধিক্যে মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যস্ত-সমস্তে অনিল শিশিরকে ডাকিল—শিশির আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনিল উদ্বিগ্নকাতর দৃষ্টিতে কেবল মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মা যে তাঁহার অত্যন্ত অভিমানিনী। এ সংসারের এবং পুত্রদের সর্ব্ব বিষয়ে তিনিই যে সর্ব্বেশ্বরী। বিশেষ অনিলকে তিনি যে চিরদিন শিশুর মতই লালন পালন ও তাড়নাও করিয়া আসিতেছেন। এতখানি বয়স এবং শিক্ষা দীক্ষা হইলেও অনিলও তাঁহাকে ছাড়া আর কিছু জানিত না, তাই মাও তাহাকে এতকাল কোলের ছেলের মতই কোলে কোলে আঁচলের পাশে পাশে রাখিয়াছিলেন। আজ সেই মার উপরে অভিমান করিয়া অনিল যে তাঁহাকে হত্যা করিবারই উদ্যোগ করিয়া বসিয়াছে। অনিলের এই উপেক্ষা তাঁহার এতই বাজিয়াছে যে তাঁহার অন্য একটি পুত্র কাঁদিয়া অস্থির হইলেও, তাঁহার এত দিনের এত সাধের গৃহস্থালি একেবারে উচ্ছন্ন যাইবে বুঝিলেও, তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু এতবড় ধাক্কা আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। মায়ের দারুণ অভিমান এবং বিষম জেদী স্বভাবের কথা অনিল এতদিন কি বলিয়া ভুলিয়া তাঁহাকে এত ব্যথা দিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে তিনি চক্ষু মেলিতেই পুত্রের ব্যথিত ব্যগ্র দৃষ্টি মায়ের চক্ষে পড়িল। আবার তিনি চক্ষু বুজিলেন। কাতরকণ্ঠে অনিল ডাকিতে লাগিল "মা—ওমা মাগো।" এতক্ষণে মাতার সমস্ত অভিমানাগ্নির উপর যেন কোথা হইতে স্নিগ্ধধারা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া সে আগুনকে নিভাইয়া দিতে লাগিল। তাঁহারও মুদ্রিত চক্ষু হইতে হৃদয়ের সেই ধারা ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া ত্রস্তে তিনি মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। তখনো কষ্টের স্মৃতি সব ধুইয়া যায় নাই ত!

অনিল জোর করিয়া মাতার মুখের আবরণ খুলিয়া দিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইল। এইবার আর কোন বাধা রহিল না। মায়ের উষ্ণ অশ্রুস্রোতে পুত্রের মস্তক নিঃশব্দে ভিজিতে লাগিল।

পুত্রের যত্ন এবং সেবায় মাতা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অনিল কাশী যাত্রার সব মোটঘাট খুলিয়া ছড়াইয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিল—মাতা নিঃশব্দ-হাস্যে আবার সে-সব সংসারের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

সলিলকে অনিল বলিল "তুই কি কোন কর্ম্মের নস! আগে ভাব্‌তাম তুই আমার চেয়ে খুব কাজের লোক হবি! এখন দেখ্‌ছি ফুটবলে কিক্ করা ছাড়া আর তোর কিছুরই যোগ্যতা নেই। মার কাশী যাবার সাজগোছ এতদিন এম্‌নি করে ভেঙে ছড়িয়ে দিতে পারিস নি?"

"হুঁ—আমি দিলে বুঝি মা আমায় রক্ষা রাখ্‌তেন? তুমি বলে তাই হাস্‌ছেন, আমি হলে এতক্ষণ 'সলিল!' বলে এম্‌নি চোখ রাঙা কর্‌তেন যে আমি কোন্ দিকে পালাব খুঁজে পেতাম না। তার চেয়ে আমার 'প্লেগ্রাউণ্ড'ই ভাল, সেখানে যা ইচ্ছে তাই স্বচ্ছন্দে কর্‌তে পারি।"

"তা হলে সংসার দেখ্‌বি কি করে রে? বিষয়কর্ম্ম চালাবি কি করে?"

"এম্‌নি করেই। এতে বুঝি তুমি আমার বড় কম বুদ্ধি দেখ্‌লে! শিশিরদা তো আমার বুদ্ধির তারিফই কর্‌ছেন। আমি এক্ষেত্রে মাথা দিলে তোমারও হুঁস্ আস্‌ত না, মারও রাগ পড়্‌ত না, সব গোল হয়ে যেত, তা জান?"

অনিল সলজ্জে হাসিয়া বলিল "আচ্ছা আচ্ছা যা, তোর খুব বুদ্ধি বোঝা গেছে, আর বেশী বক্‌তে হবে না।"

"আচ্ছা মা-ই বলুন তো, তোমার চেয়ে আমার এক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রকাশ হয়েছে কি না,—মা, ধর্ম্মতঃ বল কিন্তু।"

মাতা হাসি চাপিয়া কৃত্রিম তাড়নার ছলে বলিলেন "আবার বক্‌ছিস—তোর না সাম্‌নে এক্‌জামিন, যা পড়্‌তে বস্‌গে, কেবল খেলা আর খেলা—"

সলিল পলাইল। সস্নেহনেত্রে গমনশীল পুত্রের পানে চাহিয়া মা বলিলেন, "সলিল হতেই যদি এ বংশের মান-সম্ভ্রম নামগাম থাকে। চিরদিন ওর ওপরই আমার যা ভরসা। ছোট থেকেই ওর সবদিকে সমান বুদ্ধি।"

অনিল কিন্তু ভাল রকমেই জানিত মায়ের এতদিন ইহা মোটেই বিশ্বাস ছিল না। এক অনিল ছাড়া এবং তাহারই বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব ভিন্ন আর তিনি এতদিন কিছুই জানিতেন না। সলিলের নামে "ও তো একফোঁটা ছেলে, ওটা তো পাগ্‌লা, ওর আবার জ্ঞানবুদ্ধি হবে কখনো"—এই রকমই বলিতেন। আজ অনিলের স্বেচ্ছাচারিতাই যে তাঁহাকে সলিলের উপরে আস্থা স্থাপন করাইতেছে তাহা বুঝিয়া অনিল মাথা নামাইল।

আবার এতদিন যেমন ছিল তেম্‌নি করিয়া অনিল মাতার অঞ্চল আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু মাতাও বুঝিলেন, ছেলেও বুঝিল, যেমনটি ছিল তেমন যেন আর হইতেছে না। কোথায় যেন একটা চিড় খাইয়া গিয়াছে, সে ফাঁক আর কোন মতেই মিলিতেছে না।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে এতখানি ফাঁক থাকিলে তো তাহাদের মাতাপুত্রের কাহারই চলিবে না। নিজের কর্ত্তব্যবোধ লইয়া অনিলের মায়ের উপর অভিমানে এত-খানি দূরে যাওয়া যে উচিত হইতেছে না তাহা অনিল ক্রমে বেশ বুঝিতেছিল। মাকে বাদ দিলে জীবনে তাহার কি থাকিবে? জগতে যে উভয়েরই আর অন্য আশ্রয় নাই। তাই অনিল একদিন কথা পাড়িল "মা, তুমি যে তীর্থে যাচ্ছিলে আমি তা নষ্ট করে দিলাম, এতে কি আমার পাপ হল না?"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন "হয়েছে বৈ কি! তোরা কি পাপ-পুণ্য মানিস?"

"একটু একটু মানি বৈ কি মা! তাই বল্‌ছিলাম চলনা তুমি আমি শিশির একবার বেরোই? তীর্থের কাছে অপরাধটাও খণ্ডন হয়, বেড়িয়ে আসাও হয়।"

মার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, বলিলেন, "তীর্থের কথা মিথ্যে বেড়াতে চাস্ তাই বল্, কিন্তু সাম্‌নে সলিলের এক্‌জামিন্, এই সময়ে তাকে একা রেখে কি করে দুজনেই যাব। তার চেয়ে তুইই যা বরং শিশিরকে নিয়ে—"

অনিল তাড়াতাড়ি কথা উল্টাইয়া লইল "বাঃ তা কি হয়? শিশিরও যে পড়া আরম্ভ করবে। জান মা, আমরা রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম! শিশির এখন আর কিছুকাল বাড়ী যাবে না বলে তাই একবার সকলের সঙ্গে দেখা কর্‌তে বাড়ী গেল যে।"

"কি করে জানব—কেউ তো বলনি আমায়! তোমাদের সব কথা এখন আমার তো জান্‌বার উপায় নেই। কোথায় গেল শিশির? শুধু নিজের বাড়ী?"

অনিল একটু অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসির সঙ্গে বলিল, "এই তো সবে আমরা পরামর্শ ঠিক কর্‌ছি মা। শিশির আগে বাড়ীই গেল—তারপরে অন্যত্রও যাবে।"

মাতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে সনিশ্বাসে বলিলেন "সে আমাকে মায়ের বেশী বলে জানে, যখনি যা বলি অম্‌নি নিজের সব ছেড়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ায়। সে শ্বশুরবাড়ী যাবে জান্‌লে তার বৌকে আমার কাছে এনে দিতে বল্‌তাম! শিশিরের বৌকে তো আমার দেখা হয়নি, সে কাজ যে আমায় কর্‌তেই হবে।"

অনিল একটু থম্‌কিয়া ভাবিয়া বলিল, "তুমি বল যদি শিশিরকে এ কথা লিখে দিতে পারি।" মুখে এ কথা বলিলেও মনে কিন্তু অনিল ইহার অনুমোদন করিতে পারিল না, কেন-না বিজলীকে দেখিলে মাতা নিশ্চয়ই দ্বিগুণ অশান্ত হইয়া উঠিবেন। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া মাতাও সবেগে বলিয়া উঠিলেন "নাঃ—আমার ওতে কাজ নেই, এ অন্ধকার পুরী এম্‌নি থাক—এখানে ওসব সাধআহ্লাদ সইবে না। সঙ্গী নেই, সাথী নেই, সে ছেলেমানুষ কোথায় আসবে!"

"আমিও তাই ভাব্‌ছি মা। আচ্ছা মা, আমাদের সলিলও তো বড় হল, তারও তো এইবার বিয়ে দিতে হবে।"

মাতা মুখ দ্বিগুণ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই অনিল তাঁহার ক্রোড়ের উপর শুইয়া পড়িল। কোলে মুখ লুকাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল "সব কথাতেই এমন করে উঠে পালাতে পাবে না তুমি।

তোমার যা বল্‌বার আছে তাও আমায় শুনতে হবে—আমার যা বল্‌বার আছে তাও তোমায় শুনতে হবে, নইলে এমন করে আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না মা।"

পুত্রের এই কাতরোক্তি মাতার প্রাণে সহসা ছুরির মতই গিয়া বিঁধিল। কি তুচ্ছ অভিমানে তিনি তাঁহার অন্তরের ধনকে এমন পর করিয়া দিতেছেন! ছেলে না হয় একটা খেয়ালই লইয়াছে, তাহার দয়ার্দ্র মন যে ছোট হইতেই এমন কত অস্বাভাবিক রকম ঝোঁক ধরে। পথে কোথায় কোন অন্ধকে, কোন আতুর ভিখারীকে কাঁদিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিয়া শিশু অনিল কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিয়াছে, আর একান্ত অসময় হইলেও মাতা পুত্রকে অন্য কোন প্রকারেই সান্ত্বনা দিতে না পারিয়া, অগত্যা সেই ভিখারীকে ভৃত্যের দ্বারা সাহায্য পাঠাইয়াছেন, তবে অনিলের সে কান্না থামিয়াছে। শীতকালে কতদিন সে গায়ের জামা বা শীতবস্ত্র শীতার্ত্ত ভিখারীকে দান করিয়া ভ্রমণ হইতে গৃহে ফিরিয়াছে। চিরকালই তো অনিলের এইসব ঝোঁক তিনি সহিয়া আসিতেছেন। আজ যদি সেই ছেলে আর-একটু বেশী কিছু ধরিয়া বসে, মায়ের কি তাহাতে এতখানি রাগ করা উচিত? এতদিন তো অবিবাহিত পুত্র লইয়াই তাঁহার দিন কাটিয়াছে,—না হয় আরও কিছুকাল এইভাবে কাটিবে, তারপরে ভগবান যা করেন। কিন্তু সে পরের কথা পরে। তাঁহার কপালে অনিলের স্ত্রীপুত্র লইয়া যদি সংসারসুখ ভোগ থাকে তবেই তো তিনি পাইবেন। কিন্তু তাহা পাইতেছেন না বলিয়া সেই ক্ষোভে কি নিজের ছেলেটি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবেন? অনিল ও সলিলকে লইয়া তাঁহার কোন দুঃখই তো এতদিন ছিল না। ইহার অপেক্ষা অধিক সুখের আশায় তিনি এ কি করিতেছেন? একটা বড় সাধের ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটায় তাঁহার মনোপ্রধান-স্বভাব পুত্রের মন যদি এখন কিছুদিন বিচলিত থাকে—সেই সময়ে মায়েরও কি উচিত সেই সন্তানকে ত্যাগ করা? তাহাকে মনস্থির করিতে কিছুদিন সময়ও কি অন্ততঃ দেওয়া মায়ের কর্ত্তব্য নয়? তাঁহার এক ইচ্ছা তো সে পালনও করিয়াছে, না হয় একটু অভিমানই করিয়াছিল, তাঁহাকে তো অমান্য করে নাই?

মাতা এইবার প্রকৃতিস্থ ভাবে বসিয়া পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কি বল্‌বি বল্ তুই। মান্‌তে না পারি—সইতে না পারি,—পার্‌ব না;—তবে কানে শুনবো এই পর্য্যন্ত।"

"আমি তো আজ কিছু বল্‌তে চাইছি না মা,—তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কেবল শুনতে চাইছি।"

"কি আমায় আর বল্‌তে বলিস্ অনিল? আমার বল্‌বার আর কি আছে?"

"তুমি যাতে সুখী হবে মা তাই আমায় বল,—তাই করাও আমায় দিয়ে।"

মাতা যাহাতে সুখী হইবেন অনিল তাহাই করিবে। কিন্তু এ কথা একবার সে ভাবিতে পারিতেছে না যে মাতার আবার স্বতন্ত্র সুখ কি? অনিলকে সুখী করিতে পারিলেই যে তাঁহার পূর্ণ সুখ! কিন্তু অনিল নিজে হইতে মাতাকে আজ স্বতন্ত্র করিয়াছে বলিয়াই তাহার এ ভ্রম হইতেছে। অভিমানিনী জননী মুখ ভার করিয়া বলিলেন "আমার সুখের জন্য তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না অনিল। তুমি যাতে ভাল থাক তাই কর।"

মাতার ক্রোড়ের মধ্যে আবার মুখ লুকাইয়া ঈষৎ রুদ্ধ-কণ্ঠ পুত্র বলিল—"আমায় মাপ কর মা,—আর অমন কথা বলো না—আমার বড় কষ্ট হচ্চে।"

জননী আবার অনুতাপিতা ও ঈষৎ যেন লজ্জিতা হইয়া অনিলের মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মায়ের সেই আদর ভোগ করিয়া অনিল আবার ডাকিল—"মা!"

মা গাঢ়স্বরে উত্তর দিলেন "অনি!"

"বল!"

"কি বল্‌ব রে?"

"কি কর্‌ব আমি।"

"আমি বল্‌লে তবে তা তুই বুঝ্‌বি?"

"হ্যাঁ মা।"

"কেন অনি! এ তো সকলেই সহজ বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পারে।"

"আমার যে বুদ্ধি কম মা, তুমি তো চিরদিনই জান।"

"তোকে সুখী করা ছাড়া আমার আবার আলাদা সুখ আছে কি কিছু?"

"আমাকে সুখী! কি রকম দেখ্‌লে আমায় তোমার সুখী বোধ হবে?"

"সকল ছেলের মা নিজের ছেলেকে যেমন দেখ্‌লে সুখ বোধ করে।"

"মা, এ কি তোমার মতন মার ঠিক কথা হচ্চে? তুমি তো আমাদের দেশের সেকালের মাদের মত জগতের কিছু জান না, তা তো নয়। কোন মা নিজের ছেলের খুব ধন হলেই ছেলে সুখী হবে মনে করে, কেউ বা ছেলেকে দশের মধ্যে একজন হয়ে সুখী দেখ্‌তে চায়। এমনি কেউ বিদ্বান, কেউ ধার্ম্মিক, কেউ জ্ঞানী ছেলে চায়। কেউ ভাবে যে আমার ছেলে দশের দুঃখ দূর করুক, আবার কেউ চায় যে তার ছেলেটি মাত্র আত্মসুখপরায়ণ হোক। সকল মার মন তো সমান নয়। তুমিই এতদিন নিজের ছেলেকে কি চেয়েছ মনে করে দ্যাখ! যাক সে কথা—আজ তুমি তোমার ছেলেকে কি রকমে সুখী দেখ্‌তে চাও মা—তাই মাত্র আমায় স্পষ্ট করে বল।"

মাতা এইবার অধোবদন হইলেন। তাঁহাকে বহুক্ষণ নিরুত্তর দেখিয়া অনিল স্নিগ্ধনেত্রে মাতার পানে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল—"মা, বল, তোমার ছেলেকে আজ কি রকম চাও তুমি?"

"বলি" বলিয়া তিনি পুত্রের চক্ষের পানে স্থিরদৃষ্টি করিয়া আবার বলিলেন—"আমি যেমন চাইব—তেম্‌নি হতে পারবি তো? ঠিক করে ভেবে দ্যাখ?"

পুত্র ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিয়া একখানি হস্তে মাতার একখানি পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ করো যেন পারি!"

পুত্রের হস্ত পায়ে ঠেকিতেই আস্তে ব্যস্তে মা "ওকি ষাট" বলিয়া হাতখানি টানিয়া সরাইয়া লইলেন এবং মুখ নত করিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন "এমন পাগলও আমি পেটে ধরেছি!"

"হ্যাঁ মা,—সেই পাগলকে আবার আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরদিনের নির্ভর তার আর না হারায়!"

মাতা অপলকনেত্রে সেই মুদ্রিতচক্ষু পুত্রের উদার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার জঠর হইতে জন্মগ্রহণের পরই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত অক্রবাণ অনিল যেমন ভাবে তাঁহার ক্রোড়ে শুইয়া থাকিত,—এই দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর সে যেমন করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকে—তেমনি মুখে তেমনি ভাবে আজও রহিয়াছে। সেই ললাটে তাহার জ্ঞানের ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রসারতা-চিহ্ন, দেবশিশু-তুল্য মুখশ্রীতে উদার উন্নত স্বভাবের পরিচয়, ওষ্ঠাধরের পার্শ্বে দয়াস্নেহের কমনীয় ভঙ্গী, বিস্তৃত বক্ষে মহৎহৃদয়ের প্রসারতা,—সেই অনিল তাঁহার সেই সন্তান—যাহার জন্য সকলে তাঁহাকে রত্নগর্ভা নাম দিয়াছে—সেই পুত্র তাঁর, আজ মায়ের তৃপ্তির জন্য নিজের উন্নতহৃদয়ের বিবেকবাণীকেও খর্ব্ব করিয়া 'মা যাহা বলেন সেই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে! আজ সে সন্তানকে তাহার মাতা কি বলিবে। মায়ের অন্তর আজ যাহা চাহিতেছে, মায়ের স্নেহের চক্ষে এবং সাধারণ ন্যায়ের চক্ষে তাহা হয়ত অকর্ত্তব্য নয়; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ পুত্রটি, যাঁহার গর্ব্বে তিনি সকলের কাছে বিশেষভাবেই গর্ব্বিত, সেই পুত্রকে আজ সাধারণের দলে ফেলিয়া তিনি কোন্ প্রাণে খর্ব্ব করিবেন? তাঁহার মাতৃত্বের গর্ব্বও কি আজ এ ছেলের কাছে তাহাতে খণ্ডিত হইবে না? ছেলে যে জানে, তাহার মা সাধারণ মায়ের মত স্নেহান্ধ মা নয়। তাহার মা জানেন, তাঁহার ছেলের তুচ্ছ সাংসারিক সুখের অপেক্ষা তাহার হৃদয়বাণী পালন করার সুখ দিলেই তাহাকে যথার্থ সুখী করা হইবে। ছেলের সুখেই মা যে সুখী হয়, অনিলের সুখ ছাড়া তাঁহার সুখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—তিনিই না এখনি অনিলকে বলিয়াছেন? কিন্তু তিনি যাহা করিতে চাহিতেছেন তাহাতে কি অনিলের হৃদয় সায় দিবে, না তাহাতে এখন সে স্বেচ্ছায় সম্মত হইবে! সত্যই যদি অনিলের সুখে তাঁহার সুখ হয় তাহা হইলে তিনি সে ছেলেকে কর্ত্তব্যহীনতার অসুখে কেন ফেলিতেছেন! এ কি তাঁহার নিজেরই স্বতন্ত্র সুখ খোঁজা হইতেছে না? ছেলের মাথা কোলে লইয়া নিজের মনের কাছে তিনি একি মিথ্যাচরণ করিতেছেন? বহুক্ষণ পরে তিনি সহসা পুত্রকে বলিলেন "তুই কিসে যথার্থ সুখী হস তাই আগে আমায় বল আজ!" ম্লান হাসিয়া অনিল বলিল "তুমি আজ তা আমায় জিজ্ঞাসা করে জান্‌বে মা?—কিন্তু সে কথা নয়, আমি যে বল্‌ছি—তুমিই আজ ঠিক্ করে দেবে কি হলে আমি সুখী হব।"

অনায়াসে তিনি এখন পুত্রকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতে পারেন! কিন্তু মায়ের মুখে এখন আর কিছুই ফুটিতে চাহিল না।

বহুক্ষণ পরে—"মা—কি ঠিক্ কর্‌লে?" পুত্রের এই প্রশ্নে সংজ্ঞা পাইয়া মাতা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "তুই যেমন আছিস তেমনি এখন থাক্ ত আমার কোলে,—পরে দেখা যাবে!" ছেলে একটু যেন সানন্দোচ্ছ্বাসে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তবে একটু ঘুমোই—মা? ঘুম পাচ্ছে।"

মা বলিলেন "ঘুমো।"

১২

সমুদ্রের গভীর তলে যাহার বাস সে যদি প্রবাল-কাননের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মাঝে চিরকাল স্থান পায় তথাপি সময়ে সময়ে নিজের তেমন বাসও ত্যাগ করিতে সে উৎসুক হইয়া উঠে কেন? কারণ সেও কখনো কখনো নূতনত্ব চায়। কেবল মাত্র একরকম দৃশ্য দেখিয়া ও একস্থানে বাস করিয়া তাহার চোখ ও প্রাণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই নিকৃষ্টতর জীবের চেয়েও যাহার অবস্থা শোচনীয়, যেখানেই যাক যাহার চারিদিকে শব্দহীন অনন্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের গভীরতম তলের নিস্তব্ধতা ঘিরিয়া আছে তাহাকে সেই নূতনত্বটুকু দিবারও সাধ্য প্রকৃতির কোথায়! কিন্তু হায়, তবু যে মানুষ হইয়াই জন্মিয়াছে তাহার মানুষের মন যে কোন না কোন সময়ে নিজের দাবী উপস্থিত করিবেই! অজ্ঞানের যত অন্ধকারেই সে লুকানো থাক, ঘুমাইয়া থাক্—সেই যে গুহা-শায়ী মন—সে তো মানুষকে একদিন না একদিন দেখা দিতে ছাড়িবে না। পাঁচটা ঘোড়ার একটার অভাবে তাহার রথ নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম করিলেও একদিন না একদিন তো লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিবেই।

শ্যামলী অনুভব করিতেছিল তাহাদের সংসারে কি যেন নূতন একটা কি আসিয়া ঢুকিয়া এতদিনের সব ধারা উল্টা-পাল্টা করিয়া দিয়াছে। পিতার রুক্ষতা, ভগ্নীর কঠিন মুখভঙ্গী এখন একেবারে এমন কোমল হইল কি করিয়া ইহা তাহাকে প্রথমে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিতেছিল। মা তো তাহার চিরদিনের মা, বরং তিনিই এখন একটু কঠিন ভাবে তাহাকে সংসারের হিতাহিত বোধ ও কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য শিখাইতে চেষ্টিত রহিয়াছেন। কিন্তু তাহার পিতা ও ভগ্নীর চোখে মুখে এবং ব্যবহারে তাহার উপরে এতখানি সহানুভূতি ও করুণা সে যেন ইতিপূর্ব্বে আর কখনো অনুভব করে নাই। তাহাদের সংসারে আর-একজন আত্মীয়েরও বৃদ্ধি হইয়াছে; সে শিশির। বিজলী যে তাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিয়া পলায়, তাহার উপস্থিতিতে বিজলীর মুখে যে সলজ্জ-রক্তরাগ ফুটিয়া উঠে, তাহাতে শ্যামলী বুঝিয়াছে যে শিশির বিজলীর স্বামী, —তাহার ভগ্নীপতি, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে তাহাদের বাটীতে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার নাম বিবাহ। এই স্ত্রীপুরুষে বিবাহ হওয়াটা সে ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক দেখিয়াছিল; বর বৌ লইয়া অন্যান্য ছোট ছোট মেয়েরা যেমন আনন্দ করে তাহার দৃষ্টান্তে সেও এখন শিশিরকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বিজলী শিশিরের সাম্‌নে পড়িলেই সে বিজলীর পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া বালিকার ন্যায় করতালি দিয়া হাসে, বিজলীর সলজ্জ ভ্রুকুটী বা নিষেধ মানে না এবং ভগ্নীর সে ভ্রুকুটীতে যে পূর্ব্বের ন্যায় বিরক্তি মিশানো নাই তাহা শ্যামলীরও বুঝিতে বাকী থাকে না। শিশিরও শ্যামলীর এ খেলায় সানন্দ হাস্যে যোগ দেয়। এই নব আত্মীয়টি যে তাহাকে সস্নেহ সম্ভ্রমের চোখেই দেখে তাহাও শ্যামলী বুঝিতে পারে, তাই শিশির আসিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। আবার শিশির যখন বিজলীকে লইতে আসে তখন সে ক্ষুব্ধ হইয়া ইঙ্গিতে শিশিরকে নিবারণ করিতে চাহে এবং বিজলী চলিয়া গেলে কাঁদিয়া অস্থির হয়। আবার কিছুকাল পরে বিজলী ফিরিয়া আসিলে শ্যামলীর আনন্দের সীমা থাকে না। এখন যে মাঝে মাঝে শিশিরও আসিবে তাহা সে নিশ্চিত জানে এবং সেই নবলব্ধ আনন্দের আশায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে! বিলম্ব হইলে ইঙ্গিতে বিজলীকে কারণ জিজ্ঞাসা করে। বিজলী দু-একবার সলজ্জ ভ্রূভঙ্গী করিয়া শেষে ইঙ্গিতে তাহার কারণও বুঝাইয়া দেয়। শিশির আসিলে শ্যামলী দৌড়া-দৌড়ি তাহার পান জল সরবরাহ করিতে ছুটে, মায়ের হাত হইতে জলখাবার তৈরীর ভারও লইতে চাহে। পাড়ার এক ঠাকরুণদিদি শিশিরকে তামাসা করিবার জন্য

একবার পানের ডিবায় আরসুলা পুরিয়া এবং ঐরূপ আরও গোটাকতক বহুপ্রচলিত পুরাতন ঠাট্টা চালাইয়াছিলেন। শ্যামলীর সেই হইতে শিশিরকে প্রতিবার সেই ঠাট্টাটি করাই চাই! তাহার আমোদ বুঝিয়া শিশিরও তাহাতে এমন সন্ত্রস্ত ও ভীত ভাব দেখায় যে শ্যামলী তাহাতে হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে।

এই হতভাগ্য প্রাণীটির মধ্যের ঘুমন্ত স্নেহবৃত্তি যে এইরূপে ক্রমে জাগিতেছে তাহা শিশিরও বুঝিতে পারে এবং অনিলের কথা মনে করিয়া বিষণ্ণ হইয়া যায়। শ্যামলীর মুখে চোখে কাজে ভগিনীর স্নেহ, বন্ধুর বা সঙ্গীর সঙ্গলিপ্সা যে ক্রমেই ফুটিতেছে তাহা শিশির লক্ষ্য করে। যে এতদিন জড়ের মত ছিল, মাতাপিতার স্নেহ তাহার যে স্বভাব দূর করিতে পারে নাই, একজন সম্পূর্ণ পরের অভ্যুদয়ে সেই জড় ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠিতেছিল। শিশিরের জন্য সে কাজ করিতে পর্য্যন্ত শিখিতেছে। আর এখন সে সব সময় আকাশ-বাতাসের জন্য হাঁ করিয়া চোখ পাতিয়া পড়িয়া থাকে না, ঘরের কাজ শিখিবার জন্য মায়ের ভগিনীর সঙ্গ ধরে। একদিন সে মাতাকে জামাতার জন্য রেশম-পশমের জুতা কম্ফর্টর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে দেখিয়া এবং বিজলীকেও মাঝে মাঝে মায়ের আদেশে তাহাতে যোগ দিতে দেখিয়া নিজেও বুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। মা প্রসন্ন মুখে তাহাকে সেলাইয়ের অক্ষর পরিচয় করাইতে লাগিলেন এবং অসীম ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যহই তাহাকে লইয়া শিখাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু শ্যামলী কাজকর্ম্ম যেমন শিখিতেছিল এ বিষয়ে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে তাহার যথা-সর্ব্বস্ব চোখদুটিকে অতক্ষণ যে ঐ সামান্য সুতানাতায় আবদ্ধ রাখিতে পারে না। শব্দহীন অতলে যাহার বাস, সে মনের অতল গুহায় ডুবিতে কোন মতেই সাহস পায় না, প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠে! একটু পরেই সে-সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আঃ ভাবিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে; বোনের অনুপম মুখখানির পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসে; তার পরেই একছুটে ছাতে পলাইয়া সেই নীল ও সবুজের রাজ্যে তাহার ক্লান্ত মন ও চক্ষুকে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়ে।

সেবার বিজলীকে শিশির লইয়া গেলে সে বড়ই কাঁদিল এবং মনমরা হইয়া রহিল। সহসা একদিন তাহার মা গম্ভীর মুখে তাহার হাতে একখানা ছবি দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শ্যামলী বিস্মিত ভাবে ক্ষণেক ছবিটির পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে যেন কি একটা মনে পড়ায় একটু বিচলিত ভাবে মায়ের পানে দৃষ্টি ফিরাইল। তাহার চক্ষু দিয়া মাতাকে যেমন চিরদিনই সে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করে, তেমনি আজও করিল—এ কে মা? একে যেন চেনা বলে বোধ হচ্চে! এ কার ছবি —আর কেনই বা তা আমায় দিলে?

মাতা তখন শ্যামলীর মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন—ছবির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সেই মাথার কাপড় বেশী করিয়া টানিয়া ঘোমটা করিয়া দিলেন। শ্যামলী বুঝিল। যেন অবাক্ হইয়া স্তব্ধ হইয়া কতক্ষণ ধরিয়া সে সেই ছবিখানা দেখিল। সেই যে দিনকতক সে মা-ছাড়া হইয়া ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছিল—সেই সময়ে মাঝে মাঝে যাহাকে দেখিতে পাইত এই সেই লোকটা। তার ছবি মা কোথায় পাইলেন? আর সেই রাত্রে—হ্যাঁ—মনে হইতেছে—শিশিরের পাশে বিজলী ঘোমটা দিয়া বসিবার আগে তাকেও বোধ হয় এই লোকটার পাশেই তেমনি ভাবে তাহার বাবা বসাইয়া দিয়াছিলেন। তার বাবাকে সকলে যখন মারিতে চায়—এই-ই সকলকে থামাইয়াছিল! তাহার বন্দীত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে যে এখানে রাখিয়া গিয়াছে সেও এই। আরও এমনি গোটাকতক কথা শ্যামলীর মনে পড়িল। কিন্তু এ ছবিতে কি হইবে? এ দেখিয়া লাভ কি?

মাতা কন্যার নিষ্প্রভ চক্ষের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার হস্ত হইতে ছবিখানা টানিয়া লইলেন এবং সম্মুখের দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিতে গিয়া আবার ক্ষণেক স্নেহ-শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনিমেষদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু পুরিয়া উঠিল। সহসা ছবিখানা শ্যামলীর ললাটে ছোঁয়াইয়া অতি যত্নের সহিত কাগজে মুড়িয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। শ্যামলী অবাক্ হইয়া মাতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এই লোকটা যে দিন এখানে তাহাকে রাখিতে আসে এবং চলিয়া যায়, মায়ের সেই দিনের মুখভাব এবং রোদন তাহার

মনে পড়িয়া গেল। 'তাকে মা খুব ভাল বাসেন! কিন্তু তার ছবি তাহার মাথায় ছোঁয়াইলেন কেন!

মাতা তখন সেই বাক্স হইতে অতি আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর সুন্দর কতকগুলো ছবি বাহির করিয়া শ্যামলীর হাতে দিতে, শ্যামলী আরও বিস্মিত হইয়া পড়িল। এমন সুন্দর ছবি তো জীবনে সে কখনো দেখে নাই! এ কি রংকরা তুচ্ছ ছবি যেমন সে প্রত্যহ যেখানে-সেখানে দেখিতে পায়? না, এ তো তাহা নয়। আকাশে সে যেমন কালো কালো মেঘের উত্তুঙ্গস্তূপ দেখিতে পায়—পৃথিবীর বুকেও সেইরূপ সুকৃষ্ণ শিখর-সমন্বিত দুর্ভেদদর্শন এ-সব কি বস্তু? তাহার গায়ে কত কত গাছের লতার মালা—ফুলের শোভা! পদতলে কত স্রোতোধারা! কত বিচিত্র ভঙ্গীতে কি ফেনোচ্ছলগতিতে কোথাও সঙ্কীর্ণ খাতে কোথাও বা প্রসারিত ধারায় বহিতেছে! কোথাও তাহারা আবার সেই সুউচ্চ শিখর হইতে সতেজে বহু নিম্নে লাফাইয়া পড়িতেছে! সে দৃশ্য কি উত্তেজক, কি চমৎকার! দেখিতে দেখিতে উৎসাহে শ্যামলীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ সোৎসাহে সপ্রশ্নে মাতার প্রতি চাহিতে লাগিল—"এসব কিসের ছবি মা? কোথায় পেলে? কে দিলে? কি সুন্দর ওগো দ্যাখ দ্যাখ! আমি নেব মা, আমায় দাও এ ছবিগুলো।" মাতার মুখে তো কই আজ শ্যামলীর এত আনন্দেও আনন্দের হাসি ফুটিল না। মা সেই একই রকম বিষাদমন্থর ভাবে বাক্স হইতে সেই লোকটার ছবিখানা বাহির করিয়া ইঙ্গিতে শ্যামলীকে বুঝাইলেন এই ছবির লোকটি তাহাকেই এই ছবিগুলি পাঠাইয়াছে। বেশ ত, সে তো খুব ভাল লোক! কিন্তু এতে মা কেন এত দুঃখিতভাবে রহিয়াছেন এবং এমন সব ছবি ফেলিয়া ঐ ছবিখানাই একশবার কেন দেখিতেছেন—ইহাতেই শ্যামলীর একবার একবার কেমন যেন বোধ হইতে লাগিল। অন্য ছবি দেখার আনন্দের চেয়ে শ্যামলী যদি ঐ লোকটার ছবি দেখিয়া বেশী সুখী হইত তবেই যেন মা খুসী হইতেন, মায়ের ভাবে এটুকু শ্যামলী ক্রমে বুঝিতে পারিল এবং মার বেদনাভরা মুখচোখের পানে চাহিয়া ছবি পাওয়ার আনন্দে শেষে সে যেন একটু নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। মা তাহার আদর-প্রাপ্ত ছবিগুলো তাহাকে দিয়া বাকী সেইখানা বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন। এই মূকজগতে যাঁহার প্রত্যেক ভঙ্গী শ্যামলীর অর্দ্ধবিকশিত জীবনের সম্বল, তাঁহার এ ভাবে হতভম্ব হইয়া শ্যামলী ক্ষণেক বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহা কিছুক্ষণ মাত্র। হস্তের চিত্রগুলার পানে ক্রমে আবার তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইল এবং প্রকৃতির সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যে প্রকৃতির চিরশিশু সে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

আট্‌কে বাঁধা

(একটি চীনে কবিতার ইংরেজি থেকে)

নিলাজ নীল আকাশে মোর থুয়েছি বিশ্বাস,—
থুয়েছি থির জলের শান্ত হাসে;
দৃষ্টি আমার ভেদ ক'রে যায় মেঘেরি নাগপাশ,
ঢেউ দেখে আর কাঁপে না মন ত্রাসে।

ফুলের প্রীতি তরুর স্নেহে থুয়েছি প্রত্যয়,
—তরুণ প্রাণের দিব্যভাতি-ভরা,—
বাইরে তারা নেতিয়ে পড়ে, শুকিয়ে ধূসর হয়,
অন্তরে রয় কান্তি নিরন্তরা।

ভালোবাসি সবুজ বনে শুঁড়ি পথের রেখা,—
পাতার নাচন নিঝুম পথের 'পরে;
পাৎ-বাদামের ফলটি খসা,—গায়ে আলোর লেখা,—
ভালোবাসি নয়ন-পরাণ ভ'রে।

আস্‌ছে যে দিন পূর্ণ সে মোর বিশ্বাসের আশ্বাস,
গেছে যে দিন মূর্ত্ত সে বিস্ময়,
সে বিস্ময়ে অপরূপের অরূপ যে আভাস
অভাব্য সব সম্ভাবনাময়!

বিশ্বাসে বুক বেঁধেছি, বল পেয়েছি বিশ্বাসে,
আট্‌কে আমার হ'য়ে গেছে বাঁধা,
বিশ্বাসে মন খুসী আমার, নিশ্বাসে নিশ্বাসে
উড়িয়ে দিল উবিয়ে দিল ধাঁধা।

বিশ্বাসে মোর বাসি ভালো, আঁক্‌ড়ে রাখি বুকে,
প্রেমে বাঁধি বিশ্বনিখিল হিয়ায় নিত্যদিনই;
থুই প্রীতি-প্রত্যয়ের অগ্র তাঁরি চরণ-যুগে
বিশ্বাসের আর ভালোবাসার উৎস স্বয়ং যিনি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ক্যাবলের পত্র

শ্রীমান বাঙ্গারাম

উন্নতিশীলেষু—

তুমি যে আমার কোন চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য্য হয় না, তখন চিঠি না লেখ্বারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না-লেখাটাকে কার্য্য ব'লে ধরা যায় কি না, সেটা একটু ভাবা দর্কার। কিছু না-করাটাও যদি একটা কাজ হয়, তবে তোমরা পৃথিবীতে কেজো মানুষ আর অকেজো মানুষ ব'লে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তোমরা করেছ বল্‌ছি এই জন্যে যে ও দ্বন্দ্বটিকে আমি বরাবরই অস্বীকার ক'রে এসেছি। আমার ধারণা এই যে, আমসত্ত্ব হ'লেই যেমন আমের আমসত্ত্ব, তেমনি মানুষ মানেই কাজের মানুষ। ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ দুটোর মধ্যে তফাৎটা কেবল কৃ ধাতু আর অস্ ধাতুর তফাৎ—আর ব্যাকরণ-মতে সব ধাতুই ক্রিয়া-বাচক। "আমি আছি" এই তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য্য, এবং প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে সে আপনাকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হ'লে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম কর্‌তে হয়—কিন্তু তাই ব'লে ফুলকে ফোটাবার পক্ষে ও-উপায়টি খুব প্রশস্ত নাও হ'তে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে নিয়ে যাঁরা চব্বিশঘণ্টা টানা-টানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বোঝেন না যে, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না—কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

উপনিষদ্ বলেছেন আত্মা অব্যয়, আর ব্যাকরণেও দেখ্‌তে পাই যে অব্যয়ের রূপ নাই। কিন্তু জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেন না, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হ'লেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেটা জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়া পদটি অকর্ম্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে এবং সেই কর্ম্মটিই হচ্ছে আর্ট। রোসো, আগেই তর্ক করোনা। আর্ট কাকে বল্‌ছি সেইটে আগে বুঝ্‌বার চেষ্টা কর। তুমি বল্‌তে চাচ্চ যে বিজ্ঞান পলিটিক্‌স্ বা ফিলসফি প্রভৃতি ভারি ভারি কর্ম্মগুলো কি কর্ম্ম নয়? আমার মতে ওগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার উপসর্গ মাত্র। "উপসর্গস্তু যোগেন" ক্রিয়ার অর্থ যে ওলট-পালট হ'য়ে যায়, এটা ব্যাকরণের বিজ্ঞতা এবং সংসারের অভিজ্ঞতা এই দুই তরফেরই সাক্ষী। জীবনের ক্রিয়ার ওপর ওরা মোচড় দেয়, কিন্তু কোথাও আঁচড় দিতে পারে না। জীবনের ওপর আঁচড় দেওয়া, অর্থাৎ আপনার ছাপ এঁকে দেওয়া, অর্থাৎ এক কথায় নতুন করে রূপ সৃষ্টি করা, এই জিনিসটাই হচ্ছে আর্ট—অর্থাৎ ব্যার্গ্‌সঁ যাকে বলেছেন creative evolution.

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে বাংলা দেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়্‌তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর-একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে—সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। তার কারণ, আমাদের দেশে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে যাঁরা কার্‌বার করেন, মাল এবং মশলার পার্থক্য তাঁরা বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন—কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখ্‌তে পান না। অথচ এটা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই যে ও-বস্তুটি হচ্ছে জাতীয় খোসখেয়ালের আস্ত একটি তোষাখানা। সকলেই জানি, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সব চাইতে বড় তফাৎ হচ্ছে আকারের তফাৎ। অর্থাৎ তারা আত্মসর্ব্বস্ব আর আমরা আত্মাসর্ব্বস্ব; ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাক মাত্র ফরসা। ইংরেজের ব্যাকরণে ও আচরণে first person হচ্ছেন আমি এবং আমরা। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাকরণটাও বেদাঙ্গ, সুতরাং তাতে পরমার্থ না থাকুক পরার্থতত্ত্বের কোন অভাব নেই। তাই আমাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ইনি এঁরা তারা। এর মধ্যে দীনতা থাক্‌লেও কোন রকম হীনতা নেই, কারণ আমি-ব্যক্তিটিকে আমরা বরাবর উত্তমপুরুষ ব'লেই প্রচার ক'রে আস্‌ছি। এইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের আসল তফাৎ। ওরা অহঙ্কারী বলেই স্বার্থপর হ'য়ে থাকে, আর আমরা পরার্থপর ব'লেই অহঙ্কার কর্‌তে পারি।

অধ্যাপক Kühmre তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, মিথ্যেটাই হ'ল সাহিত্যের আসল সৃষ্টি—কেন না, সত্যকে কেউ সৃষ্টি কর্‌তে পারে না। কেবল এইটুকু না ব'লে তিনি আরও বল্‌তে পার্‌তেন যে, আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেটা সৃষ্টি-ছাড়া সেইটেকে সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানের সব সত্যিই যে সত্যি এইটে দেখানই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবসা। সত্যিটার যে কোন সত্তা নেই আর মিথ্যেটা যে মিথ্যে নয়, এইটেই হচ্ছে দর্শনের সাক্ষী। কেবল আর্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সত্য-মিথ্যার স্বত্বসাব্যস্তের কোন বালাই নেই, কেন না সাহিত্য হচ্ছে সত্য-মিথ্যার সব্য-সাচী। অর্থাৎ এক কথায়, বিজ্ঞান না পড়েই বোঝা যায়, দর্শন পড়্‌লেও বোঝা যায় না, আর সাহিত্যের বেলা বোঝা-পড়ার কোন প্রয়োজনই হয় না। একেই আমি বলেছিলুম "সাহিত্যের অনাসক্তি"। দুর্ভাগ্য-ক্রমে কথাটা কারও প্রাণে লাগেনি, অর্থাৎ কানে লাগেনি। কেন না, আমাদের দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও পড়া-শোনা করেন না, তাঁরা কেবল লেখা-পড়াই ক'রে থাকেন। আর তাতে ক'রে যে জিনিসটা গজায় সেটা আক্কেল নয়, সেটা হয় টাক নয় টিকি অর্থাৎ হয় নাস্তিকতা নয় অদ্বৈতবাদ।

দেখ কোথাকার কথা কোথায় গড়িয়ে পড়্‌ল। কথা বল্‌বার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে বেশী কথা বল্‌লে কেউ শুন্‌তে চায় না, আবার অল্পের মধ্যে সঙ্কীর্ণ ক'রে বল্‌লেও কেউ বুঝ্‌তে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, অল্প কথার মধ্যে যতটা বাহুল্য থাকে, বেশী কথায় ততটা থাকে না। তাই সাহিত্যের একটা বড় কাজ হচ্ছে সামান্য কথাকে চালিয়ে চালিয়ে, অর্থাৎ exercise করিয়ে, তার বাহুল্য নষ্ট করা। এক্ষেত্রে যাঁরা সংযমের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁদের এই সহজ তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব যে সাহিত্যের শব্দকে মেরে ভাষাকে জব্দ করা যায়, কিন্তু ও-কাজটি সম্যক্‌রূপে যমের উপযুক্ত হ'লেও তাকে সংযম বলা চলে না।

আমাদের গুরুমশাইরা বলেন যে ভাষাটার বাড়াবাড়ি হ'লে তার গুরুত্ব থাকে না, কেন না তাতে ক'রে ভাষাটা হয় ভাসা-ভাসা, অর্থাৎ হাল্কা। ও সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে যে জিনিসটা যথার্থই ভাসে, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে, তাকে ডুবিয়ে দিলে যে ডোবা সাহিত্যের—অর্থাৎ বোবা সাহিত্যের—সৃষ্টি হয়, তাকে শোভন বলা আর মূর্খ বলা একই কথা, কেন না সে "কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। ওর মধ্যে আরেকটু কথা আছে, সেটা আজ পর্য্যন্ত কাউকে বল্‌তে শুন্‌লুম না। সে কথাটা এই যে, যে-টাকা বাজে সেই টাকাই চলে, যেটা বাজে না সেটা অচল; সুতরাং সাহিত্যের বাজারে বাজে কথাই চলে ভাল—অর্থাৎ সেই কথাটাই চলে যার শব্দের জোর আছে। তুমি ভাব্‌ছ এটা নেহাৎ বাজে কথা। তা হওয়া খুবই সম্ভব, কেন না কথাটা সত্যি।

আমার একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলুম যে, সাহিত্যের উক্তির মধ্যে যুক্তি থাক্‌লেই তার মুক্তি হয় না—তাতে সাহিত্যের বিস্তার হ'তে পারে, কিন্তু তার নিস্তার হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমি এই কথাটির একটি চমৎকার উদাহরণ আবিষ্কার করেছি। "পল্লী-সাহিত্য" ব'লে একটা কথা আমি অনেক দিন ধরে শুনে আস্‌ছি, কিন্তু ও-বস্তুটা যে কি তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্য্যন্ত জানা ছিল না। সেই জন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লী-সাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ ক'রে—অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ ক'রে—কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ওতে ক'রে আসল যে কথাটি বলা হচ্ছে, সেটা ওর মধ্যে কোথাও বলা হয় নি। বলা কথাটির অর্থই হচ্ছে কিছু কথা বলা, কিন্তু কথার উপর অসামান্য বল-প্রয়োগ কর্‌লেই যে বলা কাজটি খুব ভাল ক'রে সম্পন্ন হয়, আমার অন্তত এরকম বিশ্বাস নেই। সাহিত্যকে তাজা কর্‌বার জন্য পণ্ডিতমশাই যে রকম তেজ প্রকাশ করেছেন,—তাতে তাঁর প্রবন্ধটিকে পল্লী-সাহিত্য না বলে মল্লীসাহিত্য অর্থাৎ মেয়েলি কুস্তির সাহিত্য বলা উচিত ছিল—কেন না, ওর মধ্যে প্রতাপের চাইতে প্রলাপের মাত্রাটাই বেশী।

পণ্ডিতমশাই বল্‌তে চান যে সাহিত্যটাকে সহরের বদ্ধবাতাসে আবদ্ধ না রেখে, তাকে "সহজ সুস্থ পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন" অর্থাৎ তাকে

ঘন ঘন হাওয়া খেতে পাড়াগাঁয়ে পাঠান দরকার। পণ্ডিতমশাই বলেন, "আমি মনে করি ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব"। প্রস্তাবের মাঝখানে "আমি মনে করি" ব'লে উত্তম পুরুষের অবতারণা করলেই যে প্রস্তাবটা উত্তম হ'য়ে পড়ে এ রকম যুক্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনেক উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতমশাই ভরসা করেন যে তাঁর ব্যবস্থা-মত চল্‌লে পরে সাহিত্যের ভাব এবং ভাষা হৃষ্ট এবং পুষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। সহুরে সাহিত্যকে গ্রামের হাওয়া খাইয়ে gram-fed করে পুষ্‌তে গেলে যে জিনিসটা পুষ্টিলাভ করে, সেটা 'গ্রামার' নয়, সেটা হচ্ছে গ্রাম্যতা।

ব্যার্গ্‌সঁ বলেছেন, মানুষের হাত পা কাট্‌লেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেল্‌লে আর সে বাঁচ্‌তে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের ওপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও-বস্তুটি যদি ওখানে না থাকৃত, তা হলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তিটা আরো গুরুতর হত। কতগুলো ইংরিজিপড়া মাথাকে বাংলা-সাহিত্যের ঘাড়ের উপর বস্‌তে দেখে, পণ্ডিতমশাই তার মুণ্ডপাত করতে চান, কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখেন নি যে তাতে করে তাঁর নিজের প্রবন্ধকেই তিনি কবন্ধ করে ফেলেছেন। যাহোক এ প্রবন্ধের একটা গুণ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনে—সেটা এই যে, সাহিত্য বল্‌তে পণ্ডিতমশাই কি বোঝেন সেটা না বুঝ্‌লেও, তিনি কি না-বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোন কোন সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়্‌লে তাঁদের প্রাণটা জলে কিন্তু জল হয় না। তাই শুন্‌লুম সেদিন একজন আক্ষেপ করে বলেছেন যে আমার কথাগুলো নাকি "সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না।" বোঝা যে যায় না, এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেননা সংসারের কোন বোঝাই আপনা থেকে যায় না—তাকে কষ্ট করে বয়ে নিতে হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কি, সেটা আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবে উঠ্‌তে পার্‌লুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ—অর্থাৎ ও-বস্তুটি ভগবান যাকে দেন তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এবিষয়ে যাঁদের কিছু কম্‌তি আছে তাঁরা বোধ হয় এইটে বোঝেন না যে ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।

ক্যাবল।

মানুষ হওয়া

আপ্‌নাকে যে ঠেকিয়ে রাখা দায়—
মানুষ হওয়ার আগুন আমার জ্বল্‌ছে সারা গায়।
কেমন করে হব আমি
সবার মত বড়,
কেমন করে সবার পাওয়া
করব আমায় জড়ো?
টান্‌তে গেলে নিজের পানে
উঠ্‌ছে আগুন ব্যেপে,
আপনি পুড়ি পরকে পোড়াই
রাখ্‌তে নারি চেপে;
বিষম জ্বালা, আপনাকে তাই
ছাড়্‌তে হবে হায়,
সইতে হবে বইতে হবে
মানুষ হওয়ার দায়।

আত্মা আমার চির স্বাধীন ভয় করে না কারে,
আগুন যতই জ্বলুক কভু আঁচ লাগে না তারে।
সকল ভাবেই স্বাধীন সে যে
সব হতে স্বতন্ত্র,
চির স্বাধীনতার দেশে
চির স্বাধীন মন্ত্র।
সেই তো আমার মনের মানুষ
আছে মনে জেগে,
দেখ্‌ছে আমার অন্তরে সব
সাক্ষী হয়ে থেকে।
কোনো দিকে দেয় না যেতে
হারায় না এক লেশ,
একেবারে ছাড়্‌বে আমার
মানুষ করে শেষ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বুদ্ধ ও পতঞ্জলি

বুদ্ধের মতের সহিত পতঞ্জলির মতের যে-প্রকার সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা অদ্য কেবল তিনটি বিষয়ে ইঁহাদিগের মতের সাদৃশ্য দেখাইব।

(১)

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা।

পাতঞ্জল দর্শনে এই সূত্রটি আছে :—মৈত্রী-করুণা-মুদিতাপেক্ষাণাং সুখদুঃখ-পুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাদনম্। ১।৩৩।

অর্থাৎ সুখ দুঃখ পুণ্য ও পাপবিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়।

পতঞ্জলির পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা, এই ভাবচতুষ্টয়ের একত্র সমাবেশ দেখা যায় নাই, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের বহুস্থলে এইপ্রকার প্রয়োগ আছে। অভিধর্ম্মপিটকে ধর্ম্মসঙ্গনি নামক একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাতে 'ব্রহ্মবিহার' নামক ধ্যানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই ধ্যান চারি প্রকার। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান—এই তিন ধ্যানেই মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা এই চারিটি ভাব দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ হয় (মেত্তাসহগতম্, করুণাসহগতম্, মুদিতাসহগতম্, উপেক্ষাসহগতম্)। চতুর্থ ধ্যানে চিত্তে মৈত্রীভাব থাকে না, কিন্তু ইহা করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ হয় (২৫১-২৬২)।

মজ্‌ঝিম নিকায় গ্রন্থে—বত্থূপমসুত্তে লিখিত আছে যে যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, তাঁহার অবস্থা এই প্রকার :—

"তিনি মৈত্রী-পরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা......করুণা-পরিপূর্ণ চিত্ত-দ্বারা......মুদিতা-পরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা......উপেক্ষা-পরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা......সমুদয় জগৎকে প্লাবিত করিয়া বিহার করেন।"

এই অংশ দীঘনিকায় গ্রন্থের মহাসুদশ্‌শন সুত্তন্ত (৪), মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত (৫৯), উদুম্বরিক সিংহনাদ সুত্তন্ত (১৭-১৯), চক্কবত্তিসিংহনাদ সুত্তন্ত (২৮), সঙ্গীতি সুত্তন্ত (১১১৬) প্রভৃতি বহুস্থলে পাওয়া যায়। মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা এই চারিটি সাধারণ শব্দ নহে; এ-সমুদয় বিশেষার্থ-প্রকাশক শব্দ, এ-সমুদয় দার্শনিক শব্দ, অন্তরঙ্গসাধনমূলক শব্দ, পারিভাষিক শব্দ। এ-সমুদয়ের একত্র সমাবেশও আকস্মিক নহে। এই-প্রকার ব্যবহার যখন পতঞ্জলির গ্রন্থে এবং বুদ্ধদেবের উপদেশেও পাওয়া যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এই-সমুদয় সত্য একজন অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কিংবা উভয়েই প্রাচীন ধর্ম্ম ও দর্শন হইতে এই সমুদয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মত সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ কোন প্রাচীন বৈদিকগ্রন্থে এই-সমুদয় শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কেবল তাহাই নহে, বিশ্বপ্রীতির ভাব প্রাচীন উপনিষদাদি গ্রন্থের কোন স্থলেই বর্ণিত হয় নাই এবং মৈত্রীকরুণাদির ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব।

পতঞ্জলি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক এবং বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই, পতঞ্জলিই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এই-সমুদয় ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

(২)

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ।

পতঞ্জলি বলেন :—বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। ১।১৭। অর্থাৎ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিতর্ক বিচার আনন্দ অস্মিতা—এই কয়েকটি বর্ত্তমান।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বিতর্ক বিচার প্রীতি এবং সুখ—এই চারিটি এই ক্রমেই বহুস্থলে একসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। অভিধর্ম্মপিটকের অন্তর্গত ধর্ম্মসঙ্গনি নামক গ্রন্থে এই-প্রকার আছে :—......বিতক্ক (বিতর্ক) হোতি (হয়), বিচারো (বিচার) হোতি, পীতি (প্রীতি) হোতি, সুখম্ (সুখ) হোতি......(১)।

ইহার কিছু পরেই প্রশ্ন করা হইল—"সেই সময়ে বিতর্ক কি?" (৭)। ইহার মীমাংসার পরে প্রশ্ন করা হইল—"সেই সময়ে বিচার কি?" (৮)। ঠিক ইহার পরের প্রশ্ন—"সেই সময়ে প্রীতি কি?" (৯)। ইহার পরের প্রশ্ন :—"সেই সময়ে সুখ কি?" (১০)।

অপর একস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে—"সেই সময়ে পঞ্চাঙ্গ ধ্যান কি?" (৮৩)। উত্তরে বলা হইল—"বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা।"

ইহার পরে (৮৪-৮৮) আবার প্রশ্ন করা হইল—বিতর্ক কি, বিচার কি, প্রীতি কি, সুখ কি, চিত্তের একাগ্রতা কি?

অপর একস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে—কোন্ ধর্ম্ম সবিতর্ক, কোন্ ধর্ম্ম অবিতর্ক, কোন্ ধর্ম্ম সবিচার, কোন্ ধর্ম্ম অচিবার, কোন্ ধর্ম্ম সপ্রীতিক, কোন্ ধর্ম্ম অপ্রীতিক। ইত্যাদি (১৫৭৩-১৫৭৭)।

বুদ্ধদেবের মতে প্রীতি ও সুখ—এই দুইটি ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে; পতঞ্জলি এই দুইটির স্থলে 'আনন্দ'—কেবল এই একটি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

ত্রিপিটকে কোন কোন স্থলে চারি ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম ধ্যান সবিতর্ক সবিচার এবং প্রীতি ও সুখপূর্ণ। দ্বিতীয় ধ্যান অবিতর্ক অবিচার, কিন্তু প্রীতি ও সুখপূর্ণ। তৃতীয় ধ্যানে মানব সুখবিহারী, এ অবস্থায় বিতর্ক বিচার ও প্রীতি তিরোহিত হয়। চতুর্থ ধ্যানে বিতর্ক বিচার প্রীতি ও সুখ কিছুই বর্ত্তমান থাকে না (ধম্ম সঙ্গনি ১৬০—১৬৫; ২৫১—২৬২)। দীঘনিকায়ের সঙ্গীতি সুত্তন্তেও (১।১১।৪; ৩।২।৫ ইত্যাদি) এই-প্রকারই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

যে স্থলে পঞ্চধ্যানের কথা বলা হইয়াছে সে স্থলে—

(১) প্রথম ধ্যান সবিতর্ক, সবিচার এবং প্রীতি ও সুখপূর্ণ।

(২) দ্বিতীয় ধ্যান সবিতর্ক, অবিচার এবং প্রীতি ও সুখপূর্ণ।

(৩) তৃতীয় ধ্যান অবিতর্ক, অবিচার এবং প্রীতি ও সুখপূর্ণ।

(৪) চতুর্থ ধ্যান অবিতর্ক, অবিচার, প্রীতিবিহীন, কিন্তু সুখপূর্ণ।

(৫) পঞ্চম ধ্যান অবিতর্ক, অবিচার, প্রীতিবিহীন ও সুখবিহীন।

(ধর্ম্মঃ সঃ ১৬৭—১৭৪; ২৫৪—২৬৩)।

পতঞ্জলির অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং বুদ্ধের এই পঞ্চম ধ্যান একই বস্তু। যে স্থলে চারিটি ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলে চতুর্থ ধ্যানই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুরূপ।

ত্রিপিটকে সমাধি তিনপ্রকার—(১) সবিতর্ক ও অবিচার সমাধি; (২) অবিতর্ক ও সবিচার সমাধি; (৩) অবিতর্ক ও অবিচার সমাধি।

(দীঘনিকায়, সঙ্গীতি সুত্তন্ত ১।১০।৫০; দসুত্তর সুত্তন্ত ১।৪।২)

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম সমাধিই পতঞ্জলির সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং তৃতীয় সমাধিই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সুতরাং বিতর্ক-বিচারাদি-বিষয়ক আলোচনাতেও বুঝা যাইতেছে যে পতঞ্জলির মত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।

(৩)

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা।

পতঞ্জলির মতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী, তাঁহাদিগের যোগ "উপায় প্রত্যয়"। এই যোগে প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপর বীর্য্য, তাহার পর স্মৃতি, তাহার পর সমাধি এবং তাহার পরে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। (শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা-পূর্ব্বক ইতরেষাম্ ১।২০)।

বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত এস্থলেও অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। বুদ্ধ-প্রোক্ত মনোবিজ্ঞানে প্রথমে শ্রদ্ধা (সদ্ধা), তৎপরে বীর্য্য (বিরিয়), তৎপরে স্মৃতি (সতি), তৎপরে সমাধি (সমাধি) এবং তাহার পরে প্রজ্ঞা (পঞ্ঞা)।

বহুস্থলে এই পাঁচটিকে ইন্দ্রিয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (সদ্ধিন্দ্রিয়ম্, বিরিয়িন্দ্রিয়ম্, সতিন্দ্রিয়ম্, সমাধীন্দ্রিয়ম্, পঞ্ঞিন্দ্রিয়ম্—দীঘঃ ৩৩।২।১।২৩; ৩৪।১।৬।৬; মজ্ঝিম ৭৭ ইত্যাদি)। ধম্মসঙ্গনিতে ৮টি ইন্দ্রিয়ের নাম করা হইয়াছে, তাহার প্রথম পাঁচটিই শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি সমাধি এবং প্রজ্ঞা (১; ১২—১৯; ১২৭, ১৪৭, ১৫৭—১৭৫)।

ধম্মসঙ্গনিতে ৭টি বলের নাম করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে শ্রদ্ধাদিই প্রথম পাঁচটি (১, ২৫,—৩১ ইত্যাদি)।

দীঘনিকায় গ্রন্থেও ৭টি বলের নাম করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধাদি পাঁচটি (৩৩।৩৯)। অন্য একস্থলে এই চারিটি বলের নাম করা হইয়াছে—বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা (৩৩।১।১।২৬)।

মজ্‌ঝিম নিকায় গ্রন্থেও (৭৭) পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাদি পাঁচটিকে 'বল' বলা হইয়াছে।

এখানেও দেখা যাইতেছে বৌদ্ধমতের সহিত পতঞ্জলির মতের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ; এবং এখানেও সিদ্ধান্ত—বৌদ্ধমত হইতে পতঞ্জলির মত গৃহীত হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

পঞ্চশস্য

ভগবানের বাজে খরচ—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো পদার্থ উদ্ভিদ বা প্রাণী নাই যা বিশ্ববিধানে সৃষ্টিরক্ষার কোনো না কোনো কাজে না লাগে। ভগবান প্রকৃতির কর্ম্মশৃঙ্খলায় সামঞ্জস্য ও সমান তৌল বজায় রাখিবার জন্য নানা পদার্থ উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনো প্রাণীকে একেবারে ধ্বংস করিলে দেখা যাইবে অপর দিকে অপর-বিধ ক্ষতি ঘটিয়াছে। সাপ শস্যের শত্রু পোকামাকড় খাইয়া শস্যরক্ষায় সাহায্য করে। অষ্ট্রেলিয়াতে আইন করিয়া ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিষ খাওয়াইয়া শকুনি গৃধিনী কাক প্রভৃতি মারা হইতেছিল; শেষে এমন হইল যে মৃত জীবজন্তুর দেহ মাঠেবাটে পচিতে লাগিল, এবং মাছির প্রাদুর্ভাব এমন বেশী হইল যে তাদের জ্বালায় লোক অস্থির, ছাগলভেড়ার গায়ে মাছি ডিম পাড়িয়া তাদের ঘেয়ো রুগ্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। পাখীরা আবার শস্যেরও রক্ষাকারী। টিক্‌টিকি মাকড়্‌সা প্রভৃতি জীবকে আপাতদৃষ্টিতে অকেজো মনে হইলেও, তাদেরও কাজ আছে, তারা মশা মাছি ধ্বংস করে। এইরূপ অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে সকল কিছুরই বিশ্ববিধানে কিছু-না-কিছু কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু ইঁদুরের কোনো প্রয়োজনীয়তা বৈজ্ঞানিকেরা দেখিতে পান না। ইঁদুর যেন ভগবানের সৃষ্টির বাজে খরচ; তারা উৎপাত ঘটাইতেই আছে; প্রকৃতির সামঞ্জস্য ও তৌল গোলমাল ওলটপালট করিতেই যেন তাদের সৃষ্টি। সায়েণ্টিফিক অষ্ট্রেলিয়ান বলেন, অষ্ট্রেলিয়ায় ইঁদুরের বড় উপদ্রব ছিল। ইন্দুরমেধ যজ্ঞ করিয়া দেশকে ইঁদুরশূন্য করাতে দেশের কোনো হানি ত হয়ই নাই, বরং ফসলের লাভ হইয়াছে প্রচুর। সেখানে এক এক ক্ষেত হইতে যেমন যেমন ইঁদুর মারা হইয়াছে অমনি সেই ক্ষেতের গম ফলনে প্রচুর ও গুণে উত্তম হইয়া উঠিয়াছে। ইঁদুরশূন্য হওয়াতে ক্ষেতে পোকা-মাকড়ের প্রাচুর্য্য যে হইয়াছে তাহাও নয়। বরং প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। আমেরিকাতেও অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে যে অন্যান্য ক্ষুদ্রতম প্রাণীরাও যেমন প্রকৃতির রাজ্যে ঝাড়ুদার, ইঁদুর তেমন মোটেই নয়; তার দ্বারা প্রকৃতির কোনো আবর্জ্জনাই দূর বা সাফ হয় না। স্থির হইয়াছে যে এক আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইঁদুরে ফসলের যা ক্ষতি করে তা ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের পরিশ্রম ও আয়োজনের ফল; অন্যান্য সামগ্রীও যা নষ্ট করে তা পুরণ করিতে ৫০ হাজার লোকের শ্রম দরকার। এই ক্ষতি নিবারণ করিতে পারিলে দেশের কত ধন রক্ষা পায়, লোকের কত স্বচ্ছন্দতা বাড়ে। অতএব ভগবানের এই বাজে খরচটি নিবারণ করা নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

পারীর রিভিউ সায়েণ্টিফিক্ বলেন ইঁদুরকে একেবারে ভগবানের বাজে খরচ বলা যায় না। ওর কাজ ছিল; এখন ওর কাজ চুকিয়া গিয়াছে। ওর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল এসিয়াতে। এসিয়া ভূখণ্ডে যখন হাতী প্রভৃতি অতিকায় জন্তুরা বীরদর্পে বিচরণ করিত তখন তাদের দমন করিবার জন্য ভগবান এই ইঁদুরকে সৃষ্টি করেন। হাতীরা ইঁদুরের কামড়কে বড় ডরায়। হাতী ঘোড়া প্রভৃতিকে ইঁদুর কামড়াইলে বা তাদের পা কুরিয়া খাইলে হাতী ঘোড়া জন্মের মতন জখম হইয়া যায়, এমন কি মরিয়াও যায়। এইজন্য আমাদের উপকথায় আছে টুনটুনি পাখীর অনুরোধ না রাখাতে হাতীর উপর রাগ করিয়া তাকে জব্দ করিবার জন্য টুনটুনি পাখী ইঁদুরের কাছে গিয়াছিল।

জার্ম্মান ডুবুরী-জাহাজ হাজার মাইল দূরে কথা পাঠায়—

নিউইয়র্কের দি ইলেক্‌ট্রিক্যাল এক্‌স্পেরিমেণ্টার কাগজে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে জার্ম্মান ডুবুরী-জাহাজ কেমন করিয়া হাজার মাইল দূরে খবর পাঠায়। আগে ডুবুরী-জাহাজের উপর ভাঁজকরা মাস্তুল থাকিত; টেলিস্কোপের মতন খাপে খাপে ভাঁজকরা সেই মাস্তুল টানিয়া খুলিলে ২০।৩০ ফুট উঁচু হইত; সেই মাস্তুলের ডগা হইতে বে-তার টেলিগ্রাফ ছাড়া হইত; কিন্তু সে খবর বেশী দূর যাইত না। এখন জার্ম্মানরা বুদ্ধি করিয়া ডুবুরী জাহাজ হইতে দড়ি বাঁধিয়া জোড়া বেলুন ছাড়িয়া দ্যায়; বেলুন হাজার ফুট উঁচুতে উঠে; আর অত উঁচু হইতে বে-তার টেলিগ্রাফে হাজার মাইল দূরে খবর দিতে ও দূরের খবর ধরিতে পারে। আমেরিকা হইতে জার্ম্মানী পর্য্যন্ত পথের মাঝে-মাঝে তিন চার ঘাটিতে ডুবুরী-জাহাজ খবর ধরিয়া চালাইয়া দিলে সহজেই আমেরিকা ও জার্ম্মানীর মধ্যে খবরাখবর করিতে পারে। এই বেলুনের দড়ি এমন কলে লাগানো থাকে যে দূরে কোনো জাহাজ দেখিতে পাইলে নিমেষমধ্যে দড়ি গুটাইয়া বেলুন নামাইয়া জাহাজ ডুব মারিতে পারে। বেলুনগুলির গায়ে নীল আর শাদা রং করা থাকে; সুতরাং উঁচুতে উড়িতে দেখিলেও লোকে আকাশের গায়ে মেঘের সঞ্চার মনে করিয়া ওদিকে বিশেষ লক্ষ্য করে না। আকাশে ঝড়ঝাপ্‌টা মেঘবাদলা না থাকিলে ৪০০০ মাইল পর্য্যন্ত খবর পাঠানো সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন। রাত্রিতে বেলুন উড়াইয়া খবরাখবর করা আরো বেশী নিরাপদ। ডুবুরী-জাহাজের গোলুই ও পোঁছাতে দুটো খুব শক্তিশালী মাইক্রোফোন বা অণুশ্রবণ লাগানো থাকে; তাতে অল্প মৃদু শব্দও স্পষ্ট শোনা যায়। দূরে জাহাজ আসিতে থাকিলে তার চাকায় জল আলোড়নের শব্দ অণুশ্রবণে ধরা পড়ে। এবং তখন ডুবুরী-জাহাজ সাবধান হয়। ডুবুরী-জাহাজ জলের তলে-তলেও খবর পাঠাইতে পারে; অন্য ডুবুরী-জাহাজ বা ষ্টিমার তাহা ধরিয়া সংবাদপ্রেরক জাহাজকে বিপদে সাহায্য করিতে পারে। যদি ডুবুরী-জাহাজ বে-কল হইয়া ডুবিয়া যায়, তবে জাহাজের মাঝিমাল্লারা একটা টেলিফোঁ-বয়া ছাড়িয়া দ্যায়। সেটা ডুবো জাহাজের কাছাকাছি জলের উপর ভাসতে থাকে। কোনো জাহাজ সেই পথে যাইবার সময় ভাসন্ত বয়া দেখিয়া তার ডালা খুলিয়া জলের তলায় ডুবো জাহাজের লোকেদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলিয়া সব খবর জানিতে ও বলিতে পারে। সঙ্গের চিত্রে ডুবুরী-জাহাজের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কার্য্যকলাপের হদিস দেখানো হইয়াছে।
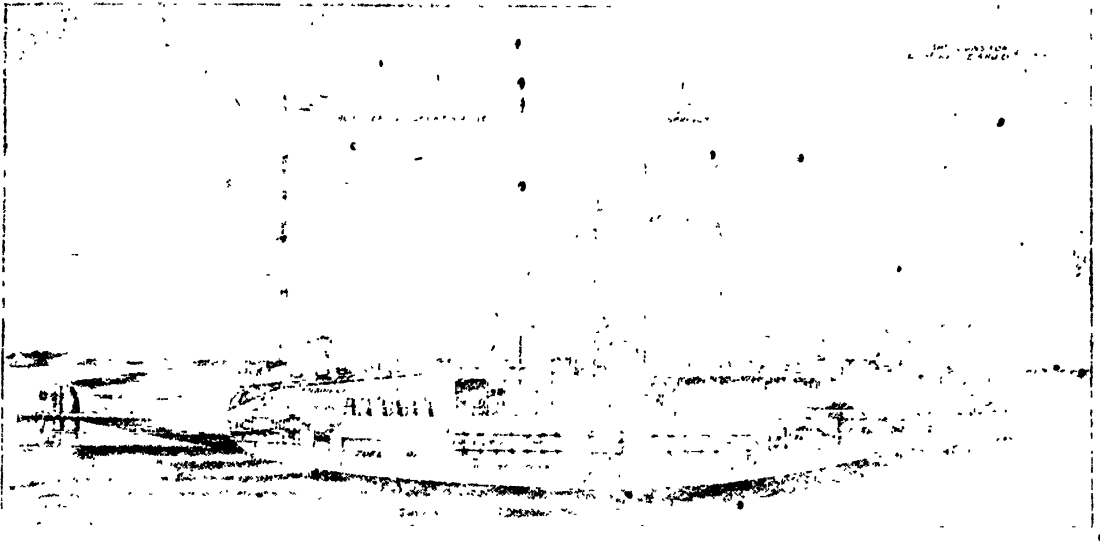
ডুবুরী জাহাজে বেলুন-বাহন বে-তার টেলিগ্রাফ।

চেপ্টা-মুখ বন্দুক—

একরকম চেপ্টা-মুখ বন্দুক আবিষ্কৃত হইয়াছে; সাধারণ বন্দুকের নলের মুখটা কোশার মতন খোল করা। ইহাতে বন্দুকের ছররা লক্ষ্যস্থলে গিয়া ইচ্ছামত হয় খাড়াভাবে নয় এড়োভাবে পড়ে। ঝাঁক বাঁধিয়া পাখী উড়িয়া যাইতেছে, বন্দুকের মুখের কোশা লম্বালম্বি করিয়া আওয়াজ করিলে ছররা গিয়া লম্বালম্বি ছড়াইয়া পড়ে ও তাহাতে

চেপ্টা-মুখ বন্দুক।

পাখীর ঝাঁকের মালায় অনেকগুলি পাখী জখম হয়; আবার মাটি বা জল হইতে পাখীর ঝাঁক উপরে উড়িবার সময় গুলি করিতে হইলে বন্দুকের নলের কোশাটা ঘুরাইয়া খাড়া করিয়া দিলে ছররাগুলা খাড়া ভাবে ছড়াইয়া যায়। এই কৌশলে যুদ্ধের সময়ও খুব সুবিধা হয়; যেখানে পাশাপাশি লোক দাঁড়াইয়া আছে সেখানেও যেমন, আবার যেখানে ধাপে-ধাপে থাকে-থাকে লোক আছে সেখানেও তেমনি এই বন্দুকের এক আওয়াজে অনেক লোককে জখম করা যায়। এই কৌশল কামান ও তোপের মুখেও লাগানো যাইতে পারে।

পেট্রোলের অভাবে গ্যাস—

যুদ্ধে পেট্রোলের দরকার, খরচ খুব। আবার পেট্রোলের খনি কারখানা যুদ্ধে কতক নষ্ট, কতক শত্রুর দখলে। সুতরাং সাধারণ লোকের কাজে পেট্রোলের খুব টানাটানি পড়িয়াছে। মধ্যে কলিকাতায়
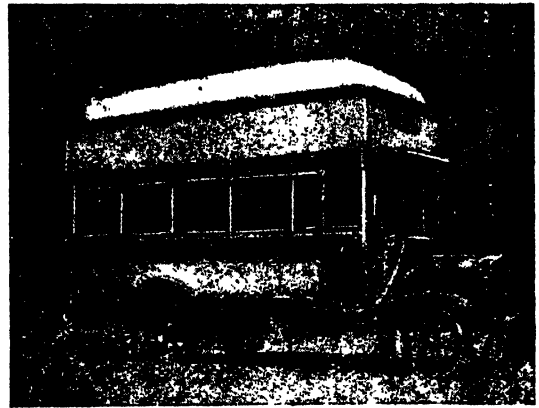
গ্যাসে চালিত মোটর গাড়ী।

পেট্রোলের এমন অভাব ঘটিয়াছিল যে বড়লোকদের মোটর দাবড়ানো বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। বিলাতেও খুব অনটন। কিন্তু তাঁরা ত কলিকাতার বাবুদের মতন কেবল প্রজার হাড়ভাঙা খাটুনির পয়সা শুষিয়া নিষ্কর্মা জড়বুদ্ধি হইয়া বাবুআনা করে না; তাদের কাজ আটকাইলেই বুদ্ধি জোগায়। তারা নিরন্ধ্র অচ্ছিদ্র থলের মধ্যে কয়লার গ্যাস ভরিয়া মোটর গাড়ীর বা নৌকার চালে রাখিয়া সেই
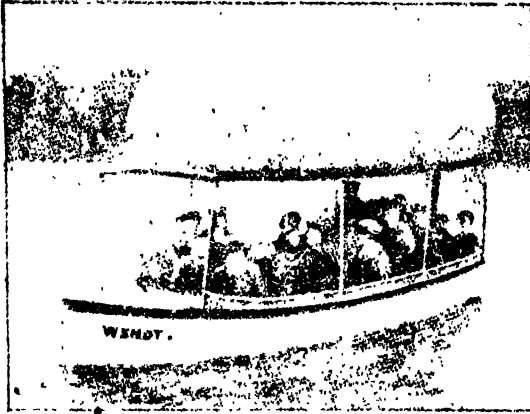
গ্যাসে-চালিত নৌকা

গ্যাসের শক্তিতে মোটর হাঁকাইয়া বেড়াইতেছে। এক গ্যালন পেট্রোল বা গ্যাসোলিন যেখানে লাগিত সেখানে ৩০০ ঘনফুট গ্যাস দরকার। তথাপি ইহা খরচ হিসাবে সস্তা। এই উপায়ে বিলাতে বড়-বড় লরি বাস্ গাড়ী মোট সব চলিতেছে। কথা উঠিয়াছে যুদ্ধের পরও এই উপায়ই চলন থাকিবে।

বরফের বাসিন্দা—

বরফের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী দুইই বাস করে, কিন্তু তারা কেউই উচ্চ উন্নত শ্রেণীর নয়। অনেক জায়গায় লাল বা সবুজ রঙের বরফ দেখা যায়। সেই জায়গার বরফের মধ্যে লাল বা সবুজ রঙের এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মে; তার জন্য বরফকে লাল বা সবুজ দেখায়। সেই উদ্ভিদ গোলাকার, এক ইঞ্চির হাজার ভাগের মতন সূক্ষ্ম। এরা নিজে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বংশ বিস্তার করে। নবজাত কোষাকার উদ্ভিদের গায়ে চাবুকের মতন দুটো শুঁয়ো ঝুলে, তার জন্য তারা জলে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। মেরুপ্রদেশে ও উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় লাল বরফ প্রচুর। কুমেরু বা দক্ষিণ মেরুতে সবুজ বরফ দেখা গিয়াছে। এক রকমের অতি সূক্ষ্ম অণুজীব আছে, তারাও বরফের মধ্যে বাস করিয়া বরফকে রঙিন করে। এক রকম চাকা-পারা পোকা, ক্ষুদে মাকড়্সা, গুব্‌রে পোকা বরফের বাসিন্দা; এরা হয় কেঁচোর মতন বুকে হাঁটিয়া, নয় উচ্চের পোকার মতন চিড়িক মারিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। কিন্তু এরা এত ছোট যে খুব ঠাহর করিয়া না দেখিলে চোখে সোঝে না। এরা একটুও গরম সহ্য করিতে পারে না; রৌদ্র উঠিলে গুটিসুটি মারিয়া বরফের মধ্যে ঢুকিয়া লুকাইয়া থাকে, বেলা পড়িলে বাহিরে আসে। জগৎব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন স্থান বা জিনিস নাই যার মধ্যে জীব ও উদ্ভিদ কোনো না কোনো আকারে না আছে।

চলন্ত পেরিস্কোপ বা সর্ব্বদর্শী নল—

জার্ম্মান ডুবুরী-জাহাজের বুকে ফুটো করিয়া পেরিস্কোপ বা সর্ব্বদর্শী নল থাকে; তার মধ্যে তেশিরা কাঁচ ও পরকলা কাঁচ এমন করিয়া লাগানো থাকে যে খুব দূরের জিনিসের অস্পষ্ট ছায়া দর্শকের চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইংরেজ যোদ্ধারা এই পেরিস্কোপ ডাঙায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটা নীচু গাড়ীর উপর থাপে-থাপে থাপানো নল ভাঁজিয়া ছোট করিয়া ভাঙিয়া শোয়াইয়া রাখা হয়।

পর্ব্বদর্শী নল।

গাড়ীটাকে একটা গাছ বা ঐরূপ উচ্চ দীর্ঘ কোনো আড়ালের কাছে রাখিয়া শোয়ানো নলটাকে খাড়া করিয়া ভাঁজ খুলিয়া খুলিয়া লম্বা করিয়া তোলে। তখন যোদ্ধা নলে চোখ দিয়া দূরের সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারে, অথচ শত্রুরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না যে তাহাদের গতিবিধি কেহ লক্ষ্য করিতেছে। এই কৌশলে ইংরেজরা বহু যুদ্ধে জার্ম্মানদের ঠকাইয়া তাদের গতিবিধি জানিয়া লইয়াছে।

থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে ঝড়জল বন্যা—

য়ুরোপ ও আমেরিকা বাস্তবের ভক্ত; আমরা কল্পনাপ্রবণ। আমাদের যাত্রায় সিন বা দৃশ্যপট নাই; বিলাতী থিয়েটারে দৃশ্যপটের বাহুল্য। আধুনিক বিলাতী থিয়েটারে ভূদৃশ্য ছাড়া সাগরদৃশ্যও বাস্তব রূপে দেখানো হইয়া থাকে; সমুদ্রে তুফানে পড়িয়া প্রকাণ্ড জাহাজ জলে ডুবিয়া গেল, আরোহীরা ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া এক দ্বীপে উঠিল,—এমন ঘটনাও আজকালকার থিয়েটারে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া সত্য ও প্রত্যক্ষবৎ অভিনয় করা হয়। ঝড় জল বজ্র বিদ্যুৎ বন্যা প্লাবন প্রভৃতিও নৈসর্গিক ঘটনার মতনই অবিকল করা হয়। এইসবের জন্য থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে তোড়জোড় কলকব্জা আয়োজন-প্রয়োজনের অন্ত নাই। রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎভাগে এই-সব তোড়জোড় কলকব্জা দড়াদড়ি খাটানো থাকে। ষ্টেজ-ম্যানেজার বিদ্যুতের আলোর চাবি টিপিয়া টিপিয়া

থিয়েটারে ঝড়জল বিদ্যুৎ বন্যা অভিনয়ের কলকব্জা।
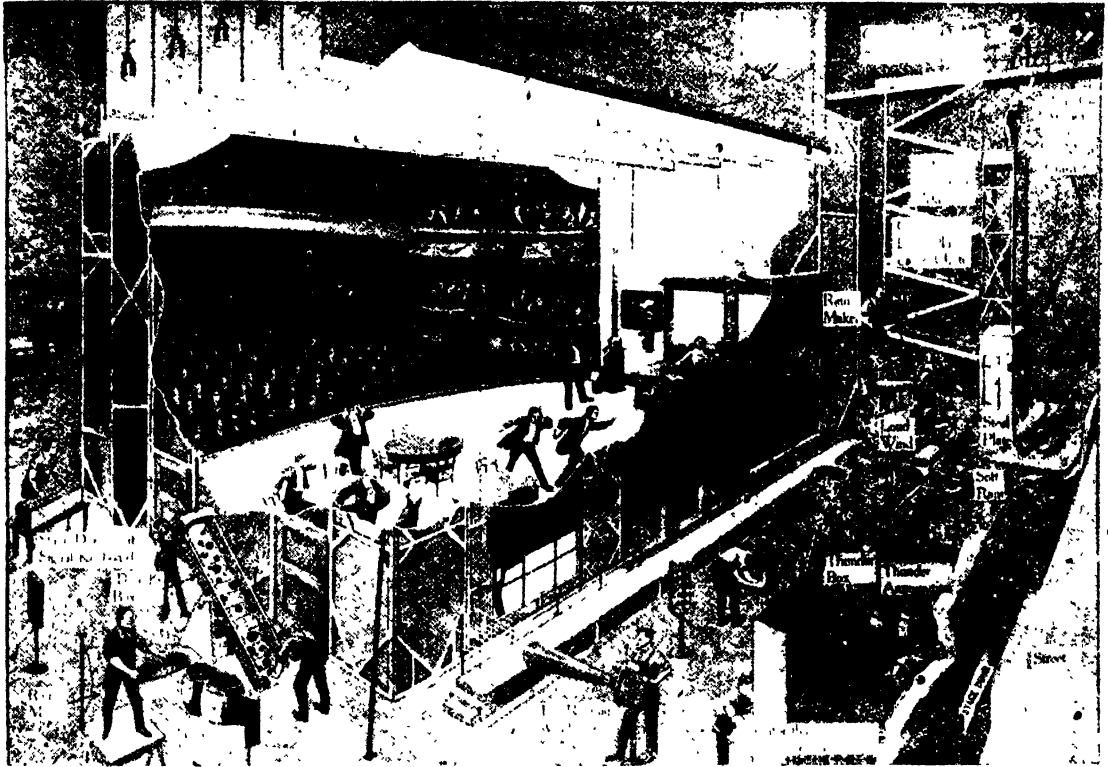
আলোক সঙ্কেতে তার সহকারীদের যখন যে কাজ করিবার তার ইঙ্গিত করে। যখন যে রঙের আলোর চাবি টেপা হয় সেই রঙের বাতি সহকারীদের সাম্‌নে জ্বলিয়া উঠে; তা দেখিয়া তারা ঠিক করে এইবার তাদের কি করিতে হইবে। কাঠের বারকোশের উপর মটর রাখিয়া চাল্‌নিতে চালিবার মতন ঘুরাইতে থাকিলে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হওয়ার মতন শব্দ হয়। একটা সরুজালে তৈরি ঢোলের মধ্যে মটর রাখিয়া সেই ঢোলটা ঘুরাইলে মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যায়। একটু বড় ফুকোরের জালের ঢোলের উপর ক্যান্‌ভাস বা চট মোড়া থাকে; সেই ঢোলটা চটের ওয়াড়ের মধ্যে ঘোরে; ঢোলের গায়ে চটের ঘস্‌ড়ানি লাগিয়া যে সোঁ সোঁ শব্দ হয় তাহা ঝড়ের বিভ্রম ঘটায়। নানা আকারের বাঁকনলের মধ্য দিয়া ফুঁ দিয়া বাতাসের নানাবিধ ডাক ও গর্জ্জনের নকল করা হয়। বড় বড় কেঠো বারকোশের ভিতর-পিঠটা আঁকাবাঁকা খাঁজ কাটা কাটা এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো থাকে; তার উপর কতকগুলা লোহার গোলা রাখিয়া বারকোশগুলাকে একবার এধার একবার ওধার উঁচু করিয়া ধরা হয়; তাহাতে লোহার গোলাগুলা গড়াগড়ি দিয়া যে শব্দ করে তা বজ্রনিনাদের অনুরূপ বোধ হয়। অর্গান-বাজ্‌নার মতন একরকম যন্ত্র আছে, তা বাজাইলে বাতাসের কম্পিত স্বর নির্গত হয়; সেইসঙ্গে লোহার পাতের উপর খুব মোটা লম্বা লোহার শিকল ফেলিয়া দিলে যে দারুণ শব্দ হয় তা আর ভুলিবার নয়; সেইসব শব্দ বাড়ীঘর ভাঙিয়া পড়া, গাছ উপ্‌ড়ানো, বন্যা প্লাবন প্রভৃতির বিভ্রম জন্মায়। এইসঙ্গে মুদ্রিত ছবিটি দেখিলেই আধুনিক রঙ্গমঞ্চের আয়োজনের আন্দাজ কতকটা হইবে।

বানর ও নর—

ডাক্তার উড্‌ জোন্‌স "আর্‌বোরিয়াল ম্যান্‌" নামে একখানা বইয়ে মানুষের সঙ্গে বানরের সম্পর্ক বিচার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন

বানরেরা গাছ চড়া অভ্যাস করিয়াছিল বলিয়াই বিবর্ত্তনে তারা দ্বিপদ মানুষ হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, চতুষ্পদ হইয়া যায় নাই। চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জীবের মধ্যে পার্থক্য শুধু এ নয় যে একজন চার পায়ে হাঁটে আর অপরজন দুপায়ে হাঁটে; কিন্তু এইটাই প্রধান যে দ্বিপদের আগের দিককার দুটা অবয়ব চতুর্দ্দিকে চালনা করা যায় আর তাহা দিয়া বস্তু ধরা যায়, এবং চতুষ্পদের চার-খানা পা আড়ষ্ট হইয়া থাকে। চতুষ্পদের দেহ ধরিয়া রাখিবার জন্য চারখানা পা খুঁটি হইয়া আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের শুধু দুখানা পা তার দেহ ধরিয়া থাকে বলিয়া হাত দুখানা মুক্তি পাইয়া নড়াচড়া করিতে শিখিয়াছে। মানুষের এই যে শক্তি তা তার অতীত জন্মের বাদুরে অভ্যাসের ফল; বানর গাছে চড়িয়া চড়িয়া তার চারখানা অবয়বকেই হাতে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল; সুতরাং চতুর্ভুজ হওয়াটা দেবত্ব না হোক বানরত্ব লাভ বটে নিঃসন্দেহ।

বানর হাতে পায়ে গাছের ডাল ধরিয়া থাকে বলিয়া তার মস্তিষ্ক খুব শীঘ্র পরিণতি লাভ করে। সে পায়েও ধরিয়া থাকিতে পারে বলিয়া হাত দুটা অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়া যথেচ্ছ নড়িতে চড়িতে শিখিয়াছে এবং এইরূপে পশ্চাতের অবয়বে নির্ভর রাখিয়া সম্মুখের অবয়বকে মুক্তি দিয়া বানর ক্রমে নরে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। বিবর্ত্তনে মানুষের হাতের গড়নে পরিবর্ত্তন বেশী হয় নাই, এ প্রকৃতির আদ্যকালের
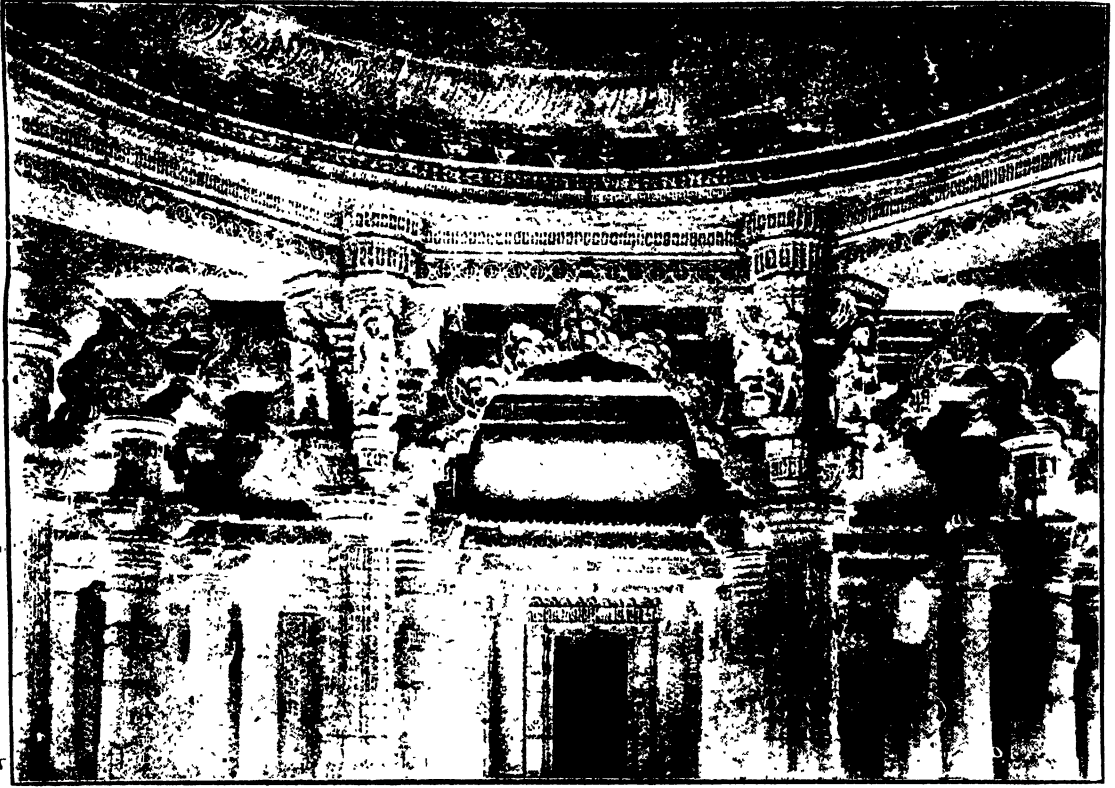
দিলওয়ারা মন্দির, আবু পর্ব্বত।

সৃষ্টি; কিন্তু তার পা বিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত নূতন সামগ্রী। অথচ পায়ের চেয়ে হাতের সম্মান ঢের বেশী—এটা সুবিচার নয়। বানর যখন গাছে ছিল তখন তার পা দিয়া গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিবার দরকার ছিল বলিয়া তার পায়ের আঙুলে দীর্ঘ পর্ব্ব ছিল; ক্রমে নর হইয়া মাটিতে হাঁটা অভ্যাস করিয়া পায়ের আঙুল খাটো হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে অঙুলগুলি ক্ষয় হইয়া একটিতে গিয়া ঠেকিবে—যেমন ঘোড়া গাধার হইয়াছে। এই প্রণালীতেই অষ্ট্রিচ হরিণ গোরু ছাগল প্রভৃতির আঙুল মাত্র দুটিতে আসিয়া পৌছিয়াছে। মানুষের নির্ভর বুড়ো আঙুলটির উপর, সুতরাং সেইটিই টিকিবে, অপর চারটি ক্ষয় হইয়া যাইবে।

বানর-বাচ্চারা শৈশবে মায়ের বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে থাকে; কারণ তাদের মায়েদেরও গাছে ঝুলিবার জন্য হাত মুক্ত রাখিতে হয়, তারা ছেলে ধরিয়া রাখিতে পারে না। শৈশবে তাদের হাতের ধরিবার শক্তি বয়স বৃদ্ধিতে কমিয়া যায়। এই ধর্ম্ম নর-শিশুতেও দেখা যায়, শিশুরা সর্ব্বদা মুঠা বাধিয়া থাকে, যত বড় হয় তত তার মুঠি শিথিল হইয়া হাত খোলে। ত্রিশ দিনের একটি নিগ্রো শিশুকে একটা লাঠি ধরাইয়া ঝুলাইয়া দেখা হইয়াছে সে এক মিনিটেরও বেশী সময় হোরাইজণ্ট্যাল বারে দোল খাওয়ার মত ঝুলিয়া থাকিতে পারে। এইরূপ সামর্থ্য পূর্ব্বজন্মের বৃক্ষবাসের ফল। এক মাসের বেশী বয়স হইলেই এই মুঠির জোর ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়। জার্ণাল অফ্ হেরিডিটি নামক আমেরিকার পত্রিকায় এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইতেছে।

বানরের চতুর্ভুজ হওয়া সত্ত্বেও সে মাটিতে হাঁটে চতুষ্পদেরই মতন, কিন্তু মাটিতে বা গাছে বসিয়া থাকিবার সময় সে দুপায়ে ভর করিয়া সোজা হইয়াই বসে, হাত দুখানা তখন মুক্তি পায়। এই অভ্যাস তাকে ক্রমে সোজা হইয়া চলিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ সোজা হইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া খোদার উপর খোদকারী করিতে গিয়া একটা বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিয়াছে। তার পেটের গড়ন চারপেয়ে অবস্থার মতন ছিল; বিবর্ত্তনে তার পেটের গড়ন খাড়া হইয়া চলিবার উপযুক্ত হইবার আগেই সে খাড়া হইয়া হাটিতে আরম্ভ করাতে পেটের নাড়িভুঁড়ির ভার ও চাপ এখন পেটের চামড়ার উপর না পড়িয়া এখন পড়িতেছে নীচের দিকে পাত্লা একটি পর্দ্দার উপর। এর ফলে মানুষের পেটের ও অন্ত্রের নানা রকম পীড়ার সৃষ্টি।

পূর্ব্ব জন্মে বৃক্ষবাসের ফলে মানুষের আর-একটা লাভ হইয়াছে সন্তানের সংখ্যা হ্রাস; আর পরম লাভ তার বুদ্ধির উৎকর্ষ। স্তন্যপায়ী জীবের প্রথম ইন্দ্রিয়জ্ঞান পরিস্ফুট হয় ঘ্রাণ। কিন্তু মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বৃক্ষবাস আরম্ভ করিলে অত উঁচুতে ঘ্রাণশক্তি আর কোনো কাজে লাগিত না; তখন ক্রমে অপর ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল আর তার ফলে মস্তিষ্কের নানান কোঠায় বুদ্ধি গজাইয়া উঠিতে সুবিধা পাইল। মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা এখনো সে ঘ্রাণ ও স্বাদের দ্বারা স্মরণ করিয়া রাখে। বৃক্ষবাসের ফলে মানুষের স্পর্শবোধ হাতের তেলোতেই সব চেয়ে তীক্ষ্ণ। এবং এর জন্য তার ঘ্রাণের দাসত্ব ঘুচিল, মস্তিষ্ককোটরে নূতন বুদ্ধি গজাইল।

হাত যত কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিতে লাগিল দেহের অপরদিকের

পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা তত কমিতে লাগিল। যাদের হাত সক্ষম নয় তাদের আত্মরক্ষার জন্য ও আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হয় গায়ের চামড়া পুরু শক্ত হয়—যেমন গণ্ডার; নয় দেহের স্থানবিশেষে গদি গজায়, আর নয়ত পায়ের খুর শক্ত হইয়া উঠে। মুক্ত অনুভবক্ষম হাত যেন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া মানুষকে সভ্যতার উন্নতির পথে লইয়া আসিয়াছে। হাতে ধরিয়া তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বস্তুর নানারূপ অনুভবের সঙ্গে দর্শনজ্ঞান যুক্ত হইয়া বুদ্ধির নানা দরজা খুলিয়া দ্যায়।

মানুষ হাত ও পায়ের কাজের পার্থক্য ঘটাইয়া গাছ ছাড়িয়া মাটিতে হাঁটিতে সুরু করিল ও ক্রমে দুনিয়ার মালিক হইয়া উঠিল; কিন্তু বনমানুষ চারখানাই হাত রাখিয়া বৃক্ষবাসীই হইয়া আছে।

এই বৃক্ষবাসের ফলেই বানরের মনে অপত্যস্নেহ প্রবল হইয়া উঠিয়া মানবে সঞ্চারিত হইয়াছে। গাছে গাছে লাফালাফির সময় অসহায় শিশুকে সযত্নে রক্ষা না করিলে তার মারাত্মক বিপদ ঘটা সম্ভব; এই জন্য সাবধান হইতে হইতে অপত্যস্নেহ সংস্কারে পরিণত হইয়া যায়। আবার এই অপত্য রক্ষার চেষ্টা ও শিশুর শৈশবকালের ব্যাপকতা হইতেই পরিবার গঠনের সূত্রপাত; প্রথমে মাতার যত্ন, তারপর জনকেরও সাহায্য হইতে পরিবারগত সহযোগিতা উৎপন্ন হয়। যে-সব জন্তুর অনেক বাচ্চা হয়, তাদের বাচ্চা একটু সক্ষম হইয়া উঠিলেই তারাও আর মা-বাপের তোয়াক্কা রাখে না, মা-বাপেও সন্তানের সন্ধান রাখে না; কিন্তু যাদের একটি বাচ্চা হয় তাদের বাচ্চার শৈশব দীর্ঘকালব্যাপী হয় বলিয়া মা-বাপের যত্ন বেশীদিন দরকার হয়; এর ফলে পারিবারিক বন্ধনের সূত্রপাত।

আপত্তি হইতে পারে যে, আরো ত অনেক প্রাণী গাছ-চড়া আছে, কিন্তু তারা কেন মানুষের মত উন্নত হইয়া উঠিতে পারিল না? তার কারণ, হয় তারা অন্যবিধ সংস্কার অর্জ্জন করার পর গাছ আশ্রয় করিয়াছিল, যেমন কাঠবিড়ালী, অথবা তারা গাছ আশ্রয় করিয়া সেই-রকম জীবনেই বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেমন বাদুড়, বানর—যারা চতুর্ভুজ; দ্বিভুজ ও দ্বিপদ নয়। মানুষ বিবর্ত্তনে অনেক উন্নত হইতে পারিয়াছে এই জন্য যে তার পরিণতি শীঘ্র নানা রকম হইলেও এখনো সম্পূর্ণ হইতে ঢের বিলম্ব আছে, মানুষ মস্তিষ্ক ছাড়া আর সব বিষয়ে একরকম আদিম অবস্থাতেই আছে, বিবর্ত্তনে আরো পরিবর্ত্তন ও অগ্রসর হইবে

চারু।
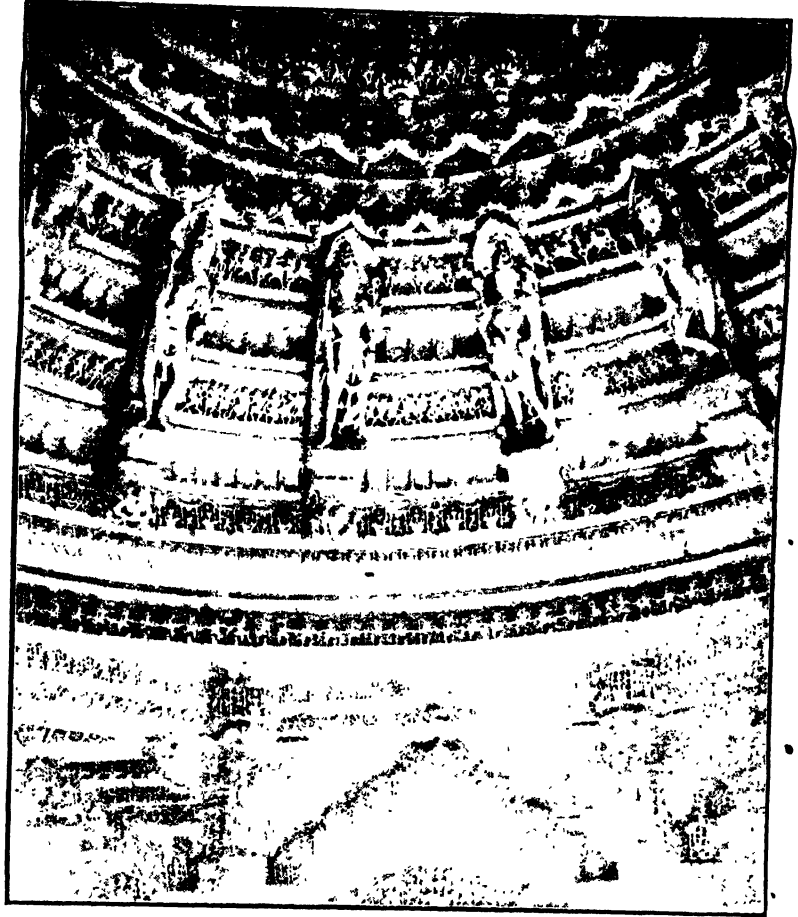
দিলওয়ারা মন্দিরের ছাদে ক্ষণ কারুকার্য্য।

আবু পর্ব্বত

রাজপুতানা দেশটা বনজঙ্গলে ভরা, যেখানে-সেখানে পাহাড় পর্ব্বত। কোথাও ছোট ছোট নির্ঝরিণীর উপর পাহাড়গুলি এমনভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যেন মনে হয় তাহারা উপুড় হইয়া পড়িয়া নদীর জলে কি যেন দেখিতেছে। নির্জ্জন উপত্যকায় কুলু কুলু স্বরে নদীর স্রোত বিচিত্র রাগিণী তুলিয়া পাষাণকারা ভাঙ্গিয়া পাগলপারা হইয়া কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এইসকল প্রকৃতি-সুরক্ষিত পর্ব্বত-কন্দরে কন্দরে রাজপুতদের এক-একটা দুর্গ শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য রহিয়াছে। অতীত যুগে স্বাধীন রাজপুত নৃপতিরা এই-সকল দুর্গে বসিয়া রাজ্য

পরিচালনা করিয়াছিলেন; এই-সব জায়গায়ই তাঁহাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, কার্ম্মুকের টঙ্কার অনুরণিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ কত দুর্গে কত রাজপুত সতী জহরব্রত অবলম্বন করিয়া হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। রাজপুতানার কপাল ভাল, সেইজন্য সে একজন দরদী ঐতিহাসিক পাইয়াছিল, যিনি তাহার অনেক খবর সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্কটল্যাণ্ডের-ভাগ্যে যেমন স্কট জুটিয়াছিলেন, রাজপুতানার ভাগ্যে তেমনি টড সাহেব জুটিয়াছিলেন। রাজস্থানে রাজপুতের শৌর্য্য বীর্য্য আত্মত্যাগের কিরূপ সুন্দর বিশদ বর্ণনা আছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। প্রত্যেক সামান্য একজন রাজপুত সর্দ্দারও মনে করিতেন তিনি এক মহদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রাচীন মহৎ
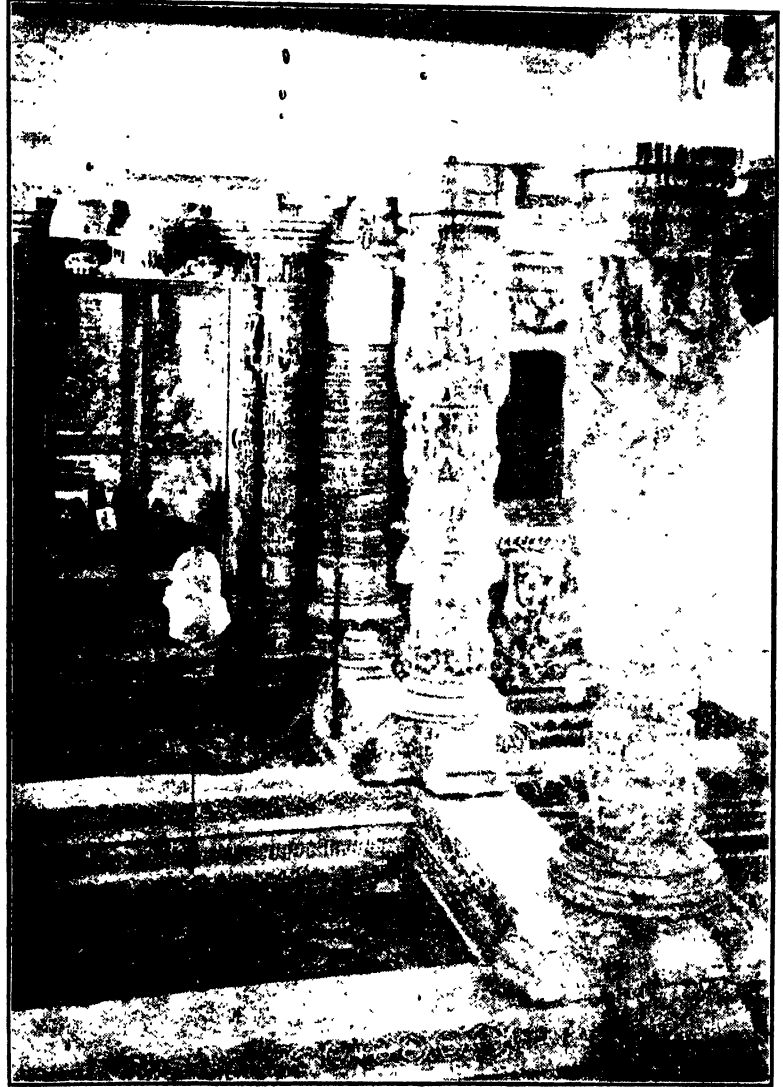
দিলওয়ারা মন্দিরের খোদাই করা থাম।

বংশের পবিত্রতা ও সুনামরক্ষা তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সকলের উপর নির্ভর করিতেছে। সর্দ্দার ব্যতীত পরিবারের অপর সকলেও এই দায়িত্ব একটুকুও কম বোধ করিতেন না। কতখানি ভূসম্পত্তি আছে তাহার উপর কিছুই নির্ভর করে না, বংশগৌরবই আদৎ গৌরব। দেশের বা ভূসম্পত্তির নামানুসারে (যেমন বিলাতী লর্ডদের) তাহাদের নামকরণ হইত না, বরং তাহাদের বংশের নামানুসারে দেশের নাম হইত। সাধারণতঃ রাজধানীর নামানুযায়ী রাজ্যের নাম হইত ও রাজধানীর নাম আবার রাজ্যস্থাপয়িতার নামে হইত। সমস্ত রাজপুত জাতির মধ্যেই বংশগৌরব রক্ষার জন্য একটা অদম্য স্পৃহা দেখা যায়। না খাইতে পাইয়া মরিলেও কোনও রাজপুত হলকর্ষণ করিবে না। হলকর্ষণের মত অপমানজনক কার্য্য যেন নাই—হলকে যেন তাহারা ভয় করে। কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে বর্শাহস্তে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাহার সাহস অদম্য—ভয় ভীতি তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। মরুভূমি বা পাহাড়ে তাহারা থাকে ভাল ও কাজকর্ম্ম সুবিধাজনক ভাবে করিতে পারে। এই পাহাড় ও

মরুর মধ্যে থাকার জন্য রাজপুতরা তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মের সম্পর্কীয় অনেক প্রাচীন প্রথা আমূল বজায় রাখিতে পারিয়াছে। সেইজন্য এখনও রাজপুতানা অন্ততঃ ঐসব কারণে কৌতূহল উদ্রেক করে।

আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমে একটা আলাহিদা শৃঙ্গ আছে। এই পর্ব্বত-শৃঙ্গের নামই আবু বর্ব্বত। আবু পর্ব্বত বনজঙ্গলে, উঁচু-নীচুতে ভরা। ইহা রাজপুতানায় সরকারের একটি শাসন-সংরক্ষণের কেন্দ্রস্থল। এখানে রাজপুতানার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ও স্বাধীন রাজপুতরাজ্যগুলির বহু এজেন্টের বাস। এইখানে বসিয়াই তাঁহাদের সারা বৎসরের কাজকর্ম্ম চলে। যোধপুর, মেওয়ার, জয়পুর প্রভৃতির এজেন্টগণের বাসস্থান ছাড়া আরও দুই কারণে আবুপর্ব্বত বিখ্যাত। ব্রিটিশ সৈন্যগণের ইহা স্বাস্থ্যনিবাস্ ও গরম কালের ঐ প্রদেশের সাহেবগণের শৈত্যাবাস। আর এখানে মর্ম্মরপ্রস্তরে হিন্দুশিল্পীর মনোহর কারুকার্য্যের নমুনা আছে। এখন সেখানে ১৭ মাইল দূর পর্য্যন্ত ট্রেনে ও বাকী পথ টোঙ্গায় যাওয়া যায়। টোঙ্গার ঘোড়া কএকবার বদল করিতে হয়। অথবা মোটরকারেও যাওয়া যায়। সব সময় মোটরে যাওয়া যায় না। ঋতুবিশেষে যাওয়া চলে। পথের প্রথম পাঁচ ছয় মাইল উপত্যকার সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, তৎপরে উঁচু নীচু পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পার্ব্বত্য পথ বড়ই মনোহর। কোথায়ও উঁচু পাহাড়, কোথায়ও গভীর খাদ। একটা বিরাট মহিমায় সমস্তটা মণ্ডিত। টোঙ্গা বেশ জোরে যায়। দ্রুতগামী টোঙ্গা থেকে খদের দিকে তাকাইতে ভয় হয়। কদাচিৎ এইসব পথে টোঙ্গার বিপদ ঘটিয়াছে। চালকেরা খুব ওস্তাদ লোক ও পথঘাট তাহাদের নখদর্পণে থাকায় তাহারা টোঙ্গা বেশ চালাইয়া লইতে পারে। উপত্যকাটি ১৫ মাইল লম্বা ও ৪ মাইল চওড়া। উপত্যকা হইতে চারিদিকের পর্ব্বতমালার দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। ইহার উচ্চতা ৪০০০ ফুট।

দিলওয়ারা মন্দিরের কারুকার্য্য।

রাজাদের প্রাসাদনিচয় রত্নহ্রদের তীরে অবস্থিত। রত্নহ্রদটি দেখিতে ভারি সুন্দর। চারিদিকের দৃশ্যও মনোরম। এই মনোরম দৃশ্যের মধ্যে এই হ্রদটি—হ্রদের মাঝে মাঝে, জলের মধ্যে-মধ্যে এক-একটি ছোট দ্বীপ মাথা উঁচু করিয়া আছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম রশ্মিজালহ্রদের জলে পড়িয়া এমন এক স্বর্গীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করে যে মনে হয় শুধু ভারতে কেন পৃথিবীতে এরূপ দৃশ্য দুর্লভ।

কিন্তু সকলের সেরা সুন্দর জিনিস এখানকার হিন্দু-স্থাপত্য ও কারুকার্য্যের উজ্জ্বল নিদর্শন দিলওয়ারা মন্দির। অমিশ্র হিন্দুশিল্পের ইহা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে উপত্যকাটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়া গ্রেনাইট পাথর আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে এক বিপুলকায় মর্ম্মর-পর্ব্বত অপরূপ সৌন্দর্য্যে ঝল্‌মল্ করিতেছে। এই শ্বেত-মর্ম্মরশৃঙ্গ পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ যেন তথায় দাঁড়াইয়া আছে। এখানে চারিটি পবিত্র মন্দির আজ থেকে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জনৈক রত্নবণিকের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হয়। পৃথিবীতে তাঁহার প্রচুর ধনসম্পদপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাই তিনি ভগবানকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য এই মন্দির অর্থব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করান। বাহির হইতে মন্দিরগুলি দেখিতে তেমন চিত্তাকর্ষক নহে। কিন্তু একবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। অভ্যন্তরের মর্ম্মরশিল্প বুঝি বা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। আবু পর্ব্বতেই এই

দিলওয়ারা মন্দিরের বাহ্যদৃশ্য।

নীচে যখন অসহ্য গরম পড়িয়া যায়, পাহাড়ের ঠাণ্ডা তখন কি আরাম ও আনন্দদায়ক। গরমের দিনে যদিও ভীড় হয়, কিন্তু বাড়ীঘর বেশ পাওয়া যায়। সাহেবী-ধরণের দুইটি বড় হোটেল ও ভ্রমণকারীর বিশ্রামগৃহ নামে একটি পান্থশালা আছে। কিন্তু শীতকালে একটু অসুবিধা। পূর্ব্বে খবর জানাইয়া গেলে অসুবিধায় পড়িতে হয়, কারণ সে সময়ে তেমন বন্দোবস্ত থাকে না।

সহরটি ছোট, কিন্তু দর্শনীয় স্থান কাছে ভিতে অনেক আছে। বৃটিশ রেসিডেন্টদের বাড়ীগুলি, বিভিন্ন রাজপুত

মর্ম্মরপ্রস্তর পাওয়া যায় নাই—দূর থেকে ইহাকে বহন করিয়া পাহাড়ে টানিয়া তুলিয়া মন্দির তৈরী করা হইয়াছে। কত বিপুল পরিশ্রম, কত বুদ্ধিকৌশল, কত অধ্যবসায়ের ফলে শত-শত মাইল দূর হইতে এই-সকল প্রস্তর আনা সম্ভবপর হইয়াছে। দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবেন, তখনকার দিনে কি করিয়া অত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দূর থেকে আনিয়া পাহাড়ে অভগ্ন অবস্থায় টানিয়া তোলা হইয়াছিল। কিন্তু হায় কি উপায়ে ইহা সাধিত হইয়াছিল ইতিহাস বা কিম্বদন্তী সে সম্বন্ধে মূক। ভারতের শিল্পবিজ্ঞান, স্থপতিবিদ্যা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিঞ্চিদাধুনিক মন্দিরগুলি প্রস্তুত করিতে ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল ও ১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা বাদে পাহাড় সমতল করিতে ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

প্রাচীন মন্দিরগুলি ১০৩২ খ্রীঃ বিমল সার অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হয়। জৈন মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে ইহা একটা সুড়ঙ্গের মত। শুধু দরজা দিয়া মন্দিরের ভিতরে আলো প্রবেশ করে। কেমন একটা রহস্যময় আলো ও আঁধারের মিশ্রণে গভীর ভাবের উদ্রেক করাই ইহার উদ্দেশ্য। মহাবীরের ধ্যানীমূর্ত্তিই মন্দিরের দেবতা। মন্দিরের মেঝের দিকটা চওড়া। মেঝে হইতে বাঁকা হইয়া দুপাশের দেওয়াল ঝুঁকিয়া মাঝের ফাঁক ক্রমশঃ সরু হইয়া দুইটি দেওয়াল পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে, অনেকটা পিরামিডের আকার। এই বাঁকানোতে নানাপ্রকার শিল্প-সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের দেবতা কালো কষ্টিপাথরের তৈরী, কিন্তু মন্দিরের আর সমস্তই শ্বেতমর্ম্মরের। মূর্ত্তিটি আকারে প্রায় মানুষের সমান ও কালো পাথরের উপরে আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে মূর্ত্তিটিতে দোদুল্যমান বিবিধ মণিমুক্তাগুলি ঝক্‌মক্ করে। মন্দিরপ্রাঙ্গণ স্তম্ভের সারি দিয়া ঘেরা। স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কুলুঙ্গীতে শ্বেতমর্ম্মরে বিনির্ম্মিত নানা দেবদেবীমূর্ত্তি। প্রধান দুইটি মন্দিরের স্থপতি-কৌশল প্রায় একই, কিন্তু শিল্পকার্য্যে ঢের তফাৎ। মনে হয় এ মন্দিরের একখানা পাথরেরও শিল্পকৌশলের সহিত অপর মন্দিরের একখানা পাথরেরও শিল্পকৌশলের একটুকুও মিল নাই। প্রত্যেক জায়গায় শিল্পী নূতনত্বের রঙ ধরাইয়াছে। লম্বা লম্বা কড়িগুলি এক প্রান্তের স্তম্ভ হইতে অপর প্রান্তের স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রসারিত ও ইহার উপরে ছাদ রক্ষিত। এই লম্বা লম্বা কড়িগুলি মাঝখানে বেঁকিয়া যায় না, তার কারণ এই যে, প্রত্যেক স্তম্ভের মাঝখান হইতে একএকটা ডাল বাহির হইয়া কড়ির মাঝখানে পৌঁছিয়াছে। মন্দিরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় যত্রতত্র শিল্পীর সুনিপুণ হস্তের এত পরিচয় পাওয়া যায় যে কোন্‌টি ফেলিয়া কোন্‌টি বলা যায় ঠিক করা কঠিন এবং ভাষায়ও তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য ব্যাপার। ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য ফোটোগ্রাফেরও সাধ্য নাই যে ব্যক্ত করে। মন্দিরের গম্বুজগুলি মনে হয় যে অরুণালোকদীপ্ত সমুদ্র-ফেনা। মন্দিরগুলি জৈন ধর্ম্মের অভিব্যক্তি সূচনা করে। জৈন ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই হইতেছে সাংসারিক সকল বন্ধন মোচন করিয়া সকল সুখদুঃখ অতিক্রম করা। জৈন সেই জন্যই মন্দির নির্ম্মাণ করে যাহাতে পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য হইতে তফাতে থাকিতে পারে এবং অন্তিমে শান্ত সুশীতল ছায়ায় দিন কাটাইতে পারে। স্বচ্ছ মর্ম্মরপ্রস্তরের মধ্য দিয়া দেওয়াল ফুটিয়া ক্ষীণ আলোক-রেখা মন্দিরে প্রবেশ করে ও ধ্যানী মূর্ত্তির উপর পড়িয়া তাঁহাকে সুন্দরতর করিয়া তোলে। প্রত্যেক মূর্ত্তির একই ভাব—শান্ত ও পরিশ্রান্ত ও ধৈর্য্যসম্পন্ন। জৈনদের নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে হইলে ধৈর্য্যের সহিত আটবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় ও জীবন কাটাইতে হয়। এই ধৈর্য্যসহকারে জীবনযাপনের বিকাশ দেবমূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

আবুপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বনজঙ্গল সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ ও কিম্বদন্তীর উদ্ভব হইয়াছে। এই-সকল প্রধান মন্দির হইতে হাঁটিয়া কিছুদূর গেলে আরও কএকটি মন্দির দেখা যায়। এগুলিকে অচলগড়ের মন্দির কহে। ওখানকার লোকেরা এই-সকল মন্দির সম্বন্ধে নানা গল্প করে ও তাহা হইতেই বুঝা যায় মন্দিরগুলি তাহাদের কাছে কিরূপ প্রিয়। দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতি যে অনেক পরিমাণে দেশের লোকের চরিত্র ও প্রকৃতি গঠন করে তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। রাজপুতেরা যে কেন ঐরূপ বীর দুর্দ্ধর্ষ, তাহার প্রমাণ তাহাদের দেশমাতৃকা।

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

আলোচনা

বাংলার প্রথম মাসিক পত্র।

গত বর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রবাসীর বয়স আলোচনায় সম্পাদক লিখিয়াছেন:—"কোন সাময়িক পত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় নাই।" কিন্তু বাস্তবিক ইহা ঠিক নহে। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন:—"সাহেবদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে আমরা উপকৃত; কিন্তু আমরা এবিষয়ে শ্লাঘা করিতে পারি যে, একজন বাঙালী বাংলা সংবাদপত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা।" (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃঃ ৫৮।) এই বাংলা সাময়িক পত্রের নাম ছিল—"বেঙ্গল গেজেট" ও ইহা ১৮১৬ (১২২৩) সালে আরম্ভ হইয়াছিল। এসম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "জন্মভূমিতে" (১৩০৩) লিখিয়াছিলেন:—"প্রথম বাংলা সম্বাদপত্রের (বেঙ্গল গেজেটের) নামকরণ অবিকল ইংরেজী শব্দেই হইয়াছিল। এই সংবাদপত্রের সম্পাদক একজন বাঙালী, জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ, নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।... বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকার ইতিবৃত্তে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের নাম ও ১৮১৬ খৃঃ অঃ—দুইই চিরস্মরণীয় বিষয়।'

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বেঙ্গল গেজেট যে মাসিক কাগজ ছিল, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় "সৌরভে" (১৩২৩, ভাদ্রে) লিখিয়াছিলেন:—"বেঙ্গল গেজেট" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক পত্র। লং সাহেব তাঁহার বাংলা গ্রন্থ-তালিকায় বেঙ্গল গেজেটকে সংবাদপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাহা সংবাদপত্র ছিল না। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত এবং ইহাতে সম্পাদকের লিখিত বিদ্যাসুন্দর, বেতাল-পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য-সকল প্রতিকৃতি সহ মুদ্রিত হইত। বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইহাই আদিম পথপ্রদর্শক।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১০২ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সাময়িক পত্র ছিল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

পুস্তক-পরিচয়

১। বীরবিক্রম—দৃশ্য কাব্য। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্ত্তৃক ইব্‌সেনের দি ওয়ারিয়ার্‌স্ অফ্ হেলিগোল্যাণ্ড বা ভাইকিংগ্‌স্ নামক প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটকের অনুবাদ। দাম আট আনা। প্রকাশক সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা।

বীরবিক্রম নামেই বুঝা যাইবে যে ইহা অবিকল অনুবাদ নহে; বিদেশী জিনিসকে দেশী ছাঁচে ঢালা। অবিকল অনুবাদের চেয়ে দেশী পরিচ্ছদে দেশী ভাবে সাজাইতে পারিলে বিদেশী জিনিস অধিক চিত্তগ্রাহী হয়। লেখক এই পন্থা অবলম্বন করিয়া ভালোই করিয়াছেন। আর-একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বইখানি আগাগোড়া কথ্য ভাষাতে লেখা; সুতরাং কোথাও এর আড়ষ্টতা বা পঙ্গুতা নাই। যাঁরা ইংরেজিতে ইব্‌সেনের বই পড়েন নাই, তাঁরা বিদেশী সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রত্নের সহিত পরিচয় করিবার এই সুযোগ নিশ্চয় অবহেলা করিবেন না।

২। প্রীতি, কণিকা, শোকগাথা—মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর রচিত কবিতার বই।

৩। সুখদা—শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য। কেণ্ড কোং, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট। এক টাকা। কবিতার বই।

৪। আত্মদান—শ্রীকালীনাথ ঘোষ, ২৯ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। চার আনা।

ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য লিখিত নাটকাকারে উপদেশের তালিকা। রবীন্দ্রনাথের লিখিত কথা কাব্যের অন্তর্গত মস্তকবিক্রয় নামক গাথার বিষয় এই নাটকের উপজীব্য। অমন ভালো জিনিসটার এমন দুর্গতি না করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইত।

৫। আর্য্যপৌণ্ড্রকের বৃত্তিবিচার—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল শ্রীশ্রীমস্তচন্দ্র ভরসা, বামন-পুকুরিয়া, বসিরহাট। তিন আনা।

১৯১১ সালের সেন্সস রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে পোদজাতির পরম্পরাগত জীবিকা মাছ-ধরা ও মাছ-বেচা। তারই প্রতিবাদ করিয়া লেখক দেখাইতে চান যে পোদ সৎজাতি, তাদের তৈরি চিঁড়া লোকে খায়, তাদের ব্যবসায় প্রধানত কৃষি।

৬। দরিদ্র-নারায়ণ—শ্রীমধুসূদন আচার্য্য কাব্যপুরাণ-তীর্থ। প্রকাশক শ্রীহীরালাল সাহা, বালিয়াটি, ঢাকা। দশ আনা।

গ্রন্থকার খোলা মনে কোনোরকম সঙ্কীর্ণ সংস্কারের বশ না হইয়া এই পুস্তক লিখিয়াছেন। দরিদ্র নারায়ণ, প্রাচ্য-ধর্ম্ম ও দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, পাশ্চাত্য-সেবাধর্ম্ম, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও দরিদ্র সেবা, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার প্রণালী নামক পরিচ্ছেদে দরিদ্র-সেবার সমস্ত দিক বিচক্ষণতার সঙ্গে সমালোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক হিতসাধনমণ্ডলী ও সমিতির ইহা পাঠ করা উচিত এবং সেবাপরায়ণ ব্যক্তিরও পঠনীয়।

৭। নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলীর অন্যতম।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের নানান শাখার কিরূপ বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছে তাহারই আভাস বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। লেখকের ভাষা এমন সরস ও রচনাভঙ্গী এমন রুচিকর যে বিজ্ঞানের বর্ণনাও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। এডিসনের ফনোগ্রাফ তৈয়ারির ইতিহাস, এমিল ফিসারের প্রাণীজ প্রোটিন প্রস্তুত, পানামা খাল খনন, ডিনামাইট, ইলেক্‌ট্রন্-তত্ত্ব, রেডিয়ম-তত্ত্ব, রঞ্জন-আলোকতত্ত্ব, পাস্তুরের জীবাণু আবিষ্কার, ম্যালেরিয়া ও মশার সম্পর্ক, ঋতুতত্ত্ব, বেল কর্ত্তৃক টেলিফোন আবিষ্কার, এয়ারোপ্লেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের আলোর ইতিহাস, অপ্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তির থিওরী, দ্রব্য রক্ষায় বরফের স্থান ও কার্য্য, বিনা তারে টেলিগ্রাফ চালাইবার মূলতত্ত্ব জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, জগদীশচন্দ্র কর্ত্তৃক জড় উদ্ভিদ ও জীবের সমতা প্রতিপাদন প্রভৃতি বিষয় ১৫টি পরিচ্ছেদে নানাবিধ গল্পের ভিতর দিয়া বর্ণনা করাতে বেশ চিত্তাকর্ষক ও সহজবোধ্য হইয়াছে। এই রকম সাধারণবোধ্য ভাষায় বহুসংখ্যক বিজ্ঞানগ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত।

৮। গুরুগোবিন্দ সিং—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি, ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা। কাপড়ে বাঁধা, ৪৬২ পৃষ্ঠা, ১৯খানি চিত্র সম্বলিত।

ইহাতে শিখ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিস্তৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুগোবিন্দ সিংহজীর জীবন-কাহিনী বিস্তৃতভাবে মূল শিখ গ্রন্থ হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গোবিন্দ সিংহজীর জীবন-কথা পাঠ আমাদের জাতীয় গৌরব উপলব্ধির একটি উপায়। সুতরাং ইহা সকল দেশভক্ত লোকের পাঠ করা উচিত। গুরুগোবিন্দ সিংহের

এত বড় বিশদ ও সম্পূর্ণ জীবনচরিত এর আগে প্রকাশ হইতে দেখি নাই। থাকিলেও, এই লেখক গুরুমুখী ভাষা জানেন, এজন্য তাঁর গ্রন্থ প্রামাণ্য বেশী।

৯। ফরাশী-বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্তর্গত।

এইরূপ ইতিহাস যত রচিত ও প্রচারিত হয় ততই সমাজের কল্যাণ। লেখক ও প্রকাশকদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

১০। স্যমন্তক—শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ভাটিখাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম। ২২০ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা।

মহাকাব্য, ত্রয়োদশ বিকাশে সম্পূর্ণ। দ্বারকাধিপতি সত্রাজিতের স্যমন্তক মণির পুরাণ-কথা লইয়া এই কাব্য অমিত্র ও মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। "মনঃ" "অপযশঃ" "শিরঃ" "পুনঃ" "ঊর্দ্ধরেতাঃ" প্রভৃতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ভূত বাংলা ভাষার ঘাড়ে চাপাইয়া খুব আড়ম্বরে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের অনুকরণ ছাড়া এই কাব্যে বিশেষত্ব বা প্রশংসাযোগ্য কিছু দেখিতে পাইলাম না।

১১। হাসি-পরিহাস—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত। ৩৯ দয়াগঞ্জ রোড, ঢাকা। আট আনা।

এখানি রঙ্গ-ব্যঙ্গ কবিতার বই। রসিকতা অত্যন্ত আড়ষ্ট অপুষ্ট, ইংরেজিতে যাকে বলে crude। কোনো কোনো কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যের বা রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুকের বা রজনীকান্তের ব্যঙ্গ রচনার ছায়া আছে। তা ছাড়া কবিতার শরীরের সৌষ্ঠবও নিখুঁত নয়; কোনো কবিতাতেই ছন্দ বাঁচে নাই, পদে-পদে জখম হইয়া পঙ্গু হইয়াছে। যেখান-সেখান থেকে তুলিয়া দুটি নমুনা লইয়া দেখাই-তেছি। "স্বামীর কর্ণে মন্ত্রণাদান" কবিতার প্রথম দুটি শ্লোক লওয়া যাক। প্রথম দুই পংক্তিতে চার চার চার দুই মাত্রা আছে; সুতরাং পাঠকের মন ও কান সেই ক্রমই বরাবর আশা করিবে; কিন্তু লেখক পরবর্ত্তী পংক্তিতে সে ক্রম রাখিতে পারেন নাই।

	১০ ১ ১১	১ ১ ১ ১	১০১ ১১০	১১
প্রথম পংক্তি,	বুঝলে কিনা	সংসারেতে	চললে এমন	করে

	১১০১০১	১০ ১ ১ ১	১০১ ১০	১০
তৃতীয় পংক্তি,	সময় থাকতে	ভাই তোমারে	বলচি বার	বার

এই পংক্তির শেষে 'বারবার' না লিখিয়া 'বারংবার' লিখিলে তবু ছন্দ রক্ষা হইত।

দ্বিতীয় নমুনা—

	২ ১ ১১	২ ১ ১১০	২ ১ ১ ১ ১	২১
১ম পংক্তি,	জীর্ণ জামা	জীর্ণ চাদর	জীর্ণ মলিন	বস্ত্র

'জীর্ণ' 'বস্ত্র' প্রভৃতি শব্দের শেষে যুক্তাক্ষর থাকাতে পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় বলিয়া দু মাত্রা। সুতরাং এখানে মাত্রা বিভাগ পাঁচ পাঁচ পাঁচ তিন। কিন্তু পরের পংক্তিতে—

ভাংগা জুতা। ভাংগা লাঠি। ভাংগা পুরান্। ছত্র

না লিখিলে ছন্দ থাকে না; কারণ "ভাঙ্গা" শব্দের উচ্চারণ আমরা "ভাংগা" করি না, উচ্চারণ করি "ভাঙা"। এবং পুরান্ নয়, পুরানো।

এইরূপ ছন্দের ত্রুটি সর্ব্বত্র। ভাবসম্বন্ধেও নূতনত্বের দৈন্য সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। চেষ্টাকৃত রঙ্গব্যঙ্গরসিকতা পণ্ডশ্রম।

১২। বিবেকানন্দ—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। লক্ষ্মী-বিলাস পাবলিশিং হাউস, ১২ নারিকেল বাগান বা ৫১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। মহাপুরুষদের জীবনীর যতই আলোচনা হয় ততই ভালো।

১৩। পিতৃবিলাপকাব্য ও বিবিধ কবিতা—শ্রীহৃষীকেশ দত্ত। প্রকাশক শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত, আড়ংপাড়া, খুলনা। ১৬৭ পৃষ্ঠা, এক টাকা ও পাঁচ সিকা।

বিশেষত্বহীন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সুদীর্ঘ ভূমিকায় সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও আমরা এর মধ্যে প্রশংসার কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না।

১৪। রামায়ণে পারিবারিক চিত্র—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এস. সি. আঢ্য এণ্ড কোং, ৫৮ ও ১২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধা। ২৬২ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

বইএর নাম দেখিয়া বড়ই আশা করিয়াছিলাম হয়ত লেখক রামায়ণের পারিবারিক চিত্রগুলির মাধুর্য্য বিশেষত্ব জটিলতা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া আখ্যানের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছেন। বই খুলিয়া হতাশ হইয়া দেখিলাম তেমন চেষ্টা মোটেই নয়, রামায়ণের উপাখ্যান গদ্যে অধ্যায় ভাগ করিয়া খুব ভারিক্কি ভাষায় লেখা হইয়াছে। সুতরাং এর নাম শুধু রামায়ণ রাখিলেই ঠিক হইত। স্কুলপাঠ্য বই হইবার উপযুক্ত। উচ্চ সাহিত্যে এর স্থান নাই।

১৫। সচিত্র রামায়ণ—অন্ধ অধিপতি বালা সাহেব পণ্ডিত পান্ত্‌ প্রতিনিধি, বি.এ. কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও চিত্র সন্নিবেশিত।

শ্রীযুক্ত সার্জন-মেজর বামনদাস বসু মহাশয় ভূমিকায় ছত্রপতি শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের এক অংশ অন্ধ বা ঔন্ধ রাজ্যের প্রতিনিধি- বা Viceroy বংশের ইতিহাস ও বর্ত্তমান প্রতিনিধি এই গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"বাল্যকাল হইতেই তিনি চিত্রাঙ্কণকার্য্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'চিত্রে রামায়ণ' তাঁহার প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ। ইহাতে রামায়ণের প্রধান-প্রধান ঘটনাগুলি প্রায় ষাটখানি চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই লেপনীবিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু বালাসাহেবের ন্যায় চিত্রাঙ্কণে পারদর্শী আর কেহ আছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। এই গ্রন্থের চিত্রের মূলগুলি রাজা সাহেবের স্বহস্তাঙ্কিত।"

এক-একখানি চিত্রের সম্মুখের পাতে রামায়ণে বর্ণিত চিত্রের বিষয়টিরও বিবরণ দেওয়া আছে; সুতরাং ইহা কেবলমাত্র চিত্রপুস্তকই নহে। চিত্রগুলি খুব কলাসৌষ্ঠবসম্পন্ন না হইলেও, অসুন্দর নয়; বাংলায় যে দু-একখানি চিত্রে বর্ণিত পুস্তক আছে তাদের ছবির চেয়ে খারাপ নয়। ছবিগুলির ছাপা খুব ভালো। বইএর কাগজ ছাপা বাঁধা সৌষ্ঠব নিখুঁত সুন্দর। এই বই অভ্যাগত তোষণের জন্য বাড়ীর বৈঠকখানার টেবিলে, এবং ছাত্রতোষণের জন্য স্কুল ও লাইব্রেরীর আলমারীতে থাকিলে তাহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইবে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের রামায়ণের ঘটনার সহিত পরিচয় করাইবার ইহা একটি সহজ সাধন। রামায়ণ আমাদের ঘরে-ঘরে সমাদৃত; সুতরাং এই 'চিত্রে রামায়ণেরও' সমাদর হইবে—বিশেষ করিয়া ধনী সাহিত্যশিল্পরসিকেরা ইহার সমাদর করিবেন আশা করি।

বইএর দাম বারো টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট ঔন্ধে, অথবা কলিকাতার এজেণ্ট রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স ৯০।২ A হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মুদ্রারাক্ষস।

১৬। অভিমানিনী—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্ এ, বি-এল্, সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশক শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য; অন্নদা বুক-ষ্টল্‌; ৭৮২ নং হ্যারিসন রোড। এখানি উপন্যাস,—ছায়া, মেঘ ও ঝড় এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। নাম শুনিলে মনে হয় বাঙালী গৃহস্থ ঘরের কোনো অভিমানিনী বধূর গল্প। সেই রকম একটি মেয়ের নাম বইখানিতে আছে বটে, লেখকও সেই মালতীকেই অভিমানিনী আখ্যা দিয়া নায়িকা মনে করিতে বলিতেছেন, কিন্তু মাত্র ২৩৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী উপন্যাসখানির জন কুড়ি পঁচিশ প্রধান নায়ক-নায়িকার ভীড়ে সে বেচারী যে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে তার ঠিক নাই। লেখক যদি মালতীর স্বামী শচীন্দ্রকে দিয়া তাহার ফোটোর তলায় বড় বড় অক্ষরে 'অভিমানিনী' না লিখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতেই পারিতাম না যে মালতীই এই উপন্যাসের নায়িকা। বইটিতে মোটের উপর এত রকম অসম্ভব ও আজগুবি বিষয়ের হুড়োহুড়ি যে তাহার সারাংশ দেওয়া আমাদের অসাধ্য। দু এক কথায় বলা যায় ইহাতে জুয়াচুরি, মারামারি, মেকি টাকা করা, জাল মানুষ সৃষ্টি, নৌকাডুবি, পথে ঘাটে প্রেমে পড়া, অপঘাত মৃত্যু, জেল খাটা, ছেলে ধরার হাঙ্গাম, খুনোখুনি, প্রভৃতি অনেক সম্ভব ও অসম্ভব ব্যাপার আছে, কিন্তু গৃহস্থ-বধূর চিত্র নাই। বাঙালীর জীবন বৈচিত্র্য-হীন বলিয়া উপন্যাস-লেখকদের প্লটের বড়ই অভাব। সেই জন্য নূতনত্বের সৃষ্টি করিতে গিয়া এত কাণ্ড বাধাইয়া বসিবার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে হয় না। লিখিবার ক্ষমতা থাকিলে ছোটখাট নিত্য-পরিচিত ব্যাপারই ছবির মত ফুটিয়া উঠে; তাহার অভাবে কেবল অভাবনীয় ঘটনাবলীর মালা গাঁথিয়া গেলে কোনোই লাভ হয় না। মানুষের যত রকম শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কষ্ট আছে লেখক তাঁহার নায়ক-নায়িকাদের ঘাড়ে প্রায় সবই চাপাইয়াছেন। বছর তের চোদ্দর একটি যুবককে (?) দিয়া বিপন্নের সাহায্য করাইয়াছেন; তাহার ফলে সে জেলে গেল, সেখানে এক অনুতপ্ত কয়েদীর মরণকালে তার ঋণ-শোধের ভার লইল, সেই কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া বেচারী এক দাগী আসামীর কবলে পড়িল, পরিণামে গোয়েন্দাগিরি করিয়া দাগী আসামীকে সদলবলে পুলিশের হাতে ধরাইয়া আর-এক বিপন্ন মহিলাকে অত্যাচারীর কবল হইতে উদ্ধার করিল। এই শিশু যুবকটির বীরত্বের ছবিটা একেবারে অস্বাভাবিক। লেখকের এক নায়িকা ব্রাহ্মমহিলা; উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলার পক্ষে এই নায়িকা নীহারের মত বেশ-ভূষা করা ও বিনা আপত্তিতে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত জাল-স্বামীর ঘর করিতে যাওয়াটা কোনো কালেও সম্ভব কি না জানি না। মোটের উপর বলিতে গেলে লেখকের মত উচ্চ উপাধিধারীর কাছে আমরা এ-রকম রচনার আশা করি নাই।

১৭। পথহারা—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য। অন্নদা বুক-ষ্টল, ৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। এখানিও উপন্যাস। বইখানির প্লটে নূতনত্ব আছে। তবে সে নূতনত্ব ঠিক স্বাভাবিক কি না পাঠক গল্পের চুম্বক দেখিয়া বিচার করিবেন। অজয়কুমার মিত্র ধনবানের 'একমাত্র দৌহিত্র'। অজয়ের মা হৈমবতী পিতৃসম্পদের গর্ব্বে ধরাকে সরা দেখেন। এম্‌-এ-পাশ পুত্র অজয় মায়ের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রিয়তমা স্ত্রী অরুণা ও পুত্র সনৎকে বাড়ীতে রাখিয়া মানুষ হইয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছায় মায়ের অজ্ঞাতে পশ্চিমে চাকরীর সন্ধানে গেলেন। দেশ-বিদেশে ঘুরিতেন বলিয়া বাড়ীতে কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা দিয়া চিঠি লেখেন নাই। একদিন কানপুর যাইবার পথে ট্রেনে ধনী বণিক ধরণীবাবু ও তাঁহার শিক্ষিতা বয়ঃপ্রাপ্তা ও তেজস্বিনী কন্যা জ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচয় হইল। তাঁহারা লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে নামিয়া যাইবার একটু পরেই একটা মালগাড়ীর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হইয়া ছুইটি ট্রেনই চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। ধরণীবাবুরা গাড়ীতে অজয়ের ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়া এই দুর্ঘটনায় তাহার কোনো ক্ষতি হইয়াছে কি না জানিতে ষ্টেশনে আসিলেন। সেখানে অজয়কে অজ্ঞান অবস্থায় পাইলেন। তাহার আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তাহার একমাত্র সম্বল নোট-কেস খুলিয়া 'অজয়কুমার মিত্র' লেখা একখানি কার্ড ও কিছু টাকা মাত্র পাইলেন। ধরণীবাবু অজয়কে বাড়ী আনিয়া চিকিৎসা ও সেবা করিতে করিতে বুঝিলেন যে "মস্তিষ্কে স্নায়বিক আঘাত লাগিয়া রোগীর পূর্ব্ব-স্মৃতি আংশিক ভাবে লোপ পাইয়াছে।" তাহা ফিরিয়া আসিবে কি না, এবং আসিলেই বা কতদিনে কেমন ভাবে আসিবে বলা শক্ত। চিকিৎসায় ও জ্যোৎস্নার সেবায় অজয় ক্রমে তাহার অতীত জ্ঞান বুদ্ধি ফিরিয়া পাইল, চেনা পথ ঘাটও চিনিল, কেবল 'বিস্মৃত জীবনকথা' ফিরিয়া পাইল না। তাহার আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করিবার ইচ্ছায় জ্যোৎস্না পিতার সঙ্গে তাহাকে লইয়া নানা দেশ বিদেশ ঘুরিতে লাগিল। বিদেশে মাত্র এই দুটি তরুণ-তরুণী পরস্পরের সাথী হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মিল ও পরে বিবাহ হইল। এদিকে অরুণা স্বামী হারাইয়া তীর্থে তীর্থে তাহার খোঁজ করিতে গিয়া কাশীতে এক গণকের বাড়ীতে অজয় ও জ্যোৎস্নার সাক্ষাৎ পাইল। অজয় তাহাকে চিনিল না, জ্যোৎস্নাকে আদর সোহাগ দেখাইতে দেখাইতে গাড়ীতে উঠিল; অরুণা মর্ম্মাহত ও সন্দিগ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। পরদিনই অজয় নূতন বধূকে লইয়া কলিকাতায় গেল। দিন কয়েক পরে পথে পুত্র সনতের চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়া ছেলেকে দেখিয়া চিনিল ও আংশিক লুপ্ত-স্মৃতি ফিরিয়া পাইল। বাড়ী আসিয়া মাতা হৈমবতীকে সব কথা বলিল। অরুণাকে খবর পাঠাইলে সে খানিকটা অবিশ্বাসে ও খানিকটা অভিমানে ফিরিল না। জ্যোৎস্নার সতীনের উপর রাগ কি হিংসার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না, কাজেই সে নিজে গিয়া অরুণাকে ফিরাইয়া আনিল। সতীনকে স্বামীর ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের মিলনানন্দের অবসরে সে পিতার কাছে চলিয়া গেল। সেই দিনই রাত্রে স্বামীকে একটা প্রেম-পত্র লিখিয়া রাখিয়া পিতার সহিত বিদেশে পলাইয়া গেল; সতীন লইয়া ঘর করিয়া নারীত্বের অপমান করিতে সে রাজি নয়। অজয় এ খবর জানিত না, সে তখন দুই জনকে ভালবাসিয়া 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘামাইতেছিল। পরদিন জ্যোৎস্নার খবর পাইয়া "অজয় যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইল—জ্যোৎস্নার সেই কুসুমিত বাসন্তীকুঞ্জ দাবদগ্ধ—অজয়ের দুর্গম জীবন পথ সুগম করিয়া দিয়া জ্যোৎস্না নিজে আজ দুস্তর মরু-প্রান্তরে—পথহারা।"

বইখানাকে মোটের উপর সফল রচনা বলা যায় না। চরিত্রগুলির মধ্যে অজয়ের ভগিনী হেমাঙ্গিনীর ছোটখাট চিত্রটিই একটু ফুটিয়াছে, হৈমবতী ও অরুণাও নেহাৎ মন্দ নয়। জ্যোৎস্না, অজয় ভাল হয় নাই। উপন্যাসের ভাষা সংস্কৃত ঘেঁসা একটু সেকেলে; 'তৎকালে,' 'কিয়ৎক্ষণ' 'আনন' 'শব্দ শ্রুত হইয়াছিল' 'পত্র প্রাপ্ত হইবার' 'প্রধাবিত হইল' 'উপর্য্যুপরি' প্রভৃতি কথার অত ছড়াছড়ি না থাকিলে ভাল হইত। বড় বড় সমাসও যথেষ্ট। বইখানির কাগজ ও ছাপা দেখিতে ভাল, কিন্তু ছাপার ভুল আছে।

২০। হাসি ও অশ্রু—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্‌, এ প্রণীত; প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়, সিটী লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ৸৹ আনা ও ॥৹ আনা। ছোট গল্পের বই। গল্পগুলি নানা মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল; তবে একটি ছাড়া অন্যগুলি আগে পড়িয়াছি

মনে হয় না। বোধ হয় পত্রিকাগুলি তেমন নামজাদা নয়। সব সুদ্ধ এগারটি গল্প আছে। লেখক নিজেই নিবেদনে বলিতেছেন ছোট গল্প লেখায় তিনি সফলতা দেখাইতে পারেন নাই। গল্পগুলি ভাল হয় নাই। একমাত্র "বিপর্য্যয়" গল্পটিতে হাস্য-রস ফুটি ফুটি করিয়াও তেমন ফুটিতে পারে নাই। 'নিঃসঙ্গ' গল্পটির মধ্যে যে লেখক কি রহস্যের সৃষ্টির ভিতর কোন্ লুকানো রূপক কি কল্পকথা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বোঝা গেল না। "বন-ফুলে" সমাজ সংস্কার বিষয়ে লেখকের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ভাষায় প্রাদেশিকতা মাঝে মাঝে আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

২১। সতুর মা—শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ গাইড রো, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা। গল্পের বই। 'সতুর মা' 'বিশ্বেশ্বর দর্শনে' প্রভৃতি সাতটি গল্প ইহাতে আছে। গল্পগুলি মামুলি ধরণের; লেখা চলনসই। সাতটি গল্পের মধ্যে "হ্যালির ধূমকেতু" গল্পটিই কেবল একরকম করিয়া ছোট গল্পের নাম রাখিয়াছে। 'সতুর মা' গল্পের প্লট ছোট গল্পের উপযোগী নয়। "বধূ" গল্পটিতে বৃদ্ধ গৌরীশঙ্করের তৃতীয় পক্ষের বালিকা বধূ শাশুর চিত্রটি প্রথম-প্রথম ভালই হইয়াছে, কিন্তু শেষের সঙ্গে এই পল্লীবালার ছবির কোনো যোগ নাই। "মিলনের" প্লটে ভাল গল্প লেখা যাইত, কিন্তু লেখিকা তেমন কিছু করিয়া তুলিতে পারেন নাই। 'সতুর মা' গল্পে পীড়িত সন্তান দুঃখিনী মাতার লুকোচুরি করিয়া ছেলেকে দেখিবার আগ্রহটা অনেকটা ফুটিয়াছে। কিন্তু গল্পটা অতখানি টানিয়া লইয়া যাওয়াতে মাঝে মাঝে যা একটু কিছু সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় তার প্রতিও নজর দিবার অবসর হয় না। বইখানির কাগজ ও হরফ ভাল, কিন্তু ছাপায় ভুল নির্মূল হয় নাই।

ক খ গ।

২২। তত্ত্বকথা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, (অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ) প্রণীত। ৬½" × ৭½" ইঞ্চ, পৃঃ ১৭১। মূল্য বার আনা।

এই পুস্তিকাতে এই-সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে—সত্য কি; ভেদের মধ্যে অভেদ; সসীমে অসীম; বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও রামানুজের মত—এইসমুদয়ের দর্শনের ত্রুটি; জড়েও সত্যের মূর্ত্তি; সত্যের প্রকাশ; ব্যক্তিত্বের মধ্যে সত্য; ক্যাণ্টমতের ত্রুটি; মহাপুরুষ ও সমাজ; ইত্যাদি।

পুস্তকে পরিচ্ছেদাদি না থাকায় পড়িবার অনেক অসুবিধা হয়।

২৩। উপাসনা-তত্ত্ব—শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ১৬০। মূল্য এক টাকা।

অশ্লীল ও অপাঠ্য। হাতে লিখিয়া অনেক অংশ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

দেশের কথা

সমুদ্রের উপরটায় যখন তুফান উঠে তখনও তলার জল নিস্তরঙ্গ থাকে যেমন, তেম্নি দেশের মাথালো লোকেরা দেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পত্তন-প্রণালী লইয়া মাতিয়া উঠিলেও দেশের তলা একেবারে নিঃঝুম! মফস্বলের কাগজগুলিতে এ বিষয়ের উচ্চবাচ্য নাই বলিলেও হয়; সব নিলামী-ইস্তাহার-জীবী ক্ষীণ-প্রাণ কাগজ দুর্ভিক্ষের উপবাসীর মত চিঁচিঁ করিতেছে, মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, যোগ্যতাও আছে কি না সন্দেহ। একমাত্র বরিশাল-হিতৈষীকে দেখি নির্ভীক এবং ইনি ব্যক্তির বড়াই দেখিয়া ভুলেন না। বরিশাল-হিতৈষী কিন্তু বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া এক কথায় মণ্টাগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার-প্রস্তাবকে উড়াইয়া দিয়া খাঁটি কথাই বলিয়াছেন—যে প্রস্তাবে দেশের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা না ঘুচিবে তা দিয়া আমরা করিব কি; এবং এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিরিক্ত আগ্রহকে তিরস্কার করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবুর দল আবার প্রস্তাব-সমর্থনে অসম্মত দলের উপর ভারি চটা। এই দুই দলের মধ্যে যে কোনো প্রকৃত বিরোধ নাই তা দেখাইয়া "মোহাম্মদী" ঠিকই লিখিয়াছেন—

মানে বুঝিলাম না।—সংস্কার-প্রস্তাবের যাঁহারা সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারাও বলিতেছেন—প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইবে না, বহু স্থানে সংশোধন করিয়া উহা গ্রহণ করিতে হইবে। সংশোধন না করিলে যে স্কিমটা অচল, তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহারাও স্বীকার করিতেছেন। আবার পক্ষান্তরে যাঁহারা বর্ত্তমান প্রস্তাব গ্রহণে একেবারেই অসম্মত, তাঁহারা পূর্ব্ব দলের কথিত সংশোধনগুলি না থাকায় বর্ত্তমান অবস্থায় ও বর্ত্তমান আকৃতিতে এ প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য, এই কথাই বলিতেছেন। সুতরাং আসলে পার্থক্য কোথায় তাহা আমরা বুঝিলাম না।—মোহাম্মদী।

এই বিষম দ্বন্দ্ব কোলাহলের সঙ্গে যে দেশের পৌনে ষোলো আনা লোক যোগ দ্যায় নাই তার কারণ কি? "স্বরাজ" "দেশের কথা" প্রবন্ধে যা লিখিয়াছেন তার চুম্বকে আমরা তার কারণ দেখিতে পাইতেছি—

অন্তর্ণীণসমস্যার পরেই বোধহয় বস্ত্রসমস্যাই দেশের বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রাভাবে একাধিক আত্মহত্যার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সতীত্ব বিক্রয় করিয়া বস্ত্র সংগ্রহের সংবাদও শুনা যাইতেছে। সহযোগী 'নায়কের' যশোহরস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছেন,—"মফঃস্বলে অমূল্য সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিয়া রমণীরা বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে। বয়ঃস্থা কন্যাগণ ও বালকেরা বস্ত্রাভাবে লোকের সম্মুখে বাহির হইতে পারে না। দুঃখিনী মাতা দায়ে পড়িয়া তাহাদের বস্ত্র সংগ্রহের জন্য অমূল্য সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইতেছে।" ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনাতেও আসে না।

চাটমোহর হইতে একজন বিশ্বস্ত সংবাদদাতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে সম্প্রতি সেখানে একদল কাবুলীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা হাটে বাজারে ও গ্রামে গ্রামে যাইয়া ধারে বা বাকীতে এই সর্ত্তে কাপড় বিক্রয় করিতেছে যে খাতায় নাম লিখিয়া দিয়া এখন আট হাতি

বা নয় হাতি এক জোড়া কাপড় লইলে ভাদ্র মাসে উহার দাম দশ টাকা দিতে হইবে। সাধারণ লোকে নিরুপায় হইয়া দলে দলে তাহাই কিনিতেছে।

গবর্ণমেণ্টের অবসর নাই, দেশীয় নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা নাই—মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্য করিবার শক্তি নাই। দেশের অনেক জমিদার ব্যারিষ্টারের মাসিক ২০।২৫ হাজার টাকা আয় আছে, ইঁহারা যদি সস্তায় দেশ-হিতৈষিতা না কিনিয়া আয়ের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশও বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদানের জন্য ব্যয় করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার চারি কোটী নরনারী আজ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে কত আশীর্ব্বাদ করিবে।—স্বরাজ।

কিন্তু আবার তাঁত চালাইবার চেষ্টার উদ্‌যোগ ও সুফল কোথাও কোথাও কিছু কিছু দেখা যাইতেছে।

তাঁতের কাপড়।—এতদঞ্চলের হাটে বাজারে খুব তাঁতের কাপড় আমদানী হইতেছে। এই কাপড়ের দর মিলের কাপড়ের দরের অপেক্ষা কিছু সস্তা। বর্ত্তমান বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে মিলের কাপড় ছাড়িয়া সকলেই যদি এই তাঁতের কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে একদিকে আমাদের দেশের লুপ্ত বস্ত্র-শিল্পের যেরূপ পুনরুদ্ধার হইবে, অন্যদিকে তেমনি মিলের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছভাবে বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধি করিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষাটাও দমিয়া যাইবে। সুখের বিষয়, আজকাল অনেকেই তাঁতের কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হাটে বাজারে তাঁতের কাপড়ের আমদানী ও কাট্‌তি খুব হইতেছে। 'নীহারে' এই বিষয় পাঠ করিয়া দূরবর্ত্তী স্থান হইতে অনেকেই এখান হইতে তাঁতের কাপড় ক্রয় করিয়া লইবার জন্য আমাদিগকে চিঠি পত্রাদি লিখিতেছেন।—নীহার (কাঁথি)।

সাহায্য-সমিতি—দীন-দরিদ্র প্রজাকুলের বস্ত্র ক্লেশ দূরীকরণ মানসে বরিশাল সহরে এক বস্ত্র-সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি তুলার চাষ ও চর্‌খা প্রচলনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ কে অস্বীকার করিবে? বঙ্গের সকল জিলার লোকই বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে, কোন কোন স্থানে এই কারণে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। প্রত্যেক জেলাতেই বস্ত্রক্লেশ দূরীকরণ-কল্পে সাহায্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। দৈন্যক্লিষ্ট পল্লীবাসীর দুর্দ্দশা দর্শন করিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। বয়ন-শিল্পের উন্নতি সাধনের দিকে দেশবাসীর উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

এই বস্ত্রাভাবের দিনে অনেক সদাশয় ধনী বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন; এতে স্থায়ী উপকার না হইলেও আশু উপশম ত হইতেছে।

বস্ত্র বিতরণ—পটুয়াখালীর নেতৃবর্গ পটুয়াখালী মহকুমার এলেকায় গ্রামে গ্রামে গিয়া দুঃস্থা রমণীদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। দেশ-ব্যাপী দারুণ বস্ত্রক্লেশের সময় ক্ষীণশক্তি নেতৃবর্গ যাহা করিতেছেন তাহাই ভগবান এবং মানবের নিকট প্রশংসার্হ হইবে। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতার নেতৃবর্গ কি শুধু আমাদিগকে আমাদের অদৃষ্টের উপরই ফেলিয়া রাখিবেন? এই দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য একটি অঙ্গুলীও উত্তোলন করিবেন না? আমরা না দিতে পারিলে অপরাধী; আমাদিগকে না দিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অপরাধী হইতে হয় না কি?—বরিশাল-হিতৈষী।

বস্ত্র দান।—৺পুরীধামের "রত্নাকরে" প্রকাশ—কলিকাতার ধনী মাড়োয়ারি শেঠ জোখারাম কেটওয়ালা সম্প্রতি ভুবনেশ্বরের ব্রাহ্মণগণকে দেড় হাজার টাকার বস্ত্র দান করিয়াছেন। বস্ত্রের এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে ব্রাহ্মণগণ এই দান পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। জোখারামের জয়জয়কার হউক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে দুঃস্থ পরিবারকে বস্ত্র-দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা এবং মফঃস্বলে বিশেষ অভাবগ্রস্ত পরিবারে কাপড় বিতরণ করা হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে কলিকাতা ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।—সঞ্জীবনী।

বঙ্গের বস্ত্রহীনদের সাহায্যের জন্য গুজরাট ও মাদ্রাজের স্থানে স্থানে সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে; তাঁরা টাকা, নূতন ও পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট, ব্রাহ্ম সমাজের নিকট কেহ কেহ টাকা পাঠাইয়াছেন; কেহ কেহ বস্ত্র বিতরণের কেন্দ্র জানিতে চাওয়াতে আমরা বরিশালের বস্ত্র-সাহায্য-সমিতি, ময়মনসিংহের কটন কমিটি ও রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্‌যোগ ও আয়োজনের কথা তাঁদের জানাইয়াছি। সম্প্রতি একজন ইংরেজ ভদ্রলোক প্রবাসী-সম্পাদকের কাছে হাজার টাকা পাঠাইয়া এই অনুরোধ করিয়াছেন—ঐ টাকা যেন পাট-উৎপাদক জেলাগুলিতে বস্ত্রাভাব মোচনের জন্য ব্যয় করা হয়; পাটের কলে তাঁর কিছু অংশ আছে; পাটের কল পাট-চাষীর সাহায্যেই অতিরিক্ত লাভ করিতেছে; সেইজন্য তাঁর আকিঞ্চন সেই লাভ পাটচাষীদের দুঃখ মোচনে ব্যয় হওয়া উচিত। এইরূপ সহৃদয়তা প্রত্যেক জমিদার ও পাটের কলের অংশী-দারের অনুকরণীয়।

কিন্তু অভাব ব্যাপক হইলে দু-একজনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় মোচন করা দুঃসাধ্য। সেজন্য দশ বিশ জনের জোট বাঁধিয়া সমবায়ের প্রয়োজন। সমবায়ে যে কত সুবিধা তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই পাওয়া যাইবে।

বারাশত মহকুমায় কয়েকটি গামে যারা দুধ বেচে, তাদের সমিতি হয়েছে। এই-সকল সমিতির সভ্যেরা নিজেদের গ্রামে অথবা পাশের গ্রামে দুধ বেচ্‌ত। কলিকাতায় দুধের দাম অনেক বেশী। দুধওয়ালাদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো, তারা যদি কলিকাতায় দুধ বেচ্‌তে পারে, তাহলে অনেক বেশী দাম পেতে পারে। কিন্তু কলিকাতায় আস্‌তে হলে গাড়ী-ভাড়া আছে। প্রত্যেকেই যদি তার দুধ নিয়ে গাড়ী কোরে কলিকাতার বাজারে আসে তাহলে তার দুধের দামের চাইতে গাড়ী-ভাড়াই হয়ত বেশী হয়ে পড়্‌বে। তাই তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো সকলের দুধ এক জায়গায় জড়ো

করে একজনে অথবা দুইজনে কলিকাতায় নিয়ে আসতে হবে। তারা তাই করলে। তারা সকলে মিলে একটা "সমবায় সমিতি" গড়্‌ল। খুব ভোরে একটা লোক বাড়ী বাড়ী গিয়ে গাই দুয়ে আনতে লাগ্‌ল। একজায়গায় সেই দুধ জড়ো করে, একজন লোক দিয়ে সেই দুধ কলিকাতায় পাঠিয়ে কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করা হতে লাগ্‌ল। এইরূপে কতকগুলি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। ছয় মাস তারা কাজ করবার পরে হিসাব নিকাশ কোরে দেখা গেছে সকল সমিতিই বেশ লাভ করেছে। এখন আরও লাভ হতে পারে,—যদি এই সমিতিগুলি সকলে মিলিত হয়, একসঙ্গে কলিকাতায় দুধ পাঠাবার বন্দোবস্ত করে, কলিকাতার বাজারে দুধ নিয়ে যাবার খরচ আরও কমিয়ে ফেলতে পারে। সেই চেষ্টা এখন করা যাচ্ছে।—ভাণ্ডার।

উলুবেড়িয়া মহকুমার ধীবরদিগের মধ্যে কতকগুলি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এই ধীবরেরা নৌকা ও জালের জন্য মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে। মহাজনেরা টাকার সুদ নেয় না, কিন্তু ধীবরদিগের মাছ খুব কম দামে কিনে নেয়। যে তপ্‌সে মাছ কলিকাতায় বারো আনায় একশো বিক্রয় হয়, তা মহাজনেরা চারি আনায় কিনে নেয়। হিসাব করে দেখা গেছে, চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসে এই ভাবে প্রত্যেক ধীবরের যে টাকা লোক্‌সান হয়, মহাজনের টাকার রীতিমত সুদ তার চাইতে অন্ততঃ তিনশত টাকা কম। তিনমাসে প্রত্যেকের তিনশত টাকা লোক্‌সান। এই ধীবরদিগের মধ্যে সমিতি হয়েছে। তারা এখন আর মহাজনের কাছে যাবে না। এখন তারা যাতে কলিকাতার বাজারে মাছ এনে বেচ্‌তে পারে তার বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা হচ্ছে।—ভাণ্ডার।

যাহা একজন দুইজনের অসাধ্য তাহা গ্রামবাসীরা সকলে জড়ো হইয়া করিলে, সাধ্য হইয়া উঠিবে। ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটি ও সুখচর গ্রামে সম্প্রতি দুটি "কো-অপারেটিভ ম্যালেরিয়া-নিবারণী সোসাইটি" খোলা হইয়াছে।

সোসাইটির কাজ—মেম্বরদের আঙ্গিনার ভিতর অস্বাস্থ্যকর ডোবা ইত্যাদি বোজান, জঙ্গল কাটা, যাহাতে রৌদ্র আসিতে পারে। সকল মেম্বরদের নিকট হইতে মাসিক ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা লওয়া হইতেছে। ১০০ শত জন মেম্বর হইলে, ১০০৲ শত টাকা মাসে সোসাইটির তহবিলে জমিবে। তাহার ৭০৲ টাকা স্থানীয় মেডিকেল কলেজের পাশকরা একজন ডাক্তারকে দেওয়া হইবে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেম্বরগণকে বিনা ভিজিটে দেখিতে স্বীকার পাইয়াছেন, এবং ঔষধ বিনা দামে দিবেন। বাকী ৩০৲ টাকা হইতে মেম্বরদের বাসার আঙ্গিনার ভিতর অস্বাস্থ্যকর বনজঙ্গল দূর করা ও ডোবা বোজান হয়। সকলে এক হইয়া মাসে মাসে সভা করিয়া উপায় ঠিক করিতেছেন। কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলে চলিতেছে। ফলাফল এক বৎসর পরে জানিতে পারা যাইবে। এইরূপ সভা বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে হওয়া উচিত, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার উপায় হইবে। যদি এই সম্বন্ধে কেহ জানিতে চান, এই সোসাইটিকে লিখিলে, তাঁহারা সাদরে সব জানাইবেন ও নূতন সভাস্থাপনের জন্য সহায়তা করিবেন।—ভাণ্ডার।

অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য শিক্ষা স্বাধীনতা এই কয়টা মানুষের প্রধান প্রয়োজন। এ-সকলের জন্য দেশকে ধনশালী হইতে হইবে; ধনের দ্বারা অভাব মোচন হইলে মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি পাইবে, কর্ম্মকুশলতা উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। ধনোৎপত্তির একটি পন্থা "ভাণ্ডার" নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যুদ্ধের জন্য এখন নানা রকম জিনিসের দর্‌কার পড়েছে। অনেকে এই-সকল জিনিস তৈরী কোরে ঢের টাকা লাভ করছেন। লোহার ছোটখাটো অনেক জিনিসের দরকার আছে। স্ক্রুপের নাট (nut), রিভেট (rivet) প্রভৃতি ঢের জিনিসের দর্‌কার। বাঙ্গালা দেশে অনেক জায়গায় বিস্তর কামার আছে। তারা এ-সকল জিনিস তৈরী করতেও পারে। যেখানে অন্ততঃ দশজন কামার আছে, সেখানে তাদের নিয়ে যদি সমবায় সমিতি গড়ে তোলা যায়, তা হলে এই-সমস্ত সমিতি বিস্তর টাকার মালের অর্ডার পেতে পারে। লোহা যদি তারা জোগাড় করতে না পারে, তা হলে সর্‌কার থেকে লোহা সরবরাহ করা হবে। কামারেরা মজুরী পাবে। দেশের শিল্পের যাঁরা হিতৈষী তাঁরা এ সুযোগে অনেক কাজ কোরে ফেল্‌তে পারেন।—ভাণ্ডার।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার ও নির্ম্মল পানীয় জল দর্‌কার। এবার পূর্ব্ববঙ্গ বন্যার জলে নিমগ্ন, পশ্চিম বঙ্গে বর্ষার অভাব চাষের বিশেষ দুর্গতি ঘটাইয়াছে। ইহাতে সমগ্র বঙ্গের লোকের, ও বাঙালীর প্রধান সম্পদ গোরুর, অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইবে। গোজাতির উন্নতি ও সংরক্ষার জন্যও একটি সমবায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

গো-রক্ষা ও দুধ সরবরাহ—"ক্যাট্‌ল্ ব্রিডিং কোম্পানী লিমিটেড" নামে কলিকাতায় একটি গো রক্ষার যৌথ কার্‌বার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পাল বাহাদুর প্রমুখ বহু ধনকুবের এই সদনুষ্ঠানের প্রধান উদ্‌যোগী। কোম্পানীর অনুষ্ঠান-পত্র আমরা দেখিয়াছি; তাহাতে প্রকাশ,—কলিকাতা সহরের অধিবাসীরা যাহাতে খাঁটি দুধ সংগ্রহ করিতে পারেন, কোম্পানী তাহার জন্য সওদাদরের দুগ্ধবতী গাভী সরবরাহ করিবেন; যে গাভীর দুধ ফুরাইবে তাহাকে গ্রহণ করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন; যাহাতে কসাইরা গাভী হত্যার সুযোগ না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে পশুচর জমি লওয়া হইবে, দুধ ফুরাইলে গৃহস্থেরা তাঁহাদের গাভীগুলিকে পুনরায় দুগ্ধবতী না হওয়া পর্য্যন্ত সেথানে রাখিতে পারিবেন, ইহার জন্য অল্প মাত্র খরচ দিতে হইবে। অন্য দেশ হইতে সবল বৃষ আনাইয়া এদেশের গো-বংশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলিবে। সম্ভব হইলে, এই কোম্পানী সুলভে খাঁটা দুধ ঘি সরবরাহ করিতে ক্রটি করিবেন না। কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় হইতেছে। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০ দশ টাকা মাত্র। কোম্পানীর এই শুভ উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার জন্য—সঙ্গতি থাকিলে—সকলেরই 'শেয়ার' ক্রয় করা কর্ত্তব্য। ১০ নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—ইহাই কোম্পানীর আফিসের ঠিকানা।—বঙ্গবাসী।

দেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির তরফ হইতে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর খুব চেষ্টা করিতেছেন। স্থানে স্থানে কলের জলের ব্যবস্থাও হইতেছে।

আমরা অতীব আনন্দ সহকারে প্রচার করিতেছি যে মেদিনীপুরের জলের কলের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানাধিপতি ৫০০০৲ টাকা জলের কল সমিতির হস্তে দান করিয়াছেন।—মেদিনী-বান্ধব।

সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্। বিদেশ বা বিদেশী রাজকর্ম্ম-

চারীদের দয়া অনুগ্রহ খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া আমাদের সকল অভাব নিজেদের চেষ্টাতেই মোচন করিতে হইবে। এইজন্যই আমরা স্বদেশীব্রত গ্রহণের পক্ষপাতী। স্বদেশব্রত না হইলে দুর্দশা মোচন ভিক্ষাতে বা পরানুগ্রহে হইবে না। স্বদেশীব্রত আমরা বরাবর নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে এখন এই বস্ত্রসঙ্কটে পড়িতাম না। এখনো আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে দেশী শিল্পের ও প্রচেষ্টার সাহায্য করা উচিত। দেশী জিনিস বিদেশীর তুলনায় নিকৃষ্ট হইলেও তারই সমাদর করা উচিত। আমরা একটি নবপ্রবর্ত্তিত দেশী প্রচেষ্টার সংবাদ পাইয়াছি—

দেশী জুতা।—কাঁথি সহরের হাটে বাজারে আজকাল স্থানীয় মুচীরা তাহাদের স্বহস্তে প্রস্তুত চটি বুট অনেক জুতার আমদানী করিতেছে, এমন কি সহরে লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে বিক্রয় জন্যও লইয়া আসিতেছে। এই জুতার চর্ম্মরঞ্জন ও পালিশ আদি সবই উহারা স্বহস্তে করিয়াছে। এই জুতা সস্তা দরে বিক্রয় হওয়ায় অনেকের সুবিধা হইয়াছে। চটির জোড়া ।৵৹ আনা হইতে ৸৹ আনা, বুটের জোড়া ১৲ টাকা হইতে ১।৹ দরে বিক্রীত হইতেছে। বর্ত্তমান জুতার দর যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে এই জুতা ব্যবহার করিয়া দেশীয় মুচীদের উৎসাহিত করা সকলের উচিত। এখন আমাদের যাবতীয় অভাব আমরা দেশেই নিবারণের উপায় না করিলে আমাদের আর গত্যন্তর নাই।—নীহার।

কিন্তু সকল কর্ম্মে উদ্‌যোগী ও সফল করিতে পারে এক-মাত্র শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। শিক্ষাবিস্তারের জন্য গুটিকয়েক প্রচেষ্টার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘের মতন এই সামান্য চেষ্টাই এই বৃহৎ দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। প্রত্যেক জেলায় দুটি ও প্রত্যেক জমিদারের বসতগ্রামে দুটি করিয়া ছেলে ও মেয়েদের জন্য কলেজ, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ছেলে ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার স্কুল, স্থানে স্থানে কারিগরী স্কুল, ডাক্তারী কলেজ ও স্কুল, চাষী মজুরদের জন্য নৈশ স্কুল, যতদিন না হইতেছে, ততদিন দেশের লোকের চেষ্টায় বিরত বা নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

নূতন কলেজ।—মাদারীপুরে একটি সেকেণ্ড গ্রেড কলেজ স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।—মোহাম্মদী।

চট্টগ্রামে কলেজ।—সুযোগ্য জমিদার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় চট্টগ্রামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এজন্য তিনি নগদ দশ হাজার টাকা ও তাঁহার দেওয়ান-বাড়ী পাহাড়ের উত্তরার্দ্ধেক প্রস্তাবিত কলেজকর্তৃপক্ষকে দান করিবেন। ভগবান যোগেশ বাবুর উদ্দেশ্য সফল করুন।—জ্যোতি।

মফঃস্বলে কলেজ।—অর্থাভাবে এবং কলেজের অভাবে অনেক পল্লীবাসী ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছেন, এ কথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। মফঃস্বলে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মফঃস্বলে অনেক ছাত্রের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটিবে। কলিকাতার বাহিরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এবং কোন কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহিত প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিটি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, স্কুলের সহিত কলেজ না খুলিয়া পৃথক কলেজ স্থাপন করা বিধেয়।

সুসংবাদ বটে।—আমরা "চারুমিহির"-মুখে শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট কটন কমিটি জেলা বোর্ডের যোগে ময়মন-সিংহ নগরে একটি বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ঐ স্কুলের সঙ্গে একটি ফ্যাক্টরী রাখিবার জন্যও চেষ্টা হইতেছে। আমরা আশা করি, জনসাধারণ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এই বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হইবেন।—ঢাকা গেজেট।

নৈশবিদ্যালয়।—গত শুক্রবার অত্রত্য স্থানীয় বি এম স্কুল হলে ব্রাহ্মসমাজের উদ্‌যোক্তা ডিপুটী কালেক্টর রায় সাহেব হরকিশোর বিশ্বাস প্রমুখ ব্রাহ্মগণ কর্তৃক একটি নৈশবিদ্যালয় বা নাইট স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর ও অস্পৃশ্য জাতির বালকদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য ইহা একটি অবৈতনিক স্কুল হইল। দিনের বেলায় কুলি, মজুর, চামার, মেথর, চাকর ও দোকানীর যাহার যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রে স্কুলে অধ্যয়ন করিতে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। আমাদের মনে হয় প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন প্রধান উদ্‌যোক্তা বাবু সদানন্দ দাস প্রভৃতির উদ্‌যোগে বরিশালে ভদ্রলোকদিগের ইংরেজী শিক্ষার জন্য নাইট স্কুল বসিয়াছিল, তাহা কিছুকাল পরে উঠিয়া যায়। এবারের অর্থাৎ এই দ্বিতীয় বারের উদ্‌যোগ নিম্নশ্রেণীর বালক লইয়া কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের উপকার হইবে। সুখের বিষয় কয়েকজন উদারপ্রাণ হিন্দুসমাজের লোকও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। প্রথম দিনেই ১৪ জন বালক ভর্ত্তি হইয়াছে। এই স্কুলে উচ্চ শ্রেণীর গরীব লোকদিগের বালক লওয়া হইবে কি?—কাশীপুর-নিবাসী।

রাজার দান।—লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ২টি ছাত্রকে ৮ টাকার ও প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ২টি ছাত্রকে ৬ টাকার বৃত্তি দানের জন্য ৩॥ টাকা সুদের ২০ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ দান করিয়াছেন। শিক্ষার সাহায্যের জন্য যাঁহারা অর্থদান করেন, তাঁহারা দেশের পরম মিত্র।—সঞ্জীবনী।

একজন ইউরোপীয় কলিকাতার ইউরোপীয় ইউরেশীয় ও ভারতীয় লোকের শিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দাতা কি সার ডেনিয়েল হেমিল্টন?

(১) ঐ টাকা হইতে একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালককে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে।

(২) একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালিকাকে ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে।

(৩) ইউরোপীয় বালক-বালিকাদের উন্নতির জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) কলিকাতার বাহিরে বালকদের জন্য অনাথ আশ্রম স্থাপনার্থ আইরিশ ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্স'এর হস্তে টাকা দিতে হইবে।

(৫) কারসিয়ংয়ের ডাউহিল বালিকা বিদ্যালয় বড় করিবার জন্য টাকা দিতে হইবে।

(৬) কলিকাতা সহরে ভারতীয় বালকদের জন্য পাঠশালা নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে।

(৭) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঠশালা নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে।

(৮) শিবপুর কলেজের ইউরোপীয় ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডে শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

দাতা যিনি তিনি আমাদের পরম ধন্যবাদের পাত্র।—যশোহর।

বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালা ভাষায় এম্‌-এ পরীক্ষার প্রস্তাব হইতেছে। মাতৃভাষায় সকল দেশেই উচ্চতম পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, নাই কেবল আমাদের দেশে। এ কলঙ্ক দূর হওয়াই ভাল।—বীরভূমবাসী।

কিন্তু আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি যে কোনো কোনো বাঙালী ফেলো নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলায় এম-এ উপাধি দিবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে! ইহা একটি প্রমাণ যে আমাদের গোলামি কিরূপ মজ্জাগত হইয়াছে ও আমরা কিরূপ আত্মসম্মানহীন হইয়াছি। দেশ-ভাষাতেই সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইংরেজ ফরাসী জার্ম্মান রুশ ইটালিয়ান গ্রীক জাপানী প্রভৃতি সবাই নিজের দেশ-ভাষার সাহায্যেই উচ্চতম জ্ঞান পর্য্যন্ত আহরণ করে, আর আমরাই শুধু চিরকাল পরকীয় বেশভূষা ও ভাষা ব্যবহার করিয়া দাসত্ব কায়েমি করিয়া রাখিব! চিন্তায় পর্য্যন্ত যারা গোলাম তাদের দুর্গতি অনিবার্য্য!

বিবিধ সংবাদ

মোকদ্দমা প্রত্যাহার।—স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার "রোহিতকারিষ্ট" প্রস্তুত করা অভিযোগে আব্‌কারী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হন, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। বাদী সরকার-পক্ষ এই মামলা উঠাইয়া লইয়াছেন। আমরা এজন্য সরকার-পক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি!—ঢাকা গেজেট।

মুসলমান বালকের সততা।—শ্রীকালাচাঁদ সেখ ১৭-১৮ বৎসর বয়স্ক দরিদ্র বালক; ইঁহার নিবাস এ সহরের বংসাল মহল্লায়। বিগত ১৭ই জুলাই দিবা ২ ঘটিকার সময় এই বালক বাবুরবাজারের রাস্তার উপরে এক তাড়া কাগজ দেখিতে পায়। উহা কুড়াইয়া লইয়া সে দেখিল যে ঐ তাড়ায় বারখানা ১০ টাকার নোট রহিয়াছে। বালক ১২০৲ টাকার লোভ সংবরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সদর কোতয়ালীতে যাইয়া সেই নোটের তাড়া জমা করিয়া দিয়া আসিল। ঈশ্বর এই নির্লোভ বালকের মঙ্গল করুন।—ঢাকাপ্রকাশ। বঙ্গরত্ন।

মুসলমান যুবকের বাহাদুরী।—জঙ্গীপুরের নিকটবর্ত্তী তেঘরী গ্রামে শশিভূষণ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে একটি অনাবৃত পাতকুয়ায় একটি গাভী পড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া অনেক হিন্দু ও মুসলমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া গাভীটির জীবন রক্ষার কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। একে সেই অল্পপরিসর কূপ, তাহাতে গাভীটি প্রায় ১৫ হাত নীচে পড়িয়াছে। কূপে প্রায় ৭।৮ হাত জল। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কূপে নামিয়া এই গো-জীবন রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি কয় জনের হয়? কিন্তু উক্ত গ্রামের তাহু সেখ নামক জনৈক দরিদ্র মুসলমান যুবক আসিয়া নিজের জীবনের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কূপে নামিয়া গরুটির গলায় তিন গাছি দড়ি বাঁধিয়া দেয়। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া গাভীটিকে টানিয়া তোলে। গাভীটি অক্ষতভাবে উঠিয়া আবার ঘাস খাইতে থাকে। দরিদ্র মুসলমানের আরও বাহাদুরি এই, গো-জীবন রক্ষার জন্য কতিপয় হিন্দু তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে উদ্যত হওয়ায় সে বলে "গরুটার জীবন রক্ষা হইয়াছে, এই আমার যথেষ্ট বখ্‌সিস। আমি এবং আমার বাপ দাদা এই গরুর রোজ্‌গার খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি।"—জঙ্গীপুর-সংবাদ। বীরভূমবার্ত্তা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদ্মার মায়া

কোন্ কুহকে পদ্মাবতী, সুধাই তোরে আজ—
এমন ক'রে ভুলিয়ে রাখিস্ সারা সকাল সাঁঝ?
তোর উদরে সব দিয়েছি—সব দিয়েছি তোরে;
তবু আমায় রাখ্‌বি বেঁধে এমন কঠিন ডোরে?

তোর ভাঙনে গেছে আমার সাতপুরুষের ভিটে—
স্বর্গ হতে সেরা ছিল, সুধার চেয়ে মিঠে!
আজিও তোর পাঁজর কেটে জাগ্‌লে নূতন চড়া—
আমার ভিটের সোনার মাটি খুঁজ্‌লে পড়ে ধরা!

পূর্ণ ছিল ষোলকলায়, পৌর্ণমাসী সমা—
ভাসিয়ে দিছি তোর জলে সে মনের মনোরমা!
আজিও তোর জ্যোছ্‌না-মাখা লহর-খেলা জলে
স্বর্ণ ছানা রূপটি তাহার ফিন্‌কি দিয়ে চলে!

মায়ের ছিল আঁচল-ধরা 'ময়নামতি' মেয়ে—
তোর জলেতে ঝাঁপিয়ে প'লো মায়ের খোঁজে যেয়ে!
আজিও তোর ঢেউএর মাঝে দেখ্‌ছি আমি কি?
বাপের কোলে আস্‌ছে ছুটে বাপদুলালী ঝি!

কোন্ কুহকে, পদ্মাবতী, সুধাই তবে আজ—
এমন ক'রে ভুলিয়ে রাখিস্ সারা সকাল সাঁঝ?
তোর উদরে সব দিয়েছি—সব দিয়েছি তোরে,
তবু আমায় রাখ্‌বি বেঁধে এমন কঠিন ডোরে?

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

যাহা পূর্ব্বে হয় নাই, তাহা পরে হইতে পারে।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, history repeats itself, মানুষের ইতিহাসে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা আবার ঘটে ও ঘটিতে পারে। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নয় যে পূর্ব্বে যাহা হয় নাই, তাহা ভবিষ্যতে হইতে পারে না, কিম্বা অতীতকালে যাহা ঘটিয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটনাই আবার নিশ্চয় ঘটিবে।

পৃথিবীর ইতিহাস ও মানুষের ইতিহাস সমকালব্যাপী নয়। ভূতত্ত্ববিদ্যার দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, যে, পৃথিবীতে নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীর আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে মানুষের জন্ম হইয়াছে। সুতরাং মানুষের জন্মটাই পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। তাহার পর মানুষের সভ্যতার ক্রমিক বিকাশ ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

কৃষিজীবী হইতে মানুষের কত যুগ লাগিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। প্রথম প্রথম মানুষ মৃগয়া ও স্বভাবজাত ফলমূল-পাতার উপর নির্ভর করিত। সে অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানুষের পশুপালক হইতে বহুযুগ লাগিয়া থাকিবে।

মানুষ প্রথম প্রথম ইতর প্রাণী বধ করিবার জন্য, পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, এবং জীবনধারণার্থ অন্যান্য কাজের জন্য, প্রায়-অগঠিত বা সামান্য পরিমাণে গঠিত পাথর ব্যবহার করিত। তাহার পর ভাল করিয়া গড়নদেওয়া পাথরের অস্ত্র, হাতিয়ার ও যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। বড় বড় মাছের কাঁটা ও জন্তুর হাড়ও ব্যবহার করিতে মানুষ ক্রমে ক্রমে শিখিয়াছে। এই-সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া কতকটা পিতলের মত মিশ্রধাতুর অস্ত্র ও হাতিয়ার এবং গৃহস্থালির জিনিস ব্যবহার করিতে মানুষ কত লক্ষ বৎসর পরে শিখিয়াছে জানা নাই। তাহার পর লৌহ ব্যবহারের যুগ।

মানুষ প্রথম প্রথম কাঁচা মাংস ও ফলমূল খাইত। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পরে, কত কত লক্ষ বৎসর পরে কৃত্রিম উপায়ে আগুন জ্বালিয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্য অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া বা রাঁধিয়া খাইতে মানুষ শিখিয়াছে কেহ জানে না।

কোন্ স্মরণাতীত যুগে মানুষ গাছের ছাল ও জন্তুর চামড়া পরিধান করিত, তাহা কেহ জানে না। তাহারা কখন প্রথমে পশুলোম হইতে ও পরে কাপাসের সূতা ও রেশমী সূতা হইতে কাপড় বুনিয়া পরিতে শিখিল, কেহ বলিতে পারে না।

মানুষ যে এক সময়ে গাছের ডালে ও পর্ব্বতের গুহায় বাস করিত, বিজ্ঞান তাহা আমাদিগকে বলিয়াছে। অনেক দেশে মানুষ জলাশয়ের উপর মাচা করিয়া তাহার উপর ঘর বাঁধিয়া বাস করিত, তাহার প্রমাণ আছে। এইসব অবস্থা অতিক্রম করিয়া কাঠ বাঁশ তৃণ খড় পাতার ঘর, মাটির দেওয়াল ও কাঠ বাঁশ পাতা আদির ঘর, কাঁচা ইট ও পোড়ান ইটের ঘর, পাথরের ঘর, প্রধানতঃ লোহা ইস্পাতের ঘর, এসব হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে।

যান-বাহনের ইতিহাসেও এইরূপ ক্রম-পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। স্থলযানের যেমন উন্নতি হইয়াছে, গাছের মজ্জা কুরিয়া ফেলিয়া প্রস্তুত ডোঙা হইতে ইস্পাতের জাহাজ এবং কংক্রীটের জাহাজ পর্য্যন্ত তেমনি ক্রমোন্নতি হইয়াছে। এখন আকাশযান যুদ্ধের জন্য খুব ব্যবহৃত হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষের যাতায়াত ও বাণিজ্যের এবং ডাক চলাচলের জন্যও ব্যবহৃত হইবে। জলের উপরে চালিত জলযান অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে জলের নীচে জলের ভিতর দিয়া চালিত ডুবুরী-জাহাজ খুব ব্যবহৃত হইতেছে।

যে-সব ভিন্ন ভিন্ন শক্তির দ্বারা মানুষ নানাবিধ যান চালাইয়াছে এবং অন্যান্য কাজ করিয়াছে, তাহাতেও ক্রমিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মানুষের নিজের দৈহিক বল, গোরু মহিষ গাধা উট হাতী কুকুর প্রভৃতি জন্তুর শক্তি, বাতাসের শক্তি, জলস্রোতের শক্তি, প্রভৃতি যে কত যুগ ধরিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। তাহার পর বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা নানারকম কল চালিত হওয়ায় পৃথিবীতে মহত্তম পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। বাষ্পীয় শক্তির পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক শক্তি নানা কাজে প্রযুক্ত হইতেছে। ইহার প্রসার কি পর্য্যন্ত হইবে, বলা যায় না। তাহার পর অন্য কোন রকমের শক্তি আবিষ্কৃত ও তাহা

মানুষের কাজে প্রযুক্ত করিবার জন্য যন্ত্র উদ্ভাবিত হইবে কি না, বলা যায় না ; খুব সম্ভব, হইবে।

মানুষের যুদ্ধপ্রণালীতেও জলে স্থলে আকাশে মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহারের কথা বর্ত্তমান যুদ্ধের আগেও মানুষের মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা এই যুদ্ধেই প্রথম ব্যবহৃত হইল। অনেক ইউরোপীয় লেখক বলিতেছেন, যুদ্ধ-প্রণালীর ইহাই চরম পরিণতি নয়। রসায়নীবিদ্যার প্রয়োগে বর্ত্তমান যুদ্ধ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বলেন, ভবিষ্যতে ব্যাক্‌টিরিয়লজি বা অণুজীববিদ্যার প্রয়োগ দ্বারা "সভ্য" জাতিরা শত্রুর দেশে মহামারী উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে, এবং তদ্দ্বারা জয়লাভ করিবার প্রয়াস পাইবে। ইহা অসম্ভব নহে। মানুষের "সভ্যতা" প্রধানতঃ প্রাণনাশ-সামর্থ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রত্যেক মানুষ পরিবার বা জাতি নিজের নিজের প্রয়োজনীয় সকল জিনিস উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিতে পারে না ; অনেক জিনিসের জন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষের বাণিজ্যের প্রথম প্রণালী ছিল, সামগ্রীর বিনিময় ; যেমন চাষী কলুর কাছে ধান বা চাল বা খড়ের বিনিময়ে তেল পাইত। ক্রমে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে। তাহার পর হুণ্ডী, চেক্, নোট, প্রভৃতি কাগজের মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় আসিয়া পৌছিতে মানুষের লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে।

আগে মানুষ নিজে বা নিজের পরিবারের লোকদিগকে লইয়া নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত, ভিন্ন ভিন্ন পরিবার পরস্পরের সাহায্য করিত। মজুরীর জন্য কাজ করা পরে আসিয়াছে। বৃহৎ মূলধন লইয়া এক একজন ধনী লোকের বহু মজুর বা কারিগর খাটান, তাহারও পরের কথা। এখনকার যৌথ কারবার (joint stock enterprise) ও বড় বড় কারখানা আরও পরে হইয়াছে। তাহার পর আসিয়াছে, মূলধনীদের ও শ্রমজীবীদের মধ্যে লাভের বখরা (profit-sharing), সমবায় দ্বারা কারবার পরিচালন (co-operative method), ইত্যাদি। সভ্যদেশ-সমূহে শ্রমজীবীরা জোট বাঁধিয়া এখন বেতন ও শ্রমের সময় সম্বন্ধে ধনীদের সঙ্গে সর্ত্ত করিতেছে। শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে সভ্যতার এই স্তরে আসিয়া পৌছিতে মানুষের বহু বহু যুগ লাগিয়াছে।

আগে পৃথিবীর সমুদয় দেশে জন্মগত বা ক্রীত দাস রাখিবার প্রথা ছিল। কোন দেশে বেশী, কোন দেশে কম ছিল। এখন সমুদয় সভ্যদেশ হইতে ইহা উঠিয়া গিয়াছে। যদিও বহু "সভ্য" জাতি এখনও শক্তিহীন বা অনগ্রসর অ-শ্বেত জাতিসকলকে চুক্তিবদ্ধ মজুর নাম দিয়া দাসরূপে ব্যবহার করিতেছে, এবং তাহাতে বাধা পড়িলে নানা-প্রকার গর্হিত চাতুরী অবলম্বন করিতেছে, তাহা হইলেও পৃথিবীতে দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে।

নারীর অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুরাকালে সার্ব্বজনীন বিষয়ে কোন কোন দেশে নারীর সামান্য অধিকার থাকিলেও, প্রায় সমান সমান অধিকার কোথাও ছিল না। এখন তাহা অনেক দেশে হইয়াছে। মোটের উপর নারীর শিক্ষার সুযোগ পৃথিবীতে এখন প্রাচীন কাল অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। নারীর সম্মান এবং কার্য্যকারিতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে-সব কাজ পূর্ব্বে পুরুষের একচেটিয়া ছিল, তাহার অনেকগুলিতে নারীর অধিকার স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নানা দেশে পুরাকাল অপেক্ষা বিদ্যার সকল বিভাগে নারীর কৃতিত্ব অধিক দেখা যাইতেছে। পুরাকাল হইতে নারীর উপর অত্যাচারের সুবিধা এবং অত্যাচার করিয়াও সমাজ বা আইন কর্ত্তৃক দণ্ডিত না হইবার সম্ভাবনা পুরুষের যতটা ছিল, তাহা ক্রমশঃ বহু সভ্যদেশে হ্রাস পাইতেছে। ইহা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়, যে, সমুদয় পৃথিবীকে গণনার মধ্যে আনিলে, নারী দাসী এবং পুরুষের সুখসুবিধার বস্তু না থাকিয়া পুরাকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুরুষের সহচরীর পদে উন্নীত হইয়াছেন।

মানুষের অসভ্য অবস্থায় রাজতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র, যে অঞ্চলের শাসনপ্রণালী যাহাই থাকুক, রাজ্য বা রাষ্ট্র অল্পপরিসর ভূখণ্ড লইয়া গঠিত হইত, প্রজা বা গণের সংখ্যা কম ছিল। বড় বড় রাজ্য, বড় বড় সাম্রাজ্য, বড় বড় সাধারণতন্ত্র অনেক পরের কথা। নানাবিধ আইন বিধি-বদ্ধ হইতে বহুযুগ কাটিয়া গিয়াছে। আইনের চক্ষে সকল

মানুষের, পুরুষ-নারীর, অভিজাত ও সাধারণ লোকের, সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে বহুযুগ লাগিয়াছে।

বিদ্যার নানা শাখার উন্নতি সম্বন্ধেও এ-কথা বলা যায়।

একই দেশের মধ্যে একজন মানুষের সহিত আর-একজনের বিবাদ হইলে, এখন আদালতের সাহায্যে তাহার নিষ্পত্তি হয়। তাহারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে না। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ঝগড়া হইলে, এখনও অধিকাংশ স্থলে তজ্জন্য যুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সালিসীর দ্বারাও অনেক অন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে। অন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য অন্তর্জাতিক লীগ ও আদালত স্থাপনের প্রয়োজন এখন অনেকে স্বীকার করিতেছেন, এবং উহা স্থাপিত করা যে অসাধ্য নহে, তাহাও স্বীকৃত হইতেছে। ইহা অন্ততঃ মুখেও স্বীকৃত হইতেছে যে ক্ষুদ্র জাতিদেরও স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনাপদ্ধতি নির্ণয় করিবার অধিকার আছে। পূর্ব্বে ইহা এত জাতির দ্বারা এরূপ স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই।

যুদ্ধ জিনিসটা যে খারাপ, ইহা এখন বহুজাতি স্বীকার করিতেছে; তাহারা বলিতেছে যে তাহারা অগত্যা বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষা, দুর্ব্বলের রক্ষা, এবং পৃথিবীতে মানবের অধিকার ও গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে।

অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ ছাড়া আর এক প্রকারের যুদ্ধ আছে; তাহা কম নৃশংস ও মারাত্মক নহে। তাহা বাণিজ্যের যুদ্ধ। প্রবল ও ধনী জাতিরা বাণিজ্যিক যুদ্ধ দ্বারা কত কত জাতির বহুপ্রকারের শিল্প ও কৃষি নষ্ট করিয়া তাহাদের জীবনোপায় নষ্ট করিয়াছে। তাহাতে শেষোক্ত জাতিরা ক্ষীণজীবী হইয়াছে। অনেক স্থলে তাহাদের সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, কোথাও বা সমৃদ্ধ জাতিদের মত তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। অন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি যে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, অবাধ প্রতিযোগিতা যে মানব-ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে, উহা রাক্ষসবৃত্তিরই নামান্তর, ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকে স্বীকার করিতেছেন।

এই প্রকারে মানুষের ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, যে, সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আগে যাহা ছিল না, এরূপ বিস্তর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং, ইতিহাসে কেবলি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হইতেছে কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে নূতন অনেক কিছু হইয়াছে, হইতেছে ও পরে হইবে।

সৌর জগৎ এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী কত কোটি বৎসর পরে, লয় পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের জল্পনা কল্পনা মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এ সমস্তই অনুমান মাত্র। যদি ভবিষ্যতে কোন কালে পৃথিবী ও মানবজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা সুদূর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা। মানুষের আবির্ভাব এখন হইতে যত লক্ষ বৎসর আগে হইয়াছিল, তিরোভাব তাহা অপেক্ষা কম লক্ষ বৎসর পরে হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, অসভ্য পশুসমান আদিম মানব ক্রমশঃ বর্ত্তমান সভ্য দশায় পৌঁছিয়াছে। মানবের জন্মের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যদি এত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান কাল হইতে ভবিষ্যতে মানবের তিরোভাবের সময় পর্য্যন্ত ঐরূপ আরও কত মহৎ পরিবর্ত্তন হইবে। মানুষ যে অবস্থায় আছে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে না। অনেকে মনে করেন বটে, যে, এই বিংশ শতাব্দীতেও যখন যুদ্ধকালে নানা অকথ্য নৃশংস ও পৈশাচিক ব্যাপার ঘটিতেছে, তখন মানুষের ক্রমশঃ আরও অধোগতিই হইবে। ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিধাতার মঙ্গল বিধানে ইহা ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। মন ইহা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না। মন ভবিষ্যতে আলোক ও শ্রেয়ঃ দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

অনেক কথা বলিলাম, কিন্তু সকলের চেয়ে গুরুতর কথার এখনও উত্থাপন করি নাই। মানুষের ইতিহাসে নূতন ত অনেক কিছু ঘটিয়াছে, কিন্তু মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? আমাদের ধারণা এই যে মানুষের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং পরে আরও হইবে। মানুষের ইতিহাসের যতদিনের কথা লিখিত হইয়াছে, মানুষের লিখিত সাহিত্য বা চিত্রিত মনের কথা যতদিন-কার তাহার দৈর্ঘ্য কয়েক হাজার বৎসর মাত্র। মানবজাতির

সমগ্র, আজন্ম, ইতিহাসের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ইহা অতি সামান্য; কারণ এই ইতিহাস লক্ষ লক্ষ, হয় ত কোটি কোটি বৎসরের। আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিসর, চীন, ভারতবর্ষ, গ্রীস্, প্রভৃতি দেশের প্রাচীনতম চিত্র, মূর্ত্তি, সাহিত্য, দশ হাজার বৎসরেরও আগেকার নয়। মানব জাতির যুগ-যুগপরিমিত ইতিহাসের তুলনায় দশহাজার বৎসরের কথা দুদিনের কথা মাত্র। সুতরাং আমরা কোন দেশের প্রাচীনতম ইতিহাসে মানুষকে যেরূপ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেখি, এখনও যদি মানুষকে প্রায় ঠিক তেমনি দেখা যায়, তাহা হইলেও ইহা প্রমাণ হয় না যে মানুষের প্রকৃতি বদ্‌লায় নাই। কিন্তু প্রাচীনতম ইতিহাসেও মানুষকে যেমন দেখা যায়, এখন বাস্তবিক মানুষ ঠিক তেমন নাই। মানুষের চেষ্টা, কর্ম্মপ্রিয়তা, আশা, শক্তি, অধ্যবসায়, ভবিষ্যৎদৃষ্টি, সমগ্র মানবজাতির সহিত ঐক্যবোধ, বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগত সম্বন্ধেও মানুষ যেন আগে হইতে ভিন্ন হইয়াছে। আগেকার প্রেমের কবিতা ও এখনকার প্রেমের কবিতা, সমুদয় দেশ ধরিয়া বিচার করিলে, আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে, যে, মানবজাতির অগ্রণী কবিদিগের আত্মায় প্রতিবিম্বিত আদর্শ প্রেম এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অশরীরী সৌন্দর্য্যের, বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর কোন আকর্ষণের বস্তুর অধিক ভিখারী হইয়াছে। আমাদের ধারণা, অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ প্রভেদ লক্ষিত হইবে। মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে কি না, জানি না; কিন্তু হওয়া উচিত।

যাঁহারা মানুষের কোন প্রকার শ্রেয়কে মনের মধ্যে ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা ইতিহাসের নজীর দেখিয়া কখনই মনে করিতে পারেন না, যে, যেহেতু এপর্য্যন্ত মানুষ এই শ্রেয়ের পথে যায় নাই, অতএব ভবিষ্যতেও এই শ্রেয়ের পথ মানুষ অবলম্বন করিবে না। আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা ঘটিবেই; যদিও কবে, কি প্রকারে ঘটিবে, তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ। হৃদয়ের এই আশাশীলতা, শ্রেয়ের দিকে আত্মার এই উন্মুখতা, যখন সজাগ থাকে, তখনই আমরা লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সমুদয় প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হই।

জেলে স্ত্রী-কয়েদী।

বাংলাদেশের জেলসমূহের ১৯১৭ সালের রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ বৎসর বিচারের পর ৯২৮ জন স্ত্রীলোককে আদালত হইতে জেলে পাঠান হইয়াছিল। ১৯১৬তে ৮০৮ জন, এবং ১৯১৫তে ৭০২ জন স্ত্রীলোক এইরূপে জেলে গিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্ত্রী-কয়েদীর সংখ্যা বাড়িতেছে। দুই বৎসরে ২২৬ জন বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির আনুমানিক বা প্রকৃত কারণ রিপোর্টে উল্লিখিত হয় নাই। কি কি সামাজিক ও আর্থিক কারণে নারীরা অধিক পরিমাণে আইনভঙ্গ করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

১৯১৭ সালে মোট ২৯৭৭২ জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক জেলে গিয়াছিল; * তাহার মধ্যে ৯২৮ জন স্ত্রীলোক। দেশে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পুরুষদের চেয়ে অনেক কমসংখ্যক স্ত্রীলোক আইনভঙ্গ করিয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক।

৯২৮ জন দণ্ডিত নারীর মধ্যে ৩৪৩ জন হিন্দু, ২৪৫ জন মুসলমান, ১১ জন বৌদ্ধ ও জৈন, ৫৪ জন খ্রীষ্টিয়ান, এবং ২৭২ জন অন্যান্য শ্রেণীর। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫২.৩ জন মুসলমান এবং ৪৫.২ জন হিন্দু। বাংলা দেশের বাসিন্দা ২,২৫,০২,০৪৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যেও মুসলমান নারীর সংখ্যা হিন্দু নারীর সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোটি ৯৭ হাজার ১৬২; মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার ১৩। হিন্দু স্ত্রী-কয়েদীদের সংখ্যা কিন্তু মুসলমান স্ত্রী-কয়েদীদের অপেক্ষা অধিক। হিন্দুদের মধ্যে এত বেশী-সংখ্যক স্ত্রীলোক কেন আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে গিয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহা অনুমান করিলে চলিবে না যে হিন্দুরা স্বভাবতঃ মুসলমানদের চেয়ে অপরাধপ্রবণ। কারণ, দেখা যাইতেছে, ১৯১৭ সালে দণ্ডিত স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ৫৬.৩২ জন মুসলমান ও ৩৯.৩২ হিন্দু, কিন্তু বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫২.৩ জন মুসলমান ও ৪৫.২

* ১৯১৬ সালে মোট ২৮,৮৩৪ জন জেলে গিয়াছিল।

জন হিন্দু। অতএব ১৯১৭ সালে বঙ্গে হিন্দুদের চেয়ে বরং মুসলমানেরাই অধিক অপরাধপ্রবণতা দেখাইয়াছিল, ইহাই বলিতে হয়। অথচ দেখিতেছি ঐ বৎসর মুসলমান নারীদের চেয়ে অধিকসংখ্যক হিন্দু নারী আইন ভঙ্গ করিয়াছে। ইহার কারণ কি?

সর্ব্বশ্রেণীর এই ৯২৮ জন অপরাধিনীদের মধ্যে ১২ জন ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক, ৫৯১ জনের বয়স ১৬ হইতে ৪০, ২৯০ জনের বয়স ৪০ হইতে ৬০ এবং ৩৫ জনের বয়স ষাটের উপর।

অপরাধিনীদের মধ্যে ২৩১ জন বিবাহিতা, ১৪ জন অবিবাহিতা, ৪৬০ জন বিধবা এবং ২২০ জন বেশ্যা। বেশ্যাদের মধ্যে যে আইনভঙ্গ অপরাধ এত বেশী জনে করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। ১৯১৬ সালে ২৫৬ জন বিধবা জেলে গিয়াছিল, ১৯১৭ তে ৪৬০ জন গিয়াছে। বিধবা অপরাধিনীদের সংখ্যা এত বাড়িবার কারণ কি?

বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের যত স্ত্রীলোক বাস করে, তাহার মধ্যে বিবাহিতা অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অনেক কম; হিন্দুদের মধ্যেও কম, মুসলমানদের মধ্যেও কম। যথা, ১৯১১ সালের সেন্সস্ অনুসারে,—

বঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা।

	মোট।	হিন্দু	মুসলমান।
অবিবাহিতা	৭৫,৬০,৮২৫	২৯,৫১,২৪০	৪৩,৬২,১২৩
বিবাহিতা	১,০৪,২৪,৩২২	৪৫,৫৪,৭১৮	৫৬,৩৪,৭০৯
বিধবা	৪৫,১৬,৯০২	২৫,৯১,২০৪	১৮,৩৭,১৮১

মোটের উপর বিধবাদের সংখ্যা বিবাহিতাদের অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু স্ত্রী-কয়েদীদের মধ্যে বিবাহিতা ২৩৪ জন, বিধবা ৪৬০ জন, অর্থাৎ বিধবাদের সংখ্যা বিবাহিতাদের প্রায় দ্বিগুণ। বিধবাদের মধ্যে আইনভঙ্গ অপরাধ এত বেশী কেন, তাহার কারণ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। পুরুষ বা স্ত্রীলোক কেহ সখ করিয়া জেলে যায় না। মানুষ অভাবে পড়িয়া, দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া, কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, লোভে পড়িয়া, কিম্বা লজ্জা ঢাকিবার নিমিত্ত, আইনবিরুদ্ধ কাজ করে। আমাদের দেশে বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ, তাহাদিগকে সুশিক্ষা-প্রদান, প্রভৃতির যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত নাই; অন্য মানুষের মত বিধবাদেরও যে রক্তমাংসের শরীর, সামাজিক ও পারিবারিক বিধানে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হয় না। এইসব কথা মনে রাখিলে বিধবাদের মধ্যে অপরাধের আধিক্যের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

সধবা ও বিধবা কয়েদীদের মধ্যে কতগুলি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই। তবে, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে, বিধবা কয়েদীদের অধিকাংশ হিন্দু। কারণ, বঙ্গে মোট হিন্দু বিধবার সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ, মোট মুসলমান বিধবার সংখ্যা ১৮ লক্ষর উপর, এবং হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ না থাকায় নিরাশ্রয় ও নিরুপায় বিধবার সংখ্যা অধিক। স্ত্রী-কয়েদীদের মধ্যেও হিন্দুর সংখ্যা বেশী।

বঙ্গের বাসিন্দা স্ত্রীলোকদের মধ্যে মোটামুটি ১ কোটি ৯৭ হাজার হিন্দু, ১ কোটি ১৮ লক্ষ মুসলমান, এবং ৫৯৪৮৬ জন খৃষ্টিয়ান। কিন্তু স্ত্রী-কয়েদীদের মধ্যে ৬৫৩ জন হিন্দু, ১৪৫ জন মুসলমান, এবং ৫৪ জন খৃষ্টিয়ান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খৃষ্টিয়ান নারীদের মধ্যে অপরাধিনীর সংখ্যা তাহাদের মোট সংখ্যার অনুপাতে ভয়ানক বেশী। ইহার কারণ কি? মোট অপরাধিনীদের মধ্যে ৮৮৩ জন নিরক্ষর, ৮৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে, এবং এক জন কেবল পড়িতে পারে।

হিন্দুবিধবার বিবাহ।

শ্রাবণমাসে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। তজ্জন্য বৎসর বৎসর বঙ্গের কোন কোন শহরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এত সভা করিয়াও দেশের লোকে বিধবাদের দুঃখমোচনের বিশেষ কোন চেষ্টা করেন না। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা বিদ্বান্ লোক দেশে অনেক জন্মিয়াছে। তিনি বহি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারের অভাব নাই। তিনি স্কুলকলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহা অন্যেও করিয়াছে। তিনি দয়ালু ও দাতা ছিলেন; অনেক ধনী সমস্ত জীবনে তাঁহা অপেক্ষা বেশী টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় মনে করিবার কারণ কি? কারণ, তাঁহার

নানাদুর্লভগুণসমন্বিত মনুষ্যত্ব। তাঁহাতে যেমন দয়া, ন্যায়-নিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা, সাহস, অধ্যবসায়, ও পুরুষকারের একত্র সমাবেশ দেখা যায়, এরূপ আর কোনও প্রসিদ্ধ বাঙালীতে দেখা যায় না। এবং এই-সকল গুণ, তাঁহার বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টায় যেমন প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার আর-কোন কাজে সেরূপ প্রকাশ পায় নাই। অথচ অধিকাংশ বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায় তাঁহার এই চেষ্টার উল্লেখমাত্রও হয় না, কিম্বা শুধু উল্লেখই হয়। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা ঠিকই যে এইসব সভায় বিধবাবিবাহ সমর্থিত হয় না। কারণ, সমর্থন করিব অথচ কাজে কিছু করিব না, এরূপ ভণ্ডামি অপেক্ষা, উহার উল্লেখ না করাই ভাল।

হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় এরূপ কোন যুক্তি নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা খণ্ডন করেন নাই। তাহার পর আরও অন্যরকমের অনেক কুতর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, বঙ্গে বিধবাবিবাহ চলিতেছে না; গুজরাত, পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা, অন্ধ্র, প্রভৃতি দেশে তদপেক্ষা অধিক চলিতেছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বাংলা দেশে কুতার্কিক, ভণ্ড, দেশাচারের দাস বেশী; ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়বান্ লোকের সংখ্যা কম। "আমাদের বিধবারা দেবী" বলিয়াই বাঙালী নিশ্চিন্ত। বিধবাদের মধ্যে অতি পবিত্রস্বভাবা পরহিতপরায়ণা অনেকে আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক, যে, অন্য অনেকে প্রতিকূল অবস্থা, প্রলোভন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হওয়ায় দেবীত্ব লাভ করিতে পারেন না, অধিকন্তু পাপপঙ্কে নিমগ্ন হন, এবং অন্যান্য শ্রেণীর নারী অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ইহা মনে রাখা দরকার, যে, যে-দেশে পুরুষসমাজে পাশব ও পৈশাচিক ভাবের প্রবলতা দৃষ্ট হয়, এবং ন্যায়নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়, তথায় নারীসমাজে দেবীত্ব সম্যক্‌রূপে স্ফূর্তি পাইতে পারে না।

আমাদের মন্তব্য পড়িয়া কেহ কেহ হয়ত পাশ্চাত্য সমাজের নানা পাপ ও কুপ্রথা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ খারাপ প্রমাণ হইলেই আমাদের সমাজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ হইবে, ইহা মনে করা মূর্খতা। আমাদের দেশের দোষ দেখাইলেই পাশ্চাত্য সমাজের প্রশংসা করা হইল, ইহা মনে করাও তদ্রূপ মূর্খতা। পাশ্চাত্য সমাজ ভাল হউক বা মন্দ হউক, তাহা আমাদের এখন বিচার্য্য নহে। আমাদের আলোচ্য এই যে আমরা কিরূপে ভাল হইতে পারি।

নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার।

অনেক ইংরেজ পুরুষ ও নারী এই ধুয়া তুলিয়াছেন, যে, যেহেতু ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থা হীন, এবং তাহা-দিগকে পুরুষদের মত রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার জন্য পুরুষ আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করিতেছেন না, অতএব ভারতবর্ষের পুরুষদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া উচিত নয়। যাহারা এরূপ তর্ক করিতেছে, তাহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঠিক কথা জানে না, এবং কতকটা ভণ্ডামিও করিতেছে।

ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থা কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে হীন, আবার কোন কোন বিষয়ে তাহাদের সম্মান ও ক্ষমতা পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে বেশী, এবং অবস্থা ভাল। ইংলণ্ডে এখনও অক্সফর্ড কেম্ব্রিজে নারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পান না, ভারতবর্ষের সব বিশ্ববিদ্যালয় নারীদিগকে উপাধি দিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডের পুরুষেরা বহুশতাব্দী ধরিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তথাকার নারীরা সবে মাত্র বর্ত্তমান বৎসরে ঐ অধিকার পাইয়াছেন। এখনও তাঁহারা একবারও পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দেন নাই। যে-সব ইংরেজ পুরুষ ও নারী এ বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করিতেছেন, এবং প্রকারান্তরে বলিতেছেন, যে, হয় পুরুষ ও নারীর একসঙ্গে অধিকার পাইবার দাবী কর, নতুবা পুরুষেরাও অধিকার পাইবে না, তাঁহারা বলুন, এত শতাব্দী ধরিয়া ইংরেজ পুরুষরা কেন নারীদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করিতে-ছিলেন। এত শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডের আত্মকর্তৃত্ব লাভ তাহা হইলে অনুচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। ইংলণ্ডের এবং আরও বহু স্বাধীনদেশের বেলায় যদি কেবল পুরুষরা আত্মকর্তৃত্ব পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পুরুষেরা কি দোষ করিল?

সম্প্রতি বিলাতের আইনজ্ঞ অনেকে বলিয়াছেন, যে, যে-সব ইংরেজ স্ত্রীলোক পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই পার্লেমেণ্টের সভ্য হইবার অধিকারী নহেন। যদি এখন বলি, যে, যেহেতু ইংলণ্ডে বর্ত্তমান সময়েও পুরুষ ও নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান নয়, অতএব ইংলণ্ডের আত্মকর্তৃত্ব লুপ্ত হওয়া উচিত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কুতার্কিক ইংরেজ পুরুষ ও নারীরা কি উত্তর দিবেন?

আমাদের কংগ্রেসে বরাবর নারীদের প্রতিনিধি হইবার অধিকার আছে। অনেকে প্রতিনিধি হইয়াছেন। গত বৎসর ইহার সভানেত্রী হইয়াছিলেন নারী; মান্দ্রাজের গত প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভানেত্রী হইয়াছিলেন নারী। নারীকর্তৃক স্থাপিত হোমরুল লীগের শাখা আছে; হোমরুল লীগের নারীসভা অনেক আছেন; মহারাষ্ট্রের হোমরুল লীগ বলিয়াছেন যে যোগ্যতা দেখিয়া পুরুষনারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের অতীত ও আধুনিক ইতিহাসে বিদুষী, কর্ম্মকুশলা, গুণশালিনী অনেক নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনে প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈ, এবং সম্রাজ্ঞী রিজিয়া ও নুরজাহান ও রাণী লক্ষ্মী বাঈ, প্রভৃতি দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। এখনও অনেক নারী পুরুষের সমান দক্ষতা ও সাহসের সহিত জমিদারীর কাজ চালাইয়া থাকেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রামসকলের কাজ চালাইবার জন্য যে-সব গ্রাম্যসমিতি ছিল, তাহাতে কোথাও কোথাও মহিলারাও সমিতিতে গ্রামের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতেন। নারীদের এই অধিকার ছিল। বড় লাটের মন্ত্রীসভার সভ্য সার্ চিত্তুর শঙ্করন্ নায়ার মহাশয় ১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসের মডার্ণ-রিভিউয়ে একটি প্রবন্ধে প্রমাণসহ এই কথা বলিয়াছেন। ইহা "টুআর্ড্‌স্ হোমরুল" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

বহুশতাব্দী ধরিয়া ইংলণ্ডে কেবল পুরুষদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল বলিয়া আমাদের দেশেও এখন কেবল পুরুষেরাই ঐ অধিকার পাক, আমরা ইহা বলিতেছি না। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যে-হেতু ইংলণ্ডের লোক আগে অনেক শতাব্দী ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিত, তাহার পর বন্দুক, কামান, গোলাগুলি, শেল, বোমা, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছে; অতএব আমাদের দেশের নূতন সৈন্যদিগকে প্রথমে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতে শিখান হউক, তাহার পর তাহারা উৎকৃষ্টতর অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে শিখিবে! আমাদের মত এই, পুরুষের যেরূপ যোগ্যতা থাকিলে তাহার যে অধিকার জন্মিবে, নারীর সেইরূপ যোগ্যতা থাকিলে তাহারও তদ্রূপ অধিকার হওয়া উচিত। যে-সব পাশ্চাত্য দেশে নারীর অধিকার এখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় পূর্ব্বে পূর্ব্বে উহার পুরুষ বিরোধীরা বলিতেন যে নারীকে ওরূপ অধিকার দিলে সামাজিক বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। এরূপ তর্ক আমাদের দেশেও হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, যে-সব দেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় সামাজিক অরাজকতা উপস্থিত হয় নাই। বরঞ্চ তথায় সুরা-উৎপাদন ও পান এবং মাতলামি কমিয়াছে, নারীর উপর ইন্দ্রিয়দাস দুর্বৃত্ত পুরুষদের অত্যাচার দমন অধিকতর সুসাধ্য হইয়াছে, শিশুদের যত্ন অধিক হইতেছে, এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমিয়াছে। আমাদের দেশেও নারী অধিকার পাইলে সুরা উৎপাদন ও পান এবং মাতলামি কমিবে, আফিংখোর গাঁজাখোর প্রভৃতির সংখ্যা কমিবে, নারীহরণ এবং নারীর উপর অন্যবিধ অত্যাচার এখনকার মত সুসাধ্য থাকিবে না, এবং শিশুদের যত্ন অধিক হওয়ায় শিশুর মৃত্যুসংখ্যা কমিবে। যে-সব দেশে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে আরও যে-সকল সুফল ফলিয়াছে, আমাদের দেশেও তাহা ফলিবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের অবলম্বিত দমননীতি, স্বদেশীর কোন কোন পাণ্ডার দেশবাসীর উপর উৎপীড়ন দ্বারা স্বদেশী চালাইবার চেষ্টা, এবং সস্তার সপক্ষে বহুসংখ্যক লোকের কুতার্কিকতা,—প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে স্বদেশীর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। আমরা সবাই যদি তখন বেশী দাম দিয়াও দেশীসূতা ও দেশী কাপড় ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে এখন দেশে বহুসংখ্যক নরনারী বালকবালিকার নগ্নতা উপস্থিত হইত

না। দেশের নারীরা শিক্ষিতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারিণী হইলে, যেমন বুঝিতে পারিবেন যে স্বদেশী না চুলায় নারীর কষ্ট ও লজ্জাই বেশী হইয়াছে, তেমনি তাঁহারা ইহার প্রতিকারের চেষ্টাও করিতে পারিবেন।

ভারতের যে-সকল প্রদেশে নারীর অবরোধ প্রচলিত, তথায় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে নারীদের ভোট দেওয়ার ও লওয়ার অসুবিধা হইবে। কারণ, ভোটদাত্রীকে স্বয়ং ভোটদানস্থলে উপস্থিত হইয়া ভোট দিতে হইবে, নতুবা তিনিই ভোট দিতেছেন কি না বুঝা যাইবে না। অথচ পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু ইহার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা করা কঠিন নহে। নারীদের জন্য, বিশেষতঃ পর্দ্দানশীন নারীদের জন্য, ভোট গ্রহণের স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, শিক্ষিতা বিশ্বাসযোগ্যা দেশীয় বা ইউরোপীয় নারীকে ভোট গ্রহণের ভার দিলেই হইবে।

নারীর যে রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকা উচিত, সে বিষয়ে সাধারণ যুক্তি এই, যে, যে-সব কারণে পুরুষেরা উহার দাবী করেন, নারীরাও সেইসব কারণে দাবী করিতে পারেন। প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর একটি মূলনীতি এই, যে, দেশের শাসনকার্য্য যাহার প্রতিনিধি দ্বারা চালিত হয় না, তাহার উপর ট্যাক্স বসান উচিত নয়; অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কার্য্য ট্যাক্স-দাতাদের প্রতিনিধির দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত। অনেক নারীও জমীর খাজনা এবং নানাবিধ ট্যাক্স ও সেস্ দেন। সুতরাং তাঁহাদেরও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার থাকা উচিত। আইন দ্বারা পুরুষের যেমন মঙ্গল অমঙ্গল হয় বলিয়া তাঁহারা নিজেদের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা আইন প্রণয়ন করিতে চান, আইন দ্বারা নারীদেরও ইষ্ট অনিষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারাও সেইরূপ প্রতিনিধি দ্বারা আইন করাইবার ন্যায়সঙ্গত দাবী করিতে পারেন। একটা দৃষ্টান্ত লউন। কোন হিন্দু নারী স্বামীর ঘর না করিলে স্বামী আইনের সাহায্যে তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইতে কিম্বা জেলে পাঠাইতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করে ও তাহার সহিত ঘর না করে, অধিকন্তু বহুবিবাহিত ও দুশ্চরিত্র হয়, তথাপি স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিতে বা তাহাকে দণ্ডিত করিতে বা তাহাকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য নালিশ করিতে পারে না। আইন-প্রণয়ন কার্য্যে নারীর অধিকার থাকিলে কখন এরূপ অবিচার ও অসাম্য হইত না।

পাটচাষীর দুর্দ্দশা ও পাটের কলের অসাধারণ লাভ।

একদিকে পাটচাষীদের দুর্দ্দশা এবং অন্য দিকে পাটের কলের অংশীদারদিগের অসাধারণ লাভ প্রাপ্তির বিষয় আমরা গত চৈত্র, আষাঢ়, ও শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছি। এই অবস্থার প্রতিকার যে মানববুদ্ধির অসাধ্য নহে, তাহাও দেখাইয়াছি।

কোন ইংরেজই যে পাটচাষীদের দুর্দ্দশায় হৃদয়ে ক্লেশ অনুভব করিতেছেন না, এমন নয়। ছোট-নাগপুরের লর্ড বিশপ, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত, *Chota Nagpur Diocesan Paper* নামক মাসিক পত্রের আগষ্ট সংখ্যায় এবিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Owing to the war certain industries in India have enjoyed unparalleled prosperity, and for some reason the Government has not thought well to impose an excess profits tax. I am not wise enough to understand why, for on the face of it it seems a course of simple justice. But in the case of the Jute trade which has profited perhaps more than others, the situation is made worse by the fact that the excess profits of the shareholders have been enhanced by the low price of the raw material due to the stoppage of its export. In other words the war has lowered the price of the raw article to half the pre-war rate, bringing thereby acute distress upon the cultivator while it has increased the price of that part of the manufactured article which is sold in the open market to the enhancement of manufacturing profits. Both factors have added to the profits of the trade.

Now it is easy to say that the price of the raw jute has been fixed by the ordinary law of supply and demand, but that is in this case untrue, for the war has stepped in to interfere with the operation of this ordinary law. Could the jute have been exported there would doubtless have been a rise rather than a fall in price. Surely the Government whose restrictions, taken in the interests of the Empire as a whole, have brought distress upon one section of the people, while enriching another, should take some steps to ensure a more equitable distribution of profits. Bring the situation to the test of our Lord's judgment and can there be any doubt as to what He would say. His moral indignation would be poured forth on those who claim to be fighting the cause of the oppressed and the weak and yet are enriching themselves at the expense of their poorer brethren. I know it is easier to point out evils than to cure them, but the first step to their cure is to realise

them. And there may be others like myself who had not realised the position. I have not the experience or knowledge to suggest the remedy but there must be those, experienced in business and versed in economics, who are able to solve the difficult problem ; but meanwhile I would urge that share-holders seek ways by which they may share their gains with those whom the war has hit so hard.

অশ্বত্থামার দুগ্ধপান ও আমাদের স্বরাজ-প্রাপ্তি !

মহাভারতের আদিপর্ব্বের ১৩০ অধ্যায়ে দরিদ্র মহারথী দ্রোণাচার্য্য নিজপুত্র অশ্বত্থামার বাল্যকালের একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন।

"একদা অশ্বত্থামা কতকগুলি ধনী লোকের ছেলেকে দুধ খাইতে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে আমি এমন আত্মহারা হইলাম, যে দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। যাহার স্বল্পসংখ্যক গাভী আছে, তাহার কাছে গাভী না চাহিয়া যাহার অনেক গাভী আছে তাহার নিকট হইতে একটি গাভী পাইবার আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সেইজন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু আমার দেশভ্রমণ বৃথাই হইল ; কারণ আমি দুগ্ধবতী গাভী পাইলাম না। বিফলপ্রযত্ন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবার পর, অশ্বত্থামার কয়েকজন খেলার সাথী তাহাকে জলে চালের গুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিল। ইহা পান করিয়া বেচারা অশ্বত্থামা অনভিজ্ঞতাবশতঃ মনে করিল, যে, সে দুধ খাইয়াছে, এবং 'আমি দুধ খাইয়াছি,' 'আমি দুধ খাইয়াছি.' বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার অজ্ঞতা ও সরলতায় তাহার সঙ্গীরা হাসিতেছে এবং সে তাহাদের মধ্যে উল্লাসে নৃত্য করিতেছে, দেখিয়া আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। কতকগুলি পরচর্চ্চাপরায়ণ লোকে অবজ্ঞার সহিত বলিতে লাগিল, 'ধিক্ দরিদ্র দ্রোণকে, যে ধন উপার্জ্জনের চেষ্টা করে না, এবং যাহার ছেলে চালের গুঁড়া মিশান জল খাইয়া তাহাকে দুধ বলিয়া ভ্রম করে, এবং, আমি দুধ খাইয়াছি, আমি দুধ খাইয়াছি, বলিয়া আনন্দে নৃত্য করে!' ইহাতে আমি আত্মহারা হইলাম।"

ভারতবর্ষের প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মণ্টেগু সাহেব ও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের রিপোর্ট পড়িয়া (এবং না পড়িয়াও!) যাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা অশ্বত্থামার মত চালের গুঁড়া মিশান জলকে দুধ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন কি না, ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যে-সব জাতির লোক স্বাধীনতার প্রকৃত খাঁটি দুগ্ধে পুষ্ট, ও যাহারা উহার স্বাদ জানে, তাহারা যদি ভারতসচিব ও লাট-সাহেবের লেখা রিপোর্টটি পড়ে এবং নৃত্যপরায়ণ ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক অশ্বত্থামাদের আচরণ লক্ষ্য করে, তাহা হইলে তাহারা হাসিবে কি কাঁদিবে জানি না। সদাশয় লোকে কাঁদিতেও পারে ; অন্যেরা ভাবিতে পারে, যে, প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদে বঞ্চিত এই লোকগুলি যতদিন জল-চালগুঁড়িকে দুধ মনে করে, ততদিন শ্বেতজাতিদের প্রভুত্ব ও বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে ; অতএব ইহা ভালই।

অবশ্য, আমাদের ভ্রম হইতে পারে। এই জন্য আমরা প্রস্তাব করি যে, রিপোর্টটি কোন রাষ্ট্রীয়-রসায়ন-বিদ্যায় অভিজ্ঞ লোকের নিকট রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য প্রেরিত হউক ; তিনি বিশ্লেষণ করিয়া বলুন, উহাতে শতকরা কত ভাগ জল, কত ভাগ চালগুঁড়ি ও কত ভাগ দুধ আছে।

দলাদলি।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টটিতে প্রস্তাবিত ভারত-শাসনবিধি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার জন্য বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইবে। পাটনার ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সৈয়দ হাসান ইমাম ইহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। হাসান ইমাম মহাশয় সুযোগ্য লোক।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা ভারতবর্ষের কতকগুলি রাজনৈতিক আন্দোলন-কারীকে এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট বা চরমপন্থী এবং অপর কতক-গুলিকে মডারেট বা মধ্যপন্থী নাম দিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগকে এইরূপ দুটা দলে ভাগ করা আমরা কখনও অনুমোদন করি নাই, এবং দলাদলির ভাব হইতে কিছু না লিখিবার চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত করিতেছি। বাস্তবিক এইরূপ সুস্পষ্ট ভাগ ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নাই। দুটি তথাকথিত দলের মধ্যে একটি রেখা টানিতে কেহই পারিবেন না। নাম দুটা চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই ব্যবহার করিব।

যাহা হউক, এংলোইণ্ডিয়ানেরা যাঁহাদিগকে মডারেট নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক বলিতেছেন যে তাঁহারা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিবেন না। সব প্রদেশের মডারেট নেতারা বিশেষ অধিবেশন হইতে দূরে থাকিবেন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, যাহাতে সকলেই অনুপস্থিত থাকেন, এরূপ চেষ্টা হইতেছে। মডারেটদের এই অধিবেশনে যোগদান কেন অবাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিব না; কারণ তাহাতে অনেক ব্যক্তিগত কথা আসিয়া পড়িবে। বঙ্গের প্রধান দুটি দেশী দৈনিক ইংরেজী কাগজে প্রত্যহ কথা-কাটাকাটি হওয়ায় মানুষের মন যথেষ্ট তিক্ত হইয়াছে; তিক্ততর করিবার ইচ্ছা নাই। অবস্থা এমন ঘটিয়াছে, যে, বঙ্গের কোন্ জায়গায় কিরূপ সভা হইতেছে এবং তথায় কাজ কিভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, কি কি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, কে কি মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সংবাদ জানা দুঃসাধ্য হইয়াছে। কেহ বা একখানা কাগজের কথা বিশ্বাস করিতেছেন, কেহ বা অন্যখানার করিতেছেন। অথচ অনেক দিন হইতেই লক্ষিত হইতেছে, যে, দুখানা কাগজের প্রত্যেকটিতেই কিছু সত্য সংবাদ থাকে, কিছু সত্য গোপন করা হয়, এবং কিছু বিকৃত, অপ্রকৃত, বা মিথ্যা কথাও থাকে। ইংরেজী দৈনিক কাগজ দুটির যেমন ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা নাই, তেমনি উহাদের সম্পাদকদিগের দলভুক্ত লোকদের সম্পাদিত বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলিও সম্পূর্ণ নির্ভরের অযোগ্য হইয়াছে; এমন কি, সাধারণতঃ অতি শ্রদ্ধেয় লোকের সম্পাদিত কাগজেও দলাদলিপ্রসূত অন্ধতাবশতঃ প্রত্যেকটি কথা ওজন করিয়া যথার্থ কথা বলা হয় না।

এ অবস্থায় মাসাধিক কাল ধরিয়া কে কি বলিতেছেন ও লিখিতেছেন, তাহা হইতে, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মডারেটদিগের উপস্থিত না হইবার ইচ্ছার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অল্প। সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই; কারণ বঙ্গের নেতা বা তথাকথিত নেতারা যাহা বলিতেছেন লিখিতেছেন, তাহার অল্প অংশই আমরা পড়িয়াছি।

ভারতসভা এসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সুরেন্দ্রবাবুর দলের মডারেটদের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; তাঁহারা কেন যে বিশেষ কংগ্রেসে যোগ দিবেন না, তাহা বলা হইয়াছে। এই প্রস্তাবটিরই একটু আলোচনা করি। ভারতসভা বলিতেছেন—

> That in view of the irreconcilable attitude towards the Reform Scheme displayed in the manifesto issued by Mrs. Besant and several other persons who will have a controlling voice over the deliberations of the Special Session of the Congress, and further having regard to the proceedings of the special session of the Madras and Bengal Provincial Conferences, the Committee of the Indian Association deeply regret that they are unable in the best interests of the country to participate in the proceedings of the forthcoming Special Session of the Congress, and the Committee appeal to all who desire progressive realization of responsible government in India to abstain from attending the same.

ভারতসভার প্রস্তাবে উল্লিখিত প্রথম কারণটিতে বলা হইতেছে, যে, মিসেস বেসান্ট এবং অন্য কতকগুলি লোক একটি ম্যানিফেষ্টো অর্থাৎ তাঁহাদের মতব্যঞ্জক একটি পত্রী বাহির করিয়াছেন, তাহাতে শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ প্রতিকূল ভাব দেখাইয়াছেন, যে, তাঁহাদের প্রতিকূলতা কিছুতেই দূর হইবে না বা কমিবে না, তাঁহারা কোন মিটমাট, মধ্যপন্থা, পরিবর্ত্তন বা রফায় রাজী হইবেন না, এবং কোন প্রকার সুযুক্তি বা সুপরামর্শ শুনিবেন না। ভারতসভার প্রস্তাবের irreconcilable কথাটির মানে আমরা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে ঐরূপ বুঝিয়াছি। আমাদের ভুল হইয়া থাকিলে সুরেন্দ্রবাবু বা তাঁহার দলের কেহ প্রামাণিক ইংরেজী অভিধান হইতে ঐ কথাটির মানে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে বাধিত হইব।

এক্ষণে, মিসেস্ বেসান্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণের ম্যানিফেষ্টোতে কি আছে, দেখা যাক। উহার গোড়াতেই নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে—

> The following draft is approved by those whose names are attached to it, as embodying substantial changes in the Montagu-Chelmsford Scheme, by introducing into it the essential features of the Congress-League Scheme—enlarged Legislative Councils with a four-fifths (or substantial) majority of elected members being already granted. They are not intended as anything more than a statement of our opinions, not in any sense as an ultimatum to anybody. We are prepared to listen to arguments against them, to change them if better proposals are made. The other essentials are:
> 1. The proportion of Muhammadans in the Legislatures.
> 2. Control over the budget, entailing the subordination of the Executive to the Legislature, and giving fiscal autonomy.
> 3. Executive Councils, half-English and half-Indian.

স্বাক্ষরকারীরা ইহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, ইহা আল্টিমেটাম্ বা শেষকথা নয়, "আমরা আমাদের প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত আছি, এবং যদি উৎকৃষ্টতর প্রস্তাব কেহ করেন, তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাবগুলি পরিবর্ত্তন করিতে রাজী আছি।" যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহাদিগকে আর যাহাই বলা হউক, irreconcilable বলা সঙ্গত নয়।

সমুদয় স্বাক্ষর সহ সমস্ত ম্যানিফেষ্টোটি ছাপিবার জায়গা

আমাদের নাই। আমরা কেবল দেখাইতে চাই, যে, শাসনসংস্কার-ব্যবস্থার প্রতি উহার প্রতিকূলতা ঐকান্তিক ও চরম নহে, কেন-না স্বাক্ষরকারীরা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন উহাতে কি কি পরিবর্ত্তন করিলে উহা "প্রজাদের নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্টে"র প্রথম কিস্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তাঁহারা ম্যানিফেষ্টোর প্রথম (e) দফায় বলিতেছেন—

"That we are of opinion that to render the Scheme possible, even for a short period, as a first step, the following changes must be incorporated in the Bill to be brought before Parliament."

"আমাদের মতে, পার্লেমেণ্টের সমক্ষে ভারতশাসন-ব্যবস্থা বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি পেশ্ করা হইবে, নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনগুলি তাহার অঙ্গীভূত হইলে, ব্যবস্থাটি, অন্ততঃ অল্পকালের জন্যও, প্রথম কিস্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে।" এই ভাবকে আমরা ঐকান্তিক চরম বিরোধিতা (irreconcilable attitude) মনে করি না।

আমরা জানি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ২।১ জন কেহ বা ব্যক্তিগত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি ইংলণ্ডের দিবার এবং ভারতবর্ষের লইবার অযোগ্য; কেহ বা বলিয়াছেন, উহার সমস্তটি অগ্রাহ্য করা উচিত।' কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে নিজের অনিচ্ছা ও অমত সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ লোকের বা দলের অধিকাংশ লোকের মতে মত দেওয়া চলিত আছে। তাহা ধর্ম্মবুদ্ধি-বা বিবেক-বিরুদ্ধ নহে। অবশ্য কেহ যদি বলেন, রাজনৈতিক ডাকাতি করা খারাপ, এবং দেশের অধিকাংশ লোকে বলে, রাজনৈতিক ডাকাতি করা ভাল, তাহা হইলে তিনি এইরূপ মতে সায় দিতে পারেন না। কিন্তু কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিলে ব্যবস্থাটিতে আপাততঃ কাজ চলিতে পারে কি না, কিম্বা কি কি পরিবর্ত্তন দরকার, এ বিষয়ে মতভেদ বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধিসংপৃক্ত মতভেদ নহে। এসব স্থলে লোকে দলের বা দেশের মতকে নিজের মতের উপরে স্থান দিতে পারে। ম্যানিফেষ্টোতেও দেখিতেছি,—কুম্বকোনমের শ্রীযুক্ত ভী কে রামানুজ আচারিয়র লিখিতেছেন, "From a sense of public duty, I subordinate my personal feeling ;" মিসেস্ বেসাণ্ট একটি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"Mr. C.P. Rama-swami Aiyar and myself are both willing to accept this substitution if generally preferred." আমরা ইহাকে irreconcilable attitude মনে করি না।

ভারতসভার প্রস্তাবে উল্লিখিত দ্বিতীয় কারণটি এই, যে, বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনে ম্যানিফেষ্টোতে স্বাক্ষর-কারীদের বেশী হাত থাকিবে। সকল কংগ্রেসেই এবং সকল দেশের সাধারণ সভাতেই, উদ্‌যোগকর্ত্তা কতকগুলি লোকের হাত বেশী থাকে। যাহাদের ততটা হাত বা প্রভাব থাকে না, তাহারা যদি বলে ঐ কারণে তাহারা উহাতে যোগ দিবে না, তাহা হইলে যে-যে দেশে দলে দলে মতভেদ আছে এরূপ কোথাও কোন সম্মিলিত কাজ বা পরামর্শ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। দলে পুরু হউন বা না হউন, সকলেরই সুযুক্তি দ্বারা সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে নিজ মতে আনিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তাহার উত্তরে, ভারতসভার প্রস্তাবে উল্লিখিত, কতকগুলি কথা বলা যাইতে পারে। উহাতে মান্দ্রাজ ও বঙ্গের বিশেষ কন্‌ফারেন্সের কার্য্যপ্রণালী ও ঘটনার উল্লেখ আছে। উভয়েই খুব গোলমাল ও অশিষ্ট ব্যবহার হইয়াছিল। আমরা এরূপ গোলমাল ও অশিষ্ট ব্যবহারকে অসভ্যতা মনে করি। পাশ্চাত্য দেশে অনেক সভায় ইহা অপেক্ষাও অসভ্যতা হয় বলিয়া উহা মার্জ্জনীয় নহে। সভাপতির নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যিনি প্রাসঙ্গিক যাহা বলিতে চান তাঁহাকে তাহা বলিতে দেওয়া উচিত। যাহা হউক, গোলমাল হইয়াছে বলিয়াই গোলমালকারীদের হাতে সব ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নয়। মান্দ্রাজের বিশেষ প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে ত মিসেস্ বেসাণ্টকেই অপমান করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ত বলিতেছেন না যে তজ্জন্য বোম্বাইয়ের বিশেষ কংগ্রেস্ হইতে দূরে থাকিবেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা রীতি ও প্রণালী আমরা পাশ্চাত্য দেশ-সকল হইতে আমদানী করিয়াছি। সেখানে দেখা যায়, যে, সভাসমিতিতে কখন কখন চেয়ার বেঞ্চী ছুড়াছুড়িও হয়; কিন্তু তাহাতেও কোন নেতা সভায় উপস্থিত হওয়া ছাড়িয়া দেন না।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে প্রস্তাবিত নূতন ভারত-শাসনবিধি গ্রহণ করিব, কি, করিব না, বলিবার সময় এখনও আসে নাই; এমন কি, যথা-সময়ে যদি দেশের অধিকাংশ কাগজ ও সভাসমিতি বলে যে উহা গ্রহণীয় নহে, তাহা হইলেও পার্লেমেণ্ট উহাকে আইনে পরিণত করিতে পারেন। এখন উক্ত রিপোর্টের লেখকগণ যাহা চাহিয়াছেন আমাদের তাহাই করা উচিত। রিপোর্টটি ৩৫৬টি প্যারাগ্রাফে বিভক্ত। ৩৫৫র প্যারাগ্রাফে নানা লোককে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে; ৩৫৬র প্যারাগ্রাফটি এই প্রার্থনা করিয়া শেষ করা হইয়াছে যে রাজার এবং তাঁহার মিত্রদের সেনাদল-সকলের আত্মবলিদান ও সহিষ্ণুতার ফলে যেন ন্যায় ও স্বাধীনতা জগতের লোকদের জন্য সংরক্ষিত হয়। আসল রিপোর্টটি ৩৫৪র প্যারাগ্রাফেই শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের পাশে উহার একটি শিরোনাম দেওয়া আছে। ৩৫৪রটির শিরোনাম "Need for criticism," "সমালোচনার আবশ্যকতা"। এই প্যারাগ্রাফে ভারতসচিব

ও বড়লাট বলিতেছেন—In a matter of so great intricacy and importance it is obvious that full and public discussion is necessary……Our proposals can only benefit by reasoned criticism both in England and India, official and non official alike." যুক্তিপূর্ণ পুরামাত্রায় সমালোচনা ইঁহারা চাহিয়াছেন। ২৭শে জুলাই কেম্‌ব্রিজে মণ্টেগু সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেও তিনি সমালোচনা চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"Its authors submitted it with a full sense of responsibility for criticism. If anybody would suggest a better way they would find in them and in Government heartfelt thanks and ready acceptance."

তাহার পর তিনি হাউস অব্ কমন্সে যে বক্তৃতা করেন তাহাতেও সমালোচনার আবশ্যকতা উল্লেখ করিয়া বলেন যে রিপোর্টটি চূড়ান্ত নয়, ইহা অপরিবর্ত্তিত ভাবে আইনে পরিণত হইবার নয়, ইহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

"Lord Chelmsford and he were absolutely sincere when they asked Government to publish the Report for criticism. The Report was not there as a finished document which they sought to translate unaltered into an Act of Parliament. It must be sifted and tested."

অতএব এখন আমাদের সকলেরই জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে রিপোর্টটির সমালোচনা করা ও ইহাতে আবশ্যক পরিবর্ত্তনের সূচনা করা কর্ত্তব্য। সকল শ্রেণীর লোক সম্মিলিতভাবে সমালোচনা ও পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে তাহার যেরূপ জোর হইবে, স্বতন্ত্র ভাবে এক এক দল তাহা করিলে তাহার তেমন জোর হইবে না; কারণ কোন দলের কথাই দেশের মত বলিয়া গ্রহণীয় হইবে না। অবশ্য প্রত্যেক দলই বলিতে পারেন, যে, তাঁহারাই দেশের অধিকাংশ লোকের ও প্রকৃত প্রতিনিধি; এবং ইংরেজ আম্‌লারা ও ভারতবাসীদের উন্নতির শত্রু অন্যান্য ইংরেজরাও তাহাদিগকেই দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া চেঁচাইতে পারে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিবর্ত্তন ও ক্ষমতা চায়। কিন্তু মিথ্যা ইংরেজ বা ভারতীয় যে দলের লোকই বলুক, তাহা জয়যুক্ত হইবে না।

মডারেট, এক্স্‌ট্রিমিষ্ট, কংগ্রেস হোমরুল সব দলের লোকই অল্পাধিক পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন। মডারেট দলের একজন প্রধান নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় রিপোর্টের যে সমালোচনা বাহির করিয়াছেন, তাহা অন্যদলের লোকদের সমালোচনা অপেক্ষা কম কঠোর নহে। এই যুক্তি-ও-তথ্য-পূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনাটি বাংলা দেশের সকল দলের লোকদের পড়িবার সুবিধা হয় নাই। কারণ, আমাদের যতদূর মনে পড়িতেছে, বেঙ্গলী ইহা ছাপেন নাই, যদিও রাম শ্যাম হরি অনেক নগণ্য লোকের মন্তব্য বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম দিয়া ছাপিয়াছেন! অমৃতবাজারও সমস্তটি ছাপেন নাই; এবং অমৃতবাজারেও নিরপেক্ষভাবে সব দলের লোকের মত মুদ্রিত হয় নাই। সকল দলের লোকই যখন পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন, তখন ব্যক্তিগত অপ্রেম ভুলিয়া দেশের কল্যাণের জন্য, কি কি পরিবর্ত্তন সকলেই চান, তাহা পরামর্শ করিয়া স্থির করা কি অসম্ভব?

কেহ কেহ বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, এই এই পরিবর্ত্তন না করিলে শাসন-ব্যবস্থা কার্য্যকর বা গ্রহণীয় হইবে না; অন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, ব্যবস্থাটি কার্য্যকর এবং গ্রহণীয়, কিন্তু ইহাতে এই এই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অবশ্য কেহ বা মৌলিক ও গুরুতর পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন, কেহ শুধু অবান্তর পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন; কিন্তু মোটের উপর বলিতে গেলে প্রভেদটা ইংরেজীতে যাহাকে বলে between tweedledum and tweedledee। কথাটা না হয় একটু গ্রাম্য করিয়াই বলা যাক। কতকগুলি লোক বলিতেছেন, "এই জালটা দিয়া মাছ ধরা যাইবে ও ধরিতে রাজী আছি,—তবে কিনা, ইহার বড় বড় ফাঁক ও ছিদ্রগুলা মেরামত করা দরকার।" অপর কতকগুলি লোক বলিতেছেন, "বড় বড় ফাঁক ও ছিদ্রগুলি মেরামত না করিয়া দিলে এই জালটি মাছ ধরিবার উপযুক্ত হইবে না, সুতরাং গ্রহণীয়ও হইবে না।" কতকগুলি লোক বলিতেছেন, "এই তরকারীটা খাইব,—তবে কি না আরও বেশী আনাজ, একটু ঘৃত, কিছু লবণ ও কিঞ্চিৎ মস্‌লা সংযোগ করিতে হইবে।" অপর কতকগুলি লোক বলিতেছেন, "আরও আনাজ এবং ঘৃত, লবণ ও মস্‌লা না দিলে তরকারীটা ভোজনযোগ্য হইবে না, সুতরাং শরীর পুষ্ট করিবে না।"

সুতরাং দুই দলের লোকের মধ্যে অতি ভয়ানক মত-ভেদ দেখা যাইতেছে! মিল অসম্ভব!!

আমাদের শেষ কথা এই। কলিকাতার দলপতিরা আপনাদিগকে হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ভাবিবেন না। মফঃস্বলের লোকেরাই দেশের অধিকাংশ। কলিকাতার সমকক্ষ লোক মফঃস্বলে আছেন। সে দিন গিয়াছে, যখন কলিকাতায় বসিয়া চাল চালিলেই কার্য্যোদ্ধার হইত। এখন নিতান্ত অন্ধ ও দাসপ্রকৃতির লোক ছাড়া, পৌরুষবিশিষ্ট কোন মানুষ কাহারও কথা অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করিবে না, করা অনুচিত। অতএব দেশকে প্রকারান্তরে হুকুম না করিয়া, দেশের মত কি, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত নির্দ্ধারণের চেষ্টা হউক। দেশের অধিকাংশ লোক যাহা বলিবে, তাহাই যে মানিতে হইবে, তাহা নয়। আমি মনে করিতে পারি, দেশের লোক ভুল বুঝিয়াছে, আমি ঠিক বুঝিয়াছি। কিন্তু দেশের লোকের নামে কথা কহিতে

হইলে তাহাদের মত নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, অনুমান বা কল্পনা করিয়া লইলে চলিবে না। নিজের ব্যক্তিগত মত কি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজে বলা যায়, কিন্তু তাহা বলিতে হইলেও রিপোর্টখানা আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পড়া দরকার। সে কথাটা নামজাদা কোন কোন লোকও ভুলিয়া গিয়াছেন!

ন্যায্য সমালোচনা ও শাসনসংস্কার-ব্যবস্থার প্রত্যাহার-সম্ভাবনা।

আমরা যাহাকে ন্যায্য সমালোচনা মনে করি, অনেকে তাহা খুব কড়া বা তীব্র সমালোচনা মনে করেন। যাহা হউক, নাম লইয়া ঝগড়া করিবার দরকার নাই। অনেকের ধারণা, যদি ভারতশাসনসংস্কার-ব্যবস্থার ন্যায্য বা তীব্র সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যতটুকু অধিকার দিতেন, তাহাও দিবেন না। এ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মিসেস্ বেসাণ্ট ও শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টের ন্যায্য বা কড়া সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে সার জন রীজের মত ভারতশত্রু বুঝিয়াছেন, যে, তাহা হইলে ত প্রস্তাবিত শাসন-ব্যবস্থা খুব ভাল, সুতরাং তিনি উহার সমর্থন করিয়াছেন! রয়টার তারে তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ পাঠাইয়াছেন—

"Sir John D. Rees urged a speedy carrying out of the proposals of the Report. If the establishment of democracy in India led to a period of Brahmin oligarchy that should not be greatly deplored. Brahmins were the natural leaders of the people of India. The reception of the proposals by extremists such as Mr. Tilak and Mrs. Besant showed that the proposals were not likely to give away British power in India."

উদ্ধৃত শেষ বাক্যটির তাৎপর্য্য এই, যে, শ্রীযুক্ত টিলক ও মিসেস বেসাণ্ট প্রস্তাবগুলির যেরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, যে, তদ্দারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব আর কাহাকেও হস্তান্তর করা হইতেছে না। সেইজন্য তিনি বলিতেছেন, রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করা উচিত!

একজন ন্যায়বান্ ইংরেজ ও পাটচাষী।

একজন সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান. ও ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ যে-সব জেলার পাটচাষীদের বস্ত্রকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তথায় ঐ বিপন্ন চাষীদিগকে বস্ত্র দিবার জন্য, প্রবাসী-সম্পাদককে এক হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি টাকা পাঠাইবার সময় নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন—

"I own a few shares in the Jute Mills which have been making enormous profits, and I understand that this is in part due to the very low price of the raw jute owing to the stoppage of export. I further understand that this low price of jute has caused very severe distress to the cultivators. I do not wish to profit by this. I learn that you are administering a fund for the relief of distress among these cultivators and I have pleasure in sending you my cheque for Rs. 1,000, which I hope you will use for me in providing clothing for those in the Jute districts who are thus distressed. I should take this as a real favour."

পত্রলেখক মহাশয় পাটের কলের কয়েকটি অংশের অধিকারী। পাটের কলে খুব লাভ হইয়াছে অথচ পাটচাষীরা কষ্ট পাইতেছে, বলিয়া, তিনি তাঁহার অংশের লাভের টাকা লইতে অনিচ্ছুক। এইজন্য তিনি পাটচাষীদের দুঃখনিবারণের জন্য হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। ইঁহার মত সহৃদয় ন্যায়বান্ লোক ইংরেজজাতির গৌরব। অন্য যে-সব ইংরেজ ও ভারতীয় লোক পাটের কারবারে খুব লাভ পাইতেছেন, তাঁহাদের এই পত্রলেখক মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আগে হইতেই পাটের জেলায় ও অন্যত্র কাপড় দিতেছিলেন। আমাদের হস্তগত এক হাজার টাকা আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে দিব। অনুন্নত-শ্রেণীর উন্নতিবিধায়িনী সমিতির অন্যতর সম্পাদক রায়সাহেব রাজমোহন দাস মহাশয় শীঘ্র স্বয়ং যোগ্য লোক বাছিয়া বস্ত্রদান আরম্ভ করিবেন।

মৈমনসিংহে লাটসাহেবের বক্তৃতা।

মৈমনসিংহের লোকেরা বঙ্গের লাটসাহেবকে যে অভিনন্দনপত্র উপহার দেন, তাহার উত্তরে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। অভিনন্দনপত্রের একটি অংশে অন্তরায়িত ও রাজবন্দীদের কথা ও অবিচারিতভাবে লোকের বাড়ী তল্লাসীর কথা ছিল। লাটসাহেব থানাতল্লাসী সম্বন্ধে বলেন যে সেগুলি খুব বিবেচনা করিয়া করা হয়; অবিচারিত ভাবে করা হয় মনে করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, বেঙ্গলী আফিস একবার এবং সঞ্জীবনী আফিস কয়েকবার তল্লাস করা হয়; পুলিশ কিছুই পায় নাই। তল্লাস কেন করা হইয়াছিল? অন্তরায়িতদের সম্বন্ধে লাটসাহেব বলেন—

Then as to the nature of the internment, except for the period during which the enquiry is being prosecuted when it is necessary to prevent those whose conduct is being enquired into from communicating with their associates, persons dealt with under the Defence of India Act are not kept in cells of any kind. They are interned in villages where all can see how they live and are treated, and where they are visited by non-official visitors. You speak of their injured prospects. It is doubtless true that a man cannot play with fire without burning his finger, but then the remedy is for the young men to give up playing with fire. The remedy lies not with Government but with the young men themselves.

অন্তরায়িতরা যখন কারাগারে নির্জ্জন কক্ষে থাকে, তখন তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, এবং কারাগারে পাঠাইবার পূর্ব্বে পুলিসের তত্ত্বাবধানে তাহারা যেরূপ ব্যবহার পায়, তাহাতে অনেক অন্তরায়িত ও রাজবন্দী পাগল বা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এখনও টলে নাই। অন্তরায়িতগণ যে-সব গ্রামে থাকে, তাহার কোন কোন স্থানে তাহাদের খুব অসুবিধা হওয়াতেই ত অনেকে অন্তরায়ণের নিয়মভঙ্গ করিয়া জেলে যাইতেছে। বেসরকারী পরিদর্শক ত গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে নিযুক্ত করেন নাই; পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হওয়ায় অল্পদিন হইল করিয়াছেন। পরিদর্শকদের কাজ সন্তোষজনক হইতেছে কি না, এখনও জানা যায় নাই। আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট বেসরকারী পরিদর্শক, ও পরামর্শদাতা-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন; অথচ আন্দোলন বন্ধ করিবার পরোক্ষ চেষ্টাও চলিতেছে। অনেক যুবকের ভবিষ্যৎ মাটি হইতেছে, এই অভিযোগের উত্তরে বলা হইয়াছে, প্রতিকার তাহাদের হাতে; তাহারা আগুন লইয়া খেলা না করিলেই তাহাদের আঙুল পুড়িবে না। সত্য; কিন্তু যে-সব ছাত্রকে গবর্ণমেণ্ট নির্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন ও যাহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছে না, তাহাদের অনেকেও যে কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিতেছে না। ইহার প্রতিকার ত তাহাদের হাতে নাই, গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে। অন্য অনেক অন্তরায়িত খালাস পাইয়াও চাকরী পায় না, পুলিশ পেছনে লাগিয়া থাকে।

অভিনন্দনকারীরা বলিয়াছিলেন যে লোকের মনে এই ধারণা জন্মিতেছে যে অনেক নির্দ্দোষ লোকের উপর অন্যায় ভাবে ভারতরক্ষা আইন প্রযুক্ত হইতেছে। তদুত্তরে লাটসাহেব ১৯০৭ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত মৈমনসিংহে যত ডাকাতী, খুন, গুরুতর আঘাত হয়, তাহার তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি প্রকারে সমুদয় আবদ্ধ লোকদের অপরাধ প্রমাণ হইল, বুঝা যায় না। গবর্ণমেণ্ট নিজেই ত কয়েক শত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া অবিলম্বে কিম্বা অল্প বা বহুকাল আবদ্ধ রাখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাদিগকে কি লাটসাহেব দোষী বলিতে চান? তাহা হইলে ছাড়িয়া দিলেন কেন? মৈমনসিংহের লোকেরা ত বলেন নাই যে সমুদয় অন্তরায়িতরা নিশ্চয় নির্দোষ; লাটসাহেব বলিতেছেন তাঁহারা বলিয়াছেন—"many innocent men are being unjustly dealt with under the Act।" গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগকে নির্দোষ বুঝিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহারাও এই many innocent-দের মধ্যে। তাহারা নির্দোষ না হইলে কখন অন্তরায়ন হইতে মুক্তি পাইত না।

লাট সাহেব রাজদ্রোহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত রৌলট কমিটির রিপোর্ট সকলকে পড়িতে অনুরোধ করেন, ও তাহা হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করেন—

"There are the persons as to whom it can be said without any reasonable doubt that they have been parties to the murders and dacoities which have been narrated in the preceding pages. Many of these are temporarily in custody or under restriction. Some, if not most, of these persons are such desperate characters that it is impossible to contemplate their automatic release on the expiry of six months from the close of the War. One man recently arrested is undoubtedly guilty of four murders and has been concerned in eighteen dacoities, of which five involved murders. There are others like him both in custody or at large."

কমিটির সভ্যেরা আইনজ্ঞ লোক। তাঁহারা পুলিশের পেশ-করা একতরফা প্রমাণ হইতে কি করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, জানি না, যে, অনেকে নিশ্চয়ই অপরাধী, এবং তাহাদের মধ্যে একজন চারটা খুন করিয়াছে ও আঠারটা ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল। যদি তাহার অপরাধ এত সন্দেহাতীত, তাহা হইলে আদালতে তাহার বিচার হয় নাই কেন? আদালতের বিচারে দোষী বলিয়া প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে সর্ব্বসাধারণে দোষী বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

লাট সাহেব বলিতেছেন যে ঐ উদ্ধৃত কথাগুলি গবর্ণমেণ্টের কথা নয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটি কমিটির কথা, বিলাতে হাইকোর্টের একজন জজ তাহার সভাপতি ছিলেন।

"Remember these are not words spoken by the Government. They are words written by an absolutely impartial Commission, two of whose members were Indian gentlemen whom no one will accuse of being subservient to the Government.

বিলাতের লোকেরা তথাকার গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত তাহাদেরই স্বজাতীয় জজ বা পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগকেও নিরপেক্ষ মনে করে কি না সে বিষয়ে আমরা আষাঢ় মাসে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

খবরের কাগজের পাঠকেরা জানেন গত মে-মাসে জেনারেল মরিস ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ব্রিটিশসেনাসম্বন্ধীয় কতকগুলি উক্তি অলীক বলিয়া সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন। তাহা লইয়া পার্লেমেণ্টে তর্কবিতর্ক হয়। মন্ত্রীসভা প্রস্তাব করেন যে, দুজন অভিজ্ঞ জজ ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রায় দিবেন। তাহাতে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আস্কুইথ সাহেব আপত্তি করিয়া প্রস্তাব করেন (৯ই মে) যে হাউস্ অব্ কমন্সের পাঁচজন সভ্য লইয়া একটি নিরপেক্ষ কমিটি হউক, সেই কমিটির উপর তদন্তের ভার দেওয়া হউক। রয়টার তাঁহার বক্তৃতার এই অংশটির চুম্বক নিম্নলিখিতরূপ টেলিগ্রাফ করেন:—

"The Government had admitted that there was a case for enquiry. He regarded the proposal that two judges of experience should hold such an enquiry in such circumstances as unsatisfactory. Such a tribunal would be impotent unless it had statutory powers, and he suggested a non-party committee of five members of the House of Commons, who could probably reach a decision which would be respected by

the House and the country in two or three days...... He hoped regarding some of these matters that there had been honest misunderstanding, but the clearer the case the Ministers had for proving the accuracy of the impugned statements the more cogent was the argument in favour of an enquiry under conditions which nobody could suspect of partiality or prejudice. (Laughter, in which Mr. Bonar Law joined).

"Mr. Asquith, turning to Mr. Bonar Law, asked whether Mr. Bonar Law thought that a Select Committee of the House was not an unsuspected tribunal.

"Mr. Bonar Law replied that every member of the House of Commons was either friendly or unfriendly to the Government, and therefore prejudiced.

"Mr. Asquith retorted, 'I am very sory to hear the leader of the House suggest that there cannot be five members of the House of Commons who are not so steeped in party prejudice that they cannot be trusted to judge a pure issue of fact. I leave it there."

যদিও বিলাতের এই তদন্তের বিষয়, এবং অন্তরায়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এক রকম জিনিস নয়, তথাপি, কে পক্ষপাতশূন্য হইতে পারে, কে পারে না, এইসাধারণ বিচার্য্য বিষয়টি পার্লেমেণ্টে উঠিয়াছিল এবং এখানেও মানুষের মনের মধ্যে রহিয়াছে। বিলাতে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আস্কুইথ সাহেব রাজবেতনভোগী দুজন অভিজ্ঞ জজ নিরপেক্ষ হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই; পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান অন্যতম মন্ত্রী বোনার ল সাহেব মনে করিলেন যে, হাউস্ অব্ কমন্সের প্রায় সাতশত সভ্যের মধ্যেও পাঁচজন এমন লোক পাওয়া যাইবে না যাঁহারা তথ্যের সত্যতা অসত্যতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে মত দিতে পারিবেন। ইঁহারা সবাই বিলাতের লোক। বিলাতের লোকেরাই আপনাদের জাতভাইদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান।

সুতরাং এখানকার বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যে-সব ইংরেজ ও দেশী রাজ-ভৃত্যকে ও বেসর্‌কারী লোককে মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, এরূপ বিশ্বাস লোকের না হইলে, আশা করি, তাহা রাজদ্রোহ বিবেচিত হইবে না।

জেনারেল মরিসের চিঠি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার দুজন জজের উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দিতে চান। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আস্কুইথ তাহাতে রাজী হন না। বিলাতের হাইকোর্টের জজ হইলেই নিরপেক্ষ হয়, ইংলণ্ডের সব লোক তাহা মানে না। তাহার প্রমাণ এংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বিলাতী কাগজ নিউ উইট্‌নেসের (New Witness) নিম্নে মুদ্রিত কথাগুলি।

"The method of investigation proposed by the Government is far from satisfactory. They propose to submit the whole quarrel to the secret investigation and arbitrary decision of two judges: and we suggest that the public keep a very sharp eye on those two judges: on who they are and on what they do. We have never seen the sense of keeping up the superstition that every judge is a premature day of judgment; awful as omnipotence and impartial as omniscience. There are good judges, and there are decidedly bad judges. But the commonest method of selecting and appointing judges makes them, with certain highly honourable exceptions, men quite peculiarly ill-fitted to decide boldly and fairly about a charge against politicians. They are themselves not only the nominees of such parliamentarians, but have learned such notice, as a rule, by long service, if not servility, in parliamentarism.

"An ambitious lawyer stands for Parliament on the secret party Fund; votes, speaks and is silent to order, moves convenient amendments (like the celebrated Buck-master amendment) and is given a certain sort of wig and gown as a reward by the statesmen he has served. And then he, and another with the same history, may be locked up in a private room with a bundle of papers, to decide at their solitary and despotic pleasure whether the man who has rewarded them is to be ruined or expelled from public life! We can see that there is a case for the enquiry not being in the ordinary sense public; since it involves military designs and details. But there is no case for it not being in the ordinary sense representative; and it should specially represent the real critics of the Government."

লাটসাহেব বলেন দেশী সম্পাদকেরা কেহ কেহ অন্তরায়িতদের বিষয়ে কাগজে যাহা লেখেন এবং সভাসমিতিতে দেশী রাজনৈতিক পুরুষেরা কেহ কেহ যাহা বলেন, তাহাতে বিপ্লবকারীরা মনে করে যে দেশের লোক তাহাদের কাজের অনুমোদন করে, এবং এই জন্যই বিপ্লবপ্রয়াস, রাজদ্রোহ, প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিবারণ করা যাইতেছে না। ইহাতে প্রকারান্তরে দেশের লোকদের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। আমরা রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার নরহত্যা ও দস্যুতার বিরোধী। কিন্তু পুলিশ যাহাকে ধরিবে ও যাহার বিরুদ্ধে গোপনে একতর্‌ফা প্রমাণ উপস্থিত করিবে, তাহাকেই আমরা, অতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরও কথার উপর নির্ভর করিয়া, দোষী মনে করিতে পারি না; আদালতে বিচার হওয়া চাই। আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই, যে, দোষী বলিয়া প্রমাণিত লোকদের দণ্ড হউক; কিন্তু দোষী বা নিরপরাধ কাহারও উপর আইনবিরুদ্ধ অত্যাচার বা আইনবিরুদ্ধ কঠোর হৃদয়হীন ব্যবহার অনুচিত। আমরা যা-কিছু লিখি, এই উদ্দেশ্যেই লিখি।

বিপ্লবপ্রয়াসীরা যে মনে করে যে দেশের লোক তাহাদের কাজের অনুমোদন করে, তাহার প্রমাণস্বরূপ লাট সাহেব বলিয়াছেন—

The question of releasing a certain political prisoner from jail was recently under consideration; but before a decision could be come to, it was necessary to find out whether he had repented of his former deeds. He was accordingly interviewed by a person who was related to him, and this is what he said: I regret that I have ever made any disclosures to the police. I made this mistake simply because I was not till then sure of the sympathy of my countrymen. Recent publications in the newspapers have cleared up my vision and I now see that my countrymen have

fully appreciated the work done by us. This is why newspapers and leaders in Congresses, Conferences and Leagues have been fighting tooth and nail for our cause and are moving heaven and earth to turn the Defence of India Act into a dead letter.' Let those words sink deeply into your minds. There you have the case of a man who was inclined to repent of his former ways but was suddenly persuaded to return to them by the writings of a certain section of the press and by the thoughtless utterances of certain public men.

লাট সাহেব স্বকর্ণে বন্দীর এইসব কথা শুনেন নাই, তাঁহাকে কেহ বলিয়াছে। কে বলিয়াছে; বন্দীর এই আত্মীয়ের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কিরূপ; তাহাদের মধ্যে জ্ঞাতি-শত্রুতা আছে কি না; আত্মীয়টি সরকারী চাকর, গোয়েন্দা, পুলিশের লোক, উপাধিপ্রার্থী বা অন্য প্রকারের উমেদার কি না; আত্মীয় হইয়াও সে ঐসব কথা রিপোর্ট করিয়া বন্দীর মুক্তি বন্ধ করিল কেন; যদি ধর্ম্মভীরুতা ও দেশ-প্রীতির জন্য করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মভীরুতা ও দেশহিতৈষিতার অন্য প্রমাণ আছে কি না; বন্দীর সহিত তাহার আত্মীয়ের সাক্ষাৎকারের সময় কোন সাক্ষী ছিল কি না; বন্দীর কথা লাট সাহেবের নিকট অবিকৃতভাবে পৌঁছিয়াছে কি না;—না জানিলে এবিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারি না।

আমরা নৈতিক কারণে সর্ব্ববিধ নরহত্যা ও ডাকাতির বিরুদ্ধে অনেকবার লিখিয়াছি। তা ছাড়া, যুক্তি ও তথ্য সহকারে বলিয়াছি, যে, গুপ্তহত্যা, ডাকাতী, বা সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীন হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কিন্তু আমরা "শান্তি ও শৃঙ্খলা" ("peace and order")-কে গবর্ণমেণ্টের বা দেশবাসীর সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য মনে করি না, যদি তাহা শ্রেষ্ঠতর জিনিস বলি দিয়া লাভ করিতে বলা হয়। মানুষের মানসিক বাচনিক ও দৈহিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যাহাতে শান্তির সময়েও বিনা বিচারে গুপ্ত কারণে লুপ্ত হয় বা হ্রাস পায়, আমরা এরূপ ব্যবস্থার বিরোধী। যে-দেশের লোকে দেশহিতৈষী, সাহসী, স্বাধীন, ও সভ্য হইতে ও থাকিতে চায় তাহাদিগকে কতকটা বিপৎ-সম্ভাবনা (risk) মানিয়া লইতে হইবে। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সকাল সাতটা পর্য্যন্ত সব মানুষের হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিলে দেশ এখনকার চেয়ে অনেক নিরুপদ্রব হয়; কিন্তু এরূপ স্বর্গসুখের লোভেও আমরা হাতপায়ের বন্ধন অবাঞ্ছনীয় মনে করি।

দেশবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ এবং আত্মরক্ষার্থ যথেষ্ট অস্ত্রলাভ, বিপ্লব প্রয়াসনিবারণের প্রকৃষ্টতম উপায়। সঙ্গে-সঙ্গে দোষী বলিয়া প্রমাণিত লোকদের দণ্ডও হউক।

রোলট কমিটির রিপোর্ট।

ভারতবর্ষে বিপ্লবপ্রয়াসের সহিত সংযুক্ত ষড়যন্ত্রগুলির প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য, এবং ঐগুলি দমন করিবার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টকে কিরূপ বাধা অতিক্রম করিতে হয় তাহা পরীক্ষা ও বিবেচনা করিয়া নূতন আইনের প্রয়োজন থাকিলে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত, ভারতসচিবের সম্মতিক্রমে সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। বিলাতের হাইকোর্টের অন্যতম জজ রোলট ইহার সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট কিছুদিন হইল বাহির হইয়াছে। এখন ইহা বাহির হওয়ায়, বিলাতের লোকদের এই ধারণা জন্মিবে যে ভারতবর্ষে ভয়ানক বিদ্রোহচেষ্টা আছে। সুতরাং এখন ইংরেজ কর্ম্মচারীদের হাত হইতে দেশের লোকদের হাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা হস্তান্তর করা অকর্ত্তব্য। অর্থাৎ প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার-ব্যবস্থাতে ভারতবাসীদিগকে খুব বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে।

মানুষ সখ করিয়া বিদ্রোহচেষ্টায় প্রাণপণ করে না। খাইবার পরিবার সচ্ছলতা থাকিলে, সামর্থ্য অনুসারে যতদূর ইচ্ছা স্বদেশে এবং যে-কোন বিদেশে শিক্ষা পাইবার সুযোগ থাকিলে, যোগ্যতা অনুসারে সর্ব্ববিধ উচ্চ ও নিম্নস্তরের কাজে নিযুক্ত হইবার সুযোগ থাকিলে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের কাজে লাগাইবার সম্পূর্ণ সুবিধা থাকিলে, রাষ্ট্রীয় কার্য্যে আইনপ্রণয়নে ট্যাক্সস্থাপনে ও ব্যয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকিলে, বিচারে বর্ণভেদ না থাকিলে, পথে-ঘাটে অকারণ অপমানিত না হইলে, এবং নানাপ্রকারে বিজিত হীন জাতি বলিয়া অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত না হইলে, কোন দেশের লোক বিপ্লব বা বিদ্রোহচেষ্টা করে না। এইরূপ চেষ্টা হইলে কড়া আইন, কড়া শাসন, বিনা বিচারে স্বাধীনতা লোপ বা হ্রাস, সরাসরি বিচারে কঠোর দণ্ডপ্রদান,—এ-সবের ব্যবস্থা করা সোজা; কিন্তু বিপ্লব-চেষ্টার মূল আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কারণ আবিষ্কার করিয়া জড় নষ্ট করা তার চেয়ে কঠিন। অথচ শেষোক্ত রূপ চেষ্টাই স্থায়ী ও আসল প্রতিকার। সেদিকে ইংরেজ আমলাদের দৃষ্টি কম, ধরপাকড় শাস্তির দিকে দৃষ্টিই বেশী। বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ম্যাকিয়াভেলী বলিয়াছিলেন, "Never let a prince complain of the faults of the people under his rule, for they are due either to his negligence or else to his own example"; অর্থাৎ প্রজাদের দোষ কীর্ত্তন করা রাজার উচিত নয়, কারণ প্রজাদের দোষ হয় তাঁহার অবহেলার নয় তাঁহার নিজেরই দৃষ্টান্তের ফল।" ইহা ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের মনে রাখা উচিত।

রোলট কমিটি একতরফা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মোটের উপর ভারতরক্ষা আইনটাকে স্থায়ী করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাহা হইলে যুদ্ধের অবসানের পরেও নিরঙ্কুশ পুলিশরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এবং সকারণে বা

অকারণে সন্দেহভাজন ব্যক্তি মাত্রেরই স্বাধীনতা বিনা-বিচারে এখনকার মত লুপ্ত হইতে পারিবে। এরূপ পরামর্শের তীব্র প্রতিবাদ সর্ব্বত্র হওয়া উচিত।

রোলট কমিটির ইতিহাস-জ্ঞান।

রোলট কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টের ভূমিকার গোড়াতেই বলিতেছেন :—

"Republican or Parliamentary forms of government, as at present understood, were neither desired nor known in India till after the establishment of British rule."

"বৃটিশ রাজত্ব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, এখন সাধারণতন্ত্র বা প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতবর্ষে তাহা কেহ জানিত না বা কেহ চাহিত না।"

এখন বাংলা স্কুলের ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পড়ে যে পুরাকালে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সাধারণতন্ত্র ছিল। রোলট কমিটির দুজন সভ্য ভারতীয়। তাঁহারাও কি এ কথাটা জানেন না? যাঁহাদের ঐতিহাসিক অজ্ঞতা এত বেশী তাঁহাদের ঐতিহাসিক কিছু একটা লিখিতে যাওয়া কেন? যদি তাঁহারা "as at present understood" কথাগুলির উপর জোর দিয়া ওকালতী করিয়া বলেন, "হাঁ, হাঁ, সেকালে ভারতে এক-প্রকারের সাধারণতন্ত্র ছিল বটে, কিন্তু এখন সাধারণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ছিল না," তাহা হইলে বলি, সেটা ভারতবর্ষের বিশেষত্ব নহে, ঠিক আধুনিক গণতন্ত্রের (democracyর) মত কিছু পুরাকালে কোথাও ছিল না। তাহার প্রমাণ দিতেছি। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা বলেন, "democracy in modern times is a very different thing from what it was in its best days in Greece and Rome......Of representative Government in the modern sense there is practically no trace [in the ancient Greek states.]" চেম্বার্সের এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বলেন, "the modern democracy differs essentially from the ancient and medieval forms."

রোলট কমিটির ইতিহাস-জ্ঞানের আরো নমুনা পরে দিবার ইচ্ছা রহিল।

রোলট কমিটি ও শিবাজী-উৎসব।

রোলট কমিটির রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠাতে আছে, "The application of the moral derived from Sivaji's successful struggle against the Muhammadans to the present condition of India under British rule was a natural and easy step."

কিন্তু কথা এই, শিবাজী-উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা অনুষ্ঠাতা ও প্রধান বক্তারা কখনও কি বলিয়াছিলেন যে, শিবাজী যেমন মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, মরাঠাদেরও তেমনি ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত? যদি কেহ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রমাণস্বরূপ সেই-সব উক্তি উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। অন্যদিকে শ্রীযুক্ত টিলকের কাগজ মারাট্টাতে লিখিত হইয়াছে।

"It can be convincingly proved that speaker after speaker in Sivaji festivals including Mr. Tilak has pointed out that on account of changed circumstances the moral to be drawn from Sivaji festival is *exactly not* what the Committee has suggested."

শিবাজী-উৎসব করিলেই যদি মানুষকে বিদ্রোহ করিতে বলা হয়, তাহা হইলে স্কচ্‌রা ওআলেস্ ও রবার্ট ব্রুসের স্মৃতিসভা করিলে তাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে বলিতে হয়, কোন ইংরেজ ক্রমওয়েলের মূর্ত্তিকে পুষ্পশোভিত করিলে তাহাকে রাজহত্যাপ্রয়াসী বলিয়া সন্দেহ করা উচিত, এবং ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার বার্ষিক উৎসবে ইংরেজরা যে যোগ দেন তাহা দ্বারা ইহাই বুঝিতে হয় যে তাঁহারা প্রকারান্তরে তাঁহাদের কানাডা অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকার ঔপনিবেশিকদিগকে অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার ঔপনিবেশিকদিগের মত বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীনতালাভে উত্তেজিত করিতেছেন! গত ৩০শে এপ্রিল ব্রিটিশ মন্ত্রী মিঃ ব্যালফুর স্বাধীন আমেরিকার জনক ও পূর্ব্বতন "বিদ্রোহী" জর্জ ওয়াশিংটনের সমাধিমন্দিরে একটি শ্রদ্ধাসূচক পুষ্পমালা অর্পণ করেন। তদ্দ্বারা তিনি কি অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত দেশের নেতাদিগকে ওয়াশিংটনের মত "বিদ্রোহী" হইতে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন? আসল কথা এই, স্কটল্যাণ্ডে এবং এই-সকল ব্রিটিশ উপনিবেশে আত্মকর্তৃত্ব থাকায় তাঁহারা বা ইংরেজরা পূর্ব্বতন বীরদের যতই সম্মান দেখান না কেন, ইংরেজের এ সন্দেহ হয় না যে ঐ-সব দেশে বিদ্রোহ হইবে; কারণ, কার্য্যতঃ স্বাধীনতা যাহাদের আছে, তাহারা কেন বিদ্রোহ করিবে? পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের আত্মকর্তৃত্ব না থাকায়, কোনও পূর্ব্বতন ভারতীয় বীরকে আমরা শ্রদ্ধা দেখাইলেই প্রভুত্বশালী ইংরেজের অমনি সন্দেহ হয়, যে, পরোক্ষ বিদ্রোহ-চেষ্টা হইতেছে।

মডারেটরা কেন বিশেষ কংগ্রেসে যোগ দিবেন না।

নেতৃস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় নহেন এরূপ কয়েকজন বাঙালী মডারেট একটি ম্যানিফেষ্টো ৩১শে শ্রাবণের বেঙ্গলীতে বাহির করিয়া বিশেষ-কংগ্রেসে তাঁহাদের যোগ

না দিবার কারণ জানাইয়াছেন। ইহা ক্ষুদ্র অক্ষরে বেঙ্গলীর প্রায় চারিটি স্তম্ভব্যাপী। প্রবাসী কল্য ৩২শে শ্রাবণ প্রাতে বাহির হইবে। এই কারণে, সময়াভাব ও স্থানাভাব বশতঃ, এই ম্যানিফেষ্টোটি পড়িয়া তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

চিত্র-পরিচয়

"আমাদের জাতীয়-নেতা" নামক রঙিন ছবিতে চিত্রকর আমাদের কোনো কোনো জাতীয় নেতার স্বরূপ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই চিত্রের মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত করিয়াছেন যে, আমাদের কোনো কোনো নেতা স্ত্রীলোকের ন্যায় ভীরু; বিলাসের অলঙ্কারে ভূষিত; অজ্ঞান প্রতারণা ও স্বার্থপরতার ঘোম্‌টায় চক্ষু দুটি আবৃত; অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাঁরা নিজেদের আসল চেহারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন; তাঁরা যেন প্রাণহীন প্রতিমূর্তি, কোথাও জীবনের চাঞ্চল্য ও স্ফুর্তি নাই; যে কাজ করেন যেন বাহিরের শাসনে বাধ্য হইয়া, নিজের অন্তরের প্রেরণার আনন্দ হইতে নহে—এখানে তাই বসিয়া আছেন আড়ষ্ট হইয়া, শুধু যেন প্রথার শাসনে রীতি মাত্র পালন করিবার অনুরোধে; তাঁদের অন্তরের বাসনা—তাঁদের পাশে সকলে আকৃষ্ট হইয়া সমবেত হইবে; কিন্তু তাঁদের অন্তরে সে অগ্নি জ্বলে নাই যার আভায় আকৃষ্ট হইয়া বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় দলে দলে সকলে তাঁদের কাছে ছুটিয়া চলিবে; তাই তাঁরা কৃত্রিম প্রদীপে তৈল দিয়া কৃত্রিম ক্ষীণ শিখা জ্বালিয়া গুটিকয়েক পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন আর মনে-মনে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন যে আমাদেরই আকর্ষণে এরা সমবেত হইয়াছে। যারা ত্যাগী নন পরন্তু বিলাসী, যাদের দুই চক্ষুই স্বার্থপরতার অজ্ঞানের ও প্রতারণার আবরণে ঢাকা, তারা দেশ ও জাতিকে চালনা করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী; এই অন্ধেরা যদি অপরকে চালনা করেন তবে "অন্ধেন নীয়মানো অন্ধ এব" তারা বিপথে অপথে কুপথে লইয়া গিয়া সর্ব্বনাশই ঘটাইবেন। খোসামোদের বা প্রতারণার তৈল প্রদীপের অঞ্জলিতে পূর্ণ করিয়া ধার-করা দীপ্তিতে কতক্ষণ অপরকে ভুলাইয়া রাখিবে? সেই প্রদীপ হঠাৎ নিবিলে সব অন্ধকার! জ্বালিয়া তোলো অন্তরের মধ্যে স্বকীয় জ্যোতি, যার কাছে মিথ্যা স্বার্থ ক্ষুদ্রতা নীচতা ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে! এই কুশ্রী দলাদলির সময় পরস্পরকে অভদ্র গালাগালি দিয়া আমাদের জাতীয় নেতা হইবার যারা স্পর্দ্ধা ও আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন তাঁরা এই শিল্পীর গূঢ় উপদেশ ও তীব্র ব্যঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মপরীক্ষার দ্বারা চরিত্রশোধন করিবেন, এই আশা ও অনুরোধের সঙ্গে আমরা এই চিত্র মুদ্রিত করিলাম। চাব।

শিক্ষার পরীক্ষা

গরমের ছুটির পর ইস্কুল কলেজ সেই সবে খুল্‌তে সুরু করেছে। নূতন পাশ-করা ছেলেরা তাদের তরুণ মুখগুলি বিজ্ঞতার আবরণে মুড়ে মহা উৎসাহে কলেজের সন্ধানে ছুটেছে। যারা দু চার বছর কলেজে পড়েছে, তাদের চেয়ে এই পথের নবীন যাত্রীদেরই বেশী ভারিক্কি চাল, বেশী গর্ব্বোজ্জ্বল মুখ। আজ তারা প্রত্যেকেই যেন একলাফে বালক-বয়সের সীমা-রেখা পার হয়ে সেই পিছনে-পড়া তুচ্ছ জীবনটার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিপাত করে বিশ্বের সাম্‌নে বিরাট মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মাষ্টার, প্রফেসার, ইস্কুলের ছেলে, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা, মোকদ্দমা-পীড়িত বিষয়ী প্রভৃতি আরো নানা রকম লোক ও গাড়ীতে যথেষ্ট। গল্পও সেখানে জমেছে ভালো। মেয়ে যাত্রীর সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে মেয়েদের জন্য মাত্র একটি ছোট কাম্‌রা।

তখন রাত দুপুর। লুপ লাইনের গাড়ী অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে ঘুমন্ত ধরণীকে নাড়া দিতে দিতে বিনিদ্র যাত্রীগুলিকে বুকে করে ছুটছিল। গাড়ীর বাইরে দুটি একটি তারার আলো, গাছের ঘন-পাতায় জোনাকির চুম্‌কি, আর দূরে লাইনের ধারে ধারে পাথুরে কয়লার আগুন ছাড়া আর কিছুই চেনা যায় না। ঘন কালো মেঘ স্তরে স্তরে আকাশ ঢেকে ফেলেছে, মাঝে মাঝে কেবল বিদ্যুৎশিখা মেঘের বুক চিরে জ্বলে উঠ্‌ছে। সমস্ত আকাশ-ধরণীর গা থেকে সৃষ্টি আজ যেন লুপ্ত; কেবল এক মুঠো আগুনের কণা এদিকে ওদিকে কে ছড়িয়ে দিয়েছে।

বাইরে দৃষ্টি চলে না। ভিতরে কোনো রকমে পিঠ খাড়া করে বস্‌বার বেশী স্থান রেল কোম্পানী দিতে নারাজ। কাজেই পথের সাথীদের সঙ্গে চির-বন্ধুর মত সংসারের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার শত গল্প করে মেয়েরা পথের দুঃখটুকুও মধুর করে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল। তখনকার মত তারা ভুলে গিয়েছিল যে এই নিমেষের বন্ধুগুলি একবার চোখের আড়াল হলে আর হয়ত কোনো দিন চোখের কি মনের কোনো সীমানাতেই উদয় হবে না।

মেয়েদের মধ্যে পশ্চিম-প্রবাসিনী এক বাঙালী গৃহিণী কেশহীন সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর পরে গায়ে পুরুষদের একখানা উড়ানি জড়িয়ে আসর জম্‌কিয়ে বসে ছিলেন। শরীরের মাংস তাঁর প্রায় সব ঝুলে পড়েছে, দাঁতও নেই বল্‌লেই চলে, কিন্তু গায়ে এক গা গয়না। বেঞ্চিতে বস্‌বারই ঠাঁই মেলে না; কিন্তু তিনি তারি মধ্যে ছেঁড়া একখানা শাড়ীতে জড়ানো দু চারখানা গামছা কাপড়, বড় একটা পানের ডিবে, একটা এলুমিনিয়মের জলের ঘটী, আর গোটা কতক মুলো বেগুন নিয়ে শক্ত করে চেপে তারি উপর কাত হয়ে আছেন। পাশেই একটি নব্য তন্ত্রের ইস্কুলের পোড়ো মেয়ে জড়ো সড়ো হয়ে কোনো রকমে বসে আছে। বৃদ্ধার খোঁচার মত হাড়-বেরোনো হাঁটু দুটো তার গায়ে গিয়ে ফুটছে। মেয়েটির প্রতি করুণা দেখিয়ে বৃদ্ধা অনেকক্ষণ পরে বল্‌লেন, "আহা

কিছু মনে কোরো না বাছা। বুড়ো মানুষ, কাঠ হয়ে বসে থাকৃতে কি আর এ বয়সে পারি। তবে তোমাদের মত বয়সে দশ রাত একটানা বসে কাটিয়েছি। আর এম্নি ছিরি কি চিরকাল ছিল? তখন লোহার কলাই চিবিয়ে গেয়েছি।"

মেয়েটি নিজের সঙ্গে গাড়ীর অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের এতটা প্রভেদ অনুভব করছিল যে বেচারার সঙ্কোচে কথাই বেরোচ্ছিল না। তাই সে সব কথাতেই শুধু একটু হাস্‌ছিল।

দুটি মোট-সোটা কালো মেয়ে ঢল্‌ঢলে নীল জামার উপর শাড়ী পরে রেশমী চাদর মুড়ি দিয়ে একহাত করে সবুজ কাঁচের চুড়ি পরে পরস্পরের গা ঠেস দিয়ে গাড়ী-ভরা অজানার সাম্‌নে নিজেদের তরুণ জীবনের অফুরন্ত দুঃখ-কাহিনী একটানা স্রোতের মত বলে যাচ্ছিল। অতি-পরিচিত দুঃখকথা বহুবার পরস্পরকে শুনিয়েই যেন তারা সে দুঃখের ভার লাঘব করছিল। বৃদ্ধা তাদের মুখের চেহারা দেখে এবং ইতিমধ্যেই তাদের মায়ের মরণ, স্বামীর পীড়ন প্রভৃতি বেদনার ইতিহাস শুনে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন, "ও মেয়ে, শুনছ? বলি, হাতে গয়না দাওনি কেন গা? এস্ত্রী মেয়ে, সোমত্ত বয়েস, এখনি কিসের এত হেলা ফেলা।"

বড় মেয়েটি উত্তর দিল, "দুঃখের কথা আর বল্‌বেন না মা। ভাই-ঝির বিয়েতে বাপের বাড়ী এলুম আহ্লাদ করতে, তা এম্নি কপাল, চোরে অর্দ্ধেক গয়না নিয়ে গেল। শাশুড়ী শুনে এমন লাঞ্ছনা করলে যেন আমিই তার লোহার সিন্ধুক ভেঙেছি। আর নাই বা করবে কেন বল? ছেলে বেচা সোনা চুরি গেলে কি আর আমায় এক টাকার ভীমনাগের সন্দেশ কিনে খেতে দেবে? তাই ঠাকুরের দিব্যি নিয়ে শপথ করেছি ও-গয়না আর গায়ে দেব না। ও-সব ত আমার গায়ের গয়না নয়, ও আমার বাপের মান-ওজন করা সোনা। যদ্দিন না সব পুরিয়ে দিতে পারবে, তদ্দিন রোজ দুবেলা বাপান্ত শুনব।"

বৃদ্ধা ইস্কুলের মেয়েটির পিছনে সরু সরু পা দুখানা ভালো করে গুঁজে দিয়ে বল্লেন, "তা এক কাজ করলে না কেন? কল্‌কেতা সহর ত? গিল্টি গয়না কিনে নিয়ে যেতে হয়। তখন-তখন ত বাপের মুখ হেঁট হত না। তারপর পয়সা হাতে হলে পুকিয়ে বদলে দিলেই হত।"

বৃদ্ধার পূর্ব্বপরিচিতা একটি মহিলা বল্লেন, "দিদির যত উদ্ভট উপদেশ সবাইকে শোনাতে হবে! পথেও দু দণ্ড বিরাম নেই?"

দিদি বল্লেন, "আহা কার বাছা, চোখের জল ফেল্‌ছিল, একটা উপায় আমি জানি, বাৎলে দেবো না? এ তোমার অন্যায় কথা ভাই বিনু। কত বয়েস হয়েছে আমার, রোগ শোক যা কিছু বলো সবের পথই মাড়িয়েছি, সবেরই টোট্‌কা জানি।"

প্যাকাটির মত রোগা আর মড়ার মত ফ্যাকাশে একটি ছোট ছেলে কোলে করে নথ আর সার-মাকৃড়ি পরা একটি বউ গাড়ীর এক কোণে এতক্ষণ বসে ছিল। তার নিজের গায়ে একটা পাৎলা সেমিজ আর একখানা শান্তিপুরে শাড়ী ছাড়া আর কোনো পরিচ্ছদের বাহুল্য নেই, কিন্তু সেই ক্ষীণপ্রাণ অবসন্ন শিশুটির সর্ব্বাঙ্গ ফ্লানেলের জামা, উলের টুপি আর জর্ম্মান শালে একেবারে বেষ্টিত। ছেলেটির মুখ দেখে মনে হয় গরমে যেন মূর্চ্ছা হয়েছে। থেকে থেকে চোখ চেয়েই সে কেঁদে উঠ্‌ছিল। মা সাদরে তার নাক মুখ চাপা দিয়ে আবার ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। বৃদ্ধার সবজান্তার মত অভিজ্ঞতার গৌরব শুনে বউটি উন্মুখ হয়ে সেই স্বল্পপরিসর বেঞ্চির মধ্যেই একটু এগিয়ে বস্‌ল। বৃদ্ধা একটা হাই তুল্‌তে তুল্‌তে তুড়ি দিয়ে হাঁ বুজবার আগেই বল্লেন, "ক মাসের ছেলে গা? আহা বড্ড রোগা যে!"

বউ বল্লে, "মাসের আর কি মা? এই ষেটের কোলে দেড় বছরের হোলো। ঘর থেকে একবারটি বের করি না, ভুলেও ঠাণ্ডা লাগাই না। এই গিরিস্থিতেও জান্‌লাটি খুলি না। তবু মা, ডাক্তার বদ্দি হার মেনে গেল।"

বৃদ্ধা দ্বিধামাত্র না করে উত্তর দিলেন, "পুঞে পেয়েছে মা, পুঞে পেয়েছে; ও আর কিছুতে সারবে না, চন্দননগরে এক পুকুর আছে, তারি জলে নিয়ে যদি চান করাতে পার, তবেই রক্ষে।"

বউটি ব্যগ্র হয়ে বল্লে, "ঠিকেনাটা বলে দাও না মা। পথেই ত পড়বে, একবার ডুবটা দিইয়ে নিলেই হবে।"

বৃদ্ধার সখী বিনুর সমালোচনা করা রোগ। তিনি বল্লেন, "তারা-দিদি, কি যে বল! পরের ছেলের প্রাণ নিয়ে ও-সব তোমার টোট্‌কা-টুট্‌কি খাটানো কেন ভাই? ভালো মন্দ হলে শাঁপ গাল সইতে পারবে?"

তারা-দিদি তেড়ে উঠে একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে ছোট্ট একটা ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই দুটি ছোট ছেলেমেয়ের হাত ধরে গোটাতিনচার ধামা টিনের তোরঙ্গ ও পুঁটুলি সমেত একঝাপ্‌টা বৃষ্টির সঙ্গে একটি বিধবা মহিলা উঠে পড়্‌লেন। কাজেই তারাসুন্দরীর মনোযোগটা তখনকার মত সেই দিকেই ভিড়্‌ল।

বিধবাটির চেহারা নিতান্ত ভালোমানুষের মতন। মাথার চুল সাম্‌নেটায় অনেকখানি পাকা, কিন্তু শরীর বেশ শক্ত, আর সোজা। সঙ্গের ছেলেটি বছর ছয় সাতের, মেয়েটি বছর বারো তেরোর। লম্বা কালো রোগা মেয়েটি, চোখদুটি বড় বড়, কপালটা একে মস্ত উঁচু, তাতে আবার টেনে চুল বাঁধা। মাথায় চুল আছে কি না বলা শক্ত,

কিন্তু খোঁপাটা রথের চাকার মত গোল হয়ে মাথা ঘিরে আছে, তার মাঝখানটা চাকারই মত ফাঁকা, কেবল লোহার কাঁটাগুলো চারিধার থেকে চাকার আরার মত ধুরোতে এসে জুটেছে। মেয়েটির বড় বড় চোখদুটির দৃষ্টি শান্ত; কিন্তু আর কোনো ভাবের ছাপ তাতে ফোটেনি। সে যেন একখানা শাদা কাগজ, যে-হাতে পড়বে তারি রেখায় তারি লিপি হয়ে দাঁড়াবে! সাজসজ্জার কোনো আড়ম্বর মেয়েটির নেই, যা দুটো-একটা খুঁজলে পাওয়া যায়, তাতে তাকে সুশ্রীর চেয়ে কুশ্রী করবার চেষ্টাই বেশী। জলে ভিজে সঙ্কুচিত হয়ে সে ঠাসা-গাড়ীর একপাশে এসে দাঁড়াল।

তার মা ছেলেটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কোনো রকমে একটা বেঞ্চিতে জায়গা করে বসলেন। মেয়েটি হাতে একটা মস্ত বড় পুঁটুলি ঝুলিয়ে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই রইল। মা বললেন "কালো, বোস্‌না রে!"

কিন্তু কালো যে কোথায় বসে তার ঠিক নেই। তবু মা বসতে বলাতে সেই ভিজে মেঝের উপরেই মায়ের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে পড়ল। লোককে ঠেলেঠুলে জায়গা করে বসবার যে তার অধিকার আছে, এ রকম কল্পনাও তার মনে আসতে পথ পায় নি; তার উপর তার পরনের কাপড়খানা ময়লা, চেহারার মধ্যেও কোনো মার্জ্জিত শ্রী ফুটেও ওঠে নি, কাজেই কেউ তাকে ডেকে কাছে জায়গা করে দিলে না।

নূতন সাথীদের দেখেই তাদের নাড়ীনক্ষত্রের পরিচয় লাভের জন্য তারা-দিদির মনটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি মেয়েটি বসতে না বসতে তার মুখের উপর একমুখ পানসুদ্ধ ঝুঁকে পড়ে বলে উঠলেন, "তোমরা কারা গা?"

হাবা মেয়ের মত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কালো তার মায়ের মুখের দিকে তাকাল। নিজে কোনো কথার উত্তর দিতেও যেন তার ভরসা হয় না; কি জানি যদি কোনো সংহিতায় তার এ কাজের সম্বন্ধে নিষেধ থাকে। কালোর মা মেয়ের হয়ে বললেন, "আমরা বামুন; ওটি আমারই মেয়ে।"

তারাদিদি বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "মেয়ে তোমার? আমি বলি নাৎনীই হবে বা? বয়েসে হয়েছে বুঝি? এটি ছেলে নাকি?"

কালোর মা বললেন, "হ্যাঁ, ওইটিই সম্বল। পাঁচ মেয়ের পর ঠাকুরদেবতার দোর ধরে পেয়েছি। তা কপালে অত সুখ সইবে কেন? ছেলের মুখে ভাত পড়তে না পড়তে বাপের কাল হল।"

তারাসুন্দরী নিজের কপালে একটা চাপড় মেরে মাথা দুলিয়ে বললেন, "আ তোমার পোড়া কপাল! কি রত্নগর্ভা ভাগ্যিমানী হয়েই সংসারে এসেছিলে! তা এ মেয়ের ত দেখছি এখনো বে দাও নি।"

দিদির মধুর বাক্য বোধ হয় বিনুর সইছিল না। তিনি তাঁর মুখবন্ধ করবার বৃথা আশায় বললেন, "পরের ঘরের খবরে তোমার অত কিসের দরকার দিদি?"

তারাসুন্দরী কিছুমাত্র না দমে উত্তর দিলেন, "হয়েছে কি তাতে? মানুষের দুখসুখের কথা দুটো সুধোব না?"

সঙ্গিনীর সহানুভূতিতে গলে গিয়ে কালোর মা বললেন, "মেয়ের বিয়ে দিতেই ত ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি ভাই। নইলে পাড়াগেঁয়ে গেরস্তর বউ আমি কখনো কি রেলগাড়ীতে পা দিইছি! আজ ওর বাপ নেই, তাই ত হতভাগীকে নিয়ে পরের দোরে সাধতে যেতে হচ্ছে। একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, তা কলকেতা নইলে তারা দেখবে না। অতি বড় পাপ না করলে কি আর মেয়ের মা হয় মানুষে!"

কালো মায়ের কথা শুনে তার কালো চোখ দুটি তুলে একবার মায়ের দিকে আর একবার তারাসুন্দরীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর আবার তেমনি গুটি টি হয়ে বসে তাঁদের গল্পে মন দিল। চোখ তার জলে ভরে ওঠে নি, বেদনায় বুকও কেঁপে ওঠে নি। এ-সব কথা ত-ঘাটে ঘরে পথে সে নিত্যই দুই কান ভরে শুনছে। ও যেন তার দৈনিক বরাদ্দ! তাই তার মুখ দেখলে কেউ আজ ভাবত না যে এই গল্পের বিষয় ওই স্থির শান্ত মেয়েটি নিজেই।

তারাসুন্দরী কালোর দিকে চেয়ে বললেন, "কি নাম বাছা তোমার?"

মেয়েটি মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মা যেন অনুমতি দিয়ে বললেন, "বল্ না, নাম বলতে কি?"

মেয়েটি অপরাধীর মত মুখ হেঁট করে বললে, "কালীদাসী।"

"হা অদেষ্ট! তবেই হয়েছে তোমার বিয়ে!"

বিনু বিরক্ত মুখ ঘুরিয়ে বললেন. "আঃ, দিদি থাম না, কি যে কর!"

তারা এমন পরোপকারে বাধা পেয়ে ঘাড় সোজা করে বললেন, "কেন? ঠিক কথাই ত বলেছি! দেখ বাছা, কলকেতা গিয়েই মেয়ের একটা ভালো দেখে নাম রেখো। তবে ত আজকালকার ছেলেদের মনে ধরবে।"

কথাবার্ত্তার সুর ফেরাবার আশায় ইস্কুলের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিনু প্রশ্ন করলেন, "তোমার নাম নিশ্চয় ভালো কিছু হবে; কি বল ত মা নামটি?"

মেয়েটি একটু মুচকে হেসে বললে, "শোভা।"

কিন্তু যার যেদিকে মন সে ত সেই দিকে ঝুঁকবে। তারাসুন্দরী আবার এই দিকেই সুর টেনে বললেন, "শুনলে ত? ওই রকম ভালো একটা কিছু নাম রেখো—শোভা, আভা, কি বিভা। এই জানো দিদি, আমি একটি নয়, দুটি নয়, আট-আটটি মেয়ে পেটে ধরেছি। তা তারা সবাই

কিছু সোনার প্রতিমের মত হয় নি, নিজের মেয়ে হলেও সত্যি কথাই ত কইব। তবু ত বাছা, নাম রাখ্‌তে কসুর করি নি। কনকলতা, হেমলতা, স্বর্ণলতা, এই-সবই নাম রেখেছি।"

নামের এত মহিমা কালোর জানা ছিল না। তাই সে একবার তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে নাম ধনে ধনী শোভার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল। তার দৃষ্টিতে প্রশংসার ভাব যেন ফুটে উঠ্‌তে চাইছিল। কিন্তু জন্মে অবধি শান্তশিষ্ট হবার উপদেশ পেয়ে পেয়ে লোকের দিকে একেবারে না-তাকানো কিম্বা বড়-জোর শূন্য-দৃষ্টিতে চকিতের জন্য তাকানোটাই তার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, যে, মনের ভাব মনেই ফুটে উঠ্‌তে সাহস করে না ত চোখে আর ফুটবে কি?

কালো মুখ তুলে চাইতেই তারাসুন্দরীর দৃষ্টি তার দিকে পড়্‌ল। তিনি যেন হঠাৎ শিউরে উঠে বল্‌লেন, "মাগো! কি মাঠ-কপাল বের করেই চুল বেঁধে দিয়েছ গা! একে ত ওই কালো মেয়ে, তার উপর কনে দেখ্‌তে যদি অম্‌নি ছিরি করে বের কর তবে যে ও-মেয়ের দিকে কেউ চাইবেও না।"

মাঠ-কপাল একটুও হেঁট না করে কালো মেয়ে মন্তব্য-কারিণীর দিকে তেম্‌নি ভাবেই তাকিয়ে রইল। তারা-সুন্দরী হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে শোভার মুখ ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "দেখ, দেখ, দেখেছ ত এই মেয়ে কেমন চুল বেঁধেছে? এম্‌নি করে চল্‌কো করে সাম্‌নে নাবিয়ে চুল বেঁধে দিও। রাম, রাম, রাম! অমন টান করে আবার মানুষে চুল বাঁধে গা?"

কালোর মা বিস্মিত দৃষ্টিতে শোভার আপাদমস্তক চেয়ে দেখ্‌লেন। বোধ হয় চল্‌কো করে চুল বাঁধার রহস্যটা খুঁজে বার কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিলেন। বেচারী শোভা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিল। তারাসুন্দরী আবার খানিক চুপ করে থেকে বল্‌লেন, "দেখ, এক কাজ কোরো; এলো চুলে মেয়ে দেখিও। আর শোন, ঝাপ্‌টা গয়না জানো ত? সেকেলে মানুষের বাড়ী আক্‌সারই ত পাওয়া যায়, তাই কপালের পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিও। মেয়েকে দেখ্‌তেও ভালো দেখাবে, মাঠ কপালও ঢাকা পড়্‌বে।"

কালোর মা মেয়ের মুখের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করে বল্‌লেন, "রং যে বড্ড কালো ভাই, শুধু ত আর কপাল উঁচু নয়।"

তারাসুন্দরী গর্ব্বিত স্বরে উত্তর দিলেন, "এই জানো দিদি, আট আট মেয়ের বিয়ে দিয়েছি আমি। কালো মেয়ে, তার হয়েছে কি? আমার হাতে পড়্‌লে কোনো থেঁদী পেঁচীর না বিয়ে হয় ত আমি নাকে খৎ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব। মেয়ে ত বটে! তবেই হোলো। এই বলি শোন, পাউডার জানো ত? গোলাপী পাউডার চার পয়সার কিনে এনে মেয়ের মুখে হাতে মাখিয়ে দিও, রং অনেক পরিষ্কার দেখাবে। যদি পাউডার না পাও ত পাৎলা কানি করে ময়দা ছেঁকে রেখো; তারপর চুনের দেয়ালে,—মাটির দেয়ালে নয় কিন্তু—আ—স্তে আ—স্তে হাত দুখানি বুলিয়ে মেয়ের মুখে অল্প করে দিয়ে আঁচলের কোণায় করে সেই ছাঁকা ময়দা মাখিয়ে দিও! আর হ্যা দ্যাখ, গোধুলিতে মেয়ে দেখিও, মোমবাতির আলো জ্বেলে তার সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে দিও। মুখ যেন না নীচু করে, তা হলে ছায়ায় কালো দেখাবে। আর হাতের রং দেখ্‌তে চাইলে সোজা পিঠ দেখিও।"

কালোর মা বল্‌লেন, "পাত্তর পক্ষ যদি দিনে দেখ্‌তে চায়?"

কনের মায়ের নির্ব্বুদ্ধিতায় একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে তারাসুন্দরী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "চাইলেই হোলো কি না? বুদ্ধি কি ঘটে তোমার একফোঁটাও নেই? বল্‌বে, আমাদের গোধূলিতে নইলে মেয়ে দেখাতে নেই। বাস্, তার ওপর ত আর কোনো কথা নেই?"

বিন্দু হেসে উঠ্‌লেন, "দিদি পাগল হলে না কি?"

দিদি রেগে বল্‌লেন, "কেন মন্দটা কি বলেছি আমি? মানুষকে দুটো ভালো শেখাবো না? কি বল ভাই?" এই ব'লে তিনি তারিফ পাবার আশায় শোভার দিকে তাকা-লেন। শোভা শুধু হেসে তাঁর কথায় সায় দিল।

সেই ক্ষীণপ্রাণ ছেলেটির মা এতক্ষণে বল্‌বার মত একটা কথা মনে পড়াতে গাড়ীর এককোণের জটলা ফেলে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "বাড়ীর লোকে দেখ্‌বে, না, অপরে, বল্‌তে পার?"

কালোর মা বললেন, "অপর নয়, তবে এই জ্ঞাতি কুটুমে আর কি?"

বউটি বল্‌লে, "তবে এক কাজ কোরো, মেয়েকে সেমিজ আর বডি পরিয়ে সায়েবের দোকানে একটা সুন্দর করে ছবি তুলিয়ে নিও। আমার বোনের চোখ ছোট, আর নাক খেঁদা ছিল, তা 'বোরন শেপার্ড' সাহেবকে বল্‌তে এমন চটক্‌দার ছবি তুলে দিলে যেন ডানাকাটা পরী! তোমার মেয়ের চড়ানে গাল, উঁচু কপাল, সব নিখুঁৎ করে দেবে দেখো।"

আবার আর-এক নূতন প্রস্তাব শুনে কালো তাড়াতাড়ি ঘুরে বসে বউটির দিকে তার শান্ত ম্লান দৃষ্টি তুলে ধর্‌ল। কালোর মা বকে উঠ্‌লেন, "কালো, কি ছট্‌ফট্ করিস্, বুড়ো মেয়ে!"

বুড়ো মেয়ে আবার তেম্‌নি উবু হয়েই মেজের উপর স্থির হয়ে বস্‌ল।

তারাসুন্দরী শোভার দিকে দেখিয়ে বল্‌লেন, "দেখো

ভাই, ছবি তোল্‌বার সময় কিন্তু অম্‌নি ধারা ঢল্‌কো করে এলো খোঁপা বেঁধে দিতে ভুলো না। অভ্যেস নেই বলে যদি সহজে না হয়, মাথার উপর ভিজে গামছা টিপে ধরে নাবিয়ে নিও, বেশ পাতাকাটা বাহার হবে এখন।"

বিনু বল্‌লেন, "দিদি, সবই যদি শিক্ষা দিলে, তবে পাঁচী ঘট্‌কীর কথাটাই বাদ যায় কেন?"

তারাসুন্দরীর অদম্য উৎসাহ এইবার যেন একটু দমে গেল। তবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ বল্‌তে আর বাধা কি? তবে আমি হেন মেয়ের-মাও সেইবার ঠকেছিলাম একটু। কনক আমার বড্ড কালো ছিল বলে পাঁচী ঘট্‌কী বলেছিল মেয়েকে এমন রং করে দেবে যে অষ্টমঙ্গলা পেরিয়ে গেলে তবে গিয়ে সে রং ক্ষরবে। তার কথাতে তাই দিলাম। তা এম্‌নি আমার পোড়া অদেষ্ট যে তিন দিন যেতে না যেতে সব ধরা পড়ে গেল। তারপর মেয়ের আমার কি কম লাঞ্ছনা গিয়েছে? গায়ের গয়না বেচে দুটি হাজার টাকা নগদ তখুনি ধরে দিয়ে তবে ঢিটিক্কার বন্ধ কর্‌লাম।"

কালোর মা বেশ সহজ সুরেই বল্‌লেন, "তা লাঞ্ছনা হয় হোক গে। মেয়ে জন্মই ত লাঞ্ছনা সইতে। সময়ে আবার সব সয়ে যাবে। সদ্য সদ্য মেয়েটাকে কোনো রকমে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচি।"

কিছুর আশঙ্কায়, কি অকারণে জানি না, কালো তার মায়ের আঁচলটা চেপে ধরে হাঁটুর কাছে মাথাটা হেলিয়ে একটু সরে বস্‌ল। মা ছেলেকে কোলে টেনে তুলে, মেয়েকে ঠেলা দিয়ে বল্‌লেন, "আঃ লাগে যে রে! যা, উঠে ডালা থেকে নিতুর সন্দেশের ঠোঙাটা বের করে দে না। চুপটি করে ছেলেমানুষ আর কতক্ষণ বসে থাক্‌বে? তুইও না হয় দুটো নে।"

কালো উঠে দাঁড়িয়ে খাবার আন্‌তে গেল। তারাসুন্দরী তার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ওরে বাবা রে, মেয়ে নয়ত তাল-গাছ। পাড়াগাঁয়ের মানুষের কি কোনো আক্কেল আছে ছাই? মেয়েকে একটু পেট কাঁদিয়ে খেতে দিতে পার না? আইবুড়ো মেয়েকে সোহাগ দেখিয়ে ক্ষীর সর খাওয়ালে ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে উঠ্‌বে, তখন যে আর কুলো ডালা-ঠেকালেও সুইবে না। অত মাথা উঁচু করেই বা হাঁটা কেন? মাথাটা এইবার নাবিয়ে চোলো।"

কালো এতদিন জান্‌ত প্রতি কাজে কর্ম্মে প্রতি পদে পদেই সে অপরাধ করে বটে; কিন্তু এই যে নিজের অজ্ঞাতে বেড়ে ওঠার পাপ সে এতদিন করেছে, এটা তার জানা ছিল না। বেচারা এতক্ষণ চুপ করে বসে বসে নিজের রূপচর্চ্চা আর প্রসাধনের নানা উপায় শুনে শুনে এইবার মনের মতন একটা জিনিস হাতে পেয়ে খাবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু পাছে সন্দেশ মুখে দিতে দিতেই এতগুলো লোকের চোখের সাম্‌নে ধাঁ করে সে খানিকটা বেড়ে ওঠে এই ভয়ে বেচারী নিজের অংশটা মুঠির মধ্যে লুকিয়ে দীর্ঘ দেহখানা অনেকটা নত করে আইবুড়ো মেয়ের উপযুক্ত ভাবে বসে পড়্‌ল। তার আশা ছিল—লুকিয়ে খেলে ভগবান তার পাপের বোঝা ভারী করে দেবেন না।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তে তারাসুন্দরী বিনুর সঙ্গে নাম্‌তে নাম্‌তে বলে গেলেন, "দেখো ভাই, আমার কথা মেনে চল্‌লেই মেয়ের ভালোয় ভালোয় ঘর বর মিলে যাবে। তখন আমায় দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোরো।"

কালোর মা বল্‌লেন, "দিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমার মেয়েটার একটা হিল্লে লেগে যায় যদি ত আমি যেন জন্ম জন্ম তোমার পায়ে বাঁধা পড়ে থাকি।"

(২)

কালীদাসীর বাপের মামাতো ভাই কল্‌কাতার কোন্ এক সওদাগরী আপিসে চাক্‌রী করেন। তিনি অনেক ভেবে চিন্তে অনেক দেখে শুনে এক মুন্‌সেফের ছেলের সঙ্গে ভাইঝির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন। কালীর খুড়া মত প্রকাশ কর্‌লেন, "শুন্‌ছি ছেলেটি নাকি হীরের টুক্‌রো, বিদ্যের জাহাজ! এই আর-বার এন্‌টেনেস্ ফেল করেছে, আর এইবারেই পাশ করে ফেলেছে!"

ছেলের মামা ঘটক। এই ব্যবসায়ে তিনি অনেক রোজ্‌কার করে ফেলেছেন। বিবাহের সময় ত করেনই, তা ছাড়া পরে যখন বিবাহ সমরে দুই বৈবাহিকে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসেন, তখনও শান্তিজল ছিটানোর অছিলায় পরাজিত কন্যার-পিতার কান মুচ্‌ড়ে কিছু আদায় করে ফেলেন। ঘটক মহাশয় কালীদাসীর পিতার সঞ্চিত দুটি হাজার টাকা ও কালীদাসীর মায়ের অলঙ্কার কখানি সমেত কালীদাসী ও তার খুড়তুতো বোনকে একযাত্রায় বিবাহ-সাগর পার করে দিতে সম্মত হয়েছেন। কালীদাসীর মায়ের চার বেয়াই তাঁদের শুভ পদধূলি দানের দক্ষিণা-স্বরূপ তাঁকে নিরাভরণ করে রেখে যাবার পর কালীর বাবা শেষ বয়সে এই অলঙ্কার কখানি পঞ্চম বৈবাহিকের অগ্রিম মূল্যরূপে স্ত্রীর অঙ্গে রেখে যান। ঘটক মহাশয় এই সামান্য সম্বলের কতখানি যে তাঁর নিজের পুত্রের যৌতুক স্বরূপ সিন্ধুকে পুর্‌বেন এবং কতটা ভগ্নীপতিকে দেবেন সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন।

পাঁচী ঘট্‌কীর সন্ধান মিলেছিল। তার হাতের ফলানো রঙে এবং তারাসুন্দরীর উপদেশ অনুযায়ী সাজসজ্জা করে ধার-করা রূপ ও অলঙ্কারের বোঝা নিয়ে গোধূলি-লগ্নে পশ্চিমের রাঙা আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে মোমবাতির আলোয় কালীদাসী সুবর্ণলতা নাম ধরে তার ভাগ্যনিয়ন্তা-দের সাম্‌নে কলটেপা পুতুলের মতন প্যা ফেলে-ফেলে

ঘাড় নীচু করে এসে দাঁড়াল। মাথার এলোচুলে ঘটকীর কথামত পাতা কেটে, জরির ফিতে জড়িয়ে, সোনার ঝাপটা দুলিয়ে, আগাগোড়া গিল্‌টি-করা সুবর্ণলতা যখন এসে হাজির হল, তখন পাত্রপক্ষ মত প্রকাশ কর্‌লেন—"মেয়ে দেখ্‌তে একরকম ভালোই বলা যেতে পারে বটে, তবে সাজসজ্জা আর পাউডার মাখানোটা বড্ড বেশী হয়েছে।"

ঘটক বল্‌লেন, "তা কি কর্‌বেন মশায়! আজকালকার দস্তুরই ওইরকম; ওরি মধ্যে খানিকটা বাদসাদ দিয়ে ধর্‌বেন।"

পাত্রপক্ষ ঠিক যে কতখানি বাদ দেবেন, ঠিক কর্‌তে পার্‌লেন না; কাজেই সে বিষয়ে চুপ করে তখনকার মত অন্য প্রশ্ন কর্‌লেন, "তুমি কি পড় বল ত।"

কালোর দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়ের বেশী বিদ্যে কোনোদিন ছিল না, কিন্তু খুড়োর শিক্ষামত 'মেঘনাদ-বধ' থেকে আরম্ভ করে 'কথা ও কাহিনী' পর্য্যন্ত খান দশবারো গদ্য-পদ্যের তালিকা তাকে দিতে হল। তারপর মেয়েকে হাঁটিয়ে চলিয়ে কথা বলিয়ে পরীক্ষা শেষ করে যখন ছেড়ে দেওয়া হল, তখন দেখা গেল প্রথম বিভাগে সম্মানের সঙ্গে না হলেও, সে ভালোয় ভালোয় উৎরে গেছে। সুবর্ণলতার ভারে কালীদাসী এমনই চাপা পড়েছিল যে তাকে বর-পক্ষের মত হুঁসিয়ার গোয়েন্দাও খুঁজে বের কর্‌তে পারেনি।

বর বিদেশে মা-বাপের কাছে; তার পরীক্ষার জন্য বোর্‌ন্ শেফার্ডের তোলা যে ছবি পাঠানো হল, সে ত আরোই নিখুঁৎ, কারণ তাতে সাজসজ্জা অনেক কম হলেও, রূপ খুলেছে আরো ঢের বেশী।

(৩)

শুভলগ্নে সুবর্ণলতার বিয়ে হয়ে গেল।

ভরা দুপুরে পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে টন্‌টনে রোদে মুখ শুকিয়ে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে হাল্‌কা রকম খানকয়েক কনে-গয়না গায়ে দিয়ে কনে যখন শ্বশুরবাড়ী এসে পৌঁছল, তখন বরের বাড়ী লোকজনে গম্‌গম্ কর্‌ছে। মুখ ভার করে বর নাম্‌ল। শাশুড়ী কনে-বৌকে কোলে করে নামাতে গিয়ে তার হাত তুলে ধরেই বলে উঠ্‌লেন, "এ যে বড় কালো ঠেক্‌ছে দাদা! তুমি না ভালো বউ ঠিক করে দিয়েছিলে?"

ঘটক দাদা যেন আকাশ থেকে পড়্‌লেন, "তাই নাকি! তবে ত বড্ড ঠকিয়েছে দেখ্‌ছি! তখন ত রং টক্‌টক্ কর্‌ছিল। ওই তোমাদের ধীরেশকেই সুধোও না। ও ত ছিল সেখানে।"

শাশুড়ী বউএর ঘোমটা তুলে ধর্‌তেই কালীদাসীর শুক্‌নো কালো মুখ বেরিয়ে পড়্‌ল। বিয়ের গোলমালে এই কদিনে সে আরো শুকিয়ে উঠেছিল।

শাশুড়ী চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "ওমা! এ যে সেই কালো পেঁচা। ও আমার কপাল! আমি মরি পরের উপকার করে! রেলগাড়ীতে কোন্ পথের লোকের হিত কর্‌তে গেলুম, না এ যে দেখি তোর শিল তোর নোড়া, তোর ভাঙি দাঁতের গোড়া! ওমা কি ঘেন্না! কলিকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কিছু রইল না। ছি, ছি, ছি, এমন ফাঁকি মানুষে দেয় গা?"

ঝুঁটো সুবর্ণলতা সেই সেদিনের কালোর মতই শূন্য-দৃষ্টিতে তারাসুন্দরীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ঘটক মামাশ্বশুর চেঁচিয়ে কয়েকটি মধুর সম্বোধন উচ্চারণ করে বল্‌লেন, "জোচ্চোর কোথাকার! আমার সঙ্গে কারসাজি? এর শোধ না তুলি ত আমায় যেন লোকে কুকুর বলে ডাকে!"

তারাসুন্দরী বৌকে শুনিয়ে বল্‌লেন, "শুনছ গো! ও ধর্ম্মিষ্ঠির মেয়ে! যাকে বোলো, কালোরূপে লোকে অম্‌নি ভোলে না। রূপের ওজনে সোনা দিতে পারেন ত বড় মুখ করে যেন মেয়ে ফিরে পাঠান। নয় ত ছেলের আমার বিয়ের ভাব্‌না হবে না।"

কালো শুধু ঘাড় হেঁট করে যেন শাশুড়ীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে নিল। মেয়ে-জন্ম যে লাঞ্ছনা সইতেই এ কথা ত তার মা বলেই দিয়েছেন। কাজেই এতে তার আপত্তি তুল্‌বার কোনো অধিকার নেই।

ঘটক মশায় বল্‌লেন, "তারা, আর দাঁড়িয়ে কেন? চুপ করে এখন ছেলে বৌ ঘরে তোল্। এ তোর ভালোই হল। মোচড় দিলেই টাকা পড়বে।"

কালোর সুখের সংসার সুরু হয়ে গেল। এই ঘর বর মিলিয়ে দেওয়ার গর্ব্ব তারাসুন্দরী আর কোনো দিন করেছিলেন কি না কে জানে? তবে কালোর মা নিশ্চয় তাঁকে দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।

শ্রীশান্তা দেবী।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শারদ শ্রী।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন ১৩২৫

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"

যখন মায়াবাদের সঙ্গে সঙ্গে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" ইত্যাদি সূত্রে দেশের আকাশটা ছেয়ে গিয়েছিল, যখন শতাব্দী শতাব্দীর ত্যাগমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মনে দৃঢ় ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে অমৃতের পথটা কৃচ্ছ্রতা সাধনের ভিতর দিয়েই আছে, যখন সমস্ত হিন্দুর প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে এই জগতটা একটা বিরাট অন্ধকার দিয়ে গড়া—এখানে আছে শুধু দুঃখ আর পাপ—আছে শুধু অশ্রু আর শোক—আছে শুধু দারিদ্র্য আর অপমান, তখন বাঙালীর কানে কানে বাঙালীর কবি নির্ভিক হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।

এ এক অপূর্ব্ব ব্যাপার—এ এক অতীতের বিরুদ্ধে জাজ্জল্যমান সংগ্রাম—ত্যাগের বিরুদ্ধে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ্। বাঙালী সে দিন তার চিন্তার পুরাতন ও সনাতন পথে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল, মনে মনে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে—একি শুনি!

বালক রবীন্দ্রনাথ যেদিন "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখেছিলেন, সেদিন সেটাকে আমরা বালকের খেয়াল বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেম। যুবক রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর "কড়ি ও কোমলে" লিখলেন

> মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
> মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,

তখন সেটাকে আমরা প্রদীপ্ত যৌবনের অতিশয়তার মাঝে একটা ব্যক্তিগত কাল্পনিক অতিশয়োক্তি বলেই উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'নৈবেদ্যে'র থালিতে

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।

এই মালাটি সাজিয়ে দিলেন—তখন তার মধ্যে এমন একটা জিনিস দেখতে পেলেম, যেটাকে বালকের খেয়ালও বলতে পারি নে, কিম্বা কল্পনা-রঙিন্ যৌবন-বসন্তের আকাঙ্ক্ষা-কল্লোলের একটি তরঙ্গ-হিল্লোলও বলতে পারি নে। তার মধ্যে এমন একটা অ-ব্যক্তিত্বের বা সর্ব্ব-ব্যক্তিত্বের কথা শুনলেম যে সেটাকে আর ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথের কথা বলে' মানতে পারলেম না। এ যেন মানুষের অন্তরের কথা—যে-মানুষ লক্ষ লক্ষ যুগ কাটিয়ে এসেছে—এ যেন আমার কথা, তোমার কথা, সবারই কথা, এ যেন বিশ্ব-মানবের আসল কথাটি—তার সত্য ধর্ম্ম। সেদিন থেকে বাঙালীর মনের সামনে একটা নতুন চিন্তার পথ খুলে গেল।

কত শতাব্দী ধ'রে হিন্দুর জীবন-দেবতার মন্দিরে যে বিরাট তমসারূপী অপ্রবৃত্তিরূপ মহা-অসুর আপনাকে

প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে মহা-অসুরের জাদু মন্ত্রে ভগবানের এই বিরাট সৃষ্টির লীলার মন্দির তার কাছে বেদনাময় হ'য়ে উঠেছিল—বিভীষিকাপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। মানুষের ঘোর অধর্ম্ম এই অপ্রবৃত্তি—এই অপ্রবৃত্তিকে মানুষের অন্তর থেকে দূর করতে হবে, নইলে মানুষ কোনদিন আপনাকে সার্থক করে' তুলতে পারবে না। এই অপ্রবৃত্তিই হচ্ছে বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠাভূমি। বৈরাগ্যের ভিতরে মানুষ কোন দিনই আপনার জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে না।

মানুষের অন্তরে অন্তরে যে চিন্ময়ীদেবী আসন পেতে বসে' আছেন, সে চিন্ময়ীদেবীর আসন থেকে মানুষের মনে প্রাণে যে আদেশ আসছে সে ত বৈরাগ্যের নয়, ত্যাগের নয়, বর্জ্জনের নয়—সে যে গ্রহণের, আলিঙ্গনের। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের, এ পৃথিবীর প্রত্যেক ধূলিকণাটির যে সম্বন্ধ সে-সম্বন্ধ ত শত্রুর সম্বন্ধ নয়, সে সম্বন্ধ যে মিত্রের—সে-সম্বন্ধ দ্বেষের নয়, প্রেমের। প্রেম যেখানে, আনন্দও সেখানে। তাই ত মানুষ নিশিদিন ছুটছে যতদিক দিয়ে সম্ভব তত-দিক দিয়ে আপনাকে এই ধরিত্রীর সঙ্গে মিলিত করবার জন্যে। তাই ত তার এই অন্তরের প্রেম আনন্দ হাজার দিক দিয়ে হাজার রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে; তাই ত তার ধন জন মান ঐশ্বর্য্য সম্পদ গৌরবকে আলিঙ্গন, আনন্দের পুলকে সে আপনাকে সহস্র থানে বেঁটে দিচ্ছে। কিন্তু ঐ অপ্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে' আমরা এই প্রেমকে হারিয়ে-ছিলেম—সুতরাং এ জগতে আমরা আনন্দকেও পাই নি। তাই বৈরাগ্যকেই চরমপথ মনে করে' নির্ব্বাণকেই আমরা পরম মোক্ষ বলে' মেনে নিয়েছিলেম।

কিন্তু মিথ্যা যা, তা কতকাল টিকবে? অনৃতের ওপরে ভিত্তি করে' যে মন্দির সে-মন্দির যত বিরাটই হোক না কেন—যত উঁচুতেই তা আকাশে মাথা তুলুক না কেন—সত্য একদিন তাকে নত করবেই। কেননা সত্যের মৃত্যু নেই—কিন্তু অনৃতের ক্ষয় আছে। তাই সুদীর্ঘকাল পরে কত-শতাব্দী-সঞ্চিত অনৃতের বিরাট স্তূপ ভেদ করে হিন্দু কবির অন্তরে ঐ পরম সত্য ফুটে উঠল "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"! কার সত্য এ? কিসের সত্য এ? এ সত্য মানুষের—মানুষের শিরায় শিরায় যে প্রাণের স্পন্দন প্রতিমুহূর্ত্তে কম্পিত হচ্ছে এ সত্য সেই প্রাণের স্পন্দনের—মানুষের অন্তরে তার অন্তর-দেবতা নিশিদিন যে আনন্দ বিতরণ করছেন এ সত্য সেই আনন্দের। এ সত্যকে যে মানুষ উপেক্ষা করবে এ জগতে তার মঙ্গল নেই। কেননা, সত্যের মধ্যেই মঙ্গল রয়েছে—অন্যত্র নয়।

সেই সুদূর অতীতের আদিম ঊষায় যেদিন মানব-শিশু আঁখি মেলে প্রথম চেয়ে দেখেছিল, সে দিন ত তার মাথার ওপরে আকাশে আকাশে পায়ের নীচে ধরিত্রীর ধূলিতে ধূলিতে কোন অমঙ্গলের ছায়া সে দেখতে পায় নি—সে-দিন ত তার মন প্রাণ বেদনায় বেদনায় ভরে ওঠে নি। সে-দিন যে বিস্ময়ে বিস্ময়ে তার আঁখিপাত বিস্ফারিত হয়েছিল—কৌতূহলে কৌতূহলে তার অন্তর ছেয়ে গিয়ে-ছিল—পুলকে পুলকে তার চিত্ত মন প্রাণ ভরে উঠেছিল। অবোধ সে, কিছুই জানত না সেদিন; কিন্তু কেমন ক'রে তার অস্পষ্ট অস্পষ্ট মনে হয়েছিল যে, এই যে ধরিত্রী—এই যে শব্দ গন্ধ রূপ রস—এ মিথ্যা নয়, ব্যর্থ নয়, অমঙ্গল-ময় নয়—এ সত্য-আনন্দময়; আর তার প্রমাণ ছিল তার অন্তরে। এ তারই জীবনের অর্থে অর্থে পূর্ণ, তার শিরায় শিরায় যে ওজস্ রয়েছে, মনে মনে যে আশা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, প্রাণে প্রাণে যে দুর্ব্বার কর্ম্মপ্রেরণা রয়েছে,—এ তারই সুরে সুরে সুরবাঁধা—তাকেই সার্থক করে' তোলবার জন্যে এই সৃষ্টি। তাই সেদিন বৈরাগ্যের কথা তার মনেও ওঠে নি। এই শব্দ গন্ধ-রূপ-রস-পুলকিত ধরিত্রীতেই যে মানুষের সকল সত্য আপনার সার্থকতা পাবে। আর সেই ত মানুষের পরম মুক্তি—তার সকল সত্যের সার্থকতা।

কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এই যে চরম সত্য—এই চরম সত্যকে আমরা কত শতাব্দী ধরে' মিথ্যা বলে' মেনেছিলেম। এই মিথ্যা আমাদের পরলোকে নির্ব্বাণ পাইয়ে দিয়েছে কি না জানি না, কিন্তু ইহলোকে তা আমাদের কোন আনন্দ-লোকে নিয়ে যায় নি। এই মিথ্যার আশ্রয়ে আজ আমাদের জীবনে যা কিছু সব হয়ে উঠেছে বন্ধন। কারণ সত্যের উদ্‌যাপনেই মুক্তি—মিথ্যার আলিঙ্গনেই বন্ধন।

এই মিথ্যাকে আলিঙ্গন করে' মানুষ আপনার মনুষ্যত্বকে খুঁজে পায় নি, আপনার আত্মাকে খুঁজে পায় নি—তাই

আজ সে দীন, অক্ষম, শক্তিহীন। তাই আজ দেশের আকাশে বাতাসে যে সুর উঠ্‌ছে সে সুর মানুষের মানব-জন্মের জয়োল্লাসের সুর নয়, দেশবাসীর মনপ্রাণ আজ মানুষের মহত্ত্ব-গৌরব দিয়ে ভরে যায় নি। আজ চারিদিকে তাই বিরাট ক্রন্দন, খিন্ন দীর্ঘশ্বাস, অসহায়ের অক্ষমতা। এ ত মুক্তি নয়, মোক্ষ নয়। এ যে মানুষের মনুষ্যত্বের' চরম দুর্দ্দশা, তার মানুষ নামের দুরপনেয় কলঙ্ক।

এই মিথ্যার পথ, অনৃতের পথ—মানুষের এই অকল্যাণের পথ যাঁরা মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা এ জগৎকে গ্রাহ্য করেন নি—তাই তাঁদের বংশধরেরা আজ জগতের অগ্রাহ্য। এই সৃষ্টির সত্যকে—এই জগতের সত্যকে—মানুষের সত্যকে যাঁরা সম্মান করেন নি, তাঁদের বংশধরদের আজ জগতব্যাপী অসম্মানের অন্ত নেই।

কিন্তু কবির বাণী আজ আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের নিগূঢ়তম সত্যটিকে 'আঘাত করে' আমাদের চোখে একটা নতুন দৃষ্টি এনে দিয়েছে। এই দৃষ্টিতে আজ আমরা এ জগৎকে অন্ধকারময় করে দেখ্‌ছি না। যেমন প্রতি উষায় সহস্র ফুল গালভরা হাসি নিয়ে ফুটে ওঠে—প্রতি নিশায় লক্ষ তারা কোন্ নিবিড় রহস্যের রসধারা পান করে' চোখ মেলে জেগে ওঠে—তেমনি মানুষের জীবন-কমল এই শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস-ময়ী ধরিত্রীর মাটি থেকে আনন্দ-রস আহরণ করে' ফুটে উঠে কোন্ অজ্ঞাত অতি-অন্তরতম চিররহস্যের পানে তার আশা-আকাজ্ক্ষার সহস্র দলরাজি মেলে দিচ্ছে। আমরা আজ মানুষকে দু'দিক থেকেই জান্‌তে চাই—আর সেই ত মানুষকে সত্য করে' জানা, নিঃশেষ করে' জানা। এক দিক তার শান্তের দিক—আর এক দিক তার অনন্তের দিক; এক দিক তার লীলার দিক—আর এক দিক তার সমাধির দিক; এক দিকে সে চিরমুখর—আর একদিকে সে অনন্ত মৌনী; এক দিকে তার এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর অগাধ স্নেহ—আর এক দিকে তার নিবিড় নীল আকাশের বিরাট আকর্ষণ।

আজ আমরা দেশকে তুল্‌তে চাচ্ছি, নেশান গঠন কর্‌তে যাচ্ছি, যশহীন গৌরবহীন ঐশ্বর্য্যহীন এই হতভাগ্য দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে আবার প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে যাচ্ছি; কিন্তু সে প্রয়াসকে সফল করে' তুল্‌তে চাইলে আগে সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুল্‌তে হবে। আর সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুল্‌তে চাইলে দেশবাসীর সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করে' তার অন্তরে এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর প্রেমকে জাগ্রত করে' তুল্‌তে হবে। যদি মানুষের জীবনের প্রতি আমাদের প্রেম না-জন্মে তবে ইহলোকে আমরা অমৃত আদায় কর্‌তে—আনন্দ আদায় কর্‌তে কিছুতেই পার্‌ব না। কেননা, যেখানে প্রেম, সেইখানেই শুধু আনন্দ। আর যেখানে আমাদের আনন্দ নেই, সেখানে কোন অনুষ্ঠানকেই আমরা সফলতা দান কর্‌তে পার্‌ব না। আনন্দহীন কর্ম্ম মানুষের বোঝা। এই বোঝার নীচে আমাদের খাটা হবে বেগার খাটা। যে-কোন বোঝা মানুষের অক্ষমতাই বাড়িয়ে তোলে—তাকে মহৎও করে' তোলে না, বৃহৎও করে' তোলে না।

অতি সহজ, অতি স্বাভাবিক যে বেঁচে থাকার আনন্দ, মানুষের জীবনে যখন সেই বেঁচে থাকার আনন্দটাই লুপ্ত হ'য়ে যায় তখন তার বেঁচে থাকাটা হ'য়ে ওঠে বোঝা। তখন সে এই জগতের কর্ম্মে ভোগে যশে গৌরবে কোনই সার্থকতা দেখ্‌তে পায় না—কারণ সার্থকতা ত মানুষের বাহিরের বস্তু বা বিষয়সমষ্টির মধ্যে নেই—আছে তা তার আপনার অন্তরে—আপনার অন্তরের সত্যে—তার অন্তরের সত্যের আনন্দে। এই বোঝার নীচে থেকে তখন সে মানুষের জীবনকে অভিশাপই দিতে থাকে, তখন সে সূক্ষ্ম দর্শনের সূক্ষ্মতর তর্কজাল বিস্তার করে' প্রমাণ কর্‌তে চায় যে সৃষ্টির কোন অস্তিত্বই নেই—এই জগৎ একটা বিরাট মিথ্যা—মানুষের জীবন একটা অর্থহীন মায়া। তার কাছে মানুষের জীবন অর্থ-হীনই বটে, কারণ জীবনের ত আর কোন অর্থ নেই—শুধু এক অর্থ ছাড়া—সে হচ্ছে, মানুষের জীবন-দেবতার আনন্দের অনন্তরূপে প্রকাশ—সহস্র সুরে, সহস্র রঙ্গে, সহস্র ভঙ্গীতে তার অনন্ত রূপকে আলিঙ্গন। কিন্তু নির্ব্বাণকামী দার্শনিকের যে এই আনন্দেরই অভাব।

কত হাজার বর্ষ ধরে' এই ধরিত্রীর বুকে বিচরণ করে'—এই ধরিত্রীর সম্পদে বিপদে যশে গৌরবে দুঃখে

সুখে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে দিয়ে হিন্দুর জাতীয়-জীবনে একটা অবসাদের যুগ, আলস্যের যুগ, একটা ঔদাসীন্যের যুগ এসেছিল। হিন্দুর কর্ম্মেন্দ্রিয় ভোগেন্দ্রিয় অক্ষম হ'য়ে পড়্‌লেও, তার খুসী হবার ক্ষমতা সুপ্ত হ'য়ে পড়্‌লেও, তার চিন্তাশক্তির ধারা সেদিনও মলিন হয়নি। তাই সেদিন সে আপনার অন্তরের সেই অবসাদকে সত্য ভ্রমে আশ্রয় করে'—তার জীবন-দেবতার ঔদাসীন্যকে মহত্ত্বে মণ্ডিত করে' এ জগতের নশ্বরতামূলক নির্ব্বাণ-তত্ত্ব-মূলক এক বিরাট দর্শন গড়ে তুল্‌ল। সমাজে শক্তিমান যাঁরা, ধীমান্ যাঁরা, তাঁরা যখন সংসারের অনিত্যতা প্রচার কর্‌তে লাগ্‌লেন, নির্ব্বাণমুক্তি-তত্ত্বের জয় ঘোষণা কর্‌তে লাগ্‌লেন, তখন সমাজের অশক্ত যাঁরা সাধারণ যাঁরা তাঁরা অবনত মস্তকে তাঁদের সে উপদেশ শিরোধার্য্য করে' তাঁদের জীবনকে সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু সত্যকে ধ্বংস কর্‌বে কে? তাই আজও হিন্দু বেঁচে আছে, তার সমাজ সংসার দেশ জাতি মান অভিমান সব নিয়ে' শুধু আজ সে অশক্ত—আজ তার জীবনে বৃহতের পরিবর্ত্তে বেদনাময় সংকীর্ণতা, মহতের পরিবর্ত্তে তার বেঁচে থাক্‌বার প্রতিদিনের ক্ষুদ্র আয়োজন, মুক্তির পরিবর্ত্তে তার ভিতরে বাহিরে সহস্র বন্ধন। এ-ই যে তার জীবনে "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। অজ্ঞানে আমরা অনৃতকে বরণ করেছিলেম, তাই আমাদের ঘরে-বাইরে আজ অমঙ্গলের ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু আজ বাঙালীর জীবন-দেবতার মন্দিরে সেই অবসাদের যুগ অবসানপ্রায়। নইলে "নির্ঝরিণীর স্বপ্ন-ভঙ্গ" হোতো না, "অচলায়তনে"র শঙ্কাহীন শান্তিময় জীবনের মাঝে পঞ্চক হাঁপিয়ে উঠ্‌ত না, নইলে আজ "ফাল্গুনী"র বাঁশী এমন করে' বেজে উঠ্‌ত না। হিন্দুর অন্তরে আবার মানুষের সত্য ধীরে ধীরে আপনাকে জাগ্রত করে' তুল্‌ছে। সেদিন অজ্ঞানে আমরা অনৃতকে বরণ করে' নিয়েছিলেম—আজ যেন সজ্ঞানে আমরা সত্যকে অভিনন্দিত কর্‌তে পারি।

(২)

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

যখন মানুষ অখণ্ডকে খণ্ডের মধ্যে দেখ্‌তে পায় পূর্ণকে অপূর্ণের মাঝে ধর্‌তে পায়, তখন জ্যামিতির নিয়ম-কানুনগুলো ধীরে ধীরে তার মনে মিলিয়ে আস্‌তে থাকে। তখন আর বন্ধন ও মুক্তিকে তার পরস্পরবিরোধী ব'লে মনে হয় না। বন্ধন—সে যে তার অপূর্ণতার দিক; মুক্তি—সে যে তার পূর্ণতার দিক। এ যে 'সীমার মাঝে অসীম সে যে বাজায় আপন সুর।' এই বন্ধনের সঙ্গে মুক্তিকে—সীমার সঙ্গে অসীমকে যুক্ত করে' রেখেছে এক অনির্ব্বচনীয় অবিনশ্বর মহানন্দময় সত্তা। তাই এই সৃষ্টি—তাই এই মানুষ।

কিন্তু মানুষ যখন আপনাকেই একান্ত ক'রে দেখে—এই বিরাট ও বিচিত্র সৃষ্টির মাঝ থেকে আপনার অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখে, তখন সে ঐ অবিনশ্বর মহানন্দময় সত্তাকেও হারায়—তখনই তার বন্ধন হ'য়ে ওঠে একান্তই বন্ধন। কারণ তখন সে তার বন্ধনের মাঝে যে বন্ধনের অতিরিক্ত একটা কিছু আছে—সেই "অতিরিক্ত"টাকে দেখ্‌তে পায় না। এই অতিরিক্তটাকে দেখ্‌বার অভাবই হচ্ছে বৈরাগ্যের মূলভিত্তি।

কিন্তু মানুষ ত একটা খাপছাড়া বস্তু বা বিষয় নয়—এই বিচিত্র লীলার মাঝে একটা একান্ত অর্থহীন বিচ্ছেদ নয়। সে যে এই সৃষ্টির অনন্তরূপেরই একটা রূপ—অনন্ত নামেরই একটা নাম। এই অনন্তরূপকে বিনিসুতোয় গাঁথা মালার মত করে' রয়েছে এক পরম অরূপ—এই অনন্ত নামের বিচ্ছেদকে অবিভক্ত করে' রেখেছে এক চরম নামাতীত; প্রত্যেক মানুষ সেই পরম অরূপেরই একটি রূপময় বিগ্রহ—সেই নামাতীতেরই একটা বিশিষ্ট নাম। এই নিবিড় বোধ যখন মানুষের প্রাণে প্রাণে স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে তখন স্বতঃই তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে—

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্তে থাক দুঃখে সুখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি!"

কারণ তখন দুঃখ তার দুঃখ নয়—কষ্ট তার কষ্ট নয়; প্রতিমুহূর্ত্তে সে তখন দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করে' আনন্দলোকের সংবাদ পাচ্ছে; তখন বেদনা তার বেদনা

নয়—ব্যর্থতা তার বন্ধন নয়—সকল বেদনা সকল ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে সে তখন সেই অমৃতলোকেরই আহ্বান শুনছে। তখন বন্ধন তার মুক্তি—বন্ধনেই তার মুক্তি। কারণ বন্ধনই যে তার জীবনের সেই পরমলীলাময়ের সত্য। আর সত্যকে স্বীকার করে যে মুক্তি সেই মুক্তিই আসল মুক্তি—সত্যকে অস্বীকার করে' যে মুক্তি সে মুক্তি প্রকৃতপক্ষে বন্ধন। মানুষ যখন তার জীবনের, তার প্রকৃতির এই আনন্দময় সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করে তখন তার সহস্র বন্ধনের ভিতর দিয়ে, সহস্রবন্ধনকে ছাপিয়ে ডুবিয়ে প্রবাহমান হয় সেই অবিনশ্বর অমৃতধারা। আর তখনই সে প্রকৃত জীবন্মুক্ত—তখন সে অধিকারী হয় এই মর্ত্তধামেই স্বর্গভোগ করতে, তার কর্ম্মে ভোগে আহারে বিহারে প্রেমে প্রীতিতে যশে গৌরবে সেই পরমজনের মঙ্গলময় হস্ত দেখতে। মানুষের সমস্ত সত্যের মাঝে সে তখন দেখতে পায় আপনার জীবনের মুক্তি—পরম মুক্তি। পরম জ্ঞানে উদ্দীপ্ত হয়ে সেদিন তার কণ্ঠে আপনা-আপনি উচ্চারিত হয়—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উদ্যানলতা

(১২)

রবিবার দুপুরে মুক্তিদের ভবানীপুরের বাড়ীর অন্দরের একটা প্রকাণ্ড চটের পর্দ্দার পাশে কেরোসিন কাঠের দুটো বড় বড় খালি বাক্সের উপর মুক্তি আর জ্যোতি বসে বসে আচার খাচ্ছিল আর দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মত অনর্গল বকে যাচ্ছিল। রোদে বারাণ্ডার আর সমস্ত জায়গাটাই ভরে গিয়েছিল; কেবল পুরাণো আসবাব আর খালি বাক্সের স্তূপের আড়ালে পর্দ্দার পাশের এইটুকু জায়গাই একটু ছায়া আর ঠাণ্ডা ছিল। তবে রোদের আঁচ সেখানেও বেশ পূর্ণমাত্রায় গায়ে লাগে। অত বড় বাড়ীতে এত জায়গা এবং ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা থাকা সত্ত্বেও কেন যে এই দুই বন্ধু পুরাণো পরিচয় ভালো করে ঝালাবার জন্যে এমন জায়গাটি বেছে বের করেছিল, তা তারাই জানে।

মুক্তির বাঁহাতে একখানা 'রোস্ হিন্ট্‌স্' আর একখানা আধছেঁড়া কালকালীতে-কাটাকুটি-করা খাতা; বইখানার কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট পাতা ঠিক রাখবার জন্যে পাঠিকার একটি আঙুল বন্ধ বইয়ের ভিতর ঢোকানো। ডান হাতে ভর্ত্তি করে আচার নিয়ে মাঝে মাঝে জিবে একটু করে ঠেকিয়ে সে জ্যোতির সঙ্গে গল্প করছিল। ছেলেবেলায় তারা দুজনে দুজনের খুবই বন্ধু ছিল; বড় হবার পরেও সেটা বন্ধ হয়ে যায় নি। কিন্তু এতকাল একটানা বোর্ডিঙে থাকার দরুণ মুক্তির অবসরটা কমে এসেছিল। মাঝে মাঝে একটু একটু যা দেখা হত, তাতে তাদের গল্পটা জমবার আগেই ভেঙে যেত। এরকম আচমকা যবনিকা পতনের পালা অনেক দিন ধরে চলার পর আজ মুক্তি সত্যিই মুক্তি পেয়েছে। তাই আজ যখন জ্যোতিকে ঠাকুরমার আনা আচার দিতে এসে সে এইখানে তার সন্ধান পেলে, তখন নিজের অনবসরের ক্ষতি পূরণের জন্যে সে কথাবার্ত্তার মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত রকম বাড়িয়ে দিলে। ছেলেবেলার বন্ধু বলে তাদের মধ্যে ভদ্রতার চলন রাখবার আবশ্যক নেই, এটা তারা দুজনেই ধরে নিয়েছিল।

মুক্তির টেষ্ট পরীক্ষা সপ্তাহ দুই আগে হয়ে গিয়েছে, পড়ার তাড়া নেই। নেহাৎ বাবা পড়াশুনো করতে বলে দিয়েছেন তাই বাধ্যতার নিদর্শন স্বরূপ সে বই খাতা দুটো হাত করে সারা বাড়ী এতক্ষণ অকারণ ঘুরে বেড়িয়েছে। ঠাকুরমার প্রদত্ত আচার আর জ্যোতির দর্শন পেয়ে অবশেষে তবু তার একটা কাজ জুটেছে।

মুক্তি বলছিল, "আচ্ছা, তোমাদের কলেজে প্রফেসররা কখখনো ছেলেদের কিছু জিগ্‌গেষ করেন না? আমাদের ওখানে কিন্তু করেন।"

জ্যোতি আচার-মাখা হাতটা সমস্তটা একবার চেটে নিয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, "না, আমাদের জিগ্‌গেষ করবে কেন? আমাদের মুখের চেহারা দেখেই সবাই এমন

ভাবে চেয়ে থাকে যে প্রশ্ন করবার কথা তাদের মনেই আসে না।”

মুক্তি জ্যোতির বাঁ হাতের উপর বইএর একটা ঘা দিয়ে বললে, “আহা মরে যাই! আমায় অত বোকা পাও নি যে তোমার ঐ মূর্ত্তির প্রশংসা করতে বসে যাব। যতই জাল ফেল না কেন, আমার পেট থেকে কথা বের করতে পারবে না। বাবারে বাবা, সেদিন থেকে বোর্ডিঙের মেয়েরা কি বললে, তাই শোনবার আশায় আর ঘুম হচ্ছে না! বল না, তোমাদের কলেজের কথা। তোমাদের ক্লাশে কে ফার্ষ্ট হয়?”

জ্যোতি মুক্তির কানের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, “সেই তোমাদের সাক্ষাৎ 'অ্যাডোনিস্' ধীরেন। ছেলে ত দিবারাত্রি কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, সাইকল্ আর মুগুর এই চারটি নিয়েই মশগুল। অবসর-কালে নাইট স্কুল আর চাঁদার খাতা। আজকালকার ছেলে হয়ে ও-রকম কাটখোট্টা এ এক অদ্ভুত!”

মুক্তি বললে, “ভালই ত! তোমার মতন ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, ছড়ি, টেড়ি, নিয়ে না বেড়ালে বুঝি আধুনিক হওয়া যায় না?”

জ্যোতি বললে, “আচ্ছা বেশ, শুক্রবারে তোমার জন্মদিনে তোমাদের নব্য হিরোটিকে নেমন্তন্ন কর না? কেমন পুরুষোত্তম দেখা যাবে!”

“আহা! আমার ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই কোথাকার কে তোমার কলেজের ছেলে, তাকে এখন নেমন্তন্ন খাওয়াতে বসি। তোমার সখ হয়ে থাকে ত পেলেটীর দোকানে নিয়ে খাইও।”

ঠাকুরমা মোক্ষদা পাশের ঘরে বসে নারকেল কুরতে কুরতে মুক্তি আর জ্যোতির অপরূপ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনছিলেন। এত বড় বড় ছেলে-মেয়ের এ-রকম আজগুবি গল্প তাঁর মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তবু ছেলের সঙ্গে আবার নূতন করে কলহ করবার ইচ্ছাও আর তাঁর নেই। তাই তিনি এবার একটা অন্য পথ ধরে কার্য্য সিদ্ধ করতে চান। জ্যোতি যখন এতকাল এই বাড়ীতেই থেকে গেল, তখন, এ কথা নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করে কি হবে? কেষ্টা বেয়ারা ত অনেক কাল চাকরী ছেড়ে চলেই গেছে। তখনকার ঝি-চাকরগুলোও নেই; কেই বা আর জ্যোতির ঠিকুজি কুষ্ঠি নিয়ে বসে আছে। ধরণধারণ দেখে ওকে ত ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হয়। বামুনের ছেলে একান্ত না হয় নাই হবে। ওর সঙ্গে ত আর কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছে না। ঘরে থাকতে দোষ কি? এবার ভবানীপুরে ছেলের বাড়ী এসে মোক্ষদা ওকে এক মা-বাপ-মরা কুটুমের ছেলে বলে পাড়ায় পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। ছেলের তাঁর দয়ার শরীর তাই পরের অনাথ ছেলে পালছে। মোক্ষদা নিজে কিন্তু জ্যোতিকে বড় আমল দেন না, তবে আজকাল বিশেষ কিছু অনাদর কি ছুঁই-ছুঁই করাও ছাড়তে হয়েছে। তাতে জ্যোতির বাড়ীতে ছেলের মত থাকার সুবিধাই হয়েছে।

মোক্ষদা মুক্তির কথায় হঠাৎ নাতনীর বয়সের বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠলেন। মনে হল—হ্যাঁ, এমনি দিনেই ত আজ ষোলো বছর আগে বৌমা আমার ওই মেয়েটাকে বুকে করে চোখ বুজেছিল। আর সে চোখ এ জন্মে চাইলে না। এই আমারই কোলে ত মেয়ে এত বড়টা হয়ে উঠেছে। সত্যি, এর পর ওর বিয়ে না দিলে আর কিছুতেই চলছে না। শিবুর কি ছাই, কোনো দিকেই চোখ নেই। শিব ত একেবারেই শিব!

মোক্ষদা বারাণ্ডায় বেরিয়ে এসে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, “হ্যাঁরে মুক্তো, শিবু কোথায় গেল?”

মুক্তো তখন জ্যোতির সঙ্গে মহা কলহে ব্যস্ত ছিল। জ্যোতির যে অপর্ণাকে এবং মুক্তির যে ধীরেনকে শুক্রবার নিমন্ত্রণ করবার বিশেষ কারণ ও আগ্রহ উপস্থিত হয়েছে এই ছিল তাদের কলহের বিষয়। হঠাৎ ঠাকুরমার এ রকম “শিবু বিষয়ক” প্রশ্নের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাঁর কথায় চমকে বললে, “অ্যাঁ কি বললে? বাবা কোথায়? আমি জানি না ত!”

মোক্ষদা ভাল করেই জানতেন যে মুক্তি এখন পিতৃ-সন্ধানে ব্যস্ত নয়; তবু তাকে সেখান থেকে ওঠাবার জন্যে বললেন, “জানি না বললেই ত চুকে গেল না। কোথায় আছে ডেকে নিয়ে আয়। বলগে মা ডাকছে।”

মুক্তি বই খাতা দুখানা সেখানে ফেলে উঠে চলে গেল। জ্যোতি একটু পরে অত্যন্ত কৌতুহলপূর্ণ চোখে মুক্তির

ছেঁড়া খাতাখানা উল্টে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাড়ীর বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

শিবেশ্বরকে পড়ার ঘরের বই খাতা কাগজ চিঠি প্রভৃতির অরণ্যের ভিতর থেকে উদ্ধার করে মুক্তি আবার নীচে ঠাকুরমার কাছে এসে নিজের মাথাটা ঠাকুরমার কাঁধের উপর কচি মেয়ের মত করে রেখে দাঁড়াল। শিবেশ্বর একটা মোড়ার উপর বসতেই মুক্তির মাথায় হাত দিয়ে মোক্ষদা বল্‌লেন, "দেখ্‌ছিস্ ত শিবু, মুক্তো লম্বে আমায় ছাড়িয়ে উঠ্‌বে এইবার।"

শিবেশ্বর হেসে বল্‌লেন, "তা মা যোলো বছর বয়সে তুমিই কি আর এতটুকু ছিলে!"

মোক্ষদা বল্‌লেন, "আমার কথা রেখে দে। এ যে আইবুড়ো মেয়ে!"

মুক্তি হেসে বাবার গায়ে ঢলে পড়্‌ল। তিনি তাকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, "আইবুড়োই হোক, আর সধবাই হোক, ষোল বছর সবাইকারই ষোলো বছরেই হয়।"

মোক্ষদা বল্‌লেন, "তোমাদের এক কথা! বে হয় নি যার তার ষোলো বছর বয়স হওয়াই যে অন্যায়।"

"সে কি মা! যে ষোলো বছর আগে জন্মেছে, তার বিয়ে হয় নি বলে কি সে আবার পেছিয়ে চল্‌তে পারে?"

"তা পারে না মানি। তবে তা যখন হয়ই না, তখন তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও, দোষ কেটে যাবে। আর বয়স বাড়্‌তে পাবে না।" মোক্ষদা ভাব্‌লেন, এইবার তাঁর যুক্তির প্যাঁচে ছেলেকে হার মান্‌তেই হবে।

ছেলে কিন্তু বেশ সাহাস্য মুখে উত্তর দিলেন, "না মা, তা হ'লেও বয়স বসে থাক্‌বে না, বাড়্‌বেই।"

মোক্ষদা এইবার বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। আর যুক্তি তর্ক কর্‌তে না পেরে বলে ফেল্‌লেন, "আচ্ছা, তা যা হয় হবে, তুমি এখন বিয়েটা দিলেই আমি বাঁচি। এই ত আমাদের হরি গোঁসাইয়ের ভাগ্নে রয়েছে, দিব্যি এম্-এ পাশ। একটু গোঁড়া হিঁদু বটে। তবে ঘর বর খুব ভাল। একটু ভাল করে খোঁজই কর না কেন? তাকে যদি নেহাৎ না মনে ধরে, তবে আমার বাপের বাড়ীর ওখানে জমিদারের বাড়ী এক ছেলে আছে, তাকে তোর মনে ধর্‌বেই। ধীরেন বলে নাম ছেলেটির, খাসা দেখ্‌তে যেন কার্ত্তিক ঠাকুর, তোদেরই মত জাতটাত মানে না, হাড়ি মুচি সবাইকার করে বেড়ায়, পৈতে গলায় দিতে চায় না। তোর মত পরের ছেলে পড়ানোর রোগও আছে। তা সে ত তোদের ভালই লাগ্‌বে। পড়েও সে এই কল্‌কাতাতেই। বি-এ পড়্‌ছে বুঝি এইবার।"

মুক্তি ভাব্‌লে—এ আবার কে? জ্যোতির ধীরেন নয় ত। কথাটা মনে করে তার ভারী হাসি পেল। সে একটু হেসে সেখান থেকে পলায়ন করল। শিবেশ্বরও "আচ্ছা সে দেখ্‌ব এখন" বলে গম্ভীর মুখে উঠে চলে গেলেন।

মোক্ষদা এদের রকম-সকম কিছু না বুঝে আবার মনে মনে কি একটা মতলব ঠিক কর্‌তে বসে গেলেন।

শুক্রবার। মুক্তির আজ জন্মদিন। সারা সকাল সে ঠাকুরমার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের খাবার জোগাড় কর্‌তে আর নিমন্ত্রিতদের চোখে তাদের বাড়ীটা আশ্চর্য্যরকম পরিপাটি করে তোল্‌বার আয়োজনে ঘুরে বেড়িয়েছে। বাড়ীর আনাচে কানাচে, ছবির পিছনে, টেবিল-চেয়ারের অন্ধি-সন্ধিতে যে ধুলো বালি আর ছোট ছোট মাকড়সার জালগুলি মুক্তির চোখের আড়ালে এতদিন চুপিচুপি লুকিয়ে পড়ে ছিল, আজ পাছে তারা কেউ তার নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবের চোখে অকস্মাৎ বড় হয়ে উঠে মুক্তির পরিচ্ছন্নতা ও আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাকে লজ্জা দেয়, এই ভয়ে নূতন ঝি-চাকরদের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁটা আর ঝাড়ন হাতে করে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে আজ সেইসব লুক্কায়িত আবর্জ্জনাগুলোকে টেনে ঘরের মেঝের উপর এনে জড়ো করেছে। তার পর শিবেশ্বরের বেয়ারা এতদিনের এই নিরীহ আশ্রিতদের নির্দ্দয়ভাবে ঝেঁটিয়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিয়েছে। মুক্তির সেই উঁচু করে ঝুঁটি বাঁধা, কোমরে কাপড় জড়ানো, গায়ে মুখে ধুলো মাখা, ঝাঁটা-হাতে চেহারা দেখ্‌লে কেউ তাকে আজকার উৎসবের কেন্দ্র, সুশিক্ষিতা মিস মুক্তি গাঙ্গুলী বলে ভুল কর্‌ত কিনা সন্দেহ। জ্যোতি ত তার চেহারা দেখে অবাক্! আজকের অভ্যর্থনা-বর্ষা এই বেশে হবে কি না প্রশ্ন কর্‌তে কর্‌তে সে মুক্তির সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘুরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে চলে গিয়েছে।

বিকেল হ'তে না হ'তে কিন্তু মুক্তির সে চেহারা বদ্‌লে গেছে। ইস্কুলের কাশ্মীরী কাপড়ওয়ালার কাছে কেনা লাল বেনারসীর টুক্‌রোটা ইতিমধ্যে হাল ফ্যাশানের জামায় পরিবর্ত্তিত হ'য়ে এসেছে। আজ সেটা "বুড়ো বয়সে" পর্‌তে মুক্তির একটুও লজ্জা বোধ হচ্ছে বলে মনে হয় না। তার বাবা সমস্ত ইণ্ডিয়ান ষ্টোর ঘেঁটে ঘুঁটে একটা লতা-পাড়ের লাল বুটিদার কোরা ঢাকাই কিনে এনেছেন, সেটাও মুক্তির অঙ্গে আজ উঠেছে। শিবেশ্বরের ইচ্ছা ছিল হাল্‌কা গোলাপী রঙের ফুলতোলা ক্রেপের শাড়ী জামা মেয়েকে পরান, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর মেয়ে এত আধুনিক শিক্ষা পেয়েও সাজসজ্জা সম্বন্ধে অনেক সেকেলে মতই পোষণ করে। অগত্যা মেয়ের আগ্রহে লালের ছোপ দেওয়া এই পোষাকেই তাঁকেও রাজি হ'তে হয়েছে। ছাগলের চামড়ার শাদা নরম এক জোড়া উঁচু হিল দেওয়া জুতো, লেসের মোজা আর বাঁশ প্যাটার্ণের এক জোড়া হ্যামিল্টনের দোকানের বালা আনা হয়েছিল, যদি মুক্তির পছন্দ না হয় ফেরৎ দেওয়া হবে। মুক্তি সেগুলো দেখে তার সুন্দর নাক মুখ এমন বিকৃত করে তুলেছিল, যে, শিবেশ্বর তৎক্ষণাৎ তা বিদায় দিলেন। আর কেউ হ'লে হয়ত একটু জোর জবরদস্তি কর্‌তে পার্‌তেন, কিন্তু মুক্তি এসব বিষয়ে তাঁর মতামত শিরোধার্য্য করে চল্‌তে মোটেই রাজি নয়, এবং কি জানি কেন শিবেশ্বরও আর সকলের উপর যে জোরটা চিরকাল ফলিয়ে এসেছেন, মুক্তির উপর সেটা ফলাতে তত ব্যগ্র নয়। মুক্তি চেঁচামেচি করে স্যাকরা-বাড়ী থেকে কেষ্টোদাসীর মত এক জোড়া কঙ্কণ গড়িয়ে এনেছে; এবং বাবাকে একটু রুষ্ট ও ঠাকুরমাকে একটু তুষ্ট করে খালি পায়ে আল্‌তাও পরেছে। ঘাড়ের উপর এলো খোঁপা আর শুভ্র কপালে আশীর্ব্বাদ-লিপির মত ঠাকুরমার হাতের চন্দন-রেখার মধ্যে একটি ছোট সিঁদুরের টিপ পরে সেকাল ও একালের প্রসাধনের সুন্দর সামঞ্জস্যে তার তরুণ অঙ্গের শ্রী আরো ফুটিয়ে তুলেছে।

এখনও নিমন্ত্রিতের দল এসে পৌঁছায়নি। কাজ কর্ম্ম সব ফুরিয়ে গেছে; কেবল জলখাবারের রেকাবি সাজানো বাকি। সেটাও ঠাকুরমা তাঁর খাস ঝির সাহায্যে শেষ করে ফেল্‌লেন বলে। মুক্তি রঙীন প্রজাপতির মত সেজে-গুজে লঘু গতিতে বাড়ীর সাম্‌নে বার বার এসে ঘুরে যাচ্ছে। তার সব আয়োজনই হয়েছে, অথচ তাকে দেখ্‌লে মনে হয়, কি যেন একটা বড় রকম ফাঁক রয়ে গেছে, যার জন্যে তার সাজটাকে সে কিছুতেই সম্পূর্ণ মনে কর্‌তে পার্‌ছে না। অথচ সেটা হবার আগেই পাছে নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধব এসে পড়ে এই ভয়ে সে মহাব্যস্ত। মনের মধ্যের এই আগ্রহ আর ব্যস্ততাটা সে নিজে যে খুব পরিষ্কার উপলব্ধি কর্‌ছিল তা নয়, কিন্তু তার চঞ্চল গতি আর ঈষৎ-উত্তেজনায়-আরক্ত মুখের ভাবে সেটা তার অজ্ঞাতেই দক্ষ শিল্পীর রেখাচিত্রের ইঙ্গিতের মত ফুটে উঠেছিল।

বাইরের ঘরের জান্‌লায় দাঁড়িয়ে মুক্তি যখন রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল, তখন দূরে রাস্তার বাঁকে দেখা গেল, শাদা উড়ুনির মধ্যে কি একটা জড়িয়ে একজন সাইকল্‌ চড়ে তাদের বাড়ীর দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে। রাস্তার বাঁকে মানুষটি উদয় হওয়া মাত্র মুক্তির চোখে পড়েছিল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। দু এক মিনিট পরেই জ্যোতি বাড়ীর সাম্‌নে এসে পড়্‌ল। তার উড়ুনির তলার ফুলের কোমল আভাও তার মুখের হাসির দীপ্তির মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মুক্তির আজ তাকে দেখে মুখের আগায় ঠাট্টার কথা জেগে উঠ্‌ছিল না, তবু পাছে সে এখনি একটা কিছু দুষ্টুমি করে, তাই মুক্তি আগেই কিছু বল্‌বার আগ্রহে বলে উঠ্‌ল, "আচ্ছা, তোমায় দেখ্‌লেই আমার কেন হাসি পায় বল্‌তে পার? তোমার সঙ্গে আমায় দেখন-হাসি পাতাতে হবে দেখ্‌ছি।"

জ্যোতিও উত্তরে প্রচুর হাস্যরসপূর্ণ কোনো কথা না বলে, উড়ুনির তলা থেকে শিথিল গ্রন্থিতে বাঁধা একগোছা ফুল পাতা দুই হাতে তার হাতে তুলে দিয়ে একবার তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বল্‌লে, "মনে থাকে যেন! জন্মদিনে দেখন-হাসি পাতালে, আর কেউ হাসির ভাগ চাইলে দেব না।"

জ্যোতির মুখে এ রকম অদ্ভুত এবং বুড়ো বুড়ো কথা মুক্তি কখনো শোনেনি। ঠিক কারণটা না বুঝেই, অকারণে একটু লজ্জিত ও বিস্মিত হয়ে সে ফুলের তোড়াটা দুই হাতে ধরে ছুটে ফিরে চলে গেল।

তার মধ্যে যে তরুণ প্রাণের স্রোত দিবারাত্রি কল্‌কল্‌

ছল্‌ছল্ করে বয়ে যেত, সে স্রোতে নিজেকে সে আনন্দে এমনভাবেই ছেড়ে দিয়েছিল যে, প্রাণের গভীরতার দিকে তার দৃষ্টি পড়্‌বার অবসর পেত না। নিজের কি পরের সম্বন্ধে তলিয়ে কোন কথা ভাব্‌বার মত স্থৈর্য্য কি গাম্ভীর্য্য তার আজ পর্য্যন্ত হয় নি। কিন্তু আজ জ্যোতির দৃষ্টি আর কথার ভিতরে যে একটা ভাব ফুটে উঠেছিল, সেটা একটু গভীর দিকেই মানুষকে টানে। মুক্তিও যেন বুঝি-বুঝি কর্‌ছিল, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। জ্যোতির একটা সামান্য কথায় এমন কি থাক্‌তে পারে, যার জন্যে তার মনের মধ্যে খট্‌কা লেগে যাবে এটা সে ভেবেই পাচ্ছিল না, এবং শেষে কিনা জ্যোতির কথা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, এই মনে করে তার রাগও হচ্ছিল না।

জ্যোতি ততক্ষণে সে মুল্লুক ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মুক্তি ত তার আগেই পিছন ফিরেছিল। কয়েক পা যেতে না যেতেই, পিছনকার পায়ের শব্দ শুনে মুক্তি ভাব্‌লে, তার কোনো বন্ধু নিশ্চয়ই এসে পড়েছে। কিন্তু তারা এমন নিঃশব্দে আস্‌বার পাত্র ত মোটেই নয়। এতক্ষণে কল-হাস্যে ও বাক্যস্রোতে ঘর তাহলে মুখর হয়ে উঠ্‌ত। নেহাৎ যদি চম্‌কে দেবার জন্যে নিঃশব্দেই আসে, তা হলেও মুক্তির চোখ টিপে ধরে, কিম্বা পিছন থেকে তার মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, একটা কিছু রঙ্গরসের সৃষ্টি কর্‌তই। মুক্তির মনে হোলো তবে নিশ্চয় জ্যোতি। জ্যোতিকে এইবার একটা খুব চোখা রকম ঠাট্টা করে, তাদের সহজ হাসির স্রোতটা আবার ফিরিয়ে আন্‌বে মনে করে, মুক্তি কথার খোঁজ কর্‌তে কর্‌তে মুখ ফেরাল। কথা কিন্তু তখন আস্‌তে নারাজ। তার বদলে মুখে লজ্জার রক্তিমাই ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল। আরক্ত মুখে ফিরে তাকিয়েই মুক্তি দেখ্‌লে, যে দাঁড়িয়ে আছে সে তার কোনো সখী ত নয়ই, জ্যোতিও নয়, সে ধীরেন। জ্যোতির কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ ধীরেনকে দেখে মুক্তির মুখটা আরো লাল হয়ে উঠ্‌ল, কারণ আজ ক'দিন ধরে নানা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে জ্যোতির সঙ্গে ধীরেনের গল্প মুক্তি অনেক করেছে; আবার এই সে দিন মুক্তিরই বিবাহ-প্রসঙ্গে ঠাকুরমা বোধ হয় এই ধীরেনের কথাই পেড়েছিলেন।

মুক্তি আরক্ত মুখ যথাসম্ভব স্বাভাবিক ও গম্ভীর করে ধীরেনের দিকে এগিয়ে এল; ধীরেন কিন্তু সেটা লক্ষ্য করেছিল; ভেবে পেলে না এই সুবেশা সুসজ্জিতা কিশোরীর তাকে দেখে হঠাৎ এত কি লজ্জার কারণ ঘট্‌তে পারে যাতে তার সুন্দর মুখখানি অমন রাঙা হয়ে উঠেছে। মুক্তি ত মোটেই গোঁড়া হিন্দুর ঘরের কনে বউ নয়। পুরুষমানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা তার নিশ্চয় ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস। কাজেই সেটা তার পক্ষে খুব সহজ হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা কোনো কালেই ধীরেনের জ্যোতির মত অভ্যাস নেই। তার আখ্‌ড়া ইস্কুল আর বই নিয়েই সে দিন কাটায়। আজ হঠাৎ একলা মুক্তির সাম্‌নে পড়ে যাওয়াতে, এবং তাকে ওরকম লজ্জিত দেখে, লজ্জায় সঙ্কোচে ধীরেনের মুখও লাল হয়ে গেল।

যা হোক, সে তাড়াতাড়ি সাম্‌লে নিয়ে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে মুক্তির হাতে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "আজ, কেন জানি না, দিদিমা আমায় বিকেলে জল খেতে নেমন্তন্ন করেছেন; আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।"

মুক্তি চিঠিখানা হাতে করেই বুঝ্‌ল, এটা তার ঠাকুর-মার জবানী চিঠি, তাদের বাড়ীর সরকারের লেখা। কাজেই ধীরেনের দিদিমা যে তারই ঠাকুরমা এ-বিষয়ে মুক্তির আর তিলমাত্রও সন্দেহ রইল না। সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "ওঃ আচ্ছা, আসুন, আমি আপনাকে ঠাকুমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

মুক্তি এগিয়ে চলেছে। ধীরেন পিছন-পিছন একটু অপ্রস্তুত মুখ করে যাচ্ছে আর ভাব্‌ছে,—জ্যোতিটা এলে বাঁচি, বাবা; নইলে আমার যে রকম বিদ্যের দৌড়, মেয়ে-দের সঙ্গে কথা বল্‌বারই মতন! সত্যি, মুক্তি আমায় না জানি কি বোকাই ভাব্‌ছে।

মুক্তি তাকে বোকা ভাব্‌ছিল কি বুদ্ধিমান ভাব্‌ছিল বলা শক্ত; কিন্তু আর একজন যে কি ভাব্‌ছিলেন, সেটা তখনই খানিকটা টের পাওয়া গেল। মোক্ষদা দেবীর ঘরের কাছে তারা পৌঁছিতেই ফুল-এসেন্সের গন্ধ আর পায়ের শব্দে তিনি বুঝ্‌লেন মুক্তি আস্‌ছে। খাবার সাজাচ্ছে সাজাতে বাইরের দিকে না তাকিয়েই তিনি মুক্তিকে

সম্বোধন করে বল্লেন, "ওগো কনে, অতিথ কুটুম্‌রা এল নাকি? আমি যে বরকে আস্‌তে লিখে দিয়েছি। তোর পছন্দ—"

মুক্তি বুঝেছিল ঠাকুরমা তাকে একলা মনে করেছেন। সে তাড়াতাড়ি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে' বাইরে থেকেই বলে উঠ্‌ল, "মা, তোমার সঙ্গে কে দেখা কর্‌তে এসেছেন দেখ।"

মোক্ষদা বেরিয়ে এসে ধীরেনকে দেখে বল্লেন, "ওঃ ধীরু! এস, এস, ঘরে এস, তুমি ত বাড়ীরই ছেলে। লজ্জা কিসের অত। আজ আমাদের মুক্তোর জন্মতিথি কিনা, তাই তোমাদের পাঁচজনকে নিয়ে একটু আনন্দ করা।"

ধীরেন ভেবে পেল না, মুক্তোর জন্মদিনে তাকে নিয়ে কি আনন্দ বর্দ্ধন হতে পারে এবং তাঁর নিমন্ত্রিত মুক্তোর বরটিই বা কে! সে মোক্ষদা দেবীকে প্রণাম করে তাঁর নির্দ্দিষ্ট একটা আসনে বসে পড়্‌ল। মুক্তি সেখান থেকে সরে গিয়ে জ্যোতিকে খবর দিয়ে এল, "দেখ গিয়ে তোমার ধীরেন এসেছে।"

জ্যোতি একটু বিস্মিত হয়ে, তারপর হেসে বল্লে, "কে নেমন্তন্ন করেছে তাকে? তুমি নাকি?"

মুক্তি খুব হেসে উঠ্‌ল, "হ্যাঁ, আমি না হলে আর কে কর্‌বে বল? আমি যে তার মস্ত একজন ভক্ত, তা জান না?"

(১৩)

ফাল্গুনমাসে যে এ রকম গরম কেন হবে, নিজের শোবার ঘরে বসে-বসে মুক্তি তার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। ঘরের দরজা জান্‌লাগুলো খুব ভাল করে বন্ধ করা এবং ঘরের বৈদ্যুতিক পাখাটা খুব জোরেই চল্‌ছিল, কিন্তু কিছুতেই মুক্তির ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল না। আসল কথা, তার মনের উত্তাপটা তখন এত বেশী যে শরীর ঠাণ্ডা হচ্ছে কি না সেটার দিকে লক্ষ্য তার তত বেশী ছিল না।

আজকে সকালে জ্যোতি যখন কলেজ যাচ্ছিল, মুক্তি তখন তাকে বল্‌তে গিয়েছিল সে যেন একটু সকাল-সকাল বাড়ী আসে। কারণ সে আজ বাবার কাছে মোটরখানা চেয়ে রেখেছে, হয় এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পিক্‌চার-প্যালেসে নয় হিপোড্রাম্ সার্কাসে তাকে নিয়ে যেতেই' হবে। জ্যোতি তখন আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে চুলের কোঁকড়া গোছাগুলো ঠিক কায়দায় কপালের উপর নেমে এসেছে কি না, তারি তদারক কর্‌ছিল। মুক্তির কথায় তাড়াতাড়ি একবার মুখ ফিরিয়ে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমার ত আর কোনো কাজ নেই, তোমাকে রোজ ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়াই। আমার আজ অন্য কাজ আছে, আঃ জ্বালালে তুমি!"

মুক্তি গট্‌গট্ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে বাড়ী আসার পর মোটে চারদিন বিকেলে জ্যোতি তাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে আবার দুদিন নিজে সেধে, মুক্তি মোটেই যেতে চায়নি। তাইতে কথা শোনাবার ঘটা দেখ না? যেন জ্যোতির সঙ্গে না বেড়ালে তার আর রাতে ঘুম হবে না! জীবনের এতগুলো দিন যদি তার জ্যোতির অমূল্য সঙ্গ বিহনে কেটে গিয়ে থাকে, তাহলে বাকি কটা দিনও কাটবে। মুক্তির মন খুব শক্ত, সে অমন কারুর বন্ধুত্ব যেচে বেড়ায় না। জ্যোতিটাই ত ঘাড়ে পড়ে' সারাক্ষণ গল্প করে' তার পড়াশুনো মাটী করে।

এই রকম বৈরাগ্য-বারিধিতে হাবুডুবু খেতে খেতে মুক্তি শোবার ঘরে গিয়ে পৌঁছল এবং তার মন যে বাস্তবিকই খুব শক্ত সেইটা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে জ্যামিতির বইখানা কোলের উপর রেখে চেয়ারে বসেই কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

এ বাড়ীতে লোকের সংখ্যা অল্প হলেও খাওয়া-দাওয়া চুক্‌তে দেরি হয় ঢের। বাড়ীর প্রত্যেকেরই আলাদা সময়ে খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিকে কলেজ যেতে হত, কাজেই সে নটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে, ডাল ভাত নামধারী খানিকটা জলন্ত কয়লারই মত সহজভোজ্য জিনিস মুখে পুরে, ঢক্ ঢক্ করে জল গিল্‌তে গিল্‌তে উঠে পড়্‌ত; শিবেশ্বর প্রাতরাশ খেতেন এত বেলায় যে তাঁর দুপুরের খাওয়াটা প্রায়ই বিকেলে গিয়ে ঠেক্‌ত। ঠাকুরমা খেতেন বেলা দুটোয় এবং মুক্তিকে বকে বকে যখন খাওয়ানো যেত সে তখনই খেত।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেই মুক্তি বুঝ্‌ল যে সম্ভবতঃ ঠাকুরমা তাকে তাগাদা দেবার জন্যে উঠ্‌ছেন। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সে মন দিয়ে জ্যামিতির আলোচনা আরম্ভ কর্‌ল।

মোক্ষদা দেবী ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই

মুক্তি বলে উঠল "আচ্ছা মা, আমার পড়ার সময় এসে না বাধা দিলে কি তোমাদের চলে না?"

তার ঠাকুরমা হেসে বললেন "বাধা না দিলে যে তোমার খাওয়া-দাওয়া সব মাথায় ওঠে।"

এ কথায় কাঁদবার কিছু ছিল না, কিন্তু মুক্তির দুই চোখ বেয়ে জল ঝরতে আরম্ভ করল, সে কাঁদতে কাঁদতে বললে "বাড়ীর সবাই মিলে আমার পড়া মাটী করবে, আর বকুনি দেবার বেলা বাবা শুধু আমায় দেখতে পান। আমি আজ কখখনো খাব না।"

মোক্ষদা দেবী অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বললেন "আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে বাপু তুই। কি বলেছি যে চোখে অমনি বান ডেকে গেল? এই পানসে চোখ নিয়ে খিষ্টানী ইস্কুলে এতদিন ছিলি কি করে?"

খাওয়া-দাওয়ার পরও মুক্তির রাগ কমবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে ঘরের দরজা বন্ধ করে এতদিনের উপেক্ষিত পাঠ্য বইগুলো স্থান অস্থান থেকে টেনে বার করে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলল। তারপর পাঁচ মিনিট অন্তর একখানা বই বদলে পড়া আরম্ভ করল।

কিন্তু পড়াটা বেশ একটানা চলছিল না। মুক্তি প্রায়ই উঠে গিয়ে জানলার খড়খড়ি তুলে বাইরের রৌদ্রতপ্ত মূর্তিখানা দেখে আসছিল। যে গরম, বাপ্ রে, কতক্ষণে রোদটা যে পড়বে!

রোদ যথাসময়েই পড়ে এল; মুক্তি উঠে জানলাটা খুলে দিল। আঃ, কেমন হাওয়া আসছে! মুক্তি দাঁড়িয়ে হাওয়াটা উপভোগ করতে লাগল। রোদ পড়ে এলেও এখনও গরমের ঝাঁঝ মরেনি, মাটীর প্রতি কণা এখনও উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

উড়ে মালীটা দীর্ঘ দিবানিদ্রার অবসানে হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এল। গামছাখানা কোমরে গেরো দিয়ে বেঁধে টীনের ঝাঁঝরি নিয়ে গাছে জল দিতে আরম্ভ করল। তা হলে এখন নিশ্চয়ই চারটে বেজে গিয়েছে, তা না হলে বেরবার পাত্র মালী নয়।

টিং-টিং-টিং! মুক্তি চমকে গেটের দিকে মুখ ফেরাল। এই যে মহা কাজের লোক মিঃ জ্যোতির্ম্ময় রায় আসছেন। মুক্তি চট্ করে জানলার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। যে অহঙ্কেরে ছেলে! ঠিক ভাববে ওকে দেখবার জন্যেই মুক্তি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাস্তবিক ছেলেগুলোর মত একাধারে এমন বোকা আর এমন অহঙ্কেরে জীব খুঁজে বের করা দায়।

সাইকলখানা যথাস্থানে রেখে জ্যোতি এক এক লাফে দু তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করল। এক নিশ্বাসে উপরে উঠে নিজের ঘরে বইখাতাগুলো ঝুপ্ করে ফেলে সে মুক্তির ঘরের সামনে এসে হাজির হল।

মুক্তির ঘরের দরজা ভেজানো। ঠক্ ঠক্ করে দরজায় আঙুল দিয়ে কয়েক ঘা দিয়ে জ্যোতি চেঁচিয়ে বললে, "এই মুক্তি, শিগ্গির 'রেডী' হয়ে নাও। আমি বাবুলালকে গাড়ী ঠিক করতে বলে এসেছি। আমার নিজের ত পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না, তোমারই লাগবে দু ঘণ্টা সাজ করতে, সময় থাকতে আরম্ভ কর না কেন?"

ঘরের ভিতর সাড়া শব্দ নেই। জ্যোতি মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থেকে আবার ডাক দিল "এই মুক্তি!"

ভিতর থেকে অত্যন্ত ধীর শান্তস্বরে জবাব এল "কি? তোমার কিছু দরকার আছে?"

"বেশ, আমার দরকার আবার কি? তুমি না বেড়াতে যাবে? সেটা কার দরকার শুনি?"

ঘরের দরজাটা খট্ করে খুলে গেল। জ্যামিতি হাতে মুক্তি বেরিয়ে এসে বললে, "কৈ বেড়াতে যাবার কিছু ত ঠিক নেই? বাবা ত কখন্ বেরিয়ে চলে গিয়েছেন, এখন আবার কার সঙ্গে যাব?"

রোদে এতটা পথ প্রাণপণ জোরে সাইকল্ চালিয়ে এসে, জ্যোতির মেজাজটাও কিঞ্চিৎ চড়ে গিয়েছিল। সে রেগে বলে উঠল, "বাবার সঙ্গে যাবে ত আমাকে এত ভোগালে কেন? তোমার জন্যে আমি এই রোদে ছুটে মরলাম! মেয়েদের যদি কিছু কথার ঠিক আছে!"

মুক্তি ত একেবারে রেগেই আগুন! বইখানা খাটের উপর ছুড়ে দিয়ে, দুই হাতে কপাটটা চেপে ধরে বলে উঠল, "আর তোমরা খুব সাধু, তোমাদের কথার খুব ঠিক! কোন্ মুখে বলছ যে আমি তোমায় ভোগালুম? সকালে একবার তোমায় বলতে গিয়েছিলুম বলে আমায় কি না বললে? তাকে নাকি বেড়াতে যাওয়ার ঠিক করা বলে?

কে তোমায় আস্‌তে বলেছিল? আমি কিছুতেই আজ যাবো না।"

ঘরের দরজাটা প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। জ্যোতিও নিজের মেজাজটা সপ্তমে চড়িয়ে খুব জোরে জোরে পা ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

সূর্য্যটা ক্রমে একটা লাল টকটকে আগুনের চাকার মত হয়ে আকাশের নীল সাগরের কোলে ডুব মার্‌তে চল্‌ল। দরজার দিকে পিঠ করে মুক্তি চুপ করে বসে রইল। জ্যোতি যে তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে এমন প্রচণ্ড রোদে এতদূর সাইক্‌ল্‌ ছুটিয়ে এসেছে আর সে তাকে বকে তাড়িয়ে দিলে, নিজের এই হৃদয়হীনতার লজ্জায় মুক্তির মন ভরে উঠেছিল। জ্যোতি সেই এল, মিছিমিছি সকালবেলা মুক্তিকে রাগিয়ে দিলে। এক-একবার অনুতাপের প্রাচুর্য্যে তার ইচ্ছে কর্‌ছিল যে গিয়ে জ্যোতিকে ডেকে আনে, আবার তার পরের মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল দোষ যখন আসলে জ্যোতির, তখন তারই এসে মুক্তিকে সাধা উচিত।

বিধাতা মুক্তির মনের ইচ্ছাটাই সফল করে দিলেন। জ্যোতি পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুক্‌ল, মুক্তি নিজের ভাবনায় এত ব্যস্ত যে সে তা বুঝ্‌তেও পার্‌লে না।

হটাৎ পিছন থেকে তার দুই কাঁধে হাত দিয়ে একজন কে বেশ একটা মাঝারি গোছের ঝাঁকড়ানি দিয়ে দিলে। সে চম্‌কে পিছন ফির্‌তেই জ্যোতি বলে উঠ্‌ল "চল্‌ চল্‌, আর অভিমান কর্‌তে হবেনা। ওঠ শিগ্‌গির, তা না হলে ভয়ানক দেরি হয়ে যাবে।"

মুক্তি তখন প্রায় পরাজয় স্বীকার করাটা স্থির করে ফেলেছে; তবু একবার একটু শেষ বিদ্রোহের চেষ্টা করে বল্‌লে "আমার জন্যে তোমার অত ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে হবে না। তোমার কত সব কাজ আছে কর গিয়ে, আমি আর একদিনও তোমায় জ্বালাতে যাব না।" কথাগুলো খুব গুরুগম্ভীর হলেও যে মহিলা সেগুলো উচ্চারণ কর্‌লেন, তাঁর যদি রাঙা ঠোঁট ফুলে ওঠে, আর চোখে জল ভরে আসে, তা হলে কথার গুরুত্ব খানিকটা যে নষ্ট হয়েই যায়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

জ্যোতি পিছন থেকে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল; দুই হাতে মুক্তির মুখখানা তুলে ধরে বলে উঠ্‌ল, "লক্ষ্মীটি এস, আমি মেনে নিচ্ছি আমারই দোষ হয়েছিল। সেদিন যে কালো শাড়ীটা পরে বাগানে গিয়েছিলে সেইখানা পোরো। আমাদের ক্লাসের অময়টা আজ এলফিন্‌ষ্টোনে যাবে, বোকাটার বিশ্বাস লেখা পড়া শিখ্‌লে মেয়েরা দেখ্‌তে বিচ্ছিরি হয়ে যায়, আজকে থাক্‌বে এখন হাঁ করে!"

এর পর না ওঠা অসম্ভব। মুক্তি কালো শাড়ীর সন্ধানে মস্ত বড় ট্রাঙ্ক খুলে, তার সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে বসে পড়্‌ল, জ্যোতি জয়ের আনন্দে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মুক্তিকে একলা জ্যোতির সঙ্গে বেড়াতে যেতে দেওয়াটা যে ঠিক সমাজের আইন-সঙ্গত নয়, এ কথাটা শিবেশ্বরের মাথার ভিতরে ঢোকানো শক্ত ছিল। তাঁর পরিচিতা একজন আইনজ্ঞা মহিলা এবিষয়ে সাবধান কর্‌বার চেষ্টা করাতে তিনি বলেছিলেন যে জ্যোতির সঙ্গেই তিনি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে মেয়েকে পাঠাতে পারেন, কারণ তাকে তিনি যতটা জানেন, ততখানি আর কোনো পুরুষমানুষকে এখন পর্য্যন্ত জানেন নি।

জ্যোতি আর মুক্তি এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পিক্‌চার-প্যালেসের সাম্‌নে গাড়ী থেকে নাম্‌বামাত্র মুক্তি বলে উঠ্‌ল "ঐ দেখ মিসেস্‌ ঘোষ চপলাদিদিদের নিয়ে এসেছেন।"

কথাটা যাঁদের সম্বন্ধে বলা তাঁদের কানে বোধ হয় গিয়ে পৌঁছেছিল। একজন সুবেশা তরুণী এগিয়ে এসে বল্‌লেন "কিরে মুক্তি, অনেক দিন তোকে দেখিনি।"

তাঁর কালো ধাঁদা মোটা মাও প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই নিজের চক্রাকার চশমিত মুখখানা ফিরিয়ে হেড্‌মাষ্টারী সুরে বলে উঠ্‌লেন, "কি, মুক্তি যে! কার সঙ্গে এলে?"

মুক্তি সংক্ষেপে উত্তর দিল "জ্যোতির সঙ্গে।"

"ও, তোমার বাবা আসেন নি দেখ্‌ছি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে বস্‌বে চল।"

মুক্তি হাঁ না কিছু বল্‌বার আগেই জ্যোতি জনান্তিকে বলে নিল "এই জ্বালালে দেখ্‌ছি! সারাক্ষণ আমাকে দিয়ে গল্পটা বলিয়ে নেবে আর কি!"

সকলে সদলে ভিতরে ঢুকে পড়্‌ল! জ্যোতি অনেক কায়দা করে মুক্তির পাশের চেয়ারখানা দখল করে বস্‌ল।

মুক্তির পরেই ছিলেন চপলা, তাঁকেও সুন্দরী বলা চলে। চেয়ারে বসেই জ্যোতি চারদিকে একবার চট্ করে তাকিয়ে নিল। অদূরে তার অমর নামক বন্ধু যে তার পাশের ব্যক্তিকে জ্যোতি সম্বন্ধেই কিছু খবর দিচ্ছে, এ বিষয়ে তার সন্দেহমাত্র ছিল না; কিন্তু সে এমন মুখ করেই বসে রইল, যেন পৃথিবীতে তার সম্বন্ধে বক্তব্য অমরের কিছুই থাকতে পারে না, কারণ সে অতি সাধারণ মানুষ।

দু ঘণ্টা বসে বসে জ্যোতি বায়োস্কোপই বেশী দেখেছিল না নিজের বন্ধুবর্গের মুখই বেশী দেখেছিল তা বলা শক্ত। মুক্তির ওসব কোন বালাই ছিল না, সে আর চপলা গল্পের নায়িকার সুখ দুঃখ নিয়েই একেবারে মেতে গিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পরস্পরকে ফিস্‌ফিস্ করে অনেক কিছু বলে নিচ্ছিল।

বায়োস্কোপওয়ালারা শুভরাত্রি জ্ঞাপন করবামাত্র সবাই হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। মিসেস্ ঘোষ ধীরে সুস্থে কেতাদুরস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াবার আগেই জ্যোতি মুক্তিকে ডেকে নিয়ে চট্ করে বেরিয়ে গেল।

মুক্তি বাইরে এসেই বিস্মিত হয়ে বললে "অত জোরে ছুটে পালিয়ে এলে কেন?"

"পালাব না ত কি? এখন মিসেস্ ঘোষের পাল্লায় পড়লেই গিয়েছিলাম আর কি! শ্যামবাজার অবধি না ঘুরিয়ে ত কিছুতেই ছাড়ত না, তারপর বাড়ী পৌঁছতাম গিয়ে রাত বারোটায়। এই যে ধীরেন, তুমি কোথেকে?"

ধীরেন মুক্তির সামনে পড়ে একটু লজ্জিত ভাবে উত্তর দিল, "কোথেকে আর, মেস্ থেকে একদল এল, আমাকেও ধরে নিয়ে এল।"

"ট্রাম ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যাবে কি করে?"

"কেন হেঁটেই যাব, কতটাই বা দূর?"

জ্যোতি বলে বসল "তার চেয়ে চল না তোমাকে খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে যাই। আমাদের কিছুই ঘুর হবে না, তোমার অনেকখানি হাঁটা বেঁচে যাবে।"

মুক্তির সঙ্গে একগাড়ীতে যাওয়ার প্রস্তাবে ব্যস্ত হয়ে ধীরেন বললে "না না, থাক, কি দরকার!"

জ্যোতি বললে, "না কেন? মুক্তির সঙ্গে ত তোমার আলাপ আছে, না মুক্তি? মুক্তিতে আমাতে তোমার গল্পও প্রায়ই হয়।"

মুক্তি হেসে বললে "আছে বৈকি, সেই যে আমার জন্মদিনের দিন গিয়েছিলেন? চলুন না ধীরেন বাবু।"

ধীরেন আর আপত্তি না করে গাড়ীতে উঠে বসল। সারাপথ জ্যোতি বক্তৃতা করতে করতে চলল। ধীরেন হাঁ, না, ছাড়া আর কোন কথাই বললে না। ধীরেনের লজ্জা দেখে মুক্তি একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিল; তার কেবলি মনে হচ্ছিল "জ্যোতি যে কি করে তার ঠিক নেই। অত করে ওকে না ধরে আনলেই কি চলছিল না? ছেলেটা যে কি ভাবল তার ঠিক নেই।" এই ভাবনাটা তাকে এতই ব্যস্ত করে তুলল যে সে নীরব হয়ে থাকার গুণে ধীরেনকেও হারিয়ে দিলে।

বড় রাস্তার মোড়ে ধীরেনকে নামিয়ে দিয়ে তারা ভবানীপুরের রাস্তা ধরল। জ্যোতি বলে উঠল, "যা হোক মুক্তি, তুমি ঠিক মিসেস্ ঘোষের ছাত্রী হতে পারবে, ধীরেনটার সঙ্গে একটা কথাও বললে না। আইনসঙ্গত ভাবে পরিচয় করে দেওয়া হয়নি বলে বুঝি?"

মুক্তি চটে বলে উঠল, "যাও যাও, তোমার আর বক্তৃতা করতে হবে না, যা না তোমার বুদ্ধি! ওকে যে কেন ডাকলে তার ঠিক নেই, একটুও ইচ্ছে ছিল না তার আসবার। দেখো এখন, আমাদের নামে কি বলে।"

মেয়েদের যে কি রকম সঙ্কীর্ণ মন, এবং সামাজিক অঙ্ক আইনের প্রতি কতখানি অন্ধ ভক্তি এবং ছেলেরা যে কিরকম বোকা অথচ নিজেদের এক একটি বিংশ শতাব্দীর সোক্রেটীস্ বলে মনে করে, এই বিষয়ে গভীর আলোচনা করতে করতে তারা বাড়ী গিয়ে পৌঁছল।

মিসেস্ ঘোষ ঠিক করে রেখেছিলেন যে মুক্তিদের মোটরখানায় অন্ততঃ চপলা আর খোকাকে তুলে দিতে হবে। মিঃ গাঙ্গুলীরই না হয় কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই—তা বলে, তিনি একজন অল্পবয়স্কা মেয়েকে ত একটা ছেলের সঙ্গে চোখের সামনে ছেড়ে দিতে পারেন না? কিন্তু বেরিয়ে দেখলেন তাদের কোনো চিহ্নই নেই। তাঁকে যে দুখানা গাড়ী ভাড়া করতে হল, এতে তিনি মুক্তির উপর মর্মান্তিক চটে গেলেন। (ক্রমশ)

শ্রীসংযুক্তা দেবী।

শ্যামলী

১৩

মাতার ঘন ঘন অসুস্থ হওয়ার সংবাদে সেবার বিজলী একটু শীঘ্রই পিত্রালয়ে আসিল। শিশিরই তাহাকে রাখিতে আসিয়াছিল।

শিশির আসিলে শ্যামলী আনন্দে অধীর হয়, এবারও হইল, কিন্তু কেমন যেন ততখানি স্ফূর্ত্তি প্রাণে আসিল না! যে তুচ্ছ রসিকতাগুলা তার সম্বল, তার একটাও সে এবার করিতে পারিল না, বেশী হাসিতেও যেন পারিল না। শিশির তাহার এই ভাবান্তরে দু-একবার শ্যামলীর পানে চাহিল।

বিজলী শ্যামলীর প্রতিদিনের নাড়াচাড়ার সেই চিত্রগুলা দেখিল, প্রশংসায় তাহার চোখও উজ্জ্বল হইল বটে কিন্তু তারপর সেই ফটোখানা হাতে পড়িতেই সে গম্ভীরমুখ করিয়া সেখানা কতক্ষণ দেখিল। যখন সেখানা বিজলী মাতার কাছে ফিরাইয়া দিল তখন তাহারো মুখে তাহার মাতারই মতন কাতরতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ মাতা ও ভগ্নীর মুখের এ কাতরতার চিহ্ন অজ্ঞাতে শ্যামলীকেও যেন একটু কাতর করিল। সেও মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিজলীর বর শিশির। সে যে কতবার আসে, কত আনন্দ করে, বিজলী তাহাকে দেখিলে লজ্জায় ছুটিয়া পলায়, ঘোমটা দেয়, কিন্তু আড়ালে সে শিশিরের সঙ্গে কত হাসে, নানা ছলে কত নিকটে যায়, দুজনে চোখোচোখি হইলেই তাহাদের মুখে চোখে কি হাসির লহর খেলিয়া যায়, কি আনন্দের আলোই ফুটিয়া উঠে! শ্যামলী এবারে এগুলো লক্ষ্য করিতেছিল আর তাহার সেই লোকটাকে মনে পড়িতেছিল। সেও যখন তাহার বর—তখন সেই বা এমন করিয়া আসে না কেন? পাড়ায় যে যে মেয়েকে সে জানিত, তাহাদের বিবাহ এবং বিবাহের অব্যবহিত পরে পিত্রালয়ে বাসের সময়ে তাহাদের বরের সহিত প্রথম পরিচয়ের এইরূপ কিশোরীলীলা যাহা শ্যামলী দেখিয়াছে সেই ছবিগুলা যে এখন তাহার স্মৃতির দর্পণে ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে! তখন সে মূঢ়ের মত কেবল দেখিয়াই গিয়াছে, অর্থও বোঝে নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ বিজলী ও শিশিরের প্রত্যেক দৃষ্টি প্রত্যেক ভঙ্গী প্রত্যেক হাসি তাহার অন্তরে নিখিলের নরনারীর এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধের রহস্যোদ্ভেদ করিয়া দিতেছিল। এই জগতে সকলকে দেখিয়া তো সকলে অমন হয় না, এমন হাসে না, এমন ভাবে চায় না! কেবল মাত্র দুইজন—তাহারা দুটি বর বৌ—যাহারা শিশির আর বিজলীর মত দুটি, তাহারাই পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া এমন হয়! শ্যামলী লক্ষ্য করিতেছিল—বিজলীর সমস্তটাই যেন সর্ব্বদা শিশিরের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে রুগ্না মাতার সেবা করিতেছে, পিতার তত্ত্বাবধান করিতেছে, তবু শিশিরের পান জল এবং যখন যাহা প্রয়োজন তাহার দিকে যেন তাহার স্থির লক্ষ্য আছেই। শুধু কি তাই? শিশিরের জন্য যখন বিজলী কাজ করিতেছে তখন শ্যামলী অবাক হইয়াই বিজলীর মুখের পানে চাহিত। সে সুন্দর মুখে তখন কি যে একটা ভাব দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিত তাহা শ্যামলী বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার মনে পড়িল, যখন শিশির না থাকে তখন তো বিজলী এত আনন্দের বিজলী খেলাইয়া এমন করিয়া বেড়ায় না। এই যে তাহার চোখ—সর্ব্বদা যেন শিশিরের চোখের দৃষ্টির প্রতীক্ষাতেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চঞ্চল, আবার তখনি চোখাচোখি হইবা মাত্র আনন্দে সুখের লজ্জায় স্থির, বিভোর হইতেছে। অকারণে ওষ্ঠে হাসি লাগিয়াই আছে, বিজলী যেন একটা অসীম সুখে সর্ব্বদা ডুবিয়াই রহিয়াছে! এমন ভাব তো শিশির এখানে না থাকিলে তাহার থাকে না। শ্যামলী বুঝিতে পারিতেছে, শিশির আসিয়াছে বলিয়া, সে নিকটে আছে বলিয়া, তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছে বলিয়াই বিজলীর এত সুখ। শিশির যে বিজলীর বর! শ্যামলীরও তো বর আছে। সেই, সেই লোকটি, যার কাজ আর কয়টা দৃষ্টি শ্যামলীর এখনি বেশ উজ্জ্বল ভাবেই মনে পড়ে। সে যখন তার বর তখন সেও কেন আসে না? তাহা হইলে বিজলীর মত—পাড়ার তাহার চেনা মেয়েদের মত—সেও এমনি করিয়া বুঝি হাসিতে সাজিতে কাজ করিতে পারিত। এদের মত এমনি আনন্দই বুঝি তাহারও হইত। কিন্তু আসে না—সে তো কৈ আসে না! কেন আসে না?

ঐ যে ছবিগুলা, সেই পাঠাইয়া দিয়াছে—তাহাকেই

দিয়াছে, কিন্তু কেন? যদি সে আসিবেই না তবে কেন পাঠাইয়াছে? ভয়ানক রাগ হইতেছে। আর শ্যামলী ও-ছবিগুলা লইবে না—দেখিবে না, না কিছুতেই না। একদিন বেশ করিয়া ওগুলি ছিঁড়িয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিবে, যদি কখনো সে আসে তাহাকে দেখাইবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে শ্যামলীর একটা নিশ্বাস বহিল, সে যদি আর না আসে।

তাহার ছবি মার কাছে আছে—মার বাক্‌সের ভিতর। বের করে নিলে মা যদি জানিতে পারেন? এ চিন্তায় শ্যামলীর অন্তরটা কেমন যেন কুঁক্‌ড়াইয়া গেল। কেহ চাহিলে দেখিতে পাইত লজ্জায় তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। না, মা জানিতে পারিলে লইতে পারিব না—কিছুতেই না।

কিন্তু শ্যামলী নিজেই অবাক হইয়া দেখিল একদিন সে মাতার অজ্ঞাতে ছবিখানা বাহির করিয়া লইয়াছে! বার বার মনে হইল রাখিয়া দৈয়—মা জানিলে তাহার বড় কেমন বোধ হইবে—না, তাহা সে সহ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু তবু একবার লুকাইয়া ছবিখানা ছাতে লইয়া না গেলেই তো নয়! শ্যামলী যাহা অনুভব করিত, ভাবিত, ছাতে বসিয়া তাহা বার কত উল্‌টপাল্‌টি করিয়া চিন্তা না করিলে, সেটা ভাল করিয়া তাহার বোধগম্য হইত না।

এই ছবি তার? এম্‌নিই তো সে। ঠিক। এই চোখ, এই মুখ—এই দৃষ্টি, এম্‌নি চেহারা—ঠিক সেই বটে! কিন্তু যখন মানুষটাকে শ্যামলী দেখিয়াছিল তখন তো এমন লাগে নাই? বরং কত রাগ কত বিরক্তি কত অবিশ্বাসই আসিয়াছে। একদিনও তো চোখ তুলিয়া লোকটা কেমন তাহা দেখিতেও ইচ্ছা করে নাই। আজ তাহার ছবিটামাত্রও দেখিতে এমন লাগিতেছে কেন? ভাল? ভাল কি মন্দ তাহা শ্যামলী জানে না—কিন্তু আর কোন ছবি দেখিয়া জীবনে তো তাহার এমন বোধ হয় নাই। সেদিন যে কত সুন্দর সুন্দর ছবি সে পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাহা দেখিয়া, তাহা পাইয়া শ্যামলীর যেমন আহ্লাদ হইয়াছিল এ ছবি দেখিতে তো তেমন কিছু আনন্দ হইতেছে না, অথচ যাহা হইতেছে তাহা বুঝি শ্যামলীর অনমুভূতপূর্ব্ব বস্তু! শ্যামলীর এই ছবি দেখা পাছে কেহ দেখিতে পায় সে লজ্জাতেও শ্যামলী অন্তরে অন্তরে কুণ্ঠিত হইতেছে। চোরের মত মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাহিতেছে, অথচ না দেখিয়াও তো থাকিতে পারিতেছে না। তার মুখ এম্‌নি? এই ছবির মত? এত সুন্দর? আর চোখ? চোখের কথা মনে নাই, কিন্তু দৃষ্টি—হাঁ, দৃষ্টিটা শ্যামলী বেশ চিনিতে পারিতেছে। এম্‌নি বটে। এম্‌নি তা যেন অন্তরের মধ্যে ঢুকিয়া পাষাণকেও গলাইয়া ফেলে! এ দৃষ্টি তো শ্যামলী কয়বার দেখিয়াছিল—দেখিয়া যেন তাহার উদ্ধত হৃদয় সহসা এক-একবার থম্‌কিয়া গিয়াছিল—কিন্তু এমন করিয়া তো তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই!

কতক্ষণ কাটিয়া গেল তবু শ্যামলীর আজ ছবিখানা দেখা শেষ হইল না। কিন্তু পাছে মাতা ভগ্নী তাহার সেই ছবি দেখা ধরিয়া ফেলে সেজন্য আর বেশীক্ষণ সে ভাবে থাকিতেও সাহস করিল না। ছবিখানা যথাস্থানে রাখিয়া বিমনা ভাবে অন্য কার্য্যে চলিয়া গেল। কিন্তু পরদিনই আবার ছবিখানা তেম্‌নি করিয়া ছাতে লইয়া গেল। মা-বোনের সাম্‌নে কুণ্ঠার ভাবও তার বেশী দিন স্থায়ী হইল না। শাশুড়ীর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য শিশির বিজলীকে রাখিয়া চলিয়া গেল। এই বিচ্ছেদে বিজলীকে যে কিরূপ কাতর করিয়াছে শ্যামলীর তাহা বুঝিতে একটুও এবার বাকী থাকিল না। সে উৎসুক নেত্রে ভগিনীর প্রত্যেক ভাবকে লক্ষ্য করিত। বিজলী যখন উন্মনা ভাবে কোথাও বসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত শ্যামলী বুঝিত সে শিশিরের কথা ভাবিতেছে। যেদিন শিশিরের পত্র আসার সম্ভাবনা থাকে সেদিন বিজলীর উন্মনা ভাব শতগুণে বৃদ্ধি পায়, সে যেন প্রভাত হইতে পথেই দাঁড়াইয়া থাকে, শতবার ঘর আর বাহির করে। তারপরে ব্যাগ ঘাড়ে একটি লোক দ্বারের নিকটে আসিয়া একখানা লেখা খাম ফেলিয়া দিয়া যায় আর বিজলী যে কি করিয়া সেই খামখানা কুড়াইয়া লয়—খামের ভিতর হইতে কত আঁচড়-পাঁচড়-কাটা একটা সাদা কাগজ বাহির করিয়া লইয়া চোখের নিকট ধরে আর তাহার মুখ শিশিরের চোখের সাম্‌নে যেমন সুখে আনন্দে জল্‌জল্ করিতে থাকে তেমনি জল্‌জলে হইয়া উঠে। শ্যামলী অবাক্ হইয়া তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখে। শিশির এই কাগজখানায়

এমন কি পাঠাইয়াছে (এবং কি প্রকারেই বা তাহা পাঠাইল) যাহা পাইয়া বিজলী এমন আনন্দ বোধ করিতেছে! মানুষটাকে দেখিতে না পাইলেও, নিকটে না পাইলেও এইরূপ এক-একখানা কাগজ আসিয়া কি এম্‌নি করিয়া সব দিতে পারে? শিশির যেমন বিজলীর দূরে আছে, তেম্‌নি শ্যামলীর স্বামীও তো দূরে আছে, তবে সেও কেন শ্যামলীকে অন্ততঃ এইরূপ একখানা একখানা কাগজও পাঠায় না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্যামলীর আবার কেমন যেন নিজেকে কোন একটা কিছুর অভাবগ্রস্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। ঐরূপ এক-একখানা কাগজ পাইলে সে কি বিজলীর মত অম্‌নি তাহাতে সব পাইবে? না, তাহা তো সে পাইতে পারিবে না। কাগজের আঁচড়-পাচড় কি আনিতে পারে তাহা তো সে এখনও বুঝিতেই পারিতেছে না। ঐ ছবিখানায় যাহা আছে তাহা কি একটা কাগজের আঁচড়ে থাকিতে পারে? বিজলীর কাছে আছে—কিন্তু তাহার কাছে যে নাই! তাহার কি যেন নাই—তাই তাহার সকলের মত সব পাওয়া ঘটে না, দেওয়াও চলে না—কিন্তু কি নাই,—কিজন্য নাই? কিসের তার অভাব যার জন্য সে সকলের মত নয়? সকলের মত সহজে সে যে নিজের ভাব অন্যকে জানাইতে পারে না এবং অন্যেও তাহাকে বুঝাইতে ক্লেশ পায় তাহা সে এখন বুঝিতে পারে। মাত্র ঠোঁট নাড়িয়া তাহারা পরস্পরের ভাব বুঝে, কিন্তু তাহাকে কিছু বুঝাইতে হইলে তাহারা বিব্রত হইয়া পড়ে। আছে, তাহার কি একটা গভীর অভাবই আছে। তাই সেও কখানা ছবি পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত, একবার আমার কথা বুঝি মনেও করে না!

দিন যে এমন করিয়া আর যায় না। যেন কিসের একটা প্রতীক্ষায় তাহারও অন্তর-বাহির সর্ব্বক্ষণই উতলা হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু কিসের প্রতীক্ষা তাহাই যে সে জানে না। কিই বা সে এমন পাইয়াছে এবং কিই তাহার পাইবার আছে? কিন্তু আছে আছে! তাহার দিবার এবং পাইবার কিছু এমন আছেই যাহার অস্তিত্ব তাহার অন্তরে দিন দিন পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে। কেবল-মাত্র ফটোখানা দেখিয়া আর তাহার দিন কাটে না। অবশ হস্ত হইতে সেখানা কেবলই পড়িয়া যায়, চক্ষু আর দেখার সুখে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না,—অনির্দ্দিষ্টভাবে শূন্যে চলিয়া যায়। তাহার চিরদিনের মাতৃকোল—এই রূপ-রসগন্ধময়ী প্রকৃতি—তাহার এ অভাব যে আর এখন পূরণ করিতে পারে না—জড়ের মত চাহিয়া থাকে মাত্র। আর তাহার ভাষাহীন শব্দজ্ঞানহীন মূক হৃদয় কেবল কাঁদিয়া ফিরে। যে একটা অভাবের আভাষ বুদ্ধির দ্বারা ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিতেছিল এ অভাব তো তাহার মত ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করার বস্তু নয়! এ যে বড় তীব্র—বড় ভয়ানক! এ যে কি তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু এ যে তাহার অন্তরে তীব্র বেদনাদায়ক কাঁটার মত দিন দিন গভীর হইয়া বিঁধিয়া যাইতেছে। অচিন্তিত অননুভূত এ বেদনা সহসা কোথা হইতে তাহার মধ্যে আসিল?

ফটোটা লইয়া মাতা-ভগ্নীর উদ্দেশে প্রথমে সে যে লজ্জাবোধ করিয়াছিল—এখন আর তো তাহা নাই। সে যে সেই ছবিটা লইয়াই ঘরের কোণে ছাতের কোণে অধিকাংশ সময় কাটায় তাহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। যে-দিন মা প্রথম দেখেন, সেদিন শ্যামলী লজ্জায় মুখ ঢাকিয়াছিল; কিন্তু মায়ের অশ্রুপূর্ণ গভীর আদরে তাহার সে লজ্জা স্থায়ী হইতে পারে নাই। সেই দিন হইতে সে রুগ্নমায়ের বুকের নিকট মাথা রাখিয়া ভিত্তিস্থ ছবিটার দিকে স্বচ্ছন্দে অন্য-মনে চাহিয়া থাকিত—অম্‌নি কত কি ভাবিত আর তাহার মায়ের ক্ষীণ হস্ত আশীর্ব্বাদ আনন্দ ও বিষাদের ভরে নুইয়া তাহার পিঠের উপরে মাথার উপরে চালিত হইত। মেয়ের এই নব জন্মের প্রতীক্ষাতেই যে তিনি ছিলেন, ইহাতে তিনি যত কাঁদিতেন তত আশ্বস্ত হইতেন। ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার দিন যে ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু শ্যামলীর জন্য যে মরিয়াও তাঁহার স্বস্তি নাই। আজ এই ছবিখানা শ্যামলীকে চিনাইয়া, ইহার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ অনুভব করাইয়া দিয়া যাইতে পারিলেও তিনি বাঁচেন! শ্যামলীর দ্বারা তিনি ছবিখানার চারিদিকে রেশমের ফুলকাটা বর্ডার তৈয়ারী করাইয়া দিয়া শ্যামলীর শয্যাপার্শ্বে তাহাকে টাঙাইয়া দিয়াছেন। মায়ের ইঙ্গিতে সে সেই ছবিখানার সম্মুখে সন্ধ্যার ধূপ দীপ নিবেদন করে, ফুলের মালা গাঁথিয়া

ছবিখানার উপরে ঝুলাইয়া দেয়। মা ধীরে ধীরে তাঁহার হতভাগ্য কন্যার নবজাগ্রত নারীত্বকে এইরূপে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছিলেন। শ্যামলীও রুগ্নমায়ের সেবা করিয়া এবং ছবিখানা লইয়া এম্‌নি পূজা ও খেলা করিয়া এত দিন একরকম বেশ ছিল, কিন্তু দিন দিন তাহার অন্তর যেন আবার বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইতেছিল। এইটুকুতে মাত্র তাহার চিত্ত আর ভরিতেছিল না—তাহার যেন আরও কত দিবার আছে, আরও কত পাইবার আছে। কি দিবে, কি পাইবে, তাহা সে জানে না। কেবল জানে তাহার অন্তর বাহিরে একটা ব্যথা—ব্যথা—ব্যথা।

মাতা একটু সুস্থ বোধ করায় বিজলীর শ্বশুরবাড়ী যাইবার কথা হইয়াছে। আজকাল শিশির তাহাকে লইতে আসিবে। বিজলী মাতার কাছে বসিয়া ছিল—এবং শ্যামলী বিকালে তাহার প্রাত্যহিক যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাতের একটি কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। বাহিরের একটা আমগাছ মুকুলে ছাইয়া ফেলিয়াছে। উঠানের ফুলন্ত লেবুগাছ ছাতের উপর দিয়া তাহার গন্ধকে ভেট পাঠাইয়া দিতেছে। অদূরের অশোককুঞ্জ—আর উচ্চশীর্ষ শিমুল গাছ লালে লাল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে—পশ্চিম আকাশেও সেই অশোক-শিমুলের আভা! তাহারই মধ্যে শ্যামলী জড়ের মত বসিয়া ছিল। ঐ চিত্রের মত নিস্পন্দ প্রকৃতিও যেন আজ তাহার কাছে অর্থশূন্য উদ্দেশ্যহীন। কেন এসব চেষ্টা তার, এত রং, এত গন্ধ? তারও একটা বড় রকম অভাব আছে; সেই 'নাই'-জিনিসটা যে কি'সে বুঝিতে পারিতেছে না? বৃথা-বৃথাই এ সব তার!

সহসা শ্যামলীর চক্ষে পড়িল—ওকি দৃশ্য! ছাতের অপর প্রান্তে দুটি প্রাণী—বিজলী ও শিশির। শিশির বিজলীর কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের চোখ দুটি জগতের আর কিছু দেখিতেছে না, অপলকদৃষ্টি দুইজনে দুইজনার মুখের প্রতিই নিবদ্ধ। ডান হাতে বিজলীর একটা হাত ধরিয়া বাম হাতে শিশির তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিয়াছে। তাহাদের মুখে—ওকি—ওকি অপরূপ অনুপম অননুভূত ভাব! শ্যামলী স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। দুইটা মুখ আরও নিকটস্থ হইল, ক্রমে আরও, একটা অন্যটাকে স্পর্শ করিয়া নিবিড় ভাবে সংলগ্ন হইয়া স্থির হইয়া রহিল। শ্যামলীরও চক্ষু ধীরে ধীরে বুজিয়া গেল।

এই! যাহার জন্য তাহার অন্তর কাঁদিয়া সারা হইতেছে সে বুঝি এই! এতদিনে শ্যামলী তাহাকে খুঁজিয়া পাইল! বিজলীর মত অম্‌নি করিয়া পাইতে, অম্‌নি করিয়া দিবার জন্যই তাহার হৃদয় বুঝি এমন অশান্ত হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু কাহাকে? কই সে? তাহার শব্দহীন বধির অন্তর ঐ আম্রমুকুল ও লেবুর ফুলের গন্ধে—অশোকের নবারুণ-বর্ণচ্ছটায় যে ভরিয়া উঠিয়াছে—হাতে তাহার একখানা প্রাণহীন স্পন্দহীন জড় ছবি মাত্র! দুই চারিবার শ্যামলী ছবিখানার পানে চাহিতে গেল, দৃষ্টি উঠিল না। অবশ হস্ত হইতে সেটা খসিয়া পড়িয়া গেল।

ধীরে, বহুক্ষণ পরে, মুদিত চক্ষু খুলিবা মাত্র শ্যামলী চাহিয়া দেখিল—সম্মুখের আকাশে ও কি মধুরোজ্জ্বল হাসি! আরক্ত আভার মধ্যে বেষ্টিত কার জ্যোতিপূর্ণ চক্ষু? ঐ তো—ঐ তো—ঐ তো সেই চক্ষের সেই দৃষ্টি! ঐ তো দীপ্ত শুভ্র নক্ষত্রালোকে মণ্ডিত হইয়া সে ধীরে ধীরে শ্যামলীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার অপরূপ রূপের আলোয় তৃতীয়া-চতুর্থীর চাঁদের মত ছাতের উপর মৃদু জ্যোৎস্না ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই তো সে! কাগজের মধ্যে আর আবদ্ধ নয়—মানুষের মত তার নিষ্প্রভ মূর্ত্তিও নয়! তাহার রূপের আলোয় আকাশ পৃথিবী সব যেন হাসিয়া উঠিয়াছে, আর হাসিয়াছে শ্যামলীর চির অন্ধকারময় অন্তর। শ্যামলীর মনে হইল বিজলীর যত নিকটে শিশির আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তেমনি করিয়া সে শ্যামলীর নিকটেও দাঁড়াইয়াছে, হাত ধরিতে হাত বাড়াইতেছে, তাহার অনুভবেই শ্যামলীর সর্ব্বাঙ্গে এমন কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে। আরও আরও নিকটে, এই যে তাহারই জ্যোতি একেবারে শ্যামলীর মুখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। শ্যামলীর মুখে এ কিসের স্পর্শ। তাহারই নিশ্বাস যে! অসহ্য আনন্দে শ্যামলীর চক্ষু মুদিয়া গেল। শরীর অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িল। মোহের মধ্যে সে অনুভব করিল সেই দীপ্ত তারকামধ্যস্থ সেই অনুপম

সুন্দর—সেই তাহার বর—ধীরে ধীরে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল,—ধীরে ধীরে, শ্যামলীর সংজ্ঞা এইবার একেবারে লুপ্ত হইল।

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিল সে মাতার ক্রোড়ের মধ্যে শুইয়া আছে।

(১৪)

অনিলের সেই কাল-বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল। অনিল চিরদিনের সেই বালক অনিলের মতই পড়াশুনা এবং মায়ের আঁচল ধরিয়া এক ভাবেই দিন কাটাইতেছে, কিন্তু মা যে আর পারেন না। ছেলে রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ স্কলার হইল, তবু এখনো বিবাহের চেষ্টা করিতেছে না দেখিয়া তখন মুখ ভারি করিয়া সলিলের জন্য তিনি পাত্রী অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। এখন আর শিশিরকে নিজের হুকুম তামিল করিতে ত তিনি হাতের কাছে পান্ না। শিশির এখন চাক্রী-বাক্রী লইয়া পুরাদস্তর সংসারী হইয়াছে। সংসারের ঝঞ্ঝাটে সে আর অনিলের সঙ্গে পড়িতেও পারে নাই। শিশিরের মুস্কিলের আদত কারণ বুঝিয়া অনিল একটু একটু হাসিত মাত্র। কাজেই মাতার মুখে যে ক্রমশঃ মেঘসঞ্চার হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়াই অনিল বৎসরাধিক পূর্ব্বে মাতার যে তীর্থযাত্রা ভঙ্গ করিয়াছিল সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মাতার এই কৃত্রিম উদ্যোগের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মাতাকে ভ্রাতাকে প্রায় টানিয়া লইয়াই তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল।

নামে তীর্থযাত্রা, কিন্তু তীর্থ অতীর্থ যেদিক্‌টা অনিলের পছন্দ হইতেছিল সেই দিকেই সে মনোরথকে চালাইতেছিল। বাংলা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তীর্থযাত্রার সর্ব্বপ্রথমে সে পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্রের বিশাল হৃদয় বাহিয়া বাংলার পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইল। বাংলার ভূস্বর্গ চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ আদিনাথ ও তাহাদের নিকটস্থ অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া অনিল মাতাকে আসাম ব্রহ্মপুত্রের বক্ষে কামাখ্যা ও উমানন্দকে দুইদিন ভাল করিয়া দেখার অছিলায় পাণ্ডা মহাশয়ের জিম্মায় রাখিয়া নিজে ভ্রাতার সঙ্গে "হস্তী প্রপাত" প্রভৃতি নিসর্গ-দৃশ্য দেখিয়া লইবার জন্য শিলং বেড়াইয়া আসিল। শিলংয়ে কোন দেবদেবী নাই শুনিয়া মাতা পুত্রদের সঙ্গে যান্ নাই, কিন্তু আর কিছুর জন্য না হোক্ 'প্রপাত' দেখিতে না পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করায় অনিল তাহার মত্‌লবগুলা মাতার কাছে আগে কিছু আর ভাঙিল না। পশ্চিম যাত্রার পথে গোমো হইতে পরেশনাথ পাহাড় দেখিতে নামিয়া আদ্রা-পুরুলিয়া শাখা-লাইন হইতে রাঁচির পথ ধরিয়া ছোটনাগপুরের প্রসিদ্ধ জঙ্গল এবং তন্মধ্যস্থ হুণ্ড্রু প্রপাত দেখাইয়া মাতার ক্ষোভ নিবারণ করিল। মাতা তাহাতে এতই খুসী হইয়া গেলেন যে এইবারে ছেলের মতেই ভ্রমণের প্রোগ্রাম প্রস্তুতে সম্মতি দিলেন। তখন অনিল যাত্রাপথকে বদ্‌লাইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নিজের ইচ্ছামত ভারতবর্ষের গিরি নদী উপত্যকাগর্ভ প্রকৃতির তীর্থগুলি দেখিয়া ও মাতাকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কাশী গয়া বৃন্দাবন কোথায় পড়িয়া রহিল, তাহারা তাহাদের এই নবতীর্থযাত্রার আনন্দকেই সে তীর্থের দেবতারূপে বরণ করিয়া লইল। তবে পথে যে তীর্থ দেখিবার সুবিধা হইতেছিল, কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিয়াও অনিল সে তীর্থ না দেখিয়া ছাড়িতেছিল না, সেখানেও যে তাহার এই দেবতা প্রত্যক্ষ! কত যুগ-যুগান্তের সাধক-ভক্তের আনন্দই যে সেখানে প্রস্তরীভূত হইয়া কালে কালে যুগে যুগে সে আনন্দকে নিত্য সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। তবে না-জানিয়া না-বুঝিয়া কেবল দৃষ্টিপাত মাত্রেই যে আনন্দানুভব তীরের মত প্রাণকে বিঁধিয়া ফেলে, যে যে স্থানে সেই আনন্দের দৃশ্যগুলাই অধিক সুস্পষ্ট, সেই সেই স্থানের দিকেই অনিলের কেমন ঝোঁক হইয়াছিল। তাই সে কলমুখর শব্দবহুল জনপদের দিকে না গিয়া মৌন স্তব্ধ গিরিপথকেই আশ্রয় করিতেছিল। সঙ্গে ফটোর ক্যামেরা ছিল, তাই তাহারা তাহাদের এই সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রার প্রথম দৃষ্ট চট্টগ্রামের ও শিলংয়ের নিসর্গদৃশ্য হস্তীপ্রপাত ও হুণ্ড্রুর নানাপ্রকার ছবি হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুর হাজারীবাগের পর্ব্বতমালা এবং বিখ্যাত পরেশনাথ পর্ব্বতের দৃশ্য যাহা তাহাদের মনমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল তাহারই ফটো তুলিতে তুলিতে চলিতেছিল। অনিলের ঈপ্সিত তীর্থগুলির পথে যাইবার পূর্ব্বে অনিল মাতার জন্য আবার খড়্গাপুরে ফিরিয়া দক্ষিণাপথের যাত্রাটাও সারিয়া লইয়াছিল।

পুরী হইতে ওয়াল্‌টেয়ার, ভিজাগাপত্তনম্‌, অবশেষে রামেশ্বর। যাইতে যাইতে এই সাগরসর্ব্বস্ব মহাভূমির শোভাও অনিলকে মুগ্ধ করিতেছিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কপাট নিরুদ্ধ করিয়া ভাবিতেছিল এই জলরাশির উচ্ছল গর্জ্জন বাদ দিলে যেন এ সমুদ্রের অনেকখানিই হানি হইয়া যায়। তাই তাহার অন্তর সেখানে কেমন যেন সঙ্কুচিত নিরানন্দ হইয়া উঠিতেছিল।

দক্ষিণাপথের যাত্রায় মাতাকে দক্ষিণের অন্যান্য তীর্থ এবং কাঞ্চিপুরীর রঙ্গনাথ বরদরাজ প্রভৃতি দর্শন করাইতে অনিল ক্রটী করে নাই। রামেশ্বর দেখিয়া মাতা চারি ধামের দ্বিতীয় ধাম দ্বারকাপুরী যাত্রীর সঙ্গে অগ্রে দ্বারকা যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠায় অনিল মান্দ্রাজ হইতে বম্বের পথ ধরিল, এবং তথা হইতে গুজরাট কচ্ছ-উপসাগরে দ্বারকা পৌছিল। সেস্থান হইতে পুনর্ব্বার বম্বের পথে ফিরিয়া অনিল মাতিয়া উঠিল। নাসিকের প্রসিদ্ধ পঞ্চবটীবন ও জনস্থান, নাগপুরের অজন্তাগুহা, জব্বলপুরের মর্ম্মর পর্ব্বত এবং নর্ম্মদাপ্রপাত, পেণ্ড্রা রোডে নর্ম্মদার জনক অমরকণ্টক পর্ব্বত এবং বিলাসপুর হইতে রামগিরি বা চিত্রকূট তীর্থ দর্শন করিয়া এবার তাহাদের এলাহাবাদ হইতে মথুরা বৃন্দাবন ও রাজপুতানার দিকে যাইবার কথা। কিন্তু অনিল সহসা প্রস্তাব করিল যে সুদূর অমরনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া তাহার পরে নিশ্চিন্ত ভাবে ওসব দেখিয়া পরে কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি ঘরের কাছের তীর্থগুলিতে কিছুদিন বাস করা যাইবে। মাতা অতি সহজেই সম্মত হইলেন এবং সলিল দাদার মতলব বুঝিয়া মনে মনে খুব হাসিই হাসিল। খুসীও অত্যধিক পরিমাণে হইয়াছিল—কেননা ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখিবার সাধ কাহার না হইয়া থাকে। দিল্লী হইয়া আম্বালা রাওলপিণ্ডি হইতে মারি কার্ট-রোড্‌ ধরিয়া তখন তাহারা কাশ্মীর যাত্রা করিল। অর্দ্ধপথে সলিল হাসিতে হাসিতে দাদা যে অমরনাথের ছলে কোথায় চলিয়াছে তাহা মাতাকে বুঝাইয়া দিলে মাতা "ওমা!" বলিয়া প্রথমে বিস্ময় এবং ঈষৎ ভয় পাইলেন, কিন্তু ক্রমশঃ প্রচুর আনন্দই সে স্থানকে অধিকার করিল।

কাশ্মীরযাত্রায় দুই ভাইয়ের ফটোর ভাণ্ডার অসম্ভব রকম বাড়িতে লাগিল। সেই মৌনমূক অথচ দৃষ্টিপাত মাত্রে প্রাণস্পর্শী ছবিগুলা নাড়িয়া-চাড়িয়া অনিল কেবলই যেন কি একটা করিবার সঙ্কল্প করিত অথচ পারিত না। কিন্তু কাশ্মীর দর্শন যেদিন তাহাদের শেষ হইল সেদিন অনিল সহসা কতকগুলা ফটো কার্ডে বসাইয়া পার্শেল বাঁধিয়া ফেলিল এবং বাংলার দিকে তাহাকে রওনা করিয়া দিল। নিজেকে লুকাইয়া তাহার মধ্যে নিজেরও একখানা ছবি সে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

কাশ্মীরের ফেরত পঞ্জাব হইতে ধীরে ধীরে তাহাদের সেদিকের তীর্থ দেখা সুরু হইল। অবশ্য দ্রষ্টব্য সহর-গুলিও বাদ গেল না। অমৃতসহর কুরুক্ষেত্র থানেশ্বরের পর হরিদ্বারে গিয়া মাতা বদরী তীর্থে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনো সে পথ সুগম হইতে অনেক বিলম্ব।

ছয় মাস ধরিয়া অনবরত ভ্রমণে মাতা অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত দৃঢ় ছিল বলিয়াই এতদিন তিনি শ্রান্তি বোধ করেন নাই, কিন্তু এইবার আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না। মাতার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অনিল হরিদ্বারেই কিছুদিন বিশ্রামের প্রস্তাব করিল। মাতা প্রথমে রাজী হন্‌ নাই, কেননা এখনো তাঁহার মতে আদত তীর্থগুলিই বাকী। কাশী গয়া বৃন্দাবন প্রভৃতিই তাঁহার মনে তীর্থের শীর্ষস্থানীয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, কিন্তু কি করিবেন শরীর আর বহে না।

সহর হরিদ্বারে না থাকিয়া অনিল হৃষিকেশের একটি বিখ্যাত ধরমশালায় আস্তানা পাতিল। প্রায় প্রত্যহই সে লছমন-ঝোলার কয়েক মাইল পথ বেড়াইয়া আসিত, মাতাও সুস্থ হইয়া ক্রমে এক এক দিন তাহার সঙ্গ লইতেন। দুর্লভদর্শন বহু বিখ্যাত গিরিপথ ও তাহাদের ক্রোড়মধ্যগতা নদী হ্রদকে তাহারা দেখিয়াছে। কিন্তু বালিকা হৈমবতীর এই বাল্যলীলা তাহাদের যেমন মুগ্ধ করিতেছিল এমন যেন আর কিছুতেই পারে নাই। কোনদিন বন্ধুর উচ্চস্থান হইতে গঙ্গার শৈলপ্রহত গতি দেখিত, কোনদিন বা সমতল ক্ষেত্রবাহিনী সেই শীতল স্নিগ্ধধারাকে স্পর্শ কারবার জন্য তাহার তীরে গিয়া বসিত।

সেদিন প্রভাতে অনিল ও তাহার মাতা যেখানে

বসিয়া ছিল তাহার পার্শ্বেই লছমন-ঝোলার পথের চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, গঙ্গার অপর পারেও উচ্চ পর্ব্বত সোজা উঁচুভাবে উঠিয়াছে, নিম্নে অনিলদের সম্মুখে সমতল এবং সমধিক গভীর খাতের মধ্য দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। নবোদিত অরুণকিরণে পার্ব্বত্যদেশটি ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। সহসা অনিল বলিয়া উঠিল—"মা মা—দ্যাখ।" মাতা পুত্রের নির্দ্দেশমত চাহিয়া দেখিলেন একটি রমণী মৃৎকলসীতে জল লইয়া সেই চড়াইয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মাতা সবিস্ময়ে বলিলেন "বাঙালীর মত করে কাপড় পরা যে, বাঙালীর মেয়ে নাকি?"

"তাই তো বোধ হচ্চে। দেখ্‌ছ মা উঠ্‌তে ভারি কষ্ট পাচ্চে বেচারা!"

মাতাও সেই ক্ষীণকায়া নারীটির পূর্ণ কলস লইয়া কষ্ট লক্ষ্য করিতেছিলেন। রমণী খানিকটা যাইতেছে, আবার ক্ষণিক থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া যেন হাঁপ ছাড়িতেছে। অনিল দু চারবার মাতার পানে চাহিলে মাতা ছেলের দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন; কিন্তু তখনি তাঁহাকে সেই ফিরানো মুখকে ছেলের দায়ে স্বস্থানে আনিতে হইল। ছেলের কণ্ঠস্বর কানে আসিল—"তোমার পায়ে পড়ি মা!" চাহিয়া দেখিলেন অনিল উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। মা অগত্যা নিঃশব্দে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনিল রমণীটির নিকট পৌছিল, কিন্তু তাহার যাওয়াই সার হইল। মাতা দেখিলেন তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায়ও রমণীটি তাহার প্রার্থিত বস্তু অনিলকে দিল না। কেবল সে বিস্মিত চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কি যেন এক-একবার বলিতেছিল। ক্ষুণ্ণ অনিল মায়ের পানে এক-একবার চাহিয়া আবার কর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে রমণীটির পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতা তখন উঠিলেন, কিছুদূর অতিবাহনান্তে উভয়ের নিকটস্থ হইয়া মাতা শুনিলেন রমণী বলিতেছে—"পথ ছাড় বাবা—আমিই নিয়ে যেতে পারব। কাছেই আমাদের আশ্রম। আজ তো নতুন নয়, দুতিন বচ্ছর আমরা এখানে আছি আর এম্‌নি করে জল নিয়ে যাই।" অনিলের মাতা পশ্চাৎ হইতে উত্তর দিলেন "দাও মাই কেন ছেলেকে কল্‌সীটা আজ। কাল আবার নিজেই নিয়ে যেও।"

রমণী দ্বিগুণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিলে অনিলের মাতা এইবার স্পষ্ট চোখোচোখি করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইলেন। পরনে একখানা মলিন গৈরিক, হাতে দু গাছা রাঙা কড়, মাথার চুলগুলি পুরুষের মত করিয়া ছাঁটা, ক্ষীণ দেহ—কিন্তু তাহারই মধ্যে মেঘাচ্ছাদিত ম্লানজ্যোতি জ্যোতিষ্কের মত রূপ—এমন স্থানে এ ভাবে এই রমণী কেন রহিয়াছে! ভদ্রঘরের মেয়ে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, ভাবে ভাষায় তাহা অতি পরিস্ফুট। রমণীকে নির্ব্বাক দেখিয়া অনিলের মাতা এইবার অগ্রসর হইয়া কলসী ধরিলেন। পুত্রকে বলিলেন, "খুব ছেলে যাহোক, এই ভরা কল্‌সী ঘাড়ে খাড়া দাঁড় করিয়ে রেখেছিস যে, পথ ছাড়্‌। দাও তো দিদি আমায় কল্‌সীটা।" বলিতে বলিতে তিনি কলসীতে টান দিলেন। এইবার নির্ব্বাক রমণীর মুখে ভাষা ফুটিল "একি দিদি, ওকি? রক্ষা করুন, মাপ করুন আমায়।" আর মাপ করা! অনিলের মাতা ততক্ষণ কলসী কাড়িয়া লইয়াছেন এবং অনিলও তৎক্ষণাৎ তাহা স্কন্ধে লইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিব্রতা রমণী উপায়ান্তরহীন ভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "একি করলেন দিদি আপনি? আপনার ছেলেই নিশ্চয় ওটি, বাছার ঘাড়ে এ ভার কেন চাপালেন? ঐ ননীর শরীরে কি এসব কষ্ট সয়?"

"কি, করব ভাই, ওছেলেদের দায়ে আমার পার্‌বার জো নেই। চল এখন, কোথায় তোমরা থাক দেখাবে, নইলে ও আবার—"

"হাঁ—চলুন চলুন।"

রমণী আর বাক্যব্যয় না করিয়া প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসেই চলিল। অনিলের মাতাও হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পিছনে ছুটিলেন। তথাপি তাঁহাকে ধীরে যাইতে অনুরোধ করিলেন না। কেননা অনিল পাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পথ ঐ ভার স্কন্ধে লইয়া অগ্রসর হইয়া পড়ে এই তাঁহার ভয়। অনিল ইতিমধ্যেই অনেকটা আগাইয়া গিয়াছিল।

তাঁহারা একটুখানি যাইতেই সম্মুখের বাঁকের পথ হইতে আর-একটি রমণী তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহার মুখের পানে চাহিতেই অনিলের মাতার মনে হইল "একি এর কেউ নাকি?" 'একই রকম মুখের

গঠন, শ্রী বরং বয়সের অল্পতায় ম্লানিমাহীন, মুখচোখ উজ্জ্বলতর। এরও চুল বোধ হয় তেমনি ছাঁটা ছিল, কিন্তু সেগুলা বর্দ্ধিত হইয়া গুচ্ছে গুচ্ছে চোখ-মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে অনিলের মাতা তাহাকে বালিকা যুবতী অথবা মধ্যবয়স্কা রমণী এই তিনটির কোনো পর্য্যায়েই ফেলিতে পারিলেন না, সে তিনই হইতে পারে—তার আচরণ শিশুর মত অসঙ্কোচ সরল, তার চেহারা যুবতীর মতন নিটোল পরিপূর্ণ, তার মুখ প্রৌঢ়ার মতন গম্ভীর। তাহাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বোক্তা রমণী ডাকিল "রেবা—"

সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক-রমণীও ত্রস্তস্বরে বলিল "মা, কলসী কই তোমার?"

মা একটু দূর হইতে বলিলেন "এগিয়ে গেল যে ছেলেটি দেখ্‌লি না?"

"দেখ্‌লাম তো। তোমারই কলসী? কে এঁরা মা? তোমার কলসী কেন নিয়েছেন?"

"শুন্‌বি শেষে, এখন যা ছুটে যা, আশ্রমের পথ দেখিয়ে দিবি।"

কন্যা দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। মাতা তখন একটু থামিয়া অনিলের মাতাকে নিকটস্থ করিয়া লইল। অনিলের মাও এইবার সুস্থ ভাবে গতি মন্দ করিয়া দিয়াছিলেন। রমণীকে বলিলেন "এটি কি তোমার মেয়ে না কি? স্বামী কি সঙ্গেই আছেন? কপালে সিঁদুর, তুমি সধবা?"

রমণী এক "হ্যাঁ দিদি" শব্দে সকল প্রশ্নের উত্তর শেষ করিয়া বলিল "আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছেন? এখানে কতদিন এসেছেন? কোথায় আছেন? কটি ছেলে-মেয়ে আপনার?" একে একে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে দিতে অনিলের মাতা আর-একটা বাঁক ফিরিয়া খানিকটা সমতল ক্ষেত্রের নিকট পৌঁছিলেন। সেই বদরীনারায়ণের পথের পার্শ্বে কয়েকখানা কুটীরে একটু আশ্রম তৈয়ারী হইয়াছে। কতকগুলি উদাসীন সেখানে বাস করিতেছেন। কাহারো কাহারো গরু বাছুর লইয়া দিব্য ছোটখাটো গৃহস্থালি। তাহারই একপার্শ্বে একখানা কুটীরের সাম্‌নে অনিল কলসী নামাইয়া দাঁড়াইয়া, আর রেবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে মধ্যপথে দাঁড়াইয়া মাতার পথপানে চাহিয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

ধর্ম্ম ও সাহিত্য

ধর্ম্মের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন সৃষ্টিরহস্যই ধর্ম্মের মূল। জগতে যে-মানুষটার অস্তিত্ব কোনোকালে ছিল না, যার কথা কেউ কোনোদিন কল্পনাও কর্‌তে পারেনি, সেই একদিন যেন উড়ে এসে সৃষ্টি জুড়ে বস্‌ল; আবার যাকে সকালে সন্ধ্যায় নিত্য নানারূপে নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে সুখে দুঃখে বেদনায় পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় এক করে দেখেছিলাম, সেই একদিন পৃথিবীকে ফেলে রেখে মিলিয়ে গেল। তার অভাবে জগৎ মূর্চ্ছিত হল না, সৃষ্টি স্তম্ভিত হল না, অথচ অত বড় যে প্রাণময় জীবন্ত সত্তার প্রকাশ এতদিন তার মধ্যে অমন সত্যরূপে বিরাজ কর্‌ছিল, তার জায়গায় রইল শুধু শূন্য; বিশ্বজগৎ খুঁজ্‌লে কেবল এক তার প্রিয়জনের বুকের স্মৃতির মধ্যে ছাড়া তাকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। যেদিন সেই স্মৃতির-আধার-গুলিও ভেঙে যাবে সেদিন আর ঐটুকুও থাক্‌বে না। সমস্ত দেহ মন ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে মানুষ অনুভব করেছিল তার এমন অন্তর্ধানে যদি মানুষকে কারণ না খোঁজায় ত কিসে খোঁজাবে?

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জগতে যত কিছু ঘটনা মানুষ দেখে আস্‌ছে সব কিছুই ত রহস্যময়। ঘোর অন্ধকার রাত্রির কালো আবরণ ভেদ করে উষার রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়্‌ছে, বৈশাখের রুদ্র তেজ বর্ষার জলধারায় করুণ হয়ে উঠ্‌ছে, জগৎ-বাঞ্ছিত রূপমাধুরীর শেষ পরিণামে নিষ্ঠুর দেবতার ভীষণ খেলা দেখে জগতের মানুষের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এ সব কি রহস্য নয়?

এই জগৎ-ঘূর্ণিই ত মানুষকে স্রষ্টার সন্ধানে ছুটিয়েছিল। তাই মনে হয় বিস্ময়ই ধর্ম্মের মূল।

এই সন্ধানের ফলে মানুষ যেটাকে সত্য বলে বুঝেছে, তার জীবনের গতি ও পরিণতির সঙ্গে যে সত্যের বিরোধ নেই, যে সত্যের ছন্দে সে সত্যাসত্যই তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে চায় এবং কর্‌তে চেষ্টা করে সেইটাই তার ধর্ম্ম। যিনি নিজ জীবনের এই সত্যপথ খুঁজে বের কর্‌তে পেরেছেন এবং তাকে অবলম্বন করে সেই পথেই চলেছেন

তাঁকে আমরা বলি ধার্ম্মিক। এই পথে চল্‌তে চল্‌তে পথিক খায় দায় ঘুমোয়, হাসে কাঁদে খেলে, সবই করে, পথ মাঝে মাঝে ভোলেও, কিন্তু তাই বলে পথের ধারের এই লীলাগুলিকে আমরা মিথ্যা বলি না। তার ধর্ম্ম-সূত্র অবলম্বন করে মণিহারের মত এই খণ্ড খণ্ড সত্যগুলিই লোকের চোখে বেশী উজ্জল হয়ে ওঠে। শরীরের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাই মানুষের নিজের উপার্জ্জনের ধনের মধ্যে অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনটাই তার সব চেয়ে বেশী আর একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তবুও ত মানুষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জুতো, ছাতা, বাক্‌স, পেঁট্‌রা, টাকা, কড়ি, আতর, গন্ধ, তেল, আয়না, চিরুনী, কত কিছুই দর্‌কারী করে তুলেছে। এখন আমরা কেবল হোটেল, কাপড়ের দোকান আর সেই সম্বন্ধীয় আর দুটো চারটে দর্‌কারী কাজ সবাই মিলে লেগে পড়ে করি না বলে কেউ আমাদের দোষ দেবেন না। কিন্তু আবার অন্য কাজের উৎসাহে যদি দেশসুদ্ধ লোক কাপড় বুন্‌তে আর ফসল ফলাতে ভুলে যাই তাহলে যে আমাদের কিরকম হাস্যকর ভুল ঘটে আর কি অনন্ত দুর্গতি হয় সেটা ত আজ-কাল চব্বিশ ঘণ্টাই চোখের উপর দেখ্‌ছি।

তেম্‌নি মনোজগতের যে সব-চেয়ে বড় সত্য ধর্ম্ম, অন্ন-বস্ত্রের চিন্তার মত সকল মানসকল্পনার তলে তলে অন্তঃসলিলা নদীর মত বয়, সেটা যদি একদিন শুকিয়ে যায় তাহলে সেইখানেই তার মৃত্যু। শরীর ধারণের চেষ্টা শরীরীর প্রধান কাজ। কিন্তু সুসভ্য মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টাটার উগ্রতা অনেক স্থানে দিন দিনই কমে যাচ্ছে। তার উপর নানা শোভন আবরণ পড়ে সেই নিত্য চেষ্টার হিংস্র ও উগ্র ভাবটাকে কোমল করে দিয়েছে। কিন্তু যে-মানুষ তার এই অবশ্যকর্ত্তব্য কাজটা ছেড়ে দিয়েছে তাকে প্রাণহীন ছাড়া আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

ধর্ম্মজগতেও সত্যধর্ম্মের ধারাটিকে বজায় রেখে মানুষকে নানা বিচিত্র কাজের মধ্যে ঘুর্‌তে হচ্ছে, সেইটেই তার পক্ষে স্বাভাবিক আর সঙ্গত। যদি কোনো মানুষ জগতের আর-সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে কেবল এইটি নিয়ে থাকে, তাকে মানুষ বলে পাগল; যদি সে ওইটি ছেড়ে দেয় তবে সে হয় ধর্ম্মভ্রষ্ট, নাস্তিক।

বিশ্বব্যাপারে বিস্ময়ের পর বিস্ময় যেদিন মানুষকে ঠেলা দিয়ে স্রষ্টা আর সৃষ্টির অতল রহস্য ভেদ কর্‌তে ছুটিয়েছিল, সেই দিন থেকে তার যে-সকল প্রয়াসের চিহ্ন পাওয়া যায়, তার মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা একটা। সাহিত্য-জগতের যে-সব প্রথম যুগের লিপি আমরা এখন দেখ্‌ছি, সে সবই প্রায় ধর্ম্মশাস্ত্র বলে পূজিত। তখনকার দিনে সাহিত্য আর ধর্ম্ম শিশু সাথীর মত গলাগলি করে চল্‌ত এই ত তাতে প্রমাণ হয়।

আমাদের মনোলোকে যে-সব বিচিত্র ভাব চিন্তা আর কল্পনা এত যুগ ধরে গড়ে উঠ্‌ছে তাকে আমরা যে নানারূপে বাইরের জগতের সাম্‌নে এনে দাঁড় করাচ্ছি তার মধ্যে একটি রূপ হচ্ছে সাহিত্য। ভাষার ছন্দবন্ধে দেহ ধারণ করে আমাদের হৃদয়-লোকের যে ভাবময়ী ছায়া মানুষের প্রাণের দরজায় গিয়ে ঘা দেয় সেই ত সাহিত্য। আমাদের জীবন ধর্ম্ম-সাহিত্যের রথে চড়ে পথে পথে ঘোরে। সাহিত্য মানুষের ছোট বড় সুখ দুঃখ শোক আনন্দ হাসি অশ্রু সকলকেই স্থান দেয় যদি সে-সকলের গায়ে তার বিশেষ বেশটি আর প্রাণে তার বিশেষ রূপটি থাকে। মানুষের মনে নিত্য যে বেদনা বাজ্‌ছে, সেই ত সাহিত্যের মূল; আর জীবনের মূল যে ধর্ম্ম, তাকে ত হাসি-অশ্রুর নির্ঝর বল্‌লেই চলে। কাজেই ধর্ম্মের স্থান যে সাহিত্যে আছে সে কথা বল্‌বার কোনো দর্‌কার নেই। আমাদের দেশের কবি আর ঋষি তাই বহুযুগ ধরে একের মধ্যেই জন্ম নিয়ে আস্‌ছেন। তাঁদের রচনায় ধর্ম্মকথা-কাব্যকথার পুর্ণির্ণয় হয়ে গেছে।

সাহিত্যের প্রাণ আনন্দ। যে সাহিত্য লেখক ও পাঠককে আনন্দ দিতে পারে না, তাকে সাহিত্য নাম দেওয়া বৃথা। ধর্ম্মের প্রাণও কি আনন্দ নয়? ধর্ম্মে যদি আনন্দ না থাক্‌ত তাহলে জগতে ধর্ম্মের জন্য লোকে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন প্রাণ অত স্বচ্ছন্দে বিলিয়ে দিত না। কিন্তু এ কথা অবশ্য আমি বল্‌ছি না যে যে দুটো জিনিসে আনন্দ আছে, সেই দুটোই ন্যায়শাস্ত্র মতে এক হতে বাধ্য। এটা কেবল একটা ঐক্যের কথা।

এখন ধর্ম্ম কোন্‌খানে সাহিত্যক্ষেত্রে এসে পড়ে সেইটে দেখ্‌তে হবে। কোনো ধর্ম্মসমাজের মত, কি কোনো সম্প্রদায়ের মূলসূত্র ও বিধিব্যবস্থাগুলি ভাষার সাহায্যে

রচনা করা হয় বলে সেগুলিকে কেউ সাহিত্য বল্‌তে পারেন না। এমন কি সাম্প্রদায়িক মতবাদ নিয়ে যে-সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত সুযুক্তিপূর্ণ সারবান প্রবন্ধ আর গ্রন্থের সৃষ্টি হয় সেগুলিও অধিকাংশ স্থলেই সাহিত্য নয়। সেগুলো প্রায়ই গিয়ে পড়ে দর্শন কি বিজ্ঞানের কোঠায়। সাহিত্য ব্যক্তিগত ক্ষণিককে সাধারণ আর নিত্যকালের করতে চায়। কবির দেবতা তাঁর জীবনে মাঝে মাঝে যে-সব পরশ দিয়ে গিয়েছেন তিনি সাহিত্যে সাধারণের জন্যে সেইগুলিই নিত্যকালের উপযোগী গানে গেয়ে গিয়েছেন। যেখানেই তাঁর ধর্ম্ম-অনুভূতি কেবল ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতি রূপে প্রত্যেক গুণগ্রাহী ব্যক্তিবিশেষকে স্পর্শ করতে পেরেছে, এবং চিরকাল করবার আশা দেখিয়েছে, সেখানেই তা সাহিত্য-সৃষ্টি। ধর্ম্ম ও সাহিত্য স্বভাবতই নিত্যকালের হতে চায়। ধর্ম্মের যেখানে সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তির সঙ্গে যোগ বেশী, ধর্ম্মসাহিত্য প্রায় সেইখানেই গড়ে। যে কবি জীবনে ধর্ম্মকে নিজের করে পেয়েছেন, যুক্তি কি তর্ক কি বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণ না নিয়ে যাঁর ধর্ম্ম প্রাণের সঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠেছে, ধর্ম্মসঙ্গীত তিনিই গেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিগত বিকাশের মধ্যে ধর্ম্ম যেখানে কেবল একান্ত তাঁর, যেখানে তা অন্যের প্রাণকে স্পন্দিত করে না, সেখানে তা নিশ্চয়ই সাহিত্য হয়ে ওঠে না।

আমরা শুনেছি দুঃখের গানই শ্রেষ্ঠ গান; কিন্তু দুঃখের কি শোকের অভিজ্ঞতা যার নেই, যে শোকের মধ্যের মাধুর্য্য ও আনন্দরসের স্বাদ পায় নি, তার গানে দুঃখের কথা পদে পদে থাক্‌লেও তা সাহিত্য নয়। কারণ সাহিত্যে হৃদয়-লোকের মাধুর্য্য আর আনন্দ থাকা চাই। অবশ্য আমরা সুখ বল্‌তে যা বুঝি সে আনন্দ তা নয়; কিন্তু যেখানে দেখি কবি বলেন,

> "আমার এ ধূপ না পোড়ালে
> গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
> আমার এ দীপ না জ্বালালে
> দেয় না কিছুই আলো"

সেখানে বুঝি এর আনন্দ কি। কবির ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্ম যে তারটিতে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সে তার যদি ঠিক সুরে বাঁধা থাকে তাহলে ওই সুরে বাঁধা সব জীবনের তারেই সে সুরের স্পন্দন গিয়ে পৌঁছবে।

মড়াকান্না সাহিত্য নয়, জানি, কিন্তু শোকের যে অনুভূতি হৃদয়রাজ্যে বিচিত্র রসের সঞ্চার করে লেখকের রচনার ভিতর দিয়ে সকলের গোপন দুঃখের দুয়ার খুলে দেয় তা নিশ্চয় সাহিত্য। তেম্‌নি কবি সাধনার ফলে ধর্ম্মজগতে যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, জীবনে যে-সকল ব্যর্থতা বেদনা ও যত ছোট বড় উপকার পেয়েছেন, ঠিক সেই সবগুলি কথায় কথায় লেখা থাক্‌লে, তা সাহিত্য নয় নিশ্চয়; কিন্তু এই সিদ্ধি তাঁর প্রাণের কক্ষে যে আলো জ্বেলে দিয়েছে, তার ছটায় জগৎসংসারে তিনি যে নূতন রূপ দেখেছেন কিম্বা তাঁর ব্যর্থসাধনা অন্তরে যে অশ্রুসাগর সৃষ্টি করেছে সে-সব যদি তিনি ভাষাসাথীর হাতে সকল সাধকের নিভৃত কক্ষে পৌঁছে দিতে পারেন, সকল ব্যর্থ ও হতাশ প্রাণের মনে এনে ফেল্‌তে পারেন, সমস্ত সুপ্ত অচেতন মানুষের মনেও সেই শান্তি কি ব্যর্থতার কথা জাগিয়ে দিতে পারেন তবে তা নিশ্চয় সাহিত্য।

দশ আজ্ঞায় যে উপদেশ আছে তাকে সাহিত্য বল্‌তে গেলে ঠিক বলা হয় না। কারণ সাহিত্যের রস আনন্দ কি-রচনা নৈপুণ্য তাতে নেই। তাতে যা আছে তা শুধু সেইটুকুই, তার কম কি বেশী কিছু নয়। কিন্তু যদি ঈশ্বরের পূজার কথা বল্‌তে গিয়ে 'ভগবানে আমার মতি হোক' না বলে, বলি—

> "রক্তধারার ছন্দে আমার দেহ-বীণার তার,
> বাজাক্ আনন্দে তোমার নামেরি ঝঙ্কার।"

তাহলে এই দশটি শব্দের অর্থে যা বোঝায় তার চেয়ে ঢের বেশী বলা হয়ে যায়, এবং এই বলার গুণেই এটি সাহিত্য। ওই কটি কথার মধ্যে যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাব ফুটে উঠেছে তা গুণে গেঁথে কেউ বলে দিতে পারবে না।

আমার ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমি যা কিছু বল্‌ব সবই সাহিত্য হবে না। যখন আমার বাইরে তার আর কোনো মূল্য নেই, যখন অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করবার কিছুমাত্র চেষ্টা তার মধ্যে নেই, যখন সেটা কেবল আমার একটা চিন্তার ঠিক কথায় কথায় লেখা প্রতিমূর্ত্তি

মাত্র, তখন সেটা অন্তের প্রাণে ঘাও দেবে না। যদি বলি "আমি হিংসা করেছি কিন্তু আর করব না। তোমরাও কোরো না" তখন সেটা শুধু ওইটুকু বলা হয় মাত্র। কিন্তু সাহিত্য হতে হলে লোকের দ্বারে পৌছবার জন্তে তার যে গতি, বেশ, পাথেয়, বাহন, ডানা প্রভৃতির দরকার, তার যে মন-ভোলানো রূপ দরকার, সে-সব তার কিছুই থাকে না।

এইভাবে ধরতে গেলে সাহিত্য-হিসাবে দশ আজ্ঞার চেয়ে হোমরের গানের ওজন ঢের বেশী।

ধর্ম্মসাহিত্য যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁর কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের কথা স্বরলিপির মত, কিন্তু তাঁর রচনাটি তাঁর কণ্ঠের সঙ্গীত। যে স্বরলিপি জানে না, তার কাছে সঙ্গীতের মূল্য যথেষ্ট, কিন্তু স্বরলিপির কিছুই নেই।

ধার্ম্মিকের কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য আছে, ধর্ম্মসাহিত্যের মূল্য সকলের কাছে।

উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে বেদনা কি দুঃখের স্থান সকলের উপরে। দুঃখ মানুষ মাত্রকেই নাড়া দিয়েছে, তাই দুঃখগান সকলের জীবনে সাড়া দেয়। বিশ্বদেবতার বিরহ ভুবনে ভুবনে অহরহ যে ক্রন্দন তোলে বিশ্ব-কবিরাই আমাদের তা শুনিয়ে দেন। আমাদের সংসারের বিরহ-ক্রন্দনের চেয়ে ভুবনভরা এই যে ক্রন্দন এর মূল্য সকলের কাছে বেশী নয়; কিন্তু যিনি এ ক্রন্দন শুনেছেন, এবং তার সুরে তাঁর বীণায় ঝঙ্কার দিয়েছেন, ভারতবর্ষ তাঁকেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ কবি বলে আস্‌ছেন। পথের ধারের খেলার মত আর-সব সাহিত্যের লীলা তাঁর কাছে শিশুর খেলা হয়ে দাঁড়ায়, যদিও তা তুচ্ছ হয় না। কারণ জীবন মাত্রেরই যেমন বিশেষ মূল্য আছে, সাহিত্য মাত্রেরও তাই।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মসাধনায় কল্পনা, হৃদয় ও ভাবলোকের স্থান খুব উচ্চে। সাম্প্রদায়িক মত খণ্ডনে যুক্তি তর্ক ও প্রমাণের স্থান উপরে, প্রচারক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু "নিভৃত প্রাণের দেবতা" মানুষের অন্তরে যেখানে একলা জেগে আছেন, যেখানে ভক্ত পূজারীর হৃদয়ের দীপে আরতি হয়, সেখানে যুক্তির চেয়ে কল্পলোক অনেক উপরে। সাহিত্যেও যুক্তিতর্কের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। কাজেই ভক্ত সাধকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক খুব নিকট।

যিনি জীবনে যথার্থই সুন্দরের পূজা করেছেন, যিনি বুঝেছেন সত্যই আনন্দ হতে জগতের সৃষ্টি, তিনিই বল্‌তে পারেন "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।" তাঁর জ্ঞানই অর্থহীন সঞ্চয় না হয়ে সার্থক হয়। যিনি বুঝেছেন যে এ জগৎ স্রষ্টার রসের খেলা; যিনি হাজার স্রোতে জগৎ-ঝরণার ঝরা দেখেছেন, তিনিই কবি, তিনিই সাহিত্যস্রষ্টা।

সৃষ্টির মধ্যে প্রয়োজনের অতীত যে আনন্দ সেটা যেমন জগৎস্রষ্টার শিল্পচাতুরীর মধ্যে তাঁর বিশ্ববীণার ঝঙ্কারে তাঁর লুকোচুরি খেলার মধ্যে ভক্ত দেখ্‌তে পান, তেমনি সাহিত্যরসিকও বোঝেন যে সাহিত্যসৃষ্টিতে রচয়িতার প্রয়োজন ছাড়িয়ে একটা আনন্দ আছে, যার কেন্দ্র তাঁর মধ্যে বটে কিন্তু সে আনন্দ তিনি জগৎবাসীকে ছুঁয়াতে দিতে পার্‌লেই সার্থক হন। বিশ্বস্রষ্টাও নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত নন, তাঁর মুগ্ধ যে ভক্ত তাঁরই অনুকরণ করেন, তিনিও একলার আনন্দে ভোর হন না। এই প্রয়োজনাতীত যে আনন্দ, সাধক তার থেকে বঞ্চিত নন। যতক্ষণ তিনি কেবল আচার ও নিয়মরক্ষার জন্য ধর্ম্মপালন করেন ততক্ষণ প্রয়োজন-বোধেই করেন; সমাজগত ধর্ম্মসাধনেও সেই প্রয়োজনটাই মুখ্য হয়, কিন্তু যখন সাধক প্রয়োজন ছাড়িয়ে উঠেন, সুন্দর যখন তাঁর জীবনে 'অরুণ-বরণ পারিজাত' হাতে নিয়ে দাঁড়ান, তখনই তিনি সাহিত্য সৃষ্টির অধিকারী হন। সেই সাধকের পাওয়া মধুর লোভে অনুরাগী দল এসে নূতন একটি চক্র গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই নূতন ঘরের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে খেলা চলে না, কল্পনার স্রোত বয় না, বাঁধা ঘরের সৃষ্টি শুধু প্রয়োজনের সৃষ্টিই হয়।

ইতিহাসে আমরা দেখ্‌তে পাই যখনই কোনো দেশে প্রকৃত সাধক জন্মলাভ করেছেন, যখনই মানুষের ধর্ম্মে প্রাণের জাগরণ হয়েছে, তখনই সে দেশের সাহিত্য বর্ষাস্নাত তরুলতার মত সতেজ হয়ে উঠেছে; কিন্তু আবার সেই-সব দেশেই যেই প্রকৃত ধর্ম্ম শুকিয়ে গিয়ে লৌকিক ক্রিয়া-কলাপ বেড়ে উঠেছে, যেই মানুষের মনের আটঘাট নানা ধর্ম্মসূত্রে আর মতে শক্ত করে বেঁধে ফেল্‌বার চেষ্টা করা হয়েছে, অমনি গোড়াকাটা গাছের মত সাহিত্যের সমস্ত রস ফুরিয়ে গিয়ে শুক্‌নো কাঠের সৃষ্টি দেশ ছেয়ে ফেলেছে।

সাহিত্য যেমন ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্ট হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, ধর্ম্মও তেমনি সাধকের প্রাণ থেকে জগতের প্রাণে গিয়ে ডাক দেয়। এই সাধক যদি একেবারেই কবি না হতেন, তা হলে তাঁর ডাক জগৎজুড়ে তেমন করে ছড়াতে পারত না।

ধর্ম্ম আর সাহিত্যের ক্ষেত্র যে এক এ কথা সত্য না হলেও দুয়ের মিলনক্ষেত্রটা খুব বড়। যে জিনিস ধর্ম্মতত্ত্ব কিন্তু সাহিত্য নয় কিম্বা যে জিনিস সাহিত্য কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব নয় এমন জিনিসের অভাব আছে এ কথা কেউ বলতে সাহস করবে না। কিন্তু কবি যেখানে বলেন "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা" সেখানে ধর্ম্মসাহিত্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। সেখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর হাতে গড়া ফুলের মালা, সেই মালায় তিনি তাঁর প্রিয় দেবতার পূজা করেন।

শ্রীশান্তা দেবী।

অচিন্ পাখী

বাইরের দরজার কড়াটা আবার খুব জোরে নড়ে উঠল। এবার আর ভুল করবার জো নেই, প্রথমবারের মৃদু আওয়াজটাকে বাতাসের কাণ্ড বলে অবহেলা করেছিলাম, কিন্তু এবারকারটা নেহাৎই মানুষের হাতের কাজ। সুরেন পাশে অগাধ নিদ্রা দিচ্ছে, তাকে এক ঠেলা মেরে তুলে দিলাম, বললাম "দেখ্ গে, এতরাত্রে তোমার কোন্ এক প্রিয়বন্ধু ব্যাকুল হয়ে এসে কড়া নাড়ছে, মাঝ থেকে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল, এই যা দুঃখ।"

সুরেন ঘুম ভাঙানোতে অত্যন্তই বিরক্ত হয়ে চোখ মুছতে মুছতে নীচে চলল, আমি আবার খাটে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আর এল না। অনেককাল পরে কলকাতায় ফিরেছি, নূতন জায়গায় পড়ে অনেক সাধ্য-সাধনায় নিদ্রা দেবীকে একবার সদয় করতে পেরেছিলাম, কিন্তু এই সুযোগে তিনি এমন পলায়ন করলেন যে তাঁর আর খোঁজই মিলল না। চোখ খুলে শুয়ে রইলাম, ঘর-জোড়া আঁধারের পর্দার উপর আমার দীর্ঘকালব্যাপী প্রবাসী জীবনের নানারকম ছবি ছায়াচিত্রের মত নেচে নেচে চলতে লাগল।

সুরেন মিনিট তিন চার পরেই চটীজুতোর ফটাফট্ শব্দ করে ঘরে ঢুকে পড়ল। তার হাতের হ্যারিকেন আলোটা মেঝের উপর নামিয়ে রেখে বলে উঠল "আচ্ছা লোক যাহোক তুমি, লোক এল তোমায় ডাকতে, আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে খাটে শুয়ে আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে কি বলে নীচে পাঠালে? যাও শীগ্গির, এক ব্যক্তি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার জন্যে হাঁকাহাঁকি লাগিয়ে দিয়েছে।"

আমি একটু অবাক হয়ে খাটের উপর উঠে বসে বললাম, "নিজেকে নেহাৎ নগণ্য অবশ্য আমি ভাবি না, কিন্তু রাত আটটার গাড়ীতে এসে পৌছেছি, আর সাড়ে এগারোটার মধ্যেই আমার আগমন-বার্ত্তা কলকাতায় প্রচারিত হয়ে যাবে, এতখানি বিখ্যাত ত এখনো নিজেকে মনে করতে পারছি না। ঠিক আমাকেই খুঁজছে ত?"

নীচে থেকে একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌছল, "মশায়, দয়া করে একটু শীগ্গির আসবেন।"

সুরেন ব্যস্ত হয়ে এক ঠেলা দিয়ে আমাকে খাট থেকে তুলে দিয়ে বলে উঠল "তোমার রসিকতা করবার অবসর ত কেউ চিরদিনের মত কেড়ে নিচ্ছে না, একটু পরেই না হয় কোরো, এদিকে একটা লোক মারা যাচ্ছে।"

এর পরে আর ডাক্তার মানুষের জবাব করা চলে না। মাথার কাছের আল্না থেকে চট্ করে একটা ড্রেসিং গাউন টেনে গায়ে দিয়ে সুরেনের সঙ্গে আমার নিশীথরাতের অজানা বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চললাম।

সদর দরজার কাছে লণ্ঠন হাতে একটি আধবয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, দেখলেই বোঝা যায় কোনও সওদাগরী আফিসের কেরানী, অবিকল সেই শীর্ণ কাতর নিস্তেজ মূর্ত্তি। আমাকে দেখেই আগ্রহে হাত কয়েক এগিয়ে এসে তিনি বলে উঠলেন, "আপনিই কি ডাক্তার প্রিয়ব্রত রায়?"

আমি বললাম "হ্যাঁ, আমায় কেন খুঁজছিলেন জানতে পারি কি?"

তিনি বললেন "মশায়, আপনি আজ ক্লান্ত হয়ে এসে বিশ্রাম করছিলেন, তাতে বাধা দিলাম বলে মাপ করবেন। আমি বড্ড বিপদে পড়েছি মশায়, আমার বাড়ীর একটি

ছোট মেয়ের ভারি অসুখ, যে ডাক্তার দেখ্‌ছিলেন তাঁকে ডাক্‌তে গিয়ে শুন্‌লাম তিনি নিজেই জ্বরে পড়েছেন। কাছাকাছি আর কাউকে পাচ্ছি না, সুরেনবাবুর কাছে শুনেছিলাম আপনি আজ আস্‌বেন, সেই ভরসায় এসেছি মশায়, আপনি রক্ষা না কর্‌লে মেয়েটা আর বাঁচ্‌বে না।"

"চলুন," বলে আমি বেরিয়ে পড়্‌লাম, সুরেনও সঙ্গেই চল্‌ল। ঝরিয়া চাকরটা গোলমালে উঠে পড়ে এতক্ষণ ইঞ্চি দুয়েক হাঁ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, আমরা ফুটপাথে পা দেবামাত্রই সে সশব্দে কপাট বন্ধ করে দিলে।

ভদ্রলোকের বাড়ী খুব নিকটেই, একই ফুটপাথ, কয়েকটা বাড়ী পার হয়ে একটা সরু গলিতে ঢুক্‌লেই হয়। দুর্গন্ধময় স্যাঁৎসেঁতে একতলা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌লাম; এইরকম বাড়ীর সঙ্গেই ডাক্তার হবার পর থেকে আমার বেশী পরিচয়। এইটা চিরকালই দেখ্‌ছি যে ডাক্তার ডাক্‌বার ক্ষমতা যার যত কম, প্রয়োজন তার সেই অনুপাতেই যেন বেশী।

দোতলার একটি ছোট ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বল্‌ছে, একখানা তক্তপোষের উপর একটি চার-পাঁচ বছরের মেয়েকে কোলে করে একটি মেয়ে বসে আছে, আমাকে দেখেই সে ঘোম্‌টা টেনে দিলে। ঘরের মধ্যে আর-একজন বয়স্থা মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আমাকে দেখেই পাশের ঘরে চলে গেলেন।

মেয়েটি একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। তাকে পরীক্ষা করে এবং তার বাড়ীর লোকদের প্রশ্ন করে বুঝ্‌লাম যে মারাত্মক কিছুই নয়, তবে আমাকে ডেকে ভালই করেছে। মেয়ের মা আমার সঙ্গে কথা বল্‌লেন না, কাজেই বিশেষ কাউকে সম্বোধন না করে, মেয়ের শুশ্রূষা এবং পথ্য সম্বন্ধে কয়েকটা উপদেশ আউড়ে গেলাম এবং একখানা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখে বাড়ীর কর্ত্তার হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরবার চেষ্টা দেখ্‌লাম। এই রকম ছোটো দরজাওয়ালা বাড়ীতেই চিরকাল ঢুক্‌তে হবে জেনেও যে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আমার শরীরটাকে কেন এত অনাবশ্যক লম্বা করেছিলেন তা বুঝ্‌তে পারি না। মাথায় একটা চৌকাঠের ঠোক্কর খাওয়া যেন আমার রোগী দেখারই একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কপালে হাত বুলোতে বুলোতে প্রায় সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে এসেছি, এমন সময় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে পিছন থেকে বলে উঠ্‌লেন "ডাক্তারবাবু, একটু দাঁড়ান।"

আমায় আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান মনে করে ফিরে দাঁড়ালাম। দেখি ভদ্রলোক পকেট থেকে খান দুই নোট টেনে বার কর্‌ছেন এবং বন্ধুবর সুরেন অত্যন্ত উদাসীন মুখ করে তার পিছনে দাঁড়িয়ে। আমি গৃহস্বামীকে বাধা দিয়ে বল্‌লাম "আপনি টাকা রেখে দিন, এ বাড়ীতে আমি টাকা নেবো না।"

ভদ্রলোক সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সুরেন যে অবাক হয়েছে তা তার মুখ দেখেই বুঝ্‌লাম, তার বন্ধুর যে মাসে দু-তিন হাজার টাকা আয় এই রকম উপায়ে কি করে হয়, তা বোধ হয় সে স্থির কর্‌তে পার্‌ছিল না।

ভদ্রলোক খানিক পরে আম্‌তা আম্‌তা করে আবার বল্‌লেন "আপনি টাকা না নিলে আমি ভারি দুঃখিত হব। আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু ওটি আমার বোনের মেয়ে, তার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা বেশ ভাল, আপনি অতিশয় মহৎ লোক তা জানি, কিন্তু তবু......"

আমি তাঁকে কথা শেষ কর্‌তে না দিয়েই বল্‌লাম, "আমি আপনাকে গরীব ভেবে টাকা নিচ্ছি না মনে করে আপনি সঙ্কুচিত হবেন না। অনেক রাজারাজ্‌ড়ার বাড়ীও আমি টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি। কোনো মেয়ের চিকিৎসা করে আমি কখনো টাকা নিই না।"

আর বেশী কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়্‌লাম, সুরেন্দ্রনাথও আমার পিছনেই বেরিয়ে এলেন। রাস্তা তখন প্রায় নির্জ্জন নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিদ্রাকাতর ঝরিয়াকে দিয়ে দরজা খোলাতে আধঘণ্টাখানিক কেটে গেল। সুরেন ঘরে ঢুকেই খাটে শুয়ে পড়্‌ল। আমি আর ঘুমের আশা না করে রাস্তার উপরের বারাণ্ডাস্থিত ইজিচেয়ারখানার দেহ প্রসারিত কর্‌লাম। কিন্তু আশা ছাড়্‌বামাত্রই দেখ্‌লাম ঘুম এসে গেল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে সুরেনের ব্যগ্র

মুখখানাই আগে চোখে পড়্‌ল। বল্‌লাম "তোমাকে আর জিজ্ঞাসা কর্‌বার কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হবে না, আমিই তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার দিকের জবাবটা দিচ্ছি। কেবল একটু সবুর কর, চায়ের পেয়ালাটা খালি হোক, এবং আমার শিশু রোগিণীটিকে আর একবার দেখে আসি। তার পর ত লম্বা অবসর।"

ছুটো কাজে খুব বেশী সময় যায়নি, তবে সুরেনের ধৈর্য্য বোধ হয় তাতেই টুটবার জোগাড় কর্‌ছিল। কাজেই আর দেরি করা চল্‌ল না।

(২)

সেই বছর আমি সবে মেডিক্যাল কলেজের দরজা পার হয়ে এসেছি। উত্তীর্ণদের নামের তালিকার চূড়াতে নামটা ছিল বলেই হোক কি বাবার কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার বন্ধুর দয়াতেই হোক, আমাকে রোগী পাবার জন্যে বিশেষ তপস্যা কর্‌তে হয়নি, তারা মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত নিজেই এসে জুট্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বাবা খুব বড়লোক না হলেও কল্‌কাতায় তাঁর একখানা বাড়ী ছিল। তাঁরা সদলে দেশে থাক্‌তেন, কাজেই আমি বাড়ীখানাকে ভাড়াটের কবলমুক্ত করে, চেয়ার টেবিল কাঁচের শিশি এবং কাঠের অল্‌মারি দিয়ে সাজিয়ে বেশ দিগ্‌গজ ডাক্তার হয়ে বস্‌লাম।

সেবার কল্‌কাতায় গরমটা বেশ অসাধারণ রকমেরই পড়েছিল, তবু খবরের কাগজে পশ্চিমের গরম সম্বন্ধে যা পড়্‌তাম তাতে আমাদের চক্ষুস্থির হবার জোগাড় হত। তখনও খবরের কাগজ পড়্‌বার সময় ছিল; রোগী আস্‌ত বটে, তবে দিনরাতের প্রভেদ তখনও ঘুচে যায়নি।

সেদিন বিকেলে ধড়াচূড়া এঁটে একবার আমার round-এ বেরোবার জোগাড় কর্‌ছি, এমন সময় বন্ধুবর নলিনীকান্ত হাজির। আমায় দেখে বল্‌লে "ওহে দাঁড়াও না, ভারি যে মাতব্বরের মত পা ফেলে চলেছ, এর পর দেখ্‌ছি আর আমাদের মত layman-দের চিন্‌তেই পার্‌বে না। রুগীগুলো না হয় আর দিন কয়েক বেঁচেই রইল, এতদিন পরে এলুম, না হয় দুটো কথাই বল্‌লে!"

টুপী হাতে নিয়ে আবার বস্‌বার ঘরে ফিরে এলাম। বাস্তবিকই যে কাজের খুব তাড়া ছিল তা নয়, অভ্যাস-মত এমনই বেরোচ্ছিলাম।

নলিনী একটা গদিওয়ালা চেয়ার বেছে নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়্‌ল, আমায় বল্‌লে "ফ্যানটা খোলো না, আচ্ছা অতিথিপরায়ণ লোক যা হোক। আঃ বাঁচা গেল! তা ভাল কথা, যে জন্যে এসেছি সেইটে আগে বলে নিই। আমার মামার এলাহাবাদে একখানা বাড়ী আছে জানো বোধ হয়। তোফা জায়গা এলাহাবাদ, এ কথা তোমাদের ডাক্তার ভায়ারাও স্বীকার করেন। মামা ত মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে চলেছেন, বাড়ীটা থাক্‌বে খালি পড়ে। কাজেই আমার মা সেইখানে গ্রীষ্মযাপন কর্‌বার চেষ্টায় আছেন। ঠিক দার্জ্জিলিংএর মত ঠেক্‌ছে না, তা মায়ের প্রয়াগতীর্থ দেখ্‌বার লোভ গরম ভোগের ভয়ের চেয়ে অনেক বেশী। আমাকে ধরেছেন সঙ্গে যেতে। আমি ত তাই ঐ একদল মেয়েমানুষের মধ্যে মারা যাব, যদি তুমি দয়া না কর; একটা পনেরো বছরের ছেলেও নেই দলের মধ্যে, আর আমার ইনি ত এখনও দিব্যি বাপের বাড়ী বসে আছেন। কি বল?"

আমি বল্‌লাম "কিছু বল্‌বার আগে ব্যাপারটা বোঝা দর্‌কার। আমার দয়াটা কি ভাবে কর্‌তে হবে ঠিক বুঝ্‌ছি না। তুমি মারা যাবার জোগাড় কর্‌লে এলাহাবাদ গিয়ে তোমার উদ্যম ব্যর্থ কর্‌তে হবে, না তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার প্রবাসদুঃখ লাঘব কর্‌তে হবে, না তোমার 'ইনি'কে তাঁর বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আস্‌তে হবে?"

নলিনী অধীর হয়ে বলে উঠ্‌ল "তোমাকে এতটা গাধা চট্ করে এই গরমের দিনেও ভাবতে পার্‌ছি না। ভয়ানক খাটুনি। আমার সঙ্গে যেতে হবে, বুঝ্‌লে?"

"বুঝ্‌লাম ত, কিন্তু সবে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেছি এরি মধ্যে......"

"রেখে দাও তোমার প্র্যাক্‌টিস! পনেরো দিনের ত মামলা, তারি মধ্যে তোমার প্র্যাক্‌টিস্ একেবারে উবে যাবে আর কি? পনেরো দিনের বেশী দেরি হবে না, এ আমি তোমায় গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

খানিকক্ষণ এ-ধার ও-ধার ভেবে রাজি হয়ে গেলাম। পশ্চিম বেড়ানোর সখ চিরকালই প্রবল ছিল, কাজেই বেশী

ভেদাভেদির দর্‌কার হল না। তার পরদিন পঞ্জাব মেলে যাত্রা কর্‌তে হবে, সে খবরটা দিয়ে নলিনীকান্ত প্রস্থান কর্‌লেন।

যথাকালে হাবড়ার জনসমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিলাম। একটু খোঁজ নিয়েই দেখি সাবধানী বন্ধু নলিনী অনেক আগেই এসে পৌঁছেচেন এবং একদল মহিলা সঙ্গে নিয়ে আকুলভাবে তাঁদের এবং অসংখ্য বাক্স, প্যাঁট্‌রা, ছেঁড়া বেতের বাক্স, ময়লা কাপড়ের পুঁট্‌লি, তর্‌কারি-বোঝাই ধামা এবং নারকেল-দড়ী দিয়ে অসম্পূর্ণভাবে বাঁধা বিছানার পোঁটলার সুগতি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন। আমার একমাত্র 'সুটকেস্'টাকে দারোয়ানের জিম্মায় রেখে আমি তার সাহায্যার্থে অগ্রসর হলাম। অনেক কষ্টে স্থাবর এবং জঙ্গম সকল রকমের মাল একটি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের মেয়েদের গাড়ীতে তুলে দিলাম। নলিনী তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগ্‌ল। একমাত্র বন্ধুপ্রীতিই যে তাকে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়েছে তা তার ব্যাপার দেখে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লাম না। মেয়েদের গাড়ী থেকে অনেক জোড়া চোখের দৃষ্টি আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে দেখে আমি একটু অবজ্ঞামিশ্রিত আনন্দ অনুভব কর্‌লাম, সেকালে নিজের চেহারার গর্ব্ব আমার ডাক্তারিতে কৃতিত্বের গর্ব্বের চেয়েও অনেক বেশী ছিল।

যাক, গাড়ীত অবশেষে ছাড়্‌ল, এবং প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমাদের যথাস্থানে নামিয়েও দিলে। নলিনীকান্তের মামার বাড়ী বিশেষ লোভনীয় জায়গায় নয়। পশ্চিমের যে উজ্জ্বল চিত্র কল্পনার রংএ মনে এঁকে রেখেছিলাম, তা এই খোলার বাড়ীতে পরিবেষ্টিত সিন্দুকের মত দোতলা বাড়ীটার ঢুকে একেবারে যেন নিরাশায় ম্লান হয়ে গেল। নলিনী একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্‌লে "এমন জায়গায় বাড়ী তা ত জান্‌তাম না, যাক্‌গে আমরা ত বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটাব।"

একটু বিশ্রামের পর বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরুনো গেল। সহরের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। পশ্চিম নিজের যথার্থ শ্রী দেখিয়ে আমার মনের অশান্তিকে নিমেষে দূর করে দিলে, বুঝ্‌লাম তাকে কল্পনায় যতটা সুন্দর ভেবেছিলাম, বাস্তবপক্ষে সে তার চেয়েও সুন্দর। আমার মুগ্ধভাব দেখে নলিনীর মুখে এমন গর্ব্বের হাসি ফুটে উঠ্‌ল যেন এলাহাবাদ সহরটা সে সবে সর্‌কার থেকে উপহার লাভ করেছে।

কিন্তু মুক্ত আকাশ যতই সুন্দর হোক আর নীড় যতই বদ্ধ আর কুৎসিত হোক, পাখীকে সন্ধ্যাশেষে সেখানে ফির্‌তেই হয়। বেড়ানো শেষ করে আবার অপ্রসন্ন চিত্তে সেই ইঁটকাঠের খোপটির মধ্যে ঢুক্‌তে হল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সাম্‌নের সরু বারাণ্ডাতে দুখানা দড়ীর খাটিয়া টেনে নিয়ে দুজনে শোবার আয়োজন কর্‌লাম। অসহ্য গরম, হাওয়ার প্রবেশ-পথ কোনো দিকে নেই। খোলার ঘরের মধুচক্রের মত বস্তি চারিদিক একেবারে ঘিরে রেখেছে, তার মাঝে মাঝে এক-একখানা দোতলা কি তেতলা বাড়ী তাদের সরু সরু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

সারারাত গরমের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভোররাত্রের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু সে ঘুম বেশীক্ষণ টিক্‌ল না। পাশের কোন্ এক বাড়ী থেকে একটা অশুভ কান্নার রোল এসে নিমেষে ঘুমকে যে কোথায় বিদায় করে দিলে তার ঠিক নেই। নলিনী আঁৎকে খাট ছেড়ে উঠে পড়ে "এ রামভরসা, রামভরসা" করে চাকরকে ডাকাডাকি সুরু করে দিলে। কান্নার শব্দ তখন যেন আকাশ ছিঁড়ে ফেল্‌ছে। আমাদের বাড়ীর লোকজন সবাই উঠে পড়েছে, ছোট ছেলেমেয়ের দল ভয়ে কাঁদ্‌তে সুরু করে দিয়েছে। অনেক ডাকাডাকির পর রামভরসা নিদ্রাত্যাগ করে উঠে এলেন। তাকে কান্নার কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে পাঠানো হল। আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে সেই অজ্ঞাত শোকের নিকেতন খোলার ঘরের স্তূপটির দিকে চেয়ে রইলাম। বাড়ীর মেয়েরা সব দরজার আড়ালে ভীড় করে দাঁড়াল।

রামভরসা এসে খবর দিলেন যে পাশের খোলার ঘর-খানায় দুজন লোকের 'বেমারি' হয়েছিল, তারা মারা যাওয়াতেই এই কান্নাকাটি হচ্ছে।

নলিনী মুখ ফ্যাকাশে করে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কি বেমারি রে?"

"পিলেগ বাবু।"

নলিনী ধপ্ করে খাটের উপর বসে পড়ল। ঘরের মধ্যে একজন কে নারীকণ্ঠে বলে উঠ্ল "মাগো, এ কি সর্ব্বনাশ, এমন জায়গায় ছেলেপিলে নিয়ে কেন এলুম!"

আর একজন "কি হবে মা?" বলে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্ল।

আমি বাড়ীর মেয়েদের সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছায় একটু উঁচু গলায় বল্লাম "নলিনী, ওঁদের ভয় পেতে বারণ কর; কাছে প্লেগ হলেই যে বাড়ীতেও হবে এমন কোনো কথা নেই।"

নলিনী উঠে ক্রন্দনরতা মহিলামণ্ডলীকে আশ্বস্ত করতে ঘরে ঢুকল। আমি বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সেই খোলার ঘরের অধিবাসীগুলির কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগ্লাম। প্লেগ এত কাছে কখনও দেখিনি, কাজেই ভয় একটু হলেও ডাক্তার-জনোচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে সব পর্য্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগ্লাম। যমরাজের স্কুলেরই ছাত্র আমরা, কাজেই খুব বেশী ভয় পেলে নিজেরই কাছে নিজের মান থাকে না।

প্রথমে দেখ্লাম, খানছই গোরুর গাড়ী বোঝাই করে একদল মেয়ে আর ছোট ছেলেপিলে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় হল। হুজন জোয়ান পুরুষমানুষ তাদের বিদায় করে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরে, একদল মানুষ একখানা খাটিয়া এনে হাজির করল, বুঝ্লাম এইবার মহাযাত্রার আয়োজন। একই খাটে একজন আধবয়সী মেয়ে আর একটি ছোট্ট ছেলের দেহ তুলে নিয়ে তারা "রাম নাম সত্য হায়" রবে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই পুরুষ হুজন তখন ঘরে ঢুকে একটা ভাঙা টিনের বাক্স বার করে আন্লে, একজনের হাতে একটা তালা আর চাবী। হটাৎ একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্ত চীৎকারে আমার বুক কেঁপে উঠ্ল। যার হাতে তালা ছিল সে একটা কুৎসিত গালাগালি উচ্চারণ করে গর্জ্জন করে উঠ্ল, তখুনি দরজায় শিকল তুলে দিয়ে তালা বন্ধ করে সঙ্গীর সঙ্গে টিনের বাক্সটা নিয়ে প্রস্থান করল।

আমি এই অভিনব ব্যাপারের মানেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটা ভীত কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছল "ওগো মাগো! কি কাণ্ড! অসুখে মেয়েটাকে তালা দিয়ে সবাই পালিয়ে গেল!"

চমকে সেই দিকে ফিরে চাইলাম, দেখ্লাম সাম্নের বাড়ীর ছাতের উপর দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আল্সের উপর ঝুঁকে পড়ে সাম্নের মরণনাট্যের অভিনয় দেখছে। আমাকে তাদের দিকে তাকাতে দেখে তারা সরে গেল।

এতক্ষণে তালাবন্ধ করার মানে বুঝ্লাম। মানুষের মধ্যে শয়তান যে এমন করে লুকিয়ে থাকে তা কখনও কল্পনাও করিনি। প্রাণের ভয় এম্নিই জিনিস। আমি হতবুদ্ধি হয়ে খাটের উপর বসে রইলাম, আমার কয়েক গজ দূরেই একটা মানুষ জীবন্ত সমাধি লাভ করছে, অথচ তার উদ্ধারের কোনো উপায়ই আমার মাথায় এল না। প্রাণপণে ভাবতে লাগ্লাম, কপালের শিরা যেন দপ্‌দপ্ করতে লাগ্ল।

কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না, হটাৎ চমক ভেঙে গেল, মনে হল যেন ঘুমিয়ে উঠ্লাম। নলিনী আমার কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলে বল্লে "আজ আর নাইবে খাবে না নাকি?"

খাবারের নামে আমার মনে যে একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠ্ল সে আর কি বল্ব। হটাৎ আমি অনুভব করলাম যে আমার মাথা ভার হয়ে উঠেছে, চোখ জ্বালা করছে, হাত-পা নাড়বারও যেন শক্তি নেই। হাড়ের ভিতর দিয়ে যেন বরফ-গলা জল বয়ে যাচ্ছে; সে কি ভীষণ শীত! আমি অনেক কষ্টে নলিনীর দিকে ফিরে বল্লাম, "ভাই, আমার শরীর একেবারেই ভাল লাগ্ছে না, আমি খাব না। তোমরা খাও গিয়ে, আমার বোধ হয় জ্বর এসেছে।"

নলিনীর সে মুখ আমার এত বৎসর পরেও পরিষ্কার মনে আছে। সাক্ষাৎ দণ্ডধারী যমরাজকে সাম্নে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ্লে বোধ হয় মানুষের অম্নি মুখ হয়। সে দশ হাত পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠ্ল "এ্যাঁ এ্যাঁ তাই নাকি? কখন জ্বর হল?"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে পিছন হাঁটতে হাঁটতে ঘরে ঢুকে পড়ল, বোধ হয় তার ভয় ছিল যে পিছন

ফিরলেই রোগটা তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়্‌বে। আমি সেই খাটিয়ার উপর গড়িয়ে পড়্‌লাম, অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় তোষক বিছানার-চাদর যা হাতের কাছে পেলাম তাই টেনে টেনে গায়ে দিতে লাগ্‌লাম।

জ্ঞান এক-একবার বেশ টন্‌টনে হয়ে উঠ্‌ছিল। তখন বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম যে আমার চারপাশে একটা ডাকা-ডাকি হাঁকাহাঁকি চলেছে, বিছানা বাক্স গোছানো হচ্ছে, কিন্তু এ-সকলের মানেটা ভাল করে মাথায় বস্‌বার আগেই আবার মস্তিষ্ক কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তখন যে মাথার মধ্যে কি ছায়ানাট্যের অভিনয় চলেছিল, তা কোনও চিহ্ন রাখেনি, কাজেই এখন মনে আন্‌তে পারি না।

সেই স্বপ্নলোকের মাঝে হটাৎ নলিনী তার অতি বাস্তব চেহারা এবং কথা এনে ফেল্‌ল। মাঝে অনেকখানি তফাৎ রেখে সে বলে উঠ্‌ল "ভাই প্রিয়, মা কিছুতেই আর ছেলেপিলে নিয়ে এখানে থাকৃতে চাইছেন না, তুমি ডাক্তার মানুষ, তোমার ত কিছু বুঝ্‌তে বাকি নেই। ওঁদের আমি ষ্টেসনে তুলে দিয়ে আস্‌ছি, পথেই হস্‌পিটাল, সেখানেও খবর দেব। রামভরসা রইল, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। এই ঘরে বিছানা করিয়ে রেখেছি, আমিই তোমায় জোর করে এখানে নিয়ে এসে এমন বিপদে ফেল্‌লাম, এতে যে আমার মনে কি হচ্ছে তা আর কি বল্‌ব।"

আমি তার কথাগুলো শুনে গেলাম মাত্র, মানে বোধ হয় কিছুই বুঝিনি। খোলার ঘরের দৃশ্য যে আবার এই পাকাবাড়ীতেও অভিনীত হচ্ছে তা আমার অচেতন মন অনুভবও কর্‌তে পার্‌ল না, আমি যেমন পড়ে ছিলাম, তেমনি পড়েই রইলাম। নলিনীরা যে কখন সদলে প্রস্থান কর্‌ল তা জানিও না।

সন্ধ্যার সময় একটা উৎকট জলতৃষ্ণা আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌লে। চোখ চাইলাম, চারিদিক অন্ধকার, নীরব। "জল, জল" বলে কয়েকবার চীৎকার কর্‌লাম, কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। আমার সমস্ত শরীর তখন জলের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। আমি খাট ছেড়ে টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালাম, ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌লাম। কিন্তু সেই অন্ধকারে জল কোথায় খুঁজে পাব? নলিনীর নাম ধরে ডাক্‌লাম, সাড়া নেই; চাকরটাকে ডাক্‌লাম, কোনোই উত্তর পেলাম না। তখন এক মুহূর্ত্তে নিজের ভীষণ অবস্থা আমার মনে পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ল; আমার প্লেগ হয়েছে, আর তাই আমাকে ফেলে সবাই পালিয়ে গিয়েছে, জলও কেউ একফোঁটা দেবে না। এগোতে গিয়ে একখানা খাটের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম, তারি উপর শুয়ে পড়্‌লাম। বিকার আর চেতনা আমাকে দুই দিক থেকে ধরে যেন টানাটানি কর্‌তে লাগ্‌ল।

চোখের উপর যেন একটা আলোর রেখা এসে পড়্‌ল, আমি চোখ খুলে তাকালাম। জ্বরের ঘোরে সাধারণ আর অসাধারণের সীমারেখা হারিয়ে ফেলেছিলাম; কেবল দেখাই দেখ্‌লাম, মনে কিছুই ভাব্‌লাম না। আলো হাতে করে একটি মেয়ে ঘরে এসে ঢুকেছে, তার হাতে একটি কাঁচের গেলাস। নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় আমি 'জল জল' কর্‌ছিলাম; সে ঘরের ভিতরের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আমার মুখের কাছে এনে ধর্‌ল, আমি এক নিশ্বাসে গেলাস খালি করে বল্‌লাম, "আরো জল।" মেয়েটি আবার জল গড়িয়ে নিয়ে এল। আমি জল খেয়ে আবার খাটে শুয়ে পড়্‌লাম। মেয়েটি ঘুরে ঘুরে ঘরের চারিদিকে ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌ল। আমি চোখ চেয়ে আছি দেখে সে আমার কাছে এসে বল্‌লে "এ বাড়ীর আর সবাই কোথায় গেল? আরো যে অনেক লোক ছিল?"

জল খেয়ে আমি একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলাম, বল্‌লাম, "আমার প্লেগ হয়েছে মনে করে সবাই আমায় ফেলে পালিয়েছে।"

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর কুঁজো আর গেলাসটা আমার খাটের পাশে একটা চেয়ারে এনে রেখে বল্‌লে "জল আপনার কাছে রেখে গেলাম, আলোটাও রইল। আমার মায়ের অসুখ করেছে, তাঁর কাছে আমার এক যমজ বোন ছাড়া আর কেউ নেই। কাল সকালে আবার আস্‌ব।"

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমি আবার একলা পড়্‌লাম। রাতটা আধ-ঘুম আধ-জাগার মধ্যে কেটে গেল। সকাল বেলা চোখ চেয়ে দেখ্‌লাম জান্‌লার ফাঁক দিয়ে

ঘরে রোদ ঢুক্‌তে আরম্ভ করেছে। খাটের উপর উঠে বস্‌লাম, নিজেই নিজের নাড়ী দেখে বুঝ্‌লাম তখনও বেশ জ্বর, তবে কালকের চেয়ে নিশ্চয়ই কম। প্লেগের কোনো লক্ষণ শরীরে খুঁজে পেলাম না। বুঝ্‌লাম আমার বাল্যসঙ্গী ম্যালেরিয়াই কোনো কারণে প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধরে এতদিন পরে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন। কিন্তু প্লেগ হতে ত আটক নেই, পালাবার ক্ষমতা থাক্‌লে পালাতাম, কিন্তু আমার লম্বা চওড়া চেহারার মধ্যে ষ্টেসনে গিয়ে পৌঁছবার শক্তিটুকুরও কোনো খোঁজ পেলাম না। জ্বর ত খুবই ছিল, তার উপর ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার অপরিচিতা করুণাময়ীর হাতের দেওয়া জল ছাড়া আর কিছুই পেটে যায়নি। আর কিছু সংগ্রহ কর্‌বারও কোনো উপায় দেখ্‌লাম না, আশাহীনের আশা নিয়ে সেই শ্মশানপুরীতে একলাই পড়ে রইলাম। প্লেগে না মর্‌লেও না-খেয়ে মর্‌বার সম্ভাবনা মনে ক্রমেই জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আমার প্রতিবেশী খোলারঘরবাসীদের পল্লী থেকে আজও সেই কান্নার শব্দ আস্‌ছিল, যমরাজ বোধ হয় ঐ দরিদ্রদের ঘর থেকে নিজের কর খুব পুরোপুরি রকমই আদায় কর্‌ছিলেন। বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনে সেই দিকে মুখটা ফেরালাম। মেয়েটি আস্তে আস্তে এসে ঘরে ঢুক্‌ল। রোগীর পথ্য দেখ্‌লাম অনেক রকমই সংগ্রহ করে এনেছে, আমার বিছানার পাশে সে-সব একে একে নামিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌ল। কাল্ রাত্রে তাকে ভাল করে চেয়েও দেখিনি, আজ সেই ভুলটা সংশোধন করে নিলাম।

অন্য সময় তাকে দেখ্‌লে হয়ত সুন্দর ভাব্‌তাম না। কিন্তু সেই শ্মশানের ছায়াচ্ছন্ন দেশে তাকে আমার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের মতই সুন্দর লেগেছিল। চারিদিকের করাল পৈশাচিকতার মধ্যে সে একলা অসহায় দাঁড়িয়ে যেন জানাচ্ছিল যে জগতে করুণার উৎস এখনও শুকিয়ে যায়নি; পিশাচের হাত বার্‌বার তাকে পঙ্কিল করে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে, কিন্তু সে এখনও নিজের নির্ম্মলতা রক্ষা করে চল্‌ছে। তাকে দেখে হয়ত আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা ভাষায় জানানো উচিত ছিল, কিন্তু আমি সে রকম একটা কথাও না বলে বল্‌লাম "তুমি এত দেরি কর্‌লে কেন ?"

সে সহজভাবেই বল্‌লে "আমার মাকে খাইয়ে এলাম কিনা, তাই একটু দেরি হল। আপনি আজ একটু ভাল আছেন, না ?"

আমাদের অবস্থার মধ্যে কোথাও যে আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে তা কেউ স্বীকার কর্‌লাম না। একান্ত প্রাপ্য ভাবেই আমি তার যত্ন সেবা সবই গ্রহণ কর্‌লাম, সেও সেই ভাবেই যেন সব করে গেল।

একটু পরে আমি বল্‌লাম "তুমি কি করে জান্‌লে যে আমায় সবাই একলা ফেলে পালিয়েছে ?"

মেয়েটি বল্‌লে "আমাদের বাড়ী যে খুব কাছেই। ঐ যে সাম্‌নের বাড়ীটা, ওরি একটু দূরে। ওদের বাড়ী বেড়াতে এসে দেখেছিলাম যে এ বাড়ীতে অনেক লোক। তারপর বিকেলে দেখ্‌লাম তারা সবাই জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ী করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; আপনাদের চাকরটাকেও সন্ধ্যেবেলা পালাতে দেখে তাকে জিগ্‌গেস কর্‌লাম, সে বল্‌লে একজন বাবুর প্লেগ হয়েছে, তাই সবাই পালাচ্ছে। আমার মায়েরও হয়েছিল, তিনি এখন সেরে উঠেছেন; তাই আমি এখানে এলাম, আমার ছোট বোন তাঁর কাছে বসে আছে।"

আমি বল্‌লাম "তোমার ভয় করে না ?"

সে বল্‌লে "না, আমার মায়েরও ত হয়েছিল, তিনি ত বেঁচে আছেন, আপনিও সেরে যাবেন।"

আমি বল্‌লাম "হাঁ, সার্‌বই মনে হচ্ছে, আমার প্লেগ হয়নি, এম্‌নিই জ্বর। আচ্ছা, তোমার নাম কি ?"

"মঞ্জরী। আচ্ছা, আমি এখনি যাই, কেমন ? আবার বিকেলে আস্‌ব।"

সে একটা শাদা ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছিল, সেইটা আবার মাথায় তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এখন আমার মনে কর্‌লেই অবাক লাগে যে মঞ্জরীর অকস্মাৎ আবির্ভাব আমাকে কেন একটুও বিস্মিত করেনি, তাকে যেন আমি চিরদিনই চিন্‌তাম, যেন আমার রোগ-শয্যার পাশে তার ফুলের মত মুখখানি দেখার মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। সে একান্ত অপরিচিত, তবু তাকে চিরপরিচিত বলে ভাব্‌লাম কেন ?

বিকেলের দিকে জ্বর ছেড়ে এল। ব্যগ্র হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইলাম, কখন সে আসে। ঘরে সন্ধ্যার

ছায়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেও এসে ঢুক্‌ল। আমি জান্‌তাম যে আমার সাংঘাতিক কোনো রোগ হয়নি, তবু যতক্ষণ একলা থাক্‌তাম মনে হত যেন আশে পাশে অসংখ্য যমদূত ঘুরছে, তারা বুঝি এই আমার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু মঞ্জরীকে দেখ্‌লেই সে ভয় চলে যেত, জীবন-নির্ঝরিণীর আনন্দ-কলধ্বনি যেন চারিদিক স্তরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌ত, মনে হত মৃত্যু তার সব বিভীষিকা নিয়ে দূরে চলে গিয়েছে।

মঞ্জরী পাঁচ দশ মিনিটের বেশী বস্‌ত না, তার করণীয় কাজগুলি লঘুক্ষিপ্রহাতে করে দিয়ে হাসিমুখে কয়েকটা কথা বলেই সে চলে যেত। আজও তাই গেল।

পরদিন ভোরে দেখ্‌লাম জ্বর বিদায় নিয়েছেন; দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কোনো রোগ নেই। পরম উৎসাহে মঞ্জরীর আনীত যা-কিছু খাদ্য সাম্‌নে দেখ্‌লাম সবই শেষ করে ফেল্‌লাম। তারপর আর কোনো কাজ না থাকাতে বাইরের সেই খাটিয়াখানায় গিয়ে বস্‌লাম। খোলার ঘরের অধিকাংশগুলোই তালাবন্ধ, জীবনের লক্ষণ কোথাও বিশেষ দেখা গেল না। সবাই মরেছে, না হয় পালিয়েছে। সাম্‌নের যে বাড়ীর ছাতে মঞ্জরীকে প্রথম দেখেছিলাম সেখানেও তেমনি অবস্থা। উৎসুক হয়ে চারিদিকের সব বাড়ীগুলোর দিকে তাকাতে লাগ্‌লাম, এর ভিতর কোন্‌টিতে আমার সেই মৃতসঞ্জীবনী সুধাটি লুকিয়ে আছে! মাথা প্রকৃতিস্থ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে হাজার রকম কথা এসে জমে গেল—কে সে, কেন এল, কোথায় থাকে, কাদের মেয়ে, বাঙালী না হিন্দুস্থানী? আজ তার কাছে সব খবর নেব এবং তাকে কৃতজ্ঞতা জানাব ঠিক করে উৎসুক হয়ে বসে রইলাম।

কিন্তু সে আর এল না। সারাদিন পথের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ ক্লান্ত হয়ে এল, দুর্ব্বল শরীরেই কতবার যে ঘর আর বার কর্‌লাম তার ঠিক নেই, কিন্তু সেই যমশাসিত মরুভূমিতে মঞ্জরীকে খুঁজে পেলাম না। সন্ধ্যা নেমে এল, কিন্তু তার সন্ধের সন্ধ্যাতারাটিকে কোন্ চিররাহু গ্রাস কর্‌লে? আজ অন্ধকার আমার ঘরে একলা রাজত্ব কর্‌তে লাগ্‌ল, মরণের রাগিণীকে বাধা দেবার জন্যেও আর কোনো জীবন-বীণায় তার ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল না।

সারারাত কেবলি চম্‌কে চম্‌কে ঘুম ভেঙে যেতে লাগ্‌ল, ঐ বুঝি আস্‌ছে। কিন্তু বুকভরা আশা নিয়েও আমার নিরাশায় পাওয়া ধনের দেখা পেলাম না। সকাল-বেলা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। নলিনীকান্ত পালাবার সময় আমার সুটকেসটাও নিয়ে পালাননি এইমাত্র তাঁর দয়ার পরিচয় পেলাম। সৌভাগ্যক্রমে টাকাকড়ি কিঞ্চিৎ সঙ্গে এনেছিলাম, কাজেই অনাহারে মর্‌বার কোনো ভয় ছিল না। পথে পা দিয়েই একখানা গাড়ী পেলাম, তাতে চড়ে বসে প্রথমতঃ পথ্যের অনুসন্ধানে যাত্রা কর্‌লাম। নলিনীর মামাবাড়ী আর ফির্‌ব নাই ঠিক্ করেছিলাম, তাঁদের খাট কুর্সী তদারক কর্‌বার মত কাউকে পেলাম না, কাজেই দরজায় শিকল দিয়েই বেরিয়ে পড়্‌তে হল। উপস্থিত প্রয়োজন মিট্‌বামাত্র মনে পড়্‌ল মঞ্জরীর খোঁজ নিতে হবে। কিন্তু সে কোথায় থাকে, কাদের বাড়ীর মেয়ে, কিছুই যে জানি না। সে মঞ্জরী—এইটুকু পরিচয়ই আমার কাছে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু অন্যের কাছে ত তা নয়। কাছেই থাকে। কিন্তু সে ত অনেকেই থাকে, তাদের মধ্যে খুঁজে পাব কি করে?

বিশেষ আশা ছিল না, তবু কাছাকাছি সব কটা পাকা-বাড়ীতে সন্ধান কর্‌লাম, কিন্তু খোঁজ কিছুই পেলাম না। অনেকগুলোতেই তালা বন্ধ, দু-চারটেতে চৌকীদারী কর্‌বার জন্যে খোট্টা চাকরের অবস্থান। সবাই প্রায় এক কথা বলে, "পিলেগ" আরম্ভ হতেই বাবুরা দেশে চলে গিয়েছে। বাবুদের খোঁজে আমার কোনো দর্‌কার ছিল না, সেইটাই প্রচুর পরিমাণে পেলাম, জগতে অযাচিতটা এমনিই সুলভ! এতে অবাক্ই বা হই কেন, আমাদের ঘরের কোণেই যে কত মঞ্জরী ফুটে উঠে কখন ঝরে যায় তারি খোঁজ আমরা রাখি না, তা পরের মেয়ের রাখ্‌তে যাব।

দুপুর তিনটে অবধি ঘোরাঘুরি করে হাল ছেড়ে দিলাম। যার অন্তরের পরিচয় শুধু জানি তাকে বাইরে খুঁজে পাব কি করে? তার মুখ কেমন সুন্দর, তার মন কেমন কোমল, তা না জেনে, তার বাড়ীর নম্বর জান্‌লে সে ক্ষেত্রে কাজে লাগ্‌ত। তা জান্‌তাম না, কাজেই বাইরের দিকে বঞ্চিত হলাম; অন্তরের সঞ্চয় নিয়েই সে দেশ ত্যাগ কর্‌তে হল।

(৩)

কল্‌কাতায় ফিরে এলাম। নলিনী এসে একদিন প্রচুর হাহুতাশ করে অনুতাপ প্রকাশ করে গেল। 'পাইওনিয়ারে' যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম তা বেরিয়েছে কি না তাই দেখ্‌তে তখন ব্যস্ত ছিলাম, তার উচ্ছ্বাসটা তত কান পেতে নিতে পার্‌লাম না। এলাহাবাদ থেকে ফেরার পর যে কত টাকা আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর সখের ডিটেক্‌টিভদের ট্রেনভাড়া দিয়ে খরচ করেছি তা শুন্‌লে অবাক্ হয়ে যাবে, কিন্তু ফল কিছু পেলাম না।

কল্‌কাতায় বেশীদিন টিক্‌তে পার্‌লাম না। এলাহাবাদে ঘুর্‌তে গিয়ে যেন এক ভবঘুরে রোগে ধরেছিল, কত জায়গায় যে ঘুর্‌লাম তার ঠিক্ নেই,—কোথাও বা চাক্‌রী নিয়ে, কোথাও বা এম্‌নিই। কিন্তু ডাক্তারীতে পশার লাভ কর্‌বার পক্ষে ভ্রমণটা শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়, সেটা বুঝ্‌তে পেরে শেষে কানপুরে আড্ডা গাড়্‌লাম। এলাহাবাদে থাক্‌তে পার্‌লাম না, কিন্তু খুব বেশী দূরে যেতেও মন চাইল না। মাঝে মাঝে বাংলা দেশে ফির্‌তাম, আরও বেশী ফির্‌তে পার্‌তাম যদি এদেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এত বেশী না থাক্‌ত। তবে তারা এখনও হাল ছাড়েনি, আমাকেই প্রায় ছাড়াবার জোগাড় করেছে।

আমার প্রথম পশ্চিম ভ্রমণের বছর চার পরে আমার এক বোনের বিয়েতে কল্‌কাতায় আসি। দেশ থেকে বাবা মা এসে পৌঁছবার কিছু আগেই বোধ হয় আমি এসে পড়েছিলাম, একলা বাড়ীতেই নিজের খোট্টা চাকরকে নিয়ে আসর জমিয়ে বস্‌লাম। বিয়ে দেবার উপযুক্ত বাড়ী বটে, একলা আমি মানুষটাকে যেন হাঁ করে গিল্‌তে চাইত, সারা দিন মোটা মোটা বই নিয়েই বসে থাক্‌তাম।

আমি যে ঘরে আড্ডা করেছিলাম তার খোলা জান্‌লার পথে পাশের একটা ছোট দোতলা বাড়ী দেখা যেত। সে দিকে তাকালে প্রায়ই দেখ্‌তাম একজন বিপুল-শরীরধারী প্রৌঢ় ব্যক্তি তামাক টান্‌ছেন, তাঁর পাশে একটি দুতিন বছরের মেয়ে খেলা কর্‌ছে। মাঝে মাঝে ঝি এসে তাঁকে খাবার জল, পান প্রভৃতি জুগিয়ে যেত, সারাদিনের মধ্যে ভদ্রলোককে ঐ স্থানটি ত্যাগ কর্‌তে দেখ্‌তাম না। একটি বাইশ তেইশ বছরের ছেলেও যে ও-বাড়ীতে থাকে তার প্রমাণ পেয়েছিলাম, কারণ সে রোজ একগাদা বই নিয়ে দশটা সাড়ে-দশটার সময় কলেজ যেত। কখন্ ফির্‌ত তা দেখ্‌তে পেতাম না।

বাড়ীর লোকগুলির সঙ্গে কথা না বলেও আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে খুকীটির সঙ্গে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক যে তাকে খুব বেশী আমল দিতেন তা নয়; কিন্তু সে তাতে একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে পরম উৎসাহে সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে নিজের ভাষায় গল্প কর্‌ত। ঝি-টা এক-একবার এসে তাকে ভিতরে নিয়ে যেত, কিন্তু মিনিট পাঁচের মধ্যেই দেখ্‌তাম সে দুগ্ধধারায় নিজের জামা ভাল করে ভিজিয়ে যথাস্থানে ফিরে এসেছে। তার খেল্‌নার সম্পদের মধ্যে দেখ্‌তাম দুটো তিনটে মর্চ্চেধরা বড় বড় লোহার চাবী, তাদেরি ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া দিয়ে পুতুল সাজিয়ে সে নিজের সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন হয়ে উঠ্‌ত। তার কোঁক্‌ড়া চুলে ঘেরা টুল্‌টুলে মুখখানা দেখে আমার বুড়োর উপর হিংসে হত। আমি স্বচ্ছন্দেই খুকীর সঙ্গে আমার মোটা বইগুলো বদল কর্‌তে রাজি ছিলাম, তাতে সেই তামাকপ্রিয় লোকটির কিছু আপত্তি হত বলে মনে হয় না, কিন্তু জগতে যা যুক্তিসিদ্ধ তা হতে খুবই কম দেখেছি। কাজেই আমি আমার বইয়ের গাদার মধ্যে বসে রইলাম আর খুকী সেই রসগ্রাহী ব্যক্তির কানের কাছে নিজের কাকলি খরচ কর্‌তে লাগ্‌ল।

হটাৎ একদিন দেখ্‌লাম ঐ চিরস্থায়ী কায়েমী বন্দোবস্ত-ওয়ালা বাড়ীতে একটা চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাড়ীর কর্ত্তা যথাস্থানে নেই, হুঁকো কোণে ঠেশ দিয়ে একলাই পড়ে আছে। খুকীকে কোলে নিয়েই ঝি সব কাজ করে বেড়াচ্ছে, সেও একটু যেন গম্ভীর হয়ে পড়েছে। কলেজ-যাত্রী ছেলেটিকেও কলেজ যেতে দেখ্‌লাম না। একটু অবাক্ হলাম, কিন্তু কল্‌কাতার সহরে পাশের বাড়ীর লোকের খবর না নেওয়াটাই হচ্ছে নিয়ম, কাজেই চুপচাপ নিজের বইয়ের গাদার মধ্যে বসেই রইলাম।

দ্বিতীয় দিন দেখ্‌লাম, বাড়ীর কর্ত্তা যথাস্থানে বিরাজ কর্‌ছেন, যথাকর্ত্তব্যেও মন দিয়েছেন। আর সব কিন্তু তখনও তেম্‌নি ভাবেই চল্‌ছে, খুকীরও দেখা নেই। বেলা বারোটা একটার সময় একখানা ঠিকা গাড়ী এসে বাড়ীর

সামনে দাঁড়াল। একটি মহিলা আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে নেমে পড়্‌লেন, সেই ছেলেটি তাঁকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেল। কর্ত্তা একবার ভুরু কুঁচ্‌কে চেয়ে দেখ্‌লেন, কিন্তু কিছু বল্‌লেন না।

মহিলাটি অন্দরে প্রবেশ কর্‌বামাত্র ভদ্রলোক হেঁকে উঠ্‌লেন "বিমল!"

বিমল বেরিয়ে এসে বল্‌লে "কি বল্‌ছেন?"

"ওকে আন্‌তে গিয়েছিল কে?"

বিমল বল্‌লে "বৌদি সারাক্ষণই ওঁর নাম কর্‌ছিলেন তাই গিয়ে নিয়ে এসেছি।"

"গাড়ী ভাড়া দিলে কে?"

বিমল একটু যেন বিরক্ত হয়ে বল্‌লে "উনিই দিয়েছেন।" বলেই ঘরে ঢুকে গেল।

ভদ্রলোক যে তাঁর হৃদয়ের সব ভালবাসা কেবল তাঁর হুঁকোটিকেই সঁপে দেননি তা বুঝতে পার্‌লাম।

খানিক পরে বিমল আবার বেরিয়ে এসে বল্‌লে "উনি খুকীকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, বল্‌ছেন এখানে ওকে দেখ্‌বার কেউ নেই।"

গৃহস্বামী হুঁকোটা দেয়ালে ঠেশিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করে রায় দিলেন "আচ্ছা তা যাক্ নিয়ে, দিনকতক পরে আবার আন্‌লেই হবে।"

নবাগতা মহিলা খানিক পরে খুকীকে নিয়ে আবার গাড়ী চড়ে প্রস্থান কর্‌লেন। অতঃপর দিনের কাজ আবার আগের মতই চল্‌তে লাগ্‌ল, কেবল বিমলের কলেজ যাওয়াটা যেন আগাগোড়াই গোলমাল হয়ে গেল। কলেজের বদলে সে বোধ হয় সারাদিন ডিস্পেন্‌সারিতেই ছুট্‌ত, তার হাতে শিশির ঘটা দেখে অন্ততঃ আমার তাই ধারণা হয়েছিল।

আমার খোট্টা চাকর আমার ঘরে আলো রাখাটা পছন্দ কর্‌ত না, কি কারণে তা আমি এখনও ভেবে ঠিক কর্‌তে পারিনি। আমার আর সব কাজ সে ঠিক সময় এবং ঠিক ভাবে কর্‌তে কখনও ত্রুটী কর্‌ত না, কিন্তু সন্ধ্যার সময় উপরে একটা আলো আনাতে হলে আমাকে এত প্রচুর পরিমাণে চীৎকার কর্‌তে হত যে তাতে অনায়াসে কলেজ স্কোয়ারে 'বিনা-পণে বিবাহ' বিষয়ক বক্তৃতা দেওয়া চলে। চেঁচামেচির পক্ষপাতী তখন বিশেষ ছিলাম না, কাজেই চোখ জেলে বই পড়া যখন আর চল্‌ত না, তখন নিজেই নীচে গিয়ে আলো সংগ্রহ করে আন্‌তে হত।

সে দিনও ঐ উদ্দেশ্যে নীচে নেমে দেখি আমার ভৃত্য কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে আমি কত বড় "ডাঁগ্‌দার" সেই বিষয়ে জ্ঞান দান কর্‌ছেন। আর একটু এগিয়ে দেখ্‌লাম লোকটি একান্ত অপরিচিত নয়, পাশের বাড়ীর বিমল। সে আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই আমার ভৃত্যের বর্ণনাচ্ছটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমার কাছে ছুটে এসে বল্‌লে "আপনার চাকর বল্‌লে আপনার fees দশ টাকা; আমার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, পাঁচ টাকায় যদি একবার এই পাশের বাড়ীতে আসেন, আমার বৌদিদির ভয়ানক অসুখ।"

চল্‌লাম তার সঙ্গে, তবে পাশের বাড়ীর কর্ত্তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা লাভের আশা বিশেষ রাখিনি। বিমল আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। খাটের উপর তার বৌদিদি শুয়ে, আমি ত তার মুখের দিকে চেয়েই চম্‌কে উঠ্‌লাম। বিমল ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌ল, "কি, অসুখ কি খুব সাংঘাতিক? সার্‌বার আশা নেই?"

সে-সব তখনও ভাব্‌বার অবসর হয়নি। যমরাজের ছায়া যেখানে পড়ে, সেইখানে ছাড়া কি একে আমি দেখ্‌তে পাব না? কিন্তু সেবার সে সাবিত্রীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছিল, এবার নিজেই হার মেনেছে।

পরীক্ষা করা, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, সব যন্ত্রের মত করে গেলাম। মাঝে সে একবার চোখ খুলে চাইলে, কিন্তু আমাকে চিন্‌তে পেরেছে বলে মনে হল না। আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় হওয়ার আর সময় হল না। সেবার সে ছিল অজানা, এবার আমি, আর দুবারেই নেপথ্যে যমরাজ!

বিমল আমায় টাকা দিতে এল, আমি তাকে বারণ করে বল্‌লাম "আমায় এখনো অনেকবার আস্‌তে হবে, টাকা এখন থাক্।" আস্‌বার কোনই যদিও আর দর্‌কার ছিল না, তবুও আস্‌তে হবে। এত কাছে ছিল, আর সারা পৃথিবী খুঁজে এলাম?

আমি চৌকাঠ পার হবামাত্র গৃহকর্ত্তা গর্জ্জে উঠে

বল্লেন "হ্যাঁরে বিমল, কে তোকে ও-ডাক্তার ডাকতে বল্লে? ভিজিট্ গুন্‌বে কে শুনি?"

বিমল বল্লে "আমিই দেব, আমার স্কলারশিপের টাকা জমানো আছে। আপনি অত জোরে কথা বল্‌বেন না, বৌদিদি ঘুমচ্ছেন।"

"ইঃ, ভারি নবাব হয়েছিস্ ছোঁড়া, লম্বা লম্বা কথা দেখ না, ভাইয়ের খেয়ে অমন সবাই টাকা জমাতে পারে।" বিমল আর কথা বল্‌লে না, কর্ত্তা নিজের মনেই গর্জ্জাতে লাগ্‌লেন।

দিন পাঁচ পরে সন্ধ্যার সময় রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়ে গেল। বিমল ঘরের মধ্যে শুয়ে পড়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগ্‌ল, গৃহস্বামী পত্নীর এমন অসময়ে অযথা ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে জ্ঞাতি-গুষ্টির সন্ধানে চল্‌লেন। আমি অনেক কষ্টে বিমলকে কিঞ্চিৎ শান্ত করে বাড়ী ফিরে এলাম।

বিমল কেঁদে আমার বোঝা একটু হাল্কা করে দিয়েছিল, তা না হলে যমদণ্ডের সবটাই আমার ঘাড়ে পড়্‌ত। তবু যতখানি বইতে হল তার ভারই প্রায় অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল।

পরদিন সকাল বেলা বিমল এসে ঘরে ঢুক্‌ল। আমার হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বল্লে "এই আমার সব জমানো টাকা, চিকিৎসা করাব বলে পোষ্টঅফিস্ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। এ আর আমি নেবো না, আপনি এই টাকা নিন্, দশজন গরীব মেয়ের বিনা টাকায় চিকিৎসা করবেন, তা হলেই আমার বৌদিদির কল্যাণ হবে।"

আমি তাকে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম "তুমি এ টাকা কোনো মেয়ে-হাঁসপাতালে দান কর, আমায় দেবার দর্‌কার নেই, আমি এর পর কোনো মেয়ের চিকিৎসাতেই টাকা নেবো না।"

বিমল আমার কাছে থেকে টাকা ফিরিয়ে নিল না, বল্লে "আপনিই ঠিক্ জায়গায় দিয়ে দেবেন, আমার বৌদিদির নামে দেবেন। তাঁর নাম শ্রীঊষা দেবী।"

বিমল ঘর থেকে চলে যাবার পর কতক্ষণ যে আমি ঘরের মাঝখানে বুদ্ধিহীনের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম তার ঠিক নেই। এ কি হল?

তার পরদিন মা বাবা বোন ভাই সব এসে হাজির হলেন। বোনের বিয়ের গোলমালে ঘর-দোরের বন্দোবস্ত সব উল্টে গেল। আমি যে ঘরে ছিলাম সেটা বাড়ীর মেয়েরা দখল করলে। আমি যে ঘরে গেলাম সেখান থেকে কোনো জান্‌লা দিয়েই বিমলদের বাড়ী দেখা যায় না, মনের জান্‌লাটাও চেষ্টা করে বন্ধ করে দিলাম। অজানাকে জান্‌তে গিয়ে সমস্যা আরও জটিল হয়ে গেল, সে জট ছাড়াবারও আর আশা রইল না। বোনের বিয়ে চুকে যেতেই কল্‌কাতা ছেড়ে পালালাম, তারপর এই কাল ফিরেছি।

(৪)

সুরেন একটু যেন অবাক হয়ে বল্লে "তুমি মঞ্জরীর খোঁজ করনি?"

"মঞ্জরী ত মরে গিয়েছে।"

"সে কি? যে মারা গেল সে ত ঊষা?"

"জানিনা ভাই সে কে। কিন্তু আমার মনে যে মঞ্জরী ছিল, সে সেই ঊষার সঙ্গে চলে গিয়েছে, চিতাভস্ম থেকে তাকে আর উদ্ধার করতে পারিনি। মঞ্জরী আর ঊষা গঙ্গা-যমুনার মত এখন মিশে গিয়েছে, যে যমরাজ আমাদের পরিচয় করিয়েছিলেন তাঁর সাম্‌নে তিনজন একসঙ্গে না দাঁড়ালে এ রহস্যের শেষ হবে না।"

শ্রীসীতা দেবী।

ধর্ম্মরাজ্যে সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ।

[এই প্রবন্ধটি দীর্ঘ বলিয়া ছোট অক্ষরে মুদ্রিত হইল। ইহা ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হইয়াছিল।]

আমার বক্তব্য বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে নৃতত্ত্ব (anthropology), মনোবিজ্ঞান (psychology), সমাজবিজ্ঞান (sociology), ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ বিষয়ক বিজ্ঞান, সমুদয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রথম যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েরও বৃত্তান্ত সংবলিত ইতিহাস, এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তাঁহাদের সহচর ও সমসাময়িক স্বজাতীয় স্বদেশীয় প্রধান লোকদের জীবনচরিত, জানা আবশ্যক। আমার এরূপ বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান নাই। মাসিকপত্র পরিচালন উপলক্ষ্যে আমি যাহা সাধারণভাবে জানিয়াছি, এবং আমার মত আর দশজন সাধারণ লোকের ন্যায় আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহাই বলিতে যাইতেছি। আংশিক সত্য এবং ভ্রমেরও এই কার্য্যকারিতা আছে, যে, তাহা জ্ঞানীকে ও সত্যানুসন্ধিৎসুকে সত্যের

অনুসন্ধান ও প্রচার করিতে প্রেরণা দেয়। যে শুধু সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহার দ্বারাও কিছু কাজ হয়; কারণ সেই সন্দেহ অপর কেহ দূর করিতে চাহিলে তাঁহাকে সত্যের অনুসন্ধান করিতে হয়। এই প্রকারে সত্য আবিষ্কৃত ও জনসমাজে প্রচারিত হয়। আমার বক্তৃতা যদি কেবলমাত্র সন্দেহ, ভ্রম ও আংশিক সত্যেরই সমষ্টি হয়, তাহা হইলেও আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

আমি যাহা বলিব তাঁহা দ্বারা সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে, আমার মনে এরূপ কোন দুরাশা, কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস নাই। যাঁহারা খুব জ্ঞানী, যাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে সত্যদ্রষ্টা বলিয়া ঋষিনামে অভিহিত বা ঋষিনামের যোগ্য, তাঁহারাও সত্যের সমস্তটি ও সকল দিক্ দেখিতে পান নাই; সত্যের পূর্ণরূপ তাঁহাদের নিকটও প্রকাশিত হয় নাই। আমি ত তাঁহাদের পদধূলি লইবারও অযোগ্য।

যাঁহারা অসাধারণ মানুষ বলিয়া, অবতার, প্রফেট, প্রেরিত, পয়গম্বর, মসীহ্, সাধু, পীর, মহাপুরুষ, প্রভৃতি নামে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব, তাহা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাববশতঃ নহে। ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের ও তাহাদের নানা শাখাপ্রশাখার প্রবর্ত্তক, ঋষি, উপদেষ্টা এবং প্রধান প্রধান ও অপ্রধান বহু বহু ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি। যাঁহারা আপনাদিগকে নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, কিম্বা প্রত্যক্ষবাদী বলেন, তাঁহাদের অনেকের সাধু চরিত্রের ও সৎচেষ্টার জন্য এবং তাহার মূলীভূত বিশ্বের অনিবার্য্য মঙ্গলাভিমুখ গতিতে তাঁহাদের বিশ্বাসের জন্য, তাঁহাদিগকেও শ্রদ্ধা করি। যাহারা সংসারে দুর্বৃত্ত ও কুক্রিয়াসক্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত, তাহাদের প্রকৃতিতেও এমন গুণ আছে, যাহা শ্রদ্ধার যোগ্য। মানবপ্রকৃতির উপর আমি শ্রদ্ধান্বিত। আত্মার সুস্থ অবস্থায় যেমন স্রষ্টাকে ভক্তি করি, তাঁহার সৃষ্টিকে তেমনি সবিস্ময় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি।

উঁচুকে নীচু করা আমার বক্তৃতার উদ্দেশ্য নয়; মানবজাতি যাঁহাদিগকে নিম্নস্থানীয় মনে করিয়া আসিতেছে, যাহারা নিজেও আপনাদিগকে হীন মনে করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বাস্তব (actual) বা সম্ভাব্য (potential) মহত্ত্ব সূচিত করিবার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা। আমি মুড়ি-মুড়কির বা মুড়ি-মিছরীর এক দর করিতে চাই না। ইহাই বলিতে চাই, যে, মুড়ি ও মুড়কি উভয়েই ধান হইতে প্রস্তুত হয়; যে-ধান হইতে মুড়কি এখনও হয় নাই, তাহা হইতে হইতে পারে বা পারিত; এবং মুড়ির ধান ও মিছরীর আক উভয়েই ক্ষেতের মাটি হইতে উৎপন্ন হয়। যাঁহারা বাস্তবিক শ্রদ্ধেয়, মাননীয়, ও ভক্তিভাজন তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি অটুট থাক্, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি অধিকন্তু কেবল এইটুকু চাই, যে, যাঁহারা সাধারণ লোক বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও ন্যায্য সম্মান প্রাপ্ত হন।

আমার চেষ্টার আর-একটি গুরুতর কারণ আছে।

মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টপ্রাণী বা বস্তুকে ঈশ্বরের আসনে বসাইলে, বা তাঁহার প্রাপ্য পূজাভক্তির কিয়ৎ পরিমাণেও অংশভাগী করিলে, ঈশ্বরকে ছোট করা হয়। ইহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিকৃষ্ট ছোট ও ভ্রান্ত হওয়ায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। কোন মানুষ যত বড়ই হউন, তাঁহাকে অবতার, মসীহ্, পয়গম্বর, প্রফেট, প্রেরিত, মহাপুরুষ, বা অপর যে নামই দেওয়া হউক, তাঁহাতে ও হীনতম মানুষে যে প্রভেদ, পরব্রহ্মের সহিত উভয়েরই প্রভেদের তুলনায়, তাহা অকিঞ্চিৎকর। আমাদের চোখে হিমালয় খুব বড় এবং একটি ধূলিকণা খুব ছোট, কিন্তু নিখিল বিশ্বের সহিত তুলনায় উভয়েই অতি ক্ষুদ্র।

পাহাড় পর্ব্বত উপত্যকা অধিত্যকা সমন্বিত একটি সমগ্র দেশের সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা যদি ভূগর্ভনিহিত শক্তির দ্বারা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে যেমন উপত্যকার উচ্চতা বাড়ে, পর্ব্বতের উচ্চতাও তেমনি পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়ে। আর, যদি পর্ব্বতের উচ্চতা না বাড়িয়া কেবল উপত্যকা প্রান্তরাদির উচ্চতাই বাড়ে, তাহাতেও পর্ব্বত ত নীচু হইয়া যায় না। কোন দেশের সকল লোকেরই জ্ঞানের মাত্রা যদি বাড়ে, তাহা হইলেও মহাজ্ঞানীরা অল্প জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠই থাকিবেন। আর সবাই যদি মহাজ্ঞানীর সমান জ্ঞানী হয়, তাহা হইলেও মহাজ্ঞানীর জ্ঞান ত কমিয়া যাইবে না। নিরস্তপাদপ দেশে এরণ্ডের বৃক্ষ বলিয়া সম্মান থাকিতে পারে; কিন্তু নানা বৃহৎ বৃক্ষ সমন্বিত অরণ্যে বনস্পতি হওয়া তদপেক্ষা উচ্চ সম্মান। অরণ্যের সব গাছ বনস্পতির মত হইলেও বনস্পতি খাট হয় না। সাধারণতঃ জ্ঞানভক্তি-সৎকর্ম্মহীন দেশে জ্ঞানী ভক্ত ও কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত হওয়া অপেক্ষা, জ্ঞানীর ভক্তের ও কর্ম্মীর দেশে মহাজ্ঞানী মহাভক্ত ও মহাকর্ম্মী বলিয়া পরিচিত হওয়া অধিক গৌরবের বিষয়। কিন্তু যদি সবাই মহাজ্ঞানী মহাভক্ত ও মহাকর্ম্মী হয়, তাহাতেও ত কাহারও দুঃখের প্রকৃত কারণ নাই। তাহাতেই জগতের কল্যাণ অধিক। এইজন্য সর্ব্বসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও গভীরতা উৎপাদন যে চেষ্টার লক্ষ্যীভূত, তাহা অসাধারণ মানুষদিগকে আসনভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা বলিয়া ভ্রম না হওয়াই উচিত।

আমি এক ব্রহ্মে বিশ্বাস করি। আস্তিক্য মানিয়া লইয়া আস্তিকের মত কথা বলিব, নাস্তিকের যুক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা এই বক্তৃতায় করিব না।

শিশুর দ্বারা জড়বস্তুর মানবীকরণ, অর্থাৎ জড়বস্তুতে মানুষের মত চৈতন্য ও ইচ্ছার আরোপ, নিত্যই দৃষ্ট হয়। শিশু মাটিতে পড়িয়া গেলে মাটিকে লাথি মারে, কপাটে মাথা ঠুকিয়া গেলে তাহাকে কীল মারে; মনে করে, যে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া তাহাকে মারিয়াছে। আদিম ও অসভ্য মানুষও এইরূপ শিশুপ্রকৃতিবিশিষ্ট থাকায় তাহারা নানা জড় পদার্থকে এবং জড়শক্তিনিচয়কে দেবতা উপদেবতা বলিয়া ভয় ও পূজা করিত। এইপ্রকারে অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্ভব হয়। জড়ে এইপ্রকার চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তির আরোপ জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের মতবাদ অপেক্ষা বিশ্বের চরম তত্ত্ব নির্ণয় চেষ্টার দিক্ দিয়া এক হিসাবে ঠিক্। কারণ, শক্তি সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান কেবল আমাদেরই অভিজ্ঞতা এবং আমাদেরই ইচ্ছা ও শক্তির প্রয়োগ হইতে লব্ধ। আমাদের টানিবার, ঠেলিবার, ধাক্কা দিবার, বা প্রতিরোধ করিবার শক্তি আছে; তা ছাড়া তদ্রূপ অন্য কোন শক্তির সাক্ষাৎজ্ঞান আমাদের নাই। আমরা চেতনাবান ও ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট; আমাদের শক্তি আত্মিক শক্তি, দেহের অঙ্গের সাহায্যে কাজ করে। জড়ের শক্তির কোন সাক্ষাৎজ্ঞান আমাদের নাই। সুতরাং জড়শক্তির কল্পনা বৈজ্ঞানিকের ব্যাবহারিক সুবিধার জন্য ধরিয়া লওয়া একটি জিনিস মাত্র; আত্মিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুর সাক্ষাৎজ্ঞান কাহারও নাই। আমার বিশ্বাস সব শক্তিই আত্মিক শক্তি, বিশ্ব-আত্মার শক্তি। কিন্তু ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত বারিপাত আদি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা এবং নানা প্রাকৃতিক শক্তিতে চৈতন্য ও ইচ্ছার আরোপ করিলে এবং সেইসব ঘটনা ও শক্তির অধিষ্ঠাতা ভিন্ন ভিন্ন বহু দেব-দেবীর কল্পনা করিলে ভ্রম হয়, এবং ঈশ্বরের যাহা স্বরূপ ব্রহ্মেতর বস্তুতে তাহা আরোপ করা হয়। তলবকার বা কেন উপনিষদে এবিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে।

দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মই অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া দেবতাদিগকে জয় ও তাহার ফল প্রদান করিলেন; ব্রহ্মেরই এই বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন, এই বিজয়

আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই। ব্রহ্ম ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইলেন ; কিন্তু তাঁহারা সেই পূজ্যস্বরূপকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহারা সেই পূজনীয়কে জানিয়া আসিবার ভার অগ্নিকে দিলেন। অগ্নি তাঁহার নিকট গেলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" অগ্নি বলিলেন, "আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞকল্প।" ব্রহ্ম বলিলেন, "এমন প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত যে তুমি, তোমাতে কি শক্তি আছে ?" অগ্নি উত্তর করিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদয় দগ্ধ করিতে পারি।" "ইহা দগ্ধ কর," বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন ; অগ্নি সেই তৃণের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমুদয় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন, "এই পূজনীয় স্বরূপ কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।" তখন দেবতারা বায়ুকে সেই পূজনীয় স্বরূপকে জানিয়া আসিতে বলায়, বায়ু ব্রহ্মের নিকট গেলেন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কে ?" বায়ু বলিলেন, "আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা" (অর্থাৎ আকাশে যাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ গমনাগমন)। ব্রহ্ম বলিলেন, "এমন গুণ ও নামযুক্ত যে তুমি, তোমাতে কি শক্তি আছে ?" বায়ু উত্তর করিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিতে পারি।" "ইহা গ্রহণ কর," বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন ; বায়ু সেই তৃণের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন, "এই পূজনীয় স্বরূপ কে, আমি তাহা জানিতে পারিলাম না।" তৎপর দেবতাদের অনুরোধে ইন্দ্র ব্রহ্মকে জানিয়া আসিতে গেলেন। কিন্তু ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইলে, ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইলেন। ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিণী অতিসৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী উমাকে আবির্ভূত দেখিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পূজনীয় স্বরূপ কে ?" উমা বলিলেন, "ইনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রদত্ত বিজয়েই তোমরা এরূপ মহিমান্বিত হইয়াছ।" উমার বাক্য হইতেই ইন্দ্র জানিতে পারিলেন যে ইনি ব্রহ্ম।

দেব-অসুরের সংগ্রাম, ধর্ম্ম-অধর্ম্মের সংগ্রাম, এখনও চলিতেছে। এই সংগ্রামে জয়ী হইয়া কেহ যেন না ভাবেন, বিজয়িনী শক্তি তাঁহার নিজের। জয় ব্রহ্মেরই। সাধনার উচ্চশিখরজাত অধ্যাত্ম আলোকরূপিণী উমার সাহায্য যিনি পান, তিনি ব্রহ্মকে সর্ব্বসাফল্যের কারণীভূত বলিয়া জানিতে পারেন।

জড়জগতে যতপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান তাহাদের অভিন্নত্ব প্রমাণ করিয়াছে। এই সব শক্তি কোন চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট দেবাত্মার শক্তি মনে করিলেও, ঐ দেবাত্মার বহুত্ব কল্পনা আর করা যায় না। কিন্তু অশিক্ষিত চিন্তায় অসমর্থ লোকেরা এখনও তাহা করিতেছে। দুঃখের বিষয়, চিন্তাহীন, আত্মপ্রতারিত বা নৈতিক সাহসহীন শিক্ষিত লোকেও তাহা করিতেছে।

অসভ্যেরা, সভ্যসমাজের অজ্ঞ, অশিক্ষিত, চিন্তাহীন, ও চিন্তায় অসমর্থ লোকেরা, এবং শিক্ষিতদিগের মধ্যে চিন্তাহীন, আত্মপ্রতারিত বা নৈতিকসাহসহীন লোকেরা কেবল যে জড়কেই ঈশ্বরের আসন দিয়াছে, তাহা নয়, নানাবিধ বৃক্ষলতা ও প্রাণীকেও দিয়াছে ;—যদিও তাহাতে তাহারা মানুষের মত চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আরোপ করিয়াছে। কথামালার গল্পে দেবপ্রতিমা বাহক গর্দ্দভ অনেক লোককে প্রতিমাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, প্রতিমাকে প্রণাম না করিয়া বুঝি বা লোক তাহাকেই প্রণাম করিতেছে ! তজ্জন্য সে আপনাকে দেবতা ভাবিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিল। অনেক মানুষও আপনাকে ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির বাহন স্বরূপ মনে না, করিয়া আপনাকেই ঈশ্বর মনে করে ; অন্যেরাও তাহাদের সম্বন্ধে ঐ ভ্রম করে। এটা কিন্তু আপাততঃ অবান্তর কথা। যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা এই, যে, গাধার পূজা কোথাও প্রচলিত আছে কি না, জানি না ; কিন্তু দেবতার বাহন বলিয়া বা অন্য কারণে নানা দেশে নানা প্রাণীর পূজা প্রচলিত আছে। যেমন বৃষ, লক্ষ্মীপেঁচা, গাভী, কুকুর, বিড়াল, মেষ, ইত্যাদি। সক্রেটীস্ আত্মপক্ষ সমর্থন কালে মিশর দেশের কুক্কুর দেবতার শপথ করিয়াছিলেন।

কোন কোন শ্রেণীর কোন কোন মানুষে দৈবীশক্তির অস্তিত্ব অনুমান করা, ভ্রান্ত হইলেও, এপর্য্যন্ত দেবত্ব আরোপের যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক মার্জ্জনীয়। কারণ, মানুষের চৈতন্য আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে, ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, শ্রেয়ের জন্য প্রেয় বলি দিয়া কষ্টস্বীকার করিবার ক্ষমতা আছে। তথাপি মানুষ যে ঈশ্বর নয়, তাহা তাহার দেশকালে সীমাবদ্ধতা, শক্তির অল্পতা, সর্ব্বজ্ঞতার অভাব, মৃত্যুর অধীনতা, নৈতিক অপূর্ণতা, প্রভৃতি দ্বারা বুঝা যায়। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা যাঁহাদিগকে অবতার বা অভ্রান্ত গুরু ও উপদেষ্টা মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নৈতিক অপূর্ণতা স্বীকার করিবেন না। এ বিষয়ে তর্ক না করিয়াও বলা যায়, যে, অন্য যে-সব লক্ষণ দ্বারা মানুষকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বলিয়া চেনা যায়, সেগুলি অসাধারণ বলিয়া সম্মানিত অবতারাদি সর্ব্ববিধ মানুষেও দৃষ্ট হয় ; যেমন দেশকালে সীমাবদ্ধতা, সর্ব্বজ্ঞতার অভাব, শক্তির অল্পতা, জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীনতা, ইত্যাদি।

ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, এরূপ অনেক শ্রেণীর মানুষকে নানা দেশে নানা যুগে লোকে দৈবশক্তিসম্পন্ন মনে করিয়াছে। যথা, জাদুকর, ডাইন, ডাইনী, medicine men, rain-makers, প্রভৃতি। এ সকলের মধ্যে কুসংস্কার এবং ফাঁকি আছে ; কিন্তু যেখানে সত্য সত্য শক্তি আছে, যেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, সেখানেও অজ্ঞানতমসাবৃত যুগে অজ্ঞ মানুষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানশালী লোককে ইন্দ্রজাল বা জাদুকরী শক্তি বিশিষ্ট মনে করিয়াছে ; যেমন ফাউষ্ট, রজার বেকন, প্যারাসেলসস্ প্রভৃতির ব্যক্তিত্বে। এইরূপ বিশ্বাস এখনও বহুদেশে বহুসংখ্যক মানুষের আছে। এখনও লোকে প্রশংসাচ্ছলে পরিহাস করিয়া জগদীশচন্দ্র বসু, লুথার বারব্যাঙ্ক প্রভৃতিকে জাদুকর বলে।

মানুষকে অসাধারণ মনে করিবার, ঈশ্বর মনে করিবার, সকলের চেয়ে সুপরিজ্ঞাত উদাহরণ অবতারবাদে পাওয়া যায়। নানা দেশে যাঁহারা অসংখ্য মানুষের দ্বারা অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের এক এক জনকে ধরিয়া বিস্তৃত সমালোচনা করিব না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহাদের একজনের জীবনের কাজ হয় ত বড় নয়, কাহারও বা জীবনের কাজ মহৎ নয়, অন্য কাহারও বা সাত্ত্বিক নয়, বা নিখুঁত নয়। কাহারো কাহারো গর্হিত কাজেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এইসব মানুষকে ঈশ্বর মনে করা যাইতে পারে না।

পূর্ণ অখণ্ড ব্রহ্মের অবতার হইতে পারে না। অবতারেরা এবং তাঁহাদের জ্ঞান ও কার্য্য দেশ, কাল, জাতি ও ভাষার সীমায় আবদ্ধ। ব্রহ্ম একটি নির্দ্দিষ্টস্থানকালবাসী ব্যক্তিতে আবদ্ধ থাকিলে বাকী সৃষ্টি চলে কি করিয়া ? যীশু বা রামচন্দ্র স্ব স্ব জীবিতকালে কি স্বদেশ ভিন্ন অন্য দেশের খবর রাখিতেন বা কাজ চালাইতেন ? স্ব স্ব দেশেরই কি সব কাজ নিয়মিত করিতেন বা সব খবর জানিতেন ? ঐতিহাসিক প্রমাণ সহ উত্তর চাই।

ব্রহ্ম অখণ্ড আত্মন্. spirit; সুতরাং তাঁহার অংশাবতারও হইতে পারে না।

তাঁহা জাতি দেশ কাল ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ নহেন। যে যে দেশের জাতির ও যুগের লোক যে যে ভাষায় তাঁহাকে ডাকিয়াছে, সকলেরই কথা তিনি শুনিয়া আসিতেছেন, এবং সকলেরই জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তিনি সব জাতির সকল মানুষের হিত করিতেছেন। তাঁহার অনুপ্রাণনা ও পরিচালনা প্রত্যেক জাতির লোক সর্ব্বকালে পাইয়াছে ও পাইতেছে। সকলের প্রার্থনা, আশা, মনোবেদনা তিনি শুনিতেছেন। অবতারদের কাহারও সম্বন্ধে একথা সত্য নহে।

অবতারনামে অভিহিত অসাধারণ মানুষদের আবির্ভাবের নানা কারণ অবতারবাদীরা বলিয়া থাকেন। তাহার দুই একটির আলোচনা করিতেছি।

গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখন ভগবান ধর্ম্মসংস্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ, এবং দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন; ইহা যুগে যুগে ঘটিয়া থাকে। দুষ্কৃতদের পরিত্রাণ হয় না, ইহা আমরা মানি না। পরিত্রাণ সকলের জন্য। সাধুদের চেয়ে বরং দুষ্কৃতদের পরিত্রাণের জন্যই ভগবৎকৃপার অধিক প্রয়োজন আছে।

যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে যুগে যুগে এক এক জন অবতারের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে দুটি অবতারের জীবিত-কালের মাঝখানে যখন পৃথিবীতে কোন অবতারই থাকেন না, তখন ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কিরূপে হয়? যদি বলেন একজন অবতারের তিরোভাবের পর যতদিন না আর-একজনের আবির্ভাব হয়, ততদিন পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রভাব চলিতে থাকে; তাহা হইলে বলি, তিনি ত সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্, তিনি দেহত্যাগ করিবার পর যদি এক শ দু শ এক হাজার দু হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তিতে সংসারের ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কাজ চলিতে পারে, তাহা হইলে বরাবর কেন চলিতে পারে না? অবতার ব্যতিরেকে ব্রহ্ম যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারেন না, তাহারই বা প্রমাণ কি?

অধর্ম্ম ত সংসারে সর্ব্বদাই রহিয়াছে; তবে ঠিক একজন অবতারের দেহান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই কেন আর-একজন সংসারের-পাপ-তাপহরণ-সমর্থ প্রাপ্তবয়স্ক অবতারের আবির্ভাব হয় না?

যদি বলেন, যে যে দেশে যে যে সময়ে অবতার প্রভৃতি অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই সেই সেই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপের প্রাদুর্ভাবের সময়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? ঐতিহাসিক প্রমাণ চাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, যে, বিদেশী মুসলমানদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার সময় ভারতবর্ষীয় সমাজে অনাচার কদাচার ও পাপের খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। নানা ইতিহাসে ইহার প্রমাণ আছে, তাহার কতকগুলি যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বীরাজ কাব্যে একত্র করা আছে। কিন্তু তখন কোন অবতার জন্মগ্রহণ করেন নাই। রোমে নীরো ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাটদের সময়ে নিষ্ঠুরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতির চূড়ান্ত হইয়াছিল, কিন্তু তখন কোন অবতার দেখা দেন নাই। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের সময় দুর্নীতির পূতিগন্ধ উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন অবতার দেখা দেন নাই। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে, যে-পক্ষেরই কথা সত্য বলিয়া ধরা যাক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, এত পাপ, এত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, একই সময়ে পৃথিবীর কোন দেশে মহাদেশে যুগে শতাব্দীতে একত্র সংঘটিত হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু এসকল নিবারণের জন্য, ইহার প্রতিকার করিবার জন্য, অবতার কৈ?

ভারতবর্ষের যুগাবতারদের দ্বারা যদিই বা ভারতবর্ষে ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্য হইয়া থাকে, অন্য সব দেশের গতি সেই সেই যুগে কি হইয়াছে? তথায় ত পাপ ছিল? প্রত্যেক দেশের পাপাধিক্যের সময়ের অবতার ত তথায় দেখা যায় না। অথচ ব্রহ্ম হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান কাহারও একচেটিয়া নহেন।

ইহাও বলা হইয়া থাকে, যে, নূতন নূতন বিধান প্রবর্ত্তন ও প্রচারের জন্য অবতার, প্রফেট, প্রেরিত, প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। আমি এক এবং সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় অলঙ্ঘ্য ঐশ বিধান মানি। ইহার অংশ আছে, আমাদের চক্ষে ইহার ক্রমবিকাশ আছে, সাময়িক প্রকাশ আছে। কিন্তু ভগবান মানুষের মত পরিবর্ত্তিত-অবস্থা-অনুযায়ী নূতন নূতন বিশেষ বিশেষ বিধান করেন, ইহা আমি মানি না। কারণ, তাহাতে ঈশ্বরের অনন্ত-পূর্ণ-জ্ঞানময়তা, অনন্তশক্তিশালিতা, ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানকালের তাঁহাতে যুগপৎ বিদ্যমানতা, কার্য্যতঃ অস্বীকার করা হয়। ভগবানের নিয়ম ও বিধান মানুষের আইনের মত নয় যে বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্য নূতন নূতন আইন চাই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবচেষ্টা, এনার্কিজ্‌ম্, বর্ত্তমান যুদ্ধ, প্রভৃতি নানা ব্যাপার যে ঘটিবে, তাহা সবজান্তা ইংরেজ কর্ম্মচারীদেরও জানা না থাকায়, তাঁহাদিগকে পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুযায়ী নূতন নূতন অনেক আইন করিতে হইয়াছে। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তথাপি কি জড়রাজ্যে কি অধ্যাত্মরাজ্যে যে-যে নিয়মে কারণ হইতে কার্য্য ঘটে, যে-যে নিয়ম অনুসারে মানুষ দৈহিক বা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য ও বল লাভ করে বা অসুস্থতাগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হয়, পাপপুণ্যের শাস্তি যেরূপে হয়, অনুতাপ আত্মপ্রসাদ যে-কারণে যেভাবে মানুষ অনুভব করে, তাহার ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ঋষি ও কবিগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে বহির্জগতের নানা নিয়ম অবস্থা ও ঘটনার সঙ্গে অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম অবস্থা ও ঘটনার সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য আছে। ইহা হইতে নানাবিধ রূপক ও উপমার সৃষ্টি হইয়াছে। বহির্জগতের মত মানুষের মনেও ঝড় বহে, আগুন জ্বলে, শীতলতা আসে, সরসতার আবির্ভাব হয়। মানুষের অন্তরের-জগতের জন্য যদি যুগে যুগে বাস্তবিকই নূতন নূতন বিশেষ বিশেষ বিধান হইত, তাহা হইলে বহির্জগতেও তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনুমান করিবার কারণ হইত। কিন্তু ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণিবায়ু, সমুদ্রতরঙ্গজনিত ও অতিরিক্ত বারিপাত-হেতু জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ ও মড়ক, ভূগর্ভস্থ শক্তি-বলে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উত্থান বা নিমজ্জন, শত শত বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি-বশতঃ কোন কোন দেশের অধিবাসীশূন্য মরুতে পরিণত হওয়া, মধ্য এশিয়ার খোটান ও অন্যান্য দেশে বায়ুচালিত বালুকা দ্বারা বহু নগরীর প্রোথিত হওয়া, গ্লেশিয়াল যুগের পর অন্য যুগের আবির্ভাববশতঃ অনেক মহাদেশের আবহাওয়া ও শীতোষ্ণতার পরিবর্ত্তন, এইসব ক্ষেত্রেও ত জড়জগতে বিশেষ কোন নূতন বিধান আবির্ভূত হয় নাই। পদার্থবিদ্যায় বর্ণিত মাধ্যাকর্ষণ, তাপ, আলোক, শব্দ, তাড়িত ও চৌম্বক শক্তি, এবং রসায়নীবিদ্যায় বর্ণিত নানা শক্তি আগে যেমন কাজ করিত, এখনও তেমনি করে। বিশেষ বিধানের একটি উদ্দেশ্য ত মানুষের দুঃখনিবারণ। কিন্তু দুঃখ যে আধ্যাত্মিক কারণেই হয়, তাহা নয়, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক কারণেও হয়। আধ্যাত্মিক দুঃখ-নাশের জন্য বিশেষ বিধান হইবে, আর পূর্ব্বে উল্লিখিত নানা আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব ও অনিষ্টপাতজনিত দুঃখ নিবারণার্থ বিশেষ বিধান হইবে না, ইহার কারণ বুঝা যায় না।

ভগবান সবই জানেন। সুতরাং তাঁহার চিরন্তন বিধানে কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার অনুযায়ী ব্যবস্থা বাদ পড়ে নাই। সর্ব্বপ্রকার অবস্থা ও ঘটনার অনুযায়ী ব্যবস্থা তাঁহার চিরন্তন বিধান অনুসারে হয়। কেবল নূতন নূতন অবস্থার সমবায়ে ও পরিবর্ত্তনে, ঘটনাচক্রে,

আমাদের নিকট ঐ বিধানের প্রকাশ ঘটিতেছে মাত্র। মানুষের অদূরদর্শিতা, অপূর্ণতা, ভগবানে নাই। কোন কোন অভিব্যক্তিবাদী বলেন, God is being evolved, ঈশ্বরের বিবর্ত্তন হইতেছে। তাহা অস্বীকার্য্য।

শৈশব হইতে মানুষের জ্ঞান, শক্তি, প্রয়োজন, যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, বর্দ্ধিত হয়, তেমনি তাহার পিতামাতা, সমাজ, ও রাষ্ট্র্ক দ্বারা তাহার শিক্ষা, সুবিধা, শাসন ও উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত উপযোগী ব্যবস্থা তাহার প্রতি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ কারণে আমরা বলি না, যে, শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়দশায় ও বার্দ্ধক্যে, মানুষের জন্য ঈশ্বর নূতন নূতন বিশেষ বিশেষ বিধান করেন; বাস্তবিক একই বিধানের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন বয়সে প্রযুক্ত হয়, অথবা একই বিধান বয়স ও অবস্থা ভেদে ভিন্নরূপে কার্য্য করে। তদ্রূপ, মানবজাতির ও মানব সমাজের শৈশবে বা আদিম অবস্থায়, আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাথমিক কয়েক যুগে, মানুষ যাহা সত্য বা বিধান মনে করিয়াছে, এখন ঠিক তাহা করে না বলিয়া বিশেষ বিধানের আবির্ভাব হইয়াছে বলা যায় না। একই সনাতন বিধান অনুসারে আমাদের নানা প্রয়োজন যুগে যুগে সাধিত হইতেছে। আমরা সমস্তটি একসঙ্গে দেখিতে ও আয়ত্ত করিতে পারি না বলিয়া মনে করি বিশেষ বিধান হইতেছে।

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। অবশ্য স্ববিরোধী যাহা কিম্বা যাহা তাঁহার স্বরূপবিরুদ্ধ, তাহা তিনি করেন বা করিতে পারেন, ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না; কিন্তু আর সমস্ত তিনি করিতে পারেন। অতএব, বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য তিনি, ইচ্ছা করিয়াই, বিশেষ বিশেষ বিধান করেন, এমনও অবশ্য হইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা এই একটা অনুসন্ধান-প্রণালী মানিয়া চলেন, (এবং ইহা সঙ্গতও বটে) যে, পূর্ব্বে হইতে জ্ঞাত কোন নিয়ম, শক্তি, বা কারণ বিদ্যমান থাকিলে, এবং নূতন লক্ষিত ফল, দৃশ্য, অবস্থা, ঘটনা, বা কার্য্যের ব্যাখ্যা তাহা দ্বারাই হইলে তাঁহারা নূতন কোন নিয়ম, শক্তি বা কারণের অনুসন্ধান করেন না। তাড়িত বা চৌম্বক শক্তির দ্বারা যাহার ব্যাখ্যা হয়, তজ্জন্য তাঁহারা অন্যবিধ প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধান করেন না। সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়েও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে অনুসন্ধান করিতে হইলে এই রীতির অনুসরণ করিতে হইবে। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে হইবে, যে, যে-যুগে যাহাকে নূতন বিধান বলা হইতেছে, আত্মিক বিষয়ে ও সামাজিক বিষয়ে ভগবানের যে যে নিয়ম কার্য্য করিতেছে, তদনুসারে ঐ বিধানগুলির স্বাভাবিক, বিজ্ঞানসম্মত কোন্ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কি না। আমার ধারণা এই, যে, এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। একটি বা দুইটি বিধানের দৃষ্টান্ত লইয়া বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিলে আমার কথা উত্তমরূপে সমর্থিত হইত, কিন্তু এখন তাহার সময় হইবে না; এবং তাহা করা এই বক্তৃতার উদ্দেশ্যও নহে। এখানে কেবল এইমাত্র বলি, যে, যাহাকে যে-যুগে নূতন বিধান বলা হয় তাহার বীজ অঙ্কুর বা সূচনা আগে হইতেই দেখা যায়; এইজন্য নূতন বিধানটি পূর্ব্ববর্ত্তী কিছুর স্বাভাবিক বিকাশ, বিবর্ত্তন, বা পরিণাম। উহাতে অলৌকিক অসাধারণত্ব এমন কিছু নাই, যাহার জন্য অবতারের বা ঐশী শক্তির তীব্র আকারে বিশেষ কোন প্রকাশের কল্পনা আবশ্যক।

অবতারাদি নামে অভিহিত অসাধারণ লোকেরা ধর্ম্মকে জয়যুক্ত এবং অধর্ম্মকে পরাজিত করিবার জন্য আসেন, অবতার ও মহাপুরুষে বিশ্বাসীরা এইরূপ মনে করেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যটি অসাধারণদেরই বিশেষ এবং নিজস্ব একটি উদ্দেশ্য নয়। তাঁহাদের জীবনে হয় ত ইহা একটু বেশী মাত্রায় দেখা যায়; কিন্তু ভগবান সকল মানুষকেই অধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিবার ও ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি দিয়াছেন। অধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম সাধারণ লোকেও করে। এ বিষয়ে সাধারণ লোকদের সাহায্য না পাইলে অসাধারণ লোকেরাও কৃতকার্য্য হইতেন না এবং হইতে পারেন না। সকলের চেষ্টা, শক্তি ও সিদ্ধি সমান নয়, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কি পরিমাণ চেষ্টা শক্তি সিদ্ধি মানুষকে অবতার প্রফেট মহাপুরুষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য করে, তাহা কেহ জানে না, এবং এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা ঐসব নাম পাইয়াছেন, তাহাদের জীবন ও চরিত্র হইতেও একটা মান বা standard ঠিক করিবার উপায় নাই।

যাহা কোন দেশে কোন যুগে নূতন বিধান, তাহা হয়ত সেই দেশেই বা অন্য দেশে, অন্য যুগে, কিছু ভিন্ন আকারে বা পরিমাণে ছিল। Do unto others as you would be done by, "অপরের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর, যাহা অপরে তোমার প্রতি করুক বলিয়া ইচ্ছা কর," খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এই উপদেশ ইহুদীদের তালমুদ্ গ্রন্থে গামালিয়েলের উক্তিতে এবং কংফুচের ব্যতীহার বা reciprocity মতে ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের Love those who hate you, যাহারা তোমাকে দ্বেষ করে, তাহাদিগকে প্রেম কর, ইত্যাদি উপদেশের অনুরূপ উপদেশ বুদ্ধদেব তাহার পাঁচশতাব্দী পূর্ব্বে দিয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নানা রূপের মধ্যে একই ধর্ম্মের অস্তিত্ব, সকল ধর্ম্মের সমন্বয়, সকল ধর্ম্মেরই অংশতঃ বা মূলতঃ সত্যতা, প্রভৃতি মত নানাদেশের ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায়। যেমন মিশর, গ্রীস্ ও ইতালীর নব-প্লেটোনিক মতে, প্লোটিনস যাহার অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। আমাদের দেশেও বুদ্ধকে হিন্দু অবতার করায়, সুফী ও বৈদান্তিকের মত-সামঞ্জস্যে, সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের কথায়, কৃষ্ণ ও কালীর একত্ব-প্রতিপাদক গানে, আকবরের দীন-ই-ইলাহীতে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থে, পরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশে লক্ষিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন ইহা পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বেই এই মতের সূচনা হওয়ায় তাঁহার কৃতিত্বের লাঘব হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসে দেখা যায়, যে, তাঁহাদের পূজিত বা সম্মানিত অবতার বা প্রফেটের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানুষের মনে তাঁহার ভবিষ্যৎ আগমনের সম্বন্ধে একটা আশা ও প্রতীক্ষার ভাব (expectancy) আসিয়াছিল। যেমন যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে, বুদ্ধ সম্বন্ধে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অবতার বা প্রফেটের উক্তিতে ও জীবনে যাহা দানা বাঁধিবে, স্পষ্ট আকার ধারণ করিবে, তাহা অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট আকারে সর্ব্বসাধারণের আত্মায় পূর্ব্বেই আসিয়াছিল।

নূতন নূতন বিধান প্রচারের জন্য অবতারের প্রফেটের মহাপুরুষের প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্য জগতে বহু বহু শতাব্দী ধরিয়া কোন অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া কেহ মনে করে নাই। প্রাচ্য প্রায় সমস্ত দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অথচ আধুনিক যুগে যে-সব দেশে কোন অবতার জন্মেন নাই, তথায় ধর্ম্মের উন্নতি, লোকহিতচেষ্টা, প্রভৃতি চলিতেছে। অবতারের, প্রফেটের, মসীহ্‌র, মহাপুরুষের মধ্যবর্ত্তিতা ভিন্নও সংসার চলিতেছে। যদি বলেন, ঐ সব দেশে বড় অধর্ম্মের বাড় হইয়াছে; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যথায় অধুনিক যুগে অবতার আদির আবির্ভাব স্বীকৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম ও নৈতিক বিষয়ে তথাকার অবস্থা কি অবতারাদি-বিহীন দেশগুলি অপেক্ষা খুব ভাল? আর যদি শেষোক্ত দেশগুলিতে বাস্তবিকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত, গীতার শ্লোক অনুসারে, সেখানেই অবতারাদির বেশী দরকার; অথচ সেখানেই ওরূপ অসাধারণ কোন মানুষ জন্মে নাই।

অবতারদিগের অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ভিন্ন-ভিন্ন জাতির ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহাদের জন্ম সাধারণ মানুষদের জন্ম হইতে স্বতন্ত্র রকম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এখন আর জ্ঞানালোক-প্রাপ্ত লোকেরা এরূপ অলৌকিক জন্মে বিশ্বাস করেন না; সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহাদের অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সব মানুষ যেরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট; তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার এই পরোক্ষ চেষ্টাটাই দূষণীয়। যেন যাহা সাধারণ তাহা পবিত্র ও ঈশ্বর-সংস্রবে গৌরবান্বিত নহে, যাহা অসাধারণ তাহাই পবিত্র ও ঈশ্বর-সংস্রবে গৌরবান্বিত!

অবতার প্রভৃতি লোকদের জন্মসম্বন্ধে অবিশ্বাস্ত গল্পের কল্পনা করিয়াও মানুষ তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র একটা জীব-জাতিতে পরিণত করিতে পারে নাই। স্বতন্ত্র জীব-জাতির মানে কি? মানুষের সন্তান মানুষ হয়, ময়ূরের সন্তান ময়ূর হয়। এইজন্ত মানুষ একটা জীব-জাতি, ময়ূর আর-একটা জীব-জাতি। কিন্তু অবতার, পয়গম্বর, প্রফেট, মহাপুরুষরা ত এক একটা স্বতন্ত্র জীব-জাতি নন। তাঁহারা অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা বা অন্ত কোন অসামান্ত লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত স্বতন্ত্র জীব-জাতিতে জন্মেন নাই। আধ্যাত্মিক হিসাবে রাজাকুলি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বণিক, ইত্যাদি সবাই সাধারণ মানুষ। অসাধারণরা এইরূপ সাধারণ মানুষদের পরিবারে তাহাদের মধ্যেই জন্মিয়াছেন। তাঁহারা অন্ত মানুষদের মত দেহে মনে বাড়িয়াছেন; পূর্ণ বর্দ্ধিত, পূর্ণ পরিণতিপ্রাপ্ত দেহ মন লইয়া জন্মেন নাই। তাহাদের মত খাওয়া-দাওয়া করিতেন, রোগ-জরা মৃত্যুর অধীন ছিলেন, দুঃখ আশঙ্কা মানসিক-অবসাদ গ্রস্ত হইতেন। অনুতাপে তাঁহাদেরও হৃদয় মেঘাচ্ছন্ন হইত। অসাধারণেরা সাধারণ মানবসমাজ হইতেই, সাধারণ সামাজিক পরিবেষ্টন (environment) হইতেই, তাঁহাদের শিক্ষা, উপদেশের মাল মশলা পাইয়াছেন; কোন অলৌকিক উপায়ে ও ভাবে যদি তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মানবের উন্নয়নে প্রবৃত্ত ও সমর্থ হইতেন। বুদ্ধ যীশু প্রভৃতি যে-সব গল্প বলিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত সাধারণ জীবন হইতে গৃহীত। সাধারণ জীবন ও সমাজ হইতেই তাঁহারা রস সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হইতেন। সাধারণ পরিবার ও প্রতিবেশী হইতে আলোক পাইতেন। সমাজবিজ্ঞানে গুণ শক্তি প্রভৃতির দুই প্রকার উত্তরাধিকার স্বীকৃত হয়; এক physical—দৈহিক, দ্বিতীয় সামাজিক বা social। মানুষ যে-সব দোষ গুণ শক্তি প্রবৃত্তি প্রভৃতি পিতা মাতা পিতামহ পিতামহী মাতামহ মাতামহী প্রভৃতির নিকট হইতে রক্তের সঙ্গে প্রাপ্ত হয়, তাহা শারীরিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত; মানুষ যাহা অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে, সমাজ, প্রতিবেশী, সঙ্গী, শিক্ষক, প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা সামাজিক উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত। এতন্মধ্যে অধুনা সামাজিক উত্তরাধিকারের প্রাবল্য স্বীকৃত হইতেছে। তদ্ধেতু, অসৎলোকের সন্তান জন্মাবধি সৎসমাজে সৎসংসর্গে বর্দ্ধিত হইলে ভাল হইবার সম্ভাবনা, এবং সৎলোকের সন্তান জন্মাবধি অসৎসমাজে ও সংসর্গে বাড়িলে অসৎ হইবার সম্ভাবনা। অসাধারণ লোকদের অসাধারণ শক্তি যে বহুপরিমাণে সমাজবিজ্ঞানোক্ত এই সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, তাহা এখন স্বীকৃত হইতেছে, এবং ক্রমশঃ আরো অধিক পরিমাণে স্বীকৃত হইবে।

পূর্ব্বেই কতকটা আভাস দিয়াছি, যে, মানুষকে ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ও পূজা দিবার দৃষ্টান্ত যেমন অবতারবাদে পাওয়া যায়, তেমনি তদপেক্ষা কিছু কম পরিমাণে প্রফেট, প্রেরিত, মসীহ, পয়গম্বর, সাধু-সন্ত, মহাপুরুষ, পীর আদির পূজায় বা তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র একরকমের মানুষ মনে করায় পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক সাধারণ মানুষে ও এইসব অসাধারণ মানুষে তফাৎ মানুষ ও ভেড়ার পার্থক্যের মত জাতি-গত (in kind) নহে, পরিমাণ-বা-মাত্রা-গত (in degree) মাত্র। তাঁহাদের সমুদয় শক্তি প্রত্যেক সুস্থ প্রকৃতির মানুষে আছে, যদিও ততটা বেশী পরিস্ফুট না থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে সাধারণ অনেক মানুষের যে-সব ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতা আছে, অসাধারণদের তাহা নাই, বা না থাকিতে পারে। একজন চাষা বুদ্ধদেবের কাজে বুদ্ধদেবের সমকক্ষ নহে; কিন্তু বুদ্ধদেবও চাষার কাজে চাষার সমকক্ষ নহেন। বুদ্ধদেব নইলে মানবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইত; কিন্তু চাষা না হইলেও সংসার চলে না। বুদ্ধদেব চাষীর ঘরে জন্মিয়া চাষ শিখিবার আবশ্যকতা বোধ করিলে ও সুযোগ পাইলে চাষী হইতে অবশ্যই পারিতেন; কিন্তু চাষীর আত্মাতেও যে বুদ্ধ হইবার বীজ অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার মত জ্ঞান ও সাহস আমার নাই। আমার ধারণা, হয় বস্তুতঃ, কিম্বা সম্ভাবনায়, সব মানুষ সমান।

অসাধারণ মানুষদের কাহারও দোষ ত্রুটি দেখান প্রীতিকর নহে; নিতান্ত আবশ্যক না হইলে বোধহয় উহা অহিতকর। সুতরাং তাঁহাদের কাহারো জীবনচরিতের সমালোচনা করিব না। সাধারণভাবে কেবল এইমাত্র বলি যে অন্ত মানুষদের মত তাঁহাদের জীবনেও অসম্পূর্ণতা দোষ ত্রুটি ছিল। এ-বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বিরচিত তাঁহার জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক সময় কতকগুলি প্রশ্ন পাঠান—তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই:—'মনুষ্য ক্রমক্রমে সাধু-লোকদিগকে অবতার বলিয়া পূজা করে, তাহাতে সাধুদিগের অপরাধ কি? ঐ সকল সাধুজীবনের দৃষ্টান্তে যদি মন নির্ম্মল হয়, তবে ধন্যবাদের সহিত সে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত কি না?'

"দেবেন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছিলেন:—এই প্রশ্নটির উত্তরপ্রদানে আমাদিগের অন্তঃকরণে দুঃখ ও কষ্ট যুগপৎ উভয়ই উপস্থিত হইতেছে। যাঁহারা জগতে সাধু এবং অবতার বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষের শ্রদ্ধা এবং পূজা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা করাও দুঃখজনক; অথচ যে-সমস্ত ভ্রম এবং অসত্য ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান হয়, তৎসমুদায়ের নিরাকরণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকাও কষ্টজনক। কেহ সাধুরূপেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা বিশেষ কোন গূঢ় অর্থে সাধু হন, আমরা আদৌ এ কথাতেই সরল-চিত্তে সায় দিতে পারি না। মনুষ্য, চেষ্টা এবং সাধনার বলে, উন্নতির-পথে যত কেন অগ্রসর হোক্ না তথাপি সে মনুষ্যই, তাহাতে আর সংশয় নাই। অপরাপর মনুষ্যেরও যে প্রকৃতি, যে প্রবৃত্তি, যে আত্মা, যে হৃদয়; তাহারও সেই প্রকৃতি, সেই প্রবৃত্তি, সেই আত্মা, সেই হৃদয়। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, অপরাপর অনেকের হয়ত হৃদয়নিহিত মহত্ত্বনিচয় উপদেশ এবং যত্নের অভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে, যাঁহাকে আমরা সাধু বলিয়া বিশেষ পূজা করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহার হয়ত সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠবৃত্তি অবস্থার অনুকূলতায় অধিকতর বিকশিত হইয়াছে; অথবা অধিকতর জাজ্বল্যমানরূপে লোকলোচনের গোচর হইতে পারিয়াছে। সাধু কে? এই শব্দটি কি আপেক্ষিক না উপমানিরপেক্ষ? ......পাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরতিই যদি সাধুতার অর্থান্তর হয়, তবে সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধংপূর্ণব্রহ্ম বিনা জগতে সাধু আর নাই, এবং যদি তাহা না হইয়া সাধুতার অর্থ আপেক্ষিক হয়, তবে জগতে সকলেই অংশতঃ সাধু এবং সকলেই অংশতঃ অসাধু।......"

"যাঁহারা পৃথিবীতে অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছেন, এবং মনুষ্যের হৃদয়জাত ঈশ্বরপ্রাপ্য ভক্তিকুসুমকে সমানভাগে ভাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত উপভোগ করিয়াছেন, নিজ নিজ অবতারত্ব প্রতিপাদনের

নিমিত্ত তাঁহারা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা চেষ্টা করিয়াছেন কি না, তৎসম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় করা আবশ্যক মনে করি না। জগতের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী; মোজেস, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্তই তাহার প্রমাণস্থল। আমরা তাঁহাদিগকে লোকবঞ্চকও বলিতেছি না, অথচ তাঁহাদিগকে ভ্রান্তির স্বয়মিচ্ছু বন্দী না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। নিজ নিজ অবতারত্ব সাব্যস্ত না করিলে তাঁহাদিগের নিজ নিজ প্রচারিত ধর্ম্ম জগতে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে না, বোধ হয় এই ভ্রান্তির অধীন হইয়াই তাঁহারা মনুষ্যের অন্ধভক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উপদেশ এবং দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা যতটুকু ভাল পাই, আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করি। কিন্তু অপরাপর মনুষ্যের সহিত তাঁহাদিগকে আমরা কোন অংশেও স্বতন্ত্র এবং সাধু শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করি না এবং ঈশ্বরের নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও নাম প্রচার করা, ঈশ্বর-পূজার আবশ্যকতা প্রতিপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুপূজারও আবশ্যকতা প্রতিপাদন করা, আমরা কখনই ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়াও স্বীকার করি না।"

আমার মত মহর্ষির অনুরূপ। আমার বোধ হয় অনেক স্থলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অপেক্ষা অনুচরদের ভ্রম দোষ ত্রুটি বেশী। Why callest thou me good? There is none good but my father which is in heaven, "আমাকে কেন ভাল বল? আমার স্বর্গস্থ পিতা ভিন্ন আর কেহ ভাল নয়;" যীশুর এই উক্তি হইতে মনে হয় তিনি আপনাকে পাপাতীত মনে করিতেন না। শুনিয়াছি, পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "ভগবানের গলায় কি cancer হয়?" তাহাতে মনে হয় তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে তিনি অবতার। কারণ তাঁহার cancer হইয়াছিল, ভগবানের হইতে পারে না।

যে-সব মহৎ লোকের কথা হইতেছে তাঁহাদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণতঃ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু কতটা বড় হইলে, কোন্ সীমা-রেখায় পৌঁছিলে এই-সব পদবী দেওয়া যায়, ইহাই জিজ্ঞাস্য। নানা দেশে বহু বহু সত্ত্বগুণপ্রধান সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রচারক সৎকর্ম্মী জন্মিয়াছেন। কিন্তু কোন্ মাপকাঠীর মাপসই হইলে মানুষকে অসাধারণত্বব্যঞ্জক পূর্ব্বোক্ত উপাধি-সকল দেওয়া চলে? কতটুকু সত্য দেখিলে ও প্রচার করিলে, কি পরিমাণ লোকশ্রেয়ঃ সাধন করিলে, মানুষকে অবতার প্রফেট আদি শ্রেণীতে ফেলা যায়? পূর্ব্বেকার প্রফেট আদি নামবাচ্য অনেক লোক অপেক্ষা মহৎ ও শক্তিশালী অনেক লোক আগেও জন্মিয়াছেন, এবং পরেও জন্মিয়াছেন; কিন্তু প্রফেট আদি নাম পান নাই। এখন ত পাওয়া দুর্ঘট। কারণ, এখন ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে সভ্য মানুষ মনুষ্যবিশেষের অলৌকিক অসাধারণত্বে অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে।

অবতার প্রফেট প্রভৃতির সমসাময়িক সহচর অনুচর এবং পরবর্ত্তী অনুচরদের মধ্যে তাঁহাদের কাছাকাছি যান বা কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এরূপ লোক দেখা যায়। St. Paul, St. Francis of Assissi, প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ে যীশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সহস্র সহস্র ব্যক্তি ক্রুশকাষ্ঠে, আগুনে, শূলে, তরবারিতে, প্রাণ দিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদের অনেকে অজ্ঞাতনামা হইলেও কোন কোন বিষয়ে স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের সমান ছিলেন, হয়ত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এইজন্য বলি, অবতার প্রফেট প্রভৃতি মহৎ ও ক্ষমতাবান্ লোক সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ও অনুশিষ্যেরাও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বপ্রকার উপহাস, ক্লেশ, উৎপীড়ন, ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া এবং বহু স্থানে প্রাণ দিয়া কম আত্মোৎসর্গ, বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও শৌর্য্য প্রদর্শন করেন নাই। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক একা সব কাজ করিতে পারেন না। দলের লোকদের উপর সাফল্য বেশী নির্ভর করে। তাঁহার কথা ও কার্য্য যেমন তাঁহার দলের লোকদিগকে অনুপ্রাণিত করে, তেমনি তাঁহার মণ্ডলীর লোকদের কথা ও কার্য্যও তাঁহাকে নূতন আলোক দেয় ও উৎসাহিত করে।

সম্পূর্ণ বৃক্ষহীন বা ছোট ও মাঝারি বৃক্ষহীন ভূখণ্ডে বড় বড় গাছও হয় না। বৃষ্টির জল এরূপ জায়গায় দাঁড়ায় না, রস উত্তাপে উবিয়া যায়। অরণ্যের মধ্যেই বনস্পতি জন্মে, তরুহীন মরুপ্রান্তরে জন্মে না।

কোন সমাজে বড় লোক জন্মিতে হইলে তাহার মত আত্মিক ও সামাজিক আবহাওয়া চাই। সেই আবহাওয়া সাধারণ লোকে সৃষ্টি করে, দেশ করে, জাতিতে করে। এবং সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে বড়লোকেরা তাহার সুবিধা পান। এইহেতু, বলি, যে-কোনও মানুষের চেয়ে তাহার জাতিটা বড়, দেশটা বড়, মানবসমাজ বড়, মানবপ্রকৃতি বড়।

খ্যাতি এবং কৃতকার্য্যতা বা সিদ্ধিলাভ বাস্তবিক ভিতরের সাত্ত্বিকতা ও ধার্ম্মিকতার সহিত অভিন্ন নয়। রাষ্ট্রীয়-আন্দোলনক্ষেত্রে নামজাদা লোকেরাই যেমন মহত্তম স্বদেশপ্রেমিক ও বিজ্ঞতম রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ না হইতেও পারেন, ধর্ম্মজগতেও তেমনি খ্যাতিমান্ লোকেরাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না হইতে পারেন। ধর্ম্মরাজ্যেও, জ্ঞান, ধর্ম্মভাব, সাধুতা, নিষ্ঠা সাত্ত্বিকতা, প্রভৃতি বেশী থাকিলেও, প্রতিভা, প্রকাশের শক্তি, বাক্‌পটুতা, নেতৃত্ব, personal magnetism না থাকিলে খ্যাতি ও কৃতকার্য্যতা হয় না। শেষোক্ত এইসব গুণ যে ধার্ম্মিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, তাহার প্রমাণ এই যে এগুলি ধর্ম্ম ভিন্ন অন্যক্ষেত্রের প্রধান লোকদের চরিত্রেও দেখা যায়; কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ অবতার প্রফেট মহাপুরুষ বলে না। সুতরাং যাঁহারা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়াছেন বা ধর্ম্মরাজ্যে নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহারাই ধার্ম্মিকতায় শ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহে ইহা বলা যায় না। কবি গ্রের কথিত mute inglorious Milton মূক অখ্যাতনামা মিল্টন না থাকিতে পারেন, কিন্তু অজ্ঞাত ও অখ্যাত সাধু জগতে হাজার হাজার জন্মিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মরাজ্যে বিশেষ কৃতী কাহারও মহত্ত্ব আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তাঁহারা যে একেবারে স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব তাহাই অস্বীকার করি। বড় বড় বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতির অসাধারণত্ব সত্ত্বেও কেহ তাঁহাদিগেতে, অন্ততঃ আজকাল, ঈশ্বরত্ব আরোপ করে না, তাঁহাদিগকে অলৌকিক অসাধারণত্বশালী বলিয়া পূজা করে না। অথচ তাঁহাদের ভুল ধরা যত শক্ত, অবতার প্রভৃতির ভুল ধরা তত শক্ত নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ শিক্ষা, যন্ত্র, পরীক্ষামন্দির প্রভৃতি সাপেক্ষ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উহা দুরধিগম্য; কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্যদ্রষ্টা হওয়া, বিশুদ্ধসত্ত্ব হওয়া, কাহারও পক্ষে সাধ্যাতীত মনে হয় না। ইহা সকলেরই সাধনার আয়ত্তাধীন। কারণ সাধারণ অসাধারণ সকল মানুষেরই মন আত্মা শক্তি এক রকমের।

ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে অসামান্য শক্তিশালী লোকদিগকে অবতার বা তদ্রূপ কিছু মনে না করিবার এই একটা কারণ অবতারবাদীরা বলিতে পারেন, যে, তাঁহারা ত ধর্ম্মসংস্থাপনে সাহায্য করেন নাই। কিন্তু তাহা ভুল। বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ, সমাজনীতিজ্ঞ, কবি, সমাজ-সংস্কারক, ও বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারাও ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে মানব-সমাজের খুব উন্নতি হইয়াছে।

একশ্রেণীর অদ্বৈতবাদীরা বলিতে পারেন, সকলেই ব্রহ্ম, সুতরাং অসাধারণ লোকেরা ঐশী শক্তিসম্পন্ন বৈ কি? কিন্তু ঐ মত মানিলে, আমরাও ঐশী শক্তিসম্পন্ন; প্রভেদ কেবল ঐ শক্তির স্ফূর্ত্তি বা বিকাশের মাত্রায়।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যদি ভগবৎ-প্রেরিত হন, তাহা হইলে সাধারণ লোকেও প্রেরিত। তাহারাও কিছু না কিছু সত্য দেখে, ভাল কথা বলে, ভাল কাজ করে। তাহারা ভিন্ন ও সংসার চলে না। তাহাদের জীবনেরও উদ্দেশ্য, mission, আছে। নতুবা তাহারা সংসারে জন্মে কেন? তাহাদের জীবনের যাহা উদ্দেশ্য তাহার জন্যই তাহারা প্রেরিত। তাহাদের জীবনের কোন mission নাই, কার্য্যতঃ এইরূপ মনে করাতে পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যতক্ষণ না কোন মানুষ শিক্ষার ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের সুযোগ পায়, ততক্ষণ কেহ বলিতে পারে না, তাহার মধ্যে কি মহৎ বস্তু আছে। নানা দেশে নারীরা সুযোগ পাওয়ায় কত মহৎ কাজ করিতেছেন। আগে নারীরা তাহা করিতেন না। সাধারণ চাষাভুষা মজুরেরাও সুযোগ পাইলে অন্তর্নিহিত মহৎশক্তির পরিচয় দিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। এরূপ পরিচয় আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে সাধারণ লোকেরা দিতেছে। সর্ব্বত্র এইরূপ হইলে পৃথিবীর উন্নতি হইবে। সাধারণ লোকেরা যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ নানা দেশে সাধারণ লোকেরা ইতিমধ্যেই এরূপ জ্ঞান লাভ করিতেছে। লৌকিক ব্যাপারে দেখা যায়, অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে প্রথম প্রথম বিলাতের ঘোরতর অপরাধীদিগকে পাঠান হইত, এখন যেমন আমাদের ঐরূপ অপরাধীদিগকে আণ্ডামানে পাঠান হয়। কিন্তু কালক্রমে উহাদের বংশধরেরা অন্য সব সভ্য সৎ লোকের সমকক্ষ হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ মূর্খ কাঙ্গাল অপদার্থ আইরিশ আমেরিকায় গিয়া জ্ঞানী ধনী কৃতী হইয়াছে। নরখাদক অসভ্য লোকেরা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতি পাইতেছে, অসভ্য খাসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে, আর আমাদের সভ্য দেশের সাধারণ লোকেরা পারিবে না? তাহারা অশিক্ষিত হইলেও সামাজিক উত্তরাধিকার (social heredity) সূত্রে অনেক উচ্চভাব ও জ্ঞান পাইয়া অনেকটা উন্নত হইয়া আছে। সেই জন্য আমাদের দেশে দক্ষিণ ভারতে অধুনা ব্রাহ্মণদের দ্বারাও পূজিত ৬৪ জন সাধু বা আলোয়ারকে অস্পৃশ্য পারেয়া জাতি জন্ম দিতে পারিয়াছিল, মুচি জাতি সাধু দাদূ প্রভৃতিকে জন্ম দিতে পারিয়াছিল, ভাঙ্গী (মেথরের মত) জাতি সাধু রবিদাসকে জন্ম দিয়াছিল, জোলা জাতি সাধু কবীরকে জন্ম দিয়াছিল, কসাই জাতি সাধু সদনাকে জন্ম দিয়াছিল, চৌর্য্য-ও-প্রবঞ্চনা-জীবী মীনা জাতি সাধু ঘাটমজীকে জন্ম দিতে পারিয়াছিল। মেথর জাতি মহারাষ্ট্রে সাধু চৌখামেলাকে জন্ম দিতে পারিয়াছিল। এরূপ আরো কত নাম করা যায়। তজ্জন্যই কত অজ্ঞাতনামা বাউলের গানে আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, সাধারণরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক আলোক, প্রেরণা ও পরিচালনার জন্য অসাধারণদের উপর নির্ভর করে নাই। তাহারা স্বয়ং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে; এবং সাধারণ মানব-প্রকৃতির গৌরব উপলব্ধ হইয়া যতই লৌকিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইবে, আধ্যাত্মিক আলোকও ততই সকলের মধ্যে বেশী পরিমাণে বিকীর্ণ হইবে। কেহ কেহ বলেন, মহাপুরুষেরা ব্রহ্মদর্শনের চস্‌মা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও বলি, দৃষ্টিশক্তি থাকিলে তবে ত চস্‌মা কাজে লাগে; চস্‌মা অন্ধকে দৃষ্টি দিতে পারে না; ব্রহ্ম ও সত্য দর্শনের ক্ষমতা সকলের আছে বলিয়া মহাপুরুষরূপ চস্‌মা কাজে লাগে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, চর্ম্মচক্ষুর জন্য চস্‌মার দরকার অল্প লোকেরই হয়, ব্রহ্ম ও সত্য দর্শনের জন্য মহাপুরুষরূপী চস্‌মার দরকার তার চেয়ে বেশী লোকের হইবার কথা নয়। চস্‌মার পূজাও কেহ করে না। মহাপুরুষদিগকে কেহ কেহ বিশ্বপতির সিংহদ্বারের দ্বারবান্ বলিয়াছেন। ইহা সত্য নহে। কাহাকেও কখনও দ্বারবান্ দ্বারা খবর পাঠাইয়া অনুমতি লইয়া ভগবানকে কিছু জানাইতে হয় না। তাঁহার নিকট সকলের সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার। সকলের প্রাণের কথা তিনি সর্ব্বদা শুনিতেছেন।

দশজন মানুষ ভগবানের নামে একত্র হইলে তাহাদের উপর এমন একটি প্রভাব আসে যাহার দ্বারা সত্যদৃষ্টির সামর্থ্য জন্মে। ইহা দ্বারা মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া উপাসনা করিবার যুক্তিযুক্ততা ও আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। সত্য যে সত্য, তাহার একটি পরীক্ষা, অপর অনেকের তাহাতে সম্মতি। এই সম্মতি বহু বহু বৎসর পরে আসিতে পারে। কিন্তু যাহাকে কেবলমাত্র আমি সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, আর কাহারও আত্মা যাহাতে সায় দেয় নাই বা কখনও দিবে না, তাহা সত্য নহে। সত্য দর্শন নির্জ্জনে নিস্তব্ধতার মধ্যে করিতে পারি; কিন্তু ঐ দৃষ্টিশক্তি সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে পাই।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে আমরা ভক্তি করি; এই ভক্তি একটুও কমাইতে চাই না। কিন্তু আমরা যে তাঁহাদের জা'ত-ভাই তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার মধ্যে যাহা বীজরূপে নাই, তাহা আমাকে কেহ দিতে পারে না। ধর্ম্মজগতের অসাধারণ মানুষেরা অন্য মানুষকে আধ্যাত্মিকতা দিতে পারেন, ধার্ম্মিক করিতে পারেন, এইজন্য, যে, এই সব অন্য-মানুষের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মপ্রবণতা সুপ্তভাবে রহিয়াছে। বাঘকে তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা ও সত্ত্বগুণ দিতে পারেন না, কারণ বাঘ আর-এক রকমের জানোয়ার; গাছপাথরকে ত পারেনই না।

মহৎ আরও মহৎ হউন, আনন্দেরই বিষয় হইবে। কিন্তু অখ্যাত অমহৎও মহৎ হউন এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। সাধারণ মানবপ্রকৃতির গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও তাহাদের দায়িত্ব-বোধ জন্মা একান্ত বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। নতুবা জগতের মঙ্গল নাই।

সাধারণ লোকদের অধিকার, সাধারণ লোকদের শক্তি, সাধারণ লোকদের দাবী, এবং সাধারণ লোকদের গৌরবের কথা আমি বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহা বৃথা আস্ফালন করিবার জন্য নয়। যেখানে অধিকার সেইখানেই তাহার অনুরূপ দায়িত্ব; শক্তি এক পিঠ, শক্তির অনুযায়ী কাজ উল্টা পিঠ। একটাকে বাদ দিয়া অন্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা বৃথা। আমরা সাধারণ লোকেরা এইজন্য উদ্বুদ্ধ হইতে চাই যে আমরা আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়া শক্তি বুঝিয়া তাহার মত মানুষ হইব, তাহার মত কাজ করিব, এবং তাহার মত অধিকার জিনিয়া লইব। আমরা প্রকৃত নেতাকে পদচ্যুত করিতে চাই না, অসাধারণ মানুষের মহত্ত্ব খর্ব্ব করিতে চাই না। কিন্তু, কে কবে নেতা হইবেন, কখন্ কোন্ মহাপুরুষ আসিবেন, কখন্ কোন্ অবতারের আবির্ভাব হইবে, আমরা তাহার অপেক্ষায় আলস্যে কাল কাটাইতে পারি না। ভগবান নানা শক্তিরূপে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রহিয়াছেন। আমাদের কাজ আমরা করিব। যাহার চোখ আছে, তাহাকে বিশ্বের চমৎকারিত্ব বুঝিবার জন্য হিমালয়ে যাইতে হয় না, পথের ধূলাতেও তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান। অসাধারণে ভগবানের মহিমা, ভগবানের শক্তি আছে বটে, কিন্তু সাধারণেও আছে। সাধারণের আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। সাধারণ জাগুন, এবং তাঁহার যাহা হইবার সম্ভাবনা তাহা হউন, তাঁহার যাহা করিবার তিনি করুন। সূর্য্য চন্দ্র আলোক দেয় বলিয়া নক্ষত্রেরা ত আলো দিতে বিরত হয়ই না, জোনাকিও বিরত হয় না। জমীকে উর্ব্বরা করিবার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু মহাবৈজ্ঞানিক ডারুইন তাঁহার Earthworms সম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখাইয়াছেন,

স্মরণাতীত কাল হইতে কেঁচোও আঁধারে লোকচক্ষুর অগোচরে জমীকে চাষের উপযোগী করিয়া আসিতেছে।

সত্য বটে, আমরা অবতার বলিয়া প্রফেট আদি অভ্রান্ত গুরু বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করি না, যদিও তাঁহাদের দৃষ্ট ও প্রচারিত সত্য শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি। কিন্তু অবতার আদিকে অভ্রান্ত বলিয়া না মানিলেও ঐসব নামে অভিহিত লোককে একটা দুরধিগম্য উচ্চ আসনে উপবিষ্ট স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলিয়া রাখিয়া সর্ব্বসাধারণ-আমরা ছোট হইয়া আছি। ব্যক্তিগত দীনতা অবস্থাবিশেষে ভাল। কিন্তু সব সাধারণলোক অপদার্থ ও অসাধারণেরাই সত্যদ্রষ্টা, চালক, ও পৃথিবীর লবণ, এইরূপ দীনতা ভাল নয়। ব্যক্তিগত অহঙ্কারের ঔষধস্বরূপ দীনতা ও অকিঞ্চনতা ভাল, কিন্তু উহা যখন মানবপ্রকৃতিকেই হীন করে, মানুষের হাত পা ও আত্মাকে শৃঙ্খলিত, অবশ ও জড়তাপন্ন করে, তখন উহা বিষ, উহা বর্জ্জনীয়। ভগবানের কাছে আমরা সাধারণ অসাধারণ সবাই অতি ক্ষুদ্র ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য যে আমরা সাধারণ অসাধারণ সবাই অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র; আমরা মরিব না। আমরাও মহৎ ও শক্তিশালী হইতে পারি।

অসাধারণ ধার্ম্মিকেরা বাস্তবিকই মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু আমরাও তুচ্ছ নহি; আমরাও "অমৃতস্য পুত্রাঃ", "অমৃতের পুত্র।" আমরা যেন অল্প জ্ঞানে, অল্প পবিত্রতায়, অল্প প্রেমে, অল্প শক্তিতে, অল্প বিশ্বাসে, অল্প সাহসে, অল্প কৃতিত্বে সন্তুষ্ট না হই; এমন যেন মনে না করি, যে, আমরা তুচ্ছ সাধারণ মানুষ, অতএব আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। না, আমাদেরও অধিকার, আমাদেরও সম্ভাব্যতা অসীম।

আমরা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যরূপ জাতিভেদ অস্বীকার করিয়াছি; কিন্তু শিক্ষিত লোক ও সাধারণ লোক, ভদ্রলোক ও ছোটলোক, প্রভৃতি ভেদবুদ্ধি আমাদের অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়া রহিয়াছে।

ধনীলোকেরা এক শ দু শ, দু-দশ হাজার, বিশ-পঁচিশ লক্ষ, দু-এক কোটি টাকা দান করেন; তাহাতে মানুষ অবাক্ হইয়া যায়, তাঁহাদের গুণে মোহিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রশংসা করিবার সময় ইহাও মনে রাখা দরকার যে ঐ-সব টাকা গরীবের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম হইতে উৎপন্ন; অনেক স্থলে গরীবকে উপযুক্ত মজুরী না দেওয়াতেই, ধনীর ধনবান্ হওয়া সম্ভব হইয়াছে; কখন-বা গরীবকে ঠকাইয়া ধনী ধন লাভ করিয়াছে। ধনীর টাকা ব্যতীত বড় কাজ যে হয় না, তাহা নয়। তীর্থস্থানের কোন কোন জলাশয়, ধর্ম্মশালা আদি মুষ্টিভিক্ষা ও এক আধ পয়সা ভিক্ষা দ্বারা কোন কোন সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতার বড় বড় বে-সরকারী কলেজ প্রধানতঃ গরীব ছাত্রদত্ত বেতন হইতে চলিতেছে। মহারাষ্ট্রের তালেগাঁও কাচের কারখানা "পয়সা-ফণ্ড" হইতে স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্রের উপর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠ-বিড়ালীর সাহায্য গরীবের আত্মদানকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাহারও শুভকামনা, কাহারও উপকার, "কায়মনোবাক্যে" করার কথা বহু গ্রন্থে আছে। "কায়মনোবাক্যে" ভগবানের ইচ্ছার অনুগত হওয়া, তাঁহার সেবা করা যাইতে পারে। কায়, মন ও বাক্য এই সংস্কৃত কথা তিনটির যেমন ঐরূপ একত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তেমনি হিন্দীতে "তন মন ধন" অর্থাৎ তনু (দেহ), মন ও ধনেরও সম্মিলিত প্রয়োগ প্রচলিত আছে। যিনি পরম ভক্ত, তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয়, যে, তাঁহার "তনমনধন" ভগবৎচরণে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। জগতে কেহ বা বাক্যমনের দ্বারা, কেহ বা ধনের দ্বারা, কেহ বা মন ও ধনের দ্বারা, কেহ বা শুধু বাক্যের দ্বারা হিতসাধনের চেষ্টা করেন। ইঁহারা কেহ কবি, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বাগ্মী, কেহ কর্ম্মী, কেহ বা দান-বীর বলিয়া যশস্বী হয়েন। কিন্তু যে-সকল লক্ষ-লক্ষ কোটিকোটি মানুষ কায় দ্বারা, "তন্" দ্বারা, দেহ দ্বারা, হাত-পায়ের দ্বারা, সমাজের সেবা করে, যাহারা না থাকিলে লোকস্থিতি অসম্ভব হইত, তাহাদের এই দৈহিক দেবপূজা, এই দৈহিক মানবসেবা, অখ্যাত এবং কবির কাব্যে অকীর্ত্তিত হইলেও, কখনই তুচ্ছ নহে। তাহারা জানে না, জানিয়া অহঙ্কৃত হয় না, যে, তাহারা কত বড় কাজ করিতেছে এবং সেই কাজ ব্যতিরেকে সংসার কিরূপ অচল হয়। এই অজ্ঞানকৃত সেবা ভগবান্ কি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না? প্রাসাদের যে অংশ মাটির উপর দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার সৌন্দর্য্যে ও তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের উপযোগিতায় আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু নয়নগোচর সমস্তটাই যে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত অসুন্দর ভিত্তির উপর খাড়া হইয়া আছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নয়। গাছের ডালপালা ফলফুল সুশোভন এবং নানা প্রকারে হিতকর ও আনন্দদায়ক; তাহার শিকড়গুলি তেমন সুন্দর নয়। কিন্তু শিকড়গুলি ব্যতিরেকে কোন শোভা, কোন হিত সম্ভব হইত না। মানুষের সমাজ প্রাসাদের মত, পত্রপুষ্পফলে সজ্জিত বৃক্ষের মত। ইহার ভিত্তি, ইহার মূল, চাষা মুটে মজুর কুলি কারিগর।

এই সত্যটি উপলব্ধি করা সকল দেশের সকল জাতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহা আমাদের দেশে যত দরকার, এত, বোধ করি, আর কোথাও নয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদের জীবনকে, আমাদের কায়মন ও বাক্যের ক্রিয়াকে, তাহার অনুরূপ করিতে না পারিলে আমাদের উদ্ধার নাই।

এব্রাহাম লিঙ্কন ঠিক বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ নিশ্চয়ই সাধারণ লোকদিগকে ভালবাসেন, তাহা না হইলে তিনি এত বেশী করিয়া সাধারণ লোকের সৃষ্টি করিতেন না।"

সকলকেই শিক্ষিত ও উন্নত হইতে হইবে, পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সকলেরই শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। শিক্ষা না পাইয়াও অনেকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পাইয়াছেন বটে; কিন্তু সমুদয় জাতি জ্ঞানে উন্নত হইলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সকলের আরও খুলিবে।

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সুব্যবস্থা কেবল অসাধারণ রাজা ও অসাধারণ মন্ত্রীদের দ্বারা হইতে পারে, এখন ইহা আর কেহ বিশ্বাস করে না। কারণ, পুরাকালে ও বর্ত্তমান সময়ে গণতন্ত্র প্রণালী দ্বারা নানাদেশে রাষ্ট্রীয় কাজ সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে ও হইতেছে। ধর্ম্মসমাজে পুরাকালে বৌদ্ধদের মধ্যে গণতন্ত্র নিয়মতন্ত্র প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাবলী সমেত প্রতিষ্ঠিত ছিল, খৃষ্টীয় কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষির সময়ে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজ এখন এইভাবে চলিতেছে। ইহা সত্য যে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দশের প্রতিষ্ঠা যেমন হইয়াছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে এখনও ততটা হয় নাই; কিন্তু তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। দশজনে সুসঙ্কল্প লইয়া পরামর্শ করিলে যেমন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সুপন্থা ও সুনীতি আবিষ্কৃত হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি সাধু-অভিপ্রায়ে দশজন মিলিত হইলে তাঁহারা তত্ত্বদর্শী এবং ধর্ম্মপন্থার আবিষ্কর্ত্তা হইতে পারেন। কারণ, সকলেরই আত্মা এক রকমের, সকলেরই সত্য দেখিবার চিনিবার মানিবার ক্ষমতা আছে। প্রজাতন্ত্র প্রণালী অনুসারে শাসিত দেশেও অতীত কালের একনায়ক দেশ-সকলের ব্যবস্থাপকদের নীতি, জ্ঞান ও ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া হয়; তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হয় না। তেমনি, ধর্ম্মজগতেও, স্বতন্ত্র পথের পথিকেরা কোন শাস্ত্র, কোন সাধুবচনকে অবজ্ঞা করিবেন না, সমস্তই শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিবেন; কিন্তু সাধারণ অসাধারণ সব মানুষের আত্মাতেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত, ইহাও কখনই বিস্মৃত হইবেন না। দশজনের ভোট লইয়া ধর্ম্মবিষয়ক সত্য নির্ণয় উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাও ঠিক যে, মনের সহিত মনের সংঘর্ষে অনেক সত্য-স্ফুলিঙ্গ মনশ্চক্ষুর গোচর হয়; ইহাও ঠিক যে, যতক্ষণ কোন

শাস্ত্রীয় উক্তি বা সাধুবচনে আমাদের অন্তরাত্মা সায় দিতেছে না, ততক্ষণ উহা আমাদের পক্ষে সত্য নহে। আমরা যন্ত্রের মত উহার অনুবর্ত্তী হইতে পারি; কিন্তু তখনই উহাকে মানুষের মত মানা হয়, যখন আমাদের অন্তরাত্মা, বুঝিয়া সুজিয়া, উহাতে আনন্দের সহিত সায় দেয়।

অসাধারণ মানুষদিগকে প্রণাম করি। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় হইবার উপযুক্ত হইতে চাই। সেই অধিকার দাবী করিতেছি। কলের মত অনুচর হইতে ও থাকিতে চাই না; সহধর্ম্মী, সহমর্ম্মী, সহযোগী, ও সহকর্ম্মী হইতে চাই। ইহা আস্পর্দ্ধা নয়; ইহাকেই আমরা প্রকৃত প্রীতি, প্রকৃত ভক্তি মনে করি।

দার্শনিক হামিল্টন বলিয়াছেন, "In the universe there is nothing greater than man, in man there is nothing greater than mind." "বিশ্বে মানবের চেয়ে বড় কিছু নাই, এবং মানুষে মনের চেয়ে বড় কিছু নাই।" এই মানব-প্রকৃতি হিমাদ্রি অপেক্ষাও উচ্চ, বিশালতা ও গভীরতায় মহাসমুদ্রকেও পরাস্ত করে। অরণ্যচারী, মৃগয়াজীবী, যাযাবর, নগ্ন, ভূতপ্রেত ও প্রাকৃতিক নানাশক্তি ও ঘটনার ভয়ে ভীত অসভ্য মানুষে, আর, নানাগুণে ভূষিত, শক্তিশালী, সুসভ্য, সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন, ব্রহ্মানন্দরসপানে অভয়পদপ্রাপ্ত মানুষে, কত প্রভেদ! এখনও কিন্তু মানুষ উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছে নাই। সে যাহা হইয়াছে, তাহা আমরা জানি; কিন্তু তাহার সম্ভাব্যতা অর্থাৎ সে যাহা হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

মানবজীবনের সকল বিভাগেই সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষে বড় বেশী প্রভেদ কল্পনা করা হইয়াছে; এবং তাহাতে এই কুফল ফলিয়াছে যে সাধারণ মানুষেরা, দৈহিক স্বাস্থ্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অধিকার, মানসিক শক্তি, রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং আধ্যাত্মিকতা, সকল বিষয়েই আপনাদিগকে অত্যন্ত হীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও নিজ নিজ হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ বিশ্বাসও অমূলক, এবং এই প্রকার সন্তোষও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের অন্তরায়। তজ্জন্য অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন, "No one can be perfectly free, till all are free; no one can be perfectly moral till all are moral; no one can be perfectly happy till all are happy" "সকলে মুক্ত না হইলে কেহ সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে না; সকলে সুনীতিপরায়ণ না হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুনীতিপরায়ণ হইতে পারে না; সকলে সুখী না হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না।" বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, যে, একজন বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব (অবলোকিতেশ্বর), সকলে মুক্তি না পাইলে নিজের মুক্তি লইবেন না, পরহিতার্থে আত্মশ্রেয়-লিপ্সাত্যাগের এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। স্পেন্সারের বাণী এবং এই বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মহাপ্রতিজ্ঞার সত্যতা, উচ্চতা ও গভীরতা জগদ্বাসী এখনও উপলব্ধি করিতে ও উপলব্ধি করিয়া আচরণকে তদনুযায়ী করিতে সমর্থ হয় নাই। এই উপলব্ধি ও তদনুযায়ী আচরণ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, সেই পরিমাণে মানবজাতি ব্রহ্মপরিবারে পরিণত হইবে, এবং সাধারণ অসাধারণ সব মানুষ পরব্রহ্মকে প্রভু, জনক-জননী, সখা ও জীবনবল্লভ বলিয়া অনুভব ও লাভ করিতে পারিবে। জগতের কয়েকজন মানুষ মাত্র অনন্ত সত্য ও প্রেমের আকর হইতে কত রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন! লক্ষলক্ষ কোটিকোটি লোক তাঁহাদের মত উন্নত একদিন নিশ্চয়ই হইবে। তাহা না হইলে মানবজাতিকে উন্নত বলা যাইবে না। লক্ষলক্ষ কোটিকোটি লোকের জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা আত্মোৎসর্গ সৌন্দর্য্যবোধ রসবোধ যখন মানব-সমাজকে উন্নত ও আনন্দময় করিবে তখন মানুষের কি শুভদিন আসিবে! সেই দিন আসুক, এবং পরমেশ্বর সেই দিন নিকটতর করিবার কার্য্যে আমাদিগকে সহযোগী করুন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আঁধারের যাত্রী

লোকে বলে আমি পাগল। সত্যিই যদি পাগল হতাম, ত নিতান্ত মন্দ হত না। কিন্তু কি জানি কেন ভগবান দুঃখের বোঝাটা খুব ভারী করলেও সেটা সইবার অমন সোজা উপায়টা আমায় দিতে ভুলে গিয়েছেন; তাই রাগে অভিমানে যখন মাথাটা কেমন বিগ্‌ড়ে যায়, তখন আমি চেঁচামেচি করে অনেক সময় তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসি। তার বেশী বড় কিছু কখনও করেছি বলে ত মনে পড়ে না।

আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি কতদিন শুনেছি, লোকে আমায় পাগল বলে কত কিছু বলছে, আমার দুঃখে দুটো দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলছে, কিন্তু আমার সাম্‌নে তারা কোনো-দিন একটি অমন কথা বলে না; বলে—ওর চেয়ে বড় দুঃখ মানুষের ঢের আছে; ভগবান যা করেছেন, তার উপর কথা কইতে নেই, তুমি ত সবই বোঝ তবে অমন অবুঝের মত কথা কও কেন? আচ্ছা, এমন কথা শুন্‌লে কার না রাগ হয় বল দেখি? এই এরাই ত আড়ালে বলাবলি করে—ঘরের লোকেই আমার কাল হয়েছে, আবার এরাই সব দোষটা ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নরম গলায় সান্ত্বনা দিতে আসে। মানুষে দেখ্‌ছি সাম্‌নে সত্যি কথা বলে না, আড়ালে যদি বা দুটো একটা বলে!

মানুষের কাছে যে আমি কতখানি ঠকেছি, সেই কথাই আজ আমার মন জুড়ে বসে আছে। সত্যি বটে চির দিবা রাত্রি একটা খুব বড় দুঃখ আমায় ঘিরে রেখেছে, অন্য মানুষ হলে সেই দুঃখটাতে তার আর সব দুঃখই চাপা পড়ে যেত; কিন্তু আমার মনে এই কথাটি দিন রাত্রিই জাগছে যে যদি জগতে একটা মানুষকেও প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে পার্‌তাম, যদি এমন একজনও থাক্‌ত যার কাছে কোনো কথায় কোনো কাজে প্রতারিত

হবার ভয় না থাকৃত, তবে এই চক্ষুহীনার, এই অন্ধ অভাগিনীর, ব্যথা কোন্ আঁধার পাতালে তলিয়ে যেত, সেই বিশ্বাসী হৃদয়টিই আলোক-স্তম্ভের মত পথ আলো করে দাঁড়িয়ে আমার নিষ্প্রভ চোখ দুটির বেদনা ভুলিয়ে দিত। কিন্তু আজ যে আমি কাউকে ভালবাসি না, একটি প্রাণীকেও বিশ্বাস করি না, চোখেও কারো মুখ দেখ্‌তে পাই না, আজ আমি কি নিয়ে আমার মনকে শান্ত করে রাখ্‌ব?

একদিন ছিল যেদিন আমার কথায় মাধুর্য্য উথ্‌লে উঠ্‌ত, দৃষ্টিতে বিশ্বাস ঝরে পড়্‌ত। সেদিন সমস্ত বিশ্বকেই আমি ভালবাস্‌তাম। তখন কথাটা না বুঝ্‌লেও তোমাদের মত আমারও মত্ ছিল যে মানুষের আত্মাকে বিশ্বাস কর্‌তে হয়। তখন নিজের মনের অজ্ঞাতেই এ কথাটা মেনে নিয়েছিলাম যে দু-চার-বার ঠকি তাতে ক্ষতি নেই, খুব বড় রকম কিছু হারালেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সব চেয়ে ক্ষতি হবে বিশ্বাস হারালে। বিশ্বাসই ত মানুষকে এ জগতে দিগ্বিজয়ী বীর করে তোলে, সে সব শঙ্কা ঘুচিয়ে দেয়, জীবনযাত্রার পথ চির প্রশস্ত বাধাবন্ধহীন করে রাখে। তাই মনে করেই হয়ত আমি তখন মানুষকে বিশ্বাস করেছিলাম। সর্ব্বস্ব মানুষকে দিয়েই স্বর্গসুখ পেয়েছিলাম।

অনেক কথাই ত বকে গেলাম; কিন্তু পাগল কিনা, তাই নিজের পরিচয়টাই দিতে ভুলে গিয়েছি। যা বল্‌বার, ঠিক সেইটুকুই বাদ দিয়ে আর যা-কিছু ছিল সবই ফেঁদে বসেছিলাম।

আমার চেহারাটা কেমন, নামটা কি, দুঃখই বা এত কোথা থেকে এল, সবই বল্‌ছি।

এককালে যখন আয়নাতে নিজের চেহারা দেখ্‌বার ক্ষমতা ছিল, তখন নিজেকে অসামান্যা রূপসী বলে ত কোনো কালেই ভ্রম হয় নি। কিন্তু তারি মধ্যে এক এক দিন হঠাৎ মনে হত—কেন, আমি ত নেহাৎ কিছু মন্দ দেখ্‌তে নয়। তবে শীতের দিনে রুক্ষ চুলে শুক্‌নো মুখে নিজের ছায়াটা দেখ্‌লে মনে হত কি কদাকার! সোজা কথায় বল্‌তে গেলে আমি দেখ্‌তে বিশেষ ভালটাল ছিলাম না। তবে চোখদুটি যে আমার পদ্মপলাশের মত সে কথা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। আমার বাবা আমার নাম রেখে গিয়েছিলেন সরোজাক্ষী। সে-সব কালের কথা মনে হলে মনে পড়ে আমার এই চোখই আমার প্রধান সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত। ওই ছিল আমার রূপ, ওই ছিল আমার গুণ, এক কথায় ওই আমার সর্ব্বস্ব। তখনকার আমার দিনগুলো ছিল আলোর মত উজ্জ্বল। চোখের অন্ধকারে সঙ্গে সঙ্গে আজ সবই অন্ধকার। আমি ছিলাম নদীর মত চঞ্চল, শিশুর মত সরল, ফুলের মত কোমল। সূর্য্যের আলো যেমন নদীর জলে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ঝল্‌মলিয়ে ওঠে, আমার কথায় বার্ত্তায় কাজে কর্ম্মে আনন্দ আর হাসি তেমনি ঠিক্‌রে পড়্‌ত। আজ যে সূর্য্যদেব চির বিদায় নিয়েছেন, কার আলোতে আর ধার-করা আলো ছড়াব?

আনন্দপ্রতিমা বল্‌লে কি বোঝায় সেটা বোধ হয় তোমরা সবাই বুঝ্‌বে। নিছক আনন্দ দিয়ে ভগবান বোধ হয় আমায় গড়েছিলেন। তাতে খাদ কোথাও ছিল না। খোলা মাঠে যেমন দিগন্তের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত চোখে পড়ে, মাঝ পথে কোনো বাধা মাথা তুলে দাঁড়ায় না, আমার চোখের সাম্‌নে ভবিষ্যৎ জীবনটা তেমনি সোজা পড়ে থাকৃত, কোনো দুঃখ-সঙ্কটের গায়ে দৃষ্টি ঠেক্‌ত না। খুব ছোট বয়সে একবার দার্জ্জিলিঙ পাহাড় দেখেছিলাম। সেখানকার আর সবই এখন ভুলে গেছি, মনে আছে কেবল রজতশুভ্র কাঞ্চন-জঙ্ঘা। সেই তুষার-শৃঙ্গের মত নিষ্কলঙ্ক সুন্দর ছিল আমার জীবন! সুখের শুভ্র হাসিতেই উজ্জ্বল, দুঃখের মূর্ত্তির ছায়া তার গায়ে ক্ষণিক কালিমাও ফেল্‌তে পারে নি। সেই আমারই আজ এই দশা। একদিন জগতের এই আলোক-সরোবরের বুকে আমারই এই অন্ধ আঁখি দুটি নীল পদ্মের মত ঢলঢল করে বেড়িয়েছে। আজ আর সে দিন নেই, তাই আজ চির অন্ধকারের কষ্টিপাথরের গায়ে আমার মনের মণি ঠেকিয়ে দেখ্‌ছি খাঁটি কিছু পেয়েছি, না সবই ভুয়ো। আলো যে দিন ছিল সে দিন ত তারি প্রভা পেয়ে গিল্‌টি সোনার মত কেবল আলোর জোরেই সব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আজ আর রূপ ধার দিতে কেউ নেই, এখন সাচ্চা ঝুঁটার বিচার ভাল করেই হবে।

শহরের বাইরে মাঠের উপর আমাদের বাড়ী ছিল। সবুজ মাঠের পরে একটা পুরোনো সেকেলে বাগান বোধ হয় বছর চল্লিশ ধরে অনাদরে পড়ে থেকে জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। তার পরে আরো দূরে আকাশের কোলে হেলে পড়ে ছিল ছোট একটি ঘন-নীল পাহাড়। পোড়ো বাগান-বাড়ীর চারি ধারের ফুলের গাছগুলো শুকিয়ে কাঠি হয়ে গিয়েছিল, ঝড়ের দাপটে বড় বড় অনেক গাছের অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবুজ মাঠের উপর যখন ধানের শীষ কচি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নেচে উঠ্‌ত, তখন বাগানটাকে দেখে মনে হত যেন বুড়ো ঠাকুরদাদাকে ঘিরে নাতি-নাত্‌নীর দল আনন্দে মেতে উঠেছে, আর ওপারের নীল পাহাড়টি যেন তাদেরই একটি খেলার সাথী। এই মাঠের আলের উপর দিয়ে ছেলেবেলা আমরা তিন বন্ধুতে সকাল-সন্ধ্যে ঐ পোড়ো বাড়ী আর নেড়া বাগানের সন্ধানে কতবার যেতাম। ধানের শীষ আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠ্‌ত; সুবিধা পেয়ে খেলার জন্যে আমরা কচি হাতে গোছা গোছা ধান ছিঁড়ে নিতাম। চুলের উপর "নবীন ধানের মঞ্জরী"র মালা পরে আমরা বাগানে যেতাম নিত্য নূতন আবিষ্কারের খোঁজে।

আনন্দের দিনের সে সব ছবিই আমার বুকের ভিতর খোদাই করা আছে। চোখে আর কোন ছবিই ত কোনো দিন দেখ্‌ব না, অল্প ক-দিনে যা পুঁজি করেছিলাম তারই উপর নিত্য রঙের প্রলেপ দিয়ে সেই কটাকেই তাজা করে রাখ্‌ছি। যাকে পাই তাকেই যদি কথায় এঁকে হারানো দিনের ছবিগুলি দেখাতে পার্‌তাম, তাহলে তারাই আমার কাছে আবার নূতন হয়ে উঠে আমার চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে দিত।

পাড়ায় আমাদের লোকজন বড় ছিল না। রাস্তার ওপারে বাহির-বাড়ীর দেয়াল বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আর শেওলার প্রলেপে শাদা কালো সবুজ নানান রঙের নক্সায় বেশ বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। দেয়ালটা আমার বেশ লাগ্‌ত। একদিন দেখ্‌লাম প্রায় আমারই মত বয়সের দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সেই দেয়ালের গায়ে লাল নীল পেন্‌সিল দিয়ে আরো কত অদ্ভুত নক্‌সা কাট্‌ছে। দেখে আমি লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। ছুটে গিয়ে তাদের সঙ্গে গলাগলি ভাব করে এলাম। এরাই আমার সেকালের দুই বন্ধু বিনু আর মিনু।

বিনু-মিনুর সঙ্গেই আমার সকল সুখস্মৃতি জড়িত। মিনু ছিল আমারই বয়সী, বিনু একটু বড়। খোস মেজাজে থাক্‌লে আমি তাকে বিনু বলেই ডাক্‌তাম, কিন্তু রাগ হলে বল্‌তাম বিনোদ-দা।

আনন্দের দিনগুলো ভরাপালের নৌকার মত তর্‌ তর্‌ করে বয়ে চলে গেল। ছোট তিনটি বন্ধু হাসি-খেলার ভিতর দিয়ে কেমন করে যে ক্রমে বড় হয়ে উঠ্‌লাম, সেই খেলার ছলেই যে কত সত্য গড়ে উঠ্‌ল, তা তখন টেরও পাইনি। প্রথম যেদিন আমাদের বড় হওয়ার কথাটা মনে পড়ে গেল সেদিন শুন্‌লাম, মিনুর মা তাকে আর বাইরে হুটোপুটি করে বেড়াতে বারণ করেছেন, তাকে দেখ্‌তে কোন্‌ দূর বিদেশ থেকে লোক আস্‌বে; মাঠে ঘাটে কনেকে খেলে বেড়াতে যদি দেখ্‌তে পায় তাহলে হয়ত নিন্দে উঠ্‌বে। মিনুর কথা শুনে প্রথমটা চম্‌কে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর মনে হল—আমরা বিদেশে থাকি তাই, নইলে দেশে ত শুনেছি আমাদের মত মেয়েরা একগলা ঘোম্‌টা দিয়ে বৌ হয়ে দিনের পর দিন কাটায়। আমাদের মত স্বাধীন সুন্দর জীবন ত তাদের নয়। প্রবাস-সুখে অভ্যস্ত আমি, বন্ধু মিনুর দুর্দ্দশার কথা ভেবে ভয়ে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়্‌লাম।

বিয়ের পরে যেদিন চোখের জলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চির-বন্ধুদের ছেড়ে চির-অজানাদের সঙ্গে মিনু সেই তার অচেনা ঘরের পথে ম্লানমুখে চলে গেল, সেদিন আমাদের খেলাধুলো আহার নিদ্রা সব ঘুচে গিয়েছিল। বাড়ী এসে পড়ে পড়ে কতক্ষণ যে কেঁদেছিলাম তার ঠিক নেই। মা যখন এসে টেনে তুল্‌লেন, তখন সভয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্‌লাম, "মা, আমি মিনুর মত অমন করে যেতে পার্‌ব না, তুমি আমার বিয়ে দিওনা মা, লক্ষীটি।"

মা আমার কপালে মুখ ঠেকিয়ে আদর করে বল্‌লেন, "পাগ্‌লী কোথাকার! কোথায় বিয়ে যে কেঁদে মর্‌ছিস্‌? আয়, আয়, উঠে আয়, তোর না হয় বিয়ে দেবো না, ঘরেই পুষে রাখ্‌ব'।"

মায়ের কথায় আশ্বস্ত হয়ে উঠে বস্‌লাম। ভেবেছিলাম, মা বুঝি সত্যি কথাই বলেছেন। মূর্খ আমি, তখন হাসি-ঠাট্টাও বুঝ্‌তাম না।

মিনু চলে যাবার পর আমাদের পুরোনো খেলাঘর ভেঙে গেল; ধূলোবালি গাছপালার সঙ্গ ছেড়ে পড়াশুনো গল্প-গাছার মধ্যে বিনু আর আমি আমাদের নূতন খেলাঘর পাত্‌লাম। কাব্য উপন্যাস নাটকে আমাদের ঘর দোর ছেয়ে গেল। মাটির পৃথিবীর নূতন রূপ তার ভিতর দিয়ে আমাদের চোখে ধরা পড়্‌ল। তিন বন্ধুতে যে-পৃথিবীর কোমল বুকের উপর শৈশবের গান গেয়েছিলাম, দুই বন্ধুর এই নূতন গানে তার পুরোনো রূপ যেন বদ্‌লে গেল। কিন্তু আজও সে পৃথিবী রহস্যময়ী হয়ে ওঠে নি; যে কাব্য-উপন্যাসের ছায়া সেদিন পৃথিবীর গায়ে দেখেছিলাম, তারি মত সুস্পষ্ট বলেই পৃথিবীকে ধরে নিয়েছিলাম! কাব্যের প্রথমে যে রহস্যের অবতারণা দেখ্‌তাম, পরিণতির মুখে যখন তার মীমাংসা শেষের আনন্দটা আরো নিবিড় করে তুল্‌ত, তখন ভাবৃতাম পৃথিবীর বুকের লুকোচুরি খেলাও বুঝি কেবল অম্‌নি আনন্দ দেবার জন্যে; চিররহস্য যে জগতে আছে, তার মর্ম্মের মাঝখানের কথা যে কেউ কোনো দিন নাও জান্‌তে পারে, এমন সন্দেহ তখন ক্ষণিকের জন্যও হয়-নি।

সেই যে আমার 'হারানো-জীবন' তার উপর আজ আমার সব চেয়ে বেশী হিংসা হয়। কি বিশ্বাসে, অতি বিশ্বাসেই সে এ জগৎকে দেখেছিল। সে বিশ্বাসের আনন্দ সন্দেহমুক্ত, সে জীবন আর ত ফিরে পাব না। তাই ইচ্ছে করছে আমার আজকার সমস্ত ভার বোঝা দুঃখ বেদনা সেই অতীতের আমির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তার আনন্দ-ময় জীবনটা কেড়ে নিয়ে আসি।

(২)

বিনুর বিয়ের দু তিন বছর পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রজনীগন্ধার গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে, আমাদের ছাদে আমরা দুজন কোনো কাব্যের গুণব্যাখ্যায় ব্যস্ত, বিনুর মুখে চোখে সেদিন কি যেন একটা নূতন ভাষা ফুটে উঠ্‌ছে, তার মুখের কথাকে সে অব্যক্ত ভাষা যেন ম্লান করে দিয়েছে। আমি বিনুর মুখের দিকে চেয়ে তার সে ভাষার অর্থ গ্রহণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলাম; বিনু মুখ নীচু করে খুব কোমল কণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল, "সরোজ, তোমার চোখ দুটি কি চমৎকার! আমি এতক্ষণ ধরে কেবল তাই দেখ্‌ছি। আর-সব কি যে এতক্ষণ বকে গিয়েছি, সেদিকে আমার খেয়াল নেই।"

বিনোদের সঙ্গে পরের রূপবর্ণনা যথেষ্ট করেছি, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের ত কথাই নেই। কিন্তু নিজের রূপ সম্বন্ধে এর আগে কোনো কথা কখনও শুনিনি। আমি কেমন যেন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলাম। সেদিন বিনোদকে ভূতে পেয়েছিল কি না জানি না, সে যে কি সব মাথামুণ্ডু বক্‌তে সুরু কর্‌লে তার ঠিক নেই।

আমার হাতের উপর হাতটা চেপে দিয়ে ভোম্‌রার গুঞ্জনের মত গুন্‌গুন্ করে আমার কানের কাছে কি যে সব সে বলে গেল, সে-সব কথা আজ শুন্‌লে আমি হেসে ঘর ফাটিয়ে দিতাম। কিন্তু সেদিনকার সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় রজনীগন্ধার গন্ধে আকুল বাতাসে যে কথাগুলি আমার কানে ভেসে এসেছিল, তার তুলনা সেদিন জগতে কোথাও ছিল না। কথা বলে সে সুখস্বপ্ন ভেঙে ফেল্‌তে আমার সাহস হচ্ছিল না; অথচ ভাবুক বিনোদের সে উচ্ছ্বাস লাজুক আমি বেশীক্ষণ সইতেও পার্‌ছিলাম না। সেদিন বুঝিনি যে জোয়ারের জলের মত যে মানুষের মনের সমস্ত গোপন সৌন্দর্য্য কথায় কাজে নিমিষের মধ্যে উছ্‌লে ওঠে তার ভিতরে বাকি আর কিছু নাও থাক্‌তে পারে। মানুষ যে কেন মানুষকে বুঝ্‌তে পারে না, সেইটে আমি আজও বুঝ্‌লাম না। মানুষ যে মানুষের সব চেয়ে আপন, অথচ সেই তার কাছে এই নিবিড় রহস্যজালে ঢাকা! মানুষের মন জান্‌বার জন্য আমাদের সমস্ত মন কাঁদ্‌ছে, অত কাছে থেকে সে যে অত দূরে এ বিরহ-বেদনা মানুষ সইতে পারে না। তবু সেই মানুষই চির দিন দূরে থাক্‌বে, দূরে থেকে আকারে ইঙ্গিতে সে আমাদের কাছে ডাক্‌বে, তার মুখের কথার রঙীন কাঁচের আড়াল থেকে সে তার মনের নিভৃত কক্ষটির সন্ধান আমাদের দেবে। কিন্তু সে কাঁচ রঙীন, কি অন্তরই রঙীন,

তা চিন্‌বার কোনো উপায়ই ত ভগবান আমাদের দেন নি। সেই দুঃখেই ত আজ আমি পাগল। কেন ভগবান আমাদের এ মরীচিকার মধ্যে ফেলে রাখ্‌বেন? আমার ইচ্ছে করে ঐ মানুষগুলোর বুক চিরে তার ভেতরটা দেখে নি কি আছে তাতে। এর জন্যে তোমরা কেউ আমাকে রাক্ষসী মনে কোরো না। আমি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন নির্ম্মম বলে অমন কাজ করতে চাইছি না। আমি যে মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তাই আমি তাদের চিনে নিতে চাই। আর যার কাছে হোক মানুষের কাছে প্রতারিত হতে আমি পার্‌ব না। তাকে ভুল বুঝ্‌তে কি বোঝাতে আমার প্রাণে যতখানি বেদনা লাগে, আর কিছুতে তা লাগে না। তোমরা বিশ্বাস না কর, আমি আমার শরীরখানা খান্ খান্ করে ভেঙে তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারি। মুখের কথা আমি যখন বিশ্বাস করি না, তখন তোমরাই বা কর্‌বে কেন?

ভুলে গিয়েছিলাম যে গল্প বল্‌ছি। যাক্, আবার বল্‌তে সুরু কর্‌ছি। সেদিন বিনোদের কাছে যে-সব কথা শুনেছিলাম সে কাব্যকথা কি সত্যিকথা জানি না। কিন্তু কিছুদিনের মত মাটির পৃথিবীটা আমার কাছে কাব্যজগৎই হয়ে উঠেছিল। আমার মুখে সে-সব ফুলের গন্ধ আর চাঁদের আলোর মত মিষ্টি মধুর কথা আজ আর ঠিক বেরোবে না। তোমরা যতটা পার কল্পনা করে নাও।

আমি বেশ বড় হয়ে উঠেছিলাম, তবু বাবা আমার বিয়ের জন্যে বিশেষ কিছুই চেষ্টা করেন নি। মা যে মিনুর বিয়ের সময় আমার বিয়ে দেবেন না বলেছিলেন, সেই কথাটা তাই আমার কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাসটা একদিন ভাঙ্‌তে হল।

এইবার আমার জীবনের সুখের পাতা উল্টে গিয়ে দুঃখের পাতা সুরু হল। পশ্চিমে একদিন ধরণীর গায়ে বসন্তের উদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের গায়েও বসন্ত দেখা দিল। আমার বাবা বসন্তের হাতে প্রাণ সঁপে দিলেন; আমি দিলাম চোখ দুটি; আরো যে কি দিয়াছিলাম, তা তখন বুঝিনি, এখন বুঝেছি। আমায় ভগবান যেটুকু রূপ দিয়েছিলেন, সেইটুকু হরণ করে বসন্ত যে আমার মুখে কি বিভীষিকার ছাপ দিয়ে গিয়েছিল তা জান্‌বার উপায়-টুকু থেকেও যে তখন আমি বঞ্চিত। ঠিক সেই সময় বিনোদ গিয়েছিল মিনুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে। বিদেশের সেই একমাত্র সম্বলকেও না পেয়ে মা যে তখন কোন্ অকূল পাথারে পড়্‌লেন তা আর বলে বোঝাতে হবে না। অত বড় বয়সেও সেদিন বুঝিনি অবিবাহিত অন্ধ মেয়ের বোঝা বিধবা মায়ের কত বড় ভার; আজ তা হাড়ে-হাড়েই বুঝেছি। সেদিন এক ঝট্‌কায় বসন্ত-পবন যখন আমার আঁখির আলো ঘুচিয়ে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি আমার চোখের উপর থেকে মুছে নিয়ে গেল, তখন একলা ওই সর্ব্বগ্রাসী কালো অন্ধকারের কবলে পড়ে আমার শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের জগৎটাকেও যেন হাত্‌ড়ে পাচ্ছিলাম না। তখন আর মায়ের দুঃখ শোক ভাব্‌নার কথা মনে থাকে কি করে বল? রোগের পালা সবে শেষ করে যখন দুঃখ সইতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছি, ঠিক সেই সময় একদিন বিনোদ ফিরে এল। আমি তখন বাবার শোবার ঘরে একলা বসে ছিলাম। বিনোদের পায়ের শব্দে ফিরে বস্‌লাম। মনে হচ্ছিল সে যেন বাতাসে ভর করে উড়ে আস্‌তে পার্‌ছে না বলে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। ঐটুকু পথ পার হওয়ার বিলম্ব যে তার সইছিল না, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম, আমি ঠিক সেই আগেকার আমি থাক্‌লে তার ধৈর্য্যের বাঁধ অমন করে টল্‌ত না। সে যেন দেবতার এই নিষ্ঠুর আঘাতের ফলটা তখনি চোখের উপর না দেখে থাক্‌তে পার্‌ছিল না।

আমি মনে করেছিলাম বিনোদ ছুটে এসে আমার হাতখানা চেপে ধর্‌বে কি মুখখানা তুলে ধর্‌বে। কিন্তু তা ত হল না। দরজার কাছে এসেই সে থম্‌কে দাঁড়াল। সে কেমন যেন একটা বিকৃত সুরে বল্‌লে, "সরোজ, তুমি..." আর কি সে বল্‌তে চেয়েছিল জানি না। মৃত্যুর মাধুরী কল্পনা করে-করে বাস্তবে যারা তার বিভীষিকা দেখে শিউরে ওঠে, মনে হল আমার এ পরিণাম দেখে বিনোদও তেম্‌নি শিউরে উঠেছে। সে হয়ত ভেবেছিল, একটি অসহায় অন্ধ বালিকার মুখ দেখে করুণায় মন তার ভরে উঠ্‌বে, কিন্তু তার গলার স্বর শুনে মনে হল মৃত্যুর এমন জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখে আতঙ্কে সে কেঁপে উঠেছে। তার পরেই ভাব্‌লাম, হয়ত আমার এ পরিণাম দেখে বেদনায়

সে অমন আর্ত্তের মত কেঁদে উঠেছে। বোধহয় এ দৃশ্য আর দেখতে না পেরে সেদিন তখনি সে চলে গেল।

তারপর বিনোদ প্রতিদিন আসত; কত কি বলত। কিন্তু সে তার যে-সরোজকে মনে করে,দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দিতে আসত, সে-সরোজ যে তখন বিশ্বজোড়া কান্নার ঘায়ে মূর্চ্ছিত; তাই বোধহয় ম্লানমুখী নীরব আমার পাশে বসে প্রেমগান শোনাতে তার ধৈর্য্য থাকত না। কিম্বা মরণের আঘাতে যে অচেতন, জীবনের গান তাকে শোনাবার ইচ্ছাও হয় ত তার ছিল না। সেই জন্যেই কি কিছুদিন পরে বিনোদকে কেমন দূর-দূর ঠেকতে লাগল? তা বোধ হয় নয়। আমার চোখ ছিল না, কাছে অনুভব আগের মত করব কি দিয়ে! সে ত রোজই এসে আমায় খোলা ছাদের ধারে সেই ফুলের বাগানের কাছে বসিয়ে কত বই পড়ে শুনিয়ে যেত! বইএর কথা আমার কানে যেত বটে কিন্তু মনে যেত না। আমি আমার প্রিয়ের কণ্ঠসুধার ভিতর দিয়ে আমার চোখের ক্ষুধা মিটাতে চাইতাম। সেইটুকুই তখন আমার সম্বল। রোজকার সেই একাগ্র সাধনাতেও কিন্তু সে হারানো দিনের বিনুকে আর তেমন করে পেতাম না। মনে হত, জীবন-মরণের এ প্রেমাভিনয় সত্য হতে পারে না, এ নিশ্চয় মিথ্যা, এ শুধু ভান। চোখের আড়াল যে হয়েছিল, মনের আড়াল সে হয়নি বটে, বরং আঁধার মনের পটে তার সে উজ্জ্বল মুখখানি আরো যেন সোনা হয়ে ফুটে উঠছিল। তবু মন যেন বলত,— এ শুধু সেই অতীতের স্মৃতির ছবি, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তোমার জন্যে নয়, জগৎটাই যে তোমার কাছে শুধু অতীত! তুমি আর কিছু চাও কেন?

ফুটন্ত ফুলের পাপ্ড়ি যেমন একটি একটি করে ঝরে পড়ে, মনে হচ্ছিল তেমনি করে আমার সুখের শতদলের দলগুলি একে-একে ঝরে পড়ছে, শুধু সৌরভটুকু স্মৃতিরূপে রেখে যাবে। এমন সময় মা একদিন অনেক দুঃখগাথার ভূমিকার পর বললেন, "মা সরোজ, আমি ত অনাথা বিধবা; ভগবান আমায় ছেলে ত দিলেন না; মেয়ে যে দিলেন, তারও চোখ দুটি নিয়ে আমার ভার-বোঝাই বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোর যদি একটা গতি করে দিয়ে যেতে পারি, যদি অভাগীর মুখ চেয়ে কেউ তোকে ঘরে তুলে নেয়, তবে আমার হাড় কখানা জুড়োয়; তোর কথা ভেবে ভেবে বিধবা হয়েও মরণের আগে দুদিন ঠাকুরের নাম করতে সময় পাই না।"

মায়ের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমি ভয়ে বিস্ময়ে মাকে চেপে ধরে বললাম, "সে কি মা! আমি যে অন্ধ! আমার আবার বিয়ে কি? মা, অমন কথা বলো না, শুনলেও আমার ভয় করে। এই অন্ধ চোখ নিয়ে লোকের বাড়ী গিয়ে আমি যে ভয়ে দুদিনেই মরে যাব।" আমার পুরোনো দিনের চেনামানুষ-গুলিই এখন আমার জগৎ,—তাদের কথার শব্দে, গায়ের স্পর্শে, পায়ের ধ্বনিতে, সব তাতেই আমি ক্রমে তাদের দেখতে শিখেছি। কিন্তু যেখানে স্মৃতির সেই কষ্টিপাথরটুকু নেই, সেখানে শুধুহাতে আমি যাব কি করে? আমার আঁধার ধরণীর কোলে মনোলোকে যে জ্যোতি রেখাটি জ্বলছে, সেটিও যে অচেনাদের গায়ের বাতাসে নিবে যাবে; পদে-পদেই আমি হুঁচোট খেয়ে পড়ব। তাছাড়া নিজের ঘরে যে দৃষ্টিহীনতা দুর্ভাগ্য আর দুঃখের কারণ, পরের ঘরে সেইটাই যে মস্ত অপরাধ হয়ে উঠবে; সে অপরাধের লজ্জায় সঙ্কোচে আমার এক পাও যে উঠবে না।

মা আমার কথা শুনে বললেন, "ওরে তোকে পেটে ধরেছি, বলতে নেই, কিন্তু তুই মরলেও যে আমার শান্তি হয়! এ বুকের আগুন নিয়ে আমি যে দগ্ধে দগ্ধে মরছি।"

সুখের দিনে মায়ের যে সান্ত্বনার কথাটার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর হয় নি, আজ দুঃখের দিনে দরিদ্রের সম্বলের মত মায়ের সেই কবেকার মুখের কথাটা মস্ত বড় সম্পদ ভেবে স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে নিয়ে এলাম। মাকে বললাম, "মা, তুমি যে মিনুর বিয়ের সময় বলেছিলে আমার বিয়ে দেবে না।"

মা হেসে উঠলেন, "ওরে পাগল, সেই কবেকার ছেলে-ভুলোনো মুখের কথাই কি সব হল?"

আজ বুঝেছি, মানুষের মুখের কথা সব নয়। কিন্তু তখন যে স্রোতের মুখে ভেসে যাবার ভয়ে সেই তুচ্ছ তৃণটাকেই আঁকড়ে ধরে উঠব ভেবেছিলাম। তা হল না, আমার সম্বল তৃণগাছি মায়ের হাসির ঘায়েই ছিঁড়ে গেল।

মা উঠে চলে গেলেন। কল্পনায় আমি আমার চির-

অন্ধকার সংসারের ছবি আঁকতে সেইখানেই বসে রইলাম। ভবিষ্যতের কালো পটে কেবল কালির আঁচড় দিয়ে কিন্তু একটা ছবিও ফুটোতে পারছিলাম না; কালোর গায়ে কালো মিলিয়ে যে ক্রমেই ঘন হয়ে আসছিল, অতীতের রঙিন তুলির একটা ছোপও তার উপর দিতে পারছিলাম না। আমি তার কথা ভেবে ভেবে কেঁপে উঠছিলাম —যে এক দিনও আমার লুপ্তদৃষ্টির তলে দাঁড়ায় নি, কিন্তু চিরদিন তার কঠোর জাগ্রত দৃষ্টির শাসনে আমায় বেঁধে রাখবে। আমি যে-জগৎকে চোখে দেখে বরণ করেছিলাম, তাকে ফেলে একলা কোথায় যাব? সেখানে হাজার ভীড়ের মধ্যেও যে-আমি মহা শূন্যে পড়ে থাকব।

আমার ভীত শঙ্কিত মনকে আশ্বাস দিতেই যেন কার পায়ের ধ্বনি আমার কানের কাছে আনন্দসঙ্গীতের মত বেজে উঠল। আমি দুঃখ-জগৎ ছেড়ে আমার ছবির রাজ্যে আবার ফিরে এলাম। এ ধ্বনি যে আমার সকল ছবির সঙ্গে জড়িত। বিনোদের গলা শুনলাম, "সরোজ, একলা চুপটি করে কি করছ? ওঠ, তোমার জন্যে কত ফুল এসেছে নেবে এস।"

বিনোদের গলাটা কেমন যেন ঠেকছিল। কি হয়েছে তার? হঠাৎ মনে পড়ল মায়ের কথা। বুঝেছি, বুঝেছি। পাগল আমি ভেবে ভেবে কেঁদে মরছিলাম যার ভয়ে, এই ত সেই আমার চির পুরাতন ভবিষ্যৎ। নিশ্চয় বিনোদের সঙ্গে মায়ের কোনো কথা হয়েছে, তাই আজ এত ফুলের ঘটা, তাই আজ আনন্দে লজ্জায় তার গলা কেঁপে যাচ্ছে! আমার অন্ধকার ধ্রুব হয়ে থাক, তাতে আর আমার দুঃখ নেই, সব চেয়ে বড় সুখই যে আজ পেয়েছি। আনন্দ আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের মত খেলে গেল, নব বধূর মত লজ্জায় আমার অন্ধ চোখ নত হয়ে পড়ল। বিনোদ হাত বাড়িয়ে দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললে, "এস।" আমি তার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালাম। বিনোদের হাত কেমন যেন ঠাণ্ডা, কেমন যেন কাঁপছে! এই কি পুলক-স্পন্দন?

একরাশ নরম নরম ফুল পাতা আমার কোলের উপর কে ফেলে দিলে। প্রণয়-উপহার কি মানুষে এমনি করে দ্যায়? মনে হল এ যেন পরের বেগার সারার মত ঠেকছে। আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম, বিনুর হাত ছুঁতে পারলাম না, তার কোমল স্পর্শের মত ফুলগুলি মুখে চোখে গায়ে চেপে ধরলাম; তার হাসির মত ফুলের গন্ধে ঘর ভরে উঠল। দুষ্ট বিনোদ তখন বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে যে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, তা আমি আমার মানস চক্ষেই দেখতে পাচ্ছিলাম। অন্ততঃ তাই ত আমার তখন বিশ্বাস হয়েছিল।

কতক্ষণ পরে মায়ের পায়ের শব্দে চমকে উঠে লজ্জিত হয়ে মুখ তুলে বসলাম। মা বললেন, "কিরে, একলা ফুলের বাগান বসিয়ে কি হচ্ছে? এত ফুল কে দিলে জানিস্?" মায়ের কথার মধ্যে কেমন যেন একটা স্নেহমাখা ঠাট্টার সুর বেজে উঠল। আমি মাথা নেড়ে বললাম, "জানি।" কিন্তু মনে কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগল। একলা আমি? কি অদ্ভুত ছেলে বিনোদ; আজকের দিনে আমায় এত শিগ্‌গির একলা ফেলে দিয়ে গেল। মা বোধ হয় একটু হেসে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আমি উঠে নীচে যেতে যেতে শুনলাম, পাশের ঘরে মা বলছেন, "বাবা বিনোদ, তুমি যে আমাদের কত আপন তা কি আর আজ বলে বোঝাতে হবে? তোমার ভালবাসার ঋণ শুধব এমন আমার কি আছে? তুমি আজ আমার অন্ধ মেয়েটাকে উদ্ধার করে আমার সকল দুঃখ হরণ করলে। তুমি না হলে আর কেউ এ কাজ করতে পারত না।"

বিনোদ এখানে? আমায় ফেলে এসে মায়ের আশীর্ব্বাদ কুড়োনো হচ্ছে! যাক, আজ আমিও সব খুঁটি-নাটি অপরাধ অনায়াসে ভুলে যেতে পারি। আমি আবার নিজের ঘরে চলে গেলাম। শুনে গেলাম মা বলছেন, "দেখো বাবা, যেন শেষ রক্ষা হয়।"

(৩)

আমার বিয়ের দিন এসে পড়ল। বিধবার অন্ধ মেয়ের বিয়ে, কেইবা আসবে আর কেইবা ফূর্ত্তি করবে? নাই বা এল কেউ! তবু আমার একলার আনন্দেই আমি ভরপুর। বাড়ীতে আমাদের লোকজন কেউ ছিল না; তাই বোধ হয় বিনোদই সারাদিন ঘরে ঘরে মায়ের সাহায্য করে বেড়াচ্ছিল। সারা ক্ষণই মনে হচ্ছিল, তার পায়ের শব্দ শুনছি; মাও 'বিনোদ বিনোদ' করে কি-সব বলছিলেন; কথাগুলোর দিকে আমার কান দেবার অবসর ছিল না,

আমি তখন কোন্ মহাপূজায় ব্যস্ত তার ঠিক নেই। বিনোদের গলা কিন্তু প্রায় শুনতে পাচ্ছিলাম না। সে যেন কেবলি দূরে সরে গিয়ে আমাকে এড়িয়ে চাপা গলায় কথা কইছিল। ভাবলাম—হায়রে লজ্জা! বর হয়ে কাজ করে বেড়াতে লজ্জা নেই, যত লজ্জা আমার কাছে!

তখন বোধ হয় গোধূলি। কাক পাখীর দল আকাশ-পথে বিদায়-সঙ্গীত ছড়িয়ে বাড়ী ফিরছিল। তপ্ত দিনের হাওয়া ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। দূর থেকে আমাদের বাড়ীর কোণের রজনীগন্ধা আর হাস্নোহানার গন্ধ ঘরের দিকে ভেসে আসছিল। তেল-কলের কুলীরা প্রতিদিনের মত সেদিনও কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় মহা কলরব করতে করতে বাড়ী ফিরছিল। আমাদের বাড়ী দু চার জন করে কারা যেন সব এল। কে এসে আমার প্রসাধনে সামান্য কি সব খুঁটিনাটি পরিবর্ত্তন করে দিয়ে গেল। তারা সেদিন আমার সঙ্গে কেউ কথা কইলে না। অন্ধের বিয়েতে ঠাট্টা তামাসা করতে তাদের মনেও ব্যথা লাগছিল বোধ হয়। কিন্তু তারা যদি করত তাতে আমার বোধ হয় কিছুই কষ্ট লাগত না। সেদিন যে আমিও সামান্য দুঃখের অনেক উপরে আনন্দসাগরে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। শুধু চন্দনের গন্ধই সেদিন আমার মনে গোধূলির আলো ছড়িয়ে দিয়ে গেল। সেই বলে গেল—আজকার আকাশে তোর সিঁথির সিঁদুরের মত উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আজ অন্ধের জগৎ আলোয় আলো।

শাঁখ বাজল না, বাজনা বাজিয়ে বরও এল না। আলো অনেক জ্বলেনি বোধ হয়; 'আলো, আলো' করে কে একটা লোক চারিদিকে চেঁচামেচি করে ছুটে বেড়াচ্ছিল। বিয়ের যে ঘটা! যাদের চোখ আছে, তারা দেখলে বোধ হয় মূর্চ্ছা যেত। কিন্তু ভগবান আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন বলে আমি সেদিন আমার বিবাহ-সভায় যে উৎসবের সৃষ্টি করেছিলাম, সুরসভায় দেবতাও সে উৎসবের কল্পনা করতে পারেন না; সমস্ত আকাশের বিদ্যুৎ থমকে দাঁড়ালেও আমার সভার সে আলোর জুড়ি মেলে না। বাঙালীর ঘরের বিয়ের আগের যত রকম খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে সব একে একে হল; আমি ত আর চোখে দেখিনি, কাজেই কেমন হয়েছিল না-হয়েছিল অত জানি না।

বিবাহসভা সাজানো হয়েছে; বর আসবার সময় হয়েছে; সবাই অভ্যর্থনা করতে গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। বর আর আসে না। কি হয়েছে, আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার বিবাহের শুভক্ষণে কোন্ অশুভ সমস্ত এমন ওলোট্ পালট্ করে দিলে? একবার যেন কেমন একটা চাপা গলার কথাবার্ত্তা শুনলাম; শব্দটা ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছিল, আমি উৎকর্ণ হয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে শোনবার চেষ্টা করেও শুনতে পেলাম না। মনে হল শূন্য ঘরে আমায় ফেলে একে একে সবাই পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। নীরব নিস্তব্ধ উৎসবলগ্ন আমার বুকের উপর পাথরের মত চেপে বসছিল। লজ্জাবতীর মত মাথা হেঁট করে বসে থাকা কি আর তখন আমার মত অন্ধ মানুষের সাজে? আমি খস্খসে চেলীর কাপড়খানা কোনো রকমে গুটিয়ে বাইরের দরজার দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে চললাম। হাতের কাছে দেয়াল কপাট কিছু পাচ্ছিলাম না, মনে হচ্ছিল পায়ে পায়েই যেন হাজার ফাঁস জড়িয়ে যাচ্ছে। হাত দুখানা অসহায়ভাবে এক একবার সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যেন অন্ধকার দু হাতে ফাঁক করতে করতে টলতে টলতে কোনো রকমে গিয়ে একটা দরজার গায়ে পড়লাম। শিকলের লোহায় কপাল ঠুকে চন্দন-রেখার উপর দিয়ে ঠাণ্ডা রক্ত গড়িয়ে পড়ল; শুভ বিবাহের উপযুক্ত লক্ষণ বটে! সে কথা তখন কেই বা ভাবছে? আমার কানে মানুষের গলার শব্দ আসিতেই আমি কপাট শক্ত করে ধরে দাঁড়ালাম। আমার বোধ হয় কেউ দেখতেই পায়নি। পেলে অমন উত্তেজিত গলায় অতলোক মিলে কথা কইত না, নিশ্চয়।

মায়ের গলা শুনলাম, "বর এল না? কেন কি হয়েছে?"

আমার মাথা টলে আসছিল; তবু শক্ত করে দরজা চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিনোদের কোন অমঙ্গলের সূচনা আমার বধূবেশের উপর রক্তধারায় গড়িয়ে পড়েছে, তাই ভেবে আমার প্রাণ শঙ্কায় কেঁপে উঠছিল।

কে যেন বললে, "বর মেয়ের সব কথা জানতে পেরেছে; সে আসবে না, ভয়ানক চটে গিয়েছে।"

মন আমার কেঁদে উঠল। কি করেছি আমি? কোন্ গোপন পাপ আমি সযত্নে তার দৃষ্টির আড়াল করে রেখে-

ছিলাম? কই মনে ত পড়ে না! আমার সমস্ত অতীত কথা তন্ন তন্ন করে দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল; কিন্তু সে শক্তি তখন আমার ছিল না। মনে মনে বল্‌লাম, "আমার অতি বড় দুর্ভাগ্য স্বহস্তে নিজের মাথায় যে তুলে নিচ্ছে, সে আমার কোন্ তুচ্ছ অপরাধের ছলে আজ অভিমান করে বস্‌ল?"

মা কেঁদে বল্‌লেন, "বিনোদকে একবার ডাক্‌তে পাঠাও। সে এত করেছে, আজ যদি কিছু উপায় কর্‌তে পারে!"

মায়ের কথার কোনো অর্থ যদি বুঝ্‌লাম! ভাব্‌লাম মাথাটা দুঃখে খারাপ হয়ে গেল নাকি?

সেই গলায় আবার শুন্‌লাম, "সে ত এখন গাঁটছড়া বেঁধে বসে আছে! তারা তেম্‌নি লোক কি না, নিজেদের মেয়ে উদ্ধার করে নিয়ে তবে কথা ফাঁস করেছে। আজ পাঁচ সাত দিন আগেই জান্‌তে পেরেছিল, আগে বল্‌লে পাছে বিনোদ ওদের মেয়ে না বিয়ে করে, তাই কাজ সেরে তবে কথা কয়েছে। জানেই ত যে তাদের অমন ডানাকাটা পরী মেয়েকে বিয়ের পরে কেউ ফেলে দেবে না। আর এমন মেয়েকে ঘরে না নিলে কেউ তাদের দুষ্‌তে পার্‌বে না।"

কি এ রহস্য! কেই বা সে ডানাকাটা পরী আর কেই বা সে বর?

আর একজনের গলায় শুন্‌লাম, "আহা, বিনোদের মত অমন ছেলেটা শুধু কানা মেয়েটার গতি কর্‌বার জন্যে ওদের কাছে একটা পয়সা নিলে না। তা কলিতে কি আর ধর্ম্ম আছে! এখন কেবল শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলিই সাজে ভাল।"

তাদের কথা শুনে মা চাপা গলায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কোন্‌দিকে যেন চলে গেলেন। আমি তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে। আমাকে পরের গলায় ঝুলিয়ে দেবার জন্যে বিনোদ পয়সা না নিয়ে কোন্ ডানাকাটা পরীকে কৃপা করে উদ্ধার করেছে! এতবড় স্বার্থত্যাগ, এমন পরোপকার মানুষে কখনো করেনি! কে যেন বল্‌লে, "মেয়ের মায়ের সাম্‌নে বল্‌তে কেমন বাধে, তাই। নইলে এ মেয়ের মুখের দিকেও যে তাকান যায় না। ওই ঠেলে-ওঠা পাথরের মত চোখ, ওই হাড়-সর্ব্বস্ব গাল, মুখ যেন কিসে খুব্‌লে খেয়েছে। যে দেখ্‌বে সে যে ভয়ে সেইখানেই হয়ে যাবে। বড়-সড় মেয়ে শুনে লোকটা চট্ করে রাজি হয়েছিল, খুসীও খুবই হয়েছিল, কিন্তু এমন ঘাটের মড়া ত আর সে বোঝে নি।"

এমন রাক্ষসী মূর্ত্তি আমার! তাই বুঝি আমার নিজের দৃষ্টিকে এ কঠিন আঘাতের হাত থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে ভগবান্ দৃষ্টিটুকুই সরিয়ে নিয়েছেন! আমার হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এল, গায়ের রক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে সমস্ত শরীর ভারে অবশ হয়ে পড়্‌ল।

তারপর কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? জানি না। যখন জাগ্‌লাম, কে যেন মাথার কাছে বাতাস দিচ্ছিল, তাকে কত ডাক্‌লাম, সে উত্তর দিল না; পা টিপে টিপে দূরে চলে গেল। বোধহয় মায়ের কোলে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আর শুন্‌তে চাও? আমার মত মেয়েকে আর কেউ মায়ের দিকে তাকিয়েও ঘরে নিলে না; আমি বাঁচ্‌লাম। কিন্তু যে দুজন মানুষ আমার ভাগ্যকে আমারি কাছে এমন করে ঢেকে রেখেছিল, যাদের আমি অন্ধ বলেই অন্ধের মত এমন নিশ্চিন্ত মনে সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম, তাদের কাছে আমি যে ঘা খেয়েছি, তাতে আর আমার বেঁচেই বা লাভ কি?

হেসে কথা বলে যে মানুষগুলো বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজ আমার মনে হয় ওরা সবাই জাল, বিশ্বটা একটা ফাঁদ। ওর মধ্যে খাঁটি সোনা আছে; কিন্তু সে কোথায়? কে আমাকে বলে দেবে? সেই খাঁটি মানুষটিকে পাবার জন্যে আমি নিশিদিন উন্মুখ হয়ে বসে আছি, কিন্তু এই বিশ্বজোড়া ফাঁদে কোথায় ভুল করে পা ফেল্‌ব সেই ভয়ে এগোতে পার্‌ছি না। নিজের মনের রচিত ভয়ের জালে নিজেই বন্দী হয়ে ক্ষুধিত সিংহের মত নিজেকেই ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। উপবাসী প্রাণ যে গেল, তবু বিষের ভয়ে সুধাপাত্র মনে করেও কিছু ছুঁতে পার্‌ছি না।

কিন্তু জানো, যতই কেন বকে মরি না, আমি এখনো ঠিক সেই তোমাদের মত। মানুষকে যে বড় ভালবাসি। তাই আজও মনে হয়, যার জন্যে বিশ্বসুদ্ধকে অবিশ্বাস করেছি, তার বুঝি কোনো দোষ নেই। আমিই হয় ত ভুল বুঝেছি। জগতের সবই যে রহস্য! অন্ধের চোখে সে রহস্যের জাল আর-এক পর্‌দা বেড়ে গেছে।

শ্রীশান্তা দেবী।

আঙ্গ্ল-মার্কিন যুদ্ধ-সঙ্গীত

(মূল ওজিবোয়া ভাষায় রচিত গানের ইংরেজী থেকে)

আমার আওয়াজ শোন্ তোরা আজ
লড়ায়ে-বাজপাখী !
শত্রু মেরে ভোজ দেব রে
আয়রে তোদের ডাঁকি।
শত্রু-সেনার গণ্ডী তোরা
যাস্ ডিঙিয়ে, তাকাই মোরা—
মোরাও যাব গণ্ডী ভেঙে
রক্ত-পাগল আঁখি।
মোর কামনা তোদের ডানার ক্ষিপ্রগতি, ভাই,
শত্রু-শাতন তোদের নখের তীক্ষ্ণতা মোর চাই ;
চল্‌ব মোরা তোদের সমান,
আয় তোরা বীর আয় রে জোয়ান !
রোষের আগুন আয় জ্বালিয়ে
বীরমাটি গায় মাখি !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ম্যালেরিয়ার বাহন ধ্বংসের উপায়

বৈজ্ঞানিকগণের মতে এনোফেলিস (anopheles) নামক মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া-বিষ মানব-দেহে প্রবেশ করে। পুকুর ডোবা নালা খাল প্রভৃতির জলে ঐ জাতীয় মশকের উৎপত্তি। কাপড়ের জাল দিয়া জলাশয়ের কিনারা ছাঁকিলে ঐ-সকল মশক কীট-অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে ইংরেজীতে larvae বলে। প্রধানতঃ দুই প্রকার মশক-কীট জলে থাকে। যথা, এনোফেলিস (anopheles) এবং কিউলেক্স (culex)। এনোফেলিস মশক-কীটগুলি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, সরু ও কালো। কিউলেক্স কীট তদপেক্ষা বড়, রংও তত কালো নহে। মশক-কীটগুলি দিনকতক জলে থাকিয়া মশক হইয়া উড়িতে থাকে। এনোফেলিস মশা এক ম্যালেরিয়া-রোগীর বিষ আনিয়া অন্য দেহে এই বিষ বিস্তার করে। কিউলেক্স-মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় না। কলিকাতার মশা প্রধানতঃ কিউলেক্স জাতীয়।

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে ইঁদুরকে ভগবানের বাজে খরচ বলা হইয়াছে। কিন্তু মশককেও ভগবানের বাজে খরচ বলা চলে। নরশোণিত তাহাদের প্রিয় খাদ্য, নরহত্যা তাহাদের ধর্ম্ম। ভগবানের রাজ্যে প্রায় দেখা যায় বড় শত্রু অপেক্ষা ক্ষুদ্র শত্রু বেশী অনিষ্টকারী। বাঘ ভল্লুক ও সর্পের কৃপায় বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর যত লোক মারা যায় তাহা অপেক্ষা বহুসংখ্যক লোককে মশক পরপারে পাঠাইয়া দেয়। অনেকে মশক নাশের উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তেমন সক্ষম হন নাই। যখন সামান্য একটি শয্যায় ছারপোকা দূর করিতে মানুষ অস্থির হইয়া পড়ে, তখন এতবড় একটা বাঙ্গলা দেশকে মশকের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা একটা অতি কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন যখন জল হইতে মশার উৎপত্তি জানা গিয়াছে তখন কীট অবস্থায় উহাদিগকে মারিয়া ফেলা প্রয়োজন। কারণ ঐ সকল মশক-কীট মশক হইয়া উড়িয়া যাইলে তখন তাহাদের মারা অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন জলে কেরোসিন দাও। কথা হইতেছে অত কেরোসিন কে জোগাইবে। তা ছাড়া পুকুর ও ডোবার জল মানুষের নানা কাজে লাগে। কেরোসিন ঢালিলে সে জল অব্যবহার্য্য হইবে। সুতরাং কেরোসিনে কিছু হইবে না।

আমাদের মতে মশক-কীট নাশের আর-এক উপায় পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কয়েক প্রকার মাছ ঐ-সকল মশক-কীট অতিশয় আগ্রহে ভক্ষণ করে। যেমন, কৈ ও খলিসা। কৈ মাছ এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সম্প্রতি শুনিলাম ডাক্তার বি এল চৌধুরী মহাশয় ত্রিচোক মাছেরও পক্ষপাতী। ঐ-সকল মশক-কীটভুক্ মাছ নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে রাখিলে মশকের উপদ্রব হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

ভিক্ষার দীক্ষা

(একটি ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে)

এক যে ছিল খোঁড়া ফকির
তার কাঠের ছিল ঠ্যাং,
কাঠের ঠেঙোয় ভর দিয়ে সে
চল্‌ত ড্যাড্যাং ড্যাং!
জন্ম-গরীব জন্ম-খোঁড়া
ঠেঙোয় দিয়ে ভর
মাগন মেগে পাড়ায় পাড়ায়
ফির্‌ত সে ঘর ঘর।

আজ আমরা সবাই যাবরে ভাই
যাব রে ভিক্ষায়,
বিনি-ঠেঙোয় সাজ্‌ব ফকির
ক্ষতিই বা কি তায়?
আমরা যাবই রে ভিক্ষায়।

ঝোলাতে তার ছোলার ছাতু
পুঁটুলিতে তার নুন্‌,
লম্বা ঠেঙোয় ভর দিয়ে সে
চল্‌ত ফারি দুন্‌!
আঁজ্‌লাতে তার চালকড়ি রে
শিশিতে তার তেল,
আর জল খেতে নার্‌কেলের মালা—
দরিয়াই নার্‌কেল!
সেই ফকিরের সঙ্গে রে ভাই
ঘুরে বছর সাত
নিত্যি মেগে হল আমার
মাগন্‌-মাগা হাত!
সেই হাত-পাতায় ওস্তাদের লেগে
পেতেছি হাত ঢের,
এখন নিজের মালিক নিজেই, তবু
ঘোচে নি হের ফের,
বদল হয় নি স্বভাবের—
রোজই পাত্‌ছি যে হাত ফের!

গাছের হাঁড়ল বাসা আমার
ভোগ করি নিষ্কর,
খুসী আছি খোদার দয়ায়—
সেই দয়া নির্ভর।
পেশার সেরা ভিক্ষে করা
তুলনা তার নাই—
ক্লান্ত হ'লে জিরোও পথে,
বক্‌বে না কেউ, ভাই।
দুষ্‌মন্‌ আমার নেই দুনিয়ায়,
দুয়ারে নেই খিল্‌,
লোকালয়ের বাইরে থাকি
আমীর হেন দিল্‌
আমার আমীর হেন দিল্‌!

যদি ভিক্ষেতে ভাই এতই মজা
আমীরী কে চায়
তবে চল্‌ রে সবাই চল্‌ ওরে ভাই
চল্‌ চলি ভিক্ষায়—
সবাই চল্‌ চলি ভিক্ষায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কষ্টিপাথর

চাষার গান।

পরাণ বঁধুরে—

ঘরের কোণায় থাকিরে আমি, তুমি থাকরে মাঠে,
কাঠ ফাটা রইদে রে তোমার মাথা ফাটে,
তোমার লাগিয়া বন্ধুরে আমি ছেঁওয়ায় পাইরে যে তাপ।
কি জানি কোন্‌ জন্মেরে বন্ধু কইরাছিলাম পাপ।
শাওনের রৈদরে বন্ধু নিমের পাতার তিতা,
বিচ্ছেদ হৈতে অনেক ভাল তেঁতে কাঠের চিতা।

(সৌরভ, ভাদ্র)

দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ

বহুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী সওদাগরগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত সমুদ্রগামী পোত লইয়া বঙ্গোপসাগর এবং আরব সমুদ্রের তীরস্থ নানাস্থানে বাণিজ্য করিতে যাইত।

এইরূপ বাণিজ্যকারণ এক দেশের লোক অপর দেশে যাতায়াত করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের হেতুস্বরূপ হয়। মাদ্রাজের চিংগলিপট জেলার সেণ্ট টমাস্‌ মাউণ্টের (St Thomas Mount) "বাঙ্গালী

[কানাড়া]র" এক সময় একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল বলিয়া কেহ-কেহ অনুমান করেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একটি বিশিষ্ট বাঙ্গালী উপনিবেশের বিষয় পাঠকগণের গোচর করিব। এই উপনিবেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১০ সহস্র, তন্মধ্যে প্রায় ৫০০০ পুরুষ এবং ৫০০০ স্ত্রীলোক। এই সম্প্রদায়ের নাম গৌড়-সারস্বত-সম্প্রদায়। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ।

ইঁহারা পূর্ব্বে গোয়া (Goa) অঞ্চলে বাস করিতেন। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক গোয়া অধিকৃত হইবার পরে তত্রস্থ অধিবাসীগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হয়। অনেকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই অত্যাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পায়, এবং অনেকে বা দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে প্রায় সমগ্র গৌড়-সারস্বত-সম্প্রদায় পলায়ন করিয়া, সমুদ্রতীরস্থ কারবার, আঙ্কোলা মাঙ্গালোর এবং হর্লিয়াল, সুপা, সিসি প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক্ষণে ঐ-সকল স্থানেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বাস করিতেছে। অতি অল্প সংখ্যক লোক পুনরায় গোয়ারাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তথায় বসবাস করিতেছে।

উত্তর কারবার জেলার (Gazeteer) গেজেটিয়রে ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

According to tradition the founders of the caste called Sharmas were brought with their family god and goddess by Parashuram the sixth incarnation of Vishnu, from Trihotra, the modern Trihut in Bengal, to help him in performing ceremonies in honour of his ancestors.

আমার বোধ হয় গেজেটিয়র লিখিত পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার নহেন, তিনি তৎকালীন গোয়ারাজ্যের রাজা ছিলেন। এই রাজা পরশুরাম বঙ্গদেশবাসী বাণিজ্যকারী বণিকগণের নিকট বঙ্গদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের হিতার্থে তিনি যে মহাযজ্ঞের অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন তৎসম্পাদনার্থ কয়েকজন শর্ম্মা বা দেবশর্ম্মা উপাধিযুক্ত ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইঁহারাই বর্ত্তমান গৌড়সারস্বতদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

গৌড় সারস্বত জাতীয় নরনারীর আকৃতির সহিত ত্রিহুত জেলার লোক অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণগণের আকৃতির অধিক সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্ত গৌড় সারস্বত নরনারীর উচ্চারণের ত্রিহুতের নিকটবর্ত্তী উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণদিগের উচ্চারণের সহিত অতি আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমার বিবেচনায় এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষগণ উত্তর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

উক্ত গেজেটিয়রে লিখিত আছে—

The memory of the Sharmas survives in figures which are placed before the images of the god Mongesh and the goddess Shantadurga which the Sharmas are said to have brought from Trihut to Goa. According to the Shenvis the caste god and goddess, Mongesh and Shantadurga, were brought from Bengal. But the Mongesh-mahatmya seems to show that they were local Goa deities whose worship was adopted by the three founders of the class. Again the Shenvis state that their names came from ninety-six, the number of the families of the original Bengal settlers.

উক্ত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশ হইতে কেবলমাত্র শান্তদুর্গা দেবীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া গোয়া প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। মঙ্গেশদেব বোধ হয় গোয়ারই স্থানীয় দেবমূর্ত্তি। কারণ বঙ্গদেশে মঙ্গেশদেব নামক কোন দেবতা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেহ-কেহ বলেন মঙ্গেশ লিঙ্গ বঙ্গেশ লিঙ্গের অপভ্রংশ মাত্র।

বাঙ্গালাদেশে আমাদের পুরুষদিগের নামের পূর্ব্বে সম্মানসূচক "বাবু" শব্দ অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গৌড়-সারস্বতদিগের মধ্যেও এই "বাবু" শব্দের ন্যায় "বাব" শব্দ সম্মানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইঁহারা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ব্রহ্মরাক্ষস বা ব্রহ্মদৈত্য, গ্রাম্য দেবতা, পঞ্চমাতৃকা, অন্নপূর্ণা, গোপালকৃষ্ণ, রাম সীতা প্রভৃতির এবং সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহারা দেবতাকে অন্ন-ভোগ প্রদান করেন।

বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণগণের কোন সাম্প্রদায়িক গুরু নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের এক এক সম্প্রদায়ের এক একজন সাম্প্রদায়িক গুরু আছেন। একারণ যখন সারস্বতগণ গোয়া প্রদেশে আগমন করেন তখন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের সাম্প্রদায়িক গুরু না থাকায় তাঁহাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে এই সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক গুরু করিতে বাধ্য হন। অদ্যাবধি তাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক গুরুর অধীন।

গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণগণের প্রধান খাদ্য সিদ্ধ বা আতপ তণ্ডুলের অন্ন (অপর ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন বড় একটা ব্যবহার করেন না), তরকারী এবং মৎস্য। শক্তি-উপাসকগণ মাংস এবং মদ্যের দ্বারা শক্তিদেবীর উপাসনা করিয়া প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের জাতিগত বাধা নাই। দাক্ষিণাত্যের অপর ব্রাহ্মণগণ মৎস্য মাংস স্পর্শ করেন না।

দাক্ষিণাত্যে হুঁকায় তামাক খাইবার প্রথা নাই। কিন্তু গৌড় সারস্বতগণের মধ্যে এই প্রথা অদ্যাবধি কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।

গৌড় সারস্বতগণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

ইহাদিগের পুরুষগণ কাছা ও কোঁচা দিয়া বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্ত্রীগণের বেশভূষা পরিধান করে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেমন বাঁশের চেটাই দ্বারা সূতিকাগৃহ (আঁতুড়-ঘর) গঠিত হইত ইহাদের মধ্যে এখনও সেই প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরও এক সম্প্রদায় সারস্বত ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহারা কান্যকুব্জ (কনৌজ) হইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে কেবলমাত্র "সারস্বত ব্রাহ্মণ" কহে।

গৌড় সারস্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি চলিত কথা (proverb) এবং গল্প আমাদের বাঙ্গালা দেশের অনুরূপ। আমি ভারতবর্ষের যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং কোন কোন স্থানে অনেকদিন বাসও করিয়াছি। কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন পূর্ব্বে আর কোথায়ও এইরূপ গল্প শুনিতে পাই নাই।

বাঙ্গালীর রক্ত যাঁহার অঙ্গে বিন্দুমাত্রও বর্ত্তমান আছে তিনিই আমাদের আদরের ধন। গৌড় সারস্বতগণ অদ্যাবধি আপনাদিগকে বাঙ্গালীর বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, আমরাই কেবল তাঁহাদিগকে জানি না!

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র।) শ্রীকালিপ্রসন্ন বিশ্বাস।

বঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যা লইয়া বেশ একটু আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। দেশের জনসাধারণ এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলের দৃষ্টিই এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত প্রথায় আর কেহই সন্তুষ্ট নহেন। জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মশক্তির বিকাশই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। সেই হিসাবে শিক্ষাকে আমরা দুই

ভাগে বিভাগ করিয়া লইতে পারি। প্রকৃতি-রচিত শিক্ষা এক, আর-এক শিক্ষা যাহা মানুষ মানুষের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানুষ যে উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইতে পারে এবং মনুষ্যসৃষ্ট প্রণালী হইতে সে শিক্ষা অবনত নয় তাহার উদাহরণ আমরা বড় বড় কবির কাব্যে পাইয়া থাকি। কিন্তু কাব্য এক এবং জীবন অন্য। অতি প্রাচীন যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভরশীল ছিল—কিন্তু আর্টের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিল, এবং বর্ত্তমান যুগে সে এতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে বিশিষ্ট যোগ এবং বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিকে অবহেলা করা মানুষের জীবনের সর্ব্বপ্রধান অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তিও মানুষকে বহুল পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। আর্টের ক্ষমতা যতই হউক না কেন, উহাকে চিরদিনই প্রকৃতির অনুগামী হইতে হইবে। প্রকৃতি হইতে পৃথক হইলে তাহার অপঘাতমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যে শিক্ষায় প্রকৃতি অবহেলিত, সে শিক্ষা কখনও তাহার চরম উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ দোষ—প্রকৃতিকে দেখিবার ও বুঝিবার প্রয়াস ইহাতে যথেষ্ট নাই। এই দোষের নিমিত্তই এ শিক্ষা আমাদের নিকট সহজ বলিয়া বোধ হয় নাই—সেই জন্যই বালক-বালিকার নিকট ইহা "ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের" মত অবতীর্ণ না হইয়া "ঘাড়ের বোঝা"র মত চাপিয়া বসে। এই শিক্ষা পুস্তকরাশির মধ্যে নিবদ্ধ—জীবনের সহিত, বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ অল্প। জীবনের সাধ ইহাতে মিটে না—জীবনের সজীবতা, নবীনতা ইহাতে নাই—পাথার অভ্রভেদী প্রাচীরের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া ইহা আত্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না হইলে জীবনের অন্যান্য কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না।

আমাদের প্রথম সমস্যা হইল স্বাস্থ্য। ইহার অভাব শিক্ষিতের মধ্যে যেরূপ অধিক পরিমাণে দেখা যায় অশিক্ষিতের মধ্যে তেমন নয়। দ্বিতীয় সমস্যা—"অন্ন-সমস্যা"—এই সমস্যা থাকিলে কোনও শিক্ষা বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না, কারণ কালিদাসের ন্যায় মহাপণ্ডিতও ইহাতে বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন।

জীবনযুদ্ধে পদে পদে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হইয়া প্রকৃত শিক্ষার জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যখন প্রথম ইংরেজী শিক্ষা উঠিয়াছিল তখনকার দিনে ইংরেজী শিক্ষাবলে ভাল ভাল চাকরী মিলিত, রাজসরকারে সম্মান পাওয়া যাইত, সেই লোভে অনেকে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিল। আশা—ইংরেজী শিখিলে চাকরী পাওয়া যাইবে। কিন্তু চাকরী আর কত পাওয়া যাইবে! স্বাস্থ্য হারাইয়া যে বিদ্যালাভ করিলাম সে আমাকে দাস হইতেই শিক্ষা দিল; অন্য কোন ভাবে যে আমি দাঁড়াইব তাহার উপায় রহিল না। জীবনের এই আঘাত বড় আঘাত—এই শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে পাশ্চাত্য জাতির অবিরাম সংঘাতে এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে এমনভাবে আমাদিগকে শিক্ষিত হইতে হইবে যাহাতে আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারি। যদি সামান্য উদরান্নের জন্যই আমাকে পরের উমেদারী করিতে হয় তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা আমার কি করিবে—ইহা আমার নিকট গলগ্রহের মতই মনে হইবে। ফলতঃ শিক্ষার সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা উচিত। নতুবা শিক্ষা এবং জীবন দুইই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই জীবনের বীজ প্রকৃতির মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং জীবনকে প্রাপ্ত হইতে হইলে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন প্রয়োজন।

প্রচলিত প্রণালীতে শিশুর প্রথম হাতে-খড়ি হইলে তাহাকে "অ, আ", শিখান হইয়া থাকে। এই অ, আ, প্রভৃতি বর্ণ তাহারা কেন শিখে তাহা জানে না—ঐ অর্থহীন শব্দ তাহাদের নবোন্মেষিত জ্ঞানের দ্বারে নিগড়স্বরূপ আসিয়া পড়ে। সুর, শব্দ প্রভৃতি জানিবার ইচ্ছা যখন তাহাকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে সেই সময়ে প্রকৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত প্রথম জগদ্দল পাথর তাহার বুকের উপর বসান হইল—অর্থহীন অ, আ। শিশু ঐ "অ, আ" করিয়াই গুরু মহাশয়ের বেতের ভয়, বাড়ীতে পিতার তাড়না এবং অধীত গ্রন্থের অভিনব প্রলাপের মধ্যে জীবনের স্বর্ণময় প্রভাত হারাইয়া বসিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে—অতি অল্প দিন পরেই আবার নূতন বর্ণমালা তাহাকে শিখিতে হইবে—তখনও পর্য্যন্ত অ, আ প্রভৃতির প্রয়োজন তাহার উপলব্ধি হয় নাই—অথচ A, B, C, D-র মহিমা না জানিলে নয়। এই ভাবে আমরা যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি তাহা জীবনের নবীনতার দ্বারা সতেজ নয় এবং জীবনের রসের দ্বারাও অভিষিক্ত নয়। ইহার পর কালেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া একেবারে যখন জীবনের সম্মুখে আসিয়া পড়ি, তখন আপনাকে জীবনযুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং দুর্ব্বল মনে করিয়া হতাশ ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে জীবনটি কাটাইয়া দিই। জীবন ভোগ করা আর ঘটিয়া উঠে না; বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ট্রাজেডি।

শিশুকে ভূগোলে শিখান হয়—হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তরে। সে মানচিত্রে একটি মসীরেখা দেখে এবং বারংবার উহা আবৃত্তি করে। এই হিমালয় যে ভারতের কি সম্পৎ তাহার আভাস সে প্রাপ্ত হয় না, তাহার কোন চিত্র দেখাইবার বন্দোবস্ত বিদ্যালয়ে নাই; ইহা ভারতীয় জীবনকে কি ভাবে গঠিত করিতেছে তাহার সামান্য মাত্র ছায়াপাতও বালকহৃদয়ে হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তাহার নিকট হিমালয় একটি অর্থহীন শব্দ, যাহার ভার তাহার স্মৃতিকে প্রপীড়িত করিয়া তুলে।

ইতিহাসের অবস্থা আরও শোচনীয়। জীবনের সঙ্গে যেন তাহার কোনই সম্পর্ক নাই—কতকগুলি রাজা ও সংস্কারকের নাম, যেগুলি শুধু নামমাত্র, সেইগুলিকে স্তরে-স্তরে স্মৃতির মধ্যে সাজাইয়া রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত বাহির করিতে হইবে। বস্তুর সঙ্গে পরিচয় নাই—শিক্ষা চলিয়াছে। যখনই সে বাহিরে যায় তাহার শিক্ষক ও অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি তাহাকে প্রকৃতি-শিক্ষা হইতে সাবধান করিয়া আসিতেছে।

রাশীকৃত পুস্তকের ভারে প্রপীড়িত অল্পবয়স্ক বালকগণের সাধারণ জ্ঞানের অল্পতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাই বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যা। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে তবেই জীবনের উপযোগী শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হইব। স্বাস্থ্যই জীবনের সমস্ত সুখের মূল ভিত্তি।

যদি দাসত্বের দ্বারা উদরের চিন্তা দূর হইত তাহা হইলে দুঃখ ছিল না, কিন্তু তাহা হইতেছে না! আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-ধারীগণ বিবাহের সময় অনেক পণ পাইয়া থাকেন—এ কেমন উচ্চ শিক্ষা যাহা বিবাহের ন্যায় গুরুতর ব্যাপারেও কন্যার পিতার অর্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখে। এই চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জন্য এমন শিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে তাহারা দেশে নানারূপ কার্য্য পাইতে ও করিতে পারেন। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে যাহাতে ঐ-সমস্ত বিদ্যালয় হইতে শিক্ষিত ছাত্রগণ এই দেশেই যথেষ্ট কার্য্য পাইতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। যাঁহার মূলধন নাই, স্বাধীনভাবে কোনও কার্য্য আরম্ভ করিতে

যিনি পারিতেছেন না তাঁহারও যেন কার্য্যের অভাব না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল—কিন্তু দেশের কোনও সুসার তদ্দ্বারা হইল না। B. Sc. ও M. Sc. উত্তীর্ণ উকিল আজকাল যথেষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান দেশের কাজে লাগিল না। এইভাবে আমাদের শিল্প ও কৃষিশিক্ষাও ব্যর্থ হইবে, যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু শুধু শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করি। যাঁহারা ব্যবসাদার, অন্যান্য বিষয়ে যাঁহাদের টাকা খাটিতেছে তাঁহারা যদি অগ্রণী হন—একটি নূতন speculation বলিয়া এই সমস্ত কার্য্য গ্রহণ করেন, তবেই একদিন উহা সার্থক হইতে পারে। শিল্প ও কৃষিশিক্ষা দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতেই হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে শিক্ষা যেন দাসত্বের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আপনার মহদুদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া না বসে।

এই স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি আমাদের সমস্ত শিক্ষার মূলে বিজড়িত করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাবলম্বনেই "অন্ন-সমস্যার" মুক্তি। তার পর উচ্চশিক্ষা—উদরান্নের জন্য লালায়িত ব্যক্তির মস্তিষ্কে উচ্চ চিন্তা স্থান পাইতে পারে না। অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্যে অভিনব রসসৃষ্টি, কাব্যকলার সুন্দরতম নৈপুণ্য সাধন, গণিতের উচ্চাঙ্গের সমস্যা পূরণ, দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব মীমাংসা—রোগক্লিষ্ট অন্নচিন্তাক্ষুব্ধ দাসত্বভারাবনত মস্তিষ্কের দ্বারা কখনই সম্ভবপর নয়।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষা দিবার এবং বঙ্গসাহিত্যকে M A পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত করিবার একটি আন্দোলন শোনা যাইতেছে। যে জাতির মাতৃভাষা ঘৃণিত সে জাতির উদ্ধারের আশা নাই। বঙ্গভাষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না হইলে বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না। বাঙ্গালীর জীবন ও শিক্ষা বাঙ্গালার জলবায়ুতে পরিপুষ্ট হইয়া বঙ্গভাষার মধ্য দিয়াই সম্যক্ বিকশিত হইবে। আজ যে শিক্ষা আমরা পাইয়াছি ইহা প্রকৃত শিক্ষা নয়, ইহা অনুকরণমাত্র। কিন্তু ইহা একেবারে ব্যর্থ নয়—বিদেশ হইতে প্রাণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আনিয়া ইহা আমাদের চেতনাহীন প্রাণকে চৈতন্যের বিপুল বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গের অন্নাভাব দূর করিয়া আজ বাঙ্গালীকে নানা বিদ্যার আভরণে ভূষিত করিবার দিন আসিয়াছে। পরের জীবনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আর আমরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব না—কলা, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অভিনব সৃষ্টি দ্বারা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিবার সুদিন উপস্থিত। এখন কেবল পূজাবেদীতে বঙ্গবাণীর উদ্বোধনের জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মায়ের আগমনী সঙ্গীতে যোগদান করিতে হইবে।

(তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, ভাদ্র।) শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম্

দাক্ষিণাত্যের চোল-বংশীয় রাজা রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশের রাজা কনৌজের প্রতীহার-বংশীয় মহীপালের রাজ্যকালে
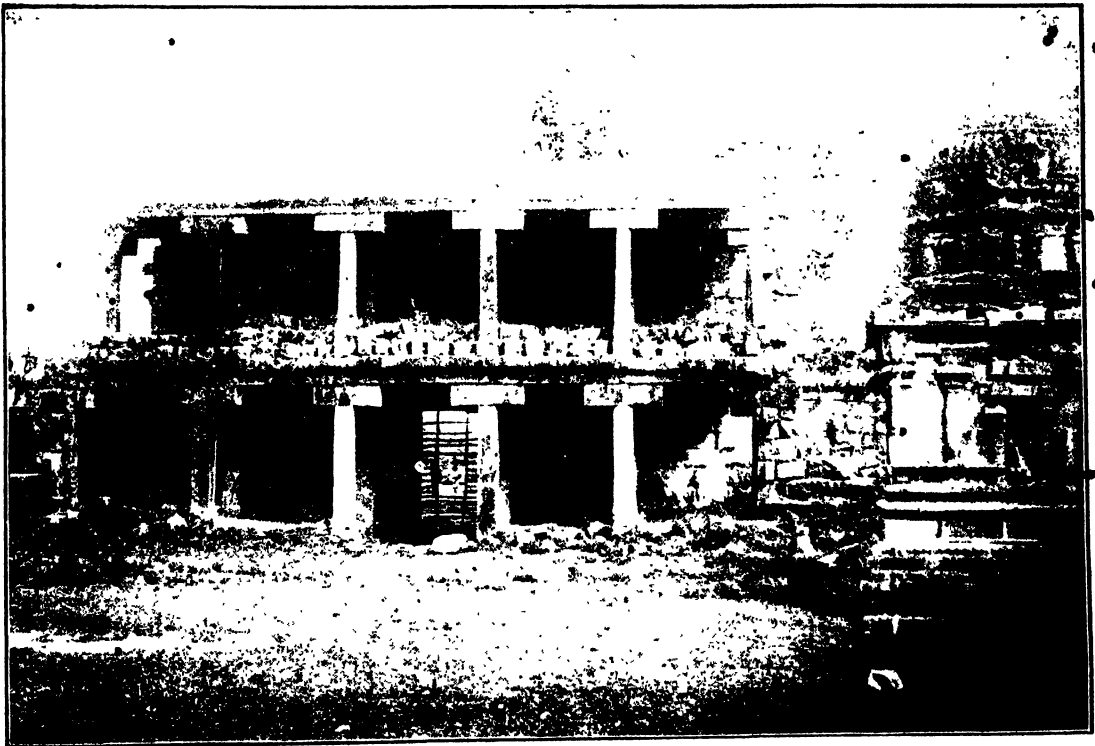
গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম্ মন্দিরের প্রাকার-বেষ্টিত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ—যাহা ভাঙিয়া প্রস্তর লইয়া ১৮৩৬ সালে ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারেরা বাঁধ নির্ম্মাণে ব্যবহার করিয়াছিল।

গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম্ মন্দির ও নন্দীবৃষ। বৃষের পাশে একটি মানুষ ও জীবন্ত বৃষ দাঁড়াইয়া বৃষমূর্ত্তির বিরাট দেহের আন্দাজ বুঝাইয়া দিতেছে।

এই প্রবল সাম্রাজ্যের রাজধানী এখন ধ্বংস হইয়া সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে; সেখানে অতীত গৌরবের সামান্য নিদর্শন এখনো দেখিতে পাওয়া যায়।

এই স্থান ত্রিচিনপল্লী জেলার উদয়রপালয়ম্ তালুকের এক কোণে অবস্থিত। তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত সাউথ-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ের অদুথুরাই ষ্টেসন হইতে গঙ্গাইকোণ্ড-চোলপুরম পর্য্যন্ত যাইবার পাকা শড়ক আছে।

গঙ্গাইকোণ্ড রাজেন্দ্র চোল ১০১৮—১০৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁর পিতা রাজরাজ চোল ও তাঁর পুত্র রাজাধিরাজ উভয়েই দিগ্বিজয়ে গঙ্গাইকোণ্ডের পথ-প্রদর্শক ও সহায় ছিলেন। এঁদের বিবরণ ভিনসেণ্ট স্মিথের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আছে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাসেও অল্প আছে; সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তাঞ্জোর এঁরই সাম্রাজ্যের অপর প্রসিদ্ধ নগর। সেখানকার প্রসিদ্ধ মহামন্দিরের আদর্শে তিনি গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে একটি বিরাট মন্দির গঠন করান ও তার মধ্যে এক অখণ্ড শিলার ৩০ ফুট উচ্চ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটির চারিদিকের হাতা ৫৮০ ফুট লম্বা ও ৩৭০ ফুট চওড়া; তাহা প্রাসাদাবলীতে পরিবেষ্টিত; প্রাচীরের কোণে কোণে গুম্বজ ছিল। মন্দিরটি ক্রমশ সরু হইয়া ২৪০ ফুট উচ্চ; তার তলা এত চওড়া যে লোকের বিশ্বাস মন্দিরচূড়ার ছায়া মাটিতে পড়ে না, মন্দিরের গায়েই থাকিয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখের

গঙ্গাতট পর্য্যন্ত জয় করিয়া গঙ্গাইকোণ্ড বা গঙ্গাবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রচোলের সাম্রাজ্য ব্রহ্মদেশের প্রোম ও পেগু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; মর্ত্তমান বন্দর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তাঁর নৌ-বহর দখল করিয়াছিল; সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম রাখা হইয়াছিল গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম্।

গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম্ নগরের পুরাতন মন্দিরের প্রবেশপথ।

প্রকাণ্ড নন্দীবৃষ যে কত বড়, ছবিতে একটি মানুষ ও জীবন্ত বৃষের তুলনায় তাহা স্পষ্ট দেখানো হইয়াছে।

এই মন্দিরের শিলাঙ্কণ ও কারুকার্য্য যে কিরূপ অলঙ্কারবহুল ও ব্যয়সাধ্য ছিল তার পরিচয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ছবিতেও দেখিতে পাওয়া যাইবে। মন্দিরে যাইবার দুটি তোরণ--উত্তরে আর দক্ষিণে - ৬০ ফুট উচ্চ।

মন্দিরের প্রাকাররূপে নির্ম্মিত দ্বিতল প্রাসাদাবলীও স্থপতিবিদ্যার চমৎকার নিদর্শন ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলের সুসভ্য সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারেরা ঐ দিগ্বিজয়ী সম্রাটের গৌরবমুকুট প্রাচীন রাজধানীর প্রাসাদ ভাঙিয়া তারই পাথরে জয়ংগোণ্ডচোলপুরমে একটি পুকুর বাঁধাইয়া কীর্ত্তি করিয়াছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ এই বর্ব্বরতাকে

Civilised Vandalism ও কর্ত্তাদের Modern Utilitarians বলিয়াছেন।

গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে রাজেন্দ্রচোল ১৬ মাইল লম্বা একটি কৃত্রিম হ্রদ খনন করান এবং সেই হ্রদের সঙ্গে নালা ও জলসেচনের ব্যবস্থা ছিল, তাতে হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হইতে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হইত না।

ভারতের যেসব সম্রাটের সাম্রাজ্য বহির্ভারত পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল, যাঁদের নৌসাধন সমুদ্র মন্থন করিয়া ফিরিত, তাঁদেরই অন্যতম পরাক্রান্ত সম্রাটের এই লীলাভূমি ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইতেছে,—কতক তাঁদের উত্তরপুরুষদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতায়, কতক কালের সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণে।

পঞ্চশস্য

নিগাও-এ—

নিগাও-এ জাপানী কথা, তার মানে অভিনেতার বিশেষত্ব ব্যঞ্জক ছবি। কোনো নাটকের অভিনেতা বা অভিনেত্রী যে যেরূপ চরিত্র অভিনয় করে তারই বিশেষ প্রকৃতি সেই অভিনেতার চেহারার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়া ছবি আঁকা জাপানী চিত্রকরদের রীতি আছে। যে অভিনেতার যে ভাবটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হইয়া স্ত্রী-দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করে, প্রধানত সেই ভাবটিই আঁকা হয়। এতে সেই অভিনেতার চেহারার আদলমাত্র বজায় রাখিয়া তার সেই ভাবটিকেই আকার দিতে চেষ্টা করা হয়। এইরকম রঙিন ছবি অভিনেতাদের ভক্তদের কাছে খুব দরে বিক্রয় হয়।
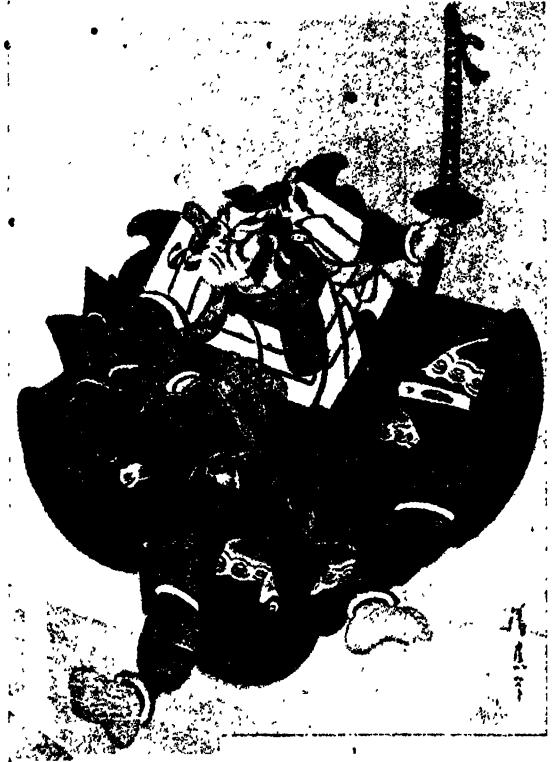
নিগাও-এ—তোরিআই কিয়োতাদা কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

নিগাও-এ। তোয়োকুনি ও কিয়োমিৎসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

এই চিত্রাঙ্কণ-প্রথা যে কত কালের তার ঠিকানা নাই। প্রথম দক্ষ ও প্রসিদ্ধ চিত্রকর যিনি এই কাজে হাত দ্যান, তাঁর নাম তোরিআই কিয়োনোবু, তিনি ৫৮ বৎসর বয়সে ১৭০২ সালে মারা যান।

তারপর অনেক বিখ্যাত চিত্রকর এই কাজে হাত দিয়াছেন। কেউ বা চিত্রিত অভিনেতার কেবল গুণপনাই আতিশয্য দিয়া কল্পনা করিয়াছেন; কেউ বা তাদের দোষ-গুণ দুইই অতিশয়তার ছাপে প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। কেউ বা ভাবমাত্র প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, কেউ বা ভাবের সঙ্গে কার্য্যের ভঙ্গী পর্য্যন্ত অঙ্কন করিতেন।

পুরাতন প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের ছবির এক-একখানা ছাপা প্রতিলিপি আশ্চর্য্যজনক বেশী দামে বিক্রয় হয়।

মৌমাছি কি জ্যামিতিজ্ঞ?—

এতকাল জীববিদ্যাবিশারদেরা মৌমাছির চাকের কোষগুলির ছকোণা আকার দেখিয়া তাদের বুদ্ধির তারিফ করিয়া আসিতে-ছিলেন। জ্যামিতিশাস্ত্রের নিয়ম-অনুসারে দেখা যায় ছকোণা জিনিসই অপর আকারের জিনিসের চেয়ে অনেকগুলি অল্প জায়গার মধ্যে রাখা
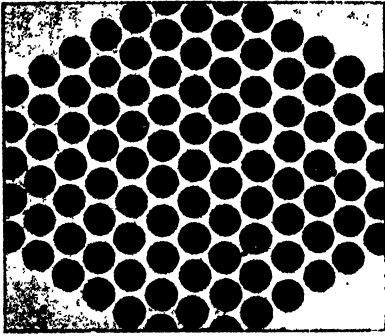
গোল জিনিসকে ছকোণা ভ্রম।
কালো কালো দাগগুলি বাস্তবিক গোল; কিন্তু
একটু দূর হইতে চোখ প্রায় বুজিয়া দেখিলে ঐগুলিকে
ছকোণা মনে হইবে।

সাবানের বুদ্বুদ, পাশাপাশি অনেকগুলি লাগিয়া ছকোণা
আকার ধরিয়াছে।

যায়। মৌমাছিরা এই তত্ত্বটি সংস্কারগত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিয়া মৌচাক রচনা করে, এই বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু এখন বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষকেরা এই বিশ্বাস টলাইয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। 'দি গাইড টু নেচার' নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদক বলিতেছেন, মৌমাছি নরম মোমের গোল-গোল কোষই তৈয়ারি করে; তারপর সেই কোষের মধ্যে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া আসা-যাওয়া করিতে করিতে প্রাকৃতিক নিয়মে কোষের গোল-গোল মুখগুলি পরস্পরের দেয়ালে চাপা লাগিয়া-লাগিয়া ছকোণা হইয়া যায়, তাতে মৌমাছির কোনো কারদানি বা নিপুণতা প্রকাশ পায় না। যে ব্যাপার ঘটনাক্রমে ঘটে ও যার উপর কর্ত্তার ইচ্ছাশক্তির কোনো প্রভাব নাই তার জন্য কর্ত্তার কোনো বাহাদুরি নাই। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে মৌচাকের ঘরগুলি ছেলের হাতের তৈরি কাদার ঘরের মতনই টেরাবাঁকা। জায়গা বাদ না রাখিয়া কেবলমাত্র ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ও ষট্‌কোণ আকারের জিনিসই গায়ে-গায়ে ঘেঁসা-ঘেঁসি করিয়া সাজানো যায়। গোল-গোল কোষগুলি পাশাপাশি থাকিয়া মৌমাছির গায়ের ধাক্কায়-ধাক্কায় ছকোণা হইয়া পরস্পরের গায়ে জুড়িয়া যায়; কিন্তু চাকের কিনারার কোষগুলা গোলই থাকে। সাবানের বুদ্বুদ একলা যখন থাকে তখন গোল; অনেক বুদ্বুদ পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি থাকিলে মাঝেরগুলি ছকোণা হয়, কিন্তু পাশের-গুলি গোলই থাকে।

কোনো একটা গোল জিনিসের চারিপাশে গায়ে-গায়ে সেই আকারের গোল জিনিস ছয়টি রাখা যায়; একটা টাকার চারিধারে ছয়টি টাকা, একটি আধুলি বা সিকি বা দুয়ানির চারি পাশে ছয়টি আধুলি বা সিকি বা দুয়ানি রাখা যায়; একটি লেড্-পেন্সিলের বাণ্ডিল বা বোতামের পাতায় দেখা যায় একটি পেন্সিলের চারিদিকে ছয়টি পেন্সিল ও একটি বোতামের পাশে ছয়টি বোতাম; ইত্যাদি। সেই ছয়টি গোল জিনিসের দিকে চোখ প্রায় বুজিয়া মিটমিটে চোখে তাকাইলে ছয়টি গোলের মধ্যবর্ত্তী গোল জিনিসটিকে ছকোণা বোধ হয়। ইহা দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র।

'দি আমেরিকান বি জার্নাল' দেখাইয়াছেন যে এই ধারণা ঠিক নয়। মৌমাছির কোষের ভিতর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সেগুলি ছকোণাই হয়। কৃত্রিম মৌচাকে গোল কোষ করিয়া দেখা গিয়াছে মৌমাছি গোল কোষগুলিকে কাটিয়া ছকোণা করিয়াছে। তবে সেই ষট্‌কোণ কোষগুলি একেবারে regular hexagon না হইতে পারে।

কিন্তু বহু বৈজ্ঞানিক মৌমাছিকে জ্যামিতিজ্ঞ বলিয়া অস্বীকার করিয়া দি গাইড টু নেচার কাগজের সম্পাদকের অনুমানই সমর্থন করিতেছেন।

জার্ম্মানী ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক—

আধুনিক কালে যে-সব বড়-বড় বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক নব-নব আবিষ্কারের দ্বারা মানবের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা ও নানা উপকার সাধন করিয়াছেন তাঁদের কে কোন্ দেশের লোক তার সন্ধান লইয়া দেখা হইয়াছে জার্ম্মানীর কোনো বৈজ্ঞানিক এপর্য্যন্ত নাকি জড়বিজ্ঞান বা রসায়নের কোনো প্রধান প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিতে পারে নাই। রসায়নের ক্ষেত্রে আভোগাড্রো, বয়েল, চার্লস্, ড্যাণ্টন, ডুলং, পেটিট (পেতি), ফ্যারাডে, গে-লুসাক, হেনরি, দ্য শাংকুর্তোয়, মেণ্ডেলিফ, ভাণ্ট্ হফ্ প্রভৃতি যাঁরা নবযুগ-প্রবর্ত্তক তাঁরা কেউ জার্ম্মান নন। জার্ম্মান লিয়েবিগ ও ভোহ্‌লের উনবিংশ শতাব্দীতে আশ্লেষণিক রসায়ন (Synthetic Chemistry) সম্বন্ধে যথেষ্ট নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁদের শিক্ষা হইয়াছিল ফ্রান্সে। বাক্‌লে রচিত হিষ্টরী অফ্ ন্যাচারাল সায়ান্সেস নামক পুস্তকে দেখা যায় ১৭শ শতাব্দীর ৩০ জন প্রধান বৈজ্ঞানিকের মধ্যে মাত্র তিনজনের জার্ম্মান গোত্রে জন্ম; ১৮শ শতাব্দীর ২৭ জনের মধ্যেও ৩জন মাত্র জার্ম্মান। উনবিংশ শতাব্দীই বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতির যুগ, তখনও দেখা যায় জার্ম্মানেরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। যে বাতাসে জার্ম্মানরা নিশ্বাসপ্রশ্বাস লয়, তার মূল বস্তুর একটিও তাদের আবিষ্কার নয়। অক্‌সিজেন আবিষ্কার করেন ইংরেজ প্রিষ্টলি, পরে তিনি শেষ বয়সে আমেরিকাবাসী হন; নাইট্রোজেন ধরেন এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাদারফোর্ড; কার্বন ডাইঅক্সাইড চিনেন স্কচ বৈজ্ঞানিক ব্ল্যাক; হেলিয়ম, ক্রিপ্টন, জেনন, নেয়ন,—যথাক্রমে লকিয়ার, রাম্‌জে, ক্রুক্‌স্, ও রেলে আবিষ্কার করেন, এঁরা চারজনই ইংরেজ। জলের উপাদানও জার্ম্মানরা আবিষ্কার করে নাই। হাইড্রোজেন ইংরেজ রাসায়নিক ক্যাভেণ্ডিশের সন্ধান, অক্‌সিজেন প্রিষ্টলির আবিষ্কার। নুনের গুণও জার্ম্মানরা জানে নাই। নুনের ক্লোরিন আবিষ্কার করেন শীল, তিনি সুইড; সোডিয়াম ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ডেভি চিনেন। এইরূপে ৭৫০০০ বস্তুর মূল উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে তার একটাও জার্ম্মানীর

আবিষ্কার নয়। আল্‌কাৎরা হইতে উৎপন্ন বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য জার্ম্মানীর অহঙ্কার আছে। কিন্তু আসল দ্রব্য আল্‌কাৎরা ১৮৫৩ সালে ডাঃ ক্লেটন আবিষ্কার করেন; ১৭৯২ সালে উইলিয়াম মার্ডক্ কয়লার গ্যাসে আলো জ্বালা প্রবর্ত্তন করেন; এঁরা দুইজনই ইংরেজ। আল্‌কাৎরার উৎপন্ন ন্যাপ্‌থালীন ও বেন্‌জল ইংরেজের উদ্ভাবন, এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান বিস্ফোরক উপাদান এন্‌থ্রাসিন ফরাশী আর টোলুএন ও পিক্‌রিক্ এসিড ইংরেজ ল্যাবরেটারীর প্রসব। আল্‌কাৎরার রং জার্ম্মানীর উদ্ভাবন নয়। বর্ত্তমান যুদ্ধসাধন বহু দ্রব্য জার্ম্মানীর প্রস্তুত নয়। ফুল্‌মিনেট্ অফ মার্কারী ইংরেজ রাসায়নিক হাওার্ড; গান্‌কটন ১৮৪৫ সালে সুইস্ শোয়েনবেইন; নাইট্রোগ্লিসেরিন ১৮৪৬ সালে ইটালিয়ান সোব্রেরো; ১৮৫৬ সালে ডিনামাইট ও ১৮৭৮ সালে বিস্ফোরক জেলাটিন সুইডেনের আল্‌ফ্রেড নোবেল; ১৮৮৬ সালে নির্ধূম বারুদ ফ্রান্সের ভিএই; কর্ডাইট ইংলণ্ডের সার আল্‌ফ্রেড এবেল; বন্দুকের ক্যাপ ইংরেজ এগ; ১৮৩১ সালে সেফ্‌টি ফিউজ্ ইংরেজ পিক্‌ফোর্ড; বারুদ প্রস্তুতের নূতন প্রণালী ইটালিয়ান বেন্‌ভেনুতো চেলিনি প্রথম আবিষ্কার করেন। ক্লোরিন গ্যাস্ 'জার্ম্মানীতে প্রস্তুত' নয়। বিস্ফোরক প্রস্তুতকারী বলিয়া যে ৬২ জন বিখ্যাত তাঁদের প্রধানতম এবেল আর ব্যুর্ত্তেলো—একজন ইংরেজ ও অপর জন ফরাসী। কাঁচ, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুতের উপকরণ সোডা-ছাই প্রস্তুতের প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তন করেন লেব্লাঙ্ক, একজন ফরাশী; তার উন্নতিসাধন করেন সল্‌ভে, একজন বেল্‌জিয়ান। কাঠের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী আমেরিকার ওাট ও বার্জেস প্রবর্ত্তন করেন; কাঠের মণ্ড কাগজে পরিণত করার অন্যবিধ উপায়ও আবিষ্কার করেন আর-একজন আমেরিকান টিল্‌ঘ্‌মান। সোনা রূপা উদ্ধার করিবার উপায় আবিষ্কার করেন আমেরিক্যান ম্যাক্‌আর্থার এবং ফরেষ্ট। এলুমিনিয়ম ও এলুমিনিয়ম ব্রোঞ্জ ধাতু আমেরিকার লোক হল ও কাউল্‌স্ প্রচলিত করেন। প্রচুর পরিমাণে গ্রাফাইট উৎপাদনের জন্য এচিসন প্রসিদ্ধ। তরল এমোনিয়া দিয়া কৃত্রিম বরফ তৈয়ারি ফরাশী ও আমেরিকানদের কাজ। জল শোধনের উপায় উদ্ভাবন করেন ইংরেজ সিম্প্‌সন্। কাঠ-কয়লার কোনো জিনিসের রং ঘুচাইয়া বে-রং করিবার শক্তি ধরেন রুশ লাওইট্‌জ্, আর হাড়-কয়লার গুণ ধরেন ফিগিয়ে, তিনি ফরাশী। হাইড্রোজেন দিয়া চর্ব্বি জমানো ইংরেজ সওদাগর ক্রসফিল্‌ড্ এণ্ড সন্সের কৃতিত্ব। সাল্‌ফিউরিক এসিড প্রস্তুতের প্রক্রিয়া-বিশেষ ইংরেজ ভিনিগার-ব্যাপারী ফিলিপ্‌স্ ১৮৩১ সালে আবিষ্কার করেন। ইংরেজ জন মার্সারের নামে মার্সিরাইজ্‌ড্ কটন চলিতেছে। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করেন ফরাশী শার্দোনে। আমেরিকার হায়াট সেলুলয়েড প্রস্তুত করেন। কৌটার মধ্যে ক্ষীর মাছ মাংস রক্ষা আমেরিকা হইতেই প্রচলিত হয়।

জার্ম্মানীর কৃতিত্ব এইখানে যে সে পরের আবিষ্কার আত্মসাৎ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য যুদ্ধবিগ্রহে সেই বিদ্যাকে প্রচুর লাভজনক করিয়া তুলিয়াছে।

হাঁটু দিয়া লেখা—

হস্তহীন নুলোরা এ পর্য্যন্ত লিখিতে হইলে হয় দাঁত নয় পায়ের বুড়ো-আঙুলের ফাঁসে কলম ধরিয়া লিখিয়া আসিয়াছে। এই দুই প্রকার উপায়ই কষ্টসাধ্য। আমেরিকার ডাক্তার ব্রাক্‌লী হাঁটু দিয়া লিখিবার সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সায়েণ্টিফিক আমেরিক্যান কাগজে তার বর্ণনা ও চিত্র বাহির হইয়াছে। হাঁটুতে আঁক্‌ড়া দিয়া একটা কলম বা পেন্‌সিল আট্‌কাইয়া ও হাঁটুর সাম্‌নে একটা কাগজ খাড়া করিয়া আট্‌কাইয়া একজন

হাঁটু দিয়া লেখা।

নুলো হাঁটু নাড়িয়া নাড়িয়া স্বচ্ছন্দে লিখিয়া যাইতে পারে। একটু অভ্যাস করিলেই ইহা আর কষ্টকর বোধ হয় না।

কংক্রীট-তক্তার বাড়ী—
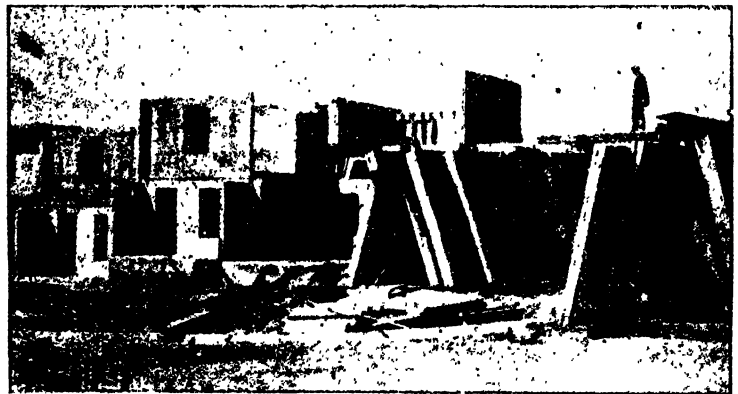
কংক্রীট তক্তার বাড়ী নির্ম্মাণ।

কংক্রীট অর্থাৎ চুন-সুর্কী জমাইয়া তক্তা করা হয় আর সেই তক্তায় জাহাজ নির্ম্মাণ হইতেছে—এ খবর আমরা আগে পাইয়াছি। এখন কংক্রীটের তক্তায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া আমেরিকায় নূতন নূতন গ্রামের পত্তন হইতেছে। একটা জায়গায় নানা আকারের কংক্রীট-তক্তা গড়া হইতেছে; সেইগুলি লইয়া গিয়া বাড়ীর পর বাড়ী গড়িয়া গ্রাম পত্তন হইতেছে। এরূপ বাড়ী সস্তা সুন্দর স্বাস্থ্যকর মজবুত হয় ও সত্বর নির্ম্মাণ করা যায়।

মাওরি জাতির যুদ্ধ-সঙ্গীত

(অষ্ট্রেলিয়া)

শত্রু আছে ঘরের কাছে
চড়াও হয়ে পড়্‌ব কি ?
—হাঁ, জী জোয়ান! হাঁ, হাঁ, জী!
শত্রু আছে বনের পাছে
শড়্‌কী ধনুক ধর্‌ব কি ?
—হাঁ, জী জোয়ান! হাঁ, হাঁ, জী!
শক্তি সাহস কেমন ওদের ?
ওদের সাথে পার্‌ব কি ?
—হাঁ, জী জোয়ান! হাঁ, হাঁ, জী!
শড়্‌কী এখন ছাড়্‌ব কি ?
হাঁ, জী জোয়ান! হাঁ হাঁ জী!
মুণ্ড কেটে পাড়্‌ব কি?
হাঁ জী জোয়ান হাঁ হাঁ জী!
অস্ত্র বুকে গাড়্‌ব কি ?
হাঁ জী জোয়ান হাঁ হাঁ জী!
ওদের ফুঁড়্‌ব তবে ফাড়্‌ব তবে
রক্তেতে জিভ নাড়্‌ব কি ?
হাঁ জী জোয়ান্ হাঁ হাঁ জী!
তপ্ত পাথর ওড়ন পাড়ন
ওদের মাংস সেঁকে সাব্‌ব কি ?
হাঁ জী জোয়ান হাঁ হাঁ জী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

ন্যায়দর্শনের সমালোচনায় কিঞ্চিৎ বক্তব্য।

গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ন্যায়দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত "ন্যায়দর্শন" (গৌতমসূত্র ও বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ) গ্রন্থের এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমালোচনায় শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অনুবাদের যে অংশটি সবিশেষ আলোচনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন,—"অতএব আলোচ্য পুস্তকে ঐ উদ্ধৃত ভাষ্যপঙ্‌ক্তির পদচ্ছেদ-চিহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া অনুবাদ পর্য্যন্ত সমস্তই 'সংশোধন' করা আবশ্যক।"—এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

জীবের আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষই সকল অধ্যাত্মবিদ্যার প্রধান নিরূপণীয়। উহাই জীবের লভ্য, তাই উহাকে 'অধিগন্তব্য' বলা হয়। এই মোক্ষ লাভ করিতে হইলে দুঃখ, দুঃখের হেতু, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং তাহার কারণ তত্ত্বজ্ঞান—এইগুলিকে সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে হইবে। 'ন্যায়বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য—এই চারিটি শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পদার্থগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও ঐ চারিটির উল্লেখ করিয়া উহাদিগকে 'অর্থপদ' বলিয়াছেন। সমালোচক শাস্ত্রীমহাশয়, বৌদ্ধশাস্ত্র ও যোগভাষ্যাদির লিপির দৃষ্টান্তে (১) হেয়, (২) হেয়হেতু, (৩) হান, (৪) উপায়—এই চারিটিকে 'অর্থপদ' বলিয়া উহাই যে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত, ইহা লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভাসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়সারে ভাষ্যের ঐরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদর্শিত ব্যাখ্যায় 'হান' শব্দের অর্থ এখানে দুঃখনিবৃত্তি। আত্যন্তিকত্ব এই দুঃখনিবৃত্তির বিশেষণ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকর 'অধিগন্তব্য' শব্দের দ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে চতুর্থ অর্থপদ বলিয়াছেন। সুতরাং 'হান' শব্দের দ্বারা তাঁহারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা বলা যায় না। 'হীয়তে অনেন' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহার দ্বারা দুঃখকে পরিত্যাগ করা যায়, সেই তত্ত্বজ্ঞানই এখানে 'হান' শব্দের অর্থ। 'আত্যন্তিক হান' বলায় দুঃখনিবৃত্তির কারণ চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকারই এখানে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত, ইহা বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র ও তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকার উদয়নাচার্য্যও ভাষ্যকারের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগভাষ্যাদি গ্রন্থে যে দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং তাহার উপায়, এই চারিটি বলা হইয়াছে, তাহা বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকরের কথিত হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য—এই চারিটি অর্থপদের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়। সকল শাস্ত্রেই যে একই ভাবে বা একই ভাষায় সকল কথা লিখিত হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। যোগভাষ্যাদি গ্রন্থে 'হেয়' হইতে 'হেয়হেতু'কে পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে। বাৎস্যায়ন ভাষ্য ও ন্যায়বার্ত্তিকে দুঃখ ও দুঃখের হেতু উভয়কেই 'হেয়' বলা হইয়াছে। কেন না, দুঃখের হেতুগুলিও দুঃখ বলিয়া হেয়। উদ্দ্যোতকর স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"হেয়ং দুঃখং তদ্ধেতুশ্চ দুঃখমুক্তং" (বার্ত্তিক, ৪ পৃঃ, কাশী সংস্করণ)। অনুবাদক তর্কবাগীশ মহাশয়ও ঐরূপ (পদচ্ছেদ দিয়া) অনুবাদ করিয়া টিপ্পনীতে সকল কথা বুঝাইয়া বসিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় যোগভাষ্যাদির দৃষ্টান্তে বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ব্যাখ্যাতেও হেয় হইতে হেয়হেতুকে পৃথক্ করিয়া তাহাকেই দ্বিতীয় 'অর্থপদ' বলিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায় ভাষ্য ও বার্ত্তিকোক্ত 'অধিগন্তব্য' পদের অর্থ কি, উহা বলার প্রয়োজনই বা কি, ইহা আমরা জানিতে পারি নাই। তিনি ভাষ্য ও বার্ত্তিকের 'অধিগন্তব্য' পদটিকে ছাড়িয়া দিয়াই ভাষ্যের ব্যাখ্যায় চারিটি অর্থপদ বুঝাইয়াছেন এবং হান শব্দে দুঃখনিবৃত্তি না বুঝিলে অধ্যাত্মবিদ্যার মূল লক্ষ্য মোক্ষ পদার্থ, ভাষ্যোক্ত চারিটি অর্থ-

পক্ষের মধ্যে থাকে না, ইহা বলিয়া নিজ ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ভাষ্য ও বার্ত্তিকে 'অধিগন্তব্য' শব্দের দ্বারাই মোক্ষকে চতুর্থ অর্থপদ বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিয়াছি। বার্ত্তিককারও "অধিগন্তব্যোঽপবর্গঃ স পুনরাত্যন্তিকো দুঃখাভাবঃ" (বার্ত্তিক, ৪ পৃঃ) এই কথা বলিয়া তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অন্য শাস্ত্রে 'হান' শব্দ দুঃখনিবৃত্তি অর্থে প্রযুক্ত হইলেও, ভাষ্য ও বার্ত্তিকে উহা যে দুঃখনিবৃত্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বলিতে হইবে। যোগভাষ্যাদি গ্রন্থে উপায় শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান, কিন্তু ন্যায়ভাষ্য ও বার্ত্তিকে উপায় শব্দে যে তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শাস্ত্রকেই বিবক্ষা করা হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। ভাষ্য ও বার্ত্তিকের মতে পূর্ব্বোক্ত চারিটি পদার্থের নাম অর্থপদ। ইহাতে যোগভাষ্যাদির কথাও উহার মধ্যে বলা হইয়াছে। কাজেই অধ্যাত্মশাস্ত্রের সমস্ত আচার্য্যই যে ঐ চতুর্ব্বিধ পদার্থের বর্ণন করিয়াছেন, এ কথা বলা অসঙ্গত হয় নাই।

দুঃখের হেতু কি, ইহা বলিতে গিয়া উদ্দ্যোতকর, "হেতুরবিদ্যাতৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি" (বার্ত্তিক, ৪পৃঃ) এই ভাবে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—এই চারিটি পদার্থের উল্লেখ করিলেও কেবল উহাই দুঃখের হেতু নহে। গৌতমোক্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে নয়টি প্রমেয়ই দুঃখের হেতু, ইহা বার্ত্তিকাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। অনুবাদক তর্কবাগীশ মহাশয়ও কয়েক স্থানে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র "উপলক্ষণঞ্চৈতৎ দ্বেষোঽপি দ্রষ্টব্যঃ।"—এই অংশে বলিয়াছেন যে দ্বেষকেও দুঃখের হেতু বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং তর্কবাগীশ মহাশয় যে "অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি"—এই ভাবে শেষে 'প্রভৃতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় যে কেন লিখিলেন—"কিন্তু প্রভৃতি শব্দটি অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে।"—ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিচার-বিতর্কের দ্বারা যেখানে গ্রন্থকারের যেরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে, তাহা গ্রন্থে শব্দ দ্বারা সুব্যক্ত না থাকিলেও ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাহা বলা আবশ্যক। তাই প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ সেই অনুসারেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ভাষ্যগ্রন্থের প্রণালী মতেই ভাষ্যের অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষ্যে যেমন ব্যাখ্যার অনুব্যাখ্যা বা বিবরণ থাকে, তাঁহার অনুবাদেও সেইরূপ আছে। নচেৎ অনুবাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। আলোচ্যস্থলে তর্কবাগীশ মহাশয় ভাষ্যকারোক্ত "হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং" ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককেই অবলম্বন করিয়াছেন এবং কেহ উক্ত স্থলে অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিতে পারেন, ইহা চিন্তা করিয়া টিপ্পনীতে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, "উহাদিগের ব্যাখ্যা উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যানুসারেই লিখিত হইল।" (২৪ পৃঃ) উদ্দ্যোতকরের ঐ ব্যাখ্যা তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র ও তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকার উদয়নাচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার যে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্য তর্কবাগীশ মহাশয় ঐ স্থলে (২৪ পৃঃ) পাদটীকায় লিখিয়াছেন, —"অনুসন্ধিৎসু এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত 'ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি' দেখিবেন। প্রচলিত তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থে এখানে অনেক অংশ মুদ্রিত হয় নাই।" আমরা নিম্নে তাৎপর্য্যটীকার ঐ সন্দর্ভ ও তাহার ব্যাখ্যা তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি উদ্ধৃত করিলাম।

"মিথ্যাজ্ঞানমাত্মাদিষু প্রমেয়েষু অবিদ্যা। তস্য লং তৃষ্ণা। উপলক্ষণং চৈতৎ দ্বেষোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। তন্মূলৌ চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তদেতদ্ধেয়ম্‌, হানং তত্ত্বজ্ঞানং হীয়তে হ্ননেন তৎসর্ব্বং তস্য প্রমাণস্যোপায়ঃ শাস্ত্রমধিগন্তব্যো মোক্ষঃ।"—(তাৎপর্য্যটীকা, ২৩৭ পৃঃ)

"ননু দ্বেষঃ কিমহেয় এব ন বা প্রবৃত্তিহেতুরিত্যত আহ। উপলক্ষণমিতি।

"ননু হানপদমাত্যন্তিকপদসমভিব্যাহারাদপবর্গে বর্ত্ততে তৎ কথং তত্ত্বজ্ঞানমুচ্যত ইত্যত আহ। হীয়তে হীতি। করণব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যানেন তত্ত্বজ্ঞানং বিবক্ষিতং, ভাবব্যুৎপত্ত্যাত্বাত্যন্তিকপদসমভিব্যাহারাদপবর্গ ইত্যর্থঃ।"—(পরিশুদ্ধি, ২৩৯ পৃঃ)

এখন কেমন করিয়া বলিব যে, বার্ত্তিকের পাঠ বিশুদ্ধ নহে, উহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বার্ত্তিকের পাঠ যদি বিশুদ্ধই না হইত, তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য উহা গ্রহণ করিতেন না। কাজেই শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত বার্ত্তিকের পাঠকে যে একপক্ষে অশুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না।

বার্ত্তিককার ভাষ্যের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া প্রথমে যেখানে হেয়, হান, উপায়, অধিগন্তব্য—এই চারিটি অর্থপদের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার বার্ত্তিকের 'অর্থপদ' শব্দের অন্যরূপ * ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, এই বার্ত্তিকগ্রন্থের এইরূপ ব্যাখ্যা, কিন্তু পরে ভাষ্যকার যে অর্থপদ বলিয়াছেন, সেই অর্থপদের ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার পরে ভাষ্যে "অর্থপদানি" এই কথার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"পুরুষার্থস্থানানি।" ইহাই তাঁহার সেই অন্যরূপ ব্যাখ্যা †। শাস্ত্রী মহাশয়, বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথার উল্লেখ করিয়া বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা যে ভাষ্যের ব্যাখ্যা নহে, তর্কবাগীশ মহাশয় বার্ত্তিকের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবশতই ভাষ্যের ঐরূপ অপ্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথার অর্থ অন্যরূপ। বাচস্পতি মিশ্র বার্ত্তিকের ব্যাখ্যানুসারেই ঐ স্থলে ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য স্থলে ভাষ্যকারের বক্তব্য, বার্ত্তিক, তাৎপর্য্যটীকা, পরিশুদ্ধি ও ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশে পূর্ব্বোক্তরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয় ঐ-সকল গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছেন। আমরা ঐ স্থলের অনুবাদে তর্কবাগীশ মহাশয়ের কোন ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।

"প্রতিভার কথা"।

ভাদ্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের "প্রতিভার কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচনা করিবার মত অনেক কথা আছে। তন্মধ্যে স্থূল দুএকটা কথার উল্লেখ করিব।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন, "প্রতিভার কাজে সকলের আগে যে জিনিসটি চোখে লাগে তাহা হইতেছে নূতনত্ব, মৌলিকতা।" ইহা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য পরে তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রতিভা সম্বন্ধে ইহা একটি চলিত ধারণা বটে, এবং ইহাতে যে কোন সত্য নাই, তাহাও নহে। কিন্তু এ-কথা দ্বারা সমগ্র সত্যটি ব্যক্ত হয় না। সমগ্র সত্যটি বুঝিতে হইলে নলিনী-বাবুর কথার কতকটা বিপরীত রকমের যেসব কথা এমার্সন তাঁহার শেক্সপীয়ার বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য। তাহা হইতে একটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

---

* "অর্থোঽর্থশব্দঃ প্রমাণতোঽর্থ প্রতিপত্তাবিত্যত্র স্থিতঃ, পদং বাচকং যেষাং তানি তথা। এতদ্‌ বার্ত্তিকগ্রন্থস্যৈতাদৃশং ব্যাখ্যানং ভাষ্যগতস্য তু অন্যথা ভবিষ্যতি।—(তাৎপর্য্যটীকা, ১১পৃঃ)

† অর্থপদানীতিভাষ্যগতস্যার্থপদস্য তত্ত্বস্থার্থো ভবিষ্যতীতি যদুক্তং তদাহ। পুরুষার্থস্থানানীতি।"—(তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, ২৪০পৃঃ)

"Great men are more distinguished by range and extent, than by originality. If we require the originality which consists in weaving, like a spider, their web from their own bowels; in finding clay, and making bricks, and building the house; no great men are original. Nor does valuable originality consist in unlikeness to other men. The hero is in the press of knights, and the thick of events; and, seeing what men want, and sharing their desire, he adds the needful length of sight and of arm, to come at the desired point. The greatest genius is the most indebted man. A poet is no rattle-brain, saying what comes uppermost, and, because he says everything, saying, at last, something good; but a heart in unison with his time and country. There is nothing whimsical and fantastic in his production, but sweet and sad, earnest, freighted with the weightiest convictions, and pointed with the most determined aim which any man or class knows of in his times."

নলিনী-বাবু যে বলিয়াছেন, "আমরা সত্যসত্যই দেখি প্রতিভাবান কোথাও একেবারে উন্মাদ, নতুবা অদ্ভুত খামখেয়ালের বশবর্ত্তী," ইত্যাদি, কবিদের সম্বন্ধে এমার্সন হইতে উদ্ধৃত কথাগুলি তাহার সংশোধক ও প্রপূরক।

তিনি লিখিয়াছেন, "প্রতিভার মধ্যে যে শুধু নূতনত্বই পাই তাহা নয়, সেখানে পাই একটা মহত্ব, বিরাটত্ব, অলৌকিকত্ব।" তিনি এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহাতে মনে হয়, প্রতিভাবান লোকেরা যেন একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব। বাস্তবিক কিন্তু প্রতিভাবান্ লোকদের মধ্যে "অলৌকিক" এমন কিছু নাই, সাধারণ লোকদের মধ্যে যাহার লেশমাত্রও দেখা যায় না। এক একটা শক্তি, বৃত্তি, গুণ, কোন কোন লোকের মধ্যে বেশী বিকশিত দেখা যায়, অন্যদের মধ্যে ততটা বিকশিত দেখা যায় না। প্রভেদ—মাত্রায়, পরিমাণে, বিকাশে। প্রতিভাবান্ ও প্রতিভাহীন লোকরা দুটা আলাদা রকমের প্রাণী নয়, একই রকমের প্রাণী। প্রতিভাবান্রা অলৌকিক এবং প্রতিভাহীনেরা লৌকিক, এরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা যায় না। ভাব, চিন্তা, কর্ম্ম, প্রভৃতির ক্ষেত্রে খুব প্রতিভাবান বলিয়া যাঁহাদের নাম করিবেন, তাঁহাদের অনেকটা কাছাকাছি যান, এরূপ অনেক লোকের নাম করা যায়, এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকটা সমকক্ষ আরও কারো কারো নাম করা যায়। এইরূপে সাধারণ লোক ও খুব প্রতিভাবান লোকদের মধ্যে পরস্পর-সন্নিকট বহু শ্রেণীর লোক দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়। প্রতিভাবানেরা "অলৌকিক" এবং প্রতিভাহীনেরা "লৌকিক" হইলে, উভয়ের মধ্যে নির্ম্মল আকাশের চকোর এবং মলিন পঙ্কের কেঁচোর মধ্যে যে পার্থক্য, সেইরূপ একটা অলঙ্ঘ্য পার্থক্য দেখা যাইত।

কাব্যজগতে শেক্সপীয়ারের নাম খুব বড়। কিন্তু তাঁরই সমসাময়িক অনেক নাটককার অনেকটা তাঁর মত প্রতিভাশালী ছিলেন। আবার, শেক্সপীয়ারের কাব্যে যাহা নাই, অন্য অনেক কবির কাব্যে তাহা আছে।

আমাদের মত সাধারণলোকদের মাথায় অনেক সময় অনেক ভাব ও চিন্তা, অনেক মানস-বস্তু আসে, যাহা পরে কোনও মহাকবির কাব্য পড়িতে পড়িতে হঠাৎ চোখে পড়ে। অথচ আমরা উক্ত মহাকবির নিকট হইতে তাহা পাই নাই, মহাকবিও আমাদের নিকট হইতে তাহা পান নাই। আমরা যে কাব্যরস গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতেই বুঝা যায়, যে আমরা ও প্রতিভাবান্ লোকেরা একই রকমের জীব। আমার মধ্যে যাহার লেশমাত্রও নাই, কেহই আমাকে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করাইতে পারে না। মহা মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন:—

"There is no great and no small
To the Soul that maketh all:
And where it cometh all things are;
And it cometh everywhere.
"I am owner of the sphere,
Of the seven stars and the solar year,
Of Caesar's hand, and Plato's brain,
Of Lord Christ's heart, and Shakespeare's strain."

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"There is one mind common to all individual men. Every man is an inlet to the same and to all of the same. He that is once admitted to the right of reason is made a freeman of the whole estate. What Plato has thought he may think; what a saint has felt he may feel; what at any time has befallen any man he can understand. Who hath access to this universal mind is a party to all that is or can be done, for this is the only and sovereign agent."

এই-সব কারণে এমার্সন মহামনা লোকদিগকে প্রতিনিধিকল্প লোক (representative men) বলিয়াছেন।

শেক্সপীয়ারের মত ঋণী-কবি দেখা যায় না। নলিনীবাবু তাহার প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফে যাহা বলিয়াছেন, এমার্সন শেক্সপীয়ার বিষয়ক প্রবন্ধে তাহার ঠিক উল্টা কথা বলিয়াছেন। কিছু তুলিয়া দিতেছি।

There is no choice to Genius. A great man does not wake up one fine morning and say, "I am full of life, I will go to sea, and find an Antarctic continent: to-day I will square the circle: I will ransack botany, and find a new food for man: I have a new architecture in my mind; I foresee a new mechanic power:" no, but he finds himself in the river of the thoughts and events, forced onward by the ideas and necessities of his contemporaries.* He stands where all the eyes of men look one way, and their hands all point in the direction in which he should go.

নলিনী বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সত্য নাই, এমন কথা আমি বলি না; কারণ সমগ্র সত্যের ধারণা করা অসাধ্য, অন্ততঃ পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি বলি, প্রতিভা সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে, যাহার তিনি আভাসমাত্রও দেন নাই। তাহার অনেকটা আভাস এমার্সনের শেক্সপীয়ার বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িলে পাওয়া যায়।

সাধারণ লোকদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব আমার মোটেই সহ্য হয় না; আমি নিজে সাধারণ লোকদের মধ্যে একজন বলিয়া বোধ হয় এই অসহিষ্ণুতা জন্মিয়াছে; সে যাহা হউক, এমার্সন ত মহা মনস্বী ছিলেন; তিনি কিন্তু সাধারণ লোকদিগকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেন নাই। তিনি Uses of Great Men নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন:—

And if any appear never to assume the chair, but always to stand and serve, it is because we do not see the company in a sufficiently long period for the whole rotation of parts to come about. As to what we call the masses, and common men;—*there are no common men.* All men are at last of a size; and true art is only possible on the conviction that every talent has its apotheosis somewhere.

---

* নলিনী বাবু ঠিক এইরূপ কথা সাধারণ লোকদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"জগৎ জুড়িয়া ভাবের, চিন্তার, কর্ম্মের যে একটা স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে সে তাহারই মধ্যে একটা অসহায় ঢেউ।" কিন্তু এমার্সন প্রতিভাবান্দের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

নলিনী বাবু লিখিয়াছেন, "আলেকসান্দরের সমস্ত জীবন একটানা বিজয়।" সত্য-ইতিহাস তাহা বলে না। তাহা হইলে আলেকসান্দরকে পাঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত না।

নলিনী বাবু নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিচার করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। কেবল ইহাই বলি, মানব-প্রকৃতি বলিয়া একটা জিনিস আছে যাহা নারীরও আছে পুরুষেরও আছে। তাহার উপর নারী-প্রকৃতির কিছু বিশিষ্টতা আছে। নারীরা ভাবিয়া চিন্তিয়া, বুদ্ধির জোরে চলে না, instinctএর দ্বারা চলে, ইহা অতি অদ্ভুত কথা। পুরুষে ও নারীতে প্রভেদ আছে বলিয়া, এত বড় একটা প্রভেদ আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। মানুষের সকল ভাব, চিন্তা ও কার্য্যের ক্ষেত্রে নারী যাহা করিয়াছেন, তাহা মৌমাছির মৌচাক নির্ম্মাণের মত instinctএর কাজ ইহা স্বীকার্য্য নহে। পুরুষ ও নারীর যত রকমের ছোট বা বড় কীর্ত্তি আছে, সেগুলি যদি নলিনীবাবুরই সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয় এবং সেগুলি পুরুষ বা নারী কে করিয়াছে বলিয়া না-দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতে পারিবেন না, কোন্‌টি নারীর, কোন্‌টি পুরুষের, কোন্‌টি বুদ্ধির বা প্রতিভার এবং কোন্‌টি instinctএর কাজ।

লেখক বলেন,—"প্রতিভার যে সর্ব্বোচ্চতম যে চরম অদ্বিতীয় সৃষ্টি তাহা যেন নারী-প্রকৃতি দিয়া সম্ভব হয় না।" সত্য হইতে পারে। কিন্তু নলিনী-বাবু যে কারণ দেখাইতেছেন, তাহা নিতান্তই কাঁচা। তিনি বলিতেছেন, "শেক্সপীয়র, দান্তে, হোমর, বাল্মীকি—নারীজাতি ত এমন কাহাকেও দিতে পারে নাই।" অর্থাৎ, এ পর্য্যন্ত যাহা হয় নাই, তাহা ভবিষ্যতে হইতে পারে না। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠাটা কি লেখা হইয়া গিয়াছে? ইংলণ্ডে শেক্সপীয়রের আবির্ভাবের ঠিক আগে যদি কেহ বলিত, "দান্তে, হোমর, বাল্মীকি—ইংরেজজাতি ত এমন কাহাকেও দিতে পারে নাই" অতএব "প্রতিভার যে সর্ব্বোচ্চতম যে চরম অদ্বিতীয় সৃষ্টি তাহা যেন ইংরেজ-প্রকৃতি দিয়া সম্ভব হয় না";—তাহা হইলে সে-কথা আজ আমাদের কানে কেমন ঠেকিত? জাপানী, চীনা, নিগ্রো, আমেরিকান, সুইড, ফরাসী, প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে ঐ চারিজনের মত কবি জন্মে নাই; তা বলিয়া কি বলিতে হইবে যে উহাদের "প্রকৃতি দিয়া" "প্রতিভার চরম অদ্বিতীয় সৃষ্টি সম্ভবে না?" পুরুষের মত শিক্ষাক্ষেত্র, অজ্ঞাতসারে অভিজ্ঞতা-লাভের ক্ষেত্র, পর্য্যবেক্ষণক্ষেত্র, নারীপ্রকৃতির উপযোগী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্ষেত্র নারী আগে পান, তাহার পর তাঁহার দ্বারা কি সম্ভব বা অসম্ভব তাহার বিচার হইবে। মাদাম কুরির বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার আগে, নারীর দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারে বলিয়া কেহ ভাবে নাই।

নলিনী বাবুর আরও অনেক মন্তব্যের ও উক্তির বিপরীতে বলিবার আছে, কিন্তু আমি আর-একটা কথা মাত্র বলিয়া শেষ করি। তিনি লিখিয়াছেন, "কবিশ্রেষ্ঠের মধ্যে যদি পাই এক সাফো, কর্ম্মীশ্রেষ্ঠের মধ্যে পাই—সেমিরামিস, ক্লেওপাত্রা, জান দার্ক।" কি মাপকাঠি অনুসারে তিনি কবি ও কর্ম্মীর "শ্রেষ্ঠ"তা নিরূপণ করিয়াছেন, বুঝিলাম না; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে যদি ক্লিওপেট্রাকে "কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ বলিতে হয়; তাহা হইলে কবিশ্রেষ্ঠের মধ্যে শতগুণে অধিক গণনীয়া সাফো ছাড়া আরো অনেক নারী আছেন। সেমিরামিসের জীবন সম্বন্ধে যে-সব কথা চলিত আছে, তাহার অধিকাংশই গল্পমাত্র, পৌরাণিক আখ্যায়িকা মাত্র। ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা যে-টুকু সত্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে কর্ম্মীশ্রেষ্ঠের মধ্যে মোটেই ফেলা যায় না। ক্লিওপেট্রা অতি জঘন্য চরিত্রের স্ত্রীলোক ছিল। চরিত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, সে একটা দিগ্বিজয়, বা মহাযুদ্ধ, বা অন্য কোন একটা বড় কর্ম্ম করে নাই, যাহাতে তাহাকে মহাকর্ম্মী বলা চলে। সে নিজের ভাইকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিল, এবং তিন জন বিখ্যাত রোমান যোদ্ধা প্রণয়ীর উপর নিজের কুহক বিস্তার করিয়াছিল। এই ত তার কাজ। নলিনী বাবু বাস্তবিক-কর্ম্মী রাণীদের মধ্যে অহল্যাবাঈ, ভিক্টোরিয়া, এলিজাবেথ, নূরজাহান, প্রভৃতির নাম করিতে পারিতেন। এবং রাণী নহেন, এমন নারীদের মধ্যে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, জোসেফিন বাট্‌লার, জেন আডাম্‌স্‌, জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ, মিসেস্ ফসেট, মাদাম কুরি, এনি বেসাণ্ট, প্রভৃতির নাম করিতে পারিতেন।

ভট্টাচার্য্য।

"ব্রাহ্মণত্ব"।

ভাদ্রের প্রবাসীতে "আমরা ও তাহারা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাম লিখিয়াছেন:—"আমাদের সমাজ আধ্যাত্মিকতার উপাসক ব্রাহ্মণকে শীর্ষদেশে স্থাপিত করিয়া আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে। অনেকে একথায় অন্যরূপ ভাবিতে পারেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় অন্যান্য জাত অপেক্ষা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই অধিকাংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে।" অনঙ্গ-বাবু কেমন করিয়া জানিলেন? প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন লোকদের সেন্সস্ কেহ লইয়াছে কি? না, তাহা লওয়া সম্ভব? ব্রাহ্মণত্ব জিনিসটা কি? তাহা যদি "আধ্যাত্মিকতা" হয়, তাহা হইলে ঐ "আধ্যাত্মিকতা" সম্বন্ধেও অনেক তর্কবিতর্ক হইতে পারে। ধরিয়া লইলাম, যে, অনঙ্গবাবু আধ্যাত্মিকতা কিম্বা ব্রাহ্মণত্ব অর্থে "বামনাই" কিম্বা ধর্ম্মের বাহ্য ভেক ও অনুষ্ঠান না বুঝিয়া, উহার অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান, জিতেন্দ্রিয়তা, সাত্ত্বিকতা, ও পরার্থপরতা বুঝিতেছেন, তাহা হইলেও বলি, কেহ কি এইসব গুণসম্পন্ন লোকদের সেন্সস লইয়াছেন? কেবল বিখ্যাত লোক ধরিলে হইবে না, এবং খ্যাতিরও মাত্রা এবং ব্যাপ্তি ভেদ আছে; অখ্যাত বা অল্প প্রসিদ্ধ লোকদের কথাও ধরিতে হইবে। সবাই জানে, যে-সহস্রাধিক যুবক অন্তরায়িত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেমন ডাকাত ও খুনে থাকিতে পারে, তেমনি এমন সব পরার্থপর যুবক আছে যাহারা অনেক বিখ্যাত নেতাদের চেয়ে স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাদিগকে কে চেনে? আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে; এ ক্ষেত্রেও, যাঁদের নামডাক বেশী, তাঁহারাই সাত্ত্বিকতম বা জ্ঞানীতম না হইতে পারেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-ইতিহাসে অতীত নয়জন অবতারের মধ্যে যাঁহারা নররূপী, তাঁদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বেশী; ব্যাসদেবের জাতি যে কি ধরা যাইবে, তাহা এক কঠিন সমস্যা; ভীষ্ম ক্ষত্রিয় ছিলেন; হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠরত্ন ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক উপনিষদ্‌গুলি ক্ষত্রিয়দের কীর্ত্তি; বুদ্ধ ও তাঁহার প্রধান প্রধান বহু শিষ্য বামুন ছিলেন না, মহাবীর এবং তাঁহারও প্রধান প্রধান শিষ্যেরা বামুন ছিলেন না। নানক কবীর তুকারাম দাদূ মীরাবাঈ তুলসীদাস চৈতন্য রবিদাস প্রভৃতি বহু বিখ্যাত সাধুসন্তদের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ছিলেন না; চৈতন্যের শিষ্যদের মধ্যে অ-ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম ছিল না; পরমহংস রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ থাকিলেও তাঁহার প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ এবং আরও অনেক অপ্রধান শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না ও নহেন।

যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে ব্রাহ্মণকুলেই প্রকৃত-ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন লোক বেশী জন্মিয়াছে, তাহা হইলেও বামুনদের রক্তের কোন গুণ প্রমাণ হয় না;—যেমন ডাক-হরকরাদের দীর্ঘপথ দৌড়িবার শক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না যে উহা তাহাদের রক্তের গুণে। যে শ্রেণীর লোক যাহার চর্চ্চা বেশী করে, তাহাদের মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ বেশী হয়। ধর্ম্মচর্চ্চা ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ রাখায় বরং অন্য শ্রেণীর লোকদের ও সমগ্রসমাজের ক্ষতি করা হইয়াছে। কারণ, সকলে চর্চ্চা করিলে, আধ্যাত্মিকতা আরও অধিক পরিমাণে আরও অধিক লোকের

প্রকৃতিতে দেখা যাইত। ধর্ম্মচর্চ্চা অনেকটা ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া থাকা সত্ত্বেও যখন অব্রাহ্মণদের মধ্যে এত বেশী সাধুলোক দেখা যায়, তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে আধ্যাত্মিকতার বীজ সকলের মধ্যেই আছে, বিকাশের সুযোগ দিলেই তাহা বিকশিত হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধে যেমন দেখা যাইতেছে, যে, কোন দেশেই কেবল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী শ্রেণীবিশেষের মধ্য হইতে সৈন্ত লইয়া যুদ্ধজয় অসম্ভব; তেমনই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংগ্রামে, আধ্যাত্মিকতা ও দেহাত্মবুদ্ধির মধ্যে সংগ্রামে, স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার মধ্যে সংগ্রামে, শ্রেণীবিশেষ হইতে যোদ্ধা লইয়া যুদ্ধজয় হইবে না। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিকতা, সাত্ত্বিকতা, পরার্থপরতা, জাগাইতে হইবে। নতুবা জগতের কল্যাণ এবং মানবের মুক্তি অসম্ভব। ভট্টাচার্য্য।

"ভগবানের বাজে খরচ।"

বৈজ্ঞানিকরা তাঁহাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ইঁদুরের কোন আবশ্যক দেখিতে পাইতেছেন না, অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগে পাইতেছেন না, বলিয়া উহাকে ভগবানের বাজে খরচ বলা বোধ হয় তাঁহাদের অতিরিক্ত বিজ্ঞতা মাত্র। বিশ্বের কতটুকুই বা তাঁহারা জানেন! অধিকতর বিনয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

যাহা হউক, আপাততঃ, অবৈজ্ঞানিক আমি ইঁদুরের একটা কার্য্যকারিতা স্থির করিয়াছি। প্লেগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে গেলে ভারতশাসক ইংরেজ আম্‌লাদের উপর পাছে দোষ পড়ে, এই জন্য প্লেগ-সম্বন্ধে গবেষণাকারীরা ইঁদুরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছেন। এই নিমিত্তই ত প্রাচীন ঋষিরা ইঁদুরকে সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন বলিয়া গিয়াছেন। মূষিক বাস্তবিক প্লেগসম্বন্ধে অনুসন্ধানকারীদিগকে সিদ্ধি দিয়াছে। ইতি।

অবৈজ্ঞানিক।

ভীষণ বন্যা

অদ্ভুত বান এল উত্তর বঙ্গে;
ঘর বাড়ী ভেসে গেল লোকজন সঙ্গে!
বন্ধুরা, ছুটে এস দুঃখীর জন্য,
দান দাও, প্রাণ দাও, মুখে দাও অন্ন!
ধান নাই, চাল নাই, নিয়ে গেল বন্যা;
পিতা মাতা ভাই বোন কাঁদে শিশু কন্যা!
গর্ভিণী অসহায়া কাঁদে চিররুগ্না;
সুন্দরী মেয়ে বৌ কেঁদে হলো শুক্‌না!
ধনী মানী চাষাভুষা কাঁদে সারা দেশটা!
প্রাণ রাখো, প্রাণ রাখো, কর কিছু চেষ্টা!!

* * *

রেলপথে গাছে গাছে মৃত্যুর যাত্রী,
ভাত বিনে এক সাথে কাঁদে দিনরাত্রি!
দেহে কারো বল নাই, ঘুম নাই চক্ষে;
কচিকাচা কোলে মরে, শেল বাজে বক্ষে!
বড় ছোট সবে মিলে সহিতেছে বৃষ্টি;
হায়, হায়, একি হলো, একি অনাসৃষ্টি!
সাপ করে কিল্‌বিল্‌, নাই কারো অস্ত্র;
ইজ্জৎ রাখিবার নাই হেন বস্ত্র!
চারদিকে জল বটে, নাশে কিসে তেষ্টা!
প্রাণ রাখো, প্রাণ রাখো, কর কিছু চেষ্টা!!

* * *

আমদানি রপ্তানি চলাফেরা বন্ধ;
অনাহারে কত মরে, কেঁদে কত অন্ধ!
তাহাদের চারদিকে সে যে মহাসিন্ধু;
খেতে পাবে প্রাণে আশা নাই একবিন্দু!
দিনরাত বন্যার কল্লোল-শব্দ;
নরনারী পশুপাখী অন্যায়-জব্দ!
কেহ কেহ ভেসে যায়, সে কি মহাকষ্ট;
দুই হাত তুলে ডাকে, শেষে প্রাণ নষ্ট!
দেশবাসী, দাও কিছু—কি যে হবে শেষটা!
প্রাণ রাখো, প্রাণ রাখো, কর কিছু চেষ্টা!!

* * *

মানুষের প্রাণ!—সে কি একেবারে সস্তা!
ওগো ধনী, চাল দাও বস্তাকে বস্তা!
দাও কোটি ভাই বোন এক এক মুষ্টি;
আট কোটি বেঁচে যাবে, হবে আরো পুষ্টি!
দুখীদের সাথে হোক্ সুখীদের সখ্য;
সকলের দুখ-নাশ সেই হোক্ লক্ষ্য!
আর্ত্তেরে দুস্থেরে দাও ঠাঁই ভিক্ষা;
সেধে আজ দুখ লও, সেই হোক্ দীক্ষা!
দাও কিছু দূর করি বিলাসের লেশটা!
প্রাণ রাখো, প্রাণ রাখো, কর কিছু চেষ্টা!!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

দেশের কথা

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে এবং রাঢ়ে বন্যায় লোক গৃহহীন অন্নহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে; পশ্চিম বঙ্গে বৃষ্টির অভাবে হাহাকার লাগিয়াছে; বস্ত্রাভাবে অন্নাভাবে লোক

আত্মহত্যা করিতেছে; দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষায় কুশিক্ষায় কুসংস্কারে ডুবিয়া দলাদলি লইয়া মাতিয়া আছে;—এই হইয়াছে চুম্বকে আমার দেশের কথা! ইহারই সমর্থনের জন্য দু-একটি উদাহরণ দৃষ্টান্ত ও প্রতিকারের ক্ষীণ চেষ্টার উদ্যোগ উপদেশ ও আয়োজন যাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা দেশের মুখপাত্র খবরের কাগজগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া ক্রমে উপস্থিত করিব। তার পূর্ব্বে একজন স্বার্থত্যাগী সহৃদয় উদ্যোগী ব্যক্তি বঙ্গদেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা বলিতেছেন তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কটের প্রতিকারার্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ২৬ আগষ্টে ভারতসভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে পঠিত বক্তৃতার সার অংশ।

আজ আমি সহস্র সহস্র উলঙ্গ রমণীর প্রতিনিধি রূপে আপনাদের দ্বারে উপস্থিত। আমি আমার কর্ম্মভূমি ময়মনসিংহে এবং জন্মভূমি বরিশালে স্বচক্ষে যে সকল চিত্র দেখিয়াছি তাহাতে মানুষ কেন পাষাণও বিগলিত হয়। ফরিদপুর ও ঢাকাতেও পল্লীবধূদের অবস্থা দর্শনের সুযোগ হইয়াছিল। ২০২৫ খানি গ্রামে অনেক গৃহে যুবতী ও বর্ষীয়সী রমণীদিগকে নগ্নাভাবে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া করুণ ক্রন্দনে তাহাদের পর্ণকুটীর প্রতিধ্বনিত করিবার বহু দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ময়মনসিংহের রামকৃষ্ণ মিশনের সহৃদয় যুবকবৃন্দ অনেক স্থলেই ইহাদের দুরবস্থা দর্শন ও করুণ কাহিনী শুনিয়া অনেকেই অশ্রুজল রোধ করিতে পারেন নাই। আমি এখানে একটি সপ্তদশ বর্ষীয়া মুসলমান-রমণীর কাহিনী বর্ণন করিব। এই যুবতীটি স্বামী-পরিত্যক্তা; পিতামাতা অতি দরিদ্র; নিজেরাই অনেক সময় উপবাসে দিন যাপন করে, এই যুবতীর ভারবহন করা তাহাদের ক্ষমতার অতীত। যুবতী রমণী ৩টি দিন সম্পূর্ণ অনশনে কাটাইয়া চতুর্থ দিনের যামিনীর শেষভাগে জঠরজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া রাত্রির অন্ধকার রূপ বসনে আবৃত হইয়া একটি ধার্ম্মিক মুসলমানের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দরজায় আঘাত করিতে থাকে এবং সর্ব্বাগ্রে একখণ্ড বস্ত্রের টুকরার প্রার্থী হয়। এই দুর্ভাগ্য যুবতী যদি ঘটনাক্রমে ঐ ধার্ম্মিক মুসলমানটির আশ্রয় না পাইত তখন তাহার অবস্থায় কি করিত এ কথার চিন্তা করিয়া দেখুন। যাহা কেহ কস্মিনকালেও কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহাও আজ সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে। 'স্বামীর জীবিত অবস্থায় পত্নীর বৈধব্যবেশ কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? আমি দুল্লা গ্রামে স্বচক্ষে দেখিয়াছি জনৈক কায়স্থ নিজের শতছিন্ন থান বস্ত্র স্ত্রীকে পরিধান করিতে দিয়া নিজে গামছা পরিধান করিয়া বুক চাপড়াইত আর বলিত—মহাশয় ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়া সব জ্বালা দূর করি।

একটি একবৎসরের শিশুর চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনে থাকিবে। জননী শিশুটিকে গৃহের একপ্রান্তে রাখিয়া একখানি তালাই জড়াইয়া গৃহের অপরপ্রান্তে করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল। প্রথম মনে করিয়াছিলাম হয়ত শিশুর কঠোর পীড়াই জননীর ক্রন্দনের কারণ। কিন্তু যখন জননীকে শিশুর কান্না থামাইবার জন্য কাছে আসিতে অনুরোধ করি, তখন সেই অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী বলিল, "বাবা, এই তালাই উপস্থিত আমার একমাত্র বস্ত্র; যদি খোকার এখন মৃত্যু হয় তবু বাবা তোমার নিকট উপস্থিত হওয়ার সাধ্য নাই।" বলিয়া অতি করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এ দৃশ্য দর্শনে আমার হৃদয়ে অতি কঠোর আঘাত লাগিয়াছিল।

আমিই সর্ব্বপ্রথমে সুদূর মফঃস্বল হইতে Cloth Famine বস্ত্রসঙ্কট নাম দিয়া ক্রমাগত Bengalee, Amrita Bazar, বঙ্গবাসী ও চারুমিহির প্রভৃতি পত্রিকায় পল্লীরমণীর দুঃখের কাহিনী বিবৃত করি। ময়মনসিংহের রামকৃষ্ণ মিশনই সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। ময়মনসিংহের রামকৃষ্ণ মিশনের সহৃদয় যুবকবৃন্দ যেরূপ অক্লান্ত দেহে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইহাদিগের লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়াছিলেন যদি বঙ্গের অপরাপর স্থানে তদ্রূপ ব্যবস্থা হইত তবে এ সমস্যা পূরণার্থ আজ আমাকে আপনাদের ভারতসভাগৃহের দ্বারস্থ হইতে হইত না। আমার বেশ মনে হয় বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপকে উপেক্ষা করিয়া ঢাকা কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বরিশাল বানড়িপাড়া-নিবাসী সুধাংশুকুমার গুহ ৩৪ মাইল বাইক করিয়া আমার সংবাদপত্রে বর্ণিত ২১১টি পল্লীরমণীর দুরবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তখনই বলিল "ডাক্তার বাবু, এ করুণ দৃশ্য আমি আর দেখিতে পারি না। আমি আই-এ পরীক্ষায় ২০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি; যদি এই টাকায় এই-সকল দুঃখিনী রমণীদের বিন্দুমাত্র উপকার হয় তবে ইহা আপনি যথোপযুক্ত পাত্রে দিলে আমার এই টাকার যথার্থ সদ্ব্যয় হইবে। আর আজ হইতে আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম নিয়া সহরে প্রতিগৃহে বস্ত্র ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইব।" ফলে বাস্তবিকই ইঁহারা বহু দুঃখিনী রমণীকে রক্ষা করিয়া ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ মিশনের অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সুদূর মফঃস্বলে শ্রীমান সুধাংশুকুমার যে আদর্শ দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন আজ মহানগরীর সুশিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বঙ্গললনার এই চরম দুর্দ্দিনে তাহা পুনশ্চ প্রদর্শিত হইবে কি? অনেক যুবতী ও বর্ষীয়সী রমণী একদম বস্ত্রশূন্য বলিলেই হয়। ঘরের পর্ণকুটীরের হোগলপাতার বেড়াই এখন ইহাদের একমাত্র আচ্ছাদন। বস্ত্রের নামে ইহারা যে নেকড়ার সমষ্টি পরিধান করে তাহা পরিধান করিয়া নিজের পেটের সন্তানদের নিকটও বাহির হওয়া অসম্ভব। মশারি, লেপের খোল, শীতবস্ত্র, ছিন্নকন্থাদি যাহা কিছু ছিল এই দুর্দ্দিনে সব শেষ হইল। অনেক গৃহে একমাত্র শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র মাতা ও যুবতী কন্যাগণের গৃহের বাহির হওয়ার একমাত্র সম্বল। যখন মা গৃহের বাহির হয় তখন যুবতীকন্যাগণ গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া থাকে। যেরূপ বীভৎস অবস্থায় এইসব স্ত্রীলোক কালযাপন করিতেছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতেও লজ্জা হয়। ইহার পর আবার অনেকের ঘরের চালে খড় নাই, পেটে অন্ন নাই, চেরাপুঞ্জির মত অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে এই সকল বস্ত্রশূন্য গৃহে আবদ্ধ নরনারীর ক্লেশের মাত্রা যেরূপ চরম সীমানায় উঠিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যখন ঘরের খড়বিহীন চাল দিয়া শতধারায় জল পড়িয়া এই-সকল দুর্ভাগ্য যুবতী ও বর্ষীয়সী রমণীদের দেহকে সিক্ত করে তখনও যে তাহারা গৃহান্তরে কিম্বা স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহার সাধ্য নাই। স্ত্রীলোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে তবু লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদের আজ এতাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারেন? হিন্দু ললনাগণ একমাত্র বস্ত্র দ্বারা স্নান, আহার ও রাত্রিবাস করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, তপ, দেবালয় দর্শন, সব বন্ধ। এই দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে হতভাগিনী রমণীদের সর্ব্বদা আর্দ্র ও জলসিক্ত বস্ত্রে কালযাপন কিরূপ কষ্টকর তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন। প্রাথমিক নিম্ন শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ। কারণ ১১।১২ বৎসরের বালক বালিকা সম্পূর্ণ নগ্নদেহে গৃহের

রায় বাহাদুর

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের সৌজন্যে।
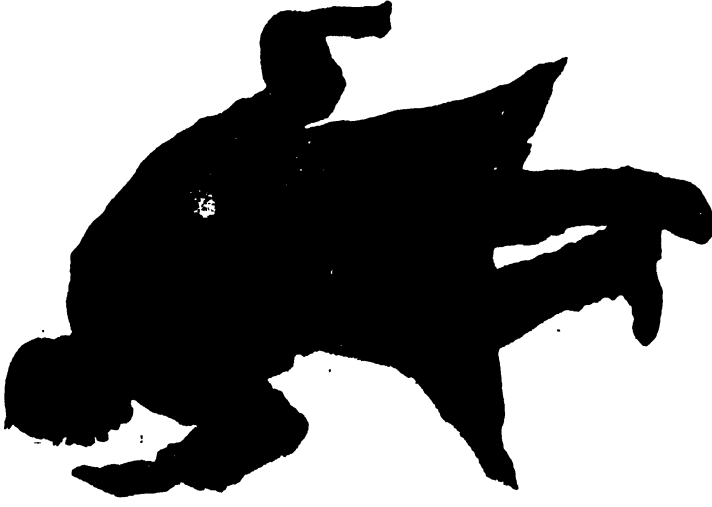
বাহির হইতে অসমর্থ। অনেক মৌলবি ও মুন্সি তাঁহাদের মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জমিদারবহুল সহর, কিন্তু বরিশালের জমিদারবর্গ অধিকাংশই বিদেশী, সেইজন্ত বরিশালের দুরবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এই ভারতসভায় আমি মহাপ্রাণ শ্রীযুত সি আর দাস মহাশয়কে তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতার দরুণ আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি সর্ব্ব প্রথমে আমাদের বরিশালের অবস্থা শ্রবণ করিয়া ৫০০০৲ টাকার সূতা সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের দায়িত্বে বঙ্গলক্ষ্মী মিল হইতে মিলের দামে সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইবার সংবাদপত্রের সাক্ষ্য লওয়া যাক।—

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা।—বস্ত্রাভাবে লজ্জার দায়ে উন্মত্ত হইয়া আমাদের দেশে মানুষ কিরূপে আত্মহত্যা করিয়া সকল লজ্জার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে তাহার এক নিদারুণ করুণ সংবাদ গত ৩১শে শ্রাবণের "বাঙ্গালী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। সে হৃদয়বিদারক কাহিনী পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবে না। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত পদ্মপুকুর গ্রামের বিধবা স্বয়ম্বরী দাসী তাহার পিত্রালয় গড়পালী গ্রামে একটী কন্তা লইয়া বাস করিতেছিল। ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূগণ তাহার ভরণ-পোষণে অস্বীকৃত হইয়া কন্তা সহ তাহাকে তাড়াইয়া দিলে পার্শ্ববর্ত্তী শিবনুর গ্রামে বিধবা আশ্রয় লয়। তথায় ধান ভানিয়া চাউল বেচিয়া স্বয়ম্বরী তাহার দশম বর্ষীয়া কন্তা সহ কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু মেয়ের ও নিজের কাপড়ের অভাব সে কোনরূপেই কুলাইতে না পারিয়া হতভাগিনী মেয়েকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে করে এবং তদনুসারে মুড়ীর সহিত করবীর বীচি মিশ্রিত করিয়া মেয়েকে খাইতে দেয় এবং নিজেও খায়। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই মেয়েটীর শরীরে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে মরিয়া যায়। স্বয়ম্বরীর শরীরেও বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, সেও যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে আত্মহত্যার কারণ দর্শকবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। হায়! হতভাগিনি, যে দেশের নিত্য অভাব দাবানল অপেক্ষাও জ্বালাময়, যে দেশের নির্ম্মম লোক এক জোড়া বস্ত্র দিয়াও তোমাদের দুটী প্রাণ রক্ষা করিতে পারে নাই, এমন দেশে কেন তুমি জন্মিয়াছিলে?—স্বরাজ।

অন্ন ও বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা।—বরিশালের গৌরনদী গ্রামবাসী এক শূদ্রজাতীয়া বৃদ্ধা রমণী অন্ন ও বস্ত্রাভাবে বিষম কষ্ট পাইতেছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের মৃত্যুতে বৃদ্ধা একেবারে সহায়শূন্ত ও অভিভূত হইয়া পড়ে এবং ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে থাকে। কিন্তু এই কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতার দরুন কাপড় কিনিতে না পারায় কয়েক দিন যাবৎ একরূপ নগ্ন দেহেই ঘরে থাকিতে বাধ্য হয়। কোনরূপে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ঘরের বাহির হইতে পারা যায় এমন উপায়ও না থাকায় বৃদ্ধা আর ভিক্ষায় বাহির হইতে পারে নাই, সুতরাং ৪।৫ দিন একেবারে অনাহারেই ঘরে কাটাইতে বাধ্য হয়। শেষে ক্ষুধার জ্বালা কাপড়ের কষ্ট ও মনঃকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া বৃদ্ধা সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।—(সময়) হিন্দুরঞ্জিকা।

দেশের বস্ত্রাভাব মোচনের জন্ত স্থানে স্থানে স্বল্প চেষ্টার সংবাদ এই পাইয়াছি—

কার্পাস শিল্পসমিতি—বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কটের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের সহজ উপায় নির্দ্ধারণ ও জেলার সর্ব্বত্র কার্পাস চাষ ও চরকা প্রথার প্রসার বৃদ্ধির জন্ত মেদিনীপুর সহরে "কার্পাস শিল্প সমিতি" নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে এই জেলার পল্লীর কৃষকগণ সহজে উৎকৃষ্ট কার্পাস-বীজ পাইতে পারে, এবং কার্পাস চাষ বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ পাইতে পারে এবং এই জেলার সর্ব্বত্র যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থ সহজে আপন আপন পরিবারে বস্ত্রাভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা এবং কার্পাস চাষ ও শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ ও উৎসাহ দান করা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। সময়-সময় এই সমিতির সভ্যগণ এই জেলার ভিন্ন-ভিন্ন মহকুমায় ও পল্লীতে গিয়া এবিষয়ে সাধারণকে উপদেশ দান ও এবিষয়ে পল্লীবাসীর অভাব, অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহা দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যাহাতে ক্রমশঃ প্রত্যেক সবডিভিশনে ও প্রত্যেক থানায় এই সমিতির শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্ত সমিতি বিশেষ চেষ্টিত আছেন।

—মেদিনীপুরহিতৈষী।

বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্ত জনৈক মুসলমান যুবকের অক্লান্ত উদ্যম। জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে—২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত বাংলানি গ্রামের স্বদেশহিতৈষী প্রজাবৎসল জমিদার মুন্সী নছিমদ্দিন আহাম্মদ সাহেবের সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত পুত্র রমজান আহাম্মদ সাহেব পল্লীগ্রামে বস্ত্রকষ্ট দূরীকরণ মানসে পল্লীবাসীদিগকে চরকায় সূতা প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে উপহাসাস্পদ হয়েন। এইরূপ কয়েকবার উপহাসাস্পদ হইয়াও তিনি অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি নিজে প্রাচীনা রমণীগণের নিকট হইতে চরকা-প্রস্তুত-প্রণালী এবং সূতা-প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি অবগত হইয়া নিজে মিস্ত্রিদ্বারা চরকা প্রস্তুত করাইয়া এক্ষণে সূতা প্রস্তুত করিতেছেন। আপাততঃ সূতা ঠিক বিলাতী ৪০-নং সূতার স্তায় হইতেছে; তবে তিনি বলিতেছেন যে এইবারে ৬০-নং সূতা হইবে। প্রায় ১৫/০ বিঘা জমিতে দেশী কার্পাস ও কলা কার্পাস চাষ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য জমিদারপুত্র হইয়াও কোনরূপ অহঙ্কার না করিয়া নিজেই এই-সমস্ত কার্য্য কেবল স্বদেশের উন্নতির জন্ত করিতেছেন। দেশবাসিগণ বিশেষতঃ গ্রামবাসী সকলেই এখন তাঁহার অনুকরণ করিতেছে এবং যাহাতে সকলেই উৎসাহিত হয় তজ্জন্ত তিনি /২॥ তুলো দিয়া /২ সের তুলার সূতা লইতেছেন; /॥ তুলা তাহাদের মজুরী।

তিনি এখন প্রায়ই সভা করিয়া কেবল ঐ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। এই শুভ সংবাদ শ্রবণে মহকুমার (বসিরহাটের) মাননীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর স্বয়ং তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমজান আহাম্মদ সাহেবের সূতা-প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এবং তিনি তথায় তিন দিবসকাল অবস্থিতি করিয়া দেশবাসীদিগকে যথেষ্ট উপদেশ দান করিয়াছেন। এবং একটি চরকা নমুনা স্বরূপ বসিরহাট কোর্টে লইয়া গিয়াছেন। এতদঞ্চলে দুর্গাপুর-নিবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ইতিমধ্যে ৬০-নং সূতা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং কয়েকখানি কাপড়ও বুনিয়াছেন। তিনি ঐ অঞ্চলে ওস্তাদ হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে বসিরহাটে একটি শিল্প প্রদর্শনী সভা হইবে। রমজান মিয়া ও সুরেন্দ্রবাবু উভয়েই ঐ সভায় বস্ত্র দেখাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং চেষ্টাও করিতেছেন।

সকলেই যদি এইরূপ সূতা-প্রস্তুত-প্রণালী শিখেন তবে নিশ্চয় এদেশে আর বস্ত্রকষ্ট হইবে না। আমরা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট রমজান আহাম্মদ মিয়া ও সুরেন্দ্রবাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। —২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

পটুয়াখালী বস্ত্রদান সমিতির কার্য্যবিবরণী।—পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রকষ্ট নিবারণ কল্পে স্থানীয় জনসাধারণ সভার পক্ষ হইতে একটি সমিতি গঠিত হইয়া গত ২রা আষাঢ়

তারিখ হইতে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। সমিতি এককালীন দান, মুষ্টিভিক্ষা, বস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি দ্বারা প্রকৃত অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোকগণকে বস্ত্র দিয়া যথাসম্ভব সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। এবং ক্রমে যাহাতে দেশীয় তাঁতের কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য সমিতি চেষ্টা করিতেছে। ঝালকাঠী হইতে তাঁতের কাপড় খরিদ করতঃ এ যাবত প্রায় ৩০০৲ টাকার বস্ত্র গ্রামে বিতরণ করা হইয়াছে। স্থানীয় উকীল, মোক্তার ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ মফস্বলে গ্রামে গ্রামে যাইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোকগণকে বস্ত্রদান করিয়াছেন। —বরিশালহিতৈষী।

এইসঙ্কটকালে মডারেট ও ন্যাশানেলিষ্ট নেতৃবৃন্দ সকলেই ইহার প্রতিকারার্থে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ৺রামকৃষ্ণ মিশনের আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণও নরনারীর দুঃসহ দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্ব্ব সাধারণের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সি আর দাস মহোদয় তাঁহার সম্পূর্ণ দায়িত্বে District Associationকে মিল হইতে cost priceএ সম্প্রতি ৫০০০পাঁচ হাজার টাকার সূতা সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বরিশাল জিলা সমিতি ইহা গ্রাম্য কমিটির মারফত জোলা ও তাঁতিদিগকে দাদন করিবেন। জিলা সমিতিকে অবশ্য এই টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যদি এই কার্য্যে জিলা সমিতি সফল হন তবে তিনি সমস্ত বঙ্গদেশে এইরূপ আদর্শে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিবেন। মিষ্টার দাস বর্ত্তমান সমস্যার পূরণার্থে তাঁহার মন্তব্য কিরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

(১) ভারতবর্ষীয় মিল হইতে সূতা খরিদ করিয়া cost priceএ গ্রাম্য সমিতিকে দেওয়া হইবে।

(২) গ্রাম্য সমিতিগুলি জিলা সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(৩) গ্রাম্য সমিতিগুলিকে চর্কার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইবে। তুলা সরবরাহের ভার মিষ্টার দাস স্বয়ং গ্রহণ করিবেন।

(৪) মিল হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি middle hand থেকে খরিদ না করিয়া direct জিলা সমিতির নিকট বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইবে।

(৫) নরনারীর দুঃসহ ক্লেশ মোচনের জন্য বস্ত্রাদি বিতরণকার্য্য সর্ব্বত্রই রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

আমাদের জাতীয় ধনভাণ্ডারের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয়ের মতও এইরূপ। তবে অধিকন্তু তিনি খুব পাতলা চট বর্ত্তমান সমস্যা নিবারণার্থে উপযোগী হইবে কি না জানিতে ইচ্ছা করেন।

যাহা হউক খুব শীঘ্রই কলিকাতা মহানগরীতে একটি শক্তিসম্পন্ন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং এই মহাকেন্দ্র হইতে মফঃস্বলের কেন্দ্রগুলির সব সমস্যা পূরণ হইবে বলিয়া আশা করি।

(বরিশাল হিতৈষী।)

বিনীত নিবেদক শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গলাচিপায় বস্ত্র দান।—বরিশাল হইতে জনৈক ভদ্রলোক গলাচিপা গিয়া তত্রত্য কাছারির নায়েব সারদা বাবুকে ২৪৲ টাকার কাপড় কিনিয়া দিয়া আসিয়াছেন এবং আরও ৫৲ টাকা নগদ রাখিয়া আসিয়াছেন। উহা হইতে কয়েক খানা কাপড় ডাউখা পাঠান হইবে। গলাচিপাকে কেন্দ্র করিয়া ৮ মাইল ১০ মাইল দূরের লোকেরও লিষ্ট করা হইয়াছে। সেই লিষ্ট দৃষ্টে ঐরূপ কাপড় দেওয়া হইয়াছে। —বরিশাল-হিতৈষী।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহা সমরের পঞ্চম-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ৪ঠা আগষ্ট লাক্সপুরের স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় যাদব-বাবুর সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী লাক্ষপুর গ্রামের দরিদ্রগণকে ৩০০৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র বিতরণ করেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি আরও সহস্র টাকার দেশীয় তন্তুবায়জাত বস্ত্র বিতরণ করিবেন। —বীরভূমবাসী।

বস্ত্র দান—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কুণ্ডলার অন্যতম জমীদার বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনে সম্প্রতি গরীব দুঃখীদিগকে ৬১ শত টাকার বস্ত্র দান করিয়াছেন। বিজয়-বাবু এই কার্য্যে যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন আশা করি ধনী মাত্রেই তাঁহার অনুকরণ করিবেন। আমরা কায়মনোবাক্যে বিজয়-বাবু ও তাঁহার ভ্রাতাদের মঙ্গল কামনা করি। —বীরভূমবাসী।

বস্ত্রদান।—রামপুরহাটের "রাঢ়দীপিকা" বলেন কুণ্ডলার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিগত ২৩শে শ্রাবণ তারিখে প্রায় ৬১ শত টাকার বস্ত্র তত্রত্য গরীব দুঃখীকে বিতরণ করিয়াছেন। আমরা এই বস্ত্র বিতরণের কথা শুনিয়া খুব সুখী হইয়াছি। আজকাল সকল ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থাপন্ন লোকের কোনরূপ আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয় না করিয়া এরূপ ভাবে বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। —বীরভূমবার্ত্তা।

ত্রিপুরার ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী এক প্রকার নূতন সূতা কাটিবার চরকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই চরকা পা দিয়া ঘুরাইয়া সহজে সূতা প্রস্তুত করা যায়। —মেদিনীপুর-হিতৈষী।

চির দুর্ভিক্ষের দেশে অন্নকষ্ট নিবারণেরও একটু স্থায়ী অনুষ্ঠানের সংবাদ আমরা পাইয়াছি।—

পুরীতে দরিদ্রদিগকে মহাপ্রসাদ দানকল্পে নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজ স্যার চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুর বেহার ও উৎকল গবর্ণমেণ্টের হস্তে সাড়ে আট হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদে পুরীধামে দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা হইবে। এই ফণ্ডের নাম হইবে "চন্দ্র নেপালী নাথের থানা ফণ্ড।" —ঢাকা প্রকাশ।

ধুতি ও শাড়ী সম্বন্ধে আমরা কিরূপে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হইতে পারি, তৎসম্বন্ধে যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর নিম্নলিখিত মন্তব্য ও উপায়গুলি সাধারণের বিচার ও অবলম্বনের জন্য প্রচার করিতেছেন।—

১। সমগ্র বঙ্গদেশে নগরের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহাতে অতি অল্প লোক বাস করে। এই সকল নগরের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালী সাধারণতঃ নিজের বাস্তুতে বসবাস করে ও প্রত্যেকেরই শাক-সবজী তৈয়ারের নিমিত্ত কিম্বা বাগানের নিমিত্ত বাস্তুসংলগ্ন কিছু না কিছু জমি আছে। ঐ সকল বাস্তু ও তৎসংলগ্ন জমিতে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান ব্যতীত অন্যান্য বন্যার বৎসরেও সাধারণতঃ বন্যার জল উঠে না।

২। তুলা নিম্ন ভূমিতে জন্মান যায় না। কিন্তু সকল রকম উচ্চ ভূমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। এক প্রকার তুলা আছে যাহার চাষ প্রতি বৎসর করিতে হয়। আর এক প্রকারের তুলা আছে যাহা এক বৎসর রোপন করিলে ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। প্রথমোক্ত প্রকারের তুলার চাষ করিতে হইলে গভীর করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়। সার দিতে হয় এবং শেষোক্ত প্রকারের তুলা অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে হয়। এই জন্য আমি বাৎসরিক তুলার চাষ করিবার পরামর্শ দিই না। দীর্ঘস্থায়ী তুলার গাছের আবাদ করিতেই পরামর্শ দেই।

৩। বাঙ্গলার কাপাস যথা দেব কাপাস, রাম কাপাস ও রাজ কাপাস, বাঙ্গলার জমিতে ভাল জন্মে; ধারাওয়ালের কাপাসও লাগান

যায়। তুলার বীজ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ঠিকানা—সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট সীড ষ্টোর, ২৭নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—অথবা সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট গভর্ণমেণ্ট কৃষি ক্ষেত্র, রামনা, ঢাকা।

গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগ হইতে বীজ পাওয়া না যাইলে স্থানীয় বাজার কিম্বা লোকের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪। তুলার বীজের মূল্য মণ প্রতি প্রায় ১০ টাকা। এক বিঘা জমিতে ১২১টি গাছের জন্য তিন ছটাক বীজ লাগে।

৫। উচ্চ ভূমিতে ১০ ফুট কিম্বা ১২ ফুট অন্তর বীজ পুতিবে। বাড়ীর সীমানাতে, কিম্বা বাগানে, কিম্বা উঠানে পুতিতে পারা যায়। কিন্তু ছায়ায় কোন গাছ জন্মিবে না।

৬। পুতিবার পূর্ব্বে যে স্থানে বীজ পুতিবে সেই স্থানে গোবরপচা সার লাগাইবে। একস্থানে ৩।৪টা করিয়া বীজ পুতিবে। কারণ সকল বীজই অঙ্কুরিত হয় না। গাছের গোড়া বৎসরে একবার খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক এবং একবার সার দেওয়ারও আবশ্যক।

৭। গাছগুলি ৮।১০ ফুট লম্বা হয় এবং ৮।১০ বৎসর থাকে।

৮। এক বৎসর হইলে গাছগুলিতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং সারা বৎসরই ফল ধরে। যখনই ফলগুলি ফাটিবে তখনই তাহাদের তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা মাটিতে পড়িয়া কিম্বা বৃষ্টি ও হিমে তুলা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৯। প্রতি বৎসর প্রতি গাছে এক সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত বীচি সমেত তুলা উৎপন্ন হয়। এই তুলাতে বীচি ও আঁশের পরিমাণ ২ : ১ অনুপাতে না থাকিলেও অন্ততঃ ৩ : ১ অনুপাতে থাকে। যদি ধরা যায় যে প্রতি গাছে বীজ সমেত এক সের করিয়া তুলা উৎপন্ন হয় এবং বীচি ও আঁশের পরিমাণ যথাক্রমে তিন ভাগ ও এক ভাগ হয়, তাহা হইলে এইরূপ সর্ব্বনিম্ন হার হিসাব করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একটা গাছ হইতে অন্ততঃ এক পোয়া তুলার আঁশ পাওয়া যায়। উপরোক্ত হিসাব অতি কম এবং উহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভাল গাছ হইতে প্রতি গাছে আধ সের পর্য্যন্ত তুলার আঁশ পাওয়া যাইতে পারে।

১০। মোটামুটি দেখা যায় যে একজন বাঙ্গালী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের বৎসরে ৬০ হাত করিয়া ৬ খানির অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয় না। বরং বালকদের তদপেক্ষা ছোট কাপড় লাগে। যদি সকলকেই পরিণতবয়স্ক বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে যে পরিবারে দশটি লোক আছে এমন পরিবারে বৎসরে ৪০ হইতে ৪৪ ইঞ্চি বহরের ৬০ খানি ১০ হাত কাপড়ের আবশ্যক হয়।

১১। ৪০ নম্বরের ঐরূপ একখানা ধুতির জন্য ½ আধ সের সূতার প্রয়োজন। চল্লিশের অপেক্ষা অধিক নম্বরের ধুতির জন্য আধ সেরের চেয়ে কম সূতা লাগে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে আশী নম্বরের ১ খানা ধুতির জন্য এক পোয়া সূতা লাগে।

১২। ৮০৪০ গজে এক ফেটি হয়। যদি ১০ ফেটি সূতা ওজনে আধ সের (১ পাউণ্ড) হয় তাহা হইলে ঐ সূতাকে ১০ নম্বরের সূতা বলে। যদি ৪০ ফেটি সূতা ওজনে আধ সের (এক পাউণ্ড) হয় তাহাদের নম্বর আশী হইবে।

১৩। আমি ৪০ নম্বরকে সূতার ভিত্তি ধরিয়া হিসাব দেখাইব। ৪০ নম্বরের সূতার ধুতি তত মোটা নহে। উহা ভদ্রলোকেরা অনায়াসে পরিতে পারেন। আজকাল ইহা অপেক্ষাও কম নম্বরের সূতার ধুতি ভদ্রলোকেরা পরিতেছেন। সূতার নম্বর যত কম হইবে ধুতি তত অধিক টিকিবে।

১৪। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যে পরিবারে ১০ জন লোক আছে এমন পরিবারের বাৎসরিক ৬০ ষাট খানি ৪৪ ইঞ্চি বহরের ১০ হাত ধুতির প্রয়োজন; এবং উক্ত পরিমাণ কাপড়ের নিমিত্ত ৩০ ত্রিশ সের তুলার আঁশ আবশ্যক হয়। ১২০টা গাছ বৎসরে অন্ততঃ ৩০ ত্রিশ সের তুলার আঁশ দেয়। এবং ইহার দ্বিগুণ পরিমাণও দিতে পারে।

১৫। যদি কেহ এক বিঘা জমিতে আগামী সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষে তুলার আবাদ করেন তাহা হইলে তিনি এখন হইতে দেড় বৎসরের মধ্যে নিজ পরিবারের কাপড়ের জন্য যতখানি তুলা আবশ্যক, তদপেক্ষ অধিক না হউক অন্ততঃ ততখানি তুলা পাইতে পারেন।

১৬। ৩০ ত্রিশ সের তুলার দাম প্রায় ৩০ টাকা। এই ত্রিশ টাকা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। তুলা উত্তমরূপে পিঁজিয়া লইয়া চরকার দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিতে হয়।

১৭। ভাল চরকা শ্রীরামপুর গভর্ণমেণ্ট বয়ন-বিদ্যালয় হইতে প্রত্যেকটি ৪ চারি টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। এবং এই নমুনানুযায়ী চরকা স্থানীয় ছুতারের দ্বারা তৈয়ার করাইলে ২ টাকা কিম্বা ২॥০ কিম্বা কম ব্যয় পড়ে।

১৮। গাছ-কাপাসের তুলার আঁশ বীচি হইতে সহজে পৃথক হয়, এবং স্ত্রীলোকেরা কাকুই কিম্বা কোন পিঁজিবার যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া হাত দিয়াই পিঁজিতে পারেন।

১৯। তুলা পিঁজিয়া চরকা দ্বারা সূতা কাটা যায়। অর্দ্ধসের তুলায় ১ খানা ও একসের তুলায় একজোড়া চল্লিশের ধুতি তৈয়ার হয়। দৈনিক ৪।৫ ঘণ্টা খাটিলে একজন স্ত্রীলোক একদিনে ১ ছটাক অথবা মাসে প্রায় ২ সের সূতা প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপে এক-জন স্ত্রীলোক মাসে প্রায় দুইজোড়া অর্থাৎ বার্ষিক ২৪ জোড়া ধুতি অর্থাৎ ১০টি লোকের একটি পরিবারের ব্যবহারোপযোগী সূতা কাটিতে পারে। ১৫ দিন চেষ্টা করিলে সূতা কাটা শিক্ষা করা যায়, এবং একমাস চেষ্টা করিলে একজন স্ত্রীলোক ৪০ নম্বর সূতা কাটা শিখিতে পারে। রাত্রে প্রদীপের আলোকে সূতা কাটা যায়।

২০। ৩০ সের পরিমাণে সূতা কাটা হইলে তাহা কোন তাঁতি বা জোলাকে দিলে সে জোড়া প্রতি ॥৵০ হইতে ১৵০ মুজুরি লইয়া কাপড় বুনিতে পারে। এই মুজুরি অধিক ধরা হইল, কারণ সাধারণ কাপড় গজপ্রতি এক আনা মুজুরিতেও বুনিয়া থাকে। নিজের জমিতে তুলা হইলে, ঘরে স্ত্রীলোকেরা সূতা কাটিলে, ৩০ টাকায় ৬০ খানা ধুতি পাওয়া যাইতে পারে। উহা বর্ত্তমানে ১০০ খরিদ করিতে হয়। যুদ্ধের সময়ের পূর্ব্বেও ইহা ৬০ টাকায় খরিদ করিতে হইত এবং যুদ্ধের পরে দর কমিয়া গেলেও ইহাতে লোকসানের আশঙ্কা নাই, কারণ জমিতে তুলা প্রস্তুত করিয়া ঘরে সূতা কাটা হইলে মাত্র বুনিবার খরচ ৩০ টাকায় ৩০ জোড়া ধুতি হইতে পারে। নিজের জমিতে তুলা প্রস্তুত ও ঘরে সূতা কাটা হইলে ম্যানচেষ্টার ও বোম্বাই সূতয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন বাধা জন্মাইতে পারিবে না—কারণ দেশে এখনও বহুসংখ্যক তাঁতি জোলা আছে যাহারা [illegible] প্রস্তুত করিতে পারে। হিমালয় প্রদেশে, আসাম, মণিপুর, [illegible] এখনও ভদ্রলোকেরা নিজে-দের ঘরে সূতা কাটিয়া থাকে। মেদিনীপুরস্থ চন্দ্রকোণায় এখনও ব্রাহ্মণেরাও কাপড় বুনিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক পরিবারে সূতা কাটার প্রথা ছিল এবং এখনও ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকেরা উপবীতের জন্য সূতা কাটিয়া থাকেন। যখন ইংরেজেরা প্রথম এদেশে আসেন তখন সূতা ও কাপড় বাঙ্গালা দেশের ধনের আকর ছিল এবং ইউরোপীয় বণিকেরা রেশম ও তুলাজাত দ্রব্যের জন্যই এই দেশে আসিতেন। ১৮১৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে কাপড় রপ্তানি হয় তাহার অধিকাংশ বাঙ্গালা দেশ হইতে গিয়াছিল এবং তাহার মূল্য

বর্ত্তমান বিনিময়ের হারানুযায়ী ১৯৫ লক্ষ টাকা। তাহার পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও অধিকপরিমাণে রপ্তানি হইত।

চর্কাই বাঙ্গালীর ধনের আকার ছিল। আসুন আমরা আবার তুলার চাষ, চর্কা ও তাঁত ব্যবহার করি। ইহাতে চিরকালের জন্য কাপড়ের কষ্ট দূর হইবে এবং আমরা দেশ বা বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিব।

এ-বিষয়ে আমার জ্ঞান কম। যাঁহারা এবিষয়ে পারদর্শী সুদক্ষ তাঁহাদের, বিশেষতঃ সরকারী দক্ষ কর্ম্মচারীগণের, সমালোচনা আহ্বান করি। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই এবং সমস্ত জমিদারবর্গ তাঁহাদের নিজ-নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে তুলার চাষ এবং সূতা প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র মাস এবং এপ্রেল অর্থাৎ বৈশাখ মাস তুলার চাষের উপযুক্ত সময় এবং এখন হইতে তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তুলার বীজেও লাভ করা যায়। ৩০ সের আঁশে দুই মন বীজ পাওয়া যায়। এইরূপে ৩০৲ টাকা মূল্যের ৩০ সের তুলা ব্যতীত ২০৲ টাকার পরিমাণে বীজও পাওয়া যাইবে। যদি বীজ ভাল না হয় তাহা হইলে অন্ততঃ ১০৲ টাকা পরিমাণে গরুর খাবার হইতে পারে।

ঘাইনে মাড়িলে তুলার বীজে তেল হয় এবং দুই মন তুলার বীজে অন্ততঃ ১৬ সের তেল পাওয়া যায় এবং তাহা জ্বালান যাইতে পারে ও অবশিষ্ট খইল দ্বারা সার ও গরুর খাবার হয়।

নূতন সংস্করণ ২৫ ভলিউম ২২৪ পৃষ্ঠায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দ্রষ্টব্য, ইহাতে বীজ, সার, গরুর খাদ্য, পরিষ্কৃত তেল এবং সাবান প্রস্তুতের জন্য তৈল প্রস্তুত করণ বর্ণিত আছে।

কার্পাসের গাছ অল্প লাগাইলে অল্পই তুলা বা কাপড় পাওয়া যায় না, কিন্তু অল্প লাগাইলে দেড় বৎসর পরে তুলা পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধ কতদিন থাকিবে বলা যায় না। যুদ্ধের প্রথমে এই উদ্যোগ করিলে আরও ভাল হইত। এই সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিলে, যুদ্ধ বেশী দিন চলুক বা না চলুক, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। যুদ্ধের শেষেও আমাদের পরমুখাপেক্ষী না হওয়াটা কি ভাল নয়? আপাততঃ যাঁহারা সূতা চান, তাঁহাদের তুলা কিনিয়া উহা করিতে হইবে। আর কাপড়ের খরচ কমাইতে হইলে, মান্দ্রাজীদিগের ন্যায় আমাদের কাছা আর কোঁচা খাট করিতে হইবে। গরিবদিগের ১০।১১ হাত কাপড় পরিলে চলিবে না। বড় লোকের স্বতন্ত্র কথা। গরিব স্ত্রীলোকদিগেরও ঘাগ্‌রা করা আবশ্যক হইবে। ১০।১১ হাত লম্বা কাপড় গরিবের পক্ষে অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি সকল দুঃখ-মোচনের মূলে শিক্ষা। শিক্ষার বিস্তারের জন্য দেশে কিরূপ চেষ্টা হইতেছে দেখা যাক।—

বাঙ্গালায় উচ্চ শিক্ষা [illegible]।—গত দুই বৎসরের মধ্যে রংপুর, ফরিদপুর, এবং বাগেরহাটে তিনটি কলেজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। চট্টগ্রাম, ফেণী, মাদারিপুর, এবং বিক্রমপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। কুমিল্লা এবং দৌলতপুর কলেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হইয়াছে। নোয়াখালির ফেণী মহকুমার কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে, বাঙ্গালা দেশে, হাওড়া জেলাকে কলিকাতার মধ্যে ধরিয়া লইলে, কেবল মালদহ, বগুড়া, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি এই ৪টি মাত্র জেলা কলেজহীন থাকিবে। বঙ্গদেশে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, আর ১০ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক মহকুমায় এক-একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা হইয়া যাইবে এবং ভারতসচিবের প্রস্তাবানুসারে অন্ততঃ দেশের স্কুলগুলির উপর দেশীয় লোকের আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে অসংখ্য উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্কুলপ্রতিষ্ঠার যে-সকল বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তিরোহিত হইলে এত দিনে বাঙ্গালা দেশে স্কুলসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।—

২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

অনুন্নত জাতির শিক্ষাবিধান।—বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী মাত্র দুই বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অনুন্নত জাতির শিক্ষার জন্য এই মণ্ডলী যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। এই মণ্ডলী বাঁকুড়া জেলা ও অন্যান্য স্থানে অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বঙ্গ ও আসামে "অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি-বিধায়ক সমিতি" ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, রঙ্গপুর, যশোহর এবং ২৪ পরগণায় ৬২টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮টি মধ্য ইংরেজী ও ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়; ১১টি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি নৈশ স্কুল আছে। ১৯১৬—১৭ সনে ১৯১৬ জন বালক ও ২৬৩ বালিকা ছিল। তন্মধ্যে ১৭৭ জন মুচী এই সমিতির প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাভাবে সমিতির কার্য্য প্রসারিত হইতে পারিতেছে না। অর্থ সংগ্রহের জন্য সমিতি জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের তালিকাতে দেখা যায় যে, ১৯১৬—১৭ সনে অনুন্নত শ্রেণীর ৭৭২৫৪ জন বালক ও ৮৯৭৩ জন বালিকা শিক্ষাধীন রহিয়াছে। বালকদিগের মধ্যে ১৯৪ জন কলেজে ও ২০২২ জন উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী, আর ২৬৮৪ বালক ও ২৩ জন বালিকা মধ্য শ্রেণীতে, এবং ৭০৮৬১ বালক অধ্যয়নার্থী, অবশিষ্ট ১২৯৩ জন বালক ও ৪২ জন বালিকা বিশেষ স্কুলে ও পাঠশালায় পাঠ করিতেছে। অনুন্নত শ্রেণীর ৮৬০২৭ জন ছাত্রের মধ্যে ৪১১০৫ জন নমঃশূদ্র, ইহার ৩৫৯৩২ বালক ও ৫১৭০ বালিকা। নমঃশূদ্র জাতির ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ১০০ জন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে, আর ১৪৮৯ উচ্চ শ্রেণীতে, ১৬৫০ মধ্য ও ৩২০৮৭ বালক ও ৫১৩৮ বালিকা নিম্ন শ্রেণীতে পাঠ করিতেছে। নমঃশূদ্র জাতীয় ছাত্রগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় বিশেষ বিশেষ হোষ্টেল স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার "অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি সাধক মিশন" উক্ত শ্রেণীর লোকের শিক্ষার জন্য ৩টি মধ্য ইংরেজী স্কুল পরিচালন করিতেছেন। শিক্ষা বিভাগ ইহার একটি স্কুলে সাহায্য দান করিতেছেন। বেপ্‌টিষ্ট মিশনও কতিপয় প্রাথমিক স্কুল পরিচালন করিতেছেন। নমঃশূদ্রগণও স্থানে স্থানে সমিতি গঠন করিয়া শিক্ষা বিস্তার সাধনে যত্নশীল হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই জাতি শিক্ষা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যত বেশী হয় ততই দেশের মঙ্গল।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

শিক্ষা বিস্তারে মহানুভবতা।—বাগেরহাটের জনৈক শিক্ষক সামান্য ২৫।৩০ টাকা বেতনের চাকুরি করিয়া অতিকষ্টে বহুদিনে ১০০০৲ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বাগেরহাটে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইলে শিক্ষক মহাশয় তাঁহার বহুদিনের কষ্টলভ্য—জীবনের শেষ সম্বল সেই সহস্র মুদ্রা কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সংখ্যা দেশে যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশ ততই উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিবে। আমরা এই স্বদেশভক্ত শিক্ষক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। —যশোহর।

স্বজাতি-প্রীতি।—এ বৎসর ফরিদপুর কলেজে ৬জন নাপিত জাতীয় ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪জনের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কাজেই তাহাদিগকে সাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে

হইয়াছে। ফরিদপুর বাজার হইতে রাজেন্দ্রকুমার শীল তাঁহার স্বজাতি-বর্গের নিকট দরিদ্র ছাত্র চারিটির সাহায্যকল্পে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন; এ সংবাদ জানিবামাত্র আমাদের প্রেসের ২জন নাপিত কম্পোজিটার স্বজাতীয় ছাত্রদের সাহায্যার্থ ২৲ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছে। আমাদের এই দরিদ্র কম্পোজিটার ২টির স্বজাতি-প্রীতি এবং দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার-বাসনা কিরূপ জাগ্রত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা আনন্দানুভব করিতেছি। —যশোহর।

দান।—আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম ফরিদপুর জিলার ধুরুকান্দী গ্রাম নিবাসী দানশীল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল মহাশয় সংপ্রতি এই জিলার আমগ্রাম নামক স্থানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন জন্য এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, এবং উক্ত স্কুলের ফার্নিচার যাহা লাগিবে তাহা সমস্ত দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইনি ইহার নিজ গ্রামের নিকটবর্ত্তী ফুকুরা মদনমোহন একাডেমী নামক উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় জন্যও অনেক টাকা দিয়াছেন ও দিতেছেন। এ জিলায় এরূপ দানশীল সাধু ব্যক্তি অতি বিরল। —ফরিদপুর-হিতৈষী।

যখন আমরা আত্মবিরোধে ছিন্নভিন্ন দুর্ব্বল, দৈবপীড়নে মরণাপন্ন, আত্মচেষ্টায় অকর্ম্মণ্য তখন

প্রকাশ, সাগরদ্বীপে অন্তরীণদিগের জন্য প্রকাণ্ড 'বন্দিনিবাস' নির্ম্মিত হইতেছে। —বঙ্গরত্ন।

বিপদ যখন চারিদিকে ঘনাইয়া আসে, যখন বিপদ-সমুদ্রে নিমজ্জমান হইয়া কূল দেখিতে না পাওয়া যায়, তখনও সেই বিপদকে গ্রাহ্য না করিয়া স্বার্থ দ্বন্দ্ব বিচ্ছেদ বিপদ ভুলিয়া পরহিতে আপ্রাণ যে চেষ্টা

ইহাকেই বলে মনুষ্যত্ব।—কিছুদিন হইল নোয়াখালীতে সাত বৎসর বয়সের এক বালক নৌকায় করিয়া তাহার পিতার কৃষিক্ষেত্রে গমন করে। আসিবার সময় সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে পড়িয়া নৌকাখানি উল্টাইয়া যায় এবং বালক সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মালায় ভাসিয়া যাইতে থাকে। বহুদূর গমনের পর মনসুর আলী ও কালামিয়া নামক দুইজন সহৃদয় ব্যক্তি বালকের এই বিপদ দেখিতে পাইলেন, এবং প্রাণের মায়া না করিয়া অনতিবিলম্বে সমুদ্রজলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এই বীর যুগলের প্রাণপণ পরিশ্রমে বালকটি রক্ষা পাইয়াছে। ইহাকেই বলে মনুষ্যত্ব। কর্ত্তব্যের আহ্বানে এমনই করিয়া যাহারা আপনাদের প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিতে পারে, মানুষ ত তাহারাই। আমরা মনসুর আলী ও কালা মিয়ার স্বজাতীয় বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।— মোহাম্মদী।

যতই দুঃখ বিপদ আসুক, ঝঞ্ঝা প্লাবন বহুক, যতই নির্য্যাতন অত্যাচার অবিচার হোক—

মাভৈঃ।—যেদিন সাধ্বী সতী সীতাহারা রামচন্দ্র শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিতেছিলেন—যেদিন পঞ্চখানি গ্রাম চাহিয়া সূচ্যগ্রভূমিশূন্য অবস্থায় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা বনে গেলেন, সেদিনও চিরস্থায়ী হয় নাই; বর্ত্তমানকালে যেদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম সার্কুলার অমান্য করিয়া পুলিশ-হস্তে বন্দী হইলেন সেদিনও চিরস্থায়ী হয় নাই। দুঃখের নিশিও প্রভাত হয়—আবার সূর্য্য উঠে—চাঁদ হাসে তারা হাসে। তেমন আজ যাঁহারা জাতীয় মহাসমিতিকে ধ্বংস করিতে বৃতসংকল্প হইয়া দেশবাসীকে উহাতে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছেন তাঁহারা একদিন তাঁহাদের ভুল বুঝিবেন—আবার ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলন হইবে। আপাত লাভের লোভ, মরুভূমির আলেয়ার আলো, বিপন্ন হইবার আতঙ্ক, বিচ্ছেদের এই করাল মেঘ কাটিয়া যাইবে। কারণ অধঃপতনের চরমতম তলদেশের চরমতম তলদেশে অবনমিত ভারতবর্ষ আবার জাগিবে। ঐ শুন মহাবাণী—

উঠ্‌ব মোরা উঠ্‌ব মোরা
বিধির আদেশ বাণী।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—যার যেমন আকাঙ্ক্ষা সে তেমন সাফল্য লাভ করে—

উচ্চ আশাতরু হয় ফলবান
হীন আশা রহে ধূলিতে শয়ান;
হয় দেবধ্যানে মানবের প্রাণে
দেবের আবির্ভাব।

মনপ্রাণে চাও দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন—চাও যে আমরা আর মশা মাছি হইয়া থাকিব না—আমরা দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মরিব না—আমরা আমাদের দেশীয় মূর্খ মূক ম্লান মুখে ভাষা দিব,—আমরা ক্ষুধিতের অন্ন যোগাইব, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিব। হীনপ্রাণ ভীরুকে সবল করিব—এই মহাদেশকে আমার দেশ বলিয়া পূজা করিব। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ—অন্তরে বল রাখ, তোমার সকল বাধা বিঘ্ন কাটিয়া যাইবে—ভ্রাতৃবিচ্ছেদ থাকিবে না—শত্রুর বিদ্বেষ কার্য্যকরী হইবে না।

কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।

তাই আবার বলি—

"মাভৈঃ"। —বরিশালহিতৈষী।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে;
চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে?
শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি;
উমার গায়ের আভা দেখি সকাল-বেলার রোদে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে!
উৎসুকী মন হঠাৎ কেন উদাস হয়ে পড়ে,
শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের ঝড়ে
বরণ-ডালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে,
রোদন-ভরা বোধন-বেলা; বুক যে ব্যথায় চাপে।
উদাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,
হাসির আভাস যায় ডুবে হায় নয়ন-জলের বানে।

বছর পরে আস্‌ছে উমা বাজ্‌ল না মোর শাঁখ,
উমা এল ; হায় গিরিবর, কই এল মৈনাক ?
* * *
কই এল বীরপুত্র আমার, কই সে অভয়ব্রতী,
অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদারমতি ;
কাট্‌তে পাখা পারেনি যার বজ্র তীক্ষ্ণধার
পাখ্‌না মেলে মায়ের কোলে আস্‌বে না সে আর ?
বিধির দত্ত বিভূতি যে রাখ্‌লে অটুট একা,—
নির্ব্বাসনে কর্‌লে বরণ,—পাব না তার দেখা ?
সে বিনা, হায়, শূন্য হৃদয়, শূন্য এ মোর ঘর,
ছিন্নপাখা শৈলকুলের কই সে পক্ষধর ?
আজ্‌কে সে হায় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ সাগরের তলে,
মাথার পরে আট পহরে কী তার তুফান চলে !
হারিয়েছে সে স্বৈরগতি, অব্যাহতি নাই,
স্বভাব-স্বাধীন কাটায় যে দিন বন্ধনে এক ঠাঁই।
কন্যা দিয়ে দেব্‌তা-জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
কি ফল হ'ল ? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী।
'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তায় 'শিব',—
তাঁর বরে হায় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরজীব !
যম-যাতনা হ'ল স্থায়ী শিবকে জামাই পেয়ে,
গোটা বছরে তিনটি দিনের অতিথ্ হ'ল মেয়ে ;
ছেলে হ'ল পর চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই ?
হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্য ঘরে রই"।
"উমার বিয়ের রাত থেকে আর শোয়াস্তি নেই মনে,
রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর দু'নয়নে।
* * *
মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে ম্রিয়মাণ ;
বোধন-বেলার শানাই বাজে,—কাঁদে আমার প্রাণ।
কত দিনের কত কথা মনের আগে আসে,
জলে-ছাওয়া ঝাপ্‌সা চোখে স্বপ্নসমান ভাসে।
মনে পড়ে মোর আঙিনায় বর-বিদায়ের রথ,
সার দিয়ে খান্ 'সু-কৃত' ভোজ তিন কোটি পর্ব্বত।
ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—
'হেম সুমেরুর হৈমচূড়া ইন্দ্র হরণ করে !'
উঠ্‌ল রুষে বজ্র-ললাট শৈল কুলাচল,
পড়্‌ল ডঙ্কা যুদ্ধ লাগি', তিন কোটি চঞ্চল !

বিদায় ক'রে গৌরী-হরে মন্ত্রণা সব করে
বাদল-ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল ঘরে।
"বিধাতারে জানাও নালিশ" স্থাবর গিরি কয়,
কেউ বলে "বৈকুণ্ঠে জানাও"। লাখ বলে "নয়, নয়,
কাঁদ্‌তে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
ইজ্জতে ভাই রাখ্‌তে বজায় বল বাহুতেই আছে।
কর্‌ব যুদ্ধ, নেইক শ্রদ্ধা আর বাসবের পরে,
পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অন্তরে।"
হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন দ্রুত পায়,
যুদ্ধ মুলতুবি হ'ল মুনির মন্ত্রণায় !
* * *
আজো যেন শুন্‌ছি কানে হাজার গলার মধ্যে থেকে,
মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠ্‌ছে জেগে ;
বল্‌ছে তেজী "কিসের শান্তি ? চাইনে শান্তি স্পষ্ট কহি,
দেব্‌তা হলে দস্যু কি চোর আমরা হব দেবদ্রোহী।
সুমেরু কোন্ দোষের দোষী ? সর্ব্বভূতের হিতৈষী সে।
ইন্দ্র যে তার নিলেন সোনা—ন্যায় আচরণ বল্‌ব কিসে ?
দেব্‌তা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,
'বৃহৎ চৌর্য্য প্রায় সে শৌর্য্য'—এমন কথা চোরেই বলে,
কিম্বা বলে তারাই যারা বিভীষিকায় ভক্তি করে—
চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পূজে শ্রদ্ধা-ভরে।
শ্রদ্ধেয় যে নয়কো জানি আমরা শ্রদ্ধা কর্‌ব না তায়,
স্বর্গপতির বজ্রভয়ে মাথা নত কর্‌ব না পায় ;
হেম সুমেরুর হৃত সোনা দেবনাকো হজম হ'তে,
পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই কর্‌ব লড়াই বিধিমতে।"
* * *
আকাশ জুড়ে বিপুলবপু উড়্‌ল পাহাড় ক্রোর
ধরার উপগ্রহের মালা উল্কা হেন ঘোর !
অন্ধ ক'রে সূর্য্য ওড়ে বিন্ধ্য বলবান্,
ধবল-গিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে ম্লান ;
তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চপাহাড় ক্রৌঞ্চ-কুলের সাধ,
নীল-গিরি নীলকান্তমণির নির্ম্মিত ঠিক চাঁদ ;
উদয়গিরি অস্তগিরি উড়্‌ল একত্তর,
মাল্যবান্ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চত্বর ;
চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্ব্বত—
লোমকূপে লাখ্ ঋষি নিয়ে উড়্‌ল যুগপৎ !

সবার আগে চল্‌ল বেগে শৈল-যুবরাজ
মৈনাক মোর ;—ফেল্‌তে মুছে শৈলকুলের লাজ।
* * *
আজো আমি দেখ্‌ছি যেন দেখ্‌ছি চোখের 'পর
দিকে দিকে দিক্‌পালেরা লড়্‌ছে ভয়ঙ্কর !
মেঘের বরণ মহিষ-বাহন যুদ্ধ করেন যম,
অগ্নি যোঝেন রক্তচক্ষু নিঃস্নেহ নির্ম্মম।
চোরাই সোনার কুমীর হোথা লড়েন কুবের বীর—
সাঁজোয়া সোনার সোনার খাঁড়া সোনার ধনুক তীর।
পবন লড়েন উড়িয়ে ধূলো অন্ধ ক'রে চোখ,
নিঋতি নীল বিষপ্লাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক।
সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ চলে, আর্ত্ত চরাচর,
আচম্বিতে দিগ্‌বারণে আসেন পুরন্দর।
হেঁকে বলে বজ্রকণ্ঠ মাহুত মাতলি—
"প্রলয়-বাদী তোম্‌রা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই।
বিধির সৃষ্টি করবে নষ্ট ? এই কি মনের আশ ?
বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে ? কর্‌বে সর্ব্বনাশ ?
ইন্দ্র-দেবের শাসন-প্রথার কর্‌বে অমান্য ?—
প্রতিষ্ঠা যার বজ্রে,—ও যা পরম প্রামাণ্য ?"
রুষ্ট ভাষে কয় আকাশে মহেন্দ্র পর্ব্বত,—
"চোরের উকীল ! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সৎ !
লোভান্ধ ওই ইন্দ্র তোমার হরেন পরের ধন,
পরের সোনা হজম ক'রে করেন আস্ফালন !
বৃহৎ চোরের আস্ফালনে টল্‌ছে না পাহাড়,
ধর্ম্মনাশা ধর্ম্ম শোনান্ যায় জ্বলে যায় হাড় !
পরস্ব নিশ্চিন্ত মনে, ইন্দ্র, কর ভোগ,
তার প্রতিবাদ করলে রোষো—এ যে বিষম রোগ !
যার ধন তার ভারি কসুর, ফিরিয়ে নিতে চায়,
বিপ্লবের আর বাকী কিসে ?—বজ্র হানা যায়।
আর তবে বিলম্ব কেন ? বজ্র হানো, বীর !
তাড়শে সাম্রাজ্য-পদের গর্ব্বে বাঁকা শির !
বিধান-কর্ত্তা ! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ !
তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ।
নেই মোটে ন্যায় ধর্ম্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,
বলছি স্পষ্ট, ইন্দ্র নষ্ট, ইন্দ্র সবল চোর।"

হঠাৎ গর্জ্জে উঠ্‌ল বজ্র ঝল্‌সিয়ে ব্যোম্‌পথ,
পড়্‌ল মর্ত্ত্যে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র পর্ব্বত।
পড়্‌ল বিন্ধ্য যোজন জুড়ে, পড়্‌ল গোবর্দ্ধন,
হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়্‌ল অগণন,
গ্রহতারার মতন যারা ফির্‌ত গো স্বাধীন
গরুড় সম অসঙ্কোচে ফির্‌ত নিশিদিন
অচল হ'তে দেখ্‌ল তাদের, আমার দু'নয়ন ;
দেখার বাকী ছিল তবু, তাই হ'ল দর্শন
হর্ষ-বিষাদ-মাখা ছবি—বীরত্ব পুত্রের—
উদ্যত বজ্রাগ্নি-আগে দীপ্তি সেই মুখের।
ঐরাবতের মাথায় হেনে পাষাণ করবাল
শ্যেনের বেগে ডুব্‌ল জলে আমার সে দুলাল !
বজ্র নাগাল পেলে না তার মিলিয়ে গেল কোথা,
মূর্চ্ছা-শেষে দেখ্‌নু কেবল বয় সাগরের সোঁতা !
* * *
সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি পর ;
পাথ্‌না দুটো যায় নি কাটা এই যা সুখবর।
ন্যায়-ধরমের মর্য্যাদা মান রাখ্‌তে গেল যারা
হার মেনে হায় লাঞ্ছনা সয় হেঁটমুখে রয় তারা !
ইন্দ্র নিলেন পরের সোনা—সেই করমের ফলে
আমার মাণিক হারিয়ে গেল অতল সিন্ধুজলে।
কুক্ষণে কার হয় কুমতি রোয় সে বিষের লতা,
ফল খেয়ে' তার পান্থপ্রাণী লোটায় যথাতথা।
কোথায় পাপের সূত্র হ'ল উঠ্‌ল ঝোড়ো হাওয়া
দিনমজুরের উড়্‌ল কুঁড়ে বুকের বলে ছাওয়া।
কোথায় লোভের ঘৃণ্য শোলুই জন্মাল কার মনে
সাপ হ'য়ে সে জড়িয়ে দিল লোক্‌সানে কোন্ জনে !
ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,
নয়নজলের নুন-পাথারে তলিয়ে দিবসযামী।
* * *
সবে আমার একটি মেয়ে, শ্মশানে তার ঘর ;
ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,
লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে।
কেমন আছে ?...কে দেবে তার খবর আমায় ক'য়ে ?
হাওয়ার মুখেও বার্ত্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;
পাখী বলো পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে।

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,
আছ্‌ড়ে কাঁদে পাষাণ হিয়া হয় না সে চুরমার।
ভাব্‌নাতে তার হায় গিরি সব চুল যে তোমার শাদা,
উমার আগমনেও হৃদয় শূন্য যে রয় আধা।
প্রবোধ কারা দ্যায় আমারে আগমনীর গানে?
যে এল না তারি কথাই কাঁদায় আমার প্রাণে।

* * *

যুগের পরে যুগ চলে যায় কঙ্কালে কাল শিকল গাঁথে,
চোরাই সোনায় তৈরী পুরী ভোগ করে রাক্ষসের জাতে।
রক্ষঃকুলে উদয় হ'ল ইন্দ্রজয়ী দারুণ ছেলে
তাও দেখেছি চক্ষে; তবু সান্ত্বনা হায় কই সে মেলে;
দেখেছি মেঘনাদের শৌর্য্য,—হেঁট বাসবের উচ্চ মাথা!
হারিয়ে পূজা শক্র ধরেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা!
লেখা আছে এই পাষাণীর পাষাণ হিয়ার পটে সবই,
হয়নি তবু দেখার অন্ত দেখ্‌ব বুঝি আরেক ছবি।—
বসে আছি শৈল-গেহে একলা আমার বিজন বাসে
জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের সুদূর আশে।
ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্ত্ত হিয়ার তীব্র শাপ—
তার তুষানল মনস্তাপে দ্যায় যে বৃথা মনস্তাপ।
মাতৃহিয়ায় দুঃখ দিলে জ্বল্‌তে হবে—জ্বল্‌তে হবে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রাজা হ'লেও আসন পরে টল্‌তে হবে।
অভিশাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে,
নিশ্বাসেরও সইবে না ভর, মিশ্‌বে হঠাৎ স্বপ্ন সনে॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চিত্র-পরিচয়

"শরৎশ্রী" ছবিতে চিত্রকর "শরৎশ্রী"কে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শরতের শুভ্র নির্ম্মলতা, আকাশের নীলিমা ও পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের ভেলার খেলা এই চিত্রে কলাসঙ্গত পদ্ধতিতে লক্ষিত হইয়াছে।

"রায় বাহাদুর" নামক ছবিতে চিত্রকর দেখাইতে চাহিয়াছেন কোনো কোনো খেতাবওয়ালা লোকের সাহেব দেখিয়া তটস্থ সম্ভ্রমের ভাব। দূরে ঘোড়া ছুটাইয়া একজন ইংরেজ চলিয়া যাইতেছে, হয়ত সে খেতাবী বাবুকে চিনেও না; লক্ষ্যও করে নাই। কিন্তু খেতাবী বাবু তাড়াতাড়ি পাগ্‌ড়ি খুলিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিতেছেন। তাঁর খেতাবে বাহাদুরী থাকিলেও তাঁর মন একেবারে ভীরু—এই কথা বুঝাইবার জন্যই খেতাবীদের টাইপ "রায় বাহাদুর" নাম, বিশেষ করিয়া ঐ খেতাবওয়ালাদের কাহাকেও ব্যাঙ্গ করিবার জন্য নয়।

চারু।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতির উদ্বোধন প্রাধান কাজ।

মানুষের স্বাধীনতা লোপ করিলে তাহার যে ক্ষতি করা হয়, তাহার চেয়ে বড় অনিষ্ট তাহার আর হইতে পারে না। আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদিগকে তাহাদের মালিকেরা স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া তাহাদের এই চূড়ান্ত ক্ষতি করিয়াছিল। অধিকন্তু দাসদের অনেক মালিক তাহাদের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহারও করিত। কিন্তু অনেক মালিক প্রকৃত স্বার্থবুদ্ধি, কিম্বা দয়া, কিম্বা উভয় কারণে, দাসদিগকে সুস্থ সবল সুখী ও কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য তাহাদের বাসের এবং গ্রাসাচ্ছাদনের সুবন্দোবস্ত করিত। যখন দাস ক্রয় বিক্রয় করিবার এবং ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা উঠিয়া গেল, তখন বাস এবং গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে নিগ্রো দাসদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আগেকার চেয়ে খারাপ হইল। দাসত্ব অবস্থায় প্রভুরা ইহাদিগকে যেরূপ ঘরে রাখিয়া যেরূপ খাদ্য ও বস্ত্র দিতেন, স্বাধীন অবস্থায় এখন তাহারা তাহা পাইল না। কিন্তু তাহাতে কি বাস্তবিক তাহাদের অনিষ্ট হইল? কখনই না। দাসত্ব অবস্থায় উদর পুরিয়া দুবেলা খাইয়া ভাল কাপড় পরিয়া ভাল ঘরে থাকিয়া ১০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা স্বাধীন অবস্থায় আধপেটা খাইয়া ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়া ভাঙা ঘরে থাকিয়া ৩৫।৪০ বৎসর বয়সে মরা, নিগ্রোদের মধ্যেই তখন অনেকে শ্রেয় মনে করিয়াছিল। কেননা, দাসত্বের অবস্থায় তাহাদের সুখ বড়-মানুষের সুপুষ্ট ঘোড়া-কুকুরের সুখ; এবং স্বাধীন অবস্থায় তাহাদের দুঃখ স্বাধীন **মানুষের** দুঃখ। পশুর সুখ অপেক্ষা মানুষের দুঃখ শ্রেয়।

বস্তুতঃ, সুখ বা দুঃখ কোনটাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য-স্থল নয়। শ্রেয়ের অন্বেষণ করিয়া শ্রেয়কে লাভ করিয়া মহৎ হওয়া, মানুষের লক্ষ্য। শ্রেয়ের অন্বেষণে ও শ্রেয় লাভে যে আনন্দ, তাহা মানুষের চরম পুরস্কার। এই আনন্দ সুখের মধ্যেও থাকিতে পারে, দুঃখের মধ্যেও থাকিতে পারে। শুনিয়াছি, মহৎ ব্যক্তিরা দুঃখের মধ্যে ইহার নির্ম্মল আভা বেশী দেখিয়াছেন।

আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাইতে পায় না, ছেঁড়া কৌপীন পরে, প্রায় নগ্ন থাকে, ভাঙা কুঁড়েঘরে থাকিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব ঋতুর অসুবিধা ভোগ করে, রোগে বিনা-চিকিৎসায় মারা পড়ে। যাঁহারা তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দিবার, তাহাদের চালে খড় দিবার, তাহাদিগকে রোগের সময় ঔষধ দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা অতি শ্রদ্ধেয় নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় কাজ ও প্রয়োজনীয় কাজ তাহাদিগকে উদ্বোধিত করা। এমন করিয়া তাহাদিগকে জাগাইতে হইবে যাহাতে তাহারা আপনাদের দুঃখকে, পশুর মত সহ্য না করিয়া, মানুষের মত বুঝিতে পারে এবং মানুষের মত স্বয়ং তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কাহারো যদি কোটি কোটি টাকা থাকিত, এবং অসীম দয়া ও দানশীলতা থাকিত, এবং তিনি যদি দেশের সমুদয় গরীব লোকের অশন বসন বাসগৃহ ও চিকিৎসার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন, তাহা একটা বড় কাজ হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা দ্বারা দরিদ্রদের প্রকৃত ও চূড়ান্ত উপকার হইত না। তাহাদের অবস্থা সুপালিত গোরু ঘোড়া কুকুরের মত হইত। গরীবকে খাইতে পরিতে দিতে নিষেধ করা দূরে থাক্, তাহা করা যে আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য, তাহা হাজার বার স্বীকার করিব ও বলিব। কিন্তু মহত্তর ও আবশ্যকতর কাজ যাহা তাহা আমরা ভুলিয়া থাকিব না, এবং অপরকেও ভুলিয়া থাকিতে দিব না। তাহা হইতেছে, উদ্বোধনের কাজ। প্রত্যেক মানুষ নিজের প্রকৃতি জানুন, শক্তি জানুন, দায়িত্ব ও অধিকার বুঝুন; নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া নিজের ও অপর সকলের শ্রেয়ের অনুসন্ধান করুন। মানুষকে নানাপ্রকারে শিক্ষা দিয়া এবং শিক্ষা পাইবার সুযোগ দিয়া তাঁহার মনকে জাগাইতে হইবে। প্রত্যেক মানুষ যখন আপনাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে বুঝিতে পারিবেন, তখন মানবসমাজের কল্যাণ সম্বন্ধে প্রধান ভাবনা চলিয়া যাইবে। আমরা যে আপনাকে চিনি না বুঝি না ও তদনুরূপ আচরণ করি না, ইহাই ত সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়।

পরাজিত হওয়া কি ভারতের বিশেষত্ব ?

একটি কথা আমাদের মনকে পীড়া দেয়, এবং অনেক সময় তাহা অনেকের মনকে অবসন্ন ও নিরাশায় পূর্ণ করে। তাহা বিদেশী দ্বারা ভারতবর্ষের বার বার পরাজয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস এযাবৎ যে-ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাহা পড়িয়া পীড়া, অবসাদ ও নৈরাশ্য অনুভব করাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এইসব ইতিহাস কাহাদের দ্বারা বা কাহাদের বরাত-মত লিখিত হইয়াছে, তাহা'ত মনে রাখিতেই হইবে; অধিকন্তু অন্যান্য দেশের ইতিহাসও পড়িতে হইবে। এখন ত ইউরোপের লোকেরা এবং তাহাদের বংশজাত আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের মালিক। কিন্তু ইউরোপের প্রবলতম জাতিরা কতবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও শাসিত হইয়াছে, তাহা ছোট ছোট ইতিহাস পড়িলেও বুঝা যায়। ইংলণ্ডের কথাই ধরুন। রোমানেরা উহা পরাজিত করিয়া দখল করিবার আগেও প্রাগৈতিহাসিক যুগে উহা অন্যান্য আক্রমণ ও উপদ্রব নিশ্চয় সহ্য করিয়া থাকিবে। কিন্তু রোমান-বিজয়ই ঐতিহাসিক যুগে উহার প্রথম বিজয়। তার পর এংগল্, সাক্সন ও জুটদের দ্বারা বিজয়। তার পর ডেন বা দিনেমারদিগের দ্বারা বিজয়। তার পর নর্ম্ম্যানদিগের দ্বারা বিজয়। তার পর ঠিক্ বিজয় বলিয়া ইংরেজদের নিজের লেখা ইতিহাসে আর কোন বৈদেশিক আক্রমণের উল্লেখ না থাকিলেও, কত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ও বংশীয় রাজা উহার সিংহাসনে বসিয়াছেন, তাহা ইস্কুলের ছেলেরাও জানে। ইংরেজদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আরব, তুর্ক, পাঠান, মোগল, প্রভৃতিদের শাসনকালে ভারতবর্ষের প্রতি মন্দ আচরণের কোনটি বাদ পড়ে নাই; কিন্তু নর্ম্ম্যানদের সময়ে দেশের পূর্ব্বতন অধিবাসী সাক্সনদের কিরূপ দুর্গতি ও অপমান হইয়াছিল, তাহার আভাস মাত্রও স্কুলকলেজ-পাঠ্য অনেক ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় না। স্কটের আইভ্যান্হো উপন্যাস হইতে তাহার কতকটা ধারণা হয়।

আমরাই একমাত্র পরাজিত, পরাধীন, লাঞ্ছিত জাতি নই। পৃথিবীর ইতিহাসে এই দুর্দ্দশা আরও অনেকের ঘটিয়াছে, এবং পরে তাহারা আত্মকর্ত্তা, শক্তিশালী ও

গৌরবান্বিত হইয়াছে। আমরা যদি এই প্রতিজ্ঞা করি, যে, আমরা অধর্ম্ম করিব না, হিংসা করিব না, কিন্তু মানব-অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতেও কোনমতেই রাজী হইব না, অধিকার লাভ করিবই করিব, তাহা হইলে আমরাও নিশ্চয়ই আত্ম-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিব।

আমরা আত্মপ্রতারিত হইয়া অপরকেও আশা-মরীচিকায় পথভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি না। সত্য-বাদী ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে পতন-অভ্যুদয় বহু বহু জাতির ভাগ্যে ঘটিয়াছে। জর্জ বার্ণার্ড শ লিখিয়াছেন—

"The truth is, all nations have been conquered; and all peoples have submitted to tyrannies which would provoke sheep or spaniels to insurrection. I know nothing in the history of India that cannot be paralleled from the histories of Europe. The Pole, whitest, handsomest, most operatically heroic of Europeans, has eaten dirt in the East as the equally romantic Irishman has in the West. Germany has given such exhibitions of helpless political disintegration accompanied by every atrocity of internecine warfare as India at her worst can never hope to surpass. If India is incapable of self-government, all nations are incapable of it; for the evidence of history is the same everywhere."

ভগবানে ও মানব প্রকৃতিতে যাঁর বিশ্বাস ও নির্ভর আছে, তাঁর মনে নিরাশা আসিতে পারে না। তা ছাড়া, সাধারণতঃ, অপর সকলের পক্ষেই জগতের ইতিহাস নিরাশার প্রধান ঔষধ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও দু-একটা কথা আশারই কথা। আসীরিয়ার রাণী সেমিরেমিসের দিগ্‌বিজয় সম্বন্ধে যে-সব কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশ কিম্বদন্তী মাত্র। কিম্বদন্তী এই যে তিনি নানা দেশ জয় করিতে করিতে ভারতবর্ষের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু তথায় পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যদি ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, তাহা হইলে ইহা সেকালের ভারতবর্ষীয় লোকদের স্বদেশরক্ষা-সামর্থ্যের একটা প্রমাণ হইতে পারে। ইহা হইতে এরূপ অনুমানও করা যায়, যে, সেমিরেমিস্‌কে পশ্চিম-এশিয়ার অন্য কোন দেশের লোক বাধা দিতে পারে নাই, কেবল ভারতবর্ষের লোকেরা পারিয়াছিল। পক্ষান্তরে যদি সেমিরেমিসের ভারতবর্ষ হইতে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের কথা গল্পমাত্র হয়, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে, যে, সেকালে ভারত-বর্ষের লোকদের দুষ্পরাজেয়তার খ্যাতি ছিল বলিয়া এরূপ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহা এরূপ ভিত্তি নয়, যে, ইহার উপর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবের একটা উচ্চ সৌধ নির্ম্মাণ করা যায়। দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক আলেগ্‌জান্দারও ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যান। এখানে তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ হয়। তাঁহার ভারতবর্ষীয় অভিযানের গ্রীক বৃত্তান্ত হইতে বেশ বুঝা যায় যে ভারতবর্ষজয় অন্যান্য দেশ জয়ের মত তাঁহার পক্ষে সহজ হয় নাই বলিয়াই তিনি ফিরিয়া যান। তাহার পর দেখা যায়, যে, আরব, তুর্ক, পাঠান, মোগল, প্রভৃতিদের আক্রমণে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইলেও, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার নানা দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্ম যেরূপ একেবারে ধূলিসাৎ হইয়াছিল, এখানে সেরূপ কিছু হয় নাই; বৈদেশিক আক্রমণের পর ভারতবর্ষীয় শক্তি ও সভ্যতা আবার মাথা তুলিয়াছিল।

সত্য, অতীত ভারত বর্ত্তমান ভারত নহে; অতীত ভারতে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতে তাহা সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু, অতীতে যাহা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এসব কথা লিখিতেছি না। আমরা অতীত ইতিহাস হইতে কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই, যে, ভারতীয়েরা "ভূতলে অধম জাতি" নহে, এবং পৃথিবীতে আর যে দেশেরই উন্নতি হউক, একমাত্র ভারতবর্ষেরই উন্নতি হইবে না, এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কারণ নাই। তবে ইহাও ঠিক, যে, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন অবস্থা এবং অন্য-সব জাতিদের সহিত বহিঃসম্বন্ধ, প্রাচীন বা আধুনিক কোন দেশের অবস্থা ও বহিঃসম্বন্ধের মত নহে। সুতরাং ভারতবর্ষের আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের উপায় নির্দ্ধারণে ঐতিহাসিক অন্য কোন দেশে অবলম্বিত উপায় অবিকল নকল করা চলিতে পারে না; যদিও আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য অনুসৃত ও অবলম্বিত মূলনীতি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে একই। সেই মূলনীতি অনুসারে উপায় চিন্তা করিয়া আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে ভারতবর্ষ আত্মিক বলে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিবে, অস্ত্রবলে নহে।

কলিকাতার স্বাস্থ্য।

১৯১৬ সালে যখন কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা হাজার-করা ২৪·৭ হইয়াছিল, তখনই এই কথা অনেক কাগজে বলা হইয়াছিল, যে, গ্রীষ্মপ্রধানদেশে কলিকাতার মত বড় একটা সহরের পক্ষে ইহা প্রশংসার বিষয়। সুতরাং ১৯১৭ সালে মৃত্যুর হার আরও কমিয়া হাজারকরা ২০·৮ হওয়াটা আরও প্রশংসার বিষয়। কিন্তু এই মৃত্যুর হার ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের সহরগুলির তুলনায় খুব বেশী। কলিকাতার লোকসংখ্যা মোটামুটি দশ লক্ষ, লণ্ডনের ৪৫ লক্ষ। কিন্তু লণ্ডনের হার (১৯১৮র হুইটেকারের পঞ্জিকা অনুসারে) ১৫ মাত্র। ইংলণ্ডের শহরের মৃত্যুর হার সর্ব্বোচ্চ, কাম্বারল্যাণ্ড জেলার হোয়াইটহেভনের ২২·৪৯; এবং ওয়েল্‌সের কার্ণার্ভনের হার ২২·৫। স্কটল্যাণ্ডে কেবল ইন্‌ভারবার্ভি নামক একটি ক্ষুদ্র স্থানের মৃত্যুর হার ২৮·১। আয়ার্লণ্ডে সর্ব্বোচ্চ হার ডাবলিন সহরের,—২১·৯। মনে রাখিতে হইবে শীতপ্রধান শিক্ষিত দেশে গ্রীষ্মপ্রধান ও অশিক্ষিত দেশ অপেক্ষা স্বাস্থ্য ভাল হইবারই কথা। তদ্ভিন্ন, সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে খুব টাকার দরকার হয়। কলিকাতা ধনী হইলেও পাশ্চাত্য সহর-সকল অপেক্ষা গরীব। কিরূপ গরীব। তাহা নিম্নোদ্ধৃত তুলনা হইতে বুঝা যাইবে।

"It is usually assumed that, being a great city, a large Indian city is therefore wealthy. The converse is really the case. The average wealth of the units comprising such a city is very low: absurdly low on a Western basis. In Calcutta, for example, the average yield per inhabitant for municipal purposes may be placed at about 12s per head, while in London it is more like £ 5-10s. per head. Yet the requirements per individual, in the matter of water supply, roads, etc., are no less, and in the case of cities subject to tropical rains, the drainage provision must be enormously greater, while the demand upon the sewers in faecal matter is twice as much per head for a rice eater than it is for a meat eater. Again, the 12s. per head, although greatly less than the Londoner's contribution, is an infinitely larger proportion of the average individual wealth. This bed rock question of "ability to pay" is one that greatly affects the possibility of carrying out costly ideals." *The Indian and Eastern Engineer*, July, 1914.

ইহাতে দেখান হইয়াছে যে লণ্ডনে জন-প্রতি গড়ে ৮২॥৹ টাকা মিউনিসিপালিটি পায়, কলিকাতায় গড়ে জন-প্রতি মিউনিসিপালিটি ৯৲ টাকা পায়। অথচ উভয়ত্র রাস্তা, জলের কল, প্রভৃতি সমান সমান চাই; ড্রেনের বন্দোবস্ত কলিকাতায় অধিকতর বারিপাত হেতু বেশী রকম চাই; কলের পায়খানা সম্বন্ধেও, অধিবাসীদের অধিকাংশ খাদ্য শাক ভাত বলিয়া, ঐ কথা খাটে। লণ্ডনের এক একজন ৮২॥৹ দিয়াও তাহার আয়ের যত অংশ দেয়, আমরা ৯৲ দিয়াও আমাদের আয়ের তদপেক্ষা অনেক বেশী অংশ দি। ইহা ইণ্ডিয়ান এণ্ড ঈষ্টার্ণ এঞ্জিনীয়ার নামক একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজচালিত ও ইংরেজাধিকৃত কাগজের মত।

বিলাত অপেক্ষা আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার যে অনেক কম, তাহা বলাই বাহুল্য। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমাদিগকে আরও শিক্ষিত এবং আরও ধনী হইতে হইবে।

কলিকাতার মৃত্যুর হার সম্বন্ধে একটি গুরুতর চিন্তার বিষয় এই আছে, যে, এখানে প্রতি বৎসরই পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মৃত্যুর হার খুব বেশী হয়। ১৯১৭ সালে পুরুষদের হার ছিল ১৯·৭, মেয়েদের ছিল ৩২·১। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাধারণতঃ মেয়েদের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে কম। কেবল সার্বিয়াতে পুরুষের হার ২৩ এবং মেয়েদের ২৪। এটা বেশী তফাৎ নয়। পুরুষদের মৃত্যুর সাধারণতঃ যে-সব কারণ আছে, মেয়েদের মৃত্যুরও সেই-সব কারণ আছে। নারীদের মাতৃত্ব কখন কখন একটি অতিরিক্ত কারণ হয়, যাহা পুরুষদের নাই। কিন্তু সকল দেশেই নারীর সন্তান হয়; সুতরাং এই কারণে কলিকাতায় নারীদের মৃত্যুসংখ্যা বেশী হইবার কথা নয়। কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক দুটি জিনিসে কলিকাতার মেয়েদের অধিক মৃত্যুর আংশিক কারণ পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে নারীরা যেরূপ অল্প বয়সে মাতা হন, অন্য দেশে তদ্রূপ অকালমাতৃত্ব নাই। ইহা একটি কারণ। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের সূতিকাগার ও প্রসব-প্রণালী অনেক স্থলেই যেরূপ কদর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর, এবং সূতিকাগারে, এবং শিশু যতদিন স্তন্য পান করে ততদিন, মাতাকে অনেক স্থলে খাদ্যাদি সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়, তাহাতে অনেক মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মৃত্যু হয়।

খারাপ ঘরে পুরুষও থাকে, স্ত্রীলোকও থাকে। খারাপ বা অযথেষ্ট খাদ্য পুরুষও খায়, স্ত্রীলোকও খায়; অনেক স্থলে পুরুষরা খাইয়া যাহা থাকে, স্ত্রীলোকদের ভাগ্যে তাহাই জুটে। পুরুষরা কিন্তু খোলা জায়গায় বেড়াইতে ও অঙ্গচালনা করিতে পারে; মেয়েরা, পর্দা থাকায়, অধিকাংশ স্থলে বদ্ধ বাতাসে দিবারাত্রি যাপন করে। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হয়। এইজন্য কলিকাতার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর নিম্নলিখিত কথাগুলি আমরা ঠিক বলিয়া মনে করি:—

"Until it is realised that the strict observance of the purdah system in a large city, except in the case of the very wealthy who can afford spacious homes standing in their own grounds, necessarily involves the premature death of a large number of women, this standing reproach to the city will never be removed."

খুব বড় লোকেরাও যে অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের পরিবারস্থ নারীদিগকে আলো-বাতাসের সুবিধা দিতে ব্যগ্র, তাহা বোধ হয় না। মেয়েদের মৃত্যুর প্রধান কারণ ক্ষয়কাশ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া। দিনরাত বদ্ধ দূষিত বায়ুতে থাকিলে যে এ-সব পীড়া জন্মে ও মারাত্মক হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে অধিক মৃত্যুর আর-একটি কারণ, মনঃপীড়া। এই কারণে আমাদের দেশে পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে আত্মহত্যা খুব বেশী। অন্যান্য দেশে কিন্তু নারীদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যেই আত্মহত্যা বেশী।

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য।

১৯১৭ সালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার হাজার-করা কিরূপ ছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

প্রদেশ	জন্মের হার	মৃত্যুর হার	শিশুমৃত্যুর হার
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৬·০৮	৩৭·৯১	২১৫·৭৩
বোম্বাই	৩৫·৭২	৪০.৭৬	২১৬·৬৭
মান্দ্রাজ	৩২·৩৭	২৭·২৩	১৯৩·৯৬
বাংলা	৩৫·৯১	২৬·১৯	১৮৪·৬০
বিহার-ওড়িষ্যা	৪০·৪৫	৩৫·২১	১৮০·৪৩
আসাম	৩১·৩৫	২৭·০৯	১৮[illegible]·২৮
মধ্যপ্রদেশ	৪৮·১৩	৩৬·০৬	২৬৮·৮৫
পঞ্জাব	৪৫·৩৪	৩৭ ৯১	২৫৭·৯৫
ব্রহ্মদেশ	৩৬·২৫	২৫·৩০	২১৩ ১৪
উঃ-পঃ সীমান্ত প্রঃ	৩২·১১	২৯·৯৫	১৮৪·২৭
দিল্লী	৫২·৭৫	৩২·৬৮	২২৪·৮৬

আমাদের দেশের মৃত্যুর হার যে কত বেশী, তাহা সভ্যতম কতকগুলি দেশের মৃত্যুর হার হইতে বুঝা যাইবে। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড ১৪·২, ভারতবর্ষ ৩০·৯, কানাডা ১৫·১২, অষ্ট্রেলিয়া ১০·৫, নিউজীল্যাণ্ড ৯·৫, অষ্ট্রীয়া ২১·৯, বেলজিয়ম ১৫·২, ডেন্‌মার্ক ১৩·৪, ফ্রান্স ১৯.৬, জার্ম্মেনী ১৬·২, ইটালী ২১·৪, জাপান ২১·৯, হল্যাণ্ড ১৪·৫, নরওয়ে ১৩·২, রুশিয়া ২৯·৮।

কেন্দ্রীভূত উচ্চশিক্ষা যথেষ্ট নহে।

বড় বড় সহরে ছাত্রদের খরচ, ছোট ছোট সহরে ও গ্রামে তাহাদের খরচ অপেক্ষা, বেশী। তা ছাড়া, বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারিলে যত কম খরচে হয়, বাড়ী হইতে গিয়া ভিন্ন সহরে বাসা করিয়া থাকিতে গেলে তদপেক্ষা বেশী খরচ হয়। এইজন্য উচ্চশিক্ষা দেশের মধ্যে যত বেশীসংখ্যক সহরে ও গ্রামে দিবার বন্দোবস্ত থাকে, গরীব ছাত্রদের পক্ষে তাহা তত সুবিধাজনক। বাস্তবিক দেশে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র কেবল ২।১ টি হইলে কি ধনী কি দরিদ্র কোন দেশেই শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে না। বিলাত এরূপ ধনী দেশ; তথাপি সেখানে অক্সফর্ড ও কেম্ব্রিজ বা স্কটল্যাণ্ডের পুরাতন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই কাজ চলিতেছে না। আরো নূতন নূতন জায়গায় নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে, এবং ওয়েল্‌স্ প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাও যথেষ্ট মনে হয় নাই। কোন ইস্কুল কলেজে না পড়িয়াও প্রাইভেট ছাত্ররূপে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম হইতে উচ্চতম পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত স্থানসকলের ছাত্রেরা প্রাইভেট-পরীক্ষার্থীরূপে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোন পরীক্ষা দিতে পারে। তাহাতে কোন কুফল হয় নাই, বরং তাহা অনেক অতি দরিদ্র ছাত্রের জ্ঞানলাভের কারণ হইয়াছে। আমেরিকার অবৈতনিক সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয় অনেকগুলি আছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও

বিস্তর। তা ছাড়া, কয়েক বৎসর হইল, গরীব ও মধ্যবিত্ত যুবকযুবতীদের সুবিধার জন্য, প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জন্ত একটি সমিতি হইয়াছে, এবং তদনুসারে ইতিমধ্যেই কতকগুলি ক্ষুদ্র সহরেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারা আমেরিকার কত যে উপকার হইয়াছে, তাহা তথাকার ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ দূত বিখ্যাত লেখক ব্রাইস্ বলিয়াছেন—

"[American Educational Reformers] may not duly realise the services which these small Colleges perform in the rural districts of the country. They get hold of a multitude of poor men, who might never resort to a distant place of education. They set learning in a visible form, plain, indeed, and humble, but dignified even in her humility, before the eyes of a rustic people, in whom the love of knowledge, naturally strong, might never break from the bud into flower but for the care of some zealous gardener. They give the chance of rising in some intellectual walk of life to many a strong and earnest nature who might otherwise have remained an artisan or storekeeper, and perhaps failed in those avocations. They light up in many a country town what is at first only a country farthing rush light, but which, when the town swells to a city,...... becomes a lamp of growing flame. This uncontrolled freedom of teaching, the multiplication of small institutions, have done for the country a work which a few State-regulated Universities might have failed to do. (Bryce's *American Commonwealth*, Vol. II, p. 693.)

আমাদের দেশের ইংরেজ আম্‌লারা, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি কোন কোন দেশীলোক উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র নিতান্ত কম ও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক করিতে চান; তাহার প্রথম ফল হইয়াছে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়। পরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকেও এই অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করা হইতে পারে। কিন্তু ধনী ও সুশিক্ষিত আমেরিকায় লর্ড ব্রাইসের দ্বারা প্রশংসিত শিক্ষা দিবার অবাধ স্বাধীনতা ("Uncontrolled freedom of teaching"এর) যদি দরকার আছে, তাহা হইলে অশিক্ষিত দরিদ্র ভারতবর্ষে উহার শতগুণ প্রয়োজন আছে। ধনী বিলাতের অতিধনী রাজধানী লণ্ডনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যদি সব পরীক্ষা প্রাইভেট ছাত্রদের দিবার অধি-কার থাকা আবশ্যক হইয়াছে, তবে আমাদের গরীব ও অজ্ঞ দেশে তাহার হাজারগুণ দরকার আছে। এক-শ দু-শ ছাত্রকে খুব ভাল শিক্ষা দিবার ওজুহাতে বাকী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছাত্রের পথ দুর্গম করা বা বন্ধ করা, দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট দেশে কতকগুলি লোককে রাজভোগ দিবার অছিলায় বাকী লোককে উপবাসী রাখার সমান।

খাদ্যের অভাব ও শিশুদের মৃত্যু।

এডিনবরা রিভিউ নামক প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিলাতী ত্রৈমাসিকে মিঃ জে, ও, পী, ব্ল্যাণ্ড একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত ভারতবর্ষে শিশুদের অত্যধিক মৃত্যুর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই দেশে গড়ে প্রতিবৎসর সত্তর লক্ষ শিশু অকালে মারা যায়। ইহাকে তিনি মানবজীবনের অপব্যয় বলিয়াছেন। এই মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, যে, অনেক দেশের লোকসংখ্যা এত বেশী যে তথাকার উৎপন্ন খাদ্যে তাহাদের কুলায় না। যে-সব দেশের লোকদের আপনাদের উৎপন্ন খাদ্য স্বদেশে আপনাদের ব্যবহারের জন্য রাখিবার ক্ষমতা নাই, উক্ত দেশগুলি সেইসব দেশ হইতে খাদ্য আম্‌দানী করিয়া জীবন ধারণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি আম্‌দানী-কারক দেশের মধ্যে বিলাতের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং রপ্তানী-কারক দেশের মধ্যে রুশিয়া ও ভারতবর্ষের নাম করিয়াছেন। যথা—

The agricultural production of Great Britain cannot suffice to maintain its present population; who shall say that fifty years hence we shall be able to draw supplies from India and Russia, as we do today, incidentally helping to impose an abnormally high infant mortality on those countries? And who shall say that the social organisation on which the Empire rests will endure even for that period the present stress and strain of economic pressure?"

ভারতবর্ষে যত খাদ্য উৎপন্ন হয়, সমস্তই যদি দেশে থাকিত, তাহা হইলেও সকলের খাইতে কুলাইত কি না সন্দেহ। ধনী দেশসকলকে খাওয়াইয়া যাহা বাকী থাকে, এখন তাহাতে ত কুলায়ই না। লক্ষ লক্ষ লোক সারাজীবন আধপেটা খাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য অর্থনীতি বলিবে, "কেন হে বাপু, তোমাদের যে-সব খাদ্য লই, তা ত ডাকাতি করিয়া লই না, টাকা দিয়া কিনি।" ঠিক বটে। কিন্তু আমাদের দেশের কোটি কোটি লোকদের ঐ খাদ্য কিনিবার টাকা নাই কেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য। তাহারা যথেষ্ট টাকা দিয়া কিনিতে পারিলে ত উহা বিদেশে যাইত না। আমরা নানা দরকারী জিনিস বিদেশীর নিকট কিনি। উহার অধিকাংশ ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা

উৎপন্ন করিতে পারিলে দেশের অনেক টাকা দেশে থাকে, অধিকন্তু ঐসব জিনিসের কতক রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতেও আমরা টাকা আনিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশী-গবর্ণমেণ্ট হইলে দেশে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য দেশে রাখিবার নানা রকম উপায় হইতে পারে।

পাটচাষীর দুরবস্থা।

একজন ইংরেজ ধর্ম্মোপদেষ্টা পাটচাষীদের দুরবস্থা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে কি মনে করেন, তাহা ভাদ্রের প্রবাসীতে উদ্ধৃত ছোটনাগপুরের বিশপ মহাশয়ের লেখা হইতে পাঠকেরা জানিয়াছেন। একদিকে পাটের কলের অংশীরা অত্যন্ত বেশী লাভ পাইতেছে, অন্যদিকে অনেক পাটচাষী অর্থাভাবে প্রায় নগ্ন থাকিতে বাধ্য হইতেছে,—এ অবস্থা যীশুখৃষ্ট কখনও সহ্য করিতেন না, এবং ইহার প্রতীকার দরকার, এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। এখন একজন ইংরেজ বণিক সার্ ডানিয়েল হামিল্টন কি বলেন, শুনুন।

"As the holder of a few jute mill shares, I feel ashamed to look a jute grower in the face. That we should be raking in 100 per cent. dividends while he is on his beam-ends...... does not tally with British ideas of fair-play." "But what the jute growers are suffering now is what the masses of India more or less suffer from the day they take up life's burden till the day they lay it down. It is a condition of things that can be tolerated no longer and it is not a credit to British rule that it has been tolerated so long."

তাৎপর্য্য। "আমার কয়েকটি পাটের কলের অংশ আছে। সেইজন্য পাটচাষীর মুখের দিকে তাকাইতে আমার লজ্জা হয়। আমরা যে একশ টাকার অংশে ১০০ টাকা লাভ খাইব, আর-চাষী বেচারার চরম দুর্দ্দশা হইবে, ইহা ব্রিটিশ ন্যায়পরতার সঙ্গে খাপ খায় না।" "কিন্তু এখন পাটচাষীরা যে কষ্ট সহ্য করিতেছে, তাহা ভারতের সাধারণ লোকেরা অল্পাধিক পরিমাণে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করে। এ অবস্থা আর বরদাস্ত করা যায় না, এবং এতদিন যে ইহা বরদাস্ত করা হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশশাসনের সুখ্যাতির বিষয় নহে।"

কাপড়ের চড়া দাম।

কাপড়ের দাম কিরূপ চড়িয়াছে, তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত ক্যাথলিক হেরাল্ড অব্ ইণ্ডিয়া কাগজ দিয়াছেন। ৮৪ নং ধুতি এক জোড়ার দাম ১৯১৪ সালে ১৸০ ছিল, ১৯১৭তে হয় ৩৲, ১৯১৮র জানুয়ারীতে হয় ৪৲, জুলাইয়ে হয় ৫।০, এবং, আগষ্টে ৭৸০। ১৯১৭তে যে ধুতির দাম ছিল ২।০, তার দাম গত আগষ্ট মাসে ছিল ১০৷৷৵০। ৯১১২ নং মার্কিন কাপড়ের, ৮ গজী থানের দাম ১৯১৪ সালে ছিল ৮৲; ১৯১৭তে উহার দাম হয় ১১ হইতে ১৫ টাকা; ১৯১৭র ডিসেম্বরে দাম হয় ২০; এবং গত আগষ্টে ৩০ টাকা। সী ৪০০০০ নম্বর লংক্লথের থানের দর ১২ হইতে ৫৫ টাকা হইয়াছে। যে মার্কিন কাপড় ১৯১৪ সালে ১৩ টাকা থান ছিল তাহা ১৯১৭ সালে ১৪ হইতে ৩৯ টাকায় বিক্রী হইয়াছে, এবং গত আগষ্টে তাহার দাম ছিল ৪৫ টাকা।

সরকারী ব্যবস্থা।

গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, অনুসন্ধানাদি শেষ করিয়া শীঘ্র ভারতবর্ষের কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে গরীব লোকদের ব্যবহার্য্য একটি নির্দ্দিষ্ট নমুনার কাপড় অল্প লাভে প্রস্তুত করিতে আইন দ্বারা বাধ্য করিবেন। এই কাপড় সর্ব্বত্র অনুমতিপ্রাপ্ত দোকানে বা সরকারী অল্প লাভে বিক্রী হইবে। ইহা করিতে পারিলে যে গরীব লোকদের কতকটা সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কাপড়ের কলওয়ালারা এ বিষয়ে একটা আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "যুদ্ধ উপলক্ষে পাটের কল, কাপড়ের কল, চামড়া কষ করিবার কার্খানা, জুতার কার্খানা, লোহা-ইস্পাতের কার্খানা, প্রভৃতি অনেকেই খুব লাভ করিতেছে; কেবল আমাদেরই লাভ আইন দ্বারা কেন কমান হইবে? আমরা সব বৎসর লাভ পাই না। লোকসানও মাঝে মাঝে দিতে হয়।" ইহা অন্যায় আপত্তি নহে। আমাদের বিবেচনায় কাপড়ওয়ালাদের লাভ যেমন নির্দ্দিষ্ট করা হইবে, তেমনি অন্যান্য ব্যবসায়েরও, যুদ্ধের আগেকার ৫ বৎসরের গড় লাভের অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স বসান উচিত। বিলাতে এইরূপ অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৫০ হইতে ৮০ টাকা গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স স্বরূপ লইতেছেন। এখানে না লওয়া অন্যায় হইতেছে।

গরীব লোকদিগকে কাপড় কিনিতে সমর্থ করিবার দুটি উপায় আছে; এক কাপড়ের দাম কমান, দ্বিতীয়তঃ, তাদের আয় বাড়ান। পাটচাষীদের পাট খুব সস্তা দরে কিনিয়া তাহা হইতে চট আদি প্রস্তুত করিয়া কলওয়ালাদের খুব লাভ হইতেছে। সুতরাং কাঁচা পাটের একটা ন্যায্য দর

বাঁধিয়া দেওয়া মোটেই অন্যায় নহে, এবং আইন দ্বারা এরূপ করা অসম্ভবও নহে। বর্ত্তমান ১৯১৮ সালেই বিলাতে শস্য উৎপাদন আইন (Corn Production Act) দ্বারা ওট এবং গমের ন্যূনতম দর ছয় বৎসরের জন্য আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দেশী কাপড়ওয়ালাদিগকে কম লাভে নমুনামত কাপড় প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা হইবে, অথচ বিলাত হইতে আমদানী কাপড়ের লাভ কমিবে না, ইহাও ন্যায়সঙ্গত নহে।

মাড়োয়ারী বণিকের বদান্যতা।

বেঙ্গলীতে দেখিলাম, কলিকাতার অন্যতম ধনী মাড়োয়ারী বণিক রায় বাহাদুর শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা বঙ্গের পল্লীগ্রাম ও ক্ষুদ্র সহরসকলে গরীবদের মধ্যে এক লক্ষ টাকার কাপড় বিতরণ করিবেন। তাঁহার নিযুক্ত লোকেরা নানাস্থানে দানের উপযুক্ত লোক বাছিয়া কাপড় দিতেছেন। ইঁহার বদান্যতা অতীব প্রশংসনীয়।

উত্তর বঙ্গে বন্যা।

উত্তর বঙ্গে নানাস্থানে বন্যায় লোকের ঘরবাড়ী গোরু বাছুর ভাসিয়া গিয়া বর্ণনাতীত কষ্ট হইয়াছে। ঘরে বসিয়া শুধু কাগজে এসব কথা লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বিপন্ন লোকদের দুঃখ নিবারণের জন্য কিছু করিতে পারিতেছেন!

সিন্ধুদেশে দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্রাভাব।

সিন্ধুদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। বাংলা দেশের ন্যায় সেখানেও বিস্তর লোক কাপড়ের অভাবে প্রায় নগ্ন থাকিতেছে। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে এবং বাঙালীর অন্যান্য বিপদের সময় সিন্ধু দেশের লোকেরা আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। তথাকার করাচী সহরের "নিউ টাইম্‌স্‌" নামক দৈনিক ইংরেজী কাগজের সম্পাদক অন্নকষ্ট ও বস্ত্রকষ্ট নিবারণের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার নিকট সাহায্য প্রেরিত হইতে পারে।

ছাত্রসহায় সমিতি।

এই সমিতি বড় ভাল কাজ করিতেছেন। ইহার সম্পাদক ও অন্য কর্ম্মকর্ত্তারা আমাদের জানা লোক। গত ৭ই আগষ্ট কলিকাতার ওভারটুন হলে অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইহার বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সমিতির সম্পাদক উহার আয়ব্যয়ের হিসাব এবং কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠ করেন। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯১৮ সালের মে মাস পর্য্যন্ত সমিতি সর্ব্বসমেত ৩৪ জন ছাত্রকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১২ জন মাসিক সাহায্য, ২০ জন পরীক্ষার ফীর কিছু অংশ, এবং ২ জন সাময়িক সাহায্য পাইয়াছেন।

সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রগণের আত্মসম্মান যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইজন্য সাহায্য ঋণস্বরূপ দেওয়া হয়। ছাত্রগণ ভবিষ্যতে তাহা সুবিধামত পরিশোধ করিবেন।

ছাত্রগণ নিজেরাই ইহার কার্য্য পরিচালন করেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস, বি-এ, ৬২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে থাকেন। সমিতি সকলেরই উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার যোগ্য।

কিছু মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে সমিতি ছাত্রদের অবসর সময়ে কারুকার্য্য করিয়া রোজ্‌গারের উপায় করিতে পারেন। আমাদের বোধ হয়, ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র ফণ্ড খুলিয়া কর্ম্মকর্ত্তারা মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করিলে ভাল হয়। তাঁহারা যদি এরূপ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমরা যেন জানিতে পারি।

গত বৎসর সমিতির আয় ৫৩৩৸৴০ হইয়াছিল, এবং ব্যয় বাদে ৯৪৸৴৫ হাতে ছিল।

জাভার গুড়চিনি।

ভারতবর্ষের বাজারে জাভার গুড়চিনির প্রথম আবির্ভাব হয় ১৯০৩ সালে। সেই যে আসিয়াছে, তাহার পর যত বৎসর যাইতেছে, তত অধিক পরিমাণে বাজার দখল করিয়া বসিতেছে। অষ্ট্রীয়ার বীটচিনি অপেক্ষা জাভার চিনি প্রথম হইতেই সস্তা ছিল। এখন বীট বাজারে নাই, জাভার খুব সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে চিনি ও গুড় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিবার জন্য একাগ্র ও আন্তরিক চেষ্টা হইতেছে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নিজ অভাব পূরণে সমর্থ করিবার চেষ্টা হইবে —, হইতেছে শুনিতে পাই। তজ্জন্য বিলাতে মিশ্র ভারত-

উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। জামেকা ও ওয়েষ্টইণ্ডীজে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত চিনির কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা প্রায় হইয়া আসিল। অনেকগুলি ব্রিটিশ উপনিবেশের ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধির দিকে তত্তৎদেশের গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের জন্য কি কিছু করা যায় না? এখন ২৫,৫০,০০০ একার জমীতে আকের চাষ হয়; তাছাড়া ১,৭৫,০০০ একার জমীতে গুড়চিনির জন্য খেজুর গাছ আছে। ইহা কি বাড়ান যায় না? কিন্তু বাড়া দূরে থাক, আকের চাষ কমিয়াছে। ১৮৯২ সালে ভারতবর্ষে ২৭,৯৮,৬৩৭ একার জমীতে আকের চাষ ছিল; ১৯১৬-১৭ সালে ২৫,৫২,০০০ একারে ছিল। ২,৪০,০০০ একার কমিয়াছে।

কংগ্রেস্ ও মস্‌লেমলীগের বিশেষ অধিবেশন।

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস্ ও মস্‌লেমলীগের বিশেষ অধিবেশন পরে পরে হওয়ায় উভয় সভার একযোগে কাজ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনে যে-সব প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, তাহা তৎপূর্ব্বে প্রতিনিধিদের নির্ব্বাচিত লোক লইয়া গঠিত সব্‌জেক্‌ট্‌স্ কমিটিতে নির্দ্ধারিত ও লিপিবদ্ধ হয়। এই সব্‌জেক্‌ট্‌স্ কমিটির অধিবেশনে মস্‌লেম্ লীগের পক্ষ হইতে অনেক মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই প্রকারে আগে হইতেই কংগ্রেস ও মস্‌লেম লীগ একযোগে কাজ করেন। ফলে দেখা যাইতেছে, প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কংগ্রেস এবং মস্‌লেম-লীগের নির্দ্ধারণ অনেকটা একই রকমের হইয়াছে। ইহার গুরুত্ব বুঝা দরকার। কতকগুলি "মডারেট" (ইঁহারা আপনাদিগকে ধীরপন্থী বলেন) কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। কিন্তু মস্‌লেমলীগে এরূপ দলাদলি হয় নাই, এবং তাহার কোন ভাঙাদলও হয় নাই। অতএব উহার নির্দ্ধারণ সমগ্র উন্নতিপ্রয়াসী মুসলমানদলের নির্দ্ধারণ বলিতে হইবে। এবং এই নির্দ্ধারণ মোটামুটি কংগ্রেসের বিশেষ অধি-বেশনেরও নির্দ্ধারণ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে উভয় সভার নির্দ্ধারণে সমগ্র উন্নতিপ্রয়াসী মুসলমানদলের মত আছে, সমুদয় তথাকথিত চরমপন্থীদলের মত আছে, এবং তথাকথিত ধীরপন্থী দলেরও এক অংশের মত আছে। এই অংশটি সমগ্র ধীরপন্থী দলের কত বড় বা কত ছোট অংশ তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে কংগ্রেস্ কাহাকেও আসিতে নিষেধ করেন নাই, সকলের জন্যই তাহার দ্বার খোলা ছিল। সুতরাং কেহ যদি বলেন উহা সমগ্র ভারত-বর্ষের আইনসঙ্গত উপায়ে আত্মকর্ত্তৃত্বলিপ্সু লোকদের প্রতিনিধির কাজ করিয়াছে, তাহা হইলে এক অর্থে উহা ঠিক্‌ই বলা হইবে। সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত, যে, মডারেটদিগের যে সব লোক কংগ্রেসে যোগ দেন নাই, তাঁহাদের কন্‌ফারেন্সের মত একটি ক্ষুদ্রদলের মত বলিয়াই গৃহীত হইবে। কারণ, এই কন্‌ফারেন্সে সকলকে যাইতে দেওয়া হইবে না। উদ্‌যোক্তারা যাঁহাদিগকে আহ্বান করিবেন, কেবল তাঁহারাই যাইতে পারিবেন।

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য মহা উৎসাহে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। একদল লোকের প্রত্যাশিত বা আশঙ্কিত বীররস রৌদ্ররস বা বীভৎসরসের আবির্ভাব হয় নাই। প্রতিনিধির সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও অধিক হইয়াছিল। এত প্রতিনিধি আর কোনও অধিবেশনে হয় নাই। সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমাম মহাশয়ের অভিভাষণে সব দলের মধ্যে আপোসে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার ভাব ছিল, কোন দলকে তিনি খোঁচা দেন নাই। অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পাটেল মহাশয়ের অভিভাষণে কিঞ্চিৎ খোঁচা ছিল। দুটি অভিভাষণের মধ্যে এই পার্থক্যের একটা কারণ সহজেই বুঝা যায়। সৈয়দ হাসান ইমাম বেহারের লোক। সেখানে কংগ্রেস লইয়া দলাদলি ও গালাগালি হয় নাই। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পাটেল বোম্বাইয়ের লোক। বোম্বাইয়ে দলাদলি ও গালাগালি খুব হইয়াছে। এই জন্য সৈয়দ হাসান ইমাম সহজেই পর-মত-সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারিয়াছেন, শ্রীযুক্ত পাটেল পারেন নাই। আমরা এ কথা বলিতেছি না, যে, সৈয়দ সাহেব বোম্বাইয়ের লোক হইলে তাঁহার কথায় খোঁচা থাকিত, এবং পাটেলজী বেহারবাসী হইলে তাঁহার অভিভাষণে খোঁচা থাকিত না। আমরা কেবল একটা স্বাভাবিক কারণের উল্লেখ করিলাম। পাটেল মহাশয় চেষ্টা করিলে তাঁহার বিরুদ্ধদলের প্রতি কোনও কটাক্ষ সহজেই পরিহার করিতে পারিতেন, এবং তাহা করা কর্ত্তব্য ছিল। আমরা একা একা কেহ অগ্রসর

হইতে পারিব না। সকলকে লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, তাঁহাদিগকে চটাইবার প্রয়োজন কি? সকলেরই লক্ষ্য এক।

কংগ্রেস ও মস্লেম্‌লীগের অভিভাষণ ও বক্তৃতাগুলির কিম্বা নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলির আলোচনা করিবার স্থান প্রবাসীতে হইবে না। কেবল একটা কথা বলি। উভয় সভাই প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার ব্যবস্থাটিকে অ-সন্তোষজনক বলিয়াছেন। উহা বর্ত্তমান অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাস্তবিক অসন্তোষজনক। কংগ্রেস অধিকন্তু ইহাও বলিয়াছেন, যে, উহা disappointing হইয়াছে,—যাহা আশা করা গিয়াছিল, তাহা পাওয়া যায় নাই। এবিষয়ে দেশের লোকের মত্ কি তাহা বলিতে পারি না। আমাদের ব্যক্তিগত মত এই, যে, আমরা বিশেষ একটা কিছু পাইব বলিয়া কোন কালেই আশা করি নাই; সুতরাং আমাদের আশা পূর্ণ হয় নাই, এরূপ কথা বলিতে পারি না। এখনও নির্দ্দিষ্ট কিছু একটা আশা করিতেছি না, সুতরাং যদি বিলাতী সিডেনহামপ্রমুখ দলেরই জয় হয়, তাহা হইলেও আমরা নিরাশ, হতাশ, বা তদ্রূপ কিছু হইব না। বড়লাট সম্প্রতি তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার শারদীয় অধিবেশনগুলির প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, তিনি সর্ব্বদাই এরূপ ওজন করিয়া কথা বলিয়াছেন, যাহাতে ভারতীয়েরা বেশী কিছু আশা করিয়া না বসেন। আমরা ব্যক্তিগতভাবে বলিতে পারি, যে, তিনি খুব বেশী কিছু আশা দিলেও আমরা উৎফুল্ল হইতাম না; কারণ তাঁহার বক্তৃতা অপেক্ষাও যাহার মূল্য বেশী এরূপ রাজকীয় ঘোষণাপত্র এবং সর্‌কারী দলিলেও ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে আশা দিয়াছে মাত্র, আশা পূর্ণ করিতে পারে নাই।

আমেরিকায় মদ্য উৎপাদন বন্ধ।

আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রসমূহের (U. S. A.) অনেক রাষ্ট্রে আগে হইতেই মদ উৎপাদন ও বিক্রী আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি আইন হইয়াছে যে সমুদয় রাষ্ট্রে আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে মদের সব কার্‌খানা বন্ধ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিরা মদ্যপায়ী জাতি। সেখানে একটি একটি করিয়া নানা দেশে ক্রমশঃ মদ বন্ধ হইতে চলিল। ভারতবর্ষের হিন্দু বা মুসলমানরা প্রধানতঃ মদ্যপায়ী জাতি নহে। এখানে কিন্তু মদ্যপান বাড়িয়া চলিয়াছে, ও তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আব্‌গারী আয়ও বাড়িতেছে। ১৮৭৪-৫ সালে এই আয় ১৫,৬১,০০০ পাউণ্ড ছিল; ১৯১৫-১৬ সালে উহা ৮৪,৯৮,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ পাঁচগুণেরও অধিক হয়। (এক পাউণ্ড মোটামুটি ১৫ টাকার সমান ধরা হয়।) গত বৎসর বড়লাটের সভার অন্যতম মান্দ্রাজী সভ্য শ্রীযুক্ত নরসিংহেশ্বর শর্ম্মা প্রস্তাব করেন যে গবর্ণমেণ্ট বলুন, যে, ক্রমে ক্রমে মদ্য-উৎপাদন ও মদ্য-বিক্রয় বন্ধ করাই গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

ছাত্রদের জন্য মহৎ দান।

বোম্বাইয়ের ধনী বণিক সার্ বিঠলদাস দামোদরদাস ঠাকর্‌সী মহাশয় একটি পাঁচ লক্ষ টাকার ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বজাতীয় গরীব ছাত্রদিগকে পড়াশুনার খরচ দিয়া সাহায্য করা হইবে। সার্ বিঠলদাস ভবিষ্যতে ইহাতে আরও টাকা দিবার ইচ্ছা রাখেন। কোনও ছাত্রকে বার্ষিক চারি শত টাকার অধিক সাহায্য দেওয়া হইবে না। সাহায্য ঋণস্বরূপে দেওয়া হইবে। সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রেরা উপাধি পাইবার পর কিস্তিবন্দী করিয়া ক্রমে ক্রমে ঋণ শোধ করিবেন। বৎসরে ১০০ ছাত্রকে এইরূপ সাহায্য দেওয়া হইবে। এই ফণ্ডের নিয়মাবলী বোম্বাইয়ের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মার কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

আমরা একবার শুনিয়াছিলাম, সার্ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এইরূপ একটি ফণ্ড স্থাপন করিবেন। ঠিক শুনিয়াছিলাম কি না, জানি না। কিন্তু সকল প্রদেশেই এইরূপ ফণ্ডের খুব প্রয়োজন রহিয়াছে।

কলিকাতায় লুট ও রক্তপাত।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী ও বঙ্গের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতায় আবার অনেক দোকান লুট ও দাঙ্গা হইয়াছে। অনেক জন লোক মারা পড়িয়াছে, এবং আহত আরো বেশী লোক হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় মুসলমানদের একটি মহা সভা হইবার কথা হয়। বিরাট মণ্ডপ প্রস্তুত হয়, এবং ভারত-

বর্ষের নানা স্থান হইতে অনেক মুসলমান আসেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া সভা হইতে দেন নাই, এবং দূরাগত লোকদিগকে অবিলম্বে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে খুব উত্তেজনা হয়। এই উত্তেজিত অবস্থার সহিত বক্ষ্যমান উপদ্রবের সম্পর্ক আছে, দৈনিক কাগজ-সকলে উপদ্রবের বৃত্তান্ত পড়িয়া এই ধারণা হয়। অবশ্য মুসলমান সভার উদ্যোক্তাগণ ইহার জন্য দায়ী নহেন, যদিও এখন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের, ধর্ম্মান্ধতা, অতিরিক্ত উত্তেজনা-প্রবণতা ও ইতর লোকদের লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি দূর করা বিষয়ে, গুরুতর দায়িত্ব আছে। ভদ্র ও শিক্ষিত মুসলমানগণের সহিত দাঙ্গার কোন সম্পর্ক নাই। লুটপাট করিবার প্রবৃত্তি যাহাদের আছে, তাহারা কোন একটা উত্তেজনা বা কোন জিনিসের দুর্ম্মূল্যতা, কিম্বা আর কিছু ওজুহাত বা অছিলা পাইলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া অপকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। ইহুদীদের টাকা আছে বলিয়া যেমন ইউরোপের নানা দেশে অশান্তির সময় উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্ত লোকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, কলিকাতায় মাড়োয়ারীদের উপর প্রত্যেক দাঙ্গার সময় আক্রমণও অনেকটা সেই জাতীয়। কারণ যাহাই হউক, এইরূপ লুটপাট, মারামারি, রক্তপাত, ও নরহত্যা প্রাণে বড় বিষাদ ও অবসাদ আনিয়া দেয়। যাহারা লুটপাট খুনাখুনি করে তাহারাও মানুষ ও স্বদেশবাসী, এবং যাহারা হৃতসর্ব্বস্ব এবং হত বা আহত হয়, তাহারাও মানুষ ও স্বদেশবাসী। যাহারা উত্তেজিত ও বিপথচালিত হইয়া গর্হিত কাজ করে, কিম্বা দুর্বৃত্ততাবশতঃ বিনা উত্তেজনায় গর্হিত কাজ করে, তাহাদের খুব শাস্তি হওয়া উচিত; কিন্তু শাস্তি দেওয়াই ত একমাত্র বা চরম প্রতিকার নয়। সুশিক্ষা, সৎসংসর্গ, ও স্বস্বসমাজের এবং সর্ব্বসাধারণের মতের প্রভাব দ্বারা মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চাই। সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ কার্য্যতঃ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া যত দিন বিবেচিত হইবে, ততদিন এইরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা থাকিবে। এইরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণ করিবার ক্ষমতা দেশবাসীর নাই; কিন্তু অপযশ তাহাদেরই হয়, এবং ক্ষতিও তাহাদেরই হয়। অপযশ ও ক্ষতি যাহাদের হয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাহাদের হাতে আসিলে প্রতিকারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের সভা বন্ধ না করিয়া নেতা-দিগকে আবশ্যকমত প্রতিজ্ঞা ও সর্ত্তে বদ্ধ করিয়া সভা করিতে দিলে ভাল হইত মনে হয়। সভা বন্ধ করা হইল শান্তিভঙ্গের ভয়ে, কিন্তু বন্ধ করার পর সেই শান্তিভঙ্গই হইল। শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যে আছে, তাহা গবর্ণ-মেণ্ট জানিতেন; তদনুযায়ী কিছু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন কাগজে দেখিতেছি। কিন্তু উহা যথেষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষের লোকদিগকে রাষ্ট্রীয়কার্য্যে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে; কিন্তু আপাততঃ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য তাহারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার পাইবে না, কারণ ইংরেজ-আম্‌লাদের মতে তাহারা এই কার্য্যের অনুপযুক্ত। কিন্তু ইংরেজ আমলারাও ত শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার রাজধানী কলিকাতায় বড়-বড় দাঙ্গায় নিরপরাধ লোকদের দোকানপাট লুট হইল, নারীর চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও অপমান হইল, মানুষ জখম ও খুন হইল। সত্য বটে, পুলিশ শেষে শান্তি স্থাপন করিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ত বহু ক্ষতি হইয়া গেল, এবং যে বিদ্বেষের আগুন জ্বলিল তাহা নিবিতে কত বৎসর লাগিবে কেহ বলিতে পারে না। ইংরেজ আম্‌লারা বলিবেন, "ক্ষমতা আমাদের হাতে না থাকিয়া তোমাদের হাতে থাকিলে আরও বেশী দাঙ্গা হইত।" কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই, ইহা কল্পনামাত্র হইতে পারে। দেশীয় রাজ্যে ত ইংরেজ আম্‌লাদের হাতে শান্তিরক্ষার ভার নাই। তথায় কি কোথাও কলিকাতার, মৈমনসিংহ জেলার, জামালপুরের, আরা জেলার; অযোধ্যার, এবং পঞ্জাবের কোন-কোন জেলার মত উপদ্রব হইয়া থাকে? এই বিংশ শতাব্দীতে, এই ১৯১৮ সালেই আত্ম-কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট স্বাধীন অনেক দেশে, যেমন আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রে, দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনাখুনি হইয়াছে। কিন্তু সে-কারণে কোন ইংরেজ বলেন নাই যে ঐসব দেশে বিদেশীর পুরা প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের যে-কোন প্রদেশে যখনই দাঙ্গা হয়, তাহার কতক লোক মুসলমান ও কতক লোক হিন্দু হইলেই,

যীশুখ্রীষ্টভক্ত এংলো-ইণ্ডিয়ান অনেক কাগজ এই বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করে, যে, হিন্দুমুসলমানের মিলটা যে কিরূপ অন্তঃসারশূন্য, তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যেন হিন্দু-সমাজের প্রধান প্রধান লোক ও মুসলমান-সমাজের প্রধান প্রধান লোকের নেতৃত্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্ত সম্প্রদায়ব্যাপী একটা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! সত্য কথা এই যে সাধারণতঃ কোন সমাজের অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই লুণ্ঠনাদি করে। আর যদি হিন্দুমুসলমানে বাস্তবিক সমগ্র-সম্প্রদায়ব্যাপী বিরোধই থাকে বা ঘটে, তাহাতে যীশুভক্ত বলিয়া পরিচিত এই লোকগুলা এমন বেহায়ার মত উল্লাস প্রকাশ করে কেন? পৃথিবীর সমুদয় ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ দূর করা। যাহা হউক এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালাদের উল্লাসের একটা নমুনা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ১৭ই সেপ্টেম্বরের এম্পায়ার কাগজে আছে:—

The commentary once again made by the disturbances on the weird and wonderful amity supposed, according to Congress Leagues, to bind Hindu and Moslem together into a nation is too obvious, too significant to need labouring here.

এম্পায়ার-সম্পাদকের মত লোকদের হাতে যদি ভারত-শাসনের ভার থাকিত, তাহা হইলে, তাহারা যখনই হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মিলের লক্ষণ দেখিত, তখনই জোগাড়যন্ত্র করিয়া একটা দাঙ্গা বাধাইয়া, "মিল নাই, মিল নাই", বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিবার একটা সুযোগ সৃষ্টি করিত, এরূপ অনুমান করিলে এম্পায়ার-সম্পাদকের মত লোকের উপর অবিচার করা হয় না।

ভিন্নজা'তের হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এইরূপ একটি আইন করাইবার চেষ্টা করেন, যে, এক জা'তের হিন্দুপুরুষ যদি অন্য জা'তের হিন্দুনারীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই বিবাহ আইনসিদ্ধ হইবে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি নামঞ্জুর হয়। গত পাঁচই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পাটেল কতকটা ঐরূপ আইনের এক পাণ্ডুলিপি বড়লাটের সভায় উপস্থিত করেন। পাটেল মহাশয় হিন্দু। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই আইন সম্বন্ধে বিবেচনা করারই বিরুদ্ধে মত দেন। নন্দী মহাশয় জাতীয় উদার-নৈতিক লীগ (National Liberal League) নামক কলিকাতাস্থ নূতন এক সমিতির একজন মুরুব্বি; সমাজ-সংস্কারও এই লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া শুনিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা যে উদারনৈতিক লীগ, তাতে ত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মহারাজের উদারনীতির পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি মহা বৈষ্ণব। বৈষ্ণবদের মধ্যে ত ভিন্ন ভিন্ন জা'তের কণ্ঠীবদল চলে। মহারাজ সে বিষয়ে কি বলেন? বঙ্গের অন্যতম সভ্য রায় বাহাদুর সীতানাথ রায়ও বিলটি বিবেচনা করিতেও নারাজ। তিনি বলেন, "Government should not be a party to an innovation in the ancient Hindu customs and usages" "প্রাচীন হিন্দু প্রথা ও রীতিতে নূতন কিছু প্রবর্ত্তনের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব থাকা উচিত নয়।" সীতানাথ বাবু হিন্দুদের প্রাচীন প্রথার খুব খবর রাখেন দেখিতেছি। প্রাচীন হিন্দুসমাজে অনুলোম বিবাহ ত ছিলই, প্রতিলোম বিবাহও ছিল। ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু জা'তের মধ্যে বিবাহ এখনও নেপালে, সিকিমে ও দার্জিলিঙে চলিতেছে। হিন্দু-রাজার অধীন বড়োদা ও ইন্দোর রাজ্য দুটিতে ভিন্ন জা'তের হিন্দুদের মধ্যে বিবাহকে বৈধ করিবার জন্য আইন হইয়াছে।

জাতীয় উদারনৈতিক লীগের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে, বিলটির নীতির সহিত তাঁহার সীম্প্যাথি (অর্থাৎ হাম্‌দর্দী বা সহানুভূতি) আছে; কিন্তু তিনি বিল্-পেশ্‌কারীকে উহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন, কারণ উহা সময়োপযোগী নয়। উহাতে আন্দোলন ও বাদপ্রতিবাদের উৎপত্তি হইবে, অতএব উহা এখন ফেলিয়া দেওয়া উচিত। শাসনসংস্কার-প্রস্তাব অনুযায়ী নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে তখন সেখানে উহা উপস্থিত করা উচিত। তবু ভাল যে সুরেন্দ্রবাবু সীম্প্যাথি দেখাইয়াছেন। এই সীম্প্যাথি কথাটি ইংরেজ আম্‌লারা খুব ব্যবহার করেন, এবং আমাদের নানাপ্রকার দাবী দাওয়া সম্বন্ধে বলেন, যে, এটা ঠিক্ সময় নয়। সুরেন্দ্রবাবু জীবনটা কাটাইলেন আন্দোলন করিয়া। তাঁহার আন্দোলন-ভীতিটা বেশ উপভোগ্য! বর্ত্তমানক্ষেত্রে কিন্তু

আন্দোলনটা হইলেও রাজনৈতিক হইবে না, সামাজিক হইবে; এবং তাহা হইতে যে কোন আশঙ্কার কারণ নাই, তাহা গবর্ণমেণ্টের বিলটি বিবেচনা করিতে অনুমতি প্রদান হইতেই বুঝা যাইতেছে।

আরও কোন্ কোন্ সভ্য কি বলিলেন, তাহার আলোচনা করিব না। কেবল এই বলিতে চাই যে বোম্বাইয়ের হিন্দু পাটেল উহা উপস্থিত করেন, মধ্যভারতের হিন্দু খাপার্দে উহা বিবেচনা করিবার সমর্থন করেন, মান্দ্রাজের হিন্দু শ্রীনিবাস শাস্ত্রী উহা বিবেচনা করিবার সপক্ষে মত দেন, আগ্রা-অযোধ্যার হিন্দু (কাশ্মীরী) ব্রাহ্মণ তেজবাহাদুর সাপ্রু সাগ্রহে উহা সমর্থন করেন এবং ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম বা সমাজ বিপন্ন হইবে এই আশঙ্কাকে উপহাস করেন, এবং মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত শর্ম্মা বিলের ভিত্তি-ভূত নীতিটি গ্রহণীয় বলেন কিন্তু ইহার আমূল পরিবর্ত্তনের আবশ্যক বলেন ও ইহা নূতন ব্যবস্থাপক সভা হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন। ইহা হইতে মনে হইবে যে সমাজসংস্কার বিষয়ে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্ত কোন কোন প্রদেশ হইতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী।

আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, তথাকথিত সমুদয় মডারেট ইহার সপক্ষে, বা তথাকথিত সমুদয় এক্‌স্ট্রীমিষ্ট ইহার বিপক্ষে মত দেন নাই। তথাকথিত এক্‌স্ট্রীমিষ্ট পাটেল ও খাপার্দে এবং তথাকথিত মডারেট সাপ্রু ও শাস্ত্রী ইহার সপক্ষে, আবার তথাকথিত এক্‌স্ট্রীমিষ্ট আয়াঙ্গার ও তথাকথিত মডারেট নন্দী, রায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, শুকুল, মালবীয় প্রভৃতি ইহার বিরুদ্ধে। এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কারণ এই যে কলিকাতার, পুনার ও বোম্বাইয়ের অনেক ব্রাহ্ম ও সমাজসংস্কারক মনে করেন যে তথাকথিত "চরমপন্থী" হইলেই সে ব্যক্তি সমাজসংস্কারবিরোধী হইবে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে মহারাষ্ট্রের প্রধান তথাকথিত "চরমপন্থী" বালগঙ্গাধর টিলকের ইংরেজী সাপ্তাহিক মহ্‌রাট্টা ভূপেন্দ্রবাবুর বিলের সমর্থন করিয়াছিল। হিন্দুসমাজের বর্জ্জননীতির অপকারিতা যে-কোন রাজনীতিজ্ঞ বুঝেন, তিনি "ধীরপন্থী"ই হউন আর "চরমপন্থী"ই হউন, ভিন্ন ভিন্ন জা'তের হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ আইনসঙ্গত বলিবার সপক্ষে শুধু রাজনৈতিক কারণেই তিনি মত দিবেন।

প্রস্তাবিত আইনটি কাহাকেও ভিন্ন জা'তে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে চাহিতেছে না। ইহা কেবল বলিতেছে, কোন হিন্দু নিজে যে জাতের, তাহা হইতে স্বতন্ত্র অন্ত কোন জা'তে সে যদি বিবাহ করে, 'তবে তাহা আইনতঃ সিদ্ধ হইবে' অর্থাৎ তাহার স্বামী বা পত্নী বৈধ স্বামী বা পত্নী বিবেচিত হইবে, এবং তাহাদের সন্তানেরা বৈধ সন্তান বিবেচিত হইবে। হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে সমাজচ্যুত জাতি-চ্যুত করিতে পারেন, তাহাদের হুঁকা বন্ধ করিতে পারেন, ধোবানাপিত বন্ধ করিতে পারেন, তাহাদের সঙ্গে আহার এবং ঔদ্বাহিক আদানপ্রদান বন্ধ করিতে পারেন। এইসব সামাজিক অধিকারে প্রস্তাবিত আইনটি হাত দিতে চাহিতেছে না। ইহা কেবল মানুষকে বিবাহ বিষয়েও কিছু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিতে চাহিতেছে। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে পাইবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চলিয়াছে, সামাজিক বিষয়েও সেই স্বাধীনতাই চাওয়া হইতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মানে এই, যে, যতক্ষণ না অন্যের কোন অনিষ্ট করি, অন্যের ন্যায্য অধিকারে যতক্ষণ না হাত দি, অন্যের স্বাধীনতায় হাত না দি, ততক্ষণ আমি আমার যাহা ভাল বোধ হয় তাহা করিতে পাইব। মানুষের প্রকৃতি একটা অখণ্ড জিনিস; ইহাতে আলাদা আলাদা কক্ষ নাই। চিন্তা ও কার্য্যের কোনও ক্ষেত্রে তাহাকে আত্মকর্তৃত্ব দিলে অন্য সব ক্ষেত্রেও তাহাকে এই অধিকার দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মানুষকে যদি বাস্তবিক স্বাধীনতা দিতে চাও, আত্মকর্তৃত্ব দিতে চাও, তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মে, সামাজিক বিষয়ে, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে,—সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া তবে সংস্কারকার্য্যে হাত দিও। তাহাকে ধর্ম্মবিষয়েও সামাজিক বিষয়ে দাস রাখিয়া যদি কেবল রাজনীতিতে স্বাধীন করিতে চাও, তাহা হইলে হয় এই চেষ্টা সফল হইবে না, নয় সে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া অন্য সব বিষয়েও স্বাধীন হইতে চাহিবে। যাহাকে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে দাস করিয়া রাখিতে চাও, সে নামে রাজনৈতিক অধিকার পাইলেও কাহারো না কাহারো দাস হইয়া পড়িবেই। মানুষকে একদিকে খাট করিয়া রাখিলে, সে অন্য সব দিকেও খাট হইবে। যাহারা এরূপ

আইনে আপত্তি করিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন জা'তের হিন্দু পুরুষনারীর অবৈধ সম্বন্ধে বাধা দিতে তাঁহারা অক্ষম। এমন অনেক অসাধু হিন্দু পুরুষের কথা তাঁহারা জানেন যাহারা এইপ্রকার অবৈধ সম্বন্ধ সত্ত্বেও সমাজে সম্মান পাইতেছে। ইহার প্রতিকার করিতে তাঁহারা চান না বা পারেন না। কিন্তু তাঁহারা আপত্তি করিতেছেন কোথায়? না, যেখানে পুরুষটি সাধুভাব-প্রণোদিত হইয়া, নারীকে সমাজের চক্ষে হেয় করিতে না চাহিয়া, তাঁহাকে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সন্তানগণকে মানবসমাজে বৈধ ও সম্মানার্হ একটি স্থান দিতে চাহিতেছেন। একজন পুরুষ যে নারীকে বিবাহ করিতে চায়, সমাজ তাহাকে বিবাহ করিতে দিবে না, তাহার সহিত মিলিত হইলে তাহার নামে দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ দিবে, কিম্বা বলিবে, তুমি যদি এই বিবাহ করিতে চাও ত অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ কর, ইহা যেমন অত্যাচার, তেমনি অদূরদর্শিতা।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, কত বিদেশী জাতিকে, কত হূণ শক তাতারকে, হিন্দুসমাজ হজম করিয়া আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে, অগণিত বর্ণসঙ্করকে স্থান দিয়াছে। হিন্দুজাতি তখন প্রকৃত শক্তিশালী ছিল, না, এখন শক্তিশালী? আর-সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ছাড়া অন্য উপায়েও সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু হিন্দুসমাজে এইসব উপায়ে বৃদ্ধি ত নাই-ই, অধিকন্তু বর্জ্জন-নীতির অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব। দুরাত্মা দুর্ব্বৃত্ত নরাধম-দিগকেও বর্জ্জন না করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা সকল জীবন্ত জাতি করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা মানব-জীবনের অপচয় নিবারিত হইতেছে, এবং সমাজের স্বাস্থ্য-বিধান ও বলবৃদ্ধি হইতেছে। হিন্দুসমাজ যদি নরাধমদিগকে সুপথে আনিবার চেষ্টা না করিয়া বর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলেও ভাবিতাম যে কতকগুলা দুষ্ট লোক বাদ পড়িল। কিন্তু তাহা ত হইতেছে না; অনেকানেক অতি পামর যেন শিরোমণি অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এমন অনেককে হিন্দুর অনেক প্রতিনিধি হিন্দু বলিতে ও হিন্দু-সমাজে স্থান দিতে চাহিতেছেন না, যাহারা চোর জালিয়াৎ প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী ব্যভিচারী নেশাখোর নয়, যাহারা ধর্ম্মমতে অহিন্দু নয়, এবং যাহাদের একমাত্র "অপরাধ" এই যে তাহারা সামাজিক একটি প্রধান ব্যাপারে আত্ম-কর্তৃত্ব চায় কিম্বা অধুনা প্রচলিত সংকীর্ণ দেশাচারের পরি-বর্ত্তে পূর্ণমাত্রায় পুরাকালের হিন্দুপ্রথা অবলম্বন করিতে চায়।

প্রস্তাবিত আইনটি যে নিখুঁত তাহা আমরা বলিতেছি না। ইহাতে আরো কিছু যোগ করা দরকার, ও ইহা বদলান দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, ইহাতে এরূপ ব্যবস্থা থাকা চাই, যে, কাহারও এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে সে ভিন্নজাতির আর-এক স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহা এই আইন অনুসারে সিদ্ধ হইবে না, এবং কেহ এই আইন অনুসারে ভিন্ন জা'তের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে ঐ স্ত্রী জীবিত থাকিতে আবার বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে এবং বিবাহকারী দণ্ডিত হইবে। এরূপ ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন এই, যে, ভিন্ন জা'তে যে পুরুষ বিবাহ করিবে, তাহার উপর সামাজিক ও পারিবারিক উৎপীড়ন হইবার খুব সম্ভাবনা। এই উৎপীড়নে পরাজয় মানিয়া অনেকের ভিন্ন-জা'তের স্ত্রীকে ছাড়িয়া আবার স্বজাতিতে বিবাহ করিয়া "সাধু" সাজি-বার প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাহাতে বাধা থাকা উচিত।

হিন্দুসমাজ বলেন, "আমাদের খাওয়া, বসা, শোওয়া, বিবাহ করা, চাষ করা, বাণিজ্য করা, সবই ধর্ম্মের অঙ্গ, এবং ধর্ম্মের সহিত অনুস্যূত।" ইহা বেশ ভাল কথা। তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার চেষ্টা এবং তাহা পাওয়াও ধর্ম্মের অঙ্গ। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের মানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক মানুষের আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক মানুষের বিচার করিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার স্বীকার করা। এবং এই অধিকার হিন্দুসমাজের নেতারাও চাহিতেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের আত্মকর্তৃত্ব হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত বলিতে হইবে। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্বের পরিবর্ত্তে সামাজিক মতের ও দেশাচারের অন্ধ অনুবর্ত্তিতা-কেই হিন্দুধর্ম্ম বলা হইতেছে। দাসত্ব ও স্বাধীনতা, আত্মকর্তৃত্ব ও অন্ধ অনুবর্ত্তিতা, দুই-ই কেমন করিয়া একই ধর্ম্মের অঙ্গ হইবে?

যুদ্ধের কথা।

যুদ্ধের বিষয়ে আমরা প্রায়ই কিছু লিখি না। উহা আমরা বুঝি না। মোটের উপর এই বলিতে পারি,

ফ্রান্স জয়ী হইয়া নিজ দেশের পরাধিকৃত অংশ ফিরিয়া পাইলে, বেলজিয়মের জয় হইয়া উহার সর্ব্বত্র বেলজিয়ান-দের স্বাধীনতা স্থাপিত হইলে, সার্বিয়া মন্টিনিগ্রো প্রভৃতি স্বাধীনতা পাইলে, এবং ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ও আমেরিকার জয় হইয়া ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্ব-জাতির আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা সুখী হইব। ব্রিটিশজাতি ও মিত্রজাতিরা এইসব উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতে-ছেন, বার বার বলিয়াছেন। হাজার হাজার মানুষের হত্যার বৃত্তান্ত পড়িতে ভাল লাগে না। শান্তি প্রার্থনীয়। কিন্তু কবে শান্তি স্থাপিত হইবে কেহ বলিতে পারে না।

"ব্রাহ্মণ-রাজত্ব।"

এংলোইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালারা, মান্দ্রাজের ডাক্তার নায়ারের দলের লোকেরা, এবং বিলাতের লর্ড সিডেনহামের মত লোকেরা একটা ধুয়া তুলিয়া দিয়াছে যে ভারতবর্ষে স্বরাজ বা হোমরুল প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা কার্য্যতঃ "ব্রাহ্মণ-রাজত্ব" হইবে, এবং ব্রাহ্মণরা আর-সব লোকদের উপর অত্যাচার করিবে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তথাপি তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যা ৩১,৫১,৫৬,৩৯৬; তার মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা মোট ১,৪৫,৯৮,৭০৮। অর্থাৎ সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে দেড় কোটিরও কম ব্রাহ্মণ। শুধু সংখ্যাতেই কিছু আসে যায় না। বাহুবলে, ধনবলে, বিদ্যাবুদ্ধিবলে, প্রভুত্ব স্থাপিত হয়; সুতরাং এগুলিও বিবেচনা করিবার বিষয়। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণরা একমাত্র যোদ্ধাজাতি বলিয়া কিম্বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাজাতি বলিয়া পরিচিত নহে। বর্ত্তমান সময়ে দুই একটি প্রদেশের কোন কোন উপজাতির ব্রাহ্মণ ছাড়া যোদ্ধা বলিয়া ব্রাহ্মণদের খ্যাতিই নাই। তাহার পর ধনের কথা। ব্রাহ্মণরা ধনশালিতার জন্য কোন কালেই বিখ্যাত ছিল না, এখনও নহে; তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধনী জাতি ত নহেই, অন্যতম ধনীজাতিও নহে। সুতরাং বিদ্যার কথাই বিশেষভাবে বিবেচ্য। ব্রাহ্মণরা লেখা পড়া জানে, উকীল ডাক্তার হয়, বড় বড় চাকরী করে, প্রধানতঃ এই কারণেই ভারতশত্রুরা এই অমূলক কথা প্রচার করিয়াছে যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণরাজত্বে পরিণত হইবে। কিন্তু এ বিষয়েও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ভারতব্যাপী নহে। সমগ্র ভারতবর্ষে লিখনপঠনক্ষম লোকের মোটসংখ্যা ১,৮৫,৩৯,৫৭৮। ইহার মধ্যে লিখনপঠনক্ষম ব্রাহ্মণদের মোটসংখ্যা ২৩,৩৫,১২২। অর্থাৎ ১৮৫ লক্ষের মধ্যে ২৩ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ। এখানেও কথা উঠিতে পারে, যে, শুধু লিখিতে পড়িতে জানিলেই ত হয় না, প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে ইংরেজী জানা চাই। এখন দেখা যাক্, সমগ্র ভারতে ইংরেজী-জানা লোক কত, এবং তার মধ্যে কতজন ব্রাহ্মণ। ভারতবর্ষে সমুদয় ইংরেজীজানা লোকের সংখ্যা ১৬,৭০,৩৮৭। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩,৩৩,৩৬৮। অর্থাৎ প্রায় ১৭ লক্ষের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৩ লক্ষ।

কোন প্রদেশেরই অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণ নহে; এমন কি, প্রত্যেক প্রদেশেই সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের চেয়ে বড় এক বা একাধিক অন্য হিন্দুজাতি আছে। কোন্ জা'তের শতকরা কত লোক লেখাপড়া জানে, তাহার দ্বারাও জা'ত-গুলির প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। শিক্ষায় কোন্ জা'ত কত অগ্রসর তাহা দেখাইবার জন্য সেন্সস্ রিপোর্টে প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান প্রধান জা'ত-দের শিক্ষায় শ্রেষ্ঠতা অনুসারে উল্লেখ আছে। তাহাতে দেখা যায়, আসামে, বালুচিস্থানে, ব্রহ্মদেশে, ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণরা এত অনগ্রসর বা অল্পসংখ্যক যে তাহাদের উল্লেখই নাই। বাংলা, বিহার ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, পাঞ্জাব এবং আগ্রা-অযোধ্যায় ব্রাহ্মণরা প্রথম স্থানীয় নহে। কেবলমাত্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ব্রাহ্মণরা শিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও আবার গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশে ব্রাহ্মণরা শিক্ষায় প্রথমস্থানীয় নহে।

এখন এক-একটি প্রদেশ ধরিয়া দেখা যাক্, তথায় মোট লিখনপঠনক্ষম এবং মোট ইংরেজী-জানা লোক কত, এবং লিখনপঠনক্ষম ও ইংরেজীজানা ব্রাহ্মণই বা কত।

প্রদেশ	মোট লেখা-পড়া জানা লোক	লেখাপড়া জানা ব্রাহ্মণ	মোট ইংরেজী জানা	ইংরেজী জানা ব্রাহ্মণ
আসাম	৩২৬৫৬৬	৪০৩৫৯	৫৫২৯৬	৬০৯২
বাংলা	৩৫২২০৪৪	৪৭২৩৪২	৪৯৪৪৯৯	১২৯২২৩
বিহার-ওড়িশা	১৪১৯১৩৮	২৫৬৩৩২	৭৯১৮২	১২৪২৩
বোম্বাই	১৩৭২৮২৬	৫৯৭৯৮	২০২৪৫৪	১০৮১৮
মধ্যপ্রঃ-বেরার	৪৯৬২৩৬	১০৭৭৯৬	৪৬১০২	১৬২০৯
মান্দ্রাজ	৩০৯৩১৬০	৪০৮৬২৬	২৭৪৬২৫	৯৩৭৪৮
পঞ্জাব	৭৭৪৮৪৫	১১৪৮৫৩	১০৯১০১	১১৫৬৪
আগ্রা-অযোধ্যা	১৬১৮৪৬৫	৫৫১৫৭৮	১৩৬৬১৬	২০২০৯

[এই তালিকায় ব্রহ্মদেশ ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের উল্লেখ করা হয় নাই; কারণ তথায় ব্রাহ্মণরা সংখ্যায় ও শিক্ষায় নগণ্য।]

উপরের তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে, যে, কোন প্রদেশেরই অধিকাংশ লিখনপঠনক্ষম লোক বা ইংরেজী-জানা লোক ব্রাহ্মণ নহে।

যখন ভারত গবর্ণমেণ্টে এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহে দেশের লোকদের মত অনুসারে কাজ হইবে, অর্থাৎ ঐসব গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকদের নিকট দায়ী হইবে, তাহার অর্থ এই হইবে যে দেশের লোকদের প্রতিনিধিগণ যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তদনুসারে কাজ হইবে। দেশের এই প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন, ভোটার অর্থাৎ নির্ব্বাচকগণ। নির্ব্বাচন-ক্ষমতা সকলে পাইবেন না। প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মধ্যে কে কিরূপ ট্যাক্স দেয়, তাহা বিবেচনা করিয়া বা কে শিক্ষা পাইয়াছে বা না পাইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া, কিম্বা এই উভয় প্রকারের সম্মিলিত যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া, কতকগুলি লোককে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে। এক কথায়, নির্ব্বাচনের অধিকার আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষা এই উভয় প্রকার যোগ্যতা দেখিয়া দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে, ব্রাহ্মণরা সংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, কিম্বা শিক্ষা, কোন দিক্ দিয়াই সমগ্র দেশে বা কোন প্রদেশে প্রধান স্থান পাইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি যে-ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণদিগকে বাদ দিবার চেষ্টাও হয় নাই, কিম্বা তাহাদের প্রতি পক্ষপাতিতা করিয়া বেশী সংখ্যায় ব্রাহ্মণপ্রতিনিধি ঢুকাইবার চেষ্টাও হয় নাই। ভবিষ্যতে এই নীতি পরিবর্ত্তিত হইবে না, যদিও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে। এখন দেখা যাইতেছে, কোন ব্যবস্থাপক সভাতেই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য নাই। বড়লাটের সভায় ২৭ জন নির্ব্বাচিত সভ্যের মধ্যে ৭ সাত জন মাত্র ব্রাহ্মণ; গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ৩১ জন সভ্যের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রত্যেকটিতে কতজন ব্রাহ্মণ সভ্য আছে, দেখান নিষ্প্রয়োজন, অধিকাংশ সভ্য কোথাও ব্রাহ্মণ নয়। বঙ্গে ২৮জন নির্ব্বাচিত সভ্যের মধ্যে ৫জন ব্রাহ্মণ, ১৬জন গবর্ণমেণ্ট-মনোনীত সভ্যের মধ্যে দুজন ব্রাহ্মণ। সকল প্রদেশের চেয়ে মান্দ্রাজেই ব্রাহ্মণদের প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু সেখানেও ২১ জন নির্ব্বাচিত সভ্যের মধ্যে নয় জন ব্রাহ্মণ, এবং ২০ জন গবর্ণমেণ্ট-মনোনীত সভ্যের মধ্যে ২ জন ব্রাহ্মণ।

আমরা সকল দিক্ হইতে দেখাইলাম যে "ব্রাহ্মণত্ব" স্থাপিত হইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। সুতরাং উহা ভারতশত্রুদের স্বার্থপরতা ও দুরভিসন্ধি-প্রসূত কল্পিত বিভীষিকা মাত্র।

কিন্তু যদি এমন হইত, যে, ভারতবর্ষকে আত্ম-কর্তৃত্ব দিলে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য হইত, তাহা কি এমনই একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার হইত? ইংলণ্ডেও ত বহুশতাব্দী ধরিয়া উচ্চশ্রেণীর লোকদের প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও শ্রমজীবী-দলের অভ্যুদয় সত্ত্বেও উচ্চশ্রেণীর লোকদের প্রাধান্য রহিয়াছে। সার্ জন্ রীজ্ বরাবর ভারতীয়দিগের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির বিরুদ্ধে কথা বলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি পর্য্যন্ত বিলাতের অন্যতম ভারতশত্রু কাগজ মর্ণিং পোষ্টে লিখিয়াছেন:—"Were there no Whig oligarchies in Britain? Will a stage be skipped in India?......Why jib so at the oligarchy? Wait till the masses object."

ভারতবর্ষের যুদ্ধব্যয় বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষ নিজের সাধারণ যুদ্ধব্যয় বরাবর দিয়া আসিতেছে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের নিকট হইতে দেড়শত কোটি টাকা "স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান" বলিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে স্বশাসক ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে বিলাতের গবর্ণমেণ্ট তিন শত তের কোটি টাকা ধার দিয়াছেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাজস্ব-মন্ত্রী মেয়ার সাহেব বড় লাটের সভায় প্রস্তাব করেন, যে, তিন বৎসর ভারতবর্ষকে আরও অতিরিক্ত যুদ্ধব্যয় স্বরূপ মোটামুটি ৬৮ কোটি টাকা দিতে হইবে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ আরও বেশী রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশসাম্রাজ্যে উচ্চতর স্থান দাবী করিতেছে। অতএব তাহাকে সাম্রাজ্যের ব্যয়ভারেরও

অধিকতর অংশ বহন করিতে হইবে। কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু আমরা বলি, আগে আমরা কিরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাই, এবং কিরূপ উচ্চতর স্থান পাই, তাহা দেখি; তাহার পর, অধিক খরচ দিতে হইবে, বলিলে ভাল হইত না? অধিকতর স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যে উচ্চতর স্থান পাইবার আগেই, তাহার অগ্রিম মূল্য চাওয়া ইংরেজের তরফ হইতে ভাল ব্যবসা হইলেও আমাদের দিক্ হইতে সওদাটা ঠিক্ হইল বলিয়া মনে হইতেছে না। আমরা এ প্রসঙ্গে বাণিজ্যিক কথা তুলিতাম না; কিন্তু মেয়ার সাহেব বেশী খরচ চাহিবার কারণ যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে ব্যবসার কথা তুলিতে হইল। স্বশাসক ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি অনেক দিন হইতে স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যে উচ্চস্থান ভোগ করিয়া আসিতেছে। তাহারা পাইয়াছে তিন শত তের কোটি টাকা ঋণ; এবং আমরা পরে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও উচ্চস্থান পাইতে পারি বলিয়া আমাদের নিকট হইতে ১৫০ কোটি লওয়া হইয়াছে এবং আরও ৬৮ কোটি লওয়া হইবে!

"বলা বাহুল্য, আমাদের দিবার সামর্থ্য নাই। যে দেশের অধিকাংশ লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, এবং যাহার মৃত্যুর হার খুব বেশী, সেখানে আরও ট্যাক্স বসান উচিত নয়। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত-গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছে, যে, যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ আরও ৬৮ কোটি টাকা ভারতবর্ষ হইতে লইলে যুদ্ধের পরেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিশিল্পাদির উন্নতি প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট টাকা বহুকাল পাওয়া যাইবে না। অথচ ইংলণ্ডের পক্ষে এই ৬৮ কোটি টাকা বড় বেশী নয়; ইহা চারিদিনের যুদ্ধব্যয় মাত্র।

মেয়ার সাহেব বলিয়াছেন বটে যে এরূপ কোন ট্যাক্স বসান হইবে না যাহাতে গরীবদের উপর চাপ পড়ে; তিনি আরও বলিয়াছেন যে যুদ্ধহেতু যে-যে ব্যবসাতে অতিরিক্ত লাভ হইতেছে সর্ব্বাগ্রে সেই অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স বসান হইবে। কিন্তু ট্যাক্স যাহার উপরই বসান যাক্, কিছু চাপ গরীবদের উপর পড়িবেই। এবং শ্রীযুক্ত শর্ম্মা যখন এই সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, যে, "মেয়ার সাহেবের প্রস্তাব এই সর্ত্তে গৃহীত হউক যে অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স ছাড়া আর কোন ট্যাক্স বসান হইবে না," তখন মেয়ার সাহেব তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, অমন করিয়া গবর্ণমেন্টের হাত পা বাঁধিয়া দেওয়া উচিত নয়। পাটের কলওয়ালা প্রভৃতি ব্যবসাদারেরা চারি বৎসর ধরিয়া অতিরিক্ত লাভ খাইয়া আসিতেছে। এখন আর সম্ভবতঃ এক বৎসর যুদ্ধ চলিবে। মোট পাঁচ বৎসর খুব লাভ খাইয়া এক বৎসর তাহার উপর ট্যাক্স দেওয়া বেশী বাহাদুরী নয়। অথচ বড় লাটের সভায় ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধিরা অতিরিক্তলাভের উপর ট্যাক্স্ বসাইবার প্রস্তাবে এমনভাবে সম্মতি দিয়াছেন, যেন তাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য অতি মহান স্বার্থত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদের জানা উচিত, তাঁহারা যে-ট্যাক্স দিয়াছেন বা দিবেন, তাহা উদ্বৃত্ত প্রাচুর্য্য হইতে, এবং গরীব ভারতবাসীরা যে ট্যাক্স দেয় তজ্জন্য তাহারা প্রায় নগ্ন থাকিতে বাধ্য হয়, ভাত কম খায়, নুন কম খায়, শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকে এবং রোগের সময় প্রয়োজনমত ঔষধপথ্য পায় না।

গবর্ণমেন্ট ৬৮ কোটি টাকা লইবার প্রস্তাব করিয়া তাহা গ্রহণ করা না-করার দায়িত্ব চতুরতাপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত সভ্যদের উপর ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কৌশল হিসাবে ইহা বেশ; কিন্তু ইহাতে নির্ব্বাচিত সভ্যদিগকে সঙ্কটে ফেলিয়া তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ঠিকই বলিয়াছিলেন যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেহ ভোট দিলে মনে করা হইবে যে তাঁহার রাজভক্তি বা সাম্রাজ্যানুরাগ (loyalty) নাই; সুতরাং তাঁহারা মুস্কিলে পড়িয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলেন, He would be a bold man to say that the voice of the non-official members under the circumstances were free votes।

যাহা হউক অধিকাংশের মতে মেয়ার সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ১৮ জন ইহার সপক্ষে ও ৫ জন বিপক্ষে মত দেন। আমরা যতটা বুঝি, এই পাঁচ জন সভ্য লোকমত অনুসারে ভোট দিয়াছেন।

শুধু যদি অতিরিক্ত লাভের উপরই ট্যাক্স বসাইয়া তাহা

যুদ্ধের জন্য দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, যে, এই ট্যাক্স ইংরেজ বণিকদের দান নয়; ইহা ভারতবর্ষের ন্যায্য পাওনা। ইহা হইতে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। পাটচাষীরা এবং তাহাদের মত আরও অনেক লোক অর্দ্ধনগ্ন ও অর্দ্ধভুক্ত থাকায় তবে ইংরেজ বণিকদের অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে।

দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন

(কারমাইকেল-অধ্যাপকের বক্তৃতার সারাংশ)

সাধারণতঃ আমরা কোন দেশের ইতিহাস বলিতে তাহার রাজনৈতিক ইতিহাস বুঝিয়া থাকি, কিন্তু ইতিহাস শব্দটিকে এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। এমন কি অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস জাতীয় উন্নতি বা অবনতি বুঝিবার পক্ষে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশী সহায়তা করে। আমি এই প্রবন্ধে ইতিহাস এই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিব এবং খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬০০ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতের সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল দেখাইবার চেষ্টা করিব। এসম্বন্ধে আমাদের উপাদানও যথেষ্ট রহিয়াছে। ধর্ম্ম ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সূত্রযুগের গ্রন্থাবলী অর্থাৎ বোধায়ন, গৌতম, আপস্তম্ব প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, কাত্যায়নের বার্ত্তিক, এমন কি বৌদ্ধ সাহিত্যের আদি পুস্তকগুলি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন এই সময়ের প্রধান ঘটনা। ব্রাহ্মণ-যুগেই আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা অতিক্রম করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভীম নামক রাজকুমারকে "বৈদর্ভ" অর্থাৎ 'বিদর্ভের রাজকুমার' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিদর্ভ এখনকার 'বেরার'; ইহা দক্ষিণভারতের স্থানবিশেষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই আবার ঋষি বিশ্বামিত্রের গল্প আছে, তিনি তাঁহার পঞ্চাশ পুত্রকে শাপ দিয়া আর্য্যপ্রদেশের 'সীমান্তে' নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মূতিব প্রভৃতি জাতি ঐ পঞ্চাশ জন নির্ব্বাসিত পুত্রের বংশধর, আর মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণাদি পড়িলে জানা যায় যে অন্ধ্র প্রভৃতি জাতি দাক্ষিণাত্যে বাস করিত। পাণিনির সময় প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭০০ বৎসর। তিনি দক্ষিণভারতে কেবলমাত্র 'অশ্মক' দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। "সুত্ত-নিপাত' একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক, ইহাতে ব্রাহ্মণগুরু বভরিনের উল্লেখ আছে। বভরিনের ছাত্রদিগের উত্তরভারত-যাত্রার গল্প হইতে বেশ বোধ হয় যে আর্য্যগণ বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণভারতে প্রবেশ করেন। পাণিনির সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে কেবলমাত্র 'অশ্মক' দেশের কথা জানিতেন, কিন্তু কাত্যায়নের বার্ত্তিক হইতে জানা যায় যে তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর্য্যগণ পাণ্ড্য, চোড়, ও কেরল দেশের বিষয়ও অবগত হইয়াছিলেন।

দেখা যাউক এই উপনিবেশ স্থাপন প্রসঙ্গে কি কি প্রমাণ পাওয়া যায়। 'চোড়' শব্দটি গ্রহণ করুন। প্রাচীন দস্যু বা দাস শব্দটার ন্যায় চোড় শব্দও প্রথমে অনার্য্য জাতির সংজ্ঞা ছিল। পরে যখন আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের ভিতর আসিয়া পড়িলেন, তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অনার্য্যদিগকে চোড় বা চোর আখ্যা দিলেন ও ক্রমে শব্দটি খারাপ অর্থ অর্থাৎ "তস্কর" বুঝাইতে লাগিল, ক্রমে এই অর্থই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। ঋগ্বেদের কোন স্থানেই তস্কর অর্থে 'চোর' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, দক্ষিণ ভারতে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের সময় হইতেই এই অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ড্য শব্দটিও এইরূপে উপনিবেশ স্থাপন সূচনা করে। প্লিনি (Pliny) ও মেগাস্থিনিস (Megasthenes) যে-সকল কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সেগুলি একটু মনোযোগ দিয়া আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে উত্তর-ভারতে মথুরার চারিধারে যে পাণ্ডু নামে জাতি ছিলেন তাঁহারাই দক্ষিণভারতে গিয়া বাস করেন ও সেখানে তাঁহাদের নূতন উপনিবেশের নাম "মোদোরা" অর্থাৎ মদুরা রাখেন। তাঁহারা তাঁহাদের আদি

বাসস্থানের নামেই তাঁহাদের নূতন বাসস্থানের নামকরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ নামকরণ বিষয়ে তাঁহারা যে কোন অভিনব রীতির প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রাচীর ও প্রতীচীর ইতিহাসে এরূপ নামকরণের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, আর্য্যগণ প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। টলেমি (Ptolemy) (খৃঃ পূঃ ১৫০ বৎসর) ও বরাহ-মিহিরের (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) গ্রন্থেও এই মতের পরিপোষক ঐতিহাসিক উপাদান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যগণ এতদূর আসিয়াই নিশ্চেষ্ট হন নাই। "মদুরা" হইতে তাঁহারা সিংহলে যান ও তথায় আর-একটি "মথুরা" স্থাপন করেন। তথা হইতে পুনরায় পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে (Eastern Archipelago) যাত্রা করেন ও তথায় আরও একটি (চতুর্থতম) "মদুরা" সংস্থাপন করেন। মৌর্য্যশক্তির অভ্যুত্থানের বহুপূর্ব্ব হইতেই সিংহল তাম্রপর্ণি নামে প্রসিদ্ধ ছিল ; ইহা হইতে বেশ প্রমাণিত হয় যে আর্য্যগণ (Tinnevelly) তিনেবেল্লী জেলায় তাম্রপর্ণি নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে সিংহলে গমন করেন ও ঐ দ্বীপের তাম্রপর্ণি নামকরণ করেন। এইরূপভাবে উপ-নিবেশ সংস্থাপনের আর একটি প্রমাণ নিজাম রাজ্যের (Nizam's Dominions) "পটিট্‌ঠান বা পৈথান,—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের উপর অবস্থিত পটিট্‌ঠান বা প্রতিষ্ঠান হইতেই যে আর্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্থানে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন ও তাহার এইরূপ নাম রাখেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইবার কি প্রণালীতে আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। পুরাকালে আর্য্যগণ যে ভাবে আফগানিস্থান ও পঞ্জাব হইতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, দক্ষিণ ভারতে গমন কালেও সেই রীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অধীনে তাঁহারা নূতন নূতন স্থানে প্রবেশ করিতে থাকেন ও দলপতি ক্ষত্রিয়সংঘের নামে ঐ-সকল স্থানের নামকরণ করেন। এ বিষয়ে শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত বিদেঘ মাঠবের নামে বিদেহ রাজ্যের নাম, পাণিনির পঞ্চাল শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যাইতে পারে। চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে দণ্ডক্য ভোজের গল্প দিয়াছেন, কৃষ্ণা জেলায় প্রাপ্ত জগজ্জপেত তাম্রলিপিতে ইক্ষ্বাকু বংশের উল্লেখ আছে। এই ভোজবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ কোথা হইতে আসিল ? ইহারা উত্তর ভারতের ভোজ ও ইক্ষ্বাকুবংশের অধস্তন পুরুষ, দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

এই উপনিবেশ স্থাপনের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমতঃ রাজ্যবিস্তার, দ্বিতীয়তঃ আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার। পরবর্ত্তী যুগের বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের ন্যায় তখনকার ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সভ্যতা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ঋষি অগস্ত্য, সুত্ত-নিপাতের ব্রাহ্মণগুরু বভরিন, এমন কি ঋক্‌রচয়িতা প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সতত উদ্যোগী ছিলেন।

আর্য্যগণ দুইটি পথ ধরিয়া দক্ষিণভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটি জলপথ, অপরটি স্থলপথ। স্থলপথে, তাঁহারা অবন্তীদেশের ভিতর দিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া বিদর্ভে উপস্থিত হন, তথা হইতে মূলক, মূলক হইতে অশ্মক—এ পর্য্যন্ত বভরিনের ছাত্রদের অনুসৃত পথ হইতে বেশ বুঝা যায়। ইহার পরের পথ অশোক অনুশাসনের প্রাপ্তিস্থান হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয় ; আর্য্যগণ অশ্মক হইতে রাইচুর ও চিতলদ্রুগের ভিতর দিয়া মদুরা জেলায় উপনীত হন। জলপথে, আর্য্যগণ প্রথমতঃ সিন্ধুনদ বাহিয়া কচ্ছে উপস্থিত হন, তথা হইতে সুরাষ্ট্র বা কাথিয়াওয়ার, তাহার পর বর্ত্তমান ব্রুচ এবং সেখান হইতে বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলার অন্তঃপাতী সোপারায় উপস্থিত হন।

আর্য্যগণ যেখানেই উপনিবেশ স্থাপন করেন, নিজেদের সভ্যতার সহিত আর্য্যভাষাও আদিম অধিবাসীদের ভিতর চালাইয়া দেন। কিটেলের (Kittel) অভিধান, ছান্দোগ্য-উপনিষদের 'মতচি' শব্দ প্রভৃতি হইতে বেশ বুঝা যায় যে এক সময়ে উত্তর ভারতে দ্রাবিড় দেশীয় ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহার পর আর্য্যগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারতে দ্রাবিড় ভাষার লোপ ও আর্য্যভাষার প্রচলন হইল। কিন্তু দক্ষিণভারতে ঠিক ইহার উল্টা ঘটিল। খৃষ্টাব্দের ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত দক্ষিণভারতে দ্রাবিড় ও আর্য্য উভয় ভাষাই প্রচলিত ছিল—কিন্তু ঐ সময়ের কিছু পরে আর্য্যভাষার লোপ ঘটাইয়া দ্রাবিড় ভাষা বলবতী হইয়া উঠিল। সিংহলে উত্তর ভারতের ন্যায় আর্য্য ভাষারই জয় হইল—সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারের সহিত মহারাষ্ট্র বা কলিঙ্গ হইতে আনীত আর্য্য পালিভাষা আধিপত্য লাভ করিল।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।